সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

৪৪শ বর্ষ] ১৩৭২ সালের বৈশাখ সংখ্যা হইতে আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত [১ম খণ্ড

বিবিধ-বিষয়ক রচনা—

ষাণ্মাসিক সূচীপত্র

মাসিক বসুমতী (কাঠখোদাই) চাঁদনী রাতে

॥ কার্তিক, ১৩৭২ ॥ —সুহৃদ মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত

● স্বর্গত সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ●

মাসিক বসুমতী

॥ ৪৪ বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড ॥

॥ কার্ত্তিক ১৩৭২ ১ম সংখ্যা ॥

॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

উপমা—(১) রাসলীলা

কথাপ্রসঙ্গে রাসলীলা উত্থাপিত হইলে সুরুচিপূর্ণ নরেন্দ্রনাথ বলেন, একে ত পৌত্তলিকতা, তাতে আবার নীতি-বিরুদ্ধ আচরণকে ধর্ম বলিয়া প্রশ্রয় দেওয়ায় দেশটা উৎসন্ন যাইতেছে। ঠাকুর সহাস্যে কহিলেন, ভাল—তোর কথাই মানলাম। কিন্তু উপাসনার আনন্দ লাভ উদ্দেশ্যে ব্রহ্মের অভয় চরণ করুণার হৃদয়, চিন্ময়রূপ কল্পনা করা কি পৌত্তলিকতা নয়? নরেন্দ্রনাথ নিরুত্তর। পুনরায় ঠাকুর কহিলেন, তুই যখন তখন স্বাধীন চিন্তার কথা বলিস; ঠিক ঠিক স্বাধীন চিন্তাতে ভাব দেখি, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার বক্তা কে, আর শ্রোতাই বা কে? মৃত্যু যাঁর আসন্ন, সেই রাজা পরীক্ষিৎ সদ্গতি লাভের আশায় ভগবানের লীলাকথার শ্রোতা, আর মায়া যাঁকে স্পর্শ করতে পারে নাই, সেই বাল-সন্ন্যাসী শুকদেব গোস্বামী বক্তা; এমন ক্ষেত্রে তোর ও কথা কি সম্ভব? নরেন্দ্রনাথ নির্বাক্। তখন ঠাকুর বলিলেন, রাসলীলার ভাবটা হচ্ছে ত্যাগ আর ধ্যানের পরাকাষ্ঠা. সত্য, এক কৃষ্ণ কি এককালে বহু হয়েছিলেন? তা নয়। গোপীরা কৃষ্ণপ্রেমে এতই উন্মত্ত হয়েছিল যে, ঘর-সংসার ছেড়ে বনে এসে, প্রত্যেকেই তন্ময় হয়ে বোধ করেছিল, যেন তাহারই পাশে কৃষ্ণ বিদ্যমান। আবার অনুরাগ-পরীক্ষার জন্য ঠাকুর যখন তাদের ছেড়ে চলে যান, তখন কোন কোন গোপী ধ্যানে কৃষ্ণময় হয়ে বলেছিল—নাসৌ রমণঃ নাহং রমণী—আমিই কৃষ্ণ। এ যে বেদান্তের পরাজ্ঞান। তাই মহাপ্রভু এই রাসলীলা-ধ্যানে বিভোর থাকতেন। তবে অন্তরে কামগন্ধ থাকতে রাসলীলার রস আস্বাদ ক'রতে পারা যায় না।

উপমা—(২) ভগবান দয়াময়

মাদ্রাজে সেবার দারুণ অন্নকষ্ট হওয়ায় বহুলোক অনাহারে মারা যাচ্ছে শুনে, হৃদয়বান নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অনুযোগ করেন—আপনি ত সদাই বলেন, ভগবান দয়াময়; কিন্তু অসংখ্য লোক যখন অন্নাভাবে মরছে, তখন ভগবানকে কি ক'রে দয়াময় বলিতে পারি? ঠাকুর মৃদু হাস্যে কহিলেন, বেশ কথা! তোদের সায়েন্ (সায়েন্সে) না বলে, এক একটা

এক একটা জগৎ, তার মধ্যে তোদের এই জগৎটা না কি সকলের চেয়ে ছোট, আবার এই জগৎটাতে কত দেশ আছে, তার মধ্যে ভারত একটা, তার ভিতর আবার বাংলা দেশ, তার রাজধানী কলকাতা, তার একটা গলিতে তোদের বাড়ী, তার ভেতর তুই একজন। হিসেব ক'রতে গেলে, তুই ত রেণুর রেণুও হ'স্ না। তখন অতি নগণ্য তুই কি না তোর সৃষ্টিকর্তার দোষগুণের বিচার করতে চাস! এই যে তাঁর পরম দয়া। নরেন্দ্রনাথ অধোবদন!

উপমা—(৩)

সগুণ ব্রহ্মোপাসক নরেন্দ্রনাথের অন্তরে নির্গুণ ব্রহ্মের ভাব দৃঢ় করিবার অভিপ্রায়ে ঠাকুর তাঁহাকে অষ্টাবক্র-সংহিতা পড়িতে বলিতেন। "জ্ঞানামৃতসমরসোহহং" জীব-ব্রহ্মের একতাব্যঞ্জক শ্লোকটি পড়িয়াই পুঁথিখানি রাখিয়া কহিলেন,

আমি কি তোকে তোর জন্য পড়তে বলেছি, আমাকে শুনোবি বলে পড়তে বলেছি। এইরূপে ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে অদ্বৈত-ভাবে ভাবিত করেন।

জীব-ব্রহ্ম অভেদ বলা বা ভাবা বড় স্পর্দ্ধা!!! ঠাকুর কহিলেন,

উপমা—(৪)

দেবতা মন্ত্রের অধীন, মন্ত্র—শিবতম রস গায়ত্রী উপাসক ব্রাহ্মণের অধীন; সুতরাং ব্রাহ্মণ দেবতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ—এই শাস্ত্রবাক্য-পোষণে ব্রাহ্মণত্ব অভিমানী এক যুবক ভাবিতেছে, এবার ঠাকুরের সন্তানমধ্যে শূদ্রভাগই অধিক। জগদ্‌ভ্রম-নিরশনে যাঁর আবির্ভাব, সেই অন্তর্যামী প্রভু তার ভ্রম নাশ ও ভাবপুষ্টি জন্য কহিলেন, না রে তা নয়। একে একে নাম গণিয়া বলিলেন, তোরা ব্রাহ্মণই অধিক, শূদ্র কম। এখন তাহাকে আপন ভাবে আনয়ন অভিপ্রায়ে কহিলেন, ভগবান যখন ভূতলে অবতীর্ণ হন, দেবতারা তাঁর লীলারস আস্বাদ করতে মর্ত্ত্যে আসেন। রাম-অবতারে দেবতারা সব বানর সেজে এসেছিলেন। কৃষ্ণ অবতারে গয়লা হয়ে এসেছিলেন। (আপনাকে দেখাইয়া) এবার না হয় ভদ্র-শূদ্র সেজে এসেছেন, তাতে কি দোষ হ'তে পারে? তবু তোদের ব্রাহ্মণের ভাগই অধিক।

[illegible] অধ্যায়

নব্যদের মোহ নাশ

অকৃতাত্মা হইলেও প্রভুর অনুকম্পায় কৃতাত্মা হইয়া নব্যগণ এতই স্ফীত যে, তাহারা ধরাকে সরাজ্ঞান করিত এবং আপনাদিগকে যেন ঠাকুরের মহাজন বলিয়া ভাবিত। কিন্তু তিনি যাহাদিগকে আপন করিয়া লইয়াছেন, তাহাদিগকে তিরস্কারের পরিবর্তে পুরস্কার করিয়া কহিলেন, "ওরে! আমি উলুবনে মুক্তা ছড়াইনে, কালে সব বুঝতে পারবি।" আরও কহিলেন, "যাঁরে ধ্যানে না পায় মুনি, তাঁরে ঝাঁটায় ঝেঁটোয় নন্দরাণী।" তো শালারা আমাকে লাট করে ফেল্লি। কেশব সেন রামকে বলেছিল—"তোমরা বুঝতে পারছ না উনি কে? তাই অত ঘাঁটাঘাঁটি করছ। ওঁকে মখমলে মুড়ে ভাল একটি গেলাসকেসের মধ্যে রাখবে, দুচারটি ভাল ফুল দেবে, আর দূরে হতে প্রণাম ক'রবে।" ইহাতে একজন কহিল,—"মহাশয়! আমরা ত আর কেশববাবু নই যে, তাঁর মত আপনাকে দেখবো; না হয় কাল হ'তে আপনাকে আর বিরক্ত ক'রতে আসবো না।" ঠাকুর অমনই সহাস্যে কহিলেন, "বা গো সখী! ঠোঁটের আগায় রাগটুকুও আছে।"

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত হইতে

কবি বিদ্যাপতি বন্দনা

জয় বিদ্যাপতি কবিকুল চন্দ।
রসিক সভাভূষণ সুখ কন্দ॥
শ্রীশিব সিংহ নৃপতি সহ প্রীত।
জগত ব্যাপি রহু বিশদ চরিত॥
লছিমা গুণকি রূপকে বহুবর।
বিলসয়ে রূপনারায়ণ সঙ্গ॥
বৃন্দাবন বন কেলি বিলাস।
করু কত ভাঁতি যতনে পরকাশ॥
শ্রীগোকুল বিধু গোর কিশোর।
গণ সহ যাক গীতরসে ভোর॥
নরহরি ভণ অরু কি কহব তায়।
অনুখন মন জনু রহে তছু পায়॥

—নরহরিদাস

বিদ্যাপতি কবি ভূব।
অগণিত গুণজন রঞ্জন, ভণব কি সুখময়
পিরীতি মুরতি রসকূল॥
শিশু সময়াবধি অধিক পরাক্রম
বিরচল দেবচরিত বহু ভাঁতি।
কোই করল উপদেশ পরম রস উলসিত
তাহে নিরত রহু মাতি॥
শ্রীশিব সিংহ নৃপতি লছিমা প্রিয় অতুল
বিমল যশ বিদিত হি ভেল।
শ্যামর গোরী কেলিমণি সংপুট
যতনে উঘাতি ভুবন ধনি কেল॥
মরি মরি যাক গীত নব অমিয়
পিবি পিবি জীবই সে রসিকচকোর।
নরহরি তাক পরশ নাহি পাওল
বুঝব কি ওরস মরুমতি মোর॥

—নরহরিদাস।

বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মবান্ধব

শ্রীনলিনীকুমার ভদ্র

কলিকাতা শিমুলিয়ার বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র নরেন্দ্রনাথের অন্যতম অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ১৮৮০ সাল বা তার কাছাকাছি সময়ে এই সৌহার্দ্যের সূচনা। ভবানীচরণের বয়স তখন উনিশ বছর (জন্ম ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬১ সাল), নরেন্দ্রনাথের চেয়ে বছর দুয়ে কর বড় তিনি। বয়ঃকনিষ্ঠ নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ভবানীর বন্ধুত্ব স্থায়ী হয়েছিল। জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছেও একে অপরকে সম্বোধন করতেন এঁরা---'ভবানী' ও 'নরেন' বলে।

যৌবনকালে শারীরিক কসরৎ ইত্যাদির দিকে দুই বন্ধুরই ছিল প্রবল ঝোঁক। নরেন্দ্র ছিলেন লাঠিখেলায় ওস্তাদ আর ভবানী সুনিপুণ কুস্তিগীর। ভবানী মেট্রোপলিটান কলেজের (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ), আর নরেন্দ্র জেনারেল এ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশনের (বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজ)। যুগধর্মের প্রভাবে কলেজে অধ্যয়নরত এই দু'টি তরুণ-বিদ্যার্থীর ওপরেই যুক্তিবাদ এবং অজ্ঞাবাদ (agnosticism) একটু একটু করে প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছিল। যদিও এঁদের ধর্মপ্রবণতা ছিল সহজাত। নরেন্দ্রনাথের গানের গলা ছিল সুমধুর আর ভবানী ছিলেন সুমিষ্ট মেজাজের অধিকারী।

তখনকার দিনে মহানগরীর উপকণ্ঠে ছিল এক উদ্যানবাটিকা—নাম তার 'তপোবন।' এখানে দুই বন্ধু প্রায়ই যেতেন বনভোজন করতে। মাঝে মাঝে হত গানের জলসা, আর হত সামাজিক, রাজনৈতিক এবং দার্শনিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপচারণা। যৌবনের সেই উৎসবানন্দে পরিপূর্ণ, সংগীতমুখর দিনগুলির কথা স্মরণ করে জীবন-সন্ধ্যায় ভবানীচরণ একটি প্রবন্ধে লোকান্তরিত বন্ধুর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, "স্বামীজী! আমি তোমার যৌবনের বন্ধু—তোমার সহিত কত আমোদ-প্রমোদ করিয়াছি—বনভোজন করিয়াছি—গল্প-গাছা করিয়াছি।- - -"

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামী এবং তাঁর নববিধান ব্রাহ্ম-সমাজের অন্যতম প্রচারক ছিলেন প্রিয়নাথ মল্লিক। জাতীয়তার আদর্শে অনুপ্রাণিত এই ধর্মপ্রচারকের সংস্পর্শে আসেন দুই বন্ধু—নরেন্দ্র আর ভবানী। তারিণীচরণই এঁদের পরিচয় করিয়ে দেন কেশবচন্দ্রের সহিত। ১৮৮১ সালে কেশবের বাড়িতে 'নববৃন্দাবন' নাটকের যে উল্লেখ্য অভিনয় হয় নরেন্দ্রনাথ তাতে অভিনয় করেন 'যোগীর' ভূমিকায়। এই অনুষ্ঠানের টিকিট বিক্রির কাজে ব্যাপৃত ছিলেন ভবানীচরণ। দুই বন্ধুই আকৃষ্ট হয়েছিলেন কেশব এবং তাঁর নববিধানের বিরোধী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি।

এই ১৮৯১ সালটি নরেন্দ্রনাথের জীবনে অবিস্মরণীয়। এই বছরেই তিনি প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের বাড়িতে প্রথম শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন। দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত সুরু হয় এই বছরেরই ডিসেম্বর মাস থেকে। শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হল এবং ক্রমে ক্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ হয়ে উঠলেন তাঁর আধ্যাত্মিক জীবনের দিশারী। ভবানী কিন্তু তখনো কেশবকে ছেড়ে যান নি। ফলে নরেন্দ্রনাথ ও ভবানী এই দুই বন্ধুর অন্তরঙ্গতায় ছেদ পড়ল।

ব্রহ্মবান্ধব পরমহংসদেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নি বটে কিন্তু তিনি তাঁর প্রতি একান্ত শ্রদ্ধাবান ছিলেন। কেশবের ন্যায় পরমহংসদেবও তাঁর অধ্যাত্মভাবনার ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। পরবর্তী জীবনে শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করতে গিয়ে নিজের সম্পাদিত 'স্বরাজ' পত্রিকায় (১০ই চৈত্র, ১৩১৩ সাল) তিনি (তখন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় নামে বিখ্যাত) বলেছিলেন—"রামকৃষ্ণ কে? তিনি সাধক চূড়ামণি। উচ্ছাসময়ী আবেগময়ী ভাবসাধনার বলে তিনি সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ ভাব আহরণ করিয়া তাঁহার ব্রহ্মবিজ্ঞানের পূর্ণতা প্রকট করিয়াছিলেন।- - -রামকৃষ্ণ কামিনী-কাঞ্চন-বিজয়ী—ব্রহ্মবিজ্ঞানী - - - ভক্ত চূড়ামণি-লোকরক্ষার সেতু—ভাবসমন্বয়ের সাগর।"

● স্বামী বিবেকানন্দ

পরমহংসদেবের প্রতি অপরিমেয় শ্রদ্ধা থাকা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু তাঁর অবতারত্বে বিশ্বাসী ছিলেন না, দ্বৈতবাদের ওপরেও তাঁর বিশ্বাস ছিল না এবং ১৮৯১ সাল থেকে ১৯০১ সাল এই এক দশককাল সংগ্রাম চালিয়েছিলেন তিনি এই অবতারতত্ত্ব ও দ্বৈতবাদের বিরুদ্ধে। এই বিষয় নিয়ে প্রিয়তম বাল্যবন্ধু নরেন্দ্রনাথকে পর্যন্ত যে তিনি আক্রমণ করেছিলেন---এটা তাঁর নিজের পক্ষেই এক মর্মান্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কর্ম এবং অধ্যাত্ম-ভাবনা ও সাধনার জগতে পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেও নরেন্দ্রনাথ ও ভবানীচরণ, এঁরা উভয়েই ছিলেন অধ্যাত্ম ভারতের তীর্থপথিক। গুরুভাইদের সঙ্গে বিরজাহোম করে নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসগ্রহণ করেন। ১৮৮৭ সালের জানুয়ারি মাসে। বছর কয়েক পরে আমেরিকা যাত্রার প্রাক্কালে স্বীয় শিষ্য খেতরির মহারাজা অজিত সিংজীর অনুরোধে বিবেকানন্দ নাম গ্রহণ করেন এবং ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চিকাগো নগরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্ম সম্মেলনে বৈদান্তিক হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে জগৎসভায় মাতৃভূমিকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন।

ওদিকে কেশবের ধর্মব্যাখ্যানে কিন্তু আত্মার ক্ষুধা মিটল না ভবানীচরণের। ব্রাহ্মধর্ম পরিত্যাগ করে খৃস্টধর্মের আশ্রয় নিলেন তিনি—শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠলেন পুরোপুরি রোমান ক্যাথলিক খৃস্টান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধর্মজীবনের চরম সম্পদের সন্ধান পেলেন বেদান্তের মধ্যে এবং প্রায়শ্চিত্ত করে আবার ফিরে এলেন স্বধর্মে। ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে হিন্দু সন্ন্যাসীর গৈরিক বাস ধারণ করে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় এই নাম গ্রহণ করলেন। এ হল বিবেকানন্দের সন্ন্যাসগ্রহণের সাত বৎসর এবং পাশ্চাত্যে তাঁর ধর্ম-বিজয়ের বছরখানেক পরে কথা।

পশ্চিমে বিবেকানন্দের বেদান্ত প্রচার ব্রহ্মবান্ধবের হৃদয়ে যে কি প্রবল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল, তাঁর একটি প্রবন্ধের নিম্নোক্ত পংক্তিগুলোতে তার কতকটা পরিচয় পাওয়া যাবে। "স্বামী বিবেকানন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধের প্রসঙ্গক্রমে, তিনি বলছেন, "কে এই পরিব্রাজক সন্ন্যাসী! ইহার স্পর্দ্ধা ত' কম নয়—স্থূল বিজ্ঞান-দৃপ্ত ফিরিঙ্গির কোটের ভিতরে গিয়া সিংহনিনাদে ঘোষণা করিলেন—হিন্দুজাতি জগতের

একমাত্র হিন্দুর নিবৃত্তিময়ী সভ্যতাই জগৎকে শান্তি ও একতার পথে লইয়া যাইতে পারে। ঐ বিজয়ভেরীর রব—ঐ সিংহনির্ঘোষ শ্রবণ করিয়া ফিরিঙ্গি স্থানের নরনারীরা চকিতস্তম্ভিত হইয়াছিল। তাহারা স্বীকার করিয়াছিল যে, আর্যজ্ঞানের অপেক্ষা উচ্চতর জ্ঞান নাই- - -"

ইউরোপ এবং আমেরিকায় অচিন্ত্য বেদান্তের জয়পতাকা উড্ডীন করে বিবেকানন্দ স্বদেশে ফিরে এলে পর, ব্রহ্মবান্ধব তাঁর বাল্যবন্ধুর সঙ্গে আবার যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন। শুধু তাই, নয়, স্বামীজীর আরব্ধ কাজে সহযোগিতা পর্যন্ত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সে উদ্দেশ্য সফল হয় নি। ব্রহ্মবান্ধব কলকাতায় এবং পরে বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে গিয়েও তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন। এই দুই বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর তখন কোন কোন বিষয় আলাপচারণা হয়েছিল আজ তা আর জানবার কোনো উপায় নেই।

এই দুই সুহৃদের শেষ সাক্ষাৎ হয়েছিল কলকাতায় হেদোর ধারে। ব্রহ্মবান্ধব স্বামীজীকে দেখতে পেয়ে তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, "ভাই চুপ করে বসে আছ কেন। এস—একবার কলকাতা সহরে বেদান্ত বিজ্ঞানের একটা রোল তোলা যাক। আমি সব আয়োজন করে দেবো, তুমি শুধু একবার আসরে এসে নামো।"

এ কথার উত্তরে বিবেকানন্দ কাতরস্বরে বললেন—"ভবানী ভাই! আমি আর বাঁচব না।(১) আমার মঠটি সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করে কাজের সাধ্যমত সুবন্দোবস্ত করে যেতে পারি তারি জন্য ব্যস্ত আছি। আমার অবসর নেই।"

এই ঘটনার মাত্র ছয় মাস পরে ১৯০২ সালের ৪ঠা জুলাই স্বামীজী মহাপ্রয়াণ করেন।

বন্ধুর মহাপ্রয়াণের কালে ব্রহ্মবান্ধব ছিলেন বোলপুরে। রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্য আশ্রমে বেড়াতে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে সবে হাওড়া ষ্টেশনে নেমেছেন এমন সময় শুনলেন কে যেন বলছে—"স্বামী বিবেকানন্দ আর ইহলোকে নেই, কাল তিনি মানব-লীলা সংবরণ করেছেন।" তাঁর তখনকার অনুভূতি ও ভাবনা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—"শুনিবামাত্র আমার বুকের মাঝে—একটুও বাড়ানো কথা নয়—ঠিক যেন একখানা ছুরি বিঁধিয়া গেল। বেদনার গভীরতা কমিয়া গেলে আমার মনে হইল—বিবেকানন্দের কাজ কেমন করিয়া চলিবে। কেন তাঁহার ত' অনেক উপযুক্ত বিদ্বান গুরুভাই আছেন—তাঁহারা চালাইবেন। তবুও একটা প্রেরণা হইল—তোমার যতটুকু শক্তি আছে ততটুকু তুমি কাজে লাগাও—বিবেকানন্দের ফিরিঙ্গি জয় ব্রত উদ্‌যাপন করিতে চেষ্টা কর।"

এক দিব্য প্রেরণার মুহূর্তে হাওড়া ষ্টেশনের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে পদচারণা করতে করতে দৃঢ় সংকল্প জাগল ব্রহ্মবান্ধবের হৃদয়ে—বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিলেতে গিয়ে বেদান্তের প্রতিষ্ঠা করবেন তিনি। কায়মনোবাক্যে আত্মনিয়োগ করবেন স্বামীজীর আরব্ধ ব্রত উদ্‌যাপনে—তার উত্তরসাধক হবেন তিনি।

দিনকতক পরে এই নিঃসম্বল সন্ন্যাসী কাষবেশে মাত্র সাতাশটি টাকা নিয়ে কলকাতা থেকে মাদ্রাজ যাত্রা করলেন। সেখানে এক বন্ধুর কাছ থেকে পাথেয় যোগাড় করে বোম্বাইয়ে গিয়ে পৌছলেন এবং ৫ই অক্টোবর জাহাজে জেনোয়ার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। জাহাজে চড়বার আগে পোতাশ্রয়ের মেডিক্যাল অফিসার তো কম্বল এবং কমণ্ডলু মাত্র সম্বল যাত্রীটিকে দেখে রীতিমত হতচকিত।

বিলেতে গিয়ে 'উক্ষপার' (২) (Oxford) ও 'কামব্রীজে' (Cambridge) বেদান্তের যে জ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা করলেন ব্রহ্মবান্ধব তা শুনে মুগ্ধ হলেন সেখানকার বিদগ্ধজনেরা। এমন কি তাঁরা হিন্দু অধ্যাপক নিযুক্ত করে বেদান্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করবেন বলে স্বীকার করলেন। বিলাতের উচ্চশিক্ষিত মহলে বেদান্তের প্রভাবের প্রসঙ্গে ব্রহ্মবান্ধব লিখেছেন: "আমি সামান্য লোক। আমার দ্বারা যে এতবড় একটা কাজ হইয়া গেল—তাহা আমার কাছে ঠিক স্বপ্নের মত। এই সমস্ত বিবেকানন্দের প্রেরণাশক্তির দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে—অঘটন ঘটিয়াছে—তাই অনেক সময় ভাবি—বিবেকানন্দ কে। বিবেকানন্দ যে প্রকাণ্ড কাজ বাঁধিয়া গিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিবেকানন্দের মহত্ত্বের ইয়ত্তা করা যায় না।"

বিবেকানন্দের অনুজ ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত স্বামীজী সম্বন্ধে বৃহদায়তন আলোচনামূলক গ্রন্থ লিখেছেন তার অভিধা হচ্ছে Swami Vivekananda : Patriot Prophet—বস্তুত বিবেকানন্দ একাধারে জগতের শিক্ষাগুরু এবং ভারতের স্বাদেশিকতার অন্যতম ভবিষ্যদ্রষ্টা ঋষি। তাঁর আগে স্বদেশের দুঃখ-দুর্দশা সমগ্র সত্তা দিয়ে বোধ করি আর কেউ উপলব্ধি করেন নি। দেশের জন্য স্বামীজীর এই অন্তর্গূঢ় মর্মবেদনার চিত্র আঁকতে গিয়ে ব্রহ্মবান্ধবের লেখনী থেকে বেরিয়ে এসেছে এমন দুটি অপূর্ব পংক্তি বাস্তবিকই যা অপূর্ব ব্যঞ্জনাময়। তিনি লিখেছেন—"ঐ ব্যথার কথা ভাবি—বেদনার কথা চিন্তা করি—আর জিজ্ঞাসা করি—বিবেকানন্দ কে। দেশের জন্য ব্যথা কি কখন শরীরিণী হয়। যদি হয়ত বিবেকানন্দকে বুঝা যাইতে পারে।"

বিবেকানন্দের মতো ব্রহ্মবান্ধবের হৃদয় ও স্বদেশপ্রেম কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ ছিল। দেশাত্মবোধে অনুপ্রাণিত রাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রামের পথকেই বেছে নিলেন তিনি। বিবেকানন্দের দেহত্যাগের এক বছর পরে ১৯০৩ সাল থেকে বাংলার স্বাদেশিকতার ক্ষেত্রে যে নতুন বিপ্লবী ভাবধারা ও কর্মপ্রচেষ্টা ভিতরে দানা বেঁধে উঠতে লাগল, ১৯০৪ সালে সন্ধ্যা পত্রিকা প্রকাশ করে ব্রহ্মবান্ধব হলেন তাঁর অন্যতম প্রধান প্রবক্তা। ১৯০৫ সালের স্বদেশ আন্দোলনের যুগে স্মরণীয় ভূমিকা গ্রহণ করল সন্ধ্যা—এই পত্রিকার মাধ্যমে দেশের মানুষকে অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করবার সাধনায় ব্রতী হলেন ব্রহ্মবান্ধব। বাংলার অগ্নিযুগের যে-সকল বিপ্লবী একদা জীবন তুচ্ছ করে দেশের মুক্তি সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন, বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মবান্ধব এই দুইজন বৈদান্তিক সন্ন্যাসীর ভাব ও চিন্তাধারা যে তাঁদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল এটা ঐতিহাসিক সত্য।

'সন্ধ্যা' ছিল জনসাধারণের কাগজ—দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জন্য ব্রহ্মবান্ধব ১৯০৭ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠা করলেন আর একটি সচিত্র সাপ্তাহিক 'স্বরাজ'। এই স্বরাজ পত্রিকার ফাইল আজ দুষ্প্রাপ্য। স্বরাজের ৩য় সংখ্যায় (১০ চৈত্র, ১৩১৩ সাল) সম্পাদকীয় নিবন্ধটির অভিধা 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ'। এ ছাড়া উক্ত সংখ্যায় 'রামকৃষ্ণ কথা' এবং 'রাসমণির কালীবাটি' নামে ব্রহ্মবান্ধবের লেখা দুটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। ৮ম সংখ্যার (২২ বৈশাখ, রবিবার, ১৩১৪ সাল) সম্পাদকীয় নিবন্ধটি স্বামী বিবেকানন্দের সম্পর্কে। এ ছাড়া 'বিবেকানন্দ কে?' শীর্ষক সম্পাদকের আরো একটি লেখা ঐ সংখ্যায় বেরিয়েছিল। স্বরাজে প্রকাশিত রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ব্রহ্মবান্ধবের লেখাগুলির মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে এই যে, উন্মার্গগামী বাঙালী জাতিকে তাঁরাই ফিরিয়ে এনেছেন ভারতের প্রকৃত আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের মঙ্গলময় পথে।

'বিবেকানন্দ কে' অভিধাযুক্ত প্রবন্ধে ব্রহ্মবান্ধব (পূর্বাশ্রমের ভবানী) বাল্যবন্ধু নরেন্দ্রের বড় একটি অন্তরঙ্গ ছবি এঁকেছেন: "নরেন্দ্র ছেলেবয়সে বড় আমুদে ছিলেন। তাস খেলিতে, ইয়ার্কি দিতে—তামাক ফুঁকিতে, গাওনা-বাজনা করিতে—এমন আর দুটি ছিল না। কিন্তু ঐ আমোদের মধ্যে কোন ইতরামি বা কদর্যতা দেখা যাইত না।"

*নিজের মৃত্যু সম্বন্ধে স্বামীজীর একটা পূর্ববোধ (Premonition) হয়েছিল। পাশ্চাত্যে এবং স্বদেশে উভয়ত্রই কোনো কোনো বন্ধু এবং শিষ্যকে সেকথা তিনি বলেছিলেন।

২। ব্রহ্মবান্ধব তাঁর 'বিলাত যাত্রী সন্ন্যাসী'র চিঠিতে এ দুটি শব্দ ব্যবহার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সহচরবৃন্দ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
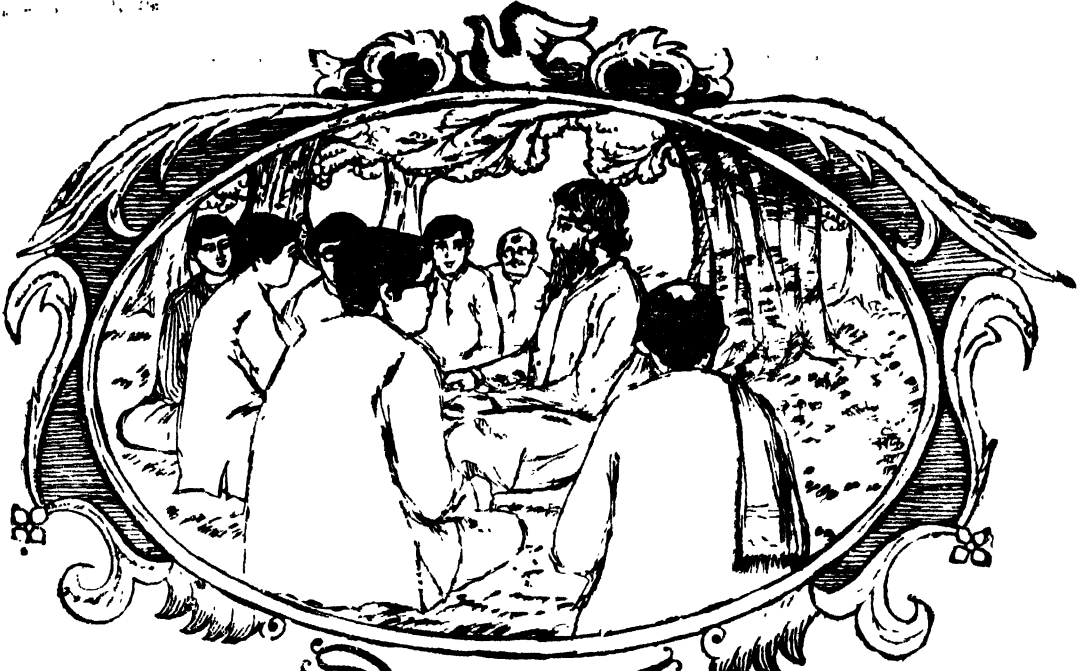
(শান্তিনিকেতন)

সম্পাদক মহাশয় লিখেছিলেন একটি রচনা চাই ; তাঁকে উত্তরে জানিয়েছিলাম আমার খেয়াল-খুশিমতো লেখা, না বিশেষ কোনো ফরমাইসি লেখা লিখতে হবে। জবাবে তিনি লিখলেন—'রবীন্দ্রনাথের সহচরদের সম্পর্কিত স্মৃতি-কথামূলক রচনা'—যার মধ্যে আমিও যেন থাকি—এইরূপ একটি রচনা প্রত্যাশা করছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনকালের বত্রিশ বৎসর শান্তিনিকেতনে তাঁর কর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম, সুতরাং তাঁর সহচরদের কথা বলতে হয়তো পারবো, কিন্তু মুস্কিল হবে নিজেকে তার মধ্যে জুড়ে দিয়ে কিছু লেখা।

রবীন্দ্রনাথ যেখানে সাহিত্যস্রষ্টা সেখানে তিনি আপাতদৃষ্টিতে নিঃসঙ্গ। লেখবার সময় একটা হাতেরই প্রয়োজন কিন্তু কাজের সময় দুই হাত তো চাই-ই, দশটা হাত লাগাতে পারলে কাজটা শক্ত-পোক্ত হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই। হাজার হাজার লোক ফ্যাক্টরী, মিলে কাজ করে বস্তুপিণ্ড গড়ে তুলছে। রচনা লেখার সময় কোন লোক সামনে বসে থাকলেই অসোয়াস্তি বোধ হয় ; সাহায্য করা তো দূরের কথা। সৃষ্টিমাত্রই গোপনে, রাহস্যিক-ভাবে নিষ্পন্ন হয় ; কবিদের এই সৃষ্টি-রহস্য কেউ উদ্‌ঘাটিত করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ বললেন 'জীবনদেবতা'---অন্যেরা বললেন—Inspiration, কেউ বললেন—Revelation। মোটকথা সাহিত্য সৃষ্টির সময়ে সবাই নিঃসঙ্গ।

কিন্তু মানুষ তো আর সারাদিন সাহিত্য সৃষ্টি বা ভগবদ্ ধ্যানে বসে থাকতে পারে না। জীবদেহের খোরাক সরবরাহের জন্য, সামাজিক কর্তব্য পালনের জন্য রীতিমত মেহন্নত করতে হয়। রবীন্দ্রনাথ কবি হলেও মানুষ এবং তাই সাধারণ মানুষের জীবনধারণের জন্য সর্বপ্রকার দায় তাঁকে বইতে হয়েছিল। জীবিকার জন্য খাটতেই হতো। অনেকের ধারণা জমিদারী থেকে টাকা আসতো, তিনি ভোগ করতেন। কথাটা আংশিক সত্য, সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, জমিদারী সংক্রান্ত কাজকর্ম তাঁকে যৌবনকাল থেকে আরম্ভ করে প্রৌঢ় বয়সের শেষ পর্যন্ত দেখাশোনা করতে হয়েছিল। সুতরাং মানুষ হিসাবে জমিদারী তদারক ও প্রজার কল্যাণের জন্য তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল। আর কাজ করতে গেলেই পাঁচজনের সহায়তা নিতে হয়। রবীন্দ্রনাথের জমিদারীতে যাঁরা কাজ করতে আসতেন, তাঁদের জীবন ও জীবিকার মধ্যে ব্যবধান ছিল না ; তাঁদের পেশাই চাকুরী। রবীন্দ্রনাথের জমিদারী চালানোও তাঁর পেশা ছিল ; কিন্তু জীবিকার উৎস হলেও পেশা উপচিয়ে নেশার পেয়ালা ভরে দিত নদী-মাতৃক উত্তরবঙ্গের শোভা ও সেকালের unsophisticated নর-নারী।

সেই নেশার ঝোঁকে লিখেছিলেন ছায়াঁনির মতো পত্রধারা—ছিন্ন পত্রাবলীর মধ্যে যাদের ছিন্নরূপ দেখা যায়—সম্পূর্ণরূপ লুপ্ত হয়েছে। মানুষ ও প্রকৃতি আছে মাখামাখি হয়ে ;—একটাকে সরিয়ে দেখলে যেন ছন্দ ভঙ্গ হয়ে যায় বিধাতার নাট্যালয়ে।

কবির জমিদারী পেশার সঙ্গে আমার কোন যোগ কখনো হয় নি—কখনো শিলাইদহ চোখে দেখি নি। তবে তাঁর জমিদারীতে কাজ করতেন এমন প্রতিভাবান মানুষ যাঁদের শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে টেনে এনেছিলেন তাঁদের জানবার সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে জগদানন্দ রায় ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

শান্তিনিকেতনে আমার পূর্বে যাঁরা কবিকে তাঁর সৃষ্টিকার্যে সহায়তা করতে এসেছিলেন, তাঁরা আমার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বাইরে পড়েন বলে আজ এ প্রবন্ধে সে আলোচনাটা করব না। জগদানন্দের নাম প্রথমে করছি—কারণ তিনি শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সুরু থেকে তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন।

বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানকে সাধারণ পাঠকদের কাছে পরিচিত করার অন্যতম অগ্রদূত জগদানন্দ—এ তথ্য আজ প্রায় বিস্মৃত। বই পড়ে তথ্য সংগ্রহ তো সবাই করে ; কিন্তু জগদানন্দ চোখ খুলে দেখতেন পোকামাকড়, নাগপাখীর টুকিটাকি স্বভাব। তাঁর লেখা 'পোকামাকড়', 'বাংলার পাখী' পড়লেই বঝা যাবে। বিকালে আপন মনে বাগানে ঘুরতেন একটা চুরুট মুখে দিয়ে ; কখনো ছাত্রদের সামনে তাঁকে ধূমপান করতে দেখি নি। ছেলেরা যেমন গুরুজনদের লুকিয়ে সিগারেট খায়, জগদানন্দ মহা-অপরাধীর মতো ছেলেদের এড়িয়ে চুরুট খেতেন—কড়া কমদামী চুরুট—বেশী দামের 'সিগার' খাবার মতো পয়সা কোনো শিক্ষকেরই ছিল না। যাকে বলে Born teacher তা ছিলেন জগদানন্দ। যন্ত্রপাতি নিয়ে বিজ্ঞান পড়াতেন, শুধু ক্লাসে নয়, ক্লাসের বাইরেও।

সেকালে আমাদের ল্যাবরেটরীতে কাঠের একটা বড় টেলিস্কোপ ছিল, সেটা কবি আনিয়েছিলেন চুঁচুড়া থেকে—ধর ব্রাদার্স সেটা নির্মাণ করে দেন। অবান্তর হলেও এই প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হয় যে সামান্য উৎসাহ পেলে বাঙালীর দূরবীণ নির্মাণ একটা বড়রকম শিল্পে পরিণত হতে পারতো হুগলীতে। কিন্তু তা হয় নি।

জগদানন্দ মেঘহীন রাত্রে সেটা বের করতেন ল্যাবরেটরী ঘর থেকে। লাইব্রেরীর মাঝের ঘরটা ছিল ল্যাবরেটরী। আমার ব্যক্তিগত উৎসাহ ছিল ; কারণ রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে রথাট বল-এর Story of Heavens প্রভৃতি বই পড়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ হয়েছিল। রাতে উঠে তারা দেখতাম—বারোখানা কার্ডে গোল আকাশ এঁকে তারাগুলির স্থান নির্দেশ করতাম। জগদানন্দবাবু কী যত্নের সঙ্গে গ্রহ-উপগ্রহগুলি চিনিয়ে দিতেন—সে সময়ে ছাত্ররাও ভিড় করতো। হেলির ধূমকেতু প্রথম দেখলাম দূর আকাশে ছোট আলোর ঝাঁটার মতো; তারপর প্রতিদিন লক্ষ্য করতাম। শুক্রের কলা, শনির কোমরবাঁধ, বৃহস্পতির চাঁদগুলি দেখি ঐ দূরবীণে চোখ লাগিয়ে। আমাদের চাহিদা থেকেই বোধহয় লিখলেন 'নক্ষত্র চেনা' বইটি।

জগদানন্দবাবু বিপত্নীক ছিলেন—তিনটি মেয়ে,—তার একটি বিকলাঙ্গ টাইফয়েডের পর—এক ছেলে নিয়ে থাকতেন, খড়ের একটি বাড়িতে। সে রকম বাড়ির নমুনা আজ শান্তিনিকেতনে দেখা যায় না। সেই বাড়ির উত্তরমুখী বারান্দায় একটা চৌকী পেতে কাগজপত্র ছড়িয়ে লেখাপড়া করতেন—বারান্দার চাল এতো নিচু যে জলের ঝাপটা সেখানে ঢুকতো না, অত মাথা হেঁট বর্ষাও করতো না। উত্তরে কনকনে হাওয়া বইলে চটের পর্দা নামিয়ে দিতেন;—বাড়িতে একটা চেয়ারও ছিল না। ভিতরের দু'টি ঘরে মেয়েরা থাকতো।

তিনি গণিত পড়াতেন উপরের ক্লাসে—বকাবকি করতেন, কিন্তু প্রত্যেক ছাত্রকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতেন। আমাদের সময়ে 'প্রাইভেট টিউশন' করে ছাত্রদের কাছ থেকে টাকা নেবার কথা ভাবতে পারতাম না। ছেলেরা চব্বিশ ঘণ্টা থাকে, বৎসরের মধ্যে সাড়ে নয় মাস বোর্ডিং-এ বাস করে—আমরা তাদের সম্পূর্ণ শিক্ষার জন্য দায়ী নই ? এই দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য তাগিদ কেউ করতো না। পিছিয়ে-পড়া ছেলেদের ক্লাসের সকলের সঙ্গে সমান করে দিতে হতো—তার জন্য অভিভাবকের কাছ থেকে উপরি মাশুল আদায় করে শিক্ষকদের ইজ্জত নষ্ট করার রেওয়াজ হয় নি—মাঝে কয়েক বৎসর বিপলভাবে এই প্রথা চালু হয়েছিল, এখন সরকারিভাবে সেখানে তা বন্ধ হয়েছে। জগদানন্দবাবু একলা নয় সকল অধ্যাপকই ছাত্রদের সাহায্য করতেন।

শুধু পড়িয়ে কর্তব্য শেষ হতো না। ছাত্রদের রান্নাঘরের খাওয়াদাওয়া, তাদের ব্যায়াম, তাদের স্বাস্থ্য—সবই দেখতে হতো আমাদের। তাই জগদানন্দবাবুকে রান্নাঘরের তদারকীও করতে হতো। কবি যখন বিলাতে যান তখন জগদানন্দ ছিলেন 'সর্বাধ্যক্ষ'। সর্বাধ্যক্ষকে ছাত্র পরিচালনায় সাহায্য করতেন তিনজন বিভাগীয় অধ্যক্ষ ; ছাত্রদের ভাগ করা হতো আদ্য, মধ্য ও শিশু—এই তিন বিভাগে। নেপালচন্দ্র রায় ছিলেন আদ্য বা বড়ছেলেদের, আমি মধ্য বা মাঝারিদের ও তেজেশচন্দ্র সেন শিশুদের ভারপ্রাপ্ত। এঁদের কথায় আসছি।

জগদানন্দকে হঠাৎ দেখলে ছেলেদের ভয় হতো; কিন্তু সেই লোক তাদের

সব কাজেই আছেন—বাগানের কাজ থেকে নাট্যাভিনয়ের আনন্দ উৎসবে। শারদোৎসবে 'লক্ষ্মীশ্বর' ফাল্গুনীতে 'দাদা' অচলায়তনে মহাপঞ্চকের ভূমিকায় তাঁর অভিনয়ের স্মৃতি এখনো স্পষ্ট হয়ে আছে। এখনো যেন দেখতে পাচ্ছি নাট্যঘরের সেই দীন 'মঞ্চে' তিনি তেড়ে ছেলেদের বলছেন, 'ছেলেগুলো তো জ্বালালো। ওরে চোবে। ওরে গিরিধারীলাল। ধরতো, ছোঁড়াগুলোকে ধরতো। অ.ন্তহীন দ্বারপালদের উদ্দেশ্যে জগদানন্দের সেই হুংকার পাকা অ্যাক্টরের অভিনয়ের সমতুল। অচলায়তনে শোণপাংশুরা যখন আয়তনে প্রবেশ করেছে, তখন দাদাঠাকুরের ভূমিকায় জগদানন্দ দৃপ্তকণ্ঠে যে ভঙ্গীতে মাচিতে বসে বলেছিলেন, "আমি আমার ইন্দ্রিয়ের সমস্ত দ্বার রুদ্ধ করে এই বসলুম-—।"

মনে আছে একটা ঘটনা; ছাত্রদের কী অপরাধে প্রথম ব্যাচে তাদের না-খাবার হুকুম দিয়েছিলেন। তারপর যতক্ষণ না ছাত্ররা দ্বিতীয় ব্যাচে আহার শেষ করে না উঠেছিল—জগদানন্দবাবু ঘুরে বেড়াচ্ছেন;—নিজে জলস্পর্শ করেন নি—ছেলেদের উদ্দেশ্যে বকে যাচ্ছেন।

লোকটির আর একটি গুণের কথা আজ সবাই বিস্মৃত; সেটি হচ্ছে বোলপুর শহরের সঙ্গে তাঁর যোগ। বোলপুর ইউনিয়ন বোর্ডের তিনিই বোধহয় প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। শহরের লোকদের সঙ্গে যাওয়া-আসার যে সম্বন্ধ ছিল, আজ সেভাবে সম্বন্ধ রাখার কথা কেউ ভাবতেই পারেন না—আমরা এতো আত্মকেন্দ্রিক হয়ে পড়েছি।

পুরাতন শিক্ষকদের অন্যতম হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বিরাট 'বঙ্গীয় শব্দকোষের' জন্য জীবন-সায়াহ্নে বিশ্বভারতী কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' উপাধি ভূষিত হন, কিন্তু কী সংগ্রামের জীবন কাটান। ইংরেজী বিরাট অক্সফোর্ড অভিধানের সম্পাদক মারে (Murray)-র সঙ্গে হরিচরণের তুলনা করতাম; কিন্তু মারে তো বহুজনের সহযোগিতা লাভ করেছিলেন এবং অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস সেই গ্রন্থ মুদ্রণের দুঃসাহসিকতায় অবতীর্ণ হয়; মারের ইতিহাস অনেকেরই জানা। কিন্তু হরিচরণ একাহাতে অভিধানের সকল কাজ করেন; এছাড়া বিদ্যালয়ের ছেলে পড়ান, সংসার দেখা তো আছেই। বই ছাপাবার জন্য দ্বারে-দ্বারে ঘুরে সহায়তা লাভ করেন বাংলার দানবীর মণীন্দ্র নন্দীর কাছ থেকে, অবশ্য রবীন্দ্রনাথের সুপারিশেই সেটি হয়। বই খণ্ডে খণ্ডে নিজব্যয়ে ছাপিয়ে বিক্রীর ব্যবস্থা করতে হয় হরিচরণকেই। অতবড় গ্রন্থ প্রকাশের মত সাহসী প্রকাশক তখন বাংলা দেশে ছিল না।

হরিচরণবাবুর সময়নিষ্ঠা ছিল যন্ত্রের মতো; তাঁকে দেখে ঘড়ি মেলানো যেতো, আমরা বলাবলি করতাম। বৃদ্ধবয়সে প্রতিদিন লাইব্রেরীতে এসে চৈতিবাবুর কাছে দাঁড়িয়ে নিজের ঘড়িটি ঠিক চলছে কি না দেখে নিতেন। গাবতলার ইঁদারার পাশে যে কুটিরে তিনি প্রথম দিকে কাজ করতেন, সেখানে দেখতাম 'বী টাইমপিস' তাঁর লেখবার জায়গায় টিক্ টিক্ করছে; বলেছিলেন, সেটা তিনি যখন কলকাতায় কলেজে পড়তেন তখন কিনেছিলেন দু'টাকায়। কাজ করতেন চৌকীতে বসে; সোজা হয়ে বসে, সামনে ডেস্ক ছিল না। টেবিল-চেয়ার তখন আমাদের মধ্যে অজ্ঞাত।

দরিদ্র-ভাণ্ডারের ভার তাঁর উপর ন্যস্ত ছিল। যে সামান্য টাকা উঠতো তাই বণ্টন করে দিতেন প্রার্থীদের মধ্যে। একজন মুসলমান তার ছেলের পড়ার জন্য মাসিক টাকা নিতে আসতো হরিচরণের কাছ থেকে। হরিচরণ অতি নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু এই সেবাকার্যে কোনো ভেদাভেদ করতেন না। দরিদ্রের প্রতি আন্তরিক দরদ ছিল বলেই স্বেচ্ছায় এই কাজ চালাতেন। ভোটের চাপে কার্যভার নিয়ে আপিসি মেজাজে দরিদ্র সেবা করতেন না।

মনে আছে, তখন শান্তিনিকেতনে পরিবার নিয়ে থাকার ঘরবাড়ি বেশী ছিল না—তাই সবাই নয় ছাত্রদের সঙ্গে নয়, দীন-কুটিরে থাকতেন। হরিচরণ যে কুটিরে থাকতেন সেখানে রাজেনবাবু ও হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়জন থাকতেন। সে ঘরে ঢুকতে দরজায় মাথা ঠুকে যেতো। মেঝেতে ইঁদুরের গর্ত, দেওয়ালে উই। তার মাঝে একখানি চৌকি পাতা—তার উপর মলিন শয্যা গোটানো। সেইরকম চৌকির উপর বসে হরিচরণ প্রথম দিকে লিখতেন; সন্ধ্যার পর দেখতাম একটা সেতার নিয়ে রোজ একটা গৎ বাজাচ্ছেন। আর বিধুশেখর এসরাজ বাজাচ্ছেন, জগদানন্দের বেহালাও চলতো কখনো কখনো। সে অন্য জগৎ ছিল তখন। [ক্রমশ।

"অই দেখ, সেই মাথার উপরে,
রবি, শশী, তারা, দিন দিন ঘোরে,
ঘুরিত যেরূপে দিক্ শোভা করে,
ভারত যখন স্বাধীন ছিল।

সেই আর্যাবর্ত এখনো বিস্তৃত,
সেই বিন্ধ্যগিরি এখনো উন্নত,
সেই ভাগীরথী এখনো ধাবিত,
পুরাকালে তারা যেরূপে ছিল।

কোথা সে উজ্জ্বল হুতাশন-সম,
হিন্দু বীরদর্প, বুদ্ধি, পরাক্রম,
কাঁপিত যাহাতে স্থাবর জঙ্গম,
গান্ধার অবধি জলধি-সীমা ?"

—হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হঠাৎ গাওয়া গান

তপতী রায়

বেশ বুঝতে পারছি ক্রমশ আমার ওপর বিরক্ত হচ্ছে মাধুরী।

হয়ত ওয়াটাই স্বাভাবিক।

কিন্তু আমারও তো কোন উপায় নেই।

কি-ই বা করতে পারি আমি? যা দেশের পরিস্থিতি, আর যা সময় চলেছে এ অবস্থা তো শুধু আমার একার নয়, কত লক্ষ লক্ষ লোকের কত পরিবারের এই একই অবস্থা। কিন্তু কি করতে পারি আমি?

রোজই তো বেরিয়ে যাই, সারাদিন ঘুরে আবার সন্ধেবেলা ফিরে আসি, কোন খবর ওকে দিতে পারি না যাতে ওর মুখ মুহূর্তের জন্যও হেসে ওঠে।

রোজ একই প্রোগ্রামের পুনরাবৃত্তি।

মাঝখান থেকে পাঞ্জাবীটা আরও ময়লা হয়, কেচে কেচে তার আয়ু কমে, পুরোন চটী শুধু ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছিঁড়ে যায় তাই নয়, তালি লাগিয়ে, সারিয়ে আবার তাকে চালাতে গেলে চটীটা পথের মাঝখানে আমাকে অপ্রস্তুতে ফেলে।

সবই তো জানি আর নিরুপায় হয়েই বেকার জীবনের গ্লানি বহন করি, তেমনি মাধুরীর ক্রমশবর্ধিত বিরক্তি সহ্য করি, উপেক্ষা করার চেষ্টা করি।

মাধুরী মুখে কিছু বলে না।

কিন্তু আমি বুঝি তো।

ওর নীরব ধিক্কার আমাকে নিয়ত বিদ্ধ করে। আমি অনুভূতিহীন মানুষ নই, ওর বিরক্তি, যে-কোন উপলক্ষে হঠাৎ ওর জ্বলে ওঠা আমাকে অস্থির করে। কিন্তু তবুও আমি কিছু করতে পারি না।

কেন না আমি বেকার।

আজ দু'বছরের ওপর আমি বেকার।

কিন্তু কি করতে পারি আমি?

শুধু নানা জায়গায় দরখাস্ত করে, অনর্থক পয়সা খরচ করা ছাড়া, শুধু পরিচিতদের কাছে কথার ছলে নিজের একটা চাকরির কথা উত্থাপন করা ছাড়া, আর কারও কাছে আশ্বাস না পেয়ে, শুধু সব জায়গা থেকেই মাথা নীচু করে বেরিয়ে আসা ছাড়া।

হ্যাঁ এইভাবেই তো দিন কাটছে।

এই রকমই তো রোজ চলছে।

কেন না আমি বেকার।

হয়ত পরে বেকার থাকব না, কিন্তু তার মধ্যেই হয়ত মাধুরীর বিরক্তি সীমা ছাড়াবে, আমাদের দাম্পত্য-জীবনে ছোট ফাটল ক্রমশ বড় হতে হতে আমাদের মাঝখানে বিরাট এক গর্তের সৃষ্টি করবে। বিরাট খাদ---

আর সেই খাদ আমরা বুঝি আর কোনদিন অতিক্রম করতে পারব না।

তার আগে?

তার আগে যদি ছোটখাটো একটা চাকরিও পেতাম; অবশ্যই ভদ্রলোকের চাকরি, যদি মাস শেষে কিছু অর্থ এনে মাধুরীর হাতে সগর্বে তুলে দিয়ে আগের মতই বলতে পারতাম।

এতেই চালিয়ে নাও---

আর মাধুরীর বিবর্ণ মুখ, কাজকর্ম ফাটা হাত সুখে আবার মসৃণ কোমল হ'য়ে আসত। সে তৃপ্তিতে চোখ নামিয়ে বলত, এই অনেক---

কিন্তু সে সুযোগ কোথায়?

আমার সঙ্গে মাধুরীর বিয়ে ঠিক প্রেম করে না হ'লেও চেনাজানার ভেতর।

আমার তিনকুলে কে আছে? ঐ বিজনদা ছাড়া? মাধুরী বিজনদারই গ্রাম-সম্পর্কে বোন। দেশ ভাগের পর পাকিস্তানের পাবনা জেলা থেকে ছিটকে-আসা একদল উদ্বাস্তুর সঙ্গে ওদের পরিবারও নতুন ঘর বাঁধবার স্বপ্ন নিয়ে পশ্চিমবঙ্গে এসেছিল।

তারপর ওদের ওঠা-নামার দীর্ঘ কাহিনী। তার ভেতরই কষ্টেসৃষ্টে স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করেছিল মাধুরী। আমাকে যে নেহাৎই সুপাত্র মনে করেছ, অন্তত দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পারবে, ভদ্রভাবে বাঁচতে পারবে মনে করেই বিজনদা আমার সঙ্গে মাধুরীর বিয়ের সম্বন্ধ এনেছিলেন---তাতে আর সন্দেহ কি?

আমার চেহারার কথা ওঠে না, তবে কুশ্রী নই।

আর মাধুরী মোটামুটি সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী মেয়ে।

সুতরাং [illegible] বটে।

সন্দেহ নেই।

অন্তত মাধুরী তাই ছিল, সুখী ও [illegible]।

অন্তত চাকরি থাকলে বিবাহিত জীবন সুখের হ'তে পারে।

তাতেই চলে যাচ্ছিল। আমার সম্বল পার্কিনসন কোম্পানীর কেরাণীর পদ।

বিয়ের পর তেমন কোন কষ্ট হয় নি।

বরং মাধুরীর খুসী খুসী মুখ দেখে বেশ একটা নিশ্চিন্ত ভাব আমার মনে এসে গিয়েছিল।
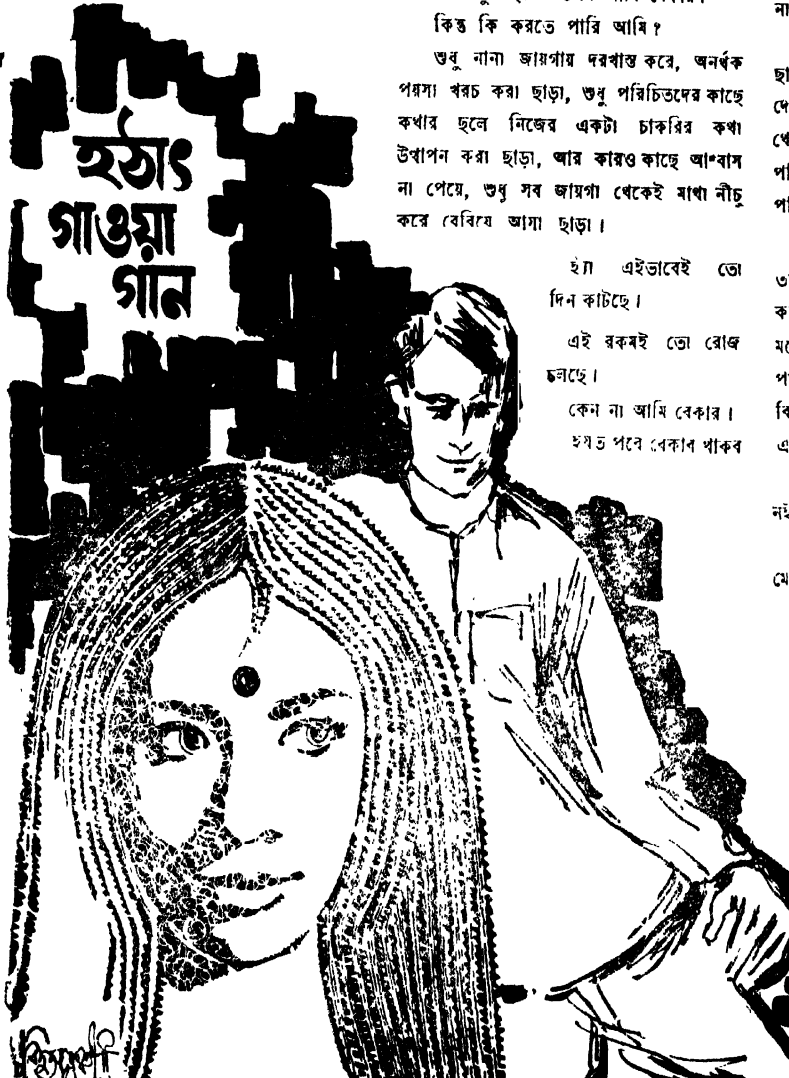
আর সেজন্যই যখন দুপুরের সময়টুকু নষ্ট না করে মাধুরী এই কাছের উষা কোম্পানীর মাসকয়েক আগে খোলা সেলাই শেখানোর স্কুলে সেলাই শিখতে যেত, তখন যেন কেমন ভাল লাগত না আমার।

যেন এটি স্বাভাবিক নয়।

কেন কি দরকার?

এত সৌখীনতা কেন?

আমার যা আয় তাতে মাধুরী ঘরের সব কাজ নিজের হাতে করে যেভাবে চালাচ্ছে তার ব্যতিক্রমে দরকার কি?

প্ল্যানটা আমার পছন্দ হয় নি।

কিন্তু মাধুরী স্কুল ছাড়ে নি।

ওর যেমন একটা জেদ আছে, সেই জেদের জন্যই শেষ পর্যন্ত শেখা শেষ করেছে ও।

আমি তো পরিহাস করার মত করে রাগ চেপে প্রশ্ন করেছি ও আমায় রোজগার করে খাওয়ানোর কথা ভাবে কি না।

তার উত্তরে ও তো শুধু জেনেছে, কেন রোজগার করা ছাড়া এসব শিখতে নেই? আর নিজের জামা-কাপড়গুলোও তো।

বিশেষ কিছু বলি নি আর---

আর বিশেষ কিছু বললে মাধুরী তো আর শুনত না।

কিন্তু হঠাৎ আমার চাকরিটা গেল।

পারবিনগন কোম্পানীতে সব শ্রমিক-কেরাণী ধর্মঘট করল। চলল ধর্মঘট একমাস ধরে।

ইউনিয়নের নেতাদের গরম গরম বক্তৃতায় আমাদের মনের জোর এগশ বাড়তে লাগল। রোজই আমরা যেন আশা করতে লাগলাম আমাদের জয় সুনিশ্চিত।

মালিকপক্ষ নতজান হতে আর বাকি নেই, হ্যাঁ তাও হল---

মালিকপক্ষ নতজান হল, হার মানল বটে, কিন্তু আমাদের ক'জনের চাকরি গেল।

ইউনিয়ন জোর লড়াই চালাল, আবার ধর্মঘটের ভয় দেখাল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাকি সকলের স্বার্থে ছোট স্বার্থ তারা ত্যাগ করল।

আমরা ক'জন ছাঁটাই হলাম।

যারা বড়সাহেবকে মারতে গিয়ে হাতে হাতে ধরা পড়েছিলাম।

বৃহত্তর স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থত্যাগ।

স্বার্থ ওদের কাছে ক্ষুদ্র, সেই দেড় হাজার শ্রমিকের তুলনায় তিনজন শ্রমিকের স্বার্থ ক্ষুদ্র। হয়ত একথা ঠিক।

কিন্তু আমি নিজে?

আমার পৃথিবীতে আমার নিজের স্বার্থ তো সর্ববৃহৎ। কিন্তু তার কি হবে?

কিন্তু কাকে শোনাব?

কাকে বোঝাব?

আমি তো ইউনিয়নের নির্দেশমত কাজ করি নি। হঠাৎ মাথা গরম করে, বলা নেই, কওয়া নেই, বড়সাহেবকে মারতে গেলাম, তার সার্টের কলার ধরলাম, তাকে অপমান করলাম।

অথচ কে না জানে বড়সাহেব আছে বলেই তবু শ্রমিকদলের জয় সম্ভব হল। বড় সাহেব লোক ভালো সেকথা আমরাও স্বীকার করেছিলাম। কিন্তু কি করবো হাতের কাছে ওকেই যে পাওয়া গেল।

সেখানেই ভুল।

এসব সুপরিকল্পিত দাবীর অভিযানে হঠকারিতার স্থান কোথায়? সব মেপে, সব বুঝে, সব একসঙ্গে।

আমরা তিনজন দলছাড়া কেন?

কে বলেছিল আমাদের ওসব করতে?

ইউনিয়নের মিটিং-এও তো এসব কথা হয় নি? তবে?

অতএব আমার তিন বছরের চাকরিটা গেল। ক্ষমা চাই নি আমি। কেন না নবীন আর সুরেশও চায় নি। অবশ্য চাইলেও পেতাম না হয়ত। আমরা তিনজনে বরখাস্ত হলাম।

নবীন আর সুরেশ শুধু অনিবার্যিতই নয়, তারা ছিল শ্রমিক, ফলে মোটর কারখানায় কাজ পেয়ে তারা বেঁচে গেল। হাতে-পায়ে খাটতে শিখেছে তারা, কিন্তু আমি শ্রমিক নই, কেরাণী।

হাতে-কলমে কোন কাজ শিখি নি, করতেও পারব না।

মন না চাবার।

দু'বছর গেল।

এই দু' বছরে মাধুরী আরও রোগা হয়ে গেল, সেই বিয়ের আগে কৈশোর হাত নেরবরা অপরিণতদেহ মাধুরীর সঙ্গে এ মাধুরীর আবার যেন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে।

মাধুরী সেই জীর্ণ অনাহারক্লিষ্ট দেহ নিয়ে রোজ চাকরি করতে যায়।

কেন না মাধুরী একটি চাকরি পেয়েছে।

মাধুরী একটি স্কুলে চাকরি পেয়েছে, কাছেই যে জুনিয়র হাইস্কুলটা উদ্বাস্তুরা নিজেদের চেষ্টায় গড়ে তুলেছে, সেটা হাইস্কুল পরিণত করবার স্বপ্নে সেক্রেটারী রামসদয়বাবু প্রায়ই পাড়ায় চাঁদা তোলেন, যেখানে আগে আমিও মাঝে মাঝে চাঁদা দিয়েছি, সেই স্কুলে মাধুরী কাজ পেয়েছে।

নীচু ক্লাশ পড়ায় আর মেয়েদের সেলাই শেখায়।

সহজে পায় নি।

সহজে চাকরি কেউ পায় না।

মাধুরীও পায় নি।

তার জন্য ওকেও অনেক ছুটোছুটি করতে হয়েছে, বহুবার রামসদয়বাবুর স্ত্রীর ব্লাউজের ছাঁট ঠিক করে দিয়ে আসতে হয়েছে।

যা হোক তবু শেষ পর্যন্ত চাকরিটা পেয়েছে।

পেয়েছে তো?

কিন্তু আমি?

আজ দু' বছর চেষ্টা করেও আজ পর্যন্ত একটি চাকরি জোটাতে পারলাম না। মোটর কারখানা বা সাইকেল সারানোর দোকানে হয়ত ছুটকো কাজ মেলে কিন্তু সে চাকরি গ্রহণ করার তো প্রশ্ন ওঠে না।

সুরেশ আর নবীন নিতে পারে।

সুরেশ আর নবীন শ্রমিক শ্রেণীর।

আমি তা নই।

আমি গ্র্যাজুয়েট, আগে কেরাণী ছিলাম, এখন বেকার।

আমি বেকার এই পরিচয়টাই মাধুরীর কাছে বড় হয়ে উঠেছে। আমি চেষ্টা করেও যে চাকরি পাচ্ছি না সে কথা সোচ্চারে না বললেও ও বুঝছে।

কিন্তু মুখে না বললেও ওর বিরক্তি আমি বুঝতে পারছি। ওর নীরব প্রশ্ন বারবার আমাকে আঘাত করছে, কিন্তু উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না, কি উত্তর দেব?

ওকে কেন বোঝাতে পারি না, মাধুরী চাকরি পেলেও আমি যে পাচ্ছি না সেটা আমার অপরাধ নয়। আর মাধুরী মাত্র স্কুল-ফাইন্যাল পাশ অথচ আমি একজন গ্র্যাজুয়েট হয়েও কেন চাকরি পাই না সেটা আমার ইচ্ছাকৃত নয়।

আমি কেন ওকে বোঝাতে পারি না, আমি যে কেন শত চেষ্টাতেও চাকরি পাচ্ছি না, তার কারণ, আমি নিজেই জানি না।

তার কারণ একটি মাত্র হতে পারে।

তার সম্ভাব্য কারণ, চাকরির জগতের এই নিয়ম।

আমি মাধুরীকে কি করে বোঝাব যে চাকরির জগতের এই নিয়ম। আকস্মিকভাবে সে নিজে চাকরি পেয়ে গেলেও আমি পাব না।

শুধু আমি কেন, আমার মত শত শত যুবক তাদের কর্মদক্ষতা, ক্ষমতা, বুদ্ধি, গুণ, কাজ করবার আগ্রহ ও আন্তরিকতা সত্ত্বেও বছরের পর বছর বেকার থাকছে, দিনের পর দিন আমারই মত তাদের গায়ের জামা ক্রমশ ময়লা হচ্ছে, পায়ের চটি ক্রমশ জীর্ণ হয়ে ছিঁড়ে আসছে, অথচ আমারই মত তারা ফিরে এসে কোনদিনই তাদের প্রিয়জনকে কোন আশার বাণী শোনাতে পারছে না।

এ শুধু তো আমি নয়, একা নয়, শত শত হাজার হাজার যুবকের এই অবস্থা চলেছে।

কিন্তু তা হলে কি হবে?

মাধুরী তো হাজার হাজার যুবকের কথা শুনতে চায় না। বাস্তবিক পক্ষে হাজার হাজার যুবকের কথা শুনে তার লাভ কি, শান্তি কোথায়, সান্ত্বনা কোথায়?

সে তো আর হাজার হাজার যুবকের স্ত্রী নয়, সে আমার স্ত্রী, শুধু একজন মাত্র বেকার যুবকের স্ত্রী। আমার স্ত্রী হিসেবে সে শুধু আমার কাছেই কৈফিয়ৎ দাবী করতে পারে।

যদিও মাধুরী কোন কৈফিয়ৎ চায় না। মাধুরী তেমনি নীরবে থাকে। ভোরবেলা থেকে উঠে উনুনের ছাই তোলে, উনুনে আগুন দিয়ে বাসন ক'খানা মেজে নেয়, তারপর রান্না সেরে আমাকে খেতে দেয় তারপর নিজে খেয়ে নিয়ে স্কুলে চলে যায়।

একবার বলেও না, কেন মিছিমিছি রোজ যাও, কি হবে রোজ বেরিয়ে, তার থেকে ঘরে বসে থাকলেও তো পার।

আসা-যাওয়ার জন্য পয়সা ও নিজেই দিয়ে দেয় হাতে, একবার বলে না, কি হবে মিছিমিছি এই পয়সা ক'টা ট্রামে-বাসে খরচ করে, তার থেকে ঘরে বসে থাকলেও তো পার। পয়সা না আন, অন্তত পয়সা অনর্থক খরচ করার হাত থেকে তো অব্যাহতি দিতে পার।

মাধুরী কিছুই বলে না।

রোজকার অভ্যাসমত আমার বরাদ্দ পয়সা দিয়ে স্কুলে বেরিয়ে যায়।

আমি জানি মাধুরী ফিরবে অনেক রাত্রে। স্কুল থেকে বেরিয়ে ও তিনটে টিউশ্যানি করবে, দু'টো সেলাইয়ের একটি পড়ার।

তারপর ক্লান্তদেহে ফিরে, আবার রাত্রের রান্না চাপাবে।

ততক্ষণে আমি বাড়ী ফিরে নিজে চা করে খেয়ে নিয়েছি, আর বাইরের রকে বসে বসে চলমান জনস্রোত লক্ষ্য করেছি।

ক্রমশ সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, তারপর রাতের অন্ধকার, সেই উদ্বাস্তু পাড়ার অন্ধকারে ক্রমে ক্রমে বাড়ীগুলোতে হারিকেন আর কোন কোন বর্ধিষ্ণু দোকানে ডে-লাইট জ্বলে উঠেছে, আমি তখনও বসে থেকেছি, মাধুরীর প্রতীক্ষা করেছি অপরাধী মনে, আর মাধুরীর জন্য অপেক্ষা করেছি।

অবশেষে মাধুরীকে দেখা গেছে।

ওকে দূর থেকে দেখলেও আমি চিনতে পারি।

ক্রমশ রোগা হয়ে যাওয়া, ক্লান্তিতে ভেঙ্গে-পড়া, সেই দেহ আমার অতি পরিচিত, আমার সে প্রিয় দেহ জীর্ণ হয়ে পড়লেও যে আমি কোন কাজে লাগতে পারছি না, এ জন্য নিজেকে আমি অপরাধী বোধ করলেও আর কিছুই করতে পারি না।

কেন না আমি বেকার।

মাধুরী কিছু না বললেও বেশ বুঝতে পারছি, সব জিনিষের একটা সীমা আছে।

দিন দিন ও যেন একটু বেশী বিরক্ত হচ্ছে।

অবশেষে?

শেষ ভাবতে পারি না।

জীবনের সব সংগীত আমার থেমে গেছে, জীবনের সব প্রবহমান নদীগুলো হঠাৎ বদ্ধ জলাশয় হ'য়ে আমাদের দু'জনের দম আটকে দিচ্ছে।

সব জানলাগুলোই যে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।

আমি বেকার।

এই একটি সত্য আমার সামনে সূর্যের মত জ্বলন্ত।

সেদিনও তেমনি সারা ডালহৌসী স্কোয়ার ঘুরে ঘুরে ফিরলাম।

আজ শরীরটা ভাল ছিল না।

যে বন্ধুর অফিসে গিয়েছিলাম, সে না আসায়, সেদিন তার কাছে সময়মত চাটুকুও খাওয়া হয় নি।

তা ছাড়া এসপ্লেনেড যাবার জন্য প্রস্তুত একটা বিরাট মিছিলকে তিনটের পর থেকে পুলিস আটকে রেখেছিল। তার ফলে আরও বিশৃঙ্খল অবস্থা। মিছিলের চীৎকার এখনও কানে বাজছে। নিজেরও গলা মেলাতে ইচ্ছে হয়েছিল, কিন্তু দু'বছর বেকার থেকে সে অধিকারও যেন হারিয়েছি।

অবশেষে বাড়ী ফিরেছি। শরীর টলছে।

অনেক পথ হেঁটে এসেছি।

আজকাল বেশীর ভাগ পথই হাঁটি।

কিন্তু তাতেই বা কি?

তবুও হাঁটি, আজও হেঁটে এসেছি অনেকটা।

বাড়ীতে আলো জ্বলছে।

কে আলো জ্বালাল?

মাধুরী ফিরে এসেছে নিশ্চয়ই।

ওর কাছেও ডুপ্লিকেট চাবি।

ওই এসেছে তাহলে। কিন্তু----

বৃষ্টি পড়ছিল আজ সারাদিন, ছাতা নয় শুধু, চটি, কাপড়, জামা সবই ভিজে গেছে। বোধ হয় মাধুরীও তাই আজ আর টিউশ্যানিতে যায় নি। ফিরে এসেছে।

ছাতাটা জল ঝরাবার জন্য ভেতরের রকে রেখে ঘরে ঢুকলাম।

মাধুরী শুয়ে আছে।

হঠাৎ যেন পাখীগুলো সব সমস্বরে গান আরম্ভ করে দিল। হঠাৎ অর্কেষ্ট্রার সুরে বুঝি আকাশ বাতাস ভরে গেল।

মাধুরী শুয়ে আছে।---

মাধুরী বাড়ীতে আছে----

আমি ক্লান্ত হয়ে ফিরে এলাম, আর মাধুরী বাড়ীতে।

কতদিন এমন হয় নি।

কতদিন মনে মনে আকাঙ্ক্ষা করেছি আমি আসার আগে মাধুরী আসবে, ও দাঁড়িয়ে থাকবে, আমার জন্য চা করে দেবে। আমরা দু'জনে গল্প করব তারপর অন্য সকলের মত, অন্য বিবাহিত লোকেদের মত ঘরকন্নার কথা আলোচনা করব। আমার স্ত্রী আমার ক্লান্তি ঘোচাবার জন্য কত রকম যত্ন করবে।

নীরবে সে নিজে ক্লান্ত চেহারা নিয়ে নীরস কর্তব্য করে যাবে না।

কিন্তু তা হয় নি।

কেন না কোনদিনই মাধুরী আগে ফেরে নি। এমন কি রবিবারও না। সেদিন তার চারটে থেকে অন্য একটা টিউশ্যানি। বড়লোকের বৌকে সেলাই শেখায়।

তাই রবিবারও সন্ধ্যাবেলা নিজে চা খেয়ে নিয়ে অপেক্ষা করি মাধুরীর ফিরে আসার।

তেমনি রকে বসে চলমান জনস্রোত দেখি, সন্ধ্যা দেখি, রাতের নেমে-আসা গাঢ় অন্ধকারে, একে একে জ্বলে ওঠা বাতিগুলো দেখি।

একই নিয়ম।

কিন্তু আজ ব্যতিক্রম।

আজ মাধুরী আগে এসেছে, মাধুরী শুয়ে আছে, হঠাৎ মনে হল চীৎকার করে উঠব। দু হাতে ওকে পাঁজাকোলা করে তুলে আমার প্রথম দিনগুলোর মত আদর করব।

কিন্তু মাধুরী ক্লান্ত।

ও ক্লান্ত হয়ে শুয়ে আছে।

আগে ফিরেও ও ক্লান্ত।

একেবারে কাছে চলে গেলাম, মাধুরী যেখানে শুয়ে আছে তার ক্লান্তদেহ ছড়িয়ে দিয়ে।

পাশে বসলাম।

ও আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, আমি ওর একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিলাম। ও নিজেকে সমর্পণ করে দিল।

ওর ঘাড় আর গলার চামড়াটা দেখা যাচ্ছে। ওর হাত আর মসৃণ নেই। রুক্ষ, কাজ করা, খেটে খাওয়া, তেল-ক্রীম না মাখান হাত, ওর নখগুলোও পরিষ্কার করে কাটা না।

তবু সেই হাত আমার আজ আরও ভাল লাগল। বহুদিন বাদে, বহু যুগ পরে যেন প্রিয়াকে প্রথম স্পর্শ করতে পারলাম।

ঘরের সমস্ত হাওয়া যেন হালকা গোলাপী রং-এ ভরে গেছে, ওর সাদা চোখে যেন সেই গোলাপী রং ছড়িয়ে পড়েছে।

ও চোখ বুজল।

আমি অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম।

এই হঠাৎ বেজে-ওঠা সঙ্গীতের জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না। রিহার্সাল না-দেওয়া নায়কের মত আমি স্টেজে উঠে পড়েছি।

কিন্তু গান যে শুরু হয়ে গেছে।

সুর যে থামছে না।

ঘরের বাতাসে এখনও তো গোলাপী আমেজ।

মাধুরী! এই!

খুব আস্তে আস্তে ডাকলাম আমি।

উঃ------

আজ সকাল সকাল ফিরেছ যে----

এমনি।

না এমনি নয়, নিশ্চয়ই----

সত্যি এমনি!

খুব ক্লান্ত নয়?

না-----

অসুস্থ লাগছে?

না----

তবে?-----

প্রশ্নটা করেই ওর দিকে তাকালাম। কি মাধুরী? বল?

কিছু না।

নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে।----

ও মুখ টিপে শুধু হাসল।

ওর সেই রোজকার অভ্যস্ত নির্বিকার মুখে অন্য ছায়া। ওর সেই পুরুষালি হ'য়ে আসা, কাজ করে কঠিন হয়ে যাওয়া হাত হঠাৎ কোমল হল।

মাধুরী মুখ ফিরিয়ে নিল।

কি হয়েছে মাধুরী?

যা হবার----

কি চাকরি গেছে?

না-----

টিউশ্যনি?

না------

তবে?

আমার গলা প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। হঠাৎ আরম্ভ হওয়া গান যেন না থেমে যায়। যেন কোন খারাপ খবর শুনতে না হয়।

কোনদিন ঈশ্বরকে ডাকি নি, আজ এই সময়, এই মুহূর্তে সেই ঈশ্বরকেও স্মরণ করতে দ্বিধা করলাম না। মাধুরী তখনও চুপ।

আমি অধৈর্য বোধ করছি, হয়ত তা উচিত নয়, বহুদিন বাদে আজ মাধুরী আমি আসবার আগেই বাড়ীতে ফিরেছে।

বহুদিন বাদে, বোধ হয় যুগ হবে, মাধুরীকে আমি দেখতে পেয়েছি, বাড়ী ফিরে ওকে দেখতে পেয়েছি, আমি ক্লান্ত হয়ে বাড়ী ফিরেছি, অফিস করে ক্লান্ত নয়, চাকরির চেষ্টায় ক্লান্ত। তবু ওকে ফিরে এসে দেখতে পেয়েছি।

আমি অনুভব করে সুখী হ'তে পেরেছি, আমার স্ত্রী আমার আগেই বাড়ীতে এসেছে, হয়ত কোথাও যায় নি, তাকে যেতে হয় না। সে বাড়ীতে সন্ধ্যাবেলায় আলো জ্বেলেছে। আর বাতিজ্বলা ঘরে বসে আমার প্রতীক্ষা করছে।

বহুযুগ বাদে, যেন মাধুরী আমার যথার্থ স্ত্রীর মত আমাকে স্বামীর সম্মান দিয়েছে।

আর পাঁচজন স্বামীর মত আজ আমি একটা বিশেষ অনুভূতিতে গৌরবান্বিত বোধ করছি। স্ত্রীর উপেক্ষা নয়, স্ত্রীর অনুকম্পা নয়, স্ত্রীর জন্য বাতি জ্বেলে বেকার জীবনের দিনান্তের প্রতীক্ষা নয়।

আমার জন্য স্ত্রী প্রতীক্ষা করছে।

আর পাঁচজন সাধারণ পুরুষের মত আমিও ফিরে এসে আমার প্রতীক্ষারতা স্ত্রীকে বাড়ীতে দেখতে পেয়েছি।

তাই এর জন্য মূল্য দিতে প্রস্তুত হলাম।

মাধুরীর এই নীরবতা মনে মনে আমাকে অস্থির করলেও আমি কষ্টে নিজেকে সংযত করলাম। অধৈর্য হব না।

ও সময় নিক, আরোও অনেক সময় নিক। অবশেষে বলুক ওর যা বক্তব্য----

বলুক ওর চাকরি গেছে, না ওর শরীর খারাপ ও আর পারছে না, কিন্তু মাধুরী সময় নিল না।

চাকরী যাওয়া বা অসুস্থতার কথাও বলল না। শুধু আস্তে আস্তে বলল।

আমার বোধ হয় বাচ্চা হবে---

না-----

প্রায় আর্তনাদ করে উঠলাম। গান থেমে গেছে। বুঝতে পারছি না আমার এতে আনন্দ পাওয়া উচিত, না বিরক্তি।

মাধুরীর মুখের দিকে তাকালাম। ওকি একটা বিরাট প্রত্যাশা নিয়ে এ-খবরটা আমায় দিল? বুঝতে পারছি না।

কিন্তু----

অসম্ভব-----

অসম্ভব কিসে?

ম্লান হেসে জিজ্ঞেস করল ও।

ওর দিকে আবার তাকালাম। শিথিল বেশবাসে ওকে আর মোহনীয় মনে হচ্ছে না। ওরও কি আমায় তাই মনে হচ্ছে? আমাকে কি ও ঘৃণা করছে? দায়ী করছে আমাকেই?

বুঝতে পারলাম না।

কি করব এখন আমি? শুধু আস্তে আস্তে বললাম, অসম্ভব, কেন না, এখন উচিত নয় বলে। এর ওপর---জীবন তো তা মানে না।

জানি, কিন্তু একে এই অবস্থা, তার ওপর তোমার শরীর অচল হ'লে----

সেজন্য ভাবনা?----আমার শরীর অচল হয়ে পাছে----

না না সেজন্য নয়-----

তবে?

তোমার রোজগারের জন্য শুধু নয়, এ-অবস্থায় আবার বাচ্চা আসা মানে কত খরচ ভেবেছ?

তা কি হবে?

অন্য উপায় দেখতে হবে।----

অর্থাৎ-----

বিরাট প্রশ্ন করে তাকাল আমার দিকে মাধুরী। ও কি আমায় আরও বেশী ঘৃণা করছে এই প্রস্তাবের জন্য? আমাকে কি একেবারে অমানুষ ভাবছে?

বুঝতে পারলাম না।

ওর দিকে ভাল করে তাকালাম।

ঘরের গোলাপী হাওয়া ক্রমশ নীল হয়ে আসছে।

না-----

দৃঢ় গলায় ও আবার বলল।

কেন?

তুমি কেন অন্য উপায়ের কথা ভাবছ বল?

কারণ সেটাই একমাত্র পথ বলে----

না-----

তোমারই তো বেশী কষ্ট হবে---

হোক কষ্ট---এর থেকে আর বেশী কি হবে?

বেশী হবে বৈকি। তোমার 'পরই তো সব বোঝা-----

হোক-----

না মাধুরী---

কেন?

আমি এ হ'তে দেব না----

কেন?

আমি তোমায় ভালবাসি----

বলেই হঠাৎ লজ্জিত হলাম।

দীর্ঘদিন বেকার, স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারছি না, তার কোন কষ্টের লাঘব করতে পারছি না, এ-অবস্থায় আমার মুখে ভালবাসার ঘোষণা, নিজের কাছেই দারুণ নির্লজ্জ লাগল।

কিন্তু মাধুরী হাসল না।

যা আশা করেছিলাম, আকাঙ্ক্ষা করেছিলাম, তেমন কোন ব্যঙ্গের হাসি ওর মুখে ফুটে উঠল না।

বরং অবাক হয়ে দেখলাম, ওর চোখের দৃষ্টি কোমল হল।

মনে মনে ওকি এমনিই একটি ঘোষণার জন্য কামনা করছিল?

আবার কথাটিকে উচ্চারণ করবার জন্য প্রবল একটা ইচ্ছে হল।

আমি আবার বললাম।

সত্যি যেহেতু তোমায় আমি ভালবাসি মাধুরী, তোমার এ-অবস্থা আমি হ'তে দেব না।

কি যে বল।-----

না সত্যি---কথাটি ভেবে দেখবার মত। শুধু তো একটা বাচ্চা নয়, তার জন্য সমস্ত ভবিষ্যৎ দিনগুলো ----

জানি----

জান। কিন্তু বিষয়টি বোধ হয় সবদিক দিয়ে বুঝতে পারছ না।-----

মাধুরী কোন উত্তর দিল না।

আমার চট্ করে হয়ত কোন চাকরীর আশা নেই সুতরাং এই সব পাগলামী ----

পাগলামী নয়। এ আমার স্বপ্ন--- আমি অনেক ভেবেছি---তবু এ আমার স্বপ্ন---

তোমার স্বপ্ন?---

প্রায় চীৎকার করে উঠলাম আমি।

তোমার স্বপ্ন? তুমি চেয়েছিলে? তুমি তাহলে সুখী হয়েছ? আমাকে ঘৃণা করছ না?

ঘৃণা?----

উত্তেজনায় উঠে বসল মাধুরী।

হ্যাঁ হ্যাঁ ঘৃণা! আমাকে ঘৃণা করছ না?

কেন?

আমিই দায়ী। আমার এ রকম অবিমৃশ্য-কারিতা----আমার আরও সংযত হওয়া উচিত ছিল----না—

মাধুরী আরও কোমল হল। অনেকদিন আগের মত যেন। তারপর প্রায় ফিসফিস করে বলল। আমি সুখী,---আমি সন্তান চাই ---

হঠাৎ আবার সব গান একসঙ্গে সুরু হ'য়ে গেল। আমি স্পষ্ট অনুভব করছি, ঘরের নীল হাওয়া পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে। অন্ধকার হয়ে আসা ঘরে হারিকেনের মিটমিটে আলোয় সূর্যের তেজ এসে পড়ল।

হঠাৎ একটা পোকা উড়ে এসে সেই কাচের ভেতর থেকে ছিটকে আসা আলোর রেখার চারদিকে ঘুরপাক খেতে লাগল।

ঘুরপাক খাচ্ছে তো খাচ্ছেই।

ওদিকে সেই গান ক্রমশ জোরাল হয়ে উঠছে, সমস্ত ঘর সেই গানের সুরে ভরে যাচ্ছে। আমি সেই হঠাৎ পাওয়া গানের স্রোতে ভেসে চলেছি। মাধবী! আমার মাধুরী।

পাগলা ----

আমার মাথাটা বুকে চেপে ধরল মাধুরী। তারপর আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বোলাতে লাগল। ওর শিরা বের করা খসখসে আঙুলে হৃদয়ের সব ভালবাসাটুকু যেন সঞ্চারিত করে দিতে চাইল।

ও আমার চুল এলোমেলো করে দিল। আমি ওর বুকে মাথা রেখে শুয়ে থাকলাম। অনেকক্ষণ বাদে আস্তে আস্তে বললাম, মাধবী!

বল!

আমার একটা চাকরির ঠিক হয়েছে। অল্প মাইনে অথচ দিন দশ ঘণ্টা খাটুনি বলে নিই নি।

নিও না---

না এবার নেব।

কি দরকার? পরে ভাল পেলে---

আরও পর? কত পর?

কিন্তু কিছু বলতে পারলাম না।

মনে পড়ল এ রকম একটা চাকরি আরও দু একবার পেয়েও নিই নি। কোথা থেকে একটা নির্লিপ্ততা এসে গিয়েছিল। এ রকম চাকরি করার থেকে রোজ বেরিয়ে গিয়ে সারাদিন চাকরি খোঁজার খেলা ঢের ভাল।

কিন্তু আর নয়।

আজ নিজেকে ভারী ছোট মনে হ'তে লাগল। নিজের সঙ্গে খেলাও যেন আর ভাল লাগল না। মনস্থির করে ফেললাম, পাড়ার ঐ সাইকেলের দোকানের কাজটাই নেব।

অবশ্য বুদ্ধিজীবী কেরাণী শ্রেণীতে আর থাকতে পারব না।

হোক ----

তবু বেকার থাকব না তো -----

মাধুরীর একার পর সব বোঝা চাপিয়ে আর তো নিশ্চিন্ত থাকতে পারব না।

মাধুরী সন্তান চায়,---মা হ'তে চায়--- তার স্বপ্ন ---

আজ ও আমার কাছে ধরা দিয়েছে; ওর মন খুলে ধরেছে, স্ত্রী হিসেবে আমার কাছে তার মনের ইচ্ছা জানিয়েছে।

আমি আমার কর্তব্য করব।

সেই কাজই করব।

হঠাৎ পাওয়া গানকে থামতে দেব না।

ঘরের হাওয়া আবেগে কাঁপছে।

হারিকেনের আলোটা কেঁপে কেঁপে হঠাৎ নিভে গেল।

বোধ হয় কেরোসিন ফুরিয়েছে, আর অন্ধকার।

শুধু সেই অন্ধকারে আমার মন অনির্বাণ শিখা হ'য়ে জ্বলতে লাগল।

ছেঁড়া কাঁথায়—লাখ টাকার স্বপ্ন

এটি প্রবাদ বাক্য। অনেক ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হয় এই প্রবাদটি কিন্তু এর পটভূমিকায় অকাট্য যুক্তি আছে বলে সব সময়ে মনেও হয় না। জীবনে স্বপ্ন দেখারও প্রয়োজন আছে। জীবনধারণের তাগিদে যেমন আহার্য প্রয়োজন সেই অনুপাতে চাহিদা না হলেও নিঃসন্দেহে অনেকটা তার কাছাকাছি তো বটেই।

ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন না দেখে যদি লাখ টাকার পালঙ্কে শুয়ে স্বপ্ন দেখতে হয় তা হলে অন্তত কোটি টাকার স্বপ্ন দেখতে হবে। তা না হলে স্বপ্ন দেখার মধ্যে থাকবে না আনন্দ, আকর্ষণ। এমন কোনও রোমাঞ্চকর শিহরণ হবে না যাতে আছে বৈচিত্র্যজনিত পরিবর্তন। লক্ষপতি জাগরণেও যে স্বপ্ন দেখেন তা নিঃসন্দেহে কোটি টাকার। একান্তভাবেই কোটি টাকার। সন্দেহের অবকাশমাত্র তাতে নেই। তা ছাড়া ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন না দেখলে আর যাই হোক লাখ টাকার মাহাত্ম্য কি বাড়তো? মোটেই না। আর বাস্তবে কোটিপতির বিপদ অশেষ।

আমরা সুবিধের জন্য অবাস্তব বলে কোনও কথা উড়িয়ে দিতে হলেই বলি ছেঁড়া কাঁথা আর লাখ টাকার প্রবাদ বাক্য। স্বপ্ন যে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে দেখেও কার্যকরী করা যায় তার প্রমাণ বিস্তর আছে। বিংশশতকেও, হাজারো আরব্যরজনীর উপন্যাসের চেয়েও বিস্ময়কর। মারবারা দেশ থেকে লোটা, কম্বল, 'হ্যারিকেন' হাতে এসে কলকাতা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, কাশী, প্রয়াগ, গৌহাটিতে ছড়িয়ে পড়েছেন এমন গন্দেরীরাম বাঁটপারিয়া, রঘুপতিরাম কালাচাঁদিয়ার অভাব কি?

একটি গোয়ালিনীর কাহিনী এই প্রবাদ প্রসঙ্গে অবতারণা করা হয়ে থাকে, এই হতভাগিনী গোয়ালিনীর কাহিনী নেহাৎই গল্প বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কারণ এর পটভূমিকায় আছে উপদেশ। অমূল্য বলেই কাহিনীকার দাবী করেছেন। অধিকাংশ পাঠকেরাই তা মেনে হয়ত নিয়েছেন এবং আরও অনেকেই নেবেন।কাহিনী মোটামুটি এই:

উদ্ভিন্নযৌবনা গোয়ালিনী দুধের কলসী মাথায় নিয়ে গ্রামপথ দিয়ে হাটে যাচ্ছিল। দুধ বেচে পয়সা পাবে আর তাই দিয়ে সে মনোরঞ্জক অনুপম সাজসজ্জা কিনবে। রূপের মায়াজাল ধরা দেবে স্বাস্থ্যবান কোনও যুবক। তারপর—যুবক প্রণয় নিবেদন করবে—প্রস্তাব করবে। সে তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। প্রত্যাখ্যানের কাল্পনিক দেহভঙ্গী নিয়েও বেচারীর চিন্তার অবধি ছিল না। অবশেষে প্রত্যাখ্যানের ভঙ্গী মহড়া দিতে গিয়ে মস্তক আন্দোলনেই যত বিপত্তি। দুধের কলসী পড়ে ভেঙ্গে যায়।

এও ত' স্বপ্নভঙ্গ: কিন্তু এর অন্তর্নিহিত বেদনার কথা আমরা কতটুকু চিন্তা করি? বেচারীর মনে সাধ হওয়াটা কি অন্যায় বা অসঙ্গত? কোনও যুবকের সান্নিধ্য কি আশা তার করার অধিকার নেই। স্বল্পস্থায়ী হলেও স্বপ্নভঙ্গে যেটুকু স্বস্তির স্বাদ বেচারী পেয়েছিলো তাও তো চুরমার হয়ে গেল। সেই অবাস্তব স্বপ্ন—ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে যে স্বল্প আনন্দ সে পেয়েছিল সে কথা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য নেই প্রবাদে। গোয়ালিনী মা হয়ে গোয়ালিনী মার্কা কনডেনসড মিল্কের একমাত্র এজেন্টের একমাত্র কন্যা হলে আপাতকারণে অভাব হত না প্রণয়প্রার্থীর। পাণিপ্রার্থীর জন্যেও না। প্রত্যাখ্যান করবার জন্য মহড়া সে মেয়ে দিতোই না—দিলেও মাথা নাড়তো না পা নাড়তো কিংবা নেপালী পাহারাদার ডাকতো কিংবা তার অঙ্গুলিসঙ্কেতে এ্যালসেসিয়ান কুকুর ডাকতো পাড়া মাথায় করে। অলমিতি বিস্তরেণ।

দীপক সেন

গতযৌবনা আটান্নর অষ্টাদশী স্বপ্ন দেখেন যৌবনসরসী-নীরে প্রতিবিম্ব। সেই স্বপ্ন দেখেন বলেই 'কসমেটিকস'-এর বিক্রী বাড়ে—'লিপষ্টিক' বিক্রী হয় বেশী। পাউডার, ক্রীমের অশেষ প্রলেপে কালো বড় হয় ছাই ছাই। 'ম্যাকফ্যাকটার'ই জীবনের 'গ্রেটেষ্ট ফ্যাকটার'—'ইয়ার্ডষ্টিকে' যে অসামান্য প্রয়াসের পরিমাপ পাওয়া যায় না। তিনি জানেন যে অপ্রকৃতিস্থ না হলে তাকে কেউ বলবে না Oh fairest of creation! last and best. বরং প্রকৃতিস্থ কেউ হয়ত বলতে পারেন Thou hast nor youth nor age—But as it were an after dinner sleep—Dreaming of both. তবু স্বপ্ন দেখেন গতযৌবনা—বেদনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার ব্যর্থ প্রয়াস তাই প্রকট হয়। জীবনের দুঃখ ভোলা চাই—মরি হায়, বসন্তের দিন চলে যায়।' প্রয়াসের মধ্যে উৎকট আতিশয্যও তাই ধরা পড়ে না—স্বপ্নমাদকতার জন্যে একান্তভাবে এটি সম্ভব।

স্বপ্ন হলেও সত্যি যে পার্থিব জগতে সে রকম ঘটনা ঘটে না আদৌ একথাও জোর করে বলা চলে না। বাস্তবে স্বপ্ন প্রকৃতই রূপায়িত হলে সুখপ্রদ ব্যাপারও সব ক্ষেত্রে হয় না। জাগ্রত ব্যক্তির স্বপ্নসৌধ বাস্তবে সুনিশ্চিত সমাধিস্থ হয় না এমন নয়। নিদ্রাভঙ্গে যেমন স্বপ্নভঙ্গ অনিবার্য তেমনি অনিবার্য কারণেই প্রেয়সীকে স্বপ্নে দেখলে পুলক হয়—তাকে নিয়ে প্রবালদ্বীপে সাতমহলা সৌধ রচনা করেও অনেক কিছু বাকী থেকে যায়। 'হানিমুনে' যাবার স্বপ্ন দেখায় মানসিক তৃপ্তি আছে অন্তত প্রাকবিবাহিত জীবনের থাকা উচিৎ। কিন্তু 'হানিমুন' ফেরৎ নবদম্পতীর সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্যে ব্যয়ের হিসেব মেলানোর সময় যা অনিবার্য, তা হচ্ছে অপরিমিত ব্যয়ের আফশোস। এরপরই নিরবচ্ছিন্ন একঘেয়েমি—অফিস যাবার তাড়ার সময়ে সফেন গরম ভাত আর লবণহীন ডাল পরিবেশন হলে তো আর কথাই নেই। বিনা বাক্যব্যয়ে দাম্পত্যকলহ। অভিযোগে শুরু অভিমানে সারা।

স্বপ্ন কে না দেখেন? ভারতবর্ষকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে দেখার স্বপ্ন যাঁরা দেখেন তাঁরাও তো ছেঁড়া কাঁথার চেয়ে কোন উন্নত অবস্থায় কখনই ছিলেন না। তাঁরা স্বপ্ন দেখেছিলেন বলেই তো আজ আমরা বাস্তবে স্বাধীন ভারত দেখছি। সেই বরেণ্য শহীদদের আজ আমরা সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। ইংরেজ আমলে মোসাহেবেরা তাঁদের ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার তুলনাই নিঃসন্দেহে দিয়েছিলেন।

নেপোলিও হিটলার, মসোলিনী স্বপ্ন সকলেই দেখেছিলেন। কার্যকরী হয় নি তাদের প্রয়াস, তাদের স্বপ্ন ছিল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার অব্যবহিত পূর্বে এবং ক্ষমতায় থাকার সময়ে তারা 'লজিক্যালি' ও 'এ্যাষ্ট্রোলজিক্যালি' 'আনসাকসেসফুল।' তাদের স্বপ্নদর্শন ছেঁড়া কাঁথায় না শুয়েও অসফল। বিধানচন্দ্র রায়ের স্বপ্ন সফল হয়েছে দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানার সাফল্যে—তাই কি কংগ্রেসের অধিবেশনও হয়েছে ক্ষমতায় আসীন থেকেও অনেকে যা পারেন নি বিধানচন্দ্রের ক্ষমতার প্রয়োগে তার সার্থক রূপায়ণ হয়েছে। আসল ব্যাপার রাশিচক্রে নিদারুণ যোগাযোগ।

আয়ুব খান ও ভুট্টো সাহেব ম্যারিকান প্যাটন ট্যাঙ্কে ভারত বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন—সে স্বপ্ন বাস্তব হয় নি এখন পর্যন্ত। নেহরু দেখেছিলেন নোবেল শান্তি পুরস্কারের স্বপ্ন—পাকিস্তানের সঙ্গে সৌহার্দ্যের স্বপ্ন—ছেঁড়া কাঁথায় নয় বিশেষ আরামপ্রদ গদি-বালিশে শুয়েই, তবু তা সার্থক হয় নি। এক্ষেত্রে ক্ষমতার অভাব বা অর্থাভাব

বড় কথা নয়। রাশিচক্রে যোগাযোগের অভাবটাই প্রকট বোধ হয়।

আজীবন সাহিত্যের সাধনায় নিরত থেকে অন্নবস্ত্র সংস্থানের মামুলী যন্ত্রণা ভুলে প্রকৃত প্রতিভাদীপ্ত রচনা লিখেও জীবদ্দশায় শুনেছেন উপহাস, বিদ্রূপ। শুনেছেন ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্নদর্শনের তুলনা। দেহাবসানে পেয়েছেন শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি, মর্যাদা, সম্মান, **Posthumous award** এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অন্যদিকে 'পাবলিসিটি'র অসামান্য যাদু-স্পর্শে সাধারণ নয় নিকৃষ্ট সাহিত্য লিখেও স্বপ্নাতীত সাফল্যে পুরস্কারের পর পুরস্কার পেয়েছেন এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। এও তো ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখারই মত। 'প্রাইজ' পেয়ে সবচেয়ে বেশী 'সারপ্রাইজড' হয়েছেন নিজেরাই—'অন্যে পরে কা কথা।'

দশ টাকা কিংবা তার চেয়েও কম দরের দৈনিক আর্টিস্ট অচিরে বিবাহিত অবস্থাতেও চিরকুমার হয়ে লাখ টাকার রোজগারের স্বপ্ন নিশ্চয়ই দেখেন। বাস্তবে এমনটি যে আদৌ হয় নি তা নয়। স্যাঁৎসেতে ঘরে নিরাভরণ তক্তপোষে অবিরাম ছারপোকার কামড় খেয়ে ঘরের চালের দিকে তাকিয়ে অনেক আর্টিস্ট দিবাস্বপ্ন দেখেছেন জাগরিত অবস্থায়। সে স্বপ্ন চিত্রতারকারা দেখান রূপালী পর্দায় তাই দেখে অনেক অপরিণতদর্শক চিত্রতারকা হবার নেশায় পাগল, কেউ বা আবার রূপালী পর্দায় নায়ক-নায়িকার মিলনের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়েই গৃহত্যাগ করেন—এমন সংবাদও সংবাদপত্রে বিরল নয়।

তরুণ ও উদীয়মান খেলোয়াড়েরা স্বপ্ন দেখেন কুশলী ও দক্ষ খেলোয়াড় হবার। একবার তো এক ফুটবল খেলোয়াড় স্বপ্নে ফুটবলে কিক করে খেলতেই পারেন নি শেষ পর্যন্ত। এই খেলোয়াড়টি চাকরী করতেন রেলওয়েজে—খেলতেন রেলদলে। বোম্বাইতে খেলতে গেলেন দলের সঙ্গে। রাত্রে থাকার ব্যবস্থা ছিল 'সাইডিং'-এ রাখা একটি বিশেষ রেল বগীতে। উপরের বাঙ্কে শুয়ে স্বপ্ন দেখতে দেখতেই তিনি ভারতবিখ্যাত সেণ্টার ফরোয়ার্ড মেওয়ালালকে পাশ করার জন্যে পা ছুঁড়লেন। তারপর স্রেফ পপাত। ফল ফ্যাকচার ও পরিণামে হাসপাতালে স্থানান্তর। খেলার দিন তাঁর বদলি খেলোয়াড় নাকি জয়সূচক গোলের কারণ হয়েছিলেন। স্বপ্ন না দেখলে বদলি খেলোয়াড় মাঠেই নামতেন না আর স্বপ্ন বাস্তব হলে অর্থাৎ স্বপ্নভ্রষ্টা নিজে খেললে হয়ত সারা বিকেল মাঠে 'মিসকিক' করতেন। অতএব স্বপ্নেরও প্রয়োজন ছিল।

আসল কথা এই যে, নানা সমস্যা-বিজড়িত জীবনসংগ্রামে নির্ভীক যোদ্ধা যে ক'টি এখনও আছে তাও আর থাকবে না যদি না কল্পনার তন্ত্রিতে স্বপ্নের রঙে জাল বোনা হয়—জীবন রাঙানোর প্রয়াস থাকে অব্যাহত। একেই তো আমাদের নিত্যকালের অভিযোগ—'যাহা চাই তাহা পাই না।' 'আর যাহা পাই তাহা চাই না'—এও সত্যি যতই হোক না কেন মর্মান্তিক।

We look before and after and pine for what is not—

Our sweetest songs are those that tell of saddest thought.

একথা—এ ব্যথা সর্বকালের সর্বমানুষের।

অবাস্তব বা অনায়ত্ত জিনিসের চিন্তা স্বাভাবিক চিত্তবিনোদনে সহায়তা করে। সে রকম না হলে মানুষ জীবদ্দশাতেই সর্ব সময়ে ভোগ করত মৃত্যুর যন্ত্রণা—কল্পনা বা স্বপ্ন সে দেখে বলেই ক্ষণিক আনন্দের আস্বাদ আছে তার জীবনে। না হলে মৃত্যুতে সে সত্যিকারের মুক্তির আনন্দ পেত না। তাই স্বপ্নের জাল বোনারও প্রয়োজন আছে—প্রয়োজন আছে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখার এবং তার জন্য ছেঁড়া কাঁথাই নিঃসন্দেহে সবচেয়ে উপযুক্ত।

আজও আমাদের ধানদূর্বা ছাড়া কোনও মঙ্গলকাজ পূর্ণ হয় না। বৈদিক যুগের যে-কোন উৎসবে এবং তদানীন্তন উৎসব স্বরূপত ধর্মীয় দূর্বা ছিল অপরিহার্য। শুধু এই নয়, কুশাসন শ্রেষ্ঠ আসনের মর্যাদা পেয়ে এসেছে সেদিন পর্যন্ত ; এখনও পূজার্চনা বিবাহাদি ক্রিয়ায় কুশাসন অন্যতম উপচার হিসেবে স্বীকৃত। নবজাতকের ষষ্ঠী পূজা, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ—কোন সামাজিক ক্রিয়াই দূর্বাহীন নয়। আমাদের দেশে দূর্বার সশ্রদ্ধ ব্যবহার আবহমান কাল থেকে। কেন? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব নয় সূর্যদেবের রথে সাতটি ঘোড়া পরিকল্পনার সঠিক ব্যাখ্যা।

আন্দাজ করতে পারি, প্রাণধারণের সর্বস্তরে তৃণজাতীয় সম্পদের অপরিহার্যতায় হয়ত তাঁরা মুগ্ধ হয়েছিলেন, তাই জলের মত এ বস্তুও স্থান পেয়েছিল তাঁদের জীবনসত্যের প্রতিটি কল্যাণকর্মের অচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে। পায়ে পায়ে বিজ্ঞান অনেক দূর এগিয়েছে, তৎপ্রসাদাৎ আজ জানতে পেরেছি তৃণদ্রুমের অপার মহিমার রূপকথা, ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে তার রহস্যাবরণ। পায়ের নীচে অনাদরে অবহেলায় পড়ে থাকে ঘাস। এই পদদলিত তৃণ পারমাণবিক বোমার থেকেও বেশী শক্তিধর—সাতশ' একর ঘাস একদিনে সূর্য থেকে কুড়ি হাজার টি. এন. টি শক্তিসম্পন্ন পারমাণবিক বোমার সমান শক্তি সঞ্চয়ক্ষম। সোনার চেয়েও দামী ঘাস বায়ু আর সূর্যালোকের মতই অতি প্রয়োজনীয়।

ভূপৃষ্ঠের এক-পঞ্চমাংশ জমি তৃণাচ্ছাদিত। ছ' হাজার জাতের ঘাস রয়েছে, আলাদা করে গুণলে ঘাসের সংখ্যা অন্য যে-কোন গাছের তুলনায় ঢের বেশী। এর গড় সরল, একটি কাণ্ড ও একটি পাতা প্রতি সংযোগস্থলে। ঘাসের যে ফুল হয় তা' অনেকেই জানেন না। বায়ুবাহিত রেণু এদের বংশ বাড়িয়ে চলে, তাই উজ্জ্বল বর্ণ বা সুগন্ধ দিয়ে পোকামাকড় আকর্ষণ করার কোন প্রয়োজন এদের নেই।

পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে খাপ খাইয়ে বেঁচে থাকার সংগ্রাম চলছে অনাদ্যন্ত কাল ধরে। শ'তেক প্রাণী নিশ্চিহ্ন হয়েছে বিবর্তনের বাঁকে বাঁকে, পুরাতত্ত্বের গবেষকদের কৌতূহলের খোরাক যুগিয়েছে তারা যুগে যুগে। তুচ্ছ ঘাস কিন্তু টিকে আছে যুগান্তরের বহু প্রলয় পেরিয়ে। উদ্বর্তনের সহজাত ক্ষমতাসম্পন্ন ক্ষুদ্র তৃণ ঘাতসহ, মানিয়ে নেওয়ার শক্তি পূর্ণ, দ্রুত বংশবিস্তারক্ষম, প্রসারণশীল. মেরু অঞ্চল থেকে মরুভূ পর্যন্ত এদের বংশবিস্তার, পর্বতশীর্ষ থেকে জলতল অবধি। প্রচুর পরিমাণে রেণু জন্মায় ঘাসে—পাঁচ কোটি রেণু কণিকা পর্যন্ত জন্মাতে পারে প্রতিটি ঘাসে। এই রেণু চার হাজার ফুট ওপরকার বায়ুস্তরেও দেখা গেছে, এদের বিস্তার অতি দূরদরান্তে।

পশুর লোমে এবং মানুষের পরিধেয় বস্ত্রে ঘাসের বীজ আটকে যায়। ফলে সুমেরু থেকে কুমেরু পর্যন্ত ঐ বীজের অবাধ গতি। দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ে ঐ বীজ এবং যে-কোন জায়গায় নিজেদের ছড়িয়ে দিতে পারে এরা, সামান্যতম সুযোগ পেলেই।

তৃণভোজী চতুষ্পদ বেঁচে থাকে ঘাসের পুষ্টির ওপর, যা মাটি থেকে জল আর সূর্যালোক নিয়ে তৈরী করে তৃণদ্রুম। আমাদেরও পুষ্টির উৎস ঐ বস্তুটি—প্রত্যক্ষে এবং পরোক্ষে ('ঘাস খাও' বললে এরপর চটে ওঠার বৈজ্ঞানিক কারণ অন্তত ধোপে টিকবে না!) বসন্তে মাটি থেকে বিপুল পুষ্টি গ্রহণ করে তৃণদল, প্রয়োজনমত পাল্টিয়ে নেয় এবং জমিয়ে রাখে বীজের মধ্যে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য হয়ে

জ্ঞানান্বেষক

ওঠে, পাতা আর কাণ্ড এর ফলে প্রায় পুষ্টিহীন অ-খাদ্যে পরিণত হয়। বীজ ছত্রাকার হয়ে গেলে তৃণভোজীরা আসল অংশটুকু থেকে বঞ্চিত হয়।

অনেক, অ-নে-ক আগেই মানুষ বুঝতে পেরেছিল পুষ্টিকর খাদ্য যোগাতে ঘাস তাকে পথ দেখাবে। বংশবিস্তারের উদ্দেশ্যে সঞ্চিত খাদ্যটুকু কায়দা করে নিজের খাদ্যে পরিণত করা—ব্যস! এটুকুই ছিল মানুষের। একতম কর্তব্য বীজগুলো উদরসাৎ করার ইচ্ছেয় সে যখন ঘাস বুনতে সুরু করল, পেল শস্যদানা যা' হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের ভাত-রুটির যোগান দিচ্ছে। ধান, গম, ওট, রাই, বাঁশ, আখ বার্লি, যব, ভুট্টা—এ সবই তৃণদ্রুম, বন্য এবং অধুনা নিশ্চিহ্ন নানা জাতের ঘাস রীতিমত চাষ করে পাওয়া সাত রাজার ধন।

চাষ করে ফলানো এইসব তৃণদ্রুম মানুষের মূল খাদ্য। ভূমধ্যসাগরীয় সভ্যতার ভিত্তি গম, ভারতীয় ও চীনা সভ্যতার মূল ধান এবং আমেরিকার প্রকৃত সভ্যতা ভুট্টাজাতীয় শস্য-ভিত্তিক।

চার হাজার বছর ধরে অর্ধেকের ওপর পৃথিবীর প্রধান খাদ্য চাল, ছ' হাজার বছর একটানা প্রতীচ্য জগতকে বাঁচিয়ে রেখেছে, গম, ভুট্টাজাতীয় শস্য আমেরিকায় বহু বহু দিন আগেই মূল খাদ্য হিসেবে চালু হয়েছিল। ভারতের একজাতীয় ঘাস থেকে আখের চাষ সুরু হয়। নিরামিষ পদার্থের মধ্যে আখ এক-বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী—আখে সবচেয়ে বেশী শক্তি সঞ্চিত হয়।

খাদ্য তৈরীর উদ্দেশ্যে ঘাস সূর্য থেকে শক্তি এবং মাটি থেকে পুষ্টি টেনে নেয়। দুটোই আমাদের পক্ষে জরুরী।

সূর্যের পরিবর্তিত শক্তি মানবদেহে আলানি যুগিয়ে দেয়। কড়ে আঙুলই তুলি, গাড়িই চালাই, আর বিরাট প্রাসাদই তৈরী করি, সব ক্ষেত্রেই গাছপালা মারফত পাওয়া সূর্যের পরিবর্তিত শক্তি সক্রিয়। শাক-সব্জি ছাড়াও দুধ, মাংস ইত্যাদির মারফত আমরা এই শক্তি পাই।

চারণভূমির সাড়ে চারশ গ্রাম ঘাসের ক্যালরি মানুষকে ঘণ্টা দেড়েক চলা-ফেরার, মিনিট দুয়েক সিঁড়ি ভাঙার, আধঘণ্টাটাক কাঠ চেরার কিংবা ঘণ্টা তিনেক বাসন ধোওয়ায় মদৎ যোগাতে পারে। আর, যে-কোন শস্যদানা এর চার গুণ বেশী শক্তি সঞ্চয়ক্ষম।

ঘাস থেকে মানবদেহ মহামূল্য প্রোটিন পায়। মাটির গভীরে কখনও কখনও কুড়ি ফুট পর্যন্ত ঘাসের শিকড় নেমে যায় নাইট্রোজেন আর নানান খনিজ পদার্থের সন্ধানে। 'জীবনপদার্থ' প্রোটিনে এগুলোই রূপান্তরিত হয়। সব জীবন্ত কোষে প্রোটিন বর্তমান। শরীরের সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি পূরণ করে চলে প্রোটিন।

এ ত' গেল। কিন্তু নিছক ঘাস, যা অন্যায় যত্রতত্র অনাদরে অবহেলায় তাও ফেলনা নয়। ঘাস সোনার চেয়ে দামী। কেবল আমাদের দেশেই নয়, আমেরিকার মত বিজ্ঞানের ধাঁধা লাগানো দেশেও বন্যা ক্ষতিকর অপরিমেয়। বৃষ্টি পড়ে তীরের মত যে সব জায়গায়, সেখানে বৃষ্টি ধারণের সবচেয়ে সস্তা এবং বেশী কার্যকর বস্তু ঘাস। এভাবে ঘাস বন্যা নিয়ন্ত্রণ করে এবং একই সময়ে ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে জমি রক্ষা করে অনায়াসে।

ঘাসের মূল খুব সূক্ষ্ম এবং সুদূরপ্রসারী। বস্তুত, কোনও একটা ঘাসের মূল সযত্নে খুঁড়ে মাথায় মাথায় জুড়ে গেলে কয়েক মাইল লম্বা হয়। মাটি আঁকড়ে থাকে ঘাসের শিকড়বাকড়। যে ক' ফোঁটা বৃষ্টি ঘাসের আয়ত্তে আসে তাও সে সযত্নে মাটির জন্য শুষে নেয়, মাটিতেই সঞ্চিত হয় জলকণাগুলো। এ জন্যই তৃণভূমির কূপের জল এত নির্মল এবং পানযোগ্য, এ জন্যই তৃণহীন অঞ্চলের কূপ থেকে কেবল যে নোংরা জল ওঠে তাই নয়, বহুমূল্য মাটিও উঠে আসে জলের সঙ্গে। পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে চাষভূমি থেকে তৃণাচ্ছাদিত মাটি হাজারগুণ বেশী মাটি এবং তিনশ' গুণ বেশী জল ধরে রাখতে পারে।

জলবাতাসের হাত থেকে কেবল মাটি রক্ষাই নয়, মাটি গড়ে তোলে তৃণদল। নদীর পাড়ে ঘাসের বেষ্টনী নরম কাদায় বেড়ে ওঠে

[পরপৃষ্ঠার নিম্নে দ্রষ্টব্য]

চল্লিশ বৎসর পূর্বেও আলোক বিকিরণ ক্ষমতা সম্বন্ধে খুব অল্পই জানা ছিল, মুষ্টিমেয় মানুষ তখন এই ব্যাপারে চিন্তা করতেন। আজ ফস্‌ফরাস কোটি কোটি টাকার ব্যবসায়ের ভিত্তিস্বরূপ। অদ্ভুত এই রাসায়নিক পদার্থটি, আলোক বিচ্ছুরিত হয় ইহার গাত্র হইতে।

লক্ষ লক্ষ ফ্লুরোসেন্ট বাতি তৈরী হয় ফি বছর, ইহাতে ফসফরাস্‌ অপরিহার্য। ইহার অভাবে সাদা-কালো টেলিভিশন তৈয়ারী অসম্ভব; রঙিন টেলিভিশনও ইহার উপর নির্ভরশীল। প্রতি গবেষণাগারে প্রয়োজনীয় ক্যাথোড-রশ্মি নল এবং ডাক্তারদের দরকারী ফ্লুরোসকোপিক পর্দায় ইহা ব্যবহৃত হয়। ফ্লুরোসেন্ট রংয়ের ইহা অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ—উহা কাজে আসে বড় রাস্তায় নিরাপদ অংশ রং করিতে, রাত্রিকালে যানবাহন চালাচলের চিহ্ন দিতে এবং আরও নানা জরুরী ব্যাপারে।

পদার্থবিদ্যামতে যদি কোন উপায়ে কোন কোন স্ফটিক যোগশক্তি পায়, তবে তাহাদের অণুর বহিঃস্থ খোলসের কয়েকটি ইলেকট্রন-এর স্বাভাবিক স্থানচ্যুতি ঘটে। এইরূপে তাহারা শক্তি অর্জন করে। ঐগুলি স্বস্থানে ফিরিয়া দৃশ্য বা অদৃশ্য আলোক বিকিরণ করে, পূর্বে অর্জিত শক্তির সাহায্যে। ফসফরাস জ্বলিয়া উঠে। প্রত্যেকটি ফসফর বিশেষ উপায়ে জ্বলে; ইহার বর্ণালী আঙুলের ছাপ বা তুষারখচিত চিত্রর ন্যায় অপূর্ব।

যদি শক্তি লইয়াই সোজাসুজি ইলেকট্রনগুলি স্বাভাবিক স্থানে ফেরে—অর্থাৎ, এক সেকেণ্ড-এর দশ কোটি ভাগের একভাগ সময়ে—তবে আলোকটিকে বলা হয় ফ্লুরোসেন্স, এক্ষেত্রে আলোক অদৃশ্য। নামটি একই গুণসম্পন্ন। খনিজ ফ্লুরোসপার হইতে গৃহীত।

কিন্তু ইলেকট্রনগুলি সব সময় সোজাসুজি ফিরিয়া যায় না। বরং ইহা পরিবাহী মণ্ডলের ঠিক নীচে trapping অবস্থায় পড়িতে পারে। এই অবস্থা হইতে সাধারণত উহা সোজাসুজি স্বস্থানে ফিরিতে অক্ষম। যতক্ষণ পরিবাহী মণ্ডল হইতে বাহিরে নেওয়ার মত আরও শক্তি না পায়, ততক্ষণ

বিদ্যুৎবরণ

ইহা পূর্বাবস্থায় থাকে। পরিবাহী-মণ্ডল হইতে ইহা সরাসরি স্বাভাবিক অবস্থানে যাইতে পারে, অথবা পথে আরও কয়েকবার trapping হওয়াও সম্ভব।

সব ক্ষেত্রেই সেকেণ্ড-এর এক কোটি ভাগের একভাগের বেশী সময় প্রয়োজন আলোক বিচ্ছুরণের জন্য—এই সময়টুকু একটি ইলেকট্রন স্তরান্তরে সোজাসুজি যাওয়ার সময় নেয়। আবার একদিনও দেরী হওয়া সম্ভব। এইভাবে পাওয়া যায় ফসফোরেসেন্স, যাহার অনুকরণে ভুল নাম ফসফরাস দেওয়া হইয়াছিল, ইহাতে আলোক স্থায়ী হয়। ভিজা বায়ুতে ফসফরাস-এর দৃশ্য জ্যোতি রাসায়নিক বিক্রিয়াজাত; ফসফোরেসেন্স পদার্থজ ক্রিয়া এবং ইহা রাসায়নিক বিক্রিয়া নির্ভর নহে। অবশ্য প্রায় সব ফসফরাস এই দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনার ফলে ধীরগ রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটে।

স্বল্প কয়েকটি পদার্থই ইহা হইতে অধিকতর জটিল। বর্তমান প্রবন্ধে ইহার আভাসমাত্র দেওয়া সম্ভব। হাজার হাজার জাতের ফসফরাস্‌ তালিকাভুক্ত হইয়াছে; ইহার সম্ভাব্য সংখ্যা গণনাতীত। পদার্থ বিদ্যাবিদদের মতে অধিকাংশ প্রাকৃতিক পদার্থই কিছু পরিমাণে ফসফর। কেবল আলোক বিকিরণকারী গুণসমূহের সম্ভাব্য রাসায়নিক যৌগগুলির তালিকা প্রণয়ন করিতে হইলে খুঁটিনাটির আকার বৃহৎ হইতো সন্দেহ নাই, তবে ইহা করা অসম্ভব নহে। কিন্তু অন্যান্য কারণ এই অসুবিধা বহুগুণিত করে।

শুনিতে অদ্ভুত লাগিলেও বিশুদ্ধ স্ফটিক সাধারণত শ্রেষ্ঠ ফসফর তৈরী করে না। কিছু পরিমাণ মালিন্য প্রয়োজনীয়। এই মালিন্যের প্রকার এবং পরিমাণ অত্যন্ত সূক্ষ্ম।

আবার সঠিক পরিমাণে মালিন্যযুক্ত হইলেও উৎকৃষ্ট ফসফর হয় না। কিছু বাড়তি মলিনতা স্ফটিক যৌগের সহিত মিশ্রিত করা দরকার, ইহার নাম 'activator'। যৌগটির নাম 'host'। নানা ধরণের 'activator' বর্তমান, প্রত্যেকটি অনেক ফসফর-এ কার্যকর।

জোয়ারের জলে। ওরা তীরগামী ঢেউগুলো ভেঙে দেয় আর জলের তোড়ে ভেসে-আসা পাথরের টুকরো ধরে রাখে। এতে পাড় রক্ষা পায়, নতুন ভূমি গড়ে ওঠে, শেষে একদিন শুকনো ডাঙা জেগে ওঠে ঐ জায়গায়। ঘাসগুলো মরে যায়, জমিটুকু চাষের উপযোগী হয়ে ওঠে। এভাবেই ভার্জিনিয়া-র অনেক 'Tide water Land' গড়ে উঠেছে।

ঈশ্বরের রুমাল বলা হয় ঘাসকে। আমাদের নজরে পড়ুক বা না পড়ুক, আমাদের জীবনের তুচ্ছ তৃণের ভূমিকা গৌরবজনক। হরিৎ ঘাসে আকীর্ণ মাঠ আজ একমাত্র সান্ত্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছে নগরবাসীর শ্রান্ত স্নায়ুর পক্ষে। পাথরের সাক্ষ্য থেকে জানতে পারা গেছে ঘাসের অস্তিত্ব ছিল দু' কোটি বছর আগেও। পৃথিবীপৃষ্ঠে এক সময় এর ছিল একাধিপত্য। আজও কি নেই? ওদের বাদ দিয়ে আমরা কি বাঁচতে পারি? আর, আর যখন আমাদের পায়ের চিহ্ন পড়বে না এই বাটে, যখন ঘাসে ঘাসে পা চালাবো না নব নব পথে যেতে, ফুলের গন্ধ যখন মানুষহীন পৃথিবীর বাতাসে আকুল হয়ে মিলিয়ে যাবে বৃথাই, তখনও মাটিমায়ের বুক আলো করে ফুটে উঠবে হরিদ্বর্ণ তৃণদল। ওদের নবনীত কোমল দেহে সূর্যের আলো তখনও ঝিকমিক করে উঠবে অনন্ত কৌতুকে: গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত আনন্দ-বেদনার মূক সাক্ষী হয়ে ওরা দাঁড়িয়ে থাকবে, যেমন করে এক অনাদি ঊষায় ওরা অপেক্ষা করেছিল, হয়ত মানুষেরই প্রতীক্ষায়। যে তার মূল্য বুঝবে, যার মরণ-বাঁচনের চিরকালীন সঙ্গী এই তুচ্ছ তৃণদল।

ম্যাংগানীজ এই কাজে বহুল ব্যবহৃত। ১২০টি যৌগে ইহা ব্যবহার করা চলে। প্রতি ক্ষেত্রেই ব্যবহার্য 'activator'-এর পরিমাণ অল্প। কিছু বেশী হইলেই ইহা বিষ হইয়া দাঁড়ায়। কোন কোন মৌল কয়েকটি 'host'-এর 'activator'; অন্যগুলির ক্ষেত্রে ইহারা বিষবৎ, পরিমাণ যত স্বল্পই হউক।

কোন কোন ফসফর-এ দুইটি 'activator' লাগে, ফলে অবস্থা জটিলতর হইয়া উঠে। দুইটির কোন একটিতে কাজ হয় না। যেন, একটিকে কার্যকর করার জন্য অন্যটি প্রয়োজনীয়। কারণ? অনেক কিছুর মত আজও রহস্যাবৃত।

ফসফর নানা উপায়ে উত্তেজিত করা সম্ভব; অতি বেগুনী বিকিরণ দ্বারা বা রঞ্জন রশ্মি, ইলেকট্রন রশ্মি, নিউট্রন এবং বিদ্যুৎমণ্ডল দ্বারা। অধিকাংশ ফসফরই উপরোক্ত কোন একটি উপায়ে উত্তেজিত করা সম্ভব হইলেও, সব কয়টি সম্ভব নহে।

পরিবর্তমান উষ্ণতা অধিকতর জটিলতা সৃষ্টি করে। অধিকাংশ ফসফরই গৃহের স্বাভাবিক উষ্ণতা বা সামান্য বেশী উষ্ণতায় সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ করে, কিন্তু অধিকতর উষ্ণতায় ইহাদের কর্মক্ষমতা হ্রস্ব হইয়া যায়। অবাক কাণ্ড এই যে, কোন কোন ফসফরাস কয়েক শ' ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় সর্বাপেক্ষা বেশী কার্যকর, তাহার ফলে নতুন ফ্লুরোসেণ্ট পারদ-বাষ্প বাতি তৈয়ারী করা সম্ভব হইয়াছে। আবার, কোন কোনটি অত্যধিক ঠাণ্ডায়, তরলীকৃত বাতাসের হিমে সর্বাপেক্ষা বেশী কার্যকর।

স্পষ্টতই যোগ-বিয়োগের সম্ভাবনা অনন্তকাজেই প্রয়োজনীয় গবেষণার পরিমাণও ভীতিজনক। পদার্থ-বিদ্যাবিদ বলিতে পারেন ইহার স্ফটিকে কী ঘটে, কিন্তু ইহার গঠন দেখিয়া কোন প্রাকল্পিক ফসফর-এর কার্য কী হইবে তাহা বলা সম্ভব নহে।

ফসফর সম্বন্ধে কিছু জানা সম্ভব হইলেও উহার ব্যবহারে, সঠিক ব্যবহার সম্বন্ধে মানুষের জ্ঞান সামান্য। উহাদের ক্রিয়াপদ্ধতি সম্বন্ধে কাণ্ডজ্ঞানের পরিমাপ অত্যল্প।

এই অবস্থা গবেষকেরা মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহেন, কোনমতেই না। এই অবস্থা তাঁহারা বেশীদিন চলিতে দিবেন না; অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন অসংখ্য বিজ্ঞানী ফসফর-এর রহস্যাবরণ উন্মোচন করিবার জন্য। তাঁহারা সফল হইলে যে কেবল ভালতর ফসফর প্রয়োজনে ব্যবহার করা সম্ভব হইবে তাহাই নহে, চতুষ্পার্শ্বস্থ জগতের বস্তুনিচয়ের গঠন সম্বন্ধেও বহু তথ্য আমাদের আয়ত্তগম্য হইবে।

এইসব একনিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টা সফল হউক, ইহাই প্রার্থনা। কেন না, ইতরজনের পাতে মিষ্টান্নর মত আমাদের ভোগেও কিছু কিছু লাগিবেই।

এবার প্রিয়ংবদা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

॥ দশ ॥

পরদিন ভোরেই বেরিয়ে ওরা সদরে গিয়ে টেলিগ্রাম দু'টো ক'রে ফিরে এল। যেতে-আসতে প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের যে সময়টা পাওয়া গেল তাতে পরিবারটির আরও কিছু পরিচয় পেল লোকেশ। কৃণার সেনেরা ছিলেন এখানকার জমিদার। মহালটা আগে ছিল একজন নীল-কুঠিয়ালের। এক সময় ইছামতী উপরি-উপরি কয়েক বছর গতি পরিবর্তন ক'রে চারিদিকটা ভেঙেচুরে এমন ক'রে দিল যে নীলের চাষ অসম্ভব হয়ে উঠল একরকম। দ্বারিক সেন ছিলেন কুঠির ম্যানেজার। টাকা করেছিলেন। কুঠিয়াল সাহেব সম্পত্তি বেচে বিলেত চলে যেতে চাইলে উনিই বে-নামিতে কিনে নিলেন। সেই থেকে চলে আসছে। ছোট মহাল, জলকরই বেশি। কয়েক পুরুষে যেমন কিছু কিছু বেড়েছিল তেমনি ভাগাভাগিতে বেরিয়েও গেছে, ফলে কৃর্ণার এঁদের বিশেষ কিছু লাভ হয় নি। তারপর এখন তো উঠেও গেছে জমিদারি।

পিসির বাড়ি, তবু নিশানাথ এখানে খুব বেশি আসে নি। স্কুলের যুগে আসবার সুবিধা ছিল, সময় ছিল। কিন্তু বার দয়েকের অভিজ্ঞতায় আতঙ্কই ধ'রে গিয়েছিল কৃর্ণা সম্বন্ধে। একবার আসে বর্ষায়, পিসিমার দেওরের বিয়েতে, একবার পূজার সময়। রাস্তাঘাট নেই, চারিদিকেই জল আর জল, গোটা দিনই নৌকায় কাটিয়ে আর এমুখো হতে চায় নি নিশানাথ। ইদানীং এই দ্বিতীয়বার এসেছে। বাঁধ বেঁধে, রাস্তা বের ক'রে এখন চেহারা বদলে দিয়েছে জায়গাটার। নিজে কৃর্ণাগ্রামটি তো বড় স্নিগ্ধ, পুকুরে-দীঘিতে, বনে-বাগানে বাংলার একখানি আদর্শ গ্রামই. কলকব্জার সহরে থেকে থেকে আরও টানে মন, কিন্তু এখন আর সময় কোথায়? একবার এসেছিল পৈতেতে, পিসিমার দেওরের প্রথম ছেলের, সেই প্রথম আসার তেরো বছর পরে. দুদিনের জন্য, তারপর এবার বদনের বিয়ের কথা উপলক্ষ করেই বছরখানেকের মধ্যে বার তিনেক এল। এবার একেবারে দিন পনেরোর ছুটি নিয়ে। পাকাদেখার পর চারদিন বাদ দিয়েই বিয়ের ঠিক হয়েছিল, হ'য়ে গেলেই নিশ্চিন্ত তো।

নিশানাথ বেশি না এলেও পিসিমাদের সঙ্গে যোগসত্রটা ভালোভাবেই রেখে গেছে। বাবার একমাত্র বোন, ওখানকার সব কাজেই যেতে হয় ওঁকে। গোড়ায় ক'বার বদনকে নিয়ে যান নি কি ভেবে, তারপর ও বরাবরই গেছে। ওর সম্বন্ধে তিন রকম মনোভাবের কথা মনে পড়ে নিশানাথের। প্রথমে ছিল একটা কৌতূহল মাত্র; পিসিমা দত্তক মেয়ে নিয়েছেন এইটুকুই প্রকাশ পেয়েছিল বাড়িতে। তার বছর দু'তিন পরে যখন প্রকৃত পরিচয়টা জানতে পারা গেল তখন সেই কৌতূহলের সঙ্গে কেমন একটা পর পর ভাব এসে পড়ে খানিকটা দূরত্বই সৃষ্টি করল ওর সঙ্গে, যদিও মেলামেশাটা আগেও কখনও বেশি ছিল না, কুটুম্বের মেয়ের সঙ্গে স্বভাবতই যেমন থাকে না বেশি। তারপর এই বছরখানেক ধরে দেখাশোনা একটু বেশি হওয়ায় সেই দূরত্বের ভাবটা গেছে কেটে। মেয়েটা আর যাই হোক, বন্য আর ঘরোয়া---এই দুটো প্রকৃতির সংমিশ্রণে বেশ ইন্টারেস্টিং (Interesting) অবশ্য বন্য অর্থে দূরন্ত-দুর্বার নয়। মুক্ত, নিঃসঙ্কোচ; হয়তো বেহায়াও মনে হতে পারে অনেকের কাছে, ওকে ঠিকমতো বুঝতে না পারলে। নিশানাথ যে কতকটা জানে তারও একটু হেতু আছে।

কাজের ব্যাপারে লোক সমাগম বেশি হলেও আসলে পিসিমাদের সংসারটা ছোটখাট, ছিমছাম; কর্তা-গিন্নি ওরা দুজন। পিসিমার দেওর, ভাজ, তাঁদের তিনটি ছেলেমেয়ে ছোট্ট, আর এদিকে বদন। বড় মেয়ে বলতে বাড়ির হিসাবে ঐ একা। কাজেই কেউ এলেগেলে দেখাশোনা করার ভার বেশ খানিকটা ওর ওপরই পড়ে। পড়াশোনা কিছু খবরাখবর রাখা সেদিকেও ওরই ঝোঁক বেশি বাড়িতে, সুতরাং অবসরসময়ে একটু এ ধরণের আলোচনা করতে হলে ও ছাড়া উপায় নেই। তারপর বদন মানে ওর ঐ দুই সখী, কনক আর মলিনা।

কনক বদনের বান্ধবাই। তবে মলিনা আবার এক হিসাবে এ-বাড়ির মেয়ে। ও হচ্ছে কর্ত্রী দয়াদেবীর দেওরের শ্বশুরবাড়ির মেয়ে, ওর জায়ের ভাইঝি। পিসির অত্যন্ত ন্যাওটো, গোড়ায় সেই সূত্রেই যাওয়া-আসা ছিল বেশিরকম, এর ওপর গ্রামে পড়াশুনার সুবিধা না থাকায় এখানকার স্কুলেই নাম লিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন স্কুল-ফাইনালের ছাত্রী।

কনক প্রতিবেশীর মেয়ে, পাশেই বাড়ি। বদনের সঙ্গে ওর ভাব। সেই বেদেরা যখন আস্তানা গাড়ে এ গ্রামে তখন থেকেই সে সময় বেদের মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করার জন্য যে নির্যাতনটা সহ্য করতে হয় তাতে আকর্ষণটা ঘনীভূত করেই এনেছিল, বদন বাড়িতে এসে উঠলেই সেটা নিবোধ নিশ্চিন্ততার মধ্যে সহজ সখ্যে রূপান্তরিত হতে বিলম্ব হোল না। এইসঙ্গে আরও একটা ব্যাপার ছিল, সেটা কতকটা প্রচ্ছন্নভাবে কাজ ক'রে যাচ্ছিল, এখনও যাচ্ছে। বুনো মেয়েকে ঘরে তুলে পোষা, দয়াদেবীর বরাবরই একটা আশঙ্কা লেগে ছিল মনে। এখন নিশ্চয় কম, তবে গোড়ায় বেশ উগ্র আকারেই থেকে ওঁর চোখের ঘুম কেড়ে নিয়ে ছিল। ওঁর চেষ্টাই ছিল, যত রকমে বদনকে ঘেরে রাখা যায়, কনকের সাহচর্যটা কাজে লাগালেন। বদনের জন্য বাড়িতে শিক্ষক নিযুক্ত হলে উনি কনককেও টেনে নিলেন। এক সঙ্গে পড়া থেকে একসঙ্গে খাওয়া-শোওয়াও একরকম নিয়মিত হয়ে গেল। দশ-এগার বছরের মেয়ে, স্কুলে পড়ছে কনক, বদন একেবারে নিরক্ষর, জোটবন্ধনের মধ্যে এই প্রভেদটাও তাড়াতাড়ি সঙ্গিনীর সমকক্ষ হয়ে উঠতে একটা প্রেরণা জোগাল বদনকে। পাশ করে স্কুল থেকে বেরুল ওরা একসঙ্গেই।

এরপর মলিনাও যথাসময়ে যে এ-বাড়ির মেয়ে হয়ে পড়ল তার মধ্যেও দয়াদেবীর প্রচ্ছন্ন হস্ত কাজ ক'রে গেছে। এখন তিনি নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ। শুধু তাই নয়, বদনকে সামলাতে উনি আরও দুটিকে পেয়ে গেছেন যেন। বদনকে ঘিরে স্নেহটা বদনের সুবাদেই এদের দু'জনের মধ্যেও চারিয়ে পড়েছে।

একই উৎস থেকে বাৎসল্যের ধারা পান করে এদের তিনজনের বন্ধনটাও আরও হয়ে উঠেছে নিবিড়।

সদর থেকে ফেরবার সময় এদের কাহিনীটা শেষের দিকে এসে বেশি করে জমে উঠেছে। শেষ করে নিশানাথ বলল—"নিবিড় বললেও ঠিক বলা হয় না। কুর্ণাটিকে আমার এক এক সময় কল্পলোক বলে মনে হয় লোকেশ। কাব্য নয়, নিতান্ত গদ্য। এবং পীড়াদায়কও। এক এক সময় ওর চারিদিক থেকে এই বিচ্ছিন্নতা; বর্ষায় সেটা আরও যায় বেড়ে। এই কল্পলোকের মধ্যে ওদের এই নিজেদের নিয়ে থাকা প্রীতি-ভালোবাসায় একেবারে পরস্পরের মধ্যে লীন হয়ে—এটা যেন সত্যিই কল্পকথা বলে মনে হয় আমার। বিশেষ করে যখন দূরে থাকি, কুর্ণা আবছা হয়ে ওঠে আমার মনে। বড় আশ্চর্য বলে মনে হয় আমার—এ যুগে। আমি ওদের কি নাম দিয়েছি জানিস? দ্য থ্রি মাস্কেটিয়ার্স (the three musketeers)—আলেকজাণ্ডার ডুমার সেই তিন নাইট বন্ধু——অল্ ফর ওয়ান্ এ্যাণ্ড ওয়ান্ ফর অল্ (all for one and one one for all.)"।

হঠাৎ লঘুগুরু মিলে গিয়ে এমন ছন্দঃপতন হয়ে গেল একটা যে লোকেশ হাসি সামলাতে পারল না। নিশানাথ বলল—"তুই হাসছিস হাস, আমিও ওদের চটাবার জন্যেই বলি, কিন্তু তোর কাছে বলতে বাধা নেই, আমি সত্যিই আশ্চর্য হই, মনে মনে শ্রদ্ধা করি ওদের এই তিনজনই একের জন্যে এবং এক তিনজনের জন্যে, —ভাবটুকুতে। কল্পকথার মতই ওদেরকার প্রাণ যেন কার বুকে লুকিয়ে আছে।"

এবার যে হাসল লোকেশ সেটা নিশানাথের ভাষার জন্য, অতিরিক্ত ভাবলুতায় পড়ে।

নিশানাথ বলল—"তুই হাসছিস কিন্তু সত্যি তাই। কনক বেশ অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। পাড়াগাঁ হিসাবে বিয়ের বয়েস হয়েছে, বরং উৎরেও গেছে। দু' দুটো সম্বন্ধ নষ্ট ক'রে দিল, অনশন করে। এনে দিয়েছে বৈকি মিষ্ট রাগিণীর মধ্যে একটা বিসম্বাদী সুর, নিরীহ হলেও বদনই তো দায়ী এর জন্যে। জানি না মলিনা আবার কি ক'রে বসবে।"

এরপর চুপ ক'রেই গেল নিশানাথ।

লোকেশও আর কিছু না বলে ষ্টিয়ারিং ধ'রে সামনে দৃষ্টি ফেলে বসে রইল চুপ করে। জেলা বোর্ডের বড় রাস্তা ধ'রেই জীপ হাঁকিয়ে আসছে ওরা। এসেও পড়েছে কাছে। ওদের ডান দিকে সমান্তরালে চলে গেছে ঝিলের তটরেখা, বিস্তীর্ণ জলরাশির ওপর রোদ ঝলমল করছে। এগিয়ে আসছে ডাকবাংলোর সাদা বাড়িটা।

তার ওদিকে ভাঙাভাঙা হাল্কা মেঘের স্তূপের নীচে কুর্ণার আমবাগান। একখানি সজল-শ্যামল মেঘই যেন খসে পড়েছে শরৎ আকাশের গা থেকে। তার মধ্যে থেকে বদনদের বাড়ির চূড়াটা অস্পষ্ট দেখা যায়।

ঐখানে নিশানাথের রূপকথা। লোকেশেরও নয় কি? [ক্রমশঃ।

১৭০৯ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই সেপ্টেম্বর ইংলণ্ডের ছোট্ট মফস্বল শহর লিচফিল্ডে স্যামুয়েল জনসনের জন্ম হয়। তাঁর বাবা মাইকেল জনসনের ঐ শহরেই একটি বইয়ের দোকান ছিল। আশে-পাশের গ্রামে হাটের দিন বইয়ের দোকানও খুলতেন। এ ছাড়া পার্চমেণ্ট তৈরী করেও বিক্রি করতেন কিছু কিছু। স্থানীয় দু' চারজন লেখকের বইয়ের প্রকাশক হিসাবেও তাঁকে নাম দিতে হত। মাইকেল শহরের সম্মানিত নাগরিক ছিলেন। কিন্তু ব্যবসায়ে তাঁর মন ছিল না। সফল ব্যবসায়ীর একনিষ্ঠতার অভাব ছিল তাঁর। এক-গুঁয়েমি আর খেয়ালীপনা নিয়ে আর যাই হোক্ ব্যবসা চলে না।

মা সারার স্বভাব ছিল উল্টো। একটু উঁচু ঘরের মেয়ে। বাবার বাড়ীতে স্বচ্ছলতা দেখেছেন। স্বামীও ব্যবসা করে যথেষ্ট টাকা উপার্জন করুন, এই ছিল তাঁর আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু মাইকেল স্ত্রীর সঙ্গে এ সম্পর্কে কোনো আলোচনা করতে চাইতেন না। দু'জনের মধ্যে মনের মিল ছিল সামান্য। মধ্যবয়সী দরিদ্র ও হতাশা-পীড়িত মা-বাবার অসুখী জীবনের কথা স্যামুয়েলের প্রায়ই মনে পড়ত। এবং এই নিরানন্দ সংসারের ছায়া তাঁর জীবনকে চিরদিনের জন্য একটু ম্লান করে তুলেছিল।

জন্মের পরেই স্যামুয়েলকে এক স্তন্যদাত্রী ধাত্রীর বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিছুকাল পরে দেখা গেল স্যামুয়েলের চোখ দুটি অন্ধ হবার উপক্রম হয়েছে। আসল রোগ চোখের নয়। স্তন্য-দাত্রীর স্তন্য পান করে তিনি গণ্ডমালা রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। সেইজন্য চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হয়েছে। বাড়ী এনে অনেক চিকিৎসা করা হল। একটি চোখ প্রায় গেছে বলা যেতে পারে। গণ্ডমালাকে তখন বলা হত রাজব্যাধি। লোকের বিশ্বাস ছিল রাজা বা রাণী যদি রোগীকে স্পর্শ করেন তাহলে রোগ ভাল হয়ে যায়। চিকিৎসায় যখন কিছু হল না তখন তাঁকে লণ্ডন নিয়ে আসা হল রাণী অ্যানের আরোগ্য-স্পর্শের জন্য। স্যামুয়েলের বয়স তখন বছর আড়াই। রাণী সযত্নে শিশুকে কোলে বসিয়ে গলায় মাদুলি ঝুলিয়ে দিলেন। রাণীর স্পর্শ বাঁ চোখটিকে রক্ষা করতে পারে নি। ওই চোখটিকে হারাতে হল চিরদিনের জন্য।

পাঠশালায় পড়া শেষ করে সাত বছর বয়সে জনসন ভর্তি হলেন

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

লিচফিল্ড গ্রামার স্কুলে। গণ্ডমালার আক্রমণে মুখের চেহারা বিকৃত; বাঁ চোখ অন্ধ, আর এক চোখের দৃষ্টিও প্রখর নয়; লম্বা হাড়-ওঠা বিশ্রী চেহারা। প্রথম প্রথম ক্লাশের ছেলেরা পিছু লাগল। কিন্তু জনসনের দেহে ছিল প্রচণ্ড শক্তি, প্রচণ্ড তাঁর ব্যক্তিত্ব, আর পড়ায় সকলকে অতিক্রম করে যাবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ক্লাশে নেতার স্থান অধিকার করলেন। সহপাঠীদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠবার অবশ্য সুযোগ হয় নি। কেন না, চোখের জন্য ক্লাশের বাইরে ছেলেদের সঙ্গে খেলা-ধূলায় যোগ দিতে পারতেন না।

স্কুল-জীবনের শেষ দু' বছর তাঁর কেটেছে পেডমোরে, মামার বাড়ীর দেশে। এখানেই তিনি প্রথম মার্জিত শিক্ষিত সমাজে মেলামেশার সুযোগ পান। আঠারো বছরের তরুণী ওলিভিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রথম প্রথম প্রেমের কবিতা লিখেছিলেন পেডমোরে। ওলিভিয়ার কাছ থেকে সাড়া না পেয়েও তাঁর হৃদয় বিদীর্ণ হয় নি, কারণ এই আকর্ষণ ছিল নেহাৎ ক্ষণস্থায়ী।

স্কুলের পড়া শেষ করে দু' বছর বাড়ি বসে থাকতে হল। টাকার অভাবে আর পড়ানো সম্ভব ছিল না। মা-বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে পৈত্রিক ব্যবসায় লেগে পড়ুক। কিন্তু ব্যবসা জনসনের ভালো লাগত না। দোকানের নতুন পুরানো বইগুলি পড়তে ভালো লাগত আর ভালো লাগত বই বাঁধাতে। দু' বছর যে বই হাতের কাছে পেয়েছেন বিচার না করে পড়েছেন। এর ফলে তাঁর জ্ঞানের ভিত্তি প্রশস্ত ও দৃঢ় হল।

১৭২৮ সালে মা'র হাতে কিছু টাকা এল। এই টাকা দিয়ে ছেলেকে অক্সফোর্ডে পাঠানো হল কলেজে পড়তে। প্রথম দিনই তিনি টিউটরকে বিস্মিত করে দিলেন অখ্যাত ল্যাটিন কবির কবিতা উদ্ধৃত করে। কলেজে পড়তে এসে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে থাকতে হয়েছে। সাহিত্য ও জ্ঞানের পুঁজি দিয়ে অর্থাভাবকে ঢাকতে চাইতেন। দারিদ্র্যের অভিমানে কখনো কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে মুখিয়ে উঠতেন। একবার অধ্যাপককে নালিশের সুরে বললেন, 'যে বক্তৃতার মূল্য এক পেনিও নয় তা শুনতে ক্লাশে যাইনি বলে আমার জরিমানা করেছেন দু' পেনি।'

জুতো ছিঁড়ে আঙুল বেরিয়ে পড়েছে। তাই নিয়েই জনসন যাতায়াত করেন। দেখে অনামা কোনো লোকের করুণা হল। একদিন সকালে জনসন দেখেন তাঁর দরজার সামনে এক

জোড়া নতুন জুতো। সে জুতো ছুড়ে ফেলে দিয়ে আঙুল বের করা জুতো পরেই ঘুরেছেন যতদিন না নিজে কিনতে পেরেছেন।

দারিদ্র্যের জন্য শেষ পর্যন্ত পড়া ছেড়ে দিতে হল। ডিগ্রি না নিয়েই বাড়ি ফিরে আসেন। বাড়ির অবস্থাও ভালো নয়। ব্যবসা বন্ধ হবার উপক্রম। মেধাবী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও পড়বার সুযোগ না পেয়ে হতাশায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়লেন। এর উপর বাবার কাছ থেকে পেয়েছেন বিষাদ রোগ। মানসিক ভারসাম্য যেন ভেঙে পড়েছে। জনসনের সর্বদা আশঙ্কা তিনি বুঝি পাগল হয়ে যাবেন। তাঁর ধর্মপিতা ডাক্তার সুইনফেনকে নিজের অবস্থা জানিয়ে লিখলেন, আমাকে রক্ষা করো।

পাগল হবার ভয় তাঁকে সারা জীবন তাড়া করেছে। এর জন্য তাঁর মনে কখনো শান্তি ছিল না। মনের অসুখের সঙ্গে যোগ হয়েছিল দেহের রোগ। বিশ বছর বয়স থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একদিনও তাঁর দেহ রোগমুক্ত ছিল কি না সন্দেহ। দেহের অসুখই হয়ত মানসিক রোগ সৃষ্টি করেছিল।

১৭৩১ সালে বাবার মৃত্যু হল। মা ছোট ভাই নাথানিয়েলকে নিয়ে বইয়ের ব্যবসা দেখাশোনা আরম্ভ করলেন। স্পষ্টই বোঝা গেল বড় ছেলের উপর আস্থা নেই। ছোট ভাইকে মা বেশী ভালোবাসেন এই অভিমান জনসনের অনেক দিন থেকেই ছিল। এবার তা স্পষ্ট হল। নিজের পথ নিজেকেই দেখে নিতে হবে। মা'র কাছ থেকে শ' আড়াই টাকা পাওয়া গেল। এইমাত্র মূলধন।

কিন্তু কোন পথ? বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেই। যদিও তাঁর মতো গভীর জ্ঞান ঐ বয়সের কোনো তরুণের কাছ থেকে আশা করা যায় না। ল্যাটিন ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর দখল অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গ্রীক ভাষায় তাঁর জ্ঞানও বেশ ভালোই ছিল। ইংরেজী, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ে জনসন প্রচুর বই পড়েছেন এবং আয়ত্ত করেছেন তাদের বিষয়বস্তু। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল আশ্চর্য প্রখর। বড় বড় বই একবার পড়েই সব কথা মনে রাখতে পারতেন।

কিন্তু তবু ডিগ্রির অভাবে ভালো কাজ পাওয়া গেল না। একমাত্র ভরসা নীচের ক্লাশের স্কুল মাস্টারী। কিছুদিন তাই করতে হল। এ কাজ তাঁর নিজের ভালো লাগত না, শিক্ষক হিসাবে তিনি সফলও হন নি। সফলতার প্রধান অন্তরায় ছিল তাঁর কুৎসিত চেহারা। গণ্ডমালার চিহ্ন তাঁর মুখমণ্ডল বিকৃত করেছে। ঢ্যাঙা হাড়-বের-করা শরীর। সর্বোপরি কথা বলবার সময় অদ্ভুত মুখভঙ্গী করতেন, হাত-পা নাড়তেন। ছেলেরা এসব দেখে কখনো হাসত, কখনো ভয়ে দূরে সরে যেত। কিন্তু জনসন শরীরের এই বিচিত্র ভঙ্গী ইচ্ছা করে করতেন না; এটা ছিল তাঁর রোগ।

সামান্য বেতন, মাস্টারী করতে মোটেই ভালো লাগে না। তবু বাঁচবার তাগিদে করতে হয়। এই কাজও কিন্তু সব সময় থাকে না। একবার যখন কাজ নেই তখন স্কুলের বন্ধু এডমাণ্ড হেক্টরের বাড়ী বেড়াতে এলেন বার্মিংহামে। এখানে তাঁর জীবনের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটল। বার্মিংহামের পুস্তক-ব্যবসায়ী টমাস ওয়ারেনের সঙ্গে পরিচয় হবার ফলে সাহিত্য-জগতে প্রবেশের সুযোগ পেলেন জনসন। ওয়ারেনের চেষ্টায় জনসনের কয়েকটি রচনা বার্মিংহাম জার্নালে ছাপা হল। এরপর ওয়ারেন নিজেই ছাপল প্রথম বই 'ভয়েজ টু অ্যাবিসিনিয়া।' এ বই ফরাসী থেকে ফাদার লবোর রচনার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। এর জন্য প্রকাশকের কাছ থেকে দক্ষিণা পেয়েছিলেন পঁয়ষট্টি টাকা।

এইটুকু সাফল্যকে মূলধন করে জনসন সাহিত্য-সম্পর্কিত জীবিকার সন্ধানে ঘুরে বেড়ালেন, সুবিধে হলো না। এদিকে বয়স পঁচিশ পার হয়ে গেল। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ দুই-ই অন্ধকার।

এখানেই আলাপ হল পোর্টার পরিবারের সঙ্গে। মিঃ পোর্টার সম্পন্ন ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর বিধবা স্ত্রী এলিজাবেথ তিনটি সন্তান নিয়ে মোটামুটি স্বচ্ছলভাবেই দিন কাটাচ্ছিলেন। স্বামীর কিছু সম্পত্তি পেয়েছেন এলিজাবেথ। জনসন বেড়াতে আসতেন মাঝে মাঝে। আর কোনো অনাত্মীয় পরিবারই বিরূপ চেহারা এবং বিরক্তিকর অঙ্গভঙ্গী উপেক্ষা করে জনসনকে এমন সাদর অভ্যর্থনা করে নি। সুতরাং গৃহকর্ত্রীর প্রতি জনসনের হৃদয় কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে উঠল। এলিজাবেথও এমন একজন পণ্ডিত ব্যক্তির সাহচর্য পেয়ে খুশি হলেন। তিনি অনেককে বলতেন যে, জনসনের মতো বিচক্ষণ ব্যক্তি জীবনে দেখেন নি।

জনসনের হৃদয় বুভুক্ষু। স্নেহ-প্রেমের স্পর্শ পান নি। কোনো নারী তাঁকে ভালোবাসতে পারে এ কথা ছিল কল্পনার অতীত। সুতরাং এলিজাবেথের সহৃদয় ব্যবহারে তিনি গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন। পঁচিশ বছরের তরুণ ছচল্লিশ বছরের প্রৌঢ়া রমণীর প্রেমে পড়লেন। এলিজাবেথ জনসনের ত্রুটি সম্বন্ধে যে অবহিত ছিলেন না তা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর পৌরুষ। এই পৌরুষের উপর নির্ভর করে বাকী জীবনটা নিশ্চিন্তে কাটিয়ে দেবার স্বপ্ন দেখলেন তিনি। এলিজাবেথ জানতেন তাঁর রূপ নেই, যৌবনও অনেকদিন চলে গেছে। সুতরাং আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আপোস করেই চলতে হবে। আর জনসনও আশ্রয় পেলেন নারী হৃদয়ের এবং কিছুটা আর্থিক নিশ্চিন্ততার। এলিজাবেথের কোনো সম্বল না থাকলে নিশ্চয়ই এ বিয়ে হত না। অবশ্য জনসন বরাবরই বলেছেন ভালোবেসেই বিয়ে করেছিলেন তিনি। বিয়ের জন্য পরে কখনো তিনি অনুতাপ করেন নি। বা

এলিজাবেথের বিরুদ্ধে তাঁর কাছ থেকে কোনো অভিযোগও শোনা যায় নি।

বিয়ের পরে স্ত্রীর আর্থিক সাহায্যে জনসন একটি বোর্ডিং স্কুল খোলেন। এ স্কুল অর্থকরী হয় নি, সুতরাং বন্ধ করতে হয়েছিল অল্প কিছু-কালের মধ্যেই। তবে এই স্কুলের ছাত্র হিসাবে জনসনের পরিচয় হয়েছিল পরবর্তীকালের বিখ্যাত অভিনেতা ডেভিড গ্যারিকের সঙ্গে।

এই স্কুল চালাবার সময়ই জনসন আরম্ভ করলেন তাঁর ট্র্যাজেডি 'আইরিন'। কনস্ট্যান্টিনোপলের পতনের পর এক সুন্দরী খ্রীস্টান বন্দিনীর প্রেমে পড়েন দ্বিতীয় মহম্মদ। এই পুরনো কাহিনীই ছিল তাঁর নাট্য-কাব্যের বিষয়বস্তু। ১৭৩৭ সালে 'আইরিন' সমাপ্ত হল---কিন্তু বারো বছর এ নাটক ছাপানো সম্ভব হয় নি। গ্যারিক যখন নাটকটি অভিনয় করবার ব্যবস্থা করলেন তখনই প্রকাশক পাওয়া গেল। অভিনয় চলেছিল মাত্র নয় রাত্রি। অভিনয়ের রয়েলটি হিসাবে জনসন পেলেন দু' হাজার ছ'শ টাকা আর প্রকাশক দিল তেরো শ' টাকা। লেখা থেকে এত টাকা এই প্রথম পেলেন জনসন। 'আইরিনে'র সাহিত্য-গুণ খুবই কম।

এর আগে জনসনের আরও দুটি বই বেরিয়েছিল। একটি 'লণ্ডন'---তিনশ লাইনের কবিতা। বে-নামিতে ছাপা হয়েছে। আর একটি 'দি ভ্যানিটি অব হিউম্যান উইশেস।' শেষের কাব্যগ্রন্থটি ইংরেজী সাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। বহু কবি ও সমালোচক বেরুবার পর থেকেই এই কাব্যের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। এ যুগের কঠোর বিচারক টি এস এলিয়টও 'ভ্যানিটি অব হিউম্যান উইশেসে'র কাব্যগুণ অস্বীকার করতে পারেন নি।

'আইরিনে'র পাণ্ডুলিপি পকেটে করে জনসন লণ্ডনে এলেন ভাগ্য পরীক্ষা করতে। এবার থেকে স্থায়ী বাস লণ্ডনে। স্ত্রী এলিজাবেথও এসেছেন। আইরিনের প্রকাশক পাওয়া গেল না। কিন্তু সেই সূত্রে আলাপ হল 'জেণ্টলম্যানস ম্যাগাজিনে'র সম্পাদক এডওয়ার্ড কেভ-এর সঙ্গে। কেভ ধূর্ত লোক। ইংরেজী ছাড়া চারটে ভাষা জানেন জনসন। লিখতে পারেন যে-কোনো বিষয়ে, অগাধ পাণ্ডিত্য, আর সবচেয়ে বড় কথা কাজ দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়। সুতরাং সম্পাদকীয় দপ্তরে তাঁকে নিযুক্ত করলেন। বেতন খুবই কম। কিন্তু এ নিয়ে জনসন কোনোদিন অভিযোগ করেন নি। বরং প্রয়োজনের দিনে সহায়তা পাওয়ায় কেভ-এর প্রতি চিরদিনই কৃতজ্ঞ ছিলেন।

'জেণ্টলম্যান্‌স্ ম্যাগাজিনে' জনসন নানা বিষয়ের প্রবন্ধ ও জীবনী লিখ-তেন। যে কোনো বিষয়ে লেখার ক্ষমতার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ঐ সময় পার্লামেণ্টের ডিবেট কাগজে ছাপানো নিষিদ্ধ ছিল। অথচ পাঠক-দের গভীর আগ্রহ ছিল পার্লা-মেণ্টে কি আলোচনা হয় তা জানবার। কেভ এর সুযোগ গ্রহণ করলেন। পার্লামেণ্টের দারোয়ানদের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে তিনি অধিবেশন চলবার সময় একজন লোক পাঠাতেন। তার কাজ ছিল কে বক্তৃতা করল, কি বিষয় বলল এবং সিদ্ধান্ত কি হল এই সব মোটামুটি লিখে আনা। তারপর জনসন পার্লামেণ্টের বিবরণীর মতো করে বক্তৃতা লিখে দিতেন। এই বিবরণী ছাপা হতো এই ধরণের হেডিং দিয়ে: 'ডিবেটস্ ইন দি সিনেট অব ম্যাগনা লিলিপুটিয়া।' পার্লামেণ্টের মেম্বার-দের নামগুলিও একটু অদল-বদল করে দেওয়া হত। কিন্তু পাঠকরা ঠিকই বুঝতে পারত। পিট এবং অন্যান্য সভ্যের বক্তৃতা পড়ে যাঁরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন তাঁরা জানতেও পারতেন না যে এসব বক্তৃতা আসলে জনসনের লেখা। জনসন পার্লামেণ্টের ডিবেট লিখেছেন ১৭৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত। 'জেণ্টলম্যান্‌স্ ম্যাগাজিনের চাকরি করেছেন তিনি পাঁচ বছর,---১৭৩৯ থেকে ১৭৪৩।

১৭৪৬ সালের জুন মাসে কয়েকজন প্রকাশক জনসনকে অনুরোধ করল ইংরেজী ভাষার একটি আধুনিক অভিধান সংকলন করে দেবার জন্য। জনসন চুক্তিবদ্ধ হলেন। তিন বছর পরে পাণ্ডুলিপি সম্পূর্ণ করে দিতে হবে। পারিশ্রমিক মোট প্রায় একুশ হাজার টাকা। সহকারীদের বেতন এবং অন্যান্য খরচা এই টাকা থেকে দিতে হবে। এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, তিন বছরে একা এত বড় কাজ করতে পারবেন? ফরাসী আকাদেমির চল্লিশ জন সভ্য চল্লিশ বছরে ফরাসী অভিধান সংকলন করে-ছেন।

জনসন হেসে বললেন সে তো ফরাসীদের কথা। ইংরেজের কর্ম-ক্ষমতার হিসাব আলাদা।

অবশ্য তিন বছরে শেষ হয় নি। নয় বছরে হয়েছিল; তবু এমন বৃহৎ কাজ একা এই সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করা বিস্ময়ের কথা।

অভিধান সংকলনের সময় কোনো বড়লোকের পৃষ্ঠপোষকতা পেলে আর্থিক সুবিধা হবে বলে বন্ধুরা পরামর্শ দিল। আর্ল অব চেষ্টারফিল্ড বিদ্যোৎসাহী এবং উচ্চ রাজপদে অধিষ্ঠিত। জনসন অভিধান সংকলনের একটি পরিকল্পনা ওঁকে পাঠালেন, কয়েকবার বাড়ি গিয়ে দেখাও করলেন কিন্তু আর্ল অব চেষ্টারফিল্ড বিশেষ আগ্রহ দেখালেন না। তাঁর উপেক্ষায় জনসন অপমানিত বোধ করলেন। পৃষ্ঠপোষকতার আশা ত্যাগ করে নিজেই কাজে ডুবে গেলেন।

কাজের জায়গা হলো সস্তা ভাড়ার চিলে কোঠার ঘর। ছয়জন সহকারী চারদিকেই বই ছড়ানো। জনসন বলেন আর সহকারী লিখে নেয়। উদাহরণ দেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত লেখক-দের বইয়ের বিশেষ বিশেষ লাইনগুলি জনসন দাগ দিয়ে দেন, সহকারীরা নকল করে। ইতিপূর্বে কয়েকটি ইংরেজী

অভিধান প্রকাশিত হয়েছিল। নাথান বেইলির অভিধান থেকে জনসন কিছু সহায়তা পেয়েছেন। অন্যগুলি ছিল শুধুই শব্দ-তালিকা।

জনসনের অভিধানেই সর্বপ্রথম ইংরেজী শব্দের বানান এবং প্রয়োগ-বিধি একটি সুনির্দিষ্ট রূপ পায়। প্রয়োগ দেখাবার জন্য তিনি উদাহরণ দিয়েছেন। শব্দের সমার্থক শব্দ দিয়েই তিনি দায়িত্ব শেষ করেন নি। অর্থ ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। এই ব্যাখ্যার মধ্যে জনসনের ব্যক্তিত্ব ধরা পড়েছে। দু'খণ্ডের বৃহৎ আকারে অভিধানটিতে, সংকলন-কর্তার চিন্তা-ভাবনা ভালোলাগা মন্দলাগা সব ধরা পড়েছে। একালের আদর্শ অভিধান অবজেক্টিভ; কিন্তু জনসনের অভিধান সাবজেক্টিভ। জনসনের কতকগুলি শব্দের অর্থ কৌতূহলোদ্দীপক পেট্রিয়টিজমের অর্থ তিনি দিয়েছেন 'শয়তানের শেষ আশ্রয়।' স্কটল্যাণ্ডের লোকদের তিনি পছন্দ করতেন না। তাই 'ওট' (Oat) শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করে বলেছেন---ইংলণ্ডে এই শস্য ঘোড়ার আর স্কটল্যাণ্ডে মানুষের খাদ্য। একটি শব্দের অর্থের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের উপক্রম হয়েছিল। সেটি হল 'এক্সাইজ।' জনসন অর্থ লিখলেন, পণ্যের উপরে ধার্য ঘৃণিত কর; তবে এ কর আদালতের বিচারকরা ধার্য করেন না। যারা আবগারি কর গ্রহণ করে তাদের ভাড়াটে লোকেরা কর ধার্য করে।' ইংলণ্ডের আবগারি বিভাগ এই সংজ্ঞা পড়ে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল।

অভিধান বেরুবার কিছুদিন আগে আর্ল অব চেস্টারফিল্ড জনসনের প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করে দু'টি প্রবন্ধ লেখেন। জনসন প্রবন্ধ দু'টি পড়ে অপমানিত বোধ করেন। এতদিন এত বাধা-বিঘ্নের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে কাজ সমাপ্ত করবার পর তিনি আরম্ভ করেছেন পিঠ চাপড়াতে। প্রতিবাদে জনসন আর্ল অব চেস্টারফিল্ডকে যে চিঠি লিখেছিলেন তা ইংরেজী সাহিত্যে চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তাঁর এই অভিযোগটি তো একালের সাহিত্য-পুরস্কার সম্বন্ধেও সত্য :

Is not a patron, my lord, one who looks with unconcern on a man struggling for life in the water, and, when he has reached ground, encumbers him with help ?

অভিধান প্রকাশিত হল ১৭৫৫ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। ফেব্রুয়ারী মাসে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানিত এম-এ উপাধিতে ভূষিত করেন। কুড়ি বছর পরে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেয়েছিলেন ডক্টর অব ল উপাধি।

জনসনের রচনার মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'দি র‍্যাম্বলার' (১৭৫০-৫২) ও 'দি আইড্‌লার' (১৭৫৮-৬০)-এর নিবন্ধগুলি। শেক্সপীয়রের রচনাবলীর তিনি যে ভূমিকা লিখেছিলেন তার মূল্য আজও অক্ষুণ্ণ আছে। ইংরেজ কবিদের জীবনী ও কাব্য সমালোচনা (১৭৭৯-৮১) ইংরেজী সাহিত্যে ক্লাসিকসের মর্যাদা লাভ করেছে। জনসনের মার মৃত্যু হয় ১৭৫৯ সালে। শোনা যায় পারলৌকিক ক্রিয়ার ব্যয় বহনের জন্য দশ দিনের মধ্যে তিনি লিখেছিলেন 'রাসেলাস'। জনসন এই একটি কাহিনীমূলক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এখানে অবশ্য কাহিনীর চেয়ে দার্শনিক তত্ত্ব বড় হয়ে উঠেছে। আবিসিনিয়ার রাজকুমার রাসেলাস পাহাড়ঘেরা 'আনন্দ উপত্যকায়' বাস করেন। বাইরের জগতের সঙ্গে যোগ নেই। একদিন তিনি বোন নিকায়া এবং কবি-দার্শনিক ইমলাকের সঙ্গে 'আনন্দ উপত্যকা' থেকে বেরিয়ে এলেন জীবনের পথে। উদ্দেশ্য, সুখ কি তার সন্ধান করা। জীবনের সকল স্তরে এবং সকল মানুষের মধ্যেই দুঃখ আছে, নিরবচ্ছিন্ন সুখ কোথাও নেই, এই তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করে আবার তাঁরা ফিরে এলেন 'আনন্দ উপত্যকায়।' কয়েক সপ্তাহ পরে প্রকাশিত ভলতেয়ারের 'কাঁদিদ-এর' সঙ্গে রাসেলাসের আশ্চর্য ভাবগত ঐক্য আছে। জনসন সবচেয়ে সরল ও সাবলীল ভাষা ব্যবহার করেছেন রাসেলাসে। কয়েকটি য়ুরোপীয় ভাষায় অনুবাদ রাসেলাসের জনপ্রিয়তার নিদর্শন।

এসব কৃতিত্ব সত্ত্বেও 'ডিক্সিওনারি অব দি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ'ই যে জনসনের খ্যাতির প্রধান কারণ তাতে সন্দেহ নেই। ইংরেজী ভাষাকে অভিধানের মধ্যে যেভাবে তিনি নিয়মের শৃঙখলে বন্দী করেছেন তাতে তাঁর প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই জন্যেই তিনি অতি সহজেই সমকালীন সাহিত্যের ডিক্টেটর হতে পেরেছিলেন। এর সঙ্গে পীড়নের প্রশ্ন নেই, স্বেচ্ছা-স্বীকৃত নেতৃত্বের আসন পেয়েছিলেন লেখকদের কাছ থেকে। ডঃ জনসনের কথাই শেষ কথা। অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, গভীর নীতিবোধ, অতুলনীয় পাণ্ডিত্য, সহজ বুদ্ধি এবং বিচার শক্তি স্বভাবতই তাঁকে নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এইসব গুণগুলিই অবিসংবাদী প্রতিষ্ঠার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। আন্তরিক মানবিকতার জন্য লোকে তার প্রতি সহজেই আকৃষ্ট হত। নিজে দারিদ্র্য ভোগ করেছেন বলে দরিদ্রের প্রতি ছিল তার গভীর মমতা। রাত্রিতে লণ্ডনের পথে পথে ঘুরে বেড়ানো ছিল তাঁর নেশা। এমন সময় গেছে যখন ঘর-ভাড়া দেবার সঙ্গতি ছিল না বলে পথে রাত কাটানো ছাড়া উপায় ছিল না। সে সময়কার লণ্ডনে ভিক্ষুকের অভাব ছিল না। পকেটে কিছু থাকলেই তিনি তাদের কিছু দিতেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও তখন পথে শুয়ে থাকত। জনসন তাদের হাতের মুঠোয় একটি পেনি গুঁজে চুপি চুপি চলে যেতেন। ভোরবেলা তারা কিছু কিনে

খেতে পারবে। পতিতা নারী হয়ত প্রচণ্ড শীতে বিষণ্ণ মুখে পথে ঘোরা-ফেরা করছে। জনসন তাদের ডেকে দুঃখের কথা শুনতেন, পয়সা থাকলে দিতেন।

বন্ধুরা নিষেধ করতেন। বলতেন, ওদের পয়সা দিয়ে কি হবে? তামাক কিংবা মদ কিনে খাবে।

জনসন বলতেন, থাক। জীবনের তেতো বড়ি সকলকেই গিলতে হয়। যারা বড়লোক তারা নানা উপকরণ দিয়ে তেতোকে ঢেকে রাখে। দু'একটা পয়সা দিয়ে গরীবের জীবন থেকে-তেতো স্বাদটা এক মুহূর্তের জন্যও যদি দূর করতে পারি, মন্দ কি?

যখনই সম্ভব হয়েছে রাস্তা থেকে দুঃস্থ নর-নারীকে নিজের বাড়ী নিয়ে এসেছেন। জীবনের শেষ ক'বছর তাঁর পরিবারভুক্ত ছিল কয়েকজন নিঃস্ব নর-নারী। আর কেউ ছিল না।

জনসনের নৈতিক আদর্শ ছিল খুবই উঁচু। কিন্তু নীতিবোধ তাঁকে সংকীর্ণচেতা করে নি। চারিত্রিক ত্রুটিকেই তিনি বিচারের একমাত্র মাপকাঠি বলে মনে করতেন না। টপহাম ব্যক্লার্ক ছিলেন জনসনের ভক্ত, তিনিও তাঁকে স্নেহ করতেন। টপহামের যে অনেক চারিত্রিক দোষ ছিল সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন জনসন। তিনি সহৃদয়তার সঙ্গে বলতেন, তোমার দেহ পাপে পূর্ণ, কিন্তু হৃদয়ে গুণ ছাড়া কিছু নেই।

একটি চোখ তো জন্মের পরেই হারিয়েছেন, বয়স বাড়বার পর একটি কানও গেছে। ভীতিজনক চেহারা; পোষাক এলোমেলো, ময়লা। চলা-ফেরা, ভাবভঙ্গী, কথাবার্তা সবই অস্বাভাবিক। ক'দিন হয়ত কিছুই খেলেন না, আবার যখন আরম্ভ করলেন খেতে তখন আর মাত্রা থাকত না। সারারাত বসে খেয়েছেন এমনও হয়েছে। খাবার সময় কিছু খাদ্য বা পানীয় মখে যেত, আর বাকিটা বাইরে পড়ত। আর্ল অব চেস্টারফিল্ড জনসনের এই বদ অভ্যাসের দৃষ্টান্ত দিয়ে ছেলেকে সাবধান করেছিলেন।

লণ্ডনের রাজপথে সে সময়ে ফুটপাথ ছিল না। পথচারীদের চলবার জন্য রাস্তার একটা অংশ খুঁটি দিয়ে আলাদা করা থাকত। জনসন পথ চলবার সময় প্রত্যেকটি খুঁটি ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলতেন। এইটে ছিল তাঁর বাতিক। লোকে বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকত। কিন্তু বিদ্রূপ করতে সাহস পেত না। ভয় করত তাঁর বিরাট চেহারাকে। দেহে শক্তি ছিল প্রচণ্ড। একবার দুপুররাত্রিতে নির্জন পথে চারজন গুণ্ডা একসঙ্গে তাঁকে আক্রমণ করল। তিনি একা চারজনকে ঠেকিয়ে রাখলেন যতক্ষণ না পুলিস এসে পড়ল। এক পুস্তক-বিক্রেতাকে নিজের অভিধানের মোটা একখণ্ড দিয়ে কয়েক ঘা মেরে দিয়েছিলেন। ছাত্র ও ভক্ত গ্যারিক স্টেজের উপর তাঁর জন্য একটি চেয়ার রেখেছিলেন। চেয়ারটা খালি দেখে বসে পড়লেন অন্য এক ভদ্রলোক। জনসন এসে বললেন উঠে যেতে, ভদ্রলোক উঠবেন না। জনসন তখন চেয়ারসুদ্ধ ভদ্র-লোককে তুলে স্টেজ থেকে নিচে ফেলে দিলেন। একদিন ওয়েটার চামচের বদলে নোংরা হাত দিয়ে জনসনের চায়ের কাপে চিনি দেওয়ায় তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে জানালা দিয়ে কাপ ছুড়ে ফেললেন আর ওয়েটারকেও ঠিক তেমনি করে ফেলতে যাচ্ছিলেন, কয়েকজন এসে তাঁকে শান্ত করায় সে যাত্রা ওয়েটার বেচারা বেঁচে গেল।

অভিধান বেরুবার তিন বছর আগে এলিজাবেথের মৃত্যু হল। স্বামীর জীবনের সবচেয়ে বড় সাফল্য তিনি দেখে যেতে পারেন নি। জনসন একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। সংসারে এবার তিনি একেবারে নিঃসঙ্গ। নিঃসঙ্গতা মস্তিষ্কবিকৃতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে এই আশঙ্কায় জীবনে শান্তি রইল না। জনসনের বয়স তখন মাত্র তেতাল্লিশ। মধ্যবয়সেই তাঁর পারিবারিক জীবন শেষ হয়ে গেল। হয়তো এই জন্যই তাঁর সকল রচনার মধ্যেই একটি বিষাদের সুর লক্ষ্য করা যায়। ড্রাইডেনের 'ঔরঙ্গজেব' থেকে এই লাইন ক'টি প্রায়ই তিনি আবৃত্তি করতেন:

> When I consider life,
> 'tis all a cheat;
> Yet, fool'd with hope,
> men favour the deceit;
> Trust on, and think
> tomorrow will repay:
> Tomorrow's falser than
> the former day;...

নিঃসঙ্গতা দূর করতেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্লাবে আড্ডা দিয়ে। বিখ্যাত চিত্রশিল্পী স্যার জস্যুয়া রেনল্ডসের সঙ্গে স্থাপন করেছিলেন 'লিটারেরি ক্লাব'। সে যুগের বিখ্যাত লেখকেরা জনসনকে মধ্যমণি করে ক্লাবে মিলিত হতেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বার্ক, গোল্ডস্মিথ, গ্যারিক, অ্যাডাম স্মিথ, বসওয়েল, বিশপ পার্সি, গিবন, শেরিডান প্রভৃতি। দেহের বিরূপতা এবং আচার-ব্যবহারের ত্রুটি সত্ত্বেও উদারতা, গভীর মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে ক্লাবের বন্ধুদের হৃদয় জয় করেছিলেন জনসন। তাঁর রসিকতা, দীপ্ত প্রত্যুত্তর এবং উজ্জ্বল বাকচাতুর্য সঙ্গীদের মুগ্ধ করে রাখত। অভিধান বেরুবার পরে এক ভদ্রমহিলা তাঁকে বললেন, আপনি অভিধান থেকে অশালীন শব্দগুলি বাদ দেওয়ায় খুব আনন্দলাভ করেছি।

জনসন উত্তর দিলেন, 'ও, আপনি বুঝি বই হাতে পেয়েই সেই শব্দ-গুলির খোঁজ করছিলেন।'

ভদ্রমহিলার মুখ রক্তিম হয়ে উঠল।

অভিধান বেরুবার পরও জনসনের অর্থাভাব দূর হয় নি। প্রকাশকরা চুক্তি অনুযায়ী যে টাকা দিয়েছিল বই শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তা নিঃশেষ হয়ে যায়। ১৭৫৫ সালে অভিধান বের হয়; তার পরের বছরই তিনি ঔপন্যাসিক রিচার্ডসনকে জরুরী চিঠি

দিলেন : পাঁচ পাউণ্ড আঠারো শিলিং দেনের দায়ে গ্রেফ্‌তার হয়েছি। রক্ষা করো।

রিচার্ডসন টাকা পাঠিয়ে তাঁকে মুক্ত করেছিলেন।

নিয়মিত কাজ করলে এমন দারিদ্র্য তাঁকে ভোগ করতে হত না। যেমন খাবার বেলায়, তেমনি কাজের বেলায় সংযম ছিল না তাঁর। হয়তো কিছু দিন অবিশ্রাম কাজ করলেন, আবার একেবারে হাত-পা গুটিয়ে কচ্ছপের মতো বসে রইলেন। তখন আর তাঁকে দিয়ে কিছুই করানো যাবে না। অল্প-আয়াসে প্রচুর অর্থ উপার্জনের জন্য ভারতে পাড়ি দেবার কথাও মনে এসেছিল জনসনের।

১৭৬২ সালে সম্রাট তৃতীয় জর্জ জনসনের শুভানুধ্যায়ীদের প্রস্তাব অনুসারে তাঁকে বার্ষিক তিনশ পাউণ্ডের পেনশন মঞ্জুর করলেন। পেনশন গ্রহণ করবেন কি না সেই নিয়ে সমস্যায় পড়লেন জনসন। কারণ তিনি নিজেই অভিধানে পেনশন শব্দের যে অর্থ দিয়েছেন তা মেনে নিলে আত্মসম্মান-বোধ বজায় রেখে পেনশন নেওয়া চলে না। তাঁর সংজ্ঞা ছিল এই :

"প্রতিদান না দিয়ে যে ভাতা পাওয়া যায়। ইংলণ্ডে পেনশনের অর্থ হল দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্য গভর্নমেন্টের ভাড়াটে কর্মীকে যে বেতন দেওয়া হয়।"

জনসন যখন আশ্বাস পেলেন যে, অতীতের সাহিত্য-সেবার জন্যই তাঁকে পেনশন দেওয়া হচ্ছে, এর মধ্যে সরকারের উদ্দেশ্যমূলক অভিসন্ধি নেই, তখনই তিনি পেনশন গ্রহণ করলেন। সে যুগের আর্থিক মান অনুসারে পেনশনের টাকায় তাঁর দিন স্বচ্ছন্দে কেটে যেতে পারত। কিন্তু তাঁর অভাব কোনোদিন ঘোচে নি। কারণ, পেনশন পাবার পর থেকে জনসনের দানের পরিমাণও আনুপাতিক হারে বেড়ে গিয়েছিল।

১৭৬৫ সালে—অভিধান বেরুবার দশ বছর পরে থ্রেইল পরিবারের সঙ্গে জনসনের বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। অবস্থাপন্ন পরিবার, স্বামী-স্ত্রী দুজনেই অতিথিবৎসল। ডঃ জনসনের মতো খ্যাতনামা ব্যক্তিকে বন্ধু হিসাবে পেয়ে তাঁরা সম্মানিত। শ্রীমতী থ্রেইলের তখন বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। জনসনের বিষাদরোগ, পাগল হয়ে যাবার আশঙ্কা এবং নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা অত্যন্ত সহানুভূতির সঙ্গে শ্রীমতী থ্রেইল দূর করতে চেষ্টা করতেন। আর ভালোবাসতেন জনসনকে নানারকম ভালো খাবার পেটভরে খাওয়াতে। ভোজন-বিলাসী জনসনের কাছে প্রচুর সুখাদ্যের আকর্ষণ ছিল প্রবল। ধীরে ধীরে জনসন পরিবারেরই একজন হয়ে উঠলেন। থ্রেইলরা তাঁকে বেড়াতে নিয়ে যেত লণ্ডনের বিভিন্ন স্থানে, ইংলণ্ডে এবং ইংলণ্ডের বাইরেও। এই বাড়ীতে তাঁর শেষজীবনের নিশ্চিন্ত আশ্রয়।

কিন্তু দীর্ঘ ষোলো বছর পরে এই আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হতে হল। মিঃ থ্রেইল পরলোকগমন করলেন ১৭৮১ সালের বসন্তকালে। কিছুকাল পর থেকেই গুঞ্জন শোনা গেল শ্রীমতী থ্রেইল ইতালিয়ান গায়ক পিয়োজ্জিকে বিয়ে করবেন। কথাটা জনসনের কানেও উঠল। তাই ডিসেম্বর মাসে তিনি শ্রীমতী থ্রেইলের কাছে আবেদন জানালেন :

আমাকে ত্যাগ কোরো না, উপেক্ষা কোরো না। আমার চেয়ে বেশী কেউ তোমাকে ভালোবাসবে না, সম্মান দেবে না---।

শ্রীমতী থ্রেইল তিয়াত্তর বছরের অক্ষম বৃদ্ধের এই আবেদনে সাড়া দিতে পারলেন না। বিদেশী গায়ক তাঁকে দেবে নতুন জীবন ; জনসন তো মৃত্যুপথযাত্রী—নবজীবনের উন্মাদনা ত্যাগ করে সেবিকা হয়ে থাকতে হবে তাঁর সঙ্গে। শ্রীমতী থ্রেইল বেছে নিলেন জীবনের পথ, পিয়োজ্জিকে গ্রহণ করলেন।

জনসন হয়ত বিয়ের কথা ভাবেন নি। তাঁর মনে হয়েছিল আগের মতো শ্রীমতী থ্রেইলের সামনে বসে গল্প করতে পারলে, তাঁর হাতের রান্না খেতে পারলে এবং রোগে ও দুঃখে একটু সহানুভূতির স্পর্শ পেলে জীবনের বাকি দিন ক'টা অব্যক্ত মাধুর্যে কেটে যাবে। বিদেশীকে বিয়ে করে নিজের সন্তানদের মঙ্গল উপেক্ষা করাতেও তিনি শ্রীমতী থ্রেইলের উপর চটেছিলেন। জীবনে তাঁকে ক্ষমা করতে পারেন নি।

মৃত্যুর সপ্তাহ তিনেক আগে জনসনকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল তিনি শ্রীমতী থ্রেইলের খবর পান কি না।

না, জনসন বেশ জোর দিয়ে বললেন। আমিও কোনো চিঠি লিখি না। মন থেকে দূর করে দিয়েছি ওর কথা। পুরনো চিঠি হাতে পড়লেই পুড়িয়ে ফেলি। আমি ওর কথা মুখে আনি না, শুনতেও চাই না ওর কথা। শ্রীমতী থ্রেইলকে মন থেকে সম্পূর্ণ দূর করে দিয়েছি।

এত দৃঢ় ঘোষণা সত্ত্বেও স্পষ্টই বোঝা যায় যে, জনসন তাঁকে ভুলতে পারেন নি।

১৭৮৪ সালের জানুয়ারী মাস থেকেই জনসনের দেহ ভেঙে পড়ে। বাত, হাঁপানী, শোথ ইত্যাদি নানা রোগে জর্জরিত হয়ে পড়েন। তাঁর আশ্রিতদের মধ্যে অন্ধ আনা উইলিয়ামস এবং রবার্ট লেভেটের মৃত্যু হয়েছে। পুরনো সঙ্গীদের মধ্যে আছে নিগ্রো ভৃত্য ফ্র্যাঙ্ক। হাঁপানীর যন্ত্রণায় সারারাত চেয়ারে বসে কাটাতে হয়। নিঃসঙ্গতার ভার তখন দুঃসহ বোধ হয়। ঐ বছর ১৩ই ডিসেম্বর তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মৃত্যু কিন্তু বেশ শান্তরূপেই এসেছিল।

জেমস বসওয়েলের নাম উল্লেখ না করলে জনসনের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। বসওয়েল তাঁর জনসনের জীবনী সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, অতীতে এরকম জীবনী লেখা হয় নি, ভবিষ্যতেও হবে না। আজ তা সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

বাড়ীতে কাচা
সার্ফে কাচা
Surf
FOR THE WHITEST WASH!

★

বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীদের অপ্রকাশিত পত্রাবলী

(অত্র প্রকাশিত পত্রগুলি সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে লিখিত। বাঙলার একাধিক সাহিত্যরথীর এই পত্রাবলীর মধ্যে তাঁদের চিন্তাধারা ও ধ্যানধারণার এক সম্যক প্রকাশ ঘটেছে। পত্রগুলি সংশ্লিষ্ট লেখকদের মনের এক-একটি উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি বহন করে। তাঁদের ভাবধারার বাহন এই পত্রগুলির মূল্য সেই বিচারে অপরিহার্য এবং চিরন্তন। পত্রগুলি শ্রীঅমিয়কুমার গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত। —স)

★

মোরাবাদি
রাঁচী
২৬।১০।৩৭

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি ঘুরে ফিরে অতঃপর আমার হাতে এসেছে। তুমি যদি কলকাতায় আমার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে থাক ত' আমার সাক্ষাৎ পাও নি। কারণ আমি ইতিমধ্যে এখানে চলে এসেছি ফিরব নভেম্বরের শেষে। সুতরাং তোমাদের সভায় উপস্থিত থাকতে পারব না। তুমি ঠিকই লিখেছ, আমি বক্তৃতা করতে ভালবাসি নে। আর সভাপতির কর্তব্য হচ্ছে বক্তৃতা করা। আমার দেহ মন দুইই বক্তৃতার বিরোধী। বক্তৃতা করা একরকম অভিনয় করা। এ অভিনয় করতে আমি অপারগ।

শ্রীরামপুর আমার সুপরিচিত এবং আমার বহু বন্ধুবান্ধব শ্রীরামপুর-বাসী। যদিচ তাঁরা এখন শ্রীরামপুরে থাকেন না, থাকেন কলকাতায়। এর কারণ আমি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ, আর বারেন্দ্রের সঙ্গে বারেন্দ্রের কুটুম্বিতা থাকেই, অন্তত কুটুম্বিতার গন্ধ।

তুমি যে লিখেছ যে, আমার লেখা তোমাদের ভাবায়, এ কথা শুনে খুসি হলুম। আমার লেখা যে লোকপ্রিয় নয় তার কারণ বোধহয় ও লোককে ভাবায়। কোন বিষয়ে কিছু ভাবা আমাদের জাতির ধর্ম নয়। হাজার বৎসরের অধীনতার ফল নিজের চিন্তার উপর অবিশ্বাস। এবং সেই সঙ্গে পুরাকালের ও দূর দেশের চিন্তার উপর অগাধ ভক্তি। আমি এই মনের ঘুম ভাঙ্গাতে একটু-আধটু চেষ্টা করেছি।

শ্রীপ্রমথনাথ চৌধুরী

৩, পাম প্লেস
বালীগঞ্জ
৭।৫।৪১

কল্যাণীয়েষু

তোমার চিঠি পেয়েছি।

১৫ই জুন শ্রীরামপুরে উপস্থিত হবার কোনও আপত্তি নেই। তবে ইতিমধ্যে যদি কোনও বাধা ঘটে ত' পরে জানাবো।

তুমি যে আমার গল্পের জনৈক গুণগ্রাহী পাঠক তা জানতে পাই "বীনাবাই" সম্বন্ধে তোমার appreciation পড়ে।

"জুড়িদৃশ্য" সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথও খুব প্রশংসা করেছেন। "চাহার দরবেশ" পাঠক সমাজে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেছে।

আমার গল্প এখন জাতে উঠেছে।

—ইতি
শ্রীপ্রমথ চৌধুরী

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড
৩রা আষাঢ়, ১৩৪২।

নমস্কারপূর্বক নিবেদন—

আপনার চিঠি ও "বাঙালীর কথা" পাইয়া বাধিত হইলাম।

ঐ কাগজটি আমি পূর্বে দেখি নাই। উহাতে আমার কোনও লেখা ছাপিবার অনুমতি আমি দিই নাই। অবশ্য "প্রবাসী" হইতে উদ্ধৃত লিখিলে অনুমতির কোন প্রয়োজন হয় না।

আপনাদের "বনফুল" কাগজটির শ্রীবৃদ্ধি হউক।

বিনীত নিবেদক
শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

ভদ্রকালী, শিমূলতলা লেন
২৮।৫।৫৩

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

সবিনয় নমস্কার নিবেদন,

আপনার পত্রখানিতে আপনি এখানে আসিবেন সংবাদে পরম আহ্লাদিত হইলাম। অবশ্যই আসিবেন, পথ চাহিয়া রহিলাম। আপনার হাতে "গীতারঞ্জন" উপহার দিব, আপনার অভিমত কাগজে প্রকাশ করিলে বড়ই সুখী হইব। আশা করি সপরিবারে কুশলে আছেন। সেদিনকার সভায় আপনাদের সম্ভাষণে ধন্য হয়েছি। ইতি

প্রীতিধন্য
শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়

নিবেদন

বনফুল সাহিত্য সমিতির কর্মিবৃন্দ এবং সহৃদয় সাহিত্যরসিকগণ, সকলে আমার নমস্কার গ্রহণ করুন। আজ আপনাদের এই সুধী-সমাগমে উপস্থিত হইতে পারিয়া আমি নিজেকে পরম ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিতেছি। জীবনের এই শেষ বেলায় আমার সতীর্থ শ্রীতারকচন্দ্র রায় এবং স্নেহভাজন অনুজ শ্রীমান কুমুদরঞ্জন মল্লিকের সুমধুর সঙ্গলাভে আমি পরম আহ্লাদিত। কৈশোরকাল হইতেই আমি বাণীর সেবা করিয়া আসিতেছে এবং কবিতা লেখার প্রচুর আনন্দ পাইয়াছি। আমার লেখা যখন আপনাদের মতন গুণিগণের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে, তখন আমার বাণীসেবা সার্থক হইয়াছে।---

জীবনের এই অন্ত-সিন্ধু পারে দাঁড়াইয়া এখন প্রতীক্ষা করিতেছি উত্তরণ।

জীবন-মৃত্যু-সঙ্গমে একা
বাই তরণী।
সাগর হইয়া গিয়াছে সুমুখে
বৈতরণী।

কতটুকু তার চোখে পড়ে হায়
ঢাকে, আসমানি নীল পর্দায়
ওই কিনারায় শেষ হয়েছে কি
এই ধরণী?
ডুবু-ডুবু করে মুকুতা-স্বচ্ছ
তারার মণি,
একি ঝড় এল, শুনি বজ্রের
জয়ধ্বনি।

ঘনাইয়া আসে দরদিয়া রাতি,
নিবে জীবনের কর্পূর বাতি,
বাজে বাগেশ্রী রাগিণীর সুরে
বিসর্জনী।

মাথার উপরে ঝরে মেঘেদের
অশ্রুজল,
চোখ থেকে মোর কে করিল চুরি
মায়া কাজল।
যার ছলনায় লেগেছিল ভালো
এই মর্ত্যের সূর্যের আলো,
করে গো ইশারী ছেড়ে গেছে যারা
মাটির কোল।

হেরি পিছু টানে রাত্রি যেথাকে
চন্দ্রাবতী,
কোন্ যাদুকরী ভেঙে দিল মোর
ছন্দোযতি।

আধ-সীন-নারী মঞ্জুমালায়
জড়ায়ে টানিছে বন্দীশালায়,
নেপথ্যে হেরি হানে কটাক্ষ
সে ভানুমতী
ঝুটা আনন্দ, সিন্দুর মাখা
মুক্তাহার,
জয়-পরাজয় প্রীতি প্রহসন—
সব আঁধার।

কোন রসায়নে মাটি-জলে-গড়া
এই দেহ হেন রঙে রসে ভরা?
জাগে দূর স্মৃতি জনমান্তর
সংস্কার।

কত যৌবনে কত শ্রী-রচনা,
পত্র-লেখা,
ছত্রগুলি সে কষ্টি পাথরে
স্বর্ণ-রেখা।

অভিসার-বাঁশী ডাকে বারে বার,
থামে যদি কভু ঝঙ্কার তার,
ধক্ষেত-সুরে কেহ কারে আর
দেবে না দেখা।

কত না অতীত চিতায় পড়িয়া
ছিন্নহারা,
পরপারে কারা মৌন ভাষায়
দেয় গো সাড়া;
রুদ্র ডঙ্কা বাজে দিক ভেরি
বধির ছবিরা উঠিল মুখরি'—
'যেথা বন্ধন সেথা ক্রন্দন—
অন্ধ-কারা'

ছুটি দাও তবে হে বসুন্ধরা,
প্রণমে মন,
পিয়েছি তোমার বিদ্যুতে মধু-
নির্ঝরণ।

মৃত্যু হাসিয়া প্রসাদ বিতরে,
কাঁপে থর থর বুকের ভিতরে,
কই গো তরণী—কোন কূলে শেষ
উত্তরণ?

আপনাদের প্রীতিধন্য
শ্রীকরুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়
৩০শে আগষ্ট, ১৯৫৩

পো: বড়িশা
কলিকাতা-৮
ইং ৬।৬।৫২

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনাকে ভুলিয়া যাইব কেন? শ্রীরামপুরে আপনার গৃহে সেই আতিথ্য—গৃহিণীরও অতিথি-সেবা বড় ভাল লাগিয়াছিল। তাছাড়া সচ্চিদানন্দ প্রায় দেখা করিতে আসে। অতএব আপনারা আমার আত্মীয় বন্ধুর মত।

আপনি "বাংলা ও বাঙালী" পড়িয়া মুগ্ধ হইয়াছেন, তার একমাত্র কারণ আপনি বাঙালী। এবং আমি আপনাকে আপনার পিতৃকুল ও পিতৃধর্মের কথা শুনাইয়াছি। কোন্ মানুষের তাহা শুনিতে ভালো না লাগে? আমিও ঐ বইখানিতে আমার পিতা, পিতৃভূমি ও পিতৃধর্মের জয়গান করিয়াছি এবং ধন্য হইয়াছি। আর দুইখানি গ্রন্থে আমি বাংলা ও বাঙালীর গৌরব কীর্তন করিয়াছি—"বাংলার নবযুগ" ও "জয়তু নেতাজী" এই তিনখানি বই আমি আমার স্বজাতির চৈতন্য সম্পাদনের জন্য লিখিয়াছি; কিন্তু এ জাতির নিদানকাল উপস্থিত—বাঁচিবার বা বাঁচাইবার কোন আশা আর নাই। সব চেয়ে দুঃখ এই যে, আর কেহ তাহা দেখিল না। দেখিয়া একফোঁটা চোখের জলও ফেলিল না। শেষ কয়টা দিন আমি বড় দুঃখ পাইয়া গেলাম, কেন যে এতদিন বাঁচিয়া রহিলাম তাহা বুঝিতে পারি না।

কিন্তু এইবার আমার সময় হইয়াছে। আমি আর বেশিদিন বাঁচিব না, দেহ একেবারে ভাঙ্গিয়াছে। বোধহয় খুব শীঘ্র হঠাৎ বিদায় লইব। আমি কি অবস্থায় যাত্রা শেষ করিতেছি তাহা কেহ জানে না। এ অবস্থাতেও লেখনী ত্যাগ করিবার উপায় নাই। দেশের কাছে আমি কিছুই চাহি নাই। আমি শ্মশানে বসিয়া শিবের আরাধনা করিয়াছি, তাহাতে কোন কামনার কথা নাই, থাকিলে সত্যকে হারাইতাম।

শ্মশানে শিয়াল কুকুর থাকে, তাহারা চিৎকার করে, করিবেই। আমি তাহাতে কিছুমাত্র বিচলিত হই না। কেবল যখন আমার গুরুকে, আমার সেই শিবকে, সত্যকে অপমান করে তখন মুখে অভিশাপ আসে, কিন্তু তাহাও ক্ষণিকের দুর্বলতা। জানি, আমার গুরুর তাহাতে কিছুই হয় না। কেবল উহাদের অকল্যাণ হয়। কিন্তু কাহারও নিকটে যেমন কিছুই চাহিবার পাইবার নাই, তেমনি অভিশাপ দিব কাহাকে? সকলেই তো মর। দেশ বাঁচিয়া থাকিলে, আমি আরও কিছুদিন হয়তো বাঁচিতাম। দুই তিনটা কাজ বাকি ছিল—শেষ করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহার বোধহয় আর প্রয়োজন নাই;—কাহার জন্যে?

"বঙ্গভারতী"র কথা লিখিয়াছেন। উহার ভিতরকার কথা কৌতুককর। আমি উহার কিছুরই সংবাদ রাখি না, কেবল ভিতরকার লেখাগুলি ঠিক করিয়া দিই। আমার এই অবস্থায় কোন পত্রিকার ভার লওয়া অনুচিত এবং অসাধ্য। তবু পাঁচজন অতি নিকট ভক্ত ও শিষ্য আমাকে জোর করিয়া উহাতে সম্মত করিয়াছে, যে ব্যক্তি উহার প্রকাশক সে আপন বুদ্ধি ও ইচ্ছামত উহার আকৃতি এবং মূল্য প্রভৃতি স্থির করিয়াছে—লোকসান সেই দিকে, কাজেই আমার কোন কথা কহিবার যো নাই। আমার সঙ্গে কোন সম্পর্কই নাই। তবু কেন যে আমি আমার আত্মমর্যাদা ক্ষুণ্ণ করিয়া এটুকু দায়িত্ব লইয়াছি, তার কারণ শুধু দুইটা কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিব এ কয় বৎসর আমার মুখ একেবারে উহারা বন্ধ করিয়া দিয়াছে, তাহা বোধহয় আপনারা লক্ষ্য করিয়াছেন। দেশের কোন সুপ্রচারিত পত্রিকায় আমার একটি লেখাও প্রকাশিত হয় না, আমাকে উহারা বয়কট করিয়াছে। উহার মূলে আছে সজনীকান্ত দাস। সেই কলিকাতার সমস্ত পত্রিকা ও প্রেসকে শাসন-দমন করিতেছে এবং গভীর ভাবে চুক্তির থাকিয়া আমাকে সর্বপ্রকারে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে। অথচ কেহই তাহা সন্দেহও করে না। এমনই কূটকৌশল তাহার। আমার মৃত্যু না হইলে সে স্বস্তি পাইবে না। 'বঙ্গভারতী' টিঁকিবে না। উহার বিজনেস পলিসী একদম আত্মঘাতী। কিন্তু আমার কথা ও শুনিবে না। আমিও সম্ভবত উহা শীঘ্র ত্যাগ করিব, তার প্রধান কারণ আর আমি পারিতেছি না। একে আমার মৃত্যুকাল উপস্থিত, তার উপর এত প্রতিকূল অবস্থার সহিত লড়িতে হইলে আমি এক মুহূর্তও বাঁচিব না। এখনই 'বঙ্গভারতী'র বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আসিতে সুরু হইয়াছে।

আশা করি আপনি সপরিবারে কুশলেই আছেন। আমার প্রীতি-সম্ভাষণ ও শুভ কামনা জানিবেন।

ইতি—আপনাদের

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

বড়িষা পোঃ
কলিকাতা-৮
ইং ২০।৬।৫২

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার পত্র পাইলাম। আমার প্রতি আপনার এই স্নেহ ও শ্রদ্ধা আপনারই অন্তরের শুচিতা ও আদর্শ-নিষ্ঠার পরিচায়ক, নইলে আমার ব্যক্তিগতভাবে প্রাপ্য কিছুই নাই। সাহিত্য-সেবা আমার অধ্যাত্মসাধনার সত্তায়, বিলাস নয়, খ্যাতি প্রতিপত্তি বা অর্থ লাভের উপায় উহা নহে। এইটুকু বিশ্বাস যদি রাখিতে পারেন, তাহা হইলেই ধন্য হইব। তারপর, আমি কি করিতে পারিলাম—শেষ পর্যন্ত এই সব গ্রন্থের কোন মূল্য থাকিবে কি না সে চিন্তা করি না, কারণ আমি দৃঢ় বিশ্বাস করি—উহা আমার গুরুনির্দিষ্ট কাজ—আমার কাজ নয়; অতএব উহার জন্য তিনিই দায়ী। এবং ইহাই ভাবি, সারাজীবন এই যে আমাকে তিনি ঐ যজ্ঞের যূপকাষ্ঠে বাঁধিয়া রাখিলেন, তাহাতে আমার কি লাভ হইল—আমার আমার কোন শান্তি, কোন সুস্থতা আমি লাভ করিলাম। আমার তিনি কি করিলেন।

'রবীন্দ্র-কাব্যে'র আপনি যে পরিচয় ঐ পত্রিকায় মুদ্রিত করাইয়াছেন—তাহাতে প্রকাশকের উপকার হইবে; কারণ বিজ্ঞপ্তিটি ভাল হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ—একটা এমন বস্তু যে, উহার সমালোচনা খুবই দুরূহ। উহাতে রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা ও তাহার কাব্য-দৃষ্টি দুইয়েরই সম্পূর্ণ নূতন ব্যাখ্যা ও পরিচয় করা হইতেছে—যাহা এ পর্যন্ত কেহ করে নাই—করিতে পারে না বরং এমনই সংস্কারবিরুদ্ধ যে, কিছুতে উহা কেহ গ্রহণ করিবে না। আমি উহাতে যাহা করিয়া গেলাম তাহা সমগ্র বাংলা সাহিত্য-সমালোচনার যুগান্তর আনিবে; কিন্তু এখনই নয়, এই মোহের অবস্থা কাটিয়া গেলে। আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ আলাপ-আলোচনায় আশা অরি কথাটা একটু বুঝাইয়া বলিতে পারিব। আপনি আমার এখানে আসিবেন বলিয়াছেন—কলিকাতায় তো প্রায়ই আসেন, মাঝে মাঝে আর একটু কষ্ট করিয়া আমার এখানে আসিলে সুখী হইব। সোমবার ও শনিবার বাদ দিয়া, যে কোনদিন বেলা ৩টা হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাকে পাইবেন।

ইতিমধ্যে 'বঙ্গভারতী' লইয়া এই শারীরিক ও মানসিক দারুণ পীড়িত অবস্থায়—কি যে বিপদে পড়িয়াছি এবং কি অনিশ্চয়তার মধ্যে আছি, তাহা আপনারা কল্পনা করিতেও পারিবেন না। আমার মনে হয় উহাই সাক্ষাৎ মৃত্যুশেল হইয়া উঠিবে। আমার Blood pres sure ভয়ানক বাড়িয়া গিয়াছে এখনও বুঝিতে পারিতেছি না—উহা গুরুর নির্দেশ, না শনির নিগ্রহ। ঐ পত্রিকা লইয়া ভিতরে তো দুর্গতির একশেষ, তার উপরে আমার পিছনে যে কুকুর ও শেয়াল দল বাঁধিয়াছে, তাহারা নাকি আবার তাহাদের সেই বিষ্ঠাভাণ্ড হইতে বিষ্ঠা ছড়াইতে থাকিবে। আমাকে এবার তাহারা চরম শাস্তি

জানিবে। ব্যক্তিগতভাবে আমার তাহাতে কোনরূপ রাগ বা দুঃখ নাই তাহা আপনি জানেন। কিন্তু এতবড় একটা পাপ শহরের চৌমাথায় দাঁড়াইয়া এমন আস্ফালন করিতে পারে---দেশের যত সাহিত্যিক ও কবি তাহাদের পৃষ্ঠপোষক---এই কথা ভাবিয়া আমার Blood pressure বাড়িয়া যায়। আমার অপরাধ---আমি 'বঙ্গভারতী'তে উহাদের শয়তানী ধরাইয়া দিয়াছি। বড় ওস্তাদ যিনি তিনি আড়ালে আছেন ---ছোটটি চারিদিকে হুঙ্কার করিতেছে। সে মনে করে, বাংলা সাহিত্যে তার চেয়ে বড় কেহ আর নাই। আমার শরীর বড় দুর্বল, যে রোগ-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি, তাহাতে এই যাহা এখন করিতেছি, তাহাই আশ্চর্য। কিন্তু এই শরীরেও এতবড় পাপকে তো প্রশ্রয় দিতে পারিব না। তাই ভয় হয়, উহাতেই আমাকে শেষ করিবে।

আপনি আমার প্রীতি সম্ভাষণ ও শুভকামনা জানিবেন। ইতি---

আপনাদের

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

১৮৩, ল্যান্সডাউন রোড

কলিকাতা-২৬

১৮-১১-৪৯

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার দু'খানা চিঠিই পেয়েছি। 'বনফুল সাহিত্য সমিতি'র পক্ষ থেকে আপনি যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেজন্যে খুব গৌরব বোধ করছি, আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

কিন্তু আজকাল আমার শরীর অসুস্থ বড্ড; যেতে পারছি না---ক্ষমা করুন। এর পরে জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী মাসে যেতে পারব আশা করছি। আপনাকে যথাসময়ে জানাব।

আপনাদের 'বনফুল' বইটি আমার খুব ভালো লেগেছে; এ সম্বন্ধে পরে বিশদভাবে আপনাকে জানাব। সম্প্রতি হাতে কোন কবিতা নেই, যদি লিখে উঠতে পারি---পাঠিয়ে দেব সম্ভব হ'লে আপনার অফিসে গিয়ে দেখা করব একদিন।

আপনার প্রথম চিঠি পেয়েই উত্তর দেব ভেবেছিলাম;---দেরী হয়ে গেল; কিছু মনে করবেন না। আশা করি ভালো আছেন। প্রীতি নমস্কার। ইতি

জীবনানন্দ দাশ

১৮৩, ল্যান্সডাউন রোড

কলিকাতা-২৬

১৭।১০।৫০

প্রিয়বরেষু,

শারদীয় 'বনফুল' ও 'নির্ণয়' পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। অনেক ধন্যবাদ।

দুটো পত্রিকাই বেশ ভালো হয়েছে। 'বনফুলে'র সঙ্গে গত বছরই পরিচয় ছিল; কি রকম হবে আন্দাজ করেছিলাম কিন্তু 'নির্ণয়' পেয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ হলাম; আপনার সম্পাদনায় মাসে মাসে এ পত্রিকা বেরুবে জেনে খুব প্রীত বোধ করছি।

আপনাকে ইতিপূর্বে একটা চিঠি লিখেছিলাম এখনও উত্তর পাই নি। অধ্যাপক বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পটা আগামী মাসের 'নির্ণয়ে' যাবে লিখেছিলেন;---আমিও ওঁকে সেই কথাই জানিয়ে দিয়েছি। শারদীয় 'দেশে'র জন্য লেখা কবিতাটির কি হল বুঝতে পারলাম না। আপনার চিঠি পেলে খুশী হব। কবে আসতে পারবেন। আশা করি ভালো আছেন? প্রীতি নমস্কার। ইতি---

জীবনানন্দ দাশ

[illegible] রোড সাউথ, কলিকাতা-৩৭

২০শে সেপ্টেম্বর, '৫১

ভাই অমিয়,

আমার এখনও একটা কম, ধর্ম ও ভাবনেতে সঙ্কটকাল এসেছে, যাতে নিজের চেষ্টায় কোনদিকে কিছু করতে না পেরে দিবা রাত্র কেবল এই কথাই ভাবছি যে, আমার নির্ধারিত দিন ফুরিয়েই এসেছে হয়তো এটা তারই লক্ষণ, তাই আমার স্রষ্টা যেন আমার প্রতি বিমুখ হয়েছেন।

শরীর যেভাবেব খারাপ, ঐ ভাবেই খারাপ শরীর নিয়ে অনেক কাজই তো করেছি, আগেও যেমন এখনও তেমনি করছি। এখন কেবল কোথাও যাওয়া-আসাটা বন্ধ করেছি; কেউ আহ্বান করলে কখনও প্রত্যাখ্যান করি না, তাঁরই নির্দেশ বলে মেনে চলি। যখন গ্রহ-নক্ষত্র জীবনে আমার নিম্নগামী তখন (তোমার ভাষাতেই বলি) কোন কাজই তো সিদ্ধ হবার নয়; কাজেই বর্তমান কালে ঐ পুরোন ছবিগুলো বোসে বোসে ফিনিস্ করাই ভালো কাজ। তাই করি, আর কখনও কখনও একটু পড়াশুনা করি। ব্যাস্ এইভাবেই উৎসাহহীনতা উপভোগ করছি। একদিন যদি আসো তাহলে খুব ভালই হয়; কিন্তু কর্ম-সমুদ্রে যে ঝাঁপাই ছেড়েচ তার সেই কর্ম ছাড়া আর সময় কোথা? কাজেই তোমার মনোমত কাজের সম্ভাবনা না থাকলে তুমি কোথাও বৃথা যাবে না এটাও হিসাব করে রেখেছি কিন্তু তবুও এমন কথা তোমায় দিতে পারচি নে যে এখানে এলে তোমার সময় নষ্ট হবে না। মাঝে মাঝে কথা কইতে ইচ্ছা হয়---এইটুকুই আমার কথা। অবশ্য, আমার রাজা কখন কিভাবে এসে কোন প্রেরণা দেবেন, কি করে ফেলবো তার তো ইতি নেই। অতএব হে বন্ধু। সময় থাকতে সুযোগের যথাশক্তি সদ্ব্যবহার করে নাও। আর বেশী কিছু বলবার নেই। ইতি---

প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়

পুঃ---দাদা, না হয় প্রমোদবাবু, এ ছাড়া আর কোন সম্ভাষণ চলবে না, আগেই সেকথা বলেচি। আমার মাথা খারাপের প্রমাণ এই যে দু পয়সার পোষ্ট কার্ডে কাল তোমায় একখানি পত্র দিয়েছি। আজ সেটা ফিরে এলো insufficient postage-এর জন্য কাজেই আবার পর্যাপ্ত দণ্ড দিয়ে বাঁচি।

বঙ্গভারতী: কার্তিক '৭৬

মাসিক

বসুমতী

কার্তিক / '৭২

আলোকচিত্র
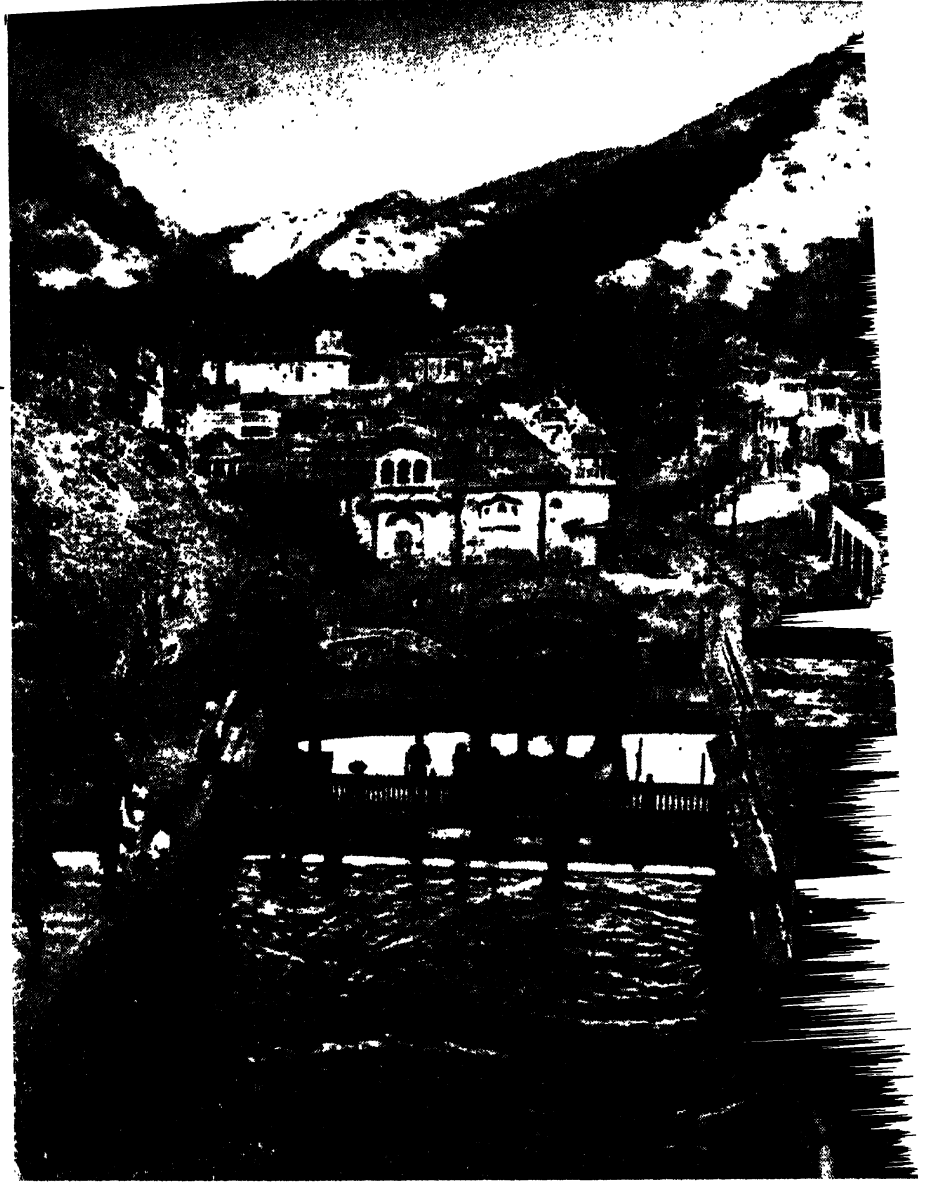
জয়পুর গলতা

—প্রবোধ দে

থাই মঠ (বুদ্ধগয়া)
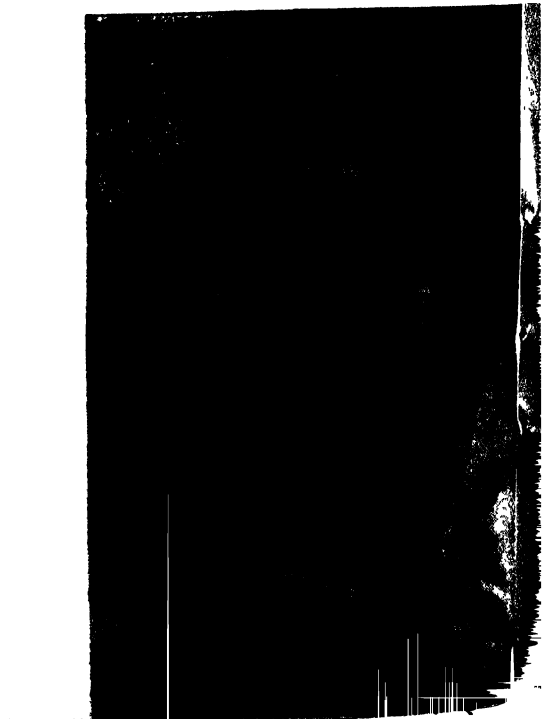
—সন্তোষ চক্রবর্তী

—সমীর রায়

—অসিত মিত্র

—সন্তোষশ্রী

—সুকুমার দাস

আজ

ও

আগামীকাল

মাসিক বসুমতী

কার্তিক / '৭২

—বিনয়কুমার মুখোপাধ্যায়

—মিহিরশেখর মুখোপাধ্যায়

—শশাঙ্ক শাণ্ডিল্য

স্নানপর্ব
—গদাধর বিশ্বাস
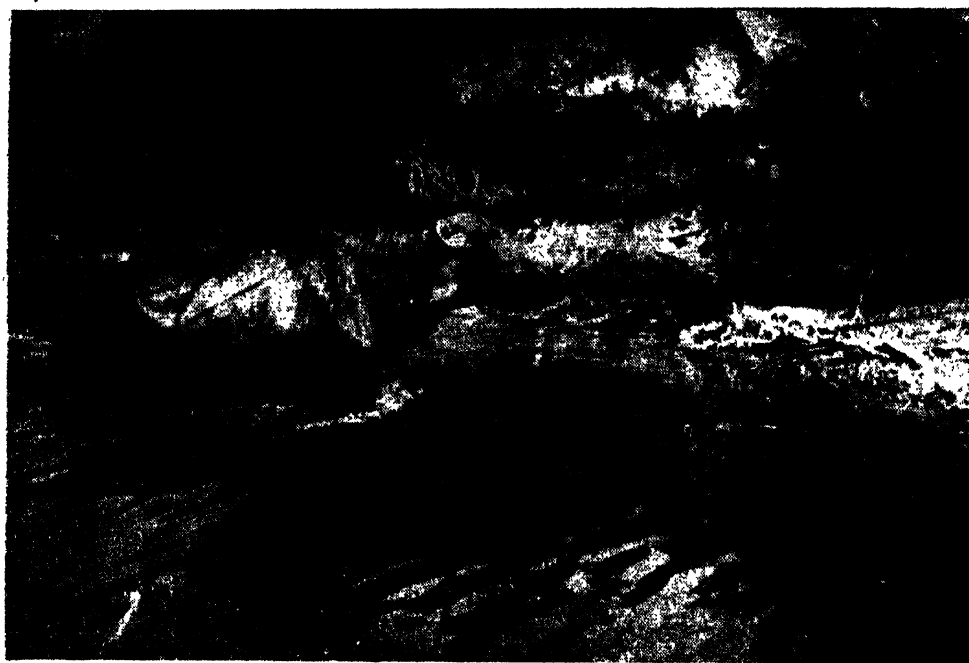
খেয়াঘাট
—দুলাল বিশ্বাস
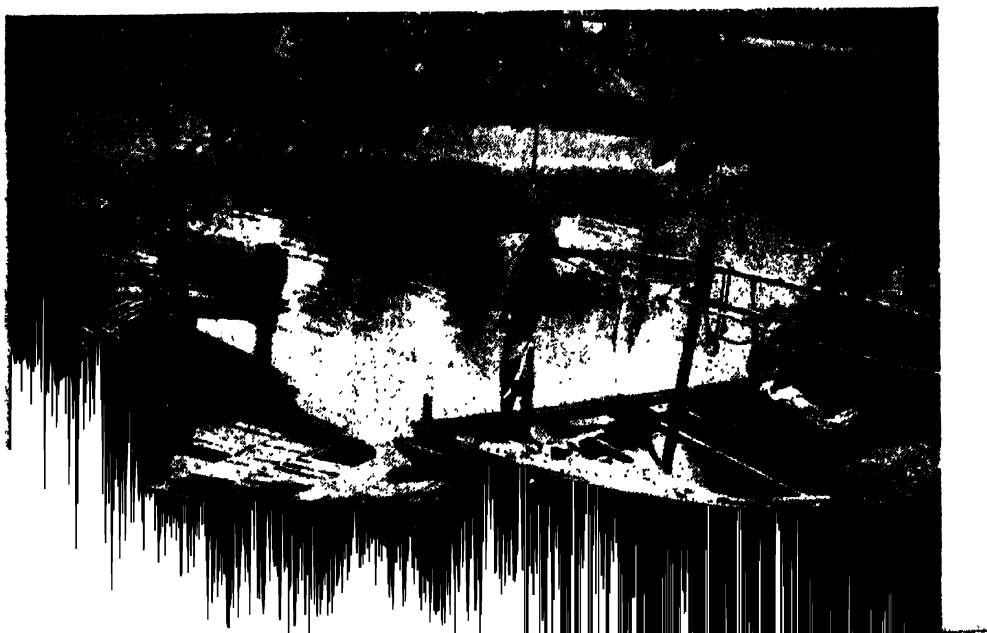
দি ইউনিভার্সিটি
লাক্ষ্ণৌ

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেলাম। পাঠকের প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া লেখকের পক্ষে স্বাভাবিক--তার ওপর যে পাঠকের ভাল লেগেছে ও যে লেখকের রচনা দুর্বোধ্য বলে পরিত্যক্ত হয়।

এ দেশে পত্রিকা চালান খুবই কঠিন। দু একটি পত্রিকা ও একটি সমিতির ভার গ্রহণ করায় দুঃসাহসিকতা প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু এই প্রকার দুঃসাহস ভাল লাগে আমার। তার মধ্যে একটা ক্ষতিপূরণের মোহ আছে।

শিক্ষক সম্প্রদায়ের কর্মদক্ষতা নিতান্তই অপরিণত। অনেক মাসিক পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছি; কিন্তু কোনটি কখনও চালাই নি। সমিতির বেলাতেও তাই। আপনার আত্ম-বিশ্বাস যেন আত্মপ্রসাদের নামান্তর না হয়।

নতুন কবিতা সম্বন্ধে কিছু লিখি নি তার কারণ ছিল অনেক। আবার পড়লাম। অবশ্য অন্য কবির ছায়া পড়েছে। তাতে আপত্তি করি না। অনুকরণটা সৃষ্টির অন্তরায় নয়। ভাল জিনিসের বিস্তার হবেই। বিস্তারের আকারকে যদি তরঙ্গ মনে করেন তবে একটি লহর অন্য একটি কেন্দ্র থেকে প্রসারিত লহরের সঙ্গে ধাক্কা খাবেই খাবে এই সুসম্বদ্ধ জগতে। দুই লহরের আঘাতে জল উঠবে ফুলে। তখন তার চূড়াই হবে নতুন সৃষ্টির কেন্দ্র।

আমার বক্তব্য তা নয়। বক্তব্য লিখলাম, আপত্তি লিখলাম না। গদ্য কবিতা উপভোগ করি, কিন্তু ভাল গদ্য কবিতার মধ্যে discriminate করবার কোনো Critical Principle খুঁজে পাই নি। রবীন্দ্রনাথের নতুন বই 'ছন্দ'তে একবার ঝোঁক দিয়েছেন content-এ আবার কোথাও—form-এ। গদ্য কবিতার লক্ষ লক্ষ রূপ যখন হতে পারে, এবং আমার মতে form অনেক সময়েই যখন পাঠকের আরোপ ও দান তখন form-এর মধ্যে কোন স্থায়ী principle পাই না, কেবল এইটুকু ছাড়া যে তার গড়ন হবে আঁট-সাঁট, পুরুষালী, tomboyish পর্যন্ত বলতে পারেন। অবশ্য পুরুষালী ন্যাকামী ছাড়া। আমার মনে হয় গদ্য কবিতার বিষয়ই প্রধানত ভিন্ন। আরো প্রভেদ আছে নিশ্চয়।

আপনাদের কবিতাগুলি পড়ে মনে হোলো, যে আপনারা এখনও Poetically minded। এ অবস্থা লোভনীয় কি? এতে শেষে কবিতাও হবে না, গদ্যও হ'য়ে যাবে পানসে। এখন অবশ্য সুখপাঠ্য।

অত্যন্ত সঙ্কোচের সঙ্গে লিখলাম। আপনি রিপণের ছাত্র। আমিও ছিলাম। আমাদের সময় অন্যরকম ছিল। এখন কেমন জানি না। তবে বুদ্ধদেব, বিষ্ণু রয়েছেন—রবীন্দ্রনারায়ণ ঘোষ এখনও অধ্যক্ষ। তাঁদের মতামত গ্রহণ করুন না? অত্যন্ত মূল্যবান বলতে পারি।

লেখা? কি লিখব? কিছুই মাথায় আসছে না। এখানে বন্যা হয়েছে। সহরের বন্যা দেখে খুশী হলাম। এ-সহরের একমাত্র গোমতীতেই বহতা এল তাও ১৩ বৎসর পরে। গোমতীর ওপর কৃতজ্ঞতা আসছে।

ধূর্জটিপ্রসাদ

ইউনিভার্সিটি কোয়ার্টার্স
লাক্ষ্ণৌ

সম্পাদক মহাশয়,

আপনাদের 'বনফুল সমিতির' কাছে একটা প্রস্তাব আছে। যে কালে আপনাদের সমিতির আমি সভ্য নই, তখন অবশ্য প্রস্তাব উপস্থিত করবার অধিকারী নই। কিন্তু আপনারা সাহিত্য-রসিক, অতএব সাহিত্য সংক্রান্ত কোন নির্দেশই আপনাদের কাছে ঐ সামান্য কারণে তুচ্ছ নয়। তাই নির্বিঘ্নে নিবেদনটি জানাচ্ছি।

প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের বাংলা সাহিত্যে দান অনেক। তাঁর স্থান সম্বন্ধে মোটামুটি সকলেই একমত। ভাষার মোড় ফিরিয়েছেন, এবং তাকে একত্রে রসাল বলিষ্ঠ করেছেন। অথচ বাঙালী পাঠক-পাঠিকা তাঁকে যথার্থ সম্মান দেখায় নি। এতে তাঁর লাভ ক্ষতি না হোক আমাদের মূল্যজ্ঞান প্রমাণিত হয় না।

তাই আমার অনুরোধ যে আপনারা একটা সভা করে তাঁকে সম্মান দেখান। কোলকাতায় সমিতি বসেছে তাঁরা বিরাটভাবে আয়োজন করেন; কিন্তু অপেক্ষাকৃত ছোট সহরে কেন সভা ডাকা হবে না। আমার অভিজ্ঞতায় এই বলে যে ছোট সহরই, বিশেষত শ্রীরামপুর, কৃষ্ণনগর, রঙ্গপুর, রাজশাহীর মতন স্থানেই সাহিত্য-রস ঘন হয়।

আপনাদের সমিতি যদি এই কাজটি গ্রহণ করে, তবে আমার বিশ্বাস যে সুচারুরূপেই তার সমাধান হবে। যে-মাসের ১২ তারিখ পর্যন্ত আমি এখানে থাকব, তারপর কোলকাতায়, অতএব এইখানেই উত্তর দেবেন। আপনাদের সমিতির মঙ্গল কামনা করছি। ইতি—

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীদুর্গায় নমঃ

বহরমপুর (বাংলা)
১৩।২।৫১

সবিনয় নিবেদন,

কল্য আপনার পত্র পাইয়াছি। ভগ্নী নিরুপমার তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে লইয়া এই সব তর্ক-বিতর্কের মধ্যে জড়াইয়া পড়িতে আমি এখন অক্ষম, অতএব এ বিষয়ে বিশেষ কোন তথ্য আমি এখন দিতে পারিব কি না বলিতে পারি না।

আপনার পত্রের প্রথম প্রশ্ন এই যে, শরৎচন্দ্র আমার ভগ্নীর কোন লেখা কখনো দেখিয়া গিয়াছেন কি না? শরৎ দাদার সঙ্গে আমার ১৭।১৮ বছর বয়সের সময় প্রথম আলাপ, তখন আমরা ভাগলপুরে থাকিতাম এবং শরৎদাও এক পাড়াতে থাকিতেন। আমাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ আলাপ তখনই হয়। সেই সময় আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলিয়া একখানা হাতের

লেখা কাগজে বাহির কর। শরৎ দাদার মাতুল গাঙ্গুলী গোষ্ঠীর সঙ্গে ঐ সময় আলাপ হয়। ঐ সময় শরৎদাদার হাতে লেখা অনেক গল্প আমরা পড়ি। আমরা যে কাগজ হাতে লিখিয়া নিজেদের মধ্যে প্রচার করি তাহাতে ভগ্নী নিরুপমাও লেখা দিতেন। শরৎচন্দ্র সেই সময় আমাদের এই সাহিত্য সাধনার প্রথম উষালোকের পথ-প্রদর্শক ছিলেন। কিন্তু আমাদের কাহাকেও তিনি হাতে ধরিয়া লিখিতে শেখান নাই। নিরুপমা আমাদের বহু পূর্বে আগত বাল্যকাল হইতেই কবিতা এবং গল্পাদি লিখিতেন। তবে আমাদের পত্রিকায় যখন যে লেখা বাহির হইত তাহা শরৎচন্দ্র দেখিতেন এবং আমাদের বন্ধুসভায় সমালোচনা করিতেন। তাই বলিয়া এ কথা কেহই বলিতে পারে না যে তিনি কাহাকেও নিজের ভঙ্গিমায় লিখিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তারপর অনেক দিন পরে নিরুপমার লেখা যখন কাগজে বাহির হয় তখনো শরৎচন্দ্র সাহিত্যাকাশে অনুদিত। নিরুপমার যে পরিবারে জন্ম হইয়াছিল এবং লালিত-পালিত হইয়াছিলেন সে পরিবারে সে সময় অপর পুরুষের সঙ্গে অন্তঃপুরিকাগণের আলাপ আলোচনা সম্ভব ছিল না—তবে নিরুপমার লেখা খাতা এবং কবিতা আমার এবং আমার দাদাদের বন্ধু মহলের সকলেই যেমন দেখিতে পাইতেন শরৎচন্দ্রও তেমনি দেখিতেন।

নিরুপমার কোনো লিখিত গল্প তিনি যে বিশেষভাবে দেখিয়া সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন তাহা আমার মনে হয় না। তবে আমার একখানা অপ্রকাশিত উপন্যাস তিনি কিছু দিন রেঙ্গুনে নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন। কিন্তু কোনরূপ সংশোধন না করিয়াই আমায় ফিরত পাঠান।

শরৎচন্দ্রের লেখার সহিত নিরুপমার লেখার 'বিষয়' ও 'ভঙ্গী' উভয়ের পৃথক। অতএব শরৎবাবুর নিকট নিরুপমার সাহিত্যিক ঋণ খুবই কম। তবে, তাঁহার সহিত আমাদের পরিচয় খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল। শরৎদাও শেষের দিকে দু-একবার আমার এই বহরমপুরের বাড়ীতে আসিয়াছিলেন এবং সেই সময় শরৎদার সহিত মুখোমুখি নিরুপমার কথাবার্তা হইয়াছিল কিনা সন্দেহ। নিরুপমা যখন সভা সমিতিতে যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তখন তাঁর বয়ঃক্রম প্রায় ৪০-এর কাছাকাছি হইয়াছিল। তবে শরৎবাবুর লেখার উপর আমাদের সকলেরই যেমন শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল নিরুপমার ততটা না হউক বেশ কিছুটা ছিল। কিন্তু তথাপি শরৎবাবুর চরিত্র সৃষ্টির বিষয়ে নিরুপমা সময় সময় অত্যন্ত বিরূপ মতও প্রকাশ করিতেন।

শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সহিত আমাদের অতি বাল্যকাল হইতেই পরিচয়। তাঁহার পিতৃবংশের সহিতও আমাদের প্রায় আবাল্য পরিচয়। অনুরূপার সহিত নিরুপমার 'গঙ্গাজল' পাতানো ছিল। কিন্তু তিনি বা তাঁহার দিদিই যে নিরুপমাকে উপন্যাসাদি লিখিতে প্রেরণা দিয়েছিলেন একথা ঠিক নয়। নিরুপমা ১৪ বৎসর বয়সে বিধবা হন। কিন্তু তৎপূর্বেই তিনি কবিতা লিখিতেন, অবশ্য সে সব শৈশব কবিতা যেমন হয় তেমনি হইত। তখনো আমাদের বাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের কবিতার তেমন আদর হয় নাই। এই বিষয়ে বলিতে পারি শরৎচন্দ্রই আমাদের রুচির পরিবর্তন করিয়াছিলেন, তাঁহারই সাহচর্যে আমাদের সবকটি বন্ধুরই রবীন্দ্র সাহিত্যে প্রবেশ লাভ হইয়াছিল। রবি-জ্যোতিতে যেমন সে সময়কার বাংলার সকল নবীন সাহিত্যিক জাগিয়া উঠিয়াছিলেন আমাদের তরুণ মনও তেমনি জাগিয়াছিল। যদি কেহ আমাদের এবং সেই সঙ্গে নিরুপমার মনকে জাগাইয়া থাকে এবং অনুপ্রেরণা দিয়া থাকে ত সেই কবি "জগৎ কবি সভায় মোরা" যাঁহাকে লইয়া গর্ব করি।

তবুও একথা বলিব যে, শরৎচন্দ্রের চারিদিকে তাঁহার উপগ্রহরূপে যদি আমাদের নাম হয় তাহাতে আমরা গর্ব অনুভব না করিয়া পারি না। কিন্তু নিরুপমা নিজের জীবনের দ্বারা সাহিত্য সাধনার দ্বারা এবং বিশেষভাবে সনাতন হিন্দুধর্মানুরাগিণী নারীর ভক্তিধর্ম সাধনার দ্বারা প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন যে, তিনি ঠিক কোনো কল্প-জ্যোতিষ্কের উপগ্রহমাত্র নহেন। তাঁহার লিখিত পুস্তকাদি পড়িলেই শরৎচন্দ্রের সহিত সর্ব বিষয়ে পার্থক্য অনুভব করা যায়। এ বিষয়ে আর বেশী কি লিখিব।

আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর এইবার সংক্ষেপে দিতেছি। নিরুপমা তাঁহার স্বর্গতা মাতার সেবার জন্য শেষ বয়সে বৃন্দাবনবাসিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু ১৯৪৭ সালের পূর্বে একবার তিনি বৃন্দাবনে অত্যন্ত অসুস্থ হন। তখন তাঁহাকে এখানে আনিয়া চিকিৎসা করিয়া বাঁচান গিয়াছিল। তারপর ১৯৪৯ সালে আবার মাতৃসেবার জন্য বৃন্দাবন যান। তারপর আমার মাতৃদেবী গত চৈত্র মাসে ধামপ্রাপ্ত হন। ইহার পর নিরুপমা এখানে ফিরিব ফিরিব করিতেছিলেন। গত আশ্বিন মাস হইতে তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়েন। এমন কি চিঠিপত্রও দিতে পারেন নাই. আমরা আমাদের একজন আত্মীয়ার নিকট হইতে পত্র পাইয়া জানিতে পারি যে তিনি অসুস্থা। তখন এখান হইতে আমার বিধবা ভ্রাতৃবধূকে এবং লক্ষ্ণৌ হইতে আমার মধ্যম পুত্রকে পাঠাইয়া তাঁহার সেবার বন্দোবস্ত করি। কিন্তু তাঁহার হস্তাক্ষর ব্যতীত এখানকার পোষ্ট অফিস ও ব্যাঙ্ক হইতে টাকা তুলিতে না পারায় আমরা বড়ই অসুবিধায় পড়িয়াছিলাম। সেই সংবাদ কোনো অত্যুৎসাহী সাংবাদিক পাইয়া নিরুপমার মৃত্যুর পর ঐ বিকৃত সংবাদ কাগজে ছাপাইয়াছিলেন। কথাটা সম্পূর্ণ আজগুবি। আমি তাঁহার চিকিৎসাদির জন্য এবং মৃত্যুর পর ঊর্ধ্বদৈহিক কার্যের জন্য সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করি। ঐ মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদও যথেষ্ট হইয়াছে।

ইতি—শ্রীবিভূতিভূষণ ভট্ট

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)
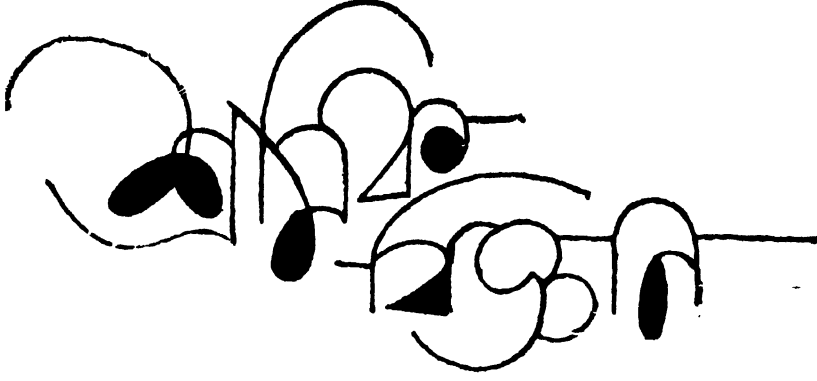
রাস্তা মেরামতে বহু শ্রমিক একত্রে বহু প্রকার কাজ করে। ঐ সকল কাজের সবই হাল্কা কাজ নয়। উহার কোনটি বা ভারী কাজ হয়ে থাকে। এখানে কর্মীদের দৈহিক শক্তি ও সামর্থ্য অনুযায়ী এই সকল কার্য তাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া উচিত। শক্তিমান লোক শক্ত কাজ সহজে করতে পারে। মেসিন বেকিং, টায়ার ভলকানাইজিং, কেবুল লেইং, বেল-লেইং, গ্যাস ফিটিং প্রভৃতি কাজেও ইহা সমভাবে প্রযোজ্য। এ'সব কাজে যে ব্যক্তি বহুক্ষণ হাল্কা কাজ করেছে তাকে ভারী কাজে এবং যে ব্যক্তি ঐ সময়ে ভারী কাজ করছে তাকে হাল্কা কাজে নিয়োগ করে তাদের কাজের মধ্যে সমতা রক্ষা করা যায়। এইরূপ ব্যবস্থাতে একটি ব্যক্তির উপর অযথা অধিক কাজের চাপ পড়ে না। এইরূপে কর্মের চাপ সকলের উপর সমানভাবে পড়াতে এদের একজন অপরজন অপেক্ষা অধিক কর্মক্লান্তিতে আক্রান্ত হয় নি। এই ব্যবস্থাতে সামগ্রিকভাবে দ্রুতগতিতে ঐ সকল কাজ সমাধা করা গিয়েছে।

শ্রমিক সম্পর্ক

শ্রমিক সম্পর্ককে ইংরাজিতে ইনডাস্ট্রিয়াল রিলেশন বলা হয়। শ্রমিক-অসন্তোষ মালিক বা শ্রমিক কাহারও পক্ষে কাম্য নয়। বণিকের উন্নতি ক্রেতাদের সন্তোষের উপর নির্ভর করে। পুলিশের কৃতিত্ব জনসাধারণের (পাবলিকের) সন্তুষ্টির উপর। শ্রমিকদের সন্তোষের উপর মালিকের বাড়-বৃদ্ধি হয়ে থাকে। আপন স্বার্থ সম্বন্ধে সহজ (নর্ম্যাল) মানুষমাত্রেই সচেতন। কিন্তু তা সত্ত্বেও উদ্যোগ-শিল্পের শান্তি প্রায়ই ব্যাহত হয়েছে। বহু ক্ষেত্রে অকারণে কিংবা সামান্য কারণে ইহা ঘটে থাকে। অথচ মালিকের ও শ্রমিকের উভয়ের স্বার্থের ইহা পরিপন্থী। মালিক ও শ্রমিক আপন দোষ-গুণ সম্পর্কে সচেতন থাকলে অযথা অশান্তি এড়ানো যায়। শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক (ইনডাস্ট্রিয়াল রিলেশন) উন্নত করতে হলে শ্রমিকদের সাধারণ (ব্যক্তিগত) এবং উহাদের দলীয় এই উভয় প্রকার মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত থাকা দরকার।

সুষ্ঠু শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক কেবলমাত্র অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হয় না। অর্থনৈতিক কারণ ব্যতীত আরও বহু কারণ ইহার জন্য দায়ী। সাধারণ মানুষের ধারণা যে কেবলমাত্র শ্রমিকদের ও মালিকদের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উপর সুষ্ঠু শ্রমিক সন্তোষ নির্ভর করে। কিন্তু সাধারণ মানুষের ইহা সম্পূর্ণরূপ এক ভুল ধারণা। এইখানে শুধু মালিকে-শ্রমিকে বন্ধুত্ব থাকলে চলবে না। এইখানে শ্রমিকে-শ্রমিকে বন্ধুত্বেরও প্রয়োজন আছে। এই উভয় প্রকার শান্তি শিল্প-ক্ষেত্রে রক্ষিত না হলে উৎকৃষ্ট দ্রব্যের উৎপাদনে

ডাঃ পঞ্চানন ঘোষাল

হ্রাস হতে বাধ্য। বর্তমান পরিচ্ছেদে শ্রমিক-দের অর্থনৈতিক অসন্তোষ সম্বন্ধে আলোচনা করবো না। এই পরিচ্ছেদে উহাদের মনস্তাত্ত্বিক অসন্তোষের কারণ মাত্র আলোচিত হবে।

সাধারণ মানষের ন্যায় শ্রমিকরাও বহুবিধ ভাবাবেগ দ্বারা পরিচালিত হয়। এই সকল ভাবাবেগ প্রতিটি ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক স্বার্থের সাথে জড়িত নয়। উহার সাথে তাদের বহুবিধ জৈব প্রয়োজনের তাগিদ থাকে। শ্রমিকরাও সাধারণ মানুষের মত প্রেম-প্রীতি-ঘৃণা-গর্ব-ঔৎসুক্য প্রভৃতি মনোবৃত্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সকল বৃত্তি নানা কারণে প্রদমিত হয়ে উহাদের মধ্যে বহু মনোজটের (কম্‌প্লেক্স) সৃষ্টি করে। ইহাদের যথাক্রমে (১) মালিকানা-বোধ (self-assertion) (২) পলায়নী বৃত্তি, (৩) আক্রমণী-স্পৃহা, (৪) সুনাম-প্রিয়তা (৫) ক্ষমতা-প্রিয়তা প্রভৃতি বলা যায়। এই সকল বৃত্তির অপপ্রয়োগ উদ্যোগ-শিল্পের যথেষ্ট ক্ষতি করে। কিন্তু উহাদের প্রয়োগ সুসংহত হলে উহা মালিকের ও শ্রমিকের যথেষ্ট উপকারে আসে। এই বিষয়ে একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। এজন্য আমি এগুলির বিস্তারিত আলোচনা করবো।

প্রথমে মালিকে-শ্রমিকে অযথা মনোমালিন্যের মনস্তাত্ত্বিক কারণসমূহ সম্বন্ধে আলোচনা করবো। এর পরে শ্রমিকে-শ্রমিকে বিরোধের মূল কারণ সম্বন্ধে বিবৃত করা হবে। এই সকল কারণ সম্বন্ধে অবহিত থাকলে মালিকে-শ্রমিকে এবং শ্রমিকে-শ্রমিকে বিরোধের মূলগত কারণ (জড়) দূর করা যায়। একমাত্র এইভাবে শিল্প ক্ষেত্রে স্থায়ী শান্তি রক্ষা করা সম্ভব। নিম্নে এই সকল বিরোধের অন্যতম কারণসমূহ বিবৃত করা হলো। মালিক এবং শ্রমিক এদের উভয় পক্ষীয় ব্যক্তির এই সকল আরোগ্য-যোগ্য দুর্বলতা সম্বন্ধে অবহিত থাকা দরকার।

(১) মালিকানা-বোধ :—এই মালিকনা বোধকে অধিকার বোধ বলা যায়। বহু মালিক শ্রমিকদের মালিকানা বোধের উপর প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেন না। এর ফলে কর্মে মন্থরগতি আসে ও তজ্জনিত উৎপাদনের হ্রাস ঘটে। সাধারণ মানুষের মত শ্রমিকদেরও ব্যক্তি, দ্রব্য ও মতের ওপর মমতা থাকে। আদি কালের মত জোর করে তারা এগুলির মালিক হতে পারে না। সভ্য জগতে এই মালিকানা-স্পৃহা মমতা বোধে রূপান্তরিত হয়েছে। এইজন্যে এই মালিকানা বোধকে মমতা-বোধও বলা যেতে পারে। বহুকাল একত্রে কর্মরত শ্রমিকদের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে নিয়োগ করলে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। এদের পরস্পরের প্রতি স্বাভাবিক মমতাবোধই ইহার অন্যতম কারণ। বদলির প্রয়োজন হলে এদের একদিনে ছত্রভঙ্গ না করে অতি ধীরে ধীরে সহিয়ে সহিয়ে তা করা উচিত। এদের এই মনোবৃত্তির কারণে বিনা পরামর্শে কোনও অধস্তন কর্মীকে হঠাৎ অন্যত্র বদলি করলে শ্রমিকগণ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। কিন্তু এ কাজ তাদের সাথে পরামর্শ করে তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে করলে তারা এজন্য মনঃক্ষুণ্ণ (দুঃখিত) হলেও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে না। শ্রমিকদের নিজস্ব মতামতের বিরুদ্ধে নির্দেশ দেবার কালেও তাদের

সম্বন্ধে আলোচনা করা ভালো। এরা কোনও ব্যক্তি ও দ্রব্যের মত তাদের নিজের মতকেও ভালবাসে। ফ্যাকটরি এবং উহার দ্রব্য (যন্ত্রাদি) সমূহের উপর তাদের কোনও বৈধ মালিকানা নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা ঐগুলি নিজ গুহপাজতে রেখে উহা তারা নিজেদের মনে করে আনন্দ পায়। যে ক্ষুদ্র যন্ত্র (tools) বা মেসিন শ্রমিকরা কিছুকাল ব্যবহার করে তার উপর শ্রমিকদের একটা মায়া পড়ে যায়। এ জন্য একটি মেসিন হতে অপর মেসিনে নিয়োগ শ্রমিকরা পছন্দ করে না। এর অন্যথা হলে ফ্যাক্টরিতে উৎকৃষ্ট পণ্য-দ্রব্যের উৎপাদনের হার কমে যায়। কারণ কিছুকাল পরে শ্রমিকরা তাদের মেসিনের সাথে একাত্ম হয়ে তাদের ভালবাসতে শুরু করে। এক উকিলের হাতের মামলা অপর উকিলের হাতে দিলে উকিলরাও এই একই কারণে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এ বিষয়ে পুলিশ অফিসার, আইনজীবী এবং শ্রমিকরা একই রূপ স্পর্শ-কাতর। কোনও এক বালিকার ব্যবহৃত সেলাই-কল বিকল হলে তাকে কাঁদতে দেখা যায়। তাকে একটি নূতন সেলাই-কল এনে দিলেও তার কান্না থামে নি। কয়েকটি ক্ষেত্রে ফোরম্যানরা অকারণে শ্রমিকদের এক মেসিন হতে অপর মেশিনে নিয়োগ করাতে প্রতিষ্ঠান বিশেষে ধর্মঘটের অবতারণা হয়েছে। ফোর-ম্যান ও বড় মিস্ত্রিদের এইরূপ অবিবেচনাপ্রসূত কার্য হতে বিরত থাকা উচিত।

(আমার এ বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে। পুলিশে ডেপুটি কমিশনার রূপে একটি জিপগাড়ি ব্যবহার করতাম। বহু সভ্যতা-বিধ্বংসী দাঙ্গা-হাঙ্গামা নিরোধে আমি এই গাড়িতে ঘটনাস্থলে যেতাম। বহুবার এই জিপ গাড়িটির উপর শক্তিশালী বোমা বর্ষিত হয়েছে। কোনও বোমার স্প্লিনটারে জিপের দেহ এফোঁড় ওফোঁড় হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারে (একটি ঘটনা ব্যতিরেকে) আমি নিজে অনাহত থেকেছি বা সামান্য মাত্র আহত হয়েছি। ঠিক সময় ঐ জিপ আমাকে নিরাপদ স্থানে আনতো। দিবারাত্র ব্যবহারে ঐ জিপ আমার অকৃত্রিম বন্ধু হয়ে উঠে। কিন্তু একদিন হেড কোয়ার্টারের এক আদেশে ঐ পুরানো জিপের বদলে আমাকে এক নূতন জিপ দেওয়া হল। কিন্তু এ'জন্য আমি কয় রাত্রি ঘুমতে পারি নি। নির্লজ্জভাবে নিজের কুসংস্কার স্বীকার করে আমাকে ঐ পুরানো জিপ ফেরত নিতে হয়।

এই কারণে যে শ্রমিক যে মেসিনে অভ্যস্ত তাকে নিষ্প্রয়োজনে ঐ মেসিন হতে অন্যত্র প্রেরণ করা অনুচিত। এই মালিকানা-বোধ একদিক হতে (উৎপাদন অক্ষুণ্ণ রেখে) অশেষ উপকার করে। অন্যদিকে ইহা যে-কোনও মুহূর্তে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহে দারুণ অশান্তির কারণ ঘটায়।

(শ্রমিকদের এই অধিকার-বোধ অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রেও উগ্রভাবে প্রকাশ পেয়ে থাকে। শ্রমিকদের প্রাপ্য বেতন কম দিলে বা তা দেরিতে দিলে বহু অঘটন ঘটে থাকে। পৃথিবীর বহু বিপ্লব মাত্র অনিয়মিত বেতন প্রদানের জন্য ঘটে গিয়েছে। এই ব্যাপারে স্বল্পমাত্র বিচ্যুতি শ্রমিকরা তাদের অধিকার হরণের সামিল মনে করেছে। বলা বাহুল্য, বেতন বৃদ্ধি দ্বারা শ্রমিকের নিজের ও পরিবারের আয় বাড়ে। এতদ্দ্বারা সে সমাজে অধিকতর প্রতিষ্ঠা অর্জন করে। বহু ক্ষেত্রে আয় বাড়া অপেক্ষা প্রতিষ্ঠা অর্জন তাদের কাম্য হয়। এইগুলিকে সে তার ভালো কাজের জন্য প্রাপ্য পুরস্কার মনে করেছে। ভালো কাজের জন্য এইরূপ পুরস্কার পাওয়া তারা একটি অধিকার বলে মনে করে। এই ন্যায়সঙ্গত পুরস্কার হতে অন্যায়ভাবে কেহ বঞ্চিত হলে সে মনে করে যে তার ন্যায্য অধিকার হরণ করা হলো। কোনও দ্রব্য কিনবার ইচ্ছা উহা সম্ভোগ করার ইচ্ছামাত্র হতে আসে না। অপর কাউকে উহা কিনতে দেখলেও উহা কিনবার ইচ্ছা আসে। এখানে অপর ব্যক্তির মত সে'ও ঐরূপ দ্রব্যের অধি-কারী হতে চায়। একে ইংরাজিতে ভ্যানিটি অব পজেশন বলা হয়। এইজন্য বহু ব্যক্তি বন্দুক না ছুঁড়েও বন্দুক কিনে। এ সকল দৃষ্টান্ত হতে এই মালিকানা বোধের বহুবিধ অভিব্যক্তি সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে।)

ধর্মঘট কালে পুরানো শ্রমিক তার স্থলে নিযুক্ত নূতন শ্রমিককে দেখলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। এর কারণ এই যে, ঐ পুরানো শ্রমিক ঐ পদের উপর তার অধিকার বর্তেছে বলে মনে করে। অন্যদিকে মালিকরা মনে করে যে, যথেচ্ছ শ্রমিক-নিয়োগে তাদের অধিকার আছে। এই ক্ষেত্রে এই উভয় প্রকার মালিকানা-বোধের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য আনা দরকার। আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে বহু ক্ষেত্রে, 'আমা-দের মালিক' এই বলেও শ্রমিকরা গর্ব অনুভব করেছে। শ্রমিকরা মনে করে যে তার অন্য সম্পদের মত তার ঐ পদটি তার নিজের। এ অবস্থাতে মালিকের বরং খুশি হওয়া উচিত। ইহা উৎকৃষ্ট দ্রব্য উৎপাদনের সদা সহায়ক। (ধর্মঘটের তিক্ততার পর এই মালিকানা বোধের জন্য শ্রমিকদের পূর্বানুরাগ ফিরে আসে) এই মালিকানা-বোধ কোনও ক্রমে নষ্ট করা উচিত নয়। চাকুরিতে স্থায়িত্বের আশ্বাস, পুত্রিগণকে কর্মে নিয়োগ এবং সদা সদ্ব্যবহার এই মালিকানা-বোধকে অক্ষুণ্ণ রাখে। এই মালিকানা-বোধের কারণে শিল্পী তার শিল্পের জন্য গর্ব অনুভব করে। এইজন্য একটা সৃষ্টির আনন্দ তাকে অভিভূত করে তুলে। ঐ দ্রব্যগুলি আমার হাতের তৈরী—এই বলে আমি বহু শ্রমিককে গর্ব করতে শুনেছি। বিগত পুরুষের অট্টালিকার কোনও অংশ বিনষ্ট হলে উত্তরাধিকারীদের আমি ক্ষোভ করতে শুনি নি। কিন্তু উহার নির্মাতা স্বর্গত রাজমিস্ত্রির অশীতিপর পুত্রকে এ জন্যে আমি চক্ষে জল ফেলতে দেখেছি। বহু অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধ ইঞ্জিনীয়ার এবং ওভারসিয়ার তাদের দক্ষতামূলক পূর্তকার্যের জন্য আজও গর্বানুভব করে। ইহার দ্বারা মালিকানা-বোধের শক্তি কিরূপ অসীম তা বুঝা যাবে।

(বর্তমান কালে এককভাবে শিল্প-কার্যের জন্য গর্বানুভবের ক্ষেত্র সীমাবদ্ধ হয়ে এসেছে। কারণ, উদ্যোগ-শিল্প সমূহে কোনও পণ্য দ্রব্য একক তৈরি করার সুযোগ নেই। এই-খানে পরস্পরের সহযোগিতাতে যৌথভাবে দ্রব্য তৈরি হয়। এখানে শ্রমিকরা 'ঐগুলি আমাদের হাতের তৈরি', বা 'ঐগুলি আমাদের ফ্যাক্টরির তৈরী দ্রব্য' এই বলে প্রায় গর্বানুভব করে। বাজারে তাদের তৈরি দ্রব্যের প্রশংসা শুনলে মালিকদের মত তারাও গর্বান্বিত হয়ে উঠে।)

শ্রমিকদের প্রতি হুকুম প্রদানের রীতি-নীতি ; উর্ধ্বতনদের অধস্তনদের প্রতি ব্যবহার এবং বেতন প্রদান কালে ও শ্রমিক ভর্তিকালে ভব্যতার উপর এই 'মালিকানা-বোধের' শুভ সূচনা হয়ে থাকে। শ্রমিকদের পারিবারিক বিষয়ে খোঁজ খবর নিলে এবং উহাদের কার্য-কর্ম বহির্ভূত বিষয়ে সাহায্য করলে ফল সর্বো-ত্তম হয়। এই বিষয়ে মালিক ও ম্যানেজার-দের সদা সচেতন থাকা উচিত।

মালিক-শ্রমিকে এবং শ্রমিকে-শ্রমিকে সম্পর্ক মধুর করতে হলে উপরোক্তরূপ কয়েকটি শ্রমিক-মনোবৃত্তির মান একটুও ক্ষুণ্ণ না করে উহার বর্ধন ঘটানো দরকার। কিন্তু উহাদের মধ্যে আরও এমন কয়েকটি বৃত্তি আছে যাহার সুযোগ গ্রহণ না করে মালিকদের উহার আক্র-মনের মূল কারণ সর্বতোভাবে দূরীভূত করা উচিত হবে। শ্রমিকদের মধ্যে পরিদৃষ্ট ঐরূপ দুইটি প্রধান মনোবৃত্তি নিম্নে ব্যাখ্যাসহ উদ্ধৃত করা হলো। মালিকে-শ্রমিকে মধুর সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ রাখতে হলে শ্রমিকদের এই দুইটি উল্লেখযোগ্য বৃত্তি সম্বন্ধে অবহিত থাকা উচিত। এই বৃত্তি দুইটি শ্রমিকদের মধ্যে অনুশীলনের কারণ যাতে না ঘটে তা দেখা উচিত। যে যে কারণে উহাদের উদ্ভব হয় তা তৎক্ষণাৎ দূর করা দরকার। এই বৃত্তি দুইটিকে বলা হয় পলায়নী বৃত্তি এবং আক্রমণী বৃত্তি (আক্রমণাত্মক স্বভাব)। এই

উভয় বৃত্তির বাহির্বিকাশের মূল কারণ নির্মূল না হলে মালিকে-শ্রমিকে স্থায়ী সদ্ভাব সম্ভব নয়।

(শিল্পক্ষেত্রে এই অশুভ বৃত্তিদ্বয়ের উপস্থিতির জন্য দায়ী বহুবিধ কারণের বিষয় উল্লেখ করা যায়। উদ্যোগ-শিল্পের ক্ষেত্রে অযোগ্য ব্যক্তি ভর্তি করা ইহার অন্যতম কারণ। ইহারা সর্বক্ষণ অভিযোগমুখর হয়ে থাকে। উচ্চাকাঙ্ক্ষী অথচ অযোগ্য ব্যক্তি এই শ্রেণীর শ্রমিক। এদের কেহ কেহ নূতন পরিবেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারে না। বৈজ্ঞানিক পন্থায় শ্রমিক ভর্তি দ্বারা ইহার সমাধান হতে পারে। এই দুরবস্থার অপর কারণ শিল্পক্ষেত্রে অব্যবস্থা ও তজ্জনিত অসুবিধা এবং নানা অনাচার, অত্যাচার ও অবিচার। এই সকল কারণ দূরীভূত হলে শ্রমিকদের মনে এই পলায়নী ও আক্রমণী বৃত্তি স্থান পাবে না। এর মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক কারণও বিবেচনা করতে হবে।

(২) পলায়নী বৃত্তি :—শ্রমিকরা সাহসের অভাবে কিংবা প্রচণ্ড বাধাতে আক্রমণে অসমর্থ হলে পলায়নী বৃত্তি দ্বারা অভিভূত হয়। আক্রমণী মনোবৃত্তি ক্রোধপ্রসূত এবং পলায়নী মনোবৃত্তি ভয়প্রসূত হয়ে থাকে। এজন্যে অভাব-অভিযোগ ভারাক্রান্ত শ্রমিকরা সুবিধামত কর্ম ত্যাগ করে অন্যত্র প্রস্থান করে। উপযুক্ত কর্মের অভাবে পরিবার ভারাক্রান্ত শ্রমিকরা বহুক্ষেত্রে কর্ম ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যেতে পারে না। এক্ষেত্রে দৈহিক পলায়ন সম্ভব না হলেও মনের দিক হতে তাদের পলায়ন সম্পূর্ণ হয়। এখানে কর্মরত থেকেও তারা সর্বক্ষণ অন্যত্র কর্মের সন্ধানে ব্যাপৃত থাকে। ফ্যাক্টরিতে স্ব স্ব নির্দিষ্ট কাজ-কর্মে তাদের মন বসে না। এর ফলে দ্রব্যোৎপাদনের হার কমে এবং বাতিল দ্রব্যের সংখ্যা বাড়ে। এতে দৈব-দুর্ঘটনারও সংখ্যা বেড়ে যায়।

(৩) আক্রমণী বৃত্তি :—শ্রমিকদের আক্রমণী মনোভাবকে ইংরাজীতে অ্যাগ্রেসিভ্ ইম্‌পাল্‌স্ বলা হয়। আক্রমণী বৃত্তি এবং পলায়নী বৃত্তি দুইটি বিপরীতধর্মী মনোবৃত্তি। কিন্তু যে কোনও মুহূর্তে একটি হতে অপরটি উদ্ভূত হতে পারে। সর্পজাতি আত্মরক্ষার্থে প্রথমে আক্রমণ করে এবং উহাতে বিপদ আছে বুঝলে তখুনি পলায়নপর হয়। অন্যদিকে পলায়নপর বিড়াল প্রভৃতি জীব কোণ-ঠাসা হলে আক্রমণ করে থাকে। বিড়াল জীবের কোণ নেওয়া (at bay) যে কিরূপ ভীষণ তা সকলের জানা আছে। এই আক্রমণী বৃত্তি আদিকালে বস্তু বা ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে ক্ষান্ত হতো। এই সভ্য যুগে ইহা অপরকে অধীন করে বা তার ক্ষতি করে তৃপ্ত হয়। কিন্তু উত্তেজিত শ্রমিকদের অন্তর্নিহিত প্রতিরোধ-শক্তির অভাব ঘটলে এরা আদি যুগের মত ব্যক্তি ও বস্তুর ক্ষতি করে। কয়েকটি হিংসাত্মক শ্রমিক-ধর্মঘটের ক্ষেত্রে ইহা আমরা পরিলক্ষ্য করেছি। শ্রমিকদের এই আক্রমণী-বৃত্তি ক্রোধপ্রসূত হয়ে থাকে। অবিচার ও অসুবিধা এ সময় তাদের মারমুখী করে তুলে। কয়েক ক্ষেত্রে ইহা জীবন ও সম্পত্তিনাশেরও কারণ হয়। (কখনও জবরদস্তি করে এরা মালিকদের নিকট হতে দাবি আদায় করতে চেষ্টা করে।)

(সমীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে স্বল্পসংখ্যক শ্রমিক আক্রমণী স্বভাবের এবং অধিকাংশ শ্রমিক পলায়নী স্বভাবের হয়। এর কারণ এই যে, পারিবারিক দারিদ্র্যে পীড়িত হলেও এদের অধিকাংশের বিচার-শক্তি বজায় থাকে। বিপুলসংখ্যক শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র স্বল্পসংখ্যক বেপরোয়া শ্রমিক একতাবদ্ধ হতে পারে। এই সময় তারা গণ-বাক্‌প্রয়োগ বা মাস সাজেস্‌শন দ্বারা পরস্পরকে প্রভাবান্বিত করে। এই একতাবদ্ধ সংখ্যালঘু শ্রমিকদের ভয়ে ভীত থাকায় সংখ্যাগুরু শ্রমিক দল তাদের স্বাধীন ইচ্ছা প্রকাশ করে না। এ অবস্থাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তারা উহাদের অনুবর্তী হয়ে থাকে।)

শ্রমিকদের পলায়নী-বৃত্তি ভয়প্রসূত এবং উহাদের আক্রমণী বৃত্তি ক্রোধপ্রসূত হয়ে থাকে। বহু ক্ষেত্রে এই উভয় বৃত্তির একটিরও বহির্বিকাশ সম্ভব হয় নি। আইন-শৃঙ্খলা (পুলিশ) এবং কর্মচ্যুতির ভয়ে তারা আক্রমণে বা পলায়নে অপারগ হয়েছে। আমরা জানি যে ক্রোধ ও ভয়ের একত্রে মিশ্রণ হলে ঘৃণার উদ্রেক করে (ক্রোধ + ভয়—ঘৃণা)। যেহেতু আক্রমণী-বৃত্তি ক্রোধপ্রসূত এবং পলায়নী-বৃত্তি ঘৃণাপ্রসূত, সেই হেতু এই উভয় প্রকার বৃত্তির একত্র মিশ্রণ মালিকের প্রতি এক বিজাতীয় ঘৃণা আনে। উহা অতীব কষ্টদায়ক হলে শ্রমিকরা এ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য উহা তারা ভুলবার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে এই ঘৃণার কারণ বিদূরিত না হয়ে উহা প্রদমিত (রিপ্রেস্‌ড) হয়। ইহাকে মনোবিজ্ঞানে প্রদমন বা রিপ্রেশন বলা হয়। এই প্রদমিত ঘৃণার কারণে মালিকদের ভালো বা মন্দ প্রতিটি কাজ তারা অপছন্দ করে। ইহাকে এক প্রকার মালিক-বিরোধী কমপ্লেক্স বা মনোজট বলা যেতে পারে। এ অবস্থাতে অকারণে বা সামান্য কারণে শ্রমিকরা ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে উঠে। কোনও ভুল বুঝাবুঝি অপসারণে এরা উদ্যোগী হতে চায় না। এরা অদক্ষ ও অনির্ভরযোগ্য শ্রমিকের সৃষ্টি করে থাকে। এর ফলে ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকচ্যুতির হার ও বাতিল দ্রব্যের সংখ্যা বেড়ে যায়। বলা বাহুল্য, এতে মালিক ও শ্রমিক উভয়ে সমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মালিকে-শ্রমিকে সম্পর্কের বিষয় বিবৃত করা হলো। এবার শ্রমিকে-শ্রমিকে সম্পর্কের বিষয় বলা যাক্। শ্রমিক-সন্তোষ শুধু মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের উপর নির্ভর করে না। উহা একজন সাধারণ শ্রমিকের সাথে অপর সাধারণ শ্রমিকের সম্পর্কের উপরও নির্ভরশীল। তদারকী কর্মী এবং সাধারণ শ্রমিকের মধ্যে মধুর সম্পর্কও এ'জন্য প্রয়োজন। এইরূপ সামগ্রিক সন্তোষের অভাবে উহাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতার অভাব ঘটে। এর ফলে উৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন নিয়ত ব্যাহত হয়। শ্রমিকে-শ্রমিকে মধুর সম্পর্ক দুইটি মূল বৃত্তির কারণে বিঘ্নিত হয়। উহাদের যথাক্রমে সুনাম-প্রিয়তা এবং ক্ষমতা-প্রিয়তা বলা যেতে পারে। এই দুইটির অপপ্রয়োগ শিল্পক্ষেত্রে বিপর্যয় এনে দিয়ে থাকে। শ্রমিকদের মধ্যে পরিদৃষ্ট এই দুইটি মানসিক বৃত্তি সম্বন্ধে পৃথক পৃথক আলোচনা করলো।

(৪) সুনাম-প্রিয়তা :—এই সুনাম-প্রিয়তাকে লভ্ ফর্ প্রমিনেন্স বলা যেতে পারে। আমি দেখেছি যে, উচ্চাভিলাষী কর্মী মাত্রই আত্ম-জাহিরের অভিলাষী হয়। ইহাকে নিজেকে সদা জাহির করার (ফোরফ্রন্ট স্থাপন) মনোবৃত্তি বলা যেতে পারে। বর্তমানে প্রচলিত পদোন্নতির প্রথা শ্রমিকদের সর্বদা নিজেদের কৃতিত্বকে সর্বসমক্ষে জাহির করার জন্য ব্যস্ত রাখে। সে যে অপরের অপেক্ষা একজন উপযুক্ত ব্যক্তি তা মালিকের কাছে প্রমাণ করতে বদ্ধ-পরিকর। এই উন্মত্ততা সাধারণ শ্রমিক এবং উহাদের তদারকী কর্মীদের মধ্যে সমভাবে দেখা যায়। এতদ্দ্বারা তদারকী কর্মীরা অধস্তন শ্রমিকদের নিকট হতে বাড়তি কাজ আদায় করে মালিকদের খুশি করে। এদের এই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে মালিকরা এদের মধ্যে ক্ষতিকর প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে থাকেন। এর ফলে শ্রমিকদের মনের ও দেহের উপর অযথা চাপ পড়ে। শ্রমিক-সংস্থা (ইউনিয়ন) সমূহের কর্তৃপক্ষের সম্ভবমত ইহাতে হস্তক্ষেপ করে ইহা নিবারণ করা উচিত। এই ব্যবস্থা তদারকী কর্মী এবং সাধারণ শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে থাকে। মালিকদের ইহা কাম্য হওয়া উচিত নয়। ইহা এই উভয় শ্রেণীর কর্মীদের মধ্যে অসহযোগিতার সৃষ্টি করে। এতদ্দ্বারা উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদনের ক্ষতি করে থাকে।

(৫) ক্ষমতা-প্রিয়তা :—উদ্যোগ-শিল্পে সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের মধ্যে এই ক্ষমতা-প্রিয়তা দেখা যায় (ইহাকে ইংরাজিতে লভ্ ফর্ পাওয়ার বলা যেতে পারে)। এই সুযোগে মালিক ও ম্যানেজারগণ এক শ্রমিককে অপর শ্রমিক দ্বারা প্রয়োজন বোধে শায়েস্তা করে। প্রয়োজনবোধে

শ্রমিকদের মধ্যে এতদ্দ্বারা বিভেদ সৃষ্টি করাও হয়ে থাকে। ক্ষমতাপ্রিয়তা তদারকী কর্মীদের অকারণে 'বুলিই'তে (bully) পরিণত করে থাকে। প্রকারভেদে এই ক্ষমতাপ্রিয়তার মধ্যে উপকারিতাও আছে। কোনও ক্ষেত্রে শ্রমিকরা কাঁচামাল এবং মেসিনসমূহের উপর অপ্রতিহত অধিকার বিস্তার করে সন্তুষ্ট। কিন্তু অধিক ক্ষেত্রে বস্তুর বদলে ব্যক্তির উপর এরা প্রভুত্ব বিস্তার করতে চায়। প্রায়শ ম্যানেজার, ফোরম্যান এবং তদারকী কর্মীদের এই স্পৃহা মানব-দানবে পরিণত করে। এই ক্ষমতা-প্রিয়তা হতে বহু শ্রমিক নেতারাও মুক্ত নন। এঁরা নিজেদের শ্রমিক-সঙ্ঘের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করার পরও খুশী নন। এঁরা তখন অন্য (বিরোধী) শ্রমিক-সংস্থার উপর আধিপত্য বিস্তার না করা পর্যন্ত শান্তি পান না। শ্রমিকদের নিয়োগকারীদের (মালিক) উপর ক্ষমতার বহর দেখাবার জন্য তাঁরা ব্যগ্র হন। এর ফলে স্ব স্ব ইউনিয়নে অনবাদ্য একদল শ্রমিকের সাথে অপর শ্রমিক দলের সদ্ভাব ক্ষুণ্ন হয়ে থাকে। এই ক্ষমতা-প্রিয়তা সামগ্রিকভাবে শ্রমিক-সন্তোষ বারে বারে বিঘ্নিত করে।

উপরে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত মনোবৃত্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত বলা হলো। কিন্তু উহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত মনোবৃত্তির অতিরিক্ত দলগত মনোবৃত্তিও দেখা যায়। শ্রমিক-সন্তোষ রক্ষাতে অভিলাষী মালিকদের উহাদের এই দলগত মনোবৃত্তি সম্বন্ধেও অবহিত হওয়া দরকার। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামতের অদল-বদল করে এরা একটি দলীয় মতামতের সৃষ্টি করে। গণ-বাকপ্রয়োগ (মাস্ সাজেশন্) দ্বারা ইহা সৃষ্টি কর হয়। এইভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থের বদলে দলীয় স্বার্থের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে তারা তাদের চিন্তাধারা একটিমাত্র খাতে প্রবাহিত করে থাকে। শ্রমিকদের এই দলীয় মনোভাব তিন প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—(১) ক্রাউড্ টাইপ্, (২) ক্লাব টাইপ এবং (৩) কমিউনিটি টাইপ্। উহাদের মধ্যে প্রভেদ এই যে একটি হতে অপরটির বাঁধন আলগা হয়ে থাকে। শ্রমিকদের এই ক্রাউড্ টাইপ্ একতা সাময়িক হয় এবং তার শক্তি যৎসামান্য থাকে। ক্লাব টাইপ একতাতে মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে তারা এক, কিন্তু অন্যান্য প্রশ্নে তারা বিভিন্নমতি। (এই কারণে সাম্প্রদায়িক ও জাতিগত প্রশ্নে বহু ধর্মঘট দানা বাঁধে নি।) কমিউনিটি টাইপ্ একতাতে শ্রমিকরা নিজেদের একটি গোষ্ঠিবদ্ধ প্রাণী মনে করে।' প্রতিটি বিষয়ে তারা জাতি, ধর্ম ও সম্প্রদায়ের উর্দ্ধে মত প্রকাশ করে। এই ধরণের একতা এ দেশের শ্রমিকদের মধ্যে এখনও সৃষ্টি হয় নি। এই তিন প্রকার দলীয় মনোভাবাপন্ন শ্রমিকদের সন্তুষ্টি সাধনের পন্থাও বিভিন্ন রূপের হতে বাধ্য। মালিকরাও শ্রমিকদের এই ক্লাব-টাইপ একতার দুর্বলতার সুযোগ প্রায়ই নেন। এই স্থানে তাঁরা খোঁজ নেন যে কোন্ বিষয়ে এরা ভিন্ন মতাবলম্বী। এর পর এদের মধ্যে বিভেদ আনয়ন করা কঠিন হয় না। এক্ষেত্রে মালিক-দের উচিত হবে যে তারা কোন্ কোন্ বিষয়ে এক মতাবলম্বী তার খোঁজ রাখা। এই ক্ষেত্রে এঁরা তাদের এই একমতটিকে বাড়তে সাহায্য করে তাদের সন্তোষ সাধন করতে পারবেন। মালিক-দের উদ্যোগী হয়ে নিজেদের শ্রমিকদের মধ্যে একতা আনয়ন করা উচিত। এ বিষয়ে যাঁরা ভিন্ন মত অবলম্বন করেন তাঁরা নিজেদের সর্বনাশ নিজেরা ডেকে আনেন। আমার মতে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত মতামত এবং উহাদের দলগত মতামত—তাদের এই উভয় প্রকার মতামতকে আমাদের সমান সম্মান দেখানো উচিত। এই উভয় মতামতের কোন্ মতটি কখন প্রাধান্য লাভ করবে তা বলা শক্ত। শ্রমিকদের এই উভয় মতামতের সহিত মালিকদের পরিচয় থাকা উচিত।

(এ বিষয়ে মালিকদের নিস্পৃহতা এবং বিরূপতার কারণ বুঝা যায়। কিন্তু এই বিষয়ে শ্রমিক সঙ্ঘগুলি কেন অমনোযোগী তা বুঝি না। মালিক ও শ্রমিকদের ন্যায় শ্রমিক-সঙ্ঘগুলিরও এই বিষয়ে অবহিত হওয়া উচিত। বলা বাহুল্য যে, এই ব্যবস্থার উপর শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির অস্তিত্ব এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে।)

পরিবেশ

জীবমাত্রেই জৈব কারণে তাদের স্ব স্ব পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও ব্যবস্থাকে পরিবেশ বলা হয়। উত্তম পরিবেশ স্বল্পকালে অধিকসংখ্যক উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদনের সহায়ক। এই পরিবেশ দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা—মানসিক ও বাস্তবিক। কর্তৃপক্ষের এবং সহ-কর্মীদের সৎ বা অসৎ ব্যবহার দ্বারা মানসিক পরিবেশ সৃষ্ট হয়। আমি প্রথমে এই মানসিক পরিবেশ সম্বন্ধে আলোচনা করবো। কদর্য দৈহিক আবহাওয়ার মত ফ্যাক্টরিসমূহে অসহনীয় মানসিক আবহাওয়ারও সৃষ্টি হয়ে থাকে। (ফ্যাক্টরির কায়িক পরিবেশ সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করবো।) আলোক-ব্যবস্থা, বায়ু-চলাচল, আর্দ্রতা ও উত্তাপ প্রভৃতি দ্বারা বাস্তবিক (কায়িক) পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই পরিবেশের উপর শ্রমিকদের স্বাস্থ্য, স্বাচ্ছন্দ্য, দক্ষতা প্রভৃতি নির্ভর করে। ফ্যাকটরি গঠনের কালে ইঞ্জিনীয়ারগণ মনোবিজ্ঞানীদের সাথে পরামর্শ করলে এ বিষয়ের সুফল হয়। পরিবেশগত মনোবিজ্ঞান বা এনভায়রনমেণ্ট সাইকোলজি দ্বারা (কেহ কেহ ইহাকে পরিবেশগত ইঞ্জিনীয়ারিং বলেন) ইহার সমাধান হতে পারে। অন্য দেশে মনোবিজ্ঞানীদের পরামর্শ মত ফ্যাক্টরিসমূহের নক্সা প্রস্তুত করা হয়। কিন্তু এদেশের শিল্পপতিগণ এ'সম্বন্ধে কখনও চিন্তা করেন নি।

(ক) মানসিক পরিবেশ :—আমরা পরিবেশ শব্দটি দ্বারা শুধু আলোক-ব্যবস্থা, উত্তাপ, শব্দ, আর্দ্রতা প্রভৃতি দৈহিক ব্যবস্থা বুঝি এবং মনে করি যে উহাদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাতে শ্রমিকরা সর্বোত্তমভাবে কার্য করতে পারে। কিন্তু অনুরূপভাবে আকাঙ্ক্ষা, ভয়, আশা, ভাবনা বন্ধুত্ব ও শত্রুতা প্রভৃতি মানসিক পরিবেশও শ্রমিকদের উপর কার্যকরী হয়ে থাকে। শ্রমিকদের স্বাচ্ছন্দ্য ও দক্ষতা এই মানসিক পরিবেশের উপরও নির্ভর করে। শ্রমিকদের এই ব্যক্তিগত বৃত্তিসমূহ পরে উহাদের গণ-চিত্তে স্থায়িভাবে স্থান করে নেয়। এর ফলে যৌথ-ভীতি (mass) যৌথ ভাবনা, যৌথ-আনুগত্য (morale) প্রভৃতি সৃষ্টি হয়ে থাকে এতদ্দ্বারা শ্রমিকে-শ্রমিকে এবং মালিকে-শ্রমিকে সহযোগিতার অভাব ঘটে। কয়েকটি ফ্যাক্টরিতে একজন শ্রমিক অপর শ্রমিককে বিশ্বাস করে না। একজন অপর জনকে কোম্পানীর দালাল (spy) ভেবে ঘৃণা করে। আবার এমন ফ্যাকটরি আছে যেখানে তারা মিলেমিশে সদ্ভাবের সাথে কার্য করে। প্রথমোক্ত ক্ষেত্রে শ্রমিকরা প্রায় পরস্পরের মধ্যে কলহে লিপ্ত হয়েছে। এই কলহজনিত সহযোগিতার অভাবে ঐ ফ্যাক্টরিতে বহু কর্মঘণ্টা বৃথা নষ্ট হয়েছে। এই পারস্পরিক সহযোগিতার অভাবে উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদনে বিঘ্ন ঘটেছে। বহু ফোরম্যান ও ম্যানেজার শ্রমিকদের মধ্যে এই কলহের বীজ অকারণে রোপণ করে ফ্যাকটরির যথেষ্ট ক্ষতি করে থাকেন।

এই সকল ফোরম্যান ও ম্যানেজার শ্রমিকদিগকে তাঁদের তাঁবে রাখার জন্য এদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে থাকেন। শ্রমিকরাও নিজেদের দলগত স্বার্থে এইরূপ বিভেদ কামনা করে। কিন্তু এতে অনুৎকৃষ্ট ও অকেজো দ্রব্য সৃষ্টি হয় এবং উৎপাদন হার কমে যায়। এর ফলে মালিকের লাভ কম

হয় এবং শ্রমিকরা কম বেতন পায়। কিন্তু উহার বিপরীত ক্ষেত্রে (দ্বিতীয়োক্ত শ্রমিকদের পরস্পরের মধ্যে সদ্ভাব থাকে। সেই ক্ষেত্রে তারা নিজেদের ভুলচুক শুধরে নেয় এবং তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ফ্যাক্টরির কাজ সহজ করে তোলে। ফ্যাক্টরিতে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সহযোগিতা থাকাতে ঠিক সময়ে ঠিক মাল প্রতিটি বিভাগে পৌঁছে যায়। বহু দ্রব্য পর পর বিভাগের কর্ম দ্বারা (processes) সৃষ্টি হয়। যে কোনও একটি বিভাগের কাজ খারাপ হলে ঐ দ্রব্যটি অনুৎকৃষ্ট বা বাতিল দ্রব্য হয়ে যেতে পারে। এইজন্যে শ্রমিকদের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন অসামান্য।

ফ্যাক্টরির কদর্য মানসিক পরিবেশের কারণ সম্পর্কে বহুক্ষেত্রে শ্রমিকদের প্রতি ফোরম্যানদের অহেতুক দুর্ব্যবহারের বিষয় বলা হয়। কিন্তু এই সকল ফোরম্যান কেন 'বুলিই' (bully) হয়ে ওঠে তার হেতু অনুসন্ধান দ্বারা জানা হয় না। এরূপ অনুসন্ধানে জানা যায় যে, উৎপাদন বৃদ্ধি সম্বন্ধে তাদের সুপারিশ ম্যানেজাররা কানে নেন না। অথচ উৎপাদন কমলে তাদেরকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়। শ্রমিকরা বহু ক্ষেত্রে ভয়গ্রস্ত হয়ে উৎপাদন ইচ্ছা করে কম করে। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, একজন অধিক উৎপাদন করলে অপর জন সেই তুলনাতে কম উৎপাদন করলে তাকে ধমকা-ধমকি করা হয়। অথচ তাদের প্রত্যেকের মেসিন সমানভাবে উৎকৃষ্ট থাকে না। শ্রমিকদের মনে বহু প্রকার ভুল বোঝাবুঝি দ্বারা মনোজট (complex) সৃষ্টি হয়। বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকদের চিত্ত-বিক্ষোভ (emotion) তাদের মনের বিচার-শক্তি (reason) হরণ করে। যে কোনও কারণে শ্রমিক অসন্তোষ ঘটুক না কেন উহা অসন্তুষ্ট শ্রমিককুল সৃষ্টি করে। এর ফলে ফ্যাক্টরিতে অনুৎকৃষ্ট ও বাতিল পণ্য-দ্রব্য সৃষ্টি হয়। এই জন্য এই সকল কু-পরিবেশের মূল কারণগুলি খুঁজে বার করে উহাদের নিরাময়ের ব্যবস্থা করা উচিত। উপযুক্ত বাক্‌প্রয়োগ (suggestion) এবং চিত্ত-বিশ্লেষণ দ্বারা শ্রমিকদের বিবিধ মনোজট দূরীভূত করা উচিত হবে। শ্রমিক-অসন্তোষ সকল ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণে ঘটে না। পরিবার-ভারাক্রান্ত শ্রমিক অধিক বেতন ও চাকুরির স্থায়িত্ব, ছুটি ও নিরাপত্তা কামনা করে। কিন্তু সেই সাথে কর্মক্ষেত্রে তারা সর্বোত্তম মানসিক পরিবেশও কামনা করে। বহু শ্রমিক উপযুক্ত মানসিক পরিবেশের অভাবে চাকুরিতে ইস্তফা দিয়ে অকুণ্ঠিতচিত্তে দারিদ্র্য পর্যন্ত বরণ করেছে। এ সকল ঘটনা হতে সুষ্ঠু মানসিক পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা বুঝা যায়।

(খ) কায়িক পরিবেশ :—এই কায়িক পরিবেশকে বাস্তবিক বা দৈহিক পরিবেশও বলা হয়। কদর্য দৈহিক পরিবেশ শ্রমিকদের মনের উপর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া আনে। উপযুক্ত আলোক-ব্যবস্থার অভাবে শ্রমিকদের কাজ-কর্মে অসুবিধা ঘটে। সেই সাথে তাদের মনে বিরক্তিরও সৃষ্টি করে। প্রথমে তারা উৎপাদিত পণ্য-দ্রব্যের উচ্চ মান রক্ষা করণে প্রাণপণ চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুক্ষণ পর ক্লান্ত হয়ে তারা কাজ-কর্মে বেপরোয়া হয়ে উঠে। এরপর তারা তাদের কর্মের গতি ধীরে ধীরে শ্লথ করে দিয়ে থাকে। ম্যানেজারগণ ইহা বুঝলেও মালিকদের এই বাবদে খরচে রাজী করাতে পারে না। এ বিষয়ে সুব্যবস্থা করা মালিকদের আয়ত্তের মধ্যে আছে বুঝলে শ্রমিকরা অভিযোগমুখর হয়ে উঠে। এই জন্য উৎকৃষ্ট ফ্যাক্টরি হতে নিকৃষ্ট ফ্যাক্টরিতে কাজে ঢুকলে শ্রমিকরা (প্রথম দিনেতেই) বিক্ষুব্ধ হয়। শ্রমিকরা তাদের ফ্যাক্টরিতে সুপরিবেশ দেখলে ফ্যাক্টরি সম্বন্ধে গর্ব অনুভব করে। এবার এই কায়িক পরিবেশ সম্পর্কিত বিবিধ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

(১) বায়ু-চলাচল :—ফ্যাক্টরি গৃহে শ্রমিকদের সামগ্রিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং দক্ষতা সুষ্ঠু বায়ু-চলাচলের উপর নির্ভর করে। এই বায়ু চলাচল ব্যতীত উহার আর্দ্রতা ও উষ্ণতার উপরও উহাদের স্বাচ্ছন্দ্য ও দক্ষতা নির্ভর করে। বায়ু চলাচলের অভাব শ্রমিকদের মধ্যে কর্মক্লান্তি ও অস্বাচ্ছন্দ্য আনে। সকলে জানে যে, শ্বাস-ক্রিয়া দ্বারা বায়ুর উপকারী অম্লজান (oxygen) বিনষ্ট হয় এবং তৎপরিবর্তে ক্ষতিকর কারবন-ডায়োক্সাইড তৈরি হয়। অন্যদের মতে কারবন-ডায়োক্সাইড-এর আধিক্য শ্রমিকদের রক্ত বিষাক্ত করে। কেহ কেহ বলেন, দেহ হতে পদার্থ বিচ্ছুরিত হওয়াতে তাদের স্বাস্থ্যের হানি হয়। এর কারণ যাই হোক, বায়ুর অভাব শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি করে।

এই দুরবস্থার প্রতিষেধকরূপে প্রত্যেকে বলবেন যে, দূষিত বায়ু বিদূরিত করে যথেষ্ট নূতন বায়ু প্রবেশ করানো হোক। একমাত্র এইভাবে শ্রমিকরা কর্মক্লান্তি হতে রক্ষা পেতে পারে। বায়ু-চলাচল একদিকে দেহ হতে উদগত উত্তাপ বিদূরিত করে ও অপর দিক হতে উহা দেহকে অতি আর্দ্রতা হতে রক্ষা করে। কিন্তু উষ্ণ বায়ু ঘরে প্রবেশ করালে সুতাকলসমূহে (টেকনিক্যাল কারণে) পণ্যদ্রব্যের ক্ষতি হয়। আর্দ্রতার অভাবে বয়ন সুতা বারে বারে ছিঁড়তে থাকে। এজন্য সাধারণভাবে ফ্যাক্টরি কক্ষে অতি মাত্রায় বায়ু না ঢুকিয়ে মাত্র উহার সহজ চলাচলের ব্যবস্থা করা আমাদের মতে উচিত হবে।

আর্দ্র বা উষ্ণ নিশ্চল (Still) বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারা অবিরত ফুসফুসের মধ্যে প্রবেশ করানো অতীব ক্ষতিকর। এতদ্দ্বারা ফুসফুসের ক্ষাণাকার মিউকাসের আচ্ছাদন ভারাক্রান্ত হয়ে শক্তিহীন হয় এবং তজ্জনিত উহা ক্ষতিকর জীবাণুর আদর্শ জন্মস্থান হয়ে উঠে। কিন্তু স্বাভাবিক বায়ু-চলাচল অব্যাহত থাকলে এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। এই বিষয়ে মালিক ও ব্যবস্থাপকদের অবহিত থাকা উচিত।

(জীবদেহে অনাবিল জৈব-রসায়ন প্রক্রিয়ার জন্য ক্রমাগত উত্তাপ তৈরি হয়। এজন্য বিশ্রামকালে বা পরিশ্রমকালে (সর্বসময়ে) আমাদের দেহ হতে কম-বেশি উত্তাপ ক্রমানুয়ে নির্গত হয়। এই উত্তাপ দেহ হতে এভাবে বাইরে বিচ্ছুরিত না হলে মানুষের দৈহিক উত্তাপ উহাদের স্বাভাবিক উত্তাপ অপেক্ষা বেড়ে যায়। এর ফলে দেহের উপরি অংশের রক্তধমনী হঠাৎ স্ফীত হয়ে উঠে রক্তকে বাহিরের আপেক্ষিক ঠাণ্ডা হাওয়ার সংস্পর্শে আনে। এতে দেহের আবশ্যক অংশ হতে রক্ত অন্যত্র সরে আসে। এতে আমরা অকারণে অতি মাত্রাতে ঘর্মাক্ত হয়ে পড়ি। এই ঘর্ম বায়ু-চলাচল দ্বারা অপসারিত না হলে শ্রমিকরা অতি সহজে কর্মক্লান্ত হয়ে পড়ে)।

[ক্রমশ

স্বপ্ন

অরবিন্দ ভট্টাচার্য

যমুনা গভীর রাত্রে পাশে এসে বসেছিল, আর
বলেছিল, "এই স্বপ্ন একান্ত তোমার আমার।"
হাসির মতন স্নিগ্ধ বাতাসের ক্ষীণ কলধ্বনি
বক্ষে তিলে তিলে গড়া আকাশের নীলকান্তমণি
জড়িয়ে আমার স্বপ্নে উপহার দিয়েছিল তাকে।

আনাচে কানাচে বাঘ নেকড়েরা ওৎ পেতে থাকে,
অন্ধকারে মুখ নাড়ে। কালো চোখে আমার আশার
পুতুলেরা প্রাণবন্ত হয়। চন্দ্রমার ব্যবধান কাঁচের পাহাড়
বহু জন্মান্তর থেকে সরে এসে যমুনার বক্ষে দিল জল
অযুত স্বপ্নের মেঘ খসে পড়া অনিন্দ্য পল-অনুপল।

যমুনা গভীর রাত্রে পাশে এসে বসেছিল, আর
ক্ষণিকের অমরত্ব দিয়েছিল মনে উপহার।

যন্ত্রের টুকিটাকি

বিজ্ঞান বার্তা

বর্তমান সভ্যতা সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল মানবজীবনের প্রতি পদক্ষেপে যন্ত্র সাহায্য গ্রহণ। উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে—ঘুম ভাঙার ক্ষণ থেকে ঘুমনোর সময় পর্যন্ত যন্ত্র ছাড়া এ যুগের জীবনযাত্রা অচল। গরম লাগছে যন্ত্র চাই, ঠাণ্ডা পড়েছে আন যন্ত্র; আমোদ-প্রমোদও যন্ত্র ছাড়া অচল। যাতায়াত যন্ত্র ছাড়া অচল। অবস্থা এমই দাঁড়াচ্ছে দিন দিন যে, সামান্য দূরত্বও পায়দলে যেতে হলে মানুষ বেঁকে বসবে। সে লক্ষণ এখনই প্রকট।

যন্ত্রসভ্যতা পাক দিচ্ছে গিয়ার-এ ভর করে। ইন্টারমেশিং দাঁতওয়ালা চাকা,—নানা আকার ও প্রকারের,—প্রায় সব যন্ত্রেই শক্তি চালান করে এ হেন গিয়ারযূথ। অসংখ্য রকম গিয়ার পাওয়া যায়, কিন্তু প্রায় সবগুলোই কয়েকটা মূল নক্‌শা থেকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী নির্মিত।

স্পার গিয়ার যত্রতত্র চোখে পড়ে। কলের চালকদণ্ডের সংগে ছোট্ট গিয়ার জুড়ে দিলে বড় গিয়ারটা ছোটটার তুলনায় মন্দগতিতে পাক খায়; ছোটটার এক পাক দেওয়া হ'লে বড়টা মাত্র সামান্য একটু ঘোরে। যাই হোক, ধীরগামী বড় গিয়ার তুরন্ত পাক দেনেওলা ছোটটার তুলনায় অনেক বেশি ঘোরার শক্তি যোগায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রে। এভাবে সামুদ্রিক লাইনার-এর টারবাইন-এর বিপুল গতি প্রপেলার-এর মৃদুল গতিতে পর্যবসিত হয়। গাড়ি, ব্যোমযান আর বহু যন্ত্রে এই নমুনা কাজে আসে। চালনাশক্তি বড়টায় লাগালে ওর এক পাকের মধ্যে ছোটটা কয়েক পাক খায়, কাজেই ছোট গিয়ার লাগানো যন্ত্রের গতি বেড়ে ওঠে, অবশ্য এর ফলে ঘোরার শক্তি কমে আসে।

কোন কোন শক্তি উৎপন্ন করার উদ্দেশ্যে

বেভেল গীয়ার ব্যবহৃত। চালকদণ্ডর ডান কোনে সক্রিয় দণ্ডে চালকদণ্ড থেকে শক্তি বদলী করার জন্য এর বহুল প্রচল। জটিল বেভেল গীয়ারের সহায্যে চালকদণ্ড থেকে রিয়ার এ্যাক্সেল-এ শক্তি পাঠান হয় গাড়ির ক্ষেত্রে।

তৈলক্ষেত্রে, গাড়ি বা অন্যান্য যন্ত্রর তৈলসিঞ্চন পদ্ধতিতে গিয়ার পাম্প ব্যবহৃত হয়
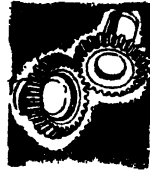
ভারী তরল নলের মধ্য দিয়ে বয়ে যেতে। ছবিটি দেখলে বোঝা যায় কীভাবে পরস্পরলগ্ন গীয়ার দু'টো কলের মধ্যে তেল চালিয়ে দেয়।

বহুল ব্যবহৃত ওয়র্ম গীয়ারও চালকশক্তির ডান কোনে শক্তি উৎপাদন করে; একটা স্ক্রু অপেক্ষাকৃত মন্দচালে বড় গীয়ার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাক দেওয়া বেশি জোর সৃষ্টি করে। চরকি কলে যখন ওয়র্ম গীয়ার ব্যবহৃত হয়, হাতলে একটা পাক দেওয়ার দণ্ড আর বড় গীয়ারে একটা কপিকল লাগিয়ে নিয়ে, তখন তা ভারত্তোলক মানুষকে ঢের ঢের বেশি মাল তুলতে সহায্য করে।
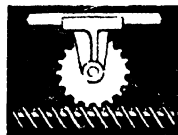
ব্যাক-অ্যাণ্ড-পিনিয়ন গীয়ার মটরের ঘূর্ণ্যমাণ গতি ব্যাক-অ্যাণ্ড-ফোর্থ গতিতে পরি- বর্তিত করে। এ কায়দা অনেক যন্ত্রে কাজেআসে।

বহু কিম্ভূত আকারের গীয়ার কৌশলপূর্ণ কাজ সেরে দেয়। এললিপ্‌টিক্যাল এবং

স্কোয়ার গীয়ার সমপর্যায়ক ঘূর্ণ্যমান গতি পাল্‌টে একবার ধীর তারপর তীব্র ধরণের পর্যায়ক্রমিক গতিতে রূপান্তরিত করে।

অসম আকারের ইনটারমিটেন্ট-মোশন গীয়ার দু' ধরণের গতি আর পূর্ণবিরতি সৃষ্টি করে বিচিত্র ব্যাস এবং দাঁতহীন খানিকটা অংশের সাহায্যে। যে অংশে দাঁত নেই,

চালক গীয়ারের মসৃণ ওপরের দিক চালিত গীয়ারের মসৃণ উপরিভাগ দিয়ে গড়িয়ে যায়; ফলে ওটা পাক খায় না। এ ধরণের গীয়ার সেই সব যন্ত্রে যেগুলো জটিল অংশ ঘুরিয়ে দেয় আর প্যাক করার যন্ত্রে—ঐ যন্ত্র মানুষের হাতের মত কাজ চালিয়ে যায়।

কয়েকটা মূল গীয়ারের বর্ণনা দেওয়া হ'ল। এ থেকে অন্তত এগুলোর বিচিত্র

কাজ সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে হয়। যন্ত্রযুগে গীয়ার অতি প্রয়োজনীয়। একে বাদ দিয়ে চলার কোনও উপায় নেই।

জেইস মাইক্রোস্কোপ

● আর্নেষ্ট এ্যাবে

যুগে যুগে মানুষের কল্যাণে বিজ্ঞান অনেক কিছু দান করেছে। বিগত উনবিংশ শতাব্দীতে মানুষ যখন উন্নতির শীর্ষদেশের পথে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছিল তখন অনেক নতুন সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এই সব কিছুর মধ্যে অন্যতম হল দৃষ্টিশক্তির সহায়ক কোন কোন সরঞ্জাম। কারণ এই সময় উপলব্ধি করা গিয়েছিল যে, মানুষের দৃষ্টিশক্তির সীমানা অসীম নয়। কোন এক নির্দিষ্ট দূরত্ব ও কোন নির্দিষ্ট আকার পর্যন্ত মানুষ আপন দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে স্পষ্ট দেখতে পায়। কিন্তু মানুষের বাসনা বহু দূরের বস্তুকে স্পষ্ট ও ক্ষুদ্রকে বড়রূপে দেখা। তাই মানুষের দৃষ্টিশক্তির সহায়করূপে আবিষ্কৃত হল মাইক্রোস্কোপ ও টেলিস্কোপ যন্ত্র।

বর্তমানে যে উন্নত ধরণের মাইক্রোস্কোপ ও টেলিস্কোপ দেখা যায়, তার মূলে রয়েছেন দুটি মানুষ, যাদের একজনের চিন্তা বাস্তব রূপ পেয়েছে অপরজনের হাতে। এরা হলেন আর্নেস্ট অ্যাবে ও কার্ল জেইস।

১৮১৬ খৃষ্টাব্দে কার্ল জেইস জার্মানীর উইমার শহরে জন্মগ্রহণ করেন। এই শহরটি বর্তমানে জার্মানীর সোভিয়েত অংশে অবস্থিত তুরিনজিয়া প্রদেশের প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় নগরী জেনার খুবই নিকটে অবস্থিত। মেকানিক হিসাবে শিক্ষানবিশী শেষ করে জেইস অন্যান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মেকানিকের মতন আপন শহর ছেড়ে বড় শহরে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। প্রায় ত্রিশ বছর বয়সে তিনি জেনায় ম্যাগনিফাইং কাঁচ ও মাইক্রোস্কোপ উৎপাদনের জন্য একটি কারখানা খোলার অনুমতি পান। শীঘ্রই তাঁর কারখানায় উৎপাদিত মাইক্রোস্কোপ সুখ্যাতি লাভ করে এবং অনেক ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং আমেরিকা থেকে এই মাইক্রোস্কোপ সরবরাহ করার অর্ডার পান। কার্ল জেইস এই সময় মাইক্রোস্কোপের উন্নতি বিধানে অক্লান্তভাবে চেষ্টা করে যেতে থাকেন। কিন্তু এই বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞানের অভাবে তাঁর এই সময় প্রয়োজন হয় এমন একজন সহযোগীর যিনি আপন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-মনীষার দ্বারা তাঁকে সাহায্য করবেন।

সেটা ছিল ১৮৬৬ খৃঃ, সেই সময় জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্নেস্ট অ্যাবে নামে এক তরুণ অঙ্কশাস্ত্র ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে অধ্যাপনা করতেন। অ্যাবে ১৮৪০ খৃঃ তুরিনজিয়া প্রদেশের Eisenach-এ জন্মগ্রহণ করেন। ছাব্বিশ বছর বয়সে অ্যাবে জেইসের কারখানা পরিদর্শনে আসেন, ফলে উভয়ের মধ্যে যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে তা দুজনার এক ও অভিন্ন লক্ষ্যে পৌঁছুতে বিশেষ সাহায্য করে।

● এক জোড়া দূরবীক্ষণ যন্ত্র

তিন বছর ধরে আর্নেস্ট অ্যাবে মাইক্রোস্কোপ উৎপাদনের ব্যবহারিক ও কারিগরী বিষয় নিয়ে অনুশীলন করেন। দু'বছর পূর্ণ হলে অ্যাবে মাইক্রোস্কোপের অপটিক্যাল পাওয়ার সঠিকভাবে নির্ণয় করার পূর্ণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এর ফলে নতুন মাইক্রোস্কোপ উৎপাদনে কার্ল জেইস যে অসম্ভব খরচের সম্মুখীন হতেন তা সহজেই দূর করা গেল এবং আরও অন্যান্য অনেক অসুবিধাই সহজ হয়ে গেল। আর পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক মহল জানল দুটি নতুন নাম আর্নেস্ট অ্যাবে ও কার্ল জেইস।

১৮৭৭ খৃঃ লণ্ডনে সিমথ-কেনসিংটন প্রদর্শনী এক বিরাট সাফল্য বয়ে নিয়ে এল। আর্নেস্ট অ্যাবে হলেন 'রয়্যাল মাইক্রোস্কোপ সোসাইটির' সম্মানিত সদস্য। আর্নেস্ট অ্যাবের প্রদর্শিত পথে গবেষণা করে অপর এক জার্মাণ রসায়নবিদ অটো স্কট্ও অত্যন্ত কার্যকরী সাফল্য

● কার্ল জেইস

অর্জন করেন। ডাঃ স্কটের সাহায্যেই জেনায় একটি কারিগরী গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত অপটিক্যাল কাঁচের ক্যাটালগটি চশমা নির্মাতাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় বস্তুতে পরিণত হয়েছে।

কার্ল জেইস বাহাত্তর বছর বয়সে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। আর্নেস্ট অ্যাবে মারা যান ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে।

গত শতকের শেষদিকে আর্নেস্ট অ্যাবে যখন জেইস ফার্মের প্রধান পরিচালক হন, তখন তিনি এই ফার্মটির নাম পরিবর্তন করে করে 'কার্ল জেইস ফাউণ্ডেশন' রাখেন এবং কর্মচারীদের নানা সুযোগ-সুবিধা করে দেন, এমন কি তিনি তাদের কারখানা পরিচালনার সহযোগিতায় করার ও লাভের ন্যায্য অংশীদার হওয়ার সুযোগ দেন।

● জেইস অণুবীক্ষণ যন্ত্র

[লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অফ আর্টস-এর কর্ম-পরিষদের সম্প্রতি অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে বাঙলার শিক্ষাব্রতিনী শ্রীমতী মীরা গুহ উক্ত প্রতিষ্ঠানের সদস্যা নির্বাচিতা হইয়াছেন। বর্তমানে শ্রীমতী গুহ ইংল্যাণ্ডে অধ্যয়নে নিরতা আছেন। কলিকাতার প্রখ্যাত চিকিৎসক মেজর পি, কে, গুহের কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী গুহ ভারতে মন্তেসরি পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা প্রচলন ও তৎসংক্রান্ত পাঠ্য নির্বাচন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্যে সমগ্র মহাদেশ পরিভ্রমণ করেন। মন্তেসরি শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র এ্যামস্টার্ডাম, হেডেলবার্গ, হেগ, বার্ন, প্যারিস প্রভৃতি নগরসমূহ পরিদর্শন করেন।

লণ্ডন সোসাইটি অফ এডুকেশান থ্রু আর্টস-এর ও দ্য ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ এ্যাডাল্ট এডুকেশান অফ ইংল্যাণ্ড এ্যাণ্ড ওয়েলস এবং অক্সফার্ডের এসোসিয়েশান অফ টিচার্স ইন ডোমেস্টিক সায়েন্স-এরও তিনি অন্যতমা সভ্যা। শ্রীমতী গুহ সম্ভবত আগামী বৎসর ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবেন। বাঙ্গালী মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সদস্যা নির্বাচিতা হইলেন।—স।]

আলোর দেশে

মীরা গুহ

প্যারিস সহরে

শিক্ষাকেই কেন্দ্র কোরে যখন ভবিষ্যতের জীবন গড়ে তুলতে হবে ঠিক কোরলাম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষাই যখন আমাদের দেশের সমাজ-জীবনের সর্বোচ্চ মানদণ্ড, তখন শেষটাতে বাঙ্গালী মেয়ে হোয়েও পাড়ি দিতে হলো সমুদ্রপারে পাশ্চাত্য শিক্ষার পুণ্যতীর্থ অক্সফোর্ডে। পড়াশুনা নিয়মমতো চলতে লাগলো বটে, কিন্তু গতানুগতিক জীবনে এই ছোট্ট সহরটিতে পাশ্চাত্য জীবনের বিচিত্রময় সভ্যতার সঙ্গে পরিচয় হোতে লাগলো খুব কমই। তাই শেষটাতে বেরিয়ে পড়লাম ইউরোপ পরিক্রমায় এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার চরম কেন্দ্র প্যারিস সহরে। প্যারিস যাবার পথে অবশ্য আরও অনেক কয়টিই সভ্যতার কেন্দ্রভূমি পরিদর্শন কোরেছিলাম, তার মধ্যে অবশ্য শিক্ষা প্রসঙ্গত উল্লেযোগ্য হচ্ছে, স্বর্গত ডাঃ ম্যারিয়া মন্তেসরীর কর্মক্ষেত্র ও আন্তর্জাতিক কার্যালয়, আমস্টারডাম, প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় হাইডেলবার্গ, বাণিজ্য ও কারিগরী শিক্ষার আন্তর্জাতিক কেন্দ্র বার্ন ও হেগ সহর।
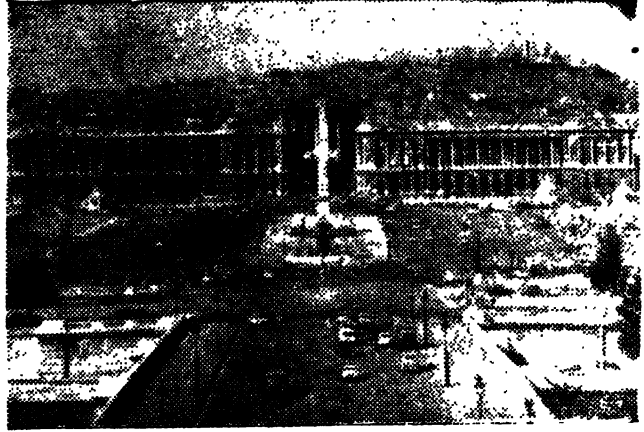
যদিও প্যারিসে আন্তর্জাতিক শিক্ষাকেন্দ্র অনেক ক'টিই আছে এবং UNESCO কার্যালয়ও প্যারিসেই, কিন্তু প্যারিসে যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল আমার পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত হতে, শিক্ষা প্রসঙ্গে নয়।

প্যারিস সহরকে আলোর দেশ বোললে অত্যুক্তি করা হবে না। ছোট বয়সে একটা বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে "আলো" পত্রিকার সম্পাদনা কোরেছিলাম মনে পড়ে, তাই আজ আলোর দেশের বর্ণনা কোরতে যৌবনের লেখনী যেন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তাই আলোর দেশ বর্ণনা কোরতে হয়তো লেখিকার খানিকটা প্রগলভতার বিকাশ হতে পারে, কিন্তু সেটা ক্ষমার্হ।

সহরটি দিনের আলোতে যেন নিঝুম—অন্যান্য ইউরোপের সহরের মতো লোকজন যার নিজ নিজ কাজে; রাস্তায় দেখা যায় সেই মান্ধাতার যুগের ঝরঝরে বাসগুলি—ট্রামের মতো বিরাট বপু নিয়ে রাস্তা জুড়ে চলেছে। পথে অন্ধ ভিখারীও দেখা যাচ্ছে আর মুচিও দাঁড়িয়ে আছে জুতা পরিষ্কার কোরতে; আর বড় বড় রাস্তাগুলির মাঝে মাঝে সুড়ঙ্গের ভিতর লোক চলে যাচ্ছে, তাদের মেট্রো টিউব ভূমধ্যস্থ রেলপথে সহরের বিভিন্ন জায়গায়; রাজপথের (boulevard) একদিকে হয়তো বড় বড় হোটেল আর অন্যদিকে অপেরা।

বেশ খানিকটা নিরাশ হয়ে গেলাম তাই দিনের আলোতে প্যারিস সহরে এসে। বিদেশীর সমালোচনাকারী চক্ষে প্যারিসের উচ্চপ্রশংসিত জাঁকজমকের আর বাহবা দেবার কিছু খুঁজে পেলাম না। মনে হলো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্যারিসের সঙ্গে ব্রাসেলস্, হেগ বা বার্নের কোন বিশেষ পার্থক্যই নেই। এই বলা যায়, সহরটা একটু বড়ো—সীন নদীর উভয় ধারে অনেক দূর বিছিয়ে। কিন্তু সহরের আয়তনই যদি সব কিছু, তবে তো লণ্ডন সহর অনেক বড়ো। এতদূর প্যারিসে আসার কি ছিল ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে? অক্সফোর্ড থেকে তো লণ্ডন মাত্র ৬০ মাইল, মাত্র ১৭ শিলিং ৬ পেন্সে যাতায়াত করা যায় ট্রেনে এবং কোচে তারও অর্ধেক ভাড়ায়। নিরাশ হয়ে Montmarte-র হোটেলে ফিরে এলাম।

হোটেলখানি কিন্তু বেশ—যেমন আলোর আর রং বেরং-এর পর্দা আবার সেই

লেখিকা

রকম সুন্দর খাবার হল, বড় বড় আয়না দেওয়া দেওয়াল আর পাশ্চাত্য কৃষ্টির নকল অনুযায়ে ঘর সাজানো—মেয়েদের জন্য Be-day-basin-bath-bed;

আর কার্পেট, টেবিলক্লোথ দেওয়া চকগুলির মধ্যে সুন্দর সুন্দর ফার্নিচার—থাক।

সারাদিন বসে শুয়ে হোটেলে কাটালাম আর ডাইনিং হলে মজা দেখলাম—স্যাম্পেনের ছড়াছড়ি; আর সুন্দর সুন্দর পোষাক পরা ছোকরা বেয়ারাগুলো দেখি যুবতী ধন্দেরদের ঠাট্টা-তামাসা কোরছে, খাবার সার্ভ করার মাঝে মাঝে—খানিকক্ষণ কষ্টি-নষ্টি কোরছে আবার কাজ কোরছে, কিন্তু সেই টেবিলে অন্যান্য প্রবীণ মহিলা বা অন্য কারুর ভ্রূক্ষেপও নেই। আমার কৃষ্টির দৃষ্টিভঙ্গীতে একটু কেমন দৃষ্টিকটু লাগতে লাগল—বেয়ারার সঙ্গে ভদ্রমহিলাদের হাসি-ঠাট্টা? কিন্তু দেখলাম, এদেশে সেটা কেউ কিছু মনে করে না এবং অবশেষে একটি যুবতীকে একজন বেয়ারা Lidoতে নৃত্যে নিমন্ত্রণ করলো সেই রাত্রেই—

রাত্রি প্রায় ৯টার সময় হোটেল থেকে শহর দেখতে বেরুলাম। বাস্তবিকই রাত্রের প্যারিস যেন এক স্বপ্নপুরী। আধুনিক প্যারিসের দ্রষ্টব্য হচ্ছে নেপোলিয়নের কবরস্থান, বিজয় তোরণ ও তার নীচে অজ্ঞাত সৈনিকের কবর, আইফেল স্তম্ভ (Eiffel Tower), কনকর্ড স্কোয়ার, Louvre Art Gallery ও Notre-Dome Cathedral ও নিশার স্বপ্নের মতো রাজপথ Avenue Champdes Elysse এবং বিজলীর লাল-নীল আভা দিয়ে ফলিয়ে তোলা ফোয়ারার রাশি—একটার পর একটা একই জায়গায় গুচ্ছ করা—দেখে মনে হবে যেন পাতালপুরীতে সাপের দেশে স্বপ্নে দেখা পরীর রাজ্য—

প্যারিসে Louvre Art Gallery-তে লেখিকা

সত্যিই এই সেই Champ de Elysse (সাঁ এলিসি) রাজপথ যা ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর পরীরাণী Marie Antoinette-এর বিলাস-পথ এবং এরই গায়ে সূর্য-রাজ (Sun-King) চতুর্দশ লুই-এর রাজপ্রাসাদ ছিল। আবার এই পথ দিয়েই সেই বিলাসিনী রাণী Marie Antoinette বধ্যভূমিতে কাঁদতে কাঁদতে গিয়েছিল French Revolution-এর সময়। সেই হাসি ও কান্নায় তৈরী আলোর খেলার মাঝে Avenue de Champe Elysse দেখে মনে পুলক জেগে উঠলো। সেখান থেকে আলোর রং খেলার ধুম দেখলাম সেই ফোয়ারার স্তম্ভ-নিচয়ে। দূরে আকাশ-ভেদী Eiffel Tower আলোর মালা পরে অন্ধকার আকাশে বিজয়-তোরণ পাহারা দিচ্ছে।

প্যারিস শহরে রাত্রির আলোর খেলা আরো বিশদভাবে উপলব্ধি কোরতে হবে শহরের মাঝখান দিয়ে যে সীন নদী গিয়েছে তাতে river cruise করা উচিত। বন্দোবস্তও করা হল একজন গাইড নিয়ে। কিন্তু সে তো অনেক রাত্রে—তাই তার আগে ঘুরে ফিরে দ্রষ্টব্য জায়গাগুলি দেখে নিলাম আর একবার যেমন—Opera House, Concorde Square, Arch of Triumph, Bois de Boulogne, Palace of Chaillot, Dome of invalides, Tuilleries Gardens, Louvre, Palace of Justice, Latin Quarters, Notre-Dame, City Hall and Bastille Square.

যখন গাড়ী কোরে এইসব দেখে সীন নদীর ধারে Seinorama কোনওতে কাচ দিয়ে সমস্ত উপরটা বন্ধ এক মোটর-লঞ্চে চাপলাম তখন রাত্রি দেড়টা।

মটর-লঞ্চে বসে আছি আর গাইড মাইক্রোফনের ভিতর বোলে যাচ্ছে—প্রথমে দুইদিকের আলোর আলোকিত দৃশ্যাবলী ও ঐতিহাসিকপূর্ণ নিদর্শনগুলি বুঝিয়ে যেতে লাগলো এবং যেমন যেমন এক একটি পুলের নীচ দিয়ে লঞ্চখানা যেতে লাগলো সেগুলির কথা বুঝিয়ে দিল।

পূর্ব ও পশ্চিম প্যারিসের সংযোগ রক্ষাকারী ৩৪ সমস্ত পুল সীন নদীর উপর তৈরি, তাদের

প্যারিসের বিখ্যাত সাঁ এলিসি রাজপথ

অধিকাংশেরই এক একটা ইতিহাস আছে। অবশ্য এই পুলগুলির মধ্যে সর্বপুরাতন পুলটি তৈরি হয়েছে চতুর্থ হেনরীর সময়। নেপোলিয়ন তাঁর বিজয় উৎসবের জন্য তৈরি কোরেছিলেন St. Michael's bridge. আলেকাণ্ডার পুলের গায়ে বড় বড় Coat of Arms পাথরের গায়ে খোদিত দেখে মনে হয় এটিও একটা বিজয়-স্মৃতি পুল এবং একটি পুলে অনেকগুলি মানুষের মাথা আঁকা দেখা গেল।

মটর-লঞ্চ কোরে এগিয়ে যেতে যেতে তীরের আলোর দেশের সুন্দর দৃশ্য দেখে স্তম্ভিত হোতে হয়। Notre Dame মহাকার আলোয় সাজানো উপাসনাগৃহ দেখে সখ হলো, দিনের বেলায় দেখতে হবে।

আস্তে আস্তে মটর-লঞ্চখানা দুইটি নদীর উপর দ্বীপের পাশ দিয়ে চলে গেল। এরাও প্যারিসের City Islands. একটির নাম St. Louis Island. এখানে প্রেমিক-প্রেমিকার সমাবেশ হয়। অপরটি হল আর্টিস্টদের দ্বীপ। তখনকার কালে নাকি বড় বড় Artist-রা সকলের সঙ্গে সহরে বাস করতেন না। এই ঝিরিঝিরি আভিজাত্যপূর্ণ দ্বীপে ছিলো তাঁদের বাড়ি।

পরের দিন উঠতে বেশ দেরী হয়ে গেল এবং একবারে দ্বিপ্রহরের খাওয়া সেরে বেরুলাম প্রথমে Academy of Music Opera House দেখে, Notre Dame Cathedral-এ। এই বিরাট উপাসনা হলটিতে সাড়াশ শত লোকের একসঙ্গে বসে পূজা করার ব্যবস্থা আছে। হলের গম্বুজের ভিতর দিকে বিরাট বিরাট কাচের রং-বেরং-এ কারুকার্য দেখে আশ্চর্য লাগলো এবং দেওয়াল-গুলিতে কাঠের কাজ করা দেখলাম। উপাসনা ঘরের পেছনে পূজারীদের কবরস্থান এবং তার উপর প্রস্তরের মূর্তি, সব ইতিহাস বোলে যাচ্ছে। ভিতরে একটি ফলকে দেখলাম প্রথমেই ভারতের নাম ও তার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত মিত্র দেশগুলির নাম লেখা আছে।

প্যারিস সহরে আরও কয়েকদিন কেটে গেল। সহরটি বেশ ভালই লেগেছিলো। একদিন ডুলিতে কোরে উঠেছিলাম Eiffel Tower-এর উপর। সেখান থেকে সহরটা যে কত বড় ও কেমন সাজানো তার পরিচয় পেয়েছিলাম।

কিন্তু আলোর দেশের আর এক পরিচয় পেয়েছিলাম প্যারিসের নিশা জীবনে ধূমায়িত Latin Quarters Club-এ এক উৎসবে গিয়ে। সে এক কি বীভৎস দৃশ্য উৎসবের মধ্যে সকলে বসে বসে যত পারে শ্যাম্পেন খেয়ে যাচ্ছে—টিকিটের মধ্যে মদের দাম ধরা। সুতরাং খাও আর না খাও যত ইচ্ছা খাও, পয়সা সেই একই লাগবে। সে এক অদ্ভুত ধরণের অর্ধউলঙ্গ তাণ্ডব নাচ—এবং নাচতে নাচতে দর্শকদের সেই অর্ধউলঙ্গ যুবতীরা টেনে নিয়ে যাচ্ছে—সারা রাত্রিই এই নাচ চলে এবং যার যতটুকু থাকার ইচ্ছা থাকে—

প্যারিসের ধনী সম্প্রদায়ের উচ্চ সামাজিক নাচের কেন্দ্র, Moulin Rouge-এ গিয়ে জল পরীদের উলঙ্গ নাচ দেখলে প্যারিসের নিশা-জীবনের খানিকটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। এই বিস্তৃত নাট্যশালায় বহু লোকে পরিবার ও বন্ধুজন-পরিবৃত হয়ে নাচ দেখে ও নাচে এবং সেই সঙ্গে শ্যাম্পেনের চলাচলি ও শতাধিক উলঙ্গ যুবতীর নৃত্য ও রং-বেরং-এর ফ্যাসান প্যারেড দেখলেই পাশ্চাত্য সভ্যতার আধুনিকতার মধ্যে প্যারিস সহরের নৈশ-জীবনের অভিজ্ঞতা হয়।

অনেক, অনেকদিন আগে এক 'নাইট' ছিলেন। তিনি দেখতে খুব সুন্দর। ঘোড়সওয়ার হিসাবেও তিনি ছিলেন সেরা। চেহারাটা তাঁর নদীর ধারের শক্ত সোজা 'বার্চ' গাছের মতো।

তিনি খুব সাহসী আর দয়ালু ছিলেন। তাঁর ঘোড়ার গলার কেশর সোনালী। সেই গলাটা জড়িয়ে ধরে তিনি হু-হু করে ছুটে চল'তেন। কখনও খুব সরু রাস্তায়, কখনও চওড়া সড়কের মাঝখান দিয়ে। দিনেও যেতেন। রাতেও যেতেন। বিপদে পড়ে লোক সাহায্য চাইতে এলে তিনি দুষ্ট লোককে শাসন করে দিতেন। সকলকেই বিপদ থেকে উদ্ধার করতেন।

সকলের ওপর তাঁর সমান দয়া ছিল। জীবজন্তু, মানুষ এমন কি প্রাকৃতিক বস্তুকেও তিনি ভালবাসতেন। তাঁর ঘোড়া জোরে দৌড়তো, কিন্তু কখনও একটি ফুলের পাপড়ি পা দিয়ে নষ্ট করে নি। সবাই তাঁকে ভালবাসতো।

নাইট একদিন পাহাড়ের ওপরে ঘোড়ায় চড়ে ঘুরছেন। হঠাৎ চোখে পড়লো চকচকে একটা ছোট্ট সরোবর। তিনি জলের কাছে এলেন, কাচের মতো স্বচ্ছ জলে দেখলেন একটি মেয়ে। পরীর মতো সুন্দর।

চোখ দু'টি রাতের প্রদীপের মতো স্নিগ্ধ। চুল যেন সমুদ্র-তরঙ্গের ওপর একঝলক আগুন। শ্বেতপাথরের বারান্দায় মেয়েটি বসে আছে। হাতে সেলাই। সে এত সুন্দর যে, কল্পনাও যেন হার মেনে যায়।

কে এই মেয়েটি? এ কি জল-পরীদের কেউ? এরা কি জলের তলায় থাকে? বাস করে কি স্ফটিকের প্রাসাদে?

নাইট ঘোড়া ছোটালেন। মেয়েটির কাছে যাবার আকাঙ্ক্ষা আর বাধা

আভেতিখ ইসাহাকিয়ান

মানছে না। তার কাছে যাবার জন্য শেষে জলে ঝাঁপ দিলেন। কয়েক-মুহূর্ত চলে গেল। ঘোড়াটা জলের ওপর দিয়ে সাঁতার কেটে চলেছে। নাইট জলের তলায় ডুব দিলেন। কিন্তু কোথায় প্রাসাদ? জলের তলায় সে সব কিছুই নেই।

তীরে ফিরে এসে নাইট বিষণ্ণ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। জলের আলোড়ন থেমে গেল। জল আবার কাচের মতো স্বচ্ছ হোল। এবার কিন্তু শুধু দূরপাহাড়ের ছায়া, মাথায় সাদা টুপি। আর নীল আকাশের প্রতিবিম্ব।

নাইট বুঝলেন স্বপ্নালোক থেকে সূর্যরশ্মি দিয়ে কোন জাইনী ঐ মেয়েটির ছবি তৈরী করেছিল। আর তিনি তারই প্রতিবিম্ব জলে দেখেছিলেন।

কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে সত্যি-কারের সেই মেয়েটিকে। কেমন করেই বা তাকে খোঁজা যায়? - - - - -

এখন তিনি আর জলের দিকে তাকাচ্ছিলেন না, নিজের মনে স্বপ্নময় সেই মূর্তি একেবারে যেন গেঁথে গেছে।

দিনে-রাতে স্বস্তি নেই, ঘুম নেই। মনের এই অবস্থায় নাইট ঘোড়ার গলাটা আঁকড়ে ধরে শুধু ছুটে চলেছেন। আর শুধু খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেই মেয়েটিকে। খুঁজছেন। অনেক খুঁজেছেন। কিন্তু সবই বৃথা।

এই রকম করে খুঁজতে খুঁজতে একদিন তিনি একটা ঝরনার ধারে এসে পড়লেন। হাতের ওপর মাথাটা রেখে বসেছেন। মনটা খুবই খারাপ।

কাঁদছো কেন যুবক—ঢেউগুলো জিজ্ঞেস করলো। তোমার বাবাকে কি ক্রীতদাস ক'রে ধরে নিয়ে গেছে? না কি তোমার মা অসুস্থ?

আমাকে জিজ্ঞেস কোর না। তোমাদেরই মতো দামী পাথরে আমি ছায়া দেখেছি। কিন্তু তাকে আর খুঁজে পাচ্ছি না।

ঢেউগুলো ফিসফিস করে ব'ললো,

আমরা তো নতুন এসেছি। তবে পাড়ের ঐ ফুলগুলো ব'লতে পারে। তারা তো সব সময় এখানেই আছে। তারা দেখে থাকতেও পারে।

মিষ্টি ফুলেরা, তোমাদেরই মতো সুন্দর একটি মেয়ে ; তার ছবি আমার মনে আঁকা রয়েছে। তোমরা কি কেউ দেখেছো তাকে ?

আহা ! আমরাও দেখি নি। চাতক পাখীকে জিজ্ঞেস কর। সে তো অনেক উঁচুতে উড়ে বেড়ায়। হয়ত, মেয়েটিকে দেখেও থাকতে পারে ওপর থেকে—চুপি চুপি বললো সুন্দর ফুলগুলো।

পাখী, পাখী, সোনালী পাখার ছোট্ট পাখী, বলতে পারো সে মেয়েটি কোথায়—যার রূপে সব সময় আমার বুক ভ'রে র'য়েছে।

চাতক উত্তর দিল : আহা বাছা রে। কিন্তু আমি তো শুধু সূর্যকেই দেখি। আর কোনদিকে চোখ দেবার তো সময় নেই। তুমি বরং বাতাসকে জিজ্ঞেস কর। সে তো অনেক অনেক দূর থেকে আসে, সে জানলেও জানতে পারে।

নাইট অমনি বাতাসকে ডেকে বললো : ভাই বাতাস, তুমি তো অনেক দূরের পথিক। তুমি কি কোথাও দেখেছ সেই সুন্দর মেয়েটিকে ? তার ভাবনায় আমার বুক যে ভরে রয়েছে। মনটা যেন টুকরো টুকরো হ'য়ে যাচ্ছে।

বেচারা ! বাতাস উত্তর দিল। হ্যাঁ, আমি তাকে দেখেছি। অ-নে-ক, অনেক দূরে সাগরের ঐ ওপারে শ্বেতপাথরের বারান্দায় ব'সে একমনে সে সেলাই ক'রছিল। আরও শোন-আমি শুনেছি তার চাপা দীর্ঘশ্বাস। তোমারই জন্য। তার বুকে তোমারই ছবি আঁকা রয়েছে। যাও, সে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।

নাইট তক্ষুণি ঘোড়া ছোটালেন। তীরের মতো যেন উড়ে চ'ললেন। আশা-আকাঙ্ক্ষায় অধীর। সাতদিন ধরে পার হ'লেন কত প্রান্তর, পার হ'লেন সাত সাগর। তারপর একদিন সবে যখন ঊষা পূর্বদিকের আকাশটাকে রাঙিয়ে দিচ্ছে, সেই লালের ছটা লেগেছে মেঘে, লেগেছে পাহাড়ের চূড়োয়—সেই সময়ে নাইট দেখতে পেলেন শ্বেতপাথরের ঝক্‌ঝকে একটা প্রাসাদ।

মোটা শক্ত থাম দিয়ে বাড়ীটা ঘেরা। তিনি প্রাসাদের চারদিকটাই ঘুরে দেখলেন। দেখলেন, শুধু একটা দরজা আছে ইস্পাতের তৈরী। সেটা আবার ভেতর থেকে বন্ধ।

নাইট পাগলের মতো ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন থামগুলোর ওপর দিয়ে। ঘোড়াটা ওপর দিয়ে উড়ে গিয়ে নামলো সদর দরজার একেবারে সামনে।

দরজার ঠিক সামনে শক্ত শেকল দিয়ে বাঁধা রয়েছে একদিকে একটা বিরাট বড় ভেড়া, আর একদিকে একটা ভীষণ নেকড়ে বাঘ। নেকড়েটার মুখের কাছে আছে একগোছা ঘাস কিন্তু ভেড়াটার সামনে র'য়েছে মাংসের টুকরো।

দুটোই প্রাণপণে চীৎকার করছে—ক্ষিধেয় পাগল, ঐ দুটোর মাঝখান দিয়ে কে ওদিকে যাবে ? যেতে গেলেই একমুহূর্তে ছিঁড়ে খাবে।

নাইট বর্শা দিয়ে মাংসের টুকরো নেকড়ের সামনে আর ঘাসগুলো ভেড়াটার দিকে সরিয়ে দিলেন। তারা কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে নাইটের দিকে একবার তাকালো। তারপর পথ ছেড়ে দিল। নাইট একনিঃশ্বাসে শ্বেতপাথরের সিঁড়িটার কাছে ছুটে গেলেন, তারপর তরতর করে সুন্দর প্রাসাদের ওপরে উঠলেন।

বাড়ীটা খাঁ খাঁ করছে। ঘরের পর ঘর পার হ'য়ে তিনি পৌঁছলেন একটা দরজার সামনে। দরজাটা হাতীর দাঁতের। সেটা খুলে তিনি কি দেখলেন। ঘরের ভেতর বসে আছে সেই মেয়েটি। রূপ যেন ঝ'রে পড়ছে। তাঁর এতদিনের খোঁজা আজ শেষ হল। মেয়েটি বসে আছে একটা চেয়ারে। কাঁদছে। মুখ নীচু করা। আগুন-লাগা সমুদ্রের রং-এর চুলগুলো এদিক-ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে। নাইট এগিয়ে গেলেন। মাথা থেকে হেল্‌মেট্ খুলে ফেললেন। তরোয়ালটা মেয়েটির পায়ের কাছে নামিয়ে শান্তভাবে তার সামনে দাঁড়ালেন।

—এ কি ! এ কেমন যাদুর খেলা। তুমি কি আমার স্বপ্নে-দেখা সেই নাইট ? হ্যাঁ, তুমিই তো সেই।

মেয়েটি যেন গান গেয়ে উঠলো—কতক্ষণ এসেছ তুমি ? এখানে তো বাতাসও আসতে পারে না। পাখীরা পর্যন্ত ঐ উঁচু থামগুলো পার হ'তে পারে না। তাদের তো তবু পাখা আছে। তুমি কেমন ক'রে এলে ?

—তোমার ভালবাসাই আমাকে পাখা দিয়েছে। তোমাকে পাবার ইচ্ছা আমাকে দিয়েছে শক্তি। আমি অপেক্ষা করছি তোমার আদেশের। বল, কি ক'রতে হবে।

—কিন্তু তুমি কোথায় আমাকে দেখলে যে এমন ক'রে ভালবাসলে আমায় ?

—আমি তোমাকে দেখেছি আমার নিজের অন্তরে। তোমাকে দেখেছি আকাশে। দেখেছি মাটিতে। অনেক, অনেকদিন ধরে, তোমাকে ভালবাসছি। তোমাকে ছাড়া জীবনটা শূন্য হ'য়ে ছিল।

—তুমি যদি সত্যিই আমাকে ভালবেসে থাকো তা'হলে এখান থেকে আমাকে এক্ষুণি নিয়ে চল। আমি তোমার জন্য অ-নে-ক দিন থেকে অপেক্ষা করছি। বলতে বলতে মেয়েটির মুখখানা রাঙা গোলাপের মতো লাল হ'য়ে উঠলো।

—কিন্তু তুমি এখানে কি করছো ? এতবড় বাড়ীটায় একেবারে একা। আর কাঁদছোই বা কেন ?

—তুমি কি জানো না, আমার বাবা এদেশের জমিদার। তিনি এই

জায়গাটা চারদিক থেকে বন্ধ করে আমাকে শাস্তি দিয়েছেন। ভয়ানক জন্তুগুলো পাহারা দিচ্ছে। বোবা পরিচারিকার দল এখানে রাখা হ'য়েছে, আমি যে বাবার কথা শুনি নি। বদমাইস রাজাটার অধীনে আমার বাবা। আর বাবা ঐ খারাপ লোকটার সঙ্গেই আমার বিয়ে দেবার কথা দিয়েছেন। বাপ-মা কি নিষ্ঠুর! আজই শেষ দিন। ঐ পাজী রাজাটা বাবাকে নিয়ে আজ এখানে আসবে। জোর করে নিয়ে যাবে আমায়। তুমি আমাকে ফেলে চ'লে গেলে আমি ঠিক মরে যাবো।

নাইট মেয়েটির চোখের জল মুছিয়ে দিলেন। হাতটা তুলে নিয়ে আদর ক'রলেন। এরপর দু'জনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। নেকড়ে আর ভেড়াটা শান্তভাবে পথ ছেড়ে দিল। পরিচারিকারা হতভম্ব হ'য়ে ওদের দু'জনকে দেখতে লাগলো। নাইট লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়লেন। পরম আদরে মেয়েটিকে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে নিলেন - - - - এইবার ঘোড়া উড়ে চ'ললো। উড়ে চললো পাহাড়ের ওপর দিয়ে, সাগর ডিঙ্গিয়ে, অনেক অনেক মাঠ পার হ'য়ে, কত নদী-উপত্যকা পেরিয়ে।

ততক্ষণে সেই রাজা প্রাসাদে ঢুকেছেন মেয়ের বাবাকে সঙ্গে নিয়ে। ঢুকেছে অনেক লোক-লস্কর, সৈন্য-সামন্ত। ঐ বিরাট লটবহর নিয়ে রাজা কত খুঁজছেন। কিন্তু প্রাসাদের কোথাও মেয়েটির দেখা পেলেন না। পরিচারিকার দল তো একেবারে বোবা। কোন খবরই জানা গেল না। তখন রাজা রেগে দলবল নিয়ে প্রাসাদ ছেড়ে চলে গেলেন। খুঁজতে লাগলেন পাহাড়, উপত্যকা সব। যত পথিকের সঙ্গে দেখা হ'ল, আর যত গাড়ী সে রাস্তা দিয়ে গেল—সবাই-এর কাছে খোঁজ নেওয়া হ'ল মেয়েটির। কিন্তু কেউ কোন খবর দিতে পারলো না।

নদী, জল—মেয়েটির বাবা নদীকে জিজ্ঞেস ক'রলেন—তোমরা কি দেখেছো আমার মেয়েকে? যদি বল তোমার ওপর দিয়ে সে গিয়েছে, তা'হলে তোমার কোমরে সোনার সেতু বেঁধে দেবো।

ঐ নদীটির ওপর দিয়েই নাইট মেয়েটিকে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু নদী সে কথা বলতে চাইলো না।

আমরা নতুন এসেছি। আমরা কিছু দেখি নি। তুমি বরং পাড়ের ফুলগুলোকে জিজ্ঞেস কর। ওরা তো সব সময়েই এখানে আছে---ঢেউগুলো নিঃশ্বাস ফেলে বললো।

ফুলেরা, আমার মেয়েকে দেখ নি? সে কি তোমাদের কাছ দিয়ে যায় নি? যদি ঠিক করে বল তা'হলে তোমাদের ডাঁটিতে চুণীর মাকড়ি পরিয়ে দেবো।

ফুলগুলো দেখেছিলো। কিন্তু সত্যিকথাটা বলতে তাদের ইচ্ছে হ'ল না।

আমরা শুধু এখান দিয়ে চাতক পাখী উড়ে যেতে দেখেছি। কিন্তু কই আর তো কিছু দেখি নি।

চাতকের দিকে ফিরে মেয়েটির বাবা বললেন, চাতক পাখী তুমি আমার মেয়েকে দেখো নি? তোমার পাশ দিয়ে সে যায় নি? সত্যি বল। আমি তোমায় ঘাসপাতার বাসার বদলে রেশমের বাসা ক'রে দেবো।

চাতকও দেখেছিলো। কিন্তু কোন জবাব দিলো না। ফুরুৎ ক'রে উড়ে গেল—সূর্যের আলোর ভেতরে।

এই রকম ক'রে তাঁরা অনেক অনেক খুঁজলেন। মনে হ'ল, সবই বৃথা। শেষে রাজা আর মেয়েটির বাপ নিরাশ হ'য়ে বাড়ী ফিরে গেলেন।

অনুবাদিকা—রত্না গঙ্গোপাধ্যায়

বিপ্রলব্ধ

সলিল মিত্র

রজনীগন্ধা হারালো গন্ধ তার—
চাঁদের জ্যোছনা ক্রমে হয়ে এল ম্লান,
রাতজাগা পাখী ডেকে গেল বারবার,
আমি বিনিদ্র, উৎকণ্ঠিত প্রাণ!

খোলা বাতায়ন, পথ পানে চেয়ে থাকি—
আলোছায়া-পথে পথিক এলো কি তবে?
দ্বারের প্রান্তে প্রদীপ জ্বালিয়া রাখি—
ছায়া যেন কার? হয়তো-বা সেই হবে!
দেখি বারবার, না-না সে নয়কো নয়—
মনের ভ্রান্তি—আসেনি সে অভিসারে
ভেঙে যেতে চায় জীবনের প্রত্যয়
অশ্রুবন্যা রাতের অন্ধকারে।

এলো না পথিক—দীপ নিভে গেল রাতে—
ব্যর্থ প্রেমের অশ্রুর বন্যাতে।

সামান্য

মীনু সেনগুপ্ত

রঙিন হতে চাইনি আমি
চেয়েছিনু ঝরণা হতে,
হৃদয়ের কত না সুর
রইল পড়ে ম্লান আলোতে।
মুক্তো হতে চাইনি আমি,
চেয়েছিনু ঝিনুক হতে।
কবি হতে চাইনি আমি.
চেয়েছিনু ছন্দ হতে।
জমিয়ে রাখা অনেক ভাষা,
জ্বালিয়ে দিলে অবহেলে।
আলোয় ধোয়া শপথ তোমার
ছড়িয়ে দিলে ধুলার তলে।

চন্দেল্ল স্মৃতি ॥

॥ এগারো ॥

শতাধিক বছর ধরে শ্রান্তিহীন পরিশ্রম করে শত শত স্থপতি আর ভাস্কর যে অক্ষয় সৃষ্টি করে গেছে,—মাত্র একদিনে তা দেখা যায় না। কিন্তু পর্যটকের হাতে সময় নেই। ঐ একদিনই, বড়ো জোর না হয় আর দু-তিন দিন। সময় যদি থাকত তাহলে খাজুরাহো মন্দিরের যে-কোনো একটি মূর্তির দিকে তাকিয়ে দিনের পর দিন, বছরের পর বছর কাটিয়ে দিতে পারত সে।

শিল্পীও বোধ হয় চায় না। সে চায় না একটি দর্শকের সহস্র দিনের বিহ্বলতা। সহস্র দর্শকের কাছে একটি করে মুহূর্ত সে চায়,—সে মুহূর্তটুকু একান্তভাবে তার সৃষ্টির প্রতি নিবেদিত হলেই হোলো। তাজমহলের শিল্পী একক প্রেমিক শাজাহানের বিরহ-ব্যাকুলতার জন্যে মমতাজ-স্মৃতি গড়ে নি। অনন্তকালের অসংখ্য প্রেমিক বিরহ-মিলনের কোমল ভাবনা নিয়ে আসুক, প্রতিটি প্রেমিক অন্তত এক মিনিটও তার সৃষ্টির প্রতি চোখ ভরে তাকাক, তাহলেই যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথের একটি পাঁচ মিনিটের গান আমি আমার ভাঙা গলায় আর ভুল সুরে লক্ষবার গেয়েছি, কিন্তু সেই গান আরো লক্ষ লোকে গেয়েছে, আর লক্ষ লোকে শুনেছে, তাই সেই গান জাতীয় সঙ্গীত।

আমাদের হাতে সময় কম, খারের হাতে সময় আরো অল্প। সে আজ একটি বেলা আমাদের পুরোপুরি দিয়েছে। কাল হয়তো আমাদের সঙ্গে এক মিনিট কথা বলারও সময় পাবে না। তাই পড়ন্ত বেলায় সে হনুমান মন্দিরের কাছে এসে টাঙ্গাকে দ্বিতীয় রাস্তায় মোড় ঘুরতে বলল।

আদিত্যকুমার খারে সুকুমার-দর্শন ভদ্রলোক,—বয়স বছর ত্রিশ। প্রত্নতাত্ত্বিক বা ঐতিহাসিক নয়,—সার্কিট হাউসের কেয়ারটেকার মাত্র। টুরিস্ট বাংলোর রক্ষণাবেক্ষণও ডিউটির অন্তর্ভুক্ত। দেশ-বিদেশের খানদানী টুরিস্টরা সার্কিট হাউসে এসে ওঠেন, ভি-আই-পি'রা এলে তাঁরা-তাঁরা পড়ে যায়। এই সমস্ত নামী অতিথিদের সুখ-সুবিধের দেখা, পান থেকে চুনটুকু যাতে না খসে—সেদিকে নজর রাখা খারের কাজ। তার সঙ্গে খাজুরাহোর মন্দির মিউজিয়ম স্থাপত্য-ভাস্কর্যের কোনো সম্পর্ক নেই। সে সরকারী খাস হোটেলের ম্যানেজার, এ হোটেল খাজুরাহোতে না হয়ে নয়াদিল্লীতে হোলে হয়তো তার চাকরির উন্নতি হোতো।

কিন্তু খারের মন-প্রাণের সঙ্গে জড়িয়ে আছে খাজুরাহো। এই বুন্দেলখণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে,—লেখাপড়া ছত্রপুর আর নওগাঁয়েই সে করেছে। সেটা অবশ্য বেশিদূর এগোয় নি। বোম্বাই গিয়েছিল কি এক টেকনিক্যাল ট্রেনিং-এর জন্যে,—সে ট্রেনিংও বেশি-

॥ নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ॥

দিন এগোয় নি। আবার ফিরে এসেছিল দেশে, পূর্তবিভাগে সামান্য চাকরি নিয়ে কর্ম-জীবন শুরু করেছিল অল্পবয়সে।

১৯৫৩ সালে খাজুরাহোতে বদলী। রাস্তা-ঘাট বানানো আর মন্দির-চৌহদ্দি পরিষ্কার রাখার কাজ। তারপর এই সার্কিট হাউস খবরদারির কাজে পদবৃদ্ধি। যৌবনের শুরু থেকে দশ-বারো বছর এই খাজুরাহোতেই সে আছে। খাজুরাহো তার অভিজ্ঞতার বৃত্ত, ভালোবাসার ধন।

দেশ-বিদেশের কতো মহান নেতা, কতো শিল্প-রসিক পণ্ডিত, কতো বিচিত্র মানুষ এই দশ-বারো বছরে খাজুরাহো দর্শনে এসেছেন। এইসব বিচিত্র টুরিস্টদের ক্ষণিক সম্পর্কে খারে তার জীবনের বৈচিত্র্য লাভ করে। সবচেয়ে মনে পড়ে পণ্ডিত নেহরু আর ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণকে। নেহরু খাজুরাহোতে গিয়েছিলেন ১৯৫৫ সালের শরৎকালে। রাধাকৃষ্ণণ গিয়েছিলেন ১৯৬১ সালের বসন্তে। সার্কিট হাউসে তাঁরা ছিলেন খারের তত্ত্বাবধানে। সবাইকে একবার না-একবার খারের কাছে আসতেই হবে,—যাঁরা ভারত-ভাগ্য-বিধাতা তাঁদেরও। সে যে খাজুরাহো বাংলোর কেয়ারটেকার। এই খারের গর্ব।

আর আছে একটি গোপন আনন্দ, গোপন ভালোবাসা। তার কথা অবশ্য সবাইকে বলা যায় না। খাজুরাহোকে ভালোবাসা, খাজুরাহোকে জড়িয়ে থাকার আনন্দ। দিনের বেলা হাতে যদি সময় থাকে, খাজুরাহোর মন্দিরের ধারে ধারে ঘুরে বেড়ান, সহস্রবার দেখেও দেখার আশা মেটে না। আর রাত্রিবেলা ঘরে বসে খাজুরাহো তথা ভারতের শিল্পকলা সম্বন্ধে বই পড়ে। আমাদের সে খাজুরাহোর মন্দির দেখাতে এনেছে। নিরাসক্ত গাইড নয়,—সেও যেন হাজারবার দেখা খাজুরাহোকে আমাদের সঙ্গে নতুন করে দেখছে, নতুন বিস্ময়ে, নতুন শ্রদ্ধায়।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই পথ ফুরোলো। এ রাস্তায় আমরা আগেই যেতে পারতাম। এখানে যা দেখবার তা সব শেষেই খারে দেখাতে চায়। যাই হোক আমাদের পক্ষেও এ ব্যবস্থা ভালো। খারের সঙ্গে সব এলাকাটার চৌহদ্দি একবারে জেনে নিলে আমাদের সুবিধে। তারপর যা বেশি করে দেখতে চাইব, তা দেখতে নিজেই আসতে পারব, খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না।

খারেও বললে, শেষ করতে করতে অন্ধকার হয়ে যাবে। এবার যেখানে যাচ্ছি,—মনে হয় ভালো করে দেখতে আবার তোমাদের আসতে হবে।

মন্দিরের এক ধ্বংসাবশেষের কাছে এসে আমরা দাঁড়ালাম। নামলাম টাঙ্গা থেকে। কয়েকটি কারুকার্যখচিত স্তম্ভ। স্তম্ভের ওপর চৌকো খিলান ও ছাদ। এইটুকুই শুধু বর্তমান। এই মূল স্থাপত্যের ওপর মন্দির গড়ে উঠেছিল, সে মন্দিরের চূড়া, দেয়াল কালের হাতে ধূলিসাৎ হয়েছে।

স্তম্ভের গায়ে গায়ে ঘণ্টার কারুকার্য।

সেদিকে খারে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললে,, এ জন্যেই এই মন্দিরের নাম ঘণ্টাই মন্দির।

আমি শুধোলাম,—এ মন্দির কোন দেবতার ?

খারে বললে, খাজুরাহো মিউজিয়ম দেখেছ সকালবেলা ?

আমি বললাম,—না দেখি নি, কাল দেখব।

মিউজিয়মে দেখবে বিশাল এক বুদ্ধমূর্তি। এই মন্দিরের সামনে বুদ্ধমূর্তিটি পাওয়া গিয়েছিল। সেই থেকে অনেকের ধারণা এটি বুদ্ধমন্দির। অনেক পণ্ডিত আবার মনে করেন এটি জৈনমন্দির।

কোদ বললে,—আমি তোমাদের ধর্মের কথা কিছু কিছু জানি। প্রাচীন ভারতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন তিনটি আলাদা আলাদা ধর্ম ছিল—তাই না ? একই দেশের একই রাজারা একই জায়গায় এই তিন ধর্মের মন্দির একসঙ্গে গড়েছিল ? এতক্ষণ তো হিন্দু মন্দিরই সব দেখলাম।

খারে হেসে বললে,—এই জন্যেই একেবারে শেষকালে তোমাদের এখানে এনেছি। বৌদ্ধ-ধর্মের বিশেষ নিদর্শন এখানে আর নেই। তবে জৈনমন্দিরগুলি দেখবে, জৈনদের উপাসনা-গৃহ। কিন্তু খাজুরাহোর মন্দির, তাই আসল কথা।

ঘণ্টাই মন্দিরের সামনে টাঙ্গা রেখে পায়ে পায়ে আমরা এগোলাম। পৌঁছলাম জৈনমন্দির-গুলির সামনে। প্রাচীন জৈনমন্দির পাশাপাশি দুটি, পার্শ্বনাথ ও আদিনাথ। আর একটি মন্দির শান্তিনাথের, সেটি হাল আমলের। এই তিনটি মন্দির এক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। শান্তিনাথ মন্দিরে জৈন ভক্তরা পূজারতি করে থাকেন; যাত্রীদের জন্য পুরোহিত বর্তমান। মাতঙ্গেশ্বর মন্দিরের মতো জীবন্ত তীর্থ।

● অগ্নিদেব

পার্শ্বনাথের মন্দির ভারতের শ্রেষ্ঠ জৈন-মন্দির। গর্ভগৃহে আছেন জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ,—মন্দির দ্বারে আছেন গরুড়বাহিনী জৈনদেবী দশভুজা।

খাজুরাহোর শিল্প বিকাশের সময়ে বৌদ্ধ-ধর্মের প্রভাব প্রায় অস্তমিত। কিন্তু সারা চন্দেল্ল রাজ্যে তখন জৈনধর্মের প্রচুর প্রভাব ছিল। বিত্তবান শ্রেষ্ঠীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন জৈন। রাজার অমাত্য ও বিত্তবিশিষ্ট রাজ-কর্মচারীরা ছিলেন জৈনধর্মাবলম্বী। তাঁদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতাতে খাজুরাহোতে জৈন-মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু এই সৃষ্টির মূলে ছিল রাজানুকূল্য।

রাজা ছিলেন হিন্দু,—হয় শিবভক্ত না হয় বিষ্ণুপূজক। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রজারঞ্জক লোকপিতা। ধর্ম রাজার একলার নয়, ধর্ম সকলের। চন্দেল্ল রাজারা ধর্মসঙ্কীর্ণতার বশবর্তী ছিলেন না। সকল প্রকার লোকধর্মের প্রতিই তাঁদের আনুকূল্য ছিল। এ সময় লোকচিত্ত থেকে বৌদ্ধধর্ম দূরে চলে গিয়েছিল। বৌদ্ধধর্ম সারা ভারত থেকেই লুপ্ত হতে চলেছিল। তবু রাজারা বুদ্ধের মহত্ত্বকে শ্রদ্ধা করতেন। ঘণ্টাই-এর বুদ্ধমূর্তি তার প্রমাণ। জৈনধর্ম বিশ্বাসীদের প্রতি রাজানুকূল্য যে প্রচুর ছিল তার খাজুরাহোর জৈনমন্দির।

রাজধানী মহোবা, আরক্ষাদুর্গ কলঞ্জর, আর ধর্মনগরী খাজুরাহো। চন্দেল্ল রাজারা তাঁদের ধর্মনগরীতে একই প্রেরণায়, একই আদর্শে বিভিন্ন মন্দির নির্মাণে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কোনো মন্দিরে স্থাপিত হয়েছিল আর্য ব্রাহ্মণ্য দেব-

বিগ্রহ, কোনো মন্দিরে ভগবান বুদ্ধ বা জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তি। এই উদার ধর্মনিরপেক্ষতা চন্দেল্ল রাজবংশের গৌরব।

পরবর্তীকালের জৈন ভক্তরা মন্দিরের গর্ভগৃহে নূতন দেবমূর্তি বসিয়েছেন। আদি মূর্তিগুলি নেই। আদিনাথের মূর্তিটি হাল আমলের। পার্শ্বনাথের মূর্তিটিও শ-খানেক বছরের পুরাতন। এ মন্দিরও আদিতে তীর্থঙ্কর আদিনাথের নামে উৎসর্গ হয়েছিল। পরে পার্শ্বনাথ মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে ও বর্তমানে এটি পার্শ্বনাথ মন্দির বলে পরিচিত।

জৈনধর্মের প্রবর্তা মহাবীর বর্ধমান। তিনি বৈশালী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। ত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করেন এবং তেরো মাস পরে দিগম্বর হন।

বারো বৎসরের সাধনায় তিনি আত্মজয়ী হন ও মহাবীর বা জিন নামে প্রসিদ্ধ হন। তাঁর নাম অনুসারে তাঁর ধর্মের নাম জৈনধর্ম।

জৈন প্রবাদ অনুসারে অবশ্য মহাবীর ছিব জৈনধর্মের শেষ গুরু বা তীর্থঙ্কর। তাঁর আগে আরো তেইশজন তীর্থঙ্কর আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রথম তীর্থঙ্কর আদিনাথ ঋষভ আর মহাবীরের ঠিক পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ। মহাবীরের আড়াইশো বছর আগে পার্শ্বনাথ আবির্ভূত হন।

আদিনাথ ঋষভ থেকে বাইশজন তীর্থঙ্কর ভক্তি-বিশ্বাসের আসনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পার্শ্বনাথ ঐতিহাসিক পুরুষ বলেই পণ্ডিতদের ধারণা। তিনি ছিলেন বারাণসীর রাজপুত্র। মহাবীরের মতো তিনিও ত্রিশ বৎসর বয়সে রাজসুখ পরিত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং দীর্ঘ তপস্যায় সিদ্ধ হন। তিনি তাঁর শিষ্যদের চারটি প্রতিজ্ঞায় দীক্ষিত করেন। যথা—অহিংসা, সত্য, নির্লোভ ও ত্যাগ। মহাবীর এই চতুঃসিদ্ধির সঙ্গে যোগ করেন সংযম।

জৈন ও বৌদ্ধধর্মের মূলে গভীর একটা জীবন বিমুখতার ভাব রয়েছে। জন্ম দুঃখের, জীবন দুঃখের,—এ জগৎ দুঃখের কারাগার। রোগ, শোক, বার্ধক্য, জরা,----দুঃখময় জীবনের এক একটি অধ্যায়। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ ভরা বিশ্ব-পরিবেশ আশার ছলনা মাত্র,—মিথ্যা মদিরার ভঙ্গুর পাত্র মাত্র। জীবনের সমস্ত দুঃখের মূল তৃষ্ণা বা বাসনা, সেই মদিরা-পানের আকুলতা। বাসনা থেকে মুক্তি পেলেই মানুষ জীবনের নিত্য দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। নিবৃত্তিই নির্বাণের পন্থা।

দিন শেষ হয়ে আসছে তাই আমরা প্রথমে মন্দিরের ভিতরটা দেখে এলাম। মন্দিরে ঢোকার আগে ক্ষোদের কথা অনুসরণ করে খারে বলেছিল,—ঠিক, চন্দেল্ল রাজারা সব ধর্মকেই সমান চোখে দেখতেন, তার কারণ তাঁদের কাছে প্রধান ধর্ম ছিল প্রজাধর্ম। কিন্তু খাজুরাহোর শিল্পীরা কোন্ ধর্ম মানত বলো দেখি?

এবার মন্দির থেকে বার হতে হতে খারে বললে,—জৈন দিগম্বর বস্ত্রটুকুও গায়ে রাখে না, ছারপোকা দিয়ে দেহের রক্ত শুষিয়ে পুণ্য অর্জন করে আর উপবাস করতে করতে মৃত্যুবরণ, চরম ব্রত বলে মনে করে---তাই না?

আমি বললাম, আজকের দিনের জৈন শেঠজীদের জীবনাদর্শের সঙ্গে কতোটা মেলে জানি নে, তবে মরজীবনের সমস্ত বাসনা-কামনাকে পরিহার করাই জৈনধর্মের প্রধান অনুজ্ঞা।

খারে বললে, আর শিল্পীর অনুজ্ঞা কী? শিল্পী কোন্ ধর্ম মানবে? চন্দেল্ল রাজাদের মতো চন্দেল্ল শিল্পীরাও একটি মাত্র ধর্মকে মেনেছে,—সে ধর্ম শিল্পনিষ্ঠার। একটি দেবতাকে তারা পূজা করছে, সে দেবতা সুন্দরের দেবতা। হাজার বছর আগেকার এই জৈন-মন্দির দ্যাখো, বলো শিল্প বড়ো না ধর্ম বড়ো; সৌন্দর্য বড়ো না অনুশাসন বড়ো।

সেই অঙ্গশিখর শোভিত রত্নাবলম্ব-শিষিত আকাশচুম্বী শিখর, মন্দিরগাত্রে সেই নয়নবিমোহন ভাস্কর্যলীলা। খাজুরাহোর শিল্পধারা কোনো ধর্মমতের প্রভাবে স্বধর্ম-বিমুখ হয়নি। হিন্দু-মন্দিরের চেহারা এক, আর জৈন-মন্দিরের চেহারা অন্য, তা নয়। গর্ভগৃহে যে দেবতাই থাকুন, উপাসকরা যে সম্প্রদায়েরই হোন না কেন, খাজুরাহোর মন্দিরকে কেবল খাজুরাহোর মন্দিরের সঙ্গেই তুলনা করা চলে।

খাজুরাহোর শ্রেষ্ঠ মন্দির কাণ্ডারিয়া মহাদেবের মন্দির। পার্শ্বনাথের মন্দিরকে কেবল কাণ্ডারিয়া মহাদেব মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করা চলে। কাণ্ডারিয়া মন্দিরের মতোই এই মন্দিরের ক্ষেত্রবিন্যাস, অর্ধমণ্ডপ, মণ্ডপ, মহামণ্ডপ, অন্তরাল ও গর্ভগৃহ। চারদিক ঘিরে পরিক্রমা-পথ। কেবল এ মন্দিরে জোড়া অলিন্দ নেই, তার বদলে গবাক্ষ আছে। অলিন্দ থাকলে মন্দিরের মধ্যে আলো-বাতাস যতোটা আসে, গবাক্ষপথে ততোটা আসে না। বাইরে থেকে দেখলে দুপাশের যুগল অলিন্দ একটা প্রসন্ন সামঞ্জস্যবোধ জাগায়, এ-মন্দিরে তার কিছুটা অভাব।

কাণ্ডারিয়া মহাদেবের মন্দিরের মতোই তিন সারিতে ভাস্কর্য মূর্তি। কিন্তু মাঝে অলিন্দ থাকলে সারির মাঝখানে ছেদ থাকে, এখানে তা নেই। সমস্ত মন্দিরের দেয়াল জুড়ে মূর্তির

● বরাহ-অবতার

লক্ষ লক্ষ প্রাণ একই সূত্রে গাঁথা।
ছোট ছোট অসংখ্য স্রোতস্বিনী যেন বিরাট এক নদীতে গিয়ে মিলিত হচ্ছে।

নানা ধর্ম্ম ও নানা মতের লোক এই দেশে স্বাধীনভাবে শান্তি ও সম্প্রীতিতে বাস করছেন। এই ঐক্যবদ্ধ সমাজ, এই শান্তি ও সম্প্রীতি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত এবং তার জন্য সংগ্রাম করতে হলেও তা বরণীয়। মনে রাখবেন যে ভারতের এই ঐক্যবদ্ধ সমাজে আপনার মতো, আপনার প্রতিবেশীও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এক মহান দেশের এক মহান জনসমাজ

পর মূর্তি। একে অপরের সঙ্গে মনসংলগ্ন; মূর্তি-শিল্প যেন সমস্ত মন্দিরকে আঁকড়ে ধরেছে, জাপটে রেখেছে।

খাজুরাহোর ভাস্কর তার প্রতিভার পরম কীর্তিকে উদ্ঘাটিত করে গেছে এই জৈন মন্দিরের দেয়ালে দেয়ালে। জীবন-শিল্পী সে, সুন্দরের উপাসক সে। জীবনকে সে দুঃখময় বলে ভাবেনি, জগৎকে মায়াময় বলে মানে নি, প্রবৃত্তিকে নীতিবহির্ভূত বলে পরিহার করে নি। সে ঘোষণা করেছে ইন্দ্রিয়ই অনুভূতির সিংহ-দ্বার,—মর্ত-জীবনের বাস্তব পাত্র সে অমর্ত-কৈবল্যের অমৃতধারায় পরিপূর্ণ করেছে।

উত্তাল ভাস্কর্য-বন্যায় আমরা দিশেহারা হয়ে গেলাম। ভাস্কর্যের লীলা সমুদ্র। রূপের অনন্ত বন্যা। ঢেউএ ঢেউএ শুধু ভেসে যাওয়া। খুঁজে পাইনে কোথায় তল, চোখে পড়ে না কোথায় তীর। তরঙ্গের পর তরঙ্গ, অসংখ্য অসীম, প্রত্যেকের মাথায় জ্বলছে মাণিক্য-দ্যুতি কোনোটিকেই আঁকড়ে রাখতে পারিনে মুহূর্তের উপলব্ধির বন্ধনে।

পড়ন্ত সূর্যের রশ্মি ক্লোদের সোনালী চুলে এসে পড়েছিল। ধুলোভরা চাতালের উপর সে ক্লান্ত হয়ে ধপ করে বসে পড়ল।

খারে বললে,—বসে পড়লে যে? খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছ না কি?

ক্লোদ ম্লান হেসে বললে,—সারা জীবন ধরে দেখেও এ দেখা শেষ করা যাবে না।

ক্লোদের বিস্ময়ক্লিষ্ট চোখের দিকে তাকিয়ে খারেও হাসল।

তাই বলে সারাটা জীবন এখানে বসেই কাটিয়ে দেবে ভাবছ না কি? ওঠো, ওঠো, সন্ধ্যে হয়ে এল বলে।

এক শিলানায়িকার দিকে নিবিষ্টমনে তাকিয়েছিল ক্লোদ। বললে, বিরক্ত কোরো না, আমাকে একটু দেখতে দাও, তোমরাও দেখো না ঘুরে ঘুরে!

খারে মুচকি হাসল। আমার দিকে চোখের একটু ইঙ্গিত করে বললে,—সন্ধ্যের পর এখানে থাকলে কী হয় জানো?

কী আবার হবে? চাঁদের আলোয় ঠিক ফিরে যেতে পারব।

কী হবে তাহলে শোন। ঐ চাঁদের রশ্মি রূপোলী মায়াজাল হয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরবে, এক-পাও নড়তে দেবে না। আর তখন এরা সবাই জেগে উঠবে, জীবন্ত হয়ে উঠবে। আর তোমাকে এদের দলে এদের উৎসব-লীলায় টেনে নেবে।

আমি বললাম, সত্যি না কি?

খারে যেন রূপকথা শোনাচ্ছে। বললে, সত্যি না? খাজুরাহোর এই সব শত শত মূর্তি, সবগুলোই কি ভাস্করের হাতে তৈরি না কি?

তবে?

এই ক্লোদেরই মতো কতোজন খাজুরাহো এসেছে। আত্মহারা হয়ে হাঁ করে ক্লোদেরই মতো মন্দিরের সামনে বসে থেকেছে। কখন যে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে খেয়ালই নেই, তারপর আর তাকে পাওয়া যায় নি।

আশ্চর্য, পাওয়া যায় নি কেন?

রাত্রির মহোৎসবে যোগ দিয়েছে সে। তারপর কোন দেয়ালে কোন অলিন্দে পাথর হয়ে ফুটে রয়েছে, কে তাকে খুঁজে পায়।

ক্লোদ মন্দির-দেয়ালের ভাস্কর্যলীলার দিকে তাকিয়েছিল আর আনমনে আমাদের কথা শুনছিল। বললে, বাজে কথা, মিথ্যে কুসংস্কার। আমি রাত নটা অবধি এখানে থাকব। দেখব কী হয়।

আমি একটু ভীতু ভীতু গলা করে বললাম, না ক্লোদ, খারে অনেকদিন এখানে আছে, অনেক কিছু জানে। হয়তো সত্যিই বলছে।

মাথা নিচু করে এক মুহূর্ত ভাবল ক্লোদ। তারপর শান্ত গলায় বললে—কিন্তু যাই বলো, এখন আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। এখানে তো আর সরকারী গেট বন্ধ হবে না। হোক না অন্ধকার,—একটু পরে চাঁদ উঠবে। সেই চাঁদের আলোয় বসে এই মন্দির দেখতে কেমন লাগবে বলো তো?

● বুদ্ধদেব

চাঁদের আলোয় লোকে তাজমহল দেখে,—আমরা দেখব খাজুরাহোর মন্দির। প্রস্তাবটা আমারও মনে লাগল। বললাম,—বেশ তো, খারে তাহলে চলে যাক, আমি তোমার সঙ্গে থাকব।

মিষ্টি হাসল ক্লোদ, বললে,—কিন্তু খারের কথায় তো তুমি বিশ্বাস করলে! আমার জন্যে এ রিস্ক তুমি নেবে?

খারে এবার দাঁত বার করে সশব্দে হাসল। কালো ঘন চুলে আঙুল চালিয়ে কস্ করে বললে,—এ কি একটা রিস্ক হোলো ম্যাডাম, এ যে অনন্তকালের একটা চান্স!

তারপর একটি নিরাজ যুগলমূর্তির দিকে আঙুল তুলে বললে,—কাল সকালে এসে দেখবে ভাগ্যের হাতে খোদাই করা এমনি আর একটি মূর্তি মন্দিরের দেয়ালে বিরাজ করছে।

লাফিয়ে উঠল ক্লোদ। লজ্জা পেয়েছে খুব, কিন্তু খারের রসিকতাটাও তারিফ না করে উপায় নেই। শেষ সূর্যের আলোয় তার মুখটা টুকটুকে লাল।

দু' চোখে হাসি ঝিলকিয়ে বললে,—চলো চলো, ফিরেই যাই। কাল সকালে আবার আসব।

খারে আবার চতুর হাসি হাসল। বললে, তাহলে রাত্রের উৎসবে যোগ দেবেন না? রিস্ক কিংবা চান্স—দুই-ই বরবাদ?

কপট রাগ দেখিয়ে ক্রোধ বললে,—হ্যাঁ বরবাদ। তোমার মতো খারাপ লোককে গাইড করলে অনেক কিছুই বাদ দিতে হয়।

খারে এবার প্রবোধ দিয়ে বললে,—বেশ, এখনো সময় আছে। উৎসবের প্রস্তুতির কিছুটা তোমাদের দেখিয়ে নিয়ে যাই।

উৎসব শুরু হবে দিনশেষে। সন্ধ্যা যখন ঘনাবে, আকাশে হলুদ রঙের চাঁদ যখন উঠবে, মন্দিরে মন্দিরে আরতি-সংগীতের সঙ্গে সঙ্গে দেবদাসীর নূপুর-শিঞ্জিনী যখন বাজবে।

সেইদিন শেষ হয়ে আসছে এখন। বাতায়নে শেষ সূর্যের আভা। শ্রমের অবসান। পাখিরা ফিরছে কুলায়ে, রাজপথ দিয়ে কর্মশীল মানুষেরা ফিরে আসছে ঘরে। প্রিয় প্রতীক্ষায় অলিন্দপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে কোন্ পুরসুন্দরী। আকুল তার নয়ন, বেপথু তার দেহ-বল্লরী।

ধারাযন্ত্রে সান্ধ্য-স্নান সবে শেষ করেছে কোন সুন্দরী। পিছন ফিরে সে দাঁড়িয়েছিল, সবে মুখটি সামনের দিকে ফিরিয়েছে। লোভন গণ্ডে এখনো কয়েকটি জলবিন্দু। ডান কাঁধ বেয়ে সামনে নেমেছে সিক্ত চুলের ধারা। দু'হাতে কেশগুচ্ছ ধরে তা থেকে সে জল ঝরাচ্ছে। কানে কুণ্ডল, হাতে কংকণ, কটিতে চন্দ্রহার। কিন্তু বক্ষ-অঙ্গ বসন এখনো ওঠে নি। বাম বাহুমূলে বাম পয়োধরের কোমল আভাস,—লতাহার সজ্জিত পক্ব পনসের মতো নিতম্বরাজি।

কোন কামিনীর কালো কেশে পড়েছে বিকালের শেষ আলো। সান্ধ্য প্রসাধনে সে নিরত। পুঞ্জমেঘের মতো অলকদামকে সুবিন্যস্ত করে অতুল কবরীসজ্জা সে করছে। কবরী শাসনের ভঙ্গিতে উত্তোলিত তার দুই পেলব বাহু। শিথিল তার মেখলা ঈষৎ-বংকিম তার ক্ষীণ কটি,—ঘন বক্ষের উৎক্ষিপ্ত উচ্চ চূড়।

ঐ দ্যাখো মদিরেক্ষণার অপরূপ ভ্রূ বিলাস। কবরী ঘিরে মাল্য রচনা। পীনোন্নত স্তনমণ্ডলে চন্দন আলিম্পন। কটিতে রত্নখচিত নীবি-বন্ধ, স্বচ্ছ দুকূলে ছায়াবৃত জঘনদেশ। নিবিষ্ট মনে প্রসাধনের অঙ্গটুকু সে সম্পূর্ণ করছে চোখের কোণে কাজলের রেখাটি টেনে।

এ বুঝি দ্বারপ্রান্তে প্রিয় পদসঞ্চার? আর সময় নেই। প্রস্তুত হয়েছে তো বরাঙ্গিণী? গুরু স্তনভারে ঈষৎ আনত কি তোমার দেহ,—গুরুশ্রোণী কম্পমান, ব্যাকুল চরণ চলচ্ছক্তি-হীন? এক মুহূর্ত সময় এখনো আছে, দর্পণে মুখটি একবার দেখে নাও।

বাজছে মৃদঙ্গ, বাজছে করতাল। মহামণ্ডপ আলোকমালায় সজ্জিত। ছুটে চলেছে নটিনী নর্তকী। স্পন্দিত চারুকুচমধ্যে রত্নহারটি দুলছে, পিঠে দুলছে মাল্যশোভিত মুক্তবেণী। দৃঢ়সংবদ্ধ তার নীবিতট, কেবল এক পায়ের শিঞ্জিনীটি হঠাৎ খসে গেছে। ত্রস্তমনে ব্যাকুল ব্যস্ততায় সেই স্খলিত নূপুর আবার সে পায়ে বেঁধে নিচ্ছে।

নগর প্রান্তের ঐ নিভৃত উপবন। আকাশে চাঁদ,—কুসুমকুঞ্জ তৃণশয্যায় ছায়ালিম্পন রচনা করছে সেখান থেকে প্রিয় দয়িতের ডাক এসেছে, বাঁশির সুরের আহ্বান। তাই তো আর ঘরে থাকতে পারে নি নায়িকা। নিশি পাওয়ার মতো ছুটেছে সে গোপন অভিসারে দেহে মনে আলুলায়িতা হয়ে। কিন্তু সহসা গতি হয়েছে রুদ্ধ,—পায়ে বিঁধেছে কাঁটা।

চাঁদ, এবার তুমি কি লজ্জায় মুখ লুকোবে মেঘের আড়ালে? ওদের তো লজ্জা নেই। ঐ প্রেমিক প্রেমিকা, যারা বিহ্বল আলিঙ্গনে এক হয়ে গিয়েছে। ওষ্ঠে ওষ্ঠ, বুকে বুক, অঙ্গে অঙ্গ,—রতিরভস অমৃতের উত্তাল ধারায় যুগল অবগাহন।

ভাস্কর্যের এই বন্যাধারায় সার্থক কাণ্ডারী খারে। চোখের সামনে শত শত মূর্তি। দিনান্তের সেই অল্প সময়টুকুর মধ্যে অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের কয়েকটি বিশেষ ভাস্কর্য নিদর্শন সে আমাদের দেখাল।

ডাক দিল টাঙ্গাওয়ালা। [ক্রমশঃ

আমার বাড়ী

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

জাম-জারুলের স্নিগ্ধ ছায়ায়
রাঙচিতির বেড়া-ঘেরা আমার বাড়ীটা
ধলেশ্বরীর তীরে এখন স্বপ্ন হয়ে গেছে।
আমার বাড়ীর আঙিনায় স্বর্ণচাঁপার ডালে ডালে
দুর্গাটুনটুনি নেচে বেড়াত সারাদিন...
নীলকণ্ঠ পাখি-ডাকা আশ্বিন সকালে
মাধবদাসের একতারাতে
আগমনীর সুর উঠত দুলে...
হেমন্তের শান্ত দুপুরে
সোনা-রং ধানক্ষেতে
নির্ভয়ে নামত টিয়াপাখির ঝাঁক।
বিশাল দেবদারু গাছের ফাঁক দিয়ে
সকালবেলার প্রসন্ন আলো
প্রতিদিন আমার চোখে বুলিয়ে দিত
খুশীর পরশ!
আমার সেই আশ্চর্য বাড়ীটা
ধলেশ্বরীর তীরে এখন স্বপ্ন হ'য়ে গেছে
যার উন্মুক্ত জানালা দিয়ে
আমি ঈশ্বরের হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখতে পেতুম॥

নীলকণ্ঠ পাখী

চিন্ময় গুহঠাকুরতা

সাতটি তারার তিমির থেকে ভোরের আলো দেখে
অপরিচয়ে হারিয়ে যেতে যেতে
অচেনা এক শব্দ শুনি, হাজার কলরবে
একক সেই স্বর:
অনেক দূরে ডাকছে একা নীলকণ্ঠপাখি।

স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে শুনি দূরান্তের ধ্বনি
শূন্য চরাচরের বুকে সহসা প্রসারিত
বিষণ্ণ সেই প্রতিধ্বনি তিন পাহাড়ে, বনে
সঙ্গীহীন, একা;
নীলাঞ্জন ছায়ায় ডাকে নীলকণ্ঠপাখি।

হাতছানিতে ডাক দিয়েছে রৌদ্র রেখাগুলি
আকাশজুড়ে ছড়িয়ে আছে আমন্ত্রণলিপি;
ভাবছি, একা হারিয়ে যাবো হাজার খরস্রোতে
তবুও সংশয়;
এখনো স্মৃতি শৈশবের পুরনো ঘর খোঁজে।

পূর্বদিকে সৌম্য আলো বরাভয়ের মত,
হৃদয়পুরে সম্মোহিত নীলকণ্ঠপাখী॥

পরশের শেষ নেই

নিউ আলিপুরের সুসজ্জিত ফ্ল্যাটটির মধ্যেও সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। সুব্রত সাদা পোষাকে সজ্জিত হয়েছে। আজ রাত্রে সুব্রতর বাইরে 'ডিনারের' নেমন্তন্ন আছে। সুপর্ণাও অভ্যাসমত অবশ্য-সঙ্গী। কিন্তু আজ সুপর্ণার দেহ ভালো নেই তাই সুব্রতর সঙ্গী হোতে পারছে না।

স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য-জীবনে এটাই বড় সমস্যা। সুপর্ণা সুব্রতর সজ্জিত জীবন্ত পুতুল। সুব্রতর মনে যখন যেভাবের ইচ্ছার উদয় হবে—সুপর্ণাকে হাসিমুখে তখুনি তার রূপদান করতে হবে। সেটা ঘরে-বাইরে সমান। তাছাড়া স্ত্রীকে সুখী করতে হোলে পুরুষের যে গুণাবলীর প্রয়োজন—সুব্রতর মধ্যে তার সবকটাই আছে বরং অপরের চাইতে কিছু বেশীই আছে তবু কোথা দিয়ে কেমন কোরে মনোবেদনার কারণ ঘনিয়ে আসে, সুপর্ণা তা বুঝতে পারে না।

সে সুব্রতকে ভালোবাসে, বিশ্বস্ত পত্নীর মত যত্ন করে, সেবা করে কিন্তু প্রেম তাদের প্রাণে সাড়া জাগায় না। এ যেন নিষ্প্রাণ-প্রেম, জোর করে জিইয়ে রাখা। কেন এমন হয়?

দু' বছরের বিবাহিত জীবনে এই বোধ হয় প্রথম যেদিন সুপর্ণা তার ব্যক্তিগত মতামত ব্যক্ত করেছে। অবিশ্যি ইদানীং আরও কয়েকটি সান্ধ্য অনুষ্ঠানে সুপর্ণা সুব্রতর সঙ্গী হোতে চায় নি।

এ্যাপলিকের আচ্ছাদন

কিন্তু সুব্রতর জোরের নিকট হার মানতে বাধ্য হোয়েছে। সে আজ 'ডিনারে' যাবে না। তার দেহ মন সুস্থ নেই। কিন্তু বন্ধু-বান্ধব মহলে তাকে শুধুই জব্দ করা।

সুব্রত গম্ভীর হোয়ে বললো, "আজ কিছু দিন থেকেই লক্ষ্য করছি পর্ণা, তুমি অত্যন্ত অন্যমনস্ক হোয়ে থাকো। এটা আমার ভালো লাগে না। বিয়ে করার আগে তোমার নিজের মন বোঝা উচিত ছিল।"

"তুমি এসব কি বলছ সুব্রত? মন না বুঝেই আমি সংসার করতে এসেছি এই তোমার ধারণা?"

"আমার ধারণা যে কতদূর সত্য তা তুমি দু' দিনেই বুঝতে পারবে। যাক এসব বাজে কথা। তা'হলে তুমি যাচ্ছো না?"

অঞ্জলি দত্তগুপ্ত

সুপর্ণা ধৈর্য হারাল। উচ্চকণ্ঠে ব'লে উঠলো, "আমি বুঝতে পেরেছি, আমি ভুল করেছি। সে ভুলের মাশুল যোগাতে আমা সারাটা জীবন কেটে যাবে।" চাপা কান্নায় সুপর্ণার গলা ভেঙ্গে এলো। সুব্রতর কণ্ঠস্বরেও ফুটে উঠলো বিরক্তি। চোখের দৃষ্টিতে ঘনিয়ে এলো দুর্জয় ক্রোধ। এ জাতীয় হৃদয়াবেগ সুব্রত কোনও কালেই বরদাস্ত করতে পারে না। এ অসহ্য! সুপর্ণার আজ হয়েছে কি?

"সারা জীবন ধরে তোমাকে ভুলের মাশুল দিতে হবে না সুপর্ণা। সে ভয় নেই তোমার। ভুল শোধরাবার প্রয়োজন ঘটলে আমিই তার ব্যবস্থা করবো। আপাতত আমি বেরুচ্ছি।"

আবছা অন্ধকার থেকে সুপর্ণার কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। কান্না ভেজা গলায় যেন ফিস-ফিসিয়ে উঠলো, "তুমি ভুল কর নি সুব্রত?"

সোফা থেকে উঠতে উঠতে সুব্রত দৃঢ়স্বরে বললো, "না আমার একটুও ভুল হয় নি পর্ণা। আমি যা চেয়েছিলাম, তা আমি পেয়েছি। আমি যে সমাজে মেলামেশা করে থাকি—সেখানে তুমি উপযুক্ত এটাও আমার ধারণা হয়েছিল। তাই নির্বাচনে দ্বিধা জাগে নি। কিন্তু তোমার ব্যবহারে আজ আমি আশ্চর্য বোধ করছি।"

সুব্রত সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিলো। পরিপূর্ণ আলোয় সজ্জিত কক্ষ হেসে উঠলো। এতক্ষণে সুপর্ণা স্বামীর মুখ স্পষ্ট কোরে দেখতে পেলো। বুকের মধ্যে নিশ্বাস চেপে নিতে নিতে করুণ হেসে বললো, "এবারকার মত আমায় মাপ কর সুব্রত। তুমি যা ভালবাস, তাই করবো সাধ্যমত।"

সুপর্ণা সত্যিকারের সুন্দরী। নিখুঁত কাটাছাটা মুখে লাবণ্যের দীপ্তি। শাঁখের মত শুভ্র রং, গোলাপী আভার উজ্জ্বল দেহের তটে তটে যৌবনের তরঙ্গ। সুব্রত মুগ্ধ হোল। সুপর্ণার নতি স্বীকারে নিজের মধ্যে স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেলো। হাসিমুখে বললো, "তাহলে চলি পর্ণা। মিস রায় আমার জন্য অপেক্ষা করে আছেন। তাঁকে আমার গাড়ীতে তুলে নিতে হবে। লক্ষ্মী মেয়ের মত তুমি খাওয়া-দাওয়া সেরে নিও।" সিঁড়িতে ওর সশব্দ পদধ্বনি মিলিয়ে যেতে থাকে। একা ঘরে দাঁড়িয়ে সুপর্ণা কান পেতে শোনে প্রতিটি পদক্ষেপ তারপর শয্যার এলিয়ে পরে বালিশে মুখ গুঁজে। মুক্তির পথ বেয়ে অতীত এগিয়ে আসে তার সামনে।

● এ্যাপলিকের কাজ

ছোট মফস্বল সহর। মফস্বল কলেজের প্রফেসর অরুণ সেন একজন ছোটখাটো সাহিত্যিক। সাহিত্য-জগতেই সে বাস করে। সেখানকার হাসি কান্না, বিরহ-মিলন, ব্যথা-বেদনার রাজ্যেই অরুণের আনাগোনা। মহানগরীতে কোলাহল ছাড়িয়ে সে বাস করে স্নিগ্ধশ্যামল পল্লীতে—প্রকৃতির কোলে। তাকে নিয়ে বন্ধু মহলে অনেক আলোচনা কিন্তু অরুণ তাতে ভ্রূক্ষেপ করে না।

অরুণের দাদারা বড় বড় চাকরী করেন কোলকাতায়। ওঁদের মান, প্রতিপত্তি অর্থ সব সমান। অরুণ এই সমাজে অনেকটা বেমানান হ'লেও কেবলমাত্র পারিবারিক কৌলিন্যে যখন ওর সঙ্গে সুপর্ণার বিবাহ ঘটে গেলো, তখন অরুণ একটু বিব্রত হোল। সুদূর বোম্বে সহরে মাতৃহীনা সুপর্ণার দাদারা বাস করেন। সেখানেই সুপর্ণার জীবন কেটেছে লেখাপড়ার রাজ্যে, রবীন্দ্রসঙ্গীতে প্রথম স্থান অধিকার কোরে এবং নৃত্য অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ কোরে দর্শকের প্রচুর অভিনন্দন কুড়িয়ে। সর্বোপরি তার অনিন্দিত রূপ?

অরুণ চমকিত হোলেও মুগ্ধ হোল। হরিণীর একজোড়া কাজলকালো চোখের স্নিগ্ধ ছায়ায় (অরুণ) নিজেকে হারালো। বর্ষামুখর রাতে নিভৃত শয্যায় শুয়ে অরুণ তার কাব্য-কাহিনী বলে যায় সুপর্ণার কানে-কানে, অবাক বিস্ময়ে সুপর্ণা তা' শোনে, পরিপূর্ণ মর্যাদা দিতে চেষ্টা করে স্বামীর প্রতিভায়। অরুণ মনে মনে কৃতজ্ঞ, এতদিন পরে সে তার কাব্য-লোকের মানসীকে খুঁজে পেয়েছে সুপর্ণার মধ্যে। শিল্প-সৃষ্টির উন্মাদনায় সে অস্থির। কাব্য-গ্রন্থের নায়িকা রূপে সুপর্ণা তখন অরুণের জীবনে অপরিহার্য। সুপর্ণাও কি খুঁজে পায় নি নতুন জীবনের আস্বাদ?

সময় এগিয়ে চলে মহাকালের বুকে। তারপর একদিন সুপর্ণার মনে জাগে অবসাদ। স্বামীর অজস্র ভালোবাসার মধ্যে ডুবে থেকেও মনে জাগে অভিমান। মনে হয় সুপর্ণা অরুণের কাব্য-জগতের লক্ষ্মী। গৃহ-লক্ষ্মী তবে নয়?

একদিন অভিযোগের সুরে সুপর্ণা বললো "তুমি বেশ আছো তোমার সাহিত্য জগতে। কিন্তু আমার সময়টা কেমন কোরে কাটে একবার ভেবে দেখেছো?' অরুণ বই থেকে মুখ তুলে সুপর্ণার দিকে তাকালো।

"অপর্ণা! চেয়ে দেখেছো জানালার বাইরে আকাশের রং?" অরুণের স্ব-রচিত নাম 'অপর্ণা'। অরুণের 'অ,' সুপর্ণার 'পর্ণা'। দুটোতে মিলে হয়েছে অপর্ণা।

সুপর্ণা চকিতে জানালার বাইরে চোখ তুলে তাকালো। কাল বৈশাখীর কালো মেঘ জমে উঠেছে আকাশের বুকে। হয়তো ঝড় উঠবে।

"আকাশে কালো মেঘ ছাড়া তো কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। রং কোথায় পেলে?"

"কালো রং নয়? ঠিক তোমার ঐ নিবিড় কুন্তল-সম"—?

সুপর্ণা তার কালো ঘন এক পিঠ চুল হাতে জড়িয়ে নিয়ে বললো "ও সব তোমার বাজে কথা। আসল কথায় যেতে চাওনা বলেই কথার জাল বুনে আমায় ভুলিয়ে রাখ।"

—"আচ্ছা বল তোমার আসল কথা কি?"

—"তোমার তো কাব্য-জগৎ আছে, কলেজ আছে, সবই আছে। কিন্তু আমার সময়টা কাটে কেমন করে?" অরুণ একটু ভাবলো, তারপর বললো, "আচ্ছা অপর্ণা একটা কাজ করলে হয় না? এখানকার নাচ-গানের স্কুলের শিক্ষিকা হোয়ে যাও না?"

সুপর্ণা অরুণের প্রস্তাবে সেদিন রাজি হোতে পারে নি। স্বামীর এই প্রস্তাব তার কাছে সেদিন অত্যন্ত খেলো মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল অরুণ তাকে ভালোবাসে সত্যি কিন্তু বাস্তবের মুখো-মুখি হোতে চায় না। দিন গড়িয়ে যায়—গতিশীল জগতে নিত্য-নতুন পরিবর্তন ঘটে। পুরোনো বিদায় নেয়, নতুন এগিয়ে আসে। অরুণ-সুপর্ণার জীবন থেকেও আরো কটি-বছর খসে পড়ে—তারা এগিয়ে চলে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে, কিন্তু ওদের দিগন্ত কোনো আশার আলোয় উদ্ভাসিত হোয়ে ওঠে না। সাহিত্য-জগতে অরুণের আসন আরও একটু দৃঢ় হয় কিন্তু মন পড়ে থাকে পশ্চাতে যেখানে ক্লান্তির রাজ্য। সুপর্ণার মন দুজনের অজান্তে কখন হারিয়ে গিয়েছে। ক্রমে একদিন ধৈর্য্যও হারিয়ে যায়। তারপরের ইতিহাস বড় সংক্ষিপ্ত ও দ্রুত। যেদিন সুপর্ণা জানতে পারে ওদের সন্তান হবার আর কোনও আশা নেই, সেদিন গভীর বিষাদে ভেঙ্গে পড়ে। অরুণের কোনও কথা, কোনও আশা, কোনও ভালোবাসাই আর তাকে টেনে তুলতে পারে না তার মৃয়মান জীবন থেকে। এভাবে দাম্পত্য-জীবনের সাত বছর সমাপ্ত করে উভয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান উভয়ের জীবন থেকে। দুজনেই শান্ত মনে মেনে নেয়—এভাবে থাকা সম্ভব নয়!

তারপর দুজন দুজনকে মুক্তি দেয় আদালতে দাঁড়িয়ে—বিভেদের পথ বেছে নিয়ে।

এরপর সুপর্ণা চলে আসে কোলকাতায়; অরুণ থেকে যায় স্বস্থানে। শিক্ষিতা সুপর্ণা কাজের মধ্যে মন ডুবিয়ে অরুণকে ভুলে যেতে চায়।

এমনি সময়ে সুব্রতর সঙ্গে সুপর্ণার পরিচয় একটি গানের আসরে। পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয় তারপর হয়তো প্রেমে। সুপর্ণার মন তখন দুর্বল। একটু স্নেহ সহানুভূতির কাঙাল। সুব্রতর ব্যবহারে তার মনের ক্ষতে প্রলেপ লাগে। তারপর কখন কেমন করে ওরা বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, সুপর্ণা তক্ষুণি সেটা আঁচ করতে পারে না। আজ সুপর্ণা ভাবে সত্যিই কি সুব্রতর প্রেম তাকে কাঙাল করেছিল না নতুন ক'রে ঘর বাঁধবার আশা ছিল?

● আত্তন্দ্র কাসরা কাজ

নিউ আলিপুরের সজ্জিত কক্ষে ঘড়ির কাঁটা তখন রাত দশটায় এসে থেমেছে। বাইরে আকাশের বুকে তৃতীয়ার বাঁকা চাঁদ।

"মা, অনেক রাত্ত হয়েছে। টেবিল সাজাব—?" দরজার বাইরে ঝিয়ের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো। সুপর্ণা পর্দা ছেড়ে উদ্যানের
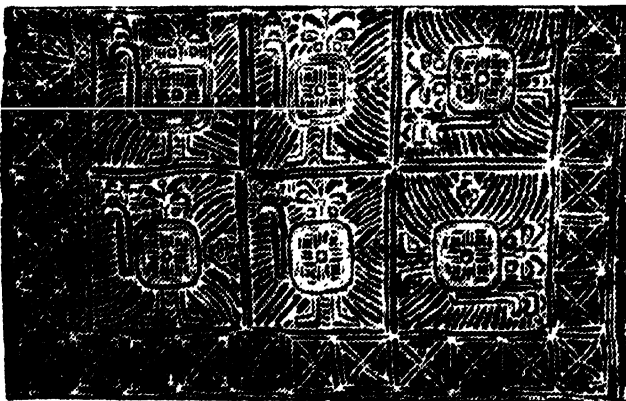
জত উঠে দাঁড়ালো। বর্তমানে ফিরে আসতে একটু সময় লাগল। এত রাত হয়েছে? সুব্রত কখন আসবে?

বাথরুমে ঢুকে বেসিনের ওপর ঝুঁকে পড়ে ঠাণ্ডা জলের স্পর্শ নিয়ে সুপর্ণার ভালো লাগলো। চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে সমস্ত গ্লানি মুছে দিল নির্মম হাতে, তারপর ফিরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়াল।

শ্যাম্পু করা ববচুলে হাত বুলিয়ে নিবিড় কুন্তলের সন্ধান করলো। সুর্মা টানা ক্লান্ত চোখে কাজলকালো আয়তদৃষ্টির ব্যর্থ সন্ধানে বিরত হোল। তারপর আয়নার সামনে চেয়ারে বসে পড়ে অলসদৃষ্টিতে চেয়ে রইলো আপন প্রতিবিম্বর দিকে।

•

কিছুদিন পর। কোনও একটা শনিবারের বিকেল। সুপর্ণা সিনেমায় এসেছে। একাই এসেছে। আলোকিত উজ্জ্বল 'হলে' বসে সুপর্ণার মনে হয় বড় বেশি আগে এসেছে। এখন অপেক্ষা ছাড়া উপায় কি?

অরুণ এলো। নিয়তির চক্রান্তে দুটি কক্ষচ্যুত গ্রহ পাশাপাশি হল। অরুণ আসনে বসেই সুপর্ণার দিকে তাকালো। উগ্র প্রসাধনে সুপর্ণাকে এক মুহূর্তের জন্য অপরিচিতা ব'লে মনে হোল।

জলভরা দৃষ্টি মেঘে যেন বর্ষণ হোল। চারটি চোখের অতর্কিত মিলনে যেন বিদ্যুৎ চমকালো। ভয়ার্ত, চাপাকণ্ঠে সুপর্ণা বলে উঠলো —"তুমি!" ধাতস্থ হোতে অরুণের সময় লাগল। তারপর বড় একটা নিশ্বাস বুকের ভেতর টেনে নিয়ে অরুণ—বলে "হ্যাঁ, আমি।" তারপর এদিকে ওদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে আবার বললো, "একাই এসেছো?" সুপর্ণা জবাব দেয় না। তার দেহ যেন অবশ হ'য়ে আসে। তবু নিস্তেজ গলায় ফিস-ফিসিয়ে বললো, "এ সময় কোলকাতা? তোমার কলেজ—" বাকীটা শেষ করা হোল না। চোখের সামনে ভেসে এলো ফেলে-আসা অভ্যস্ত জীবনের ছবি।

—"কোলকাতার একটা কলেজে চান্স পেয়ে চলে এসেছি।"

—"ও। জানতাম না।" সুপর্ণা বললো।

এক মুহূর্তের নীরবতা—মনে হোল যুগ যুগান্তর। সুপর্ণা আবার বলে, "দাদাদের বাড়ীতেই —না।" ব্যস্ত হয়ে অরুণ বলে, "হ্যাঁ ওখানেই। একা মানুষ—" এরপর সুপর্ণা কথা বলতে পারে না। ওপরের দিকে তাকিয়ে ও ভাবে আলোগুলি নিভে যেতে পারে না? তাহলে অরুণ তাকে আর দেখতে পায় না?

কিন্তু অরুণ তাকে দেখতে চায়, ভালো করেই চায়। সে তার সাহিত্যিকের দৃষ্টি দিয়ে আর প্রেম-ভরা অন্তর দিয়ে সুপর্ণাকে দেখে নেয়। তার অন্তরে যে সন্দেহ ঘনিয়ে আসে, অজ্ঞাতে কণ্ঠ হোতে তাই বেরিয়ে আসে, "অপর্ণা, তুমি ভালো আছো?"

অপর্ণা? বিস্মৃতির তীর হ'তে কে ডাকে? কোথায় অপর্ণা?

অরুণ কি জানে না অপর্ণা মরে গেছে? অরুণ এই মুহূর্তে যার সঙ্গে কথা বলছে, সে সুপর্ণা মিত্র, মিঃ সুব্রত মিত্রের সহধর্মিণী। অপর্ণা নামে ডাকবার অধিকার অরুণকে আজ কে দিল? ওদের জীবনের যে পরিসমাপ্তি, বুক ভেঙ্গে গেলেও ওরা তা' মেনে নিয়েছে। তবে আর কেন?

সুপর্ণার চোখে ফুটে উঠলো নির্মম কৌতুক। ঠোঁটের কোণে বিদ্রূপের হাসি। অরুণের চোখে চোখ রেখে স্থির হোল এক মুহূর্ত।

—"ভালো আছি। কিন্তু তোমার কি অধিকার সে কথা জানবার?" কিন্তু কণ্ঠস্বরে তেজ রাখা গেল না। অব্যক্ত কান্নায় খান্ খান্ হ'য়ে ভেঙ্গে পড়লো কথাগুলি। বুকের ভেতরে প্রচণ্ড ঝড় সুরু হ'য়ে গেল সুপর্ণার। আলো? আলোগুলো নিভে যাক। নিভে গিয়ে মুক্তি দিক তার এই অব্যক্ত বেদনা থেকে। আলো নিভে এলো, আবছা অন্ধকারে ঘর ভ'রে গেলো। অরুণ পাষাণ প্রস্তরের মত বসে রইলো। তার মনে হোতে লাগল বাস্তবে যা' ঘটে তাতেই বুঝি সাহিত্য সৃষ্টি হয়? কিন্তু সাহিত্য সৃষ্টি করতে গেলে কি এমন ক'রে বুক ভেঙ্গে যায়?

পাশে বসে সুপর্ণা দু'হাতে মুখ চেপে চোখের জল গোপন করে। তারপর ভাঙ্গা গলায় মৃদুকণ্ঠে বলে, "এ ভালই হয়েছে। তুমি খোলস ব'লে যেটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিলে, ও সেটাকে কুড়িয়ে নিয়েছে। আমার এই রক্ত মাংসের দেহকে ও ভালোবাসে, মর্যাদা দেয়।" পর্দায় চোখ রেখে অরুণ সঙ্গে সঙ্গেই বলে, "আর ও যেটা ছুড়ে ফেলে দিয়েছে, তোমার মন—?"

দাঁতে দাঁত চেপে কান্নাভরা গলায় সুপর্ণা বলে,—"সেটা মরে গেছে।"

মহানগরীর পথে গাড়ি ছুটে চলেছে। সুব্রতর সঙ্গে সুপর্ণা সামনের আসনে আসীনা। রাত প্রায় সাড়ে ন'টা। বাইরে হিমের হাওয়া। সামনে ওদের দীর্ঘ পথ।

সুপর্ণার মনে হয় এ পথের শেষ নেই। এমনি করে যাত্রা করলে যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাওয়া যায়।

রাস্তার দু'দিক—দুটি যেন সমান্তরাল রেখা। যতদূর দৃষ্টি যায় দীর্ঘ হ'য়ে ছুটে চলেছে অনির্দিষ্টের পানে, যেন কোনও-কালে কোনও দিনই এক কেন্দ্রবিন্দুতে মিলিত হবে না। সুপর্ণা ভাবে মানুষের জীবনও কি তাই?
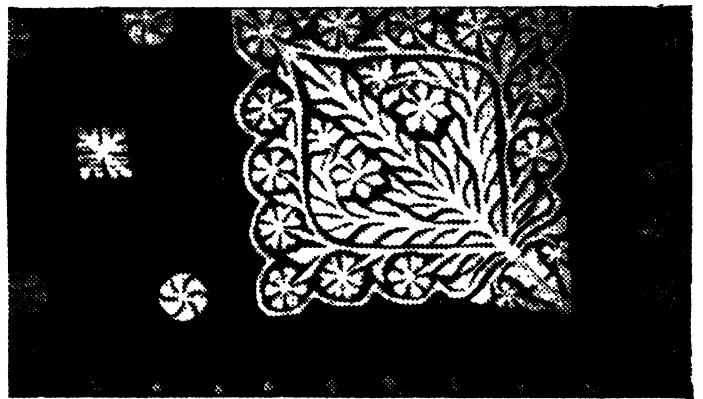
● এ্যাপলিকের চাদর

॥ জাতীয় জীবনে গ্রন্থাগার ॥

কমলা বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রন্থাগার যেন একটি জ্ঞানের সমষ্টি---জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিদের তৃষ্ণা দূর করে থাকে। এখানে আছে সেই মনীষীদের চিন্তা, যে চিন্তাধারা যুগ যুগ ধরে প্রবাহিত হয়ে আসছে কতকগুলো কালো অক্ষরের মাধ্যমে। এই মনীষিগণ তাঁদের মনের ভাব মিশিয়ে কত অপরূপ চরিত্র সৃষ্টি করেছেন তাঁদের বিভিন্ন সাহিত্যে। গ্রন্থাগার মানব মনের মণিকোঠা---যেখানে চিন্তাশীলদের চিন্তা সঞ্চিত রয়েছে। এক যুগে মানুষ চিন্তা করে যায়, সেই চিন্তাধারার রূপ ধরা থাকে কাগজের কালো অক্ষরের মধ্যে আর তার পরবর্তী যুগে মানব পড়ে থাকে---জানতে পাবে সেই অমূল্য জ্ঞান ও বিদ্যা। রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে বলেছেন---

"মহাসমুদ্রের শত বৎসরের কল্লোল কেহ যদি এমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিতে পারিত যে, সে ঘুমন্ত শিশুটির মত চুপ করিয়া থাকিত, তবে সেই নীরব মহাশব্দের সহিত এই পুস্তকাগারের তুলনা হইত। এখানে ভাষা চুপ করিয়া আছে, মানবাত্মার অমর আলোকে কালো অক্ষরের শৃঙখলে কাগজের কারাগারে বাঁধা পড়িয়া আছে। হিমালয়ের মাথার উপরে কঠিন তুষারের মধ্যে যেমন কতশত বন্যা বাঁধা পড়িয়া আছে, তেমনি এই পুস্তকাগারের মধ্যে মানব-হৃদয়ের বন্যাকে ধরিয়া রাখিয়াছে।"

সেদিন থেকে মানব লিখতে পেরেছিল, সেদিন মানব-মনের ভাবধারা এই লেখার মাধ্যমে ফুটে উঠেছিল। প্রাথমিক যুগের ভাষা, মানুষের জ্ঞানের উন্মেষ সৃষ্টি হ'ল সেই প্রকাশের ভাষাকে চিত্ররূপ দেওয়ার জন্য। মানুষের মনে এক অনুভূতির রাজ্য আছে---যার দরজা খুলে গিয়েছিল কোন এক শুভদিনে, সেদিনই তো মানবতার চিন্তা ও ভাবধারাকে নিজস্ব কল্পনায় সাজিয়ে রূপ দিয়েছিল মৃন্ময়ী মাটীর ভিতর অক্ষর সাজিয়ে (যাকে আমরা প্রথম অক্ষর বলতে পারি), বিভিন্ন ধ'চপাত্রের মধ্য দিয়ে, ভূর্জপত্র, প্রস্তরগাত্র, তাম্রফলক প্রভৃতির মধ্যে। শুনতে পাওয়া যায় মহেঞ্জোদারোর মধ্যে সাড়ে তিন হাজার পূর্বে লিখিত লেখা ও রেখা পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়ে উঠে নি এ পর্যন্ত। চামড়ার উপরও এর নিদর্শন পাওয়া যায়---উপরে থাকে লোম আর এর মধ্যে থাকে লেখা ---এ'গুলো হচ্ছে প্রাচীনতম পুঁথি। এরই মধ্যে এক বিশেষ দিনে কাগজের চলন সুরু হল পেপিরাস থেকে---যা মানুষের জ্ঞানের সীমাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছিল, জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করেছিল।

গ্রন্থাগার যুগ-যুগান্তরের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার---যা যুগে যুগে বৃদ্ধি পাচ্ছে বিভিন্ন জ্ঞানের সমষ্টি নিয়ে---এ যেন মানব সভ্যতার এক বিশুদ্ধতম ও পবিত্রতার নিদর্শন। আগেকার দিনে সাধারণ লোকদের মধ্যে শিক্ষাধারা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল না। ব্রাহ্মণ, পুরোহিতগণ ও পণ্ডিতগণ নিজের জ্ঞানভাণ্ডারের সঞ্চিত জ্ঞান দান করতেন সাধারণ লোকদের মধ্যে। তখনকার

● রেডিও নির্মাণ কারখানায় কর্মরত আরব মহিলাবৃন্দ

দিনে শিষ্যদের কাছে গুরুগৃহই ছিল একমাত্র মহান বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে গুরু মুখে মুখে শিষ্যদের শিক্ষা দিতেন তাদের জ্ঞান প্রসারের জন্য।

গ্রন্থাগারকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে—যেমন—

(১) 'ব্যক্তিগত'—আমাদের দেশে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার খুব কমই দেখা যায়। পাশ্চাত্য দেশে বিদ্যাচর্চা বেশি বলে এই গ্রন্থাগার পাশ্চাত্যের লোকেরা বেশী তৈরি করেন। এই গ্রন্থাগার ব্যক্তির রুচি ও পেশা অনুসারে সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিকগণ বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থ, আইনজীবী আইন-সংক্রান্ত, সাহিত্য রসপিপাসু ব্যক্তি কাব্যগ্রন্থ ও বিভিন্ন সমালোচনাগ্রন্থ পড়তে ভালবাসেন।

(২) 'শিক্ষা বিভাগীয় গ্রন্থাগার'—কলেজ, স্কুলে যে গ্রন্থাগার, যা ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান বৃদ্ধি করতে পারবে, বিশেষ বিভাগের গ্রন্থাগার যেমন টেক্নলজি, মেটালর্জি অথবা ডাক্তারের শিক্ষা, নৈতিক কল্যাণমূলক গ্রন্থাগার।

(৩) 'সাধারণ বা জাতীয় গ্রন্থাগার'—এই গ্রন্থাগার সর্বসাধারণের জন্য। এর উপভোক্তা জনসাধারণই। পৃথিবীর মধ্যে বড় গ্রন্থাগার প্যারিসের বিবলিওথিক, ন্যাশনাল লাইব্রেরী। বাংলা দেশেও বড় বড় গ্রন্থাগার আছে। যেমন—রাজ-মোহন লাইব্রেরী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, রাজশাহী সহরের বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির গ্রন্থাগারও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

মানুষের পরিকল্পনা ক্রমবর্ধমানে একদিন যে অমৃতের পুত্র হবে, মনের দিক থেকে যে ঊর্ধ্বগতি সেটাই মানুষের আশা। জগতে একটা বিশেষ যুগের ধারা এসেছে বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য। আমাদের জীবনে বিজ্ঞান অনেক কিছুই দিয়েছে—এ সত্য। কিন্তু মানুষের আত্মিক রীতি তা' কিছুই দিতে পারে নি।

বাইরের দিক থেকে আমাদের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে কিন্তু ভেতরের দিকে আমরা নিঃস্ব। একটি জাতি যদি বাঁচতে পারে তা' হলে তার আত্মিক শক্তি আসবে জ্ঞানের দিক দিয়ে, চিন্তার মধ্যে দিয়ে, মনের দিক দিয়ে। মানুষের দৈহিক পরিবর্তনই একমাত্র কথা নয় তার মানসিক পরিবর্তনও একমাত্র কথা। যে জ্ঞান আমাদের জীবনে লাভ আনে না, এ যেন সেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত "বিদায় অভিশাপ" কাব্যে দেবযানীর সেই অভিশাপ রয়েছে, যা আমরা প্রয়োগ করতে পারি না—ভারবাহী মাত্র। এর প্রয়োগ করতে হবে গ্রন্থাগারের মাধ্যমে —জ্ঞানের মধ্যে।

আমরা বাঁচি কেন? কেবল কৃত্তিকর পরিস্থিতি ও জৈব ধারণের জন্যই নয়, জীবনে মানুষ চলে যাচ্ছে বর্তমান সভ্যতার তাগিদে। জ্ঞান আমাদের কাছে যত শক্তি আনবে ও আমাদের আত্মিক বৃদ্ধি বাড়বে। গ্রন্থাগার এমন এক জায়গা যেখানে আমরা ভাবতে পারব সমস্ত জীবন ও জাতির কথা। আমরা যেন চিরদিনই দরিদ্রের পূজা করে এসেছি—"Plain living and high thinking".

এখানে আমরা দরিদ্রের পূজা করতে চাই না, আমরা ভাল-ভাবে বাঁচতে চাই, এর মধ্যে চাই Personal Technology. আমাদের যথেষ্ট ধন-সম্পদ চাই, কেবল বিজ্ঞান চর্চা করে নয়, কেবল লেন দেন করে নয়। আমরা জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে আমাদের আত্মিক সমৃদ্ধি বাড়াতে চাই—আমাদের মনের প্রসারতাকে বাড়াতে চাই। বিদেশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চাই। জাতীয় জীবনকে উন্নত করার জন্য একটি গ্রন্থাগার থাকবে, সেখান থেকে আমরা আমাদের মনের মতন বই পড়তে পারব এবং তার থেকে যা কিছু ভাল গ্রহণ করতে পারিব, তা জীবনে ব্যবহার করতে চেষ্টা করব।

এই ভাবেই আমরা জ্ঞানের এক একটি স্তর ভেঙ্গে আমাদের মনকে আমাদের জাতীয় জীবনকে উন্নত করে তুলতে পারব সকলের কল্যাণের জন্য। এই ভাবেই জীবন আমাদের সুগঠিত করে তুলতে পারব।

★ দাগ ★

অসীমা মৈত্র

রাত্রি দশটা বেজেছে। নার্সিং হোমের প্রায় সমস্ত কেবিনের লাইট্ নিভে গেছে। নিস্তব্ধ। কেবল আট নম্বর কেবিনটার লাইট্ জ্বলছে। কেবিনের ভেতর মিঃ চৌধুরী পায়চারী ক'রছেন আর সিগারেটের পর সিগারেট খেয়ে চ'লেছেন। যন্ত্রণা তিনি আর সহ্য ক'রতে পারছেন না। একবার বিছানায় শুয়ে, একবার পায়চারী ক'রে কিছুতেই শান্ত হ'চ্ছেন না। ছটফট ক'রছেন। শেষে কলিং-বেলটা টিপলেন। নার্স ছুটে এলো কেবিনে।

—'সিষ্টার ডাক্তার রায়কে এক-বার পাঠিয়ে দিন। আমি আর যন্ত্রণা সহ্য ক'রতে পারছি না। দয়া ক'রে একবার তাঁকে ডেকে দিন।'

—'কেন? আপনি তো আজ খুব ভালো আছেন। আপনার আজ টেম্পারেচার নেই। অন্য কোন কম্প্লেনও নেই—হঠাৎ এতো রাতে কি হ'লো?'

—'সে আপনি বুঝতে পারবেন না সিষ্টার। এ আমার কি যন্ত্রণা। উঃ আর পারছি না। একবারটি ডেকে দিন তাঁকে।'

—'কিন্তু এখন তো আসতে পারবেন না। তিনি এখন অপারেশন থিয়েটারে। অপারেশনে ব্যস্ত।'

—'অ্যাঁ কি বললেন অপারেশন

থিয়েটারে ? ভালোই হ'য়েছে।' মিঃ চৌধুরী আপন মনে কি যেন ব'লে সিষ্টারকে ব'ললেন—'ডাক্তার অপারেশন থিয়েটার থেকে বেরোলে একবার আমার কেবিনে পাঠিয়ে দেবেন।'

—'আচ্ছা, আপনি এখন শুয়ে পড়ুন।' নার্স কেবিনের লাইট্ নিভিয়ে দিয়ে চ'লে গেলো।

ঘণ্টাখানেক পরে ডাক্তার রায় ও অন্যান্য আরও ডাক্তার অপারেশন রুম থেকে বেরিয়ে এসে নার্সদের রুগীর সম্বন্ধে নির্দেশ দিচ্ছিলেন। এমন সময়ে আবার কলিং বেল বেজে উঠলো। একজন নার্স ডাক্তার রায়কে ব'ললো : 'স্যার সেদিনকার মতো আজ আবার আট নম্বরের পেসেণ্টের হাতে খুব যন্ত্রণা বেড়েছে। আপনাকে একবার উনি, ডেকেছেন।'

ডাক্তার রায় ব'ললেন : 'সন্ধ্যে সাতটায় পেসেণ্টকে একটা পেথিড্রিন ইন্‌জেকসন দিয়েছিলেন ?'

—'হ্যাঁ।'

—'আচ্ছা আমি দেখছি।'

ডাক্তার রায় আট নম্বর কেবিনে ঢুকতেই মিষ্টার চৌধুরী একবার চম্‌কে উঠে ব'ললেন : 'ডাক্তার আর পারছি না। যা হয় একটা আমার ব্যবস্থা করুন। হাতটা আমার অপারেশন ক'রে বাদ দিয়ে দিন।'

—'সে কি ?'

—'কেন ? আশ্চর্য হ'লেন বুঝি ? জানেন না এই হাতই আমার পাপ। এ হাত যতদিন থাকবে ততদিন আমাকে কষ্ট দেবে।'

—'কিন্তু কেন বাদ দেবো বলুন ? আপনার হাতের কোন দোষই আমরা পাচ্ছি না। এতবার এক্সরে ও অন্যান্য সব পরীক্ষা করা হ'লো, কিছুই পাওয়া গেলো না।'

—'উঃ আবার সেই যন্ত্রণা। অসহ্য।'

ডাক্তার দেখলেন মিষ্টার চৌধুরীর চোখ দু'টো অস্বাভাবিক লাল হ'য়ে উঠেছে। গায়ের উত্তাপও যেন কিছু বেশী মনে হচ্ছে। ডাক্তার ইন্‌জেকসন দিতে দিতে ব'ললেন : 'এবার আপনার আর কোন যন্ত্রণা হবে না। ঘুমিয়ে পড়বেন।'

তারপর ডাক্তার কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলেন। নার্স লাইট্ নিভিয়ে দিয়ে চ'লে গেলো।

সেদিন রাতে তিনি অনেকক্ষণ চিন্তা ক'রলেন এ বিষয়ে। তাঁর কাছে অদ্ভুত মনে হ'লো কেসটা। এতদিন এতো চেষ্টা ক'রেও এই অসহ্য যন্ত্রণা কমাতে পারা যাচ্ছে না। কোন কিছুতেই ফল পাওয়া গেলো না। পরের দিন সকালে ব্যস্ত থাকায় আর নার্সিং হোমে তাঁর যাওয়া হ'য়ে ওঠে নি। রাত্তির আটটায় গেলেন মিষ্টার চৌধুরীর কেবিনে। কেবিনের পর্দা সরিয়ে ডাক্তার রায় ঢুকে দেখেন তখন মিষ্টার চৌধুরী শুয়ে আছেন। ডাক্তার কাছে গিয়ে ব'ললেন : 'আপনি তো আজ বেশ ভালো আছেন। এবার আস্তে আস্তে সেরে উঠবেন। আর ভয় নেই।'

—'ভয় আমার মৃত্যু পর্যন্ত থাকবে ডাক্তারবাবু। মাঝে মাঝে মনে হয় বেশ ভালো আছি। আর যন্ত্রণা হবে না ; কিন্তু আবার সেই অসহ্য যন্ত্রণা। এ তার সেই দীর্ঘশ্বাস ; এ তার অভিশাপ। এর থেকে আমার মুক্তি নেই ডাক্তার। এই হাত—শুধু এই হাতটা আমার বাদ দিয়ে দিন ডাক্তারবাবু।'

—'কি যে বলেন আপনি। দেহ থেকে কেউ একটা অঙ্গকে বাদ দেয় ? আপনার সুস্থ-সবল সুন্দর হাত। তাকে শুধু শুধু অপারেশন ক'রে বাদ দিতে হবে ? এ আপনার মনের বিকার।'

—'আমার মনের বিকার নয় ডাক্তারবাবু। মানুষের মনের অতলে কতো অতৃপ্তি। কি বিচিত্র বুভুক্ষা। অনেক জিনিস আমাদের চোখেই পড়ে না। কিছু একটা আশ্চর্য ঘটনা যখনই ঘটে তখনই বেরিয়ে আসে প্রচ্ছন্ন সত্য। হয়তো ভুল ভেবে ভুল ক'রে সারা-জীবনটা ভুলের মাশুল গুণে যেতে হবে। আর পারছি না ডাক্তারবাবু, আমাকে বাঁচান।'

—'আচ্ছা সে সব কথা পরে হবে। কি ব্যাপার আপনি আমাকে নির্ভয়ে ব'লতে পারেন।'

—'হ্যাঁ ডাক্তারবাবু, আমি আপনাকেই সব জানাবো। আমার বোঝা খানিকটা হাল্কা হবে।'

এই কথাগুলো মিষ্টার চৌধুরী একনিশ্বাসে ব'লে হাঁপাচ্ছিলেন। ডাক্তার রায় সমস্ত লক্ষ্য করলেন। মিষ্টার চৌধুরী তাঁর য়্যাটাচী কেস্‌টা খুলে, লাল ফিতে-বাঁধা একটা প্যাকেট বার ক'রে এনে তাঁর সামনে রেখে দিলেন। একটু কি যেন ভেবে নিয়ে ব'ললেন : 'আমি প্রথম ও শেষ—এই দু'খানা চিঠি আপনাকে দেখাবো। আমার সমস্ত কাহিনী শুনে আমাকে প্রায়শ্চিত্ত করবার সুযোগ দিতে হবে। ডাক্তারবাবু আমাকে কথা দিন।'—এই ব'লেই তাঁর হাতটা চেপে ধরলেন।

তারপর প্রথম চিঠিটা দিয়ে ব'ললেন : 'পড়ুন জোরে।'

ডাক্তার চিঠিটা খুলে পড়তে আরম্ভ ক'রলেন—

প্রিয়'সু'—

অনেকদিন পর তোমার চিঠি এল আমার কাছে। খুব চ'টে গিয়েছিলাম কিন্তু। এখন আর আমার একটুও রাগ নেই। মনে হ'চ্ছে কি জানো ? অনেকদিন তোমাতে-আমাতে দেখা নেই অথচ ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম সে কি। এই তো—দিন পনেরো মাত্র। সমুদ্রের বেলাভূমি-তীরে আমাদের দিনগুলো যেন অশান্ত, উচ্ছল তরঙ্গ স্রোতের মতো কেটে গেলো। এক এক সময় মনে হয় আমাদের দিনগুলো বড়ো তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেলো। যে জিনিস সুন্দর আনন্দের তা ক্ষণিকের জন্যে আসাই ভালো। সেই দিনগুলোর কথা

ভাবলে আমার এতো ভালো লাগে যে আমি তোমার ভাষায় কি জানাবো। এ ভাব আমার ভাষাহীন অপরূপ। যেমন অপরূপ—প্রদোষলোক। তার একদিকে দিনের আলো অন্যদিকে রাতের নিবিড় অন্ধকার। মাঝখানে এমন একটা সময় যখন পৃথিবী দেখা না-দেখার সীমানায় একটুখানির জন্য অপরূপত্ব লাভ করে। সেই মধুর দিনগুলো আমার একমাত্র সাথী আর পথ চলার পাথেয়।

আজ এইখানেই চিঠিটা শেষ ক'রতে চাই। রাগ কোরো না লক্ষ্মীটি তোমার পড়াশোনার যেন কোন ক্ষতি না হয়। পরীক্ষা বোধ হয় এসে গেছে, তাই না? পাশ ক'রতেই হবে আমাদের। আমার আন্তরিক প্রীতি ও ভালবাসা জেনো।

ইতি—'জয়ন্ত'

মিষ্টার চৌধুরী আর একখানা চিঠি এগিয়ে দিয়ে ব'ললেন: এবার এইখানা। সেটাতে লেখা—

প্রিয় 'সু'—

তোমার চিঠি পেয়ে সব জানতে পারলাম। এ কথাগুলো তুমি আমায় আরো আগে জানাতে পারতে। তোমার বাবা যখন কথা দিয়েছেন তখন তুমি তার সম্মান নিশ্চয়ই রাখবে। নিজেকে অতটা উতলা কোরো না। দুঃখ কোরো না। আমাদের প্রেম অমর হ'য়ে থাকবে চিরদিন। বিয়ের ছাতনা তলার পিঁড়িতে ব'সে দু'টো মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে স্বর্গের গণ্ডীর মধ্যে তোমায় টেনে আনি নি ভালোই হ'য়েছে। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনের মাঝে নিজেদের শুধু নিঃশেষিত ক'রে ফেলতাম হয়তো। নিজেকে সঙ্গতিপূর্ণ ক'রে নিয়ে আমাদের মিলন চেয়েছিলাম। আমার ভাগ্য ভ্রূকুটি ক'রে অলক্ষ্যে হাসলো। চাওয়ার সঙ্গে পাওয়ার বিরোধ চিরকালই। যেটুকু পেলাম তাতে তৃপ্ত না হ'য়ে যেটুকু পেলাম না তার জন্যে ব্যাকুলতার দীর্ঘশ্বাস ফেলে লাভ কি বলো?

তুমি লিখেছো জীবনের বাকী দিনগুলো অপেক্ষা ক'রে থাকবে আমার দেখা পাওয়ার জন্যে। আমি সেই আশায় থাকবো। আমার এতেই আনন্দ। 'তুমি সুখে থাকবে' এই কামনা করছি। হয়তো আনন্দ পাবে না জানি। আনন্দটা মানুষের মনের। আনন্দ সকলের জন্যে নয়। তোমার নতুন ঠিকানা থেকে তোমাদের দু'জনের খবর দিয়ে আমাকে চিঠি দিও। আমি যাবো নিশ্চয়ই। ভুলে যাবে না জানি; আমি ভুলবো না। ভালবাসা রইলো।—

ইতি—'জয়ন্ত'

চিঠি দু'খানা প'ড়ে ডাক্তার খানিকক্ষণ গভীরভাবে কি যেন ভাবছিলেন। হাওয়া যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেছে। কেউ কিছুক্ষণ কোন কথা ব'লতে পারে নি। ঘরের মৌন স্তব্ধতা ভেঙ্গে মিষ্টার চৌধুরী প্রথম কথা ব'ললেন; 'কি—খুব গভীর ভালবাসা না?'

—'হ্যাঁ।'

—'এই চিন্তাই আমার অভিশাপ। জানেন তারপর'—ব'লে আবার খানিকক্ষণ অন্যমনস্ক হ'য়ে চিঠির প্যাডটার ওপর কেবল হিজিবিজি দাগ কাটতে লাগলেন। কথার খেই হারিয়ে ফেললেন। জিজ্ঞেস ক'রলেন: 'কি বলছি

'—তারপর—'

হুড. প্রপাতের পথে —শ্রীমতী উষা সিন্হার অঙ্কিত

—ওঃ মনে প'ড়েছে। আমাদের আর আমার স্ত্রী সুরমাতে কোন কিছুই গোপন ছিলো না। খোলা মন নিয়ে দু'জনে কথা ব'লতাম। কিন্তু কেন যে আমি শেষ কথাটা তাকে জিজ্ঞেস ক'রতে পারি নি তা আমি বুঝলাম না। দু'জনে কতোদিন গল্প ক'রতে ক'রতে রাত কেটে গেছে। আমি কতক্ষণে বাড়ী ফিরবো সেজন্যে সে পথ চেয়ে বসে থাকতো। প্রতিটি দিন আমাদের কাছে নতুন বেশে আসতো। আমি ছাড়া সে কোন কিছুতেই আনন্দ পেতো না। আমিও তাই। আবার তিনি অন্যমনস্ক হ'য়ে গিয়ে আঁচড় কাটতে লাগলেন। নিজের গভীর বেদনাকে এইভাবে চাপবার প্রচেষ্টা।

ডাক্তার ব'ললেন : 'এই গভীর ভালবাসায় ছেদ প'ড়লো কেন?'

মিস্টার চৌধুরী ব'ললেন : 'ওঃ ব'লছি। তারপর একদিন সুরমার দাদা বিলাত থেকে এলো তার বাবা-মাকে দেখবার জন্যে। দু'দিন থেকেই আবার যাত্রা করবে বিলাতে। বাপের বাড়ী থেকে সেইজন্যে ফোন এলো—সকালে সুরমাকে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। সুরমার প্রথমটা আমাকে ছেড়ে যেতে ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু কি ক'রবে, আমাকে সেদিন অফিস যেতেই হবে। আমাকে বিকেলে যাওয়ার কথা ব'লে সে চ'লে গেলো। মিনিট পাঁচেক পরে, রাস্তা থেকে আবার ফিরে এসে চাবির গোছা থেকে একটা চাবি খুলে নিয়ে চ'লে গেলো। আমি সুরমাকে জিজ্ঞেস ক'রলাম : ফিরে এলে কেন?

—ও কিছু না। ব'লে সে চ'লে গেলো।

আমার কি রকম খারাপ লাগলো ভাবলাম—সামান্য জিনিসটা আমাকে না বলার কি আছে? আমি যে চাবি নেওয়াটা দেখে ফেলেছি সেজন্যে তার মুখের চেহারাটা কি রকম অপ্রতিভ দেখালো। তারপর সুরমা চ'লে যাবার পর চাবিটা দেখলাম। টেবিলের একটা ড্রয়ারের চাবি নিয়ে গেছে। প্রায়ই দেখতাম এই ড্রয়ার খুলে কি দেখ্‌তো; আবার বন্ধ ক'রে দিতো। যদি আমায় দেখতো তা'হলে ওর মুখের ভাব ঠিক এইরকম হতো। আমার মাথায় কেবল এই এক চিন্তা আরম্ভ হ'লো। অফিস গিয়ে কোন কাজ করতে পারলাম না। বাড়ী ফিরে এলাম। একটু পরে রাস্তা দিয়ে 'চাবি সারাবে চাবি' হাঁক শুনলাম। চাবিওয়ালাকে ডেকে সেই ড্রয়ারটার চাবি করিয়ে নিলাম। ড্রয়ার খুলে এই লাল ফিতে বাঁধা প্যাকেট পেলাম। খুলে সমস্ত প'ড়লাম। রাগে, অভিমানে, উত্তেজনায় আমার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগলো। মনে হ'লো এখুনি গিয়ে তার মুখের ওপর এগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সব শেষ ক'রে আসি। কিন্তু ভালবাসা এমনি হিংসাত্মক যে, মানুষ মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারে তার প্রিয়জনকে। ভাবলাম—না, তা'হলে তো ভালোই হবে দুজনের আবার তাদের মিলন হবে। তারপর নিজের মনেই উন্মাদের মতো চীৎকার ক'রলাম। রাত্রি হ'য়ে গেছে; অন্ধকারেই ব'সে থাকলাম। ওদিকে আমি যাই নি ব'লে সুরমা বাপের বাড়ী থেকে তাড়াতাড়ি চলে এলো। ঘরে লাইট জেলে অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস ক'রলো।

একি! কি হ'য়েছে ঘরের অবস্থা! তোমার মুখের চেহারা অমনি কেন? তুমি কি রাগ ক'রেছো; গেলে না কেন? এই রকম নানারকম প্রশ্ন। তখন আমি কোন কথাই ব'লতে পারছিলাম না। সুরমা এসে আমার গলা জড়িয়ে আদরের সুরে ব'ললো : কি হ'য়েছে তোমার, বলো না গো লক্ষ্মীটি। আমি রাগে শুধু তাকে ছিট্‌কে ফেলে দিলাম। তার হাতের কনুইটা টেবিলের ফুলদানীতে লেগে গেলো। রক্ত প'ড়তে লাগলো। তার অভিমান ছিল বেশী। কোন কথা ব'ললো না। অনেক রাত হ'য়ে গিয়েছিল। প্রত্যেক দিনের মতো দু'গ্লাস জল রেখে দিল। এক গ্লাস আমার ও আরেক গ্লাস তার। আমি ইজিচেয়ারে অনেক রাত পর্যন্ত কাটালাম। তারপর কি মতিচ্ছন্ন হ'লো—সুরমার গ্লাসের জলে বিষ মিশিয়ে রাখলাম। সুরমা তখন অঘোরে ঘুমোচ্ছে। পরের দিন যখন আমার ঘুম ভাঙলো তখন সব শেষ। সুরমার নিশ্চল নিস্পন্দ দেহখানা প'ড়ে আছে বিছানায়।

এরপর প্রায় একমাস কেটে গেলো। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যের সময় মিলিটারী পোষাক পরনে এক ভদ্রলোক এলো। সুরমা দেবী আছেন কি না খোঁজ করাতে আমি তার নাম জিজ্ঞেস ক'রলাম। সে ব'ললো: আমার নাম জয়ন্ত গোস্বামী।

আমি কথা ব'লতে পারছি না। আমার গলা যেন আট্‌কে গেছে। ঘরের মধ্যে বিষণ্ণ শুব্ধতা বিরাজ ক'রছে।

সে আবার ব'ললো : সুরমা দেবীকে যে আমার বিশেষ দরকার। যে ক'রেই হোক, আমাকে দেখা ক'রতেই হবে।

ব'ললাম : তাঁর সঙ্গে আপনার আর দেখা হবে না।

—এই দেখুন তিনি আমায় চিঠি দিয়েছেন।

জয়ন্ত এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমি খপ্ ক'রে চিঠিটা কেড়ে নিয়ে প'ড়তে লাগলাম—

কল্যাণবরেষু জয়ন্ত,

ভাই অনেকদিন ধ'রে সুনন্দার চিঠিগুলো আমার কাছে গচ্ছিত আছে। আমি বহুযত্নে লুকিয়ে রেখেছি। তুমি এসে সেগুলো নিয়ে আমায় মুক্তি দাও। আমার মনে হয় সুনন্দাও তোমাকে জানিয়েছে। আমার প্রীতি ও শুভেচ্ছা জেনো।

ইতি—তোমাদের সুরমাদি

চিঠিগুলো আর দিই নি জয়ন্ত গোস্বামীকে। ওইগুলো আমার পাপের সাক্ষী। ভুলের স্মৃতি······।

চিত্রে সংবাদ

● লাহোর এলাকার কোন এক স্থানে ধ্বংসপ্রাপ্ত প্যাটন ট্যাঙ্কের সামনে উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারদের সঙ্গে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী

● একটি অগ্রবর্তী ষ্টেশনে গ্নাট বৈমানিকদের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের এয়ার এ্যাটাচীরা

বিদেশ সফরান্তে রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ প্রত্যাবর্তন করলে বিমানবন্দরে তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রী ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

রিষড়া এ্যালকেলি কেমিক্যাল কারখানায় শহীদ বেদীতে মাল্যদান করছেন ভারতীয় বিমানবাহিনীর এয়ার ভাইস মার্শাল শিবদেব সিং

● পঃ বঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইডুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী

● শিয়ালকোটের সালিয়ান গ্রামে পরিত্যক্ত এক ৮৫ বৎসরের বৃদ্ধাকে আমাদের এক জওয়ান খাটিয়াতে বসিয়ে দিচ্ছেন

পুরাতন বন্ধু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য সচিব শ্রীরঞ্জিৎ গুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাচ্ছেন সর্বাধ্যক্ষ জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী

দিল্লীর সামরিক হাসপাতাল থেকে একদল জওয়ান চিড়িয়াখানা পরিদর্শনে এলে একটি হাতী তাঁদের একজনকে বিজয়মাল্য পরিয়ে দিচ্ছে
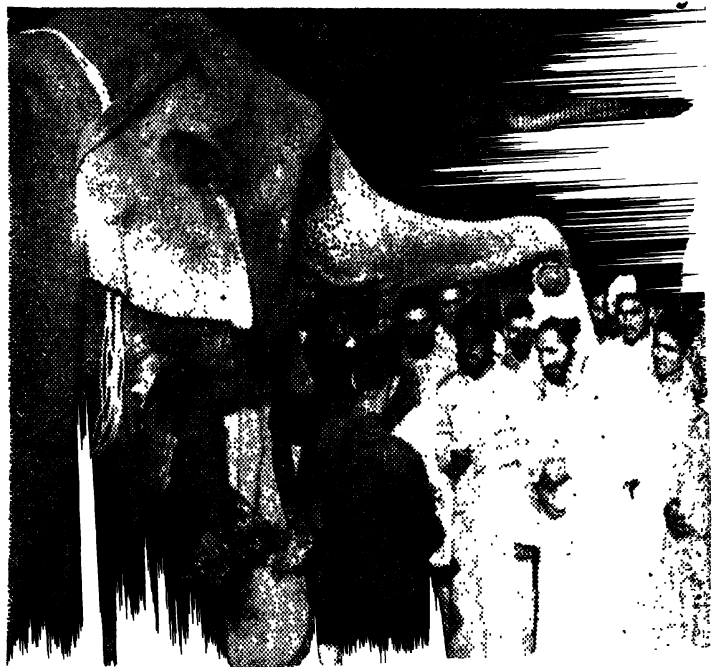
● ভারত-পাকিস্থান সঙ্ঘর্ষ সম্পর্কে শিলংয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন আসামের সামরিক আঞ্চলিক যোগাযোগ বিভাগের জি, ও, সি, মেজর জেনারেল জং বাহাদুর সিং

জাকার্তায় বিক্ষোভকারিগণ কম্যুনিষ্ট পার্টির সদর কার্যালয়ে অগ্নিসংযোগ করছেন

★ মেঘদূত কাব্যে অতীন্দ্রিয়বাদ ★

সংযুক্তা মিত্র

মহাকবি কালিদাস ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রোমান্টিক কবি। প্রকৃতির রাজ্যে কবিভাবনার ভেলায় ভাসিয়া তাঁহার অবাধ বিচরণ। বহু জনের বহু মনের বহু দিনের অব্যক্ত ও অনির্বচনীয় বেদনার বাণী তাঁহার কাব্যে বাঙ্ময়রূপ লাভ করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'কত নববর্ষার মেঘ বলাকার শ্রেণী, তপ্ত ধরণীর পরে বারিসেচনের সুগন্ধ, কত পর্বত-অরণ্য নদী-নির্ঝর নগর-গ্রামের উপর দিয়া ঘন পুঞ্জ-গম্ভীর আষাঢ়ের স্নিগ্ধ সঞ্চার, কবির মনে কতদিন ধরিয়া কত ভাবের ছায়া, সৌন্দর্যের পুলক, বেদনার আভাস রাখিয়া গেছে। কাহার মনেই বা না রাখে! জগৎ তো দিনরাতই আমাদের মনকে স্পর্শ করিয়া চলিয়াছে এবং সেই স্পর্শে আমাদের মনের তারে কিছু না কিছু ধ্বনি উঠিতেছেই।

...আজ তাহারা যক্ষের বিরহবার্তার ছুতাটুকু লইয়া বর্ণনার সুরে সুরে মন্দাক্রান্তার স্তবকে স্তবকে ধ্বনাইয়া উঠিল। —এবং ইহার ফলে আমরা যাহা পাইলাম তাহার নাম মেঘদূতম্; শুধু ভারতীয় সাহিত্যে নহে, বিশ্বের সাহিত্য-প্রাঙ্গণে অনবদ্য শাশ্বত সৃষ্টি। ইহার কাব্যধ্বনি কেবলমাত্র পরম রমণীয় সৌন্দর্যলোকই রচনা করে নাই, গভীর গহন দার্শনিক উপলব্ধির চেতনার রাজ্যে উধাও হইয়াছে।

কাব্যখানি উৎকৃষ্ট প্রকৃতি-নির্ভর মধুর রসাত্মক খণ্ডকাব্য হইলেও কবিচিত্ত এখানে মেঘকে আশ্রয় করিয়া এই মর্ত্যভূমির বিচ্ছেদবিধুর দুঃখলোক হইতে দেবতাত্মা হিমালয়ের উর্ধ্বস্থিত পরমসুন্দর শিবলোকে বা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলোকের সন্ধানে অভিসারী হইয়াছে। অমৃতের পুত্র মানব তাহার চিরন্তন স্বরূপকে ক্ষণবিস্মৃত হইয়া অনন্তলোক হইতে নির্বাসিত হইয়া বিরহের শৈলতটে বাস করিতেছে। রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন:

'কিন্তু এ কথা মনে হয়, আমরা যেন কোন এককালে একত্র এক মানস-লোকে ছিলাম।' অন্তরে তাই তার অপ্রাপ্তির হাহাকার। যেদিন আষাঢ়ের সজল মেঘে আকাশ ছাইয়া যায় যেদিন কুটজকুসুম প্রভৃতির গন্ধে বাতাস মন্থর হইয়া উঠে, সেদিন সেই হঠাৎ পাওয়া—এক একদিন সে যেন অধিক আকুল হইয়া তাহার বিরহ-বেদনাকে অনুভব করে। কিন্তু সম্মুখে দুস্তর বাধার প্রান্তর। সীমার বন্ধন। তাই সে উর্ধ্বলোকগামী মেঘকে আশ্রয় করিয়া নিজেকে তাহার সহিত উর্ধ্বগামী করিতে চায়। মর্ত্যভূমির বিরহ-বেদনার বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে চায়। তাই 'ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতের' সমবায় জানিয়াও তাহার বিরহী চিত্ত চেতন ও অচেতনের ভেদ-রেখা ভুলিতে চায়। কোথায় সে যাইতে চায় সে কথা প্রথমেই নিবেদন করে।

'গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম
যক্ষেশ্বরাণাম্।'

অর্থাৎ হৃদয়ের ব্যাকুলতা বহন করিয়া পৌঁছাইতে হইবে অলকায়—যে অলকা একান্ত সুখময়, নিরন্তর আনন্দলোক। প্রসিদ্ধ টীকাকার ভরত-মল্লিক অলকার ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন যেখানে সুখের পরাকাষ্ঠা তাহাই অলকা। কিন্তু তাহা কেবলই সুখকর নহে, তাহা আবার শিবলোকও। কারণ অলকার কথা বলিতে যে কথা প্রথমেই কবিচিত্তে ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহা এই যে, সেই অলকার প্রাসাদাবলী তাহার বাহ্যোদ্যানস্থিত চন্দ্রমৌলির চন্দ্রকলার স্নিগ্ধ-জ্যোৎস্নায় বিধৌত।

'বাহ্যোদ্যানস্থিত হরশিরশ্চন্দ্রিকা-
ধৌতহর্ম্যা।'

অর্থাৎ বিরহের ছায়াঘন যে পথে কবিচিত্ত প্রথম যাত্রা শুরু করিয়াছিল তাহারই শেষে আছে সত্য, শিব, সুন্দরের পরমমঙ্গললোক।

ধূলিমলিন জীবনে অভ্যস্ত মর্ত্যবাসী সহজে সেই শ্রেয়োপথে যাইতে পারে না। প্রবৃত্তিমার্গের পথে তাহার সতত বিচরণ। এই প্রবৃত্তিমার্গের ভিতর দিয়াই তাহাকে সত্যসন্ধানে যাইতে হইবে। কিন্তু ভোগের শেষপ্রান্তের কথা ত্যাগ। তাই এই প্রবৃত্তিমার্গের শেষেই আছে সেই আনন্দসুন্দর শিবধাম। সেখানে যাহা কিছু সবই সুন্দর, সবই মধুর।

তাই দেখি মেঘ চলিয়াছে জনপদের পর জনপদ অতিক্রম করিয়া, ধরণীর কান্তরূপে, প্রকৃতির প্রণয়ীরূপে—শিবলোকের সন্ধানে। কত তার বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অনুভূতি। প্রবৃত্তির কত রম্য অনুসরণ। মাঝে মাঝে মহাকালের মন্দিরে পটহধ্বনি মন্দ্রিত করিয়া, সান্ধ্যমেঘে পূজার জন্য নবজবাপুষ্পের রক্তিমা বিস্তার করিয়া, নৃত্যপরায়ণ নটরাজের ভুজবরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ও তাঁহার আর্দ্র-নাগাজিনেচ্ছা পূরণ করিয়া এই শুধুই প্রবৃত্তিমার্গে বিচরণ হইতে তাহার ক্ষণিক বিরাম পাইয়াছে।

কিন্তু এই পথের শেষের সীমানায় আছে দেবগিরি। এবার হইতে মেঘ আর শুধু প্রণয়াভিসারী নহে, সে এখন শুদ্ধ, পবিত্র সৌন্দর্য বা শিবলোকের অভিসারী। এখন তাহার পবিত্র হইবার পালা। সন্ধানের শেষে প্রাপ্তির মঙ্গলক্ষণের দ্বারপ্রান্তে যে উপনীত। তাই এখানে মেঘ এবং মেঘের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত কবিচিত্তও বুঝি—,আকাশ গঙ্গায় ধৌত পুষ্প বর্ষণের ন্যায় বারিবর্ষণে প্রথমে স্কন্দকে যিনি পরম শিবের শ্রেষ্ঠ অংশ, স্নান করাইয়াছে। তারপর শার্ঙ্গপাণি বিষ্ণুর অঙ্গকান্তি ধারণ করিয়া পবিত্র কুরুক্ষেত্রের উপর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। কামনার তমোলোক হইতে কর্মের রজোলোক অতিক্রম করিয়া সত্ত্বলোকের দিকে তাহার অভি-

ধারা। রজোবিমুখ বলরামের স্নানপুণ্য সরস্বতীকে প্রতিবিম্বনের দ্বারা অবগাহন করিয়া সে অন্তঃশুদ্ধ হইয়াছে। কনখলের নিকট শৈলরাজাবতীর্ণা গঙ্গাকে দর্শন করিয়া এবং তাহার ফেনশুভ্র-সলিলে কৃষ্ণ ছায়াপাতের দ্বারা অস্থানে গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমের বিভ্রম ঘটাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছে এবং অবশেষে তুষার-শুভ্র হিমালয়ের শিখরভাগে উপনীত হইয়াছে। ইহাই নিত্য আনন্দ লোকের প্রথম সোপান। এখানে কস্তুরী-মৃগের সৌরভে শিলাতল রম্য, এখানে চন্দ্রশেখরের চরণ চিহ্নে উপলসমূহ পুণ্য, এখানে সিদ্ধ পুরুষগণের পূজা উপচারে এই স্থান ধন্য। এখানে প্রকৃতি শিববন্দনায় নিত্যমুখর।

'বাতাসে ভরপুর বেণুর সুমধুর শব্দ ওঠে
সেথা অবিরাম,
মিলিত কিন্নরীকণ্ঠে বেজে ওঠে
ত্রিপুরবিজয়ের গীতিকা।'
(অনুবাদ—বুদ্ধদেব বসু।)

কিন্তু যাত্রা এখনও শেষ হয় নাই। তাহাকে আরো উত্তরে যাইতে হইবে। আরো উত্তীর্ণ হইতে হইবে ক্রৌঞ্চরন্ধ্রপথ দিয়া আপনাকে সঙ্কুচিত করিয়া আরো উর্ধ্বলোকে উঠিতে হইবে। তাহার পূর্বস্বভাবকে দমন করিয়া নবরূপে রূপান্তরিত হইতে হইবে। বলিকে যেরূপ বিষ্ণু দমন করিয়াছিলেন সেইরূপে।

অবশেষে পরম শিবলোকে তাহার উত্তরণ। এখানে নিত্য-সুন্দর শিবধাম। এখানে কৈলাশ তাহার শুভ্রবর্ণচ্ছটায় তাঁহার উচ্চহাস্য যেন গগনে বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্বয়ং শিব এখানে পার্বতীর সহিত নিত্যলীলায় আনন্দিত। এখানে সরোবর স্বর্ণকমল-প্রসূ। এইখানেই অলকা। নিত্যসুখধাম পুণ্যসলিলা গঙ্গা যাহার দুকূল রচনা করিয়াছে। পবিত্রতা, রমণীয়তা ও প্রশান্তির শেষ কথা এই অলকা।

আর সন্ধান নয়। এবার অভীপ্সিতার দর্শনলাভ। কবিচিত্ত এখানে মেঘমুখে এই কথাই বলিতে চাহিয়াছে, যে,—যদিও আমরা আনন্দের শিবলোক হইতে দুঃখের মর্ত্যলোকে নির্বাসিত, তথাপি আমরা একান্ত আত্মবিস্মৃত নহি। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—

"প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতল-স্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানসসরোবরের অগমতীরে বাস করিতেছে। - - - - আমরা প্রত্যেকে নির্জন গিরিশৃঙ্গে একাকী দণ্ডায়মান হইয়া উত্তরমুখে চাহিয়া আছি। মাঝখানে আকাশ, এবং মেঘ এবং সুন্দরী পৃথিবীর রেবা, শিপ্রা, অবন্তী, উজ্জয়িনী, সুখ-সৌন্দর্য ভোগ-ঐশ্বর্যের চিত্রলেখা—যাহাতে মনে করাইয়া দেয়, কাছে আনিয়া দেয় না—আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করে, নিবৃত্তি করে না। দুটি মানুষের মধ্যে এতটা দূর।"

তথাপি কোনো বিশেষ মুহূর্তে সেই সুরম্য নন্দনলোকের মধুর পবন আমাদের স্পর্শ করিয়া যায় বৈকি। যে আমাদের নিত্যকালের চিরদয়িত তাহাকেও স্মরণ করিয়া তাহার সহিত মিলন-পিপাসায় চিত্ত আমাদের মাঝে মাঝে ব্যাকুল হয় বৈকি। এবং আমরা ইহাও জানি যে, এই বিরহ চিরন্তন নয়। সীমা একদিন অসীম-সাগরে বিলীন হইবে। বাধা শুধু মর্ত্যজীবনের সীমিতকালটুকু।

শিশু-শিক্ষা সম্পর্কে

তৃপ্তি রায়

বাড়ী ফিরবার সময় গলির মোড়ে হঠাৎ নরেনবাবুর সঙ্গে ভবতোষবাবুর দেখা। নমস্কার বিনিময়ের পর নরেনবাবু ভবতোষবাবুর পারিবারিক খবর নেন। ভবতোষবাবু অত্যন্ত আক্ষেপের সুরে বলেন, ব্যবসা তো প্রায় অচল কিন্তু তার চেয়েও মহা-সমস্যায় পড়েছি ছেলেদের নিয়ে। তাদের জন্য পয়সার শ্রাদ্ধ হচ্ছে অথচ তাদের কাছ থেকে আশানুরূপ ফল পাচ্ছি না। এক একটা ছেলের পিছনে তিনটে করে প্রাইভেট টিউটর দিয়েও তাদের প্রমোশন নিয়ে বছরের শেষে সে কি ভীষণ চিন্তা মশায়—মহামুস্কিলে পড়েছি। এত করে বলি বাবা খেলাধুলো রাখ পড়াশুনা কর নইলে খেতে পাবি না তবু ভ্রূক্ষেপ নেই কথায়। আমরা তো মশায় নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি ওদের পড়াশুনার খোঁজ করতে পারি না তাই যখন তাদের এসব উচ্ছৃঙ্খলতা দেখি কষে মার দিই। কি যুগের হাওয়া এল বলুন তো।

এ সমস্যা কিন্তু কেবলমাত্র নরেনবাবু ভবতোষবাবুর নয় আমার এবং আপনার মত অনেক অজ্ঞ অভিভাবকের। তাই চিন্তা করতে হবে গলদ কোথায়? যুগের হাওয়ায় না ছেলেদের? না অভিভাবকদের?

স্বীকার করছি আমাদের শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে বিরাট ত্রুটি বা গলদ আছে যার পরিবর্তন প্রয়োজন—কিন্তু তা যখন আমাদের মত দৈন্য-পীড়িত দেশে সত্বর সম্ভব নয় তখন অভিভাবকদের ছেলেদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিসম্পন্ন হতে হবে।

আমাদের কর্মব্যস্ত নাগরিক-জীবনে ছেলেদের সম্বন্ধে চিন্তার অবকাশ কতটুকু? আমরা অর্থ উপার্জনের ব্যস্ততার দোহাই দিয়ে ছেলেদের প্রতি বড় উদাসীন বড় নির্মম। আমরা তাদের কাছ থেকে নিংড়ে নিতে চাই কেবলমাত্র আমাদের স্বার্থটুকু। তাদের দ্বারা নাম যশ ও অর্থ উপার্জন করবার লোভে তাদের যন্ত্র বানাবার জন্য উৎকট আগ্রহ প্রকাশ করি মাত্র। তাদের প্রতি ব্যতিকার কল্যাণচিন্তা আমরা

কতটুকু করি, আমাদের ক্ষমতা কতখানি ?

শিশুদের জীবনের প্রতি আমরা বড় উদাসীন। আমরা তাদের সমগ্র জীবনের কথা চিন্তা খুব কমজনই করি। এককথায় বই মুখস্থ ছাড়া তাদের সংসারে আর কোন ক্রিয়া আছে বলে আমাদের ধারণা কম। কিন্তু আমাদের জানতে হবে মনে রাখতে হবে শিশুদের জীবন নির্জীব একটা যন্ত্রমাত্র নয়, তা প্রাণপ্রাচর্যে ভরপুর উচ্ছল একটা ঝর্ণা বা জলপ্রপাতের মত; এবং প্রাণপ্রবাহকে যদি আমরা বাধা দিয়ে হঠাৎ রুখতে যাই তা উচ্ছ্বসিত ও স্ফীত হয়ে চতুর্দিক ধ্বংস করবে—তাই শিশুর প্রাণাবেগকে বাধা না দিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে বাধা দাও—ফলবে সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলার নব নব ফসল; জগৎ উদ্ভাসিত হবে তাদের জ্ঞানালোকে। শিশুকে খেলতে দাও, দস্যিপনা করতে দাও, লক্ষীছাড়া হতে দাও, ঠেকতে দাও, ঠকতে দাও, শিখতে দাও। অমন করে ভালো শিশু করে বেঁধে রেখ না। খেলাটা সময় ও শক্তির অপব্যবহার নয়, শিশু মনের অবুঝ খামখেয়ালী নয়—এ ওদের প্রকৃত স্বভাব এর মধ্য দিয়েই ওরা আস্তে আস্তে জানতে শেখে ব্যক্তিকে, জীবনকে, জগৎকে। এতো শেখারই মাধ্যম। তাই খেলা আর পড়া, এ দুটো বিপরীত প্রতিক্রিয়া নয়, এদের সম্বন্ধও অহিনকুল নয়।

শিশু জীবনে খেলার স্থান ও প্রয়োজনীয়তাকে মেনে নিয়েছেন এবং খুব বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন বিশ্বের কল্যাণকামী মনীষীরা এবং আজ তাঁরা উদাত্ত ও উচ্চকণ্ঠে বলছেন, তাদের বদ্ধ করে না রেখে তাদের নিজস্ব স্বভাবের মধ্যে ছেড়ে দিতে। বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী জাঁ-জ্যাকস রুশো, যোহন হেনরিক পেস্তালৎসী, ফ্রেডরিক হারবার্ট, ফ্রুএবেল, মন্তেসরী, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী সকলকেই স্বীকার করে নিলেন শিশুর ক্রিয়াচঞ্চল সত্তাকে। তাঁরা স্বীকার করলেন শিশুকে সাঁতার শেখাতে হবে, দৌড়ঝাঁপ, লাফ ইত্যাদি দস্যিপনা করতে সুযোগ দিতে হবে,—যাতে হাতের ও আঙ্গুলের দক্ষতা বাড়ে এমন সব খেলা ও কাজে তাকে রত করতে হবে, তাকে রোদ, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্মে অভ্যস্ত করতে হবে।

এতে তাদের শরীর হবে শক্ত, মন হবে বলিষ্ঠ সতেজ। এবং সেই মন হবে পরিশ্রম, শিক্ষা গ্রহণ ও অধ্যয়নের আধার। তারা কেবল বই-থেকে তথ্য মুখস্থ করবে না তারা সেগুলি বিচার করবে আবিষ্কার করবে। বই থেকে ছাড়া পেয়ে বাস্তব জীবনের সঙ্গে শিশু যত মিশবে তত বাড়বে তার অভিজ্ঞতা, মানুষের দুঃখ-বেদনা, ও মহত্ত্বের সংস্পর্শে এসে শিখবে মানুষকে ভালবাসতে তাকে সম্মান করতে—তাই প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী ও শিক্ষাবিদগণ তাঁদের জীবন সমর্পণ করলেন এক একটি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। তাঁরা পরীক্ষামূলকভাবে উদ্ভাবন করলেন খেলার মাধ্যমে শেখার বিভিন্ন পদ্ধতি। দেখা গেল প্রাচীনপন্থী, রক্ষণশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা এঁদের ছাত্ররা শেখার দিক থেকে অনেক বেশী সফলতা লাভ করল।

খেলার বা দস্যিপনার মাধ্যমে শিশুর মানসিক শক্তিকে বাড়াতে হবে; তার মানসিক আধারকে বড় করতে হবে তবেই তাতে অনেক জিনিষ ধরবে।

পেস্তালৎসী বললেন, সমস্ত শিক্ষা-দানের ভিত্তি হবে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারা শিশুর মন-বিকাশ লাভ করবে এবং এই বিকাশের ধারা অনুযায়ী তার শিক্ষার বিষয় নিয়ন্ত্রিত হবে। শিক্ষা শিশুর স্বাভাবিক-আগ্রহ প্রয়োজন ও ক্রিয়ার স্বাভাবিক পরিণতি।

ভগবান বাইরের থেকে জোড়া লাগান না, বাইরের থেকে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেন না, তিনি প্রত্যেক ব্যক্তির

—একথা বললেন ফ্রোএবেল।

তাই শিক্ষা কেবল বই মুখস্থ করে হয় না, ছেলেকে তার পরিবেশের সঙ্গে মিশতে দিতে হবে, সমাজের জীবন্ত পটভূমিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। ব্যক্তি ও সমাজ বিপরীত নয়, বিচ্ছিন্নও নয়। অন্য মানুষের সঙ্গে যুক্ত হয়েই মানুষের শিক্ষা সম্ভবপর। সেজন্য ছেলেদের বন্ধু নির্বাচন করতে দাও, বন্ধুদের সংস্পর্শে আসতে দাও, তাকে বই-এর কারাগার থেকে মুক্ত করে মিশতে দাও মানুষের সঙ্গে একে উচ্ছৃঙ্খলতা বা খেয়ালখুশী মনে কোর না।

ফ্রোএবেল আরও বলছেন খেলা হচ্ছে শিশুর বিকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ দিক, কারণ অন্তরের শ্রেষ্ঠ প্রয়োগ ও আবেগ অনুযায়ী অন্তর জগতের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই হচ্ছে শিশুর খেলা।

কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমাদের ছেলেদের বিদ্যালয়গুলিতে খেলার পরিসর নেই বললেই চলে। বিশেষতঃ কলকাতার বিশিষ্ট বিদ্যালয়গুলিও খেলার মাঠ সংলগ্ন নয়। বিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে তারা বন্দী হয় তাদের সংকীর্ণ বাসস্থানগুলিতে। এমতাবস্থায় আমরা ছেলেদের কোন পার্কে বা মাঠে বিকালে খেলার ব্যবস্থা করে দিলে তাদের শরীর ও মন দুইই ভাল থাকবে তারা সন্ধ্যার সময় পড়ায় উৎসাহ পাবে। কারণ তাদের স্বাভাবিক জীবন ধর্ম গতিশীলতা চঞ্চলতা—অ রক্ষিত হবে, তাদের প্রাণের গতি রুদ্ধ হবে না—এবং প্রাণের ধর্ম সৃজন-কুশলতা তাদের মধ্যে বৃদ্ধি হবে।

শিশুদের কিছু কিছু স্বাধীনতাও দিতে হবে। আমরা মনীষীদের জীবন আলোচনা করলে দেখতে পাব স্বাধীনতার মূল্য কতখানি। বিদ্যালয়ে ছাত্রদের কোন স্বাধীনতাই নেই। কিন্তু আমরা অভিভাবকরা একটু দরদ দিয়ে চিন্তা করে ছাত্রদের এ স্বাধীনতা সহজে দিতে পারি।

নদী

মানবেন্দ্র পাল

নদীর নাম জয়ন্তী।

সাঁওতাল পরগণার বাইরে কোথায় কোন্ পাহাড়ে তার জন্ম, দূরাঞ্চলের কোন বড়ো নদীর মধ্যে এর মৃত্যু—সে খবর এরা রাখে না। এরা যতটুকু পায়—প্রতিদিন পরিচিত যতটুকু দেখে ততটুকুকেই চেনে—জানে।

শীর্ণকায়া নদী—গোড়ালি-ডোবা জল. তবু খরস্রোতা। এ কি আজকের নদী? কবে কোন্ যুগ থেকে এ নদী বয়ে আসছে—ঠিক এমনিভাবেই। স্বচ্ছ জল। নীচে বালি চিকচিক করে। নদীর স্রোতের মধ্যে অজস্র পাথর। তার গায়ে স্রোত এসে ঠেলা দেয় মৃদু। সে-ঠেলা সহ্য করেও পাথর পাথরই থাকে। গলে না—নড়ে না।

এ নদীর পাড়ে ধোপাদের বাস। তারা কাপড় কাচে এই জলে। অল্প জল—তা হোক তবু জল ফুরোয় না। ঝর্ ঝর্ করে স্রোতস্বিনী বয়ে চলে। সেই জলে কাপড় ডোবায় আর বড়ো বড়ো পাথরের বুকে আছাড় মারে। সঙ্গে সঙ্গে তারা সুর করে বলে—হেই রাম।—হেই রাম।

প্রতিদিন প্রত্যুষে এ নদীর এই অঞ্চলটুকু ধোপাদের কর্মতৎপরতায় মুখর হয়ে ওঠে।

তারপর এক সময়ে দূরে পাথরঘ পাহাড়ের আড়াল থেকে সূর্য উঁকি মারে। সহর থেকে দু'একজন চেঞ্জারবাবু ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়াতে আসে। নদীর ধারে বসে প্রকৃতির শোভা দেখে—আর দেখে ধোপাদের কাজ। মেয়ে-পুরুষ একসঙ্গে কাপড় কেচে চলেছে। ভারী স্বাস্থ্যবতী ধোপাদের মেয়েগুলো—বড়ো চটুল—মুখরা।

কিন্তু ধোপাদের সেদিকে লক্ষ্য করার অবসর নেই। গাধার পিঠে বোঝা চাপিয়ে বাড়ি থেকে কাপড় আসছে তো আসছেই। শুধু তো এ অঞ্চলের কাপড় নয়—আশেপাশে নানা জায়গার কাপড় আসে। মীনা-বাজারের ধোপাদের যে নাম খুব। জয়ন্তীর জলে ময়লা কাপড় দুধপারা-রঙ হয়ে যায়। জয়ন্তী তাই তাদের প্রাণ। জয়ন্তীই তাদের মুখের অন্ন জোগায়।

কিন্তু গ্রীষ্মে এই জয়ন্তীই আবার কোনো কোনোবার বড়ো নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। যে বছর গরম হয় বেশি সেই সব অনাবৃষ্টির বছর জয়ন্তী শুকিয়ে যায় একেবারে। শুধু বালি আর বালি। ওপারে ফলচি গ্রাম থেকে গোরুর
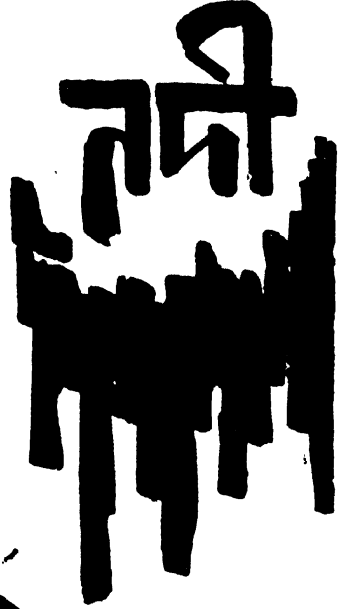
গাড়িগুলো এখন নদীর চরের ওপর দিয়ে দিব্যি এপারে চলে আসে।

তাই দেখে ধোপাদের বুক ফাটে। ধোপানীরা মনে মনে অভিশাপ দেয়।

কিন্তু এতেও তারা ঘাবড়ায় না। এক-দু মাস ছাড়া তো নয়। তারপর জ্যৈষ্ঠের শেষাশেষি একবার বৃষ্টি নামলেই হল। অমনি আবার সেই টলটলে জল।

দুঃখের দিনে তাই ওরা কষ্ট করে বালি খুঁড়ে জল বার করে। সেই জলে কাপড় কাচে। সে পরিশ্রমে দর দর করে গায়ের ঘাম ঝরে। কিন্তু উপায় কি? বালি খোঁড়ে আর বারে বারে তাকায় আকাশের দিকে—কবে বৃষ্টি পড়বে।

তবু এ জয়ন্তী তাদের নিজের ঘরের মেয়ে। বুকের রক্ত মিশছে রোজ ঘাম হয়ে ঐ জয়ন্তীর জলে। তা হোক, তবু ঐ জয়ন্তীর পরেই তাদের পেটের ভাত—মুখের হাসি—পরনের বসন। এ জয়ন্তী না থাকলে—ভাবতে পারে না তারা।

কিষেণলালের বয়েস হয়েছে। চুলে পাক ধরেছে। কিন্তু খাটতে পারে খুব। তাকে মানে সবাই—খাতির করে। বড়ো হাসিখুশি মানুষ। কিন্তু ক'দিন ধরে তার যে কী হয়েছে কেউ বুঝতে পারে না। মুখটা বড়ো ভারী—কথা বলে কম।

ধোপানীদের কৌতূহল বেশি। তারা এই নিয়ে জল্পনা কল্পনা করে। কী হল মানুষটার? কেউ কেউ অনুমান করে, মেয়েকে নিয়েই বোধহয় ওর অশান্তি। কিন্তু অশান্তি আর কি? ছেলেমানুষ মেয়ে—না হয় একটু বেশি আয়েসী কাজকর্ম পারে না, কেবল চায় ঘুমুতে। তা আর কি? বয়েস আর একটু বাড়ুক, তখন সব ঠিক হয়ে যাবে।

আর একজন আবার অন্য ব্যাখ্যা তোলে। ছুটকির শ্বশুর বাড়িতে নাকি গণ্ডগোল বেধেছে। সে জোর করে বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই। দেখলিনে সেদিন ছুটকির বর এসেছিল নিতে, ওর বাপ মেয়ে পাঠালে না।

রাধু হেসে উঠে বললে—বর না ছাই? মরণ দশা। তিনকালের বুড়ো। কী করে যে মা হয়ে মেয়ের এমন সর্বনাশ করে গিয়েছিল।

সোনা বললে—ঠিক কথাই। ও তো দুধের বাচ্চা তখন। কী বা বুঝত?

রাধু বললে—এখনো বড়ো কাঁচা—এখনো আঁচল ভরে পাথর কুড়িয়েই বেড়ায়। আহা। ইচ্ছে করে লুকিয়ে লুকিয়ে আবার ওর বিয়ে দিয়ে দিই। ঐ তো ছুটকি আসছে—কিন্তু মুখটা ওর অমন থম্-থম্ করছে কেন?

ছুটকি বাপের আদুরী মেয়ে। বাপ এ অঞ্চলের মাতব্বর। তার যশ আছে। তারই একটিমাত্র মেয়ে। মেয়ে খাটতে পারে না—খাটতে চায় না। ঘুমোতে চায় বেশি—না হলে নদীর ওপারে ধান ক্ষেতের মধ্যে মহুয়া গাছের তলায় বেড়ায় ঘুরে ঘুরে।

কথা বলে কম। কিন্তু কথা কম বললেও ওর ভেতরেও যে একটা তাজা প্রাণ আছে তা বোঝে সবাই। হয়তো ওর বাপ ওকে পাঠিয়েছে কাপড়গুলো নদীর কিনার থেকে তুলে আনবার জন্যে। ও 'না' বলবে না, ধীরে ধীরে গেল। পথে দুবার দাঁড়ালো। একটা পাথর চোখে পড়ল। কৌতূহল হল। তুলে নিল সেটা। একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল—কী সুন্দর সাদা পাথরটা। অমনি লোভীর মতো লুকিয়ে ফেললো কেমন আঁচলে। পাথুরে দেশের মেয়ে তবু পাথরের লোভ যায় না। ওরা সবাই দেখেছে তার শোবার ঘরের মাথার কাছের কাঠের বাক্সটায় কত রকমের পাথর জমে উঠেছে।

ছুটকি এল কিনারে। শুকনো কাপড় তুলতে তুলতে হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল জলে। ছোটো ছোটো পুঁটি মাছ পালাচ্ছে খরস্রোতে। অর্ধ শুকনো কাপড় ভাঁজ করা পড়ে রইল বালিতে। ছুটকি জলে নেমে দুহাত দিয়ে মাছ ধরবার চেষ্টা করবে। শুধু হাতে মাছ ধরা যায় না—হাতের ফাঁক ফাঁকে গলে যায়। যতবার ফস্কে যা ততবারই আনন্দ।

আবার এমন অনেক দুপুর—অনেক বিকেল ছুটকির কেটেছে নদীর ধারে একা একা—অন্যমনা জলে পা ডুবিয়ে বসে থাকে তো থাকে তাকিয়ে থাকে দূরের চিউটিয়া পাহাড়ের দিকে। এপাশে চিউটিয়া পাহাড়—ওপাশে পাখরডা। গল্প শুনেছে, কিছুকাল আগেও ঐ চিউটিয়া পাহাড়ে গভীর রাত্রে হায়না ডাকত। সে ডাক শুনলে মানুষের রক্ত জল হয়ে যেত। ছুটকি সেই পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে এখন আর হায়না ডাকে না কেন? তারা কোথায় গেল?

সোনা, রাধু জানে ও মেয়েটা একটু অমন ধারাই। একটু কম মেশে—কম কথা বলে—একটু আলাদা থাকতে ভালোবাসে। কিন্তু এমন জলভরা চোখ তো কেউ দেখে নি কখনো! তবে কি আজ এতদিন পর ছুটকি সত্যি বড় হল? পাথর কুড়োবার ছেলেমানুষি নেশা ঘুচল? এতদিনে ফিরে তাকাবার অবসর হল তার স্বামীর দিকে? সে দেখার আঘাতেই কি ছুটকি আজ ভেঙ্গে পড়েছে?

মুখরা সোনা আর রাধু একটু চমকে গিয়েছিল।

—কী হয়েছে রে? দিদির মতো স্নেহার্দ্র সুরে সোনা জিগেস করলে।

রাধু কাপড় আছড়ানো বন্ধ করে পাশে এসে দাঁড়ালো। তার চোখেও সেই একই জিজ্ঞাসা।

অনেকক্ষণ পরে ছুটকি কথা বললে। যেইমাত্র প্রথম কথা উচ্চারণ করলে অমনি টস্ টস্ করে গড়িয়ে পড়ল দু ফোঁটা জল।

—এ নদী—এ নদী আর থাকবে না রে—

—এ নদী থাকবে না ? সোনা অবাক হয়ে জিগ্যেস করলে।

—না, দানো এসে শুষে নিবে।

এবার সোনা আর রাধু হেসে উঠল। আচ্ছা পাগল মেয়ে তো!

প্রকাশ্যে বললে—সে আবার কী ? দানো আসবে কোথা থেকে ?

রাধু তেমনি মাথা নিচু করে বললে—বাপু স্বপন দেখেছে। ঐ পাথরডা পাহাড় নাকি ভেঙ্গে যাবে একদিন। আগুন বেরোবে আর ধোঁওয়া—শুধ ধোঁওয়া। সেই ধোঁওয়া থেকে তৈরি হবে দানো। সেই দানো রাত তিন-পহরে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসবে এই নদী-কিনারে। তারপর সব জলটা শুষে নিবে। এ জয়ন্তী মরে যাবে রাধু দিদি।

এই বলে ছুটকি ফুপিয়ে কেঁদে উঠে রাধুর বুকে মুখ লুকলো।

রাধু আদর করে বললে—পাগল মেয়ে।

হেসে বললে বটে পাগল মেয়ে কিন্তু অন্তরাত্মা কেঁপে উঠেছিল। বুড়ো কিষেণলালের স্বপন—সে কি সবটাই মিথ্যে ?

ছোকরাকে দেখতে কিন্তু ভালোই। দেখতে যাই হোক বয়েসটা কাঁচা। পাকা মেয়েদের বড়ো আগ্রহ এই কাঁচা বয়েসের ছেলেদের ওপর। এই কাঁচা বয়েসে ওরা বোকার মতো কত ছলছুতো করে মনের মানুষের মন যোগাবার চেষ্টা করে। ছেলে-মানুষ বোকা মেয়ে তাই দেখে ভোলে। কিন্তু ভোলে না রাধু আর সোনার মতো সেয়ানা মেয়েরা। তারা মজা পায়। এদের রকম দেখে আবার একবার কিশোর বয়েসে ফিরে যেতে চায়। সেখানে ফিরে গিয়ে মনে হয় সব শূন্য। তাই তারা ছুটকির ভাগ্য দেখে মনে মনে ঈর্ষা করে। বিয়ে না হোক—তবু মনে রঙ ধরাবার মানুষতো একটা এসে জুটল। বিয়ে করা সোয়ামি আর রঙ ধরায় কজনকে ? তারা ভাত দেয় বটে, কিলও মারে—কিন্তু রঙ ধরানো ? সে কি সবার সাধ্যি ?

ছুটকির এই অচিন মানুষটি হঠাৎ কোথা থেকে এসে এরই মধ্যে ছুটকিকে গিলে ফেলেছে।

রোজ বেলা তিনটের পর নদীর ওপাশের বাঁকটায় যেখানে কাপড় আছড়াবার মতো একটিও বড়ো পাথর নেই বলে কেউ যায় না বড়ো একটা—সেখানেই চোরকাঁটার ওপরই ছুটকির কাপড় শুকোতে দেবার ধুম। দূরে ঠিক তিনটের ভোঁ বাজবে আর ছুটকি পাড় থেকে তরতর করে নেমে আসবে একেবারে কিনারে। এ সময়টা ও কারও দিকে ফিরে তাকাবে না। মুখের ওপর রোদ এসে পড়ে,—হাতের চেটো দিয়ে রোদ আগলে ছুটকি এগিয়ে যায় সেই বাঁকের দিকে। একটু তাড়াতাড়িই যায়—যেন কত কাজ। তার রকম দেখে সোনা আর রাধু চোখ ঠারাঠারি করে হাসে। বেশি কথা বলতে পারে না। কারণ নদীর এদিকটায় তখন বেজায় ভিড়। কাপড় কাচা চলেছে। —হেই রাম।—হেইরাম।— হেই রাম।—হঠাৎ এক এক সময় মনে হয় কিষেণ-লালের দুঃস্বপ্নের খবর পেয়ে সব ধোপারা সমস্বরে রামনাম করছে।

সোনা হেসে তাকায় রাধুর দিকে। দু'জনেই কাপড় আছড়াচ্ছে। কিন্তু দুজনের দৃষ্টিই সেই বাঁকের দিকে। হ্যাঁ, ঐ যে সে এসেছে। মজা করে এরা ছোকরাকে নাম দিয়েছে 'কানাইয়া'। নিজেদের মধ্যেই ঠাট্টা করে—এবার হাতে একটা মুরলি ধরিয়ে দিলেই হয়। এমনিতেই তো আমাদের রাধার প্রাণ উচাটন।

রাধু বলে—মরণ। রাধা রাধা করিস নে, ছুটকি বল।

ওরা লক্ষ্য করে কানাইয়াকে। খাঁকি প্যাণ্ট—খাঁকি সার্ট। প্যাণ্টের দু'পকেটে হাত ভরা। মাথার চুল লুটোপুটি খাচ্ছে কপালের ওপর। 'কানাইয়া' কিনারে বসে একমনে ছোটো ছোটো পাথর ছুঁড়ছে নদীর জলে। যেন পরীক্ষা করছে নদীর জল কত গভীর।

সোনা হেসে ফিস ফিস করে বললে—নদীর জল মাপছে না তো, আমাদের ছুটকির পীরিতের নাগাল মাপছে। বড়ো সেয়ানা।

রাধু বললে—আর ছুটকিকে দেখ, সেই থেকে একটা কাপড় ভাঁজ করছে তো করছেই। যেন তাঁরের মানুষকে নজরে ধরছেই না। বলেই খিল খিল করে হেসে উঠল।

এমনি করেই দিন যাচ্ছিল। ক্রমে ক্রমে ঠাট্টার মাত্রা বাড়ল। এখন শুধু রাধু আর সোনা নয়, সব ধোপানীই প্রায় জেনে ফেলেছে। তারা কেউ কেউ প্রকাশ্যেই ঠাট্টা করে ছুটকিকে—প্রবীণারা মুচকে মুচকে হাসে। ছুটকি কথা বলে না। তবে সেও এতে খুশি হয়, তা বুঝতে দেরি হয় না। শুধু খুশি হয় না পুরুষরা। তারা ভুরু কোঁচকায়। এ আবার কী। ও ছোঁড়াটা এলই বা কোথা থেকে ? অমন দিন-দুপুরে হাঁ করে বসেই বা থাকে কেন ? লাজলজ্জা নেই নাকি ? দেখতে পায় না মেয়েরা কাপড় আছড়াচ্ছে—মাথার কাপড়—গায়ের কাপড় কি ঠিক রাখতে পারে সব সময়ে ?

কিন্তু—

কিন্তু কিছু বলবার উপায় নেই। কিষেণলালের মেয়েটা এসে পড়েছে মাঝখানে।

নিরুপায় হয়ে ওরা চুপ করে থাকে। মনে মনে কামনা করে, যেন কালিঝুলি মেখে না বসে মেয়েটা। এ বয়েসটা তো ভুল করবারই বয়েস—তার ওপর সোয়ামির সুখই পেল না।

সত্যি এ এক বড়ো নেশার জিনিস। বাড়িতে একা বসে কাঠের বাক্স থেকে সাদা কালো পাথরগুলো

নিয়ে খেলা করতে করতে কিষেণলালের মেয়ে মনে মনে ভাবে—এ কোন্ পরদেশী? কি নাম আছে? কোন্ দেশে ঘর?

কিছুই জানে না। কোনদিন একটা কথাও না। শুধু দেখা হওয়া। প্রতিদিন দেখা হয়। শুধু আঁখির পিয়াসা মেটে। কলিজার আগুন নেভে না।

তা না মিটুক, তবু যেন দেখা হয় এমনি—জন্মে জন্মে। একটা দিনেরও ছাড় সহ্য হয় না মেয়ের। এমনি নেশা—এমনি দশা।

নদীর ধারে এক একদিন রাধু ডাকে—ছুটকি।

ছুটকি সে ডাকের অর্থ বোঝে। ছুটকি ছুটে এসে রাধুকে জড়িয়ে ধরে।

রাধু চোখ বড়বড়ো করে মাথা নেড়ে বলে—উঁ হু, কানাইয়া দেখছে। বড়ো হিংসা করছে। ছাড়্—ছাড়—।

অমনি ধোপানীদের মধ্যে হাসির ঢেউ ওঠে। সে ঢেউ ধোপাদেরও গায়ে এসে ধাক্কা দেয়। তারা আর একবার চঞ্চল হয়ে ওঠে। কিন্তু কিষেণলালের কোনো চঞ্চলতা নেই। সেই যে হঠাৎ জবার সঙ্গে কথা বন্ধ করেছে, তারপর থেকে এক কাপড় কাচার সময় 'হেই-রাম'—ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

কিন্তু কিষেণলালের সেই নির্মম কাঠিন্য আর গাম্ভীর্য এই ধোপা-ধোপানীর সরল সহজ প্রাণ ছেয়ে সত্যিই একদিন ভারী মেঘের মতো নেমে এল। ওরা একদিন হঠাৎ চমকে উঠল। দেখল এতদিনের জয়ন্তীর বুকের ওপর কোথা থেকে এসে পড়ছে লোহা-লক্কড়। লরীভর্তি ইট আসছে—সিমেণ্ট আসছে—আসছে রাজমিস্ত্রী আর মজুরের দল। হৈ-হট্টগোল লেগে গেল। ঘটাং-ঘটাং হাতুড়ির ঘা টিনের ওপর লোহার ওপর; ঠং-ঠং কর্নিকের ঘা শক্ত ইটের ওপর। ঘড়্-ঘড়্ করে চলছে মেশিন। তাতে সিমেণ্ট আর খোয়া মাখা হচ্ছে তড়িৎ গতিতে।

ধোপারা অবাক হয়ে দেখে এ কী তাজ্জব ব্যাপার। কাপড় কাচা বন্ধ রেখে মুহূর্তের পর মুহূর্ত ধোপানীরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে কাণ্ডকারখানা। এ সব আবার কী? কী চায় এরা? কৌতুকে কৌতূহলে দিন কাটে এদের। নানা কথা নানা জল্পনা। শুধু কিষেণলালের চোখে ঘুম নেই—মুখে আহার নেই। পাথরের মতো কঠিন হয়ে উঠছে তার মুখ দিনে দিনে।

তারপর একদিন হঠাৎ ওরা চমকে উঠল। কালো চিমনি উঠেছে নূতন তৈরি বাঁধের ওপর। আকাশের দিকে তার কালো মাথাটা বাড়িয়ে দিয়েছে। দেখতে দেখতে সেই চিমনি দিয়ে বেরোতে লাগল ধোঁওয়া—কালো ধোঁওয়া। ভলকে ভলকে সেই ধোঁওয়া উড়তে লাগল আকাশে। কুণ্ডলী পাকিয়ে সারা মীনাবাজারের আকাশ ছেয়ে গেল। জয়ন্তীর ক্ষীণ বুকে পড়ল কালো ছায়া। সেই সঙ্গে ইঞ্জিন গর্জাতে লাগল ফোঁস ফোঁস করে।

ভয়ে বিহ্বল হয়ে গেল ধোপারা। সত্যিই যে পাথরডা পাহাড়ের সেই দানোটা বেরিয়ে এল। ঘরে ঘরে কান্না উঠল।—পানি শুষে লিবে রে—পানি শুষে লিবে—

কেবল কাঁদল না কিষেণলাল। বাড়ির উঠোনে বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল চিমনি আর কালো ধোঁওয়ার দিকে। পাম্প চলেছে।

প্রথম কয়েকটা দিন দুঃস্বপ্নের ঘোরে কাটল সকলের। কিষেণলালের স্বপ্ন কি সত্য হল? ভয়ে তারা এগোল না পাম্পঘরের দিকে। শুধু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে চোখের সামনে কেমন করে ঐ কলটা জল শুষে নিচ্ছে।

তারপর একদিন সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে গেল ব্যাপারটা। না, পাথরডা ভেঙ্গে কেনো দৈত্য আসে নি। এ দৈত্য পাঠিয়েছে মানুষ দূরে কোন ষ্টেশনে রেল ইঞ্জিনের জন্যে জল পাঠাতে হবে এখান থেকে পাম্প করে। এখানকার জল গিয়ে জমা হবে রেল ষ্টেশনের বড়ো ট্যাঙ্কে। সেখান থেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় ইঞ্জিন এসে জল নেবে।

ধোপানীদের মুখে আর হাসি নেই—ঠাট্টা-রসিকতা নেই। কাপড় কাচা বন্ধ হয়ে গেছে একেবারে। দুর্ভাবনায় সোনা রাধুর চোখে কালি পড়েছে। আর ছুটকি—সে কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়াচ্ছে নদী-কিনারে। সব গেল, সব গেল। আজন্মের সখী ঐ জয়ন্তী সেও যে মরতে বসেছে। আহা আর তো তেমন স্রোত নেই—পাথরের গায়ে জল লেগে আর তো তেমন ছল্ ছল্ কল্ কল্ করে না। নির্জন দ্বিপ্রহরে নদীর সেই বাঁকে বসে মাথা নিচু করে ছুটকি কাঁদে নিঃশব্দে। আর মাঝে মাঝে অল্পদূরে ঐ কালো চিমনিটাকে লক্ষ্য করে অভিশাপ দেয়—শনি শনি, সব গ্রাস করলে। বাপুর মুখে হাসি নেই—কাপড় কাচা বন্ধ হয়েছে—পয়সা নেই—জয়ন্তী মরছে—আর—আর সেই—সেই মানুষটাও আসে না। গেল কোথায় সেই পরদেশীটা? আজ এই ক'দিন একবার চোখের দেখাও মেলে নি। ছুটকির বুক ভারী হয়ে ওঠে। ইচ্ছে করে ঐ বড়ো কালো পাথরটায় মাথা কুটে মরে। পাথরে দেশের মেয়ে শুধু পাথরই চেনে।

এমনি সময় একদিন কে ছুটকিকে বললে—তার সেই মানুষের খবর। একটু বাঁকা সুরেই বললে—এই যে ছুটকি, তোমার সেই পেয়ারের মানুষটিকে একবার দেখে এসো, কেমন পাম্প চালাচ্ছে।

—পাম্প চালাচ্ছে। চমকে উঠল ছুটকি। বললে ব্যথিত স্বরে—না, না, সে কক্ষণো না।

সখী ব্যঙ্গ করে বললে—বাপ-দাদারা তো স্বচক্ষে দেখে এসে বললে। বিশ্বাস না হয়, নিজেই না হয় একা একা একসময় গিয়ে লোকাৎ

করে এসো। কী নাগর জুটিয়েছিলি ছুটকি। বলে তীক্ষ্ণ হেসে সখী পালালো।

সেই হাসি তীরের ফলার মতো বিঁধে রইল ছুটকির বুকে।

মনে মনে বললে—না না তা কখনো হতে পারে না। সে মানুষ অমন লোকই নয়।

কিন্তু তবু মন থেকে ভারী পাথরটা আর নড়ে না।

সত্যিই যদি সে হয়? একবার দেখে এলে কেমন হয়? পরের কথায় বিশ্বেস নেই—কাকে দেখতে কাকে দেখেছে।

দেখার কথা মনে হতেই ছুটকির কিশোরী বুকটা হা-হা করে উঠল। কতদিন দেখে নি মানুষটাকে।

আজ একবার দেখতে গেলে কেমন হয়? ঐ তো পাম্পু ঘর। কিন্তু এখন নয়। এখন গেলে দেখতে পাবে সবাই, কী বুঝতে কী বুঝবে। কেটে ফেলবে বাপু টুকরো টুকরো করে। তার চেয়ে রাত্তির ভালো। কৃষ্ণ-পক্ষের রাত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে লুকিয়ে গিয়ে দূর থেকে দেখবে একবার। যদি সে সত্যি হয় তাহলে ছুটকি গিয়ে তার পা জড়িয়ে ধরে বলবে—আমায় মেরে ফেলো কেটে ফেলো যা ইচ্ছে তাই করো, কিন্তু জয়ন্তীকে বাঁচতে দাও।

এই কথা ভাবতে ভাবতে ছুটকি আজ হঠাৎ যেন কেমন আশা পেল, বল পেল, মনে সাহস আর সজীবতা ফিরে এল। ঠিক করল আজ রাত্রিরেই যাবে।

রাত গভীর হল। এখনো চাঁদ ওঠে নি। উঠবে সেই ভোর রাত্রিতে। এখন কালো অন্ধকার। সেই কালো অন্ধকারে চিউটিয়া পাহাড় দেখা যায় না—নদীর পারের ধান-ক্ষেত অদৃশ্য। শুধু অল্পদূরে নদীর ধারে নতুন পাম্পু ঘরে একটুকরো আলো —আর ফস্ ফস্ শব্দ। দিনরাত জল শুষছে ঐ দানোটা।

ছুটকি সাবধানে পায়ে পায়ে বেরিয়ে এল। এত রাত্তিরে কখনো বেরোয় নি ছুটকি। তাই যেন চেনা পথটাও অচেনা লাগছে। ডান-দিকের বাগানের গায়ে বড়ো ইউ-কালিপটাস গাছের সাদা রঙটা দেখে গা ছম্ ছম্ করে ওঠে। ছুটকি সর্বাঙ্গে কাপড় ঢেকে এগিয়ে চলে। বুকের ভিতর দুরু দুরু করে। ভয় আনন্দ কৌতূহল সব রকম মিশিয়ে সে এক আশ্চর্য অনুভূতি। সত্যি যদি দেখা হয়ে যায় তার সঙ্গে। তাহলে খুশি হয়,—না হয় না?

ছুটকি এই মুহূর্তে তা ভেবে সমাধান করতে পারল না।

হন্ হন্ করে এগিয়ে চলল ছুটকি। এসে পড়েছে। পাম্পের শব্দটা খুব স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। এদিকটা কয়লার স্তূপ। ছুটকি পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল সেইদিকে। এই আড়াল থেকেই দেখতে পাবে স্পষ্ট।

আরও কাছে এগিয়ে এল ছুটকি। এই যে টিনের ঘের। টিনটা হাতে করে ছুঁতে পারছে। কাছেই দরোজা খোলা। ছুটকি উঁকি মারল। হ্যাঁ, ঐ যে একটা মানুষ। মাথায় রুমাল বাঁধা। যেমন বাঁধে তার বাপু—সুখেন-লাল কাপড় কাচবার সময়। ঐ যে সেই ফুলপ্যাণ্ট—নীল রঙের প্যাণ্ট। সেই মানুষটাই তো। থরথর করে ছুটকির সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠল। হার হল—মস্ত বড়ো হার হল তার। ওদের কথাই সত্যি। এই তো তাহলে সর্বনাশ করছে তাদের। ক্রোধে কিশোরি বধব দুই চোখ ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলতে লাগল।—এই মানুষটাই শুষে নিচ্ছে জয়ন্তীর জল—কেড়ে নিচ্ছে মুখের অন্ন। এরই জন্য তাদের ঘরে ঘরে এত কান্না। এই দস্যুটাকে সে মন দিয়েছিল।

হঠাৎ এই সময়ে ছোকরা বয়লারের মুখটা খুলে দিলে। অমনি খল্ খল্ করে লক্ষ শিখা মেলে সেই গহ্বর আগুনের আলোয় লাল হয়ে উঠল। সেই আগুনের আভায় পেশীবহুল পরিশ্রমকঠোর জোয়ানের মুখখানা আশ্চর্যরকম দেখাল ভয়ে। বিস্ময়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে ছুটকি তাকিয়ে রইল সেই দিকে। ছোকরা সেই বয়লারের মুখে কয়লা নিক্ষেপ করে ডালা বন্ধ করে দিলে আগুন অদৃশ্য হল। কিন্তু ছুটকির চোখ থেকে সে দৃশ্য গেল না। তার কেবলই মনে হতে লাগল—এত বড়ো কলটা ঐ এক-ফোঁটা মানুষটা কায়দা করেছে তো! ছুটকি মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

হঠাৎ এমন সময় চোখোচোখি হল। জোয়ান চমকে উঠল। প্রথমে মুখে কথা সরল না। তারপর যেন বুঝতে পারল। অমনি একটু হাসল। তারপর কাছে আসবার জন্যে ইসারায় ডাকল।

ছুটকি সে ইসারার অর্থ জানে। তার সারা গায়ে কে যেন চাবুক মারলে। ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল মুখ। তখনি পালালো প্রাণভয়ে।

হ্যাঁ ঠিক, প্রাণভয়েই পালিয়ে এল। কতক্ষণ ছুটে এসেছে। হাঁপিয়ে পড়েছে। এইটুকু পথ—এতখানি। মনে মনে অজস্র গাল দিচ্ছে ছুটকি :—শয়তান—শয়তানের বাচ্চা ঐ লোকটা। বদমায়েসের শিরোমণি। পাজি— হারামি।

গাল দিতে দিতে বাড়ি এসে পৌছল। এইখানে একটু থমকে দাঁড়ালো। না, বাবার নাক-ডাকার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। টের পায় নি তাহলে। সন্তর্পণে ছুটকি ঘরে ঢুকল। ঘরে ঢুকেই দরোজা বন্ধ করতে যাচ্ছে—হঠাৎ শব্দ এল ফোঁস্।—কে? চমকে পিছন ফিরে তাকালো। না, বাড়ির গাধাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কিন্তু অমন অলক্ষ্মনে দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে কেন? যেন সব লক্ষ্য করেছে।

ছুটকি দরোজা বন্ধ করে দিয়ে

চুপিচুপি শুয়ে পড়ল। লক্ষ্য করুক গে। ও তো গাধা। যদি কোনো মানুষও লক্ষ্য করত তাহলেও ভয় পেত না। ভয়ের কাজ তো কিছু করে নি। না, তেমন কিছু খারাপ—

ছুটকির চিন্তা ঘুরল অন্যদিকে।

বিছানাটা বেশ গরম—বালিসটা গরম। চাদরে ঢাকা দিয়েছে ছুটকি মাথা পর্যন্ত। সমস্ত শরীরটা তলিয়ে গেছে বিছানার মধ্যে।

না, সে খারাপ কিছু করে নি। করতে পারে না। তার সোয়ামী আছে—ঘর আছে, ইজ্জৎ আছে।

কিন্তু ছেলেটা খুব খারাপ না। কী শক্ত হাতগুলো, যেন পাথরের তৈরী!

—আগুনের আলোয় মুখটা লাগছিল যেন সিঁদুরে মেঘ। অত বড়ো কলটা ও একা তো চালায়।

না, গাধাটা যতই লক্ষ্য করুক, সে তো কিছু খারাপ কাজ করে নি—করেও মাথা হেঁট করে নি। সে যে কিষেণলালের মেয়ে! নইলে? অন্য কেউ হলে? ঐ ইনসান মরবার জন্যে ছুটে যেত। কাছেপিঠে তো কেউ ছিল না। এখনো নেই। শুধু ঐ আকাশভরা তারা—আর ঐ গাধাটার জ্বলজ্বলে দৃষ্টি—আর তার সঙ্গে ঐ পাম্পের ফোঁস ফোঁস শব্দ—আঃ কী সুন্দর রাত। এমন রাতে এ দুনিয়ার শুধু ওরা দুজনে জেগে আছে।

ভাবতে ভাবতে ছুটকি শুয়ে শুয়েই একবার খুশির চোখে সেই পাথরের বাক্সটার দিকে তাকালো। তারপর আদর করে গায়ের চাদরটা আরও নিবিড় করে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিল।

সাতদিন পর।

ধোপারা জয়ন্তীর ধারের এতোকালের বাস উঠিয়ে চলেছে দল বেঁধে, জয়ন্তী আর কতদিন? বর্ষার ক'টা দিন যা বাঁচবে। তারপর শুকনো মরুভূমি। আর এখানে কাপড় কাচা যাবে না। এখন আবার নতুন জায়গা দেখতে হবে।

সে কলহাস্য নেই—চাঞ্চল্য নেই। যন্ত্রের মতো চলেছে সবাই—সঙ্গে চলেছে নির্বোধ গাধাগুলো মাল ব'য়ে ব'য়ে।

কেবল কিষেণলাল চলেছে অন্যদিকে। জয়ন্তীর ওপারে। হ্যাঁ, ছুটকিকে শ্বশুরবাড়ি রেখে দিয়ে যাবে। পরের মেয়ে, এখন আর দায়িত্ব নেওয়া যায় না। কোথায় কোথায় ঘুরবে কিষেণলাল, তার কি ঠিক আছে? নিজের পেটেই ভাত জুটবে কী করে তার ঠিক নেই, পরের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে চলবে কী করে?

অথচ—

অথচ এই ক'দিন আগেও তার স্বামী এসেছিল নিতে। সেদিন কিষেণলাল দিয়েছিল তাড়িয়ে।

নদী পার হয়ে—নদী না ছাই! আর কি সে নদী আছে? এখন যেন চোখের জল। সেই জলটুকু পার হয়ে এগিয়ে চলেছে গরুর গাড়ি। উঁচু-নিচু চড়াই-উৎরাই ভেঙ্গে মন্থরগতিতে গাড়ি এগিয়ে চলেছে।

বিদায় জয়ন্তী—বিদায়। চিরজন্মের মতো বিদায়। আর কি কখনো তারা আসতে পারবে এই নদীর ধারে তাদের পুরনো বাসাটিতে? ছুটকিও ছাড়া পাবে না, কিষেণলালও আর দেশমুখো হবে না। বাপ আর মেয়েরও বোধহয় চিরদিনের ছাড়াছাড়ি।

চুপচাপ—দুজনেই চুপচাপ। শুধু গাড়ির একটানা অলস শব্দ—ক্যাঁ-চ্ কোঁ-চ!

আজ বড়ো সুন্দর লাগছে ছুটকিকে। এমন করে ব্লাউজ কখনো পরে নি—এত ফর্সা শাড়িও পরা হয় না। পায়ে আলতা—কপালে কাজলের টিপ—সিঁথেয় দপ্ দপ করে জ্বলছে সিঁদুর। রাধাই সাজিয়ে দিয়েছে।

হ্যাঁ, ঐ দূরে এখনো দেখা যাচ্ছে রাধার ঘরখানা, বড়ো ইউ-কালিপটাস গাছটার আড়ালে। জয়ন্তীর জলটাও মাঝে মাঝে চিক্ চিক করছে কিন্তু ঐ যে কালো ধোঁওয়া আকাশ ফুঁড়ে দানোর লোমশ পায়ের মতো উড়ছে ও যেন আরও স্পষ্ট।

কিষেণলাল একবার মেয়েকে বললে—ঠায় বসে আছিস, একটু শুয়ে নে। এখনো অনেক পথ।

খুব দরদ দিয়েই কথাগুলো বলেছিল কিষেণলাল। কিন্তু ছুটকি তার জবাব দিল না। একটু নড়ে চড়ে বসল। আর সেই সঙ্গে আঁচলের আড়ালে লুকিয়ে-আনা সেই কাঠের বাক্সটার মধ্যে নুড়িতে নুড়িতে লেগে একটু শব্দ হল মাত্র।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

খেলনার মুক্তি

ভবানী মুখোপাধ্যায়

পরদিন সকালে আমার উঠতে দেরী হয়েছিল।

সকালে ঘুম ভাঙতেই বিমলাদি আমাদের পুরানো ঝি একটা প্যাকেট এনে হাতে দিল। খুলে দেখি বাবার হাতের লেখা জন্মদিনের উপহার—

আজ আমার জন্মদিন। অন্য বছর এই দিনটা অনেক আগে থেকেই মনে করিয়ে দেওয়ার নানা ব্যবস্থা ছিল, মা ত' আশ্বিন মাস পড়লেই বলতেন —এটা তোর জন্মমাস, আর ক'দিন পরেই জন্মদিন," সাতই আশ্বিন আমার জন্মদিন, কিন্তু ইংরাজী তারিখ অনুসারে সেটা কোনোবারে তেইশে কিংবা চব্বিশে সেপ্টেম্বর পড়ে যায়। আজ জন্মদিন, অথচ আমার কিছুই মনে ছিল না, আশ্চর্য!

প্যাকেটটা খুলে দেখি মা'র একখানি জড়োয়া হার, পাতলা চেনের ওপর একটি পাথর বসানো সুন্দর লকেট, সেই সঙ্গে বাবার হাতে লেখা দুই ছত্র—

'তোমার মার বাসনা ছিল এটি তোমাকে দেওয়ার। আজ তোমার জন্মদিনে—'

আর পড়া গেল না। এবারের জন্মদিনে এই আমার একমাত্র উপহার।

বিকালের দিকে একটা টেলিগ্রাম এসেছিল। গ্রীটিং টেলিগ্রাম, রুণু মিত্তির পাঠিয়েছে। আশ্চর্য। কি করে এই দিনটা জানল—

আমি সন্ধ্যার পর ওর ফ্ল্যাটে গিছলাম। দরোয়ান বলেছিল সাহেব কলকাতায় নেই দুর্গাপুরে গেছেন। আমার নাম জানতে চেয়েছিল দরোয়ান, তাকে নামটা বলেছিলাম: ওর কাছে শুধু কুড়ি টাকা পাই, ভালোই হয়েছে কম টাকা বটে, তবে এই অছিলায় অন্তত ওকে মাঝে মাঝে বিরক্ত করা যাবে।

এইদিনই আমার মনের বিকার ও আত্মাভিমান বিশ্লেষণ করে বুঝেছিলাম রুণু মিত্তিরকে মনে মনে কখন ভালোবেসে ফেলেছি, লক্ষণগুলি তাই, কেবলই তার কথা মনে পড়ে, তার এই টেলিগ্রাম এই কারণেই আমার মনে আনন্দ না এনে বেদনার কারণ হয়ে উঠেছে।

ভালোবাসতে আমি চাই না, কাউকেই নয়, আমার এই চিত্তবিকার যেন কাটিয়ে উঠতে পারি মনে মনে এই সংকল্প করি।

অনেক ভেবে চিন্তে এই দিনটায় আমি চৌরঙ্গী পাড়ার একটা সিনেমা দেখতে গিয়েছি, এই আমার জন্মদিনের একমাত্র উৎসব।

বাড়ি ফিরেই শুয়ে পড়েছি, কিছু আর খেতে ইচ্ছে হয় নি। শুয়েছি হয়ত দশটায়, কিন্তু রাত দুটোর আগে বোধ হয় ঘুমুতে পারি নি। সেইদিন প্রাণভরে কেঁদেছি। বিলম্বিত লয়ে একটানা কান্না।

আত্মগ্লানির এই তুষানলে চিত্ত-শুদ্ধির পর ঘুম ভেঙে উঠে আবার আমি যে কে সেই হয়েছি। এমন কি কলেজেও গিয়েছি দু'একদিন, মন দিয়ে ক্লাস করেছি। কিন্তু সত্যি বলতে কি কলেজ আর আমার ভালো লাগলো না।

বাবার সঙ্গে ইদানীং দেখাই হয় না। কখন আসেন, কখন যান, কোথায় যান, কিছুই জানি না। কখনো হঠাৎ দেখা হয়ে যায়, দু-একটা কথা হয়, বিষয়গত কথা, তার মধ্যে তেমন কোনও প্রাণের যোগ নেই।

বাড়ির কাজ চলছে ঘড়ির কাঁটার মত, বিমলাদি' আছে, সে ঠিক ঠিক চালিয়ে নেয়, মার কাছে শিখেছে, তাই তার কাজে ত্রুটি নেই।

আমি নিঃসঙ্গ। প্রাণে গান নেই, সুখ নেই। আমি প্রায় বেরিয়ে যাই। বাড়িতে কম থাকি। দিনরাত এর ওর বাড়ি যাওয়া যায় না, তাই ভালো না লাগলেও ন্যাশানাল লাইব্রেরী বা বিদেশী রাষ্ট্রের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত মনোরম পাঠাগারে বই দেখি, পড়ি বলা যায় না।

আমার চরিত্রে অতি নাটকীয়ত্ব ছিল, এই বয়সে বোধকরি সব মেয়েরই অমন কিছু কিছু থাকে, ভীষণ আত্মাভিমান আমাকে গ্রাস করেছিল। অনেক সময় আমি দিনের পর দিন চুপচাপ ঘরে দরজা বন্ধ করে কাটিয়েছি; নিঃসঙ্গতার বেদনা আমাকে স্পর্শ করতে পারে না, এর স্বাদ আমার পরিচিত। আমি ভেবেছি হয়ত চরিত্র আমার বিভিন্ন, মনোভংগী অন্যের চেয়ে স্বতন্ত্র।

আজ কিন্তু বিপরীত। আমার সে

নিঃসঙ্গতার অভ্যাস আমাকে এতটুকু সাহায্য করছে না, নিঃসঙ্গতা যে একটা শারীরিক ক্লেশ তা কোনোদিনই মনে হয় নি। এর স্বাদ আছে, গন্ধও আছে। কিরকম ভ্যাপসা গন্ধ, চার পাশের দেয়াল ভেদ করে এই গন্ধ আসে আর মনটাকে গ্রাস করে। ভীষণ নিরানন্দ মনে হয়। আমি এই উক্তি নিছক কাব্য করে বলছি না, এই গন্ধ আমাকে আজো কেমন উদভ্রান্ত করে তোলে। এই নিঃসঙ্গতার সঙ্গে জড়িয়ে আছে একটা মানসিক অতৃপ্তি এবং অশান্তি।

প্রতিদিন সকালে একবার করে রুনুদার ফ্ল্যাটে গিয়ে দরোয়ানজীর কাছে খবর নেই, দরোয়ানজীর সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়ে গেছে এতদিনে।

গৌরীদিকে একদিন ফোন করেছিলাম, গৌরীদি বললেন—তিনিও রুনুর কোনো খবর পান নি, ও এক রহস্যময় মানুষ, বাড়ির অবস্থা বেশ ভালো, কেন যে এমন একা একা থাকে। কি যে করে তাও জানি না ভাই। শুধু জানি ছেলেটাকে দেখতে ভালো, তুমি ত তা জানোই,—কেমন বেশ সুন্দর নয়?

—হ্যাঁ, তা বলা যায়। সিনেমার নায়ক-নায়ক চেহারা। একটু বেশী রকমের স্মার্ট এই যা। —

গৌরীদিকে কিন্তু বেশীক্ষণ কথার জালে জড়িয়ে রাখা যায় না। টুক করে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে দেয়। আমি আবার বইমুখে করে বসি।

বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলের কাছ থেকেই দূরে সরে থাকতে চাই। যত দিন যায়, রুণু মিত্তিরের প্রতি আমার আকর্ষণ বেড়ে ওঠে। তার এই সাময়িক নিরুদ্দেশ এবং আত্মগোপন আমাকে উৎপীড়িত করে তোলে।

এদিকে বাড়ির অবস্থা ক্রমেই যেন অচল হয়ে আসছে, চারদিকে খরচ কমাবার আয়োজন, মাসের পয়লা তারিখ থেকে টেলিফোন কাটা যাবে। ফ্ল্যাটের ভাড়া অগ্রিম দেওয়া আছে চৈত্র পর্যন্ত, সুতরাং আমরা চৈত্র পর্যন্ত হয়ত এই বাড়িতেই থাকব, তারপর যাবো লাকতলা কিংবা বাঁশদ্রোণী। আমার হাত-খরচের পয়সাও কমে আসছে। খুব কম খরচ করছি, কি জানি কি হয়।

চুপচাপ শুয়ে শুয়ে এইসব ভাবছি, আর একটু পরে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ব, এমন সময় টেলিফোনের একটানা ঘণ্টা-ধ্বনি শোনা গেল—শূন্য বাড়িটায় রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করে টেলিফোন বাজছে।

নিশ্চয়ই রুণু মিত্তির। এতদিনে ফিরেছে তাহলে। তাড়াতাড়ি উঠে টেলিফোনটা তুলেই বলি—কি খবর? দুর্গাপুর শেষ হল?

অপর প্রান্ত থেকে প্রশ্ন হল—এটা কি পরিতোষবাবুর বাড়ি?

হতাশ গলায় নিস্পৃহভঙ্গীতে বলি—হ্যাঁ, কি চাই বলুন।

—তাঁকে একবার চাই?

—তিনি ত' এখনও আসেন নি, ফিরতে দেরী হবে মনে হয়।

—কে হিমানী নাকি?

কণ্ঠস্বর পরিচিত, মার এটর্নি পাল-চৌধুরী। বিরাট দেহ, ঠাণ্ডা মানুষ। আমার বেশ ভালো লাগে লোকটিকে। বললাম—কেমন আছেন চৌধুরীকাকু! আমি হিমানী।

—আমি ভালো আছি মা। পরিতোষ পাকিস্তানে যাবে শুনেছ ত'?

—পাকিস্তানে? মানে রাজশাহী না টাঙ্গাইল? আমি ত' শুনিনি কিছু।

—টাঙ্গাইলে যাবে, কি বিশেষ একটা জরুরী কাজ পেয়েছেন। ঠিকানাটা চাই। কোথাও নিশ্চয়ই রেখে গেছেন।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল, বাবা আমাকে কিছু না জানিয়ে এইভাবে পালিয়ে গেল! আমি এমনই তুচ্ছ, এমনই প্রয়োজনহীন। আমি অতি কষ্টে বললাম! আমি ত' কিছু জানি না কাকু!

পাল-চৌধুরী কি ভাবলেন কে জানে, বললেন—আচ্ছা, হিমানী আমিই যাচ্ছি সামনা-সামনি কথা হবে।

যখন ছোট ছিলাম, পাল-চৌধুরী কাকু মাঝে মাঝে সই-সাবুদ পরামর্শের জন্য মার কাছে আসতেন। আমার জন্য সর্বদা নিয়ে আসতেন এক-আধটা খেলনা কিংবা টফি।

মা'র ঘরখানি, মা'র মৃত্যুর পর থেকে এড়িয়ে চলেছি, ধূপ-ধুনা দেওয়া হয় নিয়মিত, কিন্তু ব্যবহার করা হয় না। এখন আমার উদ্বেগ ক্রমে ভয়ে পরিণত হল, আমি মা'র ঘরের আলোর সুইচ টিপলাম।

ঘরটা অন্য রকম দেখাচ্ছে। বাবার বিছানার ওপর একটা খাম পড়ে আছে। আমার নামে লেখা। বাবার হাতের স্পষ্ট অক্ষর।

হাতে নিয়ে এক মিনিট ভাবলাম। খুলতে ভয় করছে, ব্লাউজের ভেতর রাখলাম। একটা ঘর ভালোভাবে জানা মানে, আমার বাবা-মাকে যেমন জানতাম—সেই ভাবে জানা। ঘরেরও একটা ব্যক্তিত্ব আছে। সব ঠিক ঠিক আছে, ঘরে দুখানি—যামিনী রায়ের ছবির প্রিণ্টও ঠিকমত টাঙানো আছে, বিছানার চাদর টান টান করে। বিমলাদি'র কাজের ত্রুটি নেই।

কিন্তু কোথায় যেন কি গোলমাল হয়েছে, সব ঠিক নেই। এত ঠিকের মধ্যেও বেঠিক। বাবার জামা-কাপড় যে আলমারিতে থাকে খুলে দেখি তা একেবারে শূন্য। শূন্য ড্রয়ার-গুলি আমার মুখের পানে তাকিয়ে ব্যঙ্গ করে। বেশ তাড়াতাড়ি সব গুছিয়ে নিতে হয়েছে বোঝা যায়।

আলো জ্বলতে লাগল। আমি ড্রয়িং-রুমে গিয়ে চৌধুরীকাকুর জন্য বসে রইলাম। চুপ করে ভাবছি আকাশ-পাতাল, দোর-গোড়ায় পদধ্বনি শোনা গেল। কাকু এসেছেন।

চৌধুরীকাকু হাঁফাচ্ছেন, বললেন—একে-বারে ছুটতে ছুটতে এসেছি, এতক্ষণে বাড়ি ফিরছি মা, এত কাজ পড়েছে যে আর পারা যায় না —

তাঁর কণ্ঠস্বর গভীর এবং গম্ভীর। যে কাজের তিনি মানুষ নিজেকে একেবারে ঠিক ঠিক তার উপযুক্ত করে গড়েছেন। এটর্নি হিসাবে সাফল্যলাভ করতে হলে যা করা প্রয়োজন মন দিয়ে তিনি তা করেছেন। আজ তাই তার এই সাফল্য। সফল এটর্নিকে কথা-বার্তায় বিশেষভাবে সরসতা বজায় রাখতে হয়, চৌধুরীকাকু সুন্দর কথা বলতে পারেন। সততা ও নিষ্ঠার প্রতিমূর্তি হিসাবে সাধারণের নজরে পড়তে হয়, সেই সুনাম তাঁর আছে।

পাল-চৌধুরী কাকু সকল বিষয়েই পরি-পাটি ও নিখুঁত। তিনি সহৃদয়, সরল এবং সদাশয়। যদি তাঁর এই সবটাই অভিনয় হয়, তাতেই বা কি এসে যায়।

কোচটায় বেশ সজোরে বসে চৌধুরী-কাকু একটু কেশে নিলেন। গলা পরিষ্কার করছেন। অপ্রয়োজনীয় অথচ অপরিহার্য কাশি। তারপর বললেন, কই, তুমিও বসো হিমানী। অমন করে কি বুড়ো মানুষের দিকে তাকাতে হয়, কাকু আমার হাত দুটি নিজের সেই মোটা কর্কশ হাতের মধ্যে টেনে নিলেন। তাঁর ভাবভঙ্গী নিঃসন্দেহে নাটকীয়। তবে এ সবই তাঁর চরিত্রের অঙ্গ বিশেষ, এ সহ্য করতেই হবে।

তিনি বললেন—আমার পক্ষে এ সব বলা বড়ই কষ্টের, তোমাকে কত ছোট থেকে দেখছি। আমার চোখের ওপর তুমিও বড় হয়েছ। তাহলেও হিমানী আমার কাছে তুমি সেই আছ।

আমি কোন জবাব দিলাম না, বুঝতে পারছি তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন কৃত্রিম সত্তায় পৌঁছতে চিরদিনই তাঁর একটু সময় লাগে, এ আমি জানি।

তাঁর কাজটা সহজ করার জন্য বলি—কাকু। আপনি কি বলবেন তা বোধহয় আমি জানি।

চুলের যত্নের
প্রয়োজন কমেনি
কালের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের রুচি বদলায়। যুগ যুগ ধরে, নারী ও পুরুষ নিজেদের আরো সুন্দর করে তুলে ধরবার জন্য বিভিন্ন রকমের কেশসজ্জার আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু কোন কালেই তারা চুলের যত্নের প্রয়োজনীয়তার কথা ভুলে যাননি। সুন্দর কেশসজ্জার জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যোজ্জ্বল আর লাবণ্যময় চুল।
কিন্তু চুলের নিয়মিত যত্ন ছাড়া তার সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করা অসম্ভব। আপনার চুলকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করে তোলা মোটেই কঠিন কাজ নয়। নিষ্ঠার সঙ্গে, নিয়মিতভাবে ভাল তেল ব্যবহার করলেই চুলকে সুন্দর করে তোলা যায়। সত্যিকারের ভাল তেল, আপনার চুলের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে তাকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলে।
জবাকুসুম
কেশ তৈল
সি. কে. সেন এ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস ★ কলিকাতা-১২
KALPANA LEKHA

—না, না, তুমি কিছুই জানো না মা; কিছুই নয়।

—বাবা চলে গেছেন, সে কথা আমি জেনেছি। আমাকে একটা চিঠিও দিয়ে গেছেন।

—তাই নাকি!

আমি খামখানা জামার ভেতর থেকে বের করে বলি—আমি এখনও এটা খুলি নি, ভাবলাম আপনার জন্য অপেক্ষা করাই ভালো, কি না জানি লিখেছেন—

তিনি চিঠিখানি হাতে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে দেখ্‌লেন, যেন একটা কিছু অদ্ভুত বস্তু, তারপর আমাকে ফিরিয়ে দিলেন। বল্লেন,—অপরের চিঠি খুলতে নেই, মহাপাপ।

আমি এইবার খামখানা ছিঁড়ে চিঠিটা বার করলাম, তারপর তাঁর সামনে ধরে বল্‌লাম—আপনিই পড়ুন।

জানতাম তিনি লোভ সংবরণ করতে পারবেন না, তবে চেঁচিয়ে পড়া তাঁর অভ্যাস, ছোটবেলায় আমাকে 'রবিনসন ক্রুশো' পড়ে শুনিয়েছিলেন, প্রতিদিন বাড়ি ফেরার পথে আগের দিন যেখানটিতে শেষ করেছেন, সেখান থেকেই স্থরু করে পড়ে শোনাতেন। তিনি আর একবার কাসলেন, তারপর আলোর কাছে গিয়ে চিঠিটা দূরে রেখে পড়তে লাগ্‌লেন। চালসে ধরেছে—তবু চশমা নেন নি। চৌধুরীকাকু পড়তে থাকেন:

"মা-হিমানী, আমি যাচ্ছি। সব গোলমাল হয়ে গেছে। তোমার মার মৃত্যুর পর আমাকে শনিতে ধরেছে।—রাতারাতি বড়লোক হওয়ার আশায় একটা ওষুধের ব্যবসায় অনেক টাকা ফেলেছিলুম, কিন্তু সঙ্গীরা সবাই পাকা জুয়াচোর, আগে বুঝিনি। তারা টাকা ফাঁক করে পালিয়েছে, আমি পরাজিত কপর্দকহীন।

কিন্তু নতুন করে আবার স্থরু করতে হবে। দিল্লী যাচ্ছি। সেখানে আমার পুরানো বন্ধু-বান্ধব দু'চারজন আছেন, বিষয়-সম্পত্তিও কিছু আছে। কিছু যদি বিক্রী করতে পারি আর যদি কোনো কাজ-কর্ম পাই, তাহলে দু'মাসের মধ্যেই ফিরে এসে আবার আমরা পুরানো দিনের মত হেসে খেলে কাটাব। আমি তোমাকে ভালোবাসি, তাই তোমাকে এভাবে ছেড়ে যেতে আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কারো কাছে কোনো দেনা রাখিনি। সব মিটিয়ে দিয়েছি। ফ্ল্যাটটা থাকবে, কিছু টাকা এখনও তোমার মার নামে আছে ব্যাঙ্কে, সে টাকা তোমার। বুঝে চলবে। পড়াশোনা ছেড়োনা আমি দীপাবলীরই ফিরব, ভেবোনা কিছু, সব আবার ঠিক হয়ে যাবে—বাপী।"

বাপী!—কথাটি উচ্চারণ করেই আমার কণ্ঠস্বরের তীব্রতায় নিজেই চমকে উঠ্‌লাম।

চিঠিখানা মুড়ে রাখতে রাখতে চৌধুরীকাকু বল্‌লেন—এই চিঠিতে সব খবর নেই। আমি হয়ত তোমাকে এর চেয়ে কিছু বেশী বলতে পারবো। তোমার মা ব্যাঙ্কে দশ হাজার টাকা আর প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার অলঙ্কারাদি রেখে গিয়েছিলেন।

আমি মাথা নাড়লাম। এতক্ষণ এই গয়নার কথাই ভাবছিলাম।

কাকু বল্‌লেন—তোমার বাবা গয়নাগুলোর সব বিক্রী করে দিয়েছেন, তুমি জানতে কি?

জানতাম না, তবু ঘাড় নাড়লাম।

—খুব অল্প দামেই বেচেছে, হয়ত ত্রিশ কিংবা চল্লিশ হাজার। এই টাকাটা ঐ ওষুধের কারবারে ফেলেছিল। দু-চারজন পাকা জুয়াচোর—পরিতোষবাবুর হাতে টাকা আছে জেনে কায়দা করে ভুঁয়ো লিমিটেড কোম্পানী বানিয়ে টাকাটা নিয়ে তারপর কারবার গুটিয়েছে। ফলে পরিতোষবাবু এখন পথে বসেছেন। নির্বোধের মত কাজ করেছেন, আমাকে তিনি কিছুই জানান নি। কোনো পরামর্শ নয়। বিপদ যখন ঘটে, এভাবেই ত ঘটে। বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি—

বাবার মুখখানা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। অনেক তথ্য অনেক পরিসংখ্যান তাঁকে বুঝিয়েছি, তিনি কিছুই না বুঝে শিশুর মতো এক মহাসাগরে ঝাঁপ দিয়েছেন। আমাকে তাক লাগিয়ে দেবেন যেদিন হাতে আসবে হাজার হাজার টাকা, এখন তাঁর মনের ভাব কি দাঁড়িয়েছে। ফাটা বেলুনের মত তিনি চুপসে গেছেন। জীবনটা ব্যর্থ হয়েছে, তিনি পণ্ডিতলোক, কিন্তু ব্যবহারিক জগতে তাঁর অভিজ্ঞতা অল্প, তাই সহজেই তিনি জোচ্চোর ব্যবসা-বিলাসীদের হাতের পুতুল হয়ে গেছেন। ভেবেছিলেন—প্রচুর টাকা হাতে আসবে। সেই সঙ্গে তিনি ফিরে পাবেন আত্মমর্যাদা আর সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হবেন।

আমার মন সেই মুহূর্তে ভালো ছিল না মোটেই, রাগে আমি একেবারে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। তথাপি বাবার জন্য আমার মনে কষ্ট হতে লাগলো। তিনি কত কষ্ট না পেয়েছেন। তাই ভাবছি।

তাঁর কাছে এই বিশ্ব-জগতের সমাপ্তি ঘটেছে।

চৌধুরীকাকু সাড়ে সাতটার বাংলার নিউজের বেতার-ঘোষকের ভঙ্গীতে বললেন—ধার-দেনা যাদের খুচরা দেনা কিছু রাখে নি। ব্যাঙ্কে ওর নামে যা ছিল সবটাই তুলে নিয়েছে, সেও প্রায় দশ-বারো হাজার হবে। আমারও ত' ঐ ব্যাঙ্কে টাকা আছে। ম্যানেজার সুধী সেন আমার বন্ধু। তিনিই ফোনে খবরটা দিলেন। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছে। যাক মা, ব্যাঙ্কে তোমার মার যে টাকাটা পড়ে আছে সেই টাকা তুমি নিজেই তুলতে পারবে, আমি ব্যবস্থা করে দেব। সে টাকাও হাজার আট-নয় হবে। বাড়িটা ত' সেই চৈত্রমাস পর্যন্ত থাকবে। তবে তোমার বিমলা ঝি'র মাইনে বাকী আছে শুনেছি,—ও হয়ত কিছু বল্‌বে না।

আমি ঢোক গিলে বল্‌লাম—ওর টাকা ঠিক পেয়ে যাবে। আজই পাবে।

চৌধুরীকাকু বল্‌লেন—তুমি, বুদ্ধিমতী তোমাকে আর কি বল্‌ব মা। পড়াশোনা ছেড়ো না। বরং হোষ্টেলে সিফ্‌ট করতেও পারো।

চৌধুরীকাকুর গলার স্বর কাঁপছে, বুঝি তাঁর এই করুণায় কৃত্রিমতা নেই।

—তাহলে আমি এখন একেবারে বেওয়ারিশ।

চৌধুরীকাকু কোনো জবাব দিলেন না।

—পড়াশোনা ছেড়ে একটা চাকরী জোগাড় করে নিলে কেমন হয়?

—আমি পরিতোষবাবুকে টেনে আনতে পারি হিমানী।

—কি ভাবে?

—আছে, রাস্তা আছে, আইনের রাস্তা বড় ভীষণ রাস্তা। তখন কলকাতা ছাড়ার জন্য ওকে অনুতাপ করতে হবে।

প্রায় হাঁ বলে ফেলেছিলাম আর কি? চৌধুরীকাকুর মুখ, সেই পাকা অভিনেতার মুখ, মৃত্যুর মত গম্ভীর। ভাবতে থাকি। বাবাকে ওরা কোমড়ে দড়ি বেঁধে টেনে এনেছে এ আমি মনশ্চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। প্রায় কুকুরের গলায় শেকল বেঁধে টেনে আনার মত। তাতে ফল কি হবে। বাবার এই অবস্থা আমার কোনো উপকারেই লাগবে না। তিনি নিজেরই কিছু করতে পারেন নি আমায় কি সাহায্য করবেন।

আর আমি ওঁকে দেখতে চাই না।

চৌধুরীকাকু বল্‌লেন—তাহলে চিঠিটা আমারই কাছেই থাক, ওটা দরকার হবে। কাল যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে, আমি কথা দিচ্ছি হিমানী, চারদিনের ভেতর ওঁকে এইখানে হাজির করব।

—না, তার আর দরকার নেই কাকু।

—সে কি হিমানী! তুমি বলো কি?

—না, তাতে কোনো লাভ নেই। যা করবার আমিই করব।

—কিন্তু আমি যদি ওঁর সঙ্গে কথা বলি।

ওঁকে বুঝিয়ে দিই যে কি সর্বনাশ তিনি করেছেন।

—তাতে লাভ নেই কাকু। বাবাকে দিয়ে কিছুই করা যাবে না।

একটা সিগারেট ধরিয়ে তিনি বল্লেন—আমি ওকে এমন ভয় পাইয়ে দেব যে প্রাণ বেরিয়ে আসবে—

—তাতে কতটুকু দুঃখ ঘুচবে কাকু বাবা পণ্ডিত মানুষ, কিন্তু তিনি মানুষ নন, এই সমাজে তিনি অচল। তিনি ভীষণ ধরচে। মা'র কাছে আস্কারা পেয়ে তাঁর যা স্বভাব হয়েছে, সেই স্বভাব থেকে তিনি কি ভাবে মুক্তি পাবেন—

আমি হাতের চিঠিখানা কুচি কুচি করে ছিঁড়তে লাগলাম, অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু চোখের জল আটকাতে পারি নি। আমি কান্নায় ভেঙ্গে পড়লাম।

পাল-চৌধুরী কাকু উঠে দাঁড়ালেন।

—কেঁদে কোনো লাভ নেই মা হিমানী। বৃথা মন খারাপ করছ। বরং আমার বাড়ি এস, আজ ক'দিন হল গীতা এসেছে শ্বশুর বাড়ি থেকে, তোমাকে দেখলে সে খুশি হবে।

আমি মাথা নাড়লাম, তখনও চোখ দিয়ে জল পড়ছে, তাতে আমার চিন্তা বা অনুভূতির কোনো পরিবর্তন নেই, ধীর গম্ভীর গলায় বল্লাম—

—না কাকু, আমি নিজেই সামলে নেব। সব ঠিক হয়ে যাবে।

—অনেক কিছু আছে মা, যা মেয়েরা একা পারে না সামলাতে।

আমি উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। উনি এইবার উঠে পড়ুন এই আমার বাসনা। আমার মনে ভীষণ রাগ হয়েছিল, অভিমানে রাগে গলার কাছে কি যেন আটকে গেছে।

উনি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বল্লেন—কাল আমার অফিসে একবার এসো। যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। একটা চাকরী বাকরী পাওয়া শক্ত নয়। যদি টাকার কিছু প্রয়োজন থাকে ত' বল, তোমার মা আমার অনেক পুরানো মক্কেল তা জানো ত'।

আমি বল্লাম—না কাকু। তার দরকার নেই। আমি কিছু টাকা হাতে রেখেছি, তাছাড়া ব্যাঙ্কের ব্যবস্থা ঠিক করতে আর কত দেরী হবে?

—হ্যাঁ, তেমন ভাবনার কি আর আছে। এত বড় ফ্ল্যাট, এ তোমার দরকার নেই। অনেক রকম সুন্দর চাকরী পাওয়া যায়—এটা একটা ট্র্যাজেডিই নয়।—

আমি অতিশয় ঠাণ্ডা গলায় বল্লাম—আপনি রইলেন, ভয় কি কাকু। দরকার পড়লে আপনার কাছে গিয়েই ত' দাঁড়াবো।

—আচ্ছা মা, আমি যাই, কাল দেখা হবে।

—আচ্ছা কাকু। রাতও ত' হল—এই বলে নিজের হাতে দরজাটা খুলে দিলাম। ইচ্ছে করেই, 'কাকু' কথাটায় একটু বেশি টান দিলাম।

চৌধুরীকাকু নেমে গেলেন। তিরিশ বছর আগে হলে তিনি হয়ত অন্য কিছু হতেন। পরে এসেও কম করলেন না। টাকা রোজগার করলেই হয় না, টাকা রাখাটাও একটা মস্ত আর্ট।

শূন্য বাড়ি। আবার তেমনই শান্ত হয়ে আছে।

আমি অন্ধকার ঘরে, কড়িকাঠের পানে তাকিয়ে চুপ চাপ শুয়ে রইলাম। কলকাতা সহরে ভালো করেও অন্ধকার হয় না—একটা চাকরী জোগাড় করে---বাড়িটা ছেড়ে দাও---হোষ্টেলে টু সীটেড রুমে গিয়ে থাকো। যার সঙ্গে থাকবে সে হাঁচলে, কাশলে বিরক্ত হতে হবে।

আরেক স্ত্রীলোকের বদ অভ্যাস, গায়ের গন্ধ, সব সয়ে যাও। বাথরুমে থাকবে অপরের সায়া আর শাড়ী, টুথব্রাস ভুল হবে, সাবান-তোয়ালে নিয়ে টানাটানি, বাথরুমে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, অন্য ব্যক্তির সারা হলে তোমার সুরু। তারপর রুমমেট এমন কথাও বলতে পারে—একটু রাত করে ফিরো ভাই। আমার ফ্রেণ্ড আসবে। খড়গপুরের রেল কলোনীর টেলিফোনের একটা মেয়ে এমন কথাই বলেছিল। হিমানী সঙ্গে এক সময় এক সঙ্গে পড়েছিল।—এ আমার নয়, এ আমার সইবে না।

বাবা জানলে কি বলবেন। তিনি নিশ্চয়ই তা চান না।

তারপর রাগ জাগ্রত হল। বাবা হাতের কাছে থাকলে হয়ত খুন করতাম। অমন শিমুল ফুলের মত চেহারা, অথচ কি নির্বোধ, এতগুলি টাকা এত সহজে নষ্ট করলেন। বাবার জন্য আর দুঃখ হয় না, দুঃখ হয় আমার নিজের জন্য।

আমার রাগ ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসে। বাড়িটার কথা ভাবি। বাবা-মার ঘরটার কথা ভাবি, বিমলাদি যে ঘরটায় শুয়ে আছে তার কথাও মনে জাগে, লাইব্রেরী ঘর, সে ঘরটায় কখনো গেছি কি, কে জানে।

এই আমার বাড়ি। এটুকুই আছে। জন্মে অবধি আছি এই দুশো-দু নম্বরের দোতলার ফ্ল্যাটে। এইখানে জন্মেছি। বড় হয়েছি। এ বাড়িতেই মা'র মৃত্যু হয়েছে। এই স্বপ্ন দিয়ে, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ফ্ল্যাট, এই আমার আনন্দ।

পৃথিবীর যত উকিল, যত আমার পিতৃদেবের মত নির্বোধ এবং রিক্ত বাপ আসুক না কেন, এখান থেকে কেউ আমাকে হঠাতে পারবে না। আমি এখানেই থাকব। এই ক'মাসের মধ্যে ঠিক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এ বাড়ি আমি ছাড়ব না।

বন্ধুদের কথা ভাবি, ঝুমু মিত্তির, গৌরিদি ইত্যাদি সোসাইটির সেরা জীবদের কথা ভাবি, আমি ধনীর দুলালী, আদরে আবদারে আমার ইহকাল-পরকাল একেবারে ঝরঝরে। তার ওপর আমি নির্বোধ, অল্পবয়সী এবং—সুন্দরী।

এতদিন এই সব সম্পদ ভোগ করে এসেছি, আজ কে তা ছিনিয়ে নেবে।

ওপাশ ফিরলাম। অশান্ত ভঙ্গীতে ছটফট করছি। আমার অনেক বন্ধু! আমার মাথায় অনেক বুদ্ধি। পথ একটা পাবোই। যা হয় হোক। একটা পথ খুঁজে বার করতেই হবে।

এই দৃঢ় সংকল্পের ভিতর কখন গভীর ঘুমে ডুবে গিয়েছি। মৃত্যুর মত গভীর ঘুমে দেহমন অবশ হয়ে গেছে।

পাঁচ

সকালে উঠেই বিমলাদিকে তার পাওনা মিটিয়ে দিলাম। সে কিছুতেই নেবে না, শেষে কাঁদতে লাগল। বল্ল—তোমার মা সগ্গে গেছেন দিদিমণি। তিনি ত' মানুষ ছিলেন না, দেবী, সগ্গের দেবী—'

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাকে রাজী করলাম। বাবা এদেশে নেই, কারবারের কাজে বাইরে গেছেন, আসতে দেরী হবে ইত্যাদি।

আমার কথা সে বিশ্বাস করল কিনা কে জানে, তবে শুনলো, কোনো প্রশ্ন করল না। মানুষটা অনেক ভালো, ভদ্র: নিজের ওজন বুঝে চলে। ওকে ছেড়ে যে আমার কি করে চলবে, ওরই বা আমাকে ছেড়ে চলবে কি না কে জানে। তবে সবই সয়।

বসে বসে ভাবি। কি করা যায়। বাড়িটা ছাড়া হবেনা। ছাড়া ঠিক হবেনা। একশো পঁচিশ টাকা ভাড়া। ছেড়ে দিলে বাড়িওলা আশীর্বাদ করবে, কালই দুশো পঞ্চাশে ভাড়াটে পাবে। ষাট থেকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে মা একশো পঁচিশ করেছিলেন। এখন অবশ্য চৈত্র পর্যন্ত ভাড়া দিতে হবে না। মা আগাম দিয়ে গেছেন।

তারপর। একটা চাকরী জোগাড় করতে পারি। ব্যাঙ্কের টাকা আদালতের অনুমতি নিয়ে তুলে নিতে পারি হয়ত। কিংবা সব

পেতে পাবি। চাকরীই একটা সংগ্রহ করব স্থির করলাম।

কিন্তু কিভাবে সুরু করা যাবে। টেবিলের ওপর খবরের কাগজ পড়ে আছে। ওর----ওয়ানটেড কলম থেকেই সুরু করা যাক। অনেক চাকরী খালি, তবে সবকারী চাকরীর সবচেয়ে সামান্যতম গুণও আমার নেই, অর্থাৎ আমি গ্রাজুয়েট নই, মাত্র সিনিয়র কেম্ব্রিজ। কারো সেক্রেটারী হব, উপায় নেই, টাইপটা জানি, ষ্টোনোগ্রাফি জানি না। সেলস গার্ল, রিসেপসনিস্ট,—মাইনে কম, চাকরীর সংখ্যাও কম। তার চেয়ে পাত্র-চাই, পাত্রী চাই অনেক বিজ্ঞাপন। প্রায় সাত কলম ধরে, চলেছেই।

কোনো শিক্ষা নেই, কোনো হাতের কাজ জানা নেই, কোনো মুরুব্বি নেই, উৎসাহও নেই, কি করা যায়।

আমার জীবন নিয়ে এক কুৎসিৎ সমস্যা কাঁধের ওপর সিন্ধবাদের গল্পের মত চেপে বসল।

তার চেয়ে ববং এক কাপ চা নিয়ে বিছানায় গিয়ে বই-এ মুখ গুঁজে পড়ে থাকা অনেক সহজ।

কিন্তু তা সম্ভব কই! আমাকে কিছু একটা করতে হবে। অনেক এমপ্লয়মেণ্ট একসচেঞ্জ আছে শুনেছি, কাল থেকে না হয় সেখানে গিয়েই নাম বেজিস্ট্রাবি করে আসব।

বাসে যে চড়িনি কখনও তা নয়। কিন্তু বেলা দশটায় নয়। তার চেয়ে নরকে প্রবেশ অনেক সহজ। স্নাত ও অস্নাত পান চিবানো মসলা খাওয়া হাঁস-ফাঁস করা মানুষের ফোঁস ফোঁস নিঃশ্বাসে আমাব বমি আসে। অত আজে বাজে, স্পষ্ট অস্পষ্ট কথা। কত রাজনীতি অর্থনীতি এবং সংস্কৃতিমূলক চাপা এবং সোচ্চাব আলোচনা—মনে হয় যেন অনেকগুলি পশু দল বেঁধে বেরিয়ে পড়েছে অরণ্য-আবাস থেকে সহরে। বাসে ওঠা এবং বাস থেকে নামা একটা বীভৎস ব্যাপাব। আমাকে অতঃপর তাই করতে হবে।

বাসে উঠলাম শেষ পর্যন্ত। সামনে ছিল এক বিরাট-নিতম্বা পাঞ্জাবী রমণী, পেট-কাটা ব্লাউজের নীচে উদাত্ত ভুঁড়ি হাসফাঁস করলেও গায়ে শক্তি আছে, তাঁর সাহায্যেই উঠতে পেরেছি। পিছনে একজন মধ্যবয়সী পানরসসিক্ত বড়-সগরী অফিসের বড়বাবু-টড়বাবু হবেন। প্রাণপণে চীৎকার করতে থাকেন—লেডীজ সীট, লেডীজ সীট। যে বেচারী লেডীজ-সীটে বসে আছে তাকে তুলে দেওয়ার মধ্যে শিকারীর পৈশাচিক আনন্দ আছে।

ডালহাউসী স্কোয়ারের পাড়ার এই অভিসার আমি কখনো ভুলবো না। প্রতিটি মুখ আমার মনে বেদনা সৃষ্টি করেছে, কারো মনে সুখ নেই, আনন্দ নেই, কেউ গায়ে হাত লাগলেই ক্ষেপে যাচ্ছে, কেউ প্রাণভরে হয় অফিসের কর্তা নয় দেশের কর্তাদের গাল পাড়ছে, যে কিছু বলছে না, চুপচাপ আছে, তার শক্তি নেই বলেই সে নীরব। তার বারুদ একেবারে নিঃশেষিত।

ঘর্মাক্ত মানুষগুলোর গায়ে গা ঘর্ষণ করে, কারো আঙুল বা কারো কনুই-এ ধাক্কা খেয়ে অনেক কষ্টে আবার বাসের দরজা দিয়ে গলে বেরিয়ে পড়লাম। দেশের যাঁরা ধনীসম্প্রদায় তাঁরা কোনোকালে বাসে চড়েন না বলেই বোধ হয় এই দুর্দশা।

যন্ত্রণার অবসান।

আবার সূর্যালোকে নেমে এলাম। মাথার চুল যেন বিপর্যস্ত, বেশবাস বিস্রস্ত—এই জীবন আমাকে গ্রহণ করতে হবে, এইসব মানুষের সঙ্গে কাজ করতে হবে, এদের সঙ্গে হাসতে হবে, বসতে হবে।

এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জটা কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে। রাস্তা পার হয়ে কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে ঢুকলাম।

দিনটা চমৎকার। বেশ রোদ্দুর। গরম নেই, শীত পড়ার এখনও দেরী আছে, তবে কলকাতার এই আশ্বিনের শেষ আর কার্তিকের গোড়াটাই ভালো। রোদটা তাই সইছে। বাড়িটা খুঁজছি এমন সময় গৌরীদির সঙ্গে দেখা, একেবারে মুখোমুখি এসে পড়েছে।

আমাকে দেখতে পান নি। প্রায় দানবীরের মতো ভীমবিক্রমে তিনি এগিয়ে চলেছেন। তাঁর শীর্ণশুভ্র বাহুতে রোদ লেগে তা ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। হাতে সোনার ব্রেসলেট ঝকঝক করছে। গলায় সোনার পাতলা হার, আর কানের দুল চুলের মেঘ ভেদ করে উদ্ভাসিত। হাতে একটি কুমীরের চামড়ার কালো হ্যাণ্ডব্যাগ। শাড়িটা পরার মধ্যে যথেষ্ট কায়দা আছে, চোখে চওড়া সানগ্লাস, তার শাদা ফ্রীম। মাথার চুল শুকনো ও বুফার চঙে চূড়ো করা। আশপাশের লোকজন তাঁর পানে আড়চোখে তাকাচ্ছে, তবে তিনি এ সবে অভ্যস্ত, কোনোদিকে তাঁর ভ্রুক্ষেপ নেই। মাথা নিচু করে চলেছেন ও পাশের ফুটপাথ দিয়ে, বেশ উদ্ধত ভঙ্গী, আর তাঁর সামনে-পিছনের পথজনতা তাঁর আশ্চর্য শীর্ণ শরীর এবং এই বিচিত্র পোষাক-পরিচ্ছদ দেখে ভয়ে ভয়ে পথ ছেড়ে দিচ্ছে।

আমাকে শেষ পর্যন্ত ঠিক দেখতে পেয়েছেন, আঙুল ইসারায় ডাকলেন, কাছে যেতেই আদরের সুরে বললেন—কি গো সোনা মেয়ে! এখানে এ পাড়ায়, এমন অসময়ে—?

এখনো সাড়ে দশটা বাজে নি। সেই সময়টাও গৌরীদির কাছে অসময়।

আমি বোকার মত বলে ফেললাম একটা চাকরী খুঁজছি।

গৌরীদি মাথাটা অদ্ভুত কায়দায় দুলিয়ে হাসতে লাগলেন। একেবারে মর্মভেদী হাসি। কেমন অস্বস্তিকর হাসি। গৌরীদির বেশ মজা লাগছে, বোঝা গেল।

—আশ্চর্য। সোনা মেয়ে—চাকরী, বেশ বলেছ—। কিন্তু তুমি ভাই—?

—তুমি ভাই বলে থামলেন কেন, তুমি ভাই কি?

—আজ দুপুরে আমার সঙ্গে লাঞ্চ খাবে? কেমন রাজী?

—রাজী। কথাটি বলেই মাথায় একটা চিন্তা জেগে ওঠে।

—তা তুমি কোথায় থাকবে, মানে কি কাজ-টাজ আছে এখন?

—বললাম যে, একটা চাকরীর চেষ্টা করছি, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে যাচ্ছি—।

আমার মুখের দিকে অদ্ভুত ভঙ্গীতে তাকালেন গৌরীদি। যেন বলেছি যে চাঁদে চলেছি। তারপর বললেন—স্পেনসে ঠিক একটায়, কেমন?

—আচ্ছা! ধন্যবাদ।

—আমি কিন্তু আগে থেকে এসে অপেক্ষা করবো। এসো কিন্তু।

গৌরীদি সহসা কেমন বদান্য হয়ে পড়েছেন। তারপর হ্যাণ্ডব্যাগটা খুলে কি খুঁজলেন, পেলেন না। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে একটা হাততালি দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটা বিরাট ক্যাডিলাক গাড়ি এগিয়ে এসে ওঁর কাছে দাঁড়াল, বলল—এখানে দাঁড়ানো যাবে না, উঠবেন নাকি?

গৌরীদি গাড়ীর সঙ্গে এগিয়ে বললেন—না, বাচ্চু! আমার সিগ্রেট কেসটা গাড়িতে আছে, দাও।

বাচ্চু নামক ব্যক্তিটি তাড়াতাড়ি সিগ্রেট কেস আর লাইটার এগিয়ে দিল।

গৌরীদি সিগ্রেটটা ধরালেন, মাত্র কয়েকটা টান দিয়েই সেটা ফুটপাথে ফেলে দিয়ে বেশ করে পায়ের জুতোটা দিয়ে চেপে দিলেন। তারপর আমাকে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়ে হেঁটে চললেন, ক্যাডিল্যাক ওঁকে অনুসরণ করছে ধীরে ধীরে—

লক্ষ্য করলাম, বাচ্চু না কি নামধারী ড্রাইভারটি রীতিমত সুপুরুষ, বাংলা ফিলমের নায়কের ভূমিকায় এই রকম মাকাল ফলের মত বোকা বোকা চেহারার নায়কই ত' দেখেছি।

আমি থমকে দাঁড়িয়ে কয়েক মুহূর্ত ওঁকে লক্ষ্য করলাম। তারপর আবার চলতে সুরু করি, কোথায় এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ। গৌরীদির টাকা আছে, অনেক টাকা, সত্যিকার

টাকা। আমার এক মাসে যা খরচ লাগবে, গৌরীদি নিঃসন্দেহে তা একদিনেই ফুঁকে দিতে পারেন।

আমি বাসের এই পঁয়তাল্লিশ মিনিটের যন্ত্রণার কথা ভাবি, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের জোরগাড়া,—এ আমার হবে না। আজ নয়, কোনো দিনই নয়। একটা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল, হাতছানি দিয়ে উঠে পড়লাম। তারপর সেই সূর্যোকরোজ্জ্বল ধরণীর রূপমাধুরী দেখার জন্য গঙ্গার ধারে ওয়াটার গেটের কাছে নেমে পড়ে গঙ্গার ওপর ভেসে যাওয়া দেশী নৌকা দেখতে লাগলাম। তাও কি শান্তি আছে, দিন দুপুরেও জোড়া জোড়া প্রেম-পিয়াসীর দল এদিক ওদিক ঘুরছে।

ঠিক একটা পাঁচে আমি স্পেন্সেস হোটেলে এসে হাজির হয়েছি। হোটেলের এখনও যেন ঘুম ভাঙে নি। টেবল সাজানো হয়েছে তবে মক্কেলবৃন্দ আসতে আরম্ভ করেন নি। গৌরীদি একটা কোণের টেবলে বসে একমনে সিগারেট টানছেন। তিনিই একমাত্র অতিথি, তখন পর্যন্ত

বেয়ারারা তখন ও গ্লাস পালিশ করছে, কেউ কেউ একত্র দাঁড়িয়ে জটলা করছে।

হেড ওয়েটারের কৌতূহলী নজর কাটিয়ে আমি ধীরে ধীরে গৌরীদির কাছে পৌঁছলাম। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁর পাশে বসে পড়লাম। তিনি অতিশয় স্নেহভরে আমার দিকে তাকিয়ে মধুর ভঙ্গীতে হাসলেন—বললেন—ড্রিংকস। এনিথিং ইউ ওয়ানট।

গৌরীদি এক সময় এম-এও হয়েছিলেন, এইবার হেরে গিয়েছেন, সেই গৌরীদি প্রথমা দুপাত্র প্রায় নিঃশব্দেই শেষ করলেন। এই সময়টা তাঁর মুখে কোনো কথা নেই।

বললাম—জায়গাটা বেশ না গৌরীদি।

—হাঁ, আর সব জায়গাগুলো, অফুলি ক্রাউডেড। আমার এখানটাই পছন্দ!

পানীয় তাঁকে বেশী কাবু করতে পারেনি বলে মনে হয়। তিনি অবলীলাক্রমে গ্লাস শেষ করছেন, সিগ্রেট টানছেন আর আমার দিকে মধুর ভঙ্গীতে তাকিয়ে আছেন। তাঁর হাতের সোনার ব্রেসলেটটা ঝক্‌ঝক্ করছে, যেন পোকা তাড়ানোর ভঙ্গীতে হাত দুটি মাঝে মাঝে নাড়ছেন। তখন কিন্তু একটু বিশ্রী দেখায়। মুখটা নার্ভাস ভঙ্গীতে মাঝে [illegible] কাঁপছে।

—"একটু আগে আসা ভালো, এখানে আবার হাইকোর্ট পাড়ার লোকজনের ভীড় বেশী। আই হেট দেম। যাক্ গে, তোমার যেন কি একটা চাই বলছিলে—

একটা প্রশ্ন, বিবৃতিও বলা যায়। সারা জীবন ধরে মানুষ কেবল গৌরীদের কাছে প্রার্থনা জানিয়ে এসেছে, সাধারণত সেই প্রার্থনা অর্থের জন্য। আসঃ স্পর্শ পুরাঙ্গে অনুভব করার ক্ষমতা তাঁর আছে।

আমি আর ভণিতা না করেই বললাম—কিছু টাকা চাই গৌরীদি, ভীষণ দরকার। জানেন ত' মা নেই, তাঁর উইলের এখনও প্রোবেট নেওয়া হয় নি।

—তা তোমার উকীল না সলিসিটর সে কি করছে?

আমি স্পষ্ট বললাম—ওঁর কাছ থেকে এক পয়সাও নেব না। মিথ্যা কথা বলার সময় তা সোজা সুজিই বলা ভালো, এবং যা মুখে আসে সে কথাই বলা উচিত।

গৌরীদি বললেন—অঃ, আচ্ছা খাওয়াটা শেষ হোক। খেতে খেতেই একমুখ ভর্তি খাবার মুখে নিয়ে হঠাৎ গৌরীদি বললেন—তা আমাকেই বলছ কেন?

আমার মাথায় এখন সুরার ক্রিয়া সুরু হয়েছে, আমার মুখ ফেটে যেন রক্ত ঝরে পড়বে, দেহ কাঁপছে, বললাম—কারণ? কারণ আর কি, আমার জানাশোনা আপনার জনের মধ্যে একমাত্র আপনারই টাকা আছে, যে টাকা আছে তা আর কারো আছে বলে জানি না।

—সানা সেগে, চমৎকার কথা তোমার। কিন্তু আমার ত' নগদ টাকা নেই, সবই ত' ব্যাঙ্কে—।

আমি কিছু বললাম না। গৌরীদি চুপ করে রইলেন। কি যেন ভাবছেন। রাক্ষসের মত খাচ্ছেন, স্যালাড পড়ে আছে, আবো মাংস নিলেন, সেকেণ্ড হেল্পিং—

তারপর মুখটা মুছে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন। আমিও দাঁড়ালাম।

—আমার সঙ্গে চল, সাড়ে তিনটেয় অনেকে আসবে, ইণ্টারন্যাশনাল আর্ট একজিবিসনের যে কমিটি আমি আবার তার প্রেসিডেণ্ট, আমার বাড়িতেই মিটিং ডেকেছি। আর পারি না। বাবো মাস কিছু না-কিছু লেগেই আছে।

বাইরে সেই চকচকে ক্যাডিলাক দাঁড়িয়ে। চালক সেই সুদর্শন মানুষটি। গৌরীদি সেই কায়দায় হাততালি দিলেন—বাচ্চু সেন।

বাচ্চু সেন অর্থাৎ ড্রাইভার নিঃশব্দে গাড়িটা এনে সামনে দাঁড় করাল। আমি পিছনের সিটে বসে পড়লাম হেলান দিয়ে। আর গৌরীদি আনমনা ভঙ্গীতে সীটের একপ্রান্তে বসে রইলেন আলগোছে। আমি নরম গদীর বুকে আশ্রয় পেয়ে যেন বেঁচে গেলাম। সকাল থেকে এতটুকুও বিশ্রাম করি নি, উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠায় মনটা ভরেছিল। এখন আমার যত গ্লানি যেন ধুয়েমুছে গেছে। কি প্রাচুর্য, কি বিলাস-বৈভব। এত সম্পদ, এত সমৃদ্ধি। কে বলবে এ দেশের মানুষ খেতে পায় না; ফুটপাথে শুয়ে রাত কাটায়। আর গৌরীদি। যা কিছু সুন্দর। যা কিছু মূল্যবান। যা কিছু প্রাণরসে পূর্ণ তারই যেন প্রতীক।

গৌরীদি সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ড্রাইভারের কাঁধটা আলতো ছুঁয়ে বললেন—বাড়ি চলো, বাচ্চু। মিটিং আছে।

—আচ্ছা।

গৌরীদি চান সবাই তাঁকে মান্য করুক, সবাই তাঁর কথা শুনুক, কথা মুখ থেকে খসানোর সঙ্গেই যেন তা পালন করা হয়। হলও তাই; বাচ্চু তৎক্ষণাৎ হুকুম প্রতিপালন করে।

ক্যাডিলাকের অর্থ অবশ্য স্পীড নয়, তবে প্রয়োজন হলে তা ছুটতে পারে প্রচণ্ড বেগে। তাই রেড রোডে পড়ে গাড়িটা বেশ স্পীড নিল। বাচ্চু সেন চালায় ভালো। গাড়িটা বেশ চলছে। কয়েক সেকেণ্ডেই যেন ষাট মাইল বেগে ছুটেছে।

গৌরীদি জানালার কাচটা নামিয়ে দিলেন। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া শিরশির করে ভেতরে ঢুকে পড়ে। গৌরীদি যেন নখ দিয়ে শিকার ধরেছেন এইভাবে সামনের সীটের পিছনের অংশটা আঁকড়ে ধরে আছেন। ছুটে চলে যাওয়া দৃশ্যপট, চকিতে সরে পড়া ফুটপাথ, কিছুই তাঁর নজরে পড়ছে না। তিনি আনমনা।

গাড়ির চাকাগুলি একটা হিস শব্দ করে মিডলটন স্ট্রীটে ঢুকছে।

গৌরীদি এই প্রথমে বেশ ভালো করে হেলান দিয়ে বসলেন।

গাড়ি দোরগোড়ায় থামল একরকম নিঃশব্দে। চারিদিক শান্ত এবং স্তব্ধ।

বাচ্চু সেন মুখ না ফিরিয়েই গম্ভীর গলায় বলে ওঠে—এসে গেছি।

গৌরীদির চমক ভাঙে, নিজেই দরজা খুলে নামলেন, বললেন—এসো ভাই হিমানী।

অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে। গৌরীদি বাচ্চুর দরজার কাছে একটু দাঁড়ালেন, বাচ্চু সেন তাড়াতাড়ি জানলার কাচটা নামিয়ে মুখ বাড়ায়; ছেলেটা সুদর্শন বটে। গৌরীদি আদরের ভঙ্গীতে তার গায়ে হাত দিয়ে বললেন, বিকালে আর বেরোবো না, তোমার গাড়ির ছুটি।

বাচ্চুর সপ্রতিভ ভঙ্গী দেখে মনে হয় যে এই জাতীয় সমাদরে অভ্যস্ত।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

একটি রোমাণ্টিক নাটক

বাঁদীর দলের বন্দিনী
ঐ তপ্ত শিখা তন্বীকে
ধরবো ওগো কিসের জাঁকে
মনে মনে গুণছি যে

*

দশটি হাজার নগদ কিন্ত
করকরে সোনার দিনার
গুণে দিলে তবেই পাবে
অত্যাশ্চর্য দেহের মিনার।

...বৃষ্টিসজল আঁধারচপল সন্ধ্যা, মৌতাতী মেজাজে নাটক পড়ছি, সামনে ধূমায়িত চা, যা সরস করে, কিন্তু মদির করে না। প্রথম অঙ্কেই চোখে পড়লো উপরের ঐ কথাগুলো—গুনগুন করে গান করছেন এক বড় উজীর সাহেব। একটা অবাস্তব চটুল আবহাওয়া—বেচা-কেনার হাটে আলু-পটলের মত তন্বঙ্গী যুবতীদের নিয়ে দর কষাকষি চলছে, নিলেম হচ্ছে। দয়িতের দু'বাহুর নিভৃত আশ্রয় ছেড়ে আসছে ইরান দেশের বুলবুল, বসোরাই গোলাপ, নারীমাংস-লোভী পাষণ্ডদের অভাব নেই, ভবঘুরে বাউণ্ডুলেরা দালালী করছে।

উজীর-নাজীর, বাদশাবাঁদী, জল্লাদ, মুণ্ডচ্ছেদ, হুকুম-হাকিম নিয়ে এক অবাস্তব পরিবেশ—আরব্য উপন্যাসের যুগ—হারুন-অল-রশীদ ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, প্রজাদের সুখ-দুঃখের গল্প শুনছেন, অভাব-অভিযোগের প্রতিকার করছেন, কাউকে দণ্ড দিচ্ছেন, কাউকে পুরস্কার, কেউ শূলে চড়ছে, কেউ সুন্দরীদের কণ্ঠলগ্না হচ্ছে।

কিন্তু নাট্যকারটি কে? ওমর-খৈয়াম, হাফেজ, রুমী ফিটজেরাল্ড, ইরানতুরানের বিদ্বান ওমবাহ আমীর?

গল্পের আখ্যানভাগ কম। নাটকটির কাল বিখ্যাত হারুনের সময়—স্থান বসোরা ও বাগদাদ।

সুলতান মহম্মদ-বিন-সুলেমানের দুই উজীর—আলফজ্জল ইবনসয়ী আর আলমুয়েন-বিন-খাকন্। ওদের দুজনের দুই ছেলে—নুরুদ্দীন আর ফরীদ্।

দাস-দাসী বিক্রয়-ক্রয়ের হাটে একটি সুন্দরী বাঁদী এলো—নাম আনিস-আলজালিস। রূপে-গুণে অতুলনীয়া সে,—তাকে কেন্দ্র করেই এই নাটকের ঘাত-প্রতিঘাত-সংঘাত বা action বা extravaganza.

বড় উজীরের ছেলে নুরুদ্দীন উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল বটে, কিন্তু মা আমিনার মতে, সে চাঁদের মত সর্বগুণসম্পন্ন—তার বড় রমণী-প্রীতির কলঙ্ক আছে

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

বটে, সারা সহরের মেয়েগুলো তার জন্য পাগল, তবু সে পুত্ররত্ন। আর ছোট উজীরের ছেলে বিকলাঙ্গ ফরীদ একটা পশুবিশেষ—তার মা খাতুনের কথাতেই বলি—বাপের অজস্র আদরে ছেলেটা একেবারে নষ্ট হয়ে গেলো গো—মনুষ্যত্ব দূরে থাক, মনুষ্যপদবাচ্যও নয়—ভগবদ্দত্ত সৌন্দর্য, বীর্য-শৌর্য সব মুছে গেল—একেবারে পশু: বাপ বলে—না, না, ও আমার পাগল ভুতনাথ—প্রকৃতি ওকে চালায়-ওর দুরন্তপনা, বেয়াদবী, সবই তারই তাড়নায়—ও তো খাস প্রকৃতির দুলাল।

প্রথম অঙ্কেই পেলুম, সুন্দরী যৌবনশ্রীসম্পন্না আনিসাকে নিয়ে বেচা-কেনা চলছে—ক্রেতা স্বয়ং বড় উজীর। সুলতানের জন্য এক সর্ব-গুণান্বিতা ললিতকলায় পারদর্শিনী গৃহিণীসচিবসখিমিথঃ প্রিয় শিষ্যার খোঁজে তিনি বেরিয়েছেন। এর প্রতিদ্বন্দ্বী ছোট উজীর তিনি বাঁদীটিকে চান তাঁর কদাকার পুত্রের জন্য, তার ক্ষণিক লুব্ধতার তৃপ্তির জন্য। শেষ পর্যন্ত বড় উজীরই নিয়ে এলেন রূপসীটিকে, তুললেন তাঁকে ঘরে, সুলতানের প্রমোদলীলার অঙ্কশায়িনী করবেন বলে। কিন্তু বাদ সাধলেন অদৃশ্যা নিয়তি। দ্বিতীয় অঙ্কে দেখি বড় উজীরের কর্তব্যপরায়ণা ভাইঝি দুনিয়া প্রেমের দূতী হয়ে আনিস ও নুরুদ্দীনের মিলনের পথ মসৃণ করে দিচ্ছেন। এ-যেন বীর বিনা আর রমণীরতন, কারে শোভা পায় রে। আনিস চালাক মেয়ে,—অনেক ঘাটের জল খেয়েছে সে। মনে মনে সে পছন্দ করে নুরুদ্দীনকে—একটা সুস্থ সবল আদর্শবাদী যুবক, যে প্রেমে মাতোয়ারা হয়, আনন্দে ডগমগ হয়—যার চোখে লেগে আছে স্বপ্ন, কল্পনা যার হয়েছে উদ্দাম। সে বলে—আমি যে রাজকন্যাকে বিয়ে করবো তার মিঠে চোখ দুটি হবে মধুর রহস্যে ভরা, সে হবে কেশবতী আলুলায়িত-কুন্তলা, দীঘলচুল, তার হয়ে আমি যুদ্ধে যাবো, যুদ্ধ জয় করবো, দিগ্বিজয়ে বেরুবো, অরাতি নিধন করবো, বড়ো বড়ো লৌহদ্বারবেষ্টিত সহরগুলিকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়ে জয়হুঙ্কারে কেড়ে নেবো, শত্রুকবল থেকে বন্ধুরাজ্যদের উদ্ধার করবো এবং আমার হৃদয়পুর—সুন্দরীর সাম্রাজ্য বিস্তার করবো।

তার স্বপ্নের কথা সে বলেই চলে—আমি বেরিয়ে পড়বো—যাযাবর পথিক, তরবারহাতে চলে যাবো দেশ-দেশান্তরে—যাবো পশ্চিমে, করবো মুরদের সঙ্গে মিতালী—যাবো মহাচীনের প্রান্তরে—কাফেরদের দেশ দিল্লীও রবে না বহুত দূর, গজ-মোতিগুঁড়া যেখানে পথের ধূলা—আমি দান করবো অজস্র,

. . . দরিদ্র থাকবে না,
———— ...কষ্ট-দৈন্য দূর হবে- - - -

ধনলক্ষ্মী চটে যান—ছেলেকে প্রচণ্ডতম শাস্তি দেবেন—স্বয়ং সুলতানের জন্য আনা মেয়েটির উপর সে লোভ করেছে, এতো বড় স্পর্ধা—এতো বড় অনাচার, অতএব করো এর শিরশ্ছেদ—ছেলেও জানে বাপের দৌড় কতদূর। শেষ পর্যন্ত প্রমাণ হয় যে, পাকা ফলটি কোন্ দেবতার ভোগে লাগবে, না জেনেই নুরুদ্দীন তাতে কামড় বসিয়েছে, দুনিয়ার সাহায্যে এবং আনিসের মুগ্ধ গোপন সম্মতিতে— অতএব ক্ষন্তব্যোমেঽপরাধ: । পিতা তো ক্ষমা করলেন, কিন্তু পিতৃব্য আছেন, তিনিও বাগ্দার উজীর, রাজকার্যের অবহেলা নৈব নৈব চ— অতএব সুলতানের কর্ণগোচর করানো হলো এই সাধু ও স্বাদু সংবাদটি। জলে উঠলেন মহাশাস্তা (ইনি অবশ্য কামমোহিত শিবের ঔরসে মোহিনী বিষ্ণুমায়ার গর্ভজাত কেরলের ব্যাঘ্ররাজ অয়প্পন্ নন)। তৃতীয় অঙ্কে সেই সংবাদই নিয়ে এলেন নুরুদ্দীনের বন্ধুরা ওদের শান্ত প্রেমের কলায়ে, যেখানে দেনার দায়ে তখন ভরাডুবি হচ্ছে দড়ি-কলসী পর্যন্ত— স্থির হলো প্রেমনিমজ্জিত নিশীথরাতের গভীর শপথের মত যে, পশ্চাদপসরণই শ্রেয়, অর্থাৎ কি না পলায়ন—রাজরোষ থেকে।

বাগদাদে উঠলো চতুর্থ অঙ্ক। মহামান্য খলিফের রম্যবাগিচার বিলাসমঞ্জিলে—সেখানে চক্রবাক-চক্রবাকীদের কান্নায়, বন্য ঘুঘুদের মিলন-কূজনে, বুলবুলের ডাকে, কোকিলের গানে রক্তিম প্রবালের মত, মরকত-মালার মত ফুল-ফলের বিচিত্র রং-এ ও শোভায় বনশ্রীর শ্যামাঞ্চল ঝলমল। তারই রক্ষক ছিলেন ইব্রাহিম—বুড়ো হলে কী হয়, একেবারে রসরাজের শুধু দ্বারপাল নন, ডুবুরী। একজোড়া কন্দর্পকান্তি তরুণ-তরুণী দেখে শুধু লম্বকর্ণ নন, একেবারে মুগ্ধমাধব বিগলিততনু দগ্ধ দামোদর হয়ে উঠলেন। এই রসিক পুরুষটির চিত্র ফুটেছে নাটকের একটি গানে- - -

আমার দাড়ি শীতবুড়োরি
চরণচিহ্নে সাদা হলো
শ্বেতশ্মশ্রু বলিরেখাতে
আনন কপোল ভরে গেলো
তবু মত্ত আমি মদ্যপানে
নরক আগুনে ভয় করি না
নেই অরুচি সেই সরস তানে
শেষের দিনে বিচারেও না
ইব্রাহিম যে প্রেমপিয়াসী
অধর আশ তার তবু মেটে না
চাওয়া-পাওয়া যখন খুশি
তিয়াসীদের নেই ঠিকানা।

এমন সময় মঞ্জিলের বাইরে উদয় হলেন স্বয়ং সম্রাট হারুন-অল-রশীদ ও তাঁর উজীর জাফর।

গান তখনও চলছে—
ঝুম্ ঝুমাঝুম্ ঝুম
সুরার সাথে সুন্দরীদের
চটুল ঠোঁটের ধুম
টলটলে ঐ পাত্রখানি
অধরসুধার জড়িয়ে জানি
স্ফূর্তি করো চরম সুখে না, না, না
ওগো হরিণনয়না
সাঁঝের বাতির ক্ষীণ আলোতে
চকচকে ঐ চোখ দুটি।
তোমার দিল-মাতানো চেরী গলানো
রঙীন রাঙা ঠোঁট দুটি।

বুড়ো ইব্রাহিমের "কনফেশন" শুনুন---
যখন আমি ছিলাম তরুণ বয়স ছিল কাঁচা
আমার ছিল মতলব ভারী মেয়ে ধরার খাঁচা
তখন যদি দৃষ্টিপথে আসতো কোন মেয়ে
কোলে তারে বসিয়ে নিতাম
রূপসাগরের নেয়ে
হোক না তার বয়স বেশি
তন্বী নাই বা হলো
শ্যামাঙ্গিনী ষোল কিম্বা
হয়তো কালো-ধলো
এখন আমি বৃদ্ধ জীর্ণ জরায় শিথিল তনু
তরুণীরা পালায় ভয়ে কম্পিত পরম অণু
পরাণ আমার বেদন ভরা ব্যথায় জরজর
কেবলই শুনি কূজনধ্বনি সরো সরো সরো
দেখতে যদি কি ভ্রূভঙ্গি এখন আমার
জোটে
পায়ের তলায় নৃত্যের তাল বেতাল হয়ে
ফোটে।

কিন্তু নবীন যুবা আর মধুকণ্ঠী তরুণীকে দেখেই গলে গেলেন সম্রাট—ওদের ভাজা মাছ উল্টে খাওয়ালেন, বসোরার রাজা ও রানী করে ছেড়ে দিলেন—হায় রে সে সব কাল কবে কেটে গেছে—উদ্ধত যৌবনের যখন সম্মান ছিল—দুর্বৃত্তেরা শিক্ষা পেলে—ধর্মের জয় হলো—জয়ডঙ্কা বাজলো, তারপর ভরতবাক্য—শান্তি, শান্তি। গল্পটি ফুরোলো, নটে গাছটি মুড়ুলো। পঞ্চাঙ্ক নাটকের সমাপ্তি ঘটলো।

এই রোমান্টিক নাটকটির রূপকার হচ্ছেন শ্রীঅরবিন্দ—'বসোরার উজীররা' এই নাটকটির নাম দেবতার দীপ হাতে রুদ্রদূত যিনি, সত্যের গৌরবদীপ্ত প্রদীপ্ত ভাষায় যাঁর প্রশস্তি গেয়েছেন কবিগুরু, তিনি বরোদাবাসকালীন অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সে এই রম্য নাটকটি রচনা করেন। হয়তো প্রচলিত নাট্য সংজ্ঞা অনুসারে শ্রীঅরবিন্দের এই নাটকটিকে আমরা Poetical drama বা Dramatic poetry বলবো। কিন্তু ভাবে-ভাষায়-আলিম্পনে, চরিত্র সংঘাতে আরব্য উপন্যাসের বিচিত্র আবহাওয়ায় এই নাটকটির মধ্যে অবাস্তবের রেশ থাকলেও একটা গতিময়তা এসেছে—যেটা সেদিনের সমাজ পরিবেশের সঙ্গে সম্পূর্ণ খাপ খেয়ে যায়। এই নাটকটির উপর তাঁর সস্নেহ দৃষ্টি ছিল। তাঁর প্রথম যুগের চঞ্চল রাজনৈতিক জীবনের ঘূর্ণিপাকে তাঁর লেখা বহু কাগজপত্র, খাতা-বই পুলিসের হাতে লণ্ডভণ্ড হয় এবং হারিয়ে যায়। এই নাটকটির পাণ্ডুলিপি পঞ্চাশ বছর পরে আলিপুর মামলার কাগজপত্র ও নথির মধ্যে পাওয়া যায়। এখনও পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় নি। তবে পণ্ডিচেরী থেকে Sri Aurobindo Mandir Annual ও 'বর্তিকা' পত্রিকায়

(আমার কৃত অনুবাদ) প্রকাশিত হয়েছে।

নাট্যকার শ্রীঅরবিন্দকে আমরা বিশেষ জানি না। তাঁকে মহাযোগী, মহাত্যাগী, বিদগ্ধ বিরাট পুরুষ বলেই চিনি। তাঁর প্রথম নাটক "Perseus the Deliverer"—"পরিত্রাতা পারসিউস"। এটাও লেখা বরোদা-বাসের সময় গল্পের আখ্যানভাগ যে রাজা ক্রিস্যাস দৈববাণীতে জেনে-ছিলেন যে তাঁর কন্যার পুত্রই তাঁকে ধ্বংস করবে, অনেকটা কংস কাহিনীর মত। একে Heroic myth বলা যায়। কিন্তু এর মধ্যে একটা উর্ধ্ব-জীবনের আভাস পাই।

আলুলায়িতকুন্তলা দেবী আকাশ পথে এসে অশান্ত সমুদ্র দেবতাকে ডাকছেন—

হে পসিডন্, তুমি জাগো।—

সমুদ্রের বহু নিম্নে নিদ্রিত পসিডন্ জেগে বললে—কে আমাকে ডাকে?

জলধির কলনাদে উত্তর এলো—উর্ধ্বে আবির্ভাব হয়েছে এক শুভ্রাশক্তির।

তুমি কে? জিজ্ঞাসা করে পসিডন।

উত্তর হয়—শ্রীঅরবিন্দের ভাষাতেই বলি—

Me, the omnipotent
Made from His being to
lead and discipline
The immortal spirit of Man.

শ্রীঅরবিন্দের এই নাটকটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বিসর্জনের কিছুটা তুলনা করা যায়। রঘুপতি আর পলিয়াডন (Polyadon) এক নির্মম দেবতার উপাসক। অর্পণা ও এণ্ড্রোমেডা, জয়সিংহ আর পার্সিউস তার বলি। দেবতা চাইছে—মায় ভূখা হুঁ—

My victims, Polyadon, give me my victims.

মহাকালী, কালস্বরূপিণী বলেছেন
দাঁড়াইয়া তৃষাতীক্ষ্ণ লোলজিহ্বা মেলি
বিশ্বের চৌদিকে বেয়ে চিররক্তধারা
ফেটে পড়িতেছে নিষ্পেষিত দ্রাক্ষা
হতে রসের মতন অনন্ত খর্পরে তার

কিন্তু শুভ্রাশক্তির কাছে রুদ্রাশক্তির হার হয়। মৃত্যুরূপা মাতাই যে অমৃতময়ী মা।

শ্রীঅরবিন্দ কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশী'ও অনুবাদ করেছিলেন—"The Hero an[illegible]" নামে—এ সম্বন্ধে আলোচনা করেছি অন্যত্র। কালিদাসের কাত্যায়নী মন যে উর্বশীকে কল্পনা করেছিল, রবীন্দ্রনাথ যাকে অমৃতপান সভার সখীরূপে দেখলেন, শ্রীঅরবিন্দ তাকে উর্বশী প্রেমের সাধনায় নতুন করে তুলে ধরলেন। তাঁর কাছে উর্বশী অস্তাচলবাসিনী নয়।

ফিরিবে না, ফিরিবে না,
অস্ত গেছে সে গৌরবশশী।

কিন্তু সে ফেরে—

She is but gone
for a little gone
But she will soon
come back.

"বসোরার উজীররা"—এই নাটকেও শেষ কথা—সেই জ্যোতির্ময়, প্রেমময় আনন—পৃথিবীর আনন্দকে স্বর্গে নিয়ে গিয়ে তোলা। আমি উঠবো, তিনি নামবেন। এই দুই মিলনে কান্তকবি জন্মগ্রহণ করেন।

মন মে কিসী কান্ত কবি কো
ভী জন্ম দিয়া করতী হৈ॥
—কবি দিনকর।

...তা নিয়ে গড়ে ...সম্ভব-অসম্ভব মনোহারী এবং আতঙ্কের গল্প। যা হাতের কাছে, সহজলভ্য তা নিয়ে যে রূপকথা বা উপকথা হয় না তা নয়, কিন্তু এ কাজ মুষ্টিমেয় প্রতিভার আয়ত্তগম্য। আর যা জানা যায় নি, বা যা শুধুই ধরা দিয়েছে আভাসে-ইংগিতে তার আকর্ষণ যুগে যুগে মানুষকে কল্পলোকের চাবি যুগিয়েছে উদার হাতে। সীমিত জীবনের চাপে হতাশ্বাস মানুষ অসীম কল্পলোকে পাড়ি দিয়েছে মনে মনে। উধাও পক্ষীবাজ তেপান্তরের ধূ-ধূ প্রিয়া বিনা চাওয়ায় আলিংগন দেয়, সে নিতান্তই মনোলীনা। জীবনে তার অস্তিত্ব নিরালম্ব। জলপরীর দেশেও অগাধ অবাধ আনন্দ, সেখানে পৌঁছোতে হয় মৃত্যুর হাত পেরিয়ে। জলতলের সুন্দরীরা আনন্দপসরা সাজিয়ে অপেক্ষারত, ঘুমে অচেতন রাজকন্যার মতন, সেই বীরের জন্য যে বিপদবাধা নাহি মানি ভাসিয়ে দেবে তার খেয়া দুঃসাহসের পাল তুলে এবং পথের বিপত্তি চূর্ণ করে পৌঁছবে এই চিরসুখের লীলানিকেতনে। সেখানে তার চিরদিবসের যারা ঘুরে বেড়ায়, সেইসব সাগর-সন্তানদের সম্বন্ধে জানাশোনার মাত্রা স্বল্প তাই ওদের নিয়ে, বিশেষত স্বল্পতর জ্ঞাত কোন কোন জীব সম্বন্ধে যুগে যুগে গড়ে উঠেছে কাহিনী, গল্প, রূপকথা। কল্পলোকের রংয়ে ওরা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যুগ থেকে যুগান্তরে।

জলতলের অপরূপ কথার নায়ক দু'জন—অক্টোপাস্ আর স্কুইড। আর কোনও সমুদ্রচর প্রাণীকে ঘিরে এত গল্প, উপকথা এবং কুসংস্কারময় বিশ্বাস গড়ে ওঠে নি। ভয়, আতংক

মাঠ পেরিয়ে তাকে পৌঁছে দিয়েছে শিয়রে রূপোর কাঠি পায়ে সোনার কাঠি ছোঁয়ানো রাজকন্যার অগমপুরীর আলো-আঁধারি শয়নকক্ষে। ঘুমে অচেতন রাজকুমারী, তাকে জাগ্রত করে লক্ষ্মীলাভ করা যে তারই কাজ।

একদিকে এই। অন্যদিকে অগাধ জলতলে তার অবাধ বিহার। অনন্ত সাগরতলে প্রবালদ্বীপে রত্নপর্যংকে তার অধরা মানসীর উদ্দেশে সে পাড়ি জমিয়েছে যুগ যুগ ধরে। পথে বাধা-বিপদের শেষ নেই। কিন্তু তা পেরিয়েই তো সত্যিকার আনন্দ, অভিজ্ঞতা থেকে সে বুঝেছে যা পাওয়া যায় দুঃখের পরীক্ষা পেরিয়ে তাই সত্যিকারের পাওয়া। সুখের পর্যংকে যে

রত্নাকর

অভিষেক, অনন্তকালের বুকে সে শাশ্বত উজ্জ্বলতায় দীপ্যমান। রাজপুরীর রাজকুমারী আর প্রবালদ্বীপের পয়োধরার বর্ণনা উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে কত জানা-অজানা শিল্পীর মানসে, তা রূপ পেয়েছে কাগজের বুকে—কালি আর তুলির আঁচড়ে।

এই হল প্রাপ্তির তৃপ্তি। সুখীমনের আনন্দ-প্রতিচ্ছবি। কিন্তু ও-পথে বাধা অনেক, বিপত্তি পদে পদে অনুসরণ করে ছায়ার মত। তাই, এসবের বর্ণনাও অনেকখানি জায়গা নিয়েছে বিশ্বসাহিত্যে। আর, যেহেতু সমুদ্রে আর ঘোর বিতৃষ্ণাকর সব বিশে... জুড়ে দেওয়া হয়েছে ওদের নামে সংগে—শয়তানসদৃশ, পৈশাচিক, দানব ইত্যাদি।

এদের বাস মহাসাগরে, গভীর জলতলে; তাই সাধারণ মানুষের চ... পথে ওরা পড়ে না। মানুষের চো... ওদের গড়ন কিম্ভূতকিমাকার ... ওদের কারোর গঠন খুঁটিয়ে দেখে উল্লসিত হওয়া সম্ভব নয়।

প্রথম দৃষ্টিতে অক্টোপাস্ এক রাক্ষুসে মাকড়সাবিশেষ। আটটি ... সর্পিল বাহু—শুঁড়বিশেষ—স্ফীত দেহলগ্ন। শুঁড়গুলোয় বিশাল দন্ত... খাঁজ, যার ফলে কোন কিছু ধরা... ওদের সুবিধা অপরিমেয়। ওদে...

...ও। কপোতকল্প ...া খাদ্য বা শত্রুদেহ এবং আতঙ্কর ... করতে পারে সহজেই। ওদের অস্বস্তিকর, এমন কি ভয়াবহ মূর্তি সম্পূর্ণ হয় পিরিচের মত বড় একজোড়া পাতাহীন নিমেষহীন চোখ নিয়ে।

স্কুইড্-এর চেহারা দীর্ঘতর এবং মসৃণতর, ওদের শুঁড় দশটা। এই দু'টির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতায় এদের পাত্তা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কী নয়নরঞ্জন মূরতি।

হোমার-এর 'অডিসি' থেকে, স্কিল্লার সংগে ইউলিসিস্-এর যুদ্ধ বর্ণনা—যা নিশ্চয়ই একটা রাক্ষুসে স্কুইড্ ছাড়া আর কিছুই নয়, আজ পর্যন্ত রক্তপিপাসু জল-দানবদের বহু বর্ণনা সমুদ্রাভিসারী মানুষের মুখে শোনা যায়। গোড়ার দিককার নর্স (Norse) ইতিবৃত্তকাররা ওদের বলেছেন 'ক্র্যাকেনস' (Krakens) ওদের বর্ণনা বহু তথ্যসমন্বিত। মনে করা হ'ত ওরা শুয়ে থাকত চলমান জাহাজের উদ্দেশ্যে। গল্প বলে, কোন কোন সময় পাদপসদৃশ স্থূল শুঁড়গুলো জাহাজ পাকড়াও করে জলতলে নিয়ে গিয়ে মাঝি-মাল্লাদের ভোজে লাগাত। আবার কখনও জাহাজকে রেহাই দিয়ে ওরা তুলে নিত কয়েকজন সাগর-যাত্রীকে।

ক্র্যাকেনস-এর গল্প সাগরতলের অন্যান্য আজব গল্পের মতই একবার জনপ্রিয়তা পেয়েছে, আবার তা নষ্টও হয়েছে পালাক্রমে। গোড়ার দিকে বিজ্ঞানীরা এদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন এবং তাদের প্রাকৃতিক ইতিহাসের বইয়ে এই বীভৎস এবং বহুলাংশে কল্পনাশ্রয়ী জীবটির ছবি দিয়েছেন। কিন্তু ওদের দেখা না মেলায় সন্দেহ ঘনীভূত হ'তে থাকে এবং শেষে অন্যান্যদের সংগে ওরাও নিছক কল্পলোকবাসী বলে আখ্যা পায়।

কিন্তু ১৮৭০-এ রাক্ষুসে স্কুইড-এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় সন্দেহাতীতরূপে। ১৮৭৩-এ নিউফাউন্ডল্যান্ডের উপকূল থেকে দূরে দু'জন জেলে কী যেন একটা দেখতে পায় জলে এবং কাছে এগিয়ে তাদের একজন বেশ জোরে আঘাত করে দৃশ্য বস্তুটিকে। অনুমিত ভগ্নাবশেষ তুরন্ত সাংঘাতিকভাবে নিজের সজীবতা এবং বিরক্তি প্রমাণ করল। ফুলে ফেঁপে উঠল ঢেউয়ের দল, দু'টো বিরাট চোখ তাদের দিকে চেয়ে রইল, আর নৌকোয় লাগল আতংককর এক ঝাপ্টা, বিশালকায় এক ঠোঁট ঝাপটা দিয়েছিল।

তারপর দু'টো পাকান শুঁড় নৌকো জড়িয়ে ধরল। সৌভাগ্যক্রমে জেলেদের একজন উপস্থিত বুদ্ধি হারায় নি ; সে কুড়ুল দিয়ে শুঁড়গুলো কেটে ফেলল। ফলে স্কুইডটি নিরুৎসাহিত হয়ে পালিয়ে গেল দ্রুতগতিতে। পরে মাপা হ'ল—একটা শুঁড় উনিশ ফুট লম্বা আর ওটার ব্যাস দশ ইঞ্চি।

এরপর কয়েক বছর ধরে অনেক রাক্ষুসে স্কুইড নিউফাউন্ডল্যান্ড-এর উপকূলে এসে পড়ত ঢেউয়ের দোলায়। সত্যি বলতে কি, একসময় পঁচিশ থেকে তিরিশটার একটা দল দেখা গিয়েছিল। মৎস্যশিকারী একদল লোক ওদের কেটে ফেলেছিল মাছ ধরার টোপ করার আশায় ; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ওদের খুদে খুদে টুকরোয় কেটে ফেলার আগেই বৈজ্ঞানিকরা কয়েকটার মাপ-জোক নিতে পেরেছিলেন। পরে, ওরা দুর্লভ হয়ে পড়ে, প্রায় দেখাই যেত না বলতে গেলে।

জানাশোনা বৃহত্তম স্কুইড পঞ্চান্ন ফুট লম্বা। অন্যান্য প্রামাণিক মাপজোক থেকে জানা যায় একটি দেহের মাপ—পরিধি বার ফুট, চোখের ব্যাস নয় ইঞ্চি, সাঁইত্রিশ ফুট লম্বা শুঁড় এবং দু' ইঞ্চিরও বেশি চুমে খাওয়ার গোলাকার চাকতিগুলো।

কিন্তু রাক্ষুসে স্কুইড্-এর অস্তিত্ব আছে এবং ওরাই বৃহত্তম অমেরুদণ্ডী প্রাণী—এই মানুষের জ্ঞানের সীমা ওদের সম্বন্ধে। ওদের বাসভূমি, অভ্যাস বা জীবনযাপন পদ্ধতি এখনও রহস্যলীন।

এখনও প্রাচীনদের বর্ণনামত সুবিশাল স্কুইড-এর সাক্ষাৎ মেলে নি; তবে জানাশোনার বাইরে বৃহত্তর স্কুইড থাকা বিচিত্র নয়। স্পার্ম তিমি অনেক সময়ই রাক্ষুসে স্কুইড খায় এবং এসব সামুদ্রিক দানবদের সংগ্রামের খবরও পাওয়া গেছে। দানবিক স্কুইড-এর সংগে যুদ্ধের ফলে ক্ষতবিক্ষত স্পার্ম তিমি ধরা পড়েছে। এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রায়ই ওরা স্কুইড-এর বিরাট বিরাট টুকরো উগরে দেয়। এরকম একটি খণ্ড ছ'ফুট লম্বা এবং দু' ফুট ব্যাসসম্পন্ন, শুঁড়ের অংশমাত্র। এ খবর সত্যি হ'লে প্রাচীন উপকথাগুলো হয়ত নিছক কল্পনাভিত্তিক নাও হতে পারে।

এত ছবি, বর্ণনা আর 'সত্যিকার' গল্পে অক্টোপাস্-এর সংগে সংগ্রাম মূল বিন্দুতে উপস্থাপিত হয়েছে যে, অনেকেই বিশ্বাস করেন আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে অক্টোপাস্ মানুষের খোঁজে ঘুরে বেড়ায় বেশির ভাগ সময়, অন্য দিকে, জনৈক জীববিজ্ঞানী বিগত দশকের গোড়ার দিকে ঘোষণা করেন যে এই প্রাণীটি কুমড়োর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক নয়।

সত্য লুকিয়ে আছে সম্ভবত দু'টি চূড়ান্ত মতের মাঝখানে—ওরা হয়ত খুবই বিপজ্জনক, কিন্তু কেবল মানুষ মারার তাল খোঁজা ওদের পেশা নয়।

১৮৭৯-তে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম মোটামুটি পরীক্ষিত আক্রমণ ঘটে—মানুষের ওপর অক্টোপাসের। ডিনামাইট সংস্থাপনরত জনৈক ডুবুরী হঠাৎ টের পায় তার হাত পাকড়াও করে নিশ্চল করে দেওয়া হয়েছে। জল স্বচ্ছতর হয়ে গেলে আতংকিত ডুবুরীটি দেখল সে অক্টোপাস্-এর কবলে। তার আপ্রাণ মুক্তি-সংগ্রামের ফলে শুঁড়টা আরও জোরে জড়িয়ে

ধরল মাত্র এবং শুঁড়ের গোলাকৃতি চাকতির চাপের- যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠল। মরীয়া ডুবুরী মুক্ত হাতের সাহায্যে একটা লোহার দণ্ড নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। মোক্ষম জায়গায় ঘা না পড়া পর্যন্ত অক্টোপাস্ বন্ধন শিথিল করে নি, তারপর ওপরে তোলা হ'ল মৃত অক্টোপাস্ আর দম-ফুরনো ডুবুরীটিকে। ওর শুঁড় মাত্র আট ফুট বিস্তৃত, ক্ষুদে অক্টোপাস্।

অস্ট্রেলিয়া থেকে এ ধরণের গল্প সব থেকে বেশি শোনা যায়। গত দশকে আরও দু'টো ছাপা হয়েছে। পরেও।

বোধহয় অন্যান্য খাদ্যের থেকে বেশি আক্রমণ মানুষকে করে না আটটি শুঁড়ওয়ালা সাগর-সন্তান অক্টোপাস্। অবশ্য কখনও কখনও আক্রমণ হয় বৈকি। যদিও ওদের সংগে মুখোমুখি সংগ্রাম বিরল, তবুও আক্রান্তরা বোধহয় স্বীকার করবেন রাক্ষুসে অক্টোপাস্‌দের 'সিন্ধুর আতংক' বলা আদৌ অসংগত নয়।

কিছু তথ্য আর খানিকটা কল্পনা উপজীব্য করে সিন্ধু-সন্তানদের সম্পর্কে নানা গল্প পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। সম্পূর্ণ অপরিচিতের বিস্ময় [illegible] সাধারণ পাঠকের সামনে আসে, তাই কিছুই অসম্ভব মনে হয় না কখনও কখনও। বিশেষ যখন পরিচয়ের সীমায় ধরা পড়ে অপরিচিত প্রাণীকুল, তখন রূপকথাকে অপরূপকথায় রূপ দেওয়া সহজতর হয়ে ওঠে। হচ্ছেও তাই। রাজকন্যা, ব্যাংগমা-ব্যাংগমী বা জলপরী আর রূপবতী সাগরসম্রাজ্ঞীরা আজ কিছু উপেক্ষিত হ'লেও, দেখা-মেলা সমুদ্রচরদের পসার ঘরে-ঘরে। যতটুকু জানা যাবে ততটুকুই বিস্ময় জমে উঠবে ক্রমে ক্রমে।

ফার শোভিত ছাতা

পশ্চিম জার্মানী ছাতা ব্যবসায়ীকেন্দ্র ১৯৫৫-৫৬ সালের জন্য একটি অদ্ভুত সৌখীন ছাতা আবিষ্কার করেছে। আসল অথবা নকল নানা ধরণের লোমের কোটের সাথে এই ছাতাগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। ছাতাগুলো কেবলমাত্র আকর্ষণীয়ই নয়, এতে নতুনত্বও আছে বটে। এই ছাতার আবিষ্কারকেরা এ সিজনের জন্য 'সাইক্লাথ' রংটাকেই পছন্দ করেছে। এই রংটি একটি বেগুনি রং-এর সাথে নানা রং-এর সংমিশ্রণে তৈরি। এই অভিনব সৌখীন ছাতা কিশোরী, তরুণী, বৃদ্ধা নির্বিশেষে সবাইকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। মিউনিখে ছাতাগুলো খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কারণ বহু দেশ-ভ্রমণকারীদের এই বিশেষ ধরণের ছাতা কিনতে আগ্রহান্বিত হতে দেখা যাচ্ছে।—আই সি এস।

... ভা নি
...ন্তব— কপোতকল্প
...া খাদ্য বা শত্রুদেহ
এবং আতঙ্কর...
... করতে পারে সহজেই। ওদের অস্বস্তিকর, এমন কি ভয়াবহ মূর্তি সম্পূর্ণ হয় পিরিচের মত বড় একজোড়া পাতাহীন নিমেষহীন চোখ নিয়ে।

স্কুইড্-এর চেহারা দীর্ঘতর এবং মসৃণতর, ওদের শুঁড় দশটা। এই দু'টির সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ এবং বিশ্বশ্রী প্রতিযোগিতায় এদের পাত্তা পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কী নয়নরঞ্জন মূরতি!

হোমার-এর 'অডিসি' থেকে, স্কিল্লার সংগে ইউলিসিস্-এর যুদ্ধ বর্ণনা—যা নিশ্চয়ই একটা রাক্ষুসে স্কুইড্ ছাড়া আর কিছুই নয়, আজ পর্যন্ত রক্তপিপাসু জল-দানবদের বহু বর্ণনা সমুদ্রাভিসারী মানুষের মুখে শোনা যায়। গোড়ার দিককার নর্স (Norse) ইতিবৃত্তকাররা ওদের বলেছেন 'ক্র্যাকেনস' (Krakens) ওদের বর্ণনা বহু তথ্যসমন্বিত। মনে করা হ'ত ওরা শুয়ে থাকত চলমান জাহাজের উদ্দেশ্যে। গল্প বলে, কোন কোন সময় পাদপসদৃশ স্থূল শুঁড়গুলো জাহাজ পাকড়াও করে জলতলে নিয়ে গিয়ে মাঝি-মাল্লাদের ভোজে লাগাত। আবার কখনও জাহাজকে রেহাই দিয়ে ওরা তুলে নিত কয়েকজন সাগর-যাত্রীকে।

ক্র্যাকেনস-এর গল্প সাগরতলের অন্যান্য আজব গল্পের মতই একবার জনপ্রিয়তা পেয়েছে, আবার তা নষ্টও হয়েছে পালাক্রমে। গোড়ার দিকে বিজ্ঞানীরা এদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন এবং তাদের প্রাকৃতিক ইতিহাসের বইয়ে এই বীভৎস এবং বহুলাংশে কল্পনাপ্রসূত জীবটির ছবি দিয়েছেন। কিন্তু ওদের দেখা না মেলায় সন্দেহ ঘনীভূত হ'তে থাকে এবং শেষে অন্যান্যদের সংগে ওরাও নিছক কল্পলোকবাসী বলে আখ্যা পায়।

কিন্তু ১৮৭০-এ রাক্ষুসে স্কুইড-এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় সন্দেহাতীত-রূপে। ১৮৭৩-এ নিউফাউন্ডল্যান্ডের উপকূল থেকে দূরে দু'জন জেলে কী যেন একটা দেখতে পায় জলে এবং কাছে এগিয়ে তাদের একজন বেশ জোরে আঘাত করে দৃশ্য বস্তুটিকে। অনুমিত ভগ্নাবশেষ তুরন্ত সাংঘাতিক-ভাবে নিজের সজীবতা এবং বিরক্তি প্রমাণ করল। ফুলে ফেঁপে উঠল ঢেউয়ের দল, দু'টো বিরাট চোখ তাদের দিকে চেয়ে রইল, আর নৌকোয় লাগল আতংককর এক ঝাপ্টা, বিশালকায় এক ঠোঁট ঝাপটা দিয়েছিল।

তারপর দু'টো পাকান শুঁড় নৌকো জড়িয়ে ধরল। সৌভাগ্যক্রমে জেলেদের একজন উপস্থিত বুদ্ধি হারায় নি; সে কুড়ুল দিয়ে শুঁড়গুলো কেটে ফেলল। ফলে স্কুইডটি নিরুৎ-সাহিত হয়ে পালিয়ে গেল দ্রুত-গতিতে। পরে মাপা হ'ল—একটা শুঁড় উনিশ ফুট লম্বা আর ওটার ব্যাস দশ ইঞ্চি।

এরপর কয়েক বছর ধরে অনেক রাক্ষুসে স্কুইড নিউফাউন্ডল্যান্ড-এর উপকূলে এসে পড়ত ঢেউয়ের দোলায়। সত্যি বলতে কি, একসময় পঁচিশ থেকে তিরিশটার একটা দল দেখা গিয়েছিল। মৎস্যশিকারী একদল লোক ওদের কেটে ফেলেছিল মাছ ধরার টোপ করার আশায়; কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ওদের খুদে খুদে টুকরোয় কেটে ফেলার আগেই বৈজ্ঞানিকরা কয়েকটার মাপ-জোক নিতে পেরেছিলেন। পরে, ওরা দুর্লভ হয়ে পড়ে, প্রায় দেখাই যেত না বলতে গেলে।

জানাশোনা বৃহত্তম স্কুইড পঞ্চান্ন ফুট লম্বা। অন্যান্য প্রামাণিক মাপজোক থেকে জানা যায় একটি দেহের মাপ—পরিধি বার ফুট, চোখের ব্যাস নয় ইঞ্চি, সাঁইত্রিশ ফুট লম্বা শুঁড় এবং দু' ইঞ্চিরও বেশি চুষে খাওয়ার গোলাকার চাকতিগুলো।

কিন্তু রাক্ষুসে স্কুইড্-এর অস্তিত্ব আছে এবং ওরাই বৃহত্তম অমেরুদণ্ডী প্রাণী—এই মানুষের জ্ঞানের সীমা ওদের সম্বন্ধে। ওদের বাসভূমি, অভ্যাস বা জীবনযাপন পদ্ধতি এখনও রহস্যলীন।

এখনও প্রাচীনদের বর্ণনামত সুবিশাল স্কুইড-এর সাক্ষাৎ মেলে নি; তবে জানাশোনার বাইরে বৃহত্তর স্কুইড থাকা বিচিত্র নয়। স্পার্ম তিমি অনেক সময়ই রাক্ষুসে স্কুইড খায় এবং এসব সামুদ্রিক দানবদের সংগ্রামের খবরও পাওয়া গেছে। দানবিক স্কুইড-এর সংগে যুদ্ধের ফলে ক্ষতবিক্ষত স্পার্ম তিমি ধরা পড়েছে। এড়িয়ে যাওয়ার জন্য প্রায়ই ওরা স্কুইড-এর বিরাট বিরাট টুকরো উগরে দেয়। এরকম একটি খণ্ড ছ'ফুট লম্বা এবং দু' ফুট ব্যাসসম্পন্ন, শুঁড়ের অংশমাত্র। এ খবর সত্যি হ'লে প্রাচীন উপকথাগুলো হয়ত নিছক কল্পনাভিত্তিক নাও হতে পারে।

এত ছবি, বর্ণনা আর 'সত্যিকার' গল্পে অক্টোপাস্-এর সংগে সংগ্রাম মূল বিন্দুতে উপস্থাপিত হয়েছে যে, অনেকেই বিশ্বাস করেন আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে অক্টোপাস্ মানুষের খোঁজে ঘুরে বেড়ায় বেশির ভাগ সময়, অন্য দিকে, জনৈক জীববিজ্ঞানী বিগত দশকের গোড়ার দিকে ঘোষণা করেন যে এই প্রাণীটি কুমড়োর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক নয়।

সত্য লুকিয়ে আছে সম্ভবত দু'টি চূড়ান্ত মতের মাঝখানে—ওরা হয়ত খুবই বিপজ্জনক, কিন্তু কেবল মানুষ মারার তাল খোঁজা ওদের পেশা নয়।

১৮৭৯-তে অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম মোটামুটি পরীক্ষিত আক্রমণ ঘটে—মানুষের ওপর অক্টোপাসের। ডিনামাইট সংস্থাপনরত জনৈক ডুবুরী হঠাৎ টের পায় তার হাত পাকড়াও করে নিশ্চল করে দেওয়া হয়েছে। জল স্বচ্ছতর হয়ে গেলে আতংকিত ডুবুরীটি দেখল সে অক্টোপাস্-এর কবলে। তার আপ্রাণ মুক্তি-সংগ্রামের ফলে শুঁড়টা আরও জোরে জড়িয়ে

ধরল মাত্র এবং শুঁড়ের গোলাকৃতি চাকতির চাপের- যন্ত্রণা অসহ্য হয়ে উঠল। মরীয়া ডুবুরী মুক্ত হাতের সাহায্যে একটা লোহার দণ্ড নিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করল। মোক্ষম জায়গায় ঘা না পড়া পর্যন্ত অক্‌টোপাস্‌ বন্ধন শিথিল করে নি, তারপর ওপরে তোলা হ'ল মৃত অক্‌টোপাস্‌ আর দম-ফুরনো ডুবুরীটিকে। ওর শুঁড় মাত্র আট ফুট বিস্তৃত, ক্ষুদে অক্‌টোপাস্‌।

অস্‌ট্রেলিয়া থেকে এ ধরণের গল্প সব থেকে বেশি শোনা যায়। গত দশকে আরও দু'টো ছাপা হয়েছে। পরেও।

বোধহয় অন্যান্য খাদ্যের থেকে বেশি আক্রমণ মানুষকে করে না আটটি শুঁড়ওয়ালা সাগর-সন্তান অক্‌টোপাস্‌। অবশ্য কখনও কখনও আক্রমণ হয় বৈকি। যদিও ওদের সংগে মুখোমুখি সংগ্রাম বিরল, তবুও আক্রান্তরা বোধহয় স্বীকার করবেন রাক্ষুসে অক্‌টোপাস্‌দের 'সিন্ধুর আতংক' বলা আদৌ অসংগত নয়।

কিছু তথ্য আর খানিকটা কল্পনা উপজীব্য করে সিন্ধু-সন্তানদের সম্পর্কে নানা গল্প পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়েছে। সম্পূর্ণ অপরিচিতের বিস্ময় সাধারণ পাঠকের সামনে আসে, তাই কিছুই অসম্ভব মনে হয় না কখনও কখনও। বিশেষ যখন পরিচয়ের সীমায় ধরা পড়ে অপরিচিত প্রাণীকুল, তখন রূপকথাকে অপরূপকথায় রূপ দেওয়া সহজতর হয়ে ওঠে। হচ্ছেও তাই। রাজকন্যা, ব্যাংগমা-ব্যাংগমী বা জলপরী আর রূপবতী সাগরসম্রাজ্ঞীরা আজ কিছু উপেক্ষিত হ'লেও, দেখা-মেলা সমুদ্রচরদের পসার ঘরে-ঘরে। যতটুকু জানা যাবে ততটুকুই বিস্ময় জমে উঠবে ক্রমে ক্রমে।

ফার শোভিত ছাতা

পশ্চিম জার্মানী ছাতা ব্যবসায়ীকেন্দ্র ১৯৫৫-৫৬ সালের জন্য একটি অদ্ভুত সৌখীন ছাতা আবিষ্কার করেছে। আসল অথবা নকল নানা ধরণের লোমের কোটের সাথে এই ছাতাগুলো ব্যবহার করা যেতে পারে। ছাতাগুলো কেবলমাত্র আকর্ষণীয়ই নয়, এতে নতুনত্বও আছে বটে। এই ছাতার আবিষ্কারকেরা এ সিজনের জন্য 'সাইক্লাথ' রংটাকেই পছন্দ করেছে। এই রংটি একটি বেগুনি রং-এর সাথে নানা রং-এর সংমিশ্রণে তৈরি। এই অভিনব সৌখীন ছাতা কিশোরী, তরুণী, বৃদ্ধা নির্বিশেষে সবাইকে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। মিউনিখে ছাতাগুলো খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। কারণ বহু দেশ-ভ্রমণকারীদের এই বিশেষ ধরণের ছাতা কিনতে আগ্রহান্বিত হতে দেখা যাচ্ছে।—আই সি এস।

বারীন্দ্রনাথ দাশ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

"হ্যাঁ, আপনি সময় নিন। চিন্তা করুন। সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করুন। আমি দু'দিনের জন্যে মথুরার বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে আবার আপনার সঙ্গে মিলিত হবো।'

'কোথায় যাচ্ছেন?' অক্রূর নিরাসক্ত মনোভাব দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলো।

'আমার শরীর সুস্থ নয়। আমি দু'দিনের জন্যে গ্রামাঞ্চলে উদ্যানবিহারে যাওয়ার সঙ্কল্প করেছি।

অর্ধনিমীলিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো অক্রূর। কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

পূতনা চষককে সুরা ঢেলে তুলে দিলো অক্রূরের হাতে। অক্রূর আর অধিককাল অপেক্ষা করলো না। সুরা নিঃশেষিত করে বিদায় গ্রহণ করলো।

কিছুক্ষণ পরে পরিচারিকা এসে জানালো, —প্রচণ্ড এসেছে পূতনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তার নির্দেশে সে হিরণ্যাভকে লতাগৃহেই নিয়ে এলো পূতনার কাছে।

'কি সংবাদ প্রচণ্ড?' পূতনা জিজ্ঞেস করলো।

হিরণ্যাভ জানালো যে, মধ্যাহ্নে গর্গাচার্য উপস্থিত হয়েছিলো অক্রূরের আলয়ে। অক্রূরের সঙ্গে আর কারো সাক্ষাৎ হয় নি। মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ণ গৃহে কাটিয়ে সে পূতনার কাছেই এসেছিলো সায়াহ্নকালে। এখন আবার গৃহে প্রত্যাগমন করেছে।

'গর্গের সঙ্গে আজ কার কার সাক্ষাৎ হয়েছে?' পূতনা জানতে চাইলো।

হিরণ্যাভ উত্তর দিলো যে, পূতনার নির্দেশে সে শুধু অক্রূরের উপরই দৃষ্টি রেখেছিলো; আচার্য গর্গদেবের গতিবিধি অনুসন্ধান করার সুযোগ আর হয় নি।

একথা শুনে পূতনা হঠাৎ হেসে উঠলো।

॥ দশ ॥

—পূতনা ও কংস—

There's no art
To find the mind's construction
In the face....

Shakespeare,—Macbeth, I. 4.

রাত্রির প্রথম যাম অতিবাহিত হয়েছে। দীপবৃক্ষের আলোয় উজ্জ্বল রাজমার্গে লোক চলাচল তখনো অব্যাহত। রাজধানী মথুরার দু'টি রূপ। সাধারণ পুরবাসীদের প্রায় অন্ধকার গৃহকোণে ভীত-সন্ত্রস্ত স্তব্ধতা। অন্যদিকে আলোকসমুজ্জ্বল রাজমার্গের শৌণ্ডিকাপণসমূহ সুরাপ্রমত্ত বিত্তবান ও তাদের অনুরাগিণী বার-বিলাসিনীদের কলকোলাহলে মুখর।

সেই পথ ধরে হিরণ্যাভ আসছিল দ্রুত-গতিতে। পূতনার গৃহে সে অধিককাল সময় অতিবাহিত করে নি। প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হতেই বেরিয়ে পড়েছিলো। প্রাসাদে প্রত্যাবর্তন করার আগে একবার অক্রূরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। সে যে কাজের পরি-কল্পনা করেছে সে কাজ সম্পন্ন করার আগে একবার অক্রূরকে জানানো প্রয়োজন। আচার্য গর্গদেবের সঙ্গে মিলিত হওয়ার সুযোগ হলেও ভালো হোতো। কিন্তু এখন আর অধিক অবসর নেই।

পথ চলতে চলতে সে মাঝে মাঝে মুখ ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকিয়ে দেখছিল সতর্ক দৃষ্টিতে, কেউ তার অনুসরণ করছে কি না। এ সময় মথুরায় এমন ভয়ের পরিবেশ যে, কাউকে বিশ্বাস করা যায় না। কংসের গুপ্তপুরুষেরা ছদ্মবেশে সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। হিরণ্যাভ রাজপ্রাসাদের একজন রক্ষী। অক্রূরের সঙ্গে তার গোপন সাক্ষাৎকার গুপ্তপুরুষবর্গের চোখে না পড়াই বাঞ্ছনীয়।

খানিকটা পথ এসে একটি ছায়াচ্ছন্ন স্থানে উপস্থিত হতেই এক ব্যক্তি দ্রুতপদে পেছন দিক থেকে এসে পড়লো তার কাছাকাছি। তার মুখ উত্তরীয়ে ঈষৎ আবৃত। হিরণ্যাভ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো, কিন্তু চিনতে পারলো না। সে একপাশে সরে যাচ্ছিল, কিন্তু সেই ব্যক্তি তার পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে বললো, 'অক্রূরের গৃহে যেয়ো না হিরণ্যাভ, গুপ্তপুরুষেরা সতর্ক দৃষ্টি রেখেছে সেখানে।"

পরিচিত কণ্ঠস্বর। হিরণ্যাভ বিস্মিত হোলো। কিন্তু এখানে অধিক বাক্যালাপ করা অনুচিত। তাই নিম্নকণ্ঠে শুধু জিজ্ঞেস করলো, 'অক্রূরকে এখন কোথায় পাওয়া যাবে পুণ্ডরীক? তার সঙ্গে আমার মিলিত হওয়ার কথা ছিলো।"

"একটু এদিক ওদিক ঘুরে কাত্যায়নের শৌণ্ডিকাপণে চলে যাও," পুণ্ডরীক উত্তর দিলো; "সবাই সেখানে অপেক্ষা করছে। শৌণ্ডি-কাপণের কিঙ্করী সুরোচনার কাছে কাত্যায়নের শাল্যক কাশাপের সন্ধান চাইবে। সেটাই সঙ্কেত। সে তোমাকে নিয়ে যাবে এক অভ্যন্তর গৃহে। তুমি যাও। আমিও আসছি।"

পুণ্ডরীক দ্রুত পদসঞ্চারে অন্যদিকে চলে গেল। হিরণ্যাভ কিছুক্ষণ ইতস্তত পরিভ্রমণ করে ফিরে চললো রাজমার্গের অন্যদিকে কাত্যায়নের শৌণ্ডিকাপণে।

বাইরে পথের উপর পদচারণা করছিলো একজন আরক্ষী তার সঙ্গে হিরণ্যাভের পরিচয় ছিলো। তার প্রশ্নের উত্তরে হিরণ্যাভ জানালো, কর্মব্যস্ত দিবসের পর এখন সে অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছে। এখন প্রাসাদে প্রত্যাগমন করার আগে মৈরেয় পান করে ক্লান্তি অপ-নয়ন করতে চায়।

"শুধু মৈরেয়?" সেই আরক্ষী হেসে বললো, "অনেক রূপসী বারবিলাসিনীও শৌণ্ডিকাপণের অভ্যন্তরে গিয়ে ভিড় করেছে। জীবন যদি উপভোগ করতে চাও তো ভালো-ভাবেই উপভোগ করো। এই রাজধানীতে বিলাস-ব্যসনের নানা বিচিত্র ধরণ আছে। আমরা যদি সে সব উপভোগ করার অবসর না পাই—বৃথা মহারাজ কংসের আনুগত্য স্বীকার করেছি।"

তার সঙ্গে গলা মিলিয়ে অট্টহাস্য করলো হিরণ্যাভও। তারপর একটি প্রশ্ন করলো মাঝে মাঝে আরক্ষীরা এসে উৎপাত কর শৌণ্ডিকাপণে। কারণে অকারণে পুরু নারীদের ধরে নিয়ে যেতে চায় আরক্ষাধি করণের বন্দিশালায়, উৎকোচ না পেলে ছা না। হিরণ্যাভ তার আরক্ষী বন্ধুকে জিজ্ঞে করলো, আজ এখানে আরক্ষীদের হঠাৎ উপস্থি হওয়ার কোন সম্ভাবনা আছে কি না।

সে হিরণ্যাভকে আশ্বাস দিলো যে, আ ক্ষীরা এলেও কাত্যায়নের শৌণ্ডিকাপণে প্রবে যাতে না করে তার ব্যবস্থা সে করবে। আ সন্ধ্যায় এ অঞ্চলে শান্তিরক্ষার ভার অর্পণ ক হয়েছে তার উপর। ভ্রাম্যমাণ আরক্ষীরা ত

নির্দেশ না পেলে নিজের থেকে কোন তৎপরতা দেখাবে না।

তারপর এদিক-ওদিক সতর্কভাবে লক্ষ্য করে চোখের একটা ভঙ্গী করে অনুচ্চকণ্ঠে বললো, "কাত্যায়ন আমার বিশেষ বন্ধু। তার শৌণ্ডিকাপণের নিয়মিত আগন্তুকেরা কোনদিন কোন বিপদে পড়ে নি।"

হিরণ্যাভ বুঝলো। আজ সন্ধ্যায় কাত্যায়নের কাছ থেকে উৎকোচ গ্রহণ করেছে এই আপণপাল।

সে আর কিছু বললো না। একটু হেসে দ্বার অতিক্রম করে শৌণ্ডিকাপণে প্রবেশ করলো।

প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন রাজধানীর অভিজাত পল্লীতে অবস্থিত এসমস্ত শৌণ্ডিকাপণে স্বাচ্ছন্দ্য ও রুচির সমস্ত ব্যবস্থা করা হোতো বিশেষ যত্নের সঙ্গে। শৌণ্ডিককে রাজ্যের বিশিষ্ট নাগরিকদের মধ্যে গণ্য করা হোতো। অনেক সময় নাগরিকদের স্বার্থসংক্রান্ত নানা বিষয়ে রাজা গোপনে বা প্রকাশ্যে পরামর্শ করতেন শৌণ্ডিকের সঙ্গে। রাজ্যের উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গও নিয়মিত উপস্থিত হোতো এ সমস্ত শৌণ্ডিকাপণে নগরের শ্রেষ্ঠী ও অন্যান্য নাগরিকদের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে। সুতরাং শৌণ্ডিকাপণের অভ্যন্তরভাগ সুসজ্জিত থাকতো নানা উপকরণে। দীপবৃক্ষ সুসজ্জিত অঙ্গনের চারপাশে থাকতো অনেকগুলি কক্ষ। দ্বারে লম্বিত থাকতো স্নিগ্ধবর্ণে রঞ্জিত আবরণপট। প্রত্যেকটি কক্ষের অভ্যন্তরে থাকতো সুরাভৃঙ্গার ও পানপাত্র রাখবার জন্যে ত্রিপদী কাষ্ঠফলক, উপবেশন করবার জন্যে পৃষ্ঠোপাধান সমন্বিত খাট ও আসন্দী, একাধিক ব্যক্তি একসঙ্গে উপবেশন করবার জন্যে সুশোভন আস্তরণ আচ্ছাদিত প্রশস্ত মঞ্চ। কক্ষের কোণে পুষ্পাধারে সজ্জিত থাকতো গন্ধপুষ্প, ভিত্তিগাত্রে লম্বিত থাকতো গন্ধপুষ্পের মালা। ধূপিকায় প্রজ্বলিত ধূপবর্তিকার স্নিগ্ধ সৌরভ ছড়িয়ে পড়তো কক্ষের ভিতর। চিত্রিত ছত্র থেকে উজ্জ্বল হেমবর্ণ শৃঙ্খলে প্রলম্বিত প্রদীপের মৃদু আলো কক্ষের অভ্যন্তরে একটা মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করতো।

তেমনই একটি সুসজ্জিত কক্ষে হিরণ্যাভকে নিয়ে এলো শৌণ্ডিকাপণের কিঙ্করী সুরোচনা। হিরণ্যাভ সেখানে দেখতে পেলো অক্রূর, পুণ্ডরীক এবং ত্রিবিক্রম ও বিনায়ক নামে বৃষ্ণিবংশীয় দুই ব্যক্তিকে। হিরণ্যাভ একটি তরুপীঠে আসন গ্রহণ করবার পর সুরোচনা তার সম্মুখস্থ ফলকে মদিরাপূর্ণ চষক নামিয়ে রেখে চলে গেল।

"কি সংবাদ হিরণ্যাভ?" মৃদুকণ্ঠে অক্রূর জিজ্ঞেস করলো।

"দেবী অস্তি এবং দেবী প্রাপ্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তাঁদের ধারণা পূতনা তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করছে।"

"সে ধারণা অমূলক নয়," অক্রূর ঈষৎ হেসে মন্তব্য করলো।

"পূতনার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে তাঁরা আমাকে নিযুক্ত করতে চেয়েছেন।"

"কি ভাবে?" ত্রিবিক্রম জানতে চাইলো।

"পূতনাকে গোপনে হত্যা করবার জন্যে তাঁরা আমাকে এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিতে চেয়েছেন।"

"না, হিরণ্যাভ," বলে উঠলো পুণ্ডরীক, "তুমি নিজে এ কাজ করতে যেও না। এতে তোমার নিজের জীবন বিপন্ন হবে।"

"নিজেকে বিপন্ন না করে যাতে এ কাজ সম্ভব হয়, আমি তার একটা উপায় উদ্ভাবন করেছি।"

অক্রূর হিরণ্যাভের দিকে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করলো, "কি উপায় হিরণ্যাভ?"

"শুনুন বলছি—।"

সবাই ঝুঁকে পড়লো হিরণ্যাভের দিকে। হিরণ্যাভ বাইরের দিকে তাকালো। আবরণপটের বাইরে দেখা যাচ্ছে কিঙ্করী সুরোচনাকে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, প্রয়োজনমতো তাদের পরিচর্যা করবার জন্যে সে অপেক্ষা করছে বাইরে। কিন্তু হিরণ্যাভ বুঝে নিয়েছিলো সুরোচনাও বৃষ্ণিদের কংস বিরোধী সংগঠনেরই একজন। সে বাইরে দাঁড়িয়ে আছে চারদিক পর্যবেক্ষণ করবার জন্যে। প্রয়োজন মনে করলেই এদের সতর্ক করে দেবে।

হিরণ্যাভ সামনে ঝুঁকে বসলো। তারপর খুব মৃদুকণ্ঠে বললো, "পূতনা কাল প্রত্যূষে গোকুলের উদ্দেশে যাত্রা করছে।"

"এ সংবাদ আমরা অক্রূরের কাছে পেয়েছি," জানালো বিনায়ক, "সে বসুদেবের অষ্টম পুত্রের সন্ধান জেনে না যায় এই আমাদের ভয়।"

অক্রূর উত্তর দিলো, "পূতনার কথাবার্তা শুনে আমার মনে হোলো কংস একেবারে নিশ্চিত নয়, কিন্তু তার মনে একটা সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে যে বসুদেব মিত্রবর্গের সহায়তায় তার সন্তানকে নন্দব্রজে প্রেরণ করতে সক্ষম হয়েছে। পূতনাকে নন্দব্রজে পাঠানো হচ্ছে তার সন্ধান করার জন্যে।"

"আপনারা সব কিছু জানেন না," উদ্বিগ্নকণ্ঠে হিরণ্যাভ বললো, "নন্দ ঘোষের পত্নী যশোদা যে পুত্রবতী হয়েছেন এ সংবাদ কংস পেয়েছে। পূতনাকে এখন নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সে যেন যশোদার পুত্র এবং নন্দব্রজের অন্যান্য নবজাত শিশুদের নিহত করে।"

হিরণ্যাভের কথা শুনে সবাই একটু স্বস্তিপ্রাপ্ত হোলো। ত্রিবিক্রম বলে উঠলো, "গোকুলের কোনো নিভৃত স্থানে পূতনাকে গোপনে হত্যা করা কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব হবে? আমরা কয়েকজন সুদক্ষ ধনুর্ধারীকে কালই যমুনার ওপারে প্রেরণ করতে পারি।"

"না ত্রিবিক্রম, এভাবে পূতনার বিনাশসাধন করা বাঞ্ছনীয় হবে না," বললো অক্রূর, "কংসের সেনারা তাহলে প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে গোকুলের গ্রামাঞ্চলে নৃশংস অত্যাচার উৎপীড়ন আরম্ভ করে দেবে।"

অক্রূরের সঙ্গে একমত হলো হিরণ্যাভও। সে বললো, "পূতনাকে বিনাশ করতেই হবে। তবে অন্য উপায়ে যাতে কারো মনে কোনো সন্দেহের উদ্রেক না হয়।"

বিনায়ক ঈষৎ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলো। সে মন্তব্য করলো, "আমাদের হাতে সময় বেশী নেই, যা কিছু করবার আজ রাত্রের মধ্যে স্থির করতে হবে।"

"সবই স্থির হয়ে আছে," জানালো হিরণ্যাভ।

"আমাদের সব কথা জানা দরকার," বললো, অক্রূর।

"নিশ্চয়ই", হিরণ্যাভ উত্তর দিলো; "আপনাদের অনুমোদনের প্রত্যাশায় আমি এখানে এসেছি।"

হিরণ্যাভ তার পরিকল্পনা বিস্তারিতভাবে সবাইকে শোনালো। সম্প্রতি পূতনা শিশুনিধনের এক নতুন উপায় উদ্ভাবন করেছিলো। সে একটি বিষমিশ্রিত স্তন-বিলেপন ব্যবহার করতো যার ফলে যে শিশুকে সে স্তন্যদান করতো, সে শিশু মৃত্যুমুখে পতিত হোতো কিছুক্ষণের মধ্যেই। এই বিষমিশ্রিত স্তন-বিলেপন প্রস্তুত করে দিয়েছিলো কংসের একজন বিশ্বস্ত জাঙ্গুলিক।

এবার পূতনা গোকুলের উদ্দেশে যাত্রা করবে বলে কংস সেই জাঙ্গুলিককে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছে তীব্রতর বিষমিশ্রিত করে নতুন স্তন-বিলেপন প্রস্তুত করবার জন্যে। রাত্রি প্রথম প্রহরের কিছু পূর্বে কংস যখন মন্ত্রগৃহ ত্যাগ করবে তার কাছে বিলেপন-পুটিকা নিয়ে আসবে সেই জাঙ্গুলিক।

মন্ত্রগৃহ থেকে কংস যাবে কেলিগৃহে। সেখানে কিছুক্ষণ তার পরিচর্যা করবে দেবী অস্তি এবং দেবী প্রাপ্তি। ভোজনের পর ওরা চলে যাবে প্রাসাদের অভ্যন্তরে নিজের নিজের শয়নগৃহে। তখন কংসের সঙ্গে পানোৎসবে যোগ দেবে পূতনা। সেই সময় পূতনার হাতে বিলেপন-পুটিকা তুলে দেবে কংস।

"... সংবাদ আমি পেয়েছি দেবীদের কাছ থেকে," হিরণ্যাভ বললো।

"কী নৃশংস পরিকল্পনা," পুণ্ডরীক শিহরিত হয়ে বলে উঠলো।

"পূতনা তো কাল প্রত্যুষেই নন্দব্রজের উদ্দেশে যাত্রা করছে," বললো ত্রিবিক্রম, "তাকে নিবৃত্ত করার কি কোনো উপায় নেই?"

"উপায় আমি স্থির করেছি," হিরণ্যাভ উত্তর দিলো, "আমার পরিচিত এক জাঙ্গুলিক আছে ভিষক্‌-বীথিতে। আমি তার কাছ থেকে নিয়ে এসেছি মধুমিশ্রিত একটা বিলেপন। এর মধ্যে এমন একটা নির্যাস মিশ্রিত আছে যার প্রভাবে কোনো শিশু কয়েক মুহূর্তের জন্যে নিস্তব্ধ হবে মাত্র, আর কোনো ক্ষতি হবে না। দেবী অস্তি এবং দেবী প্রাপ্তি কংসের অগোচরে বিষ-বিলেপন-পুটিকা সরিয়ে নিয়ে সেখানে রেখে দেবে এই মধু-বিলেপন-পুটিকা।"

বিনায়ক বললো, "আমি যতদূর জানি, মথুরা নগরে ব্যাপকভাবে যে শিশু নিধন অনুষ্ঠিত হচ্ছে, কংসের পত্নীদ্বয় সে সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। মথুরার পুরনারীবর্গ এই ব্যাপারে দেবী অস্তি এবং দেবী প্রাপ্তির হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছিলো। কিন্তু তাঁরা এদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। সুতরাং যে স্তন-বিলেপন ব্যবহার করে পূতনা ব্রজের শিশুদের প্রাণহরণ করতে চায়, সেটি সরিয়ে অন্য অনপকারক বিলেপন সেখানে রেখে দিতে এঁরা কেন স্বীকৃত হবেন আমি বুঝতে পারছি না।"

হিরণ্যাভ ঈষৎ হেসে উত্তর দিলো, "আমি তাঁদের বুঝিয়েছি যে, এই স্তন-বিলেপন ব্যবহার করলে তার বিষক্রিয়া পূতনার নিজের জীবন নাশেরই কারণ হবে।

সবাই হাসলো হিরণ্যাভের কথা শুনে। পুণ্ডরীক বললো, "কিন্তু তা তো হবে না। পূতনা তার প্রথম উদ্যমেই বুঝতে পারবে যে, নতুন স্তন-বিলেপনের কোনো প্রভাব হচ্ছে না। সে কি তখন তার আগের স্তন-বিলেপন সংগ্রহ করবার চেষ্টা করবে না?"

হিরণ্যাভ ধীরকণ্ঠে বললো, "আমার অনুমান এই যে, পূতনা গোকুলে গিয়ে প্রথমেই নন্দগৃহে উপনীত হবার চেষ্টা করবে। যদি সে দেবী যশোদার লালিত পুত্রকে স্তনদান করতে সক্ষম হয়, আমার সংগৃহীত স্তন-বিলেপনের প্রভাবে শিশুর যে তন্দ্রার ভাব দেখা যাবে, সেটা বিষেরই ক্রিয়া বলে মনে করবে। সুতরাং পূতনা সেখানে বেশীক্ষণ অপেক্ষা করবে না। অবিলম্বে ঘাটে এসে নৌকারোহণ করে অন্য কোনো ব্রজে চলে যাওয়ার চেষ্টা করবে, সে সময় তার নৌকা জলমগ্ন হবে। পূতনার আর সন্ধান পাওয়া যাবে না।"

"কি ভাবে এটা সম্ভব হবে?" জানতে চাইলো বিনায়ক।

"আমাদের নিযুক্ত কয়েকজন ব্যক্তি পূতনা ও তার রক্ষীদের অনুপস্থিতিতে নৌকায় কয়েকটি ছিদ্র করে রাখবে।"

"নৌকা জলমগ্ন হলেও ওরা বাঁচবার চেষ্টা করতে পারে," বললো ত্রিবিক্রম।

"নদীর তীরে গাছের আড়ালে আত্মগোপন করে আমাদের কয়েকজন ধনুর্ধারী তাদের সে চেষ্টা ব্যর্থ করতে পারবে। নৌকা জলমগ্ন হওয়ার সংবাদই কংসের কাছে আসবে। ধনুর্ধারীদের কথা কেউ জানবে না।"

বিনায়ক, ত্রিবিক্রম ও পুণ্ডরীক একবাক্যে স্বীকার করলো যে, এই পরিকল্পনা ত্রুটিহীন না হলেও কার্যকরী করবার চেষ্টা করা যেতে পারে।

অক্রূর বললো, "কিন্তু সমস্ত কিছুই কয়েকটা অনুমানের উপর নির্ভর করছে। কংস পূতনাকে শুধু নন্দগৃহেই পাঠাচ্ছে, একথা আমরা নিশ্চিত-ভাবে বলতে পারি না। কংস হয়তো শুধু এই-মাত্র অনুমান করতে পেরেছে যে, বসুদেবের সন্তানকে যদি কারাগৃহ থেকে বার করে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়ে থাকে, তাহলে তাকে আর যেখানেই লুকিয়ে রাখা হোক, নিশ্চয়ই মথুরায় কোথাও রাখা হয় নি। তাই সে হয়তো পূতনাকে পাঠাচ্ছে গ্রামাঞ্চলে। সুতরাং আমরা কি করে নিশ্চিত হতে পারি যে, পূতনা প্রথমেই যাবে নন্দগৃহে?

হিরণ্যাভ বললো, "নন্দ ঘোষ গোকুল-ব্রজের গোপমুখ্য। তার স্ত্রী পুত্রবতী হয়েছেন একথা যখন কারো অজানা নয় এবং নন্দ ঘোষ বসুদেবের পরম মিত্র বলে বিদিত, তখন আমরা ধরে নিতে পারি যে, পূতনা প্রথমে সেখানে যাওয়ারই সুযোগ খুঁজবে।"

পুণ্ডরীক জিজ্ঞেস করলো, "সেখানে প্রথম প্রচেষ্টার পর পূতনা যে অন্য কোনো শিশুর উপর একই পদ্ধতি কার্যকরী করবার চেষ্টা না করে মথুরায় ফিরে আসবার জন্যে নৌকারোহণ করবে একথা আমরা কি করে বলতে পারি?"

হিরণ্যাভ উত্তর দিলো, "গোপপ্রধান নন্দ ঘোষের গৃহে শিশু নিধন করার পর পূতনা আর গোকুলে থাকতে সাহস করবে না। সাহস করলেও তার চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে না, কারণ গোকুল ব্রজের গোপেরা তার উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে সাবধান হয়ে যাবে। সুতরাং পূতনাকে নৌকারোহণ করে অন্যত্র যেতেই হবে।"

ত্রিবিক্রম জানতে চাইলো, আজ রাতে মথুরার ঘাটেই পূতনার নৌকায় ছিদ্র করে দেওয়া সম্ভব কি না?

হিরণ্যাভ জানালো যে, তা সম্ভব নয়, কারণ মথুরার যে ঘাটে প্রাসাদের বিভিন্ন প্রকার তরীগুলো থাকে, সেখানে নিযুক্ত আছে নবাধ্যক্ষের সতর্ক প্রহরিবৃন্দ। গোকুলের ঘাটে পূতনার নৌকায় প্রহরী থাকবে না, কারণ ওভাবে নিশ্চয়ই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইবে না পূতনা।

"এ শুধু আমাদের অনুমান মাত্র," অক্রূর বলে উঠলো, "নৌকাচালক এবং দু একজন ভৃত্য নিশ্চয়ই থাকবে।"

হিরণ্যাভ উত্তর দিলো, "আমি একথা জানি যে, কেউই থাকবে না। সে নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। পূতনার দুজন রক্ষী নৌকার চালক ও ভৃত্যের ছদ্মবেশে সঙ্গে যাবে। নৌকা থেকে নেমে পূতনা যেখানেই যাবে সেখানেই ওরা যাবে পূতনার সঙ্গে সঙ্গে। পূতনার পাশে না থাক কাছাকাছি নিশ্চয়ই থাকবে সব সময়। এ রকম সুযোগ আমরা আর পাবো না।"

সবার সঙ্গে আলোচনা করে অক্রূর স্থির করলো যে, হিরণ্যাভকে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে।

"তবে আমি আশা করছি," অক্রূর বললো, "হয়তো এসব আয়োজন নিরর্থক হবে।"

"নিরর্থক হবে?" হিরণ্যাভ ভ্রূ কুঞ্চিত করলো। "আপনি তাই আশা করছেন?" বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো। "আমি বুঝতে পারছি না আপনার কথা।"

অক্রূর হেসে মুষ্টিবদ্ধ হাত খুলে ধরলো হিরণ্যাভের সামনে। সবাই দেখলো হাতের পাতায় কয়েকটি ঔষধ বটিকা।

সবাই বিস্মিত হয়ে অক্রূরের মুখের দিকে দেখলো।

অক্রূর উত্তর দিলো, "আমার বান্ধবী দেবী পূতনা আজকাল এগুলো সেবন করছে। সে প্রতিদিনই এক সময় না এক সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই বটিকা সেবন করলে সুস্থ হয়ে ওঠে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই। কিন্তু ঔষধের প্রয়োগ না হলে তাকে কয়েক দিনের জন্যে শয্যা গ্রহণ করতে হবে। আজ সন্ধ্যায় সে একবার অসুস্থ হয়েছিলো। কালকের মধ্যে কি আবার একবার অসুস্থ হবে না? সে যদি কিছুদিন শয্যাশায়ী হয়ে থাকে, আমরা যশোদার পুত্রকে—হ্যাঁ, এখন থেকে যশোদার পুত্র বলেই উল্লেখ করবো আমরা—যশোদার পুত্রকে সবরকম বিপদ থেকে রক্ষা করার একটা স্থায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারবো।"

"পূতনার ব্যবহার্য ঔষধ বটিকা আপনি কোথায় পেলেন?" ত্রিবিক্রম জিজ্ঞেস করলো।

অক্রূর একটু হাসলো, "পূতনার অগোচরে তার ঔষধ-পুটিকা থেকে সব বার করে নিয়েছি। এ ঔষধ প্রস্তুত করা সময়সাপেক্ষ। সুতরাং পূতনা কিছুদিন ঔষধ ব্যবহার করার সুযোগ পাবে না।"

সবাই কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর হিরণ্যাভ বললো, "যাই হোক, আমার পরিকল্পনাও কার্যকরী করার চেষ্টা করতে হবে। পুতনা অসুস্থ হয়ে পড়বে, এই সম্ভাবনার উপর ভরসা করে বসে থাকা যায় না।"

কয়েকজন বিশ্বাসী ধনুর্ধারী সংগ্রহ করবার দায়িত্ব নিলো ত্রিবিক্রম। স্থির হোলো যে কাল সূর্যোদয়ের আগেই বিনায়ক তাদের নিয়ে যমুনা অতিক্রম করে গোকুলে উপস্থিত হবে।

হিরণ্যাভ বললো, "নন্দ ঘোষেরও কালই গোকুলে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। তাকে কি সংবাদ দেওয়া হয়েছে?"

অক্রূর উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, মধ্যাহ্নে যখন গর্গাচার্য আমার গৃহে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তাঁকে জানিয়েছি যে, পুতনা কাল প্রভাতে গোকুল যাত্রা করছে। সুতরাং নন্দ ঘোষও যেন এখানে আর কালক্ষেপণ না করে নিজের ব্রজে ফিরে যান। এতক্ষণে নিশ্চয়ই সংবাদ পেয়েছেন নন্দ ঘোষ।'

পুণ্ডরীক এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত সংবাদ দিলো। গর্গাচার্য নিজে নন্দ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন নি। হয়তো তাঁর উপর কংসের গুপ্ত-পুরুষবর্গ দৃষ্টি রাখছে একথা বিবেচনা করে তিনি নন্দ ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে উপনীত হয়েছিলেন বসুদেবেরই গৃহে। গর্গাচার্যের কাছে সংবাদ পাওয়ার পর বসুদেব নিজে গেলেন নন্দ ঘোষের কাছে। সাদর আলিঙ্গন, শিষ্ট সম্ভাষণ ও কুশল বিনিময়ের পর বসুদেব নন্দকে বললেন, —"রাজাকে বার্ষিক কর দেওয়া হয়েছে, আমাদের সঙ্গেও তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে। এখন আর এখানে অধিককাল থাকার প্রয়োজন তোমার নেই। তুমি অবিলম্বে মথুরা ত্যাগ করে গোকুলে উপনীত হও। কারণ আমি সংবাদ পেয়েছি যে গোকুলে নানারকম দস্যুৎপাত সংঘটিত হচ্ছে।

বসুদেবের কথা শুনে নন্দ ঘোষও কাল প্রভাতে মথুরা ত্যাগ করার সঙ্কল্প করেছে।

"নন্দ ঘোষকে পুতনার কথা জানানো হয় নি?" অক্রূর জিজ্ঞেস করলো।

"না," জানালো পুণ্ডরীক।

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো হিরণ্যাভ।

পুণ্ডরীক উত্তর দিলো, "নন্দ ঘোষ সরল প্রকৃতির লোক। পুতনার কথা শুনলে হয়তো অত্যন্ত বিচলিত হবে এবং সেই বিচলিত ভাব গোপন করতে পারবে না। কংস গুপ্তপুরুষের মুখে এ সংবাদ পেলে হয়তো সতর্ক হয়ে পড়বে।"

আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর হিরণ্যাভ বিদায় গ্রহণ করলো। রাত্রি প্রথম প্রহরের আর অধিক বিলম্ব নেই। কংস মন্ত্রগৃহ ত্যাগ করে কেলিগৃহে সমাগত হওয়ার আগেই হিরণ্যাভকে গিয়ে সাক্ষাৎ করতে হবে দেবী অস্থি ও দেবী প্রাপ্তির সঙ্গে।

যে সময় হিরণ্যাভ অক্রূর এবং তাদের সহযোগীরা কাত্যায়নের শৌণ্ডিকাপণে বসে আলাপ-আলোচনা করছিলো, ঠিক সে সময় পুতনা শীর্ষবেদনায় কাতর হয়ে শুয়েছিলো তার লতাগৃহে। হিরণ্যাভ তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই তার শীর্ষ-বেদনা আরম্ভ হয়েছিলো। একবার মনে হোলো এ হয়তো আবার অসুস্থ হয়ে পড়বার পূর্বাভাষ। সে ভাবলো ঔষধ সেবন করবে কি না। ঔষধ-পুটিকা নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করলো। তারপর স্থির করলো এখনই ঔষধ সেবন করার প্রয়োজন নেই। অসুস্থ হয়ে পড়লেই ঔষধ সেবন করতে হবে, শুধু এই নির্দেশই দিয়েছেন রাজবৈদ্য। শীর্ষবেদনা হয়তো এমনিই হয়েছে।

সে ডাকলো তার পরিচারিকাকে। পরিচারিকা শীর্ষ বিলেপন এনে কপালে লেপন করে দিলো।

পুতনা বড্ড দুর্বল ও ক্লান্ত বোধ করছিলো। শয্যা ত্যাগ করতে ইচ্ছে করছিলো না একেবারেই। কিন্তু কংসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে রাত্রি প্রথম প্রহরের চার দণ্ডকাল পরে। প্রথম প্রহরের আর অধিক বিলম্ব নেই। পুতনা ধীরে ধীরে উঠে বসলো। এবার বেশ পরিবর্তন করে প্রসাধন করে প্রস্তুত হতে হবে।

এমন সময় আরেকজন পরিচারিকা এসে জানালো, ধৃতি নামে এক ব্যক্তি সাক্ষাৎ করতে এসেছে।

"আমাকে এরা কেউ এক মুহূর্তও বিশ্রাম করতে দেবে না," বিরক্তকণ্ঠে বলে উঠলো পুতনা।

"ওকে চলে যেতে বলবো?" পরিচারিকা জানতে চাইলো।

"না, ওকে এখানেই নিয়ে এসো।"

"কিন্তু আপনি অসুস্থ।"

"আমি রাজার ক্রীতদাসী," দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে পুতনা উত্তর দিলো, "আমি কখনো অসুস্থ হতে পারি? রাজার প্রয়োজনেই আমাকে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে। তাকে নিয়ে এসো এখানে।"

ধৃতি এসে পুতনাকে করজোড়ে প্রণাম জানালো। সে পুতনার অধীনে নিযুক্ত দুটি গুপ্তপুরুষ, তার অত্যন্ত বিশ্বস্ত।

"কি সংবাদ ধৃতি?" পুতনা জিজ্ঞেস করলো।

সে দুটি সংবাদ দিলো পুতনাকে। প্রথম সংবাদ,—মধ্যাহ্নে গর্গাচার্য অক্রূরের গৃহে গিয়েছিলেন। সেখানে থেকে কিছুক্ষণ পরে তিনি গিয়েছিলেন বসুদেবের আলয়ে। তার-পর বসুদেব গিয়ে সাক্ষাৎ করেছেন গোকুল-ব্রজের নন্দ ঘোষের সঙ্গে। সন্ধ্যার আগে জানা গেছে যে নন্দ ঘোষ কালই গোকুলে ফিরে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছে।

এ কথা শুনে পুতনা ঈষৎ অন্যমনস্ক হয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো। ধীরে ধীরে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে।

ধৃতি জানালো দ্বিতীয় সংবাদ।—পুতনার গৃহ থেকে নির্গত হয়ে অক্রূর উপনীত হয়েছিলো কাত্যায়নের শৌণ্ডিকাপণে। কিছুক্ষণ পরে প্রচণ্ড নামক প্রাসাদের একজন আরক্ষীও উপস্থিত হোলো সেখানে। পুতনা তাকে নিশ্চয়ই চেনেন।

"প্রচণ্ড!" পুতনা বিস্মিত হয়ে তাকালো ধৃতির দিকে। তারপর নিজের মনে বললো, "আমি তাহলে ঠিকই সন্দেহ করেছিলাম।"

ধৃতি জানালো শৌণ্ডিকাপণের নিভৃত কক্ষে বসে অক্রূর, প্রচণ্ড এবং আরো তিনজন বৃষ্ণিবংশীয় ব্যক্তি নিম্নকণ্ঠে দীর্ঘ আলোচনা করেছে।

পুতনার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হোলো। কিন্তু অধরপ্রান্তে সেই অদ্ভুত হাসি। ধীরে ধীরে বললো, "প্রচণ্ডের প্রকৃত নাম কি প্রচণ্ড?"

এ প্রশ্ন শুনে ধৃতি বিস্মিত হোলো। উত্তর দিলো, "তার অন্য কোনো নাম আছে নাকি? আমি তো জানি না।"

"শৌণ্ডিকাপণ থেকে বেরিয়ে ওরা কোথায় গেছে?"

"প্রচণ্ড কিছুক্ষণ আগে চলে গেছে প্রাসাদের বহিরঙ্গলে তার নিজের আবাসের দিকে। অক্রূর এবং অন্য তিনজন এখনো শৌণ্ডি-কাপণে বসে বাক্যালাপ করছে। আপনার মহারাজের কাছে যাওয়ার সময় হয়ে আসছে বলে আমি আর কালবিলম্ব না করে আপনাকে সংবাদ দিতে এলাম।"

[ক্রমশ।

ক্যান্সার ও তামাক

(শেষাংশ)

ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকায় ফুসফুসের ক্যান্সার রোগে যত লোক মারা যায় অন্য কোন জায়গায় ক্যান্সারে তত লোক মরতে দেখা যায় না। পঞ্চাশ থেকে সত্তর বছর বয়সের লোকদেরই এই রোগ বেশি হ'তে দেখা যায় এবং শতকরা ৯৫ জনেরই মৃত্যু হয়।

অনেকের মতে, সিগারেটই ফুসফুসের ক্যান্সার রোগের প্রধান কারণ। সেণ্ট লুইয়ের বিখ্যাত সার্জেন ই এ গ্রাহাম এবং সহকর্মী ই এল ওয়াইণ্ডার তাদের রোগীদের ধূমপানের অভ্যেস এবং ফুসফুসের ক্যান্সারের মধ্যে সম্বন্ধ বিশেষণ ক'রে দেখেছেন। দেখা গেছে বেশির ভাগ রোগীই দীর্ঘদিন ধ'রে ধূমপানে অভ্যস্ত। এদের মধ্যে সাধারণ ধূমপায়ী থেকে অতিমাত্রায় ধূমপায়ী, সব রকমই আছে। শতকরা পঞ্চাশ জনের বেশিই অতিমাত্রায় ধূমপানে অভ্যস্ত। ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের শতকরা ৯৪ জনই কোন

তারা ব'লেছেন, গ্রাহাম এবং অন্যান্য অনুসন্ধানকারীরা রোগী ক্যান্সারে আক্রান্ত হবার পর তার ধূমপানের অভ্যেস সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছেন। ঐ প্রতিষ্ঠান অনুসন্ধানের অন্য পদ্ধতি অবলম্বন ক'রেছেন। এঁরা ৫০ থেকে ৬৯ বছর বয়সের মোট ১৯৭,১৩৪ জন লোককে পরীক্ষা ক'রে দেখবেন ব'লে ঠিক ক'রেছেন। এদের মধ্যে অতিমাত্রায় ধূমপায়ী, কম মাত্রায়

শ্রীবিশু দাস

ধূমপায়ী, পাইপ এবং চুরুটসেবী থেকে ধূমপান করে না এমন লোকও থাকবে। এক বছর ধ'রে এদের ধূমপানের অভ্যেস লক্ষ্য করা হয় এবং এদের মধ্যে কতজনের ফুসফুসের ক্যান্সার হয় তা ভালোভাবে লক্ষ্য করা হয়। এই অনুসন্ধান কমিটির পরিচালক প্রধান ছিলেন ক্যান্সার সোসাইটীর পরিসংখ্যান বিভাগের পরিচালক ডাঃ ই কিউলার হ্যামণ্ড এবং সহ-পরিচালক ডাঃ ডানিয়েল হর্ন। অন্যান্য ডাক্তার

চেয়ে সিগারেট ব্যবহারকারীদের মৃত্যুহার বেশী।

১৯৫৫ খৃষ্টাব্দের ৫ই জুন আটলাণ্টিক সিটিতে আমেরিকার মেডিক্যাল এ্যাসোশিয়েশানের বার্ষিক সভায় ডাঃ হ্যামণ্ড এবং ডাঃ হর্ন যে রিপোর্ট পাঠ করেন, তাতে তাঁরা মন্তব্য করেছিলেন :—

(১) ধূমপান যারা করে না তাদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সার প্রায়ই হ'তে দেখা যায় না।

(২) দৈনিক যারা অন্ততঃ দু' প্যাকেট বা তারও বেশী সিগারেট খায় তাদের বেশীর ভাগ ফুসফুসের ক্যান্সার হ'তে দেখা যায়।

(৩) সিগারেট খাওয়ার রেওয়াজ বাড়বার সাথে সাথে ফুসফুসের ক্যান্সারগ্রস্ত রোগীর সংখ্যাও বাড়ছে।

(৪) পাইপ থেকেও এ রোগ হ'তে পারে, তবে সিগারেট খাওয়ার মত এতে সম্ভাবনা তত বেশী নয়। চুরুটের ধূমপানের সাথে ফুসফুসের ক্যান্সারের কোন সম্বন্ধ নেই।

(৫) শহর এবং গ্রামে সিগারেট ব্যবহারকারীদের মধ্যে ফুসফুসের ক্যান্সারে মৃত্যুহার

কি ধরণের ধূমপান— করা হ'য়েছে।	কত জনকে পরীক্ষা করা হয়েছে।	যে সব ক্ষেত্রে প্রাথমিক ফুসফুস ক্যান্সারের হদিশ পাওয়া গেছে।		অণুবীক্ষণের সাহায্যে ফুসফুসের ক্যান্সারের হদিশ পাওয়া গেছে।	
		মৃতের সংখ্যা	প্রতি ১০০,০০০-এ মৃত্যুহার।	মৃতের সংখ্যা	প্রতি ১০০,০০০-এ মৃত্যুহার।
১। কখনও ধূমপান করে নি বা কৃচিৎ ধূমপান করে-----	৪৪,০৯১	১২	২৭,২	৪	৯,১
২। চুরুট বা পাইপ ব্যবহারকারী, সিগারেট কখনই নিয়মিত পান করে নি-----	৩৫,৮৫৩	১২	৩৩,৫	৩	৮,৪
৩। নিয়মিত সিগারেট ব্যবহারকারী----	১০৭,৮২২	১৪৩	১৩২,৬	৪৫	৪১,৭
মোট-----	১৮৭,৭৬৬	১৬৭	৮৮,৯	৫২	২৭,৭

না-কোন রকম ধূমপানে অভ্যস্ত, তবে পাইপ বা চুরুটসেবীদের সংখ্যা অনেক কম। ধূমপান একেবারেই করেন না, বা মাঝে মাঝে করেন, এরকম লোকদের কৃচিৎ ফুসফুসের ক্যান্সার হ'তে দেখা গেছে। শতকরা দু'জন হ'তো এই রোগে আক্রান্ত হয়। অসংখ্য অনুসন্ধানকারী এবং গবেষক একথা স্বীকার ক'রেছেন।

আমেরিকার ক্যান্সার সোসাইটী এই রহস্যের অনুসন্ধান করার ব্যবস্থা ক'রেছেন। এই প্রতিষ্ঠানের পরিসংখ্যানবিদ্ এবং বিজ্ঞানীরা পূর্বের পরিসংখ্যানকে বাতিল ক'রে দিয়েছেন।

এবং ২২০০০ কর্মী এতে সহযোগিতা ক'রেছেন।

এই অনুসন্ধানের প্রাথমিক ফলাফল গত ১৯৫৪ সালের ৭ই আগস্টের 'দি জার্নাল অফ দি আমেরিকান মেডিক্যাল এ্যাসোসিয়েশনে' প্রকাশিত হয়। ১৮৭,৭৬৬ জনের পূর্ণ এবং সুসমঞ্জস রিপোর্ট পাওয়া যায়। এদের মধ্যে ১৬৭ জন ফুসফুসের ক্যান্সারে মারা গেছে।

ওপরের ছকটি থেকে অনুসন্ধানকারীদের বিশ্লেষণের ফলাফল পাওয়া যাবে। এতে দেখা যাচ্ছে যে পাইপ বা চুরুট ব্যবহারকারীদের

বেশী এবং ধূমপান যারা একেবারেই করে না তাদের এই রোগে মৃত্যুর হার নগণ্য।

(৬) সিগারেট খাওয়া কমাবার সাথে সাথে ফুসফুসের ক্যান্সার হবার সম্ভাবনাও কম থাকে।

১৯৫৭ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুন আমেরিকার মেডিক্যাল এ্যাসোশিয়েশানের সভায় ডাঃ হ্যামণ্ড এবং ডাঃ হর্ন আর একটি রিপোর্ট পেশ করেন। সেই রিপোর্টে তাঁরা সিগারেট খাওয়ার সাথে ফুসফুসের ক্যান্সারের সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁদের পূর্ব মতকে আরও জোরদার করার যুক্তি উপস্থিত

করেন। তারা দেখিয়েছেন সিগারেট ব্যবহারকারীদের কণ্ঠনালীর ক্যান্সার, পাকস্থলীর ক্যান্সার, করোনারী ধমনীর রোগ, ইনফ্লুয়েঞ্জা, নিউমোনিয়া, গ্যাসট্রিক আলসার এবং যকৃতের রোগ হতে দেখা যায়।

ধূমপান যারা করে না, অন্যের পান করা তামাকের ধোঁয়া গ্রহণ করার ফলে তাদেরও ফুসফুসের ক্যান্সার হ'তে পারে। কারখানার ধোঁয়া, কার্বন গুঁড়ো, ডিজেল এবং পেট্রোল ইঞ্জিনের ধোঁয়া বা পিচ দেওয়া রাস্তার অতি সূক্ষ্ম কণা নিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করার ফলেও ফুসফুসের ক্যান্সার হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

আমেরিকার ক্যান্সার সোসাইটির রিপোর্টে প্রকাশ যে তাঁরা ধূমপানের বিপক্ষে কোন প্রচার চালাবেন না। তাঁদের মতে ধূমপান এমন একটা অভ্যাস যা কোটি কোটি লোককে দেয় আরাম, দেয় আনন্দ। বিরাট এক শিল্প গড়ে উঠেছে এর জন্যে এবং এই শিল্প থেকে মোটা অঙ্কের কর পাচ্ছে সরকার। এঁরা বলেছেন, ধূমপায়ীরা তাদের চিকিৎসকের সাথে পরামর্শ করে স্থির করবেন, ধূমপান করা তাঁদের উচিত কি না। লক্ষ্য করার বিষয় যে ডাঃ হ্যামণ্ড যিনি রিপোর্ট তৈরী করার জন্যে এত পরিশ্রম করলেন তিনি নিজে অনুসন্ধান চলার সময়ই হঠাৎ সিগারেট খাওয়া ছেড়ে পাইপ খেতে সুরু করেন।

ঠিক এই রকমের এক অনুসন্ধান ইংলণ্ডেও চালিয়েছিলেন ডাঃ আর ডল্ এবং ডাঃ এ বি হিল। এঁরা ৪০,০০০ বৃটিশ ডাক্তারের ধূমপানের পরিসংখ্যান নিয়ে দেখেন কতগুলি ক্ষেত্রে ক্যান্সার হচ্ছে। দি বৃটিশ মেডিক্যাল জার্নালের ১৯৫৬ সালের ১৯শে যে সংখ্যায় লিখিত এক প্রবন্ধে জানান যে, তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল ডাঃ হ্যামণ্ডের এবং ডাঃ হর্নের ফলাফলের মতই। তৎকালীন বৃটিশ স্বাস্থ্যমন্ত্রী মিঃ আর এইচ থারটন ১৯৫৬ সালের মে মাসে হাউস অফ কমন্সের সামনে এই সমস্যার কথা প্রকাশ করেন। তিনি বলেছিলেন, "সিগারেট খাওয়ার সঙ্গে ফুসফুসের ক্যান্সারের একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে।" কিন্তু তিনি বুঝেছিলেন যে, এই বিষয়ে অপরিণত জ্ঞান নিয়ে সিগারেটের বিরুদ্ধে অভিযান চালানো উচিত নয়।

সিগারেট ব্যবসায়ীরা অবশ্য একথা স্বীকার করেন না যে, সিগারেট খাওয়ার সাথে ফুসফুসের ক্যান্সারের কোন সম্বন্ধ আছে। ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের তামাক ব্যবসায়ীরা তামাক সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্যে Tobacco Industry Research Committee নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। বিখ্যাত ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাঃ কেয়ারেনস কুক লিট্‌ল এই প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান এবং বিজ্ঞান উপদেষ্টা কমিটির পরিচালক নিযুক্ত হন। ডাঃ লিটল বলেছিলেন যে, এই প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অনুসন্ধানের কাজ চালাবে, তামাকব্যবসায়ী সমিতির কোনরকম পরামর্শ গ্রহণ না করেই এবং তাদের দ্বারাতে কোনরকম প্রভাবিত না হ'য়েই।

অনুসন্ধানকারীরা পরীক্ষামূলক প্রাণীদের ওপর সিগারেটের ধোঁয়া থেকে সংগ্রহ করা আলকাতরার ক্রিয়া লক্ষ্য করেন। ডাঃ ই এল ওয়াইণ্ডার, ই এ গ্রাহাম এবং ডাঃ এ বি ক্রোনিনজার ইঁদুরের লোম কামিয়ে সেই কামানো জায়গাতে সিগারেটের ধোঁয়া থেকে প্রাপ্ত জিনিষের প্রলেপ দিয়ে দেখেন বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই চামড়ার ওপরে বড় বড় ফোঁড়ার মত স্ফীতি দেখা দিয়েছে। অন্যান্য পরীক্ষায় দেখা গেছে যে সিগারেটের ধোঁয়ায় আলকাতরায় শতকরা দু ভাগে ক্যান্সার উৎপন্নকারী পদার্থ থাকে। আবার অন্য কতকগুলো পরীক্ষায় পরীক্ষামূলক প্রাণীদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হ'তে দেখা যায় নি।

মানুষের শরীরে তামাকের ক্রিয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ জ্ঞানলাভ ক'রতে হ'লে আরও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার। ইতিমধ্যে কতটুকু জ্ঞান আমরা লাভ করেছি দেখা যাক।

ধূমপানের ক্রিয়া প্রশান্তিকর এবং উপশমকারী, বিশেষত দুর্বল লোকদের...। কুফলের জন্যে দায়ী ধোঁয়ার মধ্যে উপস্থিত দুটি উপাদান; নিকোটিন এবং সামান্য আলকাতরা। নিকোটিনের জন্যে দেখা দেয় অত্যন্ত জটিল লক্ষণগুলো, আলকাতরার ক্ষতিকারক ক্রিয়া হয় অত্যন্ত মন্থরগতিতে।

ধোঁয়ার নিকোটিন নতুন ধূমপায়ীদের কলিক পেন, অত্যধিক লালা নিঃসরণ এবং বমির ভাব জাগানোর জন্যে দায়ী। নতুন এবং পুরোনো, সব ধূমপায়ীদের ওপরই তামাকের ধোঁয়ার ক্রিয়া প্রায় একই রকম—রক্তের চাপ বাড়ানো, হৃদযন্ত্রের স্পন্দন হার বৃদ্ধি করা এবং ছোট ছোট রক্তবাহী নলগুলোকে সঙ্কুচিত করা। নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হ'য়েছে যে, এর থেকে সাংঘাতিক রকমের করোনারী হৃদরোগের আক্রমণও হ'তে পারে।

তামাক থেকে নিকোটিন বাদ দিলে হৃদযন্ত্র বা রক্তবাহী নলগুলো আর আক্রান্ত হবার ভয় থাকে না; অবশ্য এভাবে তৈরী তামাক অভ্যস্ত ধূমপায়ীদের ধূমপানের আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারে না।

তামাকের আলকাতরা, কিম্বা কতকগুলো অল্প পরিচিত বা অপরিচিত উপাদানের উত্তেজনাকর প্রভাব আছে। এই ধরণের উত্তেজনা থেকেই মুখের, কণ্ঠনালীর বা স্বরযন্ত্রে ক্যান্সার হতে পারে। কোন ধূমপায়ী মুখে বা গলায় যদি জ্বালা অনুভব করে এবং তার সাথে যদি কাশি হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা উচিত। অন্যান্য সন্দেহজনক লক্ষণগুলো: ওজন কমে যাওয়া, বুকের ব্যথা অনুভব করা, কখনও কখনও রক্তবমি হওয়া, শ্বাসকষ্ট, দুর্বলতা, রাতে ঘাম হওয়া এবং গলার স্বর ভেঙে যাওয়া ইত্যাদি।

এই লেখাটি পড়বার পর সিগারেট ধরাতে গিয়ে নিশ্চয়ই একটু ইতস্তত করবেন আপনি। অন্তত কয়েক মুহূর্ত।*

---

*আমেরিকার ক্যান্সার সোসাইটির রিপোর্ট এবং অন্যান্য প্রবন্ধ থেকে:

অপেক্ষার কাল

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

চতুর্দিকে বিবাহের মন্ত্র বাজে—মন্ত্র বেজে যায়
আমি মাঝখানে একা নিশুতিরাতের নদী যেন
বড় ম্লান জ্যোৎস্নার আলো নিয়ে একা জেগে থাকি,
আরো কতকাল হায় এইভাবে কাটাবো জানি না।

আমরা বিবাহ করি একমাত্র ভালোবাসাকেই
অথচ সে ভালোবাসা আজো এই আমার দুচোখে
দেখি নি—দেখি না কেন? বুকে বড় তীব্র ব্যথা বাজে—
স্মৃতির তিমির তীর্থে আকাশে একটিও তারা নেই।

চতুর্দিকে বিবাহের মন্ত্র বাজে—মন্ত্র বেজে যায়
শঙ্খের পবিত্র শব্দ কানে আসে ভোরের বাতাসে
ওরা সব ভালোবাসা খুঁজে পেলো—খুঁজে পেলো দ্রুত—
আমার প্রার্থনা বড় ক্ষীণ ছিল—ভেসেছে কোথায়।

আমরা বিবাহ করি একমাত্র ভালোবাসাকেই
কে দেবে সন্ধান তার? কোথায় রয়েছে প্রিয়তমা।
কে আমার হাত ধরে নিয়ে যাবে দূরে কিছু দূরে
কিছু নীল ভালোবাসা দিয়ে যাবে আকাশের মত।

কুমার রায়চৌধুরী

[প্রবীণ কথাশিল্পী ও দক্ষ সাংবাদিক]

কলকাতা বাঙলার (শুধু বাঙলার কেন সারা ভারতের) প্রাণকেন্দ্র হ'লেও তার সবটুকু নয়—কলকাতার বাইরেও তার অবস্থিতি বর্তমান। সেখানে আর এক বাঙলা। যাকে নগরের কোলাহলে দেখা যায় না। নাগরিক পরিমণ্ডলে সে বাঙলা অনুপস্থিত, সে বাঙলা পরিদৃশ্যমান গ্রাম-গ্রামাঞ্চলে। নগর বাঙলার পর বাঙলার অন্য রূপ আছে—মফস্বল বাঙলা, গ্রাম বাঙলা। সেই বাঙলার অধিবাসীদের সমাজ, জীবনযাত্রা, রীতিনীতি, ভাব-ভাবনা যে শক্তিমান সাহিত্য স্রষ্টাদের সুনিপুণ লেখনীর টানে এক উজ্জ্বল দীপ্তিতে সাহিত্যের পাতায় চিত্রিত হয়েছে, শ্রীযুক্ত সরোজকুমার রায়চৌধুরী নিঃসন্দেহে তাঁদেরই একজন।

আর একটি কারণেও সরোজকুমার সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় নাম। বাঙলা দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর পর দীর্ঘদিন বাদে রাজনৈতিক উপন্যাস প্রথম জন্ম নিল সরোজকুমারের লেখনী থেকে। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বন্ধনী' আধুনিক যুগে বাঙলা ভাষায় রচিত প্রথম রাজনৈতিক উপন্যাস। সেদিক দিয়ে বাঙলা সাহিত্যের দিগন্তের সম্প্রসারণে এবং নব পথ প্রদর্শনের মহান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সরোজকুমার—বয়সে তখন তিনি নিতান্ত তরুণ। 'বন্ধনী' প্রকাশিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের 'চার অধ্যায়' এবং শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' আত্মপ্রকাশ করে। এই বিচারে বাঙলা সাহিত্যে সরোজকুমারের অবদান যেমনই গুরুত্বপূর্ণ তেমনি অবিস্মরণীয়।

মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত মালিহাটী রায়চৌধুরীদের পিতৃভূমি। স্বর্গত মনোরঞ্জন রায়চৌধুরীর পুত্র সরোজকুমার ১৯০৩ সালের অগাষ্ট মাসে জন্মগ্রহণ করেন গিরিডিতে—মাতুলালয়ে। স্কুলজীবন দেশেই অতিবাহিত হয়। কলেজজীবন আংশিক অতিবাহিত হয় হাজারিবাগ এবং বহরমপুরে এবং আংশিক কলকাতায়। কলকাতায় ভর্তি হলেন দেশবন্ধু প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় সর্ববিদ্যায়তনের অধীন কলিকাতা বিদ্যাপীঠে। এই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষের আসনে সেদিন সগৌরবে সমাসীন সুভাষচন্দ্র। শিক্ষাগুরুরূপে সরোজকুমার লাভ করলেন তাঁকে। সুভাষচন্দ্র নিতেন রাজনীতির ক্লাস। এখানে সেদিন ইংরেজী ও বাঙলা পড়াতেন বিদগ্ধ জননায়ক কিরণশঙ্কর রায়। বাঙলা পড়াতেন কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। কিরণশঙ্কর প্রসঙ্গে সরোজকুমার বলেন—ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও তিনি পড়িয়ে যেতেন, অনেকগুলি ক্লাস অতিক্রান্ত হয়ে যেত, সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসত, তাঁর পড়ানোর ছেদ পড়ত না। কি অপূর্ব পড়ানো, শব্দার্থ ও ব্যাকরণের জালে তিনি বন্দী ছিলেন না। তাই আমাদের নিয়ে যেতেন রসের রাজ্যে, সেই রসের রাজ্যে তাঁর সঙ্গে আমরাও যখন পাড়ি জমাতাম, তখন আর স্থান, কাল, পাত্র জ্ঞান থাকত না। একটু থেমে বললেন অগ্রণী কথাশিল্পী—আমার সাহিত্য জীবনেও তাঁর কাছে আমি যথেষ্ট ঋণী।
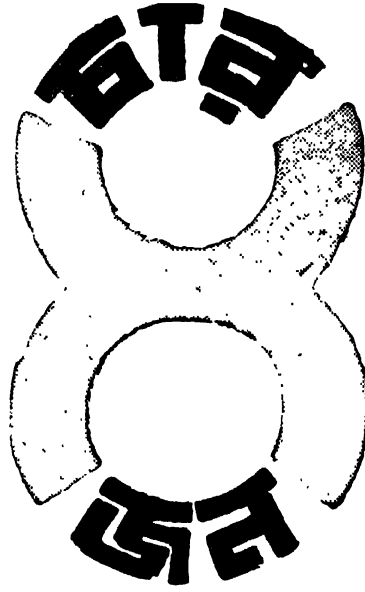
স্নাতক হওয়ার পর নানা ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন সরোজকুমার। বিপ্লবী উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হওয়ার সময় আত্মশক্তি দিয়ে গেলেন সুভাষচন্দ্রের হাতে। সম্পাদকীয় সহযোগী হিসাবে সরোজকুমারকে ডাক দিলেন সুভাষচন্দ্র। দক্ষ সাহিত্যিকের সাংবাদিক জীবনও গৌরবময়। যথেষ্ট সফলতার আলোয় উজ্জ্বল। বৈকালী নায়ক, বাঙলার কথা, দৈনিক বসুমতী, আনন্দবাজার পত্রিকা প্রভৃতি পত্র-পত্রিকাগুলির সঙ্গে সাংবাদিক হিসাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নবশক্তি ও কৃষক পত্রিকা দু'টির সম্পাদকের আসনও তিনি করেছেন অলঙ্কৃত। সব শেষে 'বর্তমান'-এর সম্পাদন দায়িত্বও তিনি পালন করেন। শেষোক্ত পত্রিকাটির স্বত্বাধিকারীও তিনি নিজে।

লেখার চর্চা ছেলেবেলা থেকেই। প্রথম জীবনে কবিতাও লিখেছেন। পূর্ণোদ্যমে সাহিত্য সাধনা শুরু হল 'বাঙলার কথা'য় যুক্ত থাকার সময়ে। তারপর অসংখ্য গল্প, বহু উপন্যাসের জন্ম হয়েছে তাঁর লেখনী থেকে। বাঙলা সাহিত্যের উর্বর ক্ষেত্রে এক একটি নতুন ফসল। সাহিত্যের ঐশ্বর্য-ভাণ্ডারের ঘটেছে মর্যাদা বৃদ্ধি। বন্ধনী, কালোঘোড়া, নীলাঞ্জন, সোমসবিতা, শুক্লা সন্ধ্যা, কৃশানু, ক্ষণবসন্ত, দেহ-যমুনা, রমণীর মন, বধূ নির্বাচন, নতুন ফসল, অনুষ্টুপ ছন্দ, শ্রেষ্ঠ গল্প প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে কয়েকটি নাম। কালো ঘোড়া, নতুন ফসল ও অনুষ্টুপ ছন্দ চলচ্চিত্রেও রূপায়িত হয়েছে।

দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনেও তিনি একদা জড়িত ছিলেন, যুক্ত ছিলেন কংগ্রেসের সঙ্গে, কারাবরণও করেছেন একবার।

মানুষ সরোজকুমারের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁদের অজানা নয় যে সারল্য ও অকৃত্রিমতা কথা দুটি যেন মূর্তিমন্ত হয়ে উঠেছে তাঁকে কেন্দ্র করে। স্রষ্টাকে না জানলে তাঁর সৃষ্টিকে বোঝা যায় না। স্রষ্টা যদি জানার আড়ালে থাকেন তাহলে তাঁর সৃষ্টির উৎস অনুসন্ধান সহজসাধ্য প্রচেষ্টা নয়। প্রচারের ঢক্কানিনাদ থেকে দূরে তিনি থাকেন ঠিকই

মাসিক বসুমতী

কার্তিক

॥ ১৩৭২ ॥

স্বাগতম্

—মোনা চৌধুরী

মেঘমালা

—দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

পর্বতনন্দন

—নীরোদ রায়

হাসনসখী

—ভবানী রায়

মাসিক

বসুমতী

কার্তিক / '৭২

বনবালা

—বিশ্বনাথ গোস্বামী

মাসিক

বসুমতী
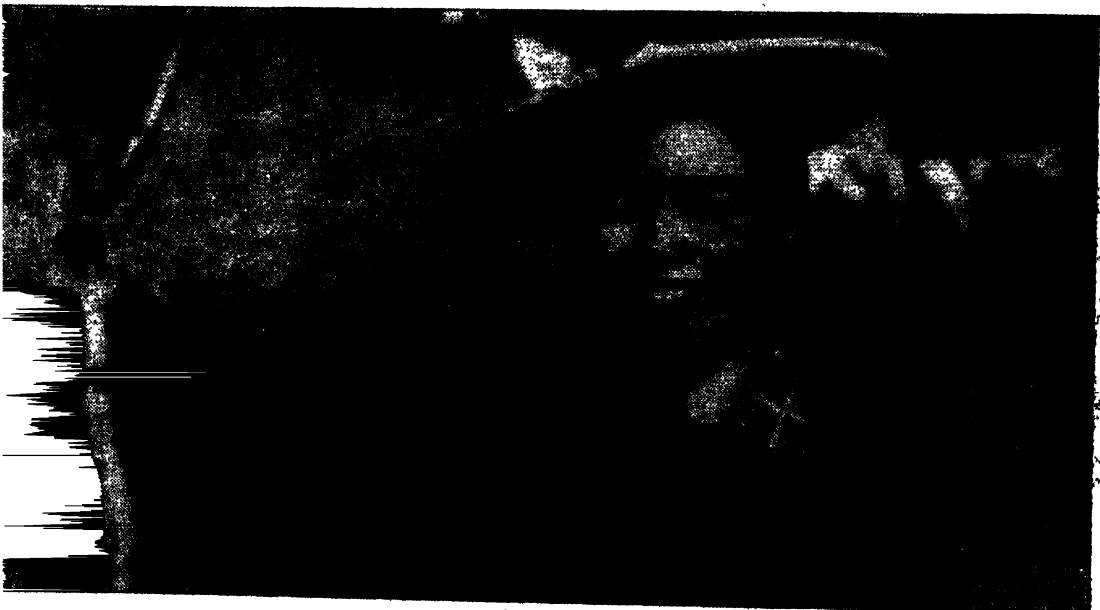
কিন্তু মানুষের কাছ থেকে তিনি মোটেই দূরে নন। বরং দূরের মানুষকে কাছে টানার এক অব্যর্থ মন্ত্র তাঁর আয়ত্তে। নাম, খ্যাতি যা এসেছে তা তিনি গ্রহণ করেছেন কিন্তু তাদের পিছুনে তিনি কখনও ছোটেন নি। সকালের দিকে সাধারণত লেখেন। সারাদিন গৃহ-কোণেই তার কেটে যায়। সুরসিক বন্ধুবৎসল, গল্পপ্রিয় মানুষ, তাই প্রিয়-জনকে কাছে পেলে তাঁর সঙ্গে গল্পে ডুবে যান।

এই রচনাটিকে কেন্দ্র করে তাঁর প্রথম উক্তিটি প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি রচনার শেষ পাদে। আমার সম্বন্ধে আমার ক। ... বিশেষ প। এক সময়ে শ্রী... ভাই, নিজেকে ...নার ...হায়। ... জানি আর নিজেকে জানাই ... সবচেয়ে বড় জানা, নিজেকে জানাই যেদিন সম্পূর্ণ হবে সেদিন তো অন্য ব্যাপার, সেদিন তো অন্য প্রসঙ্গ।

শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত

[ত্রিপুরার অন্যতম সর্বজনপ্রিয় নেতা]

শিল্প-সংস্কৃতি এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বে বাঙলার যে খ্যাতি সর্ব-জনস্বীকৃত তার মূলে আছে বাঙলার এক একটি অঞ্চলের নিজস্ব অবদান। স্বর্গাদপি গরীয়সী জননী বঙ্গভূমির অন্তর্গত যে-সকল অঞ্চল আপন আপন সম্ভারে জননীর শ্রীঅঙ্গের শোভা-বর্ধন করে জাতীয় গর্ব ও গৌরব বৃদ্ধি করেছে ত্রিপুরার স্থান তাদেরই মধ্যে। প্রাচীন কাল থেকেই ত্রিপুরা তার শিল্প-সংস্কৃতি বৈশিষ্ট্যের পরিচয় অকৃপণভাবে দিয়ে আসছে।

সময়ের অগ্রগমনের সঙ্গে তাল রেখে মহাকালের নির্দিষ্ট বিধি অনু-যায়ী সব কিছুর মত ত্রিপুরারও আকাশে, মাটিতে, পরিপার্শ্বে আজ হাওয়া বদল ঘটেছে। আজকের ত্রিপুরা স্বাধীন দেশের অন্তর্গত একটি অঞ্চল। আজ ইতিহাসের একটি নতুন ধারার সে সম্মুখীন। আজ তার নব রূপায়ণের সাময়িক সমস্যাগুলির সমাধানে, সমৃদ্ধিসাধনে যাঁরা এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছেন ত্রিপুরার মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য শ্রীযুক্ত সুখময় সেনগুপ্ত তাঁদের অন্যতম।

আগরতলাতেই ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তাঁর জন্ম। ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের ব্যাজ-গাঁও সেনগুপ্তদের আদিভূমি। সুখ-ময়ের পিতৃদেব স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত তৎকালীন আসাম-বঙ্গ রেল-পথের অন্যতম কর্মী ছিলেন।

সুখময় সেনগুপ্ত আজন্ম সংগ্রামী বললেও অত্যুক্তি হয় না। স্কুলজীবন থেকেই তিনি জাতীয়তাবাদী বৈপ্লবিক নানা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। সেই সময়েই তিনি আগরতলা 'ভ্রাতৃসঙ্ঘ'-এর দলভুক্ত হন। বাল্যকাল থেকেই দেখা যাচ্ছে, দেশের কল্যাণ, দেশের সমৃদ্ধিই তাঁর প্রধান লক্ষ্য, অন্যায়-অবিচারের সঙ্গে হাত মেলাতে তিনি কখনই রাজী নন। তাই নিশ্চিন্ত আশ্বাসে পরিপূর্ণ শান্ত জীবনের পরিবর্তে বেছে নিয়েছেন কঠোর সংগ্রামশীল অনিশ্চিত জীবন।

১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্য ত্রিপুরা জেলা, নোয়াখালী চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রমুখ অঞ্চলগুলিতে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই সময়ে তিনি আরও বহুগুণ উদ্যমে নিজের কাজে নিমগ্ন রইলেন এবং তাঁর কল্যাণকর স্বপ্নের রূপ দানের চেষ্টাতেই সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। হরিজনদের ধর্মঘট এবং চা-শ্রমিকদের আন্দোলন ঘটালেন। এই দুটি ঘটনা ত্রিপুরায় সেই প্রথম
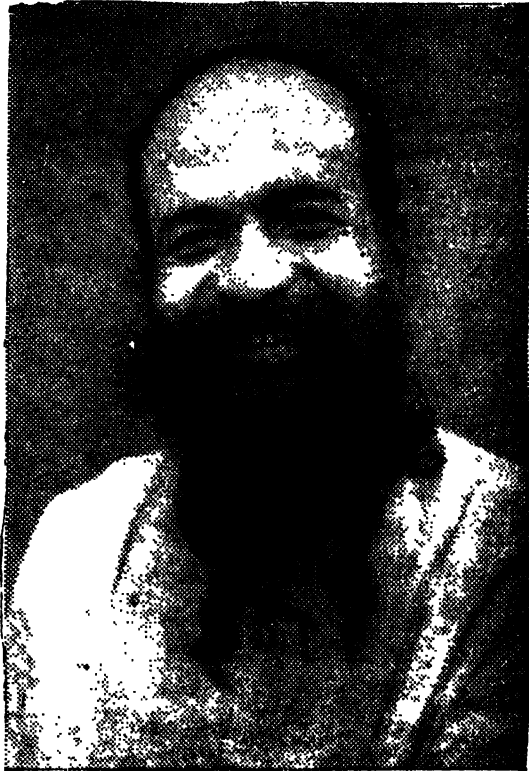
● শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত

...কুমার রায়কে ...নী এবং ... মুভমেণ্টে'ও তাকে দেখা গেল অন্যতম হোতা হিসাবে।

শিক্ষাজীবন তাঁর কেটেছে ত্রিপুরা এবং কলকাতাতে। কলেজজীবনেও তিনি দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে সক্রিয়ভাবে জড়িত রাখেন এবং কংগ্রেসের কাজে যোগ দেন। ১৯৩৯ সালে তিনি কলকাতা এবং ২৪ পরগণা থেকেও বহিষ্কৃত হওয়ায় তাঁর অধ্যয়ন যথেষ্ট পরিমাণে ব্যাহত হয়। ১৯৪২ থেকে ১৯৪৫-এর মধ্যে ডিষ্টিংসানসহ তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 'কংগ্রেস' পত্রিকাটি তিনি সম্পাদনা করতে থাকেন।'

সুভাষচন্দ্রের জন্মজয়ন্তী পালন সংক্রান্ত ত্রিপুরার তদানীন্তন সরকারের আইন লঙ্ঘন করার জন্য তিনি কারারুদ্ধ হলেন ১৯৪৮ সালে।

আগরতলা পৌরসভার প্রথম চেয়ারম্যানরূপে তিনি নির্বাচিত হলেন ১৯৫১ সালে। ত্রিপুরার চীফ কমিশনারের তিনজন উপদেষ্টার মধ্যে তিনি ছিলেন একজন (১৯৫৩-৫৭)।

বর্তমানে তিনি ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেসের এবং সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি ও খাদি ও গ্রাম্যশিল্প বোর্ডের চেয়ারম্যান; আগরতলা থেকে যে দু'টি দৈনিক প্রকাশিত হয় তাদেরই একটি "গণরাজ" তাঁরই সম্পাদনায় আত্মপ্রকাশ করে।

শ্রীঅরুণ রায়

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা অধিকর্তা]

'বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র এবং পরীক্ষার্থীর সংখ্যা যেরূপ দ্রুতহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে গতানুগতিক প্রথায় পরীক্ষার কর্ম চালালে অনর্থক সময় নষ্ট করা হয়, সেজন্য যান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ করা অপরিহার্য'—উপরোক্ত মন্তব্য করেন ভারতের মধ্যে ঐতিহ্যপূর্ণ ও অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ট্রোলার অফ এক্সজামিনেসন্স শ্রীঅরুণ রায়, শ্রীরায় আরও বলেন যে, যান্ত্রিক পদ্ধতি অর্থাৎ ইণ্টারন্যাশানাল বিজনেস্ মেসিনের সাহায্যে পরীক্ষা গ্রহণ আগামী ১৯৬৬ সালের জানুয়ারী মাস থেকে শুরু হবে এবং ভারতের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বপ্রথম এই পদ্ধতি গ্রহণ করে এক নূতন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।

১৯২১ সালে কলিকাতায় শ্রীরায় জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁর আদি-নিবাস পূর্ব-পাকিস্তানের খুলনা জেলার টাউন শ্রীপুর গ্রামে। জন্মের কিছুদিনের মধ্যেই শ্রীরায়ের পিতা অতুলচন্দ্র রায়মহাশয় গতায়ু হন। পিতা-মাতার চারটি সন্তানের মধ্যে শ্রীরায় সর্বকনিষ্ঠ।

১৯৩৬ সালে ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিউসান হতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাঁচটি লেটারসহ বৃত্তিলাভ করেন। তার পর একাদিক্রমে ছয় বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়নকালে গণিতে প্রথম শ্রেণী অনার্সসহ বি-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 'হিন্দু কলেজ ফাউনডেসন' বৃত্তিলাভ করেন এবং তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের পদকও লাভ করেন। তৎপর পদার্থ বিজ্ঞানে প্রথম শ্রেণী সহ এম-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং স্পেশ্যাল পেপার স্ট্যাটিস্টিক্স-এ রেকর্ড মার্ক পাইয়া অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দেন।
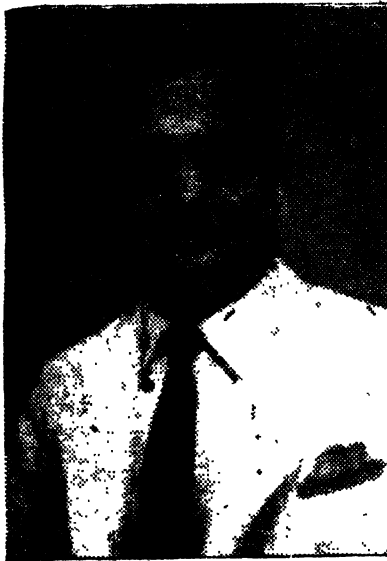
ছাত্রজীবনে বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য-পদক লাভ করার নেপথ্যে শ্রীরায়ের পরলোকগতা জননী স্বর্গতা বিজনবালা রায়ের প্রভাব ছিল বলে শ্রীরায় মনে করেন। কারণ তাঁর মাতাও পদক ও বৃত্তির অধিকারিণী ছিলেন।

● শ্রীঅরুণ রায়

শ্রীরায়ের পিতামহ ৺গোবিন্দচন্দ্র দত্তরায় কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হবার পরেই ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। শ্রীরায়ের অন্যতম মাতুল স্বর্গীয় রমাপতি রায় বাংলা দেশের সর্বপ্রথম বাঙালী চ্যাটার্ড এ্যাকাউণ্টেণ্ট।

এম-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পরেই প্রায় একই সময়ে কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজে লেকচারার পদে এবং গভর্নমেণ্ট টেস্ট হাউস-এ পদার্থ বিজ্ঞান ল্যাবরেটারীতে যোগদানের আহ্বান তাঁর নিকটে আসে। শিক্ষকতা অপেক্ষা ল্যাবরেটারীতে কাজ ভাল হবে মনে করে শ্রীরায় টেস্ট হাউসে যোগদান করেন। তিন-চার বৎসর কর্ম করবার পর শ্রীরায় আই-এ-এস পরীক্ষায় সাফল্যলাভ করে ডিভিসন্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অফ পোস্টস্ এ্যাণ্ড টেলিগ্রাফের পদে নিযুক্ত হন ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের সময় নদীয়া জেলা বিখণ্ডিত হওয়ায় ঐস্থানে পোস্ট্যাল ও আর-এম-এস কার্য বিপর্যস্ত হবার উপক্রম হলে শ্রীরায় ঐ কার্য সুষ্ঠুভাবে সমাধান করেন। ব্যক্তিগত কারণে

তিনি চাকুরীতে ইস্তফা দিয়ে রাজ্য সরকারের অধীনে কিছুকাল দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং পরে রাজ্য সরকারের কার্যেও ইস্তফা দেন।

কর্ম-জীবনের প্রারম্ভে শিক্ষকতার কার্যে সাড়া না দিলেও শিক্ষা-জগতেই শেষ পর্যন্ত তিনি এলেন। ১৯৫০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন এবং ১৯৬০ সালে মাত্র ৩৮ বৎসর বয়সে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের কণ্ট্রোলার অব এক্সজামিনেশনের পদে অধিষ্ঠিত হয়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে একটি নূতন নজীর স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন।

'হবি' বলিতে শ্রীরায় অবসর সময়ে ক্রশ ওয়ার্ড পাজেল সমাধান করেন এবং এক সময়ে শ্রী[illegible] লুপ্ত প্রাইজ উইনার [illegible] গুহায়। [illegible] সম্পাদনা-কার্যও করেছেন। [illegible] জীবন কি [illegible]

পাবনার তারাসের জমিদার [illegible] রায়বাহাদুর রাধিকামোহন রায়ের দৌহিত্রী এবং দমদম রাজবাড়ীর শ্রীঅসীমানন্দ রায় ও শ্রীনীহারিকা রায়ের কন্যা শ্রীমতী শুক্লা রায় তাঁহার সহধর্মিণী।

কুমারী লাবণ্যপ্রভা মল্লিক

[রাষ্ট্রপতির জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তা সেণ্ট মার্গারেট স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা]

শিক্ষকতার চেয়ে মহৎ বৃত্তি আর [illegible]ই। শিক্ষাদানের পবিত্র ব্র[illegible] যাঁরা জীবনের ব্রতস্বরূপ গ্রহণ ক[illegible] তাঁরা যারা জাতিকে অচ্ছেদ্য [illegible]র পাশে আবদ্ধ করে রাখেন। শিক্ষাদানেরই অন্য নাম জাতিগঠন [illegible] রূপায়ণ। বর্তমানের [illegible] যখন আসবে তখন যাদের [illegible] দেশের কোটি কোটি মানুষের রক্ষার, সমৃদ্ধি সাধনের ও পরিচর্যার ভার অর্পিত হবে তাদের সেই অনুযায়ী তৈরি করে দেওয়া এবং সেই মহান কর্তব্য সম্বন্ধে তাদের মনে সচেতনতা এনে দেওয়া শিক্ষক-শিক্ষিকার এক প্রধান কর্তব্য। এই কার্যে যাঁরা সফলতা অর্জন করেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে দেশবাসীর আন্তরিক অভিনন্দনের সুযোগ্য দাবিদার। সেণ্ট মার্গারেট স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা লাবণ্যপ্রভা মল্লিক সেই তালিকায় এক উজ্জ্বল নাম।

আদি নিবাস নদীয়ায়। পিতৃনাম স্বর্গত উমানাথ মল্লিক। ১৯০৩ সালের ২৪-এ নভেম্বরে তাঁর জন্ম। আটবছর বয়সে সেণ্ট মার্গারেট স্কুলে যোগ দিলেন। ১৯২১ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। বেথুন কলেজের ছাত্রী হিসাবে স্কলারশিপসহ আই-এ পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণা। (১৯২৩)। ১৯২৫ সালে সফল হলেন বি-এ পরীক্ষায়। পরে ভূগোলে লাভ করলেন অনার্স। বি-টি পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হলেন ১৯৩০ সালে।

ছাত্রীজীবন অতিবাহিত হয়েছে যে বিদ্যালয়ে সেই বিদ্যালয়েই আবার যোগ দিলেন এবার ভিন্ন পরিচয়ে, ভিন্ন ভূমিকায়, শিক্ষিকার সম্মানে। স্কুলের একটি সেরা ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাড়পত্র নিয়ে সেই স্কুলেই আবার ফিরে এলেন আরও অসংখ্য মেয়েকে তাঁর মত সেরা করে তুলতে। কিছুকাল পরে বর্ধমানে গেলেন। সেখানে তখন একটি স্কুল সবে খোলা হয়েছে, সেই স্কুলে যোগ দিলেন লাবণ্যপ্রভা। স্কুলটিকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সহায়তা করাই ছিল তাঁর সেখানে যোগদানের মূল উদ্দেশ্য। চার-পাঁচ বছর সেখানে ছিলেন তিনি। তারপর সেই পুরাতন কর্মক্ষেত্রে।

এই বিদ্যায়তনে প্রতিটি বিষয়ই তিনি পড়িয়েছেন, কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি। মেয়েরা সকল বিষয়েই পাঠলাভ করেছেন তাঁর কাছে। ১৯৫০ সালে শিক্ষামূলক ভ্রমণে তিনি বিলাতযাত্রা করেন। ইয়োরোপের কয়েকটি দেশ এই সময়ে তিনি ভ্রমণ করেন। দেশে ফিরে আসেন ১৯৫১ সালে। স্কুলের প্রধানা শিক্ষিকা মিস লিণ্ডসে অবসর নেওয়ার পর তাঁর শূন্য আসনে সগৌরবে অধিষ্ঠিতা হলেন লাবণ্যপ্রভা (১৯৫১)। তাঁর পূর্বে এই আসনে আর কোন ভারতীয়া অধিষ্ঠিতা হন নি। বর্তমান বৎসরে অন্যতমা শ্রেষ্ঠা শিক্ষিকা হিসাবে তিনি লাভ করলেন রাষ্ট্রপতির জাতীয় পুরস্কার।

ওয়াই ডবলিউ সি-এর সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িতা ছিলেন। বেঙ্গল উইমেনস এডুকেশন লীগের কার্যকরী পরিষদের অন্যতমা সভ্যা হিসাবেও তাঁকে দেখা গেছে। চিলড্রেন্স ফিল্ম সোসাইটির সঙ্গেও তিনি ছিলেন সংযুক্তা। এখানে ইউ সি এন আই-এর যতগুলি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আছে তাদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ বিদ্যমান। স্কটিশ চার্চ কলেজের কাউন্সিলর এবং মুকুলবীথির কর্মপরিষদের অন্যতমা সদস্যা তিনি। 'অঙ্কুর' নামক শিশু-পত্রিকাটির তিনি সম্পাদিকা। লেখনীও তাঁর নীরব নয়। তবে শিশুদের উপযোগী ভ্রমণকাহিনী 'সাগরপারের চিঠি' পাঠ্য হিসাবে নির্দিষ্ট ছিল। 'পাথেয়' নামক ধর্মপুস্তকটিরও রচয়িত্রী তিনিই।

সেণ্ট মার্গারেট স্কুলটি আজ তাঁর আত্মার মধ্যে যেন মিশে গেছে। তাঁর সামগ্রিক চিন্তা-ধারণা প্রধানত বিদ্যালয়টিকেই কেন্দ্র করে। মাত্র কয়েকটি বছর বাদ দিয়ে তাঁর সারা জীবন কেটেছে এই স্কুলেই। এই স্কুল থেকে তাকে আজ পৃথক ভাবা চলে না। শুধু তাই নয়। প্রতিটি ছাত্রীর কাছে তিনি শুধু একজন দক্ষ শিক্ষিকাই নন, তিনি যেন তাদের মনের মানুষ, সুখ-দুঃখের অংশীদার, একান্ত আপনজন। প্রতিটি ছাত্রী তাঁর কাছে আজ পরমাত্মীয়া, তাদের সঙ্গে শুধু অধ্যয়নকে কেন্দ্র করেই তাঁর যোগ নয়। এই আত্মীয়সদৃশ সম্পর্ক তাঁর কাছে এক বিরাট মূল্য বহন করে। এর মধ্যেই তিনি জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার খুঁজে পান।

... যে চেহারায় করণ কল্পনা ... থাকুক—এতটার জন্য সে প্রস্তুত তাকে দেখাদে।

...ভাবে ...নায় ময়লা ফেলা বা জল ঢেলে ভিজিয়ে রাখা কিম্বা খাবার অন্নে ছাই মাটি পাথর মেশানো —এগুলো উপদ্রব মাত্র, এ ওত মারাত্মক নয়। মারাত্মক হ'ল তাকে সাঙ্ঘাতিক কোন শাস্তির জন্য ফাঁদে ফেলার যে সহস্র অপচেষ্টা সেই-গুলোই। এমন কারণ সৃষ্টি করা যাতে সে শাস্তি-যোগ্য কোন অপরাধ করতে বাধ্য হয়। অথচ এ সব শয়তানীর মধ্যে পিকটনকে খুঁজে বার করা কঠিন, কোন ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে সে থাকে না। এক এক সময় করণেরই সন্দেহ হয়—এ সমস্তর পেছনে সে লোকটা সত্যিই আছে কি না।

অনেক রকম লোক দেখেছে করণ এই বয়সে। সার-পর-নাই ঠাকুরসাহেবকে দেখেছে, ভগবান সিংকে দেখেছে—তার ধারণা ছিল যে, মানুষ যে কত সাঙ্ঘাতিক হতে পারে তা মোটা-মুটি তার জানা হয়েই গেছে। কিন্তু এখন বুঝছে জহরতের কথাটা কেমন করে ছাউনির বারাকে বারাকে, বারাকের ঘরে ঘরে ফৌজের মধ্যে ছড়িয়ে গেছে কে জানে—অনেকেই লুব্ধ হয়ে উঠেছে। সে লোভ যেমন স্পষ্ট তেমনি উগ্র। তাদের সে লোভ নানারূপ নানা উপায়ে নিষ্পেষণ করছে ওকে। লেহন করছে। সে লোভের চেহারাটা কখনও সাপের মতো, কখনও শেয়ালের মতো, কখনও ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো। তারাও চায় সে হীরেখানা—পিকটনের জন্যে নয়, নিজেদের জন্যেই। তার জন্যে কোনপ্রকমের লোভ দেখাতে বা ভয় দেখাতে পিছপাও নয় তারা। তাদের কেউ কেউ অবশ্যই পিকটনের নিয়োজিত লোক—কিন্তু মাল যদি সত্যিই হস্তগত হয় তখন কতটা পিকটনের ভোগে লাগবে তা অনুমান করা শক্ত। সম্ভবত কিছুই লাগবে না শেষ পর্যন্ত।---এখানে এসে একটা ইংরেজী শব্দ শিখেছে করণ, "ডবল ক্রশিং" —একই সঙ্গে দু'জনকে ঠকানো, দু'মুখো সাপের বস্তি। এদের অনেকেই সেই পথের পথিক।

হাবিলদার নেকীরাম একদিন কী একটা কাজের অছিলায় ছাউনীর শেষপ্রান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা 'লুকাট' গাছের (লকেট ফল) ছায়ায় বসিয়ে প্রথম কথাটা পাড়ে।

পিকটনের অত্যাচার নাকি অসহ্য হয়ে উঠেছে। শুধু করণই নয়—এ ছাউনির সকলেই অতিষ্ঠ। দুঃখের চেয়ে অপমান বেশী দুঃসহ। তারা গরীব লোক—দুটো টাকার জন্যে জান দিতে এসেছে ঠিকই, কিন্তু তাই বলে ঐ সামান্য অর্থের বিনিময়ে মান, ইজ্জৎ, মনুষ্যত্ব বিক্রী করতে আসে নি। করণের মতো ভদ্র এবং সংলো...—বইস লোককে কী নির্যাতন করছে পিশাচটা তা তো তারা চোখেই দেখছে। সে-ই তাদের আরও কষ্ট। ওরা নিজেরা তবু গরীব দুঃখী চাষী গাঁওয়ার লোক, বিনা অপরাধে শাস্তি-ভোগ ওদের অদৃষ্টের লিখন, —কতকটা গা-সওয়া আছে। কিন্তু করণের লাঞ্ছনা দেখে ওদের বুক ফেটে যায়।

এটা তো ভণিতা মাত্র। আসল কথা নিশ্চয় এখনও বাকী। কী হ'তে পারে সেটা—মনে মনে

যে কিছুই তার জানা হয় নি, মানুষ দেখা তার বাকীই থেকে গেছে আগাগোড়া। সাবধানেই থাকে সে, চোখ এবং কান খোলা রেখেই, ফৌজী আইন তো বলতে গেলে তার মুখস্থই হয়ে গেছে, কিছুতে কোনমতে না সে আইন ভঙ্গ হয়—এ বিষয়ে সে-সম্বন্ধে সজাগ সতর্ক থাকে সে—কিন্তু মানুষের সংবুদ্ধি যতই জাগ্রত ও সচেতন হোক—দুষ্ট বুদ্ধির সঙ্গে এঁটে ওঠা তার শক্ত। কুকুর অনায়াসে মানুষের পায়ে কামড়ায় কিন্তু মানুষ কিছুতে কোন কারণেই কুকুরকে কামড়াতে পারবে না তা সে জানে। তাই সহস্র সতর্কতা সত্ত্বেও ছোটখাটো শাস্তি কয়েকটাই ভোগ করতে হয় তাকে—একেবারে বিনা দোষে ও বিনা অপরাধে। তার মধ্যে ফেটিগ ডিউটি। নির্জন কারাবাস, পেথরের ডিউটি—এ সব তো নিতান্তই সামান্য।

তবু, একটা বিষয়ে করণ নিশ্চিত—এর সবগুলিই ঠিক পিকটন-প্রণোদিত নয়। চোরাই

এত দুঃখের মধ্যেও করণের হাসি পায়।

কী বোকা, কী বোকা এরা। সেই বিপুল ঐশ্বর্য সত্যি সত্যিই করায়ত্ত হ'লে সে এই হীন বৃত্তি নিতে আসবে কেন, ফৌজীদলে নাম লেখাবে কেন? টাকা যার আছে তার জন্যে স্বর্গ-নরকের চার দোর খোলা-পৃথিবীতে সাতখুন মাপ তার। টাকা থাকলে সে যে-কোন নিরাপদ স্থানে গিয়ে সুখে থাকতে পারত—আইনের হাত তার কাছাকাছিও পৌঁছত না।

এ সব কথা সে বলেও ওদের মধ্যে মধ্যে, খোলাখুলিই বলে। বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করে—এইসব হিংস্র পরধনলোলুপ অর্ধনর জীব-গুলোকে। কিন্তু যত সে সত্যিকথা বলে ততই তারা অবিশ্বাস করে, নিজেদের ধারণা সুদৃঢ় হয় মনের মধ্যে।---

আর সেই জন্যেই—ছোটখাটো শাস্তি বা ছোটখাটো দুঃখে যখন কোন কাজ হয় না তখন বৃহত্তর সর্বনাশের জাল পাতে তারা।

ভাবতে চেষ্টা করে করণ এই কথাগুলো শুনতে শুনতেই। যেন নিজের সঙ্গেই নিজে বাজী রাখে একটা—প্রস্তাবটা কী হ'তে পারে সেই সম্বন্ধেই।

সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাতে কাঠ হয়ে ওঠে।

বৃহত্তর ও বেশ মজবুত ফাঁদ এটা। লোক-টার সঙ্গে এখানে নির্জনে আসতে রাজী হয়ে ভাল করে নি সে। এ রকম একটা কিছু হতে পারে—আগেই ভাবা উচিত ছিল।

কিন্তু তখন আর পালাবার পথ নেই। নেকী-রাম ফিসফিস ক'রে ষড়যন্ত্রকারীর ভঙ্গীতে তার প্রস্তাব খুলে বলল। ওরা স্থির করেছে কয় বন্ধুতে মিলে এই অন্যায়ের প্রতিকার করবে। রাজা বা রাজশক্তি যদি এতবড় দুর্বৃত্ততার পোষক হন, স্বয়ং ভগবানও যদি এই ঘোর অনাচার সম্বন্ধে নির্বিকার হন, তাহলে তারা নিজেরাই এর প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করবে, ন্যায়ের দণ্ড নিজেরাই চালনা করবে।---ওরা স্থির করেছে

যে, একদিন পিকটনকে কোন অছিলায় নির্জনে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে ওকে বধ করবে তারা। তার আগে পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র সরিয়ে রাখবে, তা বলাই বাহুল্য, পিকটনকে তার যোগ্য সাজা দিয়ে তারা অতর্কিতে খাজাঞ্চিখানায় গিয়ে পড়বে—সেখান থেকে মোটা টাকা হাতিয়ে নিয়ে চলে যাবে পাহাড় অঞ্চলে। সে সব দুর্গম স্থান থেকে ওদের খবর নিয়ে টেনে আনবে এমন লোক কেউ নেই। তাও যদি বেগতিক দেখে তারা, সোজাসুজি পাঠানমুলুকে পালিয়ে যাবে। পাঠান আফ্রিদিরা কেউ আংরেজের প্রজা নয়। তারা ভয় করে না কাউকে। তাদেরই বরং মোটা মোটা টাকা ঘুষ দিয়ে আংরেজরা খুশী রাখে।

সবিস্তারে সব জানিয়ে নেকীরাম সোৎসাহ-দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল ওর মুখের দিকে। সে উৎসাহটুকু যে মেকী তা তার মুখের দিকে চেয়ে বুঝতে বাকী রইল না করণের। চোখের দৃষ্টিতে সংশয় ও উৎকণ্ঠা ঢাকা পড়ে নি। সে উৎকণ্ঠা কিসের তা বুঝতেও বিলম্ব হয় না। অর্থাৎ যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য ক'রে কথাগুলো বলা হয়েছে কি না—এতেই কাজ হবে কি না।'

কিন্তু সে যাই হোক, করণ বুঝল যে এবার ওর প্রাণের দিকেই হাত বাড়িয়েছে এরা। একেবারেই শেষ করতে চায়।

'মিলিটারী' বা জঙ্গী আইনে ওপরওলার ওপর আক্রমণ বা তাকে হত্যার চেষ্টা করার অপরাধে একটিই দণ্ড নির্দিষ্ট আছে—প্রাণদণ্ড। গুলী করে মারা। সে-ই উদ্দেশ্য এদের। এই ভাবে প্রস্তাবটা পাড়ার অর্থ অনেকগুলি সাক্ষী রাখা। সে একবার এ ফাঁদে পা দেওয়ার ওয়াস্তা। এরাই সাক্ষী দেবে তার বিরুদ্ধে। আর যদি সে রাজী না হয় তো কাপুরুষ বলে বন্ধুদ্রোহী বলে এরা হত্যা করবে। সেটা আর তখন হত্যা থাকবে না—অন্য ক্ষেত্রে যা ঘৃণিত অপরাধ এক্ষেত্রে তা-ই দশের-দেওয়া-শাস্তির গৌরব লাভ করবে।

কিন্তু সে অদৃষ্টে যা আছে থাক—করণ কৃত মনস্থির ক'রে ফেলে—নিজের বিবেকের কাছে পরিষ্কার থাকবে সে। সে কোনও অপরাধ করবে না, এইটুকুই সে জানে, তৎসত্ত্বেও যদি কোন শাস্তিভোগ করতে হয় তো নাচার। দোষ না ক'রে দণ্ডভোগ করা বরং ভাল। দোষী হয়ে দণ্ডভোগ করার অর্থ তো সাধারণ অপরাধীর স্তরে নেমে আসা।...

করণ শান্ত-স্থির দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিল, বক্তব্য শেষ হবার পরও তেমনি তাকিয়ে রইল। সে দৃষ্টি নেকীরাম বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারল না। কেমন যেন একটা অকারণ অস্বস্তিতে উসখুস করে উঠল। সে অস্বস্তিটা ঢাকবার জন্য গলায় একটু বেশী জোর দিয়েই বলল, 'কী বলো ভাইয়া। তোমার কী মত? তুমি রাজী আছ তো?'

করণ সিং সেই ভাবেই ওর মুখের দিকে চেয়ে উত্তর দিল, 'না ভাইসাহেব, আমি তা পারব না। আমাকে মাপ করো।'

'পারবে না? সে কি?' নেকীরামের উত্তেজনা চাপা থাকে না, 'এই অত্যাচার সহ্য করবে নীরবে, এই অন্যায় অবিচার? প্রতিকারের কোন চেষ্টাই করবে না?'

'দ্যাখো ভাই, যেদিন এখানে নোকরীতে ঢুকেছি, সেইদিনই এ আইনটা আমাদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে, ওপরওলার কোন কাজের বিচার করার হক আমাদের নেই। আমাদের কাজ হ'ল নির্বিচারে তাঁদের হুকুম তামিল করা। যদি কোন অবিচার কি অত্যাচার হয়—তাহলে আরও বড় ওপরওলার কাছে নালিশ করবার আইন একটা আছে বটে—কিন্তু সেও নিজের ঠিক ওপরের ঐ ওপরওলার হুকুম ছাড়া করবার উপায় নেই। তার মানে সে চেষ্টাও নিরর্থক। এ সব তো জেনেই এসেছি ভাই, প্রস্তুত হয়েই এখানের খাতায় নাম লিখিয়েছি। এখন আর আপশোষ করে লাভ কি বলো? তা ছাড়া তুমি যে প্রস্তাব করছ—যা করতে চাইছ তা তো খুন। সামনাসামনি বিদ্রোহ করলে অন্যায় হয় কিন্তু তাতে এত অগৌরব থাকে না। এ তো ঘৃণ্য অপরাধ। না, খুনী সাজতে আমি রাজী নই।'

নেকীরাম যেন এ উত্তরের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না। সে যৎপরোনাস্তি আহত ও ক্ষুব্ধস্বরে বলল, 'তুমি এত অপদার্থ? এমন অমানুষ। লেখাপড়া শিখে বড়লোক রইস ঘরের জোয়ান মরদরা এমন অমানুষ হয়? এমন মেয়েমুখো। মেয়েমুখো বললেও ভুল বলা হয়, মেয়েছেলের অধম! ভেড়া—আসলে ভেড়া বলাই উচিত তোমাদের! ছি!'

করণের মুখ কঠিন হয়ে উঠল কিন্তু সে কাঠিন্য কণ্ঠস্বরে প্রকাশ পেল না। বরং আগের মতোই শান্তভাবে বলল, 'ভেড়া গালাগাল নয় হাবিলদারজী, ভেড়া অনেক দিক থেকেই মানুষের চেয়ে ভাল। মানুষের মতো নীচতা শঠতা তার জানা নেই—লোভও তার প্রয়োজনের বেশী নয়। লেখাপড়া শিখেছি বলেই দাগী আসামী হতে রাজী নই। অন্যায়ের প্রতিকার অপরাধে হয় না। সে অবিচার বা অত্যাচার করছে বলে আমি তাকে খুন করব কোন অধিকারে? সে ছোট হয়েছে বলে আমিও ছোট হবো? এ তো তার চেয়েও ছোট হওয়া। তাতে আমার মনুষ্যত্ব তো আরও নেমে যাবে।...তা ছাড়া জঙ্গী আইনে এর চেয়ে বড় অপরাধ আর নেই, এ কাজ করলে সারা জীবনের মতোই তো দাগী হয়ে থাকব, চিরদিন পালিয়ে পালিয়ে লুকি[illegible] হবে, পশুর মতো বনে, না হয় গুহায়। ধরা পড়লেই তো নিশ্চিত মৃত্যু। সে জীবন কি এ জীবনের চেয়ে বেশী কাম্য?'

'আরে যাও, আংরেজের রাজত্ব ছাড়া কি কোথাও মানুষ থাকে না? দুনিয়াটা ঢের বড়, আরও ঢের মুলুক আছে যেখানে মেহনৎ করলে রুটি মিলবে। আর আংরেজই বা ক'দিন থাকবে তার ঠিক কি? এই তো আফগানদের আমীর সাহেবের সঙ্গে লড়াই বেধেছে—আংরেজ যে জিতবেই তার কি মানে?'

'আংরেজের কাছে তো ঢের দিন নোকরি করলে নেকীরাম, এখনও চিনলে না এদের? এদের হারানোও আমীরের সাধ্যে কুলোবে না। এই তো ক'বছর আগেই—কত রাজা মহারাজা সেপাই—সবাই মিলে কত কোশিস করল—পারল কি এদের হঠাতে?...সে কথা থাক, আমি এই আইন মানব বলে জবান দিয়েছি নেকীরামজী, আমার দ্বারা সে জবান ভাঙ্গা চলবে না; তাতে আমার জান থাক আর যাক।'

নেকীরাম যেন কুকুরের মতো খেঁকিয়ে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ, তা বুঝেছি। তোমার—তোমাদের মতো নিমকহারাম লোকের দৌড় বুঝে নিয়েছি। এবার যাও, ছুটে গিয়ে এখনই সাহেবদের কাছে চুকলি খাও যে, বহুত ইনাম মিলবে, চাই কি একটা হাবিলদারিও মিলে যেতে পারে—চুকলির দাম!'

এবার হাসল করণ সিং। বলল, 'এখনও পর্যন্ত তোমার কোন নিমক খাই নি হাবিলদারজী, খেয়েছি কোম্পানীরই—কাজেই এ কথা ওপরওলাদের কাছে রিপোর্ট করলে নিমকহারামী কি করা হয় না, বরং নিমক হালালীই করা হয়। তবে ভয় নেই, বকশিসের লোভে ছুটে গিয়ে আর কারও নামে চুকলি খাব, এমন শিক্ষাও পাই নি। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমায় কেউ জিজ্ঞাসা না করলে তোমার এ মতলবের বিন্দুবিসর্গও কাউকে জানাব না—তুমি নিশ্চিন্তে থেকো।...তা ছাড়া, এ সব কিছু তো তুমি করবেও না সত্যি-সত্যিই. মিছে আর এ সব কথা বলে লাভ কী?'

এই বলে, আবারও হাসল করণ।

এবং—সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্য করল যে, প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও নেকীরামের মুখখানা নিমেষে বিবর্ণ হয়ে উঠল। বোধ হয় এমনভাবে এই বুদ্ধু না-লায়েক ছোকরার কাছে ধরা পড়বে, তা একবারও ভাবে নি সে।...

আর অপেক্ষা করার প্রয়োজন নেই, অভিনয়ের একটা অঙ্ক তো শেষই হয়ে গেছে—সুতরাং করণও আর বাদানুবাদের জন্য অপেক্ষা করল না। অন্য কোন লোক হ'লে অন্তত এই

...তোগ করার জন্যও কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করতে—সেটাও করণের ভদ্রতায় বাধল। সে চকিতে চোখ নামিয়ে নিয়ে ফিরে যেতে উদ্যত হ'ল।

কিন্তু দেখা গেল—ওর অনুমান অক্ষরে অক্ষরে শুধু নয়, আরও বেশী সত্য। এতটা সেও কল্পনা করতে পারে নি। নাটকের পরবর্তী অঙ্ক যতটা বিলম্বে সুরু হবে ভেবেছিল, তার অনেক আগেই সুরু হয়ে গেছে, মূল অভিনেতা ইতিমধ্যেই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছেন, স্বয়ং পিকটন সাহেব কখন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন তা সে বুঝতেও পারে নি—এখন ফিরে দাঁড়াতেই নজরে পড়ল তিনি একেবারে তার পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে ঠেলে না সরিয়ে এক পা'ও এগোনো সম্ভব নয়।

পিকটনের মুখের চেহারা যেমন ভয়ঙ্কর চোখের দৃষ্টি তেমনি ক্রূর। তাঁর স্থূল অধরোষ্ঠের প্রান্তে যে হাসির আভাস, তাকে পৈশাচিক বলাই উচিত। অর্থাৎ আজ আর কোনদিক দিয়ে অব্যাহতি পাবার সম্ভাবনা নেই—তিনি যা হয় একটা এসপার-ওসপার করার মতই কৃতসঙ্কল্প হয়ে এই রঙ্গমঞ্চ নিজে সাজিয়েছেন।

পিকটন কঠিন কণ্ঠে বললেন, 'এখানে তোমাদের হচ্ছিল কি, নেকীরাম? কিসের মন্ত্রণা তোমাদের? এমন কি গুরুতর কাজ যার জন্যে এত নির্জনে এসে পরামর্শ করতে হয়? সন্ধ্যা হয়ে আসছে, ছাউনীতে নাম ডাকা হবে এখনই—সে খেয়াল পর্যন্ত নেই।'

নেকীরাম অকস্মাৎ দু' হাত জোড় করে যেন হাউ-হাউ করে কেঁদে উঠল, 'দোহাই সাহেব আমি কিছু জানি না, এই বেইমান নিমকহারামটাই আমাকে ডেকে এনেছে। ভয়ানক লোক হুজুর, সাঙ্ঘাতিক লোক। এর মতলব শুনলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন, আমারই হাত-পা কাঁপছে থর থর করে।'

করণ স্তম্ভিত। মানুষ অনেক নীচ হতে পারে তা সে জানে, নররূপী পিশাচ দেখতেও সে অভ্যস্ত—স্বয়ং ঠাকরসাহেবকেই তো দেখেছে—কিন্তু এ কী? মুখের ওপর সামনাসামনি এমন নির্জলা মিথ্যা কেউ বলতে পারে। কিসের লোভেই বা এমন কাণ্ড করছে লোকটা—টাকার লোভে? কত টাকাই বা দেবে ওকে পিকটন।

কিছুক্ষণের জন্য যেন দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি দুই-ই অবশ হয়ে গিয়েছিল ওর, যখন একটু সামলে নিতে পারল, তখন কানে গেল পিকটন বলছে, 'আমি সবাইকে জানি তোমাদের—তোমরা সমান হারামজাদা—বলো কি বলছিল ও শয়তানটা—কি মতলব আঁটছিল, তোমার সঙ্গে। সত্যিকথা বলবে নইলে সাঁড়াশি দিয়ে জিভ টেনে ছিঁড়ব এখনই—নিজের হাতে।'

'বলছি হুজুর, সব সত্যিকথা বলছি। একবর্ণও মিথ্যে বলব না, রামজী সাক্ষী। এ লোকটি আপনাকে খুন করতে চায় হুজুর। বলে, এসো আমরা তিন-চার জনে মিলে ওকে নিকেশ করি—তারপর খাজানাখানা লুঠ করে আফগান মুলুকে পালিয়ে যাই। সেখানে গেলে নোকরীও মিলবে, এর চেয়ে ঢের সুখে থাকব।'---এই কথা, এখনই এই কথা বলছিল।'

'হুঁ, তা তুমি কি বললে? রাজী হয়ে গেলে তো তখনই? এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি হতে পারে।'

বিচিত্র ব্যঙ্গের হাসি পিকটনের মুখে, কণ্ঠে বিচিত্রতর বিদ্রূপের সুর। প্রতিশোধের তৃপ্তি ও কর্তব্যকার্যতার বিজয়োল্লাস একই সঙ্গে দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর ও ক্রূরতর করে তুলেছে। সে সময়কার পিকটনের চেহারা বর্ণনা করা যায় না।

'না হুজুর, কী বলছেন। আমি এত আহাম্মক। এতদিন হুজুরদের তাঁবে নোকরী করে এতটুকু বুদ্ধিও কি হয় নি। তা ছাড়া বলব কি, আমি তো তাজ্জব বনে গিয়েছি—একেবারে হাত-পা কাঁপছে আমার, জবাব দেবার মতো অবস্থাই তো ছিল না আমার।'

এবার পিকটন সোজাসুজি করণের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন।

'এ আমি জানতাম। পথের কুকুরকে ডেকে আশ্রয় দিলে সে কখনও এতটা বেইমানী করত না। কিন্তু নেটিভ বেগাররা কুকুরেরও অধম। আনগ্রেটফুল ডগ!---খুব শিক্ষা হয়ে গেল আমার।'

তারপর মিনিটখানেক নিঃশব্দে যেন ওর আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে বললেন, 'এর শাস্তি কি জানো? যা হওয়া উচিত তা দেবার আইন নেই—এই যা বাঁচোয়া তোমার। নেহাৎই গুলী ক'রে মারা—এর বেশী কিছু করা যাবে না এই আপশোস থেকে গেল। তবে ভয় নেই, মরবার আগে যেটুকু তোমার পাওনা তার কিছুটা শোধ করতে পারব বলেই আমার বিশ্বাস—'

এবার করণ নিজেকে কিছুটা সামলে নিয়েছে। নিশ্চিত সর্বনাশের সামনে একরকম প্রশান্তি বোধ করে মানুষ—সেই ধরণের একটা প্রশান্তিও এসেছে তার মনে। মরিয়ার প্রশান্তি। সে বলল, 'কিন্তু অপরাধটা কি আমার—শুনতে পাই সাহেব?'

'শুনলেই তো এইমাত্র নেকীরামের মুখে।'

'ও তো সর্বৈব মিথ্যা—আর সে তো আপনিও জানেন সাহেব, আপনিই তো ওকে এই প্রস্তাব দিয়ে পাঠিয়েছেন। তাই নয় কি? আপনার বিবেককেই জিজ্ঞাসা করুন না। শুনেছি আপনারাই বলেন—সাহেবদের বিবেক জিনিষটা এই নেটিভদের চেয়ে ঢের বেশী উঁচু আর জোরদার।'

'চোপরাও উল্লু কাহাকা। আবার লম্বা লম্বা কথা। এই বয়সেই হার্ড হার্টেড ক্রিমিন্যাল হয়ে উঠেছো। অপরাধ করে একটুও লজ্জা নেই। দাঁড়াও তোমার ও মুখ ভাঙতে হয় কী করে তা আমি জানি। বৃথাই এতকাল মিলিটারীতে কাজ করছি না! নেকীরাম, অ্যারেষ্ট হিম! ওকে এখনই কয়েদখানায় নিয়ে যাও, হাতে-পায়ে বেড়ি দিয়ে রাখবে। তারপর কাল সকালে আমি ওর প্রপার ব্যবস্থা করব—এমন শিক্ষা দেব যাতে ভবিষ্যতে ও রেজিমেন্টের কেউ না কোনদিন মিউটিনীর কথা চিন্তাও করতে পারে। নাও, নাও বাঁধো ওকে, কোন রকম গোলমাল করলে গুলী করে ওর হাত-পা জখম করে দেবে, এই নাও, পিস্তলটা রাখো। তবে প্রাণে মেরো না একেবারে, ওটা আমার জন্যে থাক। এখন প্রাণে মারলে মজাটাই মাটি।'

যেন কী এক পৈশাচিক উল্লাসে হা-হা ক'রে হেসে উঠে পিকটন কোমরবন্ধ থেকে পিস্তলটা দিতে গেলেন নেকীরামের হাতে—

আর সেই সময়েই এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে গেল---

অপ্রত্যাশিত বললেও যথেষ্ট বলা হয় না—দৈব ঘটনার মতোই অবিশ্বাস্য ও আকস্মিক সেটা।

কোথা থেকে—যেন মনে হ'ল পাশের লকেট ও আমগাছগুলোর মধ্যেকার ঘনিয়ে আসা অন্ধকার থেকে কিম্বা তার ওপরের মহাশূন্য থেকে সরু সাপের মতো লিকলিকে কী একটা জিনিষ এসে পড়ল পিকটনের মুখে—সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় আর্তনাদ ক'রে উঠলেন পিকটন, হাত থেকে পিস্তলটাও খসে পড়ল মাটিতে।

মুখের যেখানটায় এসে লেগেছিল সেখানটা কেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়তে সুরু হ'ল প্রায় তখনই। মুখে রুমাল চাপা দিয়ে বসে পড়লেন পিকটন।

নেকীরাম হকচকিয়ে গিয়েছিল; কী করবে তা তো বুঝতে পারেই নি—কী ঘটল তাও ভাল ক'রে তার মাথাতে ঢোকে নি। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বোকার মতো তাকিয়েই ছিল কয়েক মুহূর্ত—পিকটনের গর্জনে সম্বিৎ ফিরল। রুমালের মধ্য থেকে রুদ্ধস্বরে গর্জে উঠলেন সাহেব, 'You son of a bitch——যাও দেখো কোন্ হ্যায়, —'বদমাশ কো পাকড়ো জলদি। কেয়া তাকাতা হ্যায় উল্লুকা বাচ্চা!' And you—you swine জলদি

ধরে ভেজো ব্যারাকবে— গার্ডলোক কো বোলাও, Don't stand there staring like a fool! নেকীরাম দিশাহারা হয়ে সেই জঙ্গলের দিকে ছুটল—প্রাণের মায়া না করেই। সামনের অন্ধকারে বিপদ থাকতে পারে—একাধিক আততায়ী লুকিয়ে থাকাও বিচিত্র নয়। কিন্তু তা হোক। পিছনে সাক্ষাৎ শমন। এর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য আগুনে ঝাঁপ দেওয়াও নিরাপদ ও কাম্য।

তা ছাড়া, সে অবাকও হয়ে গিয়েছিল। ওদের এ ষড়যন্ত্রের কথা যে সর্বৈব মিথ্যা তা তার চেয়ে বেশী কেউ জানে না। সুতরাং এ অদৃশ্য আততায়ী এল কোথা থেকে—কার এত সাহস যে স্বয়ং পিকটনকে এমন আঘাত করে। কী স্বার্থই বা তার। করণ সিংকে তো সম্পূর্ণ নির্বান্ধব বলেই জানত এতকাল, তবে এ আবার কি ঘটে গেল একটা। কে এসে এমনভাবে করণের বিপদের সময় কাজে লাগল। একা কি একাধিক তাই বা কে জানে।

অবাক পিকটনও কম হন নি। এতই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে, আসামীকে তিনিই যে হুকুম দিয়ে মুক্তি দিলেন—আদেশ দেবার মধ্য দিয়ে তাও খেয়াল হ'ল না।

আর সবচেয়ে অবাক হয়েছিল করণ। নিতান্ত অভ্যাসেই ওপরওলার হুকুম তামিল করার জন্য গার্ডরুমের দিকে ছুটল বটে, কিন্তু তার হাত-পা কিছুই যেন সক্রিয় ছিল না। সমস্ত দেহটা অসাড় হিম হয়ে গিয়েছিল ভেতরে ভেতরে—অনড় ও নিষ্ক্রিয়।

ঐ সরু লিকলিকে পদার্থটা এঁরা কেউ ভাল ক'রে তখনও লক্ষ্য না করলেও করণের চিনতে ভুল হয় নি। ওটা বিশেষ প... সে-ই দিয়েছিল একজনকে।

রেশমের চাবুক। চীনে মনুকে তৈরী এক চীনে বাজীকরের কাছ থেকে কিনেছি সে।

কিন্তু সে চাবুক এখানে এল কী ক'রে কেই বা এমন অব্যর্থ লক্ষ্যে ছুড়ল এ চাবুক তার এত উপকারী সুহৃৎ কে এল এই শত্রুপুরীতে —যে অলক্ষ্যে থেকে তাকে অনুগমন করছে এমন লোক তো একটিকেই মাত্র জানে করণ। কিন্তু সে এখানে আসবে কি ক'রে

না না, সে অসম্ভব, অসম্ভব। বার বার নিজেকে বোঝায় করণ সিং।

নিশ্চয় কোথাও একটা বড় রকমের ভুল হয়ে যাচ্ছে। এ হ'তে পারে না।

[ক্রমশ]

চার্লম্যাগনের প্রভাব ও প্রতিভা

এ বছর ইউরোপিয়ান কাউন্সিলের বাৎসরিক প্রদর্শনীতে কিছু পরিবর্তন হয়েছে। অন্যান্য বারের ন্যায় এবার কোন বিশেষ শিল্পকলা অথবা কোন যুগের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন না করে একটি বিশেষ ব্যক্তির প্রভাব ও প্রতিপত্তির নিদর্শন দেখানো হচ্ছে। এই চার্লম্যাগনের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভা যে কতদূর প্রসারিত তা দেখানোর জন্য পৃথিবীর নানা দেশ থেকে স্বর্ণরত্ন আচেনে (পশ্চিম জার্মানী) আনা হচ্ছে। প্রদর্শনীটি আচেন শহরে হচ্ছে, কারণ আচেন কার্লম্যাগনের প্রিয় শহর, এখানেই তিনি তাঁর চরম প্রতিভা ও কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। আচেন ক্যারোনেশন হলে ২৭০টি দেশ থেকে প্রেরিত ৭০০ এরও বেশী জিনিষের প্রদর্শন করা হচ্ছে। নানা ধরণের জিনিষের মধ্যে শিল্প, অস্ত্র, রত্ন মুদ্রা, হাতির দাঁতের দ্রব্য, মডেল, স্বর্ণশিল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলোর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে চার্লম্যাগনের যুগে জার্মানী, এ্যাংলোস্যাক্সন, রোমানরা সভ্যতা ও কৃষ্টির দিক দিয়ে কতদূর অগ্রসর লাভ করেছিল। সে সময়কার 'ক্যারোলিনজিয়ান রেনেসাঁ'র অপূর্ব নিদর্শন দেখা যাবে 'আচেন কোর্ট স্কুল' থেকে প্রেরিত জিনিষগুলোর মধ্যে। ১০০০ খৃঃ সম্রাট তৃতীয় অটোর আদেশে চার্লম্যাগনের কবর খোঁড়া হলে তাঁর গলায় যে হার পাওয়া যায়, ছবিতে তাই দেখা যাচ্ছে।
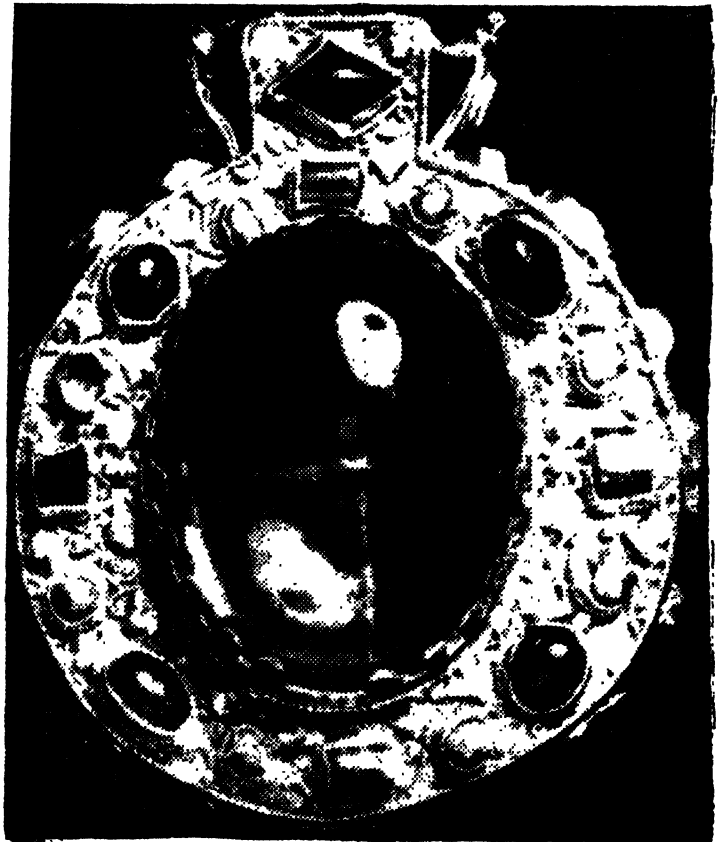
কাক
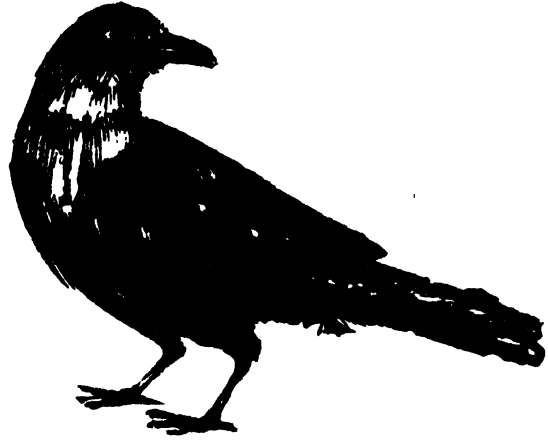
একটু একটু ক'রে আমি সব সেরা পাখি ভারতীয় কাক সম্পর্কে ভালভাবে জানতে পারলাম, ওরা আমায় মোহিত করে ফেলল। আমার মনে হয় পাখিদের মধ্যে ওরাই সব থেকে বেশী বাতগ্রস্ত। হ্যাঁ, সব চেয়ে বেশী হাসিখুশীও বটে এবং নিজেকে নিয়ে পরম আনন্দে ডগমগ। কোন আকস্মিক বা কোন নকড়া ছকড়া কাজের ফল সে নয়; সে দস্তুরমত শৈল্পিক এবং শিল্প-কর্ম সময় সাপেক্ষ; অনন্ত কালের হাতে সে তৈরী, এবং গভীর চিন্তার ফসল; চট্ করে এমনতর পাখি সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। শিব ঠাকুরের চেয়ে অনেক বেশী বার তার রূপান্তর ঘটেছে; প্রত্যেক রূপের নমুনা রেখে তা সে নিজের গড়নের কাজে লাগিয়েছে। বিবর্তনের বাঁকে বাঁকে শেষ অন্তহীন গড়নের দিকে উদাত্তভাবে চলতে চলতে সে বহুরূপী—জুয়ারী, স্থূল হাস্যরসিক, লম্পট পুরুতঠাকুর, হুজুগগ্রস্ত মহিলা, অসৎ, বিদ্রূপপ্রিয়, মিথ্যুক, চোর, গুপ্তচর, নোংরা খবর দেনেওয়ালা, ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিক রাজনৈতিক পাণ্ডা, জুয়াচোর, পাকা-পোক্ত ভণ্ড, রূপোপ্রেমী দেশপ্রেমিক, সংস্কারক, বক্তা আইন ব্যবসায়ী, ষড়যন্ত্রকার গুরুঠাকুর, বিদ্রোহী, রাজপন্থী, গণতন্ত্রী ঠগ, অশ্রদ্ধা প্রচারক, অযথা হস্তক্ষেপকারী, অনধিকার প্রবেশকারী, অনধিকার চর্চায় উৎসাহী, সত্যধর্মে অবিশ্বাসী এবং পাপের পঙ্কে নিমজ্জিত কেবল পাপের প্রতি আন্তরিক টানের জন্যই। এই সব অভিশপ্ত ক্রমিক সংহতির অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য ফল তার চিন্তামুক্তি দুঃখমুক্তি, অনুতাপহীনতা। তার জীবন এক দীর্ঘ বিপুল উল্লাসময় সুখ, মৃত্যু বরণ করবে সে নিরুদ্বেগে। সে জানে শীগগিরই লেখক বা ঐ জাতীয় কিছু হয়ে সে ফিরে আসবে এবং আগের তুলনায় অনেক বেশী অসহনীয়রূপে সমর্থ এবং স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়ে উঠবে।

তার সামনের দিকে পা ফাঁক করে এগিয়ে যাওয়া, তার পাশ মাফিক আলতো লাফ, তার ধষ্ট চালচলন,

মার্ক টোয়েন

এবং প্রয়োজনমত একপাশে চতুর-ভাবে ঘাড় হেলান, এ সবই এক জাতের আমেরিকান কোকিলের কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু মিলটুকুর ইতি এখানেই। তার আকৃতি লক্ষণীয়ভাবে বৃহত্তর এবং কোকিল জাতীয় পাখির ছিমছাম্; ছিলছিলে, সুন্দর গড়ন এবং সুগঠিত ঠোঁট তার নেই। তার ধূসর, মরচের মত কাল চেহারা ওদের ধাতব উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ এবং ঝকঝকে বোঞ্জসুলভ চাকচিক্যর তুলনায় নিশ্চয়ই খুব সাধারণ। ওরা খাঁটি ভদ্রলোক, আচরণে এবং পোশাকে-আসাকে আর ওরা গণ্ডগুলে নয় বলেই আমার বিশ্বাস। কেবল পাদপশাখে বসে ধর্মীয় কাজকর্ম বা রাজনৈতিক সভা করার সময়টুকু ছাড়া; কিন্তু এই ভারতীয় মেকি শান্তিপ্রিয়র দল নিছক গুণ্ডা, আর জাগ্রত অবস্থায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মুখর।—সব সময় দর কষছে, বকাবকি, বিদ্রূপ উপহাস, হাসি, ক্ষিপ্র-বেগে ওড়াওড়ি এবং এবং শাপশাপান্ত বিরামহীন এবং কিছু না কিছুর তালে ধুরধুর করছে। এমন কোন পাখিকে কখনও মতামত দেওয়ার জন্য দেখিনি কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না, ঘটমান সব কিছুই সে নজর করে, এবং সে সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করে, বিশেষ যদি তা তার নিজস্ব কোন ব্যাপার না হয়। তার মত সব সময়েই উগ্র কখনও ভদ্রস্থ নয়—শুধু উগ্র নয় শ্রদ্ধা-হীনও বটে, মহিলাদের উপস্থিতি তার কাছে তাৎপর্যহীন। তার মত চিন্তার ফসল নয়, কেন না কখনও কিছু ভাবা তার কুষ্ঠিতে নেই, কিন্তু মনের ওপরকার মতপ্রক্ষেপে সে পটু যা কিনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একেবারে অন্য কোন ব্যাপার সম্পর্কিত মত এবং উপস্থিত কাণ্ডয় নিতান্ত বেখাপ্পা। কিন্তু এই তার রীতি; তার আসল উদ্দেশ্য মত ছিটোনো কাজেই চিন্তার জন্য থামা সুযোগের অপচয় বই নয়।

আমার মনে হয় কোন মানুষই তার শত্রু নয়। সাদা মানুষ আর মুসলমানরা বোধ হয় কখনও তাকে উত্যক্ত করে নি, আর হিন্দুরা ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী কখনও কোন প্রাণী বধ করে না, এমন কি সাপ, বাঘ, মাছি, আঁটালি এবং ইঁদুরও রেহাই পেয়ে যায়। আমি যদি জানলার বাইরের ঘেরা-বারান্দায় এক পাশে বসতাম, অন্য দিকের রেলিঙের ওপর জড় হয়ে

ব্যয়সকুল আমাকে নিয়ে আলোচনায় মশগুল হয়ে পড়ত; আর একটু একটু করে প্রায় আমার ধার ঘেঁষে আসত; এবং তারা সেখানে বসত অত্যন্ত লজ্জাহীনভাবে আর আমার বেশভূষা, চুল, রং, সম্ভাব্য চরিত্র কাজ, রাজনৈতিক মত, কী ভাবে ভারতে এলাম, কী করছিলাম এতদিন, কতদিন এ কাজে ভিড়েছি, কী ভাবেই বা এতদিন ফাঁসীর দড়ি এড়িয়ে গেলাম, কবেই বা তা ঘটবে, আমার দেশের আমার সমজাতীয়দের সম্বন্ধে হয়ত আরও অনেক কিছু এবং কখন তাদের ঝুলিয়ে দেওয়া হবে—এইসব নানা কথা ছিল তাদের আলোচ্য, যতক্ষণ না বিরক্তি আমার সহ্যর সীমা অতিক্রম করে যেত; তখন হুস করে ওদের তাড়িয়ে দিতাম, আর তারা খানিকক্ষণ ওপরে চক্রাকারে ঘুরে হেসে ঠাট্টা-মস্করা করে আবার রেলিঙে বসে নতুন করে সুরু করত তত্ত্বকথা।

খাদ্যকণা সামনে থাকলে তারা বড় সামাজিক—পীড়াদায়কভাবে। সামান্য উৎসাহ পেলেই ওরা ভেতরে ঢুকে টেবিলে বসে আমাকে সকালের খাওয়া সারতে সাহায্য করত; আর একবার অ... ...র ... ...লাম ঘরে, একা থাকায় তারা ... সব কিছু তুলে নিয়ে গিয়েছিল; বিশেষ করে পাওয়ার পর কাজে আসবে না এমন জিনিষই ছিল তাদের পছন্দসই। ভারতে তারা অগণিত, তাদের হৈ-চৈ-এর মাত্রাও সংখ্যামাফিক। মনে হয় সরকারের থেকেও বেশী ব্যয়বহুল বায়সকুল; তবুও এ ব্যাপারটা খেলো নয়। হ্যাঁ, তারাও দেয় বইকি; তাদের দল পুষিয়ে দেয়; ওদের উৎফুল্ল স্বর মিশিয়ে গেলে দেশ ম্রিয়মাণ হয়ে পড়বে।

অনুবাদক—সমীরণ চৌধুরী

যতদূর মনে পড়ে

শেষাংশ

ভ্রাতৃহত্যার মামলা

মামলার জবানবন্দী শেষ হওয়ার পরে কোর্টের আবহাওয়া যেন একটু বদলে গেল বলে মনে হল। জুরীদের দিকে চেয়ে দেখলাম---তাঁরা নিজেদের মধ্যে আস্তে কথাবার্তা বলছেন।

কিন্তু যে সাক্ষী আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল সে হচ্ছে—Arms Expert (বন্দুক বিশারদ)।

আসামী গ্রেপ্তার হওয়ার পর তার ডান হাতের পাতা পরীক্ষা করা হয়—যাকে বলে Dermal Nitrate test বন্দুকের গুলীতে কোনও খুন হলে আসামী গ্রেপ্তারের পর এই পরীক্ষাটি করা হয় পুলিশের তরফ থেকে। অর্থাৎ পরীক্ষা করে দেখা হয় আসামীর ডান হাতের বুড়ো আঙুলের উপর দিকে অঙ্গুলীর গোড়ায় লোমকূপের মধ্যে বন্দুকের গুলীর বারুদের কালো ছাপ পড়েছে কি না। যদি সোজা গুলী করা হয় তা সে বন্দুকই হোক বা রিভলবারই হোক সাধারণত এই দাগটি পড়ে এবং এ ছাপটি সহজে মিলিয়ে যায় না---২।৩ দিন অন্তত সময় লাগে।

আসামীর বেলায় এই পরীক্ষা করা হয়েছিল কিন্তু বুড়ো আঙুলের গোড়ার উপরের দিকে কোনও ছাপ পাওয়া যায় নি। তবে দাগ পাওয়া গিয়েছিল নীচের দিকে অর্থাৎ হাতের পাতায় বুড়ো আঙুলের গোড়ার দিকে। এইসব কথা পুলিশের সাক্ষী দিয়ে আগেই বলিয়ে নিয়েছিলাম।

বন্দুক বিশারদকে, (Gun Expert) জেরায় জিজ্ঞাসা করলাম, "যদি সোজা কেউ গুলী করে তবে সে সাধারণত গুলী করেছে তার ডান হাতে অর্থাৎ যে হাত দিয়ে সাধারণত গুলী করা হয়,—বুড়ো আঙুলের গোড়ার উপরের দিকে বারুদের একটা ছাপ পড়ে—না?

উত্তর—"হ্যাঁ। তবে সময় সময় সেটা পরীক্ষাসাপেক্ষ।"

প্রশ্ন—"তার মানে?"

উত্তর—"অর্থাৎ সাদা চোখে সব সময় সেটা নাও দেখা যেতে পারে, তবে যাঁরা জানেন, তাঁরা যদি পরীক্ষা করেন, তবে এ দাগ দেখা যাবে।"

প্রশ্ন—"সেই রকম পরীক্ষায় যদি বুড়ো আঙুলের উপরের দিকে এ দাগ না পাওয়া যায় তবে অন্তত এইটেই বুঝতে হবে যে সোজা স্বাভাবিকভাবে গুলী হয় নি।"

উত্তর—"হ্যাঁ।"

প্রশ্ন—"যদি এই দাগ বুড়ো আঙুলের গোড়ার নীচের দিকে হাতের পাতায় পাওয়া যায় তবে এইটেই বুঝতে হবে নাকি যে গুলীর সময় হাত স্বাভাবিক সহজ অবস্থায় ছিল না, উল্টান ছিল অর্থাৎ কেউ জোর করে হাতটি ঘুরিয়ে দিয়েছিল?"

উত্তর—"তা হতে পারে।"

প্রশ্ন—"অর্থাৎ গুলী যখন বেরোয় তখন কারও সঙ্গে এই রিভলবার নিয়েই কাড়াকাড়ি ধস্তাধস্তি হচ্ছিল।"

একটু ভেবে উত্তর—"তা অসম্ভব নয়।"

প্রশ্ন—"এবং সেই অবস্থায় গুলী দুর্ঘটনাবশত বেরিয়ে যেতে পারে—অর্থাৎ কেউ ইচ্ছে করে গুলী ছোড়ে নি?"

উত্তর—"হতেও পারে।"

বসে পড়লাম। সাক্ষী প্রমাণ আর বিশেষ কিছু ছিল না—শেষ হল।

তখন জজ আসামীকে জিজ্ঞাসা করলেন—তার বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রমাণ যেসব দেওয়া হয়েছে তা শুনে তার কিছু বক্তব্য আছে কি না।

শ্রীনীরদরঞ্জন দাশগুপ্ত

বার এ্যাট্-ল

আসামী তার নিজের ভাষণ দিল শান্ত সংযতভাবে বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে। সমস্ত আদালত স্তব্ধ। জুরীরাও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনলেন। আমি আদালতে অনেক আসামীর নিজের কথা বলতে শুনেছি কিন্তু এরকম সহজ সরল হৃদয়স্পর্শী কথা এর পূর্বে আর কোনও আসামীকে বলতে শুনি নি।

মোটামুটি তার বক্তব্য যতদূর মনে পড়ে—ছিল এই —সে খুন করে নি। ভাইদের মধ্যে দাদাকেই সে সবচেয়ে বেশী ভালবাসত এবং তাঁকে প্রাণভরে ভক্তিশ্রদ্ধা করত। দাদার ছেলেমেয়েদের সে বোধহয় ভালবাসে নিজের ছেলেমেয়ের চেয়েও বেশী। সেদিন অপর দুই ভাইয়ের সঙ্গে তার ঝগড়া হচ্ছিল, মায়ের শোবার ঘরে, মা বসেছিলেন খাটে। পারিবারিক দু-একটি গোপনীয় ব্যাপার ও বিষয়-সম্পত্তির দিক দিয়ে। কলহটি ক্রমে খুবই ঘনীভূত হয়ে উঠল। যে দুই ভাইয়ের সঙ্গে তার কলহ হচ্ছিল তার মধ্যে এক ভাই জামার পকেট থেকে রিভলবার বার করেছিল।

"বুঝতে আমার দেরী হয় নি" বলেছিল আসামী যে, সে রিভলবার নিয়ে প্রস্তুত হয়েই আমার সঙ্গে কলহ করতে এসেছিল; কতকগুলি বিষয় শেষ বোঝাপড়া করার জন্য। তবে আমি তার প্রতি কোনও অবিচার করব না বা এতটুকু মিথ্যাকথা বলব না। সে রিভলবার হাতেই রেখেছিল এমনভাবে যাতে আমি দেখতে পাই। আমার প্রতি লক্ষ্য করে আমাকে কোনও ভয় দেখায় নি।"

যাই হোক, তখন আসামী ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে নিজের শোবার ঘর থেকে রিভলবার নিয়ে আসে। তারও আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল না শুধু ভাইদের ভয় দেখান। "তবে একথা আমি স্বীকার করব" আসামী বলেছিল, "কলহ যখন আরও ঘনীভূত হল তখন একবার আমি ভাইদের ভয় দেখাবার জন্য রিভলবার তুলেছিলাম কিন্তু খুন করার উদ্দেশ্য---আমার একেবারেই ছিল না।"

ঠিক এই সময় দাদা কলহের খবর পেয়ে ছুটে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং আসামীর হাতে রিভলবার দেখে 'কি করছিস কি করছিস' বলে আসামীকে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন ও রিভলবার কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। সেই সময় দুজনার মধ্যে রিভলবার নিয়ে একটা কাড়াকাড়ি হয় এবং সেই সময় হঠাৎ রিভলবারের গুলী বেরিয়ে গেল---সেটা আসামীর একেবারেই ইচ্ছাকৃত নয়।

"অন্যায় আমি করেছি স্বীকার করছি।" আসামী শেষের দিকে বলেছিল, "অমন দেবতুল্য ভাই আমার দিকে এগিয়ে এসে আমার হাত থেকে রিভলবার কেড়ে নিতে চাইল, আমার তৎক্ষণাৎ রিভলবার ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল। তা করি নি, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত আজ আমি ভোগ করছি।"

আসামীর বক্তব্য শেষ হল। জুরীদের দিকে চাইলাম। মনে হল জুরীরা একটু বোধহয় অভিভূত হয়েছেন। অনিল মিত্রমহাশয় তাঁর ভাষণ দেওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। খুনের অভিযোগ, তাই আইনের দৃষ্টিভঙ্গিতে খুন বলতে কি বোঝায় জুরীদের দিলেন বুঝিয়ে। তারপর ঘটনার বিষয় বলতে গিয়ে এটা যে ইচ্ছাকৃত খুন, আকস্মিক দুর্ঘটনা মোটেই নয় সেইদিক দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করতে লাগলেন এবং এই সম্পর্কে অপর দুই ভাই-এর সাক্ষীর উপর জোর দিলেন খুব বেশী। সত্যি যদি সোজাভাবে বড় ভাইকে খুন করা না হয়ে থাকে তাহলে ফাঁসী হতে পারে জেনেও তাই হয়ে ভাই-এর বিরুদ্ধে এরকম মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া অস্বাভাবিক—বস্তুই কেন

মনোমালিন্য থাকুক না ভাই-এর সঙ্গে। আসামীর মাতার সাক্ষ্য আলোচনা করতে করতে বললেন—হাজার হলেও তিনি আসামীর মা, সে কথাটা যেন জুরীরা মনে রাখেন; তিনি কখনই চান না যে, তাঁর ছেলের শাস্তি হোক। তাই দায়রা আদালতে ছেলের স্বপক্ষে কথা বলাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক আর তাঁর কি তখন মাথার ঠিক ছিল যে সব কথা যথাযথ-ভাবেই মনে রাখবেন। হাতে গুলীর বারুদের ছাপের দিক দিয়ে বললেন—আসামী তখন রাগে কাঁপছিল। তার পক্ষে হাত একেবারে ঠিক সোজা রাখা হয়ত সম্ভব হয় নি, হয়ত গুলী করবার সময় রিভলবার একটু বেঁকে গিয়েছিল হাতে—ইত্যাদি ইত্যাদি। দু-ঘণ্টারও উপর লাগল মিত্রমহাশয়ের জুরীর ভাষণ শেষ করতে।

তারপর আমি উঠে দাঁড়ালাম। অতবড় আদালত ঘর লোকে লোকারণ্য। স্কুল-কলেজ থেকে ছেলেমেয়েরা এসেছে এই মামলা শুনতে; কি হয় কি হয়—তাদের কৌতূহলের যেন সীমা নেই। বাইরের সাধারণ লোকও ছিল যথেষ্ট, আইনজীবীরা ও বিশিষ্ট লোকেরও অভাব ছিল না জুরীর ভাষণ দিতে উঠে চারিদিক চেয়ে আমার হঠাৎ মনে পড়ল—স্যার এডওয়ার্ড মার্শাল হলের সেই কথা—Sense of drama সত্যিই ত' এই আদালত ঘরে আজ যে নাটকের অভিনয় হচ্ছে, আমিই ত' তার বিশিষ্ট অভিনেতা। চারিদিকে চেয়ে জুরীর ভাষণ দিতে উঠে একটা বিশেষ অনুপ্রেরণা পেয়েছিলাম—মনে আছে।

নানাদিক দিয়ে ঘটনার বিষয় জুরীদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম। প্রথমত দাদাকে খুন করবে কেন, দাদার সঙ্গে ত' কোনও কলহ ছিল না, সাক্ষী-প্রমাণে যতদূর যা পাওয়া গেছে, দাদাকে আসামী ভক্তি শ্রদ্ধাই করত। তবে দাদাকে অমন সোজাভাবে দাঁড়িয়ে খুন করবে কেন, এ প্রশ্নের কি উত্তর দেন সরকার পক্ষ—প্রথমে এইদিক দিয়ে জুরীদের বোঝাবার চেষ্টা করলাম।

জুরীদের দিকে চেয়ে জোরের সঙ্গে বললাম গোড়ায় এই প্রশ্নটির সন্তোষজনক উত্তর চাই। এ প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর না পেলে কখনই জুরীরা আসামীকে দোষী বলতে পারেন না। আসামীর মাতার সাক্ষ্যর বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে বললাম—মিত্র-মহাশয় কি বলতে চেয়েছেন, ঠিক বোঝা গেল না। মিত্রমহাশয় কি বলতে চান—মা হয়ে ছেলের শাস্তি চান না বলে, ঐ শোকাতুরা বৃদ্ধা মহিলা হলফ নিয়ে ছেলেকে বাঁচাবার জন্য মিথ্যাকথা বলেছেন? আর কোন কথাটা ছেলের স্বপক্ষে যাচ্ছে এবং কোনটা তার বিপক্ষে—এ চুলচেরা বিচার করা কি তাঁর পক্ষে সম্ভব। একটু চুপ করে থেকে বললাম—যদি তাই হয় তবে ত' তিনি আসামীর স্বপক্ষে সব কথাই সমর্থন করে যেতেন, কিন্তু কই, অপর ভাই-এর হাতে রিভলবারের কথা তিনি ত' সমর্থন করেন নি।

আর জুরী মহাশয়েরা কার কথা বিশ্বাস করবেন, মায়ের কথা না অপর দুই ভাই-এর কথা—মা নিরপেক্ষ, সব ছেলেই তাঁর কাছে সমান। কিন্তু অপর দুই ভাই-এর সঙ্গে আসামীর নিদারুণ শত্রুতার কথা জেরায় ত' অনেক প্রকাশ হয়েছে। তাদের জেরায় এটা স্পষ্টই বোঝা গেছে—তারা আসামী পথের কাঁটা হিসাবে সরে গেলে বাঁচে। ফাঁসী হতে পারে জেনেও কোনও ভাই ভাই-এর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেয় না—এত সত্যনিষ্ঠা কৈ এ যুগে ত' দেখতে পাওয়া যায় না। দুটি ভাই কি এক একটি যুধিষ্ঠির? আঙ্গুলের গোড়ায় বারুদের ছাপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করতে করতে বলেছিলাম—মিত্র-মহাশয়ের কথা শুনে হাসব কি কাঁদব বুঝতে পারি নি; সোজা খুন করব ঠিক করে, ঠিক গুলী করার সময় রিভলবারটি কেঁপে গেল বেঁকে। সাক্ষী প্রমাণে পাওয়া গেছে—আসামী আনাড়ি নয়। রিভলবার ছোড়া তার অভ্যাস ছিল, ইত্যাদি—ইত্যাদি।

শেষ পর্যন্ত তিন ঘণ্টার উপর ভাষণ দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। জুরীদের বারে বারে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম ফৌজদারী আইনের গোড়ার কথাটি—যতক্ষণ পর্যন্ত মনে আসামীর দোষ সম্পর্কে এতটুকুও সন্দেহ থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আসামীকে দোষী বলা চলবে না। ইংরাজীতে যাকে বলে Benefit of doubt—তাই দিতে হবে, অর্থাৎ আসামীকে মুক্তিই দিতে হবে। অর্থাৎ দোষী হতেও পারে, নাও হতে পারে—এই রকম মনোভাব হলেও আসামীকে মুক্তিই দেওয়া উচিত। এই মনোভাবের দরুণ হয়ত দশটা দোষী লোক খালাস হয়ে যাবে, তা হোক—কিন্তু একটা নির্দোষ লোক যেন ভুল বিচারে শাস্তি না পায়।

Let ten guilty men escape but let not one innocent man be convicted—আইনের কথা। কেন না নির্দোষ লোকের শাস্তি যে মহাপাপ।

আমার বক্তব্য শেষ হলে বিচারপতি জুরীদের প্রতি তাঁর ভাষণ দিতে সুরু করলেন। ৩০২ ধারা বলতে কি বোঝায় ইত্যাদি আইনের দিকটা বুঝিয়ে দিয়ে আমার কথা সমর্থন করে বললেন—এই মকোদ্দমার সমস্ত ঘটনা এবং পারিপার্শিক অবস্থা পর্যালোচনা করে আসামীর দোষ সম্পর্কে যদি মনে [illegible] সন্দেহ [illegible] আসামীকে মুক্তি দেওয়াই আইনের বিধান।

কিন্তু ঘটনার বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এক এক করে সরকার পক্ষের কথাগুলিই সমর্থন করে গেলেন। স্পষ্টই ইঙ্গিত দিলেন যে, ভাইদের সাক্ষ্যই বিশ্বাস করা উচিত। আমার দিককার কথাগুলি অবশ্য আলোচনা করলেন কিন্তু সেগুলির মূল্য বিশেষ কিছু নেই এইভাবে জুরীদের বোঝাতে লাগলেন। জুরীদের বললেন যে, আসামীর মাতার সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করা চলে না, কেন না আসলে তিনি আসামী পক্ষেরই সাক্ষী—কেন না তিনি আসামীর মাতা এবং আসামীকে বাঁচানই তাঁর উদ্দেশ্য। আঙ্গুলের গোড়ায় বারুদের ছাপের বিষয় তিনি এক নতুন কথা বললেন—যে কথা অনিল মিত্রমহাশয়ও বলেন নি, তিনি বললেন—ঘটনার পর গ্রেপ্তার হওয়ার আগে আসামী হয়ত হাতের দাগ সাবান বা ঐ ধরণের কিছু, যাতে দাগ ওঠে, তাই দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলেছিলেন। কেন না, আসামী শিক্ষিত লোক—তার পক্ষে এ সব বিষয় জানাটাই স্বাভাবিক।

অস্বীকার করব না—অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেছিলাম। আমার দুইজন সহকারী ছিলেন, দু'জনই ব্যারিষ্টার। একজন পরলোকগত বন্ধু এবং বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীধীরেন দে এবং অপরটি শ্রীমতী মায়া রায় (শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ব্যারিষ্টার মহাশয়ের পত্নী)। "আমি জজের ভাষণ আর শুনতে চাই না"—এই কথা তাদের বলে তাদের আদালতে থাকবার অনুরোধ জানিয়ে, ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম।

ব্যাপারটা অনেকদিন ঘটে গেছে। আজ ভাবি—আমার বিরক্ত হওয়ার সঙ্গত কোনও কারণ ত' ছিল না। সাক্ষী প্রমাণ শুনে যদি বিচারপতির মনে হয়ে থাকে যে, আসামী সত্যই দোষী—তাহলে তা নিজের মত তিনি কেন প্রকাশ করবেন না। তাঁর কর্তব্য তিনি তার বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে পালন করছেন—তাতে আমার বিরক্ত হওয়ার কি আছে। কিন্তু তখন এ সব কথা মনে হয় নি—মন বিরক্তিতে গিয়েছিল ভরে। এটা আমার স্বভাবগত ত্রুটি, বরাবরই লক্ষ্য করেছি। আমার কাজ আমি করেছি এখন ফলাফল যা হয় হোক—এরকম নির্লিপ্ত মনোভাব কোনওদিনই আমার হয় নি। মকোদ্দমা করতে করতে আমি নিজেকে যেন তারই মধ্যে হারিয়ে ফেলি।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত জজের ভাষণ শেষ হলে, জুরীরা গেলেন নিজেদের সিদ্ধান্ত বিবেচনা করবার জন্য তাঁদের ঘরে। আমি আদালতের বাইরে বারান্দায় পায়চারী

... বন্ধু বেরিয়ে ...র কাছে।

শুধালাম, "শেষ পর্যন্ত কি জজের একই সুর ছিল, না একটু বদলেছিল?"

একজন বললেন, "না একই। আসামীর দোষ সম্বন্ধে যেন কোনও সন্দেহই নাই জজের মনে।"

অপরজন বললেন, "কিন্তু শেষকালে জুরী-দের বলেছিলেন যে তাঁরা জজের মতামত মেনে নিতে বাধ্য নন---তাঁরা তাঁদের স্বাধীন চিন্তাধারা দিয়ে নিজেদের মতামত ঠিক করবেন।"

বললাম, "সে কথা ত' বলতেই হবে। এটা ত' আইনের মস্তবড় কথা---জজ জুরীদের বলতে বাধ্য।"

এক ঘন্টারও উপর জুরীরা নিজেদের ঘরে ছিলেন---বোধহয় নিজেদের মধ্যে পরামর্শ ----করছিলেন। সেই সময়টা বাইরের বারান্দায় পায়চারী করতে করতে আমার মনের চাঞ্চল্য ও উদ্বেগের কথা---বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নাই। আসামীকে বাঁচাবার আশা যে একেবারে ছেড়ে দিয়েছিলাম----তা ঠিক নয়। কিন্তু আশা হয়ে গিয়েছিল খব ক্ষীণ--বিশেষত জজের ভাষণের পরে।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত খবর এল---জুরীরা ফিরে এসেছেন। আমি ধীরগম্ভীর পদে গিয়ে আদালতে বসলাম। বিচারপতি বসলেন নিজের আসনে। জুরীদের দিকে চেয়ে দেখলাম---জুরীরা স্থিরগম্ভীর। কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তাঁরাই জানেন।

তাঁদের জিজ্ঞাসা করা হল---তাঁরা কি সকলেই একমত, না তাঁদের মধ্যে ভাগাভাগি হয়েছে।

জুরীপ্রধান উঠে দাঁড়িয়ে বললেন---তাঁরা সকলেই একমত।

জিজ্ঞাসা করা হল---কি মত আপনাদের?

আমার বুক কেঁপে কেঁপে উঠছিল---যেন আমারই বিরুদ্ধে রায় হবে।

জুরীপ্রধান বললেন---আমাদের সর্বসম্মতি-ক্রমে আসামী নির্দোষ।

আদালত লোকে লোকারণ্য। সবাই এক সঙ্গে জয়ধ্বনি করে উঠল। এ ব্যাপার এর পূর্বে আর কখনও দেখিনি। আসামী যে সকলের এতখানি সহানুভূতি পেয়েছিল---এটা আগে ধারণা করতে পারি নি।

জজ আমার দিকে চাইলেন---একটু আড়-চোখে এবং তাঁর ঠোঁটের কোণে খেলে গেল মৃদু হাসি। সে হাসির অর্থ যে ঠিক কি, আমি আজও জানি না।

সর্বসম্মতিক্রমে জুরীরা নির্দোষ বলেছেন তাই জজ আসামীকে খালাস দিতে বাধ্য হলেন।

মনে আছে---আদালত ঘর থেকে হাইকোর্টেই আমাদের বসবার ঘরে ফিরে আসতে আমার অনেকক্ষণ সময় লেগেছিল---দলে দলে এত লোক ঘিরেছিল আমাকে।

আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন---আসামী দোষী জেনেও কি আপনি এইভাবে তাদের খালাস করার চেষ্টা করেছেন? আমি বরাবরই একই উত্তর দিয়েছি---আমি জানি নি, আমি কখনও কোনদিন আসামীকে প্রশ্ন করি নি---সে যথার্থ দোষী কি না? ফৌজদারী আইনের প্রথম এবং গোড়ার কথা---**A man is psreumed to be innocent till he is proved to be guilty.**

(যতক্ষণ পর্যন্ত না দোষ প্রমাণিত হয়, আসামীকে নির্দোষই ধরে নিতে হবে)---এই ছিল আমার ব্যবহারিক জীবনের মূলমন্ত্র।

কাজেই আসামী পক্ষ সমর্থন করবার জন্য আমার কাছে এলে আমি কাগজপত্র দেখে সরকার পক্ষের বক্তব্যটি কি বুঝে নিয়ে, তার মধ্যে কোথায় কি ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটেছে লক্ষ্য করে, সরকার পক্ষের কাহিনীটিকে কি ভাবে কি করে ভাঙ্গা যায়, এইসব বিবেচনা করে মামলা করতে দাঁড়িয়েছি এবং এইসব দিক দিয়েই আসামী পক্ষের কথাবার্তার মধ্যে কিছু সাহায্য পাওয়া যায় কি না---সেইটেই বোঝবার চেষ্টা করেছি। কোনও আসামীই তো আজ পর্যন্ত আমার কাছে এসে বলে নি---আমি দোষী, আমাকে বাঁচান। বরং উল্টো-কথাই সাধারণত শুনেছি। কাজেই যথার্থ দোষী কি না জানা না-জানার কোনও প্রশ্নই ছিল না আমার কাছে।

আর একটা কথা। ভারতীয় দণ্ডবিধির আইনের শাস্তির দিক দিয়ে, ফাঁসী দেওয়াটা উঠে যাওয়া উচিত। এ মত আমি বরাবরই দৃঢ়ভাবে পোষণ করেছি। যে প্রাণ দেওয়ার শক্তি মানুষের নেই, সে প্রাণ নেওয়ার অধি-কারও মানুষের নেই, সে মানুষ বিচারাসনেই বসুন বা যেখানেই বসুন। তারপর মানুষের বিচারে কি ভুলত্রুটি হয় না? জগতের আইন আদালতের ইতিহাসে ত' দৃষ্টান্তের অভাব নেই যে ভুল বিচারে মানুষের শাস্তি হয়েছে, এমন কি ফাঁসী পর্যন্ত হয়েছে, পরে টের পাওয়া গিয়েছে মানুষটি নির্দোষ ছিল। এসব ক্ষেত্রে নির্দোষ লোককে ফাঁসী দেওয়ার মহাপাপের ভার বহন করবে কে? শুনতে পাই কারও কারও মত---ফাঁসী তুলে দিলে, সমাজে খুনের সংখ্যা আরও যাবে বেড়ে। এ যেন বেত না মারলে ছেলেরা লেখাপড়া শিখবে না---এই ধরণের যুক্তি। বেত না মেরেও যে ছেলেদের অন্য উপায়ে লেখাপড়া শেখান যায় এবং সেইভাবেই যে হয় লেখাপড়ার প্রতি অনুরাগে সত্যিকারের লেখা-পড়া শেখা---এ কথা ত' আজ জগতে সর্বত্র স্বীকৃত। সে কথা কি তাঁদের জানা নেই মানুষকে প্রাণে না মেরে তাকে যে অনেক ভাবে অনেক কঠোর শাস্তি দেওয়া যায়---এ ত' সকলেই জানেন এবং সে সব শাস্তির ভয় মানুষের মনে প্রাণ দেওয়ার ভয়ের চেয়ে কম নয়।

কথাটা আর একদিক দিয়েও একটু তলিয়ে ভেবে দেখা যায়। মানুষ ত' সবই মন্দ নয়---ভালয় মন্দয় মিশিয়েই ভগবান মানুষ তৈরী করেছেন। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে কিছু না-কিছু ভাল দিক থাকেই, তাকে যতই ঘৃণা পাপী মনে করি না কেন এবং এও দেখা গেছে অনেক সময়ে মনুষ্য-চরিত্রে ক্রমে ভাল দিকটা বড় হয়ে উঠেছে, মন্দ দিকটা পড়েছে চাপা। অনেক ভাল কাজ করেছে সে জীবনে---ঘটিয়েছে সমাজের অনেক মঙ্গল। তাই কোনও মানুষকে তার মন্দ কাজের জন্য, সে কাজ যতই ঘৃণ্য হোক প্রাণে মেরে ফেললে তার ভাল দিকটা ফুটে ওঠার সুযোগই দেওয়া হয় না। সেটা কি ভগবানের অভিপ্রেত? পাপকে ঘৃণা কর কিন্তু পাপীকে নয়, এই ত ভগবানের দূত গিয়ে-ছেন বলে।

খুন করলে ফাঁসী দেওয়াটা, আমার মনে হয় বর্বর যুগের সেই প্রথা---**Eye for an eye, tooth for a tooth.** (চোখের বদলে নিতে হবে চোখ দাঁতের বদলে দাঁত)। তারই এটা পরিচ্ছদে ঢাকা আধুনিক সংস্করণ।

আর একটা কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করি। অনেক মামলার বিবরণ লিখেছি এবং তার মধ্যে কথাবার্তাও অনেক সংযোজিত করা হয়েছে, বিশেষ করে জেরায়। বলা বাহুল্য কথাবার্তাগুলি ঠিক যথাযথভাবে যে সব কথা হয়েছিল, তা নয়, কেন না এতদিন পরে সে সব ঠিক মনে রাখা সম্ভব নয়। তবে যতদূর মনে করতে পেরেছি, সেইসব কথাগুলির গতি এবং সারমর্ম ঠিক আছে।

॥ সমাপ্ত ॥

দন্ত-পুরাণ

গত দশকের গোড়ার দিকেই সরবরাহর জলে ফ্লুওরাইড্ মিশিয়ে দাঁতের ক্ষয় রোধ করার প্রথা বেশ সমর্থন পেয়েছে। এদেশে নয়, আমেরিকায়। ১৯৫১-র মাঝামাঝি নিরাশিটি অঞ্চলের জলে ফ্লুওরাইড্ মেশান হত, অন্য পচানব্বইটি অঞ্চলের জলে মেশানর অনুমতি তখনই দেওয়া হয়েছিল। প্রথম ক্ষেত্রে সতের লক্ষ এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ষাট লক্ষ লোকের বাস। তখনই অধিকাংশ অঞ্চলের একটা সমস্যা ছিল জলে ফ্লুওরাইড্ মেশান হবে কি না।

জনসাধারণের ব্যবহার্য জলে ফ্লুওরাইড্ মেশানোর উৎসাহ অকারণ বা অহেতুক নয়। অসংখ্য ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে যথোপযুক্ত স্বাভাবিক ফ্লুওরাইড্‌যুক্ত জল ব্যবহারে শতকরা পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ দাঁতের গোলযোগ কমে যায়। মনে হয় এতদিনে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে যে এই মিশ্রিত জল দাঁত বা হাড়ের পক্ষে ক্ষতিকর নয়, এবং পানীয়, খাদ্য তৈরী, ধাতুর কাজ বা রাসায়নিক প্রস্তুতিতেও এর ব্যবহার ক্ষতিকর নয় আদৌ।

কিন্তু এর বিরুদ্ধে যুক্তিগুলোও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। অসংখ্য কূপ ইত্যাদি থেকে জল তোলার সময় প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে উপযুক্ত ফ্লুওরাইড্‌করণ পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন। এতে খরচ খুব বেশী, হিসেব করে দেখা গেছে প্রতিটি সরবরাহ কেন্দ্রে যন্ত্রপাতি ইত্যাদির খরচা পড়ে হাজার ডলার থেকে পনের হাজার ডলার। বেশীটাই খরচ হয় সাধারণত।

সম্ভবত এহ বাহ্য। কেন না, ফ্লুওরাইড্ সরবরাহ খুবই সীমিত। যদি বড় বড় শহরগুলো এর ব্যবহার সুরু করে তা হ'লে এর সরবরাহ নির্দিষ্ট করে দেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

আর একটি যুক্তি এই যে, বাচ্চারা অল্প পরিমাণ জল ব্যবহার করে—কেবলমাত্র ওদের ক্ষেত্রেই এ বস্তুটি সুবিধাজনক। শিশুদের দাঁতের ওপর ফ্লুওরাইড-এর সত্যিকার প্রভাব বর্তমান। এখন কোন সহরে যদি শতকরা জন তিরিশ শিশু থাকে, তা হ'লে বিপুল পরিমাণ খরচ করে কতটুকু লাভ? অধিকাংশ জলই নষ্ট; এমন কি গাড়ি ধোয়া, বাগানে জল দেওয়া ইত্যাদিও এই জলেই হবে তা ভুললে চলে না।

তৃতীয় আপত্তি কোন কোন ধর্মীয় দল থেকে, তারা পাইকিরি হারে ডাক্তারী অপছন্দ করেন।

তাড়াহুড়োয় রাতারাতি সব জলে ফ্লুওরাইড্ মেশানোর ব্যাপারে সাবধান হওয়ার অন্য কারণও আছে: বাচ্চারা অনিয়মিতভাবে অনির্দিষ্ট পরিমাণে জল ব্যবহার করে। জল খাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে একটি শিশু

দন্তবিদ

অন্য একটির চেয়ে পৃথক, আবার কোন একটি শিশু প্রতিদিন বা সব ঋতুতেও যে সমপরিমাণ জল ব্যবহার করে না, তা কোন বাপ-মারই অজানা নয়। জলের প্রয়োজন খাদ্যের জলীয় অংশ বা জলীয় খাদ্য, বিশেষত দুধ দিয়ে অনেকখানি মিটে যায়।

এখন যদি সর্বসাধারণের জলে ফ্লুওরাইড না মেশানর যুক্তি থাকে, তবে অসুবিধে বাদ দিয়ে ওর সুবিধেগুলো পাওয়া যাবে কেমন করে?

ফ্লুওরাইড মেশান টুথপেস্ট বাজারে চার্‌দি-ডলার মুনাফা লাভ 'বিনাকা' ছেড়েছে, পূর্বে। ১৮৯৪-তে বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও তা পৌঁছেছে অবশ্য দু' চারজনের ঘরে। চিউয়িং গাম বা নুনে ফ্লুওরাইড্ মেশান বিশেষ কার্যকর নয়। কাজেই, বাকী রইল খাদ্য আর দুধ।

সামুদ্রিক খাদ্য আর চা বাদে অধিকাংশ খাদ্যেই ০'২ থেকে ০'৩ ভাগ (প্রতি দশ লক্ষে) অথবা সামান্য কম ফ্লুওরাইড্ বর্তমান। চায়ের পাতায় এর পরিমাণ খুব বেশী, সামুদ্রিক খাদ্যেও। চায়ের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ বা তারও বেশী পরিমাণ ফ্লুওরাইড ফুটন্ত জলে নিষ্কাশিত হয়ে যায়। দুর্ভাগ্যক্রমে বছর আটেকের কম বয়সী ছেলেমেয়েরা খুব কম ক্ষেত্রেই চা পান করে, সামুদ্রিক খাদ্যও তাদের খাওয়া হয় না।

মাটিতে বা জলে ক্যালসিয়াম ফ্লুওরাইড্ মিশিয়ে শাকসব্জী, ফলমূল এবং শস্যের ফ্লুওরাইড-এর পরিমাণ বাড়ানর চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু ফলাফল থেকে জানা গেছে মাটির ফ্লুওরাইড্-এর পরিমাণ পাতা, ফল ইত্যাদির অতি সামান্য প্রভাব বিস্তারক্ষম। সুতরাং ফ্লুওরাইড সমন্বিত নুন মিশিয়ে ছাড়া অন্য ভাবে খাদ্য-দ্রব্যে ওর পরিমাণ বাড়ানর কোন বিশেষ উপায় নেই।

গরুর খাদ্যে ফ্লুওরাইড্ মিশিয়ে দুধে ওর পরিমাণ বাড়ান যায় না। কাজেই দোয়ান দুধে কৃত্রিম উপায়ে ওটা মেশানর উপায় গভীরভাবে চিন্তনীয়।

দন্তক্ষয় রোধে কার্যকর হওয়ার জন্য ফ্লুওরাইড্ হজম হয়ে রক্তস্রোতে মিশে যাওয়া দরকার। এক থেকে দশ বছর বয়স্ক শিশুদের নিয়মিত ফ্লুওরাইড্ মেশান জল এবং

...এর কাছে। ...ও, এবং এমনভাবে ...শালাম, "শেষ, যাতে করে তা সহজেই ...না একটু... করা সম্ভব হয়।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, সোডিয়াম ফ্লুওরাইড্ বা ক্যালসিয়াম্ ফ্লুওরাইড্ দুধে মেশালে তা জলে মেশান ফ্লুওরাইড্-এর মত হজম হয়ে যায়। শিশুদের দুধ খাওয়া বয়স, লিংগ, ঋতু ইত্যাদির পরিবর্তনে ততটা পৃথক হয় না, যতটা হয় জলের ক্ষেত্রে। এ দেশে দুধ জোটে নগণ্যসংখ্যক খোকাখুকুর বরাতে। যাদের জোটে, তাদের খাওয়ার পরিমাণে সাধারণত খুব একটা এদিক ওদিক হয় না। আমেরিকায় গড়ে বাচ্চারা দেড় পাঁইট আন্দাজ দুধ খায়।

ডেয়ারী গবেষকেরা এবং জৈব-রসায়নবিদরা বলেন সোডিয়াম ফ্লুওরাইড্ ০'৮ থেকে ১'০ অংশ (প্রতি দশ লক্ষ ভাগে) মেশালে দুধের স্বাদ, পুষ্টিক্ষমতা বা হজমী শক্তি পাল্টায় না।

এ ব্যাপারে খরচ সামান্য হওয়ায় ডেয়ারীগুলো অন্যান্য পাঁচটা রুটিন মাফিক খরচের মধ্যে এটাও অনায়াসে ধরে নিতে পারে। এমন কি, এর ফলে যদি সামান্য দাম বেড়েও যায়, তা হ'লেও বাপ-মায়েরা খুশী মনেই তা দেবেন বলে মনে হয়। চিন্তা করবেন এর ফলে দাঁতের পেছনে অনেকটা খরচ কমবে।

সাধারণ মানুষ যে এতে আপত্তি জানাবেন তা ভাবার কোন কারণ নেই, বিশেষত ফ্লুওরাইড্ মিশ্রিত দুধ কেনা নির্ভর করবে ক্রেতার ইচ্ছের ওপর। বিজ্ঞাপনে বলা যাবে বাচ্চাদের জন্য ফ্লুওরাইড্ মেশান দুধ যেমন পাওয়া যায়, বড়দের জন্য বিশুদ্ধ দুধও ঠিক তেমনি পাওয়া যাচ্ছে। যারা নিছক দুধই চান, ছোটদের জন্যও, তাঁদের জন্য খাঁটি দুধ সর্বদাই পাওয়া যাচ্ছে।

আর পাঁচটা প্রথম চালু হওয়া জিনিসের মত এ ক্ষেত্রেও অভ্যাস সংস্কার ইত্যাদির বাধা আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়, কিন্তু কালে, যদি এ বস্তু সত্যিই উপকারী হয়, এর গুণপনা নিশ্চয়ই স্বীকৃতিধন্য হবে তা নির্দ্বিধায় বলা চলে।

॥ প্রাজ্ঞগণের মহাযাত্রা ॥

(T. S. Eliot : "Journey of the Magi")

"আমাদের আসতে হয়েছে খুবই ঠান্ডার মধ্যে দিয়ে—
ভ্রমণের পক্ষে সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাল বছরের এই সময়টা;
বিশেষ ক'রে যাত্রা যেখানে এত সুদীর্ঘ—
পথ দুর্গম, চাবুক-মারা আবহাওয়া, আর এই ভরা শীত।"
ফোস্কা-পড়া ক্ষতবিক্ষত পা নিয়ে দুঃশাসন ঘোড়াগুলো
গলন্ত বরফে শুয়ে পড়ে।
অতীতের সেই স্থান-কালের জন্যে আমাদের খেদঃ
উপত্যকা, অধিত্যকা, চড়াই, উৎরাই, গ্রীষ্মময় প্রাসাদসমূহ,
আর সেই সোনার মেয়েদের শরবৎ নিয়ে আসা—!
তারপর উটচালকদের সেই গজগজানি, অভিসম্পাতদান,
তাদের সেই পালিয়ে যাওয়া, তাদের সুরা-নারী-স্পৃহা,
আর সেই আলেয়ার ছলনা, আশ্রয়ের সেই অভাব,
এবং সেইসব মুখ-ফিরিয়ে-থাকা অমিত্র শহর, আর
সেই নোংরা গ্রামগুলি, যেখানে কিছু পেতে হলে
দিতে হয় চড়া দাম;—
কী কষ্টেই না এই ক'টা দিন কেটেছে!
শেষ দফায় আমরা স্থির করলাম, সারারাত ধরে চলব;
ঘুমোতে হয় তো একঝোঁকের বেশি নয়।
এদিকে কানের কাছে সুরে সুরে কান্না যেন বলছে—
এসব সমস্তই মূর্খতা।

এরপর ভোরের সংগে সংগে আমরা নেমে এলাম
তুষার-রেখার নীচে
মোলায়েম, আর্দ্র, উদ্ভিজ্জগন্ধী একটি উপত্যকায়।
একটি তটিনী আর একটি জল-কল অন্ধকারকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে,
ভারাক্রান্ত আকাশে তিনটি গাছ—
একটা বুড়ো শাদা ঘোড়া উল্লম্ফনে মাঠ পেরিয়ে গেল।
তারপর আমরা এলাম লতামণ্ডিত এক সরাইখানায়।
সেখানে বিবিধ দৈহিক কসরতের সংগে
জুয়া খেলছিল ছ'টি মানুষ। কিন্তু সেখানে
পাওয়া গেল না খোঁজখবর কোন; অগত্যা ফের
যাত্রা শুরু; এবং খুঁজতে খুঁজতে শেষে সন্ধ্যেবেলায়
উদ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছনো গেল। তখন প্রাণের শান্তি।

এসব ঘটেছিল বহুদিন আগে, মনে পড়ে,-
এর পুনরাবৃত্তি করবার ইচ্ছে থাকলেও
থেমে গেলাম, থমকে গেলাম, এই চিন্তায়ঃ
সেদিন আমরা অত পথ পাড়ি দিয়েছিলাম
একটি মহাজন্মের, নাকি এক মহামরণের জন্যে?
মহাজন্ম এক ঘটেছিল সুনিশ্চিত,
কোনও সন্দেহ নেই। প্রমাণও ছিল তার।
জন্মও দেখেছি আমি, মৃত্যুও, কিন্তু
দুইকে তফাৎ ক'রে।
এ-মহাজনম আমাদের পক্ষে বড় কঠিন, যাতনাকর,
যেমন এ-মহামরণ, যেমন আমাদের মরণ।
আমরা ফিরে গেলাম নিজ নিজ স্থানে
কিন্তু আগের মত স্বস্তি পেলাম না সেখানে;
মনে হল, ব্যবস্থাটা পুরোনো কিন্তু অবস্থাটা নতুন,
ঈশ্বরপরায়ণ এ-লোকগুলি যেন নেহাত অচেনা।
আরেকবার মরতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম।

[অনুবাদকঃ মলয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়]

দন্তমঞ্জনের প্রয়োজনীয়তা এ দেশে হাজার হাজার বছর ধরিয়া স্বীকৃত। দাঁতের যে বিশেষ যত্ন লওয়া উচিত সে সম্বন্ধে প্রাচীনরা সম্যক অবহিত ছিলেন। কবিরাজী শাস্ত্রে দন্তরক্ষার বিবিধ উপায় বর্ণিত আছে নিপুণভাবে। বিভিন্ন গাছগাছড়ার ভস্ম প্রস্তুত করিয়া ঐগুলি পরিমাণমত মিশাইয়া দন্ত সেবার সুচারু আয়োজন এ দেশে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া প্রচলিত। এখনও এ জাতীয় দন্তমঞ্জন সহজলভ্য। ইহা ব্যতীত নিম, আশশ্যাওড়া ইত্যাদির ডাল, বিশেষত নিমের ডাল অতি উত্তম দন্তসংরক্ষক রূপে এ দেশে আজও প্রচলিত। কেবল দাঁত ও মাড়ি সুস্থ রাখাই নয়, সামগ্রিকভাবে দেহ সুস্থ রাখার ব্যাপারেও নিমের খ্যাতি আছে। নিম হইতে প্রস্তুত টুথপেস্টও এখন সহজলভ্য। দেশীয় গাছগাছড়া হইতে আয়ুর্বেদীয় মতে তৈরি মাজনও পাওয়া যায়। প্রকৃতপক্ষে ভারতের মত

যেখানে মাথাপিছু রোজগার টাকার অঙ্কে দেখলে ঘুম নষ্ট হইবার উপক্রম হয়, সেখানে ইত্যাকার জিনিস বিলাস দ্রব্য হিসাবে বিবেচিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। নুন বা অগ্নিভস্মই অধিকাংশক্ষেত্রে আজও একমাত্র দন্তমঞ্জন।

প্রাচীন গ্রীসেও গন্ধসার, রুজ্ এবং বন্ধবন্ধনীর সহিত দন্তমঞ্জনের প্রচলন ছিল। দুই হাজার বছর আগে জনৈক গ্রীক চিকিৎসক মাজন তৈরির সূত্র পদ্যাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীন মিশরেও ইহার প্রচলন ছিল। অধুনা ইহার বহুল প্রচলন বিশ্বের সর্বত্র—এশিয়া, ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা এবং আমেরিকায়। অন্যান্য বহু জিনিসের মত ইহার আবিষ্কার আমেরিকায় হয় নাই, কিন্তু ঐ দেশে আজ ইহা সর্বাধিক প্রচলিত। বছরে আট কোটি ডলার এই উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হয়। অন্য কোনও দেশে ব্যয়ের এই বিপুলতা অচিন্তনীয়। ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে শুধু দন্তমঞ্জনের বিজ্ঞাপন দিতেই ব্যয়িত হয় ১৬,০০০,০০০ ডলার। প্রায় অবিশ্বাস্য ঘটনা। কিন্তু ঐ দেশে ইহা কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা নহে।

জর্জ ওয়াশিংটনের দন্ত-চিকিৎসক তাহাকে একটুকরা মোটা কাপড়ের সাহায্যে খড়ি দিয়া দাঁত মাজিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কয়েক দশক পরে টুথব্রাশ-এর আবির্ভাব। কিন্তু উহার ব্যবহার কিছুদিন বিলাসিতার পর্যায়ভুক্ত হইয়া রহিল।

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ডবল্যু এইচ হল্ নামক জনৈক ঔষধ ব্যবসায়ী 'সোজো-

দন্তচিকিৎসক

ডোনট' নামে লাল রংয়ের তরল পদার্থ বিক্রয়ার্থ বাজারে ছাড়েন। শব্দটি গ্রীক শব্দে তৈরি, উহার অর্থ 'সুস্থ করা' এবং 'দাঁত'। বিজ্ঞাপনে বাজার মাত করিবার প্রথম প্রচেষ্টা হয় 'সোজোডোনট' দিয়া। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে একটি বিজ্ঞাপন ইহাকে বলা হইয়াছে—'সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক, কার্যকর এবং উপকারী বস্তু, পৃথিবী সব মঞ্জন হইতে ইহা অধিকতর সুফলপ্রদ।'

বিজ্ঞাপনে বিখ্যাত সাক্ষী সাবুদদের চিঠিপত্র ছাপাইয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রথাও হল চালু করেন। ন্যুইয়র্ক-এর পনের জন বিশিষ্ট ধর্মযাজকের সুপারিশ ছাপা হয় একটি বিজ্ঞাপনে, অন্যগুলিতে বিস্মার্ক-এর উক্তির উদ্ধৃতি ছিল, এমন কি 'হোয়াইট হাউস'-এ উহা ব্যবহৃত হওয়ার সংবাদও ছিল কোন কোন বিজ্ঞাপনে।
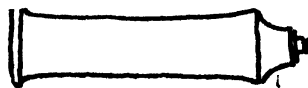
এক কোটি ডলার মুনাফা লাভ করেন হল্ মৃত্যুর পূর্বে। ১৮৯৪-তে তাঁহার মৃত্যু হয়। অবশ্য ততদিন পেস্ট এবং গুঁড়ি ইহার প্রভাব খর্ব করিতে সুরু করিয়াছিল। 'সোজোডোনট' ইহার ফলে আর কখনও জনপ্রিয় হইতে পারে নাই। একটি কাজ সে করিয়াছিল, উহার বিজ্ঞাপনের ঘটায় মানুষ দাঁত মাজিতে অভ্যস্ত হয়।

ডাক্তার আই ডবল্যু লিয়ন-এর কাহিনী ইহার বিপরীত। ইনি ন্যুইয়র্ক-এ দন্ত-চিকিৎসা অধ্যয়ন করিয়া পঞ্চম দশকে ক্যালিফর্নিয়ায় ডাক্তারী করিতে যান। ১৮৬৬-তে ইনি ন্যুইয়র্ক এ ফিরিয়া আসেন।

আমেরিকার দন্তচিকিৎসক সমিতি তরল দন্তমঞ্জনের নিন্দা করিয়া গুঁড়া তৈরির সূত্র দিলে ডাঃ লিয়ন উহা লইয়া গবেষণা করিয়া 'লিয়ন'স টুথ ট্যাবলেট' উৎপাদন করেন। ইহা গুঁড়া মাজন জমাইয়া প্রস্তুত, পাতলা টুকরার আকারে পাওয়া যাইত, একটি টুকরো টুথব্রাশ-এর উপর রাখিয়া দাঁত পরিষ্কার করিতে হইত। সবুজ রংয়ের ছোট বোতলে টুথ পাউডার ডাঃ লিয়ন
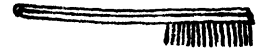
চালু করিলেন ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে। একদিন তাঁর মনে হইল এই গুঁড়া পাত্রে ভরিলে কেমন হয়? পাত্রে ভরিয়া তাঁহার 'telescopic measuring tube' সমেত দন্তমঞ্জন বাজারে বাহির হয় ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে।

ইনি সৎ চিকিৎসক ছিলেন। কোনও এক সাময়িকপত্রে ইনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, 'কোনও এক মাজন দাঁত উজ্জ্বল করিতে পারে বা উহার রং বদলাইয়া দিতে পারে বলা অর্থহীন—কেবল মাত্র এ্যাসিড-এর পক্ষে উহা সম্ভব।' ১৯০৭-এ ইনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ডাঃ লিয়ন-এর পুত্র দুই দশক ব্যবসা চালাইয়া অবশেষে উহার স্বত্ববিক্রয় করিয়া দেন। বিশ শতকের চতুর্থ

দশকেও তাঁহার মাজন সর্বাধিক বিক্রয় হইত।

গৃহযুদ্ধের পূর্বেও আমেরিকায় টুথপেস্ট বিক্রয় হইত। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে জন র‍্যানড শিল্পীদের জন্য 'collapsible' নল তৈরি করেন। ১৮৯২তে ডাঃ ডবল্যু শেফিল্ড প্রমুখ আমদানীকৃত নলে টুথপেস্ট ভরিবার চেষ্টা করেন। ফলে বিক্রয় এত দ্রুত বৃদ্ধি পাইল যে, তাঁহারা নল তৈরি করিবার উদ্দেশ্যে যন্ত্র ক্রয় করিলেন এবং কারখানা করিয়া অন্যান্যদের যোগান দেওয়ার বন্দোবস্ত করিলেন।

ফলে ইহা কার্যত টুথপেস্ট-এর ব্যবসায়ে পরিণত হইল। ১৯০০-র গোড়ার দিকে কলগেট বিজ্ঞাপন দেয় —'মালের উৎকর্ষ বিধান সম্ভব হয় নি, তাই নল উৎকৃষ্টতর করা হয়েছে।' আজ ওরা বিজ্ঞাপন দেয়—'মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে কলগেট ব্যবহার করলেই আপনি সারাদিন দন্তক্ষয়ও রোধ করতে পারবেন। কারণ একবার মাত্র কলগেট ডেণ্টাল ক্রীম দিয়ে দাঁত ব্রাশ করলেই দুর্গন্ধ ও ক্ষয়ের জন্য দায়ী বীজাণু শতকরা ৮৫ ভাগ দূর হয়ে যাবে। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ কলগেট সঙ্গে সঙ্গেই দূর করে দেয়, আর কলগেট দিয়ে দাঁত মাজলে যেমন নিশ্চিতভাবে যত লোকের দন্তক্ষয় রোধ করা যায়, অদ্যাবধি দন্তচিকিৎসার ইতিহাসে তেমন আর কখনো দেখা যায় নি। এ প্রমাণের গৌরব শুধু কলগেটই অর্জন করেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা সানন্দে কলগেট দিয়ে নিয়মিত দাঁত মাজার অভ্যেস করে নেয় কারণ ওদের মনের মত পিপারমেণ্টের সুস্বাদ অনেকক্ষণ মুখে লেগে থাকে। কলগেট দিয়ে নিয়মিত দাঁত মাজুন, নিঃশ্বাস নির্মল পরিচ্ছন্ন হবে আর দাঁত উজ্জ্বল সাদা হবে।'

ফরহান্স টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনও চমকদার। 'শেখার কি বয়স আছে?' জিজ্ঞাসা দিয়ে বিজ্ঞাপন সুরু হয়। ঐ কোম্পানী চং পাল্টাইয়া সাধারণ
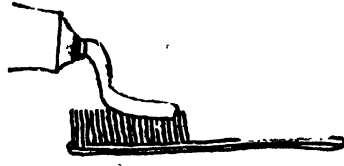
মানুষের অভিমত ছাপায় নিয়মিত, গণতন্ত্রের যুগে ইহাই বোধহয় বেশি কার্যকর। বিনাকা নিজেকে প্রত্যেক পরিবারের নিত্যসঙ্গী বলিয়া প্রচার করে। আর কলিন্স-এর উজ্জ্বল হাসির উজ্জ্বল বিজ্ঞাপনও উল্লেখযোগ্য। 'হলদে দাগটি কোথায় গেল? এ কী তাজ্জব বাত! পেপসোডেণ্টে মেজেছেন যে আপনার দাঁত। এই সুরেলা বিজ্ঞাপনও বেশ চটকদার। ইহা এ্যালবার্ট ল্যাস্কার এবং ক্লড হপকিন্স এই শতকের দ্বিতীয় দশকে আমেরিকার বাজারে ছাড়িয়া হৈ-হৈ তোলেন। তাঁহারা বলিতেন পেপ্সোডেন্ট সৌন্দর্যের স্রষ্টা। হপকিন্স তাহার বিজ্ঞাপন, 'অধিকতর সাফল্য, সুখ, সৌন্দর্য, উৎফুল্লতা'র জোরে দ্বিগুণ দামে ঐ টুথপেস্ট বাজারে বিক্রয় করিতে সমর্থ হন। পরে লিভার ভাইবর্গ উহা কিনিয়া লন। লিভার (হিন্দুস্থান) কোম্পানীর শেষ পেস্ট সিগন্যাল বর্তমান বাজার গরম করিয়া রাখিয়াছে। বিজ্ঞাপনটি সংযত কিন্তু আকর্ষণীয়—New! Striped toothpaste! Signal with germ fighting red stripes keeps your whole mouth clean—(1) Cleans your teeth (2) Cleans your breath. যেন, দন্তমঞ্জনের ইতিহাসে ইহাই প্রথম মুখ ও নিঃশ্বাস শুদ্ধ করার কৃতিত্ব লাভের যোগ্য! সম্প্রতি বিনাকা সর্বশেষ আবিষ্কার বলিয়া ফ্লুয়োরাইড সমন্বিত বাজারে ছাড়িয়াছে।

হৈ হৈ করিয়া বাজার মাৎ করার চেষ্টা কেবল পেস্ট-এর একচেটিয়া নয়। অথচ এত ঢাক-ঢোল পিটাইয়া যে প্রচার তাহার কাজ কি? দন্ত পরিষ্কার এবং দন্তক্ষয় রোধই নই নয়। অনেক দন্ত-চিকিৎসকের মতে নুন এবং সোডা পেস্ট-এর মত দাঁত পরিষ্কার এবং সুস্থ রাখিতে সক্ষম। আর, নিম ত' হাতের কাছেই রহিয়াছে। হাতে হাতে ব্রাশ এবং পেস্ট ঘোরে আজকাল। অপেক্ষায় আছি কবে বুড়িজের তিন-চতুর্থাংশ হাতার ন্যায় নুন-নিম ইত্যাদি পূর্ব গৌরব ফিরিয়া পাইবে।

জাপানী কবিতা অনুসরণে

বটকৃষ্ণ দে

[এক]

সূর্যাস্তের সিঁদুর ছটায়
সাগর করেছে স্নান—
শুভ্র একটি লিলি বুঝি দুলে নাচছে!
—না, না ওযে এক বিন্দু জাহাজ
ঢেউ-এর ডগায় ভাসছে!!

[দুই]

বসন্ত রাত্তির!
আহা সর্ সর্ কী নরম ঝিরিঝির
বৃষ্টির ঝরণা!
নীল আকাশ আর
তরুণী ধরণী স্থির
প্রেমালাপে মগ্ন,—তাই না

[তিন]

দ্যাখো পাম্পাস ঘাস,—
হাওয়ার
চুমোয়
দোলে!
কাঁপে থরো থরো
আবেগের অনুরাগে,—
আমারি মনের মতো কী সে সংরাগে!

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ নানা আকার প্রকারের সমবায়। সুতরাং প্রতিটি মানুষই অন্যান্যর সঙ্গে যেমন মিল খুঁজে পান, তেমনি গরমিলটিকেও উপেক্ষা করতে পারেন না। মনের গঠন, অভ্যাস, রুচিবোধ ইত্যাদির ওপর নির্ভরশীল মিল এবং গরমিলজনিত সুবিধা-অসুবিধা। সাধারণভাবে ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি পারস্পরিক সমঝোতায় মানিয়ে যায়, কিন্তু বোঝাবঝির অভাব ঘটলে মনের ওপর মারাত্মক চাপ পড়ে, ফল যে সুখদ হয় না তা সহজ অনুমান-সাপেক্ষ। মানসিক ভারসাম্য সকলেরই অল্পবিস্তর এদিক-ওদিক, তবুও সকলের বলেই তা মানিয়ে যায়। দুর্ঘটনাক্রমে এই সমতা হারিয়ে গেলে অশান্তি ঘনীভূত হয়ে ওঠে।

কিন্তু শুধু মনের ওপরই নয়, সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম আমাদের দেহেও নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তা দেখান সম্ভব। পরিবেশ যদি অত্যধিক দাবী করে বসে, তা হ'লে বুঝতে হবে আমরা কিছু পরিমাণে মানিয়ে নিতে অক্ষম।

আজকের পরিবেশে যন্ত্রপাতির স্থান সুনির্দিষ্ট এবং আমাদের কেউ কেউ হয়ত' শরীরগতভাবে যন্ত্রের উপস্থিতি মানিয়ে নিতে অপারগ। অনেক আগে, ১৯১৯-এ এই দেখান হয়েছিল কোন কোন মানুষ অন্যদের তুলনায় বেশীবার দুর্ঘটনা কবলিত হন। কারখানায় দুর্ঘটনা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে জানা গিয়েছিল যে, শতকরা আশী ভাগ ঘটেছিল শতকরা কুড়ি ভাগ শ্রমিকের ক্ষেত্রে। অর্থাৎ ঐ শতকরা কুড়িজন বাদবাকীদের

সাবধানী

তুলনায় অনেক বেশী দুর্ঘটনার ফাঁদে জড়িয়ে পড়েন। নানা উপলক্ষে নানা ক্ষেত্রে এ ধরণের অনুসন্ধান হয়, এবং দেখা গেছে ওপরের হিসেব রাস্তার দুর্ঘটনা সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

যদি দুর্ঘটনার কারণ কোনও রোগই হয়, তা হ'লে তা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা প্রয়োজন; দেখা দরকার তা থামান যায় কি না, অন্তত তার ফলাফল যথাসম্ভব কমানো সম্ভব কি না। এই ইঙ্গিত যদি অবাস্তব মনে হয় তবে ভুলে গেলে চলে না যে মানুষ খুব বেশীদিন আগেও রোগ বীজাণুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিল না। মানুষের রোগ যে অদৃশ্য জীবন্ত প্রাণী সংঘটিত করে তা দুর্ঘটনা সংক্রান্ত রোগের ইঙ্গিত থেকে কম অসম্ভাব্য মনে হয় নি এককালে; কেউ কেউ বেশী দুর্ঘটনায় জড়িয়ে পড়েন, অন্যরা নন এবং তার মূলে হয়ত কোন রোগ থাকতে পারে। এ ধরণের চিন্তা নিছক কল্পনা মনে হয় কি?

১৯৩৬-এ এক মেডিক্যাল গবেষণা পরিষদ চিন্তা ও কাজের মধ্যে ধীরলয় সম্পন্ন সহযোগিতা এর জন্য দায়ী কি না জানার জন্য প্রতিক্রিয়ার সময়-মাত্রা যাচিয়ে দেখেছিলেন—এ চিন্তার স্বপক্ষে সমর্থন মেলেনি ১৯৩৯-এ একদল বাস-চালককে পরীক্ষা করে দেখা যায়, কিছু কিছু মনস্তাত্ত্বিক পরীক্ষা চালানোয় তাদের অক্ষমতা বহু-সংখ্যক দুর্ঘটনার সঙ্গে জড়িত। আরও দেখা গিয়েছিল যে, যেসব চালক প্রথম বছরে বহু দুর্ঘটনা বাধিয়েছিল তাদের সেই প্রবণতা পরবর্তীকালেও অক্ষুণ্ন ছিল। তাই বলা হ'ল যে, চালকদের প্রথম বছরের দুর্ঘটনার খতিয়ান নিলেই তাদের দুর্ঘটনা প্রবণতা সম্বন্ধে হদিশ মিলবে এবং এই প্রবণতা মাত্রাধিক হ'লে অন্য কাজ দেওয়া যেতে পারে তাদের

এ সমস্ত অনুসন্ধান থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, কোন কোন লোক অন্যান্যদের তুলনায় অধিকতর দুর্ঘটনা-প্রবণ। সত্যি বলতে কি, শতকরা আশীভাগ দুর্ঘটনায় তারাই জড়িত, কি ঘরে, কারখানায়, আর কি রাস্তায়। এখন যতটা জানা গেছে তার ভিত্তিতে সমাজের ওপর এ সবের প্রতিক্রিয়া যতটা সম্ভব সীমিত করার জন্য কী করা যায়? সমস্যাটার তাল ধরা যায় দু'দিক দিয়ে—যারা দুর্ঘটনা-প্রবণ তাদের এমন কাজে ভিড়তে না দেওয়া যে কাজ তার নিজের এবং অপর লোকের পক্ষে বিপজ্জনক এবং এ জাতের মানিয়ে নেওয়ার রোগের গোড়া মেরে দেওয়া।

প্রথমোক্ত উপায় কাজে লাগান অপেক্ষাকৃত সহজ। যেমন, চালকদের প্রথম বছরের কাজের হিসেব মেলালেই ধরা পড়বে কে বা কারা দুর্ঘটনা-প্রবণ।

যাঁরা মোটর হাঁকিয়ে দৌড়ে বেড়ান যত্রতত্র তাঁদের মধ্যে দুর্ঘটনা-প্রবণদের অনায়াসেই চালকের আসনচ্যুত করা যায়—যদি বীমা কোম্পানী সব মোটর-মালিকদের প্রথম বছরে কৃত দুর্ঘটনার খতিয়ানের ওপর সাবধানে চোখ বোলান।

দ্বিতীয় পন্থাটি দুরূহতর। কোন মানুষকে কি দুর্ঘটনা-প্রবণ না হ'তে দেওয়া সম্ভব? এক থেকে পনের বছরের খোকাখুকুদের পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তাদের মধ্যে যারা দুর্ঘটনা-প্রবণতায় ভোগে তার শতকরা পঁচাশী ভাগ ক্ষেত্রেই দায়ী তাদের অযোগ্য বাপ-মা। তাদের মনে হয়েছিল স্বগৃহে তারা অবাঞ্ছিত এবং তারা কেবল বাপ-মায়ের অসন্তুষ্টিই কারণ। দুর্ঘটনা তাদের প্রাপ্য বলেই ছিল তাদের ধারণা। কাজেই পারিবারিক জীবন এ ধরণের মানিয়ে নেওয়া রোগের সঙ্গে জড়িত। পারিবারিক সম্পর্কঘটিত মুস্কিল আসানের কাজ এ প্রবন্ধের নয়, তবে এইসব তথ্য পরিষ্কারভাবে বুঝতে সাহায্য করে কত দুরূহ এ জাতের রোগের কারণ নাশ করা। সহনশীলতা, সহৃদয়তা ইত্যাদি পুরনো শব্দগুলো এসব ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর।

ডক্টর শামুয়েল জনসন

এই সংখ্যায়

প্রকাশিত

ডক্টর জনসন

সম্পর্কে

রচনাটি মাসিক বসুমতীর

কিশোর-কিশোরী পাঠক

পাঠিকারাও পড়লে যথেষ্ট

জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারবে।

এলো অমাবস্যার রাত্রি

(কিশোর উপন্যাস)

শ্রীধীরেন্দ্রলাল ধর
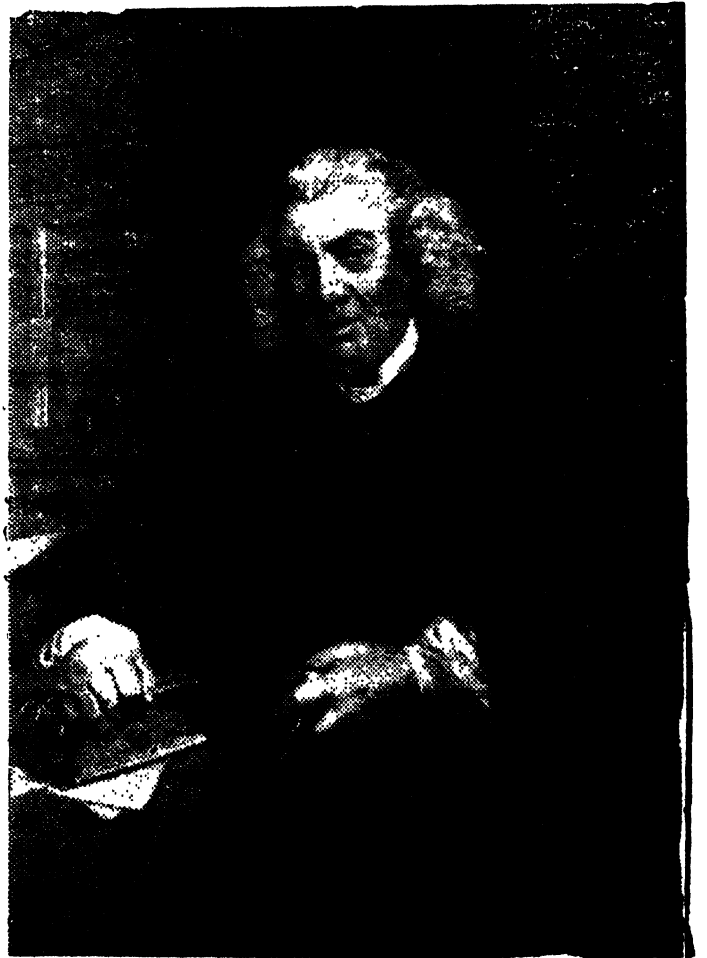
একশো বছর আগের কথা। ভারতভূমিতে তখন ব্যাপক অরাজকতা, মোগল বাদশাহের রাজত্ব শেষ হয়েছে। তৈমুরের বংশধর আবুল মুজাফর সুরাজউদ্দীন মুহম্মদ বাহাদুর শা বাদশা-ই গাজী ইংরেজের বন্দী হয়েছেন। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই যুদ্ধে নিহত হয়েছেন, তাঁতিয়া টোপী ও নানা সাহেবের খবর নেই। নেতৃত্বহীন সিপাহীদের শায়েস্তা করছে ইংরাজ সেনানায়ক ও শাসনকর্তারা। অমৃতশহরের ডেপুটি কমিশনার ফ্রেডারিক কুপার একদিনে দুশো সাঁইত্রিশ জনকে গুলী করে মারল, আর পঁয়তাল্লিশজনকে এমন একটা ছোট ঘরে বন্ধ করে রাখলো, যে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তারা দম বন্ধ হয়ে মারা গেল। এই অন্ধকূপ হত্যা করে কুপার খুশি হয়ে বললেন—'ইংরেজের দয়া-দাক্ষিণ্য দেখে এ দেশের মানুষ বড় তুষ্ট হয়েছে।'

কর্নেল নীল বারাণসীর গ্রামে গ্রামে গোরা সৈন্য ছেড়ে দিয়েছে, তারা যাকে সামনে পাচ্ছে তাকেই সিপাহী বলে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিচ্ছে। ছোট ছোট বালকেরাও বাদ যাচ্ছে না। কাশী থেকে প্রয়াগের পথে দু'সারি গাছের ডালে ডালে শুধু মৃতদেহ ঝুলছে।—বালক বৃদ্ধ নারী কেউ বাদ নেই। হাজার বছর আগের তৈমুর ও চেঙ্গিজের প্রেতাত্মা নতুনরূপে বুঝি এবার হিন্দুস্থানে আবির্ভূত হয়েছে। রাজ্যলোভ মানুষকে কতটা নির্মম করে তুলতে পারে, বৃটিশ সাহেবরা তার আদর্শ সৃষ্টি করছে। মৃত্যুর কালোছায়া দেশের আকাশ ঢেকে দিয়েছে, সারা দেশ থম থম করছে।

এমন দিনে ঘর ছেড়ে বেরুনো নিরাপদ নয়, যে পথে বেরুলো সে যে আবার ঘরে ফিরবে এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। তবু মানুষ পথ চলে। তবে প্রশস্ত রাজপথের চেয়ে এখন জলা-জংলা মেঠো পথই পথচারীরা বেছে নিয়েছে। উত্তর বিহারের যে বনভূমি ছড়িয়ে আছে উত্তর প্রদেশের পশ্চিম প্রান্ত অবধি, হিমালয়ের নিম্নভূমি থেকে নদীর জল ধারার মত এই সবুজ পাতার সমারোহ নেমে এসেছে, সমতল ভূমিতে। সর্প-শ্বাপদসঙ্কুল ঘনসন্নিবিষ্ট দুর্ভেদ্য এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে সঙ্কীর্ণ পায়ে চলা পথ ধূসর রেখার মত এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে। বিশেষ প্রয়োজন না ঘটলে সে পথে মানুষ চলে না, আর যদি বা চলে কখনও একা যায় না। আজ সেই পথ দিয়ে চলেছিল এক প্রৌঢ় এক বালকের হাত ধরে।

পথিকের আধময়লা গ্রাম্য বেশ, কিন্তু দীর্ঘ বলিষ্ঠ গৌর দেহ দেখলে মনে হয় পথিক কোন সম্ভ্রান্ত বংশের মানুষ। ছেলেটিও সাধারণ ধুলো-মাখা গাঁয়ের ছেলে নয়। এভাবে পথ চলতে সে অভ্যস্ত নয়, বার বার সে হোঁচট খাচ্ছে, প্রৌঢ় শক্ত করে তার হাত ধরে আছে। ঠোক্কর খেলেও বালক পড়ে যাচ্ছে না। বালক একবার করে ঠোক্কর খাচ্ছে আর প্রৌঢ় বলছেন—দেখে চল। দেখে চল।

বালক দেখেই চলছে, তবে পথ নয় হলুদ ফুল আর প্রজাপতির রঙের খেলা। বনের সেই দিকটা হলুদ ফুলে ভরে গেছে, দুপাশে পায়ের গোড়ায় ছোট ছোট হলুদ রঙের মুক্তো যেন কেউ ছড়িয়ে দিয়েছে সবুজ রঙের মাঝে। সাদা কালো লাল রঙের চিত্র বিচিত্র ডানা মেলে প্রজাপতির দল ঘুরছে সেই ফুলের মাঝে। গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে নেমে এসেছে রোদের ঝিকিমিকি সেই রোদের ঝলমলানিতে কখন কখন প্রজাপতির ডানার রঙ হীরে-চুণীর মত ঝলমল করে উঠছে, ছেলেটির চোখ পড়ে আছে সেই দিকে, বন্ধুর অসমতল পথের বাধার দিকে নজর নেই।

বালক তাড়াতাড়ি চলতে পারছিল না প্রৌঢ় সেজন্যে ধীরে ধীরে হাঁটছিল। বেলা বেড়ে চলেছে। গাছের ফাঁকে সূর্য দেখা যায়, কিন্তু ছায়াচ্ছন্ন বনভূমিতে রোদের উত্তাপ অনুভূত হয় না।

একটি খাদের পাশ দিয়ে পথ ঘুরে গেছে। খাদের কোল ঘেঁষে হলুদ ফুলের আধিক্য যেন একটু বেশি। প্রজাপতির পাখনার ঝলমলানিও বুঝি বেড়েছে। বালক সেইদিকে তাকিয়ে একটা বড় রকমের হোঁচট খেল। প্রৌঢ় সামলে দিলেন। বালক বললো বাবা একটু বসো।

পিতা পুত্রের মুখের পানে তাকালেন তারপর সামনেই একটি গাছের নীচে বসলেন।

একদিকে খাদ, আরেক দিকে পাহাড়। পাহাড় আকাশের অর্ধেক আড়াল করে দিয়েছে। খাদের পানে তাকালে অনেক দূর অবধি চোখে পড়ে। গাছগুলো ক্রমেই ছোট হয়ে হয়ে মাঠের সঙ্গে যেন মিশিয়ে গেছে। কোথাও কোন মানুষের সাড়া নেই। পিতার পাশে বালক বসে বসে তাকিয়ে ছিল বিস্তীর্ণ উপত্যকার পানে। কোন এক সময় বললো—বাবা, আমরা কতদূর যাব?

প্রৌঢ় পুত্রের মুখের পানে তাকিয়ে

খানেক কি যেন ভাবলেন, তারপর বললেন—সন্ধ্যা বেলায় গাঁয়ে গিয়ে পৌঁছাবো।

—সেখানে ফিরিঙ্গীরা নেই?

—না, ফিরিঙ্গীরা এতো দূরে আসবে কেমন করে?

—ফিরিঙ্গীরা বড্ড পাজী, না বাবা? শুধু শুধু মানুষ খুন করে।

পিতা কিছু বলেন না, তাঁর মুখের রেখাগুলো কঠিন হয়ে ওঠে, বল্লমটার ধারালো ফলাটার পানে একবার তাকিয়ে দেখেন।

বালক বললো—বাবা, খিদে পেয়েছে।

—এখানে তো জল নেই বাবা, আরেকটু চল্, একটা ঝর্ণার ধারে বসে হাতমুখ ধুয়ে খাবো।

প্রৌঢ় এমনভাবে কথাগুলি বললেন যেন এপথ তাঁর পরিচিত।

কোন এক সময় প্রৌঢ় বললেন,—চল এবার উঠে পড়ি, তাড়াতাড়ি গাঁয়ে পৌঁছাতে হবে।

—এখনি?

—হ্যাঁ। ঝর্ণার ধারে গিয়ে খেয়ে দেয়ে খানিক জিরুবো, তখন ভালো লাগবে।

—ঝর্ণা কতদূরে বাবা?

—এইতো পাহাড়টা পার হলেই।

বালক উঠে দাঁড়ালো। বললো—বাবা, আর চলতে ইচ্ছা করছে না।

—কাঁধে উঠবি?

—না, তোমার কষ্ট হবে।

পুত্রের মুখের পানে তাকিয়ে পিতা হাসলেন। বললেন—এবার গাঁ থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে নোব, কি বলিস!

—তোমার কাছে যে টাকা নেই বললে।

কথাটা সত্যি। ফিরিঙ্গীদের হাতে ধরা পড়ার ভয়ে তিনি গৃহত্যাগ করেছেন, মধ্যরাত্রে এক বস্ত্রে আধঘুমন্ত পুত্রকে কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি গৃহত্যাগ করেছেন, তখন অর্থের কথা মেনে উঠেছিল কিন্তু নেবার অবকাশ ছিল না। পুত্র সে কথা জানে।

দুজনে এগিয়ে চললো। শুকনো পাতার উপর দুটি মানুষের পদক্ষেপের মৃদু খস খস্ শব্দ ছাড়া সেই বনভূমিতে আর কোন শব্দ নেই।

তিন চার দণ্ড চলার পর পাহাড় শেষ হলো, সূর্য মাথার উপর উঠলো। কিন্তু কোন ঝর্ণা তো দেখা গেল না।

বালক বললো—ঝর্ণা কোথায় বাবা?

পিতা সামনের পানে তাকিয়ে দেখলেন, তারপর বললেন—আরেকটু গেলেই পাওয়া যাবে।

—আমি আর চলতে পারছি না।

—বেশ তো, তোমায় কাঁধে তুলে নিচ্ছি।

পিতা অনায়াসে বালককে কাঁধে তুলে নিলেন। কাঁধে বসে বালক পিতার গলা জড়িয়ে ধরলেন। পিতা বললেন—তুমি আগে কাঁধে উঠলে আমরা এতক্ষণে অনেক দূর আগিয়ে যেতাম।

বালক বললো—এতো বড় বন, আমি কি জানি।

সত্যই বালক ইতিপূর্বে কখনো এমনভাবে বনপথে আসে নি

প্রৌঢ় দীর্ঘ পদক্ষেপে দ্রুত এগিয়ে চললেন।

কোন-এক সময় সামনে উপত্যকা-ভূমিতে একটা ক্ষীণ জলধারা যেন চোখে পড়লো, রোদ পড়ে গাছের ফাঁক দিয়ে ঝিক্‌মিক্ করছে। বালক বলে উঠলো—ওই যে বাবা, ঝর্ণা দেখা যাচ্ছে।

পিতাও দেখতে পেয়েছিলেন। কোন সাড়া না দিয়ে আরও দ্রুত এগিয়ে চললেন।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তারা ঝর্ণার সামনে এসে পড়লো।

পুত্রকে কাঁধ থেকে নামিয়ে পিতা জলের ধারে এগুতে যাচ্ছেন এমন সময় একটা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই একটা বরাহ তীরের মত ছুটে পাশ দিয়ে চলে গেল। বালক চমকে উঠে সভয়ে ডাকলো—বাবা।

পিতা পুত্রের পানে পিছন ফিরে তাকালেন। ঠিক সেই মুহূর্তে একটি চিতাবাঘ লাফিয়ে পড়লো প্রৌঢ়ের ঘাড়ে। বাঘটি বরাহটিকে তাড়া করে আসছিল।

প্রৌঢ় একঝটকায় বাঘটিকে কাঁধ থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করলো, কিন্তু পারলো না। বাঘ কাঁধে কামড়ে ধরেছিল। বল্লমটা হাতে ছিল, প্রৌঢ় আপ্রাণ শক্তিতে বল্লমটা বিঁধিয়ে দিল বাঘের বুকে। এবার বাঘ কামড় ছেড়ে মাটিতে পড়লো। প্রৌঢ় বল্লমসুদ্ধ বাঘটিকে গেঁথে ফেলল মাটিতে। আর তাকে উঠতে দিল না। বাঘ অনেক ছটফট করলো, কিন্তু প্রৌঢ় শক্তিমান, তার বল্লম এতটুকু কাঁপলো না।

চার পাঁচ মিনিটের মধ্যেই বাঘটি স্থির হয়ে গেল। প্রৌঢ় বল্লম খুলে নিলেন। তখন বাঘের কামড়ে তাঁর বাঁ কাঁধ থেকে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে।

বালক এতক্ষণ ভয়ে কাঁপছিল। প্রৌঢ় মাথা থেকে পাগ্‌ড়ি খুলে ছেলের হাতে দিলেন, বললেন—এখানটা শক্ত করে বাঁধো, রক্ত না ঝরে।

বালক পাগ্‌ড়ি দিয়ে পিতার ক্ষত-স্থানটা শক্ত করে বাঁধার চেষ্টা করলো। কিন্তু অপটু হাতে বাঁধা ভালো হলো না। তার উপর বাঘের কামড় তো সহজ ক্ষত নয়, বালক রক্তক্ষরণ একেবারে বন্ধ করতে পারলো না।

বাঁ হাতখানি অক্ষম হয়ে পড়েছিল, কিন্তু প্রৌঢ় সে কথা প্রকাশ করল না, ঝর্ণায় নেমে হাত ও মুখের রক্ত ধুয়ে নিল, আকণ্ঠ জলপান করলো, তারপর পুত্রের পানে তাকিয়ে সহজসুরে বললো—হাত-মুখ ধুয়ে নাও, আমরা এখানে খেয়ে নিই।

—না বাবা, আমি আর কিছু খাব না, তুমি চল, আগে বন পার হয়ে যাই।

—বেশ তো, কিছু না খাও হাত-মুখ ধুয়ে নাও, সন্ধ্যের আগে তো আর গাঁয়ে পৌঁছাবে না।

বালক এবার জলের ধারে এলো। হাতমুখ ধুয়ে সেও আকণ্ঠ জলপান করলো। পিতা বললেন—কিছু খাও!

—না বাবা, দেরি হয়ে যাবে, তুমি চল।

পিতা একখানি পাথরের উপর বসেছিলেন, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, বললেন—চলো।

ক্রোশখানেক গিয়ে পথটা সমতল ভূমিতে এসে পড়েছে। সেইটুকু আসতেই পিতা ক্লান্ত হয়ে পড়লেন, পা টলছে বলে মনে হলো, মাথার মধ্যে ঝিম্‌ঝিম্ করছে। এ কি অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের ফল? কাঁধের পাগ্‌ড়ির বাঁধনটা তো ভিজে গেছে।

হঠাৎ চোখ দুটি ধোঁয়া হয়ে গেল। প্রৌঢ় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

বালক পিতার মুখের পানে তাকাল।

প্রৌঢ় পরক্ষণেই বসে পড়লেন সেই পথের উপর।

বালক ব্যাকুলকণ্ঠে ডাকলো—বাবা! বাবা!

প্রৌঢ় কোন জবাব দিল না। ধীরে ধীরে পথের পাশেই শুয়ে পড়লেন। বালক ত্রস্তে পিতার মুখের উপর ঝুঁকে পড়লো, বললো—বাবা, অমন করছ কেন?

প্রৌঢ়ের কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

॥ দুই ॥

সূর্য অস্তাচলে ঢলে পড়েছে। নিথর ছায়া বনভূমির দিবালোক ম্লান করে তুলছে। গাছের মাথায় পাখীর ডাক শোনা যাচ্ছে। সুনীল আকাশে এবার সান্ধ্য রঙের খেলা সুরু হবে।

ত্রিশূল হাতে এক ভৈরবী চলছিল বনপথ ধরে। সন্ধ্যা সমাগমে কোন ব্যস্ততা ছিল না, নির্ভয় মন্থর পদক্ষেপে আনমনে চলছিল।

খাদের পাশ দিয়ে পথের বাঁক ফিরেই ভৈরবীর নজরে পড়লো—দুটি মানুষ পড়ে আছে পথের উপর। ওরা কারা?

ভৈরবী এগিয়ে এলো। পথের পাশে এক প্রৌঢ় পড়ে আছে, এক বালক তার বুকের উপর মাথা দিয়ে ঘুমুচ্ছে।

ভৈরবী বালকের গায় হাত দিল, ডাকলো—এ লেড়কা! এ বাচ্চু!

বালক চোখ মেললো। ভৈরবীকে দেখে ভালো করে সোজা হয়ে বসলো, বললো—কে? তুমি কে?

—ভয় নেই, আমি সন্ন্যাসিনী। তা তোমরা এই অবেলায় পথের ধারে পড়ে ঘুমুচ্ছো কেন? রাত হলে বন পার হবে কেমন করে?

—বাবার জন্য। বাবা—বাবা!

বালক পিতার গায়ে হাত দিয়ে ডাকলো। কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

ভৈরবীর কেমন যেন সন্দেহ হলো, শায়িত প্রৌঢ়ের কপালে হাত দিয়ে দেখলো, তারপর জিজ্ঞাসা করলো—কি হয়েছে তোমার বাবার?

—একটা বাঘ লাফিয়ে পড়েছিল, বাবার ঘাড়ের উপর, এই যে কামড়ে দিয়েছে কাঁধে।

ভৈরবী এবার ব্যাপারটা বুঝলো। বালকের হাত ধরে বললো—তুমি এসো আমার সঙ্গে।

বালক বললো—বাবা উঠক?

—তোমার বাবা এখন চলতে পারবেন না, আমরা গ্রামে গিয়ে ওঁর জন্য পাল্‌কি পাঠিয়ে দোব। তুমি আমার সঙ্গে চল।

—বাবা এখানে একা থাকবেন?

—যাবেন কি করে ওঁর তো কোন জ্ঞান নেই।

পিতা মারা গেছেন একথা বলতে ভৈরবীর কেমন যেন সঙ্কোচ হলো।

বালক বললো—আবার যদি বাঘ আসে?

—আর বাঘ কোথায়? একটা বাঘ ছিল, সে তো তোমার বাবা মেরে ফেলেছে।

—এই বনে আর বাঘ নেই?

—না, ওই একটাই এখানে ছিল।

—তুমি বাজে কথা বলছ।

—আমি ঠিক বলছি, এই বনের সব খবর আমি জানি।

—তুমি বুঝি এই বনেই থাকো?

—হ্যাঁ, বনের পাশে এক পাহাড়ে।

—তাহলে আর এখানে কোন ভয় নেই, না?

—না, বাঘ নেই তো ভয় কিসের।

—বাঘটা খুব জোরে কামড় দিয়েছিল বাবার কাঁধে। তা বাবাও ছাড়েনি, বল্লমের এক খোঁচায় একেবারে মাটিতে গেঁথে দিয়েছিল। বাবার সঙ্গে চালাকি। কত বড় বড় জোয়ান জোয়ান পালোয়ান বাবার একটা ধমক খেলে ভয়ে কাঁপতো। বাবা কি কম লোক নাকি!

—তোমার বাবা বুঝি খুব বড় পালোয়ান?

—বাবা বল্লম ছুঁড়লে একশো হাত দূরে গিয়ে বেঁধে, তলোয়ার ধরলে সব পালিয়ে যায়। বাবাকে সবাই ভয় করে।

—তোমাদের বাড়ী কোথায়? কোথা থেকে আসছো?

—সে আমি বলবো না, বাবা বারণ করে দিয়েছে। বাবা বলেছেন—কাউকে কিছু বলবিনে, সবাই আমাদের শত্রু, শুনলেই বিপদ হবে।

—আচ্ছা, বলতে হবে না, তোমার বাবার মুখ থেকেই আমি শুনবোখন পরে। তোমার নামটা কি বল?

—আমার নাম রামশঙ্কর চতুর্বেদী।

—তোমার বাবার নাম?

—পণ্ডিত মাধবরাম চতুর্বেদী। বাবা ছিলেন রাজপণ্ডিত।

—রাজপণ্ডিত? কোন্ রাজার পণ্ডিত?

—ওই যাঃ! ভুলে তোমাকে বলে ফেলেছি। বাবা কোন রাজার পণ্ডিত নয় গো, বাবা কিছু না, আমি ভুল বলেছি। বাবা শুধু মাধবরাম চতুর্বেদী।

—আর আমার কাছে লুকানো চলবে না, আমি জেনে ফেলেছি তোমার বাবা রাজপণ্ডিত।

—বলছি তো-না, ভুল বলেছি।

—আমি সন্ন্যাসী, আমাকে তোমার এতো ভয় কিসের? ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে এমন মিথ্যেবাদী ভীতু হলে কখনো চলে? লোকে বলবে কি?

—বল তাহলে তুমি আর কাউকে বলবে না? আর কেউ জানবে না।

তাহলে চুপি চুপি তোমার কানে কানে বলবো।

—কেউ জানবে না, তুমি বল।

ভৈরবী নত হয়ে কানটা রামশঙ্করের দিকে বাড়িয়ে দিল। রামশঙ্কর ফিস্ ফিস্ করে বললো—প্রয়াগে অহল্যাবাই দুর্গে আমরা থাকতাম, বাবা ছিলেন রাজপণ্ডিত। অযোধ্যার নবাব বাবাকে খুব ভালবাসতেন।

—তা তোমরা এখানে এই বনে এলে কেন?

—সে জান না বুঝি? ওই সব ফিরিঙ্গীরা এসেছে, কোম্পানী গো কোম্পানী! ওরা নবাবকে ধরে নিয়ে গেছে কলকাতায়, কত লোককে ফাঁসী দিয়েছে, বাড়ী ঘর লুঠ করেছে, গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। যারা পালিয়ে গেছে তারাই বেঁচে গেছে, আমরাও পালিয়ে এসেছি। ওরা বাবাকে ধরতে পারলে বাবাকেও ফাঁসী দিত।

—তা তোমার মা, ভাই বোন?

—মা স্বর্গে গেছেন, আমি তখন খুব ছোট। আর ভাই বোন আমার কেউ নেই, আমি একা।

—বুঝেছি। এসো। অন্ধকার হয়ে আসছে, এখনি আবার তোমার বাবার জন্য পাল্‌কি পাঠাতে হবে তো।

রামশঙ্করের হাত ধরে ভৈরবী অগ্রসর হলো।

কয়েক পদ গিয়ে বালক বললো—ঝুলিটা আনলে না? বাবেঃ! ওর মধ্যে যে আমার পোষাক আছে, পরবো কি?

প্রৌঢ়ের পাশে একটা ছোট ঝোলা পড়েছিল, ভৈরবী এসে সেটা তুলে নিয়ে গেল।

আকাশে চাঁদ ছিল, সন্ধ্যার অন্ধকার সেই বনভূমিকে জমাট করে তুলতে পারলো না। তবু গাছের নীচের অন্ধকার নেহাৎ কম জমলো না। অজানা পথিকের পক্ষে সেই আঁধারে পথ চলা সহজ হতো না, কিন্তু ভৈরবীর কাছে সে পথ পরিচিত। রামশঙ্করের হাত ধরে সে ধীরে ধীরে অগ্রসর হলো। কোন এক সময় সে রামশঙ্করকে জিজ্ঞাসা করলো—চলতে কষ্ট হচ্ছে, কোলে নোব?

অচেনা রমণীর কোলে চড়তে রামশঙ্করের সঙ্কোচ হলো, বললো—না, আমি তো ঠিক যাচ্ছি।

সন্ন্যাসিনী আর কিছু বললো না।

ক্রোশখানেক পথ এসে এক পাহাড়ের কোলে এসে তারা থামলো। সেখানে গাছপালা নেই, চাঁদের আলো স্পষ্ট হয়েছে। পরপর কয়েকখানি মাটির ঘর। একখানি ঘরের সামনে এসে সন্ন্যাসিনী দরজার ঝাঁপ খুললো, বললো—ভিতরে এসো।

—অন্ধকার যে?

—আলো জ্বালছি।

চক্‌মকি ঠুকে সন্ন্যাসিনী একটা পিদিম জ্বাললো। রামশঙ্কর চারিপাশে তাকিয়ে দেখলো—ছোট একখানি ঘর, ছোট্ট একটা জানলা, একপাশে খড় বিছানো, চাল থেকে একটি বাঁশ ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, তার উপর গেরুয়া কাপড় ও কম্বল ঝুলছে, এক কোণে একটা জলের কলসী আর, দুচারটে মাটির বাসন। সে বলে উঠল—ঘরখানা কি ছোট্ট, এইখানে তুমি থাকো বুঝি?

—হ্যাঁ। আজ থেকে তুমিও এখানে থাকবে।

—এই বনের মাঝে এখানে একা থাকতে তোমার ভয় করে না?

—না। সন্ন্যাসীর আবার ভয় কি? ভয় করলে আমি মা-কালীকে ডাকি, ভয় চলে যায়।

—তুমি মা কালীর পুজো কর? মা-কালীর ভয়ে বাঘ-ভাল্লুক তোমার কাছে আসে না।

—হ্যাঁ। মহামায়াকে সবাই তো ভয় করে।

—আমিও তাহলে মহামায়ার পুজো করবো।

—বেশ তো, আমার কাছে থাকবে, আমি তোমায় শিখিয়ে দোব।

—বাবা যদি তোমার মত পুজো করতে জানতো, তাহলে বাবাকে আজ বাঘে কামড়াতে পারতো না। তা তুমি বাবার জন্যে পাল্‌কী পাঠাবে না?

—এই যে এখনি গিয়ে খবর দিচ্ছি। তুমি একটু বসো, আমি বলে আসি।

—কতদূর যাবে?

—ওই তো সামনে। কোন ভয় নেই এই ঘরের চারিপাশে, মন্তর পড়ে গণ্ডী দেওয়া আছে।

সন্ন্যাসিনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রামশঙ্কর বাইরের অন্ধকারের পানে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল। বাইরে চাঁদের আলো আছে বটে, কিন্তু ভালোমত কিছুই দেখা যায় না। পাহাড়ের কালো পাথরগুলো সব আলোটাকে যেন আড়াল করে আছে। কোথাও মানুষ নেই, আলো নেই, শুধু গাছ আর গাছ, বন আর পাহাড়। এতো গাছ আর এতো পাথর কোথা থেকে আসে?

সারাদিনের পথ চলার ক্লান্তিতে দশ বছরের ছেলে ঢুলতে থাকে। সন্ন্যাসিনী বড্ড বেশি দেরি করছে, গেল কোথায়? ভাবতে ভাবতে কোন এক সময় রামশঙ্কর খড়ের উপরেই এলিয়ে পড়ে।

খানিক পরে সন্ন্যাসিনী যখন ফিরে এলো, রামশঙ্কর তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। পিদিমের আলোটা এসে পড়েছে রামশঙ্করের মুখের উপর। সন্ন্যাসিনী চুপ করে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল সেই মুখের পানে। এমনি আরেকখানি মুখ তার মনে ভেসে উঠলো, সন্ন্যাসিনী একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেললো। তারপর ধীরে ধীরে রামশঙ্করকে ধাক্কা দিয়ে ডাকলো—শঙ্কর ওঠো, খাবে না?

ঠিক সেই সময় ঘরের দরজায় আরেক সন্ন্যাসিনীকে দেখা গেল। সে প্রশ্ন করলো—ও কে রে দেবী?

সন্ন্যাসিনী পিছন ফিরে তাকালো, হেসে বললো—ছেলেটাকে কুড়িয়ে পেলাম বনের মাঝে।

তুইও শেষে গুরুমার কথায় ছেলে ধরা হলি? যাক্ ভৈরবী খুশি হবে।

—কি বলিস তার ঠিক নেই, দেখছিস না, বামুনের ছেলে, পৈতা হয়েছে।

—ভৈরবীর কাছে বামুন আর শূদ্দুর, একটা পেলেই হলো। আমি তো জানি। তুই না হয় নতুন এসেছিস, আমি আছি দশ বারো বছর।

কয়েক মিনিট দেবী সঙ্গিনীর মুখের পানে তাকিয়ে রইল। তার মুখে একটা দুর্ভাবনার ছায়া পড়লো। তারপর বললো—এ কখনো হতে পারে না, নিশি।

দ্বিতীয়া সন্ন্যাসিনী হাসলো, বললো—এখানে সব কিছুই হতে পারে, আর হ'লে রুখবে কে?

ইতি মধ্যে রামশঙ্কর দেবীর ঝাঁকানিতে চোখ মেললো। এদের মুখের পানে তাকিয়ে বললো—বাবা? বাবা কোথায়?

নিশি কি বলতে যাচ্ছিল, দেবী তাকে হাত নেড়ে থামিয়ে দিলো। [ক্রমশ।

আঙুলের কারসাজি ও ছায়াবাজি

শ্রীবিদ্যাবাগীশ কারফর্মা

আঙুলের কারসাজিতে ছায়ার সাহায্যে নানারকম জীবজন্তু ও জিনিস সৃষ্টি করে এড্‌ওয়ার্ড ভিক্টর পৃথিবী-বিখ্যাত হয়েছেন। আশ্চর্য তাঁর দুটি হাত আর সেই হাতে আঙুলের খেলা। এই আঙুলের সাহায্যে ছায়া ফেলে তিনি করতে পারেন না এমন জিনিস নেই। একে বলে 'শ্যাডো'-গ্রাফি'।

পঁচিশ বছর ধরে নানাভাবে পরীক্ষা চালিয়ে, চৌষট্টি বছর বয়সে এসে পদার্পণ করেছেন এড্‌ওয়ার্ড ভিক্টর। এই কাজে তাঁর আঙুল-গুলি এমনই তৈরী হয়ে গেছে যে, মাত্র কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তিনি একটি জিনিস থেকে আর একটি জিনিস তৈরি করে ফেলতে পারেন। এই কাজের জন্যে অনেক সময় সামান্য দু'চারটি জিনিস, যেমন একটি রুমাল, কিছুটা ফিতে, কয়েকটা কাগজ, একটা সিগার পাইপ অথবা একটা পেনসিল টাসেল ছাড়া আর বিশেষ কিছুই দরকার হয় না তাঁর। সবচেয়ে আশ্চর্য হলো আঙুলের সাহায্যে তিনি যখন পৃথিবীর বিখ্যাত ব্যক্তি-দের মুখগুলি তৈরি করেন। হঠাৎ এক নিমেষে চার্চিলের মুখ ভেসে উঠলো, দর্শকদের সামনের পর্দায় সিনেমা জগতের বিখ্যাত ফরাসী অভিনেতা মরিস সিভেলিয়ার এসে দেখা দেয়, তখন ভিক্টরের আঙুলের কারসাজি দেখে দর্শকরা চমৎকৃত হয়ে শিল্পীকে তারিফ না করে পারে না।

মাত্র একটি পনর স্কোয়ার-ফুট চওড়া স্ক্রিনের উপর এড্‌ওয়ার্ড ভিক্টর তাঁর এই আঙুলের বিচিত্র কারসাজি দেখিয়ে থাকেন। বিভিন্ন দেশের ক্লাবে, পার্টিতে এই আঙু-লের ছায়াবাজি দেখিয়ে এখন তাঁর

প্রচুর পয়সা রোজগার হয়। এই শ্যাডোগ্রাফি শিল্পে এখন ভিক্টরের একমাত্র ছেলে প্যাট্রিকও খুব উপযুক্ত হয়ে উঠেছে এবং সে এই আঙুলের ছায়া ফেলে নানা ধরণের ৫-১০ মিনিটের নাটকও দেখাচ্ছে পর্দায়। ছেলে-বুড়ো সকলেই এই আঙুলের কারসাজি ও ছায়াবাজি দেখে মুগ্ধ হয়।

১৯৩৭ সালে ভিক্টর একবার বিলেতের উইণ্ডসর ক্যাসেলে রাজা-রাণীর কাছেও তাঁর এই আঙুলের কসরৎ দেখিয়ে যথেষ্ট প্রশংসা পান। গোটা ইংলণ্ডে এখনও তাঁর যেমন খ্যাতি, তেমনি তাঁর রোজগারেরও কমতি নেই।

লণ্ডনের সামান্য একটি হোটেলে চৌদ্দ বছর পূর্বে ভিক্টর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন সেই হোটেলের ম্যানেজার। যদিও ভিক্টর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হোটেলের কাজে পোক্ত হয়ে উঠছিলেন, কিন্তু তলে তলে আঙুলের ছায়া দেয়ালের গায়ে ফেলে নানা ধরণের জীবজন্তু তৈরির বিষয়েও তাঁর অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে এবং তিনি ম্যাজিক প্রভৃতি দেখানোর দিকে ঝুঁকে পড়েন।

এখানেব ছবিতে ভিক্টরের আঙুলের সাহায্যে নানা ধরণের কয়েকটি জীবজন্তু, কেট্‌লি ও মানুষের মূর্তির ছায়াও তোমরা দেখতে পাবে। সম্প্রতি টেলিভিসনেও তাঁর আঙুলের অপূর্ব কৌশল দেখান হচ্ছে পৃথিবীর অনেক স্থানে।

দেবতার যাত্রা

ঘোর অরণ্যাবৃত নীলাচল। মাঝখানে তার নীলাচল গিরি, উত্তরে কল্পবৃক্ষ, পশ্চিমে পুণ্যতোয়া রোহিণী প্রস্রবণ। এরই মধ্যে কোথায় আছেন শবরজাতির দেবতা নীলমাধব। নীল প্রস্তরে গঠিত দেবতার অপরূপ মূর্তি।

অবন্তীর সূর্যবংশীয় রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের কানে গিয়ে পৌঁছল জাগ্রত দেবতা নীলমাধবের সংবাদ। পুণ্যাত্মা রাজা দিকে দিকে সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ প্রেরণ করলেন দেবতা নীলমাধবের সন্ধানে।

কিন্তু একে একে তাঁরা সবাই ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। এলেন না শুধু পূর্বদেশে প্রেরিত ব্রাহ্মণ

সুখেন্দু দত্ত

বিদ্যাপতি। প্রায় তিনমাস নানা দেশ ভ্রমণ করে অবশেষে তিনি শবরদের দেশে এসে পৌঁছলেন। পরিশ্রান্ত বিদ্যাপতি শবররাজ বিশ্ববসুর গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। স্বয়ং শবররাজকন্যা নিলেন অতিথি ব্রাহ্মণের পরিচর্যার ভার।

দিন যায়। ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতি লক্ষ্য করেন, প্রত্যহ পুষ্পনৈবেদ্য নিয়ে শবররাজ গোপনে অরণ্যে পূজা দিতে যান। বিদ্যাপতি অনুরোধ করেন তাঁকে সঙ্গে নিতে। কিন্তু শবররাজ সম্মত হন না।

উপায়ান্তর না দেখে বিদ্যাপতি তখন শরণ নিলেন শবর রাজকন্যার। আদরিণী কন্যার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না পিতা, তিনি সম্মত
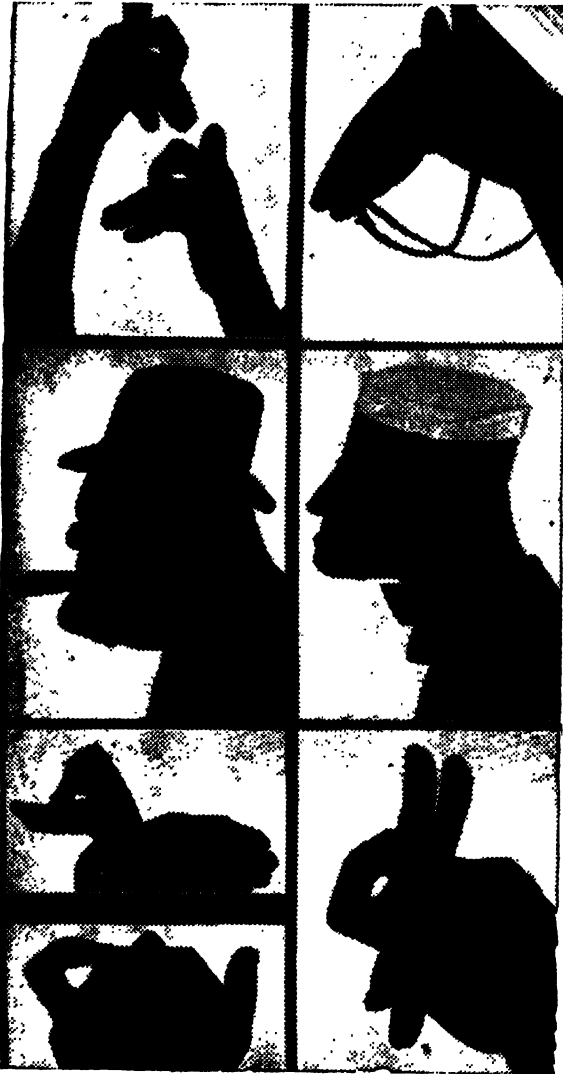
হলেন। কিন্তু এক সর্তে। বিদ্যাপতির দু' চোখ বেঁধে দেওয়া হবে যাতে পথের সন্ধান তিনি না পান।

কিন্তু গোপনে কাপড়ের ভিতর কিছু শস্য নিলেন বিদ্যাপতি। সেই শস্য ফেলতে ফেলতে তিনি চললেন। অরণ্যাবৃত নীলাচলে কল্পবৃক্ষের সামনে এসে তাঁর দু' চোখের বন্ধন খুলে দেওয়া হল। ব্রাহ্মণ দেখলেন, বৃক্ষের নীচে নীল প্রস্তরনির্মিত দেবতা নীলমাধবের অপরূপ মূর্তি। বনফুল ও ফল দিয়ে শবররা তাঁর পূজা করছে পশু ও পাখীরা এসে নীলমাধবের সামনে পড়ে প্রাণত্যাগ করে স্বর্গে যাচ্ছে। ব্রাহ্মণ বিদ্যাপতিও ভূলুণ্ঠিত হয়ে শবরজাতির দেবতা নীলমাধবকে প্রণাম করলেন।

দেশে ফিরে গিয়ে রাজাকে তিনি জানালেন দেবতা নীলমাধবের কথা। সংবাদ পেয়ে আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। বিরাট এক কাঠুরে বাহিনী নিয়ে তিনি এবার উপস্থিত হলেন নীলাচলে। জঙ্গল নির্মূল করে জাগ্রত দেবতা নীলমাধবকে তিনি উদ্ধার করবেন, প্রতিষ্ঠা করবেন তাঁকে মন্দিরে।

তখন দৈববাণী হল, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। তুমি জঙ্গল নির্মূল করতে পার, মন্দির নির্মাণ করতে পার, কিন্তু শবরদের দেবতা নীলমাধবকে পাবে না।

নতজানু হয়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন বললেন, প্রভু, আমার অপরাধ?

দৈববাণী বলল, পুণ্যাত্মা ইন্দ্রদ্যুম্ন তুমি শত অশ্বমেধ যজ্ঞের মহা পুণ্য অর্জন কর। তখন আমি তোমাকে দেখা দেব। তবে নীলমাধবরূপে আমাকে আর পাবে না। দারুময় জগন্নাথ মূর্তিতে আমি আবির্ভূত হব।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন মহাসমারোহে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পন্ন করলেন। যজ্ঞে দধিদুগ্ধের মহাহ্রদ ও শুভ্র অন্নের পাহাড় সৃষ্টি হল। গো, গ্রাম ও ধন দান করে ব্রাহ্মণদের তিনি তুষ্ট করলেন।

দিন যায়। তারপর একদিন দিগন্তব্যাপী ঘন গাঢ় নীল সমুদ্রের অশান্ত তরঙ্গে ভেসে এল এক বৃক্ষ। প্রভাস তীর্থে এই পবিত্র বৃক্ষেই দেহত্যাগ করেছিলেন পীতাম্বর চতুর্ভুজ কৃষ্ণ। চক্রচিহ্নিত এই বৃক্ষেই যোগমগ্ন কৃষ্ণের রাঙা চরণ দু'টি দেখে মৃগ মনে করে জরা ব্যাধ তাঁর পদতল শরবিদ্ধ করেছিল। মহাসমারোহে সেই পবিত্র বৃক্ষকে তীরে এনে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন পরম সমাদরে বৃক্ষের পূজা করলেন, তারপর তাকে বহন করে নিয়ে এলেন সমুদ্রতীরে বিরাট এক মন্দিরে।

দেশের শ্রেষ্ঠ সূত্রধরদের আহ্বান করে রাজা এবার সেই বৃক্ষ থেকে দেবতা জগন্নাথের দারুমূর্তি নির্মাণের আদেশ দিলেন। কিন্তু আশ্চর্য, যে শিল্পীই তাঁর যন্ত্র দিয়ে কাঠের গায়ে আঘাত করেন, তাঁরই যন্ত্র ভেঙ্গে যায়। শ্রেষ্ঠ শিল্পীরা সবাই একে একে মাথা হেঁট করে ফিরে গেলেন।

চিন্তিত ও বিষণ্ণ হয়ে উঠলেন তখন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। তবে কি দেবতা নীলমাধব তাঁর প্রতি প্রসন্ন হবেন না, ভক্তের মনোবাঞ্ছা কি অপূর্ণ রাখবেন প্রভু!

এক বৃদ্ধ সূত্রধর তখন এসে উপস্থিত হলেন রাজদ্বারে। অনন্ত মহারাণা বলে নিজের পরিচয় দিলেন সূত্রধর। বললেন, মহারাজ! বদ্ধ ঘরে বসে একাকী মূর্তি গড়ব আমি। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, একুশ দিনে মূর্তি নির্মাণ শেষ করব। কিন্তু তার আগে কেউ যেন আমার সামনে না আসে, আমার কার্যে বিঘ্ন না ঘটায়।

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বললেন, তাই হবে।

রুদ্ধদ্বার কক্ষে অনন্ত মহারাণা তাঁর কার্যারম্ভ করলেন। অস্ত্রধারী প্রহরী কক্ষের দ্বার রক্ষা করতে লাগল। দিনের পর দিন যায়, কিন্তু বৃদ্ধ সূত্রধরের মূর্তি গড়া আর শেষ হয় না। ঘরের মধ্যে তাঁর কাজের সামান্য শব্দও শোনা যায় না। তবে কি বৃদ্ধ সূত্রধর তাঁকে বঞ্চনা করলেন!

অধৈর্য হয়ে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন দ্বার উন্মুক্ত করে ভিতরে প্রবেশ করলেন। তারপরই বিস্মিত হলেন তিনি। ঘরের মধ্যে শুধু তিনটি অসমাপ্ত দারুমূর্তি— জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। আর কিছু নেই। বৃদ্ধ সূত্রধর অনন্ত মহারাণাও অদৃশ্য।

নিজের নিদারুণ ভুল এবার বুঝতে পারলেন ইন্দ্রদ্যুম্ন। এত জানলেন, বৃদ্ধ সূত্রধর অনন্ত মহারাণা আর কেউ নন, স্বয়ং দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা। নিজের দোষে রাজা তাঁকে হারিয়েছেন।

অনুতপ্ত ইন্দ্রদ্যুম্ন তখন নতজানু হয়ে দেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন, এই অসমাপ্ত দেবমূর্তিকে আমি কেমন করে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করব প্রভু! দেবশিল্পী, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। এই অধমের প্রতি তুমি প্রসন্ন হও।

তাঁর প্রার্থনায় প্রীত হয়ে দেবশিল্পী বিশ্বকর্মা আবার দর্শন দিলেন। কিন্তু দেবতা হয়ে নিজের সর্ত তো তিনি ভঙ্গ করতে পারেন না। তাই দারুময় দেবমূর্তিকে তিনি আর সমাপ্ত করলেন না। সেই অসমাপ্ত মূর্তিকে তিনি এবার বিরাট এক কাষ্ঠনির্মিত রথে স্থাপন করলেন। সেই পবিত্র রথে আরোহণ করে শুভক্ষণে মন্দিরের পথে যাত্রা করলেন দারুময় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা। সমার্জনী হস্তে রথের যাত্রাপথ মার্জনা করে চললেন স্বয়ং অবন্তীরাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন। রথে বহন করে দেবমূর্তিকে নিয়ে আসা হল অপরূপ কারুকার্যখচিত মন্দিরে।

যথারীতি মন্দিরের গর্ভগৃহে রত্নবেদীতে প্রতিষ্ঠিত করা হল দেবতাকে। প্রসন্ন হয়ে দেবতাও তখন হেসে উঠলেন। কৃতার্থ হলেন রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন। এতদিনে তাঁর প্রাণের ডাক দেবতার নিকট পৌঁছেছে। ভক্তের ভক্তিডোরে বাঁধা পড়েছেন ভক্তাধীন ভগবান।

সেই থেকে আজও দেবতার সেই মন্দির যাত্রার দিন পুণ্যভূমি জগন্নাথধামে রথযাত্রা হয়, প্রতি বছর।

পুণ্যার্থী লক্ষ মানুষ সেই রথের দড়ি ধরে টানেন। রথের চাকার তলায় প্রাণ দেয় কতজন। ভক্তের রক্তে আর চোখের জলে সেই পুণ্যধামের মাটি হয় স্বর্গের চন্দন। সূর্যবংশীয় রাজারা আজও রথের সামনে রাস্তা সোনার ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দিয়ে যান। দারুময় জগন্নাথ মূর্তিতে চণ্ডালের দেবতা নীলমাধব। তাঁর কাছে যে মানুষে মানুষে কোন ভেদ নেই। ভেদ নেই উচ্চ ও নীচের।

● কারাগারের মধ্যে কাকাতুয়াটির চিকিৎসা হচ্ছে

পশু হাসপাতাল

মানুষের মত কথা বলার ক্ষেত্রেই শুধু অক্ষমতা কিন্তু শব্দতরঙ্গ সৃষ্টির ক্ষমতাও পশুদের অধিকারগত। কোন কোন পশুর শব্দ মানুষের পক্ষে এক ভীতিকর অবস্থাও সৃষ্টি করে। ব্যাঘ্র বা সিংহের গর্জন মানুষের কাছে আর যাই হোক, সুখকর নয় বরং আতঙ্কজনকই। শুধু নির্দিষ্ট বাক্য-সৃষ্টির ক্ষমতাই মানুষের মত তাদের নেই। তা ছাড়া তাদের সমাজেও থাকে আনন্দ-বেদনা মিলন-আকর্ষণ, ভালবাসা-অভিমান, অনুরাগ সবই।

ফল, ফুল, আকাশ, বাতাস, প্রকৃতি সৃষ্টির পর পৃথিবীতে পশুর সৃষ্টি। তারপর এল তার থেকে বহুগুণ শক্তিসম্পন্ন উন্নত মানুষ, ভগবানের সৃষ্টির পূর্ণতা। পশু-পক্ষীরা আমাদের পুরাণে, সাহিত্যেও অধিকার করে আছে একটি বিশিষ্ট স্থান। আমাদের দেব-দেবীর অধিকাংশেরই বাহন এক একটি বিশেষ পশুপক্ষী, আমাদের মানুষের সংসারে বহুর মিছিলে পশু-পক্ষীও অনুপস্থিত নয়।

পশু-পক্ষীরও আনন্দ-অনুভূতি যখন আছে, তখন স্বাভাবিক নিয়মানুসারে রোগ, জ্বালা, যাতনাও আছে।

অনুসন্ধানী

আগেও ছিল, এখনও আছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। চিকিৎসা-পদ্ধতির এবং বিজ্ঞানের জয়যাত্রার অগ্রগতি অনুযায়ী এদের সংরক্ষণের, পালনের, পরিচর্যার ব্যবস্থাও অনেকখানি উন্নত আজ। এদের চিকিৎসা-ব্যবস্থাও আগেকার থেকে আজ বহুগুণ উন্নতি লাভ করেছে এবং নির্ভরযোগ্য সেই সঙ্গে বিজ্ঞানধর্মী।
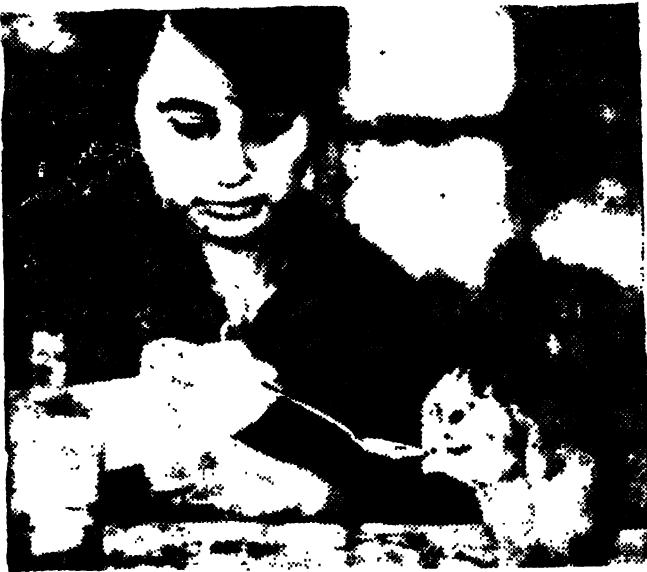
বিশ্বের নানা দেশে পশু-পক্ষীদের জন্য হাসপাতাল বর্তমান। পশুদের সম্পর্কে মানুষকেও যথেষ্ট পরিমাণে পড়াশুনা করতে হয়, তবেই তার পক্ষে পশুপালন ও পশু-পক্ষীর চিকিৎসা সম্ভব। বহু কৃতবিদ্য মানুষ আজ পশু-পক্ষীর পরিচর্যায় করেছেন আত্মনিয়োগ। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত আমাদের দেশেও পশু-পক্ষীর চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য ভেটিরিনারী হাসপাতাল আছে। কলিকাতার বেলগাছিয়া অঞ্চলে রোগাক্রান্ত পশু-পক্ষীদের চিকিৎসা ও পরিচর্যার জন্য বিরাট হাসপাতাল বিদ্যমান। ঐ হাসপাতালে বহু অসুস্থ পশু-পক্ষীর চিকিৎসা ও পরিচর্যা করা হয়। অন্যান্য জিনিষের মত পশু-পক্ষীও হচ্ছে দেশের একটি বিরাট সম্পদ।

এই নিবন্ধের সঙ্গে প্রকাশি হয়েছে সোভিয়েট রাশিয়ার কয়েক পোষা প্রাণীর আলোকচিত্র। এ পশু-পক্ষীগুলি অসুস্থ। এরা মধ্যে SVERDLOVSK জেলার পশু চিকিৎসালয়ের চিকিৎসাধীন। এখানে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এদে চিকিৎসাকার্য পরিচালিত হয়। ঘুঘু পাখী পা ভাঙলে তার ড্রেসিং করে দেওয়া হয় বেড়ালের শক্তি বৃদ্ধির জন্য নির্দেশপত্র তৈরী হয়ে যায়, কুকুরকে প্রয়োজ হলে জোলাপ দেওয়া হয়। বান জাতীয় প্রাণী শীতকালে সূর্যালোকের অভাব বোধ করলে তাদের জ

● চিকিৎসা বাড়ীতে হলেও কাঠবিড়ালীটি ঔষধ গ্রহণ করছে হাসপাতালে

একটি গোরিলা শিশুর জন্মগ্রহণে

জার্মানীর চিড়িয়াখানায় আলোড়ন

আট সপ্তাহ পূর্বে জার্মানীর চিড়িয়াখানায় একটি গোরিলা শিশুর জন্ম হয়েছে। এমন ঘটনা খুবই বিরল। কারণ জার্মানীর চিড়িয়াখানায় এর পূর্বে আর কোন গোরিলা শিশুর জন্ম হয় নি। এ বাচ্চাটির বাবা ও মা এ চিড়িয়াখানার বহুদিনকার বাসিন্দা। কিন্তু মা গোরিলাটি (মাকুলা) চিরদিন মানুষের সাহচর্যে বড় হওয়ায় বাঁদরের ছানা দেখবার সুযোগ কোনদিন পায় নি যার জন্য নিজের সন্তানের প্রতি যত্ন নিতে সে রীতিমত ভীত হয়ে পড়ে। তাই গোরিলার বাচ্চাটিকে (ম্যাক্স) 'মানব মায়ের' যত্ন নিতে হচ্ছে। তাকে রীতিমত মানবশিশুর মতই যত্ন দেওয়া হচ্ছে। বাচ্চাটির ক্রমবর্ধমান ওজন দেখে তার 'মানব-মা' ও চিড়িয়াখানার পরিচালক খুবই খুশি। তাদের ধারণা ম্যাক্স একদিন খুব শক্তিশালী গোরিলা হয়ে উঠবে।

—আই, সি, এস।

● পশুদের আলোক চিকিৎসার একটি দৃশ্য

...য়োজনীয় আলোক-চিকিৎসার ব্যবস্থাও ...মান।

...স্কোতে আজ সব মিলিয়ে ...বোটি পশু-চিকিৎসালয় অবস্থিত। ...কটি ভেটিরিনারী ক্লিনিকও আছে। ...ধু এই চিকিৎসালয়গুলিতেই যে, পশু-...দের চিকিৎসা হয় তা নয়, তারা ...রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে অথচ হাস-...তালে যাওয়া যে কোন কারণেই ...তো তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়, ...ক্ষেত্রে কি হবে? তাদের চিকিৎসা ...না, না আশঙ্কার কারণ নেই। ...একটি টেলিফোন; ব্যস, পশুদের ...কিৎসক দেখবেন অল্প সময়ের ...ষুধপত্র এবং প্রয়োজনীয় ...করণাদি সমেত যথাস্থানে হাজির ...বাড়ীর কলিং বেলটিতে আঙুল ...য়ে দিয়েছেন।

● চিড়িয়াখানায় উত্তেজনা: একটি শিশু গোরিলা

তপন তর্পণ

রামচন্দ্র চৌধুরী

[সাম্প্রতিক ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে যে তরুণবৃন্দ আত্মোৎসর্গ করিয়া দেশ-জননীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, দেশের সেই অমর সন্তানদের মধ্যে তপন চৌধুরী অন্যতম। এই বীর সৈনিকদের নিকট জাতির ঋণের সীমা-পরিসীমা নাই, তাঁহারা সারা জাতির পরম গর্ব। নিম্নে প্রকাশিত কবিতাটি তাঁহারই উদ্দেশে রচিত। কবিতাটির রচয়িতা তপন চৌধুরীরই পিতৃদেব। —স।]
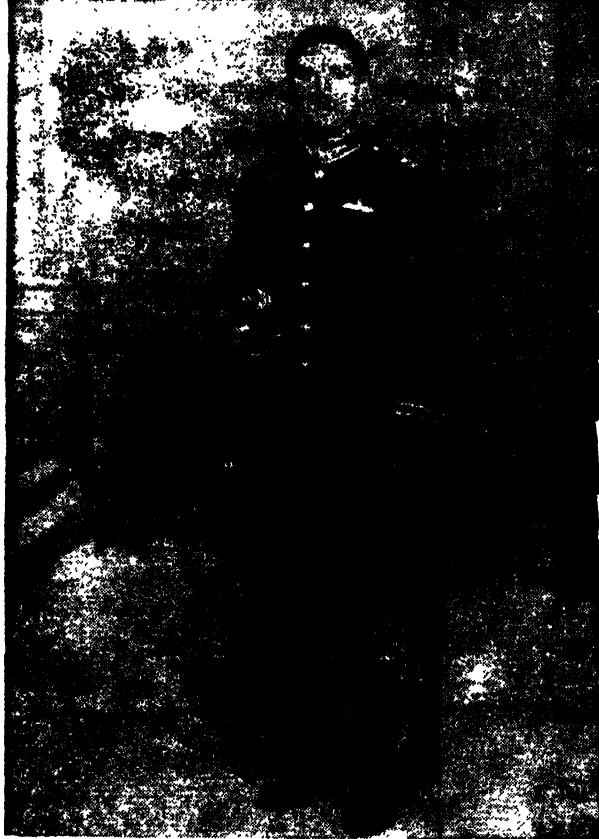
পাইলট তপন চৌধুরী

তপন তুমি যে তরুণ তপন গগনে জ্যোতির্ময়।
তোমার শৌর্য অমিত বীর্য বিশ্বভুবনময়॥
মহাভারতের হে অভিমন্যু মাতৃভূমির জন্য।
এ নব কুরুক্ষেত্রে তোমার জীবন করেছো ধন্য॥
গর্জি উঠেছে আকাশে আকাশে তোমার বিমানখানি।
তুমি সৈনিক নির্ভীক তুমি শত্রুসৈন্য হানি॥
মহান এ দেশ স্বাধীনতা তুমি রেখেছো জীবন দিয়া।
তুমি শঙ্কর শঙ্কাহরণ বিশ্বের মরমিয়া॥
ঝলকি উঠেছে বিমানের পাখা বজ্রের হুঙ্কারে।
শত্রুঘাঁটিরে ধ্বংস করেছো অস্ত্র ঝনৎকারে॥
মহাজীবনের সাধনা তোমার তরুণ তাপস তুমি।
তোমার গর্বে গর্বিত তব জননী জন্মভূমি॥
তব গরিমায় উচ্ছল তব জনকের দুটি আঁখি।
সৌম্য শান্ত মহাসমুদ্রে হেরিয়াছি থাকি থাকি॥
ধ্যান গম্ভীর সে মূর্তি মাঝে অসীম গগন রাজে।
বীর তপনের বিজয় তূর্য রহিয়া রহিয়া বাজে॥
এই তো সেদিন কিশোর তপন উঠেছো উদয়াচলে
রঙ্গমঞ্চে কত অভিনয় কনক কমল দলে॥
শত দর্শকে মুগ্ধ করেছো নব জীবনের গানে।
সে জীবন আজি মহান করেছো জননীর আহ্বানে॥
নিজ হাতে তুমি লিখেছিলে চিঠি "জননী, ভেবো না তুমি
তোমার আশীষে মন্দ্রিত হবে আজিকার রণভূমি॥"
সত্য হয়েছে এ ধ্বনি তোমার ব্রতের উদ্‌যাপন।
আহুতি দিয়াছ অঞ্জলি ভরি জীবন-সাধন ধন॥
শত্রু-বিজয়ী মরণের মাঝে অমৃত করেছো পান।
করিব না শোক বীরের গর্বে ভারত যে গরীয়ান॥
কে বলেছে তুমি হেথা নাহি আজ রয়েছো ভারতময়।
রবে চিরদিন হে চিরঅমর জয় জয় তব জয়॥
হে তপন তব শৌর্য-আলোকে নতুন অঙ্গীকার।
আমরা তোমায় এ নব প্রভাবে জানাই নমস্কার'

কবির বুদ্ধি

এক ছিল রাজা। তাঁর রাজসভায় ছিল এক মস্ত কবি। সভাকবি আর কি। রাজা থাকলেই তখনকার দিনে তাঁর রাজসভায় একজন করে কবি থাকতেন। আর বেশ সম্মান নিয়েই কবি থাকতেন রাজার সোনার সিংহাসনের পাশে আর একটা সোনার সিংহাসনে। রাজাকে কবিতা শোনানোই ছিল তাঁর কাজ। আর এই জন্যেই রাজা। ভাণ্ডার থেকে সেই কবিকে দেওয়া হোতো প্রচুর অর্থ, অলংকার আর যশঃসম্মান। তা রাজা সেই কবিকে দিয়েছিলেন প্রচুর অর্থ, অলংকার আর তাঁর বাসের জন্য একটা বিরাট চমৎকার বাড়ী। বাড়ীটা ছিল শ্বেতপাথর দিয়ে তৈরী। সামনে ছিল একটা চমৎকার ফলের বাগান। তোমরা জানো কবিরা প্রকৃতির শোভা দেখেই তার ওপর কবিতা রচনা করে থাকেন। তাই রাজা কবিকে বাড়ীর সাথে সাথে একখানা চমৎকার বাগানও দিয়েছিলেন। কবি তাঁর বাড়ীর মধ্যে থেকে চাঁদের আলোয়ভরা এই বাগানের শোভা দেখতেন আর মুগ্ধ হোয়ে কবিতা রচনা করে রাজাকে শোনাতেন। রাজা খুব খুশী হতেন আর কবিকে আরো আরো মণি-মাণিক্য উপঢৌকন দিতেন। এমনিভাবে কবিরও ছোট ধনাগার ধনে অলংকারে মণি-মাণিক্যে পং হয়ে উঠেছিল।

এই জন্যে একটা বিপদ ঘনিয়ে উঠলো। রাজার রাজত্বে যেমন কবি লোক আছে, তেমনি চোরও আছে। কবির ধনরত্নের খবর তাদেরও কানে গিয়ে পৌঁছলো। তারা সবাই মিলে ঠিক করলো কবির বাড়ীতে তারা চুরি করবে আর তার জমানো রত্ন আর অলংকার নিয়ে পালাবে। এই না ভেবে তারা কবির বাগানে একদিন এসে লুকিয়ে রইল।

তোমরা জানো কবি যাঁরা তাঁরা রাতে বড় একটা ঘুমান না—রাত জেগে প্রকৃতির শোভা দেখে দেখে তাঁরা কবিতা লেখেন। তাই কবি প্রতিদিন তাঁর অভ্যাসমতো তাঁর ঘরের বাতায়নে এসে দাঁড়ালেন বাগানের শোভা দেখবার জন্যে আর রাজাকে নূতন কবিতা শোনাতে তাঁকে যে আজই রাতের মধ্যে একটা কবিতা লিখে রাখতে হবে। প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে কবি কিন্তু হঠাৎ কতকগুলো লোককে তাঁর চমৎকার সেই নানাফলে ভর্তি বাগানে লুকিয়ে থাকতে দেখলেন। বুঝতে তাঁর এতোটুকুও বাকি রইল না যে, লোকগুলি যে ভাল নয়—নিশ্চয়ই চোর। কারণ রাতে একমাত্র জেগে থাকে কবি আর চোর। এতোগুলো কবি তাঁর বাগানে একসাথে না বলে কয়ে কিছুতেই আসবে না বাগানের শোভা সৌন্দর্য দেখতে—এটা স্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং কবিতা লেখা কবির মাথায় উঠলো, হাত থেকে কবিতার খাতাখানা পড়ে গেল।

হঠাৎ তাঁর মাথায় একটু বুদ্ধি খেলে গেল। চোরগুলোকে জব্দ করার একটা ফন্দি হঠাৎ কবির মাথায় এসে গেল। মনে মনে খানিকটা হেসে কবি তাঁর বউকে ডাকলেন আর তাকে তাঁর ফন্দির কথা খুলে বললেন। কবির বউ কবির কথানুযায়ী কাজ করতে রাজী হলেন আর এই বুদ্ধির জন্যে কবিকে খুব তারিফ

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

করলেন। কবি এবার পূর্ব কথানুযায়ী বাগানের মধ্যে গিয়ে হাজির হলেন আর সংগে সংগে তাঁর বউকেও ডাকলেন সেখানে। কবির বউ এসে হাজির হলে তাঁকে বললেন তিনি বেশ জোর করেই যাতে কি না বাগানে লুকিয়ে-থাকা চোরগুলো তাঁর কথা শুনতে পায় এই আর কি।

"আমার মনে হয় বাড়ীতে একটা চুরি হবে শীগগিরই।"

"তাই নাকি—তাহলে আমার গহনাগুলো তো চোরে নিয়ে পালাবে।"

"যাতে না নিতে পারে তাই করতে হবে।"

"কি করতে হ'বে বলো না গো।"

"গহনাগুলোকে এক বাক্সে ভর্তি করে আমরা এই বাগানের পাতকুয়াটার মধ্যে রেখে দিয়ে যাবো—তাহলে চোরেরা টেরটিও পাবে না আর ওইগুলি চুরি করতেও পারবে না।"

"চলো তাই করে ফেলি আজকেই এবং খুব তাড়াতাড়ি।"

"হ্যাঁ তাতো বটেই।"

এই না বলে কবি আর কবির বউ ঘরের মধ্যে ঢুকলেন এবং কিছু সময় পরেই একটা বাক্স এনে পাতকুয়ার জলে ডুবিয়ে দিলেন। লুকিয়ে-থাকা চোরেরা তো আনন্দে আটখানা একেবারে। এমন সুন্দর সুযোগ তারা তাদের জীবনে আর কোনোদিনও পান নাই। চুপি চুপি তোমাদের বলে রাখি চোরগুলো যেন আবার শুনতে না পান; বাক্সটার মধ্যে কতকগুলো ভারী পাথর ভর্তি করে কবি তাই ডুবিয়ে দিয়েছিলেন আসলে।

যাই হোক, কবি আর কবির বউ বাড়ীর মধ্যে গিয়ে সেদিন খুব আনন্দেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। আর এদিকে চোরগুলো কি করলো জানো, তারা একগাছা দড়ি আর একটা বালতি যোগাড় করে পাতকুয়ার জল সেঁচতে লাগলো। সারারাত ধরে আসলে পাতকুয়ায় ফেলা ওই গহনার বাক্সটাকে বগলদাবা করাই ছিল তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এই আর কি? কিন্তু পাতকুয়ার জল আর কিছুতেই শুকোয় না—যত জল তারা তোলে জলের যোগান আসে পাতাল থেকে। এমনিভাবে সারারাত জল তুলে তুলে চোরেরা তো হয়রাণ হোয়ে পড়লো!

ওদিকে ভোরও হোয়ে এলো আর একটু পরেই আকাশে লাল রঙের পাল তুলে সূর্যমামা তাঁর দিনের নৌকাখানা নিয়ে হাজির হবেন। এদিকে সারা বাগানটা তখন জলে ভাসছে, থৈ-থৈ করছে। ফলগাছগুলোতে আর সাত দিন জল না দিলেই চলবে এমনি ধারা আর কি!

আকাশ লাল হবার আগে চোরেরা যে যার বাড়ী চলে গেল ধরা পড়ার ভয়ে; অবশ্য আবার রাতে তাদের আসতেই হবে, গহনার বাক্সটা যে পাতকুয়ার মধ্যেই পড়ে রইল তাই না? এমন লোভ কি ত্যাগ করা যায় কখনো, না এমন সুযোগই ছেড়ে দেওয়া যায়—তোমরাই বলো?

এমনিভাবেই দিনের পর দিন বোকা চোরগুলো পাতকুয়ার জল তুলে ফলগাছের গোড়ায় তাই ফেলে আর ভোর হলে আবার পরের দিন আসার ইচ্ছা নিয়ে যে যার বাড়ী চলে যায়। কবি আর কবি-গিন্নীকে বাগানের ফুলগাছগুলোর গোড়ায় তাই আর কষ্ট করে জল তুলে তুলে ঢালতে হয় না। কবি বুদ্ধি, একেই না বলে।

এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের একটি চিত্র মুদ্রিত হইল। চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন শিল্পী শ্রীঅন্নদা মুন্সী।

সাহিত্য পরিচয়

মিখাইল শোলোকভ

সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার-প্রাপকদের তালিকায় আবার যুক্ত হল একটি রুশীয় নাম। মিখাইল শোলোকভ। "এ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোস দ্য ডন"-এর অবিস্মরণীয় স্রষ্টা। কিন্তু এই পুরস্কারটির সঙ্গে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক মধুর বা স্বচ্ছন্দ নয়। কয়েক বছর আগে ১৯৫৮ সালে ডক্টর জিভাগোর রচয়িতা বোরিস পাস্তারন্যাককেও এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেই পুরস্কার গ্রহণ করতে পাস্তারন্যাক সমর্থ হন নি। এই ঘটনারও পঁচিশ বছর আগে ১৯৩৩ সালে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিষবাষ্প যখন পৃথিবীর আকাশ-বাতাসকে আচ্ছন্ন করে দেয় নি, পৃথিবীর সামগ্রিক চিত্রই যখন ছিল আজকের তুলনায় সম্পূর্ণরূপে বিপরীত সেই সময়ে এই পুরস্কার অর্পিত হয়েছে আইভান বুনিনের উদ্দেশে। তবে, লক্ষণীয় এই যে, ব্যুনিন জাতে রাশিয়ান হলেও রাশিয়ার অধিবাসী তিনি ছিলেন না, তাঁর বাসভূমি ছিল ফ্রান্স। শিল্প-সৌন্দর্যের লীলাভূমি বৈজ্ঞানিক চেতনার জন্মভূমি ফ্রান্স। হিউগো, আনাতোল ফ্রাঁসে, মোপাস্যার ফ্রান্স।

দ্বিধা ছিল প্রশ্ন ছিল এই পুরস্কার সমর্পণের কি পরিণাম দাঁড়ায়! পাস্তারন্যাককে এই পুরস্কার দেওয়া নিয়ে শোলোকভই তীব্র সমালোচনা করেছিলেন, সাত বছর পরে মৎস্যশিকারে ব্যস্ত লেখকের দুয়ার থেকে এই পুরস্কার কি আসবে? প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেন শোলোকভ এই পুরস্কার। উৎকণ্ঠিত জনের উৎকণ্ঠা, জিজ্ঞাসুজনের জিজ্ঞাসা, শঙ্কিতজনের শঙ্কামোচন করলেন শোলোকভ তাঁর ঘোষণায়—"সকৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করলুম।"

গত ২৪শে এপ্রিল তাঁর জীবনের ষাটটি বছর পূর্ণ হল। বেয়াল্লিশ বছর আগে মাত্র আঠার বছর বয়সে তাঁর প্রথম গল্পগুলি তিনি রচনা করেন, সে গল্পগুলি পরে সাজানো হয় "ডনের কাহিনীগুচ্ছ"তে। দু' বছর পরেই তার বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ "ধীর প্রবাহিণী ডন" রচিত হয়। ১৯৩২ সালে প্রকাশিত হল 'ভার্জিন সয়েল আপটার্নড" (অহল্যা ভূমি জাগল)। "ফেত অফ এ ম্যান" (একটি মানুষের ভাগ্য) প্রকাশ পেল ১৯৫৬ সালের গোড়ার দিকে, ১৯৫৯ সালে "ভার্জিন সয়েল আপটার্নড"-এর দ্বিতীয় অংশ প্রকাশ পেল।

যুদ্ধক্ষেত্র থেকে যেসব বিবরণ পাঠাতেন শোলোকভ তার ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠত ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তার অপরিসীম ক্রোধ। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যে আদর্শের জন্য সোভিয়েট সৈনিকরা মরণপণ সংগ্রামে মেতে উঠেছিল আন্দ্রেই সোকোলোভ (একটি মানুষের ভাগ্য) তাদেরই একজন। মনে হয় এই যুদ্ধ যেন তার কাছ থেকে সব কিছু কেড়ে নিয়েছে, তাঁর আনন্দ, তাঁর গান, তার শান্তি সব কিছু কেড়ে নিয়ে তাকে যেন নিঃস্ব করে দিয়েছে। তাঁর সব কিছু নিঃশেষিত হলেও মুহূর্তের জন্যও দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নি তিনি। তারপর একটা সময় এল যখন আন্দ্রেই বুঝলেন যে পৃথিবী আর কোন কিছু দিয়েই তাঁকে বেঁধে রাখতে পারবে না, সব কিছু বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত তখন কোথা থেকে তাঁর জীবনে দেখা দিল একটি ছোট্ট বালকের মূর্তিতে অঙ্কুরান সম্ভাবনা। প্রাণপূর্ণ প্রত্যাশা। জীবনের কত সঞ্চয়ে ভরপুর আনন্দ। আন্দ্রেই-এর জীবনেতিহাসের পরিচ্ছেদ পরিবর্তন ঘটাল সেই বালক, তার কল্যাণে আন্দ্রেই উপলব্ধি করলেন বেঁচে থাকার সার্থকতা, জীবনের মানে।

তবে সেই কুড়ি বছর বয়সের লেখা 'ধীর প্রবাহিণী ডন' তাঁর সমগ্র জীবনের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-

● মিখাইল শোলোকভ

...র্ব বলে স্বীকৃত। সহানুভূতি ও বিশ্লেষণের ...খো দোদুল্যমান কসাক নায়ক গ্রেগরির জীবনের ...দ্বন্দ্ব অপূর্ব আলোয় এই রচনায় চিত্রিত। ...র ট্র্যাজেডি এক নতুন আলোয় হয়েছে বর্ণিত। ...ক অপূর্ব স্বপ্নবিস্তারী গ্রেগরির জীবনজিজ্ঞাসা পাঠকের মনেও এক জিজ্ঞাসা এনে দেয়। সামগ্রিক বিচারে এই গ্রন্থকে তার শব্দ সম্পদে, আঙ্গিকে, বিন্যাসে, আলেখ্য অঙ্কনে মহাকাব্যের সঙ্গে তুলনা করা চলে। প্রসঙ্গত স্মরণীয় যে, এই গ্রন্থ যে সময়ে লেখা রাশিয়া তখন এক আমূল পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে। শাসন সংস্কারে, দৃষ্টিভঙ্গীতে, জীবন যাত্রায় এক পালাবদল ঘটেছে। বলা বাহুল্য, সেই সময়ের ছাপ গ্রন্থটির মধ্যে পূর্ণ মাত্রাতেই বিদ্যমান।

অপরিণত বয়সে প্রতিবিপ্লবীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশ নেন শোলোকভ। কিন্তু তাঁর স্বদেশের মাটি, প্রকৃতি, চিরন্তন সৌন্দর্য তাঁকে এক দুর্বার আকর্ষণে বেঁধে ফেলে। তার ক্ষেত-খামার ও ডন নদীর আকর্ষণ তাঁর কাছে অনতিক্রম্য হয়ে উঠল। ভেশেনস্কায়ায় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন প্রখ্যাতনামী বৃটিশ লেখিকা প্যামেলা জনসন ও লেখক চার্লস স্নো। এখানেই পরিচয় হল পরবর্তীকালের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ ফিনল্যাণ্ডের মাতি লাসির সঙ্গে। কিছুদিন ধরে কথোপকথন চলল এক যুদ্ধে পঙ্গু সেনানায়কের সঙ্গে। গ্রন্থের জন্যে এই কথোপকথনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

ঘনিষ্ঠ মৈত্রীর বন্ধনে তিনি আবদ্ধ আছেন অন্যান্য সোভিয়েট লেখকদের সঙ্গে। তাঁর নায়কদের সঙ্গে স্কুল-জীবন থেকেই সোভিয়েট রাশিয়ার অধিবাসীদের পরিচয় ঘটে। কালের প্রবাহে স্মৃতি থেকে তাঁরা কিন্তু মুছে যান না বরং সময়ের দুস্তর ব্যবধানে মানুষের স্মৃতিতে চরিত্রগুলিকে আরও উজ্জ্বল আরও অম্লান করে তোলে। তাঁদের জীবনের সঙ্গে শোলোকভের নায়কদের জীবন যেন একসূত্রে গ্রথিত, তাই তাঁরা মানুষের স্মৃতি থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হতে পারেন না। গ্রেগরির মত পরস্পর বিরোধী ও জটিল চরিত্র সেক্সপীয়ারের চরিত্রগুলিকেই মনে করিয়ে দেয়। আকসিনিয়ার প্রগাঢ় প্রেম ও বিয়োগান্তক মৃত্যু, কুদিনভের ট্র্যাজেডির মতই পাঠকের মন অভিভূত করে তোলে।

রাষ্ট্রীয় ও লেনিন পুরস্কারের অধিকারী শোলোকভ প্রত্যহ চিঠি পান প্রচুর। দেশ ও বিদেশ থেকে হাজার হাজার চিঠি, গ্রন্থ, নবীন লেখকদের পাণ্ডুলিপি তাঁর আছে আসে।

বর্তমানে 'দে ফট ফর দেয়ার কাণ্ট্রি' (এঁরা নিজের দেশের জন্যে লড়েছিলেন) উপন্যাসটি রচনায় তিনি ব্যাপৃত আছেন। যুদ্ধকালে তিনি নিজে যা দেখেছেন, যা শুনেছেন, যা জেনেছেন তারই ভিত্তিতে রূপ নিচ্ছে এই উপন্যাস। এর মাধ্যমে তিনি তুলে ধরছেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে জনসংগ্রামের নাটক ও বিজয়ের এক পরিদৃশ্য, যার ভিতর দিয়ে প্রকাশ হয়ে উঠবে তাঁর গভীর চিন্তা ও দার্শনিক বিচারের একটি উজ্জ্বল চিত্র।

পৃথিবীর কোটি কোটি সাহিত্য-রসপিপাসু নর-নারী এই গ্রন্থটিরই অপেক্ষায় হয়তো ব্যাকুল চিত্তে প্রহর গুণবে।

আরাবল্লী থেকে আগ্রা /

আনন্দধারা প্রকাশন

বর্তমানে ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস রচনার একটা বিশেষ প্রবণতা দেখা দিয়েছে, আলোচ্য উপন্যাসটিও সেই জাতীয়। মুঘল বাদশাহ আকবর শাহ ও রাজপুতকুলচূড়ামণি মেবারগৌরব রাণা প্রতাপসিংহ এই দু'টি বিখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্রের ছায়ায় গড়ে উঠেছে কাহিনী। রাজপুত জাতি শৌর্যে-বীর্যে অতুলনীয় হলেও একতার অভাবে তাদের পতন ঘটেছিল, মুঘল বংশের তথা সমগ্র কালের শ্রেষ্ঠসম্রাট ও সেনাপতিদের অন্যতম শাহানশাহ জালালউদ্দিন মুহম্মদ আকবরের রাজত্বকালে, তবু রাজপুতদের ইতিহাসে সেই কালটি চিরদিন এক স্বর্ণোজ্জ্বল মহিমায় আবৃত হয়ে থাকবে, কারণ সেই সময়েই আবির্ভাব ঘটেছিল রাণা প্রতাপসিংহের—যিনি ক্ষুদ্র শক্তি নিয়েও সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে দ্বিধা করেন নি প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে। কয়েকটি কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টি করে যে কাহিনী বয়ন করেছেন লেখক, তাতে প্রতাপের তথা রাজপুতদের স্বাভাবিক বীর্য ও মহিমার ছবিটি স্পষ্ট হয়েই ফুটে উঠেছে। ঐ সময়ের ভারতের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশটিও বেশ ধরা দিয়াছে লেখকের বর্ণন-কৌশলে, কাল্পনিক চরিত্র সৃষ্টিতেও যথেষ্ট পারদর্শিতা দেখিয়েছেন লেখক, মূল নায়ক-নায়িকা জিৎ সিংহ, লীলাবতী ছাড়াও কয়েকটি পার্শ্বচরিত্রও বেশ উজ্জ্বল হয়েই ফুটে উঠেছে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—শ্রীপারাবত, প্রকাশক—আনন্দধারা প্রকাশন, ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলি-১২, দাম—আঠারো টাকা।

কুলদা-কিশোর গল্প-চতুষ্টয় /

এ মুখার্জী এ্যাণ্ড কোং

শিশু-সাহিত্যের ইতিহাসে যে নামটি চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে জ্বলজ্বল করবে, যা বাঙলার ঘরে ঘরে একদিন সুপরিচিত ছিল, সেই শিশু সাহিত্যসম্রাট কুলদারঞ্জন রায়ের কয়েকটি প্রসিদ্ধ রচনা সঙ্কলিত হয়েছে বর্তমান গ্রন্থে। তাঁর লেখা চারখানি শ্রেষ্ঠ বই—'পুরাণের গল্প,' 'কথা-সরিৎ-সাগর,' 'ছেলেদের বেতাল পঞ্চবিংশতি' ও 'রবিন হুড,' যা একদিন বাঙালী শিশুদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অভিভাবকদেরও মন কেড়ে নিয়েছিল, তাই একত্রে গ্রথিত করা হয়েছে বর্তমান সঙ্কলনগ্রন্থটিতে। কুলদারঞ্জনের অননুকরণীয় শৈলীর সঙ্গে যেন আবার নতুন করে পরিচয় ঘটল, বিস্মৃতপ্রায় বাল্যে এই গল্পের যাদুকর কি ভাবে মন কেড়ে নিয়েছিলেন, সে কথা মনে হল বারবার বইটি পড়তে পড়তে। বাঙলার বালক-বালিকা যে পরম সমাদরের সঙ্গেই এই সংগ্রহকে গ্রহণ করবে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। প্রকাশকের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে এই লেখকের আরও যে সব মূল্যবান রচনা, কালের প্রভাবে বিস্মৃতপ্রায় সেগুলিরও উদ্ধারসাধন করে এই ভাবেই তাঁরা পৌঁছে দিন বাঙলার কিশোর-সম্প্রদায়ের দরবারে। বাংলার শিশু-সাহিত্যের ভাণ্ডারে এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—কুলদারঞ্জন রায়, প্রকাশক—এ মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—দশ টাকা।

মাসিক বসুমতী
॥ কার্তিক, ১৩৭২ ॥

(জলরঙ)

বাদশা-বেগম

—সুনীলমাধব চক্রবর্তী অঙ্কিত

রত্নাকর গিরিশচন্দ্র / আনন্দধারা প্রকাশন

যুগপুরুষ পরমহংস রামকৃষ্ণ দেবের মহাভক্ত প্রখ্যাত নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম বাঙালী মাত্রেরই সুপরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থে এই মহাপুরুষের জীবনায়ন করেছেন লেখক। গিরিশচন্দ্রের বহুধা পরিচয় তিনি বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের শাহানশা বাদশা, তিনি অভূতপূর্ব জনপ্রিয় নাট্যকার, তিনি অসাধারণ প্রতিভা, তিনি প্রকাণ্ড জ্ঞানী কিন্তু এসবকে ছাড়িয়ে তিনি মহাভক্ত, তিনি সিদ্ধযোগী, লেখকের অসামান্য বর্ণন-কৌশলে গিরিশচরিত্রের সব কটি বৈশিষ্ট্যই উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। শুধু বিশ্বাস, শুধু ভক্তি, এই দুটি মাত্র হাতিয়ার অবলম্বন করে দস্যু রত্নাকরের মতই পাপের পাহাড় সরিয়ে আত্মজ্ঞান পেয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রসাদে আলোচ্য রচনায় সেই অপূর্ব উত্তরণের কাহিনী বিবৃত করেছেন লেখক। অচিন্ত্যকুমারের অনন্য লেখনী পাঠককে নিয়ে যায় এক রূপকথার দেশে, রক্তমাংসের গিরিশচন্দ্র যেন দেহ ধরে অবতীর্ণ রচনার ছত্রে ছত্রে। পড়তে পড়তে মন উদ্বেল হয়ে ওঠে, ছুটে যেতে চায় অজানার অভিসারে। পরমহংসদেবের স্নেহধন্য গিরিশচন্দ্র যেন প্রকৃত ভক্তেরই মূর্তবিগ্রহ, ভক্তের ভগবান কথাটির স্থূল তাৎপর্য যে কি তা পরমহংস শ্রীরামকৃষ্ণ, ও তাঁর দুরন্ত ভক্ত গিরিশচন্দ্রের অপরূপ স্নেহ-বন্ধনের মাধ্যমেই বোঝা যায়। ভক্তি-সরস এই জীবন-উপাখ্যান যে কোন রহস্য কাহিনীর মতই রোমাঞ্চকর। লেখকের অপরূপ শৈলী কাহিনীকে এক বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছে। প্রচ্ছদ রুচিশোভন, ছাপাও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের।

লেখক—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রকাশনায়—আনন্দধারা-প্রকাশন, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

ভাস-বিরচিত প্রতিমা নাটক

মহাকবি ভাস ভারতীয় সাহিত্যে আদি নাট্যকার রূপেই পূজিত হন, তাঁর রচিত এই নাটককে বাঙলায় ভাষান্তরিত করে লেখক সমস্ত সুধী সমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হলেন। মূল নাটকটি সংস্কৃতভাষায় রচিত, রাম-সীতার কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠেছে এর আখ্যানভাগ। দুহাজার বছরেরও আগে লিখিত এই নাটকটি পড়লে, ভারতীয় নাট্য-সাহিত্যের মূলসূত্রটি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়, সুতরাং এ নাটকের যে একটা ঐতিহাসিক মূল্যও রয়েছে, সে কথা অনস্বীকার্য দৃশ্যকাব্যগুলির গঠন-সৌন্দর্যে সত্যই অভিভূত হতে হয়, ভাস প্রতিমা নাটকের আখ্যান ভাগ নিয়েছেন রামায়ণের অযোধ্যা ও অরণ্য-কাণ্ড থেকে ; নাটকটি সাত অঙ্কে সম্পূর্ণ। সেই সুন্দর অতীতে যখন নাট্য শাস্ত্রের বিধি-নিয়ম স্বভাবতঃই ছিল অপরিণত, তখনও মূল নাট্যকার সহজ সরল ভাষায় যে এরূপ বর্ণাঢ্য চিত্র ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন, এটা বড় কম শক্তির পরিচায়ক নয়। অনুবাদকের শৈলী সুন্দর ও সাবলীল, মূল রচনার সৌন্দর্য অনুবাদে এতটুকুও খণ্ডিত হয় নি। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই এক কথায় পরিচ্ছন্ন। রচনা—মহাকবি ভাস। অনুবাদক—শ্রীবামাপদ বসু, ৪৪, বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা পঁচাত্তর পয়সা।

বিপ্লবী বাঙালী / সাহিত্য-প্রকাশ

বাঙলার বিপ্লবযুগের ছায়ায় রচিত এই নাটকটি অনেকেরই ভাল লাগবে। নাটকের আখ্যানভাগ সম্পূর্ণ কাল্পনিক হলেও বিগত যুগের এক মহৎ আদর্শকে এর মাধ্যমে রূপায়িত করার প্রচেষ্টা হয়েছে। জায়গায় জায়গায় ভাবাবেগের আধিক্য দৃষ্ট হলেও মোটের উপর নাটকটি গতিশীল। চরিত্র চিত্রণেও পটু নাট্যকার। জয়ন্ত, ভবানীপ্রসাদ, জয়া, সর্বাণী প্রভৃতি চরিত্রগুলি বেশ উজ্জ্বল হয়েই ফুটে উঠেছে। প্রচ্ছদ ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি, লেখক—শ্রীপ্রফুল্লকুমার ঘোষ, পরিবেশক—সাহিত্য-প্রকাশ, ৫-১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। দাম—দুই টাকা।

কয়লা / বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

ভারতের খনিজ সম্পদের অন্যতম কয়লা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বহু তথ্য পরিবেশিত হয়েছে বর্তমান পুস্তিকাটিতে। কয়লার জন্মকথা থেকে সুরু করে তার ব্যবহার, শ্রেণীবিন্যাস, খননযোগ্য খনি সমূহের হিসাব, কয়লা থেকে উৎপন্ন অপরাপর বস্তুনিচয়, আধুনিক যুগে কয়লার ব্যবহার ও তার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি দরকারী সব খবরেরই খোঁজ পাওয়া যায় এই ছোট্ট বইখানিতে। শিক্ষার্থী ও অনুসন্ধিৎসু উভয় প্রকারেরই পাঠক উপকৃত হবেন এ রচনা পাঠ করে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সাধারণ। লেখক—শ্রীরামচন্দ্র ভট্টাচার্য, প্রকাশক—বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯। দাম—এক টাকা।

শ্রীমদ্ভগবত গীতা / প্রদীপিকা

হিন্দুর শ্রেষ্ঠতম ধর্মগ্রন্থ গীতার এই সঠিক বঙ্গানুবাদটি, ধর্মশীল বোদ্ধা পাঠকমাত্রকেই খুশী করে তুলবে। নানা উপদেশ পূর্ণ এই গ্রন্থে তত্ত্ব-কথা সংবাদ বা বাক্যালাপের মাধ্যমে পরিবেশিত হয়েছে, বক্তা স্বয়ং ভগবান 'শ্রীকৃষ্ণ', শ্রোতা তাঁর সখা অর্জুন। সংস্কৃত ভাষায় যাঁদের অধিকার নেই বঙ্গানুবাদটি পাঠ করলেই তাঁরা এই মহাগ্রন্থের ভাবধারা অনুসরণ করতে সক্ষম হবেন। অনুবাদকের শৈলী স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, টীকা বা ব্যাখ্যা করাতেও তাঁর নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে। আমরা এ গ্রন্থটি হাতে পেয়ে সুখী হয়েছি। প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। অনুবাদক—শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশনায়—প্রদীপিকা, ৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—ছয় টাকা।

খাদ্য ও পুষ্টি / বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

৺রাজশেখর বসুর স্মরণে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিবছর একটি করে বক্তৃতার আয়োজন করে আসছে। আলোচ্য রচনাটি বর্তমান বছরে প্রদত্ত বক্তৃতার সারাংশ। এই রচনায় খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা করেছেন লেখক, বিশেষভাবে বাঙালীর খাদ্য সম্বন্ধেই বলা হয়েছে, কারণ বর্তমানে বাঙালী জাতির ক্রমিক স্বাস্থ্য-অবনতি বিশেষভাবেই চোখে পড়ে। অতীতের সঙ্গে তুলনা করে আধুনিক গবেষণার পরিপ্রেক্ষিতে যা বলা হয়েছে তা লেখকের পরিশ্রমলব্ধ তথ্যানুসন্ধানেরই ফল, সুতরাং এ রচনা পড়ে সাধারণ বাঙালী পাঠক যে উপকৃত হবেন তাতে সন্দেহ নাস্তি। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথাযথ। লেখক—শ্রীরুদ্রেন্দ্রকুমার পাল, প্রকাশক —বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ, ২৯৪।২।১, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা-৯, দাম—এক টাকা।

জল-বনের কাব্য / আনন্দধারা প্রকাশন

আলোচ্য গ্রন্থটি এক উপন্যাস, সুন্দরবনের পটভূমিতে গড়ে উঠেছে এর আখ্যানভাগ। এ রচনা পাঠ করতে গেলে এ কথা মনে না হয়েই পারে না যে, কাহিনীর চেয়ে পটভূমিই যেন প্রধান, বস্তুত প্রকৃতিকে এমন অবারিতভাবে উপস্থিত হতে দেখা যায় খুব কম রচনার মাধ্যমেই। ছোট একটি মেয়ে বধূরূপে প্রথম পা দিয়েছিল সুন্দরবনের মাটিতে, দু'চোখ ভরে সেদিন ও তার পরবর্তী কয়টি বছরে যা দেখেছিল সে, যা উপলব্ধি করেছিল তারই ডায়েরী যেন এই রচনা। অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল এক সৌন্দর্যের ছোঁয়ায় উজ্জ্বল এ রচনার প্রতিটি ছত্র, পড়তে পড়তে একাত্ম হয়ে উঠতে হয় বিষয়বস্তুর সঙ্গে। লেখিকার বর্ণনাভঙ্গীও অপরূপ, সরল ভাষায় রচনার পরিবেশকে ছবির মত করে ফুটিয়েছেন তিনি; সুন্দরবনের একাংশ যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমরা লেখিকাকে ধন্যবাদ জানাই। প্রচ্ছদশিল্প সুষম, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখিকা—সরলা বসু, প্রকাশক—আনন্দধারা-প্রকাশন—৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। দাম—চার টাকা।

ভারত সংস্কৃতির উৎস ধারা / ভারতী লাইব্রেরী

পাণ্ডিত্যের প্রগাঢ়তা ও অসাধারণ প্রজ্ঞা বাঙলার যে বরেণ্য সুধীবরদের জাতির চিত্তে এবং রসিক-সমাজে একটি পরম শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে পণ্ডিতপ্রবর অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের স্থান তাঁদের পুরোভাগে। এ যুগে বোধ করি এই একটিমাত্র মানুষের প্রতি 'সর্ববিষয়ক চলন্ত অভিধান' বিশেষণটি অনায়াসে প্রয়োগ করা চলে। বাঙলাদেশের জ্ঞান ও সংস্কৃতি রত্নভাণ্ডারের সমৃদ্ধি সাধনে অমূল্যচরণের অবদান যে কত বিরাট ও গভীর তা বর্ণনা করা তো দূরের কথা, [illegible] বিষয়ে সম্যক উপলব্ধিও সহজ নয়। তাঁর সারাজীবন সাংস্কৃতিক অনুশীলনের এক নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস। তাঁর অভাবনীয় সাধনায় আমাদের সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্য যে কতখানি বির্ধিত হয়েছে তার তুলনা মেলা ভার। আলোচ্য গ্রন্থটি তাঁর কয়েকটি অতি মূল্যবান প্রবন্ধের সঙ্কলন। প্রবন্ধগুলি সংস্কৃতি, সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, সম্প্রদায়, নাটক, নাট্যশালা সম্পর্কিত। প্রতিটি প্রবন্ধই তাঁর সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে অতুলনীয় গবেষণা ও ব্যুৎপত্তির পরিচায়ক। এই অবনদ্য গবেষণামূলক প্রবন্ধগুলি নানাদিক দিয়ে জিজ্ঞাসু অনুসন্ধিৎসু পাঠককে আলোকিত করবে। অনেকগুলি দুর্মূল্য [illegible] গ্রন্থটির শোভা বর্ধন করেছে। [illegible] সঙ্কলন ও সম্পাদনে যথাক্রমে [illegible] পুত্র শ্রীসৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ [illegible] সুশীলকুমার গুপ্ত যথেষ্ট কৃতিত্ব [illegible] নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। এই [illegible] আমরা ব্যাপক ও বহুল প্রচার [illegible] করি। এই জাতীয় গ্রন্থের [illegible] প্রসার সকল দিক দিয়েই জাতীয় [illegible] সাধনে সহায়তা করে থাকে। [illegible] —ভারতী লাইব্রেরী, ৬ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—কুড়ি টাকা।

এই জীবন

শ্রীমৃণালকান্তি দাশ

আমাদের ঘরে ঘরে
জীবন-যন্ত্রণার, নীল অতলান্ত স্মৃতি,
অসংখ্য কঠিন শপথে...
হয় আজ, অতীতের ভাষাহারা গীতি।

তাই
নিবিড় কল্পনার অতলান্ত দ্বারে
ক্ষুধার বিরাট গর্ভ,
জীবিকার তেল দিয়ে জ্বালে,
জীবনের দীপ।

ওই দীপই
হতাশার ধ্বংসস্তূপকে, দিয়ে ফাঁকি
শূন্যতারে পূর্ণ করে,
শুধু কাছে ডাকি।।

আজ তাই
নির্বিঘ্ন স্বপ্ন লুণ্ঠিত এই জীবন,
শুধু খোঁজে—
সোনালী ধান-শীষের, উজ্জ্বল মন।...

একটি টেস্ট ও চারটি ইনিংস

সমস্ত পৃথিবীতে তখন আর্তনাদ। ক্রিকেট জগতে দেখা দিয়েছে অপ্রত্যাশিত অশান্তি, অহেতুক আতঙ্ক নৈরাশ্যের কালো অন্ধকারে বুঝি আচ্ছন্ন ক্রিকেট খেলার ভবিষ্যৎ। এ্যাটম বোমা আর জেট প্লেনের যুগে ক্রিকেট খেলা চলেছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। না আছে উত্তেজনা, না আছে প্রাণের তাগিদ। বুঝি এ যুগের সঙ্গে তাল দিয়ে চলতে পারছে না ক্রিকেট। তাই পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে হাহাকার। 'ব্রাইট ক্রিকেট' 'ব্রাইট ক্রিকেট' করে উৎসাহীদের শুধু মাথা খোঁড়াই সার।

ঠিক এমনি সময় অস্ট্রেলিয়ার বিসবেন মাঠে ১৯৬০ সালের ৯ই ডিসেম্বর শুরু হল অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের প্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ। মাঠ ভেঙ্গে পড়েছে দর্শকে। বঝি একটি দর্শক-আসনও খালি নেই। শুধু মাঠের মধ্যেই নয়। মাঠের আনাচে-কানাচে ভিড় জমিয়েছেন অজস্র লোক।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খেলছে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। সমগ্র শক্তি দিক দিয়ে কেউই কম যায় না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে আছেন ক্রিকেটে রাজকুমার ওরেল, আছেন এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অলরাউণ্ডার সোবার্স, আছেন রান সংগ্রহের আকণ্ঠ তৃষ্ণায় তৃষ্ণার্ত খেলোয়াড় কানহাই, আছেন ধীরস্থির। অথচ দ্রুত রান সংগ্রহকারী দুই ওপেনিং ব্যাটসম্যান কনরাড হাণ্ট ও ক্যামি স্মিথ, আছেন উইকেটের সামনে ও পেছনে উত্তপ্ত খেলোয়াড় আলেকজাণ্ডার, আর আছেন স্পিন বোলিং-এর যাদুকর ভ্যালেনটাইন ও রামাধীন, আর সবার ওপরে আছেন ফাস্ট বোলিং-এর ভয়ঙ্কর মূর্তি ওয়েস্লেসলি হল।

আর প্রতিপক্ষ দল---। সেখানে রিচি বেনোর পাশে আছেন নীল হার্ভে আর এ্যালান ডেভিডসন। আছেন নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান ও'নীল, আছেন গ্রাউটের মত নিপুণ উইকেট-রক্ষক। সিম্পসন, ম্যাকে আর ফ্যাভেলের মত ব্যাটসম্যান, সেই সঙ্গে আছেন পেস বোলার মেকিফ আর স্পিনার কুইন---।

রিচি বেনোকে টসে হারিয়ে ওরেল ব্যাট তুলে দিলেন হাণ্ট আর স্মিথের হাতে। ব্রিসবেনের আকাশে সেদিন বুঝি নতুন সূর্যের আলো। আকাশে-বাতাসে এক অভিনব সংগ্রামের সম্ভাবনা। খেলার শুরু থেকেই শুরু হল ব্যাট বলের লড়াই। সে লড়াই-এর সামনে মুখ নীচু করে বুঝি পালিয়ে গেল ডাল ক্রিকেট। ব্রাইট ক্রিকেটের উজ্জ্বলতায় প্লাবিত হয়ে উঠল সমস্ত মাঠ। এরোপ্লেনের প্রপেলারের মত ঘুরতে লাগল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের হাতের ব্যাট, সময়ের সঙ্গে তাল দিয়ে উঠতে লাগল রান।

হাণ্ট আর স্মিথ খেলার সূচনাতেই শুরু করলেন মারতে। ডেভিডসনের তৃতীয় আর চতুর্থ বল হাণ্ট পাঠালেন বাউণ্ডারী সীমানার বাইরে। স্মিথও নেই চুপ করে। রানের নেশায় তিনিও মত্ত। কিন্তু ডেভিডসনও চুপ করে থাকার মত লোক নন। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তিনি ফিরিয়ে দিলেন হাণ্ট, আর স্মিথ কানাহাইকে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তখন ৬৫ রান। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হারাল আরও একটি উইকেট। কিন্তু আগে দ্বিতীয় উইকেটের পতনে মাঠে নেমেছিলেন সোবার্স। এবার শুরু হল তাঁর তাণ্ডব নৃত্য। সে নৃত্যের সামনে অস্ট্রেলিয়ার বোলাররা তটস্থ। অসহায়ের মতো মাঠময় ছুটোছুটি করে ফিরলেন ফিল্ডাররা। রিচি বেনোর অবস্থা অসহনীয়। সোবার্সের উগ্র মূর্তির কাছে মিথ্যে হয়ে গেছে তাঁর বোলিং-এর সমস্ত কলা-কৌশল। দিনের শেষে তাঁর বোলিং-এর হিসেব দাঁড়াল ১৯, ওভারে ৭৩ রান। না আছে উইকেট, না আছে একটি মেডেন ওভার।

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ রান করেছে বিদ্যুৎগতিতে সত্যি, কিন্তু সেই সঙ্গে উইকেটও হারিয়েছে। দিনের শেষে ব্যাট হাতে প্যাভেলিয়নে ফিরে এলেন আলেকজাণ্ডার আর রামাধীন. ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান তখন ৭ উইকেটে ৩৫৯। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তৃতীয় উইকেটে পড়েছিল ৬৫ রানে আর চতুর্থ উইকেটে পড়ল ২৩৯-এর মাথায়। সে উইকেট সোবার্সের। ১৩২ রান করে তিনি আউট হলেন, এছাড়া প্রথম দিন ওরেলের রাজকীয় ৬৫ আর সলোমনের প্রয়োজনীয় ৬৫ রান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পরের দিন রামাধীন আউট হয়ে যাবার পর খেলতে নামলেন হল। অপর প্রান্তে তখন আলেকজাণ্ডার। শুরু হল মারের খেলা। রানের পর রান মারের পর মার। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের চারশ রান পুরলে মেকিফ নতুন বলে বোলিং শুরু করলেন। হল আর আলেকজাণ্ডার তাঁর প্রথম ওভারে নিলেন ১৯ রান। আর তিন ওভারে মেকিফ দিলেন ৩৯ রান। মাত্র ৩৫ মিনিটে হল আর আলেকজাণ্ডার করলেন ৫০ রান। আর হল একা ৬৯ মিনিটে করলেন ৫০। তারপর এগিয়ে মারতে গিয়ে হলেন স্টাম্পড। ঘড়ির কাঁটাকে পেছনে ফেলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ৪৪৫ মিনিটে ৪৫৩ রান করে শেষ করল প্রথম ইনিংস।

দ্বিতীয় দিন খেলতে নেমে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানরা তারস্বরে আর্তনাদ করে উঠলেন হলের জোরালো আর বাম্পার বল 'ব্যাপ ব্যাগ' বলিয়ে ছাড়ল তাঁদের। ম্যাকডোনাল্ড বারবার আঘাত পেলেন হলের বলে। ৬৩ মিনিট ধরে হার্ডে পিচের মাটি ঠুকে গেলেন মাত্র ১৫ টি রান করে। বারবার আউট হবার সুযোগ দেবার পর সিম্পসন আউট হলেন ৯২ রান করে। ও'নীল চালালেন টিকে থাকার সংগ্রাম আর মাত্র ২৮ রান করে সেদিনের মত সে সংগ্রামে জয়ী হলেন। দ্বিতীয় দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়ার রান উঠল ৩ উইকেটের বিনিময়ে ১৯৬।

পরের দিন ফ্যাভেলকে সঙ্গে নিয়ে ও'নীল নামলেন মাঠে। খেলার শুরু থেকে ও'নীল খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে চললেন। ৪৭, ৫২ আর ৫৪ রানের মাথায় পর পর তিনবার লাইফ পেয়ে ও'নীল যেন ফিরে পেলেন নিজেকে। অপর প্রান্তে ফ্যাভেল খেলে যাচ্ছেন মারকুট্টে খেলোয়াড়ের মত। ভ্যালেনটাইনে পর পর দু'টো বল তিনি ওভার বাউণ্ডারী করলেন। তারপর রান আউট হয়ে গেলেন ৪৫ রানের মাথায়। ডেভিডসন নিখুঁতভাবে ব্যাটিং করে করলেন ৪৪ রান। কিন্তু ও'নীল যে ও'নীল ১৪৮ মিনিটে মাত্র ৬টা বাউণ্ডারী মেরে ৫০ রান করেছিলেন, সেই ও'নীলই ৭০ থেকে ১২০ রানের মধ্যে মারলেন ১১টা চার ও'নীলের ঠেঙানীতে অস্ট্রেলিয়ার মিনিটে এক রান করে উঠতে লাগল।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান-সংখ্যাকে পেছনে ফেলে অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে গেল। পাঁচ উইকেটে হল ৪৬৯ রান। ও'নীল আর ডেভিডসন খেলছেন ভালো। কিন্তু তারপর। তারপর হল---।

● ও'নীল

অস্ট্রেলিয়ার শেষ পাঁচটি উইকেট পড়ে গেল মাত্র ৩৬ রানের মধ্যে। শেষ খেলোয়াড় ও'নীল আউট হলেন ১৮১ রান করে। শেষ পাঁচটির মধ্যে চার উইকেট পেলেন হল। ৫০৫ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে অস্ট্রেলিয়া এগিয়ে রইল ৫২ রানে।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করল তাদের স্বভাবমতই। ঝড়ের বেগে উঠতে লাগল রান। কিন্তু ডেভিডসন। তাঁকে সামলানো দায়। ইনিংসের প্রথমেই ৬ রানের মাথায় স্মিথকে আর ১৪ রানের মাথায় সোবার্সকে তিনি আউট করে দিয়েছিলেন। কানহাই আর ওরেল খেলার মোড় ফেরাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু ১২৭ রানের মাথায় ডেভিডসন আউট করে দিলেন কানহাইকে নিজস্ব ৫৪ রানের মাথায়। তারপর ওরেল। ১৫১ মিনিটে ৬৫ রান করে ওরেলও ডেভিডসনের বলে আউট। ল্যাসলি কোন রান করার আগেই ডেভিডসনের বলে বোল্ড। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অবস্থা শোচনীয়। বুঝি পরাজয়ের পথেই এগিয়ে চলল ওরেলের দল। চতুর্থ দিনের শেষে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান হল ৯ উইকেটে ২৫৯। পঞ্চম দিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শেষ জুটি হল আর ভ্যালেনটাইন ৪০ মিনিট খেলে যোগ করলেন ২৫ রান। ২৮৪ রানে শেষ হয়ে গেল ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় ইনিংস। ডেভিডসন ২৪'৬ ওভার বল করে ৬টি উইকেট দখল করলেন ৮৭ রানের বিনিময়ে।

অস্ট্রেলিয়ার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দু' ইনিংস মিলে করেছে ৭৩৭ রান। আর অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসেই ৫০৫ রান। মাত্র ২৩৩ রান করলেই জিততে পারবে তারা। হাতে আছে ৩১২ মিনিট সময়। সুতরাং জয়লাভ হাতের মুঠোর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার। একান্ত যদি তা না হয়, ক্ষতি নেই, পরাজয়ের প্রশ্ন তো আর আসবে না। কিন্তু ভয় ঐ হলকে। কে জানি হয়তো বাম্পারের ভয়ে বিহ্বল করে দেবে অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের। কিম্বা ওরেল, ভ্যালেনটাইন আর রামাধীন। কে জানে কি আক্রমণী মন্ত্র, কি ভয়ঙ্কর অস্ত্র লুকান আছে ওদের হাতে।

অস্ট্রেলিয়া শুরু করল তাদের দ্বিতীয় ইনিংস। কিছুক্ষণের মধ্যেই অবস্থা হয়ে উঠল ঘোরাল। স্পষ্ট বোঝা গেল হারতে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের লজ্জা নেই, কিন্তু তারা খেলে হারতে চায়। তাই প্রথম থেকেই শুরু হল সংগ্রাম। এক দলের রান করার, অপর দলের রান করতে না দেবার।

হলের দ্বিতীয় ওভারে সিম্পসন আউট। বল তাঁর ব্যাটে লেগে স্কোয়ার লেগের দিকে চলে গেল। ঝাঁপিয়ে পড়ে অতিরিক্ত খেলোয়াড় গিবস সেই ক্যাচ ধরলেন। আর তারপরেই নীল হার্ভের অসম্ভব ক্যাচ ধরলেন সোবার্স। সে ক্যাচ ধরতে সোবার্স পারলেন না নিজেকে অক্ষত রাখতে। একটা আঙুল ভেঙেছিল সোবার্সের। ম্যাকডোনাল্ড টিকে রইলেন কোনরকমে। ২৪ মিনিট কোন রান করতে পারলেন না ও'নীল। লাঞ্চের সময় ৭০ মিনিটে অস্ট্রেলিয়া করল ২৮ রান। তাও দু'টি উইকেট হারিয়ে।

লাঞ্চের পর ও'নীল হাত খুললেন। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। হলের বলে পরপর দু'বার লেট কাট করে বাউণ্ডারী করার পর লোভ সামলাতে পারলেন না। আবার গেলেন বল কাটাতে কিন্তু এবার কাটা পড়লেন আলেক-জাণ্ডারের হাতে। তারপরই ওরেলের বলে

● সোবার্স

বোল্ড হলেন ম্যাকডোনাল্ড। ও'নীল আউট হবার পর ফ্যাভেল এসে খাবি খেতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত বারকয়েক প্রাণে বাঁচার পর মরলেন দু-চারবার। আর তারপরই হলের বল স্কোয়ার কাট করে তুলে দিলেন সলোমনের হাতে।

ঘড়ির কাটা ঘুরছে। বেলা তখন দু'টো বেজে কুড়ি মিনিট। অস্ট্রেলিয়ার ৫ উইকেটে ৫৭ রান। সাড়ে দশ ওভার বল করে হল ৩৭ রানের বিনিময়ে পেয়েছেন ৪টি উইকেট। ওরেল দেখলেন হল ক্ষেপে গেছে। এখনই সে যেন একটা কিছু অভাবনীয় অঘটন ঘটাতে চায়। তাই আর দু' ওভার বল করানর পর হলকে সরিয়ে নিলেন ওরেল। তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। জিততে গেলে অস্ট্রেলিয়াকে এখন ২০০ মিনিটে করতে হবে ১৭৬ রান। তাও আবার শেষ পাঁচজন খেলোয়াড়কে দিয়ে। সুতরাং জয়-----। বিজয়লক্ষ্মী তাঁর গতি পরিবর্তন করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার ৮০ রানের সময় রামাধীনের বলে স্লিপে ক্যাচ তুললেন ম্যাকে। কিন্তু গিবস ধরে রাখতে পারলেন না সে ক্যাচ। জীবন ফিরে পেয়ে ৬০ মিনিটে ম্যাকে ডেভিডসনের সংগে যোগ করলেন ৩৫ রান। কিন্তু ম্যাকে এগুলেন না বেশীদূর। অস্ট্রেলিয়ার ৯২ রানের মাথায় ২৮ রান করে ম্যাকে বোল্ড হলেন রামাধীনের বলে। বেনো এসে যোগ দিলেন ডেভিডসনের সংগে। কিন্তু তিনিও যেন ঠিকমত খাপ খাওয়াতে পারলেন না। চা-পানের সময় ডেভিডসন (১৬) আর বেনো (৬) ফিরে এলেন প্যাভেলিয়নে। অস্ট্রেলিয়ার হাতে তখন ৪টি উইকেট। কিন্তু জিততে গেলে করতে হবে ১২০ মিনিটে ১২৩ রান।

কোন আশা নেই অস্ট্রেলিয়ার। ৬ উইকেটে ১১০ রান। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলাররা বাকী চারটে উইকেট দখল করার জন্যে চালালেন প্রাণপণ সংগ্রাম। ডেভিডসন আর বেনো ঘুরিয়ে দিলেন খেলার মোড়। উঠতে লাগল রান। অস্ট্রেলিয়ান শিবিরে জাগল নতুন প্রাণের সাড়া। খেলা শেষ হতে তখন মাত্র ৩০ মিনিট বাকী। আর জেতার জন্যে অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন ২৭ রান। মোট রান হয়েছে ৬ উইকেটে ২০৬। এখনও হাতে আছে চারটে উইকেট। হয়তো সে চারটে উইকেট ঘরেই থাকবে। ডেভিডসন আর বেনো সামলে নিয়েছেন খেলা।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের আক্রমণের নড়ে গেছে মেরুদণ্ড। ওরেল সরিয়ে নিয়েছেন হলকে। নিজে খেয়েছেন মার। রামাধীনকে তুলো ধুনে ছেড়েছেন বেনো আর ডেভিডসন। মার খেয়েছেন সোবার্সও। ৯৫ মিনিটে বেনো-ডেভিডসন করলেন ১০০ রান। এর মধ্যে ডেভিডসন ৬০ আর বেনোর ৪১ রান। সাড়ে পাঁচটার সময় নতুন বল নিলেন ওরেল। তুলে দিলেন হলের হাতে। খেলার শেষ ৩০ মিনিট বাকী। ২৭ রান করলে জিতবে অস্ট্রেলিয়া। তাদের হাতে তখনও আছে ৪টে উইকেট। নতুন বলে হল ফল পেলেন না! সময়ের সঙ্গে কমতে লাগল রানের ব্যবধান। হার—ওয়েস্ট ইণ্ডিজের, নির্ঘাৎ পরাজয়।

বোধহয় তাই। তা না হলে ডেভিডসন কেন রান আউট হলেন না। ৫টা ৪৫ তখন। ১৫ মিনিটে অস্ট্রেলিয়াকে করতে হবে ১০ রান। হলের আরও একটা ওভার শেষ। বেনো

গেছে পাঁচ মিনিট। হয়েছে ১টা রান। অস্ট্রেলিয়ার দরকার ৯ রান। সোবার্সের পরের ওভারে হয়ে গেল পর পর দু'টো রান। আর ৭ রান প্রয়োজন। অন্তরায় এসে হঠাৎ বুঝি সেতারের তার ছিঁড়ে গেল। একটা মারাত্মক শর্ট রান নিতে গিয়ে ডেভিডসন রান আউট হয়ে গেলেন। সলোমনের অব্যর্থ লক্ষ্য ভেঙ্গে দিল উইকেট। ৮০ রান করে ফিরে গেলেন ডেভিডসন।

খেলা শেষ হতে তখনও ৬ মিনিট বাকী। অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন ৭ রান। বড়জোর আর দু'টো ওভার খেলা হতে পারে। সোবার্সের সপ্তম বলে (৮ বলে ওভার খেলা হয়েছিল) নবাগত গ্রাউট একটা রান নিলেন। কমলো আর এক রানের ব্যবধান। কিন্তু সমস্ত মাঠ বুঝল গ্রাউট ভুল করেছেন। পরের ওভার যে হলের। সোবার্সের শেষ বলে হাজার চেষ্টা করেও রান নিতে পারলেন না বেনো।

হলের আট বলের ওভার। বোধ হয় খেলারও শেষ ওভার। জেতার জন্যে অস্ট্রেলিয়ার ৬ রান চাই। হাতে আছে তিনটে উইকেট। হলের প্রচণ্ড বল এসে গ্রাউটের তলপেটে লাগল। বলটা পড়ল তিনজন ফিল্ডারের নাকের ডগায়। দমবন্ধ হয়ে আসছে গ্রাউটের। হঠাৎ দেখলেন বেনো ছুটে আসছেন। ফিল্ডারদের কিছু বোঝার আগে একহাতে পেট চেপে ধরে গ্রাউট পৌঁছে গেলেন উইকেটের অপর প্রান্তে। মেজাজ বিগড়ে গেল হলের। ও বলে রান হয় কি করে। ফিরে চললেন বেনোর বিরুদ্ধে বল করতে। হলের তখনও সাতটা বল বাকী। অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন ৫ রান। ওরেলের নিষেধকে উপেক্ষা করে হল ছাড়লেন বাউন্সার। উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল সমস্ত মাঠ। বেনোর ব্যাটে বল লেগেছে, আর সে বল আলেকজাণ্ডারের হাতে। শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে আলেকজাণ্ডার লুফে নিলেন বলটা—আউট, বেনো আউট। শেষ হয় ৫২ রানের একটি অধিনায়কোচিত ইনিংস।

মেকিফ ব্যাট নিয়ে মাঠে নামলেন। প্যাভেলিয়নে প্যাড পরে তখন একা বসে ক্লাইন। হলের তৃতীয় বল ঠেকালেন ব্যাট দিয়ে। চতুর্থ বল মেকিফ ফসকালেন। বল আলেকজাণ্ডারের গ্লাভসের মধ্যে। তারই মধ্যে ডাক দিয়ে গ্রাউট পৌঁছে গেলেন অপর প্রান্তে। মেকিফ ছুটলেন ক্রীজের দিকে। হল রাগে জ্বলছিলেন। আলেকজাণ্ডার বল ছুঁড়েদিলেন হলের কাছে। সঙ্গে সঙ্গে হল বল ছুঁড়ে মারলেন উইকেটে। মিড অন থেকে কোনরকমে ঝাঁপিয়ে পড়ে ওভার থ্রো রান বাঁচালেন ভ্যালেনটাইন।

প্রয়োজন আর ৪টি রানের। হলের ওভার শেষ হতে তখন চার বল বাকী।

হলের পঞ্চম বল গ্রাউট উঁচু করে মারলেন। সমস্ত মাঠ শিউরে উঠল। কানহাই ক্যাচ ধরার জন্যে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। বল নেমে আসছে তাঁর হাতে। গ্রাউট আউট, অবধারিত আউট। কিন্তু ও কি? হঠাৎ বিরাট লাফ দিয়ে কানহাই-এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন হল। সেই সঙ্গে বলও পড়ল মাটিতে। রেহাই পেলেন গ্রাউট। স্তম্ভিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়রা, সমস্ত মাঠ হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। এ সুযোগে গ্রাউট রানও নিয়ে নিলেন একটা।

জয়ের জন্যে অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন ৩ রান। হলের ওভারের আছে আর ৩ বল।

হলের ষষ্ঠ বল। প্রাণপণে লেগের দিকে ব্যাট চালালেন মেকিফ। বল ছুটল বাউণ্ডারীর দিকে। নির্ঘাৎ চার রান। সুতরাং অস্ট্রেলিয়া জিতলো। গ্রাউট আর মেকিফ রান নিচ্ছেন। কিন্তু কোথা থেকে ছুটে এসে চিলের মত ছোঁ মেরে বলটা তুলে নিয়ে হান্ট ছুঁড়ে দিলেন আলেকজাণ্ডারের হাতে। আলেকজাণ্ডার ঝাঁপিয়ে পড়লেন উইকেটের ওপর—গ্রাউটের আগেই। গ্রাউট আউট। কিন্তু ততক্ষণে ২ রান হয়ে গেছে। দু' দলের রান-সংখ্যা তখন সমান সমান ৭৩৭।

জিততে হলে অস্ট্রেলিয়াকে করতে হবে আরও ১ রান। হলের দু'বল বাকী। শেষ খেলোয়াড় ক্লাইন উইকেটের সামনে।

হলের সপ্তম বল। ক্লাইন কোনরকমে বলটাকে লেগের দিকে ঠেলে দিয়ে দৌড়তে শুরু করলেন। স্কোয়ার লেগে, ছিলেন সলোমন। বলটা তুলে নিয়ে তিনি ছুঁড়ে মারলেন উইকেটে। অব্যর্থ লক্ষ্য। আর একটি রান যোগ হবার আগেই আউট হয়ে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার দশজন খেলোয়াড়।

রান হল দু' দলের সমান সমান। দু' ইনিংস মিলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ৭৩৭ রান, অস্ট্রেলিয়ারও তাই। টাই হল খেলা। পৃথিবীর টেস্ট ইতিহাসের সর্বপ্রথম টাই। আনন্দে সেই ঐতিহাসিক খেলার খেলোয়াড়রা দু' হাত তুলে নাচতে লাগলেন। গ্যালারী ভেঙ্গে সকলে নেমে পড়লেন মাঠে। এই ঐতিহাসিক খেলার জন্যে সকলেই খুশী। কিন্তু হল! তাঁর বুঝি মেজাজ ভার—সবই শেষ হয়েছে, কিন্তু তাঁর ওভারের শেষ অর্থাৎ অষ্টম বলটা যে করা হয় নি!---

★ মাসিক বসুমতীতে লেখা ও ছবি পাঠানোর নিয়মাবলী ★

১। যে কোন প্রকাশযোগ্য রচনা—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, জীবনী, সত্যঘটনা, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা, রহস্য-মূলক রচনা অর্থাৎ পাঠক-পাঠিকার পক্ষে আকর্ষণীয় ও আগ্রহ-উদ্দীপক লেখা আমরা সকল সময়েই প্রকাশার্থে বিবেচনা করে থাকি।

২। দীর্ঘ রচনা বা ধারাবাহিক প্রকাশিতব্য লেখা সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠাবার পূর্বে পত্রযোগে লিখিত মতামত গ্রহণ করতে হবে।

৩। রচনা সচিত্র হলে বা লেখার সংগে ছবি (আলোক-চিত্র বা অঙ্কিতচিত্র) থাকলে সেই লেখা প্রকাশের প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে।

৪। রচনার নকল রেখে রচনাটি পাঠাবেন। কেন না, সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ছাপাখানার কাগজের ভিড়ে রচনা হারিয়ে যেতে পারে। কিংবা ডাকের গোলমালেও রচনা হারিয়ে যেতে পারে।

৫। কোন রচনা বা ছবির মনোনয়ন বা অমনোনয়নের সংবাদ জানতে হলে বা অমনোনীত রচনা বা ছবি ফেরৎ নিতে হলে তৎসহ উপযুক্ত মূল্যের ডাকটিকিট অবশ্যই প্রেরণীয়।

৬। কবিতা সম্পর্কে কোন মতামত জানানো হয় না বা অমনোনীত কবিতা ফেরৎ পাঠানো হয় না।

৭। কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখাই বাঞ্ছনীয়। উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত পাণ্ডুলিপি ছাপাখানার জন্যে অচল।

৮। পাণ্ডুলিপিতে রচনার শেষে লেখক বা লেখিকার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে।

৯। প্রকাশযোগ্য ও যথোপযুক্ত রচনা ও ছবির জন্য সম্মান দক্ষিণা দেওয়া হয়।

১০। প্রতিটি রচনা সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। খামের উপর "মাসিক বসুমতী"—এই কথাটি অবশ্যই লিখতে হবে।

১১। লেখা পাঠালেই তা সংগে সংগে দেখার বা লেখা মনোনীত হলেই তা সংগে সংগে প্রকাশ করার কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া চলে না। প্রত্যহ অসংখ্য লেখা আসে, প্রতিটি পাঠান্তে প্রকাশের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সময়সাপেক্ষ।

১২। আলোকচিত্র বা অঙ্কিতচিত্রের পিছনে ছবির বিষয়বস্তু ও শিল্পীর নাম এবং ঠিকানা অবশ্যই লিখতে হবে।

কেমন করিয়া মূল কোষ বিভক্ত ও পুনর্বিভক্ত হইয়া পরিণত মানুষের দশ কোটি কোষ সৃষ্টি করে?

ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীনগুলি কি, যাহাদের উপর বংশগতি নির্ভরশীল? যাহারা ঠিক করে সন্তানের গাত্রবর্ণ পিতার ন্যায় অথবা চুলের রং মাতার চুলের রংয়ের ন্যায় হইবে। এহ বাহ্য, শিশুর শারীরিক ও মানসিক গুণাবলী এবং উহাদের উৎকর্ষর ঊর্ধ্বসীমাও ইহারা নির্ধারণ করে। বংশানুক্রম মতবাদ অধুনা খুবই স্বাভাবিক ও জনপ্রিয় হইলেও ইহাকে প্রথম বৈজ্ঞানিক রূপ দেন হার্বার্ট স্পেন্সার, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে। তাহার মতবাদের সংস্কার সাধিত হয় ডারউইন, গ্যালটন এবং ওয়াইজম্যান কর্তৃক, যথাক্রমে ১৮৬৮ (উদ্বর্তনবাদ), ১৮৭৫ (বিবর্তনবাদ) এবং ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের (অভিব্যক্তিবাদ)। অবশ্য স্পেন্সার-এর মূল বক্তব্য অপরিবর্তিত থাকিয়া যায়। সব মতবাদই বলে সন্তান কোন কোন দোষগুণ বংশানুক্রমে জনক-জননীর নিকট হইতে পায় এবং কিছু কিছু লাভ করে পারিপার্শ্বিক হইতে। এখন এই জীনগুলি কি? কেবল বলা সম্ভব ইহাদের অস্তিত্ব আছে এবং ইহারা বিশেষ নিয়মে সক্রিয়, অধিক নহে।

এত অগ্রসর হইবার পর আধুনিক বিজ্ঞান প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ রহস্য মানব-জন্মের যবনিকা সবে উত্তোলন করিতে সুরু করিয়াছে।

আদিম মানুষের সময়জ্ঞান ছিল যৎসামান্য, সুতরাং সঙ্গমকাল হইতে কয়েক মাস পরে শিশুর জন্ম সে একসূত্রে গ্রথিত করিতে ছিল নিতান্তই অপারগ। কাজেই তখন শিশুজন্ম ছিল এক অপার্থিব ঘটনা। প্রথম দিকের গবেষকরা কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে মানব-জীবন, বা কোন স্তন্যপায়ীর জীবন ডিম্বজ। পক্ষী ও সরীসৃপকুলের ডিম্ব স্পষ্টতই দৃষ্টিগোচর হয়। তবে দুইশত পাউণ্ড বা ততোধিক ওজনের মানুষ প্রায় অদৃশ্য ডিম্ব হইতে জন্মলাভ করে কী করিয়া? এ্যারিস্টটল জন্ম সম্বন্ধে প্রাথমিক গবেষণা করিয়াছিলেন। তাঁহার ও ভারতের আয়ুর্বেদীয় মত এই যে, নারীর ঋতুস্রাবের সহিত পুরুষের বীর্য মিলিত হইলে সন্তান হয়।

জন্ম সম্বন্ধে আধুনিক মতবাদের ভিত্তি স্থাপয়িতা ইংরেজ ডাক্তার হার্ভে, সপ্তদশ শতকের বিখ্যাত দেহতত্ত্ববিদ্, যিনি রক্ত চলাচল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। গর্ভিণী হরিণী বধ করিয়া তিনি ভ্রূণ হইতে নবজীবনের বৃদ্ধি লক্ষ্য করেন।

নার্স মিত্র

এ্যান্টন ভ্যান লীউয়েনহোক্ প্রথম মানবের শুক্রকোষ লক্ষ্য করেন অণুবীক্ষণের সাহায্যে, তিনি উহার নাম দেন 'Animal-cules'। তিনি শুক্রকীটকেই জন্ম-ব্যাপারে একতম বস্তু মনে করিতেন। নারীর ডিম্বর অস্তিত্ব বা প্রয়োজনীয়তা তিনি উড়াইয়া দেন। রেজিনার দ্য গ্রাফ্ প্রথম ফলিকৃল্ দেখিতে পান নারীর ডিম্বাশয়ে।

ফন্ হেলার ভেড়ীর উপর পরীক্ষা করিয়া সিদ্ধান্ত করেন যে, ডিম্বাশয় হইতে কোন কিছু জরায়ুতে আসে বলিয়াই ওইখানে ভ্রূণ সৃষ্টি হওয়া সম্ভব।

জেনেভা নগরের প্রিভোস্ট ও ডুমা ১৮২৪-এ আবিষ্কার করিলেন যে, শুক্রকীটের উৎপত্তিস্থল পুরুষের অণ্ডকোষ।

নারীর ডিম্ব আবিষ্কারের কৃতিত্ব ফন্ বেয়ার-এর। কুকুরের উপর পরীক্ষা করিয়া তিনি ইহা আবিষ্কার করেন ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে।

১৮৭৫-এ হার্টউইগ্-এর যুগান্তকারী আবিষ্কার—ডিম্ব ও শুক্রকীট মিলিত হইয়া প্রাণের জন্ম দেয়—প্রজনন বিজ্ঞানকে আধুনিক করিয়া পূর্ণ প্রতিষ্ঠা দান করে।

এখন আমরা জানি মনুষ্যজীবন নারীর ডিম্বাশয়ে সুরু হয়। জরায়ুর দুই দিকে অল্প উপরে বাদামের ন্যায় প্রায় দুই ইঞ্চি দীর্ঘ দুইটি ডিম্বাশয় অবস্থিত। ইহাদের অল্পদূর দিয়া দুইটি নল দুই দিক হইতে আসিয়া জরায়ুতে মিলিয়াছে, ইহারা ডিম্ববাহী নল। ডিম্বাশয়ের নিকট ইহাদের মুখ প্রস্ফুটিত ফুলের মতন. ইহারা চার ইঞ্চির বেশী দীর্ঘ হয় না. আবিষ্কারক ইতালীয় ডাক্তার গ্যাব্রিয়েল্ ফ্যালোপিয়াস্-এর নামে বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসরণে ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে ফ্যালোপিয়ান টিউব, অর্থাৎ ফ্যালোপিয়াস্ আবিষ্কৃত নল

নারীর কোষসংখ্যা কেহ গুণিতে সক্ষম হন নাই। নারীর ডিম্বকোষদ্বয়ে

চার লক্ষ কুড়ি হাজার কোষ একবারমাত্র গোণেন সুইডেনের জনৈক দেহ-বিজ্ঞানী। মাসে একবারমাত্র একটি ডিম্ব ত্যাগ করে ডিম্বকোষ, ইহাও জীবনের উর্বরকালে মাত্র, সুতরাং চার শতরও কম কোষ ডিম্বে পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

গবেষণায় জানা গিয়াছে গড়ে ২৮ দিন অন্তর নারীর ডিম্ব স্খলন হয়। ডিম্বাশয়ের যে ডিম্বটি যথোচিত পূর্ণতা লাভ করে ইহাই বাহির হইয়া আসে, ইহার সহিত কামক্রীড়া সম্পর্কহীন। উহা ফ্যালোপিয়ান নলের মধ্য দিয়া জরায়ুতে আসে।

সাধারণত ঐ নলের মধ্যে, কচিৎ জরায়ুর মধ্যে, গর্ভাধান ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। জরায়ু ভেদ করিয়া শুক্রকীট নারীর ডিম্বের সহিত মিলিত হয়। ডিম্বটি সম্মুখে আসিবামাত্র শুক্রকীটের দল উহা ঘিরিয়া ফেলে এবং প্রথম কীটটি উহার গাত্রে ছিদ্র করিয়া স্বীয় মস্তক ও গ্রীবা ঢুকাইয়া দেয়, কীটের মধ্য ও নিম্ন দেহাংশ প্রবেশ করে না। বাহিরের অংশ ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া যায়। ডিম্ব ও শুক্রকীটের মিলনের পর প্রথমটির চারিপাশে একটি আবরণ গড়িয়া উঠে, ফলে অন্য কোন কীট উহার অভ্যন্তরে আসিতে অক্ষম।

নলের ভিতরকার ডিম্ব, এমন কি ডিম্বাশয় দুইটিও শুক্রকীটকে রাসায়নিক আকর্ষণে টানে; মনে করা হয় ডিম্ব এবং শুক্রকীটের মধ্যে পারস্পরিক আকর্ষণী শক্তি স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান। শুক্রকীটের ডিম্বাভিমুখী প্রচণ্ড গতির অন্যান্য কারণও বর্তমান।

মিলন হইলেই ডিম্বটি উর্বরতা পায় এবং প্রাণবন্ত হইয়া বিভক্ত হইতে হইতে ও বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে জরায়ুর অভ্যন্তরে আসে এবং উহার শ্লৈষ্মিক ঝিল্লিপূর্ণ গাত্রে প্রোথিত হইয়া বাড়িতে থাকে ক্রমানুয়ে। ধীরে ধীরে কোষসমূহ নানা কোষসমন্বিত অংগ-প্রত্যংগে পরিণত হয় ও একটু একটু করিয়া মনুষ্য দেহে পরিণতি লাভ করে।

ভ্রূণ মাতৃগর্ভে রক্তবাহগুলি হইতে পুষ্ট হয়। তৃতীয় মাসে গর্ভফুলের (Placenta) উৎপত্তি; ভ্রূণ ও ফুলের সংযোগকারী অংশ ভ্রূণের নাভিসংলগ্ন থাকিয়া ক্রমে বড় হইয়া উঠে। শিশু জন্মের প্রায় আধঘণ্টা পর এই গর্ভফুল জরায়ুচ্যুত হয়।

প্রথম মাসের শেষে ভ্রূণ নিজস্ব চলাচল প্রক্রিয়াসম্পন্ন হয়। এ সময় খানিকটা বুঝা গেলেও অন্য প্রাণীর ভ্রূণ ও মানব ভ্রূণের পার্থক্য ঠিক দৃষ্টিগোচর হয় না। মেরুদণ্ড ও হৃৎপিণ্ড ইতিমধ্যে গঠিত হইয়া যায়।

নাটকের গতি এবার বেশ দ্রুত। দ্বিতীয় মাসের শেষে উহা ইঞ্চিখানেক লম্বা হয়; তৃতীয় মাসের শেষে ভ্রূণর দৈর্ঘ্য তিন ইঞ্চি এবং ওজন প্রায় দেড় ছটাক। নখ, হাড় ইত্যাদির গঠন এই সময়েই সুরু হয়। দুইটি পর্দার স্তর ভ্রূণ ঘিরিয়া রাখে। ইহাকে খাদ্য, জল ও বায়ু সরবরাহ করিয়া টিকাইয়া রাখে গর্ভফুল। ভ্রূণের দেহে মাতার রক্ত যায় না, এরূপ ধারণা ভ্রমাত্মক।

চতুর্থ মাসের শেষে ভ্রূণ ইঞ্চি পাঁচ ছয় লম্বা হয় এবং উহার গড়পড়তা ওজন হয় আউন্স পাঁচেক। পঞ্চম মাসের শেষে আট হইতে দশ ইঞ্চি এবং ষষ্ঠ মাসের শেষে ইঞ্চি বারো দৈর্ঘ্য হয় ভ্রূণের; এ সময় উহা প্রায় সেরখানেক ভারী হইয়া পড়ে। উহা নড়াচড়া করিতে সক্ষম হয় এই সময়েই। এই সময় জন্মিলে উহা বাঁচিতে পারে, বিশেষ যত্ন পাইলে, কিন্তু এই সময়ে প্রসব হয় না। দশম মাসে উহা পূর্ণাঙ্গ হইয়া উঠে। তখন উহার দৈর্ঘ্য হয় কুড়ি ইঞ্চি এবং ওজন সাত পাউণ্ড-এর মত। মোটামুটি বলা চলে দশ মাস দশ দিনের সামান্য আগে বা পরে সন্তান প্রসূত হয়।

প্রথমেই জরায়ু মুখ উন্মুক্ত হয় এবং জরায়ু গ্রীবায় শিশুর মস্তকে নামিয়া আসে। অবশেষে 'পানমুচি' ভাঙিয়া গেলে শিশুর বহির্গমন সহজ হয়। জরায়ু মুখ স্ফীত হইয়া প্রসবকার্য সুগম করে।

দীর্ঘদিনের অতি জটিল ঘটনা-পরম্পরা এইরূপে সমাপ্ত হয়। একটির পর একটি ঘটনা নিখুঁতভাবে সহযোগিতা করিয়া প্রকৃতির শ্রেষ্ঠকীর্তি মানব শিশুর জন্ম দান করে।

আদিযুগের প্রহসন নাটক

শ্রীরাসবিহারী ভট্টাচার্য

জীবনের ব্যথা-বেদনাকে নিয়ে গড়ে উঠেছে ট্র্যাজেডি আর কমেডিতে হয়েছে হাসি-আনন্দের রূপায়ণ। এই কমেডি আবার দুইভাগে বিভক্ত। একশ্রেণীর কমেডিতে দেখি জীবনের হাসি এবং আনন্দের চরম রূপায়ণ। কোন গভীর সমস্যাকে নিয়ে ব্যথা-বেদনার বেড়াজালকে অতিক্রম করে হাসি-আনন্দের মধ্যে মিলন মাধুরিমার চরম রূপ দান করাই এ শ্রেণীর কমেডির লক্ষ্য। কিন্তু আর এক শ্রেণীর কমেডি আছে যারা জীবনের কোন জটিল সমস্যার ভিতর দিয়ে না গিয়ে হাস্যোচ্ছলতায় মেতে ওঠে। এই শ্রেণীর কমেডিকে বাংলায় বলা হয় প্রহসন (farce)।

ল্যাটিন Farcid শব্দ হতে Farce শব্দের উদ্ভব। নাট্য জগতে এই Farce শব্দটির অর্থ দাঁড়াল "The type of drama staffed with low humour stravagent wit."

ষোড়শ শতকে যে সকল কমেডি সেক্সপীয়র এবং বেন জনসন কর্ত্তৃক রচিত হয়েছিল তাদের ভিতর দেখা গিয়েছে অপূর্ব নাট্যিক কলা-কৌশল এবং অফুরন্ত হাস্যরসের স্ফুরণ। কিন্তু পরবর্তী কালের কমেডিগুলিতে নাট্যকারগণ সেই অপূর্ব দীপ্তি আনতে সমর্থ হলেন না—ফলে পূর্ণাবয়ব হাস্যোচ্ছলতায় ভরপূর পঞ্চমাঙ্ক কমেডির স্থলে "তিন অঙ্কের স্বল্প পরিসরের লঘু ও তরল অপেক্ষাকৃত নিম্নশ্রেণীর হাস্যরস সমন্বিত নাটক" পরিবেশিত হতে লাগল। কালক্রমে কমেডির সাথে farce-এর একটি স্পষ্ট বিভেদরেখা গড়ে উঠল। বহিরঙ্গ অর্থাৎ আয়তনে পঞ্চমাঙ্ক কমেডি এবং তিনাঙ্ক farce-এর মধ্যে যে প্রভেদ দেখা গেল, অন্তরঙ্গেও সে প্রভেদ ব্যাপক এবং সুতীব্র হয়ে উঠল। স্বল্প পরিসর আয়তনে লেখককে কাহিনী উত্থাপন, চরিত্র চিত্রণ এবং তদুপরি নাটকীয় চমক দিতে হতো বলেই এই শ্রেণীর রচনায় অতিরঞ্জন এবং কিছু পরিমাণে অবাস্তব ও অসম্ভব ঘটনার সমাবেশ অনিবার্য হয়ে উঠলো। শেষকালের farce -এর রূপ দাঁড়াল— "A short humourous Plav"

আলংকারিকের পরিভাষায় প্রহসনকে বলা হয়, "হাস্যোদ্দীপন কাব্যস্তু প্রহসনমিতি স্মৃতম"। জীবনের কোন জটিল সমস্যা বা আনন্দ-বেদনার কোন পূর্ণ পরিচয় দেওয়া এই জাতীয় নাটকের বৈশিষ্ট্য নয়। সম্ভব-অসম্ভব ঘটনার দ্বারা দর্শককে হাস্যাকুল করে তোলা এর একমাত্র উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক মদনমোহন কুমার বলেছেন, "কমেডি জীবনের নানা-বিপত্তিকে অতিক্রম করিয়া আনন্দময় পরিস্থিতির মধ্যে সমাপ্তির মাধুর্য বিকশিত হইয়া ওঠে, সেখানে হাস্য, স্নিগ্ধ, মধুর উজ্জ্বল। Farce-এ কাহিনী সংক্ষেপ করিয়া পদে পদে হাস্যকর ঘটনার সমাবেশ করিয়া লোক-হাসাই-বার আয়োজন করা হয়। এ হাস্য উদ্দাম, উচ্ছল।"

বাংলা নাটকের অন্যান্য ধারার মত অনুবাদ হতেই প্রহসন রচনার

সত্রপাত হয়। ইংরেজী এবং সংস্কৃত Farce-এর অনুবাদে বাংলার নাট্য-ধারায় যে হাস্যোচ্ছলতার উদ্দাম স্রোত নেমে এল তাকে কেন্দ্র করেই প্রহসন রচনার শুরু। বাংলায় রচিত সর্বপ্রথম প্রহসন হলো 'Disguise' এবং 'Love is the best Doctor' নাটক দুখানি ইংরেজী প্রহসনের অনুবাদ। সংস্কৃতে 'হাস্যার্ণব', 'কৌতুকসর্বস্ব' ইত্যাদি প্রহসনগুলি উনিশ শতকের প্রথম পাদে বাংলায় অনূদিত হয়; কিন্তু এগুলি উপাখ্যান আকারে গদ্যে ও পদ্যে •রচিত—নাটকের আকারে নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে নাট্যমঞ্চের যবনিকা উত্তোলিত হওয়ার পর আমরা যে বাংলা নাটকগুলি পেলাম, সেগুলি কোন না কোন সামাজিক সমস্যাকে আশ্রয় করেই লিখিত হয়েছে। বাল্য-বিবাহ, স্বপত্নী বিয়োগ, বিধবা-বিবাহ ইত্যাদি সমস্যাগুলি সে যুগে বিশেষ-ভাবে আলোচ্য হয়ে ওঠে। ক্রমে ক্রমে আমরা পেলাম—উভয়সঙ্কট, চক্ষুদান, বুঝলে কিনা, যেমন কর্ম-তেমনি ফল, ইত্যাদি নাটকগুলি। এই নাটকগুলি লেখেন রামনারায়ণ তর্করত্ন। এর কুলীনকুল-সবস্ব ঠিক প্রহসন জাতীয় না হলেও হাস্যোচ্ছলতায় ভরপুর।

এই নাটকের প্রধান কথিতব্য বিষয় কৌলীন্যপ্রথার দোষ এবং সঙ্গীত। ভিতরে পাত্রপাত্রীর কথা-বার্তায় প্রহসনের খাঁটি বীণাটি পাওয়া যায়। নারী-চরিত্রগুলি বিশেষ করে সরল, এবং সরস হওয়ায় হাস্যময়তায় ভরপুর হয়ে উঠেছে। পুরুষদের চরিত্র কিন্তু বড় গম্ভীর—এই চরিত্রগুলি ঠিক প্রাহসনিক চরিত্র হয়ে উঠেনি। কিন্তু নারী-চরিত্রগুলির একদিকে ছড়া ও অন্যদিকে প্রবচন থাকায় হাসির আবিল স্রোতে মিশে গিয়েছে। সর্বাপেক্ষা হাস্যরসের বীজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে পাত্র-পাত্রীদের নাম নির্বাচনে। অনৃতাচার্য, বিবাহবণিক, উদরপরায়ণ, কুলিনপালক ইত্যাদি নামগুলি বিশেষ কৌতুকপূর্ণ—নামের ভিতর দিয়েই ব্যক্তিচরিত্রের অন্তরসত্তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

প্রহসন রচনায় রামনারায়ণ তকরত্নের পটুত্ব অপূর্ব। ব্যাঙ্গের হুল এবং শ্লেষের খোঁচা পাঠকদের হাস্যাকুল এবং মর্মাহত করে দেয়। 'উভয় সঙ্কট' যেন হাসির খনি। মহেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'চার ইয়ারের তীর্থযাত্রা' বোধহয় প্রাক্ মধুসূদন যুগের শ্রেষ্ঠ প্রহসন। যেমন, নাম, তেমনি বিষয়বস্তু নির্বাচনে এই নাটকটির মধ্যে প্রহসনের প্রাণস্পর্শ পাওয়া যায়। সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে কেমন এক অপূর্ব হাসির ঝিলিক আমরা অনুভব করি। প্রাক মধুসূদন

পুত্রের সঙ্গে পুতুলখেলায় মগ্ন বিশ্বজিৎ —আলোকচিত্র—ডলি ঘোষ

● বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা নায়ক শাম্মী কাপুরকে—যাদুবিদ্যার নিদর্শন দেখাচ্ছেন যাদুকর করুণাশংকর
আলোকচিত্র—শান্তিময় সান্যাল

যুগের 'বাসরকৌতুক' ও একখানি উল্লেখযোগ্য প্রহসন।

এরপর মধুসূদনের হাতেই আমরা পেলাম 'একেই কী বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।'। এই দুখানি গ্রন্থ বাংলার প্রহসন বিভাগে অপূর্ব সংযোজন। হাসির দীপ্তি যেন গ্রন্থ দুখানির সর্বাঙ্গে জড়িয়ে আছে।

'একেই কী বলে সভ্যতা' দু অঙ্কে সমাপ্ত। মানুষের (বাঙালীর) জীবনের কয়েকটি অসঙ্গত আবেগ এবং ভ্রান্ত মুহূর্তকে এই নাটকে ধরে রাখা হয়েছে। ইংরেজীতে কথা বলায় যে কী তীব্র স্পৃহা সে যুগে গজিয়ে উঠেছিল, তার উলঙ্গ ছবি দেখতে পাই নবকুমারের কথায়—"আমার father yestrday কিছু unwell হওয়াতে Doctorকে call করা গেল। তিনি একটি physia দিলেন। physic বেশ operate করেছিল—four five time motion হলো। অদ্য কিছু better বোধ করছেন।" এমনিতর আরো বহু হাসির খোরাক 'একেই কী বলে সভ্যতা'র সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। মাত্র একদিনের কাহিনী নিয়ে গ্রন্থখানি রচিত অথচ এমন কোন চিত্র নেই যা এতে স্থান পায় নি—অন্তত সমকালীন ইংরেজ-স্পর্শ-গর্বী নব্য যুবকদের বুঝতে গেলে যে চিত্রটুকুর প্রয়োজন, তার সবটাই এতে স্থান পেয়েছে। খণ্ড খণ্ড চিত্রগুলি একত্রিত হয়ে যেন এক অখণ্ড রসপ্রবাহের সৃষ্টি করেছে।

'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—এর ভিতর দিয়ে সমাজের উপরতলায় ভণ্ডকর্তাদের এবং বকধার্মিকদের উপর তীব্র কশাঘাত করেছেন। এ-প্রহসনটিও প্রথমোক্ত প্রহসনের ন্যায় দু অঙ্ক ও চার গর্ভাঙ্কে পরিসমাপ্ত। সামাজিক প্রহসন হিসেবে এ গ্রন্থখানির মূল্য অনেক।

এরপর দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসনগুলিতে তাঁর স্বভাবজাত পরিহাসপটুতার অবিস্মরণীয় প্রমাণ রয়েছে। সেক্সপীয়রের প্রথম যুগের কমেডি "Merry wives of Windor" 'Comedy of errors' প্রভৃতি নাটকের ন্যায় উচ্ছলিত হাস্যরসই দীনবন্ধুর নাটকের প্রাণ। মনে হয় আমাদের অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিভ্রান্ত, বিপর্যস্ত জীবনে যেখানে যতটুকু হাস্যরসের টুকরো পড়িয়া রহিয়াছে তাহাই তাঁহার সক্ষ্য দৃষ্টিতে ধৃত হইয়া নাটকের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার নাটকে ব্যঙ্গ আছে। আঘাতও আছে, কিন্তু ব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা ও আঘাতের নির্মমতা সর্বস্থানেই সুস্নিগ্ধ হাস্যরসের অনাবিল প্রবাহে ভাসিয়া গিয়াছে।

'সধবার একাদশী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' এবং 'জামাই বারিক' এই তিনখানি হলো দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন। 'সধবার একাদশী'র পাণ্ডুলিপি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থটিকে প্রকাশ করতে নিষেধ করেন; কিন্তু একথা সত্য, যদি গ্রন্থখানি প্রকাশিত না হতো তাহলে বাংলার শ্রেষ্ঠ প্রহসন লোকচক্ষুর অজ্ঞাতে থেকে যেতো। কিন্তু দীনবন্ধুর সর্বপ্রধান হাস্যরসপ্রধান প্রহসন 'জামাই বারিক'। বাংলায় রচিত অন্য কোন প্রহসনে হাসির এমন উদ্দাম প্রবাহ আছে বলে মনে হয় না। কুলীন নিকর্মা জামাইরা বেকার অবস্থায়

শ্বশুরবাড়ী থাকে। হতভাগ্য জামাই-গুলির জীবনযাত্রার বিচিত্র দৃশ্য এই নাটকে চিত্রিত হয়েছে। এ প্রহসনের প্রতিটি দৃশ্য আমাদের চিত্তকে হাসির অনবরত আঘাতে কৌতুকে নাচাতে থাকে।

ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রহসন রচনার ধারা এইখানেই শেষ হয়েছে। পবরর্তী যুগে গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল, দ্বিজেন্দ্র-লাল, রবীন্দ্রনাথ এবং অতি আধুনিক যুগের প্রমথ বিশী, বিধায়ক ভট্টাচার্য ইত্যাদি অনেকে প্রহসন রচনা করে-ছেন, কিন্তু কেউই বাংলা নাটকের গঠনের যুগে রচিত প্রহসনের উজ্জ্বল দীপ্তিকে ম্লান করে দিতে পারেন নি।

শিক্ষাক্ষেত্রে টেলিভিশন

টেলিভিশন আজ য়ুরোপ-আমেরিকার ঘরে ঘরে। রেডিও ট্র্যান্‌জিস্টর-এর যুগ পেরিয়ে ওরা সত্যি সত্যি পৌঁছে গেছে টেলিভিশনের যুগে। ভারতে টেলিভিশন ব্যবহারের তোড়-জোড় সুরু হয়েছে সরকারী স্তরে। আশপাশের অনেক কিছু থেকে চোখ ফিরিয়ে হয়েছে মহার্ঘ টেলিভিশন-এর আধুনিকতা বরণ করে নেওয়ার সূচনা। যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে ভারতের ব্যাপক বাণিজ্যচুক্তি অনুযায়ী আমরা পাবো এক হাজার টেলিভিশন সেট, অন্যান্য অনেক অতি প্রয়োজনীয় জিনিসের সঙ্গে। কাজেই, নানা কাজে, বিশেষত শিক্ষাক্ষেত্রে টেলিভিশন কতটা কাজে আসতে পারে, গোড়ার দিকে আমেরিকায় এ নিয়ে কী ধরণের আলোচনা সমালো-চনা হয়েছিল, এ সব তথ্য পাঠকদের অরুচিকর হবে না বলেই ধারণা। অবসায় সংক্ষেপে এ সম্বন্ধে দু'-চার কথা বলছি।

বিগত দশকে মধ্য আওয়া'র মানুষ প্রশ্ন করত পরিচিতদের 'কি টেলিভিশন উপভোগ করেছ ত'? আওয়া'র রাজ্য মহাবিদ্যালয় তখন টেলিভিশন কাজে লাগাতে সুরু করেছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে এর গুরুত্ব আগে থাকতে বুঝতে পারায় আওয়া রাজ্যে ১৯৫০-এ শিক্ষামূলক চিত্র পরীক্ষা-মূলকভাবে দেখান সুরু হয়। দু'-বছর পরে ফোর্ড ফাউণ্ডেশন-এর বয়স্কদের শিক্ষাখাতে দেয় টাকার সাহায্যে 'The whole town's talking' নামে এক অভিনব কর্মসূচী সুরু করে ঐ মহাবিদ্যালয়। উদ্দেশ্য নানা সম্প্রদায় কীভাবে নিজস্ব সমস্যার মোকাবেলা করে তা তুলে ধরা। ওর ধূয়ো ছিল 'বলে ফেলুন।'

বসুবন্ধু

কেন্দ্র থেকে লোক পাঠান হ'ত খুঁটিনাটি জানার জন্য। কর্তারা কখনও আশা করতেন না যে লোকজন প্রথমেই স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ছুটে আসবে তাদের উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে। কোন জায়গায়ই তা কখনও হয় না, তাদের মঙ্গলের জন্য যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে তা বুঝে উঠতে উঠতেই কিছুদিন কেটে যায়। তারপর আসে হচ্ছে-হবের টালবাহানা। কাজেই, কেন্দ্র
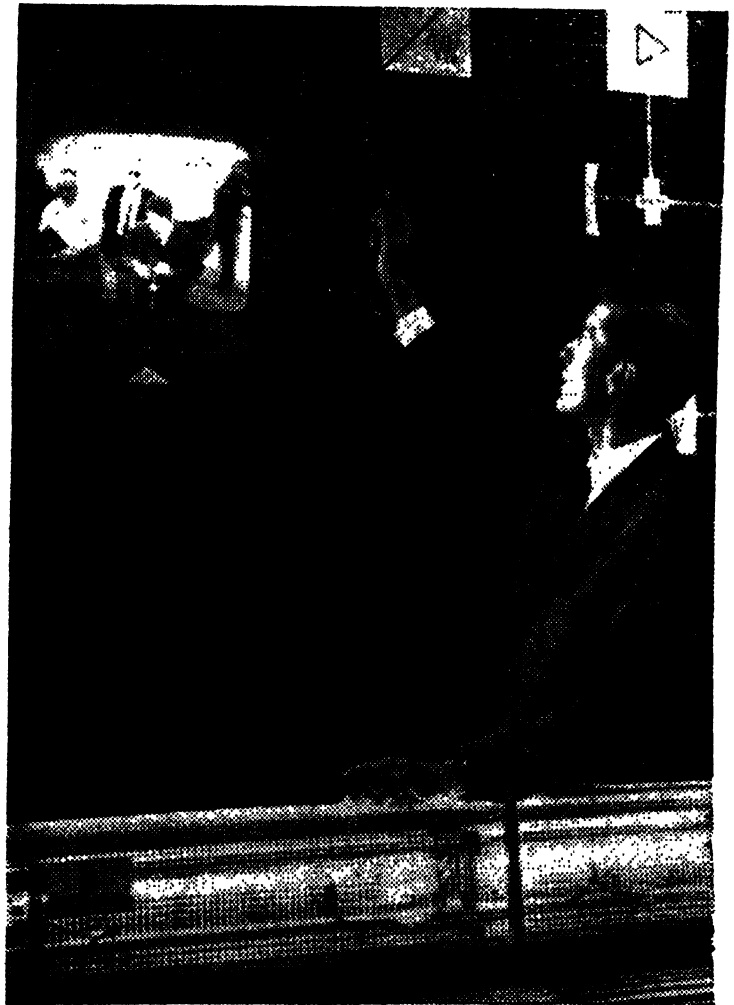
১ আলোকরশ্মিতে টেলিভিশন

নিযুক্ত খবরলেনেওয়ালা ছুটল সহরে, নাপতে, ব্যবসায়ী, দোকানের কর্মচারী, ডাক্তার, শিক্ষক, যান্ত্রিক সব রকমের, সমাজের সবস্তরের লোকজনের সঙ্গে অন্তরঙ্গভঙ্গীতে নানা কথাবার্তা চালিয়ে খবর কুড়োন তার কাজ। 'বেশ চলছে ত' আপনাদের। কী চমৎকার শান্তিপূর্ণ সহরটি, সমস্যার 'স'-ও নেই আপনাদের সহরে, কী বলেন?'

'কী বললেন?' প্রায়ই ঐ ধরণের উত্তর আসত।

'আমি টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে আসছি। আমাদের উদ্দেশ্য আওয়া'র সম্প্রদায়গুলোকে ঠেলে তুলতে চাই। আসুন একটা সভা ডেকে বেশ শাঁসাল আলোচনায় মাতা যাক। তারপর তা টেলিভিশন স্টুডিওয় পাঠিয়ে দেওয়া যাবে'খন। দেখুন, আপনাদের সমস্যা সমাধানের কোন পথ হয়ত এভাবে পাওয়া যেতে পারে।'

এই হল কাজ শুরুর কায়দা। স্বভাবতই ওখানকার মানুষ আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। সভার কথাবার্তা ধরা পড়েছিল টেপ রেকর্ডে। ফলে টেলিভিশন কর্মসূচীর জন্য যোগ্যবক্তাও বেছে নেওয়া গেল সহজেই।

স্টুডিওর এক ছোকরা কারিগর ঐ সভাগৃহ থেকে জিনিসপত্র এনে সুন্দরভাবে স্টুডিওয় ঐ সভার আবহাওয়া গড়ে তোলায় বক্তারা বেশ সহজভাবে, যেন পরিচিত পরিবেশে, তাদের আলাপ-আলোচনা চালাতে পেরেছিল।

আলোচনার ফলে ঐ সহরের অধিবাসীরা মাত্র দু'মাসের মধ্যে বিদ্যালয়ের নানা সমস্যা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে বিশেষভাবে। গত কুড়ি বছরেও তাদের এ ব্যাপারে এতখানি সচেতন করে তোলা সম্ভব হয় নি।

বিচিত্র সব সমস্যা, যেমন, হাসপাতাল স্থাপন থেকে স্থানীয় ডেয়ারী ব্যবসার ওপর ড্যানিশ-ব্লু-চীস্ আমদানীর প্রভাব পর্যন্ত টেলিভিশনে আলোচিত হ'ত। এর একটা বিশেষ সুফল হ'ল একটা ধারণা গড়ে ওঠা—গণতান্ত্রিক উপায়ে স্বাধীনভাবে নানা মত নিয়ে আলোচনা যে সাধারণত সঠিক সমাধানে পৌঁছবার পথ, সে ধারণা তাদের হয়েছিল। আজকের পরিবেশ এদেশে জটিল—ভারতীয় গণতন্ত্র চলেছে এক সুকঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে। মুনাফাখোর, জুয়াচোরদের দৌরাত্ম্যে এদেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের জীবনে কোন আশার উজ্জ্বল মূর্তি তুলে ধরতে পারছে না। আজও সমাজের অধিকাংশ নিষ্ক্রিয়। তাদের মধ্যে সক্রিয়তার ঢেউ তোলা রাষ্ট্রের কর্তব্য। শুধু তাদের মঙ্গলার্থে নয়—যদিও তাই রাষ্ট্র কর্তব্য—এ রাষ্ট্রে গণতন্ত্র সফল ও সার্থক করে তোলার জন্যও বটে।

যতদিন না কোটি কোটি মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা ফুটিয়ে তোলা যাবে, অগণিত শ্রান্ত, শুষ্ক, ভগ্ন বুকে আশার স্পন্দন জাগান না যাবে, তারা যতদিন না একত্র মাথা তুলে দাঁড়াতে শিখবে—এবং সে শিক্ষা দেওয়ার মূল দায়িত্ব রাষ্ট্রের, কল্যাণকর রাষ্ট্র ভারতের—ততদিন সব উন্নতি শুধু মরীচিকার মতন নয়ন-ধাঁধান অলীক থেকে যাবে নিঃসন্দেহে এবং এ কাজে

● সুটিং-এর অবসরে শ্রাবণী বসুর হস্তরেখা বিচার করছেন রবি বসু — আলোকচিত্র—শান্তিময় সান্যাল

টেলিভিশনের গুরুত্ব অসাধারণ। যদি তা আজকের রেডিওর মত একঘেয়ে, বিরক্তিকর, অকেজো খাড়া-বড়ি-থোড় আর থোড়-বড়ি-খাড়ায় মধ্যে সীমিত না করে সক্ষম হাতে দৃঢ়ভাবে তা জনকল্যাণের কাজে উৎসর্গ করা হয়।

আওয়া'য় কৃষিকার্যের তথ্য দেখান হ'ত সপ্তাহে তিনবার। কৃষকরা, কৃষিবিজ্ঞানের ছাত্ররা গাছপালা ছাঁটাই করার সঠিক পদ্ধতি দেখাত, রোগাটে শুয়োর সারিয়ে তোলার উপায় বাৎলে দিত এবং জমি সংরক্ষণের নানা উপায় আলোচনা করত।

জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বহু আলোচনায় আসর বসত আওয়া'র টেলিভিশন কর্মসূচী অনুসারে। কঙ্কাল দেখিয়ে বোঝান হ'ত দেহের গঠন, আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেখিয়ে দেওয়া হ'ত সুন্দরভাবে। ভাঙা হাড় জোড়া দেওয়া, আণুবীক্ষণিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদিও দেখান হ'ত।

যাদের জীবন কাটে জেলখানার আড়ালে তারাও সুযোগ পেয়েছিল জনসাধারণের কাছে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে, টেলিভিশনেরই কল্যাণে। তারা যে বিস্মৃত নয়, মানুষ যে ঘৃণায় এবং আতঙ্কে তাদের দিকে মুখ ফেরায় নি, এ বোধ ওদের জীবনে নিশ্চয়ই এক মস্ত লাভ।

টেলিভিশন শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি আনার আধুনিকতম হাতিয়ার। আজ ভারতে টেলিভিশন সেট আসছে। চালু হবেও কিছুদিনের মধ্যেই ভাল-ভাবে। কর্তারা যদি টেলিভিশনের এ দিকটা মনে রাখেন, এবং আন্তরিক ভাবে চেষ্টা করেন শিক্ষা ছড়িয়ে দিতে, তা হ'লে দেশের একটা মস্ত উপকার হয়। আওয়া এক্ষেত্রে আমাদের পথ-প্রদর্শক হ'তে পারে। নিউ ইয়র্ক বা লণ্ডন-এর টেলিভিশন বন্দোবস্ত নয়।

গান-বাজনার গালগল্প

সন্তোষকুমার দে

বিটল্‌স্‌

সঙ্গীত-জগতের একটি চাঞ্চল্যকর খবর হল, ইংলণ্ডে 'বিটল্‌স্‌' নামধারী চারজন তরুণ শিল্পীর এবার এম বি ই উপাধি লাভ। বৃটিশ এমপায়ার আমাদের দেশে না থাকলেও ইংলণ্ডে তার সম্মান তো কমেনি, সুতরাং 'মেম্বার অব দি বৃটিশ এমপায়ার' নামক উক্ত সম্মানের উপাধি তরুণ সঙ্গীতশিল্পীদের জীবনে যে সবিশেষ গৌরবজনক, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বিটল্‌স নামধারী শিল্পী-চতুষ্টয় পপ (Pop) গানের জন্য শুধু ইংলণ্ড-আমেরিকায় নয়, এ-দেশেও জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। তাদের লম্বা চুল উস্কোখুস্কো চেহারা তরুণ-সমাজে সংক্রমিত হয়েছে। বব্‌-কাট করা চুলের মেয়েরা আর বিটল্‌স-কাট চুল ছেলেরা পাশাপাশি থাকলে কে ছেলে কে মেয়ে বোঝা কঠিন। তা ছাড়া বিটল্‌স নামটাই এত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে সারা ইউরোপ, এমন কি আমেরিকাতেও বিটলস টাই, বিটল্‌স হ্যাট ইত্যাদি তাদের নামাঙ্কিত হরেক প্রকার পণ্যে বাজার ছেয়ে গেছে। আর দেশে যা হয়ে থাকে, সব পণ্য প্রস্তুতকারকের থেকে তারা চড়া হারে সম্মান-দর্শনী (Royalty) আদায় করছে—যাকে সোজা কথায় বলে, নাম ভাঙ্গিয়ে খাওয়া, তাই আর বিটল্‌স্‌ স্ট্যাচুয়েট অর্থাৎ চার বিটল্‌স্‌-এর ছোট ছোট মূর্তি বিক্রি হচ্ছে। আমাদের রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের মূর্তি হয়, হেমন্ত-সন্ধ্যা-লতা-রফির গান ভালো লাগলেও তাদের মূর্তি পূজা করতে এখনও আমরা শিখিনি।

অবশ্য সবাই যে বিটল্‌স্‌ বলতে অজ্ঞান তা নয়। এমন কি তাদের রাজকীয় খেতাব দেওয়ায় মনক্ষুণ্ণ হয়ে পূর্বে যারা ঐ উপাধি পেয়েছেন, সেই সব প্রবীণ ব্যক্তিদের কেউ কেউ তাদের খেতাবটি ফেরত দিতেও চেয়েছেন, তবু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, বিটল্‌স্‌ বিংশতাব্দীর বিস্ময়। একবার অস্ট্রেলিয়া যাবার পথে তারা দমদমের বিমান ঘাঁটিতে কিছু সময়ের জন্য বিশ্রাম নিয়েছিল, এই কথা শুনে আমার কয়েকজন ইঙ্গ-ভারতীয় সহকর্মিণীতো মাথার চুল ছিঁড়বার উপক্রম করলেন—হায় হায় হায়, আমার বঁধুয়া আন বাড়ি যায়, আমার আঙ্গিনা দিয়া। বিটলস কলকাতায় এলো অথচ তারা টের পেলেন না। কলকাতার কাগজগুলো একে-বারে অপদার্থ, তেমনি বেরসিক বিমানবন্দরের কর্মীরা। এরোপেনটা একটা দিন আটকে রেখে বিটল্‌স্‌দের শহরে নিয়ে আসতে পারলে

টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে পরিচালক কার্তিক চট্টোপাধ্যায় নায়ক বিশ্বজিৎ ও নায়িকা অমৃতা রায়কে দৃশ্য বোঝাচ্ছেন আলোকচিত্র—নৃপেন দত্ত

না তারা—এই রকমের ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন মহিলারা।

বিটল্‌স যখন আমেরিকায় গেল, সেখানে যারা 'টিন-এজার' অর্থাৎ যাদের বয়স তের (থারটিন) থেকে উনিশ (নাইনটিন), সবাই ক্ষেপে গিয়েছিল। দূর থেকে বিটলসদের দেখে তরুণ-তরুণীরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে কেউ কেঁদে ফেলেছে, কেউ মাথার চুল ছিঁড়ে উন্মত্ত আবেগ প্রকাশ করেছে। মেয়েরা লজ্জা শরম ভুলে জনতার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। হিমসিম খেয়েছে পুলিশ, ভিড় সামলাতে।

বিটলস-এর গ্রামোফোন রেকর্ড বেরুবে এই ঘোষণামাত্র কমপক্ষে দশ লক্ষ রেকর্ড অগ্রিম বুকড হয়ে গেছে, এর নজির আছে। বিটলস-এর রেকর্ড বের করেন ইংলণ্ডে ই এম আই (E. M. I.), সারা পৃথিবীর সব চেয়ে বড় রেকর্ডিং প্রতিষ্ঠান, ভারতবর্ষের গ্রামোফোন কোম্পানীরও তারাই হলেন মূল মালিক। সেই সুবাদে গ্রামোফোন কোম্পানীও দমদম কারখানায় বিটলস-এর হাজার হাজার রেকর্ড তৈরি করে এদেশে এবং বিদেশের বাজারেও বিক্রি করেন। বিশেষ করে বলবার বিষয় এই,—ই, এম আই অর্থাৎ ইলেকট্রিক এণ্ড মিউজিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রী লিমিটেডের চেয়ারম্যান স্যার জোসেফ লকউড গত বছর যখন ডিরেক্টর বোর্ডের মিটিং-এ বক্তৃতা করেন, তখন সানন্দে স্বীকার করেন যে, একা বিটলস-এর রেকর্ড বিক্রয় করে কোম্পানীর মোট মুনাফা এত বেড়েছে যার ফলে ই এম আই-এর শেয়ারের দাম বেড়েছে। ইউরোপ আমেরিকার সকল অর্থনৈতিক পত্রিকায় সংবাদটি ফলাও করে প্রকাশ করা হয়েছিল। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রেকর্ডিং কোম্পানীর বার্ষিক হিসাবনিকাশে চেয়ারম্যান স্যার জোসেফ লকউডের ছবির সঙ্গে বহু কাগজে বিটলস-এর ছবিও ছাপা হয়েছিল।

গ্রামোফোন কোম্পানীর বিলাতের অফিসে একটি নিয়ম আছে, যে রেকর্ড দশ লক্ষ বিক্রয় হয়, তার একখানি রেকর্ড সোনার পাতে তৈরি করে শিল্পীকে উপহার দেওয়া হয়। এই 'গোলডেন রেকর্ড' (Golden Record) বারবার পেয়েছে বিটলস চতষ্টয। স্যার জোসেফ প্রতিবারই স্বহস্তে বিটলসদের সেই সোনার রেকর্ড উপহার দিয়েছেন। শুধু ইংলণ্ডে নয়, অষ্ট্রেলিয়া থেকেও সোনার রেকর্ড পেয়েছে বিটলস চতুষ্টয়।

রেকর্ডের অতুলনীয় জনপ্রিয়তায় আকৃষ্ট হয়ে চলচ্চিত্র প্রযোজকেরাও এগিয়ে এসেছেন। বিটল্‌সদের ভাঙ্গিয়ে ফিল্ম জনপ্রিয় করবার একাধিক চেষ্টাও সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে। তাদের সর্বাধুনিক ছবি 'হেলপ' (Help) শীঘ্রই এদেশেও আসবে। আগেও বিটলস্-এর ছবি এদেশে দেখান হয়েছে।

বিটলস্-চতুষ্টয় যেখানে যায় সেখানেই সম্বর্ধনা, তাদের ফিল্ম উদ্বোধনে পুলিশ ভিড় ঠেকাতে পারে না। তারা বারম্বার সোনার রেকর্ড উপহার পাচ্ছে, ফলে ফেঁপে ছাপিয়ে পড়ছে তাদের ব্যাঙ্ক ব্যালান্স—এ সবে আকৃষ্ট হয়ে বিটলস-এর মত অগুণতি ছোট ছোট দল দেশে দেশে গড়ে উঠছে। দু' জন, তিন জন, চারজন এমন কি পাঁচজন ছেলের দল, কোন কোন দলে আবার একজন মেয়ে, কোন দলে আবার সবাই মেয়ে। নামের বাহারও কম নয়—রোলিং ষ্টোন (Rolling Stone), এ্যানিম্যালস (Animals) শ্যাডোস (Shadows) —এমনই কত কি। তাদেরও রেকর্ড চলছে; দু-এক দল সোনার রেকর্ডও বাগিয়েছে। ইংলণ্ডে গিয়েও কোন কোন শিল্পী জাঁকিয়ে বসেছেন যেমন ক্লিফ রিচার্ড (Cliff Richard); টোনি ব্রেণ্ট (Tony Brent)। বিটলস্-এর জনপ্রিয়তা, অনেকে বলেন, নিতান্তই সাময়িক। এই হুজুগ বেশি দিন থাকবে না। যাবে যাবে করেও বেশ কয়েক বছর তো এই হৈ চৈ চলছে। আমাদের দেশের কোন কোন কাগজেও তাদের 'বিটলোমি'র বিষয়ে আলোচনা বেরিয়েছে। যে যাই বলুক, বিটল্‌স তাদের সৌভাগ্য অর্জন করে নিয়েছে। এখন যদি তারা বিস্মৃতও হয়, তাদের ভবিষ্যৎ তারা গড়ে নিয়েছে, সুতরাং এই বিস্ময়কর বিটলস-এর বিষয়ে আরও কিছু বলা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

[ক্রমশ।

● বৃটেনের বিটলসরা এম-বি-ই পদক গ্রহণের জন্য রাণী এলিজাবেথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন (বাঁ দিক থেকে) পল ম্যাকার্টনী, জর্জ হ্যারিসন, জন লেনন ও রিঙ্গো স্টার

পুরুষদের যেভাবে দেখেছি

[হলিউডের খ্যাতনাম্নী চিত্রতারকা 'রোজালিণ্ড রাসেল' লিখিত এই ছোট প্রবন্ধটির মাধ্যমে পুরুষজাতি সম্বন্ধে কিছু কিছু কৌতূহলপ্রদ তথ্য পাওয়া যায়।
—অনুবাদিকা]

● রোজালিণ্ড রাসেল

সপ্তাহে ছয় রাত্রি আমি এক ব্রডওয়ে রঙ্গ প্রদর্শনীতে "ওয়াণ্ডারফুল টাউন" নামে একটি নাটকে অংশগ্রহণ করছি, ভূমিকাটি এক হতভাগ্য মেয়ের—যে নাকি সামনে গেলেই ভেগে পড়ে পুরুষের দল। বিশ্বাস করুন ভূমিকাটি যথাযথভাবেই উপলব্ধি করতে পারি আমি। আমি নিজেই যে ওরকম এক মেয়ে ছিলাম। আমার যখন ত্রিশ বছর বয়স, তখন থেকেই তো সংবাদপত্রসমূহে উল্লিখিত হয়ে আসছি 'হলিউডের পয়লা নম্বর কুমারী মেয়ে বলে।'

আমার জানা অনেক মেয়েদের চেয়েই বেশী লাঞ্ছিতা হয়েছি আমি পুরুষদের হাতে, আবার সেই লাঞ্ছনার মাধ্যমেই তাদের সম্বন্ধে চারিত্রিক সত্যও জানতে পেরেছি।

আগুনের জ্বালার মধ্য দিয়ে যে সত্য আমার হৃদয়ঙ্গম হয়েছে, এখানে সেটাই প্রকাশ করছি।

আমি যখন মাত্র ছয় বছরের মেয়ে; তখনই একটা কথা জানা হয়ে গিয়েছিল আমার, সেটা হল এই যে, পুরুষরা নিজেদের যতটা শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে, তা তারা আদপেই নয়।

আমাদের সঙ্গে একই শ্রেণীতে যেসব ছেলেরা পড়ত তাদের ধারণা ছিল এই যে; নর ও নারী দুটো ভাগে বিভক্ত এই মানবজাতি, যার মধ্যে সৌভাগ্যবশত তারা উন্নততর অর্থাৎ দেবজাতির সমগোত্রীয়।

হয়ত বা তাদের সে ধারণার অংশীদার হয়ে উঠতে পারলে অর্থাৎ ওই ছোট ছোট জন্তুগুলোকে সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের চোখে দেখতে পারলে, আমার জীবনটাই আজ অন্য ধরণের হতে পারত।

কিন্তু আমি তা পারিনি, কারণ প্রথমেই আমি লক্ষ্য করেছিলাম যে, ক্লাসের সমস্ত মেয়ে যখন নিপুণভাবে নিজেদের জুতোর ফিতে বাঁধতে সক্ষম, তখন ওই ছেলেগুলো এই সামান্য কাজেও কি হাস্যকর ভাবেই না অপারগ।

তারা ঢলঢলে ফিতেশুদ্ধ জুতো নিয়ে টেনে টেনে বেড়াত যত্রতত্র, আর যখনই মনে করত আমাদের চোখ এড়াতে পারবে তখনই লুকিয়ে লুকিয়ে চলে যেত শিক্ষয়িত্রীর কাছে, তাঁর কাছে ওই ব্যাপারে সাহায্য পাওয়ার আশায়।

রোজালিণ্ড রাসেল

তারপর তো প্রশস্ত কপালওয়ালা বহু বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের দলই আমার শিশুবয়সের উপলব্ধিকে সত্য বলে প্রমাণিত করলেন, তাঁদের মতে পুরুষরা মেয়েদের চেয়ে দৈহিক ভাবেও নিকৃষ্ট শ্রেণীর, রোগের সঙ্গে যুঝবার ক্ষমতা তাদের অপেক্ষাকৃত কম, তাদের জীবনীশক্তিও কম মেয়েদের চেয়ে।

আমার দ্বিতীয় আবিষ্কার এই যে পুরুষরা মেয়েদের কাছে হেরে যাওয়াটা পছন্দ করে না।

স্কুলে পড়ার সময় আমি এটা প্রমাণ করেছিলাম যে, আমি যে কোন ছেলে বা মেয়ের চেয়ে লেখাপড়াতে শ্রেষ্ঠতর, মেয়েরা কেউ বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতো না তা নিয়ে, কিন্তু ছেলেরা স্পষ্টতই বিচলিত হয়ে পড়ত।

প্রেমে পড়বার মত বয়সে পৌঁছলে আমার দিদি ক্লারা আমাকে সমাজে বার করার ভার নিল।

দিদি, যাকে আমরা আদর করে ডাচেস বলে ডাকতাম, ছিল সুন্দরী ও পুরুষের বাঞ্ছিতা।

সে আমাকে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক উৎসব-সভায় নিয়ে গেল, পাঁচজনের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় ঘটানোর উদ্দেশ্যে।

চা-পানের আগে যে নাচের আয়োজন তার পূর্ব মুহূর্তে আমি দুটি ছেলের সঙ্গে আলাপ করছিলাম, যারা কথোপকথন সুরু হওয়ার সময় থেকেই একে-অন্যের চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে সপ্রমাণিত হওয়ার অদম্য প্রয়াসে নিযুক্ত ছিল। ডাচেস যখন আমার খোঁজ পেল তখন আমি বিলিয়ার্ড খেলার টেবিলের ওপর একটা [illegible] দিয়ে উপস্থিত আর

● শ্রীশুক্লা দাস ছায়াছবির বাইরে আলোকচিত্র—নৃপেন দত্ত

পাচজনকে বোঝাচ্ছি যে, এক সটে দুটো বল দুটো পকেটে ফেলাটা কিছু নয় আমার পক্ষে।

বহু বছর পরে এই হলিউডেও এই ধরণের অসুবিধাজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতাম আমি।

একজন চিত্র-পরিচালক, যাঁর ওপর মনটা বেশ ঝুঁকেছিল আমার, একদিন আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন গলফ খেলার জন্য, উৎসাহের প্রাবল্যে এত ভাল খেললাম যে, ভদ্রলোক ভয়ানকভাবে হেরে গেলেন, বাস সেই থেকে তাঁর টিকিটিরও দর্শন আর পাই নি।

আর একটি মূল্যবান উপলব্ধি হয়েছে আমার যে, প্রেমের ব্যাপারেই হোক বা কোন কাজকর্মের ব্যাপারেই হোক, মেয়েরা বুদ্ধির পরিচয় দিলেই পুরুষরা দারুণ ঘাবড়ে যায়।

আমার প্রথম প্রদর্শনীর সঙ্গীত গ্রহণের সময় যখন সঙ্গীতকার লিওনার্ড বার্নস্টিন আমার পরামর্শ নিতে এলেন, গ্রহণযোগ্য সংগীত সম্বন্ধে তখন আমি যে মত প্রকাশ করলাম তার থেকেই বোঝা যাবে যে কেন ছেলেরা আমার দিকে ভেড়ে না কিছুতেই।

"আপনি রোমান্টিক ধরণের কোন গানের কথা বলছেন?" লিওনার্ড জিজ্ঞাসা করল।

"আরে না---না", আমি বিশদ হই ব্যাখ্যায়, "একেবারে নতুন ধরণের কিছু একটার কথা বলছি"।

লিওনার্ডকে সবিস্তারে বুঝিয়ে বললাম যে, কিভাবে সমস্ত ভাবপ্রবণতা ও আবেগকে ছেঁটে ফেলে গান বানাতে হবে।

লিওনার্ড তো খুব খুশী, তারপরই ওই নাটকের সবচেয়ে জাদার গানটা লিখে ফেললো, গানটার প্রথম চরণ হল, 'পুরুষকে হারাবার একশোটি সহজ উপায়"।

হলিউডের একজন অভিনেত্রী একবার আমাকে পুরুষ সম্বন্ধে একটি অতি প্রয়োজনীয় তথ্য সম্বন্ধে অবহিত করেছিলেন, পুরুষরা নাকি নিজেরাই কথা বলতে চায় সর্বদা আর মেয়েদের চায় ভাল শ্রোত্রীরূপে পেতে।

এক সান্ধ্য ভোজের আসরে যখন আমি রাশিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে জোর আলোচনা চালাচ্ছি, তখন হঠাৎ লক্ষ্য করলাম যে, আমার সুদর্শন যুবক বন্ধুটি তার মুখোমুখি বসা তরুণীর সঙ্গে টেবিলের তলা দিয়ে পা ছোঁয়া-ছুঁয়ির খেলা সুরু করে দিয়েছে।

এরপর থেকেই ছেলেদের কাছে শুধু শ্রোত্রীরূপেই প্রতিভাত হব বলে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলাম: আর-সত্যি সত্যি সচেষ্টও হলাম সেজন্য।

খুব যে একটা আয়াসসাধ্য ব্যাপার তাও নয়, তবে বড্ড বোকা বোকা লাগে নিজেকে এই যা।

ছেলেরা ক্লান্ত হয়ে হাঁফ নিতে থামলেই

● বার্লিন যাত্রার প্রাক্কালে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শৈলেন মুখোপাধ্যায়

ধরাবাঁধা কয়েকটি বাঁধা গৎ-এর যে কোন একটা আউড়ে দেওয়া, এই তো মোট ব্যাপার, যেমন "সত্যি নাকিই "কখন ঘটল"? "আপনি নিশ্চয় তা বলতে চান না"? "কি করে জানলেন বলুন তো"? ইত্যাদি ইত্যাদি।

পুরুষ সম্বন্ধে আর একটি তথ্য পরিবেশন করছি, তাদের প্রেমোচ্ছ্বাসকে সর্বদাই খাঁটি বলে ধরে নিতে হবে।

আমার এক তরুণ ভক্ত আমাকে কমপ্লিমেণ্ট দিয়ে অভিভূত করে দেওয়ার মানসে একবার বলেছিল যে, আমাকে দেখতে নাকি ঠিক একটি হরিণীর মত; আমি সমর্থনসূচক হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠলাম তার কথা শুনে, "ঠিক বলেছ, এই দ্যাখ আমার লম্বা গলা, লম্বা লম্বা হাত পা, এখানে সেখানে চরে বেড়াচ্ছি তোমার দিকে যাচ্ছি না তা বলে"। ছেলেটি তাড়াতাড়ি অন্য প্রসঙ্গ পাড়ল।

ষষ্ঠ তথ্য হল এই যে, পুরুষরা সর্বদা নিজেদের মেয়েদের উদ্ধারকর্তার ভূমিকায় দেখতে চায়।

নিজে যথেষ্ট লোভনীয়া এক তরুণী হওয়ায়, আমি সর্বদাই বিস্ময় অনুভব করতাম যখন কোন পুরুষকে নির্বোধ অসহায় ধরণের কোন মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খেতে দেখতাম।

উৎসব শেষে একা বাড়ী ফিরে যেতে ভয়াতুরা হয়ে উঠতে দেখতাম বহু নীলনয়না সুন্দরীকে, যাদের রক্ষার্থে ছুটে যেত বলিষ্ঠ পুরুষের দল আকস্মিকভাবেই।

অসহায়া হয়ে উঠতে সচেষ্ট হলাম নিজেও অবশেষে। আমার যা মুখের ভাব তাতে সে প্রচেষ্টা খুব সহজসাধ্য হল না।

অনেক সময় পুরুষদের ডেকে ডেকে বেচারী বেচারী মুখ করে নিজের অসম্ভব জলতৃষ্ণার কথাও জানিয়েছি, যদিও সে সব ক্ষেত্রে প্রায়ই জলের পাত্র কোথায় জলাধার কোথায় এ সব খোঁজই নিজেকে দিতে হত।

সবচেয়ে বড় সত্য হল এই যে, পুরুষেরা স্বভাবতই কিছুটা লাজুক মেয়েরা যা নয়।

পুরুষ প্রচণ্ড, পুরুষ দুঃসাহসী অন্তত মেয়েদের কাছে বলে যে তথ্য পরিবেশিত হয়, তা একেবারেই বাজে। পুরুষ অনেক সহজে ভয় পায়, ছোটখাট নীরব স্বভাবের মেয়েদের পুরুষরা সেজন্যই বেশী পছন্দ করে।

পুরুষের পৌরুষের অহঙ্কারটা এই ধরণের মেয়েদের কাছেই সম্যক তৃপ্তিলাভ করে।

বহু বছরের অভিজ্ঞতায় আমি জেনেছি যে, কিছু পুরুষ আছে যারা স্বামী হিসাবে সন্দেহজনক। এখানে ছয় রকম প্রকৃতির পুরুষের উদাহরণ দিচ্ছি, যারা ভাল স্বামী হয় না সচরাচর।

প্রথমত অত্যন্ত ধোপদুরস্ত রকমের আচার-ব্যবহার হয় যে সব পুরুষের, তারা ভাল স্বামী হয় না প্রায়শ; এ ধরণের বহু পুরুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশে এটুকু বুঝেছি যে এরা সাময়িক সান্ধ্যসঙ্গী হিসাবেই যা লোভনীয়; অষ্টপ্রহর এদের কেতাদুরস্ত ভাব, কৃত্রিম আলাপ সহ্য করতে হলে যে কোন মেয়েই ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

দ্বিতীয়ত উচ্ছ্বাসী প্রেমিক, এ ধরণের পুরুষকেও ভাল লাগে কিছুক্ষণের জন্যই; সর্বদা চুম্বনোদ্যত কোন মানুষকে জীবন-সাথীরূপে পাওয়ার কল্পনাটা মধুর হতে পারে, কিন্তু বাস্তবে তা হয় না বরং ক্লান্তিকরই হয়ে ওঠে সমস্ত ব্যাপারটা।

তৃতীয়ত অত্যন্ত শরীরসচেতন কোন পুরুষ এখানে শরীরসচেতন কথাটা আক্ষরিক অর্থেই বলতে চাইছি। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক— ব্যায়ামবীর পুরুষদের, এরা সর্বদা শরীরচর্চা করে করে, পেশী প্রদর্শন করতে সদাই উৎসুক থাকে, দুটো মিষ্টিকথা বলে স্ত্রীর মনোহরণ করবে সে অবকাশ এদের কোথায়?

অত্যন্ত প্রাজ্ঞ পুরুষ, স্বামী হিসাবে এই শ্রেণীর পুরুষও অপাংক্তেয়, কারণ এদের আত্মঅহমিকা থাকে দারুন, সব কিছুরই উত্তর এদের যেন জানা আছে, এমন কি সাংসারিক খুঁটিনাটির ব্যাপারেও সর্বদা হস্তক্ষেপ করতে চায় তারা, যেটা কোন স্ত্রীর পক্ষেই মেনে নেওয়াটা সম্ভব নয়

পঞ্চমত : সুদর্শন পুরুষ নিজেদের সৌন্দর্য সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতন হওয়ার ফলে সকলের কাছেই এরা আশা করে রূপ-মুগ্ধতা. স্ত্রীও এর ব্যতিক্রম নয়, তাজেই পুরুষের কাছে যে স্তুতি একান্তভাবেই মেয়েদের প্রাপ্য, মেয়েরা এ ধরণের পুরুষদের কাছ থেকে সেটা পায় না কখনই।

পরিণামে স্ত্রীর মনে অসন্তোষ জাগাটা অস্বাভাবিক নয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজে পুরুষের রূপমুগ্ধ হয়ে পড়ার চেয়ে, তারাই আমাকে দেখে মোহিত হোক এইকামনা করি, পুরুষ মানুষ সুস্থ সবল, অমায়িক ও বুদ্ধিমান হলেই যথেষ্ট, নাই বা রইল তার বাঁশীর মত নাক, পটলচেরা চোখ।

ষষ্ঠত : ঈর্ষাপরায়ণ পুরুষ, এরা একেবারেই অসহ্য। যে কোন মেয়েই অবশ্য স্বামীর ঈর্ষাপরায়ণতায় প্রথমটা খুসী হয়ে ওঠে এইভেবে যে, ওটা তার প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ, কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই এ ভাবটা কেটে যায়, ঈর্ষার তাড়নায় দৈনন্দিন জীবন হয়ে ওঠে দুর্বহ। আমার এক পুরুষ বন্ধু এই রোগে আক্রান্ত ছিল, আমার গতি-বিধির ওপর রীতিমত গোয়েন্দাগিরি করতে সুরু করেছিল সে, শেষ পর্য্যন্ত যার ফলে আমাদের সম্বন্ধ ভেঙ্গে যায়। আমি তাকে খুব শান্ত মেজাজে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, আমার কাছে না এসে কোন মনঃসমীক্ষকের কাছেই যাওয়া উচিত ছিল তার।

স্বামী হিসেবে বরণযোগ্য পুরুষের কাছে মেয়েদের চাহিদা নানা ধরণের থাকতে পারে, কিন্তু আমার মতে বিশেষ কোন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের দাবী না করাটাই মঙ্গলজনক।

আমার জীবনের সাথী নির্বাচনে আমি এই মত দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছি। সে যখন আমার জীবনে প্রথম এলো, তখন যৌবনজল তোড়ে উদ্দামভাবে ভেসে চলেছি আমি, জীবনটা যেন বসন্তোৎসবেরই প্রতীক, ক্যারী গ্রাণ্ট, জিমি স্টুয়ার্ট প্রমুখ খ্যাতনামা পুরুষ আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

এক রাত্রে ক্যারীকে সোৎসাহে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে দেখলাম সে একা নয়, তার সঙ্গে রয়েছে নীরস ধরণের আর একজন, শুনলাম তার নাম 'ফ্রেড ব্রিশন'।

কেন জানি না আমাকে ওর পছন্দ হয়ে গেল, প্রায়ই আসতে সুরু করে দিল ও। প্রথমটা ওকে বিশেষ ভাল লাগত, তা নয়, এমন কি অনেক সময় তো বাড়ী না থাকার মিথ্যে ছুতোয় দেখাও করতাম না ওর সঙ্গে। ও কিন্তু নিয়মিত আসত। এইভাবেই কেটে গেল সুদীর্ঘ নয় মাস, একদিন ডালাভরা বসরা-গোলাপ উপহার পাঠাল ও, সেগুলোর মাঝে ওর একাগ্র হৃদয়ের ছবিই বুঝি ফুটে উঠতে দেখলাম, মুহূর্তে উদ্বেল হয়ে উঠল মন, ছুটে গিয়ে টেলিফোনটা তুলে নিলাম, কাঁপা কাঁপা গলায় ধন্যবাদ জানালাম।

বাস, এই হল সুরু, কিছুদিনের মধ্যেই এনগেজড হলাম আমরা, এখন আমরা স্বামী-স্ত্রী। ভালবাসা সত্যই এক বিচিত্র ব্যাপার, নয় ?

ক্যারী আমাদের বিয়েতে প্রধান অতিথির স্থান নিয়েছিল, বিবাহিত-জীবন সম্বন্ধে আমার ধারণা একেবারে পালটে গেছে, বিয়ে ব্যাপারটা সম্বন্ধেই আজ আমি পরম উৎসাহী।*

---

* রোজালিণ্ড রাসেল লিখিত এই প্রবন্ধটির অনুবাদ করেছেন—শ্রীমতী রেবা দেবী। বিদেশী সাময়িক পত্র থেকে গৃহীত।

● সত্যজিৎ রায় পরিচালিত 'নায়ক' চিত্রের একটি বিশেষ চরিত্রে অবতীর্ণা হয়েছেন সুস্মিতা সান্যাল। আলোকচিত্র—জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

● নবাগতা নায়িকা শ্রীমতী অমৃতা রায়

একটি নতুন সুর

পৃথিবীর মানুষ আজ নতুন সুরের পিয়াসী। এ সুর শুধু গান-বাজনার আসরে ক্ষণিকের জন্য আবদ্ধ হয়ে না থেকে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে মিলেমিশে জীবনকে সুর-সমৃদ্ধ করে তুলবে। বিশ্বের দেশে দেশে সুরকাররা আজ তাই সাধনায় মেতে উঠেছেন। জার্মানীর অন্যতম সুরকার মি: কার্ল ওরফ এই বিষয়ে বেশ খানিকটা সাফল্য অর্জন করেছেন। তিনি ড্রাম, টাম্বুরিন, জাইলোফোন, ঘণ্টা ইত্যাদি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে জার্মানীর ভাবী নাগরিক ক্ষুদে ক্ষুদে শিশুগুলিকে একছন্দে তাল মিলিয়ে পা ফেলতে শিখিয়েছেন।

অধ্যাপক ওরফ্ আধুনিককালের জার্মানীর সর্বশ্রেষ্ঠ সুরকার। তাঁর প্রতিভা কতকটা জন্মগত। তিনি ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই জুলাই এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। যখন তাঁর বয়স মাত্র পাঁচ বছর তখন থেকেই বাজনায় তাঁর হাতে-খড়ি। এই সময়ে তিনি পিয়ানো, অর্গান ও ভায়োলিনচেলো বাজাতে শুরু করেন। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি মিউনিখের 'মিউজিক অ্যাকাডেমীতে' প্রবেশ করেন এবং ১৯১৪ খৃ: পর্যন্ত সেখানেই শিক্ষালাভ করেন। ১৯১৫ খৃ: থেকে তিনি দু বছরের জন্য মিউনিখ থিয়েটারের সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন। এরপর তিনি ম্যানহেইমের জাতীয় নাট্যশালা ও ড্রামষ্টাডের স্টেট্ থিয়েটারে যোগদান করেন। এক বছর পরে তিনি মিউনিখে ফিরে আসেন এবং সুখ্যাত জার্মান সুরকার কামিনস্কির কাছে দু বছর সঙ্গীতের নানা বিভাগে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৪ খৃ: গানথারের সহযোগিতায় একটি বিখ্যাত সঙ্গীত-শিক্ষার বিদ্যালয়—'Guntherschule' স্থাপন করেন।

১৯২০ খৃ: পর্যন্ত অধ্যাপক ওরফ্ নিবিড়ভাবে সঙ্গীত-শিক্ষাদান ও সুর-রচনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন। এর ফলেই একদিন আত্মপ্রকাশ করে সঙ্গীত-শিক্ষার প্রাথমিক নির্দেশ সম্বলিত গ্রন্থ 'Schulwerk'। এই গ্রন্থটি বিশ্ববাসীর সঙ্গে ওরফ্-এর পরিচয় করিয়ে দেয়। পাঁচ খণ্ড 'Schulwerk'-র নব-সংস্করণ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং ১৯৫৮ খৃ: সর্বপ্রথম এটিকে এক সঙ্গীত বিষয়ক শিক্ষামূলক ছায়াচিত্রে রূপায়িত করা হয়। তাঁর উদ্ভাবিত অর্ফিয়ান 'Schulwerk'—যেটির বাদ্যযন্ত্র তিনি বিশেষভাবে উদ্ভাবন করেছেন, আজ বিশ্বের শিশু-সমাজের সঙ্গীত, ভাষা, ছন্দে সেটি এক আনন্দের দুয়ার খুলে দিয়েছে। হাততালি দিয়ে, আঙ্গুলে তুড়ি দিয়ে, পা ঠুকে বা ছোট ড্রাম, জাইলোফোন, টাম্বুরিন, ঘণ্টা ইত্যাদি বাজিয়ে যে কত সুরের ঝংকার তোলা যায় তার বিস্তারিত বিবরণ আছে ওরফ উদ্ভাবিত অর্ফিয়ান 'Schulwerk'-এ। তাই সঙ্গীত আজ প্রত্যেকের কাছেই আকর্ষণীয়, এমন কি যে সব শিশু আগে কখনও সঙ্গীতে আগ্রহী ছিল না, তারাও এখন এ-বিষয়ে

যথেষ্ট আগ্রহ দেখাচ্ছে। ওরফ্ তাঁর লিখিত বিভিন্ন গ্রন্থাবলীতে ছন্দকে একটি বিশেষ স্থান দিয়েছেন।

ওরফ্ বর্তমানে গ্রীক বিয়োগান্তক 'প্রমেথিয়াস'-এর সঙ্গীত-সুর রচনায় ব্যস্ত। তিনি ইতিমধ্যেই সোফোক্লেসের 'এ্যান্টিগোন' এবং 'ওয়দিপাস দি টাইরান্ট'-এর সুর রচনা করেছেন।

মিঃ কার্ল ওরফ সত্তর বছরে পড়লেন। গত ১০ই জুলাই এই উপলক্ষে ব্যাভারিয়ার 'Diessen Am Ammersee'-তে সঙ্গীতজ্ঞের বাস-ভবনে উৎসবের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। জন্মগত প্রতিভার অধিকারী মিঃ ওরফ মিউনিখের মিউজিক অ্যাকাডেমীতে ও চার বছর থিয়েটারে সঙ্গীত পরিচালকের কাজে শিক্ষালাভ করা ছাড়া আর কোথাও তাঁর শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটে নি। কিন্তু যাঁর হৃদয়ে সুরের মন্দাকিনী স্বতঃই প্রবহমান, তার কি কোন শিক্ষার প্রয়োজন আছে—নির্ঝরের মতই তা আপন ধারায় প্রকাশিত হয়।

—সুরপিপাসু

বাংলার খ্যাতনামা চিত্রতারকা শ্রীমতী সুচিত্রা সেন ও বোম্বাইয়ের স্বনামধন্য অভিনেতা অশোককুমারের স্ত্রী শ্রীমতী শোভা গঙ্গোপাধ্যায়—হাস্যালাপরত

—আলোকচিত্র—ডলি ঘোষ

নেদারল্যাণ্ডের এ্যামেচার থিয়েটার

আমরা প্রকৃতপক্ষেই বলিতে পারি যে, হল্যাণ্ডের এ্যামেচার থিয়েটার ক্রমেই পরিব্যাপ্ত হচ্ছে। অনুমান করা হয় যে বর্তমানে পাঁচ থেকে ছয় হাজার নাট্যসংস্থা সক্রিয়ভাবে এই আন্দোলনে যোগ দিচ্ছে। প্রত্যেক বছরেই নতুন নতুন থিয়েটার দল গঠিত হচ্ছে বলে সঠিক সংখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়, তবে আনুমানিক হিসেব অনুযায়ী প্রতি ২,২০০ জন লোকের জন্য একটি করে এ্যামেচার নাটক সংস্থা আছে। বর্তমানে হল্যাণ্ডের জনসংখ্যা হ'ল এক কোটি ২০ লক্ষ।

প্রত্যেক গ্রামে একটি বা দুটি দল আছে কাজেই সহর ও নগরগুলিতে যে অনেক বেশী দল থাকবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। এই দলগুলির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নিজেরা দুটি বড় সংস্থায় সঙ্ঘবদ্ধ হয়েছেন। নেদারল্যাণ্ডের এ্যামেচার থিয়েট্রিক্যাল ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা হ'ল ১,৩০০ এবং ক্যাথলিক এ্যামেচার থিয়েট্রিক্যাল ইউনিয়নের সদস্য সংখ্যা হল ৫০০। দ্বিতীয় সংস্থাটির নাম থেকেই বোঝা যায় যে এটি রোমান ক্যাথলিক অভিনেতাদের নিয়ে গঠিত। প্রথমটিতে অবশ্য সব মত, সব ধর্মের সদস্য আছেন। এ্যামেচার অভিনেতাদের এই রকম ধর্মীয় সংস্থার অর্থ হ'ল এঁদের মধ্যে অনেক দল চার্চের বাড়ীতে ক্লাব স্থাপন করেছেন অথবা ধর্মযাজকগণের কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমেই ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।

সৌভাগ্যবশত দুটি সংস্থার মধ্যে কোন ঈর্ষার ভাব নেই। এ্যামেচার থিয়েটার করার উপযোগী একটি লাইব্রেরি পরিচালনা করা তাঁদের অন্যতম কাজ। এই ইউনিয়ন দুটির অন্তর্ভুক্ত সদস্য দলগুলি যাতে ভালো বই মঞ্চস্থ করে সেজন্য এঁরা খানিকটা প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করেন কিন্তু সেজন্য কোনরকম চাপ দেওয়া হয় না। বই নির্বাচন করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ভার দলগুলির ওপরেই থাকে। পল্লীর দলগুলির হালকা কৌতুকমূলক গার্হস্থ্য বিষয়ক নাটকই পছন্দ করে বলে মনে হয় আবার সহরের দলগুলি প্রায়ই বিদেশী নাটক মঞ্চস্থ করে। এগুলির মধ্যে ছাত্রদের প্রায় ১২টা থিয়েটার দল আছে এবং তাঁরা সাধারণত ফরাসী নাটক অভিনয় করাই পছন্দ করেন।

ওলন্দাজ এ্যামেচার অভিনেতাগণ যেসব নাটক মঞ্চস্থ করেন সেগুলির গ্রন্থকার বা প্রকাশককে সেজন্য রয়্যালটি দিতে হয়। কয়েকজন ওলন্দাজ নাট্যকার আছেন যাঁরা প্রধানত এ্যামেচার দলগুলির জন্য নাটক রচনা করেন। তবে পেশাদার মঞ্চে যে সব নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে, এ্যামেচার দলগুলি সাধারণত সেগুলিরই অভিনয় করে থাকে। নাটক মঞ্চস্থ করতে যে ব্যয় হয় তা পূরণ করার জন্য এ্যামেচার দলগুলি সামান্য দামের টিকেট বিক্রী করতে বাধ্য হয়। সাধারণত প্রত্যেকটি নাটক মাত্র কয়েকবারই পরিবেশন করা হয়। এই রকম এ্যামেচার পার্টির আনন্দ ও উৎসাহ রিহার্সেলের সময়েই বেশী দেখতে পাওয়া যায়, তখনই সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জনগণ একত্রিত হয়ে বিপুল উৎসাহে নতুন নাটকের মহলা দেন।

সদস্য দলগুলির, থিয়েটারের কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান বাড়াবার জন্য ইউনিয়ন দুটি দেশের প্রধান প্রধান সহরে তিনটি এ্যামেচার নাটক স্কুল স্থাপন করেছে। পেশাদার অভিনেতাগণ, আমস্টারডাম, রটারডাম ও দি হেগের এই তিনটি স্কুলে এ্যামেচার অভিনেতাগণকে অভিনয়ের কলাকৌশল শিক্ষা দেন। ২৪ সপ্তাহ ব্যাপী এই শিক্ষাসূচীর জন্য সামান্য ফী নেওয়া হয়। প্রযোজক ও পরিচালকগণের জন্য তিন বছরের একটি নিয়মিত শিক্ষাসূচীও রয়েছে।

দেশের সাংস্কৃতিক জীবনে এ্যামেচার থিয়েটার আন্দোলনের গুরুত্ব ওলন্দাজ সরকারও স্বীকার করে নিয়েছেন। এ্যামেচার থিয়েটার সম্পর্কে একটি বই, লাইব্রেরীর রক্ষণাবেক্ষণ, ডাকযোগে পরামর্শদান এবং অন্যান্য কাজের জন্য ইউনিয়ন দুটির যে ব্যয় হয়, তা অন্ততপক্ষে আংশিকভাবে পূরণ করার জন্য সরকার এই ইউনিয়ন দুটিকে ২০,১০০০ পাউণ্ডেরও বেশী সাহায্য করেছেন। এই সাহায্য ছাড়া অবশ্য ইউনিয়ন দুটি এবং তাদের সদস্য দলগুলি তাঁদের নিজস্ব মূলধনসহ স্বাধীন দল।

'রাজদ্রোহী'র আউটডোর সুটিং-এ পরিচালক নীরেন লাহিড়ী নির্দেশ দিচ্ছেন নায়ক উত্তমকুমার ও নায়িকা অঞ্জনা ভৌমিককে —আলোকচিত্র শান্তিময় সান্যাল

নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের স্নেহধন্য প্রবীণ অভিনয়-শিল্পী কানু বন্দ্যোপাধ্যায় বাঙলার মঞ্চের একটি সুখ্যাত নাম—চিত্রজগতেও তাঁর প্রসিদ্ধি দীর্ঘদিনের। তাঁর অভিজ্ঞতার ভাঁড়ার থেকে এবার কিছু উপহার দিয়েছেন বসুমতীর পাঠকদের—অবশ্যই তাঁর কথাগুলি মূল্যবান।

—সম্পাদক

একাল ও সেকাল

কানু বন্দ্যোপাধ্যায়

দর্শক হিসাবে অভিনয় দেখতে সুরু করি ছাত্রাবস্থায়, তখন কৈশোর। রসবোধ তখনও গাঢ় হয় নি। তবু, মঞ্চ-মায়া আমাকে মুগ্ধ করেছিল—কেমন যেন আত্মিক-যোগ অনুভব করেছিলাম মঞ্চাভিনয়ের সঙ্গে। রাতের পর রাত মঞ্চাভিনয় আমাকে আকর্ষণ করেছে। মন্ত্রমুগ্ধের মত গিয়েছি অভিনয় দেখার জন্যে।

তখন গিরিশোত্তর যুগ। দানীবাবু, হীরালাল চাটুজ্যে, চুণীলাল দেব, ক্ষেত্র মিত্র, অমৃত বসু, অপরেশবাবু, তারাসুন্দরী, সুশীলাসুন্দরী, নরীসুন্দরী, শশিমুখী প্রভৃতি অভিনেতা অভিনেত্রীবৃন্দ অভিনয়ের জড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছেন—দর্শকবৃন্দ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতেন তাঁদের দিকে। তখন রূপালী পর্দার প্রাধান্য হয় নি, অভিনয় ছিল মঞ্চের ওপরেই গণ্ডীভূত। তাই শিল্পীবৃন্দ সব এসে জড়ো হতেন মঞ্চকে ঘিরেই। নতুন নতুন শিল্পী এসে দেখা দিতেন, অপেশাদার সম্প্রদায় থেকে, শিক্ষা পেতেন মঞ্চের আচার্যের কাছ থেকে। তখন দেখেছি, দু মাস, চার মাস পর পরই নাটক পরিবর্তিত হ'ত, এমন কি, মধ্য-সাপ্তাহিক (Mid-week) অভিনয় হিসাবে বিভিন্ন নাটকও অভিনীত হ'ত মঞ্চে। এতে শিল্পীদের বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দেবার সুযোগ ঘটত। এখনকার মত—দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর একই নাটকে একই চরিত্রে অভিনয় করতে করতে শিল্পীরা যান্ত্রিক (Mechanical) হয়ে পড়তেন না এখনকার মত। তাছাড়া, এখন দেখি, কোনও বিশেষ অভিনেতা কোনও একটি বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করে সাফল্যলাভ করলেই তার আর রক্ষা নেই—তাকে বিভিন্ন নাটকে সেই একই ধরণের চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। নাটকে সে রকম চরিত্র না থাকলে,—আর সেই শিল্পী সে রকম খ্যাতনামা হলে; তার জন্যে সেই রকম চরিত্র সৃষ্টি করা হবে নাটকে। আগের দিনে কিন্তু এ রকম হতো না। শিল্পীর প্রয়োজনে নাটক সৃষ্টি হতো না তখন। নাটকের প্রয়োজনেই শিল্পী সৃষ্টি হতো সেই শিল্পী-সৃষ্টির পেছনে থাকতো নাট্যাচার্যের অকুণ্ঠ পরিশ্রম আর শিল্পীর অক্লান্ত প্রচেষ্টা যা তাকে সার্থক করে তুলতো। রাতের পর রাত মহলা দিয়েছে, চিন্তা করেছে নাটকীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের কথা। আমি পরবর্তীকালে ব্যক্তিগতভাবে দেখেছি যখন তখন নিজে মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হলাম, শুনেছি, আমার পূর্ববর্তী দিনের শিল্পীদের মুখে।

গিরিশবাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু, অমৃত মিত্র, তিনকড়ি, বিনোদিনী প্রভৃতি স্বনামধন্য অভিনেতা, অভিনেত্রীদের অভিনয় দেখার সৌভাগ্য আমার হয় নি—আমি পরের যুগের মানুষ—অবশ্য সে যুগও যেতে বসেছে। আমাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ দর্শকবৃন্দকে গিরিশোত্তর যুগে বলতে শুনেছি যে, 'এ আর কী অভিনয়—অভিনয় করে গেছেন গিরিশ বাবু, অর্দ্ধেন্দুবাবু!' এখনও গিরিশোত্তর যুগের লোকেরা আধুনিক কালের অভিনয় দেখতে দেখতে অনুরূপ উক্তি করেন কেবল গিরিশবাবু অর্দ্ধেন্দুবাবুর নামের বদলে তাঁরা উল্লেখ করেন দানীবাবু, অপরেশবাবু, হীরালালবাবু প্রমুখ অভিনেতাদের নাম। পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে অভিনয়ের ধারা বদল হবে এতে দুঃখের কিছু নেই, তবে ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হচ্ছে যে, আধুনিক অভিনয়ধারা যেন তেমন আর অন্তরস্পর্শী হয় না। বেগের (Speed) যুগে আবেগ (emotion) যেন হারিয়ে। নাটকীয় সংলাপগুলি যেন শিল্পীদের মুখ থেকেই ঝরছে অন্তরের গভীরতর দেশ থেকে নয়।

আগেও বলেছি, তখন শিল্পী সৃষ্টি হত মঞ্চে থেকেই, তাই হয়ে এসেছে পরবর্তী যুগেও, যখন চিত্রাভিনয় সুরু হল তখনও—এখন অবশ্য হাওয়া বদলেছে, এখন মঞ্চ থেকে শিল্পী তৈরি হয়ে পর্দায় যায় না, বরং পর্দায় নাম হলে মঞ্চে দাম বাড়ে—মঞ্চাভিনয়ের ক্ষমতার ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে না। আমি পুরাতন দিনের প্রতি মোহের বশে একথা বলছি না যাঁরা সে সময়ের অভিনয় দেখেছেন, তারা হয়ত আমার সঙ্গে একমত হবেন। মঞ্চাভিনয়ের মান যেন নেমে এসেছে। তার কারণ এ নয় যে, সে রকম শক্তিমান নটের অভাব, বরং এখন মঞ্চাভিনয়ের সুযোগ-সুবিধা অনেক বেড়েছে—ঘূর্ণায়মান মঞ্চ আলোক-সম্পাতের নৈপুণ্য প্রভৃতি। তবু কেন এই অবনতি? আমার ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়েছে যে, মঞ্চাভিনয় শিক্ষার জন্য যে সময় ব্যয় করা উচিত সে সময় দেওয়া শিল্পীদের পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়—আর তাছাড়াও বড় কথা নিষ্ঠার যেন

● "যাযাবর"-এর "মেঘমুক্তি" নাটকে মীরেন অধিকারী ও জ্যোৎস্না বসু

কিছু অভাব হয়েছে, অভাব হয়েছে উপযুক্ত নাট্যাচার্যের।

আমি যখন পেশাদার মঞ্চে যোগ দেবার উদ্দেশে যোগেশদার (৺ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী) কাছে যাই, তখন তিনি রঙমহল মঞ্চে, তিনি আমায় বলেন, "অভিনয় যদি শিখতে চাও ভাই, শিশিরবাবুর কাছে যাও, এখানে তো তেমন সুবিধে হবে না।" আমি তাঁকে বলি, শিশিরবাবুর সঙ্গে তো পরিচয় নেই। তিনি আমায় চিঠি দিয়ে দিলেন শিশিরবাবর নামে। আমি কম্পিত বুকে, কণ্ঠিত পায়ে গেলাম শিশিরবাবুর কাছে। শিশিরবাবু তখন মঞ্চে এসেছেন, দেখেছেন, জয় করেছেন। অন্যান্যসাধারণ প্রতিভাধর শিশিরকুমার ভাদুড়ী। প্রতিভাবান আমি তাঁকেই বলি যিনি বিভিন্ন চরিত্রে সার্থক রূপদান করেছেন। হ্যাঁ, তাই ছিল শিশিরকুমারের। তিনি নিয়ে এসেছিলেন নতুন জোয়ার নাট্য-ধারায়, যা মুগ্ধ করেছিল দর্শকবৃন্দকে। মঞ্চে তাঁর আগমন নয় আবির্ভাব। তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম, স্থানও পেলাম তাঁর অন্যান্য ছাত্রদের একপাশে। মগ্ন হয়ে দেখতাম তাঁর শিক্ষাদানের ধারা, নাটকীয় চরিত্র বিশ্লেষণের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, বিস্ময়ে অবাক হয়ে শুনতাম ঈশ্বরদত্ত অনুপম অপূর্ব কণ্ঠস্বরের সূক্ষ্মমোচড়-গুলি। তাঁর প্রয়োগনৈপুণ্য অসাধারণ—তার স্বাক্ষর তাঁর 'দিগ্বিজয়ী" নাট্যপ্রযোজনায়। সে অভিনয় যাঁরা দেখেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই আজও ভোলেন নি।

মঞ্চে আঙ্গিকের প্রয়োজন সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন আজ অনেকের মনে জেগেছে। আঙ্গিক তো শিশিরবাবুর যুগেও ছিলো—এমন কি তার আগেও ছিল। তবে এ-প্রশ্ন তখন কেন জাগে নি। আমার মনে হয়, তখন নাটকের ছিলো জোর, অভিনয়ে ছিল গভীরতা তাই হয়ত জাগে নি দর্শকমনে এ-প্রশ্ন। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, মঞ্চে আঙ্গিকের প্রয়োজন আছে, তবে তা যেন কোনও সময়েই অভিনয়কে ছাপিয়ে না যায়। ছাপিয়ে গেলেই সেই আঙ্গিক নাটকের রসবৃদ্ধি না করে রসহানিই করবে। যেমন যন্ত্র-সঙ্গীতের সঙ্গে তবলা-সঙ্গত। সঙ্গত যেমন, যদি কোনও সময়ে মূল সঙ্গীত, যার সঙ্গে সে সহযোগিতা করছে, তাকে ছাপিয়ে যায় বা চাপা দিয়ে দেয়, তাহলে সঙ্গীতের যেমন রসহানি হয়, মঞ্চ-আঙ্গিকও ঠিক তেমনি। তাই, আধুনিককালে আমি এমনও দেখেছি যে, দৃশ্যের শেষে যেখানে অতি করুণরসের পরিবেশনা হচ্ছে, ঠিক সেই সময়েই মঞ্চে আঙ্গিকের বাহাদুরী দেখে দর্শকবৃন্দ উল্লসিত হয়ে হাততালি দিয়ে তাদের অভিনন্দন জানালো। এ অভিনন্দন অভিনয়ের উৎকর্ষতার জন্য নয়, এ অভিনয় মঞ্চ-আঙ্গিকের উৎকর্ষতার জন্যে। এর জন্যে দায়ী করবো কাকে—নাট্যাচার্যকে, নাট্যকারকে, অভিনেতাদের না আলোক-শিল্পীদের। অবশ্য মঞ্চ-আঙ্গিকের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ নেই, অভিযোগ তার পরিমিতিবোধের প্রতি। মঞ্চ-আঙ্গিক—মঞ্চাভিনয়ের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কিন্তু অভিনয় যেখানে মুখ্য সেখানে যেন বাহ্যিক চাকচিক্যই প্রাধান্য না পায়। যেমন পাচ্ছে সর্বজনীন পূজামণ্ডপে। সেখানে দর্শকবৃন্দ কোন সর্বজনীন পূজামণ্ডপ কত ভালো সাজানো হয়েছে তাই দেখে—দেখে না তার মুখ্য বস্তু প্রতিমা—প্রতিমা যেন অবহেলিত।

আরও একটি জিনিষ অধুনা মঞ্চে অবহেলিত সেটি হল সঙ্গীত। আমার নিজের মনে হয়েছে সঙ্গীতও নাটকের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অবশ্য গানের প্রয়োজনে নাটক নয়, নাটকের প্রয়োজনেই গান। তবু দর্শকবৃন্দ বোধ হয় গানও চান নাটকের মধ্যে, উপভোগ করেন সুগীত সঙ্গীত।

এই প্রসঙ্গে শ্রীচারুচন্দ্র চক্রবর্তী (জরাসন্ধ) মহাশয়ের একটি উক্তি মনে পড়লো। তিনি একদিন কোনও একটি নাট্য-সাহিত্য আসরে বললেন, আমি একদিন দর্শক হিসাবে একটি আধুনিক নাটকের অভিনয় দেখছিলাম, আমার পেছনের সারির কয়েকটি অল্প বয়স্ক দর্শক বলাবলি করছে—"হাঁরে, সেই সিন কখন আসবে রে? তার সঙ্গী জবাব দিলে, আর একটু পরেই।' তারপর আর একটু পরেই সেই অতি প্রতীক্ষিত দৃশ্যটি এলো,—তারা দেখলো ও উল্লসিত হয়ে উঠলো,—আমিও দেখলাম মঞ্চের ওপর যেন ইন্দ্রজালের কাণ্ড হল—দৃষ্টি-বিভ্রমকারী দৃশ্য শেষ হল সমস্ত দর্শকদের মুগ্ধ করে। তিনি বললেন, আমাদের যৌবনেও আমরা অভিনয় দেখতে দেখতে ঠিক ঐ রকমই বলাবলি করেছি, যেমন করে সেদিনের অল্পবয়সী দর্শকগুলি, তবে ভিন্ন অনুভূতি নিয়ে। তখন, সেই সিন কখন আসবে অর্থে আমরা বুঝতাম, সেই হৃদয়স্পর্শী অভিনয়ের অংশটি কখন আসবে। ঠিক তাই, অভিনয় তখনও হয়েছে—এখনও হচ্ছে, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে অনুভব করি যে, অভিনয়ের গভীরতা (depth) কমে, সূক্ষ্ম মোচড়ের (modulation) হয়েছে অভাব—কণ্ঠস্বরের সে মাধুর্য গেছে ফুরিয়ে গেছে, যা তখনকার দিনে অন্তর স্পর্শ করতো।

এখন যুগ হয়েছে, প্রচারের। তাই প্রচারের ঢাকঢোল পিটিয়ে শিমূল, 'সোনা' দরে বিকোচ্ছে। এর দায়িত্ব—সংবাদপত্র, সাময়িকপত্রের সমালোচকদের। তাদের হতে হবে নিরপেক্ষ। মঞ্চই যদি শিক্ষার বাহক হয়—তবে প্রকৃত শিক্ষা যাতে পরিবেশিত হয় মানব সমাজে, তার জন্য নিষ্ঠা সহকারে চেষ্টা করা উচিত মঞ্চ সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষেরই। শিল্পের ক্ষেত্রে পথ-নির্দেশ দিতে হবে, সমালোচকদের। জাল ও ভেজালের যুগে শিক্ষার মধ্যেও যেন মেকী ও ফাঁকিতে ভরে

সলিল দত্ত পরিচালিত 'শুধু একটি বছর' চিত্রের নায়ক উত্তমকুমার, আশা দেবী ও শব্দযন্ত্রী সৌমেন চট্টোপাধ্যায়—আলোকচিত্র জানকী বন্দ্যোপাধ্যায়

...যায়। কিন্তু হচ্ছে কই। শিক্ষার কোনও মূল্য নেই, অভিজ্ঞতারও কোনও দাম নেই, যুগ এখন কাঞ্চন-কৌলীন্যের। অর্থের প্রাচুর্য থাকলেই তিনি আজ সর্ববিদ্যা বিশারদ (master-know-all) সাহিত্যের আসরেও যেমন তাঁর বিচরণের অবাধ অধিকার—শিল্প-ক্ষেত্রেও তাঁর পদার্পণে তেমনি কৃতার্থ। কিন্তু শিল্পক্ষেত্র ব্যবসায়ের কেন্দ্র নয়। অবশ্য লোকসান করে ও মঞ্চ চালাতে হবে, একথা আমি বলি না—তবে অর্থের লোভে এই পূত শিল্পপীঠকে কলুষিত করতে হবে তারও কোন মানে নেই।

শুনেছি, আগেকার দিনে বিত্তবান লোকেরা বেড়ালের বিয়ে দিতো—বিয়ের ব্যাপারটাই আসল—কিন্তু সেটা হয়ে দাঁড়াতো উপলক্ষ—সেই উৎসবে প্রচুর আলোক রোশনাই ভোজ্যবস্তুর আয়োজন—নহবৎখানায় নহবৎ। অকিঞ্চিৎকর ব্যাপার—কিন্তু আড়ম্বরের প্রাচুর্যে আসল বিষয়-বস্তুর কথা আর কারুর লক্ষ্য থাকতো না। যেমন এখন হয়েছে বারোয়ারি পূজামণ্ডপে যেখানে প্রতিমা অবহেলিত—যার জন্য এই আয়োজন তার কথা আর কারুর মনে নেই—প্রাধান্য মণ্ডপ সজ্জার—কাদের মণ্ডপ ভালো সাজানো হয়—দর্শকও মণ্ডপসজ্জার বাহাদুরীর আলোচনা করতে করতে আসে—প্রতিমার কথা যায় ভুলি। লক্ষ্যটা গৌণ হয়ে পড়ে—উপলক্ষটাই পায় মুখ্য স্থান। মঞ্চেও যেন সেই অবস্থা। মঞ্চে যা হওয়া উচিত মুখ্য—অর্থাৎ অভিনয় সেটাই যেন হয়ে দাঁড়াচ্ছে গৌণ, প্রাধান্য পাচ্ছে মণ্ডপসজ্জা। নাটকও হারিয়েছে তার সৃজন-ধর্মী প্রয়াস। পয়সা পেলেই যেন শিল্পের সার্থকতা! এই অবস্থাটা যে শুধু প্রযোজক, মঞ্চ-মালিকদের প্রতি প্রযোজ্য তাই নয়। অভিনেতাদের প্রতি সমধিক প্রয়োজ্য। শিল্পীরাও যেন পয়সা পেলেই সার্থক ;—সৃষ্টির সার্থকতার কথা গেছেন ভুলে। যে দর্শকরা তাঁদের পয়সা দিলো, তার বিনিময়ে আমরা, অর্থাৎ শিল্পীরা তাদের কতটুকু ফিরিয়ে দিলাম, সে কথা যেন আমরা আর ভাবি না। এই মেকী ও ফাঁকি দর্শকরাও যেন নীরবে মেনে নিয়েছেন—তা না হলে তাঁদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়ে উঠতো। সোচ্চারে তাঁরা বলতেন, 'এ ভেজাল আমরা আর গিলবো না—খাঁটি কিছু দাও।' কই তাঁরা তো কিছু বলছেন না? কেন বলছেন না? তাঁরা কি বুঝতে পারছেন না যে, অভিনয়ের মান নিম্নমুখী। যাঁরা কিছুদিন আগেও ভালো অভিনয় দেখেছেন তাঁরা তো নিশ্চয়ই উপলব্ধি করছেন। তবে তাঁরা নীরব কেন? তাই, এই মঞ্চাভিনয়ের মান যদি নেমে থাকে তাহলে দর্শককুলও সমভাবে দায়ী।

তবে এই অবনতির মূল নিহিত আছে, সামাজিক দুর্দশার মধ্যে। সামাজিক উন্নতি, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, সমষ্টিগত শান্তি না এলে, নাটক গড়ে ওঠে না—নাটক গড়ে না উঠলে অভিনয়েও সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষতা বাড়ে না। এই পরিবর্তনমুখ দুর্দিনে নাটক হয়ত হচ্ছে,—তবে তা অধিকাংশ হয়ে পড়ছে প্রচারধর্মী, নয় দর্বল। প্রচারধর্মী নাটকে সাময়িক আবেদন থাকলেও তা কালজয়ী বা সর্বকালীন হয়ে উঠে না।

তাই আশা করবো—আমাদেরও সুদিন আসবে, শান্তির প্রতিষ্ঠা হবে। আমরা এই মঞ্চ-মাধ্যমে পথ-নির্দেশ দেব, শিক্ষার বিস্তার করবো। তার জন্যে এগিয়ে আসবেন হৃদয়বান মঞ্চ-মালিক, এসে দাড়াবেন শক্তিশালী নাট্যকার, প্রতিভাধর শিল্পিবৃন্দ। অভিনয়ের স্বর্ণযুগ আসবে। নতুন দিনের সেই সূর্যের আশায় আছি।

'ব্রেক' চিত্রের সুটিং-এর অবসরে আলাপরত মাধবী মুখোপাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায় ও পরিচালক শ্রীবিজলীচরণ সেন। আলোকচিত্র—জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

"রুচিবান—দর্শকের সঙ্গে শিল্পীর যোগাযোগ মঙ্গলকর"

—কমল মিত্র

(সাক্ষাতকার)

একদিকে জলদকণ্ঠের বজ্রনির্ঘোষ, দৃঢ়তাব্যঞ্জক সুগঠিত ব্যক্তিত্ববান আকৃতি। অন্যদিকে প্রাণখোলা দরাজ হাসি। বন্ধুবৎসল, নিরহঙ্কার, সহানুভূতিশীল মন—এরই সমষ্টি কমল মিত্র। এক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন রূপকার হিসাবে যিনি আবির্ভাবের অল্পকালের মধ্যেই এ দেশের অভিনয় জগতের ইতিহাসে একটি বিশেষ আসন আপন অধিকারের আয়ত্তে এনেছেন।

শরৎ বসু রোডের বাড়িতে বন্ধুবেষ্টিত হয়ে বসেছিলেন তিনি। সন্ধ্যা তখন ঘনীভূত হয়ে আসছে। ঘরে ঘরে মঙ্গলশঙ্খের ধ্বনিতরঙ্গ নিনাদিত হচ্ছে, সংসারের কল্যাণে কত গৃহলক্ষ্মী তখন তুলসীতলায় প্রদীপ জ্বালাচ্ছেন, কত ঘর ধূপের সৌরভে, ধুনোর ধোঁয়ায় ভরে যাচ্ছে। সামনে দাঁড়াতেই সপ্রীতি সাদর-সম্ভাষণ—এসো, এসো।

বন্ধুরা এক-এক করে বিদায় নিলেন। একটু দূরে বসেছিলাম—কমল মিত্রের কণ্ঠে ধ্বনিত হল—সামনে এস, অত দূরে বসলে কথা চালানো যায়। তার সামনের একটি আসনে উপবিষ্ট হয়ে বললুম—মাসিক বসুমতীকে কেন্দ্র করে আজ আপনার কাছে আমি এসেছি।

—বল?—শিল্পীর জিজ্ঞাসু কণ্ঠ।

উদ্দেশ্য ব্যক্ত করলুম। ততক্ষণে চা ও নানাবিধ খাদ্যের সম্ভার সামনে এসে হাজির হয়েছে। আমি কলম খুলতে যাচ্ছি শিল্পী বাধা দিয়ে বললেন—এগুলোর সদ্ব্যবহার আগে কর, তারপর যত খুশি কাজ কর।

—সুরু হল কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা।

কমল মিত্র চলচ্চিত্র ও রঙ্গমঞ্চ উভয় ক্ষেত্রেই সমান দক্ষতা প্রদর্শন করেছেন। জিজ্ঞাসা করি—মঞ্চে এবং চিত্রে—কোন অভিনয়ে আপনি আনন্দ পান? উত্তর আসে—মঞ্চে। তার কারণ ব্যক্ত করে বললেন—মঞ্চাভিনয়ের মধ্যে এক ধারাবাহিকতা থাকে, ঘটনাগুলি পর পর অভিনীত হয় সেদিক দিয়ে শিল্পীর চিন্তা, একাগ্রতা তখন সেই চরিত্রটির মধ্যে নিবদ্ধ থাকে, ফলে চরিত্রটির সুরূপায়ণ সহজ হয়ে ওঠে। সিনেমায় এদিক দিয়ে একটু অসুবিধা আছে যেমন ধর—আজ মৃত্যুর দৃশ্য তোলা হল, কাল তোলা হবে বিয়ের দৃশ্য। প্রশ্ন করি—আজকাল এক-একটি নাটক যে শত শত রজনী অভিনীত হচ্ছে, এক সংলাপ বলতে হচ্ছে রজনীর পর রজনী, সেই এক বাঁধাধরা অভিনয়ে। প্রবেশ, প্রস্থান, অঙ্গ সঞ্চালন সবই এক—এই একঘেয়েমি শিল্পীর মনে কি কোন প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করে না? —সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করলেন শিল্পী—দেশলাইয়ের পোড়া কাঠিটা ছাইদানিতে নিক্ষেপ করতে করতে বললেন—দীর্ঘদিন অভিনয় করতে হলে গোড়ার দিকে যে ঐকান্তিকতা, যত্ন ও মনোযোগ থাকে না, শেষের দিকে সেটা যে ঠিক পূর্ণমাত্রায় বজায় থাকে এমন কথা অবশ্যই জোর করে বলা চলে না।

● কমল মিত্র

কমল মিত্রকে প্রশ্ন করি—সাধারণ দর্শকের সঙ্গে শিল্পীর যোগাযোগ কতখানি বা কি ধরণের হওয়া আপনার মতে উচিত? তিনি উত্তরে বললেন—দেখ, সব দর্শকই এক শ্রেণীভুক্ত নন। তবে হ্যাঁ, (তাঁর কথার মধ্যে, লক্ষ্য করলুম, এইবার জোর এল), ভদ্র ও রুচিবান দর্শকের সঙ্গে শিল্পীর যোগ যত ঘনিষ্ঠ এবং দৃঢ় হয়, ততই মঙ্গল, এতে শিল্পীই লাভবান হন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় শিল্পী নিজের দোষত্রুটিগুলি সহজে অবহিত হন এবং তদনুসারে অভিনয় পদ্ধতির পরিমার্জনের সুযোগ পান। বহু চরিত্রের সার্থক রূপকার কমল মিত্রকে প্রশ্ন করি যে কোন ধরণের চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে আপনি আনন্দ পান। মৃদু হেসে উত্তর দেন শিল্পী—শিল্পী হিসাবে যে কোন চরিত্রই আমার প্রিয়। সেখানে বাছাবাছির কোন প্রশ্ন আসে না। তবে—তাকে সত্যিকারের 'চরিত্র' হতে হবে। দুশ্চরিত্র হলে চলবে না। জিজ্ঞাসা করি—আপনি যখন অভিনয় করেন তখন আপনি আত্মসচেতন থাকেন না পুরোপুরি চরিত্রসচেতন হয়ে যান—উত্তর আসে—পুরোপুরি ভাবে আত্মসচেতন থাকি—তবেই একটি চরিত্র ফুটিয়ে তোলা সম্ভব।

প্রশ্ন উঠল—আজকের দিনের অভিনয়ধারা নিয়ে, তার আঙ্গিক নিয়ে, ছবিতে বা নাটকে যান্ত্রিক চাতুর্যের আধিক্য নিয়ে—এ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—প্রতিটি যুগই পরিবর্তনের সম্মুখীন হয় এবং এ অতি স্বাভাবিক নিয়ম, এই পরিবর্তনে অনেক ওলোট পালোট হয়ে যায়, আজ যার চল আছে, কাল তা অচল হবে, আজ যা কল্পনার বাইরে, কাল তাই হবে অপরিহার্য। এই পরিবর্তনের ফলেই আজকের দিনের নাটকে যান্ত্রিক চাতুর্যের প্রাধান্য এসেছে, নাটকের শিক্ষার দিকটায় আর আগেকার মত নজর পড়ছে না।

আজ বিপুল খ্যাতি, যথেষ্ট যশ তাঁর অধিকারগত—কিন্তু প্রথম যেদিন তিনি অভিনয় জগতে পদার্পণ করেন সেদিন কোন বিশেষ আসন তাঁর জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। কোন প্রচারসচিব সেদিন তাঁর সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "নীলাঙ্গুরীয়"তে তাঁর আলেখ্য সর্বপ্রথম রূপালী পর্দায় প্রতিবিম্বিত হয় —নির্বাক এক্সট্রার ভূমিকায়, তারপর এক্সট্রা হিসাবেই "রামানুজ"-এ অবতরণ তফাতের মধ্যে এই যে—এতে তাঁর কথা বলার সুযোগ ছিল। মানু সেন পরিচালিত "রাত্রি" ছবিটি সর্বপ্রথম কমল মিত্রকে দর্শকের সামনে তুলে ধরে নায়ক হিসাবে। তাঁর বিপরীত ভূমিকায় ঐ ছবিতে আবির্ভূতা হয়েছিলেন প্রতিমা দাশগুপ্ত—সে যুগের বিখ্যাত অভিনেত্রীদের একজন। পাদপ্রদীপের সম্মুখে তাঁর প্রথম অবতরণ স্টার থিয়েটারে।

বিপিন গুপ্তের মাধ্যমে স্টারের সঙ্গে তার যোগসূত্র স্থাপিত হল। 'কেদার রায়' নাটকে তিনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন। ঐ নাটকেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন আরও একজন খ্যাতিমান শিল্পী অনুপকুমার। সেদিন খ্যাতি, যশ ছিল না বটে কিন্তু ছিল নিষ্ঠা, ছিল সাধনা, তার সুফল পরবর্তী জীবনে তিনি পেলেন, ভরে উঠলেন দর্শকের বিপুল সাধুবাদে, অসীম জনপ্রিয়তায়।

বহু ধরণের চরিত্র তিনি ফুটিয়ে তুলিয়েছেন তাঁর অনবদ্য সৃজনী-প্রতিভায় নায়ক ও খলনায়ক ছাড়াও তাঁকে দেখা যায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদার, রক্ষনশীল সমাজপতি, বীর যোদ্ধা, স্নেহময় পিতা, অসহায় অধ্যাপক এবং আরও কত বিভিন্ন ভূমিকায় এই বৈচিত্র্য তাঁর শিল্পীসত্তাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে।

তিপান্ন বছর বয়স্ক শিল্পীকে সবশেষে প্রশ্ন করি—১৯৩৪ থেকে অভিনয় জগতের সঙ্গে আপনার সংযোগ। আপনার অভিনীত নাটক ও চলচ্চিত্রের সংখ্যা কত হবে? —একটু ভেবে বললেন দাঁড়াও, একটা তালিকা করা আছে, সেটা নিয়ে আসি। সেই তালিকায় দেখলুম—নাটকের সংখ্যা চুয়াল্লিশ আর ছবির সংখ্যা দেড়শ' অতিক্রম করে গেছে।

"এখনকার গান শেখার পদ্ধতি আশানুরূপ নয়"—

—উৎপলা সেন

(সাক্ষাৎকার)

"এক হাতে মোর পুজোর ডালা আর এক হাতে মালা"—গানটি একদিন লোকের মুখে মুখে ফিরত, এক বিপুল সাড়া জাগিয়ে তুলেছিল এই গান রসিকসমাজে, সঙ্গীতে যাঁদের অনুরাগ তাঁরা প্রত্যেকেই একবার না একবার এই গানটি গেয়ে তৃপ্তি পেয়েছেন। এই গানের শিল্পী উৎপলা সেন। আজকের দিনের লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়িকা শ্রীমতী উৎপলা সেনের গাওয়া এই গানটি সেদিন আলোড়ন এনেছিল বললেও অত্যুক্তি হয় না।

এই রেকর্ডটির মাধ্যমেই বাঙলার সঙ্গীতপিপাসুর দল জানতে পারল সুরের আকাশে নতুন তারকার অভ্যুদয় ঘটেছে। তারপর দীর্ঘ দিন কেটে গেছে। ষড়ঋতুর আবর্তনের মধ্যে কত উৎসব এসেছে, গেছে, কত ঘটনার ঝড় বয়ে গেছে, কত কি পরিবর্তন ঘটেছে আর এই বহমানতার মধ্যে শিল্পীও এগিয়ে চলেছেন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ও খ্যাতিতে পরিপূর্ণা হয়ে। সেদিনকার নবাগতা শিল্পীরও আজ আসন বদল ঘটেছে, আজ সঙ্গীতজগতের একটি পুরোভাগের আসনে তিনি সসম্মানে অধিষ্ঠিতা।

কালীপুজো সবে তখন অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু বাজী পোড়ানো শেষ হয় নি। বাজী পোড়ানো না বলে বোধহয় বোমা ফাটানো বলাই সমীচীন। পুজো নির্দিষ্ট দিনে, সময়ে শুরু, নির্দিষ্ট ক্ষণে হয় সমাপ্ত। কিন্তু এই বোমা ফাটানো—যা ঘটনাচক্রে আজ পুজোর অঙ্গস্বরূপ হয়ে গেছে—তার কখন শুরু, কখন শেষ—এ সম্বন্ধে বোধহয় কোন বিধিনিষেধ নেই—তাই চতুর্দিকে থেকে থেকে ধ্বনিত হচ্ছে বিকট শব্দ, তীব্রতায় ভরপুর। এই পরিবেশেই শ্রীমতী সেনের সঙ্গে তাঁর দক্ষিণ কলকাতার ভবনের একটি সুসজ্জিত কক্ষে আলোচনা চালাতে হচ্ছে।

নানা কথার মধ্যে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি · গানের অনুপ্রেরণা আপনি কোথা থেকে পেলেন? —উত্তর এল একটি মাত্র শব্দে, যার গুরুত্ব আজও অপরিমাপ্য। শব্দটি—মা।

শ্রীমতী সেনকে সর্বপ্রথম সঙ্গীত সম্বন্ধে শিক্ষা দেন খগেশচন্দ্র চক্রবর্তী। খগেশচন্দ্র তাঁকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পাঠ

● শ্রীমতী উৎপলা সেন

দেন। আধুনিক গানের শিক্ষা তাঁকে দিলেন স্বর্গত শিল্পী সুধীরলাল চক্রবর্তী। ঠুংরি শিখেছেন সুনীল বসুর কাছে। এযুগের অন্যতম খ্যাতিমান শিল্পী সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কাছেও তিনি গান শিখেছেন। সাধারণ পাঠ তিনি গ্রহণ করেছেন স্কটিশ চার্চ কলেজে।

হিন্দুস্থানে তাঁর প্রথম রেকর্ড গৃহীত হল। পূর্বোক্ত "এক হাতে মোর পুজোর ডালা" উল্টো দিকে ছিল—"বনফুল জাগে পথের ধারে" (১৯৪৬)। চলচ্চিত্রে কণ্ঠদান তিনি সর্বপ্রথম করেন জজ সাহেবের নাতনী চিত্রে। তারপর দীর্ঘ বিরতির পর তিনি পুনরায় নেপথ্যে গান পরিবেশন করেন "মাই সিস্টার"-এ। তারপর আর বিরতি নেই। এখনও তিনি যথেষ্ট সফলতার সঙ্গে ছায়াচিত্রে কণ্ঠদান করে চলেছেন। আজ পর্যন্ত গৃহীত তাঁর গাওয়া রেকর্ডের সংখ্যা দুশোর ঘরে পেঁছেছে। সাম্প্রতিক মহাপুজায় সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় তাঁর দুটি গানের রেকর্ড হয় (ঝুমকোলতার বনে এবং এই মাধবী যদি ফোটে)। "তাসের দেশ"-এর লঙপ্লেয়িং রেকর্ডে তিনি গানও গেয়েছেন এবং দহলানীর ভূমিকায় অভিনয়ও করেছেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেছেন দিকপাল শিল্পী শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিকের কাছে।

সময়ের আবর্তনে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়· তাই জিজ্ঞাসা করি এযুগে গান শেখানোর পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁর অভিমত কি—উত্তর আসে নেতিবাচক। তাঁর মতে এ পদ্ধতি ঠিক আশানুরূপ নয়, তাঁর মতে এ যেন লেখা-পড়ার মত দাঁড়িয়ে গেছে, সমস্তটাই যেন একটা ছকে বাঁধা বস্তুতে পরিণত হচ্ছে, তাছাড়া এখন শেখার দিকে ততটা নজর নেই যতটা আছে অনুষ্ঠান, খ্যাতির দিকে। এখন গান শেখার থেকে গান গাওয়ার দিকেই ঝোঁকটা বেশি। একটু থামলেন শিল্পী এযুগকে বোধহয় একবার মিলিয়ে নিলেন বিগত যুগের সঙ্গে, খ্যাতির সূত্র ধরে বোধহয় চলে গেলেন নিজেদের ছাত্রী জীবনে—তারপর বললেন—আমাদের শেখার দিকটাতেই নজর ছিল, সেদিন মন্ত্র দেওয়ার মত শেখানো হত। আমরা শুনতাম। সেই শোনা মন্ত্রের মত কাজ করত, একেবারে হৃদয়ে গেঁথে যেত,

প্রথম অন্বেষণে ব্যর্থ হ'লে অনেকে রেগে যান, আমরা সমালোচনার সম্মুখীন হতাম, তারই ভিত্তিতে নিজের দোষত্রুটি সংশোধনের চেষ্টা করতাম।

প্রশ্ন করি—অনেক জায়গায় আপনাদের অনেক শ্রোতা তাঁদের পছন্দমত গান গাইতে অনুরোধ করেন—এর কি প্রতিক্রিয়া আপনাদের মধ্যে হয়, সব সময়েই কি সব গান গাওয়ার মত 'মুড' থাকে, উত্তরে বলেন—ফরমায়েসী গানে শ্রোতার রুচিবোধের পরিচয় পেলে মন সত্যিই প্রফুল্ল হয়। এখনকার সাংগীতিক পরিবেশ তাঁর মতে সবক্ষেত্রে ভাল নয়। কি এক প্রয়োজনে একবার শিল্পীকে একটু উঠে যেতে হল ক্ষণকালের মধ্যেই তিনি ফিরে এলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি শিল্পী হিসাবে গভীর পরিতৃপ্তি আপনি কিসে পান—উত্তর আসে—ভাল গান শুনলে বা নিজে গেয়ে মনে মনে এক বিরাট আনন্দ পেলে। আমার পরবর্তী প্রশ্ন—শ্রোতার সংগে শিল্পীর আপনার মতে সম্পর্ক কি রকম হওয়া উচিত—ছোট্ট কথায় জবাব এল—মধুর। একটু থেমেই শিল্পী আবার বলতে আরম্ভ করলেন, আপন বক্তব্যকে ব্যাখ্যা করে বললেন—কোন কোন শ্রোতা ভাল প্রশ্ন করেন আবার কেউ কেউ করেন অবান্তর প্রশ্ন।

আধুনিক বাঙলা জনপ্রিয় গানের প্রথম লঙ প্লেয়িং রেকর্ড (যা যুক্তরাষ্ট্র থেকেও একযোগে প্রকাশিত হয়েছে) আত্মপ্রকাশ করেছে তাঁর কণ্ঠ বহন করে। সেই রেকর্ডে আর একজন বিখ্যাত শিল্পীর কণ্ঠও ধরা আছে—তাঁর নাম শ্যামল মিত্র।

কথায় কথায় সময় যে কতদূর এগিয়ে গেছে লক্ষ্য করি নি, হঠাৎ নজর পড়ল ঘড়ির ছোট কাঁটা এগারোর ঘরে ঢুকছে। আর কথা চলে না। আলোচনায় আনতে হয় সমাপ্তি, পা বাড়াতে হয় ঘরের দিকে। উঠে আসছি, হঠাৎ হাসতে হাসতে শিল্পী বললেন—আমার সবচেয়ে মজা লাগে কখন জানেন—ফিরে তাকাই—জিজ্ঞাসা করি কখন? —হাসির মধ্যেই বললেন—যখন আমার ছেলের চেয়েও বয়সে ছোট কেউ আমার নাম ধরে সম্বোধন করে।

"গান ছাড়া নিজের অস্তিত্বই ভাবতে পারি না"—

—লক্ষ্মীশঙ্কর

[সাক্ষাৎকার]

১৯৫৭ সালের এণ্টালী কন্‌ফারেন্সে প্রথম লক্ষ্মীশঙ্করের নাম শোনা গেল। কোলকাতায় উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের আসরে সে বছরই তাঁর আবির্ভাব। তারপর থেকেই নিজস্ব শান্ত, অনাড়ম্বর গায়কী ঢঙে ইনি একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছেন।

জীবনের প্রতিষ্ঠালগ্নে প্রথিতনামা কণ্ঠসঙ্গীত-শিল্পী হলেও সঙ্গীত-জগতে এঁর পদার্পণ, নৃত্যের মাধ্যমে।

দক্ষিণভারতীয় রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। জামসেদপুরে জন্ম। ছোট্ট মেয়েটি হাসে খেলে আবার হঠাৎ উদাস হয়ে যায়। কেউ তার মনের খবর পায় না। কোথাও কোনো সাধুসন্ত দেখলে, কিম্বা পূজার মন্ত্র শুনলে মনটা দুলে ওঠে। মা বিশালাক্ষী দেবী, বাবা বৈদ্যনাথ শাস্ত্রী। শান্তিপ্রিয় নির্বিরোধ পরিবার। এই ত' গেল জীবনের প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় দৃশ্যের পটভূমিকা—মাদ্রাজে। মেয়েটি এখানে এলো মা-বাবার সঙ্গে। প্রথম বালা সরস্বতীর নাচ দেখে শুধু মুগ্ধবিস্ময়ই জাগল না অন্তরে, প্রেরণায় দেহ যেন চঞ্চল হয়ে উঠল। নৃত্যের বিদ্যুৎস্পর্শে এই মাটির দেহ কি অপরূপ সৌন্দর্যময় হয়ে ওঠে।

"মাকে রাজী করাতে দেরি হয় না। বালার নাচ মাকেও খুব অভিভূত করেছিল। মা রক্ষণশীল হলেও মোহান্ধ ছিলেন না। রক্ষণশীলতা

● লক্ষ্মীশঙ্কর

গ্রহণ-শীলতার পথে বাধার সৃষ্টি করে নি। তাই গ্রহণযোগ্য বস্তুকে গ্রহণ ও অভিনন্দন করায় দ্বিধা ছিল না একটুও। গুরু কন্দর্প পিল্লাই-এর কাছে আমি ও বালা একসঙ্গে ভারত নাট্যম শিখতাম। তা ছাড়া আমোভি সিং-এর কাছে আমি শিখতাম মণিপুরী। দু-এক জায়গায় মঞ্চে অবতরণ করে প্রশংসাও পেলাম কম নয়। অতএব নৃত্য-জীবনের গতি রইল অপ্রতিহত।"

স্মরণীয় পট-পরিবর্তন ঘটল ১৯৩৯ সালে। উদয়শঙ্কর তাঁর নৃত্যসম্প্রদায় নিয়ে মাদ্রাজে এলেন। উদয়শঙ্করের নৃত্য দেখে মা শুধু মুগ্ধ নয় শুধু। আর মেয়ের মনে হোলো নৃত্য-সৌন্দর্য যেন তার চূড়ান্ত-পরিণতিতে পৌঁচেছে ঐ দেবদুর্লভ দেহতটে। নৃত্যকে যদি জীবনের শ্রেষ্ঠতম বস্তু হিসাবে গ্রহণ করতে হয়---উদয়শঙ্করের দলে যোগ না দেওয়ার কোনো মানে হয়? তখন শঙ্করের ব্যবস্থাপক ও কর্ণধার ছিলেন তাঁরই অনুজ রাজেন্দ্রশঙ্কর। তাঁকে ফোন করা হল। তাঁরই উদ্যোগে ও সহায়তায় শঙ্করের পার্টিতে যোগদান করে আলমোড়ায় গেলেন লক্ষ্মীশঙ্কর। সেবারই গুরু শঙ্করন নম্বুদরিকে সঙ্গে নেওয়া হোলো কথাকলির নৃত্যশিক্ষক হিসাবে।

আলমোড়া নৃত্যকেন্দ্র। যেন স্বর্ণপুরী, শিল্পী-সাধনার পক্ষে উপযুক্ততর ক্ষেত্র কল্পনা করা যায় না। ধূলি-কাঁকরের জগতের রূঢ় বাস্তবের উর্ধ্বে—আকাশের সঙ্গে পাহাড়ের মিতালী সেখানে। বরফের

দৃষ্টি যায় হিমালয়ের তুষার-শুভ্র শৃঙ্গ। এ-হেন তপস্যার তীর্থে দুর্লভ শিল্পী-সঙ্গমের মণি-কাঞ্চন যোগ---গুরু আলডিকিন, শঙ্করম নম্বুদরি, তিমিরবরণ, সিরালী, সিমকী আর সবের মধ্যমণি রূপরাজ উদয়শঙ্কর।

"সে পরিবেশ ভাবা যায় না, অ-শিল্পিমনও শিল্পের স্বপ্ন দেখে সেখানে। এখনকার বিপুল খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির অধিকারিণী অমলাশঙ্কর তখন কত ছোট ছোট মেয়ে। এরই মধ্যে কাটল ১৩৪৭ সাল অবধি। সে যেন শুদ্ধ ধ্যানের জগৎ---সকলেই এক অভাবনীয়ের আরাধনায় বিভোর। অনেক স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে ছোট্ট একটি ঘটনা বললেন লক্ষ্মীশঙ্কর। সাধক আলডকিনের বিনয়নম্র চরিত্রের মধুর ছবিখানি যেন তুলির এক আঁচড়ে ফুটে উঠল।

'একবার গুরু শঙ্করম নম্বুদরি বাবার (আলাউদ্দিন খাঁ) বাজনা শুনতে চাইলেন, বাবা অমনই ব্যস্তসমস্ত হয়ে সরোদ হাতে নম্বুদরির ঘরের সামনে বারান্দায় বসলেন। উনি হাতজোড় করে যত সম্ভ্রম করে ডাকেন, "ঘরে আসুন—সে কি কথা।" বাবা মাটির সঙ্গে মাথা ঠেকিয়ে বলেন, "আমি মুসলমান, হিন্দু ব্রাহ্মণের ঘরে যেতে পারি? শেষকালীয় নম্বুদরি চটে লাল, "আপনি এতবড় গুণী, গুণীর আবার জাত কিসের? তা ছাড়া হিন্দু-মুসলমান সবাই ত' ঈশ্বরের উপাসক, আমি কি এমনই ধর্মান্ধ?" অবশেষে বাবাকে হার মানতে হোলো। বাজনা যখন শুরু করলেন এক-একটা মীড় টানেন আর নম্বুদরির চোখ দিয়ে অজস্র ধারা গড়িয়ে পড়ে। বাবারও তাই। সেখানে যে ক'জন শ্রোতা,---সবাই কাঁদছেন আর সে কান্নার মধ্যে কি আনন্দ? মনে হচ্ছে বুকের ভেতরকার সব ভাব যেন হাল্কা হয়ে যাচ্ছে। সে এক অদ্ভুত অনুভূতি। বলে বোঝানো যায় না।"

এতবড় গুণী কিন্তু নিরহঙ্কার বললে কিছুই বলা হয় না। এমন আত্ম-অচেতন যে মানুষ হতে পারে তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আমি গান শেখা সুরু করার পর বাবা 'তারানা' শেখাচ্ছেন। প্রথমে ইমনের ওপর একটা তারানা শেখালেন, তারপর সেটা ওঁর নিজের তৈরি---তারপর ওঁর গুরু উজীর খাঁর একটি তারানা শোনালেন---"আলাহিয়া বিলাবল"---রাগের ওপর। গাওয়ার পর হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলেন---আমাদেরই একজনকে, "কোনটা ভাল লাগল?"

যাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো তিনি হয়ত ভাবলেন বাবা নিজের রচনার প্রশংসা শুনলেই খুশি হবেন। তাই জিজ্ঞেস করামাত্রই বললেন, "ইমন।" বাবা অমনই ক্রোধে রক্তচক্ষু হয়ে তাকে মারতে যান আর কি! "মূর্খ কোথাকার। কার সঙ্গে কার তুলনা।" আলাহিয়া বিলাবলের তারানা যে কি জিনিস তা বোঝবার ক্ষমতা আছে? বক্তা অপ্রস্তুত। বাবা বারবার গুরুর উদ্দেশ্যে প্রণাম করতে লাগলেন। যেন একথা কানে শোনাও গুরুর কাছে অপরাধ করা। ---সত্যি বাবা যেন সেই একলব্যের যুগের মানুষ।"---

"নাচ থেকে গানে কি করে converted হলেন?" জিজ্ঞাসা করি। ১৯৪৭ সালে রবুর (রবিশঙ্কর) "Discovery of India"-তে আমি নেচেছিলাম। অন্নপূর্ণাও সেই প্রোগ্রামে সেতার বাজিয়েছিল। তার পরই আমার প্লুরিসি attack হোলো। এরই মধ্যে একদিন স্বনামধন্য দিলীপকুমার রায় আলমোড়ায় এলেন। আমায় একটি ভজন শেখালেন। গান শুনে উনি খুব খুশি। আদর করে বললেন, "এত সুন্দর গলা অথচ গান গাও না কেন?" শুনে মনের মধ্যে যেন আনন্দের শিহরণ খেলে গেল। প্লুরিসি-কে একরকম ভগবানের আশীর্বাদ বলা চলে। সত্যি, সামান্য এক-একটা ঘটনা কেমন করে যে জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।" একটু থামলেন। "হ্যাঁ, কি বলছিলাম? প্লুরিসির পর শরীরটা দুর্বল হওয়ায় ডাক্তার বারণ করলেন বলেও বটে, আর নিজের ভেতর থেকে গানের তাগিদ আসছিল বলেও নাচ ছেড়ে গানে আত্মনিয়োগ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম। এরই মধ্যে জীবনের সবচেয়ে বড় অধ্যায় বিবাহপর্বও সমাধা হয়ে গেল।"

"কেমন করে?"

"তোমার মেজদা (রাজেন্দ্রশঙ্কর) যদিও গুরুগম্ভীর আর আমি শান্ত প্রকৃতির মানুষ,---তবু আমাদের গভীরে কোথায় যেন মিল ছিল। আলমোড়ার অনেকেই প্রস্তাব করলেন এদের মিলন সার্থক

● 'বদাগ' চিত্রের অন্য একটি দৃশ্যে মেহমুদ ও মনোজকুমার

হবে। অবশেষে জোহরা একদিন মা'র কাছে কথাটা পাড়ল। ওঁকে প্রথমে দেখেই মা'র খুব পছন্দ হয়েছিল। ধীর, বিবেচক, দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন, মার্জিতরুচি, বিনয়-সৌজন্য সব মিলিয়ে এমন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ কমই চোখে পড়ে। ১৯৪১ সালের মে'তে রবুর বিয়ে হোলো। নভেম্বরে আমাদের।"

"বিয়ের সময় গানের উৎসব খুব জমেছিল নিশ্চয়ই? বিশেষ অমন শিল্পী সমাবেশের রংমহলে?"

'সে আনন্দের ছবি কথায় ফোটানো যায় না। গানের বাসরঘরে যেন আমাদের মিলন-মুহূর্ত সাজানো হয়েছিলো। শুধু সুর, ছন্দ ও আনন্দ। মনে হয়েছিল স্বর্গ বুঝি নেমে এলো মাটির পৃথিবীতে।---"

এরপর গানের অধ্যায়। ইতিমধ্যে বোম্বের সঙ্গীত পরিচালক মদনমোহনের তত্ত্বাবধানে কয়েকটি ব্যাকগ্রাউণ্ড গানে নামও হয়েছিলো যথেষ্ট। গান শেখবার decision নেওয়ার পর পাতিয়ালা ঘরানার ওস্তাদ আবদুল রহমানের কাছে তিনিই নিয়ে গেলেন। এঁর শেখানোর পদ্ধতি অপূর্ব। ১০ বছর সমানে এঁর কাছে শিখেছি। বাবার (আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব) কাছে ধ্রুপদ ধামারের তালিম নিয়েছি। শিক্ষাদানে তাঁর কোনো কার্পণ্য নেই— সে ত' জানই। তাছাড়া সঙ্গীতবিশারদ প্রোফেসার দেওধরের কাছেও রবু আমায় পাঠিয়েছিলো। সবার কাছে সব ঋণ স্বীকার করেও বলব, "গানের ক্ষেত্রে রবু আমার মস্ত গুরু ও পরিচালক। কত কঠিন বিষয়ে আমার conception clear হয়েছে শুধু ওরই সুন্দর বোঝানোর গুণে। অনেক সময় ওর বাজনা শুনেও মনে হয়েছে একটা রুদ্ধদুয়ার যেন হঠাৎ খুলে গেল। ওর সহজলব্ধ অন্তর্দৃষ্টি এত সহজে অপরের অন্তরে সঞ্চারিত হয় যে, আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। আর এসব এদের মত---'কোটিতে গোটিক' শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব।"

● 'বেদাগ' চিত্রের পরিচালক শ্রীরতন ভট্টাচার্য

"পারে যে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে"—
তাই —না?"

"ঠিক তাই। এই দেখ না, দক্ষিণ ভারতীয় গানের ক্ষেত্রে। এ দেশে দক্ষিণ ভারতীয় গান অনভ্যস্ত কানে শুনতে ভালো লাগল না---অমনিই তাকে "ভাল-না-লাগার" জলে ঠেলে রেখে পাশ কাটিয়ে গেল।

কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় রাগের গভীরে প্রবেশ করে তার রসরূপকে এদেশের সঙ্গীতমহলে পরিবেশন করে এর সম্ভাবনার দ্বারটি খুলে দিলেন কেমন কৌশলী যাদুকরের মত? গত কয়েক বছর "চিরবাণী," "সিংহেন্দ্র মাধ্যম", "মলয়-মারুতম", "বাচস্পতি", "চারুকেশী"---এইসব রাগ শুধু popular-ই হয় নি, যেন এদের ঘরের জিনিস হয়ে গেছে। এর সমস্ত কৃতিত্ব রবুর একার। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে এমন মিলনসেতু রচনার জন্য সঙ্গীতরসিক-সমাজ ওর কাছে ঋণী থাকবে।"

"গানের মধ্যে কোন্ রসের আবেদনে আপনার মন বেশি সাড়া দেয়?"

"ভক্তিরস। দক্ষিণ ভারতীয় আমরা। ভক্তি আমার রক্তে প্রবহমান। তারও পর আলমোড়ার সেই সাত্ত্বিক

● 'শাওন কি ঘটা' চিত্রের কৌতুকশিল্পী নীলম বেলগাওনকরকে লিখিত নির্দেশ দিচ্ছেন পরিচালক

পরিবেশ মনের অতলে কাজ করে গেছে। শুভলক্ষ্মীর প্রসঙ্গে বললেন, "ওঁর গান এইজন্যই আমার এত ভাল লাগে। অপূর্ব কণ্ঠই শুধু নয়, যেন ভক্তির রসে ডুবে আছেন। আর মানুষটার ত' তুলনাই নেই। শিশুর মত সরল ও আত্মভোলা। এত নামডাক,—কিন্তু তার জন্য এতটুকু অহঙ্কার দূরের কথা— এত লাজুক যে মুখ থেকে কথা বার করাই মুস্কিল।"

"এতদিন অবধি ত' এত প্রোগ্রাম করলেন। কোথায় গান গেয়ে আপনি সবচেয়ে তৃপ্তি পেয়েছেন?"

"একবার অমৃতসরে একটা ঘরোয়া জলসায় গেয়েছিলাম। একাদিক্রমে ৫।৬ ঘণ্টা। যাঁরা শুনছিলেন তাঁরা খুব সংবেদনশীল বলেই কিনা জানি না, আমার এমন মেজাজ এসে গেল যে, গাইতে গাইতে হুঁস ছিল না।"

মতে সাঁইবাবা বলে এক মহাপুরুষের কাছে একবার গিয়েছিলাম। তিনি কাউকে স্পর্শ করেন না। কোনো উল্লাস প্রকাশ করেন না। ওঁর কাছে গান শোনাবার জন্য আমায় নিয়ে যাওয়া হোল। আমি প্রথমে গাইলাম, "অবকে মাধব মোহি উধার"—শুনে উনি আর একটা গাইতে বললেন। তারপর আরো আরো এমনই করে সাত-আটখানা গান গাইলাম।"— ফেরার আগে প্রণাম করবার পর উনি আমার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন—আর একটি লকেট দিলেন আমার হাতে। তার একদিকে ঠাকুর আর একদিকে এক যুগপুরুষের ছবি। সবাই খুব অবাক। উনি নাকি চট্ করে কারো প্রতি এতটা সদয় হন না। খুব গম্ভীর ও রাশভারী মানুষ। আনন্দে সেদিন আমার চোখে জল এসে গিয়েছিল। এতবড় সিদ্ধপুরুষের হাত থেকে এমন দুর্লভ বস্তু পাবার আশা ত' করি নি।

১৯৬৩ সালে উদয়শঙ্কর সম্প্রদায়ের সঙ্গে আমেরিকা গিয়েছিলাম, Music-conductor হয়ে। আমার ১০ মিনিটের প্রোগ্রাম ছিল। কিন্তু এত appreciation পেয়েছিলাম যে, সময় আরো বাড়াতে হোলো। কিন্তু যাক সেসব কথা—নিজের কথা বলতে লজ্জা করে বড্ড।"

মৃদু হেসে বললেন, "এখন জীবনটা এমন হয়ে গেছে—গান ছাড়া আর সবকিছুই মিথ্যে মনে হয়। গান ছাড়া নিজের অস্তিত্ব ভাবতেই পারি না। আমি ভগবানের কাছে আর কিছু চাই না—শুধু এইটুকুই প্রার্থনা—গান বন্ধ হয়ে যাবার আগে যেন আমার মৃত্যু হয়।"

স্বভাবে শান্ত, অমায়িক—সোজাসোজা সংযত স্বল্পভাষী শিল্পী লক্ষ্মীশঙ্কর শঙ্কর-পরিবারের গৌরবময় শিল্পী-ঐতিহ্যে এক উজ্জ্বল সংযোজন।

—সন্ধ্যা সেন

মোহন সায়গল পরিচালিত 'দেবর' চিত্রের একটি দৃশ্যে ধর্মেন্দ্র, শর্মিলা ঠাকুর ও দেবেন বর্মণ

বোম্বাই সমাচার

বর্তমান রাষ্ট্রীয় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথমে 'ধান ভানতে শিবের গীত' কিছু গাইলে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

শরৎ বিদায়োন্মুখ—হেমন্ত সমাসন্ন।

এবার আমরা শেষ করতে পারি নি শরৎ-বন্দনা। শারদীয়া উৎসবও শেষ করতে হয়েছে নমো নমো করে। হেতু, ভারতের ঈশান ও পশ্চিম সীমান্তে ঈশানীর তাণ্ডব নৃত্য। বেজেছে রণ-ঈশানীর দামামা। ডেমোক্রেসীর সঙ্গে ডিক-টেটরসিপের লড়াই।

হাস্যকর এই যে, যে-দেশের নিজের নেই 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রশ্ন,'—তারাই গলা-বাজি করছে কি না অন্যের দেশকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেবার। আর যে দেশ হয়েছে কোন এক স্বাধীন রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ,—তার বেলায় নূতন করে আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন আসেই বা কি করে ?...

যাক্—এ হচ্ছে রাজনীতি কটনীতিবিদদের আলোচনার ব্যাপার। তবে আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে, এ যুদ্ধ ফিল্ম-জগতে কি প্রতিক্রিয়া এনেছে।

দেশ যখন বিপর্যয়ে সম্মুখীন হয়, তখন দেশবাসীর কর্তব্য হয় সে বিপর্যয় থেকে দেশকে রক্ষা করা। প্রত্যেক জাতীয় প্রতিষ্ঠান, সঙ্ঘ, সমিতির কর্তব্য হয় দেশকে 'আসন্ন' বিপন্মুক্ত করা। সুতরাং বর্তমান ক্ষেত্রে

নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

দেশীয় ফিল্ম-শিল্পী সঙ্ঘের জাতীয় কর্তব্যও যে প্রতিকূলে যাবে না, সে কথা সুনিশ্চিত।

ঠিক একারণে কিছুদিন আগে ফিল্ম-জগৎ থেকে দেশের সেনাবাহিনীকে অকাতরে সাহায্যের জন্যে এক আবেদন প্রচার করা হয়—যার ফলে কয়েক লক্ষ টাকা ফিল্মের নেতা জাতীয় লোকেরা সরকারের হাতে তুলে দিতে পেরেছেন।

শুধু তাই নয়, জোয়ানদের যুদ্ধ তহবিলে অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে বোম্বের চলচ্চিত্রকর্মী-দের সহধর্মিণীরাও স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছেন। ওঁরা তুলে দিয়েছেন প্রায় ষাট হাজার টাকার মত। এদের এ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেণ্ট মিসেস বি আর চোপরা প্রায় এক হাজার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থ জোয়ানদের পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন। বোম্বের চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিচালকদের প্রায় প্রত্যেকের সহধর্মিণী হচ্ছেন এই এ্যাসোসিয়েশনের মেম্বর।...

কিছুদিন আগে মিসেস নার্গিস দত্ত আবার জোয়ানদের উদ্দেশে অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো থেকে ওঁরই অভিনীত ফিল্মের কতকগুলো জনপ্রিয় সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। চিত্রের সঙ্গীত-গুলো ছিল 'আগ', 'আওয়ারা', 'আন্দাজ', 'জাগতে রহো', 'বরসাত', 'পরদেশী', 'মাদার ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি হতে।

বলা প্রয়োজন, মিসেস নার্গিস দত্ত চলচ্চিত্র জগতের প্রথম মহিলা—যিনি যুদ্ধরত জোয়ানদের সাহায্য ব্যাপারে পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট।...

● রোনো ফিল্মসের 'তু হি মেরি জিন্দেগী' চিত্রের একটি দৃশ্যে নবাগত দেব মুখোপাধ্যায় ও সলোমে

কয়েকদিন আগে তেজল 'আর্টিস্ট' নিয়ে সুনীল দত্ত ওঁর স্ত্রী নার্গিস দত্ত সমভিব্যাহারে দিল্লীর পথে চলে গেছেন আমাদের জোয়ানদের মধ্যে আমোদ-প্রমোদ বিতরণের অভিপ্রায়ে। এই দলে আছেন আনোয়ার হুসেন, মহেন্দ্র কাপুর, মনোহর দীপক, মধুমতী, শাম্মী, প্রেম দেওয়ান, আর বি বি ভাল্লা।---

আর ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়েই বোম্বের একজন প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্র প্রযোজক ও পরিবেশক জি পি সিপপি, 'জিদ্দি' ও 'দুলহা-দুলহন' নামে দুইটি চিত্র জোয়ানদের নামে উৎসর্গ করে ফেলেছেন।---

জোয়ানদের জন্যে অর্থসংগ্রহ বা তাদের আনন্দ বিতরণই শুধু নয়, বোম্বের কয়েকটি চিত্র প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে ভারত-পাকিস্থানের, যুদ্ধকে উপলক্ষ করেই চিত্র প্রস্তুতির কাজে লেগে গেছেন।

দশহরার দিনে মনোরঞ্জন চিত্রের পতাকা-তলে অমরিত কে, ওবিরয়ের প্রযোজনায় শহীদ হাবিলদার আবদুল হামিদের স্মৃতিকে উজ্জীবিত করার অভিপ্রায়ে ওঁরই নামে এক চলচ্চিত্রের উদ্বোধন করলেন ভারতের প্রতি-রক্ষা-মন্ত্রী শ্রীওয়াই বি চ্যবন। এইদিন হাবিলদার আবদুল হামিদের এক বড় প্রতিকৃতিতে সশ্রদ্ধ পুষ্পমাল্য অর্পণ করা হয়। এই সময় মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী -সন্তরাও নায়েকও উপস্থিত ছিলেন। চিত্রটির কাহিনী লিখেছেন ওমর খৈয়াম। পরিচালনায় আছেন ভি আর নাইডু। সঙ্গীত পরিচালনায় এক নূতন জুটি—সোনিক ও ওমি। অভিনয়াংশে আছেন রমেশ দেও ও তাঁর স্ত্রী সীমা।--

আর একটি নূতন চিত্র প্রতিষ্ঠান—সুরেশ পিকচার্স—যাঁরা 'প্যানিক-ইন-গোয়া' নামে একটি চিত্রের শুভমুহূর্ত পালন করেছেন কয়েক দিন আগে। ভারত-পাক বিরোধ সংক্রান্ত ঘটনা নিয়েই 'প্যানিক-ইন-গোয়া' কাহিনীর পট-ভূমিকা। লিখেছেন: জি বক্সী। স্ক্রিন-প্লে আর সংলাপ লিখেছেন ইবি-ই। অনজান ও যোগেশ রচিত কথায় সুরসৃষ্টি করেছেন রবীন ব্যানার্জি। প্রযোজনা: এইচ রায়। পরিচালনা: ধরমকুমার। ক্যামেরায় আছেন এ গদানন্দ,—যিনি 'হকিকৎ' চিত্রায়িত করে খ্যাতিসম্পন্ন হয়েছেন।

গত কুড়ি তারিখে এদেরি এক দৃশ্য গ্রহণ প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেলাম আমি।

পরিচিত হলাম পরিচালক ধরমকুমারের সঙ্গে।

উনি তখন ব্যস্ত ছিলেন এক অর্ন্তদৃশ্য গ্রহণে।

এই দিনের প্রধান অভিনেতা ছিলেন গোয়ার সম্রান্ত ও ধনীপ্রধান হলেন এই অমরনাথ।

সেদিন ওঁর ঘরে কয়েকজন ধনবান ইয়ার বন্ধু এসেছেন 'চা-চক্রে।'

তখন রেডিয়োতে সংবাদ আসছে লাহোর ফ্রণ্টে ভারত-পাক যুদ্ধের।---খবর শেষ হোলো। বন্ধুদের কাছে আবেদন জানালেন অমরনাথ। পাক-দুশমনদের সায়েস্তা করতে হবে, এবং তার জন্যেও চাই সকলের অকুণ্ঠ সাহায্য। বন্ধুরা জানালো, তারা সবাই সাহায্য করতে প্রস্তুত: সবাই প্রায় মোটা টাকা দেবে বলে প্রতিশ্রুত হ'ন।

মোট এই ছিল সেদিনের দৃশ্যগ্রহণ।

এ চিত্রের চরিত্রলিপিতে যাঁরা আছেন, তাদের নাম যথাক্রমে: শেখ মুখতার, রণধাওয়া, মালিকা (নায়িকা) মারুতি, হারকিউলিস, সেরি দিলীপ দত্ত, অরুণা ইরাণী, মীনাক্ষী ও সুজাতা।

জানা গেল যে, এই কয়দিনে 'প্যানিক-ইন গোয়ার' পাঁচ রিল সম্পূর্ণ হয়েছে। এবং তিনটি নৃত্যদৃশ্য ও একটি সঙ্গীতও গ্রহণ করা হয়েছে।

সুরেশ পিকচার্সের দ্বিতীয় নিবেদন 'কোণ-হো তুম—'প্যানিক-ইন-গোয়ার' প্রায় সঙ্গেই 'শুভ-মুহূর্ত' পালন করেছে। 'কোন-হো-তুমে'র কাহিনী লিখেছেন লক্ষ্মীকান্ত শর্মা। প্রযোজক: এইচ রায়। গীতরচয়িতা: রাজা মেহেদি আলী খান। ক্যামেরার কাজে আছেন, বি গুপ্ত অভিনয়াংশে—সোনিয়া সাহানি, শৈলেশকুমার, রাজমেহরা বীণা, অমরনাথ, রণধীর, মোহন-ছোটি, মীনাক্ষী ও খুরশীদ।

চারদিনের অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ করেছেন এরা রূপতারা ষ্টুডিয়োতে। অলংকারপ্রধান বায়-বহুল বিরাট সেটে এই চারদিনের দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। প্লে ব্যাকের জন্যে দুটি সংগীত গ্রহণ করা হয়েছে লতা মুঙ্গেশকর ও মুকেশের কণ্ঠে।

একুশ তারিখের সোনালী বিকেলে হাজির হয়েছিলাম মোহন ষ্টুডিওতে।

হাওয়াতে শীতের আসন্ন আমেজ। চমৎকার পরিবেশ।---আর এই পরিবেশে দেখলুম ফিল্ম জগতের অন্যতম নায়ক রাজেন্দ্রকুমারকে। চার নম্বর ষ্টুডিয়ো থেকে ধীরপদে বেরিয়ে আসছেন।

জানলুম, চার নম্বর চলেছে রমেশ তাল-সোনিয়া প্রযোজিত 'পালকি।'—রাজেন্দ্রকুমার যার প্রধান ভূমিকয়।

রমেশ তালসোনিয়ার সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল কিছু দিন আগে। এই ষ্টুডিয়োতেই। তারুণ্যে ভরপুর রমেশ তালসোনিয়ার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হয়েছিলাম সেদিন। আর সে সময়ই উনি আমাকে ওর চিত্রের স্যুটিংএ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু নানা কাজে আর শীঘ্র আসা ঘটেনি।--

● বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা অভিনেতা শাম্মী কাপুর
আলোকচিত্র—শ্রীবিমল সান্যাল

আর এসে দেখলুম একেবারে ঠকিনি। তবে রাজেন্দ্রকুমারের লোভনীয় অভিনয় দেখার সুযোগ আর ঘটলো না তখন। ওর কাজে তখন 'ইতি'-

কিন্তু 'ইতি' হয়নি অন্যান্য দৃশ্যগ্রহণ। কাজেই, সেটের ভেতর প্রবেশ করলুম। পুরানো ইঁটের গাঁথুনিতে একটা অতি জীর্ণ ভাঙা মুসলমান-বাড়ীর অপরিসর চতুষ্কোণ সেটের একাংশ। বাড়ীর চতুর্দিকে দারিদ্র্যের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ।

কলাকুশলীদের মধ্যে একজনকে দেখে খুশী হয়ে উঠলুম। মাথুর সাহেব। বিখ্যাত ক্যামেরাম্যান, যিনি মোগল-ই-আজমের চিত্রের ফটোগ্রাফারদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন। আমাকে দেখে বলেন, 'আপ?'

কৈফিয়েৎ হিসেবে একটি কার্ড এগিয়ে দিলুম।

কার্ডটা ভাল দেখে নিয়ে হেসে ভাঙ্গা-ভাঙ্গা বাংলাতে বললেন: ভাল, ভাল।

এবার আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, কিন্তু—আপনি? ইরানী সাহেব কোথায়? ক্যামেরাতে উনিই কাজ করছেন, না?

উত্তরে মাথুর সাহেব জানালেন যে, ইরানী সাহেব বিশেষ কাজে মাদ্রাজে গিয়েছেন, সেহেতু কয়েক দিনের জন্যে তাঁকে এই বি এস প্রোডাকসানের কাজ দেখতে হচ্ছে। অবশ্য অনুরোধ ইরানীরই।

দৃশ্যগ্রহণটি দেখলুম।

পাল্কির পরিচালক হচ্ছেন, মহেশ কাউল।

পরিচালক হিসেবে নামডাক আছে কাউল সাহেবের। কিন্তু প্রকৃতিটা কিছু স্থূ।

সেটের ভেতর একটা ছোট চৌকির উপর বসে আছে তখনকার দিনের অভিনেত্রী প্রতিমা দেবী, জীর্ণ শীর্ণ মুসলমানী বেশবাস। এক মাটির হাঁড়ি নিয়ে প্রবেশ করলো জনি ওয়াকার। পরনে ছেঁড়া গেঞ্জি আর লুঙ্গি। প্রবেশ করেই প্রতিমা দেবীর কোঁচড়ে কতকগুলো 'মোহর' ঢেলে দিয়ে এই বলে চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, এইসব 'মোহর' ছাপ্পর ফুড়ে আসে নি, সে পেয়েছে সত্যিকার মাটি থেকেই।

'পাল্কি' অভাবগ্রস্ত মানুষের এক অসমাপ্ত জীবন-কাহিনী।

পাল্কির অভিনয়াংশে আছেন,—রাজেন্দ্রকুমার, ওয়াহিদা রহমান, জনি ওয়াকার, মনমোহন কৃষ্ণ, মিন মমতাজ, প্রতিমা দেবী এবং বাচ্চা।

রমেশ তালসোনিয়া আমাকে জানালেন যে, 'পাল্কির' বারো রীল প্রায় সম্পূর্ণ, খুব সম্ভব ১৯৬৬ সালের জানুয়ারীতে শুভমুক্তি ঘটবে।

কিন্তু সম্প্রতি শুভমুক্তি ঘটেছে রঙ্গমের প্রথম নিবেদন 'আকাশ-দীপের'। সেদিন প্রকাশ স্টুডিয়োতে অবস্থিত রঙ্গমের অফিসে যেতে অফিস-ইন-চার্জ নরেশ দত্ত জানালেন যে, 'আকাশ-দীপ' বোম্বাই বাজারের 'বক্স হিট' করবে। মাসিক-দৈনিক-সাপ্তাহিক কাগজের reviewগুলো দেখালেন উনি আমায়। reviewগুলোয় দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলাম। দেখলাম, পরিচালক ফণীদার চারিদিকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা। দিল্লী-বোম্বাইয়ের মন্ত্রিমণ্ডল পর্যন্ত ওঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন।

চিরাচরিত দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে জীবন-সংগ্রামের চিত্র। দীপান্বিতার অমারাত্রে গ্রামবাংলা তথা ভারতের ঊর্ধ্ব গগনে যে আকাশ-দীপ জ্বালিয়ে দেয়া হয়,—সেইদিকে তাকিয়ে দারিদ্র্য-নিপীড়িত ছেলে শংকর ওরই মত উচ্চাকাংখার দেয়ালী মনে-প্রাণে জ্বালিয়ে নিয়েছিল। আর আশা পোষণ করেছিল,—ওর মহান জীবনের বিস্তার ঘটবে ওই আলো ঝলোমলো উর্ধ্বাকাশের মতই। সুতরাং এ হচ্ছে আদর্শবাদের কাহিনী। কাহিনীকার ফণীদা নিজেই। স্ক্রীনপ্লে লিখেছেন—নবেন্দু ঘোষ। আর সংলাপ রচয়িতা, বিশ্বামিত্র আদিল। গীত রচনায়, মজরু সুলতানপুরী। সংগীতে চিত্রগুপ্ত। শিল্প-নির্দেশনায়: সুধেন্দু রায়।

আকাশ-দীপের ভূমিকালিপিতে আছেন। অশোককুমার, নন্দা, ধর্মেন্দ্র, নিম্মি, রশিদ খান, মণি চ্যাটার্জি, অচলা সচদেব, তরুণ বোস, চন্দ্রিমা ভাদুড়ি প্রভৃতি।

এই 'রঙ্গমের' দ্বিতীয় নিবেদন: দধ-কি-কিস্মত'।

কয়েক মাস আগে চিত্রটির 'শুভ-মহুর্ত'

● 'তিসরি মঞ্জিল' চিত্রের একটি টুইস্ট নৃত্যে শাম্মী কাপুর ও অন্যান্য শিল্পিবৃন্দ

পালিত হয়েছে। এবং বাকি চারিটি রিলও সম্পূর্ণ।

গল্প ও পরিচালনা : কণী মজুমদার।

সংলাপ : বিশ্বামিত্র আদিল। সংগীত : চিত্রগুপ্ত। শিল্প-নির্দেশ : তজ্‌ওয়ানী। আলোকচিত্র : ওয়াক্ লেটন। অভিনয়াংশে : কিশোরকুমার, কুমকুম, তরুণ বোস, চাঁদ-উসমানী, কানু রায়, এবং আরো দুটি 'নূতন মুখ' (একটি ছেলে ও একটি মেয়ে) কয়েক-দিনের মধ্যে চিত্রটির রেগুলার স্যুটিঙ্ আরম্ভ হবে।

গিয়েছিলাম খারে হেমন্তকুমারের বাড়ী। হেমন্তকুমারের চিত্র প্রোডাকশন গীতাঞ্জলির অফিস ওখানেই। বাড়ীর নামও গীতাঞ্জলি। যে বইয়ের উপর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, তারও নাম গীতাঞ্জলি। হেমন্ত-কুমারের বড় প্রিয় কবি রবীন্দ্রনাথ। ওঁরই রচিত কত না গানে বাংলার আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলেছেন তিনি। হয় তো ওঁরই অনবদ্য স্মৃতিকে সর্বদা স্মরণ করার মানস নিয়ে হেমন্তকুমার নিজের বাড়ীরও নাম রেখেছেন গীতাঞ্জলি।

গীতাঞ্জলির প্রথম চিত্র-নিবেদন 'ফারার'—বাংলা 'রক্তপলাশের' হিন্দিরূপ। ফারারের নায়ক বাংলার অন্যতম নায়ক অনিল চট্টো-পাধ্যায়,—যাঁর হিন্দি চলচ্চিত্র-রাজ্যে প্রথম পদার্পণ এ চিত্র দিয়েই। নায়িকা রূপে প্রথম অভিবাদন জানাচ্ছেন 'শবনম্' নামে একটি নূতন মুখ। চিত্রটি শুভমুক্তি প্রতীক্ষার দিন গুণছে।

গীতাঞ্জলির দ্বিতীয় নিবেদন—'বিবি ঔর মাকান'। কাহিনী—শৈলেশ দে লিখিত একটি বাংলা চিত্রের হিন্দি রূপ। কৌতুক চিত্র।

অভিনয়াংশে আছেন,—বিশ্বজিৎ, কল্পনা শবনম, কুমারী পদ্মা, আশীষকুমার, জগদেব, কেষ্ট মুখার্জি, সবিতা দেবী, বদ্রীপ্রসাদ, অজিত চ্যাটার্জি ও মেহমুদ। প্রযোজনা ও সংগীত : হেমন্ত মুখার্জি। পরিচালনা : হৃষীকেশ মুখার্জি। গীত রচনা : গুলজার। স্ক্রীন প্লে : শচীন ভৌমিক।

চিত্রটির মাত্র তিন রিল শেষ হয়েছে।

পরিচালক হিসেবে হৃষীকেশ মুখার্জি বর্তমানে খুব ব্যস্ত। ওঁর হাতে কম করেও চার পাঁচটি চিত্র।

ওঁরই পরিচালিত 'দো দিল' মুক্তি প্রতীক্ষায়। জুটি—বিশ্বজিৎ, রাজশ্রী।

তারপর ওঁরই পরিচালনায় রয়েছে মুন্সী প্রেমচাঁদ বিরচিত কাহিনী 'গবন।' ঐ চিত্রটি পরিচালনা করছিলেন কিষাণ চোপড়া। হঠাৎ ওঁর মৃত্যু ঘটাতে প্রযোজক বি এ সাস্তালিয়া আর আর কে সোয়ার হৃষীকেশের হাতেই গবনের দায়িত্বভার ছেড়ে দিয়েছেন। গবনের ভূমিকালিপিতে রয়েছে—সুনীল দত্ত, সাধনা, কানাইয়ালাল, আনোয়ার হুসেন আগা প্রভৃতি।

টি সি দেওয়ান আর রাজেন হাকসার প্রযোজিত একটি অনামী চিত্রের দায়িত্বও গ্রহণ করেছেন হৃষীকেশ—মডার্ণ পিকচার্সের পতাকাতলে। কাহিনী লিখেছেন রঞ্জন বসু। নায়িকারূপে রয়েছেন মালা সিংহা। সুরা-রোপ করেছেন, চিত্রগুপ্ত। ---

অনেকদিন পর নীতিন বোস পরিচালিত একটি চিত্রের শীঘ্রই শুভ উদ্বোধন ঘটতে চলেছে। চিত্রটির নাম 'উমিদ।' নায়ক-নায়িকা যথাক্রমে জয় মুখার্জি আর নন্দা। ভূমিকালিপির অন্যানাংশে আছেন,—অশোক-কুমার, লীলা নাইডু, তরুণ বোস, চন্দ্রিমা ভাদুড়ী প্রভৃতি। সুর সংযোজনা করেছেন রবি। গীত রচয়িতা : সাকিল বাদায়ুনি।

পরিচালক এ আর কারদারও নিজে একটি চিত্র উপহার দিচ্ছেন আপনাদের অনেক দিন পর। নাম 'দিল দিয়া দর্দ লিয়া।' চিত্রটি হবে 'ইস্টম্যান কালারে।' সুর সংযোজনা করছেন নৌসাদ। ক্যামেরায় রয়েছেন দ্বারকা দিভেচা। অভিনয়াংশে আছেন,—দিলীপকুমার, ওয়াহিদা রহমান, প্রাণ, জনি ওয়াকার, রেহমান, শ্যামা প্রভৃতি।

আনন্দ দত্ত লিখিত ও পরিচালিত চিত্র 'দিল ঔর মহব্বত'—শর্মিলা ঠাকুর ও জয় মুখার্জিকে জুটি করে চিত্রায়িত হচ্ছে। সুরারোপ করছেন, কল্যাণজী, আনন্দজী। তারকান্বিত হয়েছেন যাঁরা তাঁদের নাম যথাক্রমে : অশোককুমার, জনি ওয়াকার, গজানন জায়গীরদার, অনুপকুমার, কে এন সিং, শাম্মী প্রভৃতি।

নরেশ সায়গল প্রযোজিত ও পরিচালিত চিত্র 'যব ইয়াদ কিসি-কি আতি হ্যায়'—

● মুক্তিপ্রাপ্ত 'যব যব ফুল খিলে' চিত্রের নায়িকার ভূমিকায় শ্রীমতী নন্দা

…র সম্পূর্ণতার পথে। শুধু তিনটি বহির্দৃশ্য গ্রহণ বাকী। চিত্রটি ইস্টম্যান কালারে গৃহীত হচ্ছে। সংগীত পরিচালক: মদন-মোহন, গীত রচয়িতা,—রাজা মেহেদী আলি খান। জুটি ধর্মেন্দ্র ও মালা সিংহা।

জগন্নাথ দত্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত চিত্র মা-বেটিও সেদিন দাদরের শ্রী সাউণ্ড স্টুডিয়োতে মাত্র তিনদিনের অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ করেছে। এন দত্ত—চিত্রটির সুরারোপ করেছেন। গীত রচনা করছেন আনন্দ বক্সী। অভিনয়াংশে রয়েছেন,—কিশোরকুমার, কল্পনা, নিরুপা রায়, সুলোচনা প্রভৃতি।

কয়েকদিন আগে রঞ্জিত স্টুডিয়োতে লোটাস প্রোডাকশানের ব্যানারে নির্মল সরকার কর্তৃক প্রযোজিত চিত্র 'জুয়ারীর' এক খণ্ড যুদ্ধের দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। খণ্ড দৃশ্যটি ছিল শশী কাপুর ও নন্দপবীর।

'হার মোনো' চিত্রের কাহিনীকার নির্মল সরকার আমাকে জানিয়েছেন যে, অনেক অসুবিধার মধ্য দিয়ে তাঁকে এই জুয়ারীর কাজ করতে হচ্ছে,—যার জন্যে চিত্রটির মুক্তির সময় দীর্ঘতর হচ্ছে। উর্ধ্বতন অভিনেতাদের চিত্রে সংযোজন করলে 'ব্যাপার'টা এরকমই হয়ে দাঁড়ায়। কারণ 'টপ' শিল্পীরা ঠিকমত সময় দিতে পারেন না। ---অথচ এঁদের সংযোজন না ঘটালেও 'বক্স-অফিস' হিট সফল হয় না।

জুয়ারীর পরিচালক: সুরজপ্রকাশ। সংগীত কল্যাণজী, আনন্দজী। অভিনয়াংশে যাঁরা আছেন তাঁরা হচ্ছেন,—নন্দা, তনুজা, আগা, ডেভিড, অচলাসচদেব, রেহমান, মাধবী, বিমল চাওড়া, কমল কাপুর, বি বি ভল্লা, প্রভৃতি।

এবার সম্পূর্ণ এক নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী ও যুগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রস্তুত এক চিত্রের সংবাদ জানাচ্ছি। চিত্রটির নাম 'ভূদান।' আচার্য বিনোবা ভাবের দর্শনতত্ত্বের উপর কেন্দ্রীভূত করে তৈরী হচ্ছে। কাহিনী, চিত্রনাট্য, সংলাপ আর পরিচালনা: শ্রীমহাদেব মিশ্র; নায়িকার ভূমিকায় আছেন শর্মিলা ঠাকুর।'

* * *

চিঠিপত্রের জবাব:

শ্যামল চক্রবর্তী (১ নং গভঃ কলোনী, মালদা)। তুমি বিশ্বের সেরা পাঁচজন পরিচালকের নাম জানতে চেয়েছ? চোদ্দ পনেরো জনের নাম আমি জানি,—তার মধ্যে মাত্র পাঁচজনের নামই আমি উল্লেখ করছি। নামগুলি তোমার মনের মত হোলো কি না জানাবে। বার্গম্যান, ফেলিনি, আইজেনস্টাইন, আন্দ্রে ও সত্যজিৎ রায়।

সংবাদ-বিচিত্রা

তপন সিংহের নতুন সম্মান

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র-পরিচালক শ্রীযুক্ত তপন সিংহ শিশু চলচ্চিত্র সমিতির কার্য-নির্বাহক পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন—নয়াদিল্লী থেকে এই সংবাদ প্রচারিত হয়েছে।

সুচিত্রা সেনের অসুস্থতা

বাঙলা ছায়াচিত্রের দর্শক সমাজে জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থান অধিকারিণী শিল্পী শ্রীমতী সুচিত্রা সেন কিছুকাল যাবৎ অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসালয়ে ছিলেন। বর্তমানে হাসপাতাল থেকে তিনি ছাড়া পেয়েছেন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী কলকাতার বাইরে গেছেন। উদ্দেশ্য বায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্যোদ্ধার। বর্তমানে তিনি উত্তমকুমার প্রযোজিত শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' এবং অসিত সেন পরিচালিত 'মমতা'য় অভিনয়রতা।

যুগোস্লাভিয়ায় আঁধারে আলো

শরৎচন্দ্রের অমর লেখনীজাত 'আঁধারে আলো' কয়েক বৎসর পূর্বে কানন দেবীর প্রযোজনায় চলচ্চিত্রে মুক্তিলাভ করে প্রভূত সাধুবাদ এবং সমাদর লাভ করেছিল। নির্বাক চলচ্চিত্রের আদিযুগে নটগুরু শিশির-কুমারও এই কাহিনীর চিত্ররূপ দিয়েছিলেন। কানন দেবী প্রযোজিত এই ছবিটি ব্যবসায়িক ভিত্তিতে যুগোস্লাভিয়ায় প্রদর্শিত হবার সংবাদ শোনা যাচ্ছে। রাষ্ট্রীয় পুরস্কারজয়ী এই চিত্রটির মুখ্য তিনটি চরিত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন বসন্ত চৌধুরী, বিকাশ রায় এবং সুমিত্রা দেবী।

সৈনিকদের উদ্দেশে অভিনেত্রী সঙ্ঘের উপহার

কলকাতার অভিনেতৃ সঙ্ঘ সম্প্রতি সীমান্তে যুদ্ধরত সৈনিকদের উদ্দেশে উপহার স্বরূপ দশো চারটি প্যাকেট পশ্চিম বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের হাতে সমর্পণ করেছেন।

পাক অপচেষ্টার এক নিদর্শন

ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সঙ্ঘর্ষ আজ শুধু যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পাকিস্তান আজ ভারতের বিরুদ্ধাচরণ করছে—এ রকম সংবাদও আমাদের গোচরীভূত হচ্ছে। ভারতের রাষ্ট্রনায়করা বারংবার বলছেন এ যুদ্ধ রাজনৈতিক এ যুদ্ধ কখনও রাজনীতির সীমা বহির্ভূত হবে না। কিন্তু পাকিস্তানীদের আচরণ অন্যরূপ। ভারতীয় ছায়াছবির প্রদর্শন বন্ধ করার চেষ্টায় তাঁরা তৎপর, তাও নিজেদের দেশে নয়, যুক্তরাজ্যে, বৃটেনে যাতে ভারতীয় ছায়াছবির প্রদর্শন বন্ধ হয় সেজন্যে পাকিস্তানীদের চেষ্টার অন্ত নেই অথচ বিলাতে পাকিস্তানী পরিবেশকরা ভারতীয় ছবি দেখিয়েই অর্থ উপার্জন করেন। পাকিস্তানী ছবির মান ভারতের সমতুল্য তো নয়ই অধিকন্তু ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকেও পাকিস্তানী ছবির স্থান ভারতীয় ছবির অনেক নিচে।

জওয়ানদের উদ্দেশে আশা পারেখের উপহার

দোসরা অক্টোবর তারিখটি নানা কারণে স্মরণীয়। গান্ধীজী এবং শাস্ত্রীজীর জন্মদিন। নাট্যজগতেও এই তারিখটি তাৎপর্যপূর্ণ। পাশ্চাত্য হিসাবে নটগুরু শিশিরকুমারেরও জন্ম তারিখ দোসরা অক্টোবর। এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পরিচালক তপন সিংহও ১৯২৪ সালে যেদিন জন্মগ্রহণ করেন সে তারিখটিও দোসরা অক্টোবর। চব্বিশ বছর আগে এই তারিখটিতে জন্মগ্রহণ করেন এ-কালের অন্যতমা খ্যাতিময়ী অভিনেত্রী —তাঁর নাম আশা পারেখ। এ-বছর যে দিন তাঁর জন্মদিনটি এল—সেইদিন দু'হাজার চারশোটি শুকনো ফলের প্যাকেট তিনি পাঠিয়ে দিলেন যুদ্ধরত জওয়ানদের উদ্দেশে তাঁর অন্তরের শুভকামনা-সহ। সম্প্রতি শ্রীমতী আশা প্রতিরক্ষা-মন্ত্রী শ্রীচ্যবনের হাতেও পাঁচ হাজার টাকা অর্পণ করেছেন।

জেনিফার জোনসের প্রত্যাবর্তন

হলিউডের সুপ্রসিদ্ধা চিত্রতারকা জেনিফার জোনস (৪৭)কে বহুকাল কোন ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যায় নি। দীর্ঘ বিরতির পর পুনরায় তাঁকে জন লেটন ও মাইকেল পবিসেব সঙ্গে "দ্য আইডল" ছবিতে আত্মপ্রকাশ করতে দেখা যাবে। তাঁর প্রথম স্বামীর ঔরসজাত পুত্র রবার্ট ওয়াকারও (২৫) অভিনেতা হিসাবে আজ যথেষ্ট খ্যাতিমান। তাঁর দ্বিতীয় স্বামী অসংখ্য যুগান্তকারী ছায়াছবির স্রষ্টা ডেভিড সেলজনিক কয়েক মাস পূর্বে লোকান্তরিত হয়েছেন।

আবত বিশেষজ্ঞ জেরি লুইস

রূপালী পর্দায় যাঁর আবির্ভাব মাত্র সারা প্রেক্ষাগৃহে হাসির রোল ওঠে, যাঁর কণ্ঠস্বর অনেক গম্ভীর ব্যক্তিকেও হাস্যরসে উদ্দীপ্ত করে। যাঁকে সামগ্রিকভাবে এক অফুরন্ত হাসির উৎস বলা চলে। পৃথিবীর কোটি কোটি ছায়াছবির দর্শক সেই জেরি লুইসকে এবার এক আবহ বিশেষজ্ঞ রূপে দেখবেন। "ওয়ে, ওয়ে আউট" ছবিটিতে এই চরিত্রটি তার অভিনয়ে কতখানি উজ্জ্বল ও চিত্তাকর্ষক হয়ে ওঠে তাই দেখার জন্য বহু মানুষ আজ প্রতীক্ষারত।

নোয়েল কাওয়ার্ডের ভারতে আগমন

প্রখ্যাত বৃটিশ নাট্যকার, প্রযোজক ও অভিনেতা নোয়েল কাওয়ার্ড সম্প্রতি অবকাশ উপভোগের উদ্দেশে ভারতে আগমন করেন।

এক হাজার টেলিভিসান যন্ত্র

ভারতের বাণিজ্য-মন্ত্রী শ্রীমানুভাই শাহ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি সাংবাদিক সম্মেলনে প্রকাশ করেছেন যে, যুগোশ্লাভিয়া ভারতকে এক হাজারটি টেলিভিসান যন্ত্র দিতে স্বীকৃত হয়েছে। প্রতি যন্ত্রের মূল্য আট শ' টাকা।

রঙ্গপট প্রসঙ্গে

শ্রীশ্রীআদ্যামা

শ্রীশ্রীআদ্যা জননীর পরম পবিত্র কাহিনী অবলম্বনে গড়ে উঠছে "শ্রীশ্রীআদ্যামা" ছবিটি। পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী পরিচালিত এই ভক্তিমূলক ছবিটির বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হচ্ছেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতবরণ, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শিশির মিত্র, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, দ্বিজু ভাওয়াল, হরিধন মুখোপাধ্যায়, জহর রায়, শিপ্রা মিত্র, লিলি চক্রবর্তী, দীপিকা দাস, কৃষ্ণা বসু প্রভৃতি।

যৌবনের গান

"ঢেউ এর পর ঢেউ"—এবপর "যৌবনের গান" আলোকচিত্রী ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল ('মেজদা' নামে চিত্রজগতে পরিচিত) এর দ্বিতীয় ছবি। নানাদিক দিয়ে নির্মীয়মাণ এই ছবিটি এক অভিনবত্বের স্বাদ বহন করে আনবে বলে আশা করা যায়। ছবিটির মুখ্য দুটি চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করছেন সুমিতা সান্যাল ও অবনীশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বনানী কন্যা

শ্রীশ্রীলোকনাথ পিকচার্সের "বনানী কন্যা" ছবিটি গৃহীত হচ্ছে রমাপ্রসাদ চক্রবর্তীর পরিচালনায়। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিচ্ছেন জহর গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণকুমার, অসীমকুমার, হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিজু ভাওয়াল, ধীরাজ দাস, সুমিতা সান্যাল, ভারতী রায় প্রভৃতি। সুরযোজনা করছেন চিন্ময় লাহিড়ী।

সৌখীন-সমাচার

দুর্গেশনন্দিনী

সাহিত্যসম্রাট ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের "দুর্গেশনন্দিনী" মঞ্চস্থ করলেন দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে টিকেট-চেকিং সাংস্কৃতিক সংস্থা। বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দিলেন মিহির গঙ্গোপাধ্যায়, জীবনকৃষ্ণ ঘটক, ব্যোমকেশ ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ কর্মকার, মিতা দাশগুপ্তা, বীণা রায়, বেবী ঘোষ প্রভৃতি।

আলমগীর

অমর নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদের "আলমগীর" নাটকটি অভিনীত হল এ্যান্টি প্লেগ রিক্রিয়েশান ক্লাবের সদস্যদের উদ্যোগে। চরিত্রগুলির রূপায়ণের দায়িত্ব পালন করেন দেবেন মুখোপাধ্যায়, হরিনারায়ণ মজুমদার, মনোরঞ্জন সিংহরায়, প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল দত্ত, শান্তি বৃন্দ, শিপ্রা সাহা প্রভৃতি।

ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের নৃত্যানুষ্ঠান

গত ২৯শে অক্টোবর বাটানগরস্থ বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাবের ব্যবস্থাপনায় বাটানগর পূজা মণ্ডপে বিজয়া সম্মিলনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানে নৃত্যশিল্পী শ্রীনীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের পরিচালনায় ভারতীয় নৃত্যকলা মন্দিরের ছাত্রী কুমারী পূর্ণিমা হালদার কথক নৃত্য পরিবেশন করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাবের পক্ষ থেকে প্রতিরক্ষা তহবিলে একহাজার এক টাকা দেওয়া হয়।

॥ ইন্দ্রসেন ॥

'Patience, and shuffle the cards.'
—Saavedra Cervantes.

বেলা গেল, দিন ফুরালো। গৃহস্থের ঘরে ঘরে শংখ-ধ্বনিতে সন্ধ্যা-বন্দনার সুর বেজে ওঠে। ধূপ আর ধুনোর পবিত্র সুগন্ধ ভাসছে বাতাসে। দেবদেউলে, দেবীর মন্দিরে কাঁসর-ঘণ্টা বাজতে থাকে একযোগে। গলবস্ত্র কুলবধূরা তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রণাম করেন ভূমিতে কপাল ঠেকিয়ে। গৃহস্থের মংগলের জন্য প্রার্থনা জানাতে হয় কায়-মনোবাক্যে। স্বামী ও সন্তানের হিতার্থে কৃপা ভিক্ষা চাই। ধানের মরাই যেন উপচে ওঠে। অভাব-অনটন যেন ঘুচে যায়! রোগের বালাই যেন না আসে। শোক সন্তাপ যেন দূরে থাকে। সুখ শান্তি অক্ষুণ্ণ হোক। সকলের জন্য কল্যাণ চাই নিয়ত।

তন্দ্রার জড়তা টুটে যায় আকাশভেদী শংখধ্বনিনাদে। প্রতীক্ষারত রামচন্দ্রর চোখে ঘুমের ঘোর নেমেছিল। অতিথি-শালার ঘরের দেওয়ালে দেহ এলিয়ে ব'সে থাকতে থাকতে কখন নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েছেন, তিনি নিজেই জানেন না। শংখ-বাদ্যের জোরালো শব্দে ঘুম ভাঙলো। কেমন যেন লজ্জা অনুভব করলেন রামচন্দ্র। প্রার্থী তিনি, অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের সংস্থান চান। তাঁর চোখে সুখনিদ্রা মানায় না। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন। উদ্দেশ্য সাধন না হওয়াতক ক্ষণেকের বিশ্রাম নেই। দেহ যদি বিনষ্ট হয়, ক্ষতি কি ! অভাবী দরিদ্রজনের সুখের আশা কেন!

রামচন্দ্র ঘুম ঘুম চোখে দেখলেন, ঘরে ঘরে বেললণ্ঠন জ্বলছে। বেলোয়ারী রঙীন কাচের আলো ঝুলছে কড়িকাঠ থেকে। শ্রীকান্তর সুরম্য আবাস, যেন হাসছে সদ্যজ্বলা লণ্ঠনের রঙবেরঙ আলোয়। জ্বলন্ত মশাল উঁচিয়ে মশালচি ঘোরাঘুরি করছে ঘরে দালানে উঠানে। দেওয়ালগিরি জ্ব'লে উঠছে একে একে। অতিথিশালার অপেক্ষা-আগারে কখন বাতিদান জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে, রামচন্দ্র জানতে পারেন না। বাতির কাঁপা কাঁপা শিখার ছায়া খেলছে ঘরের দেওয়ালে।

চোখে জল ছিটোলেন রামচন্দ্র। তন্দ্রালস্য কাটিয়ে স্বাভাবিক হ'তে হবে। কেউ যেন না অনুমানে বোঝে, তিনি শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত, নিদ্রাভাবে কাতর। অস্থৈর্য যেন না প্রকাশ পায় হাবেভাবে।

—কাছারীতে আইসেছেন হুজুর। এখনই ডাক পড়বে একে একে। মহাশয়গণ প্রস্তুত হউন।

অতিথিশালার আমলা বললে চাপাকণ্ঠে। ভয় আর সম্ভ্রমের দৃষ্টি তার চোখে। গৃহকর্তার ভয়ে যেন তটস্থ।

কাজের মানুষ শ্রীকান্ত ঘোষ। সময়ের মূল্য তিনি জানেন। বিলাস আর আয়াস কাকে বলে তাঁর জানা নেই। সপ্তগ্রাম মহলের প্রধানতম হিসাবরক্ষক শ্রীকান্ত। দায়দায়িত্ব তাঁর সীমাহীন। সদাজাগ্রত চোখে থাকতে হয় শ্রীকান্তকে। হিসাবের গরমিল দেখতে হয় খুঁটিয়ে। চোখে না ধুলো দেয় কেউ। নবাবের সরকার যেন না ঠকে। কেউ না ফাঁকি দেয়। জমার সংগে খরচের ঠিক ঠিক মিল না থাকলেই ফ্যাসাদ। কিন্তু হিসাবের পরীক্ষার কাজ শ্রীকান্তর কাছে জলবৎ তরল। চোখ বুলালেই তিনি খাতার কারচুপি ধরতে পারেন। গলতি ধরিয়ে দেন সংগে সংগে। দাখিলী হিসাবের খরচপত্র সঠিক কি না, এক লহমায় বলেন। শুধুমাত্র দাম দেখে রায় দেন না, মালের ওজন পরিমাণ মিলিয়ে দেখেন। কম দিয়ে কেউ যেন না বেশী নিতে পারে।

সুলতান হোসেন শাহ বেহিসাবী কর্মচারীকে বরদাস্ত করেন না। সুলতানের বিশ্বাস একবার হারালে আর রক্ষা নেই। মুখে চুন-কালি পড়বে। সেই কলঙ্কিত মুখ আর কাকেও দেখতে পারবেন না শ্রীকান্ত। হিসাবে ভুল দেখলে সুলতান তাঁর এই অধীনস্থ কর্মীর স্থাবর-অস্থাবর সকল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হুকুম দেবেন। একেক হিজরার রাজস্ব কড়ায়-ক্রান্তিতে বুঝিয়ে দিতে হবে সুলতানকে। মাসে মাসে আদায়ীকৃত রাজস্বের প্রাপ্য টাকা ঠিক পাঠিয়ে দিলেই হোসেন খুশি থাকেন।

—মণিরাম শর্মা।

—হাজির।

—নটবর পালচৌধুরী।

—হাজির।

—জওলাপ্রসাদ সিং।

—হাজির।

আমলা একটা একটা নাম ধ'রে ডাক দেয় সরবে। নামের অধিকারীরা তাদের উপস্থিতি জানায় সংগে সংগে।

—হুজুর তলব পাঠায়েছেন। আপনারা আসেন কাছারীতে। আমলা বলে।

আহ্বান শুনে তিনজন উঠে পড়লো। আমলার পিছু পিছু চললো যেন তিনটি বলির পাঁঠা। কি এক যৌথ অপরাধের জন্য দায়ী তিন আগন্তুক। শ্রীকান্তর ভয়ে ঠক ঠক কাঁপছে।

কাছারীতে এক কেদারায় আসীন শ্রীকান্ত। আলবোলার রুপোলী নল তাঁর হাতে। কাছারীতে তামাকের গন্ধ ভুর ভুর করছে। আলবোলা গর্জন তুলছে থেকে থেকে। কাছারী-ঘরের দেওয়ালে গণেশ, জগদ্ধাত্রী, দুর্গা আর লক্ষ্মীর হাতে-আঁকা পট। ধুপদানিতে অগুরু ধুপের গোছা জ্বলছে! ঘরের এখানে-সেখানে লাল শালুর কাপড়ে বাঁধা খাতার স্তূপ। লাল ফিতায় বাঁধা কাগজপত্র। শ্রীকান্তর হাতের কাছে রুপার দোয়াতদানি। চিলের পালখের কলম। রুপোর রেকাবীতে পান তাম্বুল।

বিনয়-নম্র ভঙ্গীতে নমস্কার জানালো তিনজন—মণিরাম, নটবর ও জওলাপ্রসাদ। উর্ধ্বাঙ্গ আনত করতে হয়। তিন-জনে একই সুরে বলে,—হুজুর দীর্ঘায়ু হোন। হুজুরের জয় হোক।

হাতের নল মুখ থেকে নামিয়ে খুব খানিক হাসলেন শ্রীকান্ত। অট্টহাসিতে যেন কাছারীঘর গমগমিয়ে ওঠে। শ্রীকান্ত হাসতে হাসতে বললেন,—বিনয়-সম্ভাষণে কাজ হইবে না। আগেই কহে রাখি। বিনয়ের মাত্রাটা যেন অধিক ঠেকে। কারণ কি মণিরাম, নটবর, জওলাপ্রসাদ?

—হুজুরই আমাদের আশা-ভরসা।

তিনজনের মধ্যে একজন কথা বলে।

আবার সোচ্চারে হেসে উঠলেন শ্রীকান্ত। হেসে হেসে বললেন,—কিন্তুক এটা যে বড় শক্ত ঠাঁই। চাটুকারিতে আমি ভুলি না, নিশ্চয় জানো।

—জানি হুজুর, আমরা ভালই জানি। হুজুর স্বয়ং ধর্মাবতার।

বৃথা বাক্যব্যয়ের সময় নাই। সরকারী তঙ্কা, দাখিলের কি হইল তাই শুনি? সহসা হাসি থামিয়ে গম্ভীর সুরে বলতে থাকেন শ্রীকান্ত। বলেন,—মহাশয়দের প্রার্থিত সময় তো সপ্তাহখানেক আগেই উত্তীর্ণপ্রায়। আর কোন নূতন প্রস্তাবে আমি রাজী নহি জানিও।

—এই লন হুজুর। আমাদের প্রণামী আপনার শ্রীচরণে।

কথার শেষে তিনজনে মাথার পাগড়ী খুলে শ্রীকান্তর পাদমূলে রাখলো। একজন বললে,—যেমন সাধ্য তেমন দিলাম হুজুর। আপনি গ্রহণ করেন। সরকারী পাওনা মিটাতে আরও কিছু সময় প্রার্থনা করি।

—উঁহু—

এপাশে ওপাশে মাথা দোলাতে থাকেন শ্রীকান্ত। দুই পা সরিয়ে নিয়ে বলেন,—উঁহু, আর নয়। আর সময় দেওয়া যায় না। নবাব স্বয়ং নারাজ। আমিও নাচার, অক্ষম, নিরুপায়। কথার শেষে আবার হাসলেন তিনি। বললেন,—ঐ তিনখান বস্ত্রখণ্ড লইয়া আমার কর্ম কি?

—শূন্য নয় হুজুর, পূর্ণ। আপনি কৃপা করেন।

—কি আছে তাই শুনি?

ভুরু বেঁকিয়ে শুধোলেন শ্রীকান্ত। আমলাকে বললেন,—পাগড়ীগুলাতে কি আছে দেখেন তো।

একেকটি পাগড়ীর বেড় খুলতে থাকে আমলা। মুঠো মুঠো সোনা চিকণ তুলতে থাকে দেওয়াল গিরির আলোয়। পাগড়ীর স্তরে স্তরে সোনার মোহর।

কিঞ্চিৎ বিস্মিত হ'লেন শ্রীকান্ত। সহাস্যে বললেন,—উপঢৌকন? না কি উৎকোচ?

—হাঁ হুজুর। আপনার শ্রীচরণে—

আবার মাথা দোলাতে থাকেন শ্রীকান্ত। অসম্মতি জানালেন! বললেন,—তা হয় না। অবৈধ উপহার আমি গ্রহণ করি না। নেহাৎ স্বর্ণমুদ্রা, তাই পদাঘাত করিতে পারি না, নতুবা—

—মার্জনা করেন ঘোষ মহাশয়। আরও কিছুকাল সময় দান করেন। তখন পাওনা যদি না পাওয়া যায় যা শাস্তিবিধান করেন মানিতে প্রস্তুত থাকিব।

—শাস্তিদানের কর্তা আমি নহি। ঠিক আছে। নবাব দরবারে জানাই। নবাব যেমন বোঝেন তেমন করুন। শাস্তি আর কি! উচ্ছেদ, হাজতবাস, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ইত্যাদি ইত্যাদি যা যা রীতি আছে সকলই যথাযথ পালিত হইবে।

একনিঃশ্বাসে কথাগুলি শেষ করলেন শ্রীকান্ত। মুখে আলবোলার নল তোলেন। আলবোলা গর্জন তোলে ঘন ঘন।

—আপনি যদি ক্ষমা করেন, নবাব আপত্তি জানাইতে পারেন, তেমন মনে করি না। তঙ্কার সংগ্রহ নাই, অজন্মা শুকায় আদায় হয় না এক কপর্দক। এই অধমদের অবস্থাটা বিবেচনা না করেন তো আমরাই বা যাই কোথায়?

মণিরাম বয়সে জ্যেষ্ঠ। তিনিই বললেন ব্যথিত সুরে। দুই হাত যুক্ত করলেন। যেন একটা প্রার্থনার মন্ত্র বলছেন দেবতার সমীপে।

—জাহান্নমে!

শ্রীকান্ত বিরক্তির ভঙ্গীতে বলেন, অন্য দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে।

—নির্দয় না হন, এই অনুরোধ। মণিরাম আবার বলে।

কণ্ঠস্বর পঞ্চমে তোলেন শ্রীকান্ত। কাছারী গমগম করতে থাকে জলদ শব্দে। শ্রীকান্ত বললেন,—কথায় কথা বাড়ে! অধিক কথার প্রয়োজন দেখি না! বন্ধক দাও, বিক্রয় কর, যাহা ইচ্ছা তাহা।

—তবে কিছু বাদছাড় দিতে আজ্ঞা হয়! আমরাও রক্ষা পাই।

নটবর পালচৌধুরী বললেন বিনীত ঢঙে। তিনিও দুই হাত এক করলেন।

—অধিকার নাই। নবাব বাদছাড়ে রাজী নহেন। নবাব বলেন, হিসাবের কড়ি বাঘে খাইতে পারে না।

উচ্চগ্রামে কথা বলছেন শ্রীকান্ত। ক্রোধের জ্বালা কথায়। মুখে চোখে বিতৃষ্ণা না বিরক্তি। কথার শেষে কেদারার হাতলে মুষ্টির আঘাত হানলেন একটা। বললেন,—জমিনদারি সমর্পণ কর। দখলীস্বত্ব ছাড়ো। আর কেন?

কি যেন বলাবলি করতে থাকেন তিনজনে। কানে কানে ফিসফাস কথা। শলা-পরামর্শ চলে নিঃশব্দে। ইশারা ইঙ্গিতে।

মণিরাম বললেন,—হুজুর, আগামী কাইল যা হয় পাকা-পাকি একটা কিছু জানাইতে আদেশ হোক। আইজ বিদায় লই।

—তথাস্তু। এই পাগড়ী তিনটা লইয়া যাও। বেয়াদপির সীমা নাই দেখি।

থেমে থেমে বলতে থাকেন শ্রীকান্ত। উচ্চরব আর নেই, তত। যদিও মুখাকৃতি বিরক্ত!। কপালে কুঞ্চনরেখা। বাঁকানো ভুরু।

অতিথিশালায় উৎকর্ণ রামচন্দ্র। কাছারীঘর থেকে শ্রীকান্তর ক্রোধ-গম্ভীর প্রতিটি কথা সুস্পষ্ট ভেসে আসে! রামচন্দ্র যেন সেই কথার গমকে-গমকে শিউরে-শিউরে ওঠেন। ব্যাঘ্রনিনাদের মত শোনায় যেন একটি একটি শব্দ।

—নাম, ধাম, সাক্ষাতের উদ্দেশ্য এই পত্রে লিখহ।

একখণ্ড কদলীপত্র এগিয়ে ধরে আমলা। এক লেখনী কালি! খাগের কলম।

তন্ময় রামচন্দ্র চমকে শিউরে উঠলেন আমলার কথায়। খানিক নির্বিকার তাকিয়ে থেকে আমলার বক্তব্য অনুধাবন করেন। পরনের বস্ত্রপ্রান্তের খুঁট খুলতে থাকেন তৎক্ষণাৎ। বললেন,—লেখালিখির প্রয়োজন নাই। এই চিরকুটখানেই সাক্ষাতের উদ্দেশ্য, পরিচয় সবই জানা যাইবে। চিরকুটে তথ্যাদি লিখা আছে।

—ভাল কথা।

চিঠি গ্রহণ করে আমলা। কক্ষ থেকে বেরিয়ে যায়।

আর এক আমলা এসে ডাক দেয়.—পদ্মনাভ রায়।

—হাজির।

আবদুল জাফর খাঁ?

—হাজির।

—দীনদয়াল আচার্য।

—হাজির।

—মীরজুমলা বেগ।

—হাজির।

—গঙ্গাকিশোর বন্দ্যঘটি।

—হাজির।

আবার এক দল অতিথি, আহ্বানে সাড়া জানিয়ে অতিথি-শালা ত্যাগ করলেন। রামচন্দ্র দেখলেন, ঘরে অন্য কেউ নেই। তিনি একা। তার ভাগ্যে যে শিকা কখন ছিন্ন হয় কে জানে। কখন ডাক পড়ে। ক্ষুধার জ্বালা আর নেই। ক্ষুৎতৃষ্ণার অনুভূতি লুপ্ত হয়েছে। নিজেকে শক্তিহীন নিঃসাড় মনে হয়। শরীর টলছে অনাহারের দৌর্বল্যে। মুখে কথা ফোটে না। যেন বাক্যহারা।

মুক্ত বাতায়ন থেকে রাত্রির আকাশ চোখে ধরা দেয়। বাইরে ঘনান্ধকার। আকাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত নক্ষত্ররাজি। কাছাকাছি কোথায় আছে বৈষ্ণবদের আখড়া। হরিসংকীর্তনের ঐকতান কানে আসছে। শ্রীখোল আর করতালি বেজে চলেছে। বিষ্ণুভক্তদের আবেগ ও উচ্ছ্বাসে আকাশ বাতাস মুখরিত। হরিভক্তির প্লাবনে দেশ যেন ভাসমান।

আজ যদি ডাক না আসে, সমূহ বিপদ। কোথায় যে রাতটুকু যাপন করবেন রামচন্দ্র, তার কোন স্থিরতা নেই। কে তাঁকে আশ্রয় দেবে এই অপরিচিত স্থানে! কোথায় আহার্য মিলবে! ভীতির কালোছায়া ফোটে রামচন্দ্রের মুখে। অনিশ্চয়তায় ধৈর্যধারণ সম্ভব নয়। কেমন বিষণ্ণ দেখায় রামচন্দ্রকে। তিনি আনচান করেন।

—আমার নাম শ্রীকান্ত ঘোষ।

গৃহকর্তা স্বয়ং কক্ষে প্রবেশ করলেন। সুপুরুষ। বলিষ্ঠ আকৃতি। বিস্তৃত বক্ষ। প্রশস্ত ললাট। তীক্ষ্ণ নাসিকা। আজানুলম্বিত হস্তদ্বয়। কপালে চন্দনতিলক! শুভ্রলাল গাত্রবর্ণ। সাদা রেশমের বেনিয়ান আর তসরবস্ত্র পরিধানে। পায়ে খড়ম। হাতে হীরক-অঙ্গুরী। যেন আকাশের একটি তারা, শ্রীকান্তর অনামিকায় মিটি মিটি জ্বলছে।

—আপনি কায়স্থপ্রধান বিরাট গুহের বংশধর, আপনাকে প্রণাম!

ভক্তিসহকারে যুক্তকরে কথা বলছেন শ্রীকান্ত! আগন্তুক অতিথি যেন ঈশ্বরপ্রেরিত। তাই তাঁর দর্শন পেয়ে শ্রীকান্ত গদগদচিত্ত। আনন্দে আকুল।

—মহাশয় বয়োজ্যেষ্ঠ। প্রণামের অধিকার আমার। মহাশয়ের আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। কথা বলতে বলতে শ্রীকান্তকে প্রণাম করলেন রামচন্দ্র। পদধূলি মাথায় দিলেন। বললেন,—আমি আপনার সাহায্যপ্রার্থী। নেহাৎ দরিদ্র, তাই একটা কর্ম-সংস্থানের প্রার্থনা জানাই। নয়তো বিরাট গুহের বংশধরকে অনাহারে মরণ বরণ করতে হয়। মহাশয়ই একমাত্র অবলম্বন।

শ্রীকান্তর পিছনে তাঁর দুই সুযোগ্য পুত্র। শ্রীধর ও শ্রীনাথ। তাঁদের পশ্চাতে আমলা ও সহকারিবৃন্দ। সকলেই যেন বিস্মিত, হতচকিত। জনৈক কিশোর বালকের প্রতি মহান ব্যক্তিত্বের শ্রীকান্ত ঘোষকে এমন নম্র ও অনুগত দেখে উপস্থিত সকলেই নীরবতা পালন করেন।

—বক্তব্য পরে শুনা যাইবে। একটা সম্মানজনক ব্যবস্থার দায়িত্ব আমার প্রতি ন্যস্ত করেন। আপাতত অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা করা যাক। কত দূর হ'তে আপনার আগমন! সর্বাগ্রে পথক্লান্তি মোচন হোক। পূর্ববঙ্গের বাকলা থেকে এই সপ্তগ্রাম, কতটা পথ তাহা আমার জানা আছে। আর এক তিল অপেক্ষা নয়।

কথা বলতে বলতে শ্রীকান্ত যেন কাকে খুঁজতে থাকেন ইদিক-সিদিক দৃষ্টি চালিয়ে। পিছনে পুত্রদ্বয়কে দেখেই বললেন,—শ্রীধর ও শ্রীনাথ, তোমাদিগের মাতৃদেবীর কাছে লইয়া যাও আমাদিগের মহাগুরুর এই বংশধরটিকে। বল যে, কোন প্রকার ত্রুটি যেন না হয়। কুলদীপক গজপতির জ্যেষ্ঠ পুত্র ছকড়ীর বংশধর ইনি। যেন দেবতা-জ্ঞান করা হয়। নববস্ত্র দান করিতে বলিও মাতৃদেবীকে। কুলদেবতার প্রসাদী ভোগে সেবা ও আহারের বন্দোবস্ত হইবে। দেখিও, অন্যথা না হয়। কাছারীর কর্মশেষে আমি আসিতেছি জানিও।

শ্রীধর ও শ্রীনাথকে অনুসরণ করলেন রামচন্দ্র। আশার অতীত আপ্যায়নে তাঁর ক্লান্ত মুখে প্রসন্ন হাসি ফুটেছে। মনে মনে পূর্বপুরুষদের স্মরণ করেন রামচন্দ্র। সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদের পরিচয়ে তিনি যেন ঈষৎ গর্ববোধ করলেন। ধর্মপ্রাণ মহাত্মারা আজ স্বর্গগত, পরলোকের বাসিন্দা,—কিন্তু তাঁদের শ্রীঅঙ্গের শোণিতধারা আজও রামচন্দ্রের দেহে ও ধমনীতে প্রবাহিত।

অভাবের ঘর থেকে প্রাচুর্যের গৃহস্থালীতে এসেছেন রামচন্দ্র। পর্ণকুটির থেকে এসে উঠেছেন ইষ্টকালয় প্রাসাদে

ফেলে আসা পাতার চালার ছিল শুধুই দৈন্য, অভাব, শূন্যতা, হাহাকার। এখানে যেন চতুর্দিকেই পূর্ণতা। ঐশ্বর্য ও বৈভবের চিহ্ন সর্বত্র। অনন্ত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের পরিপূর্ণতা। রামচন্দ্র চোখে যেন আশার ক্ষীণ আলো দেখতে পেয়েছেন। অন্দর অভিমুখে চলেছেন তিনটি বালক। সুন্দর, সুঠাম, সুশ্রী প্রত্যেকেই।

আলো না আলেয়া কে জানে!

দুহুঁ মুখ দরশনে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর॥
দুহুঁ তনু পুলকিত গদ গদ ভাষ।
ঈষদবলোকনে লহু লহু হাস॥
—নরোত্তম দাস।

এই মাত্র সায়াহ্নকাল উত্তীর্ণ হয়েছে। তমস্বিনীর আগমনে দিকে দিকে আঁধার নেমেছে।

শ্রীকান্তর অন্তঃপুরে কোথাও অন্ধকারের লেশ নেই। অন্দরমহল আলোকময়। ঘরে ঘরে দীপমালা জ্বলছে! রজতদীপ, স্ফটিক দীপ, গন্ধদীপ স্নিগ্ধ-উজ্জ্বল আলোক বর্ষণ করছে। লম্বমান দালানের দুই পাশের দেওয়ালগাত্রে সারি সারি দেওয়ালগিরি। প্রজ্বলিত। সুপ্রশস্ত দালানে উঠানে, দাঁড়ের শীর্ষে জ্বলন্ত মশাল। শ্রেণী-সোপানের মাথায় মাথায় রঙীন বেল-লণ্ঠন। এখানে-সেখানে পুষ্পাধারে সুগন্ধি কুসুম। প্রতি ঘরে মূল্যবান আসবাব, আসন, শয্যাধার। পারশ্যের গালিচায় ভূমি দেখা যায় না অগণিত দাস-দাসীর ঘোরাফেরা, লক্ষ্য করলেন রমচন্দ্র। এক রকমের বসন ভৃত্যদের। দাসীদের পরিধানে নীল, লোহিত, শ্যামল ও পাটল রঙের চীনবাস। কাহারও বা বস্ত্র হৈমকার্যখচিত।

—মাতৃদেবী কোথায় গো! মা জননী!

এক কক্ষের বাহিরে দাঁড়িয়ে ডাকলেন শ্রীধর ও শ্রীনাথ। সুবাধ্য, সুযোগ্য সন্তানের নম্রমিষ্ট ডাক।—সেই ডাক কানে গেলে গর্বিণী মা মনের অন্তস্তল থেকে সাড়া দেন।

এক পরমাপ্রকৃতি। দুর্গাপ্রতিমা যেন, বাহন ছেড়ে এসে ব'সেছেন এক প্রস্তরময় জলচৌকিতে। টিকালো নাক, আকর্ণ চোখ, টানা ভ্রূ, কুঞ্চিত কেশদাম। রক্তিম মুখে খুশির হাসি। পরনে মেঘডম্বরু শাড়ি। সর্বগাত্রে ভারী ওজনের স্বর্ণালংকার। হাতভর্তি গোছা গোছা চুড়ি। মকরমুখী কাঁকন। কণ্ঠে সীতাহার। কানে মুক্তার ঝুমকা। নাকে মতির নথ। মুক্তার নোলক। বাহুতে অনন্ত। পায়ে মিনকাজের পাঁয়জোর।

—কেন বাছা, ডাকো কেন?

কক্ষ থেকে সাড়া দিলেন মা। চন্দ্রাননী অন্নপূর্ণা। শ্রীকান্তর সহধর্মিণী।

—আইস, দেখ, কার আগমন। মহাগুরু বিরাট গৃহের বংশধর ইনি। পিতার আদেশ, আদর-আপ্যায়ণে যেন কোনরকম ত্রুটি না হয়। দেবতা-জ্ঞান করা হয় যেন।

—এই আসি আমি। অপেক্ষা কর'।

অন্নপূর্ণা জলচৌকিতে ব'সেছেন পা ছড়িয়ে। জনৈকা দাসী তাঁর শুভ্র পদযুগলে অলক্তক চিহ্ন অংকনে রত। তিনি যে লক্ষ্মীমন্ত সুগৃহিণী, তাঁর রচিত সংসার দেখলেই ধরা যায়।

কোথাও কোন অবিন্যাস্ত চোখে পড়ে না। কোথাও কোন বিচ্যুতি নেই। সবই যেন ঘষামাজা, ধৌত, পরিচ্ছন্ন। অন্নপূর্ণার সাজানো সংসারের রূপ যেন উছলে উঠছে। এত ঐশ্বর্যের অধিকারিণী অন্নপূর্ণা, তথাপি তিনি বিনীতা, দর্পশূন্যা, স্নেহশালিনী, প্রেমময়ী। স্নেহবিহীনা নারী-হৃদয় তো জলশূন্য নদীমাত্র—কেবলই বালুকাময়। কিম্বা পঙ্কিল।

—আপনার নাম কি?

শ্রীধর প্রশ্ন করে নবাগত অতিথিকে। কৌতূহল দমন করতে পারে না।

—নাম রামচন্দ্র গুহ। আমি 'তুমি' সম্বোধনই পছন্দ করি। অধিকন্তু আমরা প্রায় সমবয়সের! তোমরা দুইজনে আমার ভ্রাতৃতুল্য।

ধীরে ধীরে কথা বলেন রামচন্দ্র। মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে।

—ভাইয়ের তুল্য সম্পর্ক আর নাই।

শ্রীধর বললে অনাবিল হাসির সঙ্গে।

—ভাই, ঐ যে মা আসেন। শ্রীনাথ বলে।

দুয়োরে দেখা দিলেন সালঙ্কারা অন্নপূর্ণা। রাত্রির স্নিগ্ধ বাতাসে মেঘডম্বরু শাড়ির অঞ্চল উড়ছে। ঘনলাল সিন্দুর টিপ অন্নপূর্ণার ফর্সা কপালে। কেশকুন্তল দুলে দুলে ওঠে লাল টিপের দুই পাশে। মাথায় ঈষৎ গুণ্ঠন টানলেন অন্নপূর্ণা।

—আপনি আমারও মা। আমি আপনার এক অভাগা সন্তান।

কথার শেষে প্রণাম জানালেন রামচন্দ্র। ভূমিতে মাথা ঠেকালেন। দুই পা স্পর্শ করলেন।

—দীর্ঘজীবী হও, আশীর্বাদ করি। সুখী হও।

স্নেহসিক্ত সুরে বললেন অন্নপূর্ণা। রামচন্দ্রের সুক্ষ্ম চিবুক ছুঁলেন। সেই হাতে একটি চুমো খেলেন।

—আপন মাকে বহুকাল পূর্বেই হারাইয়াছি। আজ আর স্পষ্ট স্মরণে আসে না। অদ্য এই মুহূর্তে পুনরায় সেই হারানো মাকে যেন ফিরে পেলাম। শ্রীধর ও শ্রীনাথ আমার দুই ভাই;

—সত্যই তাই। আমরাও তাই মনে করি।

কথায় সায় দেয় শ্রীধর। সম্মতি জানায়।

—আহা, কি সুন্দর মুখখানি! কি অপূর্ব দেহকান্তি। স্নিগ্ধ হেসে বললেন অন্নপূর্ণা। বললেন,—তবে যেন বড়ই ক্লান্ত দেখায়। হয়তো পথশ্রান্ত। আহা!

—বহু কষ্টের পথ। ঘোর বর্ষায় ক্ষিপ্ত নদীর উৎপাত। অজানা অচেনা রাস্তাঘাট। তদুপরি কয় দিন ও কয় রাত্রির আহার ও নিদ্রার ব্যাঘাতে আমি ক্লান্ত, অবসন্ন।

রামচন্দ্রর কথায় যেন অপ্রস্তুততা বোধ করলেন অন্নপূর্ণা। স্নেহকাতর সুরে বললেন,—আমি আহার ও শয্যার ব্যবস্থা করি। শ্রীধর ও শ্রীনাথ, তোমরা দুধের বাছাকে স্নান-ঘর দেখাও। দাসীকে বল নতুন ধুতি উড়ানী দিক। এক খণ্ড নতুন গামছা।

অন্নপূর্ণা স্থান ত্যাগ করলেন ত্বরায়। আহার্য সাজাতে ভাঁড়ারের দিকে চললেন। কুলদেবতার প্রসাদী ভোগ, স্বহস্তে সাজিয়ে দেবেন রূপার থালায়। ফল, মিষ্টান্ন, ক্ষীর, পায়স।

কিন্তু কাকে দেখলেন রামচন্দ্র!

কে সেই মোহিনী রাধা! ঐ নবীনার মুখবিম্ব যেন রামচন্দ্রের বক্ষপটে অঙ্কিত হয়। মুখে মধুর হাসি। অলঙ্কার-শিঞ্জিতা। কাজলকালো চোখে যেন অদ্ভুত প্রকারের মোহ। দেহখানি কতই না কমনীয়। কে এই ভুবনমোহিনী সুন্দরী কুমারী!

আবার একবার দেখা যায় না? সেই অনিন্দ্যসুন্দর অপ্সরীনিন্দিত মুখশ্রী। পেলব দেহের মল্লিকাবর্ণ! সেই দুই মৃগনয়ন!

রামচন্দ্রর দৃষ্টিতে যেন ভাসতে থাকে. সেই রূপ, ঘন লাল শাড়ি, মধুর হাসি, রাগভরা চাহনি, চালচিত্র কবরী।

কয়েকবার দৃষ্টি বিনিময় হয় পরস্পরে। রামচন্দ্র বোধ-করি হাসির উত্তরে কিঞ্চিৎ হেসেছিলেন। মুগ্ধ চোখের দর্শন-বাণ হেনেছিলেন। সে তখন অন্নপূর্ণার পিছনে। সলজ্জায় দণ্ডায়মানা। কিন্তু সে কে? সুন্দর মুখ কি সহজে ভোলা যায়। [ক্রমশ]

পরিত্রাণ

রাণু ভৌমিক

ট্রেন থেকে তোমাকে দেখলাম,
হঠাৎ ভালো লাগল।
বেঞ্চের পাশে তুমি দাঁড়িয়েছিলে।
তোমার শুকনো চুলে,
জমেছিল ইঞ্জিনের ধোঁয়া।
অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম তোমার দিকে
খু-ব ভালো লাগল।
তোমাকে তো দেখেছি বহুবার
বহুদিন—বহুমাস—বহু বৎসর।
ঐ চোখ—ঐ চুল
মুগ্ধ হয়েছি—স্পর্শ করেছি
অরে আঘাত
সেই সে দিন...
থাক সে কথা
আমি জানি—তুমি জানো—জানে বিশ্বের লোক
প্রতিবেশী—থানা কোর্ট,
কিন্তু কেউ জানে না সেই মুহূর্তের কথা
উগ্র ঘৃণায় ক্লেদাক্ত সেই মুহূর্ত
একটা কালো শিখার মতো বেরিয়ে এসেছিলাম
শেষ—সব শেষ।
আজ দেখলাম
তোমার সেই উদাস চুল
আর কালো চোখ।
মন দুলে ওঠে।
তখন-ই তুমি চোখ ফেরালে
তোমার চোখে আমার মনের ছায়া,
উঠে দাঁড়াই—
এক পা এগিয়ে যাই দরজার দিকে
তুমি দু'পা এগিয়েছ।
হুইসিলের তীব্র শব্দ
ট্রেন ছেড়ে দিল
বাঁচলাম।

বিশ্বাস যদি নাই করেন

স্মরণাতীত কাল থেকে আমাদের দেশের হঠযোগীদের আশ্চর্য ক্রিয়া-কৌশল ও লৌকিক শক্তির কথা শোনা যায়, এ সম্পর্কে অধিক ইউরোপীয় ও আমেরিকান ভূপর্যটক ও ভ্রমণকারী তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এখানে আমার নিজের দেখা এরকম একটি অদ্ভুত ঘটনার বিবরণ সংক্ষেপে বর্ণনা করছি।

সেটা বোধহয় ১৯৩০ সাল হবে, নভেম্বর মাস। পিতৃদেব ডাক্তার প্রকাশচন্দ্র দাসমহাশয় তখন কাঁকেতে ভারতীয় মানসিক ব্যাধি হাস-পাতালের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেন্টরূপে অধিষ্ঠিত। ঐ সময় নরসিংহ স্বামী নামে এক মাদ্রাজী হঠযোগী রাঁচিতে আগমন করেন। তিনি এক রাতের সন্ধ্যায় হাসপাতালের ডাক্তার, রোগী ও কর্মচারীদের সামনে তাঁর বিস্ময়কর যৌগিক ক্রিয়া প্রদর্শন করলেন। হাসপাতালের প্রমোদ-কক্ষটি (Amusement Hall) বেশ বড়। মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের চিত্তবিনোদনের জন্য এখানে মধ্যে মধ্যে কৌতুক অভিনয়, ম্যাজিক, বায়োস্কোপ দেখাবার এবং কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীত শোনাবার ব্যবস্থা ছিল। এখানেই স্বামীজী তাঁর অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেন। স্টেজের উপর এসে স্বামীজী প্রথমে হঠযোগ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন, দেখলাম তিনি মধ্যবয়সী ও মধ্যমাকৃতি, গায়ের রঙ মাঝারি শ্যামবর্ণ—দক্ষিণ দেশের লোকেদের মত। তাঁর পরনে ছিল গেরুয়া রঙের আলখাল্লা। হাসপাতালের একজন ডাক্তার তাঁর নিজের সংগৃহীত একশিশি তীব্র নাইট্রিক এসিড এনে স্বামীজীকে দেখালেন। ঐ এসিড একটি তামার পয়সার ওপর ঢালবামাত্র পয়সাটি গলে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর লাল রঙের ধোঁয়া উঠতে লাগলো। এরপর নরসিংহ স্বামী ঐ এসিড হাতে ঢেলে নিয়ে জিব দিয়ে চেটে চেটে খেতে লাগলেন। তাঁর কোনরকম দৈহিক বা মানসিক অস্বাচ্ছন্দ্য হতে দেখা গেল না। তদনন্তর তিনি একটি কাচের গ্লাস ভেঙে নিয়ে মিছরির মত চিবিয়ে খেলেন। খেলা দেখাবার অনেক পরেও তাঁর কোনপ্রকার শারীরিক ক্ষতি হতে আমরা দেখি নি। ইতিপূর্বে স্বামীজী কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজেও বহুবিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক অধ্যাপকদের সামনে তাঁর খেলা দেখিয়েছিলেন। স্যার সি ভি রমন তাঁর অদ্ভুত যৌগিক শক্তি পর্যবেক্ষণ করে বলেছিলেন, স্বামীজীর অত্যাশ্চর্য ক্রিয়াকলাপ আধুনিক বিজ্ঞানকেও স্তম্ভিত করে দেয়। কিছুদিন পরে অবশ্য এই হঠযোগী সুদূর রেঙ্গুনে খেলা দেখাবার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রাণত্যাগ করেন।

এই সময়েই কিম্বা এর কিছু আগে কাঁকেতে একজন উত্তর প্রদেশীয় পালোয়ান এসে আমাদের কয়েকটি শারীরিক শক্তির কৌশল দেখিয়ে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি কসরতের কথা এখনও আমার মনে আছে। খেলা দেখানো হচ্ছিল হাসপাতালের মাঠে বিকালবেলায়। মল্লবীর প্রথমে এসেই একটি লেমনেডভরা বোতল চেয়ে নিলেন, তারপর দুই হাতে ধরে ঐ বোতলের মুখে সজোরে ফুঁ দিতে লাগলেন। এর ফলে তাঁর দুই গাল ফুলে উঠল আর সমস্ত মুখ রাঙা হয়ে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই ফট করে একটা শব্দ হলো আর বোতলের মুখ থেকে সফেন পানীয় সজোরে বার হতে আরম্ভ হলো। পালোয়ানজী এইবার মনের সুখে লেমনেড পান করতে লাগলেন। এই ঘটনার অনেক পরে ১৯৫১ সালে রাঁচির দুর্গাবাড়ী প্রাঙ্গণে আর একজন মল্লকে শুধু হাতের জোরেই একমুষ্টি সরিষা মর্দন করে তৈল নিষ্কাষণ করতে দেখেছি।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস

উপযুক্ত রকম চর্চা করলে মানুষের শারীরিক বল কতদূর বর্ধিত হতে পারে, এই সমস্ত ঘটনাই তার প্রমাণ।

এবার আমার প্রত্যক্ষ করা শব্দ সঞ্চার বিদ্যা বা ভেন্ট্রিলো কুইজমের বিষয় বলব। আমরা তখন রাঁচিতে সেণ্ট পলস হাইস্কুলের নবম শ্রেণীর ছাত্র। ১৯৩৩ সাল, বর্ষাকাল। স্কুলের হলঘরে খেলা দেখাবার আয়োজন করা হয়েছিল। যতদূর মনে পড়ে এই যাদুকর এলাহাবাদ প্রবাসী একজন বাঙালী ভদ্রলোক ছিলেন। তাঁর মুখে কালো দাড়ি ছিল, অঙ্গে ম্যাজিসিয়ানদের মত কৃষ্ণ পরিচ্ছদ। প্রথমে তিনি মামুলী কয়েকটি ছোটখাটো তাসের খেলা দেখালেন। তারপর তিনি হরবোলা হয়ে বিভিন্ন জীবজন্তুর ডাক অবিকল অনুকরণ করতে লাগলেন। মনে হল যেন একদল আকাশচারী হাঁস প্যাঁকপ্যাঁক করতে করতে ক্রমশ দূরে চলে যাচ্ছে। এরপর তিনি বললেন তাঁর এক অদৃশ্য ভৃত্য আছে, ডাকলে সে সাড়া দেবে। তাঁর আহ্বানে আমরা সত্যই শুনতে পেলুম দূর থেকে একজন লোক উত্তর দিতে দিতে ধীরে ধীরে কাছে আসছে। এবার তিনি ঐ ব্যক্তিকে মাটির নীচে যেতে বললেন। আবার স্পষ্ট শুনতে পেলুম ভূগর্ভ থেকে গুরু গম্ভীর স্বরে কে একজন তাঁর কথার জবাব দিচ্ছে। এত সুন্দর স্বরপ্রক্ষেপ শোনবার সুযোগ আমার আর কখনও হয় নি। যদিও একাধিক যাদুকরের প্রদর্শনী দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

এই সেণ্ট পলস স্কুলে পড়বার সময়ই একজন নেপালী তীরন্দাজের অদ্ভুত নৈপুণ্য আমরা দেখেছিলুম। এটা বোধহয় ১৯৩৪ সালের জানুয়ারি মাসের কথা। এই ছোটখাটো মোঙ্গোলীয় ধনুর্ধরটি দূর থেকে সুতা বাঁধা বলের দিকে তীর নিক্ষেপ করে অনায়াসে সুতা কেটে দিচ্ছিলেন। তিনি দুইজন ছাত্রকে দুইপাশে দাঁড় করিয়ে তাদের হাতে সুতা বাঁধা দুটি বল দিয়ে দোলাতে বললেন, আর নিজে কিছুদূরে গিয়ে তীরধনুক নিয়ে লক্ষ্য-স্থির করে বসলেন। দুলতে দুলতে সুতাশুদ্ধ বল দুটি যেই গুণ চিহ্নের মত—আড়াআড়ি অবস্থায় এলো, তৎক্ষণাৎ তিনি দুই সূত্রের সংযোগস্থল লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে সুতা কেটে গিয়ে দুটি গোলকই ভূপতিত হলো। এরপর তিনি শব্দভেদী বাণের খেলা দেখিয়েছিলেন: তার দুই চক্ষু কাপড় দিয়ে ভাল করে বেঁধে দেওয়া হলো। ইতিপূর্বেই তিনি একটি তার বাঁধা ফ্রেম একজনের হাতে দিয়ে রেখেছিলেন, ঐ তারে আঙুল দিয়ে সেতারের মত আস্তে আস্তে বাজাতে। তারের মৃদুমন্দ ঝঙ্কার শুনবামাত্র চোখবাঁধা অবস্থাতেই দূর থেকেই তিনি শর-ক্ষেপণ করলেন। অব্যর্থ লক্ষ্য, তখনই তার কেটে দু'টুকরো হয়ে গেল।

আমি আর একজন হঠযোগীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলুম, ইনি রাজস্থানের অধিবাসী—নাম রুদ্রদেবজী। ইচ্ছামত নিজের নাড়ীর গতি পরিবর্তন এবং হৃৎস্পন্দন রোধ করবার ক্ষমতা এঁর ছিল। রাঁচিতে ওয়েলফেয়ার সেণ্টার হলে খেলা দেখান হচ্ছিল। যোগীরাজ স্টেজের মাঝখানে একটি চেয়ারে উপবেশন করে দর্শকদের মধ্য হতে যাঁদের নাড়ীজ্ঞান আছে এরকম লোককে ওপরে উঠে আসতে অনুরোধ করলেন। সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানে কোন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন না, সেজন্য আমি আর ইতস্তত না করে সোজা স্টেজের ওপর চলে গেলুম। হঠযোগীর বাঁ হাতের নাড়ী আমি পরীক্ষা করছিলুম আর ডান হাতের নাড়ী দেখছিলেন রাঁচির তদানীন্তন জেলাধীশ। ডেপুটি কমিশনার মহাশয়কে আগমন করতে দেখে প্রথমটা আমি কিঞ্চিৎ অস্বস্তি বোধ

করেছিলুম, কিন্তু পরে দেখলুম তাঁর নাড়ীজ্ঞান আমার চেয়ে কিছু বেশী নয়। যা হোক হঠযোগী মহোদয় এবার নিজের বুক ও পেট বেঁকিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস অন্যরকমভাবে নিতে আরম্ভ করলেন। অল্পক্ষণ পরেই আমি স্পষ্টই অনুভব করলুম তাঁর বাম হস্তের ধমনীতে নাড়ীর কম্পন একেবারেই নেই। এরপর তিনি দক্ষিণ হস্তের নাড়ী বন্ধ করেছিলেন, তারপর দুই হাতের নাড়ী একসঙ্গে বন্ধ করে দিলেন। আমরা তো সবাই অবাক। আমি ভাল করেই পরীক্ষা করে দেখেছিলুম তাঁর বগলে কোন কাপড়ের বা রবারের বল লুকান নেই, যার ওপর চাপ দিয়ে শোণিত সঞ্চালন রুদ্ধ করা সম্ভব হতে পারে। পরে অবশ্য রাঁচির সিভিল সার্জন তাঁকে উত্তমরূপে পর্যবেক্ষণ করে একই ফল পেয়েছিলেন। এই হঠযোগীর তীর ছুঁড়ে লক্ষ্যভেদ করবার ক্ষমতাও বেশ ভাল ছিল। তবে পূর্বোক্ত নেপালী তীরন্দাজের নিপুণতা আরও বেশী ছিল বলে মনে হয়।

এবার ১৯২৭ সালে আসা যাক, তখন আমরা পূর্ণিয়া জেলার আরারিয়া মহকুমায় রয়েছি। পিতৃদেব সেখানকার সহকারী সিভিল সার্জন। এই সময় এক বাঙালী যাদুকর সেখানে এসে তাঁর অপূর্ব ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখিয়ে কয়েক-দিনের জন্য ঐ ছোট সহরটিকে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সবগুলি খেলার কথা আর আমার ভাল মনে নেই, তবে তাঁর একটা প্রদর্শনী এখনও আমার বেশ স্মরণ আছে। সামিয়ানার সামনে এক জায়গায় একটি লম্বা গর্ত খোঁড়া ছিল। যাদুকর মহাশয় এসেই প্রথমে খুব জোরে জোরে কয়েকবার নিশ্বাস নিয়ে নিলেন। তারপর তিনি ঐ গর্তে গিয়ে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লেন, ওপর থেকে কাঠের তক্তা চাপা দিয়ে তার ওপর আবার মাটির রাশি ফেলা হল। সর্বশুদ্ধ প্রায় পৌনে দু'ঘণ্টা কাল তিনি ঐ গর্তের মধ্যে অবস্থান করেছিলেন। এই অবসরে একটি সুন্দরী তরুণী নৃত্যগীতের দ্বারা সমবেত দর্শকবৃন্দের মনোরঞ্জন করছিল। নির্দিষ্ট সময় অতীত হবার পর মাটি সরিয়ে ম্যাজিসিয়ান মহাশয়কে আবার জীবন্ত অবস্থায় ওপরে তোলা হল, তবে তিনি কিঞ্চিৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এরপর তিনি সেদিন আর কোন খেলা দেখান নি। এখন পরিণতবয়সে মনে হয়, গর্ত বড় হলে তার ভিতর একজন মানুষের কিছুক্ষণ নিশ্বাস নেবার মত অক্সিজেন হয়তো থাকতে পারে। সেইজন্য ঐ যাদুকরের পক্ষে একঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট কাল মাটির নীচে থাকা অসম্ভব হয় নি।

এই পূর্ণিয়া প্রসঙ্গে আর একটি ব্যাপার মনে পড়ে গেল। পূর্ণিয়া সহরে থাকবার সময় অকারণে বন্দুক ছোড়ার মত দুমদাম শব্দ সর্বদাই শুনতে পেতুম। কখনও জোরে, কখনও আস্তে, কখনও কাছে, কখনও বা দূরে। এই কামান গর্জন বর্ষা কালেই বেশী শোনা যেত। অন্য সময় কম হত। এই আওয়াজ পূর্ণিয়া গান্‌স নামে পরিচিত, কিন্তু এর কারণ আজও অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। শুনেছি বরিশালেও অনুরূপ শব্দ শোনা যায় এবং তাকে বরিশাল গান্‌স বলা হয়। আশা করি আবহাওয়া বিদ্যা-বিশারদ ও ভূবিজ্ঞানীরা এই সম্বন্ধে গবেষণা করে দেখবেন।

যাদুকর গণপতি চক্রবর্তী মহাশয়ের ক্রিয়া-কৌশল দেখবার সুযোগ একমাত্র আমার হয়েছিল। স্থান কলিকাতার এক স্বদেশী মেলা। কাল ১৯৩১ সাল। তখন গণপতিবাবু সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ, মাথার সমস্ত চুল সাদা। দু-একটি সাধারণ খেলা দেখাবার পর তাঁর সহকারী একটি লোহার বারবেল নিয়ে উপস্থিত হলেন, একজন দর্শক গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলেন সত্য সত্যই সেটি মধ্যমাকৃতি ভারী বারবেল। তারপর ঐ সহকারী নিজের দুই চোখের পল্লবে মোটা সুতা বেঁধে এই বার-বেলের সঙ্গে সংলগ্ন করে দিলেন এবং অবলীলা-ক্রমে ঐ ভারী বারবেল শুধু নেত্রপল্লবের জোরে ওপরে ওঠালেন। এই ব্যাপার দেখে সকলেই আশ্চর্য। তবে এর মধ্যে কতখানি ছিল হস্তকৌশল আর কতটুকুই বা অলৌকিক শক্তি সেটা বিচার করে দেখবার ভার পাঠকদের ওপর। আমি কেবল যেরকম দেখেছিলুম ঠিক সেইভাবে লিখে যাচ্ছি।

একবার এক বার-তের বছর বয়সের বালক যাদুকর আমাদের বাড়ীতে এসেছিলো। অন্যান্য যাদুর মধ্যে সে একটি বেশ মজার খেলা দেখিয়েছিল। প্রথমে সে ঘরের মেঝের ওপর মাটির ছোট একটি স্তূপ গড়ে নিল। তারপর একটি কড়িতে একটি শুকনা সরু কাঠি লাগিয়ে ঐ মৃত্তিকা স্তূপের মধ্যে বসিয়ে দিল। অতঃপর সে দূর থেকে কড়ির ওপর দু-চার ফোঁটা জলের ছিটা দিতে লাগল। —আর সঙ্গে সঙ্গে কড়িটি একটি পাক ঘুরে গেল। আমার বিশ্বাস আর্দ্রতা-জনিত তন্তু সম্প্রসারণের সঙ্গে এই ব্যাপারের কোন সম্পর্ক আছে, কারণ দেখেছি কোন দোমড়ান দেশলাইয়ের কাঠিতে জল দিলে সেটি সোজা হবার চেষ্টা করে।

একদা এক সার্কাস পার্টিতে জীবন্ত ফোয়ারা দেখেছিলুম। রোগামতন স্যুটপরা একজন, চক্রে এসে ছোট একবালতি জল গেলাস গেলাস খেয়ে শেষ করলেন, তারপর ভরাপেট চেপে ধরে মুখ দিয়ে সমস্ত জল ফোয়ারার মত বার করে দিলেন। এরপর ছোট ছোট কাচের গেলাসে করে লাল মাছ সেখানে আনা হ'ল। সেই ভদ্রলোক পাঁচ-ছয় গেলাস জলশুদ্ধ লাল মাছ সহজেই গলাধঃকরণ করে ফেললেন। এরপর তিনি একে একে ঐ সমস্ত লাল মাছই জীবন্ত অবস্থায় উদ্‌গিরণ করলেন।

১৯২৮ সালে আমরা সকলে কিছুদিনের জন্য সিমলা পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলুম। এখানে এসে অবধি আমার দাদামহাশয়ের প্রায়ই পালাজ্বর হতে লাগল, তার ঠিক একদিন অন্তর অত্যন্ত শীত করে কম্প দিয়ে জ্বর আসত। সাধারণভাবে চিকিৎসা করে বিশেষ কোন উপকার পাওয়া গেল না। এই সময় দাদা-মহাশয়ের ছোটভাই (রবীন্দ্রনাথ মিত্রমহাশয়) আমাদের ছোট দাদাবাবু কোন কাজে সেখানে আসেন। তিনি ঐ পালাজ্বরের অব্যর্থ এক ঔষধ দিলেন। জ্বর আসবার দিন তিনি কোন গাছের পাতা ছিঁচে পুঁটলি বেঁধে দাদামশায়কে কেবল শুঁকতে দিলেন, এতেই তাঁর জ্বর আশ্চর্যরকমভাবে বন্ধ হয়ে গেল আর তিনি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করলেন। পরে অবশ্য আমি এই গাছের নাম জানতে পারি। কিন্তু কোন বিশেষ কারণে তার নাম এখানে প্রকাশ করা সম্ভব হ'ল না। পাঠকগণ যেন ত্রুটি মার্জনা করেন।

ঘটনাচক্রে কোন এক সময় আমি একজন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ও জ্ঞানী সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পেয়েছিলুম। ইনি একাধারে সাধক ও সুসাহিত্যিক এবং মহাযোগী। ইনি শ্রীঅরবিন্দের 'দিব্যজীবন' মহাগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছেন এবং সমগ্র ঋগ্বেদের ভাষ্য প্রণয়নে নিযুক্ত আছেন। এঁর ভবিষ্যদ্বাণী কখনও নিষ্ফল হতে দেখি নি, একদা এক উদ্বিগ্ন ছাত্রীকে পরীক্ষার ফল বার হবার প্রায় দেড়-দুই মাস আগেই তাকে তার সফলতার সংবাদ জানিয়ে আশ্বস্ত ও আনন্দিত করেছিলেন। আর একবার একটি দশ বছরের ছোট মেয়ের বহুকাল স্থায়ী সর্দিকাশি কেবল আধ্যাত্মিক শক্তি প্রয়োগে ইনি নিরাময় করেন। অন্য এক সময় এঁর ছবিতে ফুলের মালা পরিয়ে সেই মেয়েটিই কৌতূহলবশে তাঁকে চিঠি লিখে জিজ্ঞাসা করে, কোন ফুলে গাঁথা মালা ফটোতে লাগান হয়েছে। স্বামীজী রহস্য করে উত্তর দেন, বকুল ফুলের মালা। তাঁর উক্তি সম্পূর্ণ ঠিক হয়েছিল, যদিও তিনি তখন প্রায় আড়াই শ' মাইল দূরে অবস্থান করছিলেন।

এখানে আমার কয়েকটি মাত্র ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয় বর্ণনা করলুম, এই রকম ভাবে যদি অন্যান্য পর্যবেক্ষকরা নিজ নিজ অভিজ্ঞতার কথা বিবৃত করেন তাহলে প্রকৃতির অনেক রহস্য জানা যাবে আর আমাদের জ্ঞানের সীমাও বাড়বে। আমি প্রত্যেককেই এ বিষয়ে অবহিত হতে অনুরোধ করি।
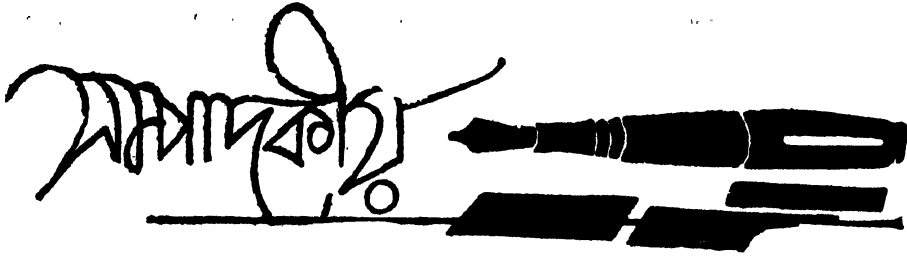
আফ্রো-এশীয় সম্মেলন প্রসঙ্গে

প্রস্তাবিত আফ্রো-এশীয় সম্মেলন অবশেষে বানচাল হইয়া গেল। প্রতীক্ষিত এই সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হইল না। সব কিছু স্থির থাকা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে অধিবেশন বন্ধ হইল।

এশিয়া ও আফ্রিকার—এই দুটি মহাদেশ আজ নানা সমস্যায় জর্জর। বহুবিধ সমস্যার সম্মুখীন তাহাদের হইতে হইতেছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক নানাপ্রকার বিপর্যয়ের মুখোমুখি আজ এশিয়া ও আফ্রিকা অন্তর্গত বহু রাষ্ট্র।

সমস্যাকে কখনই চিরদিন জিয়াইয়া রাখা চলে না। তাহার সমাধানকল্পে যথাব্যবস্থা অবিলম্বেই করণীয়। এই সকল সমস্যাগুলি নিবারণের পন্থা উদ্ভাবনের জন্য আলাপ-আলোচনার জন্যই আহূত হইয়াছিল আফ্রো-এশীয় সম্মেলন। এশিয়া ও আফ্রিকার অধিবাসীরা খুব আগ্রহ সহকারে প্রহর গণিতেছিলেন ঐ অধিবেশনের, সকলেরই মনে আশা ছিল যে, ঐ অধিবেশন সমস্যার অন্ধকার হইতে মুক্তির পথ নির্দেশ দিবে, যন্ত্রণার অবসানের পর শান্তি রাজ্যে পদার্পণের দিনে দিকনির্দেশ, এশিয়া-আফ্রিকার আকাশ-বাতাস, মাটিতে তাহার স্বস্তি ও প্রাচুর্যের সমাবেশ ঘটাইবে, কিন্তু সকলের এই ব্যাকুল প্রতীক্ষা নির্মূল করিয়া দিল এশিয়ারই অন্তর্গত একটি রাষ্ট্র—চীন। এত প্রত্যাশা, এত আকাঙ্ক্ষা, এত স্বপ্ন বিনষ্ট হইল। অন্ধকারকে, হতাশাকে, বেদনাকে আরও গভীর, আরও ঘনীভূত, আরও গাঢ় সন্নিবদ্ধ করিয়া তোলা হইল। আশার একটি আলো প্রজ্বলিত হওয়ামাত্রই নির্বাপিত হইল।

যে সম্মেলনটির প্রতি মানুষ এতখানি আস্থা ও নির্ভরতা পোষণ করিতেছিল, যাহার মাধ্যমে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের একটি বর্ণাঢ্য প্রতিবিম্ব অবলোকন করিতেছিল, যাহার মধ্যে বহু যাতনা হইতে মুক্তির সন্ধান সে পাইয়াছিল তাহাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করার কি কারণ থাকিতে পারে, কোন যুক্তি থাকিতে পারে তাহার স্বপক্ষে, ইহার দ্বারা চীন কি উদ্দেশ্যই বা সাধন করিল —এই সকল প্রশ্ন অবশ্যই আজ সকলের মনে দানা বাঁধিয়া উঠিতে পারে।

আসলে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইলে চীন নানাভাবে বাধা পাইত তাহার হিংসাধর্মী প্রবৃত্তি অতঃপর চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে। এই সম্মেলনে মিলিত হইতেন বহু স্থিতপ্রজ্ঞ রাষ্ট্রনায়ক, বহু চিন্তাশীল নেতা, বহু মানবকল্যাণকামী জনপাল তাঁহাদের সূক্ষ্ম, বলিষ্ঠ এবং শুভপ্রদ সিদ্ধান্তে চিন্তাধারায় চীনের অভিসন্ধিমূলক উদ্দেশ্যগুলি রূপলাভ করিত না। অতএব চীন মরীয়া হইয়া সেই সম্মিলনটি অনুষ্ঠিত হইতে দিল না। এই সম্মেলনে সোভিয়েট রাশিয়া সদস্য হইত, রাশিয়া সদস্যদলভুক্ত হইলে ভারতের পক্ষে লাভজনক হইত, রাশিয়া ভারতের বন্ধু, অতএব চীনের স্বার্থসিদ্ধির সেইখানেই অন্তরায়।

চীনের 'দোস্ত' এতদিন যাহারা ছিল তাহারাও আজ চীনের সহিত মিত্রভাবাপন্ন নয়। যাহাদের সহায় পাইয়া চীন তর্জনগর্জন করিতেছিল, যাহাদের বন্ধুরূপে পাইয়া চীন দুনিয়াকেই দম্ভে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল আজ তাহাদেরই দরজা তাহার নিকট রুদ্ধ। ইন্দোনেশিয়া, আলজিরিয়া আজ চীনের সহিত কোন ধরণের সম্পর্ক রাখিয়া চলিতেছে তাহাও কাহারও অজানা নয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে সে সবশক্তি প্রয়োগ করিয়া অধিবেশনটি বানচাল করিল।

একা চীনই নয়, এই সঙ্গে পাকিস্তানও আছে। চীনেরই সুহৃদ পাকিস্তান। ভারতের উভয়েই সমান শত্রু। উভয়েই ভারতের ক্ষতি-সাধনে সমান তৎপর। অধিবেশন বানচাল করার মূলে পাকিস্তানের হস্তক্ষেপও লক্ষ্য এড়াইয়া যায় না। পাকিস্তানও দেখিল যে এই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইলে ভারতের বিরুদ্ধে তাহার সাম্প্রতিক আচরণ সম্বন্ধে আলোচনা হইবেই এবং তাহার ফলে তাহার চরিত্রের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকটি প্রকট হইয়া উঠিবে সর্বজনসমক্ষে এবং এক কথায় তাহার মুখোস খুলিয়া যাইবে, মুখোসের অভ্যন্তরস্থ লোভাতুর মুখটিই প্রকাশিত হইবে। কয়েকটি রাষ্ট্র তাহাতে সমর্থন করিতে পারে কিন্তু এশিয়া ও আফ্রিকার বিপুলসংখ্যক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ ও প্রতিভাদীপ্ত প্রাজ্ঞ নেতৃবৃন্দ কখনও এবম্বিধ অন্যায় আচরণ বরদাস্ত করিবেন না। অতএব অধিবেশনে পাকিস্তানের অবস্থা শোচনীয় হইত।

বিশ্বের আজ যে পরিস্থিতি, বিশেষতঃ এশিয়া, আফ্রিকার আজ যা অবস্থা—সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই জাতীয় অধিবেশন সর্বতোভাবেই আশার সম্ভাবনা বহন করে। এই অধিবেশন বানচাল করা শান্তি ও কল্যাণের সম্ভাবনাকে হত্যা করারই নামান্তরমাত্র। বহু মানুষের মঙ্গলের বীজ যাহার মধ্যে নিহিত, তাহাকে যে নষ্ট করে, তাহা অপেক্ষা বড় অপরাধী আর কে হইতে পারে, তাহা আমাদের জানার বাইরে।

আশা আমাদের সম্বল। নিদারুণ দুর্যোগেও আমরা আশা হারাই না বলিয়াই সর্বপ্রকার প্রতিকূল অবস্থা জয় করিতেও সমর্থ হই। সেই আশার উপর ভরসা রাখিয়াই আমরা আবার এই জাতীয় সম্মেলনের প্রত্যাশায় প্রহর গণিতেছি। —প্রহর গণিব।

বাঁদরামি

ইতিহাস এতাবৎ আমাদের বহু পরদ্রোহী, পররাজ্য গ্রাসের সঙ্কল্পে অটল, পরের নাশ সাধনে তৎপর চরিত্রের সহিত পরিচিত হইয়াছে। ইতিহাসের আলোকে তাহাদের রূপ সম্বন্ধে আজ কোনপ্রকার জিজ্ঞাসার কারণ নাই। আধুনিক যুগেও এ-জাতীয় চরিত্রের অভাব নাই। তাহাদের ভাবধারা, চিন্তা, ধারণা এবং ক্রিয়াকলাপগুলির সহিতও আমাদের অপরিচয় নাই। কিন্তু সকলকে অতিক্রম করিয়া গেলেন পাক পররাষ্ট্র-মন্ত্রী ভুট্টো। যাহাকে বলে বাজীমাৎ—শত শত বৎসর ধরিয়া এ-ক্ষেত্রে তাঁহার পূর্বসূরিবৃন্দ যাহা করার সাহস তো দূরের কথা, যাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। ভুট্টো সেই অসাধ্যসাধন এবার করিয়া বসিলেন। কি করিলেন, কিসেরই বা এই বাজীমাৎ—চরম বেয়াদপি প্রদর্শন এবং অভাবনীয় সাধারণ শিষ্টাচার সম্পর্কেও বোধশূন্যতার।

সেদিনকার প্রভাতী সংবাদপত্রগুলি যে সংবাদ পরিবেশন করিল তাহা বোধ করি সকলকেই ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ ও হতভম্ব করিয়া দিয়াছিল। কারণ, মানুষ নানাপ্রকার অসৌজন্যতা ও অশালীনতা দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে এবং অভব্য ব্যক্তির নিকট অবশ্যই ভদ্রাচার কেহই প্রত্যাশা করে না, কিন্তু পাক পররাষ্ট্র-মন্ত্রীর একটি উক্তি—ইহা কেহই কল্পনাও করিতে পারে নাই। প্রকাশ্য অধিবেশনে তিনি ভারতীয়দের সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন তাহা তাঁহার চরিত্রের কুৎসিততম দিকটির একেবারে আবরণ উন্মোচন করিয়া দিয়াছে।

রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে রাজনৈতিক কারণে সঙ্ঘর্ষে নূতনত্বের কোন স্বাদ নাই। রামায়ণ-মহাভারতের যুগ হইতেই ইহার নজীর মিলিয়াছে। কিন্তু এ-যুগে রাজনৈতিক কলহকে কেন্দ্র করিয়া কোন রাষ্ট্রনায়ক প্রতিপক্ষকে—তাহার নিকট নিজের অন্যায় আচরণের সম্যক প্রত্যুত্তর পাইয়া ক্রোধে দিশাহারা হইয়া, সম্পূর্ণরূপে কাণ্ডজ্ঞান বিসর্জন করিয়া তাহাকে ইতরের ভাষায় গালি দিবেন—এ নজীর বোধ হয় আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে এই প্রথম স্থাপিত হইল।

অনেক সময় পরাজিত শত্রু করুণার পাত্র হয়। তাহার বল খর্ব করিয়া তাহাকে অসহায় করিয়া দিয়া পরে তাহার সহিত করুণাসুলভ আচরণ করা হইয়া থাকে—কিন্তু ভুট্টো করুণারও পাত্র নন। তাঁহার ন্যায় বর্বরতার পৃষ্ঠপোষক, লোভ ও হিংসার প্রতীক, ঘৃণ্য মনোভাবের উপাসক ব্যক্তিকে করুণা করা হইলে "করুণা" শব্দটির প্রতি চরম অসম্মান প্রদর্শন করা হইবে।

পৃথিবীর সুপ্রাচীন সভ্যতাগুলির মধ্যে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি অন্যতম। মানুষের চিন্তার পরিধিবিস্তারে, স্বপ্নের নবদিগন্ত উন্মোচনে ভারতের অসামান্য দান অনস্বীকার্য। সুদূর অতীতেও ভারতের মহামূল্য বাণী তাহার বরেণ্য সন্তানরা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন পৃথিবীর নানাদেশে, বিশ্বের বহু সুধী, জ্ঞানী, পর্যটক সেই সুপ্রাচীন যুগেও ভারতভূমির মৃত্তিকার স্পর্শে আপন আপন সঞ্চয়ের ঝুলি পূর্ণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পাকিস্তান নামক আজ যে ভূখণ্ডের নাম ভূগোলে, ইতিহাসে বিদ্যমান, আঠার বৎসর পূর্বে তাহা ভারতেরই অন্তর্গত ছিল। পরিসংখ্যানের সাহায্যে আর একটি বিষয়ও স্পষ্ট হইবে যে, ভারতের স্বাধীনতা আনয়নে কাহাদের অবদান সর্বাধিক।

দীর্ঘকাল ধরিয়া পাকিস্তানের সর্ববিধ মাতুলালয়সুলভ আবদার এবং হিন্দুদের সংখ্যাল্পতার সুযোগ লইয়া তাহাদের উপর অকথ্য নির্যাতন ভারত সহ্য করিয়াছিল, পাকিস্তান ভারতের এই আচরণের বিপরীত অর্থ করিল—ভারতের সহনশীলতা এবং উদারতা তাহাদের নিকট প্রতিভাত হইল দুর্বলতারূপে। তাহারই সমুচিত প্রত্যুত্তর গত সেপ্টেম্বরের যুদ্ধে পাকিস্তান পাইয়াছে এবং তাহারই ফলে আয়ুব-ভুট্টো বেসামাল। তাহারই পরিণতি—ভুট্টোর এই অমার্জনীয় উক্তি।

শুধু ধৃষ্টতাই নয়, যে দেশ শিক্ষায়, দীক্ষায়, জ্ঞানে, গরিমায়, সভ্যতায়, সংস্কৃতিতে পৃথিবীর মধ্যে একটি শীর্ষ আসন অধিকার করিয়া আছে সেই দেশের মানুষকে যিনি মনুষ্যেতর জীবের সঙ্গে তুলনা করিয়া থাকেন তাঁহার মস্তিষ্কের সুস্থতা সম্বন্ধেও তো যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থাকা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তাহারও উত্তর আছে, যদি তাহাই হয় তাহা হইলে তাঁহাকে যথাস্থানে প্রেরণ করা হউক, একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে তাঁহাকে ভাষণ দেওয়ার সুযোগই বা দেওয়া হয় কেন, অতএব যখন তিনি সে সুযোগ পাইতেছেন সে-ক্ষেত্রে তাঁহার আচরণের যথোচিত উত্তর দেওয়া আবশ্যকতাকেও উড়াইয়া দেওয়া কোনক্রমে চলে না।

উত্তর দিয়াছেন শ্রীচাগলা—তাঁহাকে শত শত ধন্যবাদ। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা এই জঘন্য উক্তি নীরবে হজম করেন নাই। যেমন কথা, তাহার তেমন উত্তরই ঘটিয়াছে। যে বিচক্ষণতার সহিত সুনিপুণভাবে ভুট্টোর কথার মুখের মত জবাব শ্রীচাগলা দিয়াছেন তাহাতে একদিকে তাঁহার দেশপ্রেমিক মন যেমন প্রতিবিম্বিত হয় অন্যদিকে তাঁহার ইতিহাস সম্পর্কে গভীর জ্ঞানও প্রমাণিত হয়। পাকিস্তানের প্রতি যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের সহানুভূতি ইত্যবসরে নানাভাবে প্রমাণিত হইয়াছে এবং এতদিন পাকিস্তান যে তর্জন-গর্জন করিয়াছে তাহা মূলত এই দুইটি শক্তি-গোষ্ঠীর সাহায্য ও সমর্থনকেই ভিত্তি করিয়া। কিন্তু বর্তমানে পাকিস্তানের সহিত এই দুই রাষ্ট্রের সম্পর্ক ও তৎসম্পর্কিত মনোভাবও এইবার ভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। মিঃ উইলসন আজ ভুট্টোর স্বরূপ চিনিয়াছেন—পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য বন্ধ করার সিদ্ধান্তও আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গ্রহণ করিয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ যে, ভুট্টো এই ক্ষমার অযোগ্য আপন উক্তির জন্য ক্ষমা চাহিয়াছেন। তবে তাহাও স্বতঃস্ফূর্ত নয়, নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে। অতএব, ইহা ক্ষমা প্রার্থনাই নয়। এই চরম অসম্মানের জন্য ভারত সরকার ভুট্টোকে বিনাসর্তে খোলাখুলিভাবে ক্ষমা চাওয়ানোর ব্যবস্থা যথানির্দিষ্ট উপায়ে করুন। এই পরিস্থিতিতে ইহাই আজ আমাদের একমাত্র কামনা।

খাদ্য-সমস্যা ও সোমবারের উপবাস

সমস্যা বাহিরে, সমস্যা ভিতরে। ভারতের জাতীয় ভাগ্যাকাশে আজ ঘোর দুর্যোগ। বাহিরে—শত্রু সমস্যা। একদিকে চীন অন্যদিকে পাকিস্তান, এই দুইয়ের লোভলোলুপ দৃষ্টি ভারতের দিকে স্থিরনিবদ্ধ। সুযোগ পাইলেই সেই বাহু বিস্তারের যথেষ্ট সম্ভাবনা, ইন্দোনেশিয়াও ভারতের প্রতি আজ মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন নয়, তুরস্ক, ইরান ও জর্ডানও আজ ভারতের প্রতি প্রতিকূল মনোভাবসম্পন্ন। ভিতরে নানাবিধ সমস্যা, বেকারিত্ব এবং খাদ্যই তন্মধ্যে প্রধান।

আজ এক অগ্নিপরীক্ষার মধ্যে ভারতকে অগ্রসর হইতে হইতেছে, অদম্য মনোবল ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার মধ্যে সেই পরীক্ষায় সাফল্য লাভের মন্ত্র নিহিত। ঐ মনোবল এবং ঐকান্তিকতার মধ্যেই সেই দুর্গম পথ পরিক্রমণের পাথেয় বিদ্যমান। ভারত সরকার আজ বহুভাবে বিব্রত। একদিকে তাহাদের সদাসতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইতেছে সীমান্তে, জলে, স্থলে। অন্তরীক্ষে—কখন কোন দিক হইতে কিভাবে শত্রু আক্রমণ করে ভারতের পবিত্র ভূমি সেই চিন্তায় তাঁহাদের সর্বশক্তি নিবদ্ধ। আবার অন্যদিকেও দেশের একাধিক সমস্যার কথা চিন্তা করিয়া সেগুলির সমাধানের বিষয়ও তাঁহাদের যথেষ্ট চিন্তা ব্যয়িত হইতেছে এবং সেগুলির সমাধানের উপায় উদ্ভাবন করিতে হইতেছে।

সমস্যা যত অল্প সময়ের মধ্যে ব্যাপক আকার ধারণ করে, সমাধান কিন্তু অত সহজে হয় না। কিন্তু সেই সমস্যা সমাধানের প্রকৃত এবং সম্ভাবনাপূর্ণ প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হইলে তাহার মাধ্যমে যথেষ্ট সান্ত্বনা পাওয়া যায়।

দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলির মধ্যে খাদ্য সমস্যাই আজ মুখ্য এবং শুধু মুখ্যই নয়—ভয়াবহও। এই সমস্যার সমাধান বিলম্বে ঘটিলে ততদিনে মানব-সমাজের মধ্যে যে কি বিপুল হাহাকারের সৃষ্টি হইবে তাহা ভাবা যায় না। খাদ্য সমস্যা এমন এক সমস্যা যাহার সমাধান অবিলম্বে করণীয়। যে কোন বিষয়েই মানুষ প্রয়োজন হইলে বিলম্ব করিতে পারে কিন্তু জঠরের জ্বালা সময়ের অপেক্ষা রাখে না। উদরে ক্ষুধার উদ্রেক ঘটিলে তখন কোন প্রকা

আশ্বাস, সান্ত্বনা বা স্তোক কার্যকরী হয় না, দুমুঠো অন্নের পাত্রই তখন জ্বালা নিবারণের একমাত্র উপায়।

দেশে ক্রমশই এখন খাদ্য দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিতেছে, নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু অচিরেই ...ভ বস্তুতে পরিণত হইতে চলিয়াছে, ...বা বাজারে তাহার সন্ধান মেলে তখন তাহা ক্রয় করাও সাধারণ মানুষের পক্ষে কষ্টকর ব্যাপারে পরিণত হয়। বাজার দর আকাশ-ছোঁয়া, সেই দরে জিনিস কিনিলে সাধারণ মানুষকে শুধু সোমবার রাত্রি কেন ...সের অর্ধভাগই উপবাসে কাটাইতে হইবে। ...দ্যের স্বল্পতার জন্য সরকার প্রতি সোমবার ...ত্রে সারা জাতিকে অনাহারে থাকিবার ...পদেশ দিয়াছেন।

কিন্তু এই উপদেশ বা সিদ্ধান্তকে সংশ্লিষ্ট ...মস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে উত্তম পন্থা বলিয়া ...বেচিত করা চলে না।

উপবাসের প্রয়োজন যদি সত্যই দেখা ...য় তাহা হইলে সারা জাতি এই সিদ্ধান্ত ...সম্বন্ধে এবং প্রসন্নমনে মানিয়া লইবে কারণ ...মস্যা নিবারণে শুধু সরকারেরই নয়, জাতির ...মকাও নগণ্য নয়। সরকারী সিদ্ধান্তের সার্থকতা নির্ভর করে জাতির সহযোগিতার উপর। কিন্তু এইখানেই আমাদের একটি প্রশ্ন আছে। প্রশ্ন এই যে, আমাদের দেশে খাদ্যের কি সত্যই অভাব? দেশে খাদ্যোৎপন্ন কি সত্যই হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে? শস্যক্ষেত্রের ফলন কি সত্যই আমাদের চাহিদা আর মিটাইতে পারিতেছে না?—আমরা স্বীকার করি জনসংখ্যা বৃদ্ধির দিকে, আমরা অস্বীকার করি না যে শুধু কলকাতাতেই বাসিন্দার সংখ্যা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে।

খাদ্য লইয়া যে বিরাট মুনাফাবাজি চলিতেছে তাহা প্রদমিত করিলেই এই সমস্যার সমাধান হয়। অধিক খাদ্য ফলনের নীতিও যাহাতে প্রকৃত কার্যকরী হয় সেদিকে দৃষ্টি দিলে কোন সমাধানই আর থাকে না। একদল মুষ্টিমেয় লোক লাভবান হইবে বহুজনকে উপবাসে বাধ্য করিয়া ইহার অবসান আশু করণীয়। বাঙলা দেশে যে ফসল ফলে এবং অব্যবহৃত জমিগুলি যথাকার্যে ব্যবহার করিবার পর তাহাদের ফসলগুলি মিলাইলে উৎপন্ন ফসলের যে পরিমাণ হয় তাহার যথাস্থানে সরবরাহগুলি ঠিক-ঠিক হইতেছে না—সেদিকে একটু দৃষ্টি দিলেই বোঝা যাইবে যে, খাদ্যাভাব কৃত্রিম, ইহা সৃষ্ট। বহু জমি এখনও মিলিতে পারে যেগুলি কাজে লাগাইলে এবং উৎপন্ন ফসলগুলির যথাযোগ্যভাবে সরবরাহ হইলে সোমবারের উপবাসের প্রয়োজন হইবে না।

আরও একটি কথা আছে। সোমবার গৃহস্থের উনানই শুধু জ্বলিবে না। কিন্তু হোটেল, রেস্তোরাঁগুলির দুয়ার অর্গলমুক্তই থাকিবে, অনেকেই যদি বাড়ির খাবার বন্ধ রাখিয়া সেই রাত্রি হোটেলে আহারপর্ব সমাধা করেন তাহা হইলে সরকারী উপদেশ আর পালিত হইল কোনখানে?

শাস্ত্রী সরকারের প্রতি আমরা আস্থাশীল, সেইজন্যই তাঁহাদেরই অনুরোধ করি এইদিকে আরও একটু প্রখর দৃষ্টি তাঁহারা দিন। আমরা জানি, দেশীয় সরকার নানা সমস্যায় বিব্রত, কিন্তু যেখানে মানুষের জঠরের অন্নের প্রশ্ন জড়িত, সেখানে সেই সমস্যাগুলিকে তো ছোট করিয়া দেখা চলে না। এদিকে ব্যর্থতা বরণ করিলে "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর"-এর দ্বিশত-বার্ষিকী ব্যাপকভাবেই উদযাপিত হইবে।■

কৌশল টিকিল না

অপকৌশল টিকিল না, টেকেও না। মিথ্যার ...ধাবা, ছলনার দ্বারা, মাৎসর্যের দ্বারা ...র সৃষ্টি তাহা কখনও স্থায়ী হয় না বা চরম ...তা লাভ করিতে পারে না। তাই আয়ুব ...প্রমুখ পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র-নায়কদের ...শা সিদ্ধ হইল না। ভারতের বিরুদ্ধে ...বঙ্গকে উত্তেজিত করার যে স্বপ্ন তাঁহারা ...খিয়াছিলেন তাহা সফল হইল না। তাঁহাদের ...র পূর্ববঙ্গ পা দিল না।

ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ...মণে পাকিস্তানের মনোভাব এবং চরিত্র কাহারও নিকট আর অস্পষ্ট নয়। যেন-প্রকারেণ আপন উদ্দেশ্য সাধনই তাহার একমাত্র নীতি, তাহার জন্য সে সব কিছু ...তেই প্রস্তুত, তজ্জন্য যে কোন চুক্তি ভঙ্গ ...তে সে বিন্দুমাত্র পশ্চাৎপদ নয়। এই ...র আক্রমণের পরিণতিও আজ বিশ্ববাসী ...ই দেখিয়াছে। নিজেদের কৃতকর্মের ...পাকিস্তান পাইয়া আজ সে আরও ...রী হইয়া উঠিয়াছে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃগোষ্ঠী পূর্ববঙ্গকে উত্তেজিত করিলেন ভারতের বিরুদ্ধে; কিন্তু এইখানেই তাঁহারা বুদ্ধির খেলায় পরাস্ত হইলেন। আসলে পূর্ববঙ্গের প্রতি তাঁহাদের বিমাতৃসুলভ আচরণ পূর্ববঙ্গবাসী কখনই বিস্মৃত হইতে পারে না। পূর্ববঙ্গকে যতভাবে সম্ভব শোষণ করিয়া উক্ত নেতৃগোষ্ঠী পাকিস্তানকে সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেন কিন্তু পূর্ববঙ্গের স্বার্থ সম্পর্কে তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে তাহার ভাল-মন্দ কল্যাণ-অকল্যাণ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তা করার প্রয়োজন তাঁহাদের মধ্যে অনুভূত হয় না। পূর্ববঙ্গের দ্বারা তাঁহারা নানাভাবে উপকৃত ও লাভবান হন কিন্তু বিনিময়ে পূর্ববঙ্গবাসী তাঁহাদের নিকট হইতে লাভ করে উপেক্ষা, অনাদর। অতএব, তাঁহাদের এইখানেই চালে ভুল হইল—তাঁহারা ভাবিলেন যে, তাঁহাদের মন্ত্র পূর্ববঙ্গবাসীকে বশীভূত করিবে, কিন্তু তাহারাও বুঝিল যে, এ-ক্ষেত্রে তাহারা নিছক কার্যসিদ্ধির উপকরণ-রূপে ব্যবহৃত হইতেছে মাত্র। অতএব এই টোপ তাহারা গিলিল না।

টোপ ভারতের উদ্দেশেও ফেলা হইয়াছিল, কিন্তু ভারতও তা গলাধঃকরণ করে নাই, এই রহস্য ভারতের শ্রদ্ধেয় নেতৃবৃন্দের নিকট স্বচ্ছ হইয়া গিয়াছিল, সহস্র চেষ্টা করিয়াও পাকিস্তান সরকার ভারত সরকারকে দিয়া পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করাইতে পারিলেন না। অথচ, পরিস্থিতি অনুযায়ী ভারত অনায়াসে পূর্ব-পাকিস্তান আক্রমণ করিতে পারিত কিন্তু ভারত কিছুতেই তাহা করে নাই। ভারতের সর্বজনবন্দিত প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীজীর সাম্প্রতিক কলিকাতা-সফরকালীন জনসভায় প্রদত্ত ভাষণে এই সত্যটির প্রতি তিনি আলোকপাত করিয়াছেন।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার চাহিয়াছিল যে, ভারতকে দিয়া কোন প্রকারে পূর্ববঙ্গ আক্রমণ করাইতে পারিলে ভারতের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গকে সহজেই উত্তেজিত করা চলিবে। কিন্তু এই আশা সমূলে নির্মূল হইল। ভারতের শিক্ষা-মন্ত্রী এবং বিশিষ্ট নেতা শ্রীচাগলাও বলিয়াছিলেন যে, ভারতের ন্যায় একটি

বিরাট রাষ্ট্রকে পাকিস্তানের ন্যায় একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ধ্বংস করার চেষ্টা কখনও সফল হইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে তাঁহার উক্ত বক্তব্যও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

আজ পাক কেন্দ্রীয় নেতৃগোষ্ঠীর স্বরূপ পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের নিকটও অস্পষ্ট নয়। এই ছলনা, চাতুরী, কৃত্রিমতা তাঁহারাও আজ ধরিয়া ফেলিয়াছেন। আজ তাঁহাদেরও বহুদিনসঞ্চিত বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে বিদ্রোহের মাধ্যমে। সর্বপ্রকার একদেশদর্শিতা, উদাসীনতা—যাহা এ-যাবৎ তাঁহারা সহ্য করিয়া আসিয়াছিলেন আজ আর সেগুলি সহ্য করিতে তাঁহারা রাজী নন। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় নেতৃগোষ্ঠীর যথেচ্ছাচারিতার জবাব দিতে আজ তাঁহারা বদ্ধপরিকর। ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো তো দূরের কথা কেন্দ্রীয় অহিন্দু নেতৃগোষ্ঠীর আচরণের প্রতিবাদে আজ তাঁহারা সোচ্চার। দিনের পর দিন যে অবিচারের শিকার তাঁহারা হইয়াছেন আজ তাহারই বিরুদ্ধে তাঁহারা রুখিয়া দাঁড়াইয়াছেন। সেইজন্যই আজ আর তাঁহারা কাঠপুত্তলির মত পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ক্রীড়নক হইলেন না। যে আগুন আপন গৃহের অভ্যন্তরেই, পাকিস্তান সরকার তাহার লেলিহান শিখার কবল হইতে তাহার স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম অনুযায়ী কখনও মুক্তি পাইতে পারেন না, যে বিষবৃক্ষ তাঁহারা নিজে বপন করিয়াছেন, তাহার ফল তাঁহাদের গ্রহণ করিতেই হইবে। যে আকাশ-বাতাস তাঁহারা হিংসা ও লোভের বিষবাষ্পে ভরপুর করিয়া তুলিয়াছেন, তাহার ক্রিয়া হইতে তাঁহাদের পরিত্রাণ নাই। পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক বিদ্রোহের মধ্যে এই সত্যটিই প্রতিভাত হয়।

শোক-সংবাদ

রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার

কলিকাতার প্রাক্তন পৌরপাল এবং বিধান পরিষদের সদস্য রাজেন্দ্রনাথ মজুমদার গত ৬ই কার্তিক শ্রীশ্রী৺কালীপূজার দিন ৫৫ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ইনি সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের পৌত্র ও ডাঃ জিতেন্দ্রনাথ মজুমদারের পুত্র ছিলেন। কর্মজীবনে সলিসিটার হিসাবে ইনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। ইনকরপোরেটেড ল সোসাইটি, বিদ্যাসাগর কলেজ, প্রতাপচন্দ্র মেমোরিয়াল হাসপাতাল প্রভৃতি আরও একাধিক জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

শিল্পাচার্য গগনেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র ও শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র নবেন্দ্রনাথ ঠাকুর গত ১লা কার্তিক ৬৬ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। শিল্পী হিসাবে ইনি একদা যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। বহু বিখ্যাত শিল্প ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল।

প্রেমাঞ্জন পাল

দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র পালের কনিষ্ঠ পুত্র প্রেমাঞ্জন পাল গত ৯ই কার্তিক ৬০ বছর বয়সে গতাসু হয়েছেন।

অবনী মুখোপাধ্যায়, সুরেশ আচার্য ও ত্রৈলোক্য বসু

অল্পকালের ব্যবধানে বাঙলা দেশে তিনজন প্রবীণ বিপ্লবী পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। অবনী মুখোপাধ্যায় (৫৩), সুরেশ আচার্য (৭৮), ত্রৈলোক্য বসু (৭৮) যথাক্রমে ১২ই, ২০শে ও ১৮ই কার্তিক দেহান্তরিত হয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে এই তিনজনের অবদান অপরিসীম। দেশের মুক্তির জন্য এই তিনজনই যথেষ্ট লাঞ্ছনা ও নিপীড়ন বরণ করে প্রগাঢ় দেশপ্রেমের পরিচয় দেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অল্পকালপূর্বে অবনী মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে একটি সুবিস্তৃত আলোচনা মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

বিকাশেন্দুনারায়ণ ভুপবাহাদুর

কুচবিহারের বিকাশেন্দুনারায়ণ ভুপবাহাদুর সম্প্রতি ৮১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ইনি কুমার গজেন্দ্রনারায়ণ ভুপবাহাদুর ও ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের দ্বিতীয়া কন্যা সাবিত্রী দেবীর অন্যতম পুত্র ছিলেন।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

[দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হইতে শ্রীসদ্গুরু গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।]

পাঠক পাঠিকার চিঠি

প[illegible]-সমালোচনা

[illegible]
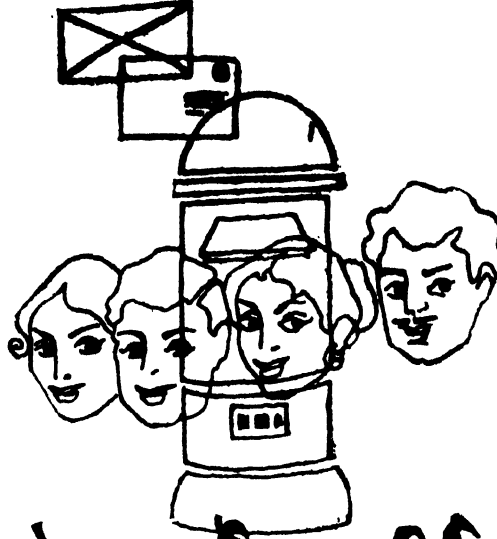
আ[illegible] মাসিক বসুমতীর অনুরাগী পাঠিকা। [illegible]আজকালকার দিনে নামকরা মাসিক পত্রিকা [illegible]লিতে একমাত্র আপনার বসুমতীকেই বোঝায়। [illegible]াসিক বসুমতী বইটি প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত [illegible] পড়ি[illegible] দি[illegible] [illegible]নে বইটির উন্নতি এত [illegible]ইতেছে তা[illegible] দেখিয়া আমি সত্যই [illegible] আনন্দিত হইয়াছি। আশা করি, আমার মত [illegible]ন্যান্য পাঠক-পাঠিকারা আমার মতের সঙ্গে [illegible]কমত। অবশ্য এর যে সমস্ত কৃতিত্ব আপনার [illegible]কথা আমি নিঃসন্দেহে বলিতেছি। নতুন নতুন [illegible]খিকাদের অপূর্ব ধরণের লেখা এই সমস্ত [illegible]তিত্বও একমাত্র আপনারই প্রাপ্য। সত্যি [illegible]ণতোষবাবু আপনি পাকা জুহরী। 'মাসিক [illegible]সুমতী' ছাড়াও এবারকার পূজাসংখ্যা 'দৈনিক [illegible]সুমতী' আমি পড়িয়াছি। তাহার মধ্যে দু' [illegible]টি উপন্যাস অত্যন্ত উঁচুদরের।

পরিশেষে আপনাকে আমার আন্তরিক [illegible] ও অভিনন্দন জানিয়ে এবং 'মাসিক বসুমতী'র [illegible]রাত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে আপাতত [illegible]খানেই শেষ করলাম। ইতি—নীলা চক্রবর্তী, [illegible]এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

[illegible]শয়,

মাসিক বসুমতীর মূল্যবৃদ্ধি সংক্রান্ত আপ-[illegible]র বিজ্ঞাপন দেখলাম। আজ যেখানে কারণে [illegible]কারণে সর্বক্ষেত্রে মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে সেক্ষেত্রে [illegible]পনারা পাঠকের মতের অপেক্ষায় থেকে [illegible]াদের সম্মানিত করেছেন। মাসিক বসুমতীর একটি জনপ্রিয় ও সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকার ১৫ পয়সা মূল্যবৃদ্ধি আজকের দুর্মূল্যের বাজারে খুব বেশী কিছু নয়। তবে, আমার কয়েকটি কথা বলবার আছে। প্রথমত আপনাদের পত্রিকায় একটি ধারাবাহিক ভ্রমণকাহিনী দেখিতে চাই, যে কাহিনীর সাহিত্যিক মূল্যও আছে। দ্বিতীয়ত, বিভিন্ন বিদেশী ভাষায় যে সব জনপ্রিয় বই প্রকাশিত হয়, সেই সকল বইয়ের একটা সংক্ষিপ্ত আলোচনার ধারা যদি প্রবর্তন করেন তাহলে ভাল হয়। আর সেই আলোচনা আমাদের ভারতের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত নামকরা বইয়ের আলোচনাও থাকবে। প্রতিটি সংখ্যায় এক একটি বইয়ের আলোচনা প্রকাশিত হবে। তৃতীয়ত, আমার মনে হয় আপনারা আগের চাইতে, এখন বেশী করে চলচ্চিত্র জগতের প্রতি মনোযোগী হয়েছেন। চতুর্থত, বিজ্ঞানজগৎ সম্বন্ধে আলোচনা আপনাদের পত্রিকায় আরও বেশী করে হওয়া দরকার।

আপনাদের পত্রিকা পড়ে আনন্দ পাই বলেই উপরোক্ত কথাগুলো বললাম। ধন্যবাদান্তে—ইতি—শ্রীঅরুণকুমার ভট্টাচার্য, কোক ওভেন কলোনী, দুর্গাপুর-২।

মহাশয়,

আপনাদের বহুল প্রচারিত সর্বজনপ্রিয় 'মাসিক বসুমতী' ভাদ্র সংখ্যায় মূল্যবৃদ্ধি হ্রাস করা দেখিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিত হলাম। আমরা আপনাদের পত্রিকার আজ প্রায় ১২ বৎসর অধিককাল গ্রাহক—যখন পত্রিকার ।।৶০ দাম ছিল তখন হইতে। যাই হোক, আপনারা বর্তমান বাজার-এর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যে সুবিচার পাঠকবর্গকে দিয়াছেন, তার জন্য অশেষ কৃতজ্ঞ। তবে সর্ব দিক বিচার করিতে গেলে এই পত্রিকার আর ২৫ পয়সা মূল্য বাড়িলে কিছুই বলবার নেই; যা যা সংকলন থাকে তা বর্তমানে আর কোন 'মাসিক পত্রিকায়' নেই। অধিক কি? নমস্কারান্তে।

—তরুণ ঘোষ, কাঁসারীপাড়া, কালনা।

মাননীয়,

সম্পাদক মহাশয়, বর্তমানে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে মাসিক বসুমতীর মূল্য-বৃদ্ধি সমীচীন কি না, সে সম্পর্কে আমার ব্যক্তি-গত মতামত এই যে, বর্তমানে প্রত্যেকটি নিত্য-ব্যবহার্য দ্রব্যের যখন মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে, তখন মাসিক বসুমতীর মূল্য বৃদ্ধি হওয়াটা স্বাভাবিক।

তবে এটাও আমরা আশা করি যে, মাসিক বসুমতীর মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকার অঙ্গসজ্জা, মুদ্রণ-পারিপাট্য ও কাগজের মান আরও বৃদ্ধি পাবে। নমস্কারান্তে, ইতি—

—গৌরচন্দ্র মোদক, দক্ষিণপাড়া, পোঃ—রাণাঘাট, জেলা—নদীয়া।

মান্যবরেষু,

সম্পাদক মহাশয়, আপনার মাসিক বসুমতীর ৮৫৭ পৃষ্ঠায় পত্রিকার দাম বাড়ান উচিত কি অনুচিত জানিতে চাহিয়াছেন। সেই জন্য লিখিতেছি, দাম বাড়ান উচিত। এত বড় বই ১৷০ জায়গায় ১৷।০ হওয়া অনুচিত নয়। যদি বাড়ান ছ' মাসের চাঁদা দেওয়া হইয়া গিয়াছে, কবে থেকে বাড়াবেন। নমস্কার জানিবেন।

ইতি—বিনীতা তারকদাসী দেবী।

C/o, এ, ব্যানার্জী,

এ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার

পোঃ বিসাম কটক, জিঃ কোরাপুট

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

শ্রীমন্মথনাথ মায়া, উত্তরনারায়ণতলা, ডাক নাগগনখালি (ক্যানিং হয়ে) জেলা ২৪ পরগণা ***শ্রীবৈদ্যনাথ মণ্ডল কারকারিয়া, ডাক তারাপুর (রামপুরহাট হয়ে), জেলা বীরভূম*** হামিউদ্দীন আমেদ, গ্রাম কালিকাপুর, ডাক কালিয়াচক, জেলা মালদহ***শ্রীবিজয়কুমার চক্রবর্তী, জামুরিয়া ইরিগেশন ডিভিশন নং ২, ডাক বাকুলিয়া মিকির পাহাড, আসাম***ডাঃ এন বি ঘোষ, ডাক মানের, পাটনা***শ্রীবিজলী দাশগুপ্ত, রাণীবাজার, রাজস্থান।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ পাঠালাম। নিয়মিত প্রতি মাসে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ইন্দু টকিজ, কিষণগঞ্জ বাজার, পূর্ণিয়া।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা বাবদ ১৫৲ পাঠাইলাম। প্রতি মাসে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী তৃপ্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, কাটরা, ফতে মহম্মদ খাঁ, এটোয়া, ইউ, পি।

I am sending herewith the annual subscription of Rs. 15·oo for the Monthly Basumati. Please acknowledge. Superintendent, Sevayatan Silpa Vidyalaya. Po, Sevayatan. Dt, Midnapur.

Please acknowledge receipt of Rs. 15·oo towards the annual subscription of the Monthly Basumati. Kindly send the magazine. Dr. Bhola Nath Singha. Vill & Po, Paschimbazer, Balasore.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠান হইল। প্রতি মাসে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ডাক্তার মনোতোষ মুখোপাধ্যায়, গ্রাম—পাহাড়পুর, ডাকঘর—সুরে কালনা, জিলা—বর্ধমান।

Remitting the annual subscription of Rs. 15/- Please accept it and send the Monthly Basumati every month. The Headmaster. High School, Hiranpu, S. P.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। প্রতি মাসে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীনীলিমা মুখোপাধ্যায়, অবধায়ক—শ্রীভবানন্দ মুখোপাধ্যায়, ব্যাঙ্ক রোড, পাটনা।

I am sending Rs. 15/- (Rupees fifteen) only towards the subscription of the Monthly Basumati. Please send the magazine regularly. The Secretary, Rabindra Pathachakra, Chandanpur, Purulia.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা বাবদ ১৫৲ পাঠাইলাম. নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী অমিয়া চট্টোপাধ্যায়, ১১৯।এ, ফৈজাবাদ রোড, লক্ষ্ণৌ।

Sending herewith the annual subscription of Rs. 15/- for the Monthly Basumati. Kindly send the magazine every month. Sri M. K. Banerjee. C/o. A. O. A. Co. Ltd. Post Box No. 14/76, Raipur, (M. P.)

Herewith the annual subscription of Rs. 15/- for the Monthly magazine regularly, Mrs. Santi Lahiri. C/o. S. N. Lahiri. Dy. Commander Works Engineer, Dehradun. U. P.

বিদগ্ধ ও সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে বাঙলা দেশের সর্বজনপ্রিয় পত্রিকা মাসিক বসুমতীর যোগাযোগ যেন অবিচ্ছেদ্য। অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক-পাঠিকার সহযোগিতা ও আশীর্বাদধন্য মাসিক বসুমতী বর্তমানে ৪৪ বর্ষে পদার্পণ করেছে। গত কয়েক বছরের মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির দুর্দিনে প্রয়োজনীয় সকল কিছুর দাম উচ্চহারে বর্ধিত হয়েছে—কিন্তু আপনাদের অতি প্রিয় মাসিক বসুমতীর মূল্য (মুদ্রণব্যয় ও কাগজ, কালি ইত্যাদির দাম বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও) যথাপূর্ব রাখতে আমরা চেষ্টা করেছি।

মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, মাসিক বসুমতীর আকার বর্তমান সংখ্যা থেকে বৃহত্তর রূপ গ্রহণ করেছে। পত্রিকার আয়তন বৃদ্ধি হওয়ায় আমরা আশা করি, আরও অনেক ভাল লেখা ও ছবি পত্রিকায় যুক্ত হবে। পাঠক-পাঠিকা উপকৃত হবেন।

সম্প্রতি মাসিক বসুমতীর মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকার মতামত চাওয়া হয়। অত্যন্ত সুখের বিষয়, আমরা অগণিত পাঠক-পাঠিকার সমর্থন পেয়েছি। অনেকে পত্র-যোগে আমাদের এই প্রস্তাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মাসিক বসুমতীর আকার বৃহত্তর হওয়ার জন্য এবং বর্তমান মুদ্রণব্যয়, কাগজ, কালি ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধির কারণে আগামী সংখ্যা থেকে প্রতি খণ্ডের মূল্য এক টাকা পঁচিশ পয়সার পরিবর্তে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা ধার্য হবে!!

পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা ও এজেণ্টগণ অবহিত হোন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

★ বর্তমান সংখ্যা

থেকে

মাসিক

বসুমতীর

প্রতি খণ্ডের

★ মূল্য

এক টাকা পঁচিশ পয়সার

পরিবর্তে

★ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা

ধার্য হইল !!

বাংলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সর্বপ্রথম পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম সরকার কর্তৃক
প্রমোদকরমুক্ত ছবি—

সুবর্ণ জয়ন্তী সপ্তাহের পথে শ্রী - প্রাচী - ইন্দিরা ও অন্যান্য চিত্রগৃহে

বিদগ্ধ ও সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে বাঙলা দেশের সর্বজনপ্রিয় পত্রিকা মাসিক বসুমতীর যোগাযোগ যেন অবিচ্ছেদ্য। অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক-পাঠিকার সহযোগিতা ও আশীর্বাদধন্য মাসিক বসুমতী বর্তমান ৪৪ বর্ষে পদার্পণ করেছে। গত কয়েক বছরের মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির দুর্দিনে প্রয়োজনীয় সকল কিছুর দাম উচ্চহারে বর্ধিত হয়েছে—কিন্তু আপনাদের অতি প্রিয় মাসিক বসুমতীর মূল্য (মুদ্রণব্যয় ও কাগজ-কালি ইত্যাদির দাম বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও) যথাপূর্ব রাখতে আমরা চেষ্টা করেছি।

মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, মাসিক বসুমতীর আকার গত সংখ্যা থেকে বৃহত্তর রূপ গ্রহণ করেছে। পত্রিকার আয়তন বৃদ্ধি হওয়ায় আমরা আশা করি, আরও অনেক ভাল লেখা ও ছবি পত্রিকায় যুক্ত হবে। পাঠক-পাঠিকা উপকৃত হবেন।

সম্প্রতি মাসিক বসুমতীর মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকার মতামত চাওয়া হয়। অত্যন্ত সুখের বিষয়, আমরা অগণিত পাঠক-পাঠিকার সমর্থন পেয়েছি। অনেকে পত্র-যোগে আমাদের এই প্রস্তাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মাসিক বসুমতীর আকার বৃহত্তর হওয়ার জন্য এবং বর্তমান মুদ্রণব্যয়, কাগজ, কালি ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধির কারণে বর্তমান সংখ্যা থেকে প্রতি খণ্ডের মূল্য এক টাকা পঁচিশ পয়সার পরিবর্তে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা ধার্য হইল!!

পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা ও এজেন্টগণ অবহিত হোন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা-১২

(রেখাচিত্র)

গ্রাম্য কুটীর
—সুনীলমাধব চক্রবর্তী

৺সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত

। ৪৪ বর্ষ, অগ্রহায়ণ ১৩৭২ ॥ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড, ২য় সংখ্যা ।

মুক্তিলাভ

একটা কথা আছে—জপতপ কর কি, মরতে জানলে হয়। প্রভুর স্নেহপালিত যুবকদের অন্তরে কি জানি, এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, তাঁহার কৃপায় এবারের খেলায় তাহারা মুক্তিলাভ করিয়াছে, অর্থাৎ আর তাহাদের পুনরাবৃত্তি হইবে না।

অভয় বাণী

আলোক-আঁধার সংমিশ্রণে যদিও আত্মপরিচয় কহিয়াছেন এবং কৃপাপুরঃসর কহিয়াছেন যে, জানতে বা অজানতে, ভ্রান্তে বা অভ্রান্তে যে কেহ ব্যাকুল প্রাণে ভগবানকে ডেকেছে, তারাই এখানে আসবে। তথাপি প্রিয় নবাগণ নগদ বিদায় (আদর, পাইয়া নিশ্চিন্ত হইল, না, তাঁহার প্রকৃত ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে প্রয়াস পাইল। এই অভিপ্রায়ে ঠাকুর তাঁহার যুবক-সন্তানগণের মনোভাব পরীক্ষা করিতেন।

ভাব-পরীক্ষা

এই হেতু এক জনকে কহিতেছেন, "দ্যাখ্ এক সময় বামনী (ভৈরবী), বৈষ্ণব চরণ, ইন্দেশের গোরী পণ্ডিত, বর্ধমান-রাজার সভাপণ্ডিত পদ্মলোচন আমাকে অবতার বলেছিল। এখন গিরিশ, রাম, মনমোহনও আমাকে অবতার বলে; শুনে শুনে অবতারে ঘেন্না হয়ে গেছে। আচ্ছা, আমাকে তোর কি বোধ হয়?" সে বলিল, "যাহারা আপনাকে অবতার বলে, তাহারা ইতর।" ঠাকুর স্মিতমুখে কহিলেন, "ওরা সব অবতার ব'লে আমাকে কত বড় ক'রলে, আর তুই তাদের ছোটলোক বলছিস্?" যুবক, কহিল, "আমার ধারণায় অবতার পূর্ণ নহেন, অংশ মাত্র।" ঠাকুর কহিলেন, "ঠিক বলেছিস্। তবে তোর কি বোধ হয়?" সে জানাইল—"আপনি সাক্ষাৎ শিব, অংশ নহেন। কারণ, আপনার উপদেশমত তপংগুরু শিবের ধ্যান করিতে যাইলে, এক আধদিন নয়, বহুদিন ধরিয়া শিবের স্থানে আপনাকেই দেখিয়া দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, আপনিই সেই সত্যং শিবং সুন্দরং শিব।"

"তোর ভাবে তুই ঠিক, কিন্তু আমি তোর লোমের যোগ্য নই"—বলিয়া ঠাকুর উচ্চহাস্য করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর কি?

ঠাকুর বলিতেন, "কি জানি মহামায়ার প্রেরণায় আমি তোদের মধ্যে কতক শিব অংশ ও কতক বিষ্ণু অংশ ব'লে দেখি। পূর্ণ বিভোর হয়ে বলে, আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। আবার কালী ছোঁড়াটার ভাগ্য ভাল। সে দেখেছিল যত সব অবতার আমাতে লীন হয়ে গেল। তাই আমি তাকে বলি তোর বৈকুণ্ঠ দর্শন হয়ে গেল। ব্রহ্মজ্ঞানীরা অবতার মানে না; তারা বলে, আমি কৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা ও চৈতন্যের মত ঈশ্বর-প্রেমিক, কিন্তু বিজয় (গোস্বামিপ্রবর) বলেছিল—আপনি অবতারি—অর্থ আপনার হ'তে অবতারগণের উদ্ভব। উইলিয়াম নামক এক জন সাহেব আমাকে ঋষিকৃষ্ণ (যিশুখৃষ্ট) ব'লে ভজনা করেছিল। আর ঠাকুরবাড়ীর একজন পালোয়ান আমাকে 'মহাবীর' ব'লে পূজো করে কুস্তীতে জিতেছিল!" আবার কামারহাটীর মহাতপস্বিনী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী দেখিতেন, ঠাকুর গোপালরূপে তাহার গলা জড়াইয়া পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করিতেছেন। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে আসিলে সেই গোপালমূর্তি ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে বিলীন হইয়া যাইত। গৃহগমনকালে দেখিতেন, কোন দিন বালগোপাল বা কোন দিন বালকরূপী রামকৃষ্ণ তাঁহার ক্রোড়ে চাপিয়া যাইতেছেন; এই হেতু ঠাকুর তাঁহাকে আদর করিয়া "গোপালের মা" বলিতেন এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীও তাঁহাকে শ্বশ্রূঠাকুরাণীতুল্য শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন।

সংশয়-নিরসন

একটা মহাসংশয় আসিতে পারে; পারে কেন, আইসে যে, ইহারা ত সকলেই ত শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে শিব, নারায়ণ এবং অবতার বলিয়া দেখিল, কিন্তু ইহাদের জীবনস্রোত পূর্ববৎ রহিল, না উল্টা দিকে বহিল? ভক্ত কবি বলিয়াছেন—কৃষ্ণ দরশনের ফল কৃষ্ণ দরশন; ইহাদের তাহাই হইয়াছে। রাজনন্দিনী পাঞ্চালী যাজ্ঞসেনী বনবাস-ক্লেশে বেদনা জানাইলে, ধর্মরাজ কহেন—আমি ত ধর্মব্যবসায়ী নই যে, লাভালাভ বিচারপূর্বক ধর্মাচরণ করিব? শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রিতগণ সম্বন্ধে এই সদুত্তরটি প্রযোজ্য। প্রারব্ধ কর্ম বা ভগবৎ ইচ্ছায় জন্ম-মরণ-স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণতরীতে যাঁহারা চিরদিনের মত আশ্রয়সুখ লাভ করিয়াছেন, সেই অদৃষ্ট বা কর্মফলদাত্রী ইচ্ছাময়ীই জানেন—তাঁহাদের কি গতি হইবে? এই প্রসঙ্গে বিচারও আবশ্যক যে, অসংখ্য নরনারীর মধ্যে কেবল মুষ্টিমেয় কতিপয় ব্যক্তিই বা কেন প্রভুর পদাশ্রয় পাইল?

এই সংশয় নিরসন জন্য ধীমান্ শ্রীনরেন্দ্রনাথ বলেন যে, গতিশীল চক্রদ্বয়ের সংযোজক দণ্ডটিকে কোন শক্তিমান ব্যক্তি এক আঘাতে কর্তন করিলে, একখানি চক্র অমনি তথায় নিপতিত হয়। অপরখানি পূর্বগতি জন্য কিছুদূর যাইয়া তবে পড়িয়া যায়। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ও তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত ভাগ্যবান্‌গণের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ। অর্থাৎ প্রভুর কৃপায় তাঁহার আশ্রিতগণের ইহজন্মের কর্মফল নিঃশেষে দগ্ধ হওয়ায়, তাঁহাদের ভাবী জন্ম নিবৃত্তি পাইয়াছে। তবে সংস্কারজাত কর্মফল বর্তমান শরীরে ভোগ করিয়া দেহান্তে সদ্গতি লাভ করিবে—ইহা অনুমান নহে, ধ্রুব সত্য।

নিত্যলীলা

দক্ষিণেশ্বরে বিরাজকালে কি জানি কি ভাবে ঠাকুর এক দিন আপন মনে বলিতে থাকেন—এসে ঠেকেছি যে দায়, কব কায়, যার দায় সেই জানে, পর কি বুঝে পরের দায়। তার পর কহেন, এবার যাদের না হল, পরের বার হবে। তাতেও যাদের না হবে, তাদের অনেক দিন অপেক্ষা করতে হবে। ভাবে বুঝা গেল, প্রভু আবার আসবেন।

আর একদিন নহবৎখানার কাছে মেয়েদের স্নানের ঘাটের উপর বকুলতলায় দাঁড়াইয়া ভাবভরে ভক্তদের বলেন—তোমরাই সুখী, এলে, আনন্দ করলে ছুটি অর্থাৎ জগজ্জ্বালা হতে উদ্ধার পেলে। (আপনাকে দেখায়) এখানকার নিষ্কৃতি নাই, সরকারী লোক কি না, যখন যেখানে আবশ্যক, সেইখানেই যেতে হবে। ভাবসাম্যের পর ভক্ত-আগ্রহে—উত্তর-পশ্চিম কোণ দেখায়ে কহেন—ঐ দিকেই। তবে কত দিন পরে, তাহা বলেন নাই।

আবার এক দিন কোন কারণে শ্রীমাকে কহেন—পাছে কর্মবিপাকে অন্য গতি হয়, তাই ভক্তদের অন্তিমকালে আমি এসে, তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাব। শ্রীমার মুখে শুনিয়াছি। বড়ই করুণাপূর্ণ আশাপ্রদ বাণী!!! এইরূপ যাতায়াতে কত যে অসংখ্য জীবের মহৎ কল্যাণ হবে, তাহা ইয়ত্তার অতীত।

বোধ হয়, ভাব পরিস্ফুট-করণে, রামলীলা উপলক্ষ করিয়া, গল্পচ্ছলে নিত্যলীলাটি বুঝাইয়া দেন। বলছেন—ভগবান্ যখন নিত্য, তাঁর লীলাও নিত্য। তোদের সায়েন্সে (সায়েন্সে) না বলে—এক একটা নক্ষত্র এক একটা জগৎ—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড জননি তব-বিগ্রহং এই রকম অনন্ত জগতে অনন্তকাল ধ'রে তার লীলা হচ্ছে, ইহাই বালক রাম কাকভূষুণ্ডিকে দেখায়েছেন। গল্পটি এই—বালক রাম এক দিন আঙিনায় ব'সে খাবার খাচ্ছেন দেখে কাকভূষুণ্ডি মনে করিল, ইনিই কি সেই পূর্ণব্রহ্ম রাম? পরখ করবার ইচ্ছায় ছোঁ মেরে যেমন হাতের খাবার কেড়ে নিতে গেল, অমনই বালক রাম বাম হাত দিয়ে ধরতে গেলে, পালাবার জন্য উড়তে উড়তে একটা স্বর্গ (সৃষ্টি) ভেদ ক'রে দেখলে—সেখানে মহা-রাম, কিন্তু বালকরামের হাতটি তার পিঠের ওপর রয়েছে। এই রকম পর পর স্বর্গ ভেদ ক'রে দেখে—কোথায়ও রামচন্দ্র রাবণ বধ করচেন, আর কোথায়ও বা রাজা হয়েচেন, কিন্তু সকল স্বর্গেই দেখে যে সেই বালকরামের হাত তার পিঠের ওপর। পরাস্ত হয়ে যখন অহমিকা গেল, বুঝলে ইনিই সেই পূর্ণব্রহ্ম রাম। তখন জ্ঞান হলে, বালকরামকে প্রণাম ক'রে তাঁর প্রসাদ খেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেল। মূঢ় আমরা অনায়াস-লব্ধ পূর্ণব্রহ্ম প্রভুকে পাইয়া, পাছে তাঁর মহিমা অবধারণে অসমর্থ হই, তাই রামলীলা অবলম্বনে আপনারই নিত্যলীলা অর্থাৎ অসংখ্য জগতে অনন্ত কাল ধরিয়া যে শ্রীরামকৃষ্ণলীলা হইতেছে ও হইবে, ইহাই আমাদিগকে ইঙ্গিত করিলেন।

সমতা দান

প্রভু যদি প্রসন্ন হইয়া সেবাপরায়ণ প্রিয় ভৃত্যকে "তুমিতে আমাতে সমান" বলিয়া আপন আসনে উপবেশন করান, তাহাতে প্রভুর মহত্ত্ব এবং ভৃত্যেরও গৌরব প্রকাশ পায়; কিন্তু ভৃত্য যদি ধৃষ্টতাপ্রযুক্ত প্রভুর আসনে বসিতে যায়, তা হলে সে ধিক্কৃত ও তিরস্কৃত হয়। ঠাকুর ভাবিলেন—তাঁহার কার্যে সমাগত নরেন্দ্রনাথ যদি চিরদিনই নিম্ন পদবীতে থাকে, তবে ভাবী কালে তাঁহার স্বরূপ হইয়া লোকসমাজে কিরূপে মর্যাদা পাইবে? এই হেতু বোধ হয়, তাহাকে আপনসহ সমতা প্রদান মানসে এক দিন ভগবৎ-প্রসঙ্গে অর্ধ-বাহ্যদশায় উন্মত্ত ও উলঙ্গপ্রায় প্রভু তাহার জানুর উপর স্বীয় জানু দিয়া চাপিয়া বসিলেন। মণিকীটের (কাঁচপোকার) আক্রমণে তৈল-পায়ীর (আরশুলার) যেরূপ অবস্থা হয়, দেখিলাম—নরেন্দ্রনাথ ঠিক সেইমত। যেন প্রভুর পরশে আচ্ছন্নপ্রায়। উন্মত্ত প্রভু আপন হাতে তামাক খাইয়া, বলপূর্বক সেই হাতে নরেন্দ্র-নাথকে তামাক খাওয়ালেন। আবার সেই হাতেই যখন নিজে ধূমপানোদ্যত, শঙ্কিত ও শীর্ণপ্রায় নরেন্দ্রনাথ "কি করেন, কি করেন" বলিয়া বাধা দিতে যাইলে, জ্বলন্ত প্রভু ধমক দিয়া কহেন—হীনবুদ্ধি তুই বুঝিস না যে তোর শরীর আর আমার শরীর অভিন্ন। দুই-ই আমার শরীর। দেখিয়া আমি হতভম্ব! ঘটনাটি বৈকাল বেলায়, ঘরে আর কেহ ছিল না।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত হইতে

রবীন্দ্রনাথের সহচরবৃন্দ

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(২)

নেপালচন্দ্র রায় একটি অবিস্মরণীয় চরিত্র; ইনি প্রৌঢ়বয়সে আসেন শান্তিনিকেতনে, কিন্তু একেবারে একাত্ম হয়ে যান এর সঙ্গে। যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন, ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হন নি, কারণ তাঁদের বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের মাথার উপর অতি নিষ্ঠাবান সনাতনী পিতা বর্তমান ছিলেন। বি-এ পাশ করবার পর নিজ গ্রাম মূলঘরে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। সেই বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সম্বন্ধে একটি কাহিনী শুনেছিলাম; ছাত্ররা খুলনায় জেলা স্কুলে টেস্ট পরীক্ষা দিতে গিয়েছে; ছাত্রদের খুব কাছাকাছি বসতে দেখে স্থানীয় [illegible] পরিদর্শক আপত্তি করলে স্কুলের হেডমাস্টার বললেন, 'এ ছাত্ররা নেপাল রায়ের ছাত্র, কোনো অন্যায় হবে না এদের দ্বারা।'

একথা শুনে মনে হয় যেন মেগাস্থেনিসের ভারত কথা পড়ছি—লোকে দরজায় কুলুপ তালা লাগাতো না।

হিন্দু-মুসলমানকে সমভাবে দেখতেন বলে সনাতনীরা তাঁর উপর রুষ্ট হয় ও শেষকালে গ্রাম ত্যাগ করে কলকাতায় চলে আসতে বাধ্য হন। তারপর এলাহাবাদ যান শিক্ষকতার কাজ নিয়ে বাঙালীদের স্কুলে। স্বদেশী যুগের সময় তাঁর স্বাধীনচিন্তায় [illegible] প্রদেশের তৎকালীন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের চক্ষুশূল হয়ে উঠলেন। অবশেষে চব্বিশ ঘণ্টার নোটিসে শহর ত্যাগ করতে হয়েছিল। কলকাতায় এসে প্রৌঢ়বয়সে আইন পড়ে পাশ করলেন—ইচ্ছা স্বাধীনভাবে রাজনীতি করবেন। এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে ধরা পড়লেন; এখানকার অন্যতম শিক্ষক অজিতকুমার চক্রবর্তী অক্সফোর্ডে যাচ্ছেন ম্যানচেস্টার বৃত্তি পেয়ে, নেপালচন্দ্রকে আনা হলো—মাত্রিক ছাত্রদের তরিয়ে দেবার জন্য—কয়েক মাসের কড়ারে। সেই যে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন—আর তার মায়া কাটাতে পারলেন না।

রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন বললে যথেষ্ট বলা হয় না। কারণ রবীন্দ্রভক্তের মধ্যে সাহিত্যরসিকের অভাব ছিল না, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধর্মবিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ভগবৎভক্ত মানুষ কমই দেখা যায়। নেপালচন্দ্র রায় ছিলেন সেই মানুষ, যিনি সবাইকে আপনার করতে পারতেন। আমাদের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখে তাঁরমত দরদী বন্ধু দুটি ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সাংসারিক-বৈষয়িক, বিদ্যালয় [illegible]

অজিতকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র রায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—তিন বন্ধুর একটি সুন্দর ফটো আছে—এক ছত্রতলে তিনজন। রবীন্দ্রনাথের ছত্রতলে প্রথমে আসেন সতীশচন্দ্র, যার সম্বন্ধে কবি বলেছিলেন, 'আশ্রমের আদর্শের একটি জীবন্ত প্রতিমূর্তি।' আমি সতীশচন্দ্রকে দেখি নি—দেখেছিলাম খোয়াই-তীরে তাঁর চিতাক্ষেত্রের বিস্তারিত অঙ্গার রাশিমাত্র—আশ্রমবাসীর মধ্যে তাঁর স্মৃতি তখনো জীবন্তভাবে ছিল—বিশেষ করে অজিতকুমারের জন্য। তিনি বন্ধুর রচনা সংগ্রহ করে প্রকাশ করেন। একুশ বৎসর বয়সের এক যুবকের লেখা সংগ্রহ করলেন পঁচিশ বৎসরের আর এক যুবক।

আমি যখন অজিতকুমারকে দেখি তখন তিনি অবিবাহিত; তার মা থাকেন আশ্রমের একটি ঘরে—'নূতন বাড়ি'র পিছনে। বিবাহ করে নূতন বাড়ির একটি ঘরে এসেই ওঠেন। একটি বাড়িতে আমরা তিন-চারটি পরিবার থাকতাম—সে তো 'বাসা' নয়, যেন একান্নবর্তী পরিবার। সবাই সবার হেঁসেলের খবর রাখতেন, অর্থাৎ যাঁর বাড়িতে যেটা নূতন রান্না হতো সেটার স্বাদ সবাই পেতাম। বাড়ন্ত হলেও অজ্ঞাত থাকতো না।

দেখতাম একটা ঘর—যার মধ্যে একটা ছোট টেবিল ও একখানা চেয়ার ছাড়া অন্য [illegible]

দিকের একটি গবাক্ষ দিয়ে যে ঘরে আলো প্রবেশ করে, সেখানে অজিতকুমার বসে পড়েন, লিখছেন, অন্ধকার হয়ে গেছে—ছোট লণ্ঠন জ্বালিয়ে কাজ করে চলেছেন। সে রকম দরিদ্র পরিবেশের মধ্যে বাস করে লেখাপড়ার কথা আজ বিশ্বভারতীতে কেউ কল্পনা করতে পারেন না।

অজিতকুমার অতি [illegible] ছিলেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত [illegible] গেয়ে গাইতেন; একটি [illegible] ছিল— তা বাজাতে বাজাতে গানের পর গান গেয়ে যেতেন— শোনাবার জন্য নয়, গানের রসের মধ্যে ডুবে অন্তরে [illegible]।

অজিতকুমার ইংরেজী পড়াতেন কিন্তু কেবল ভাষা শেখাতেন না,—ভাবের রাজ্যে নিয়ে যেতেন ছাত্রদের। পনেরো বৎসরের ছেলেদের মধ্যে সাহিত্য পড়বার উৎসাহ সৃষ্টি করে দিতেন। আজকাল কোনো শিক্ষক কল্পনা করতে পারেন না যে স্কুলের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক পড়িয়ে দেবার বাইরে শেক্সপীয়রের নাটক পড়িয়ে শোনানো সম্ভব হতো বাংলায় ব্যাখ্যা করে। এমার্সনের প্রবন্ধ পড়িয়ে দিচ্ছেন। আমি অজিতকুমারের ক্লাসে যেতাম; তাঁরই প্রেরণায় কত বই যে পড়েছিলাম বলতে পারি নে। ম্যাট্রিকের একটি ছেলেকে দিয়ে ফ্রেডারিক হ্যারিসনের মি নিং অব হিসট্রি থেকে প্রবন্ধ সংকলন করালেন।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দশম বৎসরে অজিতকুমার 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম' নাম দিয়ে যে পুস্তিকা লিখেছিলেন, তা আজও পড়বার মতো, কারণ আজ-যে বিশ্বভারতী বহু বিদ্যার শাখা-প্রশাখায় পল্লবিত হয়ে উঠেছে, তা কল্পনায় দেখা হয়েছিল অজিতকুমারের লেখনীতে। আজ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে অগণিত প্রবন্ধ, গ্রন্থ রচিত হচ্ছে, কিন্তু সে যুগে রবীন্দ্রনাথকে যে শ্রদ্ধার সঙ্গে জানতে হবে, তাঁর কথা বুঝতে হবে—এসব ভাবনার উদয় হয় নি। অজিতকুমার কবির পঞ্চাশৎ জন্মবর্ষ উপলক্ষে (১৯১১) যে প্রবন্ধটি লিখেছিলেন, তা আজও পড়লে পাঠকরা উপকৃত হবেন—হয় তো তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মিলবে না, কিন্তু তাঁর মনস্বিতার পরিচয় পাবেন। অজিতকুমার মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে মারা যান—১৯১৮ সালের বিশ্বব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে।

রবীন্দ্রনাথের কাজে যাঁরা সহায়তা করতে এসেছিলেন এবং যাঁদের প্রভাবস্পর্শ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যে ও জীবনে রেখাঙ্কিত করেছিল, তাঁদের মধ্যে ক্ষিতিমোহন সেন, বিধুশেখর ভট্টাচার্য ও নন্দলাল বসুর নাম অমর হয়ে আছে—শান্তিনিকেতনের সীমানার বাইরেও বিধুশেখর প্রথমে আসেন কাশী থেকে—একেবারে 'টোলো' পণ্ডিত। রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও প্রেরণায় পালিভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়নে ও অনুবাদে মন দেন, তাঁরই সহযোগিতায় 'বিশ্বভারতী'র জন্ম হয়।

বিধুশেখর সম্বন্ধে আমার নিজ অভিজ্ঞতার কথা কয়েকটি বলি। তখন কলকাতায় পড়ি ন্যাশনাল কলেজে—পালি পড়তে আরম্ভ করেছি চট্টগ্রামের বৌদ্ধ ভিক্ষু পুন্নানন্দের কাছে। বাংলা হরফে চারুচন্দ্র বসুর 'ধম্মপদ' ছাড়া বই নেই; আমরা সিংহলী অক্ষর শিখে পালি বই পড়ি। ভিক্ষু অধ্যাপকের কাছে শুনলাম শান্তিনিকেতনের বিধুশেখর শাস্ত্রী নামে এক পণ্ডিত মিলিন্দপঞ্হো বাংলা হরফে অনুবাদসহ বের করেছেন। শুনে সেইদিন বিকালে কলেজ স্ট্রীটে সান্যাল কোং-র দোকান থেকে প্রথম খণ্ড কিনে এনে পড়তে আরম্ভ করে দিই।

তারপর সেবার (১৯০৯) বৈশাখী নববর্ষের দিন বোলপুর যাই বেড়াতে। সেখানে দেখলাম এই জ্ঞান-তাপসকে লাইব্রেরীর একটি ঘরের মধ্যে দিনের বেলা পড়তে; রাতের বেলায় শুতে। ঘরের মধ্যে চারদিকে বই-এর শেলফ মাঝখানে দুটো চৌকী—সেখানে ছোট বাপ মরা ভাইপোকে নিয়ে তিনি থাকেন রাতে। তার ঘরে ঢুকে বই ঘেঁটে দিন গেল। তারপর কত দীর্ঘকাল একত্র কাজ করেছি, পড়েছি তাঁর কাছে—এখনো সেই নোটস রয়েছে—হঠাৎ পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে পেলাম সেদিন। আমার এক পরমাত্মীয়া শাস্ত্রী মশায়ের ক্লাসের ছাত্রী ছিলেন; এক দর্শন-তত্ত্ববাগীশের কন্যা বলে তাঁর দার্শনিক-তত্ত্ব বুঝবার শক্তিটা একটু বেশি ছিল বলে শাস্ত্রী মশায় তাঁকে খুব স্নেহ করতেন, তাঁকে দিয়ে দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিয়েছিলেন—পুরাতন শান্তিনিকেতন পত্রিকায় সেটি আছে। বৃদ্ধ বয়সে শেষবারের মতো যখন আসেন শান্তিনিকেতনে তাঁর 'ছাত্রী' দেখা করতে গেলে কী খুসি হলেন। মনে আছে, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রের অন্নপ্রাশনে তিনি পৌরোহিত্য করেন, অথচ তিনি জানতেন যে আমাদের 'জাত' নেই; কোন দ্বিধা ছিল না মনে।

বিধুশেখর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন, কারও হাতে এমন কি কারোও রান্নাও খেতেন না; স্বপাক ছিলেন। এক ভৃত্য উনোন ধরিয়ে দিতো। সকালের পড়াশুনা শেষ করে রান্না করতেন আতপ চালের ভাত, মুগের ডাল আনাজ দেওয়া এক তরকারি। অবশ্য তার সঙ্গে গব্যঘৃত (যা তখন পাওয়া যেতো) অকৃপণভাবে বর্ষিত হতো। অত্যন্ত লোভনীয় সেই খাদ্যের প্রতি আমাদের অনেকেরই লোভ ছিল— তাই মাঝে মাঝে আমরাও 'নিমন্ত্রণ' আদায় করে ভাগ বসাতাম। নিজে নিষ্ঠাবান কিন্তু আমার মতো ম্লেচ্ছকেও তাঁর ঘরে বসে খেতে দিতে বাধতো না। বিধুশেখর যথার্থ জ্ঞান-সাধক ছিলেন; কেউ কিছু জানবার জন্য উপস্থিত হলে, তিনি তাঁকে তাঁর ঝুড়ি ঝেড়ে দান করে দিতেন—ওস্তাদের মারের লাঠি লুকিয়ে রাখতেন না। তাঁর কাছে গেছি কতবার কতরকমের প্রশ্ন নিয়ে—নিরাকরণ করে দিতেন। আর অন্যকে কাজে লাগিয়ে দিতে পারলে ভারি খুসি হতেন; বিশ্বভারতী পর্বে তাঁর কাছে পড়ে অনেকে গবেষণা পদ্ধতি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হন,—সে-ইতিহাস বলতে গেলে পুঁথি বেড়ে যাবে; ব্যক্তিগত কথা সব এসে পড়বে।

ক্ষিতিমোহনবাবু ছিলেন সকলের 'ঠাকুর্দা', এ নামটি তিনি কাশীতে যৌবনকালেই অর্জন করেছিলেন; কারণ জ্ঞানের সঙ্গে রসের আশ্চর্য সমন্বয় ছিল তাঁর জীবনে বাক্যে ভাষণে। গল্প বলে, শব্দের Pun করে শ্রোতাদের হাসাবার যে শক্তি ছিল 'ঠাকুর্দার' তার জুড়ি দেখিনে আর। গভীর তত্ত্বকথা শুনতাম বিকালে যখন বেড়াতে যেতাম তাঁর সঙ্গে, ভারতের চিন্ময় রূপের চিত্র তাঁর কাছ থেকেই প্রথম পেয়েছিলাম। 'ব্রাহ্ম' না হয়েও তিনি ব্রহ্মবাদী ছিলেন এবং কখনো কোনো পৌত্তলিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতেন না, নিজের ছেলেমেয়েদের বিবাহের আচার-অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ অ-পৌত্তলিক—তার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল—তার বাইরে যেতে পারেন নি।

[আগামী সংখ্যায় সমাপ্য]

শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ

এক সময় মানব সমাজ পশুর ন্যায় স্বেচ্ছাচারী ছিল। বিবাহ এল পরে। কিন্তু তাও প্রতিষ্ঠিত হতে বহুকাল অতিবাহিত হয়েছিল। মানুষ যখন গোষ্ঠিবদ্ধ হয়ে সমাজে বাস করছিল—তখনকার সেই আদিম অবস্থায় নরনারী নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তি গণ বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। কেউ কারুর একার সম্পত্তি ছিল না। এবার অধিকারে আনতে গেলে নিজের গোষ্ঠী থেকে আনা যেত না, অন্য গোষ্ঠী থেকে আনতে হত। তাই সমাজের আদিম অবস্থায় বিয়ে করতে গেলে ভিন্ন গোষ্ঠী বা গণ ছাড়া উপায় ছিল না। সুতরাং বলপ্রয়োগ করে, হয়তো গোষ্ঠীর সকলের সাহায্য নিয়েই ভিন্ন গোষ্ঠী থেকে কন্যা সংগ্রহ করে ব্যক্তিগত অধিকারে আনা হত। এতে গোষ্ঠীর অন্যের কারুর দাবী-দাওয়া ছিল না। একে রাক্ষস বিবাহ বলা হত। রাক্ষস বিবাহই হল বিবাহের আদি। বিবাহের ইতিহাস আমি শোনাতে চাচ্ছি না, তারা কেমন করে রাক্ষস বিয়ে করত, কেমন করে গান্ধর্ব বিয়ে, আসুর বিয়ে হত, তারপর ব্রাহ্ম, দৈব আর্য, প্রাজাপত্য এল, কেমন করে সমাজের পরিবর্তন, গণ, গোত্র, জাতিতে বিভক্ত হল। গোষ্ঠী ভেঙ্গে পরিবার হল—তার ইতিহাসও আমি জানাতে বসি নি। একদিন শ্বেতকেতু বাপ-মায়ের কাছে বসে আছেন, এমন সময় এক ব্রাহ্মণ তার জননীর হাত ধরে বলপ্রকাশ করে তাকে নিয়ে গেলেন। এতে শ্বেতকেতু ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন, কিন্তু পিতা উদ্দালক তাকে শান্ত করে বললেন, এতে ক্রোধের কোন কারণ নেই। কেন না, অতি প্রাচীন কাল থেকেই এই ধর্ম চলে আসছে।

শ্বেতকেতু কিন্তু সন্তুষ্ট হলেন না। তিনি বাপ-পিতামহের ধর্ম মানলেন না। বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। তিনি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের মধ্যেই সামাজিক সীমা নির্দেশ করে দিলেন। এ কাহিনী মহাভারতের। এর পর মনু, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর এমন কি স্মার্ত রঘুনন্দন প্রভৃতি কেমন করে আদিম বিশৃংখল সমাজের স্বেচ্ছাচারকে যুগে যুগে নিয়মের দ্বারা বশীভূত করে বর্তমান বিবাহের আদর্শ রূপ গড়ে তোলার ব্যবস্থা দিয়েছেন—তার ক্রমিক ইতিহাস দেওয়ার উদ্দেশ্যও আমার নয়। আধুনিককালে নানা উপজাতি, জাতি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে নানা জনের লেখার মধ্যে থেকে, নানা লোকের কাছ থেকে [illegible] করে এখানে সেই প্রথাগুলির কিছু কিছু বর্ণনা দিচ্ছি। এইসব বিয়েতে যে কত বৈচিত্র্য আছে তা বিশেষ করে উপলব্ধির বিষয়।

আসামে নাগাদের মধ্যে নানা শাখা আছে, তার মধ্যে অঙ্গামি নাগাদের মেয়েদের স্বামী নির্বাচনে বেশ স্বাধীনতা আছে। তাদের অমতে কিছুতেই বিয়ে হতে পারে না। অবিবাহিত অবস্থায় এরা বিবাহযোগ্য স্বশ্রেণীর যুবকদের সঙ্গে প্রণয় করতে পারে। কিন্তু এক গোত্রের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ। কোন অঙ্গামি তরুণ কোন তরুণীকে বিয়ে করতে ইচ্ছা করলে তার অভিপ্রায় প্রথমে নিজের বাপ বা অভিভাবককে জানাতে হয়। পাত্রের পিতা কন্যার পিতার সঙ্গে আলোচনা করে তার মতামত তখনই জানিয়ে দেয়। পাত্রপক্ষ তখন এখানে বিয়ে হবে কি না দৈব উপায়ে জানতে চেষ্টা করে। এই উদ্দেশ্যে এরা একটা মোরগের গলায় ফাঁস মারে। মরবার সময় মোরগটি যে দিকে পা ছোড়ে সেই দিকে বিয়ে হবে বলে এদের ধারণা। সুতরাং উদ্দিষ্ট পাত্রীর বাড়ীর দিকে মোরগের ইঙ্গিত হলে তা পাত্রীকে জানানো হয়। সম্মতি থাকলে বিয়ে স্থির হয় এবং পাত্রীর বাড়ীতে নিত্য ভোজ হয়। সন্ধ্যার সময় পাত্রী মনোনীত পাত্রের বাড়ীতে চলে যায় ও রাত্রিবাস করে। পাত্র কিন্তু পাত্রীর সঙ্গে রাত্রিবাস না করে ভদ্রভাবে নৈশ আড্ডায় বের হয়। দু-তিন দিনের মধ্যে পাত্রী কোনরূপ অশুভ স্বপ্ন দেখলে বিয়ে হয় না। এরূপ আট-নয় দিন কাটিয়ে পুরোহিত ডেকে বিয়ে হয়। বিয়ের উৎসবের সময় এরা এক বিচিত্র সাজগোজ করে। পুরুষেরা জমকালো উষ্ণীষাদি পরে, মেয়েরা ফুল ধারণ করতে লজ্জা পায়, কারণ মেয়েদের ফুল দিতে পারে একমাত্র তাদের প্রেমিকরাই। সেখানে তারা বৃত্তাকারে নাচতে ও গাইতে থাকে।

অও শাখার নাগাদের পুরুষদের ২৫ বছরের মধ্যে ও মেয়েদের ১৫-২০ বছরের মধ্যে বিয়ে হয়। বিয়ের আগে অও পুরুষ কুমারী বালিকার শয়নগৃহে কিছুদিন যাতায়াত করে। তারপর তার বাপ-মা বা অভিভাবকদের উৎসাহ পেলে সে বিয়ের প্রস্তাব করে। বিয়ের সময় বরকে কিছু মূল্য দিতে [illegible]

করতে পায় না। সে অপর কয়েকটি কুমারী বালিকার সঙ্গে একটি বৃদ্ধাকে অভিভাবিকা ক[illegible] স্বতন্ত্র বাড়িতে বাস করে। লোথাদের অবিবাহি[ত] যুবকরা এই কুমারীদের কুটিরে রাত্রে তাদে[র] সঙ্গে মেলামেশা করে। বালিকারা কিন্তু স্বগোত্র পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করে না। সে সংসর্গের ফলে যদি কুমারী গর্ভবতী হয়—তবে তা[র] সঙ্গে বিয়ে হয়। এই বিয়েকে তারা 'চিকি-বিয়ে' বলে। এটি গান্ধর্ব বিয়ে।

টিপারা জাতির মধ্যে সাধারণ[ত] দু'রকমের বিয়ের প্রচলন আছে—অনুরাগবশত বিয়ে আর অভিভাবক মনোনীত বিয়ে। স্বেচ্ছা বিয়েতে কোন পুরোহিতের দরকার হয় না কেবল বর ও কন্যা পক্ষ হতে একটা ভোজ দেওয়া হয়। এই বিয়ে 'হিকনানানী' বিয়ে পিতামাতার মনোনীত বিয়েতে বরকে বিয়ে[র] আগে কনের বাড়ীতে একবছর বাস করতে হয় ও তাদের সংসারের যাবতীয় কাজ করতে হয়। যদি এই সময়ের মধ্যে বরের কার্যদক্ষতা ও সচ্চরিত্রতা প্রকাশ পায় ও বর-কন্যা উভয়ের সম্মতি থাকে তবেই নির্দিষ্ট দিনে বিয়ে হয়। আর অসম্মতি থাকলে কন্যার পিতা পাত্রকে উক্ত সময়ের জন্য কিছু পারিশ্রমিক দিয়ে বিদায় দেয়।

বিবাহানুষ্ঠানে দুটি বাঁশ পুঁতে তার ওপর একটা বাঁশ রাখা হয় ও দুটি বাঁশের চোঙের ওপর একটিতে মদ ও অপরটিতে জল রাখা হয়। তারপর 'লামপ্রা' নামে এক দেবতার পুজো করা হয়। পুজোয় মোরগ ও হাঁস বলি দেওয়া হয়। তারপর পুরোহিত চোঙার রাখা জল বর-কনের মাথায় ছিটিয়ে দেয়। এরপর বরের কোলে কনে বসে ও একপাত্র মদের অর্ধেক কনে পান করে বাকী অর্ধেক বরকে পান করতে দেয়। বর সেই অর্ধাংশ পান করলেই সিঁদুর পরান হয় ও বিয়েও শেষ হয়। এরপর উপস্থিতদের মধ্যে ভোজ ও মদ্যপান হয়।

ত্রিপুরার জমাতিয়া জাতির বিয়ে টিপারা জাতির মত। তবে বিয়ের পর বরকে দু বছর শ্বশুরের ঘরে থাকতে হয়। তবে বর ইচ্ছা করলে কনেকে নিয়ে যেতে পারে। কিছুটা তাতে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়।

দার্জিলিং-এ নেওয়ার নামে এক পাহাড়ী জাত আছে। এদের এক সংস্কার [illegible]

বিলুফলের সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া হয় ও তার পর তাকে কয়েকদিন ঘরে আবদ্ধ রাখা হয়। পাছে মেয়ে একা থাকতে ভয় পায় তাই অপর কয়েকটি মেয়েরও ঐরূপ বিলুফলের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে একসঙ্গে রাখে। বিলুফলের সঙ্গে বিয়ের শেষে ফলটি নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। এদের বিশ্বাস যে ঐ ফল নদীতে অনন্তকাল জীবিত থাকবে—আর কন্যারা চিরকাল সধবা থাকবে। এরা অধিকাংশ সময় কন্যার নির্বাচিত সৎপাত্রের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে থাকে।

ত্রিপুরার **কুকী** জাতির বিবাহ পিতা-মাতার মনোনীত বা পরস্পর আলাপজনিত মনোনয়নে হয়। উভয় বিবাহ পিতামাতার সম্মতিতে হয়। বিয়েতে কন্যাপণ দিতে হয়। তবে পাত্রপক্ষ দিতে অসমর্থ হলে চার পাঁচ বছরে পরিশোধ করতে হয়। এতে বিয়ে আটকায় না। এদের বিয়েতে কোন মন্ত্রপাঠ হয় না। বিয়ের দিন কন্যার বাড়ীতে উভয়পক্ষের আত্মীয়-স্বজন সম্মিলিত হলে কন্যাকে বিবাহানুষ্ঠান স্থানে নিয়ে আসা হয়। বর ও কন্যা পরস্পর মুখোমুখি বসে। তাদের মাঝখানে এক কলসী মদ দেওয়া হয়। বর ও কন্যা উভয়েই দুটি নলের সাহায্যে উক্ত কলসী থেকে মদ পান করে এমন সময় এক বৃদ্ধ এসে বর ও কন্যার কেশগুচ্ছ একসঙ্গে বেঁধে দেয়। মদ পান করা শেষ হলে বর-কন্যার সমবয়স্করা এসে চুলের বাঁধন খুলে দেয় ও তাদের সঙ্গে মদ খেতে শুরু করে। এই হল বিবাহানুষ্ঠান। বিয়ের পরদিন বাসরশয্যা। এই দিনে বরপক্ষ থেকে কন্যাকে যৌতুকস্বরূপ নগদ টাকা ও অলঙ্কার দিতে হয়। যদি কোন কারণে যৌতুক দিতে দেরী হয় দু-একদিন পরে বাসর শয্যা হয়।

দার্জিলিং-এর পাহাড়িয়া লেপচা জাতিদের সাধারণত যৌবন বিয়ে হয়। অনুরাগবশতও হতে পারে। তবে কৌশলে অভিভাবকদের জানাতে হয়। অভিভাবক ও আত্মীয়গণের সম্মতি অনুসারে বিয়ে হয়। কন্যা পছন্দ করবার জন্য মেয়ে দেখা'র রেওয়াজ এদের মধ্যে নেই—তবে বরপক্ষ গোপনে কন্যাকে দেখে এবং সম্বন্ধ ঠিক করে। কন্যা দেখারও কোনও অসুবিধা নেই। কারণ এদের মধ্যে অবগুণ্ঠন প্রথা নেই। এদের মধ্যে কন্যাপণ আছে, বিয়ের দিনস্থির হলে বরপক্ষ কন্যার গৃহে যায়। বিবাহানুষ্ঠানে এক লামাও উপস্থিত থাকে। বরপক্ষ এই সময়ে কন্যাকে কিছু অর্থ ও লামার সামনে যৌতুক দেয় বর নিজে কনেকে একটা রেশমের রুমাল উপহার দেয়। আত্মীয়-স্বজন ও লামা কন্যাকে স্বামী-স্ত্রী বলে ঘোষণা করে। ঘোষণার পর ভোজ হয়। ভোজের খরচ পাত্রপক্ষের। কন্যার বিয়েতে কন্যাপক্ষের বিশেষ কিছুই খরচ হয় না।

নেপাল ও দার্জিলিং-এর পাহাড়ে কিরাত জাতিরা লিম্বু ও রাই নামে পরিচিত, বাল্য-বিয়ে অপেক্ষা এদের মধ্যে যৌবন বিয়ে, অধিক প্রচলিত। পূর্বকালে এদের একটা বিয়ের নিয়ম ছিল। কোন লিম্বু যুবক কোন লিম্বু যুবতীর সঙ্গে দেখা হলে তাকে তৎক্ষণাৎ সঙ্গীত যুদ্ধে আহ্বান করত। সঙ্গীত যুদ্ধে যুবতীকে পরাজিত করে তাকে বিবাহার্থে নিজের ঘরে বন্দী করে আনত। এখন সঙ্গীত যুদ্ধ লোপ পেয়েছে। তবে কখন বা প্রেম ছলনায় তাকে মুগ্ধ করে নিজের বাড়ীতে নিয়ে আসে। তারপর বিবাহানুষ্ঠান হয়। তখন বিয়েবাড়ী বরের আত্মীয়-স্বজনে পূর্ণ হয়। বর বাজনা বাজাতে থাকে আর কনে বাজনার তালে তালে নাচতে থাকে। অন্যান্য যুবক-যুবতীরাও এর সঙ্গে যোগ দেয়। নাচগান শেষ হলে পুরোহিত মন্ত্র পড়তে থাকে। বর ও কনে উভয়ে তখন একটা মোরগ ও একটা মুরগী হাতে নিয়ে ধরে থাকে। পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করতে করতে ঐ মোরগ ও মুরগীর গলা ছেদন করে সেই রক্ত একটা কলাপাতায় ধরে। এটা নাকি নবদম্পতীর শুভাশুভ নির্ণয় করে। তারপর বর কনের মাথায় সিঁদুর দেয়। এরপর আত্মীয়-স্বজনের ভোজের উৎসব চলে। ভোজে শূকর, মদ, ভাত ও পিঠে থাকে। ভোজের পর অশরীরী আত্মাকে আহ্বান করে তাদের আশীর্বাদ নেওয়ার রীতি আছে। কোন কোন স্থানে গ্রহ-শান্তিরও ব্যবস্থা আছে। এসব হয়ে গেলে কয়েকদিন পরে কনেকে বাপের বাড়ীতে দেওয়া হয়। কয়েকদিন পরে ঘটক রূপোর টাকা, মদ, শূকর প্রভৃতি উপঢৌকন নিয়ে যায়। কন্যার বাপ বা অভিভাবক তখন ক্রোধের ভাণ করে ঘটককে মারতে আসে। ঘটক কৌশলে তার রাগ থামিয়ে দেয়। উপঢৌকন ও পাত্রীপণ দিয়ে কনে নিয়ে আসে। তারপর বর ও কনে একসঙ্গে শ্বশুরবাড়ীতে যায় ও কয়েকদিন থাকে।

বীরভূম জেলায় কোড়া জাতের বাস। কোড়াদের কন্যাপণ আছে। এদের বাল্য-বিবাহ হয়। বিয়ের দিন বরের ডান হাতের কড়ে আঙ্গুলের নখ ও কনের বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলের নখ ছাড়া সব নখ কাটা হয়। যেখানে বিয়ে হয় সেখানে ৫টা আমের সঙ্গে ৫টা কলসী রাখা হয়। বর ও কনে আসামাত্র ঐ কলসী থেকে জল নিয়ে সকলের মাথায় ছিটিয়ে দেওয়া হয়। ঐ কলসীর জলকে 'হামানি' বলে। তারপর বরকে আসন দেওয়া হয় ও ... নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর বর-কনেকে একটা কাপড় দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়। এদের পুরোহিত আছে—প্রায়ই হিন্দুস্থানী হয়। পরামানিক এসে বরের ডান হাতের ও কনের বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুল নরুণ দিয়ে একটু চিরে দেয় যাতে দু-এক ফোঁটা রক্ত পড়ে। ঐ রক্তে কয়েকটি আতপ চাল ভিজিয়ে নেওয়া হয়। তারপর মেয়ের বাপ ঐ চাল দিয়ে মেয়ে-জামাইকে আশীর্বাদ করে। এরপর বরকে কিছু তৈজস-পত্র দান করা হয়। তারপর বর কনের কপালে সিঁদুর লাগিয়ে দিয়ে ঘোমটা টেনে দেয়। এরপরে মদ আর ভোজন চলে।

ভুঁইমালিদের বিয়েতে বর ও কনে উভয় উভয়ের বাপের কোলেতে বসে। তারপর কনে বরের কোলে ও বর কনের কোলে এরূপ পাঁচবার কোল বদল করে। এরপর বরের ভাগিনেয় বরের ও কনের ডান হাতের কড়ে আঙুলের ওপর দিক চিরে দিয়ে দু'-এক ফোঁটা রক্ত বার করে। একটা পাটের সুতোয় সেই রক্ত মাখিয়ে সুতোটি গোল করে মুড়ে কনের হাতে দেয়। তখন কনে ঐ সুতোর গুটিটি কেড়ে নিতে চেষ্টা করে। কনের সাফল্য বিবাহে শুভসূচনা করে। এরপর সিঁদুর দেওয়া হয়। পুরোহিত ও পঞ্চায়েৎগণ বিয়ের সভায় উপস্থিত থাকে। নাচ-গান আমোদ-প্রমোদ শেষ হয়।

ধাঙ্গড়দের বাল্য-বিবাহই হয়। বিয়েতে কন্যাপক্ষকে অন্তত সাড়ে সাত টাকা মেয়ের বাপকে দিতে হয়। বরপক্ষকেও রূপোর ও পেতলের গহনা কনেকে দিতে হয়। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই বরযাত্রা যায়। কন্যাপক্ষের কর্তাই পুরোহিতের কাজ করে। এদের আলাদা পুরুত নেই। বিয়ের দিন কনের বাড়ীতে বর এলে কোন কোন ক্ষেত্রে, বিশেষত বীরভূম জেলায় বিয়ের সময় বর গাছের ওপর চড়ে থাকে। সহজে নামতে চায় না। নামবার জন্য অনেক অনুনয় করবার পর কনে গিয়ে গাছের নীচে দাঁড়িয়ে তাদের ভাষায় গানের কলিতে বরকে ডাকে। তার অর্থ—'বর, গাছ থেকে নাম তুমি, মাটি কেটে খাওয়াব আমি।' কনের ডাক শুনে বর তখন গাছ থেকে নামে। তারপর কয়েকটি অনুষ্ঠানের পর মালাবদল করে বিয়ে শেষ হয়। বিয়ের সময় মাদলের বাজনা ও গান হয়।

দার্জিলিং-এর মালপাহাড়িয়াদের বিয়ে খুব সংক্ষিপ্ত। বিয়ের আসনে বর ও কনে সামনা-সামনি বসে। পুরোহিত বরের হাতের ওপর কনের হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করায় যে পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসবে। দুজনে স্বীকার করলে সিঁদুর দেওয়া হয়। বিয়েতে ...

একটি পৃথক ঘরে বর ও কনেকে একপাত্রে খেতে দেওয়া হয়।

দ্রাবিড় শাখার অগরিয়াদের বিয়েতে পাত্র বা পাত্রীর মতামতের কোন মূল্য নেই। পাঁচ থেকে দশ বছরের মধ্যে মেয়ের বিয়ে হয়। সম্বন্ধ স্থির হয়ে গেলে পর পাত্রের পিতা কন্যার পিতাকে ২০ টাকা ও ১ জোড়া ধুতি পাঠিয়ে দেয়। ঐ টাকায় সামাজিক ভোজ হয়। বিয়ের দিন বরযাত্রীদের ভোজ দেওয়ার নিয়ম নেই। ঐদিন কনেকে কোন গুপ্ত-স্থানে লুকিয়ে রাখা হয়। পরদিন সকালে বর তার বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কনেকে গুপ্তস্থান থেকে জোর করে বের করে এনে উঠানে নিয়ে আসে। সেইখানেই বিয়ের আসর বসে।

মহীশূর রাজ্যে অগস এক রজক জাতি। বরের পক্ষ থেকে প্রথমে বিয়ের কথাবার্তা হয়। বরের পিতা আত্মীয়-স্বজন সঙ্গে কনের বাড়ীতে এসে বলে—'আমরা তোমার বাড়ীতে ঘি-ভাত খেতে এসেছি।' এতে কনের বাপ একটা ভোজ দেয়। ভোজের পর বিয়ের কথাবার্তা হয়। কন্যার পিতা সম্মত হলে সুপারি বিনিময় করে বিয়ের দিনস্থির হয়। পাত্র বা পাত্রীর যে-কোন পক্ষের বাড়ীতে বিয়ে হতে পারে। বিয়ের আগের দিন বরপক্ষ গ্রামের বাইরে উপস্থিত হলে কন্যাপক্ষ তাদের অভ্যর্থনা করে স্বতন্ত্র বাড়ীতে নিয়ে আসে। বারটি স্তম্ভের ওপর এদের বিয়ের মণ্ডপ হয়। বিবাহ-মণ্ডপের উত্তর-পূর্ব কোণে অশ্বত্থের শাখা পোঁতা হয়। বিবাহ-মণ্ডপ চূর্ণ ও শস্যদানের সাহায্যে চিত্রিত করা হয়। মেয়েরা কুমোর বাড়ী থেকে চিত্রিত ঘট আনে। মাটিতে কাপড় পাতা থাকে। মেয়েরা তার ওপর দিয়ে হেঁটে গিয়ে বিয়ের জন্য জল আনে। বর ও কনে দেব-মন্দিরে গিয়ে মালা পুজো করে আসে। বিয়ের দিন দেবমন্দির থেকে প্রথমে দুবার বরপক্ষের লোক কনের বাড়ীতে গিয়ে কনেকে উপহার দিয়ে আসে। তৃতীয়বারে বর নিজে তরবারি হাতে নিয়ে লোকজন সমেত আসে। তার সঙ্গে কনের জন্য অলঙ্কারও নিয়ে আসা চাই। বর জোর করে বিবাহ-মণ্ডপে ঢুকতে চাইলে কৃত্রিম বাধা দেওয়ার পর তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়। এরপর বিয়ে হয়। বিয়ের পরের দিনে বর একটা ঘোড়ায় ও কনে একটা বৃষে আরোহণ করে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে কোন অশ্বত্থতলায় যায়। কনের বাপ-মা হাতে ফুল নিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করে। তারপরদিন বিবাহস্তম্ভকে পুজো করে বধূসহ স্বগৃহে যায়।

সাঁওতাল যেন প্রকৃতির সন্তান। নিকষ কালো পাথরে গড়া যেন অটুট স্বাস্থ্য ও যৌবন নিয়ে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে রাঙা মাটির পথ দিয়ে মাথায় ছোট ছোট বোঝা নিয়ে দলে দলে চলার পথে এগিয়ে চলে সাঁওতাল রমণীর দল। কণ্ঠে তাদের সঙ্গীতের বেশ, খোঁপায় তাদের বিচিত্র রঙের ফুলের গুচ্ছ। হাতে বাঁশী বা 'কাঁড়' নিয়ে সন্ধ্যায় নৃত্যের তালে তালে মাদল বাজনার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় বলিষ্ঠ সাঁওতাল পুরুষদের। এদের বাল্য-বিবাহের রীতি নেই। পরস্পরের মধ্যে মনোনয়ন স্থির হলে বিয়ে হয়। বিয়ের কয়েকটা পদ্ধতি আছে। কোন পর্বে বিশেষত বিঁধা পর্বে সাঁওতাল কোন যুবতীরা খোঁপায় নানা রঙের ফুল গুঁজে দলে দলে গাঁয়ের মন্দিরে বা হাটতলায় যায়। কেনাকাটার অছিলায় হাটের মাঝে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—মুখে হাসি, ভাষায় চপলতা। এই দলের মধ্যে পূর্ব-মনোনীতা পাত্রী থাকে। সাঁওতাল যুবকেরা বাঁশী আর কাঁড় হাতে নিয়ে অদূর থেকে তাদের পেছনে পেছনে ঘুরে বেড়ায়—হাস্যরসিকতা করে। কন্যাপ্রার্থী যুবক সাঁওতালের হাতে একটা ছোট্ট বর্শাফলক থাকে। উদ্দেশ্য কন্যার অজ্ঞাতে তার গায়ে সেই বর্শাফলক বিঁধিয়ে দিয়ে সামান্য রক্তপাত করা। তাহলেই সেই দল তখনই কন্যাকে দাবী করে। তারাও ছাড়বে না, এতে দু' দলের মধ্যে কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় হয়। পাত্রীকে সখীরা ঘিরে রাখে। পাত্র ইতা-বসরে কোনরকমে পাত্রীর হাত ধরে ধস্তাধস্তি করে টেনে যেন টাগ অফ ওয়ারের মত নিজের গণ্ডীর মধ্যে নিয়ে আসে। ব্যস এ হল পানিপীড়ণ বা পানিগ্রহণ। তারপরেই উভয়ের পরিবারের মধ্যে কথাবার্তা চলে, বিবাহ হয়।

কোন কোন স্থলে বর্শা বিঁধিয়ে দিয়েই পাত্রের দল পালিয়ে যায় কোন গুপ্তস্থানে বা গাছের ওপরে ওঠে। তখন পাত্রীর দল তাদের খুঁজে বেড়ায় ও কৃত্রিম যুদ্ধ হয়।

বিবাহানুষ্ঠানে একরকম প্রথা দেখা গেছে, সারারাত ধরে নাচ-গান, বাজনা, মদপান চলার পর বিয়ের অনুষ্ঠান বসে। পরদিন কন্যা স্বামি-গৃহে যাবার সময় বরের বড়ভাই অভাবে গ্রামের বড়ভাই সম্পর্কীয় কনেকে কাঁধে করে স্বামি-গৃহ পর্যন্ত নিয়ে আসে। কোনও কোনও সময় এ-দূরত্ব হয় তো এক মাইল-দেড় মাইল হয়।

মুরিয়া জাতের মধ্যে কয়েকরকম বিয়ের প্রথা আছে। নাগাদের মোরাঙের মত মুরিয়া ঘটুল হচ্ছে রাতের আড্ডাখানা। এই জাতের নিয়ম ৫।৬ বছর থেকেই বালক-বালিকারা সন্ধ্যায় ঘটুলে যায় ও সকালে বাড়ীতে ফিরে আসে। এখানে ওদের সামাজিক শিক্ষা দেওয়া হয়। এক একটা ঘটুল এক একটা গোষ্ঠীর মত—একই ঘটুলে বিয়ের ব্যবস্থা হতে পারে। আবার যে-কোন ছেলে অন্য ঘটুলের মেয়েকেও বিয়ে করতে পারে। বিয়েতে কন্যাপণ দিতে হয়। কোন ক্ষেত্রে বরের বাপ হয় তো কন্যাপণ দিতে পারে না। সেক্ষেত্রে বরকে কন্যার বাড়ীতে মজুর হিসেবে থাকতে হয় ছ' মাস বা এক বছর। এই সময় ভাবী কনে কিন্তু তার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলতে পারে না। যদি তাদের মধ্যে কোন গোপন সম্পর্ক জানাজানি হয় তো শাস্তি পেতে হয়।

এদের বিয়েতে সাতদিন ধরে উৎসব চলে বিবাহ-মণ্ডপের মাঝখানে একটা মাটির বেদী তার ওপর কিছু নক্সা আঁকা। বেদীর সামনে মাদুর পাতা। তার ওপর ভাবী শ্বশুর জামাতাকে কোলে নিয়ে বসে। সেখানে পিতৃ পুরুষের উদ্দেশ্যে কিছু উৎসর্গ করা হয় তারপর একটা টোপর এনে পাত্রের মাথায় সাতবার দুলিয়ে পরিয়ে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে গান হয়। তারপর কনেকে এনে ভাবী শ্বশুরের কোলে বসিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ীর মেয়েরা এসে কনের হাত থেকে কনুই পর্যন্ত তেল মাখিয়ে দেয়। বরের আঙুলে একটা কুশের আংটি পরান হয়। মন্ত্র পড়ান হয়। তারপর বর সেই কুশের আংটি খুলে কনের আঙুলে পরাতে যায়। কিন্তু হাতে তেল মাখা। কনে কিছুতেই পরাতে দেবে না। বাঁধে ধস্তাধস্তি। হাত পিছলে যায়। কোল ছেড়েও কেউ উঠতে পারে না। অবশেষে কনেকে হার মানতে হয়। আংটি পরতে হয়। তখন কনে কোল থেকে উঠে বরের পিঠে একটা কিল মেরে ছুটে বাড়ীর দিকে যায়। বরও তাকে ধরবার জন্যে ছোটে। এরপরে নাচ-গান হৈ-হল্লা। বরেরও নাচ হয়। কনেরও নাচ হয়। ব্যস বিয়ে হয়ে গেল।

দক্ষিণ ভারতে পণ্ডরম বলে একরকম জাত আছে। ছোট-খাট বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। তারা গুহায় বা গাছের কোটরে থাকে। শিকার করে। এক রকমের কাপড় বা বাকল পরে। এদের বিয়েতে বর-কনে সামনা-সামনি বসে। মেয়ের বাপ ছলছল চোখে বলে আমার এই আদরের মেয়েকে তোমার হাতে সঁপে দিলুম। তুমি তাকে ভাল করে রেখো। তারপর একটা পাতার ওপরে চার গোলা ভাত রাখে। বর দু' গোলা ভাত কনেকে দেয়। কনে দু' গোলা ভাত বরকে দেয়। বর-কনে উভয়ে খায়। এইখানেই বিয়ের শেষ ও আমোদ-প্রমোদ চলে।

উরালিন নামে এক কুমীর শিকারী জাত আছে। এদের বিয়েতে ছেলেমেয়ের কারুর হাত নেই। যে মেয়ের বিয়ে হবে তাকে একটা চারদিক বন্ধ তালপাতার কুঁড়ের মধ্য রাখা হয়। তাকে বিয়ে করবার জন্য অনেক পাত্র আসে। তারা সেই কুঁড়ের চারধারে এক একটা বাঁশের লাঠি নিয়ে ঘুরবে, নাচবে আর সেই কুঁড়ের মধ্যে লাঠি ঢোকাবে। এমনি নাচ অনেকক্ষণ চলার

ঝুঁড়ের মধ্যে কনে একটা লাঠি ধরবে। নাচ শেষ হবে আর যার লাঠি ধরবে তার সঙ্গেই বিয়ে হবে।

মুদন জাতির বিয়ে বাপ-মায়ে ঠিক করে দিয়ে তাদের দু' জনকে ছেড়ে দেয়। তারা কোন গুহায় গিয়ে নির্জনে কয়েকদিন বাস করবে। কয়েক সপ্তাহ পরে তারা ফিরে এসে তাদের মতামত জানাবে। অসম্মত হলে আবার নতুন ব্যবস্থা হয়।

অরুণাচলের জাতির বিয়েতে জ্যোতির্ষী পাত্র-পাত্রীর যোগাযোগ বিচার করে। পাত্রীর রাশিফল যদি পাত্রের চেয়ে ভাল হয় তবেই বিয়ে হবে। পাত্রীর জাতি পাত্রের জাতির চেয়ে উঁচু হওয়া চাই। পাত্রের বোন এসে নানা উপহার দিয়ে কনেকে সাজিয়ে দিলে বিয়ে হয়।

মালাবারীদের বিবাহের অনুষ্ঠান সর্বতোভাবে উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মত হয়ে থাকে। বিয়ের কোন নির্দিষ্ট বয়স নেই। কোষ্ঠিবিচার করে বিয়ে দেওয়া হয়। বিয়ের প্রস্তাব হলে পাত্রের পিতা পাত্রীর বাড়ীতে দই, মিঠাই ও ২১টি টাকা পাঠায়। একটা মাটির ভাঁড়ে দইকে পীতবর্ণ করে তার মুখে একটা লাল কাপড় বেঁধে তার ওপর টাকা দিতে হয়। বিয়ের দিন পাত্রের পিতা কিছু মিশ্র ধাতুর অলঙ্কার একটা সিল্কের খোপা, কিছু মেহেদি ও ডালিম, কিছু মিষ্টি, খেলনা ও একটি শাড়ী পাঠিয়ে দেয়। এর সঙ্গে কন্যাপক্ষে ১১টি থালা তাকে উপহার-স্বরূপ পাঠাতে হয়। এই থালা ১২৫টা পর্যন্ত হতে পারে। পাত্রীর পিতা কন্যার জন্য শাড়ী, কিছু মিষ্টি ও ফল রেখে সমস্তই পাত্রের বাড়ীতে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়। পরদিন কনের চুলে ফুলগুলি পরিয়ে দেওয়া হয়। নগরে বিয়ে হলে কোন মন্দিরে গিয়ে পূজার্চনা করে ও সেখানে ভাবী শাশুড়ীর সঙ্গে প্রথম দেখা করে। এরপর পাত্র-পাত্রীকে 'তেল হলুদ' দেওয়া হয়।

বরযাত্রার সময় একজন কুমোর একটা গামলা নিয়ে আসে। বর গামলাকে পা দিয়ে স্পর্শ করে। অনেক জায়গায় বরকে ঐ গামলার পিঠে চড়তেও শোনা যায়। এই রীতির দ্বারা বোঝান হয়, বর একটা মর্দের কাজ করতে যাচ্ছে।

বর কনের বাড়ীতে এলে তাকে একটা পিঁড়ের ওপর বসতে দেওয়া হয়। তখন সেই বাড়ীর মেয়েরা কনেকে ধরে তুলে বরের চারদিকে ঘোরায়। এই সময় কনে বরের গায়ে চাল ছুঁড়ে দেয়। একটা থলেতে কিছু দই রেখে ঝুলিয়ে রাখা হয়—যখন দইয়ের জলীয় অংশ সব পড়ে যায়, তখন সেই দইয়ে দুধ, চিনি, এলাচ, মরিচ ও সুগন্ধি মিশিয়ে প্রথমে কুল-দেবতাকে উৎসর্গ করে পরে ভোজে পরিবেশন করা হয়।

কোন আত্মীয় কনেকে বিয়ের আসরে নিয়ে আসে ও কণের বাপের কোলে তাকে বসিয়ে দেয়। কনের বাপ তখন একটা আংটিও ময়দার পিণ্ডের সঙ্গে কনের হাত বরের হাতে সমর্পণ করে। এরপর যথারীতি মন্ত্র উচ্চারণ করে কন্যাসম্প্রদান হয়। তারপর একটা উত্তরীয় দিয়ে বর ও কনেকে ঢাকা দেওয়া হয়। তার ভেতর বর কনের সিঁথিতে ৫ বার সিঁদুর লেপন করে। উহা হয়ে গেলে ৫ বার বিবাহ-মণ্ডপ প্রদক্ষিণ করে। এরপর উভয়ের কাপড় একসঙ্গে বেঁধে বাসর ঘরে নিয়ে যায়। বাসর ঘরে বরের মাথায় টোপর পরিয়ে দেওয়া হয়।

নবপরিণীতা স্বামীর সঙ্গে স্বামিগৃহে আসতে পারে না, বিয়ের ৩য় বা ৫ম বছরে আসে। এদের বিয়ের কোন পণপ্রথা নেই।

লিঙ্গায়ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিয়ে বেশ জমকালো হয়। প্রথমে বাগ্‌দান হয় অর্থাৎ কনের বাড়ীতে তারা পুরোহিতসহ কোন ভাল দিনে কনে দেখতে যায়। যাবার সময় সাড়ী, জ্যাকেট, দুটো নারকেল, হলুদ, সুপুরি, পান, চুন, ফুল, সোনা-রূপার গয়না, চিনি প্রভৃতি নিয়ে যায়। অতিথিরা অভ্যর্থিত হয়ে পান-ভোজনাদি করে। কনে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হয়। বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরা বরপক্ষের আনীত নারকেল কনের কোলে দেয়। স্ত্রীলোকেরা মঙ্গল গান করে। এদের মধ্যে পাঁচজন কম্বলের ওপর, বাহু ও মাথার ওপর চাল ছেকে দেয়। তিনবার করা হয়। পান ও চিনি দেওয়া হয়। তখন বরপক্ষের একজন স্বীকারকরে সে এই মেয়ের সঙ্গেই বিয়ে হবে।

অবস্থানুসারে এদের বিয়ের অনুষ্ঠান ১ থেকে ৪ দিন হয়। ১ম দিন পিতৃপুরুষের উপাসনা হয়। ২য় দিন মঠে চাল ও হলুদ পাঠানো হয়। আত্মীয়দের তেল বিতরণ করা হয়। আনন্দধ্বনি করে নতুন কলসী এনে দেবতার মন্দিরে রাখা হয়। সভামণ্ডপ তৈরী হয়। বর বিবাহিত স্ত্রীলোকের সঙ্গে পাশাপাশি বসে, চারকোণে চারটি নতুন কলসী স্থাপন করা হয়। কলসীতে ১০ বার কাপাস তুলো জড়ানো হয়। বর-কনেকে তেল হলুদ দিয়ে চান করিয়ে দেওয়া হয়। পর পর আর কিছু অনুষ্ঠানের পর সূত্রাদি পুরোহিতকে দেওয়া হয়। তারপর বর-কনে দেবতার ঘরে যায়—বর সেখানে থাকে কনে পুষ্পে সাজানো ঘরে চলে আসে। বর সেখানে থেকে ফুলে সজ্জিত হয়ে বৃষস্কন্ধে চড়ে গ্রাম্য মন্দিরে যায়। সেখানে নারিকেল উৎসর্গ করে। দেবতার ঘরে কারু-কার্যখচিত ধাতুনির্মিত পাঁচটি কলস সজ্জিত থাকে, সেই কলসে ছাই ও পান থাকে। চার কোণে চারটি কলস ও মাঝখানে একটি কলস রাখে। কোনও কলসের ওপর নারিকেল, কোনটিতে তাল, কোনটিতে পান-সুপারি রাখা হয়। একটা পয়সাও রুমালে বেঁধে রাখা হয়। তখন একগাছি সূতা দিয়ে সব স্থানটা বেড়া হয় ও আর একগাছি সূতা মাঝের কলসীটি বেড়িয়া সেই সূতোর এক দিক গুরুর হাতে ও আর একদিক বরের হাত দেওয়া হয়। বর ও গুরু বিপরীত দিকে বসে। গুরু ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে কুশের আংটি পড়ে। বরের বাম দিকে কনে বসে ও বর-কনের হাত গুরু কুশ দিয়ে বাঁধে। বর ও কনের যুক্তহাত ধোয়ানো হয়। বেলপাতা ও ফুল দেওয়া হয়। গলার হাড়ে সুতো বাঁধে ও যুক্তহাতের কব্জিতে সুতো বাঁধে। কনের গলার সুতো বর হাতে নেয়। পুরোহিত এই সময় মন্ত্র পড়ে। বর-কনের কাপড়ে কাপড়ে গাঁট বাঁধা হয়। কনে বরের পা পূজা করে ও কনের মাথার ওপর চাল ফেলে। পাঁচজন জঙ্গমকে পাঁচটি পয়সা-সহ ফলমূলাদি দান করে। আত্মীয়স্বজনেরা বর-কনের পা ধোয়ায়, নানা যৌতুক দেয়। তৃতীয় দিন নিমন্ত্রণ। চতুর্থ দিন—কনে সন্ধ্যে বর পেছনে এক বলদের ওপর চড়ে মিছিলসহ গ্রাম প্রদক্ষিণ করে। ফিরে এসে সুবাসিত একপ্রকার চূর্ণ পরস্পরকে দেয়। আগন্তুকেরাও এই আমোদে যোগদান করে। তারপর বৌ-ভাত।

বাউরী বিবাহে ডাকনামে গুণিয়ে গুভদিন ঠিক হয়। আঁকই, সিন্দুর, জাঁতি, কাজললতা, লাটাই সূতা, ইত্যাদি দেওয়া হয়। বিয়ের রাতে বর কন্যা গৃহে গমন করে। সেখানে ছাঁদনাতলায় বর পূর্বমুখ হয়ে দাঁড়ায়। দুজন পুরুষ কন্যাটিকে আনে, সধবারা ন'বার বরকে প্রদক্ষিণ করে। তারপর কন্যাকে বরের বাম পাশে বসায়। সকলেই তিনবার হরিধ্বনি করে। বর তখন ফুলের মালা কন্যাকে দেয় ও কন্যা একগাছি সরু পৈতা বরকে দেয়। সিঁদুর তার পরদিন দেওয়া হয়। কন্যাকর্তা গলবস্ত্র হয়ে একঘটি জল ও তার ওপর একটা পাতায় চাল, সুপুরি, গুড় ও পয়সা দিয়ে সকলের সামনে বলবে—বাবারা আমি বড় কষ্টে চারটি ক্ষুদকুঁড়া জোগাড় করেছি। আপনারা এগুলো আহার করুন। বরযাত্রীরা জলপাত্রটি গ্রহণ করে। তারপর একটু তেল এনে মাটিতে ঢেলে বলে 'হে পৃথিবী, আমি অধম, কিছুই জানি না। তারপর একটু তেল-চাল-কলাই এনে সকলের অনুমতি নিয়ে আগুনে চাপে। সেই উনুনে রান্না হয়। তাই খেয়ে সকলে বাড়ী যায়।

[আমাদের পাঠক-পাঠিকার কাছে 'রম্যাণি বীক্ষ্য' পর্যায়ের গ্রন্থসমূহের নাম নিশ্চয়ই অজানা নয়। ভ্রমণমূলক কাহিনীর মধ্যে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ইতিকথা এই লেখকের রচনায় আমরা পেয়ে থাকি। রম্যাণি বীক্ষ্যর লেখকের আর একটি চিত্তাকর্ষক, কৌতূহলোদ্দীপক ও ঘটনাবহুল ধারাবাহিক এই লেখাটি পাঠে, আশা করি মাসিক বসুমতীর পাঠক পাঠিকা তৃপ্তি পাবেন।—স]

একজন লামা ও মানস সরোবর

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

॥ এক ॥

এবারে শুধু বিশ্রামের জন্যেই আলমোড়ায় এসেছিলাম, তার বেশি কোন বাসনা মনে ছিল না। বাঙলা দেশে গ্রীষ্ম শেষ হয়ে বর্ষা নেমেছে, কিন্তু গরম কমে নি। এবারে গরম না কমলে দেশে ফিরব না বলে সঙ্কল্প করেছি।

অপরাহ্নে বেড়াতে বেরিয়ে রামকৃষ্ণ কুটীরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেখানে দেখলাম কৈলাশ যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন। ভারতের নানা প্রান্ত থেকে যাত্রীরা এসে সমবেত হচ্ছেন, সহরের নানা স্থানে এই সমাবেশ। একজন বাঙালী আমাকে প্রশ্ন করলেন: আপনি কি কৈলাশ যাত্রী নাকি?

আমি সংক্ষেপে বললাম: না।

একজন তরুণ লামা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে দেখিয়ে ভদ্রলোক বললেন: ইনিও আমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন। তবে কৈলাশে নয়, মানস সরোবরে। মানসকে এঁরা সকল তীর্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাবেন।

আমি বললাম: সত্যি নাকি!

লামা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল। ভারি সুন্দর প্রসন্ন হাসি, শিশুসুলভ সরলতায় ভরা। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: বাঙলা বোঝেন বুঝি?

উত্তর দিলেন বাঙালী ভদ্রলোক, বললেন: হিন্দী বোঝেন, বলতেও শিখেছেন। কিছুদিন আগে নিজের দেশ থেকে পালিয়ে এসে এ দেশে আশ্রয় নিয়েছিলেন। এবারে তীর্থ করতে যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে।

লামা যেন সবই বুঝতে পেরেছে, এমনিভাবে মাথা নাড়লে। মুখে তেমনি সুন্দর সরল হাসি।

আমি তাঁদের নমস্কার করে ফিরে আসছিলাম। ভদ্রলোক বললেন: কোথায় উঠেছেন?

হোটেলে।

একা?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

অল্পদিন থাকবেন বুঝি?

বললাম: যতদিন ভাল লাগে, ততদিন থাকব।

ভদ্রলোক এবারে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠলেন, বললেন: তবে চলুন না আমাদের সঙ্গে। ফেরার যখন তাড়া নেই, তখন একা বসে থেকে করবেন কী?

কথাটা মিথ্যা নয়। বসে বসে লেখাপড়া ছাড়া আর কিছু করবার নেই। বললাম: বিশ্রামের জন্যে এসেছি, কিছু করবার নেই বলে বিশ্রামটা ভাল হবে। বলে আমি বিদায় নিয়ে ফিরে এলাম।

পথে আর একদল কৈলাশ যাত্রীকে দেখলাম। তাঁরা বাজারে পরম উৎসাহে পাহাড়ে ওঠার সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করছেন। বিশেষ ধরণের জুতো, লম্বা ছড়ি, ওয়াটারপ্রুফ, কাপড়, ইত্যাদি। নানা রকমের কথা হচ্ছে তাঁদের মধ্যে। তিব্বতের রুক্ষ ও ঠাণ্ডা হাওয়ায় নাক-মুখ ফেটে রক্ত বেরিয়ে পড়ে। তার জন্যে ভাল ক্রীম বা ভেসেলিন দরকার। বরফের উপর উজ্জ্বল আলোয় চোখ যায় ধাঁধিয়ে, সঙ্গে গগলস্ থাকলে চোখ বাঁচে। কেউ পরামর্শ দিচ্ছেন, কেউ নিচ্ছেন। সাংসারিক যাঁরা, তাঁরা পথের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহে ব্যস্ত।

দুজন বাঙালীকেও দেখলাম। শক্ত-সমর্থ চেহারার মাঝবয়সী ভদ্রলোক। তাঁদের একজন আমাকে বাঙালী বলে চিনতে পারলেন। বললেন: কি মশায়, আপনার ব্যবস্থা সব পাকা হয়ে গেছে?

কিসের ব্যবস্থা?

কেন, আপনি কৈলাশ যাচ্ছেন না?

আমি মাথা নেড়ে বললাম: না।

তাঁর সঙ্গী ভদ্রলোকও এবারে আশ্চর্য হয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। এ সময়ে আলমোড়ায় এসে কৈলাশে যাচ্ছি না, এ যেন অবিশ্বাস্য কথা। কেন জানি না, একটু লজ্জা বোধ করে আমি কৈফিয়ৎ দিলাম: বিশ্রামের জন্যে এখানে এসেছি।

যে ভদ্রলোক আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি বললেন: তীর্থ করবার এমন সুযোগ জীবনে কম আসে, ভাল করে ভেবে দেখবেন।

বলে নিজেদের কাজে মন দিলেন।

আরও বিস্ময় আমার জন্য সঞ্চিত ছিল। হোটেলে ফিরে দেখলাম যে, পুরুষ ও নারীর একটি ছোটখাট দল কৈলাশ যাত্রার নাগালে এসে জুটেছেন। বাঙালী নন, কথাবার্তা বলছেন হিন্দুস্থানীতে, নানা বয়সের মেয়ে-পুরুষ। কিন্তু বয়সে প্রবীণ কেউ নন। সাজসজ্জায় তীর্থযাত্রী বলে মনে হয় না, ইংরেজীতে যাকে টুরিস্ট বলে সেই রকমই আচরণ। এক ভদ্রলোক আমার দিকে এগিয়ে এসে বললেন: গুড ইভনিং, আমার নাম ধীর।

প্রতি-নমস্কার করে আমি নিজের নাম বললাম।

মিস্টার ধীর আনন্দ প্রকাশ করে দলের আর সকলের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। মিসেস ধীর ও মিস ধীর। মিস্টার ও মিসেস মাথুর। বুঝতে কষ্ট হল না যে এই দুই পরিবারের মধ্যে পুরাতন প্রীতির সম্পর্ক। ধীরপরিবার উদ্বাস্তু পাঞ্জাবী, বর্তমান বাস দিল্লীতে। মাথুর পরিবার উত্তরপ্রদেশবাসী, কিন্তু কর্মোপলক্ষে দিল্লীতেই থাকেন। তাঁরা মানস সরোবর ও কৈলাশ দর্শনের জন্য দু'মাস ছুটি নিয়ে এসেছেন। জীবনটা উপভোগ করে ফিরবেন।

মিস্টার মাথুর বললেন : এ বেশ ভালই হল, আমরা আর একজন সঙ্গী পেয়ে গেলাম।

মিসেস ধীর বললেন : আপনি যে কৈলাশে যাচ্ছেন, ম্যানেজার তো সে কথা বললেন না।

আমি সসঙ্কোচে বললাম : আমি কৈলাশে যাচ্ছি না বলেই ম্যানেজার সে কথা জানেন না।

সবাই যেন চমকে উঠলো, বললেন : আপনি যাচ্ছেন না!

তারপরে মিস্টার ধীর একই মন্তব্য করলেন : এ একটা রিয়াল অ্যাডভেঞ্চার হত।

মিসেস ধীর বললেন : সবাই তোমাদের মতো নন তো। ঘরে বসে ছুটি ভোগ করতেও অনেকে ভালবাসেন।

রাতে আমি নিজের ঘরে বসে কৈলাশ যাত্রার কথা ভাবছিলাম। এ দেশের অগণিত তীর্থকাম পর্যটকের স্বপ্ন মানস সরোবর ও কৈলাশ। ভারতের সীমান্ত পেরিয়ে অনেক দূরে তিব্বতে এই পবিত্র তীর্থ। পূর্বদিকে মানস সরোবর ব্রহ্মার মন থেকে উৎপন্ন। পশ্চিমে রাক্ষস তালের সৃষ্টি হয়েছে দশানন রাবণের স্বেদ বা অশ্রু থেকে। এই দুই হ্রদের মাঝখান দিয়ে গেছে দেবাদিদেব মহাদেবের বাসভূমি কৈলাশের তুষারাবৃত পথ। কালিদাস এই কৈলাশের রূপ বর্ণনায় বলেছেন, ত্রিদশবনিতাদর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ। কবি নরেন্দ্র দেব তার অনুবাদ করলেন :

'স্ফটিকের বিরাট গিরি তুষার পাতে
দেখায় যেন,
দেবনারীদের প্রসাধনের দীপ্ত উজ্জ্বল
মুকুর যেন।'

এই অপরূপ দৃশ্য আমরা মানস চক্ষে দেখি, সাহস পাই না এই দুর্গম তীর্থ যাত্রার। কিন্তু দুর্গমতাকে মানুষ কোনদিন ভয় পায় নি। ভয়কে জয় করেছে প্রেমে, রূপের মায়ায় ও তীর্থের টানে। আমি যে যাত্রীদের দেখে এলাম তাঁদের কেউ চলেছেন তীর্থের টানে, সৌন্দর্যের টানেও চলেছেন কেউ। আবার সঙ্গী হবার লোভেও হয়তো কেউ চলেছেন। আমার হৃদয়ে এতদিন কোন টান ছিল না, সহসা আজ যেন একটি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছি, গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে মন।

আমাদের প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থের বর্ণনা থেকে মানস সরোবরের একটা ছবি আমি কল্পনা করে নিয়েছিলাম, ঘননীল বিশাল জলরাশি দিগন্তের শুভ্র পাহাড় পর্যন্ত বিস্তৃত, আর হংসমোদম্পতি পরস্পরং প্রেম্না বিহরন্তৌ নিরন্তরম্। এরই নিকটে ধনপতি কুবেরের আলয়। তাঁর অবলারা এসে মানসের জলে চিরং বিহৃত্য সংস্নায় বটমূলে সমাশ্রয়ৎ।

কখন জানি না আমার মন চলে গেল সেই বিস্মৃতপ্রায় অতীতে। কুবেরের পুরললনাদের আমি মানসের তটে দেখতে পেলাম। চঞ্চল চরণে স্বর্ণ নূপুরের নিক্কণ তুলে তাঁরা নেমে এলেন, তাঁদের পরিধেয় বসনে রামধনুর বর্ণাঢ্য, অঙ্গের আভরণ থেকে মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। বটমূলে বসন ত্যাগ করে তাঁরা জলে নামলেন।

হংসমিথুনেরা এই কন্যাদের দেখে ভয় পেল না। আবেগে উচ্ছল হয়ে কেলি করতে লাগল শীতল সলিলে। তাদের পক্ষপুটের আঘাতে তরঙ্গ উঠল বলয়ের মতো, আঘাত করল স্নানরতা কন্যাদের নিরাবরণ বুকে। সে তরঙ্গ তাঁরা কঙ্কণ-বলয় সিঞ্জিত লীলায়িত বাহুর কঠিন তাড়নায় ফিরিয়ে দিলেন।

তারপর?

তারপর চোখ ফিরিয়ে নিতে হয়। যে বৃদ্ধ বট আছে তটপ্রান্তে নির্বাক প্রহরীর মতো দিবারাত্রি সতর্ক প্রহরায়, কন্যারা উঠে এলেন তারাই ছায়ায়। যৌবনভারে গর্বিতা নারী ঝুরির আড়ালে দাঁড়িয়ে বেশবিন্যাস করবেন আর প্রসাধন করবেন তাঁদের ঘনকৃষ্ণ কেশদাম রৌদ্রে মেলে।

আজ হয়তো মানসের তটে সে বটগাছ নেই। কুবেরকন্যাদের কলহাস্যে মুখর হয়ে ওঠে না তার তীরভূমি। ধনপতি কুবের আজ ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছেন, তাঁর নূতন পুরী রচনা করেছেন দেশান্তরে, যে ভারত একদিন তাঁকে তার আদর্শের জন্য সম্মান করে নি, সেই ভারতকে তিনি চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করে গেছেন। ভুখা ভারত আজ ক্ষুধায় কাঁদে।

কিন্তু ভারত থেকে তীর্থযাত্রীর দল এই মানস সরোবরের পাশ দিয়ে আজও চলেছে কৈলাশ দর্শনে, কৈলাশের প্রতি তাদের নাড়ির টান।—

'অসংখ্য তার শুভ্রশিখর কুমুদ ফুলের
তুল্য সাদা,
শিবের যেন অট্টহাসি যুগযুগান্তে
জমাট বাঁধা।'

কখন আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি নে। যখন ঘুম ভাঙল তখনও সূর্যোদয় হয় নি। গায়ে একখানা গরম চাদর জড়িয়ে দরজা খুলে আমি বাহিরে বেরিয়ে এলাম।

পৃথিবী জেগে উঠেছে, পাখির কলকাকলি শুনছি চারিদিকে। অন্ধকার ফিকে হয়ে গেছে, পূবের আকাশে দেখছি আলোর বিজ্ঞাপন। ভাল লাগল আলমোড়ার এই সকালটি। পরিচ্ছন্ন রাজপথে আমি পায়চারি করতে বেরুলাম।

বেশিক্ষণ নয়, অল্পক্ষণ পরেই দু'ধার থেকে এল দু'জন।

আমাদের হোটেল থেকে বেরিয়ে এল মিস মায়া ধীর, বলল : আপনি এত সকালে ওঠেন!

আর পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়াল সেই তরুণ লামা, নির্বাক বিস্ময়ে তাকাল আমাদের দুজনের মুখের দিকে, প্রসন্ন হাসিতে তার সারামুখ ভরে গেল।

আমি দুজনের পরিচয় করে দিলাম। বললাম : আপনারা তো একই পথের যাত্রী, পথে পরিচয় গভীর হবে।

মায়া ধীর বলল: আপনি যাবেন না কেন?

যাবার কথা আমি ভেবে দেখি নি।

লামা এবারে প্রথম কথা কইল, বলল: জরুর জায়েঙ্গে।

এ তার আশার কথা, না বিশ্বাসের তা বলল না। কিন্তু আমার মনে হল যে এই তরুণ মানুষটি যেন আমার ভবিষ্যৎ দেখতে পেয়েছিল। তাই আরও বলল: পথে আপনাকে আমি অনেক তিব্বতের কথা বলব, চলতে আপনার একটুও কষ্ট হবে না।

মায়া ধীর বলল: সত্যি কথা, পথ চলার আনন্দ আপনার কষ্টকে ছাপিয়ে যাবে।

আমি কোন উত্তর দিতে পারলাম না। আর তারাও কোন উত্তর চাইল না। আমার সম্মতি বুঝি তারা অনুভব করতে পেরেছিল।

॥ দুই ॥

হোটেলে ফিরে চায়ের টেবিলে মায়া ধীর কথাটা ঘোষণা করল, বলল: মিস্টার রায়ও কৈলাশে যাচ্ছেন। কথা দিয়েছেন তাঁর বন্ধু লামাকে।

মিসেস ধীর বললেন: সত্যি নাকি!

কিন্তু মিস্টার ধীর তাঁর বাঁ হাতের রুটিতে কামড় দিয়েছিলেন বলে কথা কইতে পারলেন না, উঠে এসে আমার দিকে তাঁর ডানহাতটা বাড়িয়ে দিলেন। আমি হাত বাড়াতেই প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়ে আনন্দ প্রকাশ করলেন। তারপর মুখের রুটির টুকরোটা সামলে বললেন: এই তো কাজের কথা।

মিস্টার মাথুর বললেন: সঙ্গে নেবার জিনিসপত্র সব আছে তো, না সংগ্রহ করতে হবে?

মিসেস মাথুর বললেন: সঙ্গে আর থাকবে কী করে, সবই এখানে জোগাড় করতে হবে।

মিস্টার ধীর নিজের চেয়ারে এসে বসে বললেন: কুছ পরোয়া নেহি। আমাদের দলে যখন যোগ দিয়েছেন, তখন আমিই সব ভার নিচ্ছি।

মিস্টার মাথুরের কথায় জানলাম যে, মিস্টার ধীর এই দলের লীডার এবং কৈলাসের পথে সবাইকে তাঁর হুকুম মেনে চলতে হবে। বললেন: রাজী?

আমি উঠে দাঁড়িয়ে দরবারী কায়দায় তিনবার সেলাম করলাম।

মিস্টার ধীর প্রবলকণ্ঠে হেসে উঠে বললেন: বান্দা আকলমন্দ হ্যায়, ইনকো ইনাম দেও শ—

জুতা ব'লো না যেন।

বলে মায়া ধীর খিলখিল করে হেসে উঠল।

এই পরিহাসেই আমি এঁদের দলভুক্ত হয়ে গেলাম।

আলমোড়া থেকেই আজকাল পদযাত্রা শুরু হয় না। আসকোট নামে একটা শহর পর্যন্ত বাস যাতায়াত করে শুনেছি। কৈলাসযাত্রীরা ট্রেণে চেপে কেউ টনকপুরে এসে নামেন, কেউ আসেন কাঠগোদাম স্টেশনে। টনকপুর নেপাল সীমান্তের একটি ছোট শহর। সেখান থেকে পিথোরাগড়ের বাস চলে চম্পাবতের উপর দিয়ে। কাঠগোদাম থেকে আলমোরার বাস আছে, আবার আলমোরা থেকেও পিথোরাগড়ে বাস চলাচল করে। পিথোরাগড় থেকে আসকোটের দূরত্ব অল্প। একেবারে নেপাল সীমান্তে এই শহর। এর পরেও সীমান্ত বরাবর পথ গেছে উত্তরে লিপুলেক পাসের দিকে। এই গিরিবর্ত্ম চির তুষারবৃত। জ্যৈষ্ঠের শেষে বরফ গলতে শুরু করে, তখন শুরু হয় মানুষের যাতায়াত। ভেড়া ও টাট্টুর পিছনে পাহাড়ী বণিকেরা যায় তিব্বতে বাণিজ্যের জন্যে। লিপুলেক পাস পেরুলেই তিব্বত। গুরেলা মান্ধাতা হয়ে মানস সরোবর ও রাক্ষস তালের মাঝখান দিয়ে কৈলাসের পথ। পথের এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমি মানচিত্রে পেয়েছি। মানস সরোবর ও কৈলাস-যাত্রার ভ্রমণ-কাহিনী পড়েছি দু'খানা। সে অনেকদিন আগে। অনেকদিনের পুরণো কাহিনী। সে সব কথা এখন আর ভাল মনে নেই।

মিস্টার ধীর অ্যাণ্ড পার্টি তৈরী হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। বললেন: আসুন একটু খবর সংগ্রহ করে আসা যাক।

আমি বললাম: সেই সঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রও কিনতে হবে।

মিস্টার ধীর মাথা নেড়ে বললেন: উহুঁ, সে লীডারের ভাবনা। ... যখন নাম লিখিয়েছেন, তখন আর দায়িত্ব কিছু নেই।

আমিও মাথা নেড়ে বললাম: উহুঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত এইটে সমর্পণ না করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আছে। বলে নিজের টাকার থলিটি মিস্টার ধীরের দিকে বাড়িয়ে দিলাম।

মিস্টার ধীর হাত বাড়ালেন না, বললেন: ও এখন আপনার কাছেই থাকবে।

মিস্টার মাথুর বলে উঠলেন: এ রকম একচোখোমি কেন! আমাদের সবাইকে তো আগাম দিতে হয়েছে।

মিস্টার ধীর গম্ভীরভাবে বললেন: খরচ পাঁচ ভাগের বদলে ছ' ভাগ হবে। আগে সেই হিসেব করে পরে আগামের কথা।

মায়া ধীর বলল: অঙ্ক ভুল হল। খরচ ছ ভাগ হবে, কিন্তু পাঁচ জনের খরচ ছ ভাগ হবে না। ওঁরও এখন সমান ভাগ দিতে হবে। পরে ছ ভাগের হিস্যা।

মিস্টার ধীর বললেন: সে হোটেলে ফিরবার পরে, এখন নয়।

আমি বললাম: কাজটা কিন্তু আপনারা ভাল করলেন না। অজ্ঞাত-কুলশীল এক সঙ্গীকে নিয়ে পথে বিপদ না হয়।

মিস্টার ধীর তৎক্ষণাৎ তাঁর কোমর থেকে একটা রিভলবার বার করে দেখালেন। আর সেই সঙ্গে মিস্টার মাথুরের কোমরটাও দেখিয়ে দিলেন। বললেন: যে পথে যাচ্ছি, সে পথে এ সবের দরকার আছে।

মিসেস মাথুর হেসে বললেন : আপনার পরিচয় ভাল করে না জেনে শুনে আমরা আপনাকে সঙ্গে নিই নি। ভুল করে হোটেলের ম্যানেজারকে আপনি বোধ হয় নিজের পরিচয়টা দিয়ে ফেলেছিলেন,

মায়া ধীর সহাস্যে বলল : আমাদের নামধাম নোট করে নেন।

হাঁটতে হাঁটতে আমরা রামকৃষ্ণ কুটিরে গিয়ে উপস্থিত হলাম। স্বামীজী-দের সঙ্গে কথা বললে যে সমস্ত খবর পাওয়া যাবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের এই যাত্রার উদ্দেশ্য শুনে একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী একটু দমে গেলেন, বললেন, আপনারা কি এত কষ্ট স্বীকার করতে পারবেন?

কেন পারব না?

তিনি বললেন, কৈলাসের পথ অন্য কোন পাহাড়ী পথের মতো নয়, একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির পথ। কখনও চড়াই উঠবেন একটানা পাঁচ-সাত মাইল, আবার উৎরাই ঠিক অতটাই পথ। পাশাপাশি দুজনে যেতে পারবেন না, স্থানে স্থানে এমনই সঙ্কীর্ণ যে একা যেতেই ভয় করবে। যেখানে ঝর্ণার জল নামছে, সেখানে শ্যাওলায় পিছল হয়ে আছে, একটু পা হড়কালেই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। দিনে চোদ্দ-পনর মাইল করে এই দুর্গম পথে হাঁটতে হবে। শুধু দেহের শক্তি নয়, বুকের সাহসও চাই।

মিষ্টার ধীর বললেন, দুইই আমাদের আছে।

স্বামীজী তারপর মহিলাদের দিকে তাকিয়ে বললেন : আপনাদের কষ্টের সীমা থাকবে না। সারাপথ ডাণ্ডিতে যেতে পারবেন না, ঘোড়াতেও না। কখনও হাঁটতে হবে, কখনও সতরঞ্চির ঝোলায় বসতে হবে, আবার কখনও মানুষের পিঠে চেপেও দু-একটা দুর্গম স্থান অতিক্রম করতে হবে। পারবেন এত কষ্ট করতে?

মিসেস ধীর বললেন : সত্যি কথা।

কিন্তু মিসেস মাথুর প্রতিবাদ করে বললেন : কেন পারব না।

মায়া ধীর সকৌতুকে বলল : মিষ্টার মাথুর পারবেন তো?

মিষ্টার মাথুর একটু রুষ্টভাবে বললেন, পড়েছি যবনের হাতে—

মায়া ধীরের হাসি ছাপিয়ে গেল মিষ্টার ধীরের উদ্দাম হাসি।

আমার বুঝতে বাকি রইল না যে, এই যাত্রী-দলের তিন জনের উৎসাহে অন্য দুজন আসতে বাধ্য হয়েছেন। দুর্গম পথের ভয় এখনও তাঁদের দূর হয় নি।

স্বামীজী বললেন : আপনারা তীর্থযাত্রী হলে আপনাদের আমি নিরুৎসাহ করতাম না। দেবতার টান এমনই নিবিড় যে পথের কষ্টকেও আনন্দ মনে হয়, আর ভয় দূর হয় দেবতার নামে। 'জয় শঙ্করজীকি জয়' বলতে বলতে অগণিত তীর্থযাত্রী এই পথেই নিত্য যাতায়াত করে আনন্দে নির্ভীক চিত্তে।

আমি বললাম : দেবতা তো সত্য ও সৌন্দর্যেরই প্রতীক।

স্বামীজী আমার কথা মেনে নিলেন, বললেন : 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্'।

আর একজন তরুণ স্বামীজী আমাদের উৎসাহ দিলেন। বললেন : কষ্ট ভাবলেই কষ্ট, তা না হলে কষ্ট কিসের। মনটাই হল আসল, মনে আনন্দ থাকলে বাইরের কষ্ট কোনদিন মানুষকে ছোট করতে পারে না। তবে হ্যাঁ, ও পথে অনেক জিনিষের অভাব আছে। সেগুলো সঙ্গে নিয়ে যাবেন।

এই বলে প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের একটা লম্বা ফিরিস্তি তিনি দিলেন। রাত্রিবাসের জন্য তাঁবু সঙ্গে নিতেই হবে। পথে চটি সরাই বা ধর্মশালা নেই। কোন কোন গ্রামে যদি বা আশ্রয় পাওয়া যায় তো সেই পরিবেশে রাত কাটানো প্রায় অসম্ভব। নোংরামি আর দুর্গন্ধই তার প্রধান কারণ। তারপর সঙ্গে প্রচুর শীতবস্ত্র চাই। শুধু গরম জামা-কাপড় নয়, মাথায় টুপি, গলায় মাফলার হাতে দস্তানা এবং পায়ে মোজার উপরে লপেটা মানে গরম কাপড়ের পটি। শোবার জন্যে লেপ কম্বল দুইই। পোষাক পত্র দু সেট চাই, কেননা কখন বৃষ্টি হবে পাহাড়ে। তার কোন ঠিক নেই। মাঝে মাঝে ভিজতেই হবে। সঙ্গে ছাতা আর ওয়াটারপ্রুফ থাকলে উপরের দিকটা বাঁচানো যায়। কিন্তু নিচের দিক বাঁচে না। উপরের দিক ভিজলে আরও কেলেঙ্কারি, শীতে একেবারে জমে যেত হলে। বিছানাপত্র ও খাবার জিনিষের বোঝা বাঁচাবার জন্যেও ওয়াটারপ্রুফ বা অয়েল ক্লথ জাতীয় জিনিষ সঙ্গে রাখতে হবে। এর পরে খাবার জিনিষের কথা।

ভারতের সীমানা লিপুলেক পাসের এধারে গার্চিয়াং আর ওধারে তাকলাকোট। এই পর্যন্তই খাদ্যদ্রব্য কিছু কিছু পাওয়া যায়। ঘি আটা গুড় নতুন চাল আর মসুর ডাল। অন্যান্য জিনিষ সঙ্গে নিতে হয়। নিরামিষাশীর জন্যে খুব প্রয়োজনীয় হল টক-ঝাল আচার, শুকনো মেওয়া ফল বাদাম পেস্তা আখরোট কিসমিস, ডালমুট বিস্কুট চা। ষ্টোভ স্পিরিট লণ্ঠন কেরোসিন টর্চ ব্যাটারি মোমবাতি দেশলাই হাল্কা বাসন প্রভৃতি যাবতীয় রান্নার ও বাতি জ্বেলে কাজ করবার জিনিষ।

মিস্টার ধীর বললেন : এ সবের ভাবনা আমাদের নেই। সঙ্গে আমাদের খানসামা যাবে। তার ওপরেই সব ভার দিয়ে দিয়েছি।

স্বামীজী বললেন : একবার তবু দেখে নেবেন, পরে যাতে পস্তাতে না হয়। আর একটা দরকারী জিনিষ হল একটা ওষুধের বাক্স। যাত্রীদের মধ্যে কোন ডাক্তার না থাকলে নিজেদের চিকিৎসা নিজেদেরই করতে হবে।

মিসেস মাথুর বললেন : একটা ফার্স্ট এইড বক্স আমরা সঙ্গে এনেছি।

স্বামীজী বললেন : ওর ভেতর

জ্বরের ও পেটের অসুখের ওষুধ, মাথাধরার বড়ি, পায়ে বেদনার মালিশ, ঘায়ের মলম, মুখে মাখবার ক্রীম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি আছে কি না ভাল করে দেখে নেবেন।

তারপরে জিজ্ঞাসা করলেন : চোখ বাঁচাবার জন্যে কালো চশমা কিনে নিয়েছেন তো?

মায়া ধীর বলল : শুধু মিস্টার রায়ের জন্যে এক জোড়া চশমা কিনতে হবে।

তিনি বললেন : তার সময় আছে। যাত্রীরা এখান থেকে পরশু যাত্রা করছেন। আজ রাত্রে একবার আলোচনা করবেন যে, কী কী না হলে দু মাস আপনাদের চলে না। সেই সমস্ত জিনিষ কাল কিনে নেবেন। তবে মনে রাখবেন যে, যত জিনিষ বাড়বে, ঘোড়া আর ঝপ্পর সংখ্যাও বাড়বে তত।

মিষ্টার ধীর বললেন, বুঝেছি। কলম্বাসের মতো স্বাবলম্বী হয়ে আমাদের যাত্রা করতে হবে, কিন্তু সঙ্গে জাহাজ নেই।

স্বামীজী হেসে বললেন : ঠিক তাই।

তারপরে আমরা বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

॥ তিন ॥

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর আমি একটু পায়চারি করতে পথে বেরিয়েছিলাম। সহসা আবার লামার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। মনে হল, সকালে বেরিয়ে লামা এখন ফিরছে। বললাম : কী খবর লামাজী?

প্রসন্ন হাসিতে লামার মুখ ভরে গেল। বলল : আমার নাম টাশি থেনদুপ।

আমি বললাম : আপনি তো লামা, আপনাকে আমরা থেনদুপ লামা বলব। না না, আমাকে শুধু থেনদুপই বলবেন, আমি আর লামা নই।

আমি হেসে বললাম : বিয়ে করেছেন বুঝি?

না।

তবে?

বড় বিষণ্ণ দেখাল লামার দৃষ্টি। বলল, আমি আর গোম্পায় থাকি না, গোম্পা থেকে বেরিয়ে এসেছি।

কেন?

বেরিয়ে না এলে অন্য লামারা আমাকে বার করে দিতেন। কিংবা—

কিংবা কী?

খুন করে ফেলতেন আমাকে।

আমি পরম বিস্ময়ে প্রশ্ন করলাম কেন?

লামা হঠাৎ সংযত হয়ে গেল, বলল : না না, থাক সে কথা সে আমার ব্যক্তিগত কথা। আমিই ভুল করেছিলাম, মরাই আমার উচিত ছিল। বলে সামনের দিকে পা বাড়াল।

আমি অন্যদিকে যাচ্ছিলাম। এবারে পিছন ফিরে লামার সঙ্গেই চলতে শুরু করলাম। আর কোন প্রশ্ন করলাম না তাঁকে। আমি বুঝতে পেরেছি যে, এই তরুণ মানুষটির জীবনে একটা মস্ত বিপর্যয় ঘটে গেছে। সে কোন সুখের স্মৃতি নয়, সে এক বেদনার্ত কাহিনী। অসতর্ক মুহূর্তে লামা সেই দুঃখের ইঙ্গিত দিয়ে ফেলেছে, এর বেশি আর সে কিছু বলবে না। আমিও আর তাকে বিব্রত করতে চাইলাম না।

সুন্দর সুগঠিত দেহ এই থেনদুপ লামার। মুখের ফর্সা রঙে যেন আলতার ছোপ লেগেছে। ঢিলে আলখাল্লা কোমরে ফিতে দিয়ে বাঁধা। পায়ে বুট জুতো। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বয়স অনুমান করতে চাইলাম। চব্বিশ—পঁচিশের বেশি হয়তো হবে না, কিন্তু চোদ্দ—পনর বছরের কিশোরের মতো সরল হাসি-হাসি মুখ। এর অপরাধের কথা ভেবে আমি আশ্চর্য হলাম। এই বয়সে এমন কি অন্যায় করতে পারে যে, তাকে গোম্পা থেকে বেরিয়ে আসতে হল। তা না এলে অন্য লামারা তাকে খুন করত! লামা তো বুদ্ধের সেবক। তারাও মানুষ খুন করে! আমার মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন একসঙ্গে জট পাকিয়ে উঠল, কিন্তু এই সামান্য পরিচয়ের মূলধন সম্বল করে সব কথা জানতে চাইবার সাহস আমার হল না।

চলতে চলতে লামা আমাকে জিজ্ঞাসা করল : আপনি কতদূর যাবেন?

আমি সত্যি কথাই বললাম, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে বের হই নি, আপনাকেই একটু এগিয়ে দিয়ে আসব।

কিছু বলবার জন্য লামা যেন দ্বিধা করছিল। তা লক্ষ্য করে আমি বললাম : কিছু বলবেন কি?

লামার দ্বিধা তবু দূর হল না। অনেক সঙ্কোচে বলল : আজ সকাল বেলায় যে মহিলাকে দেখলাম, তিনি আপনার—

প্রশ্নটা লামা শেষ করতে পারল না। তার আগেই আমি বললাম : কেউ নয়।

লামা আমার মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাল। আমি তার দৃষ্টিতে বিস্ময় নয় ভয় দেখতে পেলাম। বললাম : কৈলাস যাবে বলে ওর দাদা ও বৌদির সঙ্গে আমাদের হোটেলে এসে উঠেছে।

লামা যে ভয় পেয়েছে, এবারে আমি তা স্পষ্ট দেখতে পেলাম। কিন্তু তার কারণ বুঝতে পারলাম না। জিজ্ঞাসা করলাম, কেন, তাতে ক্ষতি হয়েছে কিছু?

ক্ষতির কথা নয়।

তবে?

লামাকে বড় অন্যমনস্ক দেখাল, যেন হারিয়ে ফেলেছে নিজেকে। দৃষ্টি তার দূরের পাহাড়ে গিয়ে নিবদ্ধ হয়েছে। আমি তাকে বাস্তব জগতে ফিরিয়ে আনবার কোন চেষ্টা করলাম না।

এক সময়ে সে নিজেই বলল : কোথায় যেন ছ্যাতেনের সঙ্গে একটা মিল দেখতে পেয়েছি।

আমি খুবই সন্তর্পণে প্রশ্ন করলাম : ছ্যাতেন কে?

লামা তেমনি অন্যমনস্ক ভাবে বলল : আমাদের গ্রামেরই একটি মেয়ে। বয়স ঐ রকমই হবে। কিন্তু

কোথায় মিল তা ধরতে পারছি না।

আমি বললাম : নিশ্চয়ই কোথাও আছে।

খেনদুপ লামা বুঝি তার নিজের গ্রামে চলে গেছে। ছ্যাতেনকে মনে করবার চেষ্টা করছে প্রাণপণে। ঠিক মনে পড়ছে না। সে হয়তো অনেকদিন আগের কথা। কতদিন হল সে তার গ্রাম ছেড়ে এসেছে। আমার সে কথা জানা নেই। তা জানবার জন্য বললাম, আপনি কতদিন আগে এদেশে এসেছেন ?

লামা সংক্ষেপে বলল : বছর কয়েক আগে।

কিন্তু এই সংক্ষিপ্ত উত্তরে আমার কৌতূহল মিটল না। আমার আরও কিছু জানবার ইচ্ছা। বললাম : দু-তিন বছর ?

লামা বলল : বেশি। আমার বয়স তখন ঐ মেয়েটির মতো, যাকে আজ সকালে দেখলাম। ছ্যাতেনরও তখন ঐ বয়েস।

কথা বলতে বলতে আমরা তখন বাজার ছাড়িয়ে এসেছি। সামনে নন্দাদেবীর মন্দির। আমি বললাম : আসুন না এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটু বসি।

লামা আপত্তি করল না, আমাকে অনুসরণ করে মন্দিরে উঠে এল।

একটুখানি উঁচু জায়গায় এই মন্দির। দূরের পাহাড় দেখা যায় এক ধারে দাঁড়িয়ে। মন্দিরের দরজা বন্ধ। আমরা একটা চত্বরের উপরে পাশাপাশি বসলাম। তারপরে শুনলাম টাশি খেনদুপের জীবনের কথা। প্রথম দিনেই সব কথা সে আমাকে বলেনি, বলেছে একটু একটু করে, মানস সরোবরের পথে বিশ্রামের সময়, কিংবা পায়ে হেঁটে পথ চলতে চলতে।

প্রথম দিন আমি তাকে ভুল বুঝেছিলাম। ভেবেছিলাম যে, এ গল্প সে হয়তো সবার কাছেই বলে। তা না হলে আমাকেই বা বলবে কেন ? কিন্তু অল্পদিন পরেই ভুল আমার ভেঙ্গে গেল। দেখলাম যে, সে আর কারও কাছেই এ গল্প বলতে চায় না। অতর্কিতে কেউ এসে পড়লেই থেমে যায় গল্পের মাঝখানে।

শুধু একটি প্রশ্ন আমার মনে জেগে থাকে। এই গল্প শোনাবার জন্যে সে আমাকে কেন বেছে নিল ? এই প্রশ্ন আমি তাকে শেষ দিনে করেছিলাম। তার উত্তর শুনে আমি বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গিয়েছিলাম। প্রথমটায় বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু বিশ্বাস না করেও কোন উপায় ছিল না।

শেষ দিনের কথা শেষ দিনেই হবে, আজ হোক আজকের কথা। টাশি খেনদুপের গল্প আমি তার শৈশব থেকেই শুরু করি। [ক্রমশ।

শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব

বারীন্দ্রনাথ দাশ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

পুতনা কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করলো। তারপর মুখ ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে তাকালো ধৃতির দিকে। বললো, "তোমার এত ব্যস্ত হওয়ার কোনো কারণ ছিলো না। আমাকে কাল বললেও হোতো, পরশু বললেও হোতো। গর্গাচার্য বসুদেবের সঙ্গে কি অক্রূরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন, এ এমন কিছু বিশেষ সংবাদ নয়। তিনি বৃষ্ণিদের কুল-পুরোহিত, এঁদের গৃহে প্রায়ই যান এবং প্রায়ই যাবেন। নন্দ ঘোষ বসুদেবের মিত্র, সুতরাং তাঁরাও যে একবার মিলিত হবেন এ মোটেও অপ্রত্যাশিত নয়।"

ধৃতির মুখে একটা হতাশা ফুটে উঠলো। তার ধারণা ছিলো সে কোনো গোপন ষড়যন্ত্রের সন্ধান নিয়ে এসেছে। পুতনা শুনে আহ্লাদিত হবে।

পুতনা অপাঙ্গদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলো ধৃতির মুখভাব। সে মনে মনে সন্তুষ্ট হোলো। এসব সংবাদ আর কারো কর্ণগোচর হওয়া তার কাছে অবাঞ্ছনীয়। কংসের প্রতিপক্ষবর্গের সম্বন্ধে তার নিজের একটা [illegible] আছে—যা কাউকে সে জানতে দি[illegible]।

পুতনা বলে গেল, [illegible] আমাদেরই লোক। অত্যন্ত বিশ্বস্ত, [illegible] অত্যন্ত প্রেমপাত্র। আর অক্রূর সম্বন্ধে একটা সংবাদ তুমি হয়তো জানো না,—মহারাজ কংস তাকে অমাত্যবর্গের মধ্যে স্থান দেওয়ার কথা বিবেচনা করছেন।"

ধৃতির চোখ দুটি বিস্ফারিত হোলো একথা শুনে।

"কিন্তু এ সব গোপন সংবাদ। এখন কাউকে জানানো হবে না। তুমি আমাদের বিশ্বাসী বলেই তোমাকে বললাম।"

ধৃতি পুতনাকে আশ্বাস দিলো যে এসব কোনো কথা এখন সে কাউকে জানাবে না।

"সুতরাং বুঝতেই পারছো," পুতনা বললো, "অক্রূর এবং প্রচণ্ড অন্যান্য বন্ধুবর্গের সঙ্গে শৌণ্ডিকাপণে বসে সুরাপান ও অবসর অতিবাহিত করছিলো। নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গে একজন সুন্দরী সঙ্গিনী ছিলো।"

ধৃতি স্বীকার করলো যে শৌণ্ডিকাপণের এক সুন্দরী কিঙ্করী তাদের পরিচর্যা করছিলো বটে।

"কি নাম বললে?" পুতনা জিজ্ঞেস করলো "সুরোচনা? আহা, কী মধুর নাম। সত্যি, আমাদের মহারাজা কংসের হাতে শাসনক্ষমতা আসবার পর পুরবাসীরা জীবন উপভোগ করবার সুযোগ সুবিধাগুলো পাচ্ছে। দিবাভাগে সবাই নিজের কাজেকর্মে লিপ্ত থাকবে, সায়াহ্নের অবসর মুহূর্তগুলো স্ত্রী পুরুষ সবারই কাটবে পরস্পরের সঙ্গ উপভোগ করে, সুরাপান করে,—প্রচুর হাসি উল্লাস ও আনন্দ কোলাহলের মধ্যে। জানো ধৃতি, এসব সুযোগ পুরবাসীরা যতো বেশী পাবে, ততোই ভালো। কেউ আর কংসবিদ্বেষী হবে না, কেউ বিদ্রোহের কথা চিন্তা করবে না। তুমি বলো ধৃতি, রাজা উগ্রসেনের শাসনকালে এসব সুযোগ ছিলো? তখন আমাদের দেশ ছিলো গণরাজ্য। সাধারণ নাগরিকেরা প্রত্যেকেই জীবন উপভোগ করবার পরিবর্তে রাজ্যের ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেকটি সমস্যা নিয়ে সরবে তর্কবিতর্ক করে সময়ের অপচয় করতেই ভালবাসতো। মহারাজ কংস যদি শূরসেন রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ না করতেন, তাহলে মগধের জরাসন্ধ এতদিনে এদেশ অধিকার করে নিজরাজ্যভুক্ত করতেন। আমাদের স্বাধীনতা থাকতো না। আমরা পরাধীন হতাম।"

ধৃতি সকৃতজ্ঞভাবে স্বীকার করলো যে, সত্যি, মহারাজ কংস শূরসেন রাজ্যকে রক্ষা করেছেন। রাজ্যের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রতিবেশী রাজারা কংসকে ভয় পায়। পূর্বে সবার ধারণা ছিলো যাদব সমবায় নির্ঝঞ্ঝাট শান্তিপ্রিয় রাজ্য। সুতরাং তাদের কাছে যাদবজাতির কোনো সামরিক মর্যাদা ছিলো না। মহারাজা কংস শূরসেন রাজ্যকে মর্যাদা দিয়েছেন। এখন এ রাজ্যে সবাই সুখী, সবারই আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

পুতনা হেসে বললো, "তোমার এ কথাগুলো আমি উল্লেখ করবো মহারাজ কংসের কাছে।"

ধৃতি কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে প্রণাম করলো। কে না জানে, কংসের উপর পুতনার খুব প্রভাব। পুতনার একটি কথায় ধৃতির অবিশ্বাস্য পদোন্নতি হতে পারে।

সে চলে যাওয়ার পর পুতনা নিজের মনে একটু হাসলো। পরিচারিকা ইতিমধ্যে কেশ-পরিচর্যা আরম্ভ করেছিলো। তাকে শুনিয়ে পুতনা কতকটা আত্মগতভাবেই বললো, "একেবারে নির্বোধ। লোকটার মনে এ প্রশ্ন একবারও এলো না যে, যাঁকে মহারাজ কংস নিজের অমাত্যবর্গের মধ্যে স্থান দেওয়ার কথা বিবেচনা করছেন, সে রাজপ্রাসাদের একজন সাধারণ আরক্ষীর সঙ্গে শৌণ্ডিকাপণে প্রকাশ্যে সুরাপান করছে কেন।"

পরিচারিকা কোনো উত্তর দিলো না। নীরবে পুতনার কেশদাম নিয়ে একটা জটিল কবরীবিন্যাস রচনায় মনোনিয়োগ করলো।

পুতনা, মৃদুকণ্ঠে বললো, "আজ এ রাজ্যে একমাত্র আমিই বুঝতে পারছি ঘটনার গতি কোনদিকে প্রবাহিত হতে চলেছে। মহারাজ কংসকে একদিন স্বীকার করতেই হবে যে, আমার বুদ্ধি ও জ্ঞান তার প্রধান অমাত্য হস্তিপকের চাইতেও অধিক।"

একই কথা পুতনা পুনরাবৃত্তি করলো কংসের কাছে। তখন রাত্রি দ্বিপ্রহরের বড় বেশী বিলম্ব নেই। কংসের কেলিগৃহে রত্নখচিত পর্যঙ্কে পাশাপাশি বসেছিলো পুতনা ও কংস।

কংসের হাতে স্বর্ণ চষক। চক্ষু সুরা-প্রভাবে আরক্ত।

পুতনা ভৃঙ্গার থেকে মহার্ঘ মাধ্বী ঢেলে দিলো কংসের চষকে। তারপর পর্যঙ্কের পার্শ্বস্থিত ত্রিপদী কাষ্ঠফলকের উপর ভৃঙ্গার নামিয়ে রেখে বললো, "এ রাজ্যে একমাত্র আমিই বুঝতে পারছি ঘটনার গতি কোনদিকে প্রবাহিত হচ্ছে। আপনাকে একদিন স্বীকার করতেই হবে যে, আমার বুদ্ধি ও জ্ঞান আপনার অন্যান্য অনুচরদের চাইতেও অধিক।"

"বেশ, তাই যদি হয়," কংস সুরাপান করে জড়িতকণ্ঠে বললো, "তোমায় আমার প্রধানমন্ত্রী করবো। মন্ত্রগৃহে দেবে পরামর্শ ও মন্ত্রণা, কেলিগৃহে দেবে সঙ্গ। সত্যি, এমন সৌভাগ্য ক'জন রাজার হয়? সংসারের কোনো রাজা কোনো প্রধানমন্ত্রীর মুখের দিকে সন্ধ্যার পর আর তাকাতে পারে না," বলে নিজের রসিকতায় নিজেই উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো।

পূতনা হাসলো না। অলক্ষ্যে ঈষৎ অধর দংশন করলো। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললো, "কে আপনার প্রধানমন্ত্রী হতে চায়? আমি তো চাই না।"

"তুমি কি চাও পূতনা?" কংস জিজ্ঞেস করলো স্নেহের অভিব্যক্তিতে।

"একজন নারী জীবনের কাছে কি চায় মহারাজ?—একজন সুন্দরী, যৌবনবতী, বুদ্ধিমতী নারী জীবনের কাছে কি চাইতে পারে?"

কংস নয়ন উন্মীলিত করলো। বললো, "সংসার করতে চাও? আমাকে ত্যাগ করে?"

পূতনার চোখ দুটি অকস্মাৎ অশ্রুসিক্ত হোলো। বললো, "আপনাকে ত্যাগ করবো? আমি? একথা আপনি আমাকে বলতে পারলেন?"

কংস হেসে বললো, "তোমায় মাঝে মাঝে আঘাত না দিলে তোমার ওই অশ্রুসজল স্নিগ্ধরূপ আমি দেখতে পাইনা পূতনা।"

পূতনা সামলে নিলো নিজেকে। তারপর বললো, "আজ অক্রূর এসেছিলো।"

প্রণয়ী কংস নিমেষে রাজা কংসে পরিণত হোলো। ঔৎসুক্য অবদমিত করে জিজ্ঞেস করলো, "কি বললো সে? আমার অমাত্য হতে স্বীকৃত হয়েছে?"

"স্বীকৃতি বা অস্বীকৃতি কিছুই প্রকাশ করে নি," কংসের চোখে চোখ রেখে পূতনা ধীরকণ্ঠে উত্তর দিলো, "ওর কথাবার্তা শুনে আমার মনে হোলো, ব্যক্তিগতভাবে সে আপনার অনুরাগী।"

"হ্যাঁ, একদা আমাদের মধ্যে যথেষ্ট সখ্যতা ছিলো। কিন্তু,—কিন্তু তার অনুরাগ দিয়ে আমার কি হবে? আমি চাই তার সহায়তা। সে আমার সহায় হলে আমি বৃষ্ণি, অন্ধক ও সাত্বতদের সম্মিলিত বিরোধিতা সহজেই চূর্ণ করতে পারবো।"

"অক্রূর বলছে, তাহলে আপনিই দুর্বল হয়ে পড়বেন," বললো পূতনা।

"আমার প্রতিপক্ষীয়দের বিনাশ করে আমি দুর্বল হয়ে পড়বো?" হেসে উঠলো কংস।

"অক্রূর বলছে, তাহলে রাজসভার মাগধবর্গ অতি শক্তিমান হয়ে উঠবে। তারা আপনার হাতে কোনো ক্ষমতা থাকতে দেবে না। নামে রাজা থাকবেন আপনি, কিন্তু রাজ্যের প্রকৃত শাসক হবে হস্তিপক, প্রলম্ব, বক ও চাণুর—।"

"পূতনা।" শ্রুত হোলো কংসের গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

"—কিংবা হয়তো, দেবী অস্তি ও দেবী প্রাপ্তি আপনাকে এমনভাবে প্রভাবিত করবে যে, আপনি মহারাজ জরাসন্ধের একজন সামন্তে পরিণত হবেন।"

"তুমি আমাকে চেনো না পূতনা," কংস সুরা নিঃশেষ করে স্বর্ণচষক সশব্দে নামিয়ে রাখলো পার্শ্ববর্তী ফলকের উপর।

"আমি আপনাকে চিনি মহারাজ," পূতনার চোখ দুটি আবার অশ্রুসজল হোলো, "সে জন্যেই আমার ভয় হয়।"

"ভয়?" কংস বিস্মিত হোলো, "কিসের ভয়?"

"মহারাজা, আপনি জ্ঞানী, আপনি শাস্ত্রজ্ঞ, আপনি ইতিহাসবেত্তা। একথা কি আপনি জানেন না,—যে নৃপতি নিজের রাজ্যের কুলপতিদের সমর্থন হারিয়ে আত্মীয়তার সূত্রে সম্পর্কিত অন্য রাজ্যের রাজসভা থেকে আগত অমাত্য ও যোদ্ধাদের উপর নির্ভর করেন নিজের ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করে রাখবার জন্যে, তাঁর হাতে ক্ষমতা কোনোদিন থাকে না শেষ পর্যন্ত?"

"আমার মতো শক্তিমান লোকের হাতে ক্ষমতা চিরকালই থাকে,"—কংস উত্তর দিলো।

শান্তকণ্ঠে পূতনা বলে উঠলো, "আপনার মতো লোকের পরিণতি আরো ভয়ঙ্কর হয়।"

"কি বলছো তুমি?" কংসের গম্ভীর মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে উঠলো, "পূতনা, আমি তোমার প্রতি আসক্ত। তাই বলে তুমি মাত্রা অতিক্রম কোরো না। রাজার সঙ্গে এভাবে কথা বলা অত্যন্ত অশালীন।"

"আপনার কাছে সত্যিকথা বলতে আমি ভয় পাই না," পূতনার ঠোঁট দুটি কাঁপতে লাগলো, "কেন জানেন? আপনার ভালোবাসা আমি পেয়েছি, তাই আপনার জন্যে আমি জীবন দিতে পারি। মহারাজ, আপনাকে আমি ভালোবাসি," বলতে বলতে পূতনা কেঁদে ফেললো, কিছুক্ষণ অশ্রুবর্ষণ করলো, তারপর বললো, "আপনার কি একথা কোনোদিন মনে হয়নি যে, এ জগতে আমি ছাড়া আর কেউ আপনাকে ভালোবাসে না? সবাই আপনাকে সমীহ করে, সকাই আপনাকে ভয় করে,—কিন্তু কেউ ভালোবাসে না আপনাকে, কেউ না।"

কংস স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর নিজের হাতে সুরার ভৃঙ্গার তুলে নিয়ে চষকে ঢাললো। ঈষৎ পান করে বললো, "আমার মতো লোকের পরিণতি ভয়ঙ্কর হয়? কি পরিণতি হয় পূতনা?"

পূতনা মুখ ফিরিয়ে তাকালো কংসের দিকে, তারপর উত্তর দিলো, "একটা কথা আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি, মহারাজ, আপনি যদি কারো ক্ষমতা অর্জনে বাধা হয়ে দাঁড়ান, তারা আপনাকে হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করবে না।"

কংস হঠাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে কিছু একটা বলতে গেল, তারপর আত্মসংবরণ করে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো।

পূতনা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললো, "আপনি এত দাম্ভিক যে, কে আপনার প্রকৃত শুভানুধ্যায়ী, আপনি বুঝতে পারেন না।"

"অন্য কেউ আমার সঙ্গে এভাবে কথা বললে-----"

"----হ্যাঁ জানি," পূতনা কংসের কথার মাঝখানেই বলে উঠলো, "তাকে কঠোর শাস্তি দিতেন। একথা বলে আপনি পরোক্ষে আমাকেই ভর্ৎসনা করছেন। কিন্তু মহারাজ, দেবী প্রাপ্তি কিংবা দেবী অস্তি যদি আপনাকে একথা বলতেন, আপনি কি তাদের সঙ্গে এরকম রুক্ষ হতে পারতেন? না মহারাজ, আপনি পারতেন না। তারা প্রবল পরাক্রান্ত মহারাজাধিরাজ জরাসন্ধের কন্যা, তাঁদের সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে হয় অনেক বিচার বিবেচনা করে। শুধু তাই নয় মহারাজ, তাঁরা আপনার স্ত্রী, তাঁদের মর্যাদা আপনারই সমান। তাদের আপনি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে পারবেন না।"

কংস হাসলো ঈষৎ অবজ্ঞাভরে। কোনো উত্তর দিলো না।

পূতনা ভগ্নকণ্ঠে বলে গেল, "কিন্তু আমি কোনো দিগ্বিজয়ী সম্রাটের কন্যা নই, আমি আপনার পরিণীতা পত্নী নই, আমি এক সামান্য সেবাদাসী। আমার কথার কোনো মূল্য নেই। কিন্তু—"

হঠাৎ দৃপ্ত হয়ে উঠলো পূতনার কণ্ঠস্বর,----"কিন্তু আমি যদি হতাম এ রাজ্যের রাণী, আমি একবার দেখতাম কোথাকার কোন জরাসন্ধ আমার স্বামীকে নিজের নিয়ন্ত্রণাধীন করবার চেষ্টা করে। শুধু আমার ভ্রূভঙ্গিতে রাজ্যের সমস্ত গণমুখ্য আমার স্বামীর সিংহাসনের সামনে এসে তাদের উদ্ধত শির ভূমিসংলগ্ন করতো,----কিন্তু, আমি শুধু পূতনা, তাই আমার সমস্ত যোগ্যতা, সমস্ত ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমি শুধু শিশুহত্যা করে বেড়াচ্ছি।"

"ও হ্যাঁ, আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম---," বলে কংস উপাধানের নীচে থেকে বার করলো একটি পুটিকা। বললো, "তোমার স্তন-বিলেপন। আমার জাঙ্গলিক আজ করে এনেছে।"

পূতনা শান্তদৃষ্টিতে তাকালো, কিন্তু হাত বাড়িয়ে নিলো না।

কংস হাসলো। বললো, "আমার দু'-দুটো রাণী আছে।" তারা অত্যন্ত শান্ত, অতি সুশীলা। সুতরাং আমার কোনো আক্ষেপ নেই।"

"আপনি অনেক কিছুই জানেন না," মুখ ফিরিয়ে বললো পূতনা।

"কি জানি না?"

"আপনি প্রতিপক্ষ বলে জানেন গণরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠাপ্রয়াসী বৃষ্ণি ও সাত্বতদের কিন্তু ওরা ছাড়াও যে অন্য প্রতিপক্ষ আছে এ সংবাদ কি আপনার কানে আসে?"

"অন্য প্রতিপক্ষ? কাদের কথা বলছো তুমি?"

"আপনি কি একথা জানেন যে প্রাসাদের এমন বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিকে ভিষক বীথিতে বিষ-বৈদ্যদের কাছে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেছে যে আমাদের অতি শ্রদ্ধেয়া, অতি সুশীলা, অত্যন্ত শান্ত দুই রাণীর পরম অনুগ্রহভাজন? বিষবৈদ্যদের কাছে গোপনে বিশ্বাসী লোক পাঠানোর কি প্রয়োজন রাণীদের থাকতে পারে?"

কংস ঝট করে সোজা হয়ে বসলো। তীব্রকণ্ঠে বললো, "পূতনা, কি বলছো তুমি?"

"আরো বলছি শুনুন। আজ সায়াহ্নকালে নগরের এক প্রখ্যাত শৌণ্ডিকাপণে আপনার অনিষ্ট কামনায় এক গোপন ষড়যন্ত্র-সভার অনুষ্ঠান হয়েছিলো।"

"ষড়যন্ত্র-সভা?" কংসের কণ্ঠস্বর ভয়ঙ্কর হোলো, "কারা ছিলো সেখানে?"

পূতনা অবিচলিত শান্তকণ্ঠে যে উত্তর দিলো, সেটা শুনলে অক্রূর এবং হিরণ্যাভ স্তম্ভিত হোতো। পূতনা তার আয়তদৃষ্টি কংসের দিকে ফিরিয়ে বললো, "সেখানে অন্য যারা ছিলো তাদের পরিচয় আমি এখনো জানতে পারি নি, তবে এটুকু জানি যে দেবী অস্তি এবং দেবী প্রাপ্তি তাঁদের অতি বিশ্বস্ত সেই ব্যক্তিকে সেখানে পাঠিয়ে ছিলেন। সে ব্যক্তি সেখানে যোগদান করেছিলেন রাণীদের প্রতিনিধিরূপে।"

বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে কংস কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো পূতনার দিকে। তারপর বললো, "আমি তোমার কথা বিশ্বাস করি না।"

"বেশ," উত্তর দিলো পূতনা, "আমি গোকুল থেকে ফিরে আসি, তারপর আপনার হাতে বিস্তারিত বিবরণ ও প্রমাণ তুলে দেবো।"

কংস চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ, ধীরে ধীরে পান করলো চষকের মাধ্বী। তারপর শান্তকণ্ঠে বললো, "যাই হোক, দুর্ভাবনার কোনো কারণ আমি দেখি না। যে-কোনো পরিস্থিতি আয়ত্তের মধ্যে আনতে আমি সক্ষম বলে মনে করি নিজেকে। এখন উপস্থিত কর্তব্য বিবেচনা করা যাক,---পূতনা।"

"আদেশ করুন মহারাজ।"

"কাল প্রত্যূষে তুমি গোকুল যাত্রা করছো।"

"হ্যাঁ, মহারাজ।"

"গোপপ্রধান নন্দ ঘোষ নিশ্চয়ই আরো কয়েকদিন মথুরায় অবস্থান করবে?"

একমুহূর্ত চুপ করে থেকে পূতনা বললো, "আমি কোনো সংবাদ পাই নি মহারাজ। তবে আমার ধারণা তিনি হয়তো কিছুদিন মথুরায় থাকবেন।"

[ক্রমশ।

"I had a feeling once about Mathematics—that I saw it all. Depth beyond Depth was revealed to me—the Byss and the Abyss. I saw—as one might see the transit of Venus or even the Lord Mayor's Show—a quantity passing through infinity and changing its sign from plus to minus. I saw exactly how it happened and why the tergiversation was inevitable—but it was after dinner and I let it go."

—*Winston S. Churchill.*
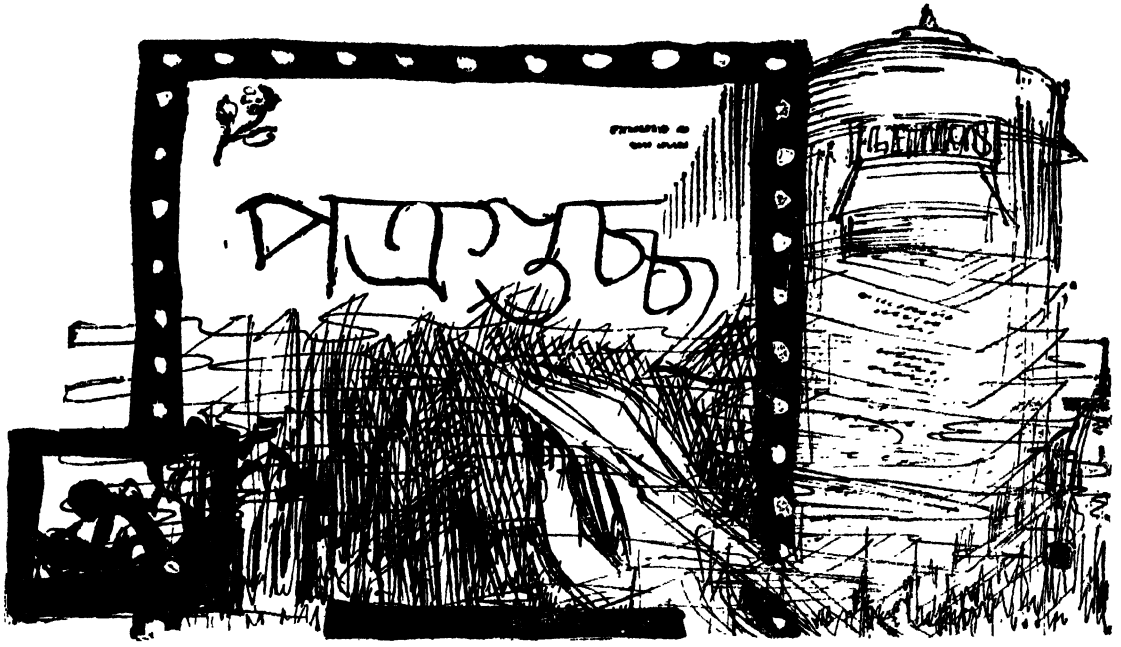
[জাতীয়তার মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা শুধু বাঙলার নয়, ভারতের এক অসামান্য সম্পদ। বাঙলার জাতীয় জীবনে তাঁর রচনার প্রভাব সম্বন্ধে নতুন করে আজ বলার কিছু নেই। তাঁর রচনার সঙ্গে সারা জাতির ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকলেও তাঁর চরমপত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা মহিলাবর্গ ছাড়া জনসাধারণের পরিচয় বোধ করি নেই। বলা বাহুল্য এই চরমপত্রের জন্মও তাঁরই অমর লেখনী থেকে। নিম্নে তাঁর চরমপত্রটি প্রকাশ করা হল—এতে তাঁর সহধর্মিণী তিন কন্যা এবং জ্যেষ্ঠ জামাতার নাম উল্লিখিত আছে। এটি সর্বসাধারণের সামনে সর্বপ্রথম তুলে ধরেন স্বর্গত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এবং শ্রীসুধীর-কুমার মিত্র।—স]

বঙ্কিমচন্দ্রের চরমপত্র বা উইল

১৮৮৭ খৃস্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র একখানি দলিল সম্পাদন করিয়া তাঁহার সম্পত্তি কি ভাবে বণ্টন করা হইবে তাহার নির্দেশ দিয়া যান। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত এই দলিলখানি এ-যাবৎ লোকচক্ষুর অন্তরালে ছিল। ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত এই দলিলখানি বঙ্কিমচন্দ্রের দৌহিত্র স্বর্গীয় ব্রজেন্দ্রসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন।

লিখিতং শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সাং—কাঁটালপাড়া, থানা—নৈহাটী, জেলা ২৪-পরগণা, সব-রেজিষ্ট্রী নৈহাটী হাল মোকাম শহর কলিকাতা ৫নং প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলি কস্য উইল পত্রমিদং কার্যনঞ্চোগে যেহেতু আমার প্রাচীন বয়স উপস্থিত এক্ষণে আমার সম্পত্তি সম্বন্ধে আমার উইল করা বিধেয়. এজন্য আমি স্বেচ্ছাক্রমে সুস্থ

● বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরীরে, সজ্ঞানে নিম্নলিখিতমত উইল করিতেছি:

১। আমার মৃত্যুর পর আমার যা কিছু স্থাবর-অস্থাবর পুস্তকের কপিরাইট বা অপর যে কিছু সম্পত্তি আছে বা থাকিবে তাহাতে আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী সম্পূর্ণ অধিকারিণী হইবেন এবং তাহাতে দান-বিক্রয়-হস্তান্তর করার তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার থাকিবে। এবং ঐ সকল সম্পত্তি সম্বন্ধে তিনি নিজে উইল করিতে পারিবেন।

২। কেবল এই সকল সম্পত্তির মধ্যে শহর কলিকাতার পটলডাঙার অন্তর্গত প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গলিতে ৫ নম্বরের যে খরিদা পোক্তা বাটী ও ৪ নম্বরের যে খরিদা জমি আছে তাহা আমার উক্ত বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী দান, বিক্রয় অথবা হস্তান্তর করিতে পারিবেন না। বা তৎসম্বন্ধে উইল করিতে পারিবেন না। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ ৫ নম্বরের বাটী ও ৪ নম্বরের ভূমি আমার

জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী প্রাপ্ত হইবেন। তখন উক্ত শরৎকুমারী দেবী উহাতে সম্পূর্ণ স্বত্বশালিনী হইবেন এবং তাঁহার উহাতে দান বিক্রয় বা অন্য প্রকার হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে। যদি আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর মৃত্যুকালে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা (ঈশ্বর না করুন) বিদ্যমান না থাকেন, তবে উক্ত ৫ নম্বরের ভবন ও ৪ নম্বরের ভূমি শরৎকুমারী দেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র প্রাপ্ত হইবেন।

৩। যদি আমার মৃত্যুর পর কোন সময়ে আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী বিবেচনা করেন যে, উক্ত ৫ নম্বরের বাটী বা ৪ নম্বরের ভূমি বিক্রয় করা আবশ্যক তবে আমার উক্ত জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর লিখিত সম্মতি লইয়া বিক্রয় করিতে পারিবেন নচেৎ পারিবেন না। ঈশ্বর না করুন। ঐ সময়ে যদি শরৎকুমারী দেবী বিদ্যমান না থাকেন তবে শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী আপন স্বেচ্ছাক্রমে ঐ ৫ নম্বরের ভবন ও ৪ নম্বরের ভূমি বিক্রয় করিতে পারিবেন। কাহারও সম্মতির অপেক্ষা করিবেন না।

৪। যদি আমার মৃত্যুর পূর্বেই আমার উক্ত বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবীর মৃত্যু হয়, তবে আমার মৃত্যুর পরে আমার উক্ত সম্পত্তিতে যে যে প্রকারে অধিকারী ও স্বত্ববান হইবে তাহা নিম্নে ক, খ, গ, ঘ দফাওয়ারিতে লিখিলাম।

(ক) আমার সমস্ত সম্পত্তির মধ্যে যাহা স্থাবর সম্পত্তি তাহাতে আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী সম্পূর্ণ স্বত্বাধিকারিণী হইবেন। তাঁহার দান-বিক্রয়ের অধিকার থাকিবে। ইহার মধ্যে আমার কাঁঠালপাড়ায় যে পৈত্রিক ভদ্রাসন বাটী আছে তাহাতে আমার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী নীলাব্জকুমারী এবং আমার তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী উৎপলকুমারী দেবীর যাবজ্জীবন বাস করিবার অধিকার রহিল।

(খ) আমার অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে আমার শাল, রুমাল, ইলবাস, পোষাক, গাড়ী, ঘোড়া, ঘড়ি, ঝাড়, লণ্ঠন, আসবাব ও লাইব্রেরী আমার জ্যেষ্ঠ জামাতা শ্রীমান রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রাপ্ত হইবেন। অবশিষ্ট অস্থাবর সম্পত্তি আমার তিন কন্যা তুল্যাংশে পাইবেন।

(গ) আমার লিখিত পুস্তকের কপিরাইটে আমার যে স্বত্ব তাহা আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী প্রাপ্ত হইবেন। তাহাতে যে লভ্য হইবে অর্থাৎ পুস্তক ছাপানো ও বিক্রয় করার খরচখরচা বাদে যে লাভ থাকিবে তাহার মধ্যে এক টাকায় তিন আনা তিনি আমার দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী নীলাব্জকুমারীকে এবং ফি টাকায় তিন আনা আমার কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী উৎপলকুমারীকে দিবেন এবং তাঁহারা চাহিলে তিন মাস অন্তর তাঁহাদের এক এক খণ্ড হিসাব দিবেন। শরৎকুমারী স্বয়ং ফি টাকায় দশ আনা লইবেন।

(ঘ) ঈশ্বর না করুন যদি আমার মৃত্যুকালে আমার বনিতা শ্রীমতী রাজলক্ষ্মী দেবী এবং আমার জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবী উভয়েরই অভাব হয় তবে এই উইলের দ্বারা যে অধিকার আমি শ্রীমতী শরৎকুমারীকে দিলাম তাহা তদভাবে তাঁহার পুত্রগণ প্রাপ্ত হইবেন। আর এই উইলের দ্বারা যে অধিকার আমার অপর দুই কন্যাকে দিলাম তাঁহাদের অবর্তমানে তাঁহাদের পুত্রগণ আপন আপন মাতার অংশ তুল্যাংশে পাইবেন। যদি (ঈশ্বর না করুন) ঐ দুই কন্যার কাহারও পুত্র বর্তমান না থাকে তবে সেই কন্যার অবর্তমানে শ্রীমতী শরৎকুমারী দেবীর পুত্রগণ তাঁহার স্বত্বে স্বত্ববান হইবেন। ইতি---১৮৮৭, ২১ ফেব্রুয়ারী।

স্বাঃ---শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

Executed in my presence
Bepin Chandra Chatterjee
of Kantalpara
Anukul chandra chatterjee
of Kantalpara.

আমার সম্মুখে দস্তখত হইল—
শ্রীউমাচরণ বন্দোপাধ্যায়
সাং—ভাটপাড়া
শ্রীবিনয়কৃষ্ণ দাস
সাং অম্পষ্ট, জেলা—বাঁকুড়া

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীকে রবীন্দ্রনাথের পত্র

(অভিনন্দনলিপি)

ওঁ

সুহৃত্তম শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

হে মিত্র, পঞ্চাশৎ বর্ষ পূর্ণ করিয়া তুমি তোমার জীবনের ও বঙ্গ সাহিত্যের মধ্যগগনে আরোহণ করিয়াছ, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

যখন নবীন ছিলে তখনই তোমার ললাটে জ্ঞানের শুভ্রমুকুট পরাইয়া বিধাতা তোমাকে বিদ্বৎ সমাজে প্রবীণের অধিকার দান করিয়াছিলেন। আজ তুমি যশে ও বয়সে প্রৌঢ় কিন্তু তোমার হৃদয়ের মধ্যে নবীনতার অমৃত-রস চিরসঞ্চিত। অন্তরে তুমি অজর, কীর্তিতে তুমি অমর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সর্বজনপ্রিয় তুমি মাধুর্যধারায় তোমার বন্ধুগণের চিত্তলোক অভিষিক্ত করিয়াছ। তোমার হৃদয় সুন্দর, তোমার বাক্য সুন্দর, তোমার হাস্য সুন্দর, হে রামেন্দ্রসুন্দর, আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

পূর্বদিগন্তে তোমার প্রতিভার রশ্মিচ্ছটা স্বদেশের নবপ্রভাতে উদ্বোধন সঞ্চার করিতেছে। জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যে চিরদিন তুমি দেশমাতার পূজা করিয়াছ। হে

মাতৃভূমির প্রিয়পুত্র আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

সাহিত্য পরিষদের সারথি তুমি এই রথটিকে নিরন্তর বিজয়পথে চালনা করিয়াছ। এই দুঃসাধ্য কার্যে তুমি অক্রোধের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিয়াছ, ক্ষমার দ্বারা বিরোধকে বশ করিয়াছ। বীর্যের দ্বারা অবসাদকে দূর করিয়াছ এবং প্রীতির দ্বারা কল্যাণকে আমন্ত্রণ করিয়াছ। আমি তোমাকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

প্রিয়াণাং ত্বা প্রিয়পতিংহবামহে
নিধীনাং ত্বা নিধিপতিংহবামহে।

প্রিয়জনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রিয় তুমি, তোমাকে আহ্বান করি। নিধিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নিধি তুমি তোমাকে আহ্বান করি। তোমাকে দীর্ঘ জীবনে আহ্বান করি। দেশের কল্যাণে আহ্বান করি, দেশের বন্ধুজনের হৃদয়াসনে আহ্বান করি। ---৫ই ভাদ্র ১৩২১

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র কাব্য

সৃষ্টি প্রলয়ের তত্ত্ব,
লয়ে সদা আছ মত্ত,
দৃষ্টি শুধু আকাশে ফিরিছে,
গ্রহতারকার পথে
যাইতেছ মনোরথে,
ছুটিছ উল্কার পিছে পিছে;
হাঁকায়ে দু'চারি জোড়া
তাজা পক্ষীরাজ ঘোড়া,
কল্পনা গগন---ভেদিনী
তোমারে করিয়া সঙ্গী
দেশ-কাল যায় লঙ্ঘি,
কোথা পড়ে যাবে এ মেদিনী?
সেই তুমি ব্যোমচারী,
আকাশ-রবিরে ছাড়ি'
ধরার রবিরে করো মনে।
ছাড়িয়া নক্ষত্র গ্রহ
একি আজ অনুগ্রহ
জ্যোতির্হীন মর্ত্যবাসী জনে।
ভুলেছ ভুলেছ কক্ষ
পুরবীণে ভ্রষ্ট-লক্ষ্য
কোথা হ'তে কোথায় পতন।

ত্যজি' দীপ্ত ছায়া-পথে
পড়িয়াছ কায়া-পথে,
মেদ-মাংস-মজ্জা-নিকেতন।
বিধি বড়ো অনুকূল,
মাঝে মাঝে হয় ভুল,
ভুল থাক জন্ম জন্ম বেঁচে।
তবু-তো ক্ষণেক তরে
ধূলিময় খেলাঘরে
মাঝে মাঝে দেখা দাও কেঁচে।
তুমি সদা কাশী-বাসী
সম্প্রতি লয়েছ আসি'
বাবা ভোলানাথের শরণ;
দিব্য নেশা জমে ওঠে
দু'বেলা প্রসাদ জোটে,
বিধিমতে ধূমোপকরণ।
জেগে উঠে মহানন্দ
খুলে যায় ছন্দোবন্ধ
ছুটে যায় পেন্সিল উদ্দাম,
পরিপূর্ণ ভাবভারে
লেফাফা ফাটিয়া পড়ে
বেড়ে যায় ইস্টাম্পো দাম।

আমার সে কর্ম নাস্তি,
দারুণ দৈবের শাস্তি,
শ্লেষ্মা দেবী চেপেছেন বক্ষে,
সহজেই দম কম
তাহে লাগাইলে দম
কিছুতে রবে না আর রক্ষে।
নাহি গান নাহি বাঁশী
দিনরাত্রি শুধু কাশী
ছন্দ তাল কিছু নাহি তাহে;
নব-রস কবিত্বের
চিত্তে ছিল জমা ঢের
ব'হে গেল সর্দির প্রবাহে।
অতএব নমো নম
অধম অক্ষমে ক্ষম
ভঙ্গ আমি দিনু ছন্দরণে
মগধে কলিঙ্গে গৌড়ে
কল্পনার ঘোড় দৌড়ে
কে বলো পারিবে তোমা সনে।
উডফিল্ড শিমলা
জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭

বিশ্বভারতীর সৌজন্যে।

ঋষি মোক্ষমূলারের পত্র ঃ প্রত্নতাত্ত্বিক মনীষী ডঃ রামদাস সেনকে লেখা

ইয়োরোপের যা কিছু ভাল, যা কল্যাণকর তা অবশ্যই সবটুকু পুরোপুরি ভাবে গ্রহণ কর। কিন্তু নিজেরা কখনও কোন কারণে ইয়োরোপীওতে পরিণত হয়ো না। মঙ্গলকর ও শুভাময় যে সকল কাজের দ্বারা সকলে যে ঈশ্বরের প্রকারান্তরে সেবা করে থাকে, সেই ঈশ্বরের সেবায় রত, অবদানশীল মৃত্তিকার সন্তান, মনুর পুত্র হয়ে থেক। অর্থাৎ যা আছে হুবহু তাই থেক, তা থেকে বিন্দুমাত্র পরিবর্তিত হয়ো না।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র

কৃষ্ণনগর
২৬এ মে ১৮৬১

প্রিয়বরেষু,

ভাই, আমরা এখন বাঙলার উদ্যানে দিবসগুলি অতিবাহিত করিয়া চলিতেছি। ব্রহ্মানন্দের পরম উদ্দীপনাময়ী ও হৃদয়ে গভীরভাবে আবেদন জাগানো বক্তৃতাসমূহ কৃষ্ণনগরে এক অভাবনীয় সাড়া জাগাইয়া তুলিয়াছে দিকে দিকে। ইহার প্রভাব এখানে সর্বত্রই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। এই ব্যাপারে এখানকার মিশনারীদিগের সহিত আমাদের এক প্রচণ্ড এবং দুর্বার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। তবে জনসাধারণের অভিমতে এই সংগ্রামে মিশনারী দল এক নিদারুণ পরাজয় বরণ করিয়াছে। এমন কি এক প্রাচীনপন্থী সংরক্ষণশীল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণও আমাদের বিপুল সাধুবাদ দিলেন, আমাদের উভয়েরই শত্রুগোষ্ঠীকে পরাস্ত করার ক্ষেত্রে সফলতা অর্জনের জন্য।

মূলত ইংরাজী ভাষায় লিখিত সত্যেন্দ্রনাথের উপরোক্ত পত্রটির সম্বোধনে "মাই ডিয়ার কাজিন" লেখা আছে। অতএব এই কারণেই আমরা অনুমান করি যে পত্রটি গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্র : গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত

১৪ই জুলাই, ১৮৬৭
আমেদাবাদ

প্রিয়বরেষু,

গুণুদাদা। কয়েক দিন পূর্বে তোমার নিকট হইতে একটি এবং যদুর নিকট হইতে একটি পত্র আমি পাইয়াছি এবং ইতোমধ্যে তাহাদের জবাবও আমি দিয়াছি। দশ দিনের পূর্বে চিঠি পৌঁছিবে এরূপ আশা তুমি কখনই করিতে পার না। জোড়াসাঁকোর থিয়েটারের আদি ইতিহাস আজ অবলুপ্তির গহ্বরে স্থানলাভ করিয়াছে, সে ইতিবৃত্ত আজ বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে, তাহা আজ পুরাতত্ত্বে পরিণত। কোন সুযোগ্য ঐতিহাসিক তাহাকে পুনরায় বর্তমানের আঙ্গিনায় আনিয়া তাহার মধ্যে যদি পুনবার তাহার লুপ্ত জ্যোতি ও ঔজ্জ্বল্য সঞ্চারিত করিতে পারেন তাহা হইলে তো ভালই হয়। সেদিন কে ভাবিয়াছিল বল তো—আমাদের সেই ইটিং ক্লাবের দিনগুলিতে এই চিন্তা কাহার মস্তিষ্কে জাগিয়াছিল যে সেই বীজ একদিন মহীরুহে পরিণত হইবে, ক্ষুদ্র সূচনা প্রসব করিবে এক বিরাট পরিণতি সামান্য একটি অগ্নিকণা রূপ লইবে অপ্রতিরোধ্য লেলিহান শিখায়? বল, কে ভাবিয়াছিল এই কথা ভবিষ্যতের দিকে এতখানি দূরগামী দৃষ্টি সেদিন কাহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ইহা যদি তিলমাত্রও আমাদের বুদ্ধিতে বা চিন্তায় ধা মারিত। এখনও যদি স্মৃতির সূত্রের সাহায্যে নিজেদের দুই বৎসর পূর্বে লইয়া যাইতে পারি তাহা হইলে দেখা যাইবে যে, সেই বহু স্মৃতিবিজড়িত কক্ষটিতে আমরা সকলে সমবেত। সেই ঘরে আবার যেন কয়েকটি আনন্দঘন আত্মার সমাবেশ ঘটিয়াছে। আমাদের জীবনে কত মধুরতম লগ্ন সেই কক্ষে কাটিয়াছে, কত উচ্চ হাস্যের রোলে কক্ষটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে, মনে পড়ে সেখানে বামার চিত্তাকর্ষক গানগুলি গাহিতে সে কি প্রবল উত্তেজনা, গরম গরম কচুরি ও ছোকায় মুহূর্তগুলি কতখানি সজীব ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠিত।

মনে পড়ে গোপাল উড়ের যাত্রা দেখিয়া এই থিয়েটার সৃষ্টির পরিকল্পনাটি আমাদের মস্তিষ্কে জাগ্রত হয়। গাঙ্গুলী, তুমি এবং আমি এই তিনজনই সর্বপ্রথম এ বিষয়ে আগ্রহী হই এবং এ বিষয়ে অগ্রসর হইতে থাকি। যদু যে ইহার অন্যতম পরিকল্পনাকার ইহা তো আমার মনে হয় না।

তোমার স্নেহের
স্বাঃ—জে এন টেগোর

মূলত ইংরাজী ভাষায় লিখিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উপরোক্ত পত্রটিতে "যদু" এবং "গাঙ্গুলী" বলে দু'টি নাম উল্লেখিত হয়েছে। এঁরা উভয়েই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জামাতা এবং জ্যোতিরিন্দ্র নাথের ভগ্নীপতি। প্রথম জন যদুকমল মুখোপাধ্যায় মহর্ষির তৃতীয়া কন্যা শরৎকুমারী দেবীকে বিবাহ করেন। স্বর্গত শিল্পাচার্য অসিতকুমার হালদার ছিলেন যদুকমলের অন্যতম দৌহিত্র। দ্বিতীয়জন সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় মহর্ষির জ্যেষ্ঠা কন্যা সৌদামিনী দেবীর পাণিগ্রহণ করেন। প্রখ্যাতনাম্নী চিত্রতারকা শ্রীমতী দেবিকারাণীর জননী ছিলেন সারদাপ্রসাদের অন্যতমা দৌহিত্রী।

ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য

[বিশ্বভারতীর নবনির্বাচিত উপাচার্য ও বিদগ্ধ দার্শনিক]

আধুনিক ভারতের দর্শন জগতে কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য একটি পরমোজ্জ্বল নাম। কৃষ্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য এমন একটি নাম—যে নাম সর্বভারতীয় দার্শনিক সমাজে বহন করে বিপুল শ্রদ্ধা, সম্মান ও গুরুত্ব। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে দর্শনশাস্ত্রের অনুশীলনে রত হলেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র কালিদাস ভট্টাচার্য। নিরবচ্ছিন্ন ও অনলস সাধনা তাঁকেও প্রতিষ্ঠিত করল দার্শনিক মহলের একটি বিশিষ্ট আসনে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে তাঁর দার্শনিক খ্যাতি ভারতীয় দর্শনের মুখ উজ্জ্বল করল।

দর্শনের সাধনাতেই তাঁর জীবনের একটি দীর্ঘ অংশ অতিবাহিত হল। এবার তাঁর জীবনমঞ্চের অঙ্ক বদল ঘটল। জীবনের রঙ্গমঞ্চে এবার নতুন ভূমিকায় তাঁর আবির্ভাব। আরও বৃহত্তর পরিসরের কর্মজগতে এবার তাঁর পদার্পণ। সম্প্রতি ঘোষিত হল বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের আসনে তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

১৯১১ সালে তার জন্ম। শ্রীরামপুরের ইউনিয়ন ইনস্টিটিউশান থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন [illegible] সালে। হুগলী কলেজে আই-এ পড়া আরম্ভ করলেন। ১৯৩০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক-স্নাতক পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের মধ্যে দেখা গেল তাঁর নামটি তৃতীয় স্থান অধিকার করে আছে। প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন দর্শনে অনার্স নিয়ে, অল্পদিনের মধ্যেই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কর্তৃপক্ষের বিরাগের পাত্র হওয়ার জন্য তাঁকে আবার হুগলী কলেজেই ফিরে আসতে হয়। এখান থেকেই তিনি বি-এ পরীক্ষা (অনার্স সহ) দেন ও প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানটি আপন অধিকারভুক্ত করেন। ১৯৩৪ সালে দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষা দেন ও ফল পূর্ববর্তী
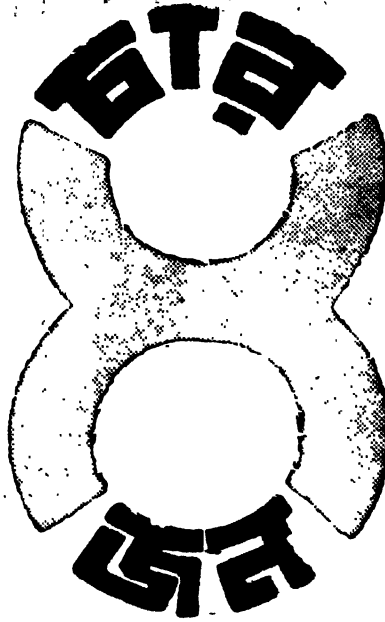
পরীক্ষারই অনুরূপ ছিল—সেই প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানটি অধিকার।

১৯৩৬ সালে অধ্যাপক হিসাবে তিনি যোগ দিলেন বিদ্যাসাগর কলেজে। ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা সুরু করলেন। দর্শনশাস্ত্রে 'ডক্টরেট' লাভ করলেন ১৯৪৫ সালে। সংস্কৃত কলেজে ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক রূপে যোগদান করলেন ১৯৫১ সালে।

বিশ্বভারতী যখন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ নিল সেই সময় তার পাঠ্যসূচী প্রণয়ন, পরীক্ষা ও অধ্যাপক নির্বাচনী সভার কর্মীদিগকে কেন্দ্র করে বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর প্রথম যোগসূত্র স্থাপিত হয়। বিশ্বভারতীর তদানীন্তন উপাচার্য স্বর্গত ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন দর্শন বিভাগে প্রধানের পদ গ্রহণের (১৯৫৭) ১৯৫৮ সালে তিনি লাভ করলেন বিশ্বভারতীর স্নাতকোত্তর ও গবেষণা বিভাগ—বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষের দায়িত্বভার। ১৯৬৪ পর্যন্ত সেই আসনে তিনি ছিলেন সমাসীন। এরই মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আহ্বান আসে আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল অধ্যাপক পদ গ্রহণের।

● ডঃ কালিদাস ভট্টাচার্য

ভারতীয় দর্শন-কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের আসনে চার বছর তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমেরিকান ফিলজফিকাল এ্যাসোসিয়েশনের ভারতীয় শাখার তিনি এক বিদগ্ধ সদস্য। ১৯৬৪ সালে হাওয়াইতে অনুষ্ঠিত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন সম্মেলনে তিনি তিনজন ভারতীয় প্রতিনিধির অন্যতম ছিলেন। অল্টারনেটিভ স্ট্যাণ্ডপয়েন্ট ইন ফিলজফি, অবজেক্ট। কনটেণ্ট এ্যাণ্ড রিলেশান, দ্য কনসেপ্ট অফ কজ এ্যাজ ইন ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড দ্য ওয়েস্ট, ইণ্ডিয়ান থিওরিস অফ নলেজ এ্যাণ্ড সেলফ্, ফিলজফি—লজিক এ্যাণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ নামক তাঁর প্রণীত গ্রন্থগুলির মধ্যে তাঁর প্রতিভার যে অনন্যতা প্রতিবিম্বিত হয়েছে—তা বিপুল সাড়া জাগিয়েছে আন্তর্জাতিক পণ্ডিতসমাজে। ইণ্ডিয়ান ফিলজফিকাল কোয়ার্টালি এবং বিশ্বভারতী জার্নাল অফ ফিলজফি পত্রিকা দুটিও তাঁর সম্পাদন-কৃতিত্বের স্বাক্ষরবাহী।

রবীন্দ্রস্বপ্ন সম্ভূত এবং তাঁর আদর্শে সমৃদ্ধ বিশ্বভারতীর (যা আজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত) নেতৃত্বভার আজ তাঁর উপর ন্যস্ত হ'ল। তাঁর মত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক মনীষীর নায়কত্বে বিশ্বভারতীর আরও উজ্জ্বল, আরও সমৃদ্ধ, আরও অবদানশীল হয়ে জাতীয় জীবনে দেখা দিক এবং তার ভাবীকালের ইতিহাস আরও আলোর সমারোহে বয়ে যাক—এই কামনাই সর্বান্তঃকরণে করি।

ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগীয় প্রধান ও দিকপাল ঐতিহাসিক)

অতীতকে অবলুপ্তি, বিস্মৃতি এবং নিশ্চিহ্নতার গ্রাস থেকে রক্ষা করে বর্তমানের পরিসরেও সমান ঔজ্জ্বল্যে ও মহিমায় যিনি বাঁচিয়ে রাখেন তিনি ঐতিহাসিক। ঐতিহাসিকের দুশ্চর তপস্যার ফলেই বহু শতাব্দীর দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করে অতীত এসে দাঁড়ায় বর্তমানের আঙ্গিনায়। বর্তমানের মধ্যে, ভবিষ্যতের মধ্যে বেঁচে থাকে ঐতিহাসিকেরই কল্যাণে অতীতের অনুশীলনে ঐতিহাসিককেও যে পরিমাণ ধৈর্য, ক্লেশ স্বীকার এবং অধ্যবসায়ের পরিচয় দিতে হয় তাও এক কথায় বিস্ময়কর। ইতিহাসের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে বাংলা তথা সমগ্র ভারতের মুখ যাঁরা বহির্ভারতে উজ্জ্বল করেছেন বিদগ্ধ ঐতিহাসিক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডঃ নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ তাঁদের অন্যতম।

১৯০৩ সালে ১০ই নভেম্বর তাঁর জন্ম। রাজশাহী জেলার অন্তর্গত বারুইহাটি গ্রামে তাঁদের আদি নিবাস। বাবা স্বর্গত প্রমোদকৃষ্ণ সিংহ ছিলেন সাব-জজ। নরেন্দ্রকৃষ্ণ যখন আট বছরের বালক সেই সময় চুয়াল্ল বছর বয়েসে প্রমোদকৃষ্ণের জীবনান্ত হয়।

রাজশাহী শহরে শুরু হয় তাঁর বিদ্যারম্ভ। ১৯২০ সালে দীঘাপাতিয়া হাই স্কুল থেকে তিনি উত্তীর্ণ হলেন প্রবেশিকা পরীক্ষায়। ১৯২২ সালে রাজশাহী কলেজ থেকে আই, এ, পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ। প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র হিসাবে বি, এ, পরীক্ষায় ইতিহাসের অনার্সে প্রথম শ্রেণীর দ্বিতীয় স্থানটি তিনি আয়ত্তে আনলেন। ইতিহাসে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম স্থানটি এল তাঁর অধিকারে।

১৯২৭ থেকে ১৯২৮ সালের জুন পর্যন্ত ইম্পিরিয়্যাল রেকর্ড ডিপার্টমেণ্টে তিনি গবেষণা কার্যে ব্যাপৃত থাকেন পরবর্তীকালে রঞ্জিত সিংহ সম্বন্ধীয় যে বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থটি তাঁকে বিপুল প্রসিদ্ধি ও খ্যাতি এনে দেয় সেই গ্রন্থটির পরিকল্পনা এবং উপকরণ সংগ্রহ এই সময় হয়। সেদিক দিয়ে এই সময়টি তাঁর জীবনেতিহাসে বিশেষভাবে দীপ্তিমান।

● নরেন্দ্রকৃষ্ণ সিংহ

মেদনীপুর কলেজে অধ্যাপনার ভার পেলেন ১৯২৮ সালের জুলাই মাসে। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ঐ কলেজের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে এলেন ডায়োসেসান কলেজে। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত ঐ কলেজে অধ্যাপনা করে ছ' মাসের জন্য তিনি যোগ দিলেন আশুতোষ কলেজে। ১৯৩৬ সালে তাঁকে দেখা গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অন্যতম অধ্যাপকরূপে। ১৯৫৫ সালে তিনি আশুতোষ অধ্যাপক (ইতিহাসের বিভাগীয় প্রধান) রূপে ঘোষিত হলেন।

১৯৩২ সালে ইনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ লাভ করলেন। ১৯৩৬ সালে লাভ করলেন পি-এইচ-ডি। ছাত্র-জীবনে ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, কুরুভিলা জ্যাকেরিয়া প্রমুখ দিকপাল ঐতিহাসিকগণের শিষ্যত্বলাভ করেছেন। তাঁর থিসিসের পরীক্ষক ছিলেন আধুনিক ভারতের ইতিহাস চর্চার জনক বিদগ্ধ মনীষী আচার্য স্যার যদুনাথ সরকার।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণার জন্য তাঁকে ফার্সী ভাষা আনতে হয়েছে আয়ত্তে। আপন বক্তব্য ও সিদ্ধান্তকে যথাসাধ্য প্রামাণ্য করার জন্য ক্লেশ ও পরিশ্রম তিনি নির্দ্বিধায় বরণ করে নিয়েছেন।

১৯৩৮ সালে দেশনায়ক শ্যামাপ্রসাদ, তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকর্ড কমিশনের সদস্য নির্বাচিত করলেন। ১৯৬২ পর্যন্ত যতদিন কমিশনের অধিবেশন বসেছে—ততদিন এই অধিবেশনাদিতে যোগ দেওয়ার জন্য ভারতের নানাস্থান তিনি পরিভ্রমণ করেছেন।

ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের ১৯৪৯ সালের কটক অধিবেশনে আধুনিক ইতিহাস শাখার তিনি পৌরোহিত্য করেন। এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁকে ১৯৬৪ সালে প্রদান করলেন 'স্যার যদুনাথ সরকার স্বর্ণ পদক' ১৯৬৪ সালেই ভারত সরকার তাঁকে পাঠালেন সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে। ঐ বছরই পশ্চিম জার্মাণীর হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি আমন্ত্রিত হলেন এশীয় ইতিহাসের অধ্যাপকরূপে। রাশ্যান আকাডেমীরও তিনি অন্যতম সদস্য।

রণজিৎ সিংহ, রাইজ অফ দা শিখ পাওয়ার, হায়দার আলী, হিষ্ট্রী অফ ইণ্ডিয়া (ডঃ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহ), ইকনমিক হিষ্ট্রী অফ বেঙ্গল প্রমুখ গ্রন্থগুলি তাঁর বিপুল পাণ্ডিত্য এবং প্রগাঢ় ইতিহাস চেতনার সার্থক পরিচায়ক।

ডাঃ অরবিন্দ মণ্ডল

[ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংক্রামক ব্যাধি বিশেষজ্ঞ ও অধ্যক্ষ আর জি কর মেডিকেল কলেজ]

মানব সমাজের অভিশাপগুলির তালিকায় রোগ একটি মুখ্য স্থানের অধিকারী। বিভিন্ন রোগের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধি ভয়াবহ—এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নাই। যে-কোন সংক্রামক ব্যাধি যে-কোন মানুষকে যে কি শোচনীয় পরিণতির সম্মুখীন করে তা কারো অজানা নয়। এই ব্যাধির মারাত্মক গ্রাস থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার সাধনায় যাঁরা নিজেদের সর্বশক্তি ও সর্বচিন্তা প্রয়োগ করেছেন তাঁরা নিঃসন্দেহে সর্বসাধারণের অফুরন্ত কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দনের পাত্র। এই তালিকায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ডাঃ অরবিন্দ মণ্ডলের নাম। যে দুরূহ ও মহান ব্রত অবলম্বন করেছেন তার সফলতা শুধু বাংলারই নয় সমগ্র ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধি করে। ২৪ পরগণা জেলার কৌটাল-পুর জমিদার ৺জীবনকৃষ্ণ মণ্ডলের কনিষ্ঠ পুত্র ডাঃ মণ্ডল।

[illegible] সালের ১২ই নভেম্বর কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। মাতা [illegible] মণ্ডল। কলিকাতা সাউথ সুবারবন বিদ্যালয় হইতে ১৯২৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুকাল বঙ্গবাসী ও প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যয়ন করেন। তৎপরে ১৯৩২ সালে ভারত ত্যাগ করিয়া এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। খুব অল্পবয়সেই ডাঃ মণ্ডলের পিতা মারা যান। তাই তিনি তাঁর বড়ভাই

● ডাঃ অরবিন্দ মণ্ডল

বার্ড কোম্পানীর প্রাক্তন ইঞ্জিনীয়ার শ্রীধীরেন্দ্র মণ্ডলের স্নেহেই আজ তিনি জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়েছেন বলে তিনি মনে করেন। ১৯৩৭ সালে তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় উত্তীর্ণ হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং হাওড়া জেনারেল হাসপাতালে যোগ দেন। তৎপরে মেডিকেল কলেজে (কলিকাতা) ১৯৪৫ সাল অবধি চাকুরী করেন। ১৯৪৫-৪৭ সাল অবধি তৎ-কালীন রাজ্যপাল আর জি কেসির "ওয়ার টাইম চিকিৎসক" নিযুক্ত হন। ১৯৪৭ সালে সরকারী বৃত্তি লাভ করিয়া ডাঃ মণ্ডল দুই বৎসরের জন্য 'কনটিনেণ্টাল টুর' করেন। বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পর হইতে ৫৭ সাল অবধি নীলরতন সরকার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চাকুরী করেন। তৎপরে বেলেঘাটা আই ডি হাসপাতা-লের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন এবং ১৯৬৩ সাল হইতে আর জি কর মেডিকেল হাসপাতালে অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করিতেছেন।

সংক্রামক ব্যাধি হইতে কিভাবে মানুষ বাঁচতে পারে তার জন্যে ডাঃ মণ্ডল এখনও অবধি সাধনায় মগ্ন। সাধনায় তাঁর এখনও তিলমাত্র বিরতি নেই। তাঁর অক্লান্ত নিরলস সাধনা মানুষকে সর্বনাশা ব্যাধির সীমানা থেকে সর্বতোভাবে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। নিয়ত চলেছে উক্ত রোগকে কেন্দ্র করে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নানা গবেষণা। তাই ডাঃ মণ্ডলের ডাক পড়লো ১৯৬৪ সালের নভেম্বরে W. H. O. উদ্যোগে ম্যানিলাতে সংক্রামক ব্যাধি সেমিনারে। আবার ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে হনলুলুতে অনুষ্ঠিত কলেরা রোগের ওয়ার্লড সিম্পোশিয়ামে।

চিকিৎসক হিসাবে ইণ্ডিয়ান মেডি-কেল এসোসিয়েশন, রেফারী মেডিকেল ফ্যাকালটী, অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও কলেজ অফ মেডিসিনের সদস্য।

কলিকাতা বন্দেল রোডের শ্রীঅতুল-কৃষ্ণ রায়ের কন্যা শ্রীমতী রত্নপ্রভা মণ্ডলের সঙ্গে তিনি পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ।

মিহিরলাল গঙ্গোপাধ্যায়

[মহানগরীর বর্তমান উপ-পৌরপাল ও প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন চেয়ারম্যান]

কর্মের জন্য নির্দিষ্ট মুহূর্ত কাজেরই জন্যে আর অবসরের জন্য নির্ধারিত লগ্ন অবসরেরই। নিরবচ্ছিন্ন একটানা কর্ম এনে দেয় অবসাদ আর ক্লান্তি, তারই হাত থেকে মানুষ মুক্তি খোঁজে অবসরের মধ্যে। এই অবসর ভরিয়ে তোলে আবার নতুন কর্মের উদ্যমে। অবসর উপভোগের উপায়ও আছে বিভিন্ন, এক-এক মানুষ অবকাশ যাপন করেন এক-এক উপায়ে, আবার এই বহুর মেলায় এমন কয়েকজনেরও সন্ধান মেলে যাঁরা অবকাশ যাপন করেন রিক্রিয়েশান—সেও কাজ করেই, কাজের মধ্যেই আবার রিক্রিয়েশানও আছে।—অর্থাৎ জনকল্যাণকর কর্মকে যাঁরা সাধনা হিসাবে গ্রহণ করেছেন তাঁদের কর্মের আকর্ষণ থেকে বিচ্যুত করা সহজ নয়। কর্মই তাঁদের জীবন।

মহানগরীর বর্তমান উপ-পৌরপাল এবং প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান শ্রীমিহিরলাল গঙ্গোপাধ্যায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম।

সাংবাদিক জগৎ ও পৌরসভা উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর সেবায় এবং উল্লেখযোগ্য দক্ষতার স্পর্শে সমৃদ্ধ। বয়েস পঞ্চাশের ঘর স্পর্শ করেছে, তবু অন্তরে এক অফুরান প্রেরণা, তাঁর কর্মে, ভাষণে, দৃষ্টিভঙ্গিতে যার বাহ্যিক প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। একদিকে ঐকান্তিক কর্মনিষ্ঠা, যুগোপযোগী বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী, অন্যদিকে সকলের সঙ্গে সরল, অমায়িক, বন্ধুবৎসল আচরণ—সামগ্রিকভাবে পরিচিত মহলে মানুষটিকে অশেষ পরিমাণে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

গঙ্গোপাধ্যায়ের আদি নিবাস বিক্রমপুর। মিহিরলালের নিজের ভাষায়—"তবে, দেশে আমি যাই নি কখনও।" পিতৃদেব স্বর্গীয় হীরালাল গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন সে-যুগের খ্যাতনামা আইনজীবীদের অন্যতম।

১৯১৬ সালের ১লা মার্চ তাঁর জন্ম। স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় হলেন উত্তীর্ণ (১৯৩১)। ১৯৩৫ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে অর্থনীতিতে অনার্সসহ বি-এ পরীক্ষায় লাভ করলেন সফলতা। বাংলা ভাষা ছিল বিশেষ পঠিতব্য বিষয়। অর্থনীতিতেই এম-এ পরীক্ষায়ও হাত মেলালেন সাফল্যের সঙ্গে (১৯৩৮)। ১৯৩৯ সালে আইনের উপাধিও (প্রথম শ্রেণী) অর্জন করলেন।

বছর দুয়েকের জন্যে শিক্ষানবিশী করলেন বার্ড এ্যাণ্ড কোম্পানীতে।

● মিহিরলাল গঙ্গোপাধ্যায়

তারপর কিছুকাল কয়েকটি সরকারী কাজে নিযুক্ত ছিলেন। ১৯৪৬ সালে কলকাতা হাইকোর্টে এ্যাডভোকেট হিসাবে যোগ দিলেন। ১৯৪৭ সালে হল পিতৃবিয়োগ।

ঐ বছরই সাংবাদিক জগতে পদার্পণ ঘটল মিহিরলালের। আজও উক্ত জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অটুট, বরং সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে সে সম্পর্ক আজ উত্তরোত্তর ক্রমশই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে চলেছে। ১৯৫৭ সালে পৌর নির্বাচনে জয়লাভ করে অন্যতম পৌরপিতা নির্বাচিত হলেন। পৌরসভার বিভিন্ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসাবে তারপর তাঁকে দেখা যেতে থাকে। বর্তমান বৎসরে তিনি নির্বাচিত হলেন মহানগরীর উপ-পৌরপাল। কলকাতা পৌরসভার প্রতিনিধি হিসাবে ক্যালকাটা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের অন্যতম অছি ছিলেন তিনি (১৯৫৮-৬১)। ১৯৬১ সালে (আনুমানিক) তিনি লাভ করলেন অন্যতম জাস্টিস অফ দ্য পীসের সম্মান।

ডঃ বি সি রায় মেমোরিয়াল কমিটির তিনি অন্যতম সহকারী সম্পাদক, ইণ্ডিয়া ডিফেন্স এড কমিটির সঙ্গেও তিনি যুক্ত। জাপান দেশটি তিনি পরিভ্রমণ করেছেন দু'বার। ভারতবর্ষের প্রায় সমগ্র অংশই তাঁর ঘোরা। এই প্রসঙ্গে তিনি বললেন—"আমি যেখানেই যাই, সেখানকার পৌর-ব্যবস্থাটি ভাল করে পরিদর্শন করি, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্যবেক্ষণ করি---সেই সব পৌরসভার কার্যরীতি পরিচালন ব্যবস্থা, ইত্যাদি।

জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গেও তাঁর যোগসূত্র বিদ্যমান। ১৯৬৪ সালে প্রেস ট্রাস্ট অফ ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যানের আসনে তিনি অধিষ্ঠিত হলেন। বর্তমানে ঐ প্রতিষ্ঠানের তিনি অন্যতম পরিচালক (সেপ্টেম্বর ১৯৬৫ থেকে) ১৯৫৮ সাল থেকে তিনি ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটির কার্যকরী সমিতির অন্যতম সভ্যপদে সমাসীন আছেন।

একটি সিগারেট ধরালেন মিহিরলাল, তাকালেন একবার বাইরের দিকে। দরজায় গাড়ী দাঁড়িয়ে। বেরোবার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আলোচনাও শেষ হয়ে আসছে। ক্ষণকালীন নীরবতার পর বললেন—আমরা ভায়েরা একসঙ্গেই বাস করি, আর এযুগেও আমি মুক্তকণ্ঠে বলছি যৌথ পরিবারে আমি বিশ্বাসী।

শ্রীমতী অনুপমা গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সহধর্মিণী।

ভীড়ের মধ্যে কণ্ঠস্বর

টেড জোন্স

কখনো যদি ভীষণ ভীড় পথে,
চলতে দেখ কখনো লোকটিকে।
বলতে শোনো নিজের সংগে
উচ্চস্বরে কথা;
এড়িয়ে তাকে যেওনা বিপরীতে,
এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ো তার কাছে।
সত্যছাড়া অন্যতর কিছু
কবির কাছে ভয় পাবার তো নেই।

অনুবাদ : মন্মথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পারমাণবিক শক্তির ব্যাপক প্রয়োগ

ডঃ গ্লেন টি সীবর্গ (মার্কিণ পারমাণবিক শক্তি কমিশনেরচেয়ারম্যান)

আসুন, ১৯৮০ সালে একটু ঘুরে আসা যাক। এ সময়টা বর্তমান কাল আর ২১শ শতাব্দীর প্রারম্ভকালের মাঝামাঝি। বৈদ্যুতিক শক্তির ব্যাপারে পরমাণু ক্রমেই বেশী করে প্রাধান্য লাভ করছে এবং পারমাণবিক চুল্লি নিরাপদ বলে প্রমাণিতও হয়েছে। যাতে শুধু এখন বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদন নয়, অন্যান্য কাজেও পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কারখানা ক্রমেই বেশী করে ব্যবহৃত হবে। ১৯৮০ সালে সমুদ্রের জলকে লবণ-মুক্ত করে সুপেয় জলে পরিণত করা হবে পরমাণু শক্তির সহায়তায়। এ থেকে আবার বিদ্যুৎ শক্তিও উৎপন্ন হবে। ১৯৬৪ সালে প্রেসিডেন্ট জনসন আন্তর্জাতিক সহযোগিতার যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, ১৯৮০ সালের মধ্যে এই দ্বৈত উদ্দেশ্যসাধনে পারমাণবিক শক্তির উদ্ভাবন ও গ্রহণে তা বেশ একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবে। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে জলকে লবণ মুক্ত করার পরিকল্পনাটি প্রসারিত হলে ১৯৮০ সালের মধ্যেই আমরা পাব শহরাঞ্চলে ঘরোয়া ব্যবহার ও শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারে জলের সরবরাহ অনেক বেড়ে গেছে। পারমাণবিক প্রক্রিয়ায় সমুদ্রের জল লবণ মুক্ত করা হলে এর উৎপাদন ব্যয় অনেক কমে যাবে। ফলে শিল্পের প্রসার ঘটবে বিপুলভাবে। যথোপযুক্ত জল সরবরাহ ব্যবস্থা না থাকায় ইতিপূর্বে শিল্পের প্রসারে অনেক ব্যাঘাত দেখা দিয়েছে।

হবে দূরবর্তী কারখানা প্রভৃতিতে বিদ্যুৎশক্তি ও তাপ সরবরাহ।

দক্ষিণ মেরুতে কোন বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রে তাপ ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করা অথবা মাঝ সমুদ্রে নোঙ্গর করা ছোট কোন জাহাজে অবস্থিত

স্বয়ংক্রিয় আবহাওয়া কেন্দ্রে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহ করার মত নাটকীয় ব্যাপার আর কি আছে এই শতাব্দীর বর্তমান দশকে যে সব বিশেষ ইউনিট হাতে-কলমে পরিচালনা করে দেখা হয়েছে তাদের মধ্যে কতকগুলি পরমাণুশক্তি চালিত রিঅ্যাক্টর, কতকগুলিতে জ্বালানি স্বরূপ তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়েছে। ১৯৮০ সালের মধ্যে এগুলির ব্যাপক ব্যবহার হবে।

১৯৮০ সালের মধ্যে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ চালিত থার্মোইলেকট্রিক ও থার্মিওনিক জেনারেটর ব্যবস্থার ব্যাপক ব্যবহার চালু হবে এই সময়ের মধ্যে সমুদ্র বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণায়, সমুদ্রতল-সন্ধানী অভিযানে, সামুদ্রিক খনিজ পদার্থের সন্ধানে এবং গভীর সমুদ্রে নৌ চলাচলের সহায়তার কাজে অতি উচ্চশক্তি সম্পন্ন, গভীর সমুদ্রে ব্যবহারোপযোগী হাল্কা জেনারেটর ব্যবহৃত হবে।

সমুদ্রের তলদেশে রিঅ্যাক্টর ব্যবহার করা থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে, এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন সমুদ্রে সন্ধানকার্য এত ব্যাপক আকারে সম্ভব হবে যা আমরা কল্পনাই করতে পারি না। পারমাণবিক শক্তি চালিত স্থায়ী সন্ধানী কেন্দ্র আমাদের সমুদ্র জয়ের প্রধান পদক্ষেপ হবে। আর এই সমুদ্র জয়ের অর্থ হল খনিজ ও খাদ্যসম্পদ বৃদ্ধিতে সহায়তা। ১৯৮০ সালে আইসোটোপের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থা বর্তমান পদ্ধতি অপেক্ষা প্রীতি [illegible]

● পরমাণু চূর্ণ করার যন্ত্র বিভাট্রন
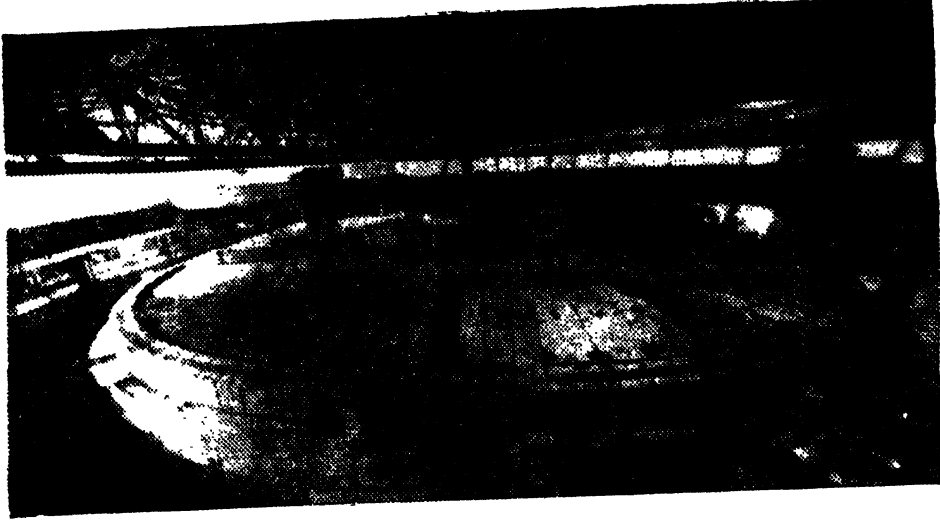
ম এবং দশ বছরেরও বেশি কাল এ কার্য-
থাকবে। এই সব সুবিধার ফলে জনপদ
দূরেও এর ব্যবহারে উৎসাহ দেখা দেবে।
কি ব্যাটারী, ডিজেল-চালিত জেনারেটর,
চালিত জেনারেটর প্রভৃতির সঙ্গে প্রতি-
তায়ও এর সাফল্য দেখা দেবে।

ই একই কারণে বার্তা আদান-প্রদান
র এগুলির ব্যবহার প্রসারিত হবে।
ফলে উন্নতিশীল দেশে টেলিভিশন ও
র প্রসার হবে। এছাড়া অল্প ব্যয়ে বিমান
এবং বিমানে ও জাহাজে নিরাপত্তা
রক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হবে।

নৌবহর ও সাধারণ বাণিজ্য জাহাজ
র কাজে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার
সালের মধ্যে খুব একটা সাধারণ ব্যাপার
াঁড়াবে। ডিজেলের চেয়ে বৃহত্তর সকল
নূতন জাহাজই পারমাণবিক শক্তি চালিত হবে।
১৯৮০ সালের মধ্যে যাত্রীবাহী ও মালবাহী
জাহাজ চালনায় পারমাণবিক শক্তি ব্যবহৃত
হবে। আমেরিকার পরমাণুশক্তি চালিত
জাহাজ সাভান্নার পরীক্ষামূলক চালনার পর এটা
প্রমাণিত হয়েছে যে, পরমাণুশক্তি চালিত
জাহাজ অতি উচ্চ গতিবেগ বজায় রেখে বহু-
দূর স্থান পর্যন্ত মাল বহন করতে পারে। অথচ
টন প্রতি ব্যয়ও অনেক কম পড়বে।

বিশ্বব্যাপী আবহাওয়া নিরূপণ ও বার্তা
আদান-প্রদানের কাজে নিযুক্ত কৃত্রিম উপগ্রহের
শক্তি আসছে আইসোটোপ চালিত ইউনিট
থেকে। ১৯৮০ সালের মধ্যে চন্দ্রাভিযান
মহাকাশ পরিকল্পনায় পারমাণবিক রিঅ্যাক্টরের
পূর্ণ ব্যবহার সম্ভব হবে। মাঝারী ইউনিটগুলি
আন্তঃগ্রহ সন্ধানী মহাকাশযানের যন্ত্রপাতিতে
বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। মহাকাশে বিচরণশীল
গবেষণাগারেও এই ইউনিটগুলি থেকে শক্তি
সঞ্চারিত হবে। কিন্তু ১৯৮০ সালে মহাকাশে
পারমাণবিক শক্তির সবচেয়ে অভিনব ব্যবহার
হবে মানুষের চন্দ্রাভিযানে আর মানুষ চালিত
কৃত্রিম উপগ্রহ পরিকল্পনায়।

চাঁদের সম্পদ সন্ধানের কাজে যে সব
কেন্দ্র নিযুক্ত থাকে সেগুলির জন্য অবিচ্ছিন্ন
বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের প্রয়োজন হবে। এই
প্রয়োজন সবচেয়ে ভালভাবে মেটাতে পারবে
পারমাণবিক শক্তি।

মহাকাশ সন্ধানের কাজে ব্যবহারের জন্য
যন্ত্রপাতি ক্রমেই উন্নত হচ্ছে এবং সেগুলি খুব
কার্যকরীও হচ্ছে। আশা করা যায় ১৯৮০
সালের মধ্যে রিঅ্যাক্টর ইউনিটগুলি মনুষ্য-
চালিত বড় বড় কৃত্রিম উপগ্রহগুলিতে পার-
মাণবিক শক্তি সরবরাহ করবে।

পারমাণবিক শক্তি ইউনিট সমেত মঙ্গল,
শুক্র, ও বুধ গ্রহগুলিতে বৈজ্ঞানিক অভিযান
চালাবার জন্য মনুষ্যবিহীন মহাকাশ যান প্রেরণ
১৯৮০ সালের মধ্যে খুব সাধারণ ব্যাপার হয়ে
দাঁড়াবে।

অতঃপর মহাকাশযানগুলির যন্ত্র চালু করার
বিষয়টি পারমাণবিক রকেট ইঞ্জিন দ্বারাই সম্পন্ন
হবে। পারমাণবিক শক্তি চালিত রকেট
১৯৮০ সালের মধ্যেই উৎক্ষেপণ করা হবে।

ভেষজ বিজ্ঞান, কৃষি ও শিল্প ক্ষেত্রে
রেডিও আইসোটোপের অবদান ইতিমধ্যে
মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে।
আগামী বিশ বছরের মধ্যে এর আরও ব্যাপক
প্রয়োগ হবে।

আশা করা যায় এই সময়ের মধ্যে অনেক-
গুলি বড় বড় শিল্পও গড়ে উঠবে যাতে রেডিও
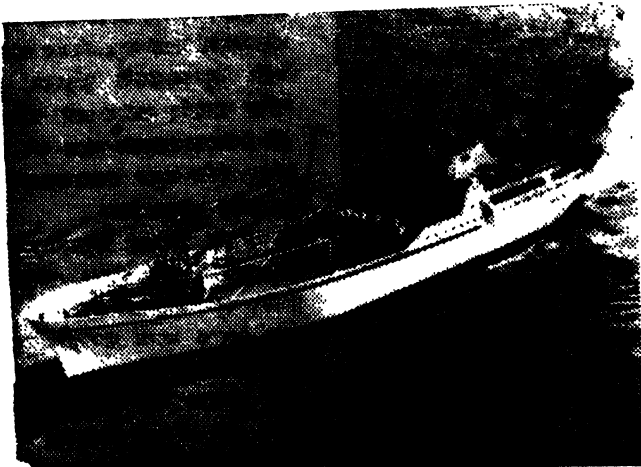
পারমাণবিক শক্তিচালিত জাহাজ "সাভান্না"

রাইসোটোপ ও তেজবিকিরণ মূল শক্তিরূপে কাজ করবে। যেমন, তেজবিকিরণের সাহায্যে রাসায়নিক পদার্থ ও প্লাষ্টিক প্রস্তুত করার শিল্প।

পারমাণবিক শক্তিজাত তাপ এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব কিনা যাতে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন হতে পারে তা নির্ধারণের পরিকল্পনাটিও এই সময়ের মধ্যে অনেক দূর এগিয়ে যাবে। ১৯৮০ সালের মধ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরকের ব্যবহারও অনেক প্রসার লাভ করবে। এর সাহায্যে আকরিক পদার্থ চূর্ণ করা যাবে, তৈল খনির উৎপাদন ও প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং জলসম্পদ বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে ও সেই সঙ্গে জল সম্পদ সংরক্ষণও করা যাবে। ১৯৮০ সালের মধ্যে পরমাণু শক্তির সহায়তায় বড় বড় খনন কার্য পরিকল্পনাও সাফল্যমণ্ডিত হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ খাল ও পোতাশ্রয় খনন ও পাহাড় কেটে রাস্তা নির্মাণের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯৮০ সালের মধ্যে পারমাণবিক শক্তির বহুল প্রসার ঘটবে এবং এক্ষেত্রে গবেষণাও হবে ব্যাপকতর। এই ক'বছরে শিল্পে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োগের চেয়ে চমকপ্রদ আর কোন গবেষণার কথা চিন্তাই করা যায় না।

—ডাঃ গ্লেন টি সীবর্গ

একটি পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন কারখানার নিয়ন্ত্রণ কক্ষ

★ নক্ষত্র সংবাদ ★

নক্ষত্রগুলো কত পুরনো? কত বয়স ওদের—কয়েক লক্ষ না কয়েক কোটি বছর?

না কি ওরা অনাদিকালের স্রোতে ভেসে আসা ফুল? তা নয়; জ্যোতিবিজ্ঞানীরা সন্দেহ করছেন ওরা অনবরত সৃষ্ট হচ্ছে এবং পুরানো তারার দল বিদায় নিচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে। গবেষণায় ধরা পড়ছে ওদের জন্ম-মৃত্যুর নতুন নতুন প্রমাণ।

সাধারণভাবে এদের দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন ডঃ ডব্লু বাডি। প্রথমটির নাম পপুলেশন ১, এর দেখা মেলে ছায়াপথের বহিঃস্থ কক্ষে ধূলোর মেঘের মধ্যে, এই তারকাপুঞ্জে সূর্য এবং সৌরমণ্ডলের অবস্থান। অন্যান্য আরও তারকাপুঞ্জেও এর অবস্থান চোখে পড়ে।

পপুলেশন-২ কিন্তু তারকাপুঞ্জে বিশাল চক্রনাভিসংলগ্ন, চক্রের সমতল থেকে গোলাকারে প্রসারিত। এই নক্ষত্রগুলো মনে হয় পুরনো এবং স্থিতিশীল, সম্ভবত ছায়াপথের সমবয়সী। প্রথমটির নক্ষত্ররাজি বোধহয় তুলনায় নতুনতর।

প্রথমটিতে 'Blue Giant' জাতীয় কিছু কিছু উজ্জ্বলতম নক্ষত্র বর্তমান, ওরা এত দ্রুত শক্তি নিঃশেষ করে যে এক কোটি বছরের অনেক আগেই ওদের পরমায়ু ফুরিয়ে যাবে। দ্বিতীয়টির নক্ষত্রগুলোর সমবয়সী হলে ওরা অনেক আগেই ফুরিয়ে যেত।

আকাশ-পর্যবেক্ষক জ্যোতিবিজ্ঞানীরা মনে করেন ওদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মহাকাশে সংক্ষেপণরত বস্তুপুঞ্জ থেকে সম্ভবত নতুন নক্ষত্র জন্ম নেয়।

ডঃ বার্ট জে বক প্রমুখ বিজ্ঞানীরা মনে করেন মহাকাশের ধূলিকল্প বস্তুকণাগুলো নিকটবর্তী তারকাপুঞ্জনিঃসৃত আলোকরশ্মির সাহায্যে চাপ বাঁধে। হয় এবং ফলত সঙ্কোচনশীল বস্তুপুঞ্জ আলোকময় হয়ে ওঠে, এরই নাম নক্ষত্র।

গোলাকৃতি বস্তুপুঞ্জ—এরূপ এ জাতীয় নক্ষত্রের জন্মের আগের রূপ—ইতিমধ্যেই মহাশূন্যে লক্ষিত হয়েছে খুব বেশীমাত্রায় জমানো ধূলিসাগরের মধ্যে।

ছোট ছোট বহু কালো দাগ দেখা গেছে। ডঃ বক বলেছেন,

'...These dark globules are dense clouds of cosmic dust. They are seen projected against almost all of the larger luminous nebulae surrounding blue.white supergiants, A total of 65 of these embroyo stars have been found near the Eta Carinae nebula,'

বিদ্যুজাগতিক অর্থে। ওদের ব্যাস পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের পাঁচ হাজার থেকে তিরিশ হাজার গুণ বড়। তবুও ওরা এত হাল্কা যে ওদের ভর সূর্যের ১:১০ ভাগ থেকে ১:১০০ ভাগ মাত্র।

লক্ষ লক্ষ বছর পরে ওরা ঠিক দানা বাঁধবে এবং ওদের দেহ থেকে বিচ্ছুরিত হবে সত্যিকার নক্ষত্রালোক,

ডঃ ডবুা জে লুইটেন এবং ডঃ টি এফ কার্পেণ্টার ক্ষুদ্রতম নক্ষত্র আবিষ্কার করেছেন, ওর আয়তন পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ মাত্র।

ওর নম্বর হল ৮৮৬-৬, ব্যাস মাত্র আড়াই হাজার মাইল। চাঁদের আয়তন এর তুলনায় খুব বেশী কম নয়।

শীত সন্ধ্যার ছায়াপথে বড় আর ছোট নক্ষত্রদ্বয়ের মাঝামাঝি এর অবস্থান। আবিষ্কারকদের মতে বিরাট টেলিস্কোপের সাহায্য ছাড়া এই ক্ষীণকায় তারার দেখা মেলাই ভার। সূর্যের আলোকশক্তি মাত্র ৬০,০০০ ভাগের এক ভাগ-এর সম্পত্তি, কাজেই জানা শোনা তারার মধ্যে এটি অতি ক্ষীণ। মাত্র পঁচিশ আলোকবর্ষ দূরে এর অবস্থান। তবুও খোলা চোখে ওকে দেখতে পাওয়ার কোন সম্ভাবনাই নেই।

এটি সিত খর্বকায় তারকাপুঞ্জর অন্তর্গত। এগুলো ক্ষুদ্রাকার, অত্যুত্তপ্ত এবং অকল্পনীয়ভাবে ঘন।

এ জাতের ঘন নক্ষত্রে মাধ্যাকর্ষণ মাত্রাধিক। পাথিব মাধ্যাকর্ষণের চল্লিশ লক্ষগুণ বেশী। পৃথিবীতে যে মানুষের ওজন পৌনে দু'মণের মত, তার ওজন এইসব নক্ষত্রে হবে কয়েক শ' হাজার টন। ফলে এর বায়ুমণ্ডল কয়েক ফুটের বেশী গভীর নয়। সূর্যের ওপরকার বায়ুমণ্ডল কয়েক হাজার মাইল পুরু।

ঘণ্টায় ১,০০০,০০০ মাইল বেগে সিগনাস আর সোয়ান তারকাপুঞ্জের দুটি তারা পরস্পরকে পাক দেয়। ডঃ জে এ পিয়ার্স বলেছেন, This is the greatest value thus far discovered. নক্ষত্র দু'টি প্রায় ১১,০০০,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত। দু'দিনের সামান্য কম সময়ে ওরা পরস্পরকে সম্পূর্ণরূপে প্রদক্ষিণ করে। টেলিস্কোপ ছাড়া এ দুটো চোখেই পড়ে না, এত আবছা ওরা। দুটোই সাংঘাতিক গরম, ওদের উষ্ণতা প্রায় ষাট হাজার ডিগ্রী ফারেনহাইট।

আমাদের সূর্যের তুলনায় ওরা বিরাটাকৃতি সম্পন্ন। সূর্যর দু'শ' একানব্বই গুণ বেশী জায়গা নেয় একটা, অপরটা সূর্যর থেকে ছ'শ' তিরিশ গুণ বড়।—ডঃ পিয়ার্স হিসেব করেছেন। এদের বস্তুও সূর্যর তুলনায় ঢের বেশি যদিও এদের বস্তুসংস্থান সূর্যর তুলনায় হাল্কাতর।

যে নক্ষত্রটি ভয়াবহ বিস্ফোরণের জন্য অতিখ্যাত, তার নতুন বিস্ফোরণ হয়েছিল '৫২ সালে।

এটা ক্যারিন্-এর প্রথম বিস্ফোরণ জানা যায় ১৪২ খৃষ্টপূর্বাব্দে, ওর ঔজ্জ্বল্য বেড়েই চলেছে। যদি সবশেষ বিস্ফোরণ একশ' বছর আগেকার মত সাংঘাতিক হয়, তা হলে আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্রকেও ঔজ্জ্বল্যে হার মানিয়ে শেষে বিস্মৃতির অতলে হারিয়ে যাবে এটা ক্যারিন্। ডঃ এগেন এবং ডঃ ভকুরোলেয়ারস নির্দিষ্ট স্থানে
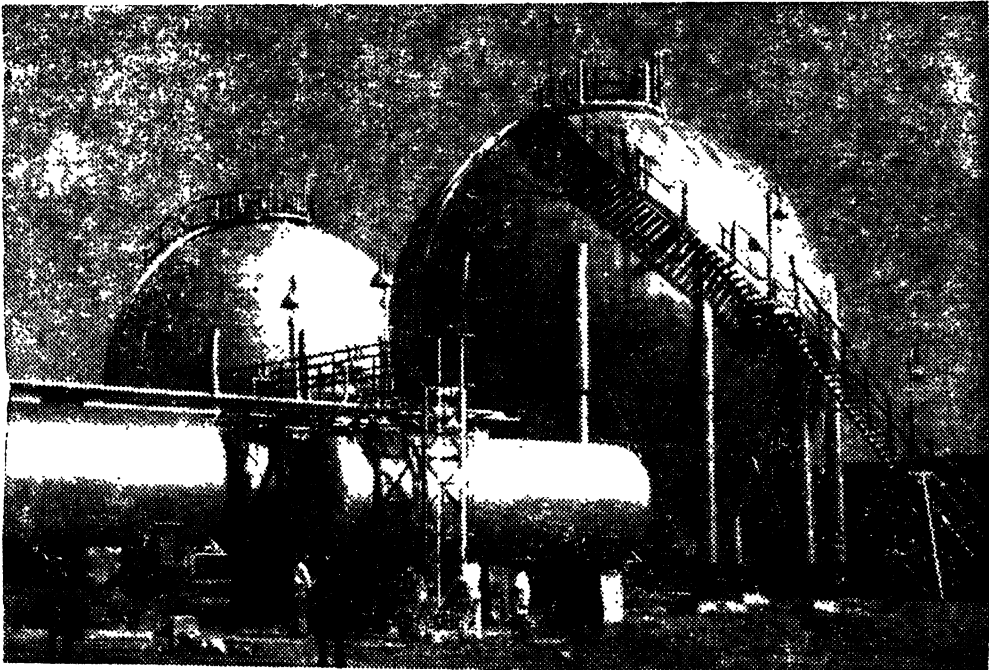
প্রায় চতুর্গুণ উজ্জ্বল একটা নক্ষত্র লক্ষ্য করেন '৫২ সালে। দেখা গেছে ধীরগতিতে ওটা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠছে।

বহুসংখ্যক গ্রহণাত্মক নক্ষত্র এত উজ্জ্বল যে পৃথিবীতেই তাদের দর্শন মেলে, যদিও ওরা আমাদের ছায়াপথ-সংলগ্ন তারকাপুঞ্জের বাইরে।

আমাদের নিকটস্থটির ঘনিষ্ঠতম তারকাপুঞ্জ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ম্যাজেল্লান মেঘরাশির মধ্যে মোট বিয়াল্লিশটি গ্রহণাত্মক নক্ষত্র চিহ্নিত হয়েছে, করেছেন মিসেস ভি এম নেইল। এগুলো ছাড়া, আমাদের ছায়াপথের বাইরে মাত্র দুটো তারায় গ্রহণ লাগে বলে জানা গেছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত গবেষণায় মগ্ন। আজ যেসব তথ্য অভ্রান্ত বলে স্বীকৃত, তা হয়তো কাল নতুনতর তথ্যাবিষ্কারের ফলে বাতিল হয়ে যাবে। নক্ষত্র-রহস্য ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে, নতুনতর নক্ষত্র-সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার ফলে। আরও পাওয়া যাবে, কারণ প্রতীচ্যের বিজ্ঞানীরা ক্লান্তি জানেন না।

---বসুবন্ধু

অভিনব বাতি

শীতল ক্যাথোড সমন্বিত ভ্যালব

রেডিও-ভ্যালব, বেতার-যন্ত্র ও টেলিভিশানের একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অংশ। সারা পৃথিবীতে আজ প্রায় ত্রিশ হাজার রকমের ২০০০ লক্ষ রেডিও ভ্যালব আছে। এই ভ্যালবের ভিতর মূল্যবান ধাতব পদার্থে তৈরী অকল্পনীয় আকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ থাকে। কেন্দ্র স্থলে থাকে 'ক্যাথোড'। 'ক্যাথোড' প্রজ্জ্বলিত অবস্থায় ইলেকট্রন উৎপাদকের কাজ করে।

কিন্তু এই ভ্যালব ব্যবহারের আসল অসুবিধা এই যে, এইগুলির উপর পুরোপুরি নির্ভর করা যায় না। কারণ যে কোন সময়ে প্রজ্জ্বলিত ক্যাথোড উদ্বায়িত বা ভস্মীভূত হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়া ক্যাথোডটিকে উত্তপ্ত করিতে প্রচুর বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হয়, ফলে এই শক্তি তাপের আকারে বিকিরিত হয়ে সমস্ত যন্ত্রটির উষ্ণতা অত্যন্ত বৃদ্ধি করে।

তবে সাম্প্রতিককালে আবিষ্কৃত "সেমি-কণ্ডাকটার ট্রায়োডস" বা "ট্রানজিসটারস" এইসব অসুবিধার একটা বড় অংশ দূর করতে সক্ষম হয়েছে।

বর্তমানে সোভিয়েট বিজ্ঞান আকাদেমীর পদার্থ বিজ্ঞান শাখার বৈজ্ঞানিকেরা এই সমস্ত অসুবিধা দূর করে এক নতুন ধরণের শীতল ক্যাথোড সমন্বিত গ্যাস-ডিসচার্জ টিউব প্রস্তুত করেছেন।

এই শীতল ক্যাথোড সমন্বিত ভ্যালবটি সম্পর্কে পদার্থবিজ্ঞান গবেষণা শাখার প্রধান মি: L. Korablyov বলেন যে, শীতল ক্যাথোড সমন্বিত টিউব পূর্বেকার ভ্যালবের মতনই একই প্রক্রিয়ায় কাজ করে। এই ভ্যালবগুলি প্রজ্জ্বলিত হতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগে, কারণ এই সময়েই বিদ্যুৎশক্তির প্রভাবে গ্যাসে আয়ন উৎপাদনের প্রক্রিয়াটি ঘটে।

অনুসন্ধানী

এই কারণেই আগে মনে করা হত যে, সাধারণ রেডিও ভ্যালব বা সেমি-কণ্ডাকটারের পরিবর্তে এই টিউবগুলি ব্যবহার করা যাবে না। কিন্তু বর্তমানে এই অসুবিধাটি দূর করা গেছে। শীতল ক্যাথোড সমন্বিত এই টিউবগুলি সব বেতার যন্ত্র ও ইলেকট্রনিক যন্ত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, এইটিকে ঠিকভাবে কাজে লাগাতে হলে বিদ্যুৎশক্তি নিয়ন্ত্রণ করার প্রক্রিয়াটি
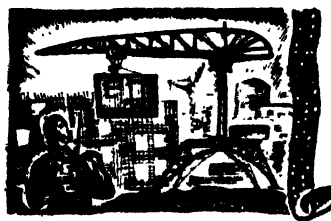
জানা চাই এই টিউবটির যান্ত্রিক কৌশল ও ব্যবহারপ্রণালী একেবারে ভিন্ন হওয়ায় যে কেউ সাধারণ ভ্যালবের পরিবর্তে এটি ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না। বর্তমানে অবশ্য এটিকে ঠিকভাবে কাজে লাগানোর জন্য একশ রকমের বিভিন্ন প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এটি অত্যন্ত সহজে ও অনায়াসে নানা কম্পিউটার স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ও সরঞ্জামে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই টিউবের প্রধান সুবিধা, এটির সরল গঠন ও সহজে উৎপাদন। একটি শীতল ক্যাথোড সমন্বিত টিউবে সাধারণত ছটি অংশ থাকে। এর ধাতব
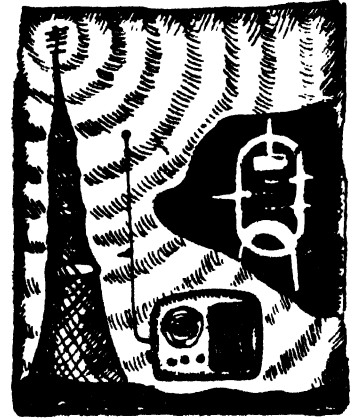
অংশগুলি প্রস্তুতে মাত্র ০'৫ থেকে ০'৬ গ্রাম ওজনের ধাতব পদার্থের প্রয়োজন হয়। তুলনামূলকভাবে বলা যেতে পারে, বর্তমানে প্রচলিত একটি ইলেকট্রন টিউবে থাকে ষাট থেকে নব্বুইটি সূক্ষ্ম যন্ত্রাংশ। একটি গ্যাস ডিসচার্জ টিউব একটি ইলেকট্রন টিউবের থেকে দশগুণ সুলভে প্রস্তুত করা যায় এবং এক একটি গ্যাস ডিসচার্জ টিউব প্রায় ১০০,০০০ ঘণ্টা সচল থাকে, ইলেকট্রন টিউবের থেকে এর স্থিতিকাল একশগুণ বেশি। তা ছাড়া বিদ্যুৎশক্তি অতি অল্পই ক্ষয় করে।

বর্তমানে বছরে প্রায় দশ কোটি

গ্লাস ডিসচার্জ টিউবের চাহিদা রয়েছে। এগুলি উৎপাদিত হলে বছরে প্রায় ৫০০০ লক্ষ রুবল অর্জন করা যাবে।

আবিষ্কারক গুসেভ ও অন্যান্য যন্ত্রবিদরা এই টিউবের উন্নতি সাধনে যথাসাধ্য চেষ্টা করছেন। যন্ত্রবিদরা অধিক উৎপাদনের জন্য এমন একটি স্বয়ংক্রিয় ভার্টিক্যাল লেদ তৈরী করেছেন যেটি প্রতি ১৭ সেকেণ্ডে একটি টিউব উৎপাদন করতে সক্ষম। এই রকম আরও দুটি মেশিনের সাহায্যে বছরে দেড় লক্ষ শীতল ক্যাথোড সমন্বিত টিউব প্রস্তুত করা যাবে।

উড়ন্ত যান

সাম্প্রতিককালে লেনিনগ্রাড এক্সপেরিমেণ্টাল রিসার্চ ফ্যাক্টরিতে নির্মিত উড়ন্ত যানটি এক কথায় বিস্ময়কর। একটি বৃহৎ আকারে মোটর লঞ্চের মত দেখতে এই উড়ন্ত যানটির দুটি কামরায় প্রায় আটত্রিশ জন যাত্রীর সংস্থান হয়।

যদিও এটি দেখতে প্রায় একটি লঞ্চের মত, কিন্তু এর কার্যকারিতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি জল না ছুঁয়ে বাতাসে ভেসে বেড়াতে পারে। এই যানটির ঠিক তলায় যে দুটি ভেণ্টিলেটার আছে তাতে শক্তিশালী বিমানের ইঞ্জিন লাগানো আছে। এই দুটি ইঞ্জিন সেকেণ্ডে একশ দশ ঘন মিটার বাতাস শোষণ করে এবং এই বাতাস স্রোতে একটি কক্ষে পরিচালিত করা হয়। এই কক্ষটিতে কোন নিষ্কাশনের পথ না থাকায় যানটি ভূপৃষ্ঠতিতে ভূমি অথবা জলের উপর বাতাসে ভর করে ভেসে যায়। যানটি পিছনের একটি প্রপেলারের সাহায্যে সামনে অগ্রসর হয়। এটি ঘণ্টায় পঞ্চাশ কিলোমিটার বেগে চলতে পারে। এর ফলে অগভীর নদীতে চলাচলের সময় বালুচরে আর কোন বাধাই হবে না। এই যানটি শুধু জল ও শূন্যেই চলতে পারে তা নয়, স্থলেও এটি সচল।

ফ্যাক্টরির ডিরেক্টর মিঃ ভিক্টর সের্গেইভ বলেন—'আমি এই অদ্ভুত যানটি সম্পর্কে এখনই সবকিছু ফাঁস করার পক্ষপাতী নই, কারণ এটিকে অধিকভাবে চালু করতে এখনও অনেক কাজ বাকি আছে।'

স্বয়ংক্রিয় ক্রেণ

স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে আজকাল কি না করা হচ্ছে। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ইস্পাত গলাচ্ছে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অংশ একে একে জোড়া দিচ্ছে। কিন্তু Glavmosstroi-র গবেষণা ইন্‌স্টিটিউটে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে যা করা হচ্ছে তা অতি আশ্চর্যজনক। এখানে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাড়ী তৈয়ারীর প্রণালী নির্ধারণ করা হচ্ছে।

এই কাজ করছে একটি ক্রেণ। বাইরে থেকে এই ক্রেণটি দেখতে অন্য আর সব ক্রেণের মত, কিন্তু এই ক্রেণটি অন্য সাধারণ ক্রেণের থেকে একেবারে ভিন্ন। এই ক্রেণের নিয়ন্ত্রক একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র যেটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত নানা অংশ জুড়ে বাড়ী সম্পূর্ণ করার কাজটি নির্ভুলভাবে করে যায়।

এই ক্রেণটি বেতারে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই রেডিও ট্রান্‌সমিটারটির আকার সিগারেটের প্যাকেটের মত। শুধুমাত্র একটি বোতাম টিপে অনায়াসে এই যন্ত্রটির সাহায্যে ক্রেণটিকে পরের অংশের কাজের জন্য নির্দেশ দেওয়া যায়। আরও মজা এই যে, এই ক্রেণ যন্ত্রটি কখনও ভুল নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে না, এমন কি যদি ক্রেণটি খারাপ হয়ে যায়, তবে এটি নিজেই এর বিকল হওয়ার সঠিক কারণ নির্ণয় করতে পারে।

এই ক্রেণের উদ্ভাবকরা এই ক্রেণটিকে সর্বতোভাবে স্বয়ংক্রিয় করার জন্য চেষ্টা করছেন। এই ক্রেণের নিয়ন্ত্রক ইলেকট্রনিক মস্তিষ্কটির সঙ্গে একটি টেপ রেকর্ডার সংযুক্ত করা থাকে, ফলে ক্রেণটি লাউড স্পীকারের সাহায্যে কি কাজ করছে সেটি জানায়, সঙ্গে সঙ্গে এরপরই কি করতে হবে সেটাও জানায়।

এই ক্রেণের প্রধান প্রস্তুতকারক মিঃ আনাটোলি কোজলভস্কি বলেন—"আমরা পরীক্ষায় অত্যন্ত ভাল ফল পেয়েছি। শীঘ্রই এই স্বয়ংক্রিয় ক্রেণ কার্য ক্ষেত্রে প্রযুক্ত করা হবে।"

Glavmosstroi গবেষণা ইন্‌স্টিটিউট আগামী বছরে দশটি এই ধরণের যন্ত্র উৎপাদন করতে মনস্থ করেছেন।

গরুর খাদ্যের পরিমাপকারী বৈদ্যুতিন গরু

হ্যানোভারের ডেয়ারী সমবায় প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় পশ্চিম জার্মানীর বৈদ্যুতিক সংস্থা সিমেন্স এমন একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র তৈরী করেছেন যেটি কি জিনিস কতটা খেলে একটি গরু সবচেয়ে কত বেশী দুধ দেবে, তা কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে জানিয়ে দেয়। কাচ দিয়ে তৈরী এই যন্ত্রটির চেহারা গরুর মত। কোন খাদ্য কতটা খেলে প্রোটিন ও শ্বেতসারের অংশ কতটা থাকবে তাও এই যন্ত্রে জানা যায়। এই যন্ত্রে আরও জানা যায় কতটা খাদ্য গরুর নিজের শরীরের জন্যে প্রয়োজন এবং কতটা খাদ্য তার দেহে দুগ্ধ উৎপাদনের জন্যে দরকার এবং কি পরিমাণ দুধ সেই গরু দেবে।

পশ্চিম জার্মানীতে বর্তমানে যে ষাটলক্ষ গরু আছে তা থেকে বছরে দুধ পাওয়া যায় ২১ বিলিয়ন লিটার অর্থাৎ গরু প্রতি বছরে গড়ে ৩৫০০ লিটার কিন্তু ভালো জাতের গরু থেকে যদি বছরে দশ হাজার লিটার পেতে হয়, তাহলে সেই গরুকে আধুনিক পদ্ধতিতে খাওয়াতে হবে। সাধারণ চাষীদের গরুর জন্যে বিভিন্ন- খাদ্যের গুণাগুণ বোঝানোর জন্যে এই কাচের গরুটিকে পশ্চিম জার্মানীর বিভিন্ন কৃষি প্রদর্শনীতে দেখানো হবে।

মাসিক

বসুমতী

অগ্রহায়ণ / '৭২

দেওয়ালীর রাতে

—দেবু দাশ

মনোনিবেশ

—আরতি ভট্টাচার্য

পাকিস্তান হুঁশিয়ার !!

—বৈদ্যনাথ ভড়

—সুধীন বন্দ্যোপাধ্যায়

—ভোলানাথ দেব

লা

স

—আশু ভট্টাচার্য

—ডলি দত্ত

যাত্রী, যান ও বাহক

—সমীর ঘোষ

দিল্লীর পার্লামেণ্ট ভবন

—মানসরঞ্জন কুংচৌধুরী

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

চন্দেল্ল স্মৃতি ॥

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

॥ বারো ॥

খাজুরাহোর সার্কিট হাউসে সন্ধ্যে হতে না-হতেই আন্তর্জাতিক মেলা। ভি আই পি ছাড়া স্বদেশী লোকের পাত্তা এখানে বিশেষ মেলে না। বিদেশী পর্যটকদেরই এখানে আমন্ত্রণ, তাদের অধিকাংশেরই চামড়া শাদা, লালচে চুল। তারা দূর সমুদ্রপারের অধিবাসী।

দুপুরবেলা খারে আমাকে তার অতিথিদের লিস্ট দেখিয়েছিল। সব-শুদ্ধ আঠারোজন,—ইংরেজ, ফরাসী, ক্যানাডিয়ান, জার্মান ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ান। বিকেলের দিকে এসেছে তিনজন আমেরিকান, দু'টি পুরুষ আর একটি মেয়ে। ছোট ছোট দলে অতিথিরা বিভক্ত,—কেউই একলা আসে নি, আমি আর ক্লোদ ছাড়া। আর এতোজনের মধ্যে আমিই একমাত্র ভারতীয়।

আমেরিকান দলটি সন্ধ্যেবেলাকার আসর জমিয়ে রেখেছে। তারা খুব মিশুক, খুব হৈ-চৈ করছে। মার্কিন দেশের মানুষরা সারা বসুধায় কুটুম্বিতা করতে উদগ্রীব। তারা সবচেয়ে নবীন জাতি, সবচেয়ে ধনী জাতি। তারা চুপ করে থাকতে পারে না এক মুহূর্ত। তাদের যৌবন কথা বলে, তাদের ডলার কথা বলে।

ক্লোদের কোনো দল নেই। সে আমার সঙ্গেই মিশতে চায়। ভারত ভ্রমণে সে এসেছে,—ভারতীয় লোকের সঙ্গে যতো সে কথা বলে বা মেলামেশা করে ততোই তার লাভ,—এই তার ধারণা। তাই সার্কিট হাউসের সান্ধ্য আড্ডায় সে জমে না।

পশ্চিম মন্দির গোষ্ঠীর সামনেকার গেট সন্ধ্যে হতে না-হতেই বন্ধ। তবে এই এলাকাতেই স্থানীয় জমায়েত। এইখানটাতেই দু-রাস্তার মোড়, বাস স্ট্যাণ্ড, ধর্মশালা। কয়েকটা দোকান-পাট। ওপারে একটু বাঁ দিকে মাতঙ্গেশ্বরের মন্দির। অন্ধকারে চায়ের দোকানের উনুনে আঁচ, কেরাসিনের আলো টিম্‌টিম্‌ করে জ্বলে, খদ্দের বসে থাকে দু-চারজন।

কনকনে শীত। ক্লোদের গায়ে পুরু গরম পোশাক, হাতে পশমের দস্তানা। আমার গলাবন্ধ কোটের শেষ বোতাম পর্যন্ত আঁটা। আকাশের নিচে বসে আছি চা-ওয়ালার বেঞ্চিতে পাশা-পাশি। চাঁদ উঠেছে,—শীত-কুয়াশার মধ্য দিয়ে চাঁদের আলোয় মন্দির-রাজির ছায়ারেখা দিগন্তে ফুটে উঠেছে। দোকানী খাতির করেছে; কাচের গ্লাসে করে ফুটন্ত গরম চা পরিবেশন করেছে আমাদের।

ক্লোদ আমার সঙ্গে গল্প করে, নানা প্রশ্ন করে। হাজার বছর আগেকার বিনষ্ট বিস্মৃত সভ্যতার স্মৃতিতীর্থে বসে আমি তাকে আধুনিক ভারতবর্ষের কথা বলি,—শোনাই আমাদের যুগের মহামনীষীদের কথা, স্বাধীনতা আন্দোলনের কথা,—শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিদেশী শাসকের শোষণের কথা, আবার স্বাধীন ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রেরণা, পরিকল্পনার কথা বিশ্বের এক মহান জাতির ক্রম-অবনতির কথা, আবার তার নূতন করে ক্রম-উন্নয়নের সম্ভাবনার কথা।

ক্লোদ বোম্বাইতে এক ভারতীয় পরিবারে ক'দিন অতিথি হয়েছিল। সেই পরিবারের মেয়ে-পুরুষ ক্লোদকে দেখিয়েছিল আধুনিক ভারতীয়রা সাহেব-মেমের ময়ূরপুচ্ছ কতোটা পরতে পারে। কঠোর মাদক-নিয়ন্ত্রণের রাজ্যে তারা চোরাবাজারের বিদেশী মদ্য ক্লোদকে সাগ্রহে পরিবেশন করেছিল। পশ্চিমী সংস্কৃতির সমন্বয়ে আধুনিক ভারত যে পিছিয়ে নেই তা তারা সগর্বে প্রমাণ করতে চেয়েছিল নিষিদ্ধ সুরার মাধ্যমে।

খাজুরাহো থেকে ক্লোদ যাবে বারাণসীতে। বারাণসী ভারতের শ্রেষ্ঠ হিন্দুতীর্থ। অদূরে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ-তীর্থ সারনাথ। ভারতের মহাসংস্কৃতির হৃদ্‌মন্দির এই বারাণসী। এই বারাণসী দর্শন করতে গিয়ে এই বিদেশী মেয়ে কোথায় উঠবে?

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক বন্ধুর নাম-ঠিকানা আমি ক্লোদকে দিলাম। বললাম, ক্লোদ, কাশীতে পৌঁছে আর কোথাও তুমি উঠো না। সোজা এঁর কাছে যেয়ো, এঁর কাছে থেকো। আমার নাম বললেই হবে।

রাত আটটা হতে না-হতেই চারদিক নিঝুম নিশুতি। জনমানবের দেখা নেই। দোকানী ঝাঁপ বন্ধ করবে। দূরে শেয়ালের দল ডাকছে। ম্লান চাঁদের আলোয় আমরা ফিরে চলেছি রাতের আশ্রয়ের অভিমুখে।

আর দুজন বিদেশীর সঙ্গে আলাপ হোলো,—এক প্রৌঢ় ইংরেজ-দম্পতি। কেমব্রিজবাসী অধ্যাপক ক্লেয়ার ও তাঁর স্ত্রী। বিজ্ঞান শাখার অধ্যাপক, অনেক বছর আগে এক বিজ্ঞান সম্মিলনীতে ভারতবর্ষে এসেছিলেন, পরিচিত হয়েছিলেন বোম্বাই ও দিল্লী শহরের সঙ্গে। এবার ছুটি নিয়ে সস্ত্রীক এসেছেন ভারত-ভ্রমণে।

দুপুরবেলা মন্দিরের পথে আলাপ হয়েছিল, রাত্রের ডিনারের পর ঘরে আমন্ত্রণ করলেন। তাঁদের কথাবার্তা বড়ো ভালো লাগল।

খানের সংগ্রহ থেকে খাজুরাহোর চিত্রাবলীর একটা বই এনে পাতা উলটিয়ে দেখছিলেন মিসেস ক্লেয়ার। একটি ভাববিহ্বল মিথুনমূর্তির চিত্রের উপর অনেকক্ষণ চোখ রাখলেন। আলিঙ্গনবদ্ধ পুরুষ আর নারী। অনির্বচনীয় আনন্দ-বিহ্বল উভয়ের মুখকান্তি।

হঠাৎ মুখ তুলে স্বামীকে লক্ষ্য করে বললেন,—এমনি করে কিন্তু তোমরা আমাদের ভালোবাসতে পারো নি!

মৃদু হাসলেন অধ্যাপক ক্লেয়ার। বললেন,—সত্যি বলছ?

কেন, নয়? তোমাদের পুরুষদের জন্যে আমরা দিনে দিনে কতো পশরা সাজাচ্ছি, সে সব পশরার দিকে তো ফিরেও তাকালে না।

কিসের পশরা?

দেহের পশরা, যৌবনের পশরা। কতো স্টাইল, কতো ফ্যাশন, কতো অঙ্গরাগ। কতো আভরণ আর কতো নগ্নতা। সব ব্যর্থ হয়ে গেল, তোমাদের মন আর পেলাম না!

মিসেস ক্লেয়ারের কথার মধ্যে খেদের ভাণ, কিন্তু কৌতুকের স্পর্শ। তাই তাঁদের আলোচনায় যোগ দিয়ে বললাম,—আপনি কী কথা বলছেন তা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি নে। পুরুষ হিসেবে আমি দাবী করতে পারি কি,—ভালো করে বুঝিয়ে বলুন।

প্রৌঢ়া মুচকি হেসে বললেন,—আপনি না বুঝলেও আমার কর্তা ঠিক বুঝছেন। দেখুন, নারীর সজ্জা আর লজ্জা বিসর্জন—এ আজ সভ্য জগতের শ্রেষ্ঠ আর্ট ইন ইণ্ডাস্ট্রি। এই নিয়ে পুরুষরা শুধু ইণ্ডাস্ট্রিই করল আর কিছু করল না। প্রকৃত মূল্য দিতে পারল না, বাসনার মূল্য, ভালোবাসার মূল্য। নারীকে সে পণ্য করতে পারল, ভোগ্য করতে পারল না।

অধ্যাপক শান্তগলায় বললেন, তুমি ঠিকই বলছ, মাই ডিয়ার।

স্বামীর স্বীকৃতিতে হৃষ্ট হলেন মিসেস ক্লেয়ার। হাতের ছবিটি উঁচু

প্রসাধনরতা

করে তুলে ধরে চাপা ব্যাকুল গলায় বলে উঠলেন,—নারীর নগ্নতা নিয়ে আমাদের শিল্পী কারবার করছে—কিন্তু পুরুষ-নারীর এমনি মিলন-মাধুর্যকে সে অশ্লীল বলে পরিহার করেছে।

এবার বেশ বড়ো করে হাসলেন অধ্যাপক। বললেন,—ঠিকই করেছে। জানো আমাদের ভগবান নিজের প্রতিচ্ছবিতে পুরুষ সৃষ্টি করেছিলেন, আর সেই অপাপবিদ্ধ পুরুষকে জ্ঞান-বৃক্ষের বিষফল খাইয়ে পাপের পথে টেনে নামিয়েছে শয়তানের অনুচরী নারী। ঈশ্বরের প্রতিভূ পুরুষ কিছুতেই নরকে যাবে না আর নারী তাকে নিয়ে যাবেই। যুগ যুগ ধরে এই টানাটানি চলছে। নরনারীর মিলন নরকের সিংহদ্বার। লজ্জা আর সজ্জাহারা হয়ে যতো প্রলোভনই দেখাও না কেন,—আমাদের শিল্পী সজ্ঞানে কিছুতেই নরক দর্শন করবে না।

ভারতের ধর্ম আলাদা। ভারতের দর্শন অন্য কথা বলে। এক প্রাণবিন্দু আপন প্রেরণায় দুই হোলো,—আর দুই-এর মিলনে-বিচ্ছেদে শুরু হোলো সৃষ্টির লীলা। বিজ্ঞানের এই কথা। ভারতের দর্শনও এই একই তত্ত্বাবলম্বী। অনাদ্যন্ত ব্রাহ্মণ একমেব। তিনি চরাচর বিস্তৃত অনন্য পুরুষ। সৃষ্টির প্রেরণায় এক দুই হলেন। ব্রাহ্মণ এবং আত্মন্, পুরুষ এবং প্রকৃতি। সৃষ্টির মানসে তাঁরা মিলিত হলেন, দুই আবার এক হলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ এই আদি মিলনের প্রতিচ্ছবি এঁকেছেন নরনারীর মিলনে। উপনিষদকার ঋষি বলছেন,—এই মিলনই শ্রেষ্ঠ বোধ, শ্রেষ্ঠ অনুভূতি। এই মিলনেই আত্মার ব্রহ্মোপলব্ধি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, আমি পুরুষ, সৃষ্টির মহোল্লাসে আমি প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হই, প্রকৃতির গর্ভে আমার বীজকে নিক্ষিপ্ত করি।

ঋগ্বেদের ঋষিরা বহু স্তোত্রে দ্যাবা-পৃথিবীর বন্দনা গান করেছেন। দ্যৌ পিতা, পৃথিবী মাতা, দ্যৌ পুরুষ, পৃথিবী প্রকৃতি। দ্যাবা-পৃথিবী রূপ, পুরুষ-প্রকৃতির সঙ্গমকে পূজা করি,—এই সঙ্গমই আনন্দের উৎস, কর্মের প্রতীক, সৃষ্টির প্রেরণা, পুণ্যের প্রতিভূ। নিরানন্দ আর অকর্মণ্যতাই পাপ,—তাই হে দ্যাবা-পৃথিবী তোমাদের মিলনরূপ আনন্দ কর্মে আমাদের উজ্জীবিত করো, মহাপাপ থেকে রক্ষা করো।

বৈদিক আর্য-চেতনার এই দ্যাবা-পৃথিবী আর্য-অনার্য সংস্কৃতি-সংশ্লেষের ফলে ভারত-ভাবনার পরম পূজনীয় হরপার্বতী। ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কাব্য হরপার্বতীর মিলনকাব্য কুমারসম্ভব।

ভারতের নারী শয়তানের অনুবর্তিনী নয়, সে পুরুষের অর্ধাঙ্গিনী। প্রিয়ারূপে সে বাসনা-বাসিনী, কামমোহিনী, আনন্দ-বিধায়িনী। জননীরূপে সে সন্তান-পালনী, শক্তিদায়িনী, অমৃত-নির্ঝরিণী। প্রিয়ারূপে সে পরম ভোগবতী, মাতৃরূপে সে পরম পূজনীয়া। ভারতের কবি আর শিল্পী, ভক্ত আর সাধক—যুগ যুগ ধরে একাগ্রচিত্তে এই নারীপ্রকৃতির বন্দনা আর উপাসনা করেছে। এই বন্দনা-উপাসনায় যতো আকৃতি, যতো প্রগলভতা—তার কোনো সীমারেখা নেই।

এই কারণেই ভারতের চিত্ত ভক্তিকে কখনো অহেতুক উচ্ছ্বাস বলে হেয় করে নি, কামকে কখনো অশ্লীলতা বলে অসম্মান করে নি। রামানুজ থেকে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত কতো শত সাধক ভারত-ভূমিতে ভক্তির বন্যা বইয়ে দিয়েছেন, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত কতো সহস্র কবি আর শিল্পী কামামৃতে নিত্য স্বর্গ রচনা করে গেছেন।

জীবন সাধনার চতুর্বর্গ, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। ধর্মাচরণ করতে হবে, অর্থ লাভ করতে হবে, কাম চরিতার্থ করতে হবে,—এই ত্রিবর্গ সম্পন্ন করার পর সন্ধান করতে হবে মোক্ষের। মহাভারতে তৃতীয় পাণ্ডব বলেছেন এই ত্রিবর্গের মধ্যে তৃতীয় বর্গটি শ্রেষ্ঠ। কামই সৃষ্টির ও কর্মের, সম্পদ-আহরণের ও ধর্মাচরণের উৎস। কাম পরিতৃপ্তি পুরুষার্থের পরিতৃপ্তি, কাম ব্যর্থতা সকল বেদনার আকর।

কাম কাব্যের উৎস। কামমোহিত ক্রৌঞ্চবধূর বিরহ-বেদনা থেকে মহাকাব্যের জন্ম। নরনারীর দেহ-প্রাণের আকর্ষণ ও মিলন সৃষ্টির পরম সঙ্কেত, প্রাচীন ভারতের কাব্য-নাটকের স্রষ্টারা এই সংকেত ভোলেন নি, বাস্তব ও কল্পনার অপূর্ব সংমিশ্রণে নানা ছন্দে নানা উপমায় নানা দৃশ্যে নানা কাহিনীর মাধ্যমে এই আনন্দ-সংকেতকে বিধৃত করে গেছেন। ভারতের বিভিন্ন মনীষী কামের দেহগত ও মনোগত গুণ, প্রকৃতি ও ব্যবহার বিশ্লেষণ করে রচনা করে গেছেন কামশাস্ত্র। শিল্পীরাও পিছিয়ে থাকেন নি।

পুরুষ-প্রকৃতির মিলন-দর্শন দেবতা ও দেবীর, অপ্সর ও অপ্সরার, যক্ষ ও যক্ষিণীর, মানব ও মানবীর বহু বিচিত্র মিলন-লীলার বাস্তবচিত্রে চিত্রায়িত করেছেন। বিশ্বসৃষ্টির মূলাধার রূপ এই মিলনের প্রথম প্রতীক লিঙ্গযোনি।

পুরুষ এক, প্রকৃতি বিচিত্র,—বিচিত্রতর পুরুষ-প্রকৃতির সঙ্গমলীলা। ভারতের শিল্পী তাই প্রকৃতিরূপিণী নারীসৌন্দর্যের বিচিত্র প্রকাশ-সাধনায় বিহ্বল,—পুরুষ-নারীর মিথুনভাস্কর্যে তার শিল্পের সার্থকতা।

খাজুরাহো অনঙ্গরঙ্গশালা। খাজুরাহোর অনঙ্গ শিল্প সকলকেই আকর্ষিত ও বিস্মিত করে। ভ্রমণ-কারীরা খাজুরাহো দেখে এই রতি-মূলক শিল্পের কারণ অন্বেষণ করেন,

নায়িকা

তাঁরা একটু বেশি অনুসন্ধানী তাঁরা এ বিষয়ে পণ্ডিতদের ব্যাখ্যা অনুসন্ধান করেন।

অধিকাংশ বাঙালী ভ্রমণকারীই মিথুনভাস্কর্যের সঙ্গে পরিচিত পুরীর জগন্নাথ মন্দির দেখে। বাঙালী ভক্ত-মানসে নীলাচলধামকে চিরপ্রিয় করেছিলেন গৌরাঙ্গদেব। সেদিন থেকে প্রায় পাঁচ শতাব্দী কেটেছে। এই পাঁচশো বছর ধরে কতো লক্ষ বাঙালী যাত্রী যে পুরীধাম যাত্রা করেছেন তার ইয়ত্তা নেই। সারা পশ্চিম বাঙলায় এমনি একটি পরিবার পাওয়া শক্ত, যাদের তিনপুরুষের মধ্যে কেউ পুরী যান নি।

পুরীর জগন্নাথ মন্দির দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত। পাথরের মন্দির, নানা ভাস্কর্যশিল্পে অলংকৃত, মন্দিরের গায়ে চূণবালির মোটা আস্তরণ,—আদিম ভাস্কর্য তার নিচে চাপা পড়ে আছে। দেয়ালের কোণে কোণে কয়েকটি বীভৎস মিথুন-মূর্তি ঝুলছে, প্রাচীন শিল্পধারণার উপরে অর্বাচীনের হস্তপ্রয়োগের কদর্য নিদর্শন।

উড়িষ্যার মন্দির-স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ কীর্তি রয়েছে ভুবনেশ্বরে। এখানকার শ্রেষ্ঠ মন্দির লিঙ্গরাজ মন্দির। লিঙ্গরাজ মন্দিরের স্থাপত্যভাস্কর্য অতুলনীয়। ভুবনেশ্বরে বহু মন্দির। লিঙ্গরাজ বৃহত্তম। ক্ষুদ্রতম মন্দির মুক্তেশ্বর। এ মন্দিরকে বলা হয় স্বপ্নের মতো সুন্দর। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগাত্রের যে-কোনো নারীমূর্তির দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরানো যায় না। মিথুন-মূর্তিগুলিও অনুপম।

স্বাধীনতার পর কোনারকে যাবার পথ সুগম হয়েছে। সূর্যমন্দির কোনার্ক অনন্য ভাস্কর্যের জন্য বিখ্যাত। সেই ভাস্কর্য-সুধার আস্বাদ লাভ অধুনা মোটেই শক্ত নয়। পুরী গেলে কোনারক দেখে আসতেই হয়।

কোনারকের মন্দির লালচে বালি পাথরে নয়,—কালো পাথরে তৈরি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তৈরি হয়েছিল। মন্দির তিন অংশে বিভক্ত,—দেউল, জগ-

● পূর্বরাগ

মোহন ও নাটমন্দির। প্রায় দুশো ত্রিশ ফুট উঁচু দেউল মাটিতে মিশিয়ে গেছে, এখন রয়েছে জগমোহন ও অর্ধভগ্ন চূড়াহীন নাটমন্দির। জগমোহনের চারটি দ্বারই স্থায়িভাবে রুদ্ধ, অন্তভাগ বালি দিয়ে ঠাসা, যাতে ছাদ ধ্বসে না পড়ে যায়। জগমোহনের বাহ্যিক স্থাপত্য ও বহির্গাত্রের ভাস্কর্য দেখাই কোনারক দেখা।

কোনারক সূর্যমন্দির। কোনার্কের দেবতা—সৃষ্টির দেবতা, প্রাণের দেবতা। সূর্যের উত্তাপে জড়ের অন্তরে প্রাণ উজ্জীবিত হয়, ইন্দ্রিয়ের কোষে কোষে চৈতন্যের প্রেরণা জাগে। সূর্যের উপাসনা—সৃষ্টির উপাসনা। তাই এই মন্দিরে প্রাণোৎসবের উচ্ছল ভঙ্গিমায় বহু নারীমূর্তি,—সৃষ্টির বিভোর আনন্দে বহু মিথুনমূর্তি।

হিন্দু মন্দিরের গাত্রে ও শীর্ষে মিথুনমূর্তি স্থাপন কেন করা হোতো—এ সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। পরবর্তীকালের একটি কুসংস্কার দিয়ে এর একটি ব্যাখ্যা সৃষ্টি করা হয়েছে। মিথুনমূর্তি যে গৃহের সামনে থাকে, সে গৃহে নাকি বজ্রপাতের ভয় থাকে না। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সামনের মিথুনমূর্তি কার্যকরী পাহারা। মহার্ঘ দেবমন্দিরকে বজ্রপাত থেকে রক্ষা করার জন্য এর গায়ে মিথুনমূর্তির রক্ষাকবচ পরানো হোতো।

আর একটি মতের ভিত্তি ধর্ম-সংস্কার। প্রাচীন যুগের জীবনধর্ম নয়, পরবর্তীকালের সংস্কারাবদ্ধ লোক-ধর্ম। ভগবানকে পেতে হলে কামনা-বাসনা ত্যাগ করতে হবে। দেহের আসক্তি দূর না হলে দেহাতীতকে লাভ করা যায় না। তৃষ্ণাকে যদি রোধ করতে পারো তবেই পাবে তৃষ্ণাতীত অমৃতের আস্বাদ। মন্দিরের বহির্গাত্রে এতো লোভনীয় নারীমূর্তির সমাবেশ, কামকুণ্ডরূপ এতো মিথুনদৃশ্যের সমাহার,—এ ভক্তের ভগবৎনিষ্ঠার পরীক্ষা। দেবমন্দিরে কতো শত পূজার্থীর সমাগম। সকলেই আসে আকিঞ্চন নিয়ে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। কদাচ কোনো ভক্ত আসে নিষ্কাম মানসিকতায়,—দেবতার পায়ে সমর্পণ করে মুমুক্ষু হৃদয়ের পবিত্র অঞ্জলি। চরম আকাঙ্ক্ষা নারী, চরম তৃষ্ণা রতিসুখ বাসনা। এই বাসনা-কামনা যার মনে আছে তার মন ঐ মন্দির-গাত্রের ভাস্কর্যেতেই আকৃষ্ট হয়। ঐসব ভাস্কর্যের আকর্ষণে বিচলিত না হলে যে অবিচলিত মন নিয়ে দেবতার সামনে উপস্থিত হতে পারে, সেই প্রকৃত ভক্ত, প্রকৃত পূজারী, দেব-আশীর্বাদের প্রকৃত অধিকারী।

তৃতীয় ব্যাখ্যা সমাজতাত্ত্বিকের। তিনি বলেন, যে-যুগে হিন্দু মন্দিরগাত্রে এইসব কামনাময়ী নারী ও অশ্লীল যৌন-মূর্তি বসানো হয়েছিল, সেই

যুগের নিম্নগামিতারই এগুলি প্রতীক। চরিত্রভ্রষ্ট উচ্চসমাজ যৌনবিকৃতির পাপ পংকে ডুবে ছিল, তাদের মানসিক ও সামাজিক কলুষ-ভাবনাকে তারা নির্লজ্জ দম্ভের সঙ্গে অংকিত করেছিল দেবমন্দিরের অঙ্গে।

এই সমস্ত ব্যাখ্যার কথা বিদেশিনী ক্লোদকে আমি বলি নি। এই সমস্ত ব্যাখ্যা যখন রচিত হয়েছিল তখন ভারতবাসী তার স্বাধীনতাকে বলি দিয়েছে বিধর্মীর খড়্গে, তার ধর্মকে বেঁধেছে কুসংস্কারের নিগড়ে, তার প্রাণবান জীবনের আনন্দস্বাদকে হারিয়েছে পরপদলেহনের কাপুরুষ মোহে, তার আলোকময়ী নারীপ্রকৃতিকে বন্দী করেছে ছায়াবগুণ্ঠনের অবরোধে। যুগের আলোক-আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে শিল্পী সৃষ্টি করে সুন্দরকে, আর যুগ-অন্ধকারের ধূসর ছায়ায় বসে সমালোচক করে সেই শিল্পের ব্যাখ্যা। সেই ব্যাখ্যার ফাঁদে শিল্পের সত্য-বিহঙ্গকে ধরা যাবে না।

প্রাক-আর্য সিন্ধু-সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হলেও বৈদিক যুগ থেকে বৌদ্ধ যুগের আগে পর্যন্ত আর্য-সভ্যতার স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বিশেষ কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় নি। সে যুগের সভ্যতার পরিচয় বৈদিক সাহিত্যের মধ্যেই যা পাওয়া যায়। পাটলিপুত্রে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের যে প্রাসাদ মেগাস্থিনিস দেখেছিলেন তা কাঠের তৈরি। বৌদ্ধ-সম্রাট অশোক শিলাস্তম্ভ নির্মাণ করে তাতে তাঁর বাণী উৎকীর্ণ করেছিলেন। সারনাথ স্তম্ভের মাথায় তিনি ত্রিসিংহ শীর্ষিত ধর্মচক্র স্থাপন করেছিলেন, সেই ধর্মচক্র এখন স্বাধীন ভারতের প্রাণ-প্রতীকরূপে গৃহীত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য- ভাস্কর্যের জনকরূপে সম্রাট অশোকের নাম।

তখন ভারতের শিলাশিল্পী কোনো পূর্ণাঙ্গ দেবমূর্তি গঠন করে নি। বুদ্ধমূর্তি গঠন তো সুরু হয়েছিল অনেক দেরিতে,—মহাযান হীনযান ভেদাভেদের পরে। শিলাভাস্কর্যের সেই আদিম প্রভাতে শিল্পী যে বিষয়-বস্তুকে তার শিল্পসৃষ্টির পরম প্রেরণা বলে গ্রহণ করেছিল,—সে নারী। নারীর পরমাশক্তি তার যৌনশক্তি, পুরুষকে আকর্ষণ করবার শক্তি, সৃষ্টিকে বিবর্তনের নব নব যাত্রায় আহ্বান করার শক্তি। নারীর এই আদিম শক্তি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে দেহের প্রতিটি রেখায়। এই হ্লাদিনী নারী-মূর্তিকে শিল্পী আদিকাল থেকে বন্দনা করে এসেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সমস্ত হিন্দু যুগ ধরে শিল্পী এই নারীকে কতো বিচিত্ররূপে এঁকেছে, কতো রত্ন-আভরণ কতো বিচিত্র অলংকার দিয়ে সাজিয়েছে, কিন্তু লজ্জা-আবরণের আড়ালে তার শক্তি-ময়ী দেহরেখাকে ঢেকে রাখে নি। হিন্দু ভারতের ভাস্কর্যের আদর্শ প্রেরণা কামকান্তিময়ী রত্নদ্যুতিময়ী নগ্নিকা।

আর্য-ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের সুপ্রাচীন নিদর্শন কারলা, ভাজা ও বেদশা গুহায়, সাঁচীর স্তূপাবলীতে, ভারহুট ও অমরাবতীর ধ্বংসাবশেষে। খৃস্টপূর্ব যুগের সৃষ্টি এ সব। সুঙ্গ-কাণ্ব রাজত্বকালের। এই সমস্ত প্রাচীন শিল্পতীর্থে নারীমূর্তির রূপমাধুরী দেখে বিস্মিত হতে হয়। সাঁচী-তোরণের ব্র্যাকেটের নগ্নিকাকে দেখে চোখ ফেরানো যায় না।

তারপর কুশানযুগ গুপ্তযুগ পার হয়ে হিন্দুমধ্যযুগ। এ যুগের শিল্প-নিদর্শনগুলি এখনো রয়েছে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে। ইলোরায়, অজন্তায়, এলিফ্যাণ্টায়, বাদামী, আইহোল ও পট্টডাকলে, বিজয়নগরে, ভুবনেশ্বর ও কোনারকে, হালেবিড় ও বেলুড়ে, তাঞ্জোর, মাদুরায়, রামেশ্বরে। দেবী-রূপিণী বা মানবীরূপিণী, সর্বত্র এই নগ্নিকা বা অর্ধনগ্নিকার বন্দনা। নারীর রূপমাধুরী ভারত-শিল্পের হৃৎ-কমলের অনির্বাণ অমৃত।

ভারতের মিথুনভাস্কর্যও কোনো বিশেষ কালের বা স্থানের পরিধিতে সীমাবদ্ধ থাকে নি। প্রকৃতি-পুরুষের মিলনচিত্র ভারত-ভাস্কর্যের বহু প্রাচীন

দর্পণে হেরিছে মুখ

যুগ থেকে পাওয়া যায় এবং তা শুধু হিন্দু মন্দিরের বৈশিষ্ট্য নয়, বৌদ্ধ ও জৈন মন্দিরেরও। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম ভারতেরই ধর্ম, হিন্দুধর্মের ক্রোড়েই তার জন্ম। প্রকৃতি-পুরুষবাদ ভারতীয়-দর্শনের আদিসূত্র,—যার সঙ্গে আচার-নির্ভর বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের কোনো মৌলিক বিরোধ নেই। বৌদ্ধযুগে ভারত-ভাস্কর্যের স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গেই শৃঙ্গার একটি বিশিষ্ট ভাস্কর্যরূপ বলে স্বীকৃত হয়েছে। গান্ধার, কুশান ও গুপ্ত-যুগ অতিক্রম করে হিন্দুমধ্যযুগে এই রূপ এক শিল্প-সুন্দর পরিণতি লাভ করেছে।

কাশ্মীরের মার্তণ্ড মন্দির ও উড়িষ্যার কোনার্ক মন্দির সূর্যমন্দির, উড়িষ্যার ভুবনেশ্বর ও মহীশূরের বেলুড় হালেবিড়ের বিষ্ণুমন্দির। আই-হোল ও পট্টডাকলে বিষ্ণু ও শক্তির উপাসনা। ইলোরা ও খাজুরাহোতে হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের সমন্বয়। উপরোক্ত সব ক'টি মন্দিরেই অল্পবিস্তর মিথুনমূর্তির সমাবেশ। এ সব মন্দির

দ্বিদলে পদ্ম

বিমলচন্দ্র ঘোষ

॥ এক ॥

চোখ দুটো যদি পাথর হ'ত
জল ঝরতো না,
অক্ষিগোলকে প্রতিবিম্বিত হ'ত না
বিশ্বরূপের আলো।
মনটা যদি হ'ত শব্দধারক যন্ত্র
তাহ'লে সে শুধু
শোনা-কথারই পুনরাবৃত্তি করতো
কথা সৃষ্টি তার দ্বারা হ'ত না।
বাহুদ্বয় যদি হ'ত শাল্মলী শাখা,
তাতে শুধু হেলান দিয়েই থাকতে
তারা তোমাকে বুকে টেনে নিতো না।
প্রেম সংশয়াতীত দ্বন্দ্বমুক্ত হ'লে
নায়ক-নায়িকার স্থান হ'তো
ব্রহ্মচর্য আশ্রমে
কিম্বা পাগলাগারদে।
নিরবচ্ছিন্ন যান্ত্রিক প্রেম
নির্দ্বন্দ্ব নিরহঙ্কার মনোবিনিময়,
কাব্য সৃষ্টি করে না।

॥ দুই ॥

মুক্তির চেহারা নেই,
শান্তি সুখ আজো নিরাকার
হৃদয়ের আলো প্রেম
প্রশান্তির স্বপ্নে ঘেরা অশান্তির শিখা
অনিদ্র আত্মায় অনির্বাণ।
সে শিখা নেভে না ঝড়ে
তাই বেঁচে থাকা।
তাই দিনে দিনে
নিশান্তে আহ্বান করা নতুন দিনকে
মানুষ যা চায় তার
শতাংশের একাংশও পেলে
বাঁচার নিষ্ঠায় মন জাগে,
অদম্য সৃষ্টির অনুরাগে
একা পায় প্রত্যুষের নক্ষত্রের দ্যুতি।
মানুষের স্বপ্নে অনুভূতি
মূর্ত হয় তত্ত্বে রূপে প্রমূর্ত
অমূর্ত বাসনায়।
একটি সোনালী শুভ্র রক্তিম চুম্বন
একটি পরম লগ্নে উরসে
নিশ্চিন্তে মাথা রাখা।
পৃথিবীকে নবজন্ম দেয়
ইতিহাস আলো পায়
আলো পায় প্রেম।

প্রাক-মুসলিম যুগের হিন্দু শিল্পের স্মৃতি নিদর্শন। মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে কিছু কিছু পড়ে আছে। উত্তর ভারতের সব সম্পদ ধ্বংস হয়েছে। মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ভাস্কর্য-শিল্পের অবসান। মুসলমান যুগের শেষের দিকে মারাঠারা যেসব মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, যেমন কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির, উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দির, সে সব মন্দিরে মিথুন-ভাস্কর্য তো দূরের কথা, নারীমূর্তিও বিরল। ততোদিনে ভারতের নারী বোরখার অন্তরালে অদৃশ্য হয়েছে।

মিসেস ক্লেয়ারও সেই একই প্রশ্ন করেছিলেন, দেবতার মন্দিরে এতো মিথুনমূর্তি কেন?

খারে সে প্রশ্নের চমৎকার জবাব দিয়েছিল। সে বলেছিল, দেবতা যা ভালোবাসেন ভক্ত তাই দিয়েই তো দেবতার অর্ঘ্য সাজায়—তাই না?

মিসেস ক্লেয়ার মাথা নেড়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে খারে বলেছিল,—ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ। মানুষ নব নব বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সৃষ্টিকে পূর্ণ পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। মানুষের আনন্দপুলকভরা সৃষ্টিলীলা দেখে সৃষ্টিকর্তার আনন্দের সীমা নেই। দেবতার প্রীতির জন্যেই তো ভক্ত ভাস্কর দেবমন্দিরের অঙ্গে অঙ্গে মানুষের মিলনলীলার অলংকার পরিয়েছে।

(ক্রমশ।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

খেলনার মুক্তি

ভবানী মুখোপাধ্যায়

ওপারে হলঘরের দরজা খুলে ও কার্পেট-মোড়া ঘরটিতে প্রবেশ করার অনেক আগেই বেশ গুঞ্জন শোনা যাচ্ছিল। গৌরীদি একটু থমকে দাঁড়িয়ে ঢুকে পড়লেন। আমাকেও অনুসরণ করতে হল। তবে একথা বলা প্রয়োজন যে, গৌরীদি যেখানে যান তাঁর অনুসরণ করে সেখানে অগ্রসর হওয়া সহজ কাজ নয়।

বড় ঘর, জন পঞ্চাশেক লোক জমায়েত হলে মনে হবে না। অনেক লোকজন। ঘরের আসবাবপত্র স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন। ইন্দ্রের সভা। যেমন আলোর বাহার, তেমনই কোচ, কেদারা, সোফা আর নানাবিধ দুষ্প্রাপ্য শিল্পদ্রব্য। বিলিতি, চৈনিক, জাপানী এবং দেশী। একজন শিল্পরসিকের ঘর দেখলেই তা বোঝা যাবে, কাউকে বলে দিতে হবে না। সবই ভালো, সবই চমৎকার, সবই আহামরি। এটা নেই বা ওটা নেই দেখি। বৈভব বটে, রাণীর মত ঐশ্বর্য বলা যায় রাণীর মতন।

উজ্জ্বলালোকিত সেই ঘরে যেসব বিচিত্র নরনারী পানপান করছেন বা গ্লাস হাতে করে নিজেদের মধ্যে তর্ক করছেন তাঁদের যেন মনে হয় যেন অশরীরী মানুষ বলে মনে হয়। যেমন কৃত্রিম আকৃতি, তেমনই কৃত্রিম কথা বলার ঢং।

যে যা খুশী বলছে। যার যা খুশী করছে। কিন্তু তাতে কিছু এসে যায় না।

গৌরীদি নির্বোধ নন, অন্তত সেই মুহূর্তে আমার তাই মনে হল।

সেই আলো-আলো আধো-অন্ধকার ঘরে কি যে হচ্ছে, কি যে কোথায়—যেন বুঝতে পারা যায় না। বাইরের আকাশে যে তখনও সূর্য যে প্রজ্জ্বলিত তা বোঝার কোনও উপায় নেই।

আমার পাশের আসনে এসে বসলেন গৌরীদি। চমকে উঠেছি, এমনভাবে বসলেন যে তাতে অবাক হয়ে যেতে হয়।

গৌরীদির কণ্ঠস্বর খস্‌খসে এবং উত্তেজনায় ভরা, বললেন—আমি একটু ফোন করতে গিয়েছিলাম ভাই, সারপ্রাইজ, সোনা মেয়ে সারপ্রাইজ—

—কি সারপ্রাইজ গৌরীদি।

—এই টেলিফোনটা। যাক্ গে শোনো—যা কিছু পেলুম বাড়িতে এটা রাখো।

গৌরীদি আমার হাতের মুঠোয় কয়েকখানি নোট গুঁজে দিলেন বেশ গোপনে। আমি তাড়াতাড়ি সেগুলি ব্যাগে রেখে দিলাম। গৌরীদি তাহলে ভুলে যান নি। বললাম— গৌরীদি, এতে আমার উপকার হবে, কি বলে ধন্যবাদ দেব জানি না—

—আর ধন্যবাদ দিতে হবে না। একটু বসো আমি ওদিকটা দেখে আসি। টুটুল চৌধুরী যেরকম হাত নাড়ছে, ভয় করে।

—টুটুল চৌধুরী কে গৌরীদি?

—ওরে বাবা, ওর নাম শোনো নি, মস্ত আর্টিস্ট, সেই যে দুটো ফুটকি আর একটা স্ট্রেট লাইন দিয়ে মা ও মেয়ে এঁকে বিশ হাজার টাকা পেয়েছেন। কাগজে পড়ো নি—

বোকার মত ঘাড় নেড়ে বললাম— ও হ্যাঁ বটে।

গৌরীদি বললেন—বসো একটু, পালিও না যেন।

আমি কফির পেয়ালাটায় চুমুক দিলাম। গৌরীদি কত টাকা দিলেন কে জানে, বাইরে গিয়ে দেখব। এমন সময় লক্ষ্য করলাম, গৌরীদি একসঙ্গে প্রায় দশ-বারোটি ধূপ জ্বেলে ওদিকে এগিয়ে আসছেন, ধূপদানিতে সাজিয়ে রাখবেন। দেশী-বিদেশী কোনো বায়দা'ই বাদ যাবে না।

মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে, এই যে—অনেক দিন পরে যে—কিংবা—চললে, এর মধ্যেই যেতে হবে। অপর পক্ষ কুণ্ঠিত কণ্ঠে জবাব দিচ্ছেন—যেতে ইচ্ছে করছে না, কিন্তু একটা এমন ভীষণ জরুরী এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট রয়েছে যে—

যেন একই রেকর্ড বার বার বাজছে।

এমন সময় দেখি রুণু মিত্তির। টেরিলিনের সার্ট কায়দা করে ঝুলিয়ে বেশ কালো রঙের ডেকরনের ড্রেন পাইপ পরে এসেছে। দেখাচ্ছেও বেশ স্মার্ট। আমি ত' অবাক। সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি—এই যে রুণুদা! তুমি এখানে—?

—আরে—গৌরীদি ডেকেছিল, প্রথমটায়,

বুঝি না কি ব্যাপার, তারপর ভাবলাম হিমানীর হয়ত কোনো দরকার পড়েছে। তাই এলাম।---

রূপদাকে বেশ দেখাচ্ছে, একটু অবশ্য পাতলা হয়েছে, তবে ওর ছেলেমানুষী মুখভঙ্গী আরো প্রকাশিত, আমি মৃদু হেসে ওর দিকে তাকালাম। বললাম---কবে ফিরেছ? অনেকদিন নিশ্চয়ই।

---না না, আজই সকালে। তোমার ওখানে গিয়েছিলাম, দেখি তুমি নেই।

যাহোক আমার কথা ভোলে নি একেবারে। আমি এবার একটু নীচু গলায় বললাম---রূপদা চলো এখান থেকে পালাই। রাত অনেক হয়েছে। আমার একটুও ভালো লাগছে না কিন্তু---

---কেন? গৌরীদির পার্টি। কলকাতার সেরা আসর, মাঝে মাঝে এর কথা খবরের কাগজেও বেরিয়েছে।

হতে পারে, তবে রাত বারোটা অবধি এই হুল্লোড়, আর সইছে না---

রূপদা বলল---জানো না বুঝি, এই ঘরে পার্টি লেগেই আছে। বাইরের এই হলঘরটায় প্রায়ই নতুন শিল্পীদের ছবির প্রদর্শনী হয়, ঢালা নিমন্ত্রণ সব সময়।

আমরা বেরিয়ে এলাম। নীচে নামতে নামতে বলি---এইসব একগাদা লোক, এরা কারা---?

---শহরের সব সেরা লোক, শিল্পী, সংবাদপত্রের রিপোর্টার, বড় বিজনেস ম্যাগনেট---কে নয়?

বাইরে বেরিয়ে এসে ওকে আবার ভালো-করে দেখলাম, না, তেমন শরীর নয়। কোথাও কিছু একটা ঘটেছে, চোখের কালো কালো গভীর দাগ দেখে বেশ সুস্থ চেহারা মনে হয় না।

রাস্তায় কোনও গাড়ি নেই। রূপদা একটা ট্যাক্সী ধরল। তারপর ট্যাক্সীতে উঠেই একটা সিগারেট ধরায়, সেই সময় দেশলায়ের আলোয় ওর মুখটা আবার দেখলাম, আমার সারা দেহটা কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে, বেশ শীত শীত মনে হচ্ছে। এমন সময় রূপদা বলে ওঠে---তারপর, ব্যাপারটা কি?

---কি আবার! কিছুই নয়।

আমার কেমন কোনো কথা বলতে ইচ্ছে করল না। আমি ওর দিকে তাকিয়ে ভাবতে থাকি, কেন এই মানুষটাকে এমন ভালোবেসে ফেলেছি, কি আছে ওর? কেন এই দুর্বার আকর্ষণ?

ঐ চোখ, ঐ আশ্চর্য মুখখানার মধ্যে নিশ্চয়ই কিছু আছে। একটু গভীরভাবেই ওকে দেখতে থাকি।

রূপদা আবার বলে ওঠে---বলো না হিম, কি হয়েছে? গৌরীদি খুলে বলে নি। তবে বুঝেছি নিশ্চয়ই কিছু একটা---?

আমি একটু সরে বসলাম, কি একটা পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি তুলে নিলাম। আমার ব্যাগটা পড়ে গিয়েছিল। ওর ভেতরই আছে গৌরীদির অনুগ্রহ।

সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে এমন এক হাস্যকর অসহায়তা রয়েছে যা আমার মনে অস্বস্তি জাগায়। পঞ্চাশ টাকা গৌরীদি দিয়েছেন। আমার কাছে এই অর্থ নিছক অর্থহীন। গৌরীদি আমাকে বেশী কথা বলার সুযোগ দেন নি, তাঁর আশপাশে যে হুল্লোড় তার মধ্যে সে অবসর কোথায়।

গাড়িটা রূপদার বাড়ির সামনে থামল। আমি গৌরীদির দেওয়া টাকা থেকে ট্যাক্সী ভাড়া মিটিয়ে দিলাম। তারপর ওপরে ওঠার সময় সিঁড়িতেই রূপদা আমাকে জড়িয়ে ধরে নিবিড়ভাবে, তারপর চুম্বনে সারা অঙ্গ ভরে দেয়। আজ আমি রূপদাকে বুঝেছি।

আমরা ধীরে ধীরে ওর ঘরে গিয়ে পৌঁছলাম, দরজাটা খোলা ছিল, ঘরের ভেতর চেয়ারে বসে আছেন সেই শীর্ণশুভ্র মূর্তি, চোখে কঠিন দৃষ্টি, এই চোখ এই মুখ আমার পরিচিত। আর একদিন আমি ওঁকে দেখেছি।

রূপদার মুখখানা সাদা হয়ে গেল এক-নিমেষেই।

মহিলাটি বললেন---বস, কথা আছে।

সেই মধ্যরাত্রে সেই কঠিন কণ্ঠস্বর যেন বজ্রপাতের মত শোনালো। তিনি যে ভীষণ রেগে আছেন তা বুঝতে একটুও দেরী হয় না। অপরাধীর ভঙ্গীতে রূপদা অকারণেই বলে ওঠে---মা এই সেই হিমানী।

মহিলাটি এবার আমার মুখের পানে সেই দৃষ্টি মেলে তাকালেন। এমনই তার জ্বালা যে, আমি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিলাম। তিনি বললেন---মেয়েটি থাক। আমি এখনই যাব। আমার কথা বেশী নেই, তুমি বরং বসো---

রূপদা আমার দিকে ফিরে বললেন---তুমি না হয়---

রূপদার মা বললেন---না, প্রয়োজন নেই। ও থাক, আমি যা বলার বলছি।---

---কিন্তু মা!

---কোনো কিন্তু নেই। আমার যা বলার আছে ও শুনতে পারে।

রূপদা বসল। ইতস্তত করে আমিও বসলাম।

রূপদার মা বললেন---তুমি যা করে বেড়াচ্ছ তা আমার সব জানা। এরপর তোমার সঙ্গে আর আমার কোনো সম্পর্ক থাকা উচিত নয়। তোমাকে বাঁচাবার জন্য আমি যথাসাধ্য করেছি, কিন্তু তুমি যে পথে চলেছ সেই পথ থেকে উদ্ধার করার শক্তি আমার নেই। এ এক সর্বনাশের পথ। আমার সমস্ত সম্পত্তি আমি দান করে দিয়েছি, তোমার জন্য কিছুই রাখি নি, কাল সকালেই সব জানতে পারবে।

এই পর্যন্ত বলেই তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

সমগ্র ঘটনাটি এমনই দ্রুততালে ঘটে গেল যে, আমি বা রূপদা কেউই বুঝলাম না তিনি কখন কিভাবে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

আমরা দুজনে বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

অনেক পরে রূপদা কেমন চড়া গলায় বলে উঠল---ভালোই হল, আমার আর কোনো বাঁধন রইল না। কথাটা যেন আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল'র মত শোনালো।

আমি তখনও বুঝি নি ব্যাপারটা ঠিক কি। উদ্‌ভ্রান্ত রূপদার দিকে তাকিয়ে আছি এমন সময় রূপদা আবার বলল---আমি কাউকেই ডর করি না। মার টাকা আমার ভরসা নয়। আমার টাকা---পথেঘাটে ছড়ানো, কুড়িয়ে নিলেই হয়।

তারপর একটা সিগারেট ধরিয়ে বলে ওঠে---হিম, তুমি পারো আমাকে বাঁচাতে, তুমি একমাত্র প্রাণী যার হাতে আমি জীবনটা ছেড়ে দিতে পারি। শুধু আমি যেমনটি বলব তা করতে হবে।

এই রূপদাই আমাকে শেষ পর্যন্ত টেনে এনেছিল বোম্বের স্টুডিয়ো চত্বরে। জীবনে কোনোদিন যে চিত্রতারকা হয়ে উঠবো মজার মানুষের খেলনার বস্তু হয়ে দাঁড়াবো, এ কথা ভাবিনি।

এ এক বিচিত্র জগৎ। গৌরীদির মজলিস পর্যন্ত জানা ছিল, সেখানে মেয়েরা কি ভাবে অবলীলাক্রমে গ্লাসের পর গ্লাস জিন খায় আর সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ে তা দেখেছি। কিন্তু ছবির জগৎ অন্যরূপ, বাহির বিশ্বের কোনো কিছুর সঙ্গে এর সংযোগ নেই। বোম্বাই শহরটা ভূগোলের দিক থেকে ভারতবর্ষে সে কথা আমরা জানি, কিন্তু সেখানকার এই বিচিত্র নর-নারীর সঙ্গে কোনো দেশের মানুষের বোধ করি মিল নেই। এদের পোষাক-পরিচ্ছদ পাঁচ-মিশেলী, আহার-বিহার, আদব-কায়দা সবই পাঁচ-মিশেলী। ভাষাও সেই রকম।

ছোট পার্ট নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ, তারপর একদিন ডিরেকটার সাহেবের ভালো লেগে গেল। তিনি আমাকে সেদিন হোটেলে নিয়ে গিয়ে অনেক উপদেশ দিলেন, আর জিন

কত রকমে যে খাওয়া যায় তাও শিখিয়ে দিলেন।

আমার ছায়াচিত্রের জীবনে উন্নতি ঘটল, রাতারাতি আমার নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। মুখস্থ করা হিন্দি দোরস্ত করে নতুন নায়িকা বাজী মাৎ করল। কত পত্রিকায় ছবি, আর কত না জল্পনা-কল্পনা আমাকে নিয়ে।

নিভৃত নিরালায় কখনো কখনো সে সব পড়ি আর হাসি। কিন্তু এই নির্ভৃতি আমার ছিল না। দিনরাত হুল্লোড়, আমার ফ্ল্যাটে এক একদিন রাত তিনটে পর্যন্ত এইভাবে চলেছে। আমি এখন বুঝে নিয়েছি, অভিনয় যাই করি না কেন, নাম আমার জ্বলজ্বল করে জ্বলবে, নিওন সাইনে সেই নাম জ্বলবে আর নিভবে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমিও যে এমন করে জ্বলব তা জানা ছিল না।

রুণু মাঝে মাঝে আসে, আমার কাছ থেকে বেশ কিছু টাকাকড়ি নিয়ে আবার কোথায় উধাও হয়ে যায়। এতদিনে বুঝেছি ওর ব্যবসাটাই এই রকম। কিছু মেয়ে সংগ্রহ করে এদিক-ওদিকে চালান দেয়, তাদের রোজগার কর্ণধার রোজগার, সেই পয়সায় মদ খায়, ফূর্তি করে, আর কি করে কে জানে।

ওকে এখন দেখলে আমার মনে আতংক জাগে।

আমাদের মধ্যে প্রেমিক-প্রেমিকার উত্তাপ আর নেই। আমরা এখন যেন অনেক দিনের বিয়ে করা জীবনের প্রৌঢ়-দম্পতি। বিবাহের এ এক নিষ্ঠুর প্যারডি। আমি যখন কাজে যাই, তখন ও এসে আমার ফ্ল্যাটে ঘুমিয়ে কাটায়। আমাকে ও বিশ্বাস করে না, আমারও মাথাব্যথা নেই। ওকে দেখলে আমার মনটা বিষিয়ে যায়।

ইদানীং আমার মনে অনেক সংস্কার জেগেছে। মঙ্গল-অমঙ্গলের চিন্তা বৃদ্ধি পেয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় কিছুক্ষণ চোখ বুজে দাঁড়িয়ে থাকি, বাড়ির আয়না-টায় অনেকক্ষণ ধরে মুখ দেখি, নিজের মধ্যে কি যেন একটা আবিষ্কারের চেষ্টা। অথচ কোনোকালে এসব বালাই আমার ছিল না।

যদি কোনোদিন ভুলে যেতাম ত' ভারী অস্বস্তিবোধ হত। আবার ফ্ল্যাটে ফিরে গিয়ে ঐ সব কাজ করার জন্য মন চঞ্চল হয়ে উঠত।

অনেক সময় যখন বাড়ি ফিরতাম আমার দুর্বহ অবস্থা। কিছুতেই সামলাতে পারি না। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমার এই এক প্রোগ্রাম। আমি এখন আর কেউ নই, একটা খেলনা মাত্র।

প্রথম প্রথম এসব কথা মনে এলে হেসে উড়িয়ে দিতাম। মনকে প্রবোধ দিতাম যে আমার একটা ম্যানিয়া হয়ে দাঁড়াচ্ছে। একদিন রাতে শুয়ে আছি, বাথরুমের কলটা খোলা আছে, আমি অনেকক্ষণ কান পেতে শুনতে থাকি, ও কিসের শব্দ। দেহ ক্লান্ত মন অবশ। পোর্সিলেনের বেসিনে এই জল পড়ার শব্দ আমাকে কেমন আতংকিত করে তোলে। কিন্তু আমার শরীর এমন অবশ যে কিছুতেই উঠে গিয়ে সেই শব্দ বন্ধ করার শক্তি আমার নেই। শব্দেরও বিরাম নেই, কখন তন্দ্রা এসেছিল, আবার জেগে উঠি, সেই নিস্তব্ধ রাত্রের সকল স্তব্ধতা ভেদ করে শোনা যাচ্ছে টপ-টপ। বিরক্তিকর একটানা বিশ্রী শব্দ, বীভৎস।

তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। বাথরুমের কলটা বন্ধ করতে গিয়ে দেখি সেটা বন্ধই আছে, চারদিক শুখনো খটখটে।

বিছানায় ফিরে এলাম। দেহের পেশি-গুলি শিথিল করে বিছানায় ছড়িয়ে দিলাম আপনাকে। আবার সেই শব্দ, কি ভীষণ! আশ্চর্য এই দেখে এসেছি অন্য রকম, অথচ এই শব্দ যে বাস্তব সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

জল পড়ছে। আমার রাগ বেড়ে যায়। উন্মত্তের মত বেগে উঠি। আমি নিজে ত' দেখে এলাম, কলটা বন্ধ, কোথাও জল নেই এক ফোঁটা---তবে? আবার ভাবি আমি কি ঠিক দেখেছি? আমার মনের ভুল নয়ত? আবার বাথরুমে ঢুকে প্রাণপণে কলটা টেনে ঠিক করি, সমগ্র দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করি। বিছানায় ফিরে এসে অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে থাকি। একটা নিরালা একটানা শব্দ আমাকে যন্ত্রণা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কোন শয়তান কোনো এক অদৃশ্যলোক থেকে আমাকে এভাবে নিপীড়ন করছে। শেষ পর্যন্ত ঘুমিয়ে পড়তে অনেক দীর্ঘ সময় লেগে যায়।

এ সব হাস্যকর মনে হতে পারে---কিন্তু পড়তে যেমন মনে হচ্ছে, গভীর রাতের অন্ধকারে নিরালা বিছানায় শুয়ে তা মনে হয় না।

আমার এইসব ম্যানিয়া ক্রমেই বেড়ে চলছে একদিন মাঝরাতে ঘুম ভেঙে উঠে পড়ে দেখতে গেলাম দরজাটা ঠিকমত বন্ধ করা হয়েছে কি না। তারপর যেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে তখনই মনে হচ্ছে তাই ত' ভালো করে দেখা হয় নি ত'।

এইভাবে আট আটবার উঠে উঠে দেখেছি দরজাটা ঠিকমত বন্ধ হয়েছে কি না।

পরদিন রাতে আবার সেই ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে, না, এবার আর নয়, ওর মধ্যে আর যাব না, যদি একবার এই খেয়ালকে প্রশ্রয় দিই তাহলে তা মাথায় চড়ে বসবে। এও যেন এক নেশা। মাথায় চড়ে বসছে আর রক্ষা নেই।

স্টুডিয়োর খাটুনির জের মেটাতে জিভ টানার মত, তারপর আর তার শেষ নেই। যেমন এই আমার স্নান করার বাতিক, এটা অবশ্য লেডী ম্যাকবেথের রুটিন নয়, তবু রাতে শোওয়ার আগে একরকম বার বার মাথায় জল ঢালি, সকালেও তাই।

একবার সাবান মাখি, তার পদ্ধতি আমার নিজস্ব, তারপর দাঁত মাজা। টুথ ব্রাসে পেস্টটুকু একটা বিশিষ্ট কায়দায় লাগাতে হবে। আমার গা শুকানোর জন্যও এইরকম অসহ্য পদ্ধতি, বারবার তোয়ালে ঘসেও মনে হয়, কোথাও যেন জল লেগে রইল। মনে মনে গুণি ক'বার হল, যদি মনে হয় হিসাব মিলছে না তবে আর একবার। আমার সারা অঙ্গ ঘর্ষণের প্রাবল্যে লাল হয়ে ওঠে।

এই আবেগ নিয়তই লেগে আছে, একবার মনে ভেসে ওঠে, আবার মিলিয়ে যায়। আমি কিন্তু পাগল হই নি, জানি আমার এ সব কাণ্ড নিছক বোকামি। তবু এরকম করা ভালো; নইলে সারা দিনটা মন অস্বস্তিতে ভরে থাকবে। কি যেন হয় নি, কি যেন ফাঁকা ফাঁকা---

আমি বেশ অসুস্থ বোধ করি, কিন্তু এ আমার জীবনের একটা অঙ্গ হয়ে উঠেছে। আমার হাতে যে অনেক অবসর।

রূপোপজীবিনীর জীবন অলস মহর। খাওয়া আর শোওয়া এবং চিন্তা-ভাবনার জন্য প্রচুর সময়। অনেক---অনেক অবসর। রুণুদা আমার কাছে এসে হামলা করে টাকা নিয়ে গেলেও আমার এখন অনেক টাকা। কি ভাবে যে খরচ করি তাই ভেবে পাই না একটুও। অনেক কাঁচা টাকা, সামলানো দায়।

আমার ডিরেক্টার সাহেব নিয়ম করে আসা-যাওয়া করেন, এ মূল্য দিতে হয়; তিনিই আমাকে সম্মান দিয়েছেন, খ্যাতি দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন। এই মধ্যবয়সী ভদ্রলোক আশ্চর্য খেয়ালী, তাঁর গ্লাস ভর্তি থাকলে চ বে না, সেইসঙ্গে আমারও।

রুণুদা মাঝে মাঝে চিঠি দেয়। কখন যে ধূমকেতুর মত এসে হাজির হবে জানি না। আমার এখন ওকেই বেশী ভয়।

টাকা আমার এমনই এসে যায়। আমার স্টুডিয়োর কর্তারা মাঝে মাঝে আসেন বটে; কিন্তু আর এক শ্রেণীর মানুষও আমার কাছে আসেন, তাঁরা বড় মিল মালিক, কিংবা সমাজের ও রাষ্ট্রের কর্ণধার। টাকা আমি কারো কাছে চাই না, টাকা আমি পাই। একটু বেশীই পাই। সবচেয়ে ধারণা আমার দর বেশী। সেদিন একদল এলেন আমেদা-

লাঞ্চ থেকে। আমাদের ডিরেক্টার সাহেবের সঙ্গে লাঞ্চের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলাম 'তাজে', ডিরেক্টার একফাঁকে উঠে গেছেন, একটা জরুরী এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে। আমেদাবাদের মিঃ মুন্সী সারাদিন আমাকে আটকে রাখলেন, বিকালে মেরিন ড্রাইভে বেড়ালেন। কারো সঙ্গে দেখা হলে পরিচয় করে দিলেন 'মাই ডটার' বলে। বয়স পঞ্চান্ন কি ষাট হবে। সেই রাত্তেই আবার ফ্লাই করছেন দিল্লীতে। আমাকে এয়ার পোর্ট পর্যন্ত যেতে হল, এয়ার পোর্টে আমাকে আদর করলেন 'মাই ডটার' বলে, সেকহ্যাণ্ড করার ফাঁকে হাতে অনেক টাকার একটা চেক গুঁজে দিলেন। ভদ্রলোক বিবাহ করেন নি এ কথা বলেছেন, সারাদিনে একবার সেকহ্যাণ্ড করা ছাড়া আমার অঙ্গ স্পর্শ করেন নি---অথচ এই টাকা।

এইদিন আমার চোখে জল এসেছিল। এইদিন আমি সামান্য গিমলেট পান করেছি মাত্র দুবার। মিঃ মুন্সীকে যদি আরো দু-একদিন পেতাম হয়ত জেনে নিতে পারতাম ওঁর কোথায় দুঃখ।

কিন্তু এই জীবন জীবন নয়। আমি কারো নই, কেউ আমার নয়। তারপর সুরার আকর্ষণ ক্রমশ প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছে। স্টুডিয়োতে দু-একদিন একটু কথা হয়েছে। আমি নাকি উল্টা-পাল্টা বলে ফেলেছি, ফলে আবার রিটেক করতে হয়েছে। কোনদিন ওরা সবাই আমাকে ধরাধরি করে খাটে শুয়ে দিয়ে গেছে।

আমি শেষ পর্যন্ত স্থির করেছি, মদ আমি ছাড়বই। একবার আমার পেটের অসহ্য যন্ত্রণার জন্য ডাক্তারকে আসতে হয়েছিল, এক সপ্তাহ বিছানায় শুয়ে কাটিয়েছি, আমায় জুস খেতে দিয়েছে, কেউ আমাকে এক ফোঁটা মদ এনে দেয় নি। আমি তবু বেঁচে গেছি।

কিন্তু এত সহজ নয়। ঘুম আসে না। দিনে পিল খাই, দিনের বেলায় কফি অরেঞ্জ জুস আর রাতের বেলায় স্লিপিং পিল।

কত ডাক্তার যে দেখালাম তার হিসাব নেই। একজন আমাকে একবাক্স '[illegible]' দিলেন। বার বার করে বলেছিলেন, সাবধান এটা যেন অভ্যাসে পরিণত না করি। বলেছিলেন, আমার সঙ্গে মাঝে মাঝে দেখা করবে, আমি তোমার সব সারিয়ে দেব।

আমি সেদিন বাসে করে বাড়ি ফিরেছিলাম। বাড়ি ঢুকতেই আমার কাচের আলমারিতে সাজানো হোয়াইট হর্সের বোতল নজরে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি একটা গ্লাসে খানিকটা ঢেলে নিলাম। কেমন সুন্দর মেহগিনি রঙ।

সেদিন আমি সেই ব্রাণ্ডি গলায় ঢেলে দিয়েছিলাম একনিঃশ্বাসে। একমাস পরে এই প্রথম সুরাস্পর্শ। তরল গরল আমার কণ্ঠ বেয়ে নেমে গেল। কোনো ব্যথা নেই, জ্বালা নেই। এখন আর আমি একা নই।

আবার একপাত্র ঢেলে নিই। আমার দেহ কাঁপছে, যেন স্যাম্পেনে স্নান করেছি। চমৎকার! হয়ত সত্য---নয় মদ্য। ডাক্তাররা সবাই ঐ রকম খালি ভয় দেখায়। এই ত' আমি বেশ আছি। কোনো কিছু কষ্ট নেই। তারপর একসময় দেখি বোতলটা শেষ হয়ে গেছে, তার ভেতর আর একফোঁটা ব্রাণ্ডি নেই। তাহলে! তাহলে কি আবার সেই ব্যথাটা---

পাগলের মত সেদিন আর একটা বোতলও শেষ করেছিলাম। আমি জানতাম আজ আমার নিশ্চিত মরণ।

পরদিন সকালে মহা আতংকে ঘুম ভাঙল। না আমার পরাজয় হয়েছে। সুরা আমার চাই। যত টাকা লাগে লাগুক, মদ আমার চাই। সারা দেহ মদের প্লাবনে ভাসিয়ে দেব। কতখানি সময় যে এভাবে নষ্ট হয়েছে জানি না, সারা দেহে তীব্র জ্বালা, মনে ভীষণ আতংক। দেয়ালে কিসের ছায়া। আমার চুলগুলো যেন সাপের মত ফণা তুলে ধরেছে। আমার গায়ে পিঁপড়ে ধরেছে, না না পিঁপড়ে নয়, নিশ্চয়ই কাঁকড়া বিছার সার। আমার গায়ের চামড়া যেন ফেটে পড়ছে। বাথ-রুমের দরজা বন্ধ, সামনের দরজা বন্ধ, তবু এই কাঁকড়া বিছার দল সার বেঁধে আসছে---

এভাবে কতক্ষণ কেটেছে জানি না, আমি শেষ পর্যন্ত অচৈতন্য হয়ে মাটিতে পড়ে গেছি।

আমার সেই ডাক্তার আবার এসেছিলেন, এইবার তিনি আমাকে সাবধান করে দিয়েছেন, বলেছেন বাড়িতে কিছু রাখা চলবে না, পুলিসে তিনি খবর দেবেন। আমি যদি এভাবে কেবল নেশায় ডুবে থাকি তাহলে আমার উন্মাদ হয়ে যেতে আর বেশী দেরী থাকবে না।

ডাক্তার দেশাই লোকটি প্রবীণ। আমাকে তিনি মেয়ের মতই স্নেহ করতেন, তাঁর চিকিৎসার ধরণটাই ছিল অন্যরকম। তিনি আমাকে 'ডাইভারসান্যাল থেরপি' অর্থাৎ মনকে অন্যমনস্ক করে অন্য কর্মে ব্যস্ত থাকার ব্যবস্থা করলেন, এমন একটা প্রোগ্রাম করেছিলেন যার ভেতর ফাঁক নেই, আর বললেন যারা মদ খায় তাদের এড়িয়ে চলতে। চোখের সামনে মদ না দেখাই ভালো।

এই স্নেহময় মানুষটির চিকিৎসার গুণে আবার আমি উঠে দাঁড়ালাম। এইবার আমার অর্থ কমে আসছে। স্টুডিয়ো পাড়ায় বদনাম হয়ে গেছে নতুন কনট্রাক্ট আর আসছে না। আমার আকৃতিও ক্রমশ শ্রীহীন হয়ে আসছে।

ডাক্তারের নির্দেশমত আমার জীবনটা গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। রাতের ঘুমটা কিছুতেই আয়ত্তে আনতে পারছি না। মানসিক এক উৎকট যন্ত্রণায় আমি ব্যাকুল হয়ে উঠছি দিন দিন।

ঠিক এই সময় সেই আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল। স্টুডিয়োর চত্বরে একদিন একা বসে আছি, সবাই লাঞ্চে গেছে, আমি যাই নি। ইদানীং আমি আর লাঞ্চ করি না। সামান্য যা হয় কিছু খাই, সেইসঙ্গে একটু কফি।

অফিস রুমের চারপাশে তাকিয়ে একটি সুন্দর সৌম্য আকৃতি নজরে পড়ল। ক'দিন ধরেই ওঁকে দেখছি, চোখ দুটো কিছুক্ষণ নজর করে দেখার মত। একা একা বসে উনিও কফি পেয়ালায় চুমুক দিচ্ছেন। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি। আবার তার দিকে তাকাই, ছেলেটি কে, স্টুডিয়োতে একটা নতুন কাজ নিয়ে এসেছে নিশ্চয়ই। এবার তাকাতেই চোখে চোখ পড়ল, আমি একটু হাসলাম।

উনি এগিয়ে এসে আমার কাছে বসলেন, বললেন--- ক'দিন ধরেই আপনাকে দেখছি, কাছে আসতে সাহস করি নি, আপনার চার-পাশে যা ভিড়। শুনেছি আপনার শরীর ভালো নয়, এখন কেমন আছেন?

---ও বাবা, তাও শুনে ফেলেছেন! তা যখন শুনেছেন তখন আরো অনেক কিছু সেই সঙ্গে!

---না, বেশী কিছু নয়। আপনাকে ছবিতে দেখেছি, এখানে এই চাক্ষুষ দর্শন। আমার নাম বিশ্বনাথ মজুমদার, আমি স্ক্রিপ্ট রাইটার।

---বা রে, বাংলা দেশ থেকে এতদূর এসেছেন স্ক্রিপট রাইটার হয়ে, আপনি তাহলে নিশ্চয়ই লেখেন-টেখেন---

---আপনিও ত' সেই দুর্ভাগা বাংলা দেশেরই মেয়ে এবং এতদূরে এসেছেন অভিনয় করতে।

আমি হেসে উঠলাম। অনেক দিন এমন প্রাণভরে সহজভাবে হাসি নি। বললাম ---আর আমার শেষ প্রশ্নটির জবাব পাই নি এখনও, লেখেন নাকি?

---হ্যাঁ, লিখি এবং আপনার লেটেস্ট বইটা আমারই লেখা।

---আসমান জমিন, বারে, সেদিন শুনছিলাম বটে স্টোরিটা, বেশ চার্মিং---

বিশ্বনাথ মজুমদার হঠাৎ বললেন---কি

করছেন সন্ধ্যাটা! চলুন না একটা কোনো সিনেমায় যাওয়া যাক, কোথায় যেন দেখলাম, হিচককের কি যেন হচ্ছে।

আমি স্কুলের ছাত্রীর মত আনন্দে নেচে উঠলাম।

আমার হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে ভীষণ সর্দি হয়েছিল, ঘনঘন হাঁচি আসছে। তাই সন্ধ্যার সিনেমায় যেতে কুণ্ঠিত বোধ করছিলাম, বললাম---আগে কখনও এ সব হয় নি---

বিশ্বনাথ মজুমদার বললেন---হয়েছে, বুঝতে পারেন নি। শরীর চিরদিনই এমনই কিছু না কিছু উৎপাত করবে---

আমি বললাম---শরীর অবশ্যই যন্ত্রণা দেয়, সেই অবস্থায় সিনেমায় যাওয়া কি ঠিক হবে!

বিশ্বনাথ মজুমদার বললেন---বরং সিনেমায় বসলেই শরীর অন্যরকম হয়ে যাবে। আর সন্ধ্যা হলেই বারে ঢুকে পড়ার ঝোঁক হত, কিছুতেই আর সামলাতে পারতাম না, তখন এই রাস্তাটাই ধরেছিলাম, ফলও ভালো হয়েছে, এখন আমি অনেকটা শক্ত হয়েছি।

বুঝলাম বিশ্বনাথও এ্যালকহলের দাস হয়েছিল এক সময়, এখন ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

সিনেমায় আমরা পাশাপাশি বসেছিলাম, কথা বেশী আর হয় নি। শুধু বুঝেছিলাম মানুষটা ভালো, জীবনে কিছু আঘাত আছে, ব্যথা আছে।

পরদিন সকালে বিশ্বনাথ মজুমদারকে দেখার জন্য আমার মনটা আকুল হয়ে উঠল, কিন্তু তিনি আসার আগেই এলেন আমাদের মিউজিক ডাইরেক্টর জয়কৃষ্ণ চাটুজ্যে। জয়কৃষ্ণ বাবু কদাচিৎ আমার কাছে আসেন। মিউজিক সম্বন্ধে বিশেষ কোন দরকার না থাকলে ত' নয়ই। ভীষণ দাম্ভিক মানুষ, নিজের অহঙ্কারেই মত্ত। তিনি এসেই বললেন,---হিমানী, বন্ধু হিসাবে দু'চারটে কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। বিশ্বনাথ মজুমদারকে নিয়ে মাতামাতি করার আগে ওর বিষয় দু'চারটে কথা তোমার জানা দরকার। ওরা হল ভবানীপুরের লোক, আমাদের বাসার কাছাকাছি ওদের বাড়ি। আমি ওকে ভালো করেই জানি। ও ছেলেটা এমনই এ্যালকহলিক হয়ে উঠেছিল যে, ওকে বাড়ি থেকে একরকম তাড়িয়ে দিয়েছে। কি একটু-আধটু লিখতে পারে, সেই সুবাদে মিঃ রাজহংস ওকে এখানে আমদানি করেছেন।

আমি বুঝলাম জয়কৃষ্ণ চাটুজ্যে কি বলতে চান। অর্থাৎ তুমিও কানা অপর ব্যক্তিও কানা।

এঁর সম্বন্ধে কোনো কাগজে পড়েছি ইনি কয়েকটি সখের থিয়েটারে নতুন আঙ্গিকে নাটক লিখে খুব নাম করেছেন।

ও যদি কানা হয়, আমিও কানা। এ্যালকহলিক বলে বাড়ির লোক তাড়িয়ে দিয়েছে, আমাকে ত' জগৎ সংসার তাড়িয়ে দিয়েছে। ভালোই হল। এক কানা আর এক কানাকে পথ দেখাবে।

কয়েক মিনিট পরে বিশ্বনাথ এলেন আমাকে অভিবাদন জানালেন। আমি কেমন আছি জিজ্ঞাসা করলেন। বললেন---কিছু নয়, কমন কোলড।

আমি বললাম---এলার্জি। কোলড এলার্জি, হঠাৎ হয়, হঠাৎ সেরে যায়।

বিশ্বনাথ হেসে বললেন---পৃথিবীটাই তো এলার্জি। এখানকার যা সয় না, সেটাই এলার্জি।

সেদিন শুনলাম, বিশ্বনাথের জীবনেরও সমস্যা অনেক ছিল। অতি শৈশবে পোলিও ধরেছিল, ন'বছর বয়স পর্যন্ত একরকম পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে রেখেছিল। ওদের বাড়ির লোক অবস্থাপন্ন, কয়লার খনি আছে [illegible]নবাদে। গাড়ি-ঘোড়া আছে। অনেক বেড়িয়েছে, অনেক দেখেছে। কিন্তু একরকম অতি

অল্পবয়সেই সুরার আকর্ষণে জড়িয়ে পড়ে।

বিশ্বনাথ বললেন---আমি সে ছেলে নই, যে হোঁচট খেয়েই পড়ে যায়, যে ফুটবল বা ক্রিকেট খেলে না। বার বছর পর্যন্ত আমার কথাই কেউ [illegible]।

এই [illegible] দিনকতক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], তা [illegible] আগে ঘটেছে।

এ [illegible] সব [illegible] একটা সুযোগ পেয়ে [illegible] এসেছে। আজ পাঁচ মাস সে [illegible] স্পর্শ করে নি।

বিশ্বনাথ আমাকে [illegible]---একজন সাধু আমাকে [illegible]। জানি না আপনি এ সব বিশ্বাস করবেন কি না। এই সাধুর সঙ্গে আমার ট্রেনে আলাপ। বাঙালী সাধু। পরণে গেরুয়া নেই, গলায় নেই রুদ্রাক্ষ। কিন্তু আশ্চর্য দুটি চোখ। চোখ দুটি দেখলেই বুঝে নেওয়া যায়, তিনি কিছু পেয়েছেন। কথা বলেন কম। শিষ্যদের ভিড় নেই। একরকম মানুষজন এড়িয়ে চলেন।

---এ রকম সাধু আছে নাকি! সাধু মানেই ত' চেলা-চামুণ্ডার দল, আর হল্লোড়।

---না, ইনি, তা নন। খুবই শিক্ষিত। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে মানুষ। নিজের কথা কম বলেন। তিনি একবার আমাকে নানারকম উপদেশ দিয়ে, আর গীতা পড়িয়ে একরকম উদ্ধার দিয়েছেন।

---আপনি! গীতা পড়েন?

---চমকে উঠলেন! গীতার ভেতরেই আমি আমার হারান-জীবন খুঁজে পেয়েছি। জীবনের অর্থ পেয়েছি।

এরপর বিশ্বনাথ আমাকে প্রতিদিন একখানা করে গীতা বুঝিয়েছেন। হাসির কথা নিশ্চয়ই। যে কপোপজীবিনীর ঘরে মদের বোতল আর কাচের গ্লাস ছাড়া কিছুই ছিল না, সেখানে এখন ধূপ জ্বলে সকাল সন্ধ্যায়, গঙ্গাজল মাথায় দিয়ে একটু করে গীতা পড়ি।

এই বিশ্বনাথ কিভাবে যে আমার মানসিক পুনর্গঠন করেছেন, তা কেউ বিশ্বাস করবে না। একদিন কুণাল এসেছিল,---সেদিন টাকা দিতে পারি নি, আমার যা দু-চারখানা গয়না ছিল, চুরি করে পালিয়েছে। আমাকে খুন করবে শাসিয়েছে।

একদিন সন্ধ্যায় আমার ফ্ল্যাটে বসে আমরা জুস পান করছি। বিশ্বনাথ ও আমি। পুরাণো স্মৃতিচারণার দিন আমি বললাম, বিশ্বনাথ, আজ ঠিক সাত মাস হল আমাদের দেখা হয়েছে। এর ভেতর আমি আর মদ খাই নি। ছবিও একটা হয়েছে, খ্যাতি পেয়েছে।

বিশ্বনাথ হেসে বললেন---এর নাম কৃপা। সাধুজী তাই বলেন।

আমি বললাম---এইবার গীতা আওড়াবে নাকি।

—যদি তাই হয়। গীতাই ত' আমাদের একরকম উদ্ধার করেছে। এখন এর পরের সাত মাসের কথা চিন্তা করতে হয়।

আমি চুপ করে থাকি।

তারপর বলি---দেখো ভবিষ্যতের কথা ভাবা ভালো, তবে ভবিষ্যতকে দেখা ত' যায় না। সাদা চোখে বর্তমানটাই কেবল দেখি। রুক্ষ বর্তমান। তবে এখন বিশ্বাস হয় ঈশ্বর হয়ত আছেন—

বিশ্বনাথ বলল---বিশ্বাস! দেখো, মানুষ শুধু রুটি খেয়ে বাঁচে না। রাশিয়ায় পর্যন্ত কথা উঠেছে 'নট বাই বেড এ্যালোন'। অন্ন চাই, প্রাণ চাই, চাই মুক্ত বায়ু। কিন্তু তার ওপর চাই আনন্দ। ঈশ্বর সেই আনন্দ। সেই মহানন্দের প্রতীক। সত্যি তার অনেক হাত আর অনেক মাথা নেই, যা আছে তা এক বিমূর্ত-শক্তি। এই প্রচণ্ড শক্তিই আমাদের চালাচ্ছে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বিশ্বনাথ বলল---শেষ পর্যন্ত সবটা তেমন কঠিন নয়। যা প্রয়োজন তা হল মনের দৃঢ়তা। চাই একটা অবলম্বন---মহাসমুদ্রে যে অবলম্বন আমাদের ভাসিয়ে রাখবে।

বিশ্বনাথের ভালোবাসা যে কত গভীর তা এ কমাসে বুঝেছি। যা ঘটে গেছে তা অতীত তাও যেমন সহজে ঘটেছে, যা আগামী দিনের তাও আমাদের মনে শক্তি এনে দেবে। আমি ম্লান গলায় বললাম—আমার অতীত, আমি এ একটা সামান্য খেলনামাত্র, একথা কিন্তু সবসময় মনে পড়ে বিশ্বনাথ।

---এই খেলনার আজ মুক্তি হয়েছে। উজ্জ্বল দিনের আলোয় রাতের অন্ধকার দূর হয়, কাল যে ছিল সামান্য খেলনা, আজ সে আনন্দ-প্রতিমা। অতীতকে ভুলে যাও। আগামী কালের কথাটাই সবচেয়ে বড়ো।

বিশ্বনাথ আমার হাতটা চেপে ধরলেন।

॥ সমাপ্ত ॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ডাঃ পঞ্চানন ঘোষাল

বায়ু অতি উষ্ণ বা অতি আর্দ্র হওয়া উচিত নয়। ফ্যাক্টরিসমূহে তাপের সমতা রক্ষা করা উচিত। কিন্তু অগ্নি-উদ্দীপক ফ্যাক্টরীতে আর্দ্র বায়ু এবং অন্য হালকা কর্মশালাতে উষ্ণ বায়ুর প্রয়োজন হয়। অপর দিকে শীতকালে উষ্ণ বায়ু এবং গ্রীষ্মকালে আর্দ্র বায়ু প্রয়োজন। কিন্তু সুতাকল এবং বস্ত্র-শিল্পে উষ্ণ বায়ু উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায়। উহার কারণে সুতা বারে বারে ছিঁড়ে কাঁচা মালের ক্ষতি করে। এজন্য আমি অন্য উপায়ে ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছি। আমার নিজস্ব ফিতাকলে আমি ইহার প্রথম পরীক্ষা করি। প্রতিটি নির্মীয়মাণ ফিতার তলাতে গামলা করে জল রাখা হয়। এই জল ক্রমাগত বাষ্পে পরিণত হলে উহা উপরের ফিতার সুতাগুলিকে আর্দ্র রাখে। এর ফলে শীতকালে উষ্ণ বায়ু কর্মশালাতে ঢুকালে দ্রব্যোৎপাদনের কোনও ক্ষতি হয় না। (পূর্বকালে ভারতে এই পন্থায় ঢাকাই মসলিন তৈরী করা হতো)। এই কারণে আজও দেওয়াল-বিহীন (খুঁটির উপর রক্ষিত) আটচালাতে কর্ম-শালা স্থাপন করা হয়। এই প্যাগোডাকৃতি আটচালার একটি ঘরের নমুনা প্রদত্ত হলো।

কর্মশালার ছাদ বেশি নীচু হলে উহা উত্তপ্ত (রৌদ্রদগ্ধ) হয়ে ঐ উত্তাপ নিম্নে উহার তপ্ত রশ্মি বিকিরণ করে। এতে শ্রমিকরা বিনা পরিশ্রমে ঘর্মাক্ত হয়ে গরমে অস্থির হয়ে পড়ে। এইভাবে দেহের তাপ হারিয়ে তারা সহজে কাবু হয়ে পড়ে। কিন্তু কর্মশালার ঐ ছাদ অতি উঁচু হলে তাপ কমে, কিন্তু উহাতে অন্য এক বিপদ ঘটে। নীচের দূষিত বায়ু উপরে উঠে ছাদের নিম্নে থাকে থাকে জমা হয়। সামান্য কয়টি ছোকা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভেন্টিলেটর উহা নির্গত করতে অক্ষম থাকে। (ছাদ নীচু হলে উহা জানালার পথে বহির্গত হতে পারে।) উহা ক্রমানুয়ে ছাদের নিম্নে জমা হওয়ার এক সময়ে হঠাৎ উহা নীচে নেমে আসে। এই দূষিত বায়ু তখন শ্রমিকরা শ্বাসপ্রশ্বাসে ফুসফুসে ঢুকিয়ে নিজেদের স্বাস্থ্যের হানি ঘটায়। কিন্তু উপরোক্ত নক্সাতে প্রদর্শিত পদ্ধতিতে কর্মশালা নির্মিত হলে এই দূষিত বায়ু উপরে উঠে পর পর দুইটি থাকের বিপুল ফাঁক দিয়ে নির্গত হয়ে যায়। ঐ সময় বিশুদ্ধ বায়ু অবিরতভাবে উহাদের ঐ বিপুল ফাঁক দিয়ে ঢুকে নীচে নামতে থাকে। এইভাবে নীচে চারিপাশ হতে এবং সেই সাথে উপরে চারি পাশ হতে সর্বদাই বায়ু আপনা হতে ঐ কর্মশালা পরিশুদ্ধ করে দিতে পারে। এইভাবে উত্তম বায়ু-চলাচলের উত্তম ব্যবস্থা পরিকল্পনা করা যায়। এইরূপে নির্মিত পিরামিডাকার আটচালাতে ঢাকাই মসলিন প্রভৃতি বিখ্যাত দ্রব্যসমূহ পূর্বকালে এদেশে তৈরী হতো। অধুনাকালে এই আর্দ্র ও উষ্ণ বায়ুর পরিমাণ ও উহাদের গতি পরিমাপক বহু প্রকার থারমোমিটার আবিষ্কৃত হয়েছে। উহাদের যথাক্রমে কাটা থারমোমিটার, ওয়েট ও ড্রাই বাল্ব থারমোমিটার, উলেন উইক থারমোমিটার ইত্যাদি বলা হয়। ইহাদের সাহায্যে উত্তাপ এবং আর্দ্রতার পরিমাণ বুঝে ফ্যাক্টরিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলম্বন করা যেতে পারে। এইভাবে কর্মশালাতে শ্রমিকক্ষতি, দৈব-দুর্ঘটনা, রোগ-ভোগ, উৎপাদন-হ্রাস প্রভৃতি সহজে এড়ানো যায়।

এই বায়ুতে আর্দ্রতা কম এবং শুষ্কতা বেশি থাকা উচিত। উহা অবস্থাভেদে উষ্ণ না হয়ে শীতল হলে ভালো। উহাকে নিশ্চল (Still) অবস্থাতে না রেখে সদা সচল করতে হবে। এই বায়ু এক প্রকারের ও এক ভাবের না হয়ে ইহার তাপ স্থানে-স্থানে বিভিন্ন হওয়া উচিত। দুঃখের বিষয় এই যে, এ দেশে মালিক ও ম্যানেজারগণ বাধ্য না হলে, এই সম্বন্ধে মাথা ঘামানো প্রয়োজন মনে করেন না।
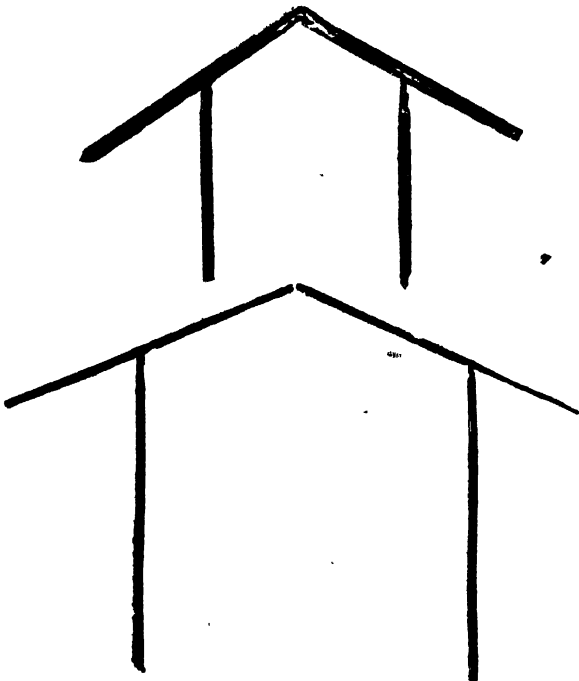
(২) আলোক-ব্যবস্থা :—বায়ু-চলাচলের অভাব শ্রমিকদের দেহ ও মনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং তজ্জনিত স্বল্পকালে উৎকৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন ব্যাহত হয়। কিন্তু উপযুক্ত আলোক-ব্যবস্থার অভাব প্রত্যক্ষরূপে উদ্যোগ-শিল্পের ক্ষতিসাধন করে। দুঃখের বিষয় যে, ফ্যাক্টরিসমূহে এই অত্যাবশ্যক আলোক-ব্যবস্থারই অভাব দেখা যায়। এই আলোক-ব্যবস্থা দ্বারা মূল কর্মকেন্দ্রে পর্যাপ্ত আলোক পৌঁছানো দরকার। বলা বাহুল্য যে, ইহা অতি স্বল্প কিংবা অতি উগ্র হলে শ্রমিকদের সুবিধা অপেক্ষা অসুবিধা ঘটে। এতে উৎকৃষ্ট ফ্যাক্টরিতে দ্রব্যোৎপাদন ব্যাহত হয়। মানুষের চক্ষুর মণি ধীরে ধীরে কম বা বেশি আলোকে অভ্যস্ত হয়। কিন্তু ইহা সীমিত না হলে, চক্ষুতে অযথা চাপ পড়ে। স্বাভাবিক দিবালোক ফ্যাক্টরির জানালার ধারে কর্মরত শ্রমিকদের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু ঐ দিবালোক উহার অভ্যন্তরভাগে কম হয়। এ'ক্ষেত্রে ছাদের স্কাইলাইট হতে আলো এলে অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়। বহু ক্ষেত্রে জানালাতে ধূলা জমতে দেওয়া হয় এবং দেওয়ালও কালো হয়ে উঠে। এই অবস্থাতে ঐ জানালা ও দেওয়ালের মলিন রঙ প্রায় শতকরা ৪০ হতে ৯০ ভাগ আলো (শুষে) নষ্ট করে। এই জন্য দেওয়ালসমূহ কখনও ছাই রঙের হতে দেওয়া উচিত হবে না। আলোক বিচ্ছুরণের জন্য ইহা সবদাই ধবধবে সাদা রঙের হওয়া উচিত। বর্ষাকালে ও বৈকালে পর্যাপ্ত দিবালোক পাওয়া যায় না। উপরন্তু পার্শ্ববর্তী অট্টালিকাসমূহও (ব্যাড প্ল্যানিং) এই দিবালোক অবরুদ্ধ করে।

উপরোক্ত কারণে ফ্যাক্টরিসমূহে কৃত্রিম আলোকের প্রয়োজন হয়। সাধারণত একটি জোর শক্তিসম্পন্ন আলো ছাদের নীচে টাঙানো হয়। কিন্তু উহাতে চতুষ্পার্শ্বে ছায়া পড়ে ও তজ্জনিত অসুবিধা ঘটে। কয়েকটি টিউব বাল্ব লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি রাখলে এই অসুবিধা দূর হয়। আমার মতে, একটি অতি জোর আলোর স্থলে তিনটি কম-জোর আলো কম করে রাখলে ছায়া কম পড়ে। এ'ছাড়া ধারে ধারে আলোক বাধা পেতে পারে। আলোক বিচ্ছুরণের জন্য পিছনে আয়না বা চকচকে খোল রাখা ভালো। কিন্তু উহা একীভূত হয়ে উগ্রভাবে চক্ষুকে পীড়িত করলে চলবে না। আমার মতে কম উজ্জ্বল আলো সমান্তরালে যথাযথ স্থানে রাখলে খুব উত্তম হয়। ফ্যাক্টরির অবস্থা ও ব্যবস্থা অনুযায়ী আলোক-সমাবেশ করা উচিত। আলোকের অসুবিধা শ্রমিকদের কর্মক্লান্তি এবং শিরঃপীড়ার কারণ হয়। স্বল্পালোকে জোর করে উত্তম কাজ করার চেষ্টা করলে এই অবস্থা অবশ্যম্ভাবী।

এক্ষণে এই কৃত্রিম আলোক কিরূপ আলোক হওয়া উচিত তা আলোচনা করা যাক। রৌদ্রালোক, স্কাইলাইট, বৈদ্যুতিক আলোক, গ্যাসের আলোক প্রভৃতি আলোকের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ আছে। রাত্রে কৃত্রিম আলোকে ক্রীত পোশাক প্রায় দিনের আলোতে ভালো লাগে না। রঙ তৈরির কারখানাতে এইরূপ তারতম্য লোকসানের কারণ ঘটায়। অধুনা বহুপ্রকার ডে-লাইট-ল্যাম্পের সৃষ্টি হয়েছে। উহারা যথাসাধ্য আলোক হতে পীত রশ্মি কমিয়ে দেয়। এই প্রকার আলো বহুলাংশে দিবালোকের সমতুল হয়ে উঠে। এই প্রকার আলোর আরও উন্নতি ঘটলে একদিন এই সমস্যার সমাধান হবে। আমার মতে, রাত্রে এই প্রকার কৃত্রিম দিবালোকেরই ব্যবস্থা করা উচিত।

(৩) শব্দ রোধ :—ফ্যাক্টরিসমূহ হতে পুরোপুরি শব্দ নিরোধ সম্ভব নয়। মেসিন থামালে এই বিরক্তিকর শব্দও বন্ধ হয়। কিন্তু উহা থামলে কারখানাও বন্ধ হয়। এই শব্দাপেক্ষা তজ্জনিত স্পন্দন (ভাইব্রেসন) আরও খারাপ। এই শব্দ দ্বারা ইঁদুর প্রভৃতি জীবের ক্ষতি হয় নি। কিন্তু এই শব্দ ও স্পন্দন একত্রে উহাদের নিহত করেছে। এ'জন্য মেসিন এমন মজবুত করে শক্ত ভূমিতে স্থাপন করতে হবে যাতে ঐ মেসিনের কোনও অংশ এবং তৎসহ শ্রমিকদের দাঁড়াবার প্ল্যাটফর্ম একটুও না কাঁপে। তবে মেসিনের নির্মাণ-কৌশল দ্বারা উহা হতে নির্গত শব্দ যথেষ্ট রূপে কমানো যায়। অনাবিল শব্দে মানুষ শীঘ্রই অভ্যস্ত হয়ে উঠে। আমি এক ভদ্রলোককে একদিন জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—'আচ্ছা! আপনার এই রেল লাইনের ধারের বাড়িতে রেলের শব্দে রাত্রে ঘুম হয়?'

এই ভদ্রলোক একটু হেসে উত্তরে আমাকে বলেছিলেন,—'প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হতো। কিন্তু এখন রেলের শব্দ না শুনলে ঘুম হয় না।'

বলা বাহুল্য, অনাবিল ও অভ্যস্ত শব্দ অসুবিধার কারণ হয় না। কিন্তু ছাড়া ছাড়া (ইররেগুলার ও ইনটারাপ্টেড্) অনভ্যস্ত শব্দ পীড়াদায়ক হয়। ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরে বাহির হতে কোনও শব্দ এলে উহা বিরক্তিকর হয়। কিন্তু ফ্যাক্টরির অভ্যন্তরের (অভ্যস্ত) শব্দ ক্ষতিকর হয় না। তত্রাচ এই শব্দ যথা-সম্ভব কমানো উচিত। মোটরচালকগণ জানেন যে, শ্রমিকরা গাড়ির হর্নে সরে যায় না। এর কারণ, বাহিরে এসেও যন্ত্রের ঘরঘর ধ্বনি তাদের কানে লেগে থাকে। এই জন্য বহুক্ষণ বাহিরের কোনও শব্দ তারা ঠিকভাবে শুনে না। বহু শ্রমিক ফ্যাক্টরি-কক্ষে শব্দের মধ্যে পরস্পরের সাথে উচ্চৈঃস্বরে বাক্যালাপ করে। এর ফলে বাহিরে এসেও ঐ ভাবে উচ্চনাদে তারা কথা বলেছে। এই জন্য তারা অতি শীঘ্র ফেটিগ্ দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই সম্বন্ধে শ্রমিকদের সাবধান হওয়া উচিত। উত্তাল শব্দের মধ্যে নিম্নস্বরে কথা কইলে বরং তা ভালো শুনা যায়। এ'জন্য শব্দবহুল ফ্যাক্টরিতে প্রয়োজন হলে নিম্নস্বরে কিংবা ইশারাতে কথা বলা ভালো।

দৈব-দুর্ঘটনা

এই দুর্ঘটনাকে ইংরাজিতে অ্যাকসিডেণ্ট বলা হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য যে, অ্যাকসিডেণ্টের কারণে শ্রমিকদের মত মালিকরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই দুর্ঘটনার জন্যে মালিকদের ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ দিতে হয়। শ্রমিকরা চিরজীবনের মত ইহাতে বিকলাঙ্গ হয়ে থাকে। তারা এতে অক্ষম হলে তাদের রুজি-রোজগার নষ্ট হয়। এর ফলে অপরের গলগ্রহ হয়ে এরা মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করে। মালিকদেরও এজন্য বহু দ্রব্য ও যন্ত্র ধ্বংস হয়ে থাকে এবং তজ্জনিত তাদের উৎপাদন হ্রাস হয়ে থাকে। উপরন্তু নূতন শ্রমিক নিয়োগ ও তাদের শিক্ষা-দীক্ষা বাবদ তাঁদের বহু ক্ষতি হয়। উদ্যোগ-শিল্পে এই দৈব-দুর্ঘটনা নিবারণের প্রয়োজন সর্বাধিক। বর্তমান প্রবন্ধে দৈব-দুর্ঘটনার মূল কারণসমূহ এবং উহার সংখ্যা কমানোর উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করবো। তৎসহ কতো প্রকার দৈব-দুর্ঘটনা উদ্যোগ-শিল্প-ক্ষেত্রে দেখা যায় তাও বলবো। সাধারণত বহু প্রকারের দৈব-দুর্ঘটনা দেখা যায়, যথা—(১) যান্ত্রিক, (২) বৈদ্যুতিক, (৩) দ্রব্যগত, (৪) কায়িক ইত্যাদি। মালিকদের অবহেলা এবং শ্রমিকদের অসাবধানতা ও নিবারণ-যোগ্য বহু দৈব-দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ।

(১) যান্ত্রিক দুর্ঘটনা :—শ্রমিকদের অসাবধানতাবশত তাদের দেহাংশ যন্ত্রে প্রবিষ্ট হলে দৈব-দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। বহু ক্ষেত্রে যন্ত্রের দোষের জন্য বিনা দোষে শ্রমিকদের আহত হতে হয়। দৈব-দুর্ঘটনার কারণে যন্ত্র বিকল হলে কিংবা উহা বিনষ্ট হলে মালিকের আর্থিক ক্ষতি হয়। কিন্তু সেই সাথে শ্রমিকের জীবনহানি ও অঙ্গহানিরও সম্ভাবনা আছে। প্রথমোক্ত দৈব-দুর্ঘটনা-জনিত ক্ষতি অর্থের দ্বারা পূরণ করা যায়। কিন্তু শ্রমিকদের দৈহিক ক্ষতি অর্থ দ্বারা পূরণ করা যায় না। (আর্থিক ক্ষতি পূরণ এখানে নগণ্য।) বলা বাহুল্য যে,

জীবন ও হাত আর ফিরে পাওয়া সম্ভব হবে আর্থিক ক্ষতিপূরণের কোনও প্রশ্ন থাকতো না। বহু ক্ষেত্রে মেসিন খারাপ হয়েছে বা তা খারাপ হতে চলেছে বুঝেও ফোরম্যানরা তা মেরামত করার প্রয়োজন মনে করেন নি। শ্রমিকদের এতে কাজ করতে প্রায়ই তাঁরা মানা করেন নি। এমন কি এই সম্পর্কে শ্রমিকদের তাঁরা সাবধান পর্যন্ত করেন নি। এইসব বিপদসঙ্কুল যন্ত্র অভিজ্ঞ শ্রমিকদের বিনা বিপদে চালাতে দেখে তাঁরা ধরে নেন যে, নবাগতরাও উহা অনুরূপভাবে চালাতে পারবে। এর ফলে নবাগত তরুণ শ্রমিকরা ঐ কষ্টসাধ্য যন্ত্রগুলি চালাতে গিয়ে প্রায় দৈব-দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন। প্রায়শ ঐ সকল যান্ত্রিক গোলযোগ এই নবাগত তরুণ শ্রমিকদের পূর্বাহ্নে জানানো হয় নি। বহু নবাগত যুবককে সম্ভাব্য যান্ত্রিক বিপদ সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়াও হয় না। এইজন্য প্রয়োজনীয় সাবধানতা তারা অবলম্বন করেন নি। এইবার এই যান্ত্রিক দৈব-দুর্ঘটনা নিবারণের বিভিন্ন উপায় সম্বন্ধে বিবৃত করা যাক।

ধাবালো ফলাযুক্ত গিলটিন যন্ত্রসমূহে এমন লৌহ-ফ্রেম যুক্ত থাকা উচিত—যাতে ঐ ক্ষুরধার ফলক পতনের সাথে কর্মরত শ্রমিকের দেহ উহা দূরে সরিয়ে দিতে পারে। কিংবা ঐ সকল যন্ত্র এমন লম্বা লিংকড ঢাকনা দ্বারা আবৃত রাখতে হবে যাতে কর্তনার্থে লৌহ-সিট উহাতে ঢুকানো গেলেও কোনও অঙ্গ তাতে ঢুকবে না। এতদ্ব্যতিরেকে বিপদসঙ্কুল যন্ত্রাদির চতুর্দিক লোহার রেলিং দ্বারা ঘিরে রাখা উচিত।

বহুক্ষেত্রে বহুকাল মেসিনের বিভিন্ন স্ক্রু ও নাটবোল্ট পরীক্ষা করে আঁটা হয় না। অথচ বহুকাল ব্যবহারে উহারা সাধারণ কারণে উপর্যুপরি জাকিং-এর জন্য আলগা হয়ে যায়। বৈজ্ঞানিকরা জানেন যে, উষ্ণতা ধাতুর প্রসারণ এবং শৈত্য উহার সঙ্কোচন ঘটায়। এজন্য শীতকালে ঐ আলগা নাটবোল্ট হঠাৎ পড়ে যায় না। গ্রীষ্মকালে মেটালের প্রসারণে ঐ আলগা নাটবোল্ট খসে পড়ে। তজ্জনিত কলকাগুলি খসে মেসিনে ঢুকে যায়। এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ সমগ্র মেসিন ভেঙে-চুরে দৈব-দুর্ঘটনা ঘটায়। প্রকৃত বিষয় না বুঝে একত্রে এতোগুলি মেসিন ভাঙার কারণস্বরূপ কর্তৃপক্ষ উহাকে স্যাবোটেজ ভাবেন। কিন্তু দেখা যায় যে উপরোক্ত কারণে গ্রীষ্ম শুরু হওয়ার সাথে সাথে একত্রে বহু মেসিন ঐ ভাবে ভেঙে পড়ে।]

সহজ যন্ত্রসমূহে নবাগত যুবক শ্রমিকদের এবং জটিল যন্ত্রসমূহে পুরাতন অভিজ্ঞ শ্রমিকদের নিয়োগ করা ভালো। যুবকরা প্রায় অহেতুক সাহসিকতা (Bravado) দেখাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে তাদের মধ্যে বেপরোয়া ভাব থাকে। কিন্তু বয়স ও অভিজ্ঞতার সাথে এইসব ত্রুটি তারা শুধরে নেয়। এজন্য বিপজ্জনক যন্ত্রাদিতে মাত্র অভিজ্ঞ শ্রমিকদেরই নিয়োগ করা উচিত। এইভাবে বিভিন্ন যন্ত্রের জন্য উপযুক্ত শ্রমিক নির্বাচন দ্বারা দৈব-দুর্ঘটনা নিবারণ করা যায়।

[কয়টি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে স্বল্পদৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন মজদুরকে যন্ত্রে তৈল দেওয়ার কাজে নিযুক্ত করা হয়। ঐ ব্যক্তি চোখে ঝাপসা দেখাতে তৈল ক্যান যন্ত্রের ফ্রেমে না রেখে যন্ত্রের মধ্যে ফেলেছে। এর ফলে সমুদয় যন্ত্রটি ভেঙে-চুরে গেছে। কিন্তু মালিকরা একে স্যাবোটেজ বলে ধরে নেন।]

যান্ত্রিক গোলযোগের সামান্যমাত্র সম্ভাবনা থাকলে উহা মেরামত না করে কোনও শ্রমিককে ব্যবহার করতে দেওয়া উচিত হবে না। এজন্য দ্রব্যোৎপাদন ব্যাহত হলে তজ্জনিত ক্ষতি স্বীকার করে নেওয়া উচিত। নবাগত শ্রমিকদের যন্ত্রের সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে হবে। খুব বেশি পাকাপোক্ত না হলে কোনও শ্রমিককে এককভাবে বিপজ্জনক যন্ত্র চালাতে দেওয়া অন্যায়। তাদের সাথে এক অভিজ্ঞ শ্রমিককে মোতায়েন রাখা ভালো। এই অভিজ্ঞ শ্রমিককে নবাগত শ্রমিকের বিপদ কোথায় তা সবজমিন বুঝিয়ে দিতে হবে। এইরূপ শিক্ষাকে বিপদ নিবারণ শিক্ষা বলা যেতে পারে। যন্ত্র-পরিচালনা শিক্ষা এবং বিপদ নিবারণ শিক্ষার মধ্যে প্রভেদ আছে। কিন্তু এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় দরদের অভাবে মালিকগণ একটিমাত্রও অবহিত হতে চান না।

বহু ক্ষেত্রে যন্ত্রবিদগণের শ্রমিক-দরদী মন না থাকাতে যন্ত্র নির্মাণকালে তাঁরা উহার পরিচালকদের বিপদাপদ সম্বন্ধে চিন্তা করেন না। তাঁদের মতে যন্ত্রের দ্বারা সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে চিন্তা করলে অধিক উৎপাদনশীল যন্ত্র নির্মাণ করা সম্ভব নয়। উহাতে যন্ত্রের উৎপাদন ক্ষমতার হ্রাস ঘটবে। আমি মনে করি যে, এই উভয় বিষয় স্মরণ রেখে যন্ত্রবিদ ইঞ্জিনীয়ারদের যন্ত্র নির্মাণ করা উচিত হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনমত তাঁরা দেহ-বিজ্ঞানী এবং মনোবিজ্ঞানী পণ্ডিতদের সাহায্য নিতে পারেন। যন্ত্রের সামান্য একটু লিভার একটু এদিক-ওদিক করে স্থাপন করলে বহু দৈব-দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব। যাঁরা যন্ত্রকে অ্যাক্সিডেণ্ট প্রুফ করে তৈরী করেন তাঁরা জাতির নমস্য ব্যক্তি। এজন্য বহু প্রকার দুর্ঘটনা প্রতিরোধক বা অ্যাক্সিডেণ্ট গার্ড তৈরী করা যেতে পারে।

বহু ক্ষেত্রে বলা হয় যে, দৈবপ্রতিটি ক্ষেত্রে মানুষের দোষে হয় নি। মতে বহু দৈব-দুর্ঘটনা আশাতীতভাবে (কারণে) ঘটে থাকে। এইরূপ দৈব যথাযথ সাবধানতা সত্ত্বেও ঘটে। এই উহা নিবারণ করা মানুষের সাধ্যাতীত।

আমার মতে আমাদের সীমিত (lim বিদ্যাবুদ্ধির জন্যে আমরা এইরূপ আমাদের অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সাথে উ ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। এজন্য প্রতিটি দুর্ঘটনার জন্য (যন্ত্রগত ও উহার ত্রুটি কারণ যথাযথভাবে তদন্ত করা উচিত। তদন্ত শুধুমাত্র এইসব যন্ত্র বা দ্রব্য করলে চলবে না। এই তদন্তে ঐ সকল উপকরণ (যে যন্ত্র দ্বারা উহা সম্বন্ধেও তদন্ত করতে হবে।

(২) বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনা :—বৈদ্যুতিক স্থাতে ও ভুল-ভ্রান্তির জন্যে উদ্যোগ-শি বহু দৈব-দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। বৈদ্যুতিক স্পষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা এদেশে বিরল বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও উহার তার স্থাপন ও ব্যবহারে একটু সাবধানতা গ্রহণ করলে নিবারণ করা যায়। প্রায়ই শুনা যায় বৈদ্যুতিক তার উহার স্তম্ভ বিচ্যুত হয়ে মাটি পড়াতে এই দৈব-দুর্ঘটনা ঘটেছে। বহু ব্যবহারে পদার্থমাত্রই কমজোর হয়ে যা কিন্তু উহা কতটা কমজোর হলো তা মধ্যে পরীক্ষা করা হয় না। উপরন্তু শ্রমিক প্রায়ই রবারের জুতা, দস্তানা এবং রবা আবৃত হ্যাণ্ডেলযুক্ত প্লাস ব্যবহার করেন না অধিক ক্ষেত্রে বিদ্যুতের ধ্বংসকারী ক্ষমতা সম্বন্ধে এবং উহার আধারভূত যন্ত্রের কার্যকার সম্বন্ধে—সম্যক জ্ঞানের অভাবে মানু তার মহা কল্যাণকর এই বিদ্যুৎশক্তি দ্বা নিহত হয়েছে।

(৩) দ্রব্যাগত দুর্ঘটনা :—কোনও ভারী দ্রব্য মস্তকে পড়লে শ্রমিকদের আহত বা নিহত হতে হয়। ক্রেনের তার ছিঁড়ে প্রায় এইরূপ অঘটন ঘটেছে। এর কারণ, ঐ তার যথাযথ ভাবে প্রতিদিন পরীক্ষা করা হয় না। বহু ক্ষেত্রে মেসিন হতে দ্রব্য বা পদার্থ (তরল) ছিটকে পড়ে শ্রমিকদের আহত করে। ত্রুটিপূর্ণ মেসিন চালানোর জন্যে যত্রতত্র ইহা ঘটে থাকে। উপর হতে পড়া ইঁট, পাথর ও মাল দ্বারাও বহু ব্যক্তি আহত হয়েছে। এইরূপ বিপদের সম্ভাব্যস্থান ঘিরে রাখলে অসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা এইরূপ বিপদ এড়াতে পারে। মই ও ভারাতে উঠবার কালে উহাদের ক্ষমতা ও অবস্থা সম্বন্ধে প্রায়ই বিবেচনা করা হয় না। ভাগ্যবিশ্বাসী ভারতীয় শ্রমিকরা সর্ববিষয়ে তাদের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে থাকে।

[নিরাপত্তা সপ্তাহ বা সেফটি উইকের প্রবর্তন করে প্রায়ই শ্রমিকদের তাদের দৈব-দুর্ঘটনার সম্ভাব্য বিপদ সম্বন্ধে সাবধান করে দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ সকল বিপদ নিবারণের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তারা শিক্ষা পায় না। কেবলমাত্র 'বিপদ—বিপদ' বলে ভয় দেখালে ফল আরও খারাপ হয়। এতে শ্রমিকরা অযথা ভীত হয়ে মনোবল হারায় এবং এতদ্বারা দৈব-দুর্ঘটনার কারণ ঘটায়। এইভাবে কাজ করলে শ্রমিকরা বিপদে পড়বে না—এইটুকু মাত্র তাদের বুঝিয়ে বলা দরকার। কিন্তু বিভিন্ন যন্ত্রের বিপদ বিভিন্ন হওয়ায় শ্রমিকদের বিভিন্ন দলকে পৃথক পৃথক ভাবে, শিক্ষা দেওয়া দরকার। এই জন্যে এদের এক এক দলের জন্য পৃথক পৃথক ক্লাশে পৃথক পৃথক শিক্ষা দেওয়া দরকার। কিন্তু আমি দুঃখের সাথে লক্ষ্য করেছি যে, এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের প্রোপাগাণ্ডা করার ঝোঁক অধিক। বাস্তবক্ষেত্রে শ্রমিকদের এতে কোনও উপকার হয় না।]

(৪) কায়িক দুর্ঘটনা :—শ্রমিকদের দৈহিক ও মানসিক কারণে দৈব-দুর্ঘটনা ঘটলে উহাকে শ্রমিক-বিজ্ঞানে কায়িক দৈব-দুর্ঘটনা বলা হয়ে থাকে। আমরা গৃহ-নির্মাণরত বহু মিস্ত্রিকে উঁচু ভারা হতে পড়ে মৃত্যুবরণ করতে দেখেছি। বহুক্ষেত্রে বৃষ্টির জন্যে পিচ্ছল বা মসৃণ হওয়াতে ইহা ঘটে থাকে। অতএব নিশ্চয়ই ইহা নিবারণ-যোগ্য—বহুক্ষেত্রে ক্রেনের দড়ি ছিঁড়ে পড়াতে বা বংশ বা লোহদণ্ড ভাঙাতে ভারী দ্রব্য দ্বারা পিষ্ট হয়ে এরা আহত হয়েছে। মাল-মশলা নিকৃষ্ট হওয়াতে বহু শ্রমিক ভেঙে-পড়া পাঁচিল বা ছাদ-চাপা পড়ে আহত হয়েছে বয়লার ফেটে শ্রমিকদের আহত হওয়া কোনও এক অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। ঐ বয়লার ফাটার কারণ এবং উহার সম্ভাবনা না বোঝার জন্য কেহ না কেহ দায়ী। অসাবধানতা বশত এদের দেহাঙ্গ যন্ত্রে ধৃত হওয়াতে বহু শ্রমিক আহত হয়েছে। আঁটসাঁট হাফপ্যাণ্ট ও গেঞ্জি না পরে ঢলঢলে ধুতি আদি পোশাক পরে কাজ করলে এরূপ প্রায়ই ঘটে। যন্ত্রের দোষের বদলে শ্রমিকের নিজদোষে দৈব-দুর্ঘটনা ঘটলে ইহাকে কায়িক দৈব-দুর্ঘটনা বলা হবে। এইরূপ বহু দৈব-দুর্ঘটনা শ্রমিকদের অমনোযোগিতার জন্যেও ঘটে গিয়েছে। একজন অভিজ্ঞ ও দক্ষ শ্রমিক-বৎসরের পর বৎসর বিনা বিপদে কাজ করেছে তা সত্ত্বেও সে একদিন হঠাৎ এক নিদারুণ দৈব-দুর্বিপাকে পড়ে গেল। এই ক্ষেত্রে নিজের উপর অতি বিশ্বাস থাকা এবং দারুণ যান্ত্রিক গোলযোগ অগ্রাহ্য করার জন্যও একপ ঘটে থাকে। এ ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, তার অমনোযোগিতা ও বেপরোয়া ভাবই এর একমাত্র কারণ। কিন্তু একজন মনোযোগী ও সাবধানী প্রবীণ শ্রমিকের মধ্যে এই অসাবধানতা ও অমনোযোগিতা কেন এল? এইরূপ অকস্মাৎ দৈব-দুর্ঘটনার পর ইহা আমাদের তদন্ত করে বার করা উচিত। শ্রমিকদের এই কায়িক দৈব-দুর্ঘটনার সম্ভাব্য কারণসমূহ নিয়ে বিবৃত করা হলো।

(ক) দুর্ঘটনা-প্রবণতা :—এই দুর্ঘটনা প্রবণতাকে ইংরাজিতে বলা যায় প্রোনেনেস (Pronness)। এক-একজন শ্রমিকের মধ্যে এই দুর্ঘটনা-প্রবণতা থাকে। এ'জন্য আমরা একই ব্যক্তিকে বারে বারে দুর্ঘটনাতে পড়তে দেখি। দুর্ঘটনা-ভীতি এদের মধ্যে খুব বেশি দেখা গিয়ে থাকে। প্রোপাগাণ্ডামূলক দুর্ঘটনা সম্পর্কিত পোস্টার এদের ভীতি আরও বাড়িয়ে দেয়। (ইহার প্রতিষেধক পূর্বে বলা হয়েছে।) সকল ক্ষেত্রে ইহা যে বিচার-বুদ্ধির (জাজমেণ্ট) অভাবের জন্য হয় তা নয়। বহু ক্ষেত্রে এরা এদের কর্মতালকে যন্ত্রের গতির সাথে মেলাতে পারে নি। কয়েক ক্ষেত্রে এদের রি-অ্যাকশন টাইম অতি-মাত্রাতে দুর্বল থাকে। এজন্য প্রয়োজনমত এরা ত্বরিত গতিতে হাত বা পা সরাতে পারে নি। এই সকল দুর্ঘটনা-প্রবণ ব্যক্তিরা উদ্যোগ-শিল্পে অনুপযুক্ত শ্রমিক। শ্রমিক ভর্তিকালে এদের বাদ দেওয়া উচিত। কিংবা এদের হালকা মেসিন বা অন্য নিরাপদ কার্যে নিযুক্ত করা উচিত।

(শ্রমিকদের প্রতিক্রিয়া-শক্তি বা রি-অ্যাকশন টাইম মাপার জন্যে মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্র আছে। যন্ত্রের বোতামে হাত রেখে এদের উপরের আলো জ্বলা মাত্র তা টিপতে বলা হয়। এই আলো দেখা এবং বোতাম টেপার মধ্যে ব্যয়িত সময়কে ঐ ব্যক্তির রি-অ্যাকশন টাইম বলা হয়। ইহা ঘূর্ণ্যমান ড্রামের কার্ডে বা অন্য যান্ত্রিক ব্যবস্থাতে ধরা পড়ে। এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগকে এক সিগমা বলা হয়। এই সিগমার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমিকদের ব্যক্তিগত রি-অ্যাকশন টাইম পরিমাপ করা যায়।)

এতদ্ব্যতিরেকে বহু শ্রমিক স্নায়ু-দৌর্বল্য লো বা হাই ব্লাড প্রেশারে ভুগে থাকে। এই রোগ কার মধ্যে কখন আসে তা জানা যায় না। এ জন্য মধ্যে মধ্যে শ্রমিকদের দৈহিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা দরকার।

(খ) অসাবধানতা :—বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকরা হাফ প্যাণ্টের বদলে কাপড় পরে কাজ করেছে। এর ফলে এদের কাপড়ের খুঁট যন্ত্রের দাঁতে আটকে গিয়েছে। ক্ষতিকর ধূলা, ধোঁয়া, বায়ু এড়ানোর মত নিবারক পরিচ্ছদ তারা পরিধান করে নি। আশ্চর্যের বিষয় যে, রবার গ্লোভ ও জুতা না পরে এদের পাওয়ার হাউসে কাজ করতে দেওয়া হয়। এদের ব্যবহৃত প্লাস-এর ডাণ্ড রবার দিয়ে মোড়া থাকে নি। বহু ক্ষেত্রে এদের ব্যবহৃত চক্ষুর গগল্‌স (চশমা) ভাঙা থাকাতে অগ্নিশিখার ছুটন্ত কণিকাতে তারা অন্ধ হয়েছে। ছোট ছোট ধাতুর কণিকা হতে চক্ষু রক্ষা করার জন্য জালিযুক্ত দুর্ঘটনা নিবারক চশমা এদের দেওয়া হয় না। উপরন্তু এদেশের শতকরা ৪০ ভাগ শ্রমিকের চক্ষু খারাপ থাকে। প্রোটিনহীন খাদ্য গ্রহণ এবং অতি পরিশ্রম এর জন্য দায়ী। চক্ষুহানি অপেক্ষা মৃত্যুও বোধ হয় মঙ্গলকর হয়ে থাকে। নকল হাত-পা দ্বারা হয়তো কাজ চালানো যায়। কিন্তু নকল চোখ এখনও আবিষ্কৃত হয় নি। শ্রমিকদের প্রদত্ত গ্যাস-মাস্ক, রবার দস্তানা ও লৌহশিরস্ত্রাণ ত্রুটিপূর্ণ হয়ে থাকে।

(গ) কর্ম-ক্লান্তি :—বহু ক্ষেত্রে দৈহিক, মানসিক ও স্নায়বিক কারণে দৈহিক দুর্ঘটনা-সমূহ ঘটে থাকে। এই কর্মক্লান্তি শ্রমিকদের সহসা অন্যমনস্ক করে তোলে। ঘরের সদ্য-ঘটা অশান্তি বহু ক্ষেত্রে হঠাৎ দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ। এই দৈহিক, মানসিক এবং স্নায়বিক কর্মক্লান্তির স্বরূপ সম্বন্ধে পূর্বে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কয়েক ক্ষেত্রে দ্বিধাবিভক্ত মনোযোগ (ডিভাইডেড অ্যাটেনশন) এবং হঠাৎ চিত্তবিক্ষোভ এবং অসুস্থতার কারণেও দৈব-দুর্ঘটনা ঘটে। এজন্য অসুস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা কর্ম করানো অনুচিত হবে। বহু ক্ষেত্রে ফেটিগ কমানোর জন্য ফ্যাক্টরিতে রেডিও যোগে গীতের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ইহা মাত্র হালকা যন্ত্রসঙ্গীত হলে ফল উত্তম হয়। কিন্তু কণ্ঠসঙ্গীতে এর ফল বিপরীত হয়ে থাকে। কর্মকালে এ গানের কথা বোঝার চেষ্টাতে এদের মনোযোগ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে থাকে। এই কারণও বহু দৈব-দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে।

(ঘ) দৃষ্টিহীনতা :—বহু শ্রমিকের দৃষ্টিশক্তি কম থাকে। কয়েক ক্ষেত্রে উহা শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশি হয়। কিন্তু এ বিষয়ে যথোচিত পরীক্ষা না করে তাদের ভর্তি করা হয়। এই দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতার কারণেও বহু দৈব-দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। দৈহিক কো-অর্ডিনেশনের অভাবও এই দৈব-দুর্ঘটনার কারণ হয়েছে। কিন্তু অধিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, দৃষ্টিশক্তির স্বল্পতা উদ্যোগ-শিল্পে দৈব-দুর্ঘটনার প্রধান কারণ।

(ঙ) মনো-প্রদমন :—বহু শ্রমিক (মেয়েদের মধ্যে অধিক) একটু ভীতু স্বভাবের হয়ে থাকে। কিন্তু কার্যকালে তারা জোর করে তাদের ভীতি প্রদমন করে। কিন্তু এই প্রদমিত ভয় তাদের দুর্বল মুহূর্তে কখন যে বার হবে তার স্থিরতা নেই। এই প্রদমিত ভয়ের হঠাৎ বহির্বিকাশের কারণেও বহু দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে। এই ভয় প্রদমিত না করে

মনস্তবিশ্লেষণ ও বাক্‌-প্রয়োগ দ্বারা উহা বিদূরিত করা উচিত।

(চ) অস্থিরতা :—বাটী ফেরার তাগিদে বা অন্য কারণে শ্রমিকদের মনে অস্থিরতা আসে। প্রায় দেখা গিয়েছে যে ডে-সিফ্‌টের (দিবা) শেষে এবং নাইট-সিফ্‌টের প্রথমে অধিক দৈব-দুর্ঘটনা হয়। ডে-সিফ্‌টের কর্মীরা শান্ত মনে প্রথমে কাজ সুরু করে। কিন্তু শেষের দিকে তারা উত্তেজিত হয়ে ওঠে। বহুক্ষণ কর্মবিরতির পর নাইট-সিফ্‌টের কর্মীরা কার্যে এসে প্রথমে উত্তেজিত থাকে। কিন্তু ভোরের শান্ত পরিবেশ তাদের শান্ত করে। বাড়ি ফেরার তাগিদ, কিংবা ক্ষুধার উদ্রেক, স্বাভাবিক বায়ু চলাচল এবং উপযুক্তরূপ আলোক এবং উত্তাপ না পেলে শ্রমিকদের দেহ ও মনকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই সকল পরিবেশ-সম্ভূত প্রতিকূল বা অনুকূল ব্যবস্থার ওপর এই দৈব-দুর্ঘটনা ঘটা বা না ঘটা নির্ভর করে। অসুবিধার মধ্যে কাজ করলে কিংবা কর্মচাতুর্যের অভাব ঘটলে এবং দাঁড়াবার বা বসবার বেকায়দাতেও দৈহিক ভারসাম্য হারিয়ে বহু শ্রমিক দুর্ঘটনাতে পতিত হয়েছে।

(ছ) স্বয়ংক্রিয়তা :—বহু ক্ষেত্রে শ্রমিকদের পেশীর অতি স্বয়ংক্রিয়তা দৈব-দুর্ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে হঠাৎ এদের এক মেসিন হতে অপর মেসিনে কাজ করতে দেওয়া হয়। পূর্ব মেসিনে সৃষ্ট (অভ্যস্ত) কর্ম-রীতি এবং স্বয়ংক্রিয়তা নতুন মেসিনে খাপ খাওয়াতে সময় লাগে। কিন্তু ঐ জন্য যথেষ্ট সময় এদের না দিয়ে এদের উৎপাদন বাড়াতে বলা হয়। পেশীর এই অতি স্বয়ংক্রিয়তার জন্য এরা অতর্কিতে নিজেদের হাত বা পা এগিয়ে বা পিছিয়ে এনেছে। এর ফলে এরা অতর্কিতে দৈব-দুর্ঘটনাতে পতিত হয়েছে।

(জ) পরিবেশ :—চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অনুক্রমিক বোধ-কেন্দ্র আমাদের মস্তিষ্কে আছে। অতি শব্দের মধ্যে থেকে কিংবা অন্ধকারে বহুকাল কাজ করলে মস্তিষ্কের ঐ সকল বোধ-কেন্দ্র নিস্পৃহ হয়ে ওঠে। ইহার দ্বারা শ্রমিকদের মধ্যে মানসিক বধিরতা বা দৃষ্টিহীনতার সৃষ্টি হয়। এর সতর্কীকরণ শব্দ সময়মত এরা শুনতে পায় নি। অন্ধকারে বা স্বল্প আলোকে কাজ করলে ঐ আধ-আঁধার (আলোছায়া) তাদের মধ্যে দৃষ্টিভ্রম আনে। এতে দূরের দ্রব্য কাছে ও কাছের দ্রব্য দূরে এবং উঁচু দ্রব্য নিচে এবং নিচু দ্রব্য উঁচুতে মনে হয়। এই কারণে তারা প্রয়োজনীয় সাবধানতা অবলম্বনে অপারগ হয়েছে। কম-বেশি উত্তাপ ও আলো-ছায়াজনিত বিভিন্ন স্তরের আলো ও বায়ুর বিভিন্নরূপ ঘনত্বের জন্য বায়বীয় মরীচিকা কিংবা রিফ্র্যাকশন সৃষ্টি হওয়াও অসম্ভব নয়। খনিগর্ভে (মাইন) কর্মরত শ্রমিকদের সম্বন্ধে ইহা বিশেষরূপে প্রযোজ্য। বাহিরের সমুজ্জ্বল দিবালোক হতে হঠাৎ খনিগর্ভের অন্ধকারে এসে চক্ষু অভ্যস্ত না করে চলা-ফেরাতেও বহু খনি-শ্রমিক দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে।

(ঝ) মতিভ্রম :—কখনও কখনও মানসিক কারণে শ্রমিকদের মতিভ্রম হয়। এই সময় মরণ যেন তাদের নিজের কাছে ডাকতে থাকে। এ সময় এরা এমন কাজ করে যা স্বাভাবিক মনে তারা করে না। কোনও উঁচু ছাদে উঠে কেহ নিচুতে 'লাফাই-লাফাই' মনে করলে লাফাবার এক দুর্দমনীয় ইচ্ছা তাদের পেয়ে বসে। রাত্রে গভীর জলাশয়ের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকলেও এইরূপ অনুভূতি মনে স্থান পায়। এই সময় কোনও কারণে মনের প্রতিরোধ-শক্তি দুর্বল হলে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এরা বহু অঘটন ঘটিয়ে ফেলে। কিন্তু ইহার মূলে থাকে অন্য কারণে আত্মহত্যার ইচ্ছাপ্রসূত কোনও এক প্রদমিত মনো-জট (কমপ্লেক্স)। মনোবিশ্লেষণ দ্বারা শ্রমিকদের এইসব মনোজটের মূল কারণ খুঁজে বার করে বাক প্রয়োগ দ্বারা তাদের নিরাময় করা যেতে পারে।

বিঃ দ্রঃ—মানসিক বধিরতা এবং দৃষ্টি-হীনতা প্রাপ্ত কয়জন শ্রমিককে পরীক্ষার জন্য শব্দবহুল আধ-অন্ধকার ফ্যাক্টরি হতে সরিয়ে এনে আমার গ্রামের নিজস্ব কৃষিক্ষেত্রে আমি পাঠাই। এই সাথে তাদের হরমোন ইনজেকশন এবং প্রোটিন খাদ্য প্রদান করা হয়। ফলে, মস্তিষ্কস্থ তাদের শ্রবণ ও দৃষ্টি সম্পর্কিত বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অনুক্রমিক বোধ-কেন্দ্রগুলির ওপর চাপ না পড়াতে ঐগুলি পুনরায় সতেজ হয়ে ওঠে। এইভাবে এরা ধীরে ধীরে ঐ সকল মানসিক রোগ হতে মুক্ত হয়। এই পরীক্ষা হতে বোঝা যায় যে, ঐন্দ্রিক দৃষ্টিহীনতা এবং বধিরতার মত মানসিক বধিরতা ও দৃষ্টিহীনতারও অস্তিত্ব আছে। কিন্তু উহা ঐন্দ্রিয়িক বধিরতা এবং দৃষ্টিহীনতা হলে তাহা দৈহিক চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় করার প্রয়োজন হয়। এজন্য ছয় বৎসর অন্তর এদের ঐন্দ্রিক দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি সম্বন্ধেও নিশ্চিত হবার জন্য ডাক্তারী পরীক্ষা করানো উচিত।

(পরিসংখ্যা দ্বারা দেখা গিয়েছে যে, তাপমাত্রা এবং ফেটিগ বাড়ার সাথে দৈব-দুর্ঘটনার সংখ্যাও বেড়ে যায়। জোর করে সামান্য উৎপাদন বৃদ্ধি বহুসংখ্যক দৈব-দুর্ঘটনার কারণ হয়। প্রখর গ্রীষ্মের দুপুর বেলাতে দৈব-দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে যায়। এইসব অসুবিধাতে এদের অভ্যস্ত হওয়ার পর অবশ্য ঐরূপ দুর্ঘটনা কম ঘটে।)

মানুষ প্রাকৃতিক শক্তিকে আপন তাঁবে এনে উদ্যোগ-শিল্পে উহাকে আজ নিয়োগ করেছে। তাই সে নিজ সৃষ্ট এই নতুন পরি-বেশে নিজেকে খাপ খাওয়াতে বাধ্য। অন্যথায় সে নিজের সৃষ্টি দ্বারা নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এজন্য আমাদের প্রধান কর্তব্য এই নতুন পরিবেশের উপযুক্ত করে শ্রমিকদের তৈরি করা। এ জন্য যথেষ্ট গবেষণা করার প্রয়োজন আছে। 'এইটুকুর জন্যে বেঁচে গেছে' কিংবা 'যাক, স্বল্প আঘাতে রক্ষা পেল', ইত্যাদি বাক্যালাপ সাধারণ মানুষদের মধ্যে প্রায় শোনা যায়। কিন্তু এইরূপ অহেতুক আত্মশ্লাঘার দ্বারা মূল সমস্যার সমাধান হয় না। ইহার নিবারণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার। কিন্তু উহা সুষ্ঠুভাবে করতে হলে ফ্যাক্টরিসমূহের দৈব-দুর্ঘটনার উগ্রতা (ফ্রিকোয়েন্সি) প্রথমে বার করতে হবে। ইহা ব্যতিরেকে এ সম্পর্কে কোনও বৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্ভব নয়। ফ্যাক্টরিতে দৈব-দুর্ঘটনার উগ্রতা অধিক হলে বুঝতে হবে যে, ঐ স্থানের ব্যবস্থাপনাতে যথেষ্ট গোলযোগ আছে। [ক্রমশঃ।

চুট্‌কি

লিভার! লিভার! লিভার
তবু সে পারে না বইতে ভার
গেলাস গেলাস মদের।

না পারুক তাতে কোন ক্ষতি নেই,
আমরা সাঁতারু ছাপমারা সেই,
"সুরা-সুধাময় হ্রদ"-এর।

আজ টিকে আছ, কাল থাকবে না,
তাই তো বলছি এখানে নিও না
ভূমিকা বশংবদের।

-কমরেড
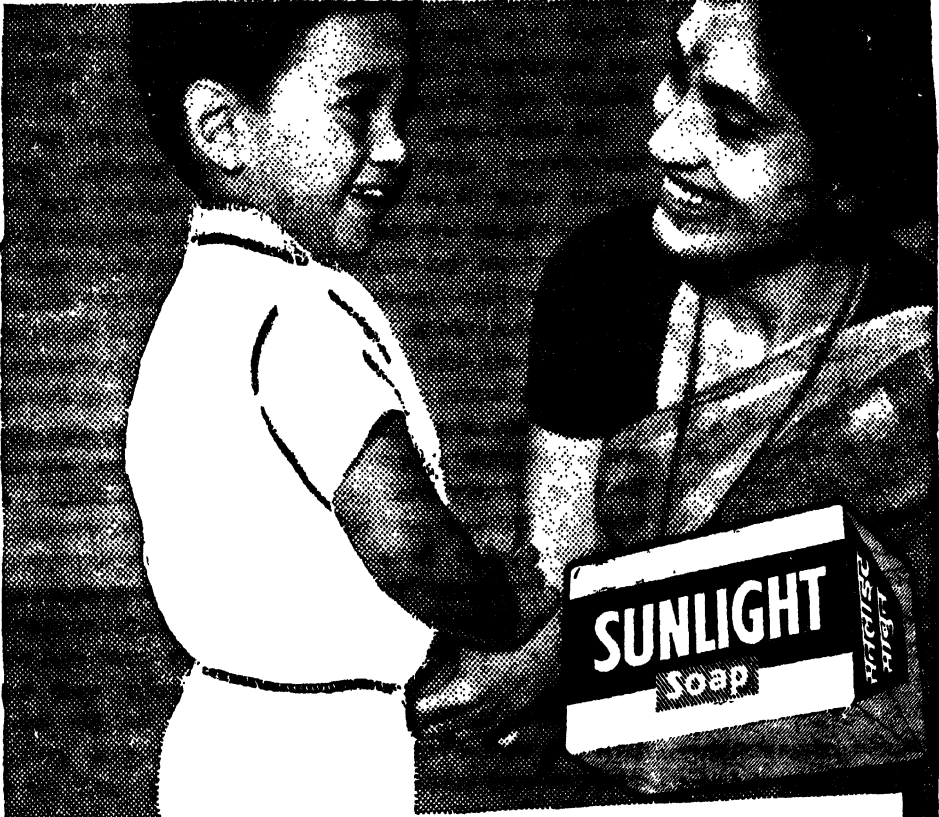
(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

॥ এগারো ॥

মলিনা যেন কাছেপিঠে প্রতীক্ষাই করছিল কোথাও, জীপ এসে বারান্দার সামনে দাঁড়াতে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে উৎসুকভাবে প্রশ্ন করল—"কি হোল?"

"কিসের কি হোল?"—বিস্মিত-ভাবে প্রতিপ্রশ্ন করল নিশানাথ জীপ থেকে নামতে নামতে।

"নাঃ, আমি মনে করেছিলাম- - -" অপ্রতিভ হয়ে গিয়ে থেমে গেল মলিনা। নিশানাথ বলল—"বলোই না কি মনে করেছিলে। ওর সামনে লজ্জার কিছু নেই।"

লোকেশ নেমে এসেছে, তার মুখের ওপর অবাধ্যভাবেই দৃষ্টিটা একবার গিয়ে পড়ল মলিনার। একটু যেন রেঙেও উঠল, বলল—"আমি ভেবেছিলাম—ওঁদের বুঝি আনতে গিয়েছিলেন, যাঁদের আসবার কথা আছে।"

এবার নিশানাথের মুখটা একটু রাঙা হ'য়ে উঠল। কথা কইতে গিয়ে প্রথমটা একটু বেধেও গেল। সামলে নিয়ে বলল—"তাঁদের তো সন্ধ্যেয় আসবার কথা। উয়ে- - -বাড়ির সবাই তাই মনে করেছেন বুঝি যে আনতে গেছি?"

"না- - -" একবার চারিদিকে চেয়ে নিয়ে উত্তর করল মলিনা—"শুধু আমিই ভেবেছিলাম বুঝি- - - আচ্ছা যাই।"

ঘুরে যেন পালিয়ে বাঁচল। নীচে বেশি কেউ নেই, যারা বা আছে, বাইরের লোক, কোন প্রশ্ন করল না।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে কিন্তু কার ত্রস্তভাবে এগিয়ে আসবার পায়ের শব্দ কানে এল। উঠেই সামনে পিসিমা দয়াদেবী, বললেন—এসেছিস? গেছলি কোথায় বাবা সাতসকালে? শিকার—তার তো একটা সময়- - -"

"কোথায় গিয়েছিলেন দু'জনে?" হনহন করে এসে ওঁর কথাটা চাপা দিয়েই প্রশ্ন করল বদন, কতকটা শাসনের ভঙ্গীতে ভ্রূ দুটো চেপে। তারপর দয়াদেবীর দিকে চেয়ে বলল—"জলটল কিছু না খেয়েই বেরিয়ে গেলেন মা। ওঁর যেন সে সব খেয়াল কোনকালেই নেই, কিন্তু এঁকে পর্যন্ত টেনে নিয়ে- - -"

"কার কাছে রেখে যাব, কী প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেবে আবার- - -"

আরও কিছু বলবার ইচ্ছা থাকলেও সেটা চাপা পড়ে গেল। ওর কথার পিঠেই দয়াদেবী বললেন—"আমি যাই মা বদু, চারিদিকে কাজ পড়ে রয়েছে। তুই এদের নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দে আগে। আর, একটু নজর রাখবি, আমার অবস্থা তো দেখছিস, নিঃশ্বাস ফেলবার ফুরসৎ নেই।"

কথা বলতে বলতেই ত্রস্তভাবে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। বদন এদিকে কান রেখে চোখ দু'টো আস্তে আস্তে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কি যেন ভাবছিল, দয়াদেবী বেরিয়ে গেলে নিশানাথের দিকে চেয়ে একটু হাসিল, নিশ্চয় তার মন্তব্যটুকুর জন্য—প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেওয়ার কথা। পরে লোকেশের দিকে চেয়ে বলল—"আপনারা আসুন আমার সঙ্গে একটু, এদিকটায় বড় গোলমাল।"

ঘুরে এগিয়েছে, নীচে কনকের গলা শোনা গেল, ব্যস্ত, "বদন কৈ রে? যাকে সবচেয়ে বেশি দরকার তারই দেখা পাওয়া- - -"

বদন তাড়াতাড়ি ঘুরে গিয়ে সিঁড়ির রেলিঙে ঝুঁকে ইসারা করতে থেমে গেল। একটু বিরক্তি দিয়েই প্রশ্ন করল—"এসে গেছেন ওঁরা?"

উঠেও আসছে। কয়েক ধাপ উঠে এদের দেখতে পেয়ে প্রশ্ন করল—"কোথায় গিয়েছিলেন আপনারা দু'জনে?"

বদন বলল—"সে কথা হবে'খন তুই ভাই এক কাজ কর, এঁদের ওদিক-কার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা, আমি তাড়াতাড়ি চা-জলখাবারটা নিয়ে আসি।"

সিঁড়িপথে নেমে গেল।

এখানে ছোটদের ঘরটায় নিয়ে গেল, বসাল। বসতে ব'লে জানাল—বদন। জিনিস ধর।

বেশ ভালো করে সাজানো ছোট-খাট মজলিস আড্ডার জন্য যে বিশেষ করে সাজানো হয়েছে সেটাও টের পাওয়া যায়। দু'জনে দু'টো চেয়ারে বসলে কনক একটা মোড়া টেনে বসতে যাবে, লোকেশ দৃষ্টি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছিল, বলল—"একটা কথা—নেমে গিয়ে ওঁকে একটু বলে দেবেন যে, আমি একটু কড়া চা খাই?"

"এই যাই।"—বলে কনক তাড়াতাড়ি চলে গেলে নিশানাথ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল—"কি রকমটা হোল?"

ফরমাস করাটাই ওর কেমন একটু অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। হঠাৎও। লোকেশ উঠতে উঠতে বলল—"এদিকে আয়।"

ঘরটার তিনদিকে বারান্দা। পেছনের দিকটায় গিয়ে রেলিঙে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল দু'জনে। লোকেশ বলল, "একটু সরিয়ে দিলাম ওকে।"

"উদ্দেশ্য?"—বিস্মিত প্রশ্ন করল নিশানাথ।

বাড়ির উঠানে উৎসবের গুরু আয়োজন। ওদের সামনেই দেয়াল দিয়ে ঘেরা জায়গাটায় ভিয়েনের ব্যবস্থা, চারিদিকেই - - - আনা-রাখা-দেওয়া-ফরমাস; হৈ-চৈটা ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে। বেরিয়ে এসে সেইসবই লক্ষ্য করছিল লোকেশ, নিশানাথের প্রশ্নে ঘুরে উত্তর করল—"উদ্দেশ্য একটা আছেই, যদিও আর উপায় একবারেই নেই। বলছিলাম, কাজটা আমাদের বড় বেশ অন্যায় হয়ে গেল নিশা, অত্যন্ত হেষ্টি (hasty) তো বটেই।"

"খবর ক'রে দেওয়া?"

"হ্যাঁ। এই আয়োজন—কথাও বাদ দেওয়া যায় না। তবে আমি ভাবছিলাম কী ভীষণ আঘাতটা যে লাগবে সবার। মলিনার কথা নিয়েই ভেবে দেখ না, কী আশা, কী উৎকণ্ঠা নিয়ে ছিল দাঁড়িয়ে—সকালে আসবার কোন কথা ছিল না তবুও। এর পর যখন একেবারেই আসবে না? বদনের মনের অবস্থাটা কী হবে? পিসিমার- - -"

"এসে পড়লে যখন সমস্ত জীবন-টাই ব্যর্থ হয়ে যেত ওর?"

"হোতই কি?"

"সকালবেলা যা শুনলি সব ভুলে বসেছিস; না, বিশ্বাসই করিস নি?" উত্তেজিত হয়ে উঠল নিশানাথ, বলল—"সে ছেলে বাপ-মায়ের অস্তিত্ব অস্বীকার ক'রে বিয়ে করতে এল- - -"

হঠাৎ ছেড়ে দিল। মোটা চশমার পেছনে বড় বড় চোখ দু'টো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, বলল—"বেশ তো, অপচয়ের কথা? সবার মনস্তাপের কথা? আমার হাতে এমন উপায় আছে, মনস্তাপ দূরে থাক, এই আনন্দটাই দ্বিগুণ চতুর্গুণ হয়ে উঠতে পারে- - -"

"ভোজবাজিটা কি শুনতে পাই?" —হয়তো আন্দাজ করেই একটা সূক্ষ্ম হাসিও ফুটে উঠেছে মুখে, নিশা-নাথ বলল—"কেন, তুই যদি রাজি হোস। কোনখানেই তো আটকাচ্ছে না।"

কিভাবে বন্ধুর এই হঠাৎ পরি-বর্তনটা মনে সুড়সুড়ি দিয়েছে, এবার হো-হো করেই হেসে উঠল লোকেশ, বলল,—"ক্ষেপে গেছে ছোঁড়া।"

তারপর গম্ভীর হয়ে গিয়েই প্রশ্ন করল—"যে ছেলে বাপমায়ের অস্তিত্ব লুকিয়ে বিয়ে করতে চাইল, আর যে ছেলে বাপ-মাকে পাশে ঠেলে রেখে নিজের বিয়ের পাকাদেখার ভোজ খেল—দুইয়ের মধ্যে তফাৎ কতটুকু?"

"তফাৎ- - -"

আরম্ভ করেছে নিশানাথ, লোকেশ একটু ক্লিষ্টস্বরেই বলল—"থাক্, একটা মেয়ে নিয়ে—যার এখনও চান্স রয়েছে ওদিকে—পারেও তো তার এসে পড়তে- - -"

চোখ দু'টো জ্বলে উঠলো নিশা-নাথের, বলল—"আমি চাপাচুপি দিয়ে যাওয়ারই চেষ্টা করছি লোকেশ, তা সত্ত্বেও যদি এসে পড়ে তো অপদস্থ হবে। কিছু অপচয়, কিছু মনোকষ্টের ওপর দিয়ে কেটে যায় তো যাক, কিন্তু এতবড় সর্বনাশটা আমি কোনমতেই হতে দেব না। তারপর তোর কথা- - -"

মাথা নীচু ক'রে শুনছিল লোকেশ, চোখ তুলে চাইল ওর দিকে। নিশানাথ বলল—"তারপর এই যদি আমার সংকল্প হয়তো তোর কথাই বা কেন ভাবব না? আজই তো বিয়ে হয়ে যাচ্ছে না যে- - -"

মলিনা উঠে হনহন করে এগিয়ে এসে বলল, "কৈ, এরা তো এখানেও নেই।"

সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে সেইভাবে চলে গেল। লোকেশ একটু চেয়ে রইল ওর দিকে, তারপর বলল—"এর কষ্টটা হবে সবার চেয়ে বেশি।"

নিশানাথ যেন আত্মসমর্থনেই বলল, "হ্যাঁ, বদনের কিছু হ'লে।"

॥ বারো ॥

এরা তিনজনেই উঠে এল। বদনের হাতে একটা ট্রে, তাতে খাবারের রেকাবি সাজানো; একটা কনকের হাতে, তাতে রয়েছে চায়ের সরঞ্জাম—টীপট্, পেয়ালা, পিরিচ, চিনি আর দুধের পাত্র। এর সঙ্গে সন্তর্পণে নিয়ে আসার ভঙ্গী মিলে গিয়ে অতিথি-আপ্যায়নে একটা আড়ম্বরের ভাব এসেই গেছে, এরপর আবার মলিনাকে দু' ধাপ নীচে দুটো খালি গ্লাস আর একটা জলভর্তি কাঁচের জগ নিয়ে আসতে দেখে নিশানাথ হেসেই ফেলল, প্রশ্ন করল—"কাদের জন্যে!"

মলিনা আর কনক একটু গুটিয়ে গেলেও বদন বেশ সোজা হোয়েই দু'হাতে ট্রে ধরে ঘরের মাঝখানে টেবিলটার ওপর নামাতে নামাতে বলল, "ন্যাকা সাজবেন না, একটু জল খেতে হবে না?"

"বিশ্বাস করা শক্ত হচ্ছে যে। আমি

তো বরাবরই **পিসিমার কাছে বসে** একটা যা' তা' প্লেট, যা' তা' কাপ টেনে নিয়ে খেয়ে এসেছি কাল পর্যন্ত---"

"পিসিমার আদুরে, আপনি কোলে বসে খেলেও মানিয়ে যেত"—ছোট বড় দু'টো ক'রে খাবারের প্লেট ট্রে থেকে তুলে টেবিলে দুজনের সামনে রাখতে [illegible] টিপ্পনী করল বদন।

তারপর তাড়াতাড়ি ট্রেটা নীচে [illegible] মলিনার হাত থেকে জগটা [illegible] নিতে বলল—"আমায় দে, [illegible] দিদি আছড়ে।"

একটা গেলাস নিয়ে জল ঢালতে [illegible] লোকেশের দিকেই নজর [illegible] যেতে বলল—"বুড়ির মতন [illegible] দেখুন হাত!"

লোকেশের মুখে হঠাৎ কিছু [illegible] না, শুধু অল্প একটু হাসির সঙ্গে একবার দৃষ্টিটা গিয়ে পড়ল মলিনার ওপর। উত্তরটা দিল নিশানাথ, বলল— সব মেয়ে সমান হয় না।"

বলার ভঙ্গিতেই উদ্দেশ্যটা অনেকখানি স্পষ্ট হয়ে উঠল. বাকিটুকু বদনই দিল স্পষ্ট ক'রে। দ্বিতীয় গ্লাসে জল ঢালছিল, থেমে গিয়ে বলল—"তার মানে যার কাঁপে না---সে বড় মন্দ।"

"বাঃ, তা কৈ বললাম? এ যেন তোমার নিতান্তই গা পেতে নেওয়া।"

একটু থেমে বলল---"ভালোমন্দর কথা উঠলে বরং যার কাঁপে না সেই ভালো বলতে হবে। জগটার দাম কম করে ধরলেও পাঁচটা টাকা হবে তো?---লোকেশ কি বলিস?"

"তা বৈকি।"---সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল লোকেশ।

"আপনিও বন্ধুর দিকে হলেন?"—গেলাস দুটো প্লেটের পাশে রেখে মন্তব্য করল বদন।

"জগটার দামের কথাই বললাম আমি।"---আত্মসমর্থনে বলল লোকেশ চতুর একটু হাসির সঙ্গে তারপর [illegible] দিল—তাবলে জগের দামের হিসেবে মানুষ বিচার করা মানব কেন?"

"খোসামোদ।"—নিশানাথ বলল মুখটা একটু ভার ক'রে।

"নিজের মনের মতন না হলেই খোসামোদ।"---মুখটা ভার করেই বদন আবার মন্তব্য করল। অহেতুকভাবে প্লেট গেলাসগুলো আবার ঠিক করে দিয়ে পাশে কনকের দিকে হাতটা বাড়িয়ে বলল---"দে এবার চায়ের ট্রেটা।"

"আমার হাত কাঁপে না।"---কথাটি বলে এমনভাবে ট্রেটা একটু সরিয়ে নিল যে, সবাইকেই হেসে উঠতে হোল একটু। বদনকেও। সে সরে দাঁড়িয়ে বলল---"নে, আর তাহলে। খুব বীরপুরুষ তো।---কৈ, শুরু করুন আপনারা।"

নিঃশব্দেই আহার আর চা প্রস্তুতের কাজ খানিকটা চলল। [illegible], নিতান্ত কাজের অভাবেই
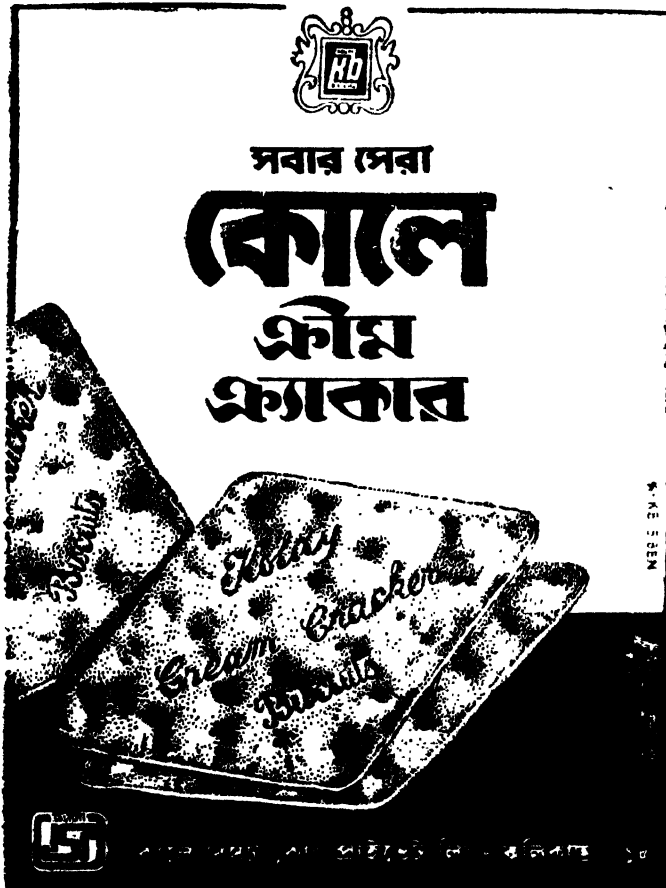
বদন কাপ-ডিশ আর একবার ধুয়ে নিচ্ছিল, মলিনা মুখটা তার কানের কাছে একটু সরিয়ে এনে কি বলতে জবাব দিল—"তুই নিজেই বল না, পারিস না ?"

নিশানাথ মাথা নীচু করে খেতে খেতেই বলল—"তখন বলবে গলা কেঁপে গেছে, কারণ কি বেচারি ?"

খালি প্লেট দুটো ঠেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসল, তারপর মোটা চশমার ভেতর দিয়ে আবার সে দুটোর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলে বলল—"নিশ্চয় পাত্রের অবস্থা দেখে আরও কিছু চাই কি না জিজ্ঞেস করতে বলছেন উনি। নাঃ, সত্যিই আমার খাওয়াটা অসামাজিক হয়ে পড়ে, বর্বর বলাই ঠিক।"

লোকেশ খাচ্ছেই, তার পাত্রের দিকে চেয়ে বলল—"বরঞ্চ তোর খাওয়া বেশ সভ্য। আস্তে আস্তে, আর পাতে নিশ্চয় কিছু ছেড়েও দিবি মনে হচ্ছে।"

"আপনার কোন দিকটা বর্বর নয় ?" চা ঢালতে ঢালতে বলল বদন—"মুখখানা দাড়িতে-গোঁফেতে জঙ্গল করে রেখেছেন। মাথার অবস্থা ঐ—চিরুণী-বুরুশের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই, তাছাড়া কতদিন যে কাঁচি দেখেনি বলা যায় না। আর, সত্যিই তো পাতে কিছু রাখতেই হয় ছেড়ে, এটা না হয় দিদির বাড়ী, মানিয়ে যাচ্ছে —"

"খবরদার, একটিও ছাড়বিনি লোকেশ, ফাঁকা নীতি শিক্ষা।"

—ঘুরে চোখ পাকিয়ে এমনভাবে বলে উঠল যে, আবার সবাই হেসে উঠল। বদন চায়ের কাপটা ওর দিকে এগিয়ে দিয়ে একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়েই বলল—"কী সাংঘাতিক মানুষ! আমি ওঁকে বললাম ? আবার—নীতি শিক্ষা!"

নিজের কথায় হাসেনি শুধু নিশানাথই। একটা চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে স্পষ্ট তর্কের সুরেই বলল—"নীতি শিক্ষাই। তোমার এ-অভ্যেস আছে। এবার না হয় একটু ঘুরিয়ে---"

"এবার! তার মানে এর আগেও দিয়েছি!"

"দিয়েছ বৈকি।"

"কবে ?"—বেশ বিমূঢ় হয়ে পড়েছে বদন।

"কালই তো নীতিশিক্ষা দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছ, আর কখনও শিকার করবে না।"

শরীরটা কৌতূহলে-উদ্বেগে যে খানিকটা কঠিন হয়ে উঠেছিল, একেবারে আবার ঢিলা করে দিল বদন। কণ্ঠস্বরেও তর্কের আর কিছুমাত্র ঝাঁজ না রেখে আস্তে আস্তে প্লেটে চা ঢালতে ঢালতে নিতান্ত অবহেলার স্বরে বলল—"এই কথা! তা করলেন কেন প্রতিজ্ঞা উনি ? আমি বলেছিলাম ? জিজ্ঞেসই করুন না ওঁকে।"

"তুমি না বললেও তোমাদের প্রভাব কাজ করেছে, তিনজনের।"

"প্রভাব!! বুঝলুম না।"

"হ্যাঁ প্রভাব।" —কাপটাকে পিরিচের ওপর চেপে জোরের সঙ্গেই বলল নিশানাথ, ওর তর্কের ঝোঁকটা বেড়েই গেছে। বলল—'দুর্বল পুরুষের ওপর মেয়েদের একটা প্রভাব খুব বেশি রকম কাজ করে, যদি আবার সুন্দর হয় তারা। একটু খুশি করতে পারলে হাতে যেন স্বর্গ পায়----"

এরপর লোকেশের দিকে ঘুরে বলল—"তুই যে প্রতিজ্ঞাটা এক পায়ে দাঁড়িয়ে কান ধরে করিসনি, এই ঢের বাঁচোয়া বলতে হবে।"

ওর ভাবগতিকের সঙ্গে এই চিত্রটা মিশে গিয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করল যে আবার সবাই চাপা গলায় হেসে উঠল। বদন সমস্ত ব্যাপারটাকে আরও লঘু করে দিয়ে বলল—"থাক্, একটা লাভ হোল—সুন্দর বলে একটা সার্টিফিকেট। আজ সন্ধ্যেয় ওরা যদি মানতে না চায়, খুঁৎ ধরে, আপনি এই প্রমাণটা দিয়ে একটু ওকালতি করবেন!—জ্বালা বাবা। এমন মানুষের পাল্লায়ও পড়ে!---নিন, চা ঠাণ্ডা হয়ে যায় ওদিকে।"

লোকেশ বেশ খানিকটা অপ্রতিভ পড়ে গিয়েছিল। তর্কটায় যে একম উত্তাপ জমে উঠেছিল। কিছুক্ষণ, অন্তত যেটুকু আছে তা এ [illegible] দেখে আশ্বস্ত হল। হালকা মনে ঠাট্টাই করে উঠল—"হতেই দিন না ঠাণ্ডা, এর ওপর আবার গরম চা!"

আর একচোট হেসে উঠল সবাই।

[ক্রমশ।

চুনী মুক্তার ফুল

চিত্রিতা দেবী

কি চমৎকার দেখতে।—ঠিক যেন একটা সত্যিকারের ফুল। না না ঠিক সত্যিকারের ফুলের মতো অবশ্য নয়,—ওটা শুধু কথার ছলেই বলা। সত্যিকারের ফুল নয়,—তবে তার চেয়েও সুন্দর; পাপড়িগুলি চুনী-মুক্তার 'সেট' করা, যেমন পেলব, তেমনি কোমল। অনীতা কতবার ফুল দুটিকে হাতের উপরে রেখে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে থাকত। যতবারই কান থেকে ফুল দুটো খুলত, ততবারই তাদের দিকে একটা সস্নেহ দৃষ্টিপাত না করে পারত না। আর কানে দিলে মুখের শোভা কি চমৎকারই না খুলত। সত্যিই ছোটর উপরে এমন সুন্দর জিনিস সহজে চোখে পড়ে না।

হঠাৎ কেমন করে অনীতার নজরে পড়ে গিয়েছিল কে জানে। কপালে ছিল বলেই তো। এই দুটি বছর সমানে কানে দিয়েছে। যেই দেখেছে, সেই মুগ্ধচোখে জিনিষটার বিষয়ে অনাবশ্যক প্রশ্ন করেছে।

সরলাও তো তাই করেছিল, —তবে কেন শুধু সরলাকেই সন্দেহ করছে অনীতা? তপনও সেই কথাই বলছিল,—"সবাই তোমার কানের এই ফুল দুটির তারিফ করে, দেখলেই হাজার প্রশ্ন করতে থাকে, কি সুন্দর ফুল,—কোথায় কিনেছ, আরো কত কী! আর সরলা বেচারা লোকের ঝি বলেই কি তার একটা প্রশ্ন করারও অধিকার নেই,—অধিকার নেই সুন্দরকে দেখে মুগ্ধ হবার?"

—রাখ তোমার কাব্যি। আর সস্তা [illegible]।"—অনীতা সত্যি সত্যি চটে উঠল স্বামীর উপরে, "ওসব কথায় আজকাল অ[illegible] না নেই। নেহাৎই পুরোণো বক্তৃতা! ঐ ধরণের কথা শুনে শুনে কান পচে গেছে।—[illegible] হবার কেন সুন্দর জিনিষটি হরণ করবার [illegible] গ্রহণ করেছে সরলা।"

—ঐ দ্যাখো, তুমি আবার রেগে উঠলে।—আমি বলছিলাম"—"থাক্ থাক্ তোমার আর বলে কাজ নেই। শুধু [illegible] বড়ো বড়ো লেকচার তোমার কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের দিও।"

হায় রে কপাল, অনীতা ভুলে গেছে যে সেও একদিন তপনের কলেজের ছাত্রীই ছিল। মুখচোরা প্রফেসরকে নিয়ে বন্ধু-মহলে হাসি-ঠাট্টা করতে সেও কম যেত না কারুর চেয়ে; আর সেই মুখচোরা প্রফেসরই যে বারবার চোরা চাউনিতে ঐ অনীতার দিকেই চেয়ে দেখছে, এ কথা নিয়ে যখন রীতা, নীতা, সুস্মিতা, [illegible] দল হৈ-হৈ লাগাত তখন ঐ অনীতাই মুখ টিপে হেসে বলত,—"মুখচোরা পুরুষই স্বামী হিসেবে ভালো; রাগ করলেও [illegible] করবে না।"
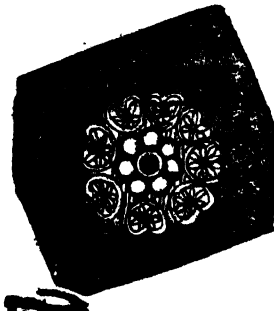
কিন্তু বিয়ের পর অনীতার মত বদলেছে। ও দেখছে, বাইরের লোকের কাছে যতই মুখ বুজে থাক্ না কেন, ঘরের লোকের কাছে তপনের বেশ মুখ খুলে যায়। কলেজে লেকচার দিয়ে দিয়ে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, ঘরের মানুষদের উপরেও যখন তখন বক্তৃতা দেবার

সুযোগ ছাড়ে না।—অবশ্য শুধু বক্তৃতাই নয়, আরো অনেক কারণে তপন মুখ খুলে থাকে। ভালোবাসা সম্বন্ধে ওর আদর্শ একেবারে বিলিতী ধরণের। ইংরেজী সাহিত্য পড়ে পড়ে প্রেম-ট্রেম সম্বন্ধে অনেক নতুন ধারণা গড়ে উঠেছে ওর; আবিষ্কার করেছে মনোরঞ্জনের বেশ কিছু নতুন টেক্‌নিক, তাই সাধারণত ওর বক্তৃতা-গুলো গায়ে মাখে না অনীতা। অন্য ব্যবহার-গুলি ওর আশ্চর্যরকম মধুর। নইলে এই চার পাঁচ বছর হতে চলল, এখনো প্রেমে একটুও ভাটা পড়ে নি। বউকে ফেলে কোথাও যায় না, এক, কলেজে পড়াতে যাওয়া ছাড়া। সিনেমা-টিনেমা সব যায়গাতে অনীতাই চিরসঙ্গিনী। এমন কি কলেজের পরে যে কফি হাউসে বসে এককাপ কাফি কি একটু বাদাম ভাজা খেয়ে আসবে তাও কখনো করে না।

কানের ঐ ফুলজোড়ার কথাই ধরা যাক্ না। মার্কেট ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ ঐ ফুলজোড়া অনীতা দেখতে পেয়েছিলো "শো কেসে"। নীল মখমলের ট্রের উপরে আর পাঁচটা কানের গয়নার সঙ্গে সাজানো রয়েছে।—দেখেই চোখটা যেন আটকে গিয়েছিলো। আহা কি চমৎকার দেখতে গয়নাটা! কিন্তু দামটাও তেমনি চমৎকার। একজোড়া কানের ফুলের দাম কি না দুশো পঁচিশ টাকা! তা পছন্দের একটা দাম নেই!—পাথরগুলোও সব সাচ্চা।

হোক। ঐ দুল কেনার কথা অনীতা মনেও স্থান দেয় নি। যা ভালো লাগবে তাই কি কিনতে হবে নাকি? সখ মেটাতে অত পয়সা খরচ করার মত পয়সা ওদের নেই। আর বিয়েতেও তো এত সব গয়নাগাটি পেয়েছে। কাজেই অনীতা বেশ স্বচ্ছন্দেই ফিরে আসছিলো;—কিন্তু তপন কেমন যেন তেমন স্বচ্ছন্দে ফিরতে পারল না।—অনীতার মুগ্ধ চোখের লুব্ধ দৃষ্টিটা তপনের মনের মধ্যে বারবার কাঁটার মত খচখচ করে বিঁধতে লাগল।

তিনদিন পরে ওদের বিয়ের তারিখ। সেদিন সকালে ঘুম ভাঙতে না ভাঙতে অনীতার মনে হোল, হাতে যেন কি একটা রয়েছে, তাড়াতাড়ি তাকিয়ে দেখে একটা ছোট্ট গয়নার কেস—আর খুলে দেখে তার মধ্যে জ্বলজ্বল করছে সেদিনের সেই কানের ফুল দুটো। ফুল দুটোর দিকে চেয়ে চেয়ে পলক পড়ে নি অনীতার। ঐ গয়না দুটোর মধ্যে শুধু যে একটি অপরূপ শিল্প কাজকেই সে দেখছিলো তা নয়, ঐ দুল দুটো যেন স্বামীর ভালবাসার ফুল হয়ে ওর শরীরের কানায় কানায় সুরভি ছড়াতে লাগল। খুশীতে উচ্ছল হয়ে অনীতা উঠে পড়েছিলো। ঘরদোরের কাজ পড়ে আছে। বিয়ের তারিখে, ক'জন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছিল ওরা।

তপনের মা-বাবা তো থাকেন সেই জলপাইগুড়ি। কলকাতার সংসারে তাই অনীতাকেই গিন্নী হতে হয়েছে।

তাই তো অনীতার মা এই সরলাকে পাঠিয়েছেন, অনেক চেষ্টাচরিত্র করে। আজকাল লোক কাজেই তো আর পাওয়া যায় না—আর চেনাজানা না থাকলে তো আর যাকে-তাকে ঘরে ঢোকানও যায় না। এই নিয়ে কতবার তো হোল। একটা করে লোক আসে দুদিন যেতে না-যেতে পালায়।

তাই এতদিন পরে সরলার মতো একজন মেয়ে পেয়ে ভারী খুশী হয়েছিল অনীতা। যেমন কাজের তেমনি সভ্য ভব্য। শুধু ঐ একটি দোষ, বড্ড গায়েপড়া—কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ এসে এসে এমন আত্মীয়তা দেখিয়ে কথা বলবে, যেন অনীতা আর সরলা একই দরের একই দলের মানুষ। অনীতা যে মধ্যবিত্ত উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেশ একজন জাঁদরেল মেম্বার আর সরলা যে মাত্র 'ঝি' সে কথা সরল যেন কিছুতেই বুঝতে চাইত না,—কিম্বা ভাণ করত যেন বোঝে না। একদিন তো ধপ্ করে অনীতার পাশে তার বিছানায় এসে বসে পড়ে বলল,—"এসো ভাই বৌদিমণি! আমি আজ তোমার চুল বেঁধে দিই, তোমরা যে আজকাল কেমন করে সব চুল বাঁধো আমার তো একটুও পছন্দ হয় না।"

বাধ্য হয়েই অনীতাকে বলতে হোয়েছিলো, "তুমি কিন্তু আর এমনি করে বিছানা-টিছানায় বোস না সরলা, তোমাদের দাদাবাবু আবার ওসব একেবারে পছন্দ করে না।"

একথা শোনামাত্র অবশ্য সরলা দারুণ অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে যেখানে বসেছিলো সে জায়গাটা বার বার হাত দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে জিভ কেটে বলেছিল,—"হেই গো, বৌদিমণি বড্ড ভুল হয়ে গেছে, মুখ্যু-সুখ্যু লোক, মাথার ঠিক নেই, নইলে কখনো এমন কাজ করতে পারি?—তোমরা বড়লোক, তোমরা মনিব, তোমাদের সঙ্গে কখনো একাসনে বসতে পারি, ছি ছি—এমন বুদ্ধির মাথায় মারি ঝাঁটার বাড়ি।" বলতে বলতে পালিয়ে গিয়েছিলো সরলা।

আজও একেবারে নিঃশব্দে পালিয়ে যায় নি সরলা। অনেক প্রতিবাদ অনেক চেঁচামেচি করেছিল; কিন্তু অনীতা বিশ্বাস করে নি। সরলার মুখ দেখেই ওর মনে হয়েছিল যে সরলাই দোষী।

সরলা নিজেও বোধ হয় ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না কে দোষী? আর সেইজন্যেই চেঁচামেচি করতে করতেও কেমন যেন থতমত খেয়ে যাচ্ছিল। সরলাকে ওরকম ভয় পেয়ে যেতে দেখেই অনীতা আরো ধরে নিয়েছিল, যে, ওই চোর। তপন কিন্তু চট্ করে বিশ্বাস করতে চায় নি। বলছিলো,—"ফস্ করে একটা মানুষকে দোষী সাব্যস্ত কোর না নীতু, ভালো করে না জেনে মানুষকে অবিশ্বাস করার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকাও ভালো।"

—"হ্যাঁ বিশ্বাস করেই বরাবর ঠকে এসেছি, এবারেও ঠকলাম, তোমার কাছে তো পরামর্শ চাইতে আসি নি।"

সত্যিই রাগে গা জ্বলে গিয়েছিল অনীতার। ওসব বড়ো বড়ো কথা Platform-এর ওপর ভালো শোনায়।

—"বিশ্বাস করে করে গেল তো অমন সুন্দর জিনিষটা।"

তবুও তপন তর্ক করতে ছাড়ে না। "বিশ্বাস করে হারাও নি, অনীতা, অসাবধান হয়েই হারিয়ে ছিলে।"

সত্যিই অনীতা বড় অসাবধান। জিনিসপত্র-টাকা-পয়সা যখন তখন এখানে ওখানে পড়ে থাকছে। হাতের আংটী, কানের মাকড়ি, দুল, ফুল সব সময় দেরাজের উপরে পড়ে থাকে। দেরাজটা খুলে ভিতরে ঢুকিয়ে দেবার কথাও তার অনেক সময়েই মনে পড়ে না। তাই তপন বলে—"ওদের চোখের সামনে অমন লোভের পসরা খুলে সাজিয়ে রেখো না, সবাইকে কামজয়ী মহাদেব তৈরী করতে চাও নাকি?"

সরলাও মনে মনে ঠিক এই কথাই বলত, "কেন গা, গয়না-টয়না টাকা-পয়সা সব অমন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে রাখা—তারপরে যদি হারিয়ে যায়, দোষ হবে সরলার। লোক বলতে তো ঐ একটি। ঠিকে-ঝি তো আসে-যায়,—তার উপুরে নজর রাখার দায়ও সরলার? কেন গো, সরলা কি মানুষ নয়? তার দেহেও কি কামনা-বাসনার স্থান নেই? হ্যাঁ কি গো, তারও কি সাধ যায় না সোয়ামীর সামনে মন চটক দেখিয়ে ঘুরে বেড়াতে। সোয়ামী না হয় নেই, তা বলে কি একটা গয়নাগাটি পরবারও সখ হতে পারে না? কেন গো সরলার দেহে কি যৌবন নেই?"

না নেই,—সরলার মত মেয়ের দেহে যৌবনও থাকতে নেই, মনেও সখ থাকতে নেই, তাই ওরা ভাবে। নইলে কেন চোখের সামনে লোভের পসরা খুলে ফেলে রেখে চলে যায়। কিন্তু আজ অবধি কেউ বলতে পারবে কী যে, সরলা কখনো একটা জিনিষ সরিয়েছে? কানের মাকড়ি, গলার হার, খুচরো পয়সা, টাকার ব্যাগ যা যেখানে পড়ে থাকে, সবই তো সরলা গুছিয়ে গুছিয়ে তুলে-টুলে রাখে, বৌদি এলে সব তাকে বুঝিয়ে দেয়; হাতে করে না দিলে একটা জিনিষ কখনো সরলা নিজে থেকে নেয় না।

তবে এটার বেলা কি হোল?—সরলা কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলো,—"কি হোলো কেমন করে জানব গো বৌদিমণি। আমি হলপ্ করি বলতিছি, আমি যদি নিয়ে থাকি তবে যেন আমার মুখে রক্ত ওঠে গো, বৌদিমণি—যদি আমি নিয়ে থাকি।"

—"আর থাক শুধু শুধু দিব্যি গালতে হবে না। তুই তো জিনিষটা হাতে নিয়ে দেখছিলি?"

হ্যাঁ তা দেখছিলো বটে সরলা। কিন্তু সে তো শুধু একবার,—বৌদি ওটা খুলে টেবিলের উপরে রাখছিলো। সরলা তখন জিনিষটির দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে বলেছিলো—"হাই গো বৌদিমণি দেখি না একটু গো"।

অনীতার ইচ্ছে ছিল না জিনিষটা ওর হাতে দেয়, কিন্তু কি করবে। চক্ষুলজ্জার খাতিরে দিতেই হোল, একটুক্ষণের জন্য। সেই অল্পক্ষণ-টুকুর মধ্যে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে, একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনীতার হাতে ফিরিয়ে দিল ফুলজোড়া, অল্প একটু হেসে বললে, কোনদিন তো আর এসব জিনিষ কিনবার ক্ষ্যামতা হবে না ভাই, তবু তোমার কল্যাণে শুধু একটু হাতে করে দেখলাম। শুনে সত্যি যেন কেমন লেগেছিলো অনীতার। ওর কেবলি মনে হচ্ছিলো সরলাকে আর রাখা চলবে না, ও যেন কেমন ধারা অদ্ভুত—কেবল নিজেকে তুলে ধরতে চায় অনীতাদের সামনে, বারবার ওদের মনে পড়িয়ে দিতে চায় যে, সেও একজন মেয়ে—অনীতারই মতন; অনীতারই মতন তারও সুখ-দুঃখ-আকাঙ্ক্ষার ঢেউ।

যাক্ গে সেসব কথা। অনীতা তখনকার মতন ফুল দুটো পরে নিলো আবার। তারপর সন্ধ্যেবেলা বিয়েবাড়ীতে নেমন্তন্ন ছিল। অনীতা বেনারসী সাড়িটাড়ি পরে, সেজেগুজে ওর নিজের বিয়ের জড়োয়া সেটটা পরল। কানবালা, নেকলেস আর জড়োয়া চুড়ি। ফুল দুটো খুলে তখন আলমারীর দেরাজেই তো রেখেছিলো, মনে পড়ছে অনীতার। কিন্তু হয়ত রাখে নি, হয়ত বাইরেই ফেলে রেখে গিয়েছিলো আর সেই সুযোগে কেউ হাতসাফাই করেছে। নইলে আজ সারা সকাল ধরে আলমারীর সমস্ত দেরাজ

তন্নতন্ন করে খুঁজেও কেন পেল না জিনিষটা। আলমারী, ড্রেসিং-টেবিলের টানা—শোবার ঘরের তাক সম্ভব অসম্ভব সব জায়গা খুঁজেছে, কেউ যদি না নেবে তো জিনিষটা গেল কোথায়?

সত্যি কথা! গেল কোথায়? সরলাও ভাবে, সরলা তো নেয় নি, তবে জিনিষটা গেল কোথায়?

বৌদি অবশ্য মোটেই আলমারীর দেরাজে জিনিষটি ভরে রেখে যায় নি—তার অভ্যেসমতো ড্রেসিং-টেবিলের উপরেই ফেলে রেখে গিয়েছিলো। কিন্তু সেকথা আর সরলা বলতে পারে নি অনীতাকে,—তাহলে তো আরোই চেপে ধরবে। তাই সরলা বারবার দিব্বি গেলে প্রতিজ্ঞা করছিল, "ছেই গো বৌদি, আমি তো ও জিনিষটা আর কখনো চক্ষেও দেখি নি। এই তোমরা চলে গেলে, আমি অমনি বিছানা-পাটি সেরে জলটল রেখে রান্নাঘরে গিয়ে কাল সকালের সব ব্যবস্থা করে নিজে খেয়েদেয়ে সবে রান্নাঘর ধুইতেছি, আর তোমরা এসে কড়া নাড়লে।"

এসব কথাই সত্যি, কিন্তু এর মধ্যে একটা মস্তবড়ো কথা বাদ দিয়েছে সরলা,—বিছানা করতে এসে সরলা দেখতে পেল ড্রেসিং-টেবিলের উপরে অনীতার কানের সেই অপরূপ ফুল দুটো—নেহাৎই অকিঞ্চিৎকর দুটো সেফটীপিনের মতো নিঃ হয়ে পড়ে আছে।

ও মা, কি কাণ্ড! আচ্ছা মেয়ে যা হোক এই বৌদি! ছি ছি! এমন অসাবধান মানুষে হয়। কোথায় জানে কি না সরলা চোর নয়। কিন্তু এমন ভুলো মানুষের জিনিষ চুরি করলেও দোষ হয় না সত্যি। সরলা ফুল দুটো হাতে তুলে নিল। বড় বড়ো দুটো কড়া আলো জ্বলছে। তার-মধ্যে এলোমেলো-পালোট ঘরটা যেন কেমন ছন্নছাড়া ভাবে পড়ে আছে। অনীতার পরা সাড়ীটা অর্ধেক বিছানায়, অর্ধেক মেঝেতে লুটাচ্ছে, বুঝি বিধাতা এ-সুখটুক তার কপালে লিখেছিলেন,---

ড্রেসিং--টেবিলের উপরে অজস্র জিনিষ এলোমেলো। আয়নাময় পাউডারের গুঁড়ো। সরলা এসেছিলো চটপট সব সেরে নেবে বলে। কিন্তু এ কী কাণ্ড!

সকালবেলায় ফুল দুটা হাতে করে একটু-ক্ষণের জন্যে যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিলো সরলা, তাই এখন এই নিরালা ঘরে একা একা বসে যতক্ষণ খুশী সে ফুল দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারে।

ড্রেসিং-টেবিলের সামনের টুলের উপরে বসল সরলা বেশ আরাম করে। আয়নার ওর মোটাসোটা কালো চেহারাটা জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠল। এমন করে কোনদিন ও নিজেকে দেখে নি। অদ্ভুত। ওর চেহারা তো এমন কি খারাপ নয়, হুঁঃ, রাতদিন সাজগোজ করে পাউডার-পমেড মেখে থাকলে ওকেও দেখতে অনীতার চেয়ে এমন কিছু খারাপ হোত না।

অনীতার তোয়ালেটা দিয়ে বেশ করে নিজের মুখটা মুছে নিল সরলা,—তারপরে কৌটো থেকে একখাবলা পাউডার নিয়ে মুখে মেখে অনীতার ছাড়া সাড়িটাই বেশ গুছিয়ে পরে নিল, পাতলা সবুজ সাড়ির হলুদ রঙের চওড়া পাড়। আহা সাড়িখানি পরে আয়নার ভিতরে সরলার চেহারাটা কি চমৎকার মানিয়েছে। এইবারে বসে বসে অতি ধীরে ধীরে ফুল দুটি কানে পরলো সরলা। মুখখানা যেন আলো হয়ে উঠল, —কি সুন্দর দেখাচ্ছিল, কে বলবে ও সরলা, যেন সত্যি সত্যি একজন ভদ্দরলোকের বউ। আরে বড়োলোক ছোটলোকের তফাৎই তো ওই, গয়না আর সাড়ি। নইলে চুরি বলো, জোচ্চুরি বল, কোনটাতে আর ভদ্দর-অভদ্দরে তফাৎ আছে?

ওইসব পরেই সরলা সব ঘরের কাজ সারল। বিছানাটি ঝেড়ে ঝুড়ে চাদরটি টানটান করে পেতে, স্বামী-স্ত্রীর মাথার বালিস দুটি পাশাপাশি সাজিয়ে দিল। কত জন্মের পুণ্যের ফলে, এমন ঘরে এমন বিছানায় এমন স্বামীর পাশে শুতে পারে কোন মেয়ে ভেবে পেলো না সরলা।

সরলার মা বলত, আর জন্মে অনেক পাপ করেছিলি হতভাগী,—তাই এ-জন্মে বয়স না জাগতেই বিধবা হলি। কিন্তু সে জন্মের সেই পাপিনীকে তো সরলা একেবারেই চেনে না। সেই অচেনার পাপের ভার বইতে কেন সরলাকে এ-জন্মে এত দুঃখ পেতে হচ্ছে?

ভালো ভালো রান্না করে দেবে সে, খাবে অন্য লোক, ভালো ভালো কাপড়-চোপড় সাড়ি-জামা কেচেকুচে ইস্ত্রি করে রাখবে, পরবে অন্য লোক। অবশ্য এগুলো এমন কিছু একটা বড়ো রকমের দুঃখ নয়। এখানে তবু খেতে পায়, রোজই প্রায় মাছও জোটে এক-আধ-টুকরো। বৌদি আর যাই হোক, খাওয়া-দাওয়াটা দেখে, শুধু বড্ড দূর থেকে দেখে, কাছে এসে দাঁড়াতে জানে না।

তা-ছাড়া সরলাকে বিশ্বাসও করে ওরা দুজনেই। আর দাদাবাবু তো মাটির মানুষ। বৌদি যদি বা যখন তখন একটু মেজাজ দেখাবার চেষ্টা করে দাদাবাবুর জ্বালায় তাও পেরে ওঠে না।

নাঃ। সরলার মত মেয়ে কি এদের এত বিশ্বাস চুরি করতে পারে। গয়না চুরি তো আর সত্যি সত্যি শুধু গয়নাটুকুই চুরি নয়, সে যে সারা জীবনের বিশ্বাসটাই চুরি,—চরিত্র চুরি, ছি ছি, সরলা কি তা করতে পারে। আর চুরি করলেই কি রাখতে পারবে? অন্য চোরে এসে তার উপরে বাটপাড়ি করে যাবে। দুলটি কানে পরে যদি একদিন তাদের বস্তিতে এর ওর তার ঘরে বেড়াতে যায়, তবে কি সকলেরই চোখ টাটাবে না? আর সবাই কি মনে মনে ওকে চোর বলবে না? আর তক্কে তক্কে থাকবে না কি করে ওই দুল জোড়া ওর কাছ থেকে হাতাতে পারে?

না ছি,—ও সব ভাবনা সরলা মনেও স্থান দেবে না।

সরলা আস্তে আস্তে অনীতার সাড়ি খুলে, নিজের পুরনো বেশভূষায় ফিরে গেল। এক-ঘণ্টার রাণী খুলে ফেলল তার সাজ; শুধু চুনি-মুক্তার ফুল দুটো তখনো তার কালো কান দুটিতে আলোর মতো জ্বলতে থাকল। নেবে তো আর না, ফিরিয়ে তো দেবেই, তবে থাক্ না আর একটুক্ষণ কানে।

সরলা রান্নাঘরের কাজকর্ম সারল, আর ভাবল আজ যদি পরেশ একবার দেখা করতে আসত, যেমন সে প্রায়ই আসে তাহলে বেশ হোত। কিন্তু তখুনি মনে হোল, ভাগ্যিস, পরেশও ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ঐ কথাই বলত, "করেছিস্ কি হতভাগী, খুলে ফেল, খুলে ফেল্—কার জিনিষ নিয়ে কানে দিয়েছিস্?" পরেশ তার প্রসাধিত মুখের দিকে ভালোবাসায় চোখে চাইত কি? না তার আগেই ওর কানের দুল দুটির দিকে চেয়ে বিব্রত হয়ে উঠত। সবাই ওকে চোর ভাবত, এমন কি পরেশও। ছি।

এসব জিনিষে লোভ করা কি সরলার মতো মেয়েকে সাজে? যদি ওর তেমনি কপাল হোত, তাহলে কি আর চুরির কথা ভাবতে হোত। এমনি এমনিই ঠাকুর লিখে দিতেন কপালে,—সুখ, ভোগ, ঐশ্বর্য,—যেমন অনীতাকে দিয়েছেন। কাজেই এসব কথা তার ভাবতে যাওয়াই ভুল।

খেয়েদেয়ে মুখ-হাত ধুয়ে কান থেকে ফুল জোড়া খুলে ফেলল সরলা। আহা কি রূপ, ওর হাতের তেলোটা যেন ফুল দুটির ছটায় ঝল্‌মল্ ঝল্‌মল্ করে উঠল। পানের বাক্সটা ছিল হাতের কাছে। হঠাৎ ওর দুর্বার বাসনা হোল দুল দুটি ওই বাক্সের মধ্যে রেখে দেয়, পান সেজে, দুটো পানের খিলির মধ্যে দুটি ফুল,---কেউ ধরতে পারবে না যদি শতবার করে সার্চ করে। বাক্সের ডালার উপরে ফুল দুটি রেখে দুটি খিলি তৈরী করল সরলা চুন না দিয়ে। তারপরে ফুল দুটি হাতের মুঠোয় করে কেবলি দ্বিধা করতে লাগল, খিলির ভিতরে রাখবে, কি রাখবে না?

নাঃ পাগল নাকি, এ জিনিষ নিয়ে যদি সামলাতে না পারে--তো জেল খাটতে হবে। কাজ নেই বাবা। পানের বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে দিল সরলা। হাতের মুঠোয় দুল দুটো শক্ত করে ধরে সরলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল,—আর ঠিক সেই মুহূর্তেই নীচে থেকে ঘণ্টা বাজল,—দাদাবাবু, বৌদিদি সব ফিরে এসেছে। পড়ি কি মরি করে ছুটে গেল সরলা শোবার ঘরের দিকে,—অন্ধকারের মধ্যেই টানা

তিনদিন পরে ওদের বিয়ের তারিখ। সেদিন সকালে ঘুম ভাঙতে না ভাঙতে অনীতার মনে হোল, হাতে যেন কি একটা রয়েছে, তাড়াতাড়ি তাকিয়ে দেখে একটা ছোট্ট গয়নার কেস---আর খুলে দেখে তার মধ্যে জ্বলজ্বল করছে সেদিনের সেই কানের ফুল দুটো। ফুল দুটোর দিকে চেয়ে চেয়ে পলক পড়ে নি অনীতার। ঐ গয়না দুটোর মধ্যে শুধু যে একটি অপূর্ব শিল্প কাজকেই সে দেখছিলো তা নয়, ঐ দুল দুটো যেন স্বামীর ভালবাসার ফুল হয়ে ওর শরীরের কানায় কানায় সুরভি ছড়াতে লাগল। খুশীতে উচ্ছল হয়ে অনীতা উঠে পড়েছিলো। ঘরভোড়া কাজ পড়ে আছে। বিয়ের তারিখে, ক'জন বন্ধুকে নেমন্তন্ন করেছিল ওরা।

তপনের মা-বাবা থাকেন সেই জলপাইগুড়ি। কলকাতার সংসারে তাই অনীতাকেই গিন্নী হতে হয়েছে।

তাই তো অনীতার মা এই সরলাকে পাঠিয়েছেন, অনেক চেষ্টাচরিত্র করে। আজকাল লোক বললেই তো আর পাওয়া যায় না---আর চেনাজানা না থাকলে তো আর যাকে-তাকে ঘরে ঢোকানও যায় না। এই নিয়ে কতবার তো হোল। একটা করে লোক আসে দুদিন যেতে না-যেতে পালায়।

তাই এতোদিন পরে সরলার মতো একজন মেয়ে পেয়ে ভারী খুশী হয়েছিল অনীতা। যেমন কাজের তেমনি সভ্যভব্য। শুধু ঐ একটি দোষ, বড্ড গায়েপড়া---কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ এসে এসে এমন আত্মীয়তা দেখিয়ে কথা বলবে, যেন অনীতা আর সরলা একই দলের একই দলের মানুষ। অনীতা যে মধ্যবিত্ত উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেশ একজন জাঁদরেল মেম্বার আর সরলা যে মাত্র 'ঝি' সে কথা সরল, যেন কিছুতেই বুঝতে চাইত না,---কিম্বা ভাণ করত যেন বোঝে না। একদিন তো ধপ করে অনীতার পাশে তার বিছানায় এসে বসে পড়ে বলল,---"এসো ভাই বৌদিমণি। আমি আজ তোমার চুল বেঁধে দিই, তোমরা যে আজকাল কেমন করে সব চুল বাঁধো আমার তো একটুও পছন্দ হয় না।"

বাধ্য হয়েই অনীতাকে বলতে হোয়েছিলো, "তুমি কিন্তু আর এমনি করে বিছানা-টিছানায় বোস না সরলা, তোমাদের দাদাবাবু আবার ওসব একেবারে পছন্দ করে না।"

একথা শোনামাত্র অবশ্য সরলা দারুণ অপ্রস্তুত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে যেখানে বসেছিলো সে জায়গাটা বার বার হাত দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে জিভ কেটে বলেছিল,---"হেই গো, বৌদিমণি বড্ড ভুল হয়ে গেছে, মুখ্যু-সুখ্যু লোক, মাথার ঠিক নেই, নইলে কখনো এমন কাজ করতে পারি?---তোমরা বড়লোক, তোমরা মনিব, তোমাদের সঙ্গে কখনো একাসনে বসতে পারি, ছি ছি---এমন বুদ্ধির মাথায় মারি ঝাঁটার বাড়ি।" বলতে বলতে পালিয়ে গিয়েছিলো সরলা।

আজও একেবারে নিঃশব্দে পালিয়ে যায় নি সরলা। অনেক প্রতিবাদ অনেক চেঁচামেচি করেছিল; কিন্তু অনীতা বিশ্বাস করে নি। সরলার মুখ দেখেই ওর মনে হয়েছিল যে সরলাই দোষী।

সরলা নিজেও বোধ হয় ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না কে দোষী? আর সেইজন্যেই চেঁচামেচি করতে করতেও কেমন যেন থতমত খেয়ে যাচ্ছিল। সরলাকে ওরকম ভয় পেয়ে যেতে দেখেই অনীতা আরো ধরে নিয়েছিল, যে, ওই চোর। তপন কিন্তু চট করে বিশ্বাস করতে চায় নি। বলছিলো,---"সব করে একটা মানুষকে দোষী সাব্যস্ত কোর না নীতু, ভালো করে না জেনে মানুষকে অবিশ্বাস করার চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকাও ভালো।"

—"হ্যাঁ বিশ্বাস করেই বরাবর ঠকে এসেছি, এবারেও ঠকলাম, তোমার কাছে তো পরামর্শ চাইতে আসি নি।"

সত্যিই রাগে গা জ্বলে গিয়েছিল অনীতার। ওসব বড়ো বড়ো কথা Platform-এর ওপর ভালো শোনায়।

—"বিশ্বাস করে করে গেল তো অমন সুন্দর জিনিষটা।"

তবুও তপন তর্ক করতে ছাড়ে না। "বিশ্বাস করে হারাও নি, অনীতা, অসাবধান হয়েই হারিয়েছিলে।"

সত্যিই অনীতা বড় অসাবধান। জিনিসপত্র-টাকা-পয়সা যখন তখন এখানে ওখানে পড়ে থাকছে। হাতের আংটি, কানের মাকড়ি, দুল, ফুল সব সময় দেরাজের উপরে পড়ে থাকে। দেরাজটা খুলে ভিতরে ঢুকিয়ে দেবার কথাও তার অনেক সময়েই মনে পড়ে না। তাই তপন বলে—"ওদের চোখের সামনে অমন লোভের পসরা খুলে সাজিয়ে রেখো না, সবাইকে কামজয়ী মহাদেব তৈরী করতে চাও নাকি?"

সরলাও মনে মনে ঠিক এই কথাই বলত, "কেন গা, গয়না-টয়না টাকা-পয়সা সব অমন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে রাখা—তারপরে যদি হারিয়ে যায়, দোষ হবে সরলার। লোক বলতে তো ঐ একটি। ঠিকে-ঝি তো আসে-যায়,—তার উপুরে নজর রাখার দায়ও সরলার? কেন গো, সরলা কি মানুষ নয়? তার দেহেও কি কামনা-বাসনার স্থান নেই? হ্যাঁ কি গো, তারও কি সাধ যায় না সোয়ামীর সামনে মন চটক দেখিয়ে ঘুরে বেড়াতে। সোয়ামী না হয় নেই, তা বলে কি একটা গয়নাগাটি পরবারও সখ হতে পারে না? কেন গো সরলার দেহে কি যৌবন নেই?"

না নেই,—সরলার মত মেয়ের দেহে যৌবনও থাকতে নেই, মনেও সখ থাকতে নেই, তাই [illegible] ভাবে। নইলে কেন চোখের সামনে লোভের [illegible] খুলে ফেলে রেখে চলে যায়। কিন্তু আজ [illegible] কেউ বলতে পারবে কী যে, সরলা কখনো এ[illegible] জিনিষ সরিয়েছে? কানের মাকড়ি, গলার [illegible] খুচরো পয়সা, টাকার ব্যাগ যা যেখানে [illegible] থাকে, সবই তো সরলা গুছিয়ে গুছিয়ে [illegible] তুলে রাখে, বৌদি এলে সব তাকে [illegible] দেয়; হাতে করে না দিলে একটা [illegible] কখনো সরলা নিজে থেকে নেয় না।

তবে এটার বেলা কি হোল?—স[illegible] কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলো,—"কি [illegible] কেমন করে জানব গো বৌদিমণি। আমি [illegible] করি বলতিছি, আমি যদি [illegible] আমার মুখে রক্ত ওঠে গো, [illegible] আমি নিয়ে থাকি।"

---"আর থাক শুধু শুধু [illegible] হবে না। তুই তো জিনিষটা [illegible] দেখছিলি?"

হ্যাঁ তা দেখছিলো [illegible] সে তো শুধু একবার,—বৌদি [illegible] উপরে রাখছিলো। সরলা [illegible] দিকে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে [illegible]—"হ[illegible] গো বৌদিমণি দেখি না একটু গো"।

অনীতার ইচ্ছে ছিল না [illegible] দেয়, কিন্তু কি করবে। [illegible] দিতেই হোল, একটুক্ষণের [illegible] টুকুর মধ্যে বারবার ঘুরিয়ে [illegible] দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনীতার হাতে [illegible] ফুলজোড়া, অল্প একটু হেসে [illegible] তো আর এসব জিনিষ কিনবার [illegible] ভাই, তবু তোমার কল্যাণে [illegible] করে দেখলাম। শুনে সত্যি [illegible] লেগেছিলো অনীতার। [illegible] হচ্ছিলো সরলাকে আর রাখা চলবে না, ও [illegible] কেমন ধারা অদ্ভুত—কেবল নিজেকে তুলে ধর[illegible] চায় অনীতাদের সামনে, বারবার ওদের [illegible] পড়িয়ে দিতে চায় যে, সেও একজন মেয়ে[illegible] অনীতারই মতন: অনীতারই মতন তার [illegible] সুখ-দুঃখ-আকাঙ্ক্ষার ঢেউ।

যাক্ গে সেসব কথা। অনীতা তখনকা[illegible] মতন ফুল দুটো পরে নিলো আবার। তারপ[illegible] সন্ধ্যেবেলা বিয়েবাড়ীতে নেমন্তন্ন ছিল। অনী[illegible] বেনারসী সাড়িটাড়ি পরে, সেজেগুজে ও[illegible] নিজের বিয়ের জড়োয়া সেটটা পরল। কানবালা[illegible] নেকলেস আর জড়োয়া চুড়ি। ফুল দুটো খু[illegible] তখন আলমারীর দেরাজেই তো রেখেছিলো[illegible] মনে পড়ছে অনীতার। কিন্তু হয়ত রাখে নি[illegible] হয়ত বাইরেই ফেলে রেখে গিয়েছিলো আ[illegible] সেই সুযোগে কেউ হাতসাফাই করেছে। নইলে[illegible] আজ সারা সকাল ধরে আলমারীর সমস্ত দেরা[illegible]

তন্নতন্ন করে খুঁজেও কেন পেল না জিনিষটা। আলমারী, ড্রেসিং-টেবিলের টানা—শোবার ঘরের তাক সম্ভব অসম্ভব সব জায়গা খুঁজেছে, কেউ যদি না নেবে তো জিনিষটা গেল কোথায়?

সত্যি কথা। গেল কোথায়? সরলাও ভাবে, সরলা তো নেয় নি, তবে জিনিষটা গেল কোথায়?

বৌদি অবশ্য মোটেই আলমারীর দেরাজে জিনিষটি ভরে রেখে যায় নি—তার অভ্যেসমতো ড্রেসিং-টেবিলের উপরেই ফেলে রেখে গিয়েছিলে। কিন্তু সেকথা আর সরলা বলতে পারে নি অনীতাকে,—তাহলে তো আরোই চেপে ধরবে। তাই সরলা বারবার দিব্যি গেলে প্রতিজ্ঞা করছিল, "হেই গো বৌদি, আমি তো ও জিনিষটা আর কখনো চক্ষেও দেখি নি। এই তোমরা চলে গেলে, আমি অমনি বিছানা-পাট সেরে জলটল রেখে রান্নাঘরে গিয়ে কাল সকালের সব ব্যবস্থা করে নিজে খেয়েদেয়ে সবে রান্নাঘর ধুইতেছি, আর তোমরা এসে কড়া নাড়লে।"

এসব কথাই সত্যি, কিন্তু এর মধ্যে একটা মস্তবড়ো কথা বাদ দিয়েছে সরলা,—বিছানা করতে এসে সরলা দেখতে পেল ড্রেসিং-টেবিলের উপরে অনীতার কানের সেই অপরূপ ফুল দুটো—যেনবাই অকিঞ্চিৎকর দুটো সেফটীপিনের মত নিঃ হয়ে পড়ে আছে।

ও মা, কি কাণ্ড! আচ্ছা মেয়ে যা হোক এই বৌদি। ছি ছি! এমন অসাবধান মানুষে হয়। কোথায় জানে কি না সরলা চোর নয়। কিন্তু এমন ভুলো মানুষের জিনিষ চুরি করলেও দোষ হয় না সাত্যি। সরলা ফুল দুটো হাতে তুলে নিল। বড়ো বড়ো দুটো কড়া আলো জ্বলছে। তার-মধ্যে ওলোট-পালোট ঘরটা যেন কেমন ছন্নছাড়া ভাবে পড়ে আছে। অনীতার পরা সাড়ীটা অর্ধেক বিছানায়, অর্ধেক মেঝেতে লুটাচ্ছে, বুঝি বিধাতা এ-সুখটুক তার কপালে লিখেছিলেন,---

ড্রেসিং-টেবিলের উপরে অজস্র জিনিষ এলোমেলো। আয়নাময় পাউডারের গুঁড়ো। সরলা এসেছিলো চট্‌পট্‌ সব সেরে নেবে বলে। কিন্তু এ কী কাণ্ড।

সকালবেলায় ফুল দুটা হাতে করে একটু-ক্ষণের জন্যে যেন হাতে স্বর্গ পেয়েছিলো সরলা, তাই এখন এই নিরালা ঘরে একা একা বসে যতক্ষণ খুশী সে ফুল দুটি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারে।

ড্রেসিং-টেবিলের সামনের টুলের উপরে বসল সরলা বেশ আরাম করে। আয়নায় ওর মোটামোটা কালো চেহারাটা জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠল। এমন করে কোনদিন ও নিজেকে দেখে নি। অদ্ভুত! ওর চেহারা তো এমন কি খারাপ নয়, হুঁঃ, রাতদিন সাজগোজ করে পাউডার-পমেড মেখে থাকলে ওকেও দেখতে অনীতার চেয়ে এমন কিছু খারাপ হোত না।

অনীতার তোয়ালেটা দিয়ে বেশ করে নিজের মুখটা মুছে নিল সরলা,—তারপরে কৌটো থেকে একখাব্‌লা পাউডার নিয়ে মুখে মেখে অনীতার ছাড়া সাড়িটাই বেশ গুছিয়ে পরে নিল, পাতলা সবুজ সাড়ির হলুদ রঙের চওড়া পাড়। আহা সাড়িখানি পরে আয়নার ভিতরে সরলার চেহারাটা কি চমৎকার মানিয়েছে। এইবারে বসে বসে অতি ধীরে ধীরে ফুল দুটি কানে পরলো সরলা। মুখখানা যেন আলো হয়ে উঠল, —কি সুন্দর দেখাচ্ছিল, কে বলবে ও সরলা, যেন সত্যি সত্যি একজন ভদ্দরলোকের বউ। আরে বড়োলোক ছোটলোকের তফাৎই তো ওই, গয়না আর সাড়ি। নইলে চুরি বলো, জোচ্চুরি বল, কোনটাতে আর ভদ্দর-অভদ্দরে তফাৎ আছে?

ওইসব পরেই সরলা সব ঘরের কাজ সারল। বিছানাটি ঝেড়ে ঝুড়ে চাদরটি টানটান করে পেতে, স্বামী-স্ত্রীর মাথার বালিস দুটি পাশাপাশি সাজিয়ে দিল। কত জন্মের পুণ্যের ফলে, এমন ঘরে এমন বিছানায় এমন স্বামীর পাশে শুতে পারে কোন মেয়ে ভেবে পেলো না সরলা।

সরলার মা বলত, আর জন্মে অনেক পাপ করেছিলি হতভাগী,—তাই এ-জন্মে বয়স না জাগতেই বিধবা হলি। কিন্তু সে জন্মের সেই পাপিনীকে তো সরলা একেবারেই চেনে না। সেই অচেনার পাপের ভার বইতে কেন সরলাকে এ-জন্মে এত দুঃখ পেতে হচ্ছে?

ভালো ভালো রান্না করে দেবে সে, খাবে অন্য লোক, ভালো ভালো কাপড়-চোপড় সাড়ি-জামা কেচেকুচে ইস্ত্রি করে রাখবে, পরবে অন্য লোক। অবশ্য এগুলো এমন কিছু একটা বড়ো রকমের দুঃখ নয়। এখানে তবু খেতে পায়, রোজই প্রায় মাছও জোটে এক-আধ-টুকরো। বৌদি আর যাই হোক, খাওয়া-দাওয়াটা দেখে, শুধু বড্ড দূর থেকে দেখে, কাছে এসে দাঁড়াতে জানে না।

তা-ছাড়া সরলাকে বিশ্বাসও করে ওরা দুজনেই। আর দাদাবাবু তো মাটির মানুষ। বৌদি যদি বা যখন তখন একটু মেজাজ দেখাবার চেষ্টা করে দাদাবাবুর জ্বালায় তাও পেরে ওঠে না।

নাঃ। সরলার মত মেয়ে কি এদের এত বিশ্বাস চুরি করতে পারে। গয়না চুরি তো আর সত্যি সত্যি শুধু গয়নাটুকুই চুরি নয়, সে যে সারা জীবনের বিশ্বাসটাই চুরি,—চরিত্র চুরি, ছি ছি, সরলা কি তা করতে পারে। আর চুরি করলেই কি রাখতে পারবে? অন্য চোরে এসে তার উপরে বাটপাড়ি করে যাবে। দুলটি কানে পরে যদি একদিন তাদের বস্তিতে এর ওর তার ঘরে বেড়াতে যায়, তবে কি সকলেরই চোখ টাটাবে না? আর সবাই কি মনে মনে ওকে চোর বলবে না? আর তকে তকে থাকবে না কি করে ওই দুল জোড়া ওর কাছ থেকে হাতাতে পারে?

না ছি,—ও সব ভাবনা সরলা মনেও স্থান দেবে না।

সরলা আস্তে আস্তে অনীতার সাড়ি খুলে, নিজের পুরনো বেশভূষায় ফিরে গেল। এক-ঘণ্টার রাণী খুলে ফেলল তার সাজ; শুধু চুনি-মুক্তার ফুল দুটো তখনো তার কালো কান দুটিতে আলোর মতো জ্বলতে থাকল। নেবে তো আর না, ফিরিয়ে তো দেবেই, তবে থাক্‌ না আর একটুক্ষণ কানে।

সরলা রান্নাঘরের কাজকর্ম সারল, আর ভাবল আজ যদি পরেশ একবার দেখা করতে আসত, যেমন সে প্রায়ই আসে তাহলে বেশ হোত। কিন্তু তখুনি মনে হোল, ভাগ্যিস, পরেশও ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ঐ কথাই বলত, "করেছিস্‌ কি হতভাগী, খুলে ফেল, খুলে ফেল্‌—কার জিনিষ নিয়ে কানে দিয়েছিস্‌?" পরেশ তার প্রসাধিত মুখের দিকে ভালোবাসার চোখে চাইত কি? না তার আগেই ওর কানের দুল দুটির দিকে চেয়ে বিব্রত হয়ে উঠত। সবাই ওকে চোর ভাবত, এমন কি পরেশও। ছি।

এসব জিনিষে লোভ করা কি সরলার মতো মেয়েকে সাজে? যদি ওর তেমনি কপাল হোত, তাহলে কি আর চুরির কথা ভাবতে হোত। এমনি এমনিই ঠাকুর লিখে দিতেন কপালে,—সুখ, ভোগ, ঐশ্বর্য,—যেমন অনীতাকে দিয়েছেন। কাজেই এসব কথা তার ভাবতে যাওয়াই ভুল।

খেয়েদেয়ে মুখ-হাত ধুয়ে কান থেকে ফুল জোড়া খুলে ফেলল সরলা। আহা কি রূপ, ওর হাতের তেলোটা যেন ফুল দুটির ছটায় ঝল্‌মল্‌ ঝল্‌মল্‌ করে উঠল। পানের বাক্সটা ছিল হাতের কাছে। হঠাৎ ওর দুর্বার বাসনা হোল দুল দুটি ওই বাক্সের মধ্যে রেখে দেয়, পান সেজে, দুটো পানের খিলির মধ্যে দুটি ফুল,---কেউ ধরতে পারবে না যদি শতবার করে সার্চ করে। বাক্সের ডালার উপরে ফুল দুটি রেখে দুটি খিলি তৈরী করল সরলা চুন না দিয়ে। তারপরে ফুল দুটি হাতের মুঠোয় করে কেবলি দ্বিধা করতে লাগল, খিলির ভিতরে রাখবে, কি রাখবে না?

নাঃ পাগল নাকি, এ জিনিষ নিয়ে যদি সামলাতে না পারে—তো জেল খাটতে হবে। কাজ নেই বাবা। পানের বাক্সের ডালাটা বন্ধ করে দিল সরলা। হাতের মুঠোয় দুল দুটো শক্ত করে ধরে সরলা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল,—আর ঠিক সেই মুহূর্তেই নীচে থেকে ঘণ্টা বাজল,—দাদাবাবু, বৌদিদি সব ফিরে এসেছে। পড়ি কি মরি করে ছুটে গেল সরলা শোবার ঘরের দিকে,—অন্ধকারের মধ্যেই টানা

খুলে ঢুকিয়ে দিল দুলজোড়া হাতড়ে হাতড়ে। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসে নীচে খুলে দিল দরজা।

ব্যাস,—তারপর আর কি। দাদাবাবু-বৌদিদি হেসে হেসে বিয়েবাড়ির গল্প করতে করতে চলে গেল ওদের ঘরের দিকে,—সরলার দিকে একবার তাকিয়ে দেখতেও ভুলে গেল।—শুধু বৌদির মাথার খোঁপা থেকে বেলফুলের মালার গন্ধ ক্ষণেকের জন্যে সরলার প্রাণের মধ্যে দিয়ে তার সমস্ত অস্তিত্বকে ছুঁয়ে গেল।—খুট করে বাতি নিবিয়ে দিল সরলা।

আর তারপর অন্ধকার, শুধু অন্ধকার। ভাঁড়ার ঘরের মেঝেতে একটি আধছেঁড়া মাদুর তার উপরে একটা আধহাত ছোট্ট বালিস, তাতে একটা আধময়লা ওয়াড় পরানো, তার এককোণায় লাল সবুজ পাড়ের সুতোয় ফুল পাতা সেলাই করেছিলো সরলা। বালিসের উপরে মাথা রেখে ঐ ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে এতক্ষণ পরে নিশ্চিন্ত আরামে নিঃশ্বাস ফেলল সরলা।

ভাগ্যে দুলজোড়া নেয় নি,—তাহলে কি এমন নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমের কথা ভাবতে পারত? সমস্ত রাত ছট্‌ফট ছট্‌ফট্ করতে হোত। হয়ত ভোর না-হতেই পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে পালিয়ে যেতে হোত। শুধু নিজের বস্তিতে গিয়েও রেহাই পেত না, চলে যেতে হোত সেই আগরপাড়া কিম্বা তেঁতুলতলা, যেখানে ওর দু-একজন চেনা-জানা লোক আছে। যাক্ গে সেসব কথা। আপাতত সরলার জন্যে বিধাতা মেপে রেখে-ছেন একটি নিরবচ্ছিন্ন নির্ভেজাল ঘুম।

এই তো এই ছোট্ট দুটি কর্ণভূষার ইতি-হাস, কামজয়ের একটুকরো রোমাঞ্চিত কাহিনী। সরলা নিজেই কি কোনদিন ভেবেছিলো, তার মনের মধ্যে এত লোভ, এত মোহ, এত দুর্বুদ্ধি, এত জোর, এত ত্যাগ, এত মহত্ত্ব আছে।

না—সরলা এখনো সে খবর ভালো করে জানতে পারল না, শুধু মনের মধ্যে ওর সেই গা ছমছমে বাসনার দাহটা যেন জুড়িয়ে গেল।

তবে আবার কেন এ কাঁ ঝালা?

সকালের রোদ যত বাড়তে লাগল,—অনীতার কথা ততো বেশী জ্বলন্ত হয়ে ফুটতে লাগল। আলমারী, দেরাজ, আয়না, টেবিল সমস্ত আতি-পাতি করে খোঁজা হোল, বিছানা উলটিয়ে,—বালিসের ওয়াড় খুলে সমস্ত পাওয়া গেল না।

গেল কোথায় জিনিসটা? হাওয়া হয়ে উড়ে যেতে তো আর পারে না। নির্ঘাৎ ঐ সরলাই নিয়েছে। হ্যাঁ এখন অনীতার বেশ মনে পড়ছে যে, আলমারীর দেরাজে তুলে রাখতে ভুলে গিয়েছিল, তাড়াতাড়িতে টেবিলের উপরে ফেলে রেখে গিয়েছিল: ওই মেয়েটা ছাড়া নেবার আর লোক কই? কে নেবে?

সত্যিই তো কে নেবে? সরলাও তাই ভাবছিল,—তাই চুপ করে গিয়েছিল, বেশী কথা বলার ওর সাহস ছিল না। উত্তেজনায় ওর হাত-পা ঝিমঝিম্ করছিল,—তাই ওর উপরে সন্দেহ আরো বাড়ছিলো সকলের। সরলা নিজেও মাঝে মাঝে নিজেকে সন্দেহ কর-ছিলো,—সত্যি কি সেই ওটা নিল নাকি শেষ পর্যন্ত? কৈ না তো—নিজের হাতে দেরাজে ভরে রেখে দিয়েছে। হায় হায় শেষ পর্যন্ত সেই চুরির বদনাম যখন নিতেই হোল, তখন সত্যি সত্যি চুরি করলেই বা ক্ষতি কি হোত।

শেষ পর্যন্ত দাদাবাবু এগিয়ে এল,—"মিছি-মিছি চেঁচামেচি করে শরীর খারাপ করছ কেন? তার চেয়ে ওকে ছাড়িয়ে দাও, চলে যাক।"

—"না আমি ওকে পুলিশে দেবো।"

—"অত সোজা নয়—পুলিশ কি করবে? প্রমাণ কিছু নেই। তার উপরে ওর জিনিসপত্তর সব তো দেখলে।"

হাঁ, একটু আগে বৌদি এসে ওর ছোট তোবঙ্গটা ঝেড়েঝুড়ে দেখেছে, পানের বাক্সটা হাতড়ে সব ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ফেলে দিয়েছে,—সেই কিবা চুনের খিলি দুটো বাক্সের এক-কোণায় নির্জীব মলিন হয়ে পড়েছিল,—অনীতা সে দুটো উলটেপালটে ছুঁড়ে ফেলে দিল। হঠাৎ সরলার মনে হোল, কি জানি শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি দেরাজে গিয়ে তুলে রেখেছি, না কি ওই খিলি দুটোর মধ্যেই ঢুকিয়ে দিয়েছি? দুরদুর খিলি দুটো শুকনো চুপসানো: তবু একবার সরলা ভাবল উঠে গিয়ে খিলি দুটো খুলে দেখে।

না ততক্ষণে দাদাবাবু ওর মাইনে হিসেব করে এনে দিয়েছেন,—"গুণে নাও সরলা, কিছু মনে কোর না, আমাদের এখন আর লোকের দরকার নেই।"

তাই বটে। আর লোকের দরকার নেই? এত বিশ্বাসের এই মর্য্যাদা দিলে তোমরা? সরলা ইচ্ছে করল, একবার সিংহীর মত গর্জন করে ওঠে।

কিন্তু হঠাৎ মনে হোল,—চুরি কি ও একে-বারেই করে নি? সন্ধ্যেবেলা বৌদির ঘরে বসে যা করছিলো,—সে কি চুরি নয়? মনের চুরিটুই শেষ পর্যন্ত আসল চুরির চেয়ে বড়ো হোল?

যাক উচিত শাস্তিই হয়েছে তার,—সরলা মুখ দিয়ে আর একটা কথাও বলতে পারল না। তার বদলে আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে ওর জিনিসপত্তর গুছাতে লাগল। অকারণেই ওর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। মাথার উপরে ছোট টিনের তোবঙ্গ আর হাতে পানের বাক্স নিয়ে সরলা বেরিয়ে গেল দরজা খুলে।

সমস্ত বাড়ীর কাজ একা সারবো ভেবে কান্নাকাটি করে তপনকেও আপিসে যেতে দিল না। "একটা ছোট্ট দুলের জন্যে তুমি এত upset হবে, এ আমি ভাবতেই পারি না।"

—"আচ্ছা, ভেবো না।" অনীতা শান্ত হয়ে খাট-বিছানা নিয়ে টানাটানি আরম্ভ করল। খাট দুটো সরিয়ে তলাটা ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে ফেলল। নিজেই ঝাঁটা নিয়ে আলমারী, ড্রেসিং-টেবিল সব সরিয়ে ঠিকে-ঝিকে দিয়ে পরিষ্কার করালে।—তপন শুধু হতভম্বের মত হুকুম তামিল করে যাচ্ছে। ঝাঁটা দিয়ে ড্রেসিং-টেবিলের পিছন দিকের অজস্র ময়লা সাফ করতে গিয়ে হঠাৎ অনীতা দেখতে পেল দেরাজের নীচেই একটা পেরেকের সঙ্গে আটকে আছে তার অনেক সাধের কর্ণভূষণের একটি। অন্যটিরও একখানি চিকচিকে অংশ দেখা যাচ্ছে। ড্রেসিং-টেবিলের নীচে থেকে। এত নীচু টেবিলটা যে, ওর তলা থেকে কিছু বার করা শক্ত। অনেক কষ্টে যখন বের হোল দুটো তখন তেকোচুরে চিঁড়েচ্যাপটা হয়ে গেছে।

অবাক হয়ে ওরা দু'জনে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল।

এ ফুল দুটো আর কোনদিনই অনীতার কাজে লাগবে না,—ভাবল অনীতা,—আর তখনি মনে পড়ল, কাল থেকে সব কাজ তাকে নিজেই করতে হবে,—তবু বোধহয় পরো শান্তি পেল না সে,—পেল কী?

॥ সোনার ডাকটিকিট ॥

প্রথম ডাকটিকিটের একশত পঞ্চবিংশতি বার্ষিক উপলক্ষে পশ্চিম জার্মানীর ব্যাভেরিয়ার টাঁকশালে সোনার ডাকটিকিট ছাপানো হচ্ছে। খুব শীঘ্রই আইসল্যাণ্ড, আইওনিয়ান দ্বীপ, রাশিয়া, মোনাকো, ফিনল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, লুক্সেমবুর্গ ও গ্রীসের ৩০০০ করে সোনার ডাকটিকিট বাজারে বেরুবে। তারপর ছাপা হবে বেলজিয়াম ও ফ্রান্সের সোনার ডাকটিকিট প্রত্যেকটি দশ হাজার হিসেবে। এইসব সোনার ডাকটিকিট তৈরী হবে ৮ গ্রাম ও ১৬ গ্রাম ওজনে। প্রথমটির দাম পড়বে ৭০ মার্ক ও দ্বিতীয়টি কিনতে লাগবে ১৪০ মার্ক।

জসীম উদ্‌দীন

বেচারা আনন্দকে বারবার মনে পড়ে। সেই মলিন মুখখানি কিছুতেই ভুলিতে পারি না।

সেটা বোধহয় ১৯২৩ কিম্বা ২৪ সন হইবে। চৈত্রমাস। আমি ফরিদপুরের সহর হইয়া কলেজে যাইতেছি। কোথা হইতে যেন কে সুমধুর বাঁশী বাজাইতেছে শুনিতে পাইলাম। যেখান হইতে বাঁশী বাজিতেছিল বাঁশীর সুর যেন আমাকে মন্ত্রমুগ্ধের মত সেইদিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছিল।

যাইয়া দেখিলাম, ২২।২৩ বৎসর বয়স্ক একটি লোক বাঁশী বাজাইতেছে। আর একটি সুদর্শন ছেলে মেয়ের পোষাক পরিয়া সেই বাঁশীর তালে তালে নাচিতেছে। চারিদিকে লোকজন ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বাঁশীবাদকের বাঁশীটিকে একখানা সুদীর্ঘ লাঠিও বলা যাইতে পারে। পাঁচ-ছয় হাত লম্বা চিকণ বাঁশ। তাহার গোড়ায় কয়েকটি ছিদ্র। বাঁশীবাদক সেই ছিদ্রগুলির মধ্যে মুখের বাতাস পুরিয়া অপূর্ব সুরলহরী বিস্তার করিতেছে। বুঝিতে পারিলাম, বাঁশীবাদক জাতে নমশুদ্র। পূর্ব-পাকিস্তানের বীর সম্প্রদায়। প্রয়োজন হইলে বাঁশের বাঁশীটিকে বংশদণ্ড করিয়া লইতে তাহার অসুবিধা হয় না।

বাঁশীর সুরে সুরে সেই সুদর্শন বালকটি ঘুরিয়া ঘুরিয়া নাচিতেছিল। আর মাঝে মাঝে নৃত্য থামাইয়া চৈত্রপূজার অষ্টগান গাহিতেছিল।

"ও সুখ বসন্তকালে
ডালে বসে কালো কোকিল তুমি
ডেকো নারে আর।"

সেই গান, নৃত্য আর বাঁশীর সুর সমস্ত মিলিয়া যে অপূর্ব মাদকতা সৃষ্টি করিতেছিল তাহার মোহে চারিপাশের শ্রোতারা কাষ্ঠপুত্তলির মত দাঁড়াইয়াছিল। সামনের দোকানদারেরা দাঁড়িপাল্লা হাতে লইয়া চাল-ডাল-নুন মাপিতে ভুলিয়া গিয়াছে। সামনে খরিদ্দার দাঁড়াইয়া আছে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও নাই।

আমারও কলেজের বেলা চলিয়া যাইতেছে। অনেকক্ষণ গান গাহিয়া তাহারা গোয়াল চামটের পুল পার হইয়া একটি বাড়িতে ঢুকিয়া পূর্ববৎ গান ও নৃত্য আরম্ভ করিল। আমি তাহাদের পিছে পিছে, পার্শ্ববর্তী, এবাড়ি ওবাড়ি হইতে মেয়েরা আসিয়া জড় হইল। কারো কপালভরা সিন্দুর। পরনে সিন্দুরেরই মত লাল-পাড় শাড়ী। কারো কপালে সিন্দুর নাই। চোখ দু'টি কৌতুকভরা। গান শুনিতে শুনিতে পার্শ্ববর্তী সখীর গায়ে ঠেলা মারিতেছে। সখীটি মৃদু হাসিয়া তাহার উত্তর দিতেছে।

এইভাবে দুই-তিন বাড়ি ঘুরিয়া তাহাদের গান শুনিলাম। সেই সুদর্শন ছেলেটির নৃত্য এবং গান, ঢোল ও কাঁসি সংযোগে দোহারদের সমবেত সুর, সমস্ত ছাপাইয়া বংশীয়ালের বাঁশীটিই আমাকে বেশী মুগ্ধ করিল। আমি আমার খাতায় তাহার নাম টুকিয়া রাখিলাম। আনন্দমোহন বিশ্বাস, গ্রাম—বাউতিপাড়া, চৌমুখার কাছে।

তারপর কয়েক মাস কাটিয়া গেল। বর্ষার পানিতে সমস্ত মাঠঘাট ভাসিয়া গিয়াছে। আনন্দমোহনের সেই মধুর বাঁশীর স্বর আমি কিছুতেই ভুলিতে পারি না। আরও ত' কতজনের মুখে বাঁশী বাজান শুনি। রাত্রিবেলায় ক্ষেত পাহারা দিতে টঙ্গে বসিয়া কৃষকেরা বাঁশী বাজায়। ভাল লাগে শুনিতে; কিন্তু আনন্দমোহনের বাঁশীতে কি যে মোহ ভরিয়া আছে, আবার তাহা না শুনিলে আমার যেন উপায় নাই।

অনেক কষ্টে একটি টাকা সংগ্রহ করিলাম। আমাদের গোবিন্দপুর হইতে পাটের নায়ের বেপারীরা ভাঙ্গা যায় পাট বেচিতে। তাহাদেরই এক নৌকোয় করিয়া একদিন রওযানা হইলাম আনন্দমোহনের দেশে। বাউতিপাড়ার কাছেই চৌমুখা গ্রাম। সেখানে আমাদের এক দূর-সম্পর্কের আত্মীয় আছেন। সন্ধ্যাবেলায় যাইয়া তাঁহার বাড়ি উঠিলাম। পথঘাট পানিতে টলমল। এবাড়ি হইতে ওবাড়ি যাইতে নৌকা লাগে। বহু চেষ্টা করিয়াও নৌকা যোগাড় করিতে পারিলাম না। সারারাত্র আমি আনন্দমোহনের বাঁশীর কথা চিন্তা করিলাম।

পরদিন দুপুরবেলায় অনেক কষ্টে নৌকা মিলিল। একজন কৃষক আট আনার বিনিময়ে আমাকে বাউতিপাড়া লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইল। তাহার নৌকায় চড়িয়া ধানক্ষেতের আল দিয়া পাট ক্ষেতের পাশ দিয়া অনেক নাওদাঁড়া ঘুরিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। এ দেশের বর্ষার পানি আমাদের পদ্মানদীর দেশের মত ঘোলা নয়, আয়নার মত পরিষ্কার। তাহার ভিতর দিয়া জলতলের শ্যাওলা শামুকের ঐশ্বর্যপূর্ণ দুনিয়াখানি স্পষ্ট দেখা যায়। কত রকমের শ্যাওলা ঘাস কি সুন্দর সুন্দর কুটির-বাড়ি গড়িয়া রাখিয়াছে অগভীর জলতলে। তারই পাশ দিয়া ছোটবড় মাছগুলি ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মাঝে মাঝে সেই শ্যাওলার একটু অংশ মুখে পুরিয়া গোগলা ছাড়িয়া উপরের পানিতে নক্সা আঁকিতেছে। চইড়ের আঘাতে আমাদের ক্ষুদ্র নৌকাখানি যখন কলকল করিয়া চলিতেছিল তখন সেই জলতলের শ্যাওলা ঘাসগুলি কাঁপিয়া উঠিতে

ছিল। মাছগুলি ভয়ে পলাইয়া যাইতেছিল—এইসব দেখিতে দেখিতে বাউতিপাড়া আনন্দমোহনের বাড়ি আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আনন্দমোহনের বৃদ্ধ পিতা এখানকার বর্দ্ধিষ্ণু কৃষক। কত আদরের সঙ্গেই আমাকে গ্রহণ করিলেন। আমি এতদূরের পথ হইতে তার ছেলের বাঁশী বাজান শুনিতে আসিয়াছি জানিয়া তিনি আরও খুশী হইলেন। আনন্দ বাড়ি ছিল না। মাঠ হইতে তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন। সে আসিয়া আমাকে পায়ের ধূলি লইয়া প্রণাম করিল।

আমি বলিলাম, "আনন্দ, সেই কবে চৈত্রপূজার সময় তোমার বাঁশী শুনিয়াছি, কিন্তু সেই সুর এখনও কানে লাগিয়া আছে। তোমার বাঁশীটি লইয়া আমার নৌকায় ওঠ; মাঝ-মাঠে যাইয়া তোমার বাঁশী বাজান শুনিব।"

আনন্দের পিতা বলিলেন, "বাঁশী শুনিবেন সে ত' বড় খুশীর কথা, কিন্তু তার আগে সামান্য কিছু জলসেবা করিয়া লইতে হইবে।"

অনেক ওজর-আপত্তি করিলাম কিন্তু বৃদ্ধ বারবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন, "মহাভাগ্যে যদি গরীবের বাড়িতে পায়ের ধূলা দিয়াছেন, সামান্য জলসেবা না করিয়া যাইতে পারিবেন না।"

সুতরাং আমাকে জলসেবার জন্য আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইল।

বাড়ির একটি বউ আসিয়া শঙ্খের কাঁকণ পরা হাতে বারেন্দার একটি কোণ অতি পরিপাটি করিয়া লেপিয়া দিল। আর একটি বউ আসিয়া একখানা বড় পিঁড়ি সেখানে আনিয়া স্থাপন করিল; আনন্দের পিতা হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "কর্তা! আসন গ্রহণ করেন।'

আমি যাইয়া সেই আসনে উপবেশন করিলাম। এমন সময় আর একটি বউ মুড়ি, গুড়ে পাক দেওয়া খই, নারকেলের লাড়ু, কিছু গুড় আর চিঁড়া একটি বৃহৎ থালায় সাজাইয়া আনিয়া আমার সামনে রাখিয়া মাটিতে কপাল ছোঁয়াইয়া আমাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল। ঈষৎ ঘোমটার ফাঁকে তাহার কল্যাণ মূর্তিটি ক্ষণেকের জন্য দৃষ্টিগোচর হইয়া মিলাইয়া গেল। সামনে খাদ্যসামগ্রীভরা থালাখানার দিকে চাইয়া মনে হইল, আহার একটি নিতান্ত গদ্যাত্মক ব্যাপার কিন্তু এই অশিক্ষিত নমশুদ্র গৃহে ইহা একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মত হইয়া অপূর্ব শিল্প-নৈপুণ্যে পরিণত হইয়াছে। থালার উপরে খই-মোয়া-লাড়ুগুলি এমন সুনিপুণ করিয়া সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা যেন আমার সামনে কোন সুদক্ষ শিল্পীর আঁকা ছবির মত মনে হইতেছিল। আমি থালাখানার দিকে চাহিয়া মুগ্ধ হইয়া দেখিতেছি এমন সময় আনন্দের পিতা হাতজোড় করিয়া বলিলেন, "কর্তা! এবার সেবা করুন।"

খাইতে খাইতে আনন্দের মা আসিয়া পাথরের বাটিতে সদ্য আওটা কিছু দুধ আনিয়া আমার পাতে ঢালিয়া দিলেন। আহার সমাধা করিতে বেলা পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়িল। আমি তাড়াতাড়ি আনন্দকে নৌকায় লইয়া মাঠের মধ্যখানে আসিলাম। অদূরের গ্রাম্য ঝোপ হইতে ডাহুক ডাকিতেছে। ধানক্ষেতের এপাশে কোড়া ওপাশে কুড়ি একে অপরকে কত মধুর করিয়াই যে ডাকিতেছে। মাঝে মাঝে বকের ঝাঁক উড়িয়া আসিয়া সবুজ ধান-পাতার উপরে পড়িতেছে। সবুজ ক্যানভাসের উপর সাদার আলিপনা!

আনন্দ তাহার বাঁশীটি লইয়া বাজাইতে লাগিল। আজ আর সে অষ্টগানের সুর বাজাইল না। সে সুর বাজাইতে হয় চৈত্রপূজার সময়। পরিবেশের সঙ্গে মিলাইয়া ত' সুর বাজাইতে হইবে। বর্ষা চিরকাল বিরহের সুর লইয়া আসে। তাই বর্ষাকালে বিলম্বিত লয়ের বারমাসী সুর—রাখালী সুর। আনন্দ বাজাইতে লাগিল—

ও স্বরূপ তুই বিনে দুখ বলব
কার কাছে রে
তুই ছাড়া মোর বান্ধব কে
আর আছে রে;
—প্রাণের স্বরূপ রে।

ও স্বরূপ রে - - - - - - - - - - -
তুই যে আমার বান্ধব ছিলি,
ঘুমের ঘোরে পালাইলি রে,
(আমি) জাগিয়া না দেখলাম চন্দ্রমুখ রে,
—প্রাণের স্বরূপ রে। - - - -

ও স্বরূপ রে - - - - - - - - - - -
আশা করে বাঁধলাম বাসা,
না পুরাইল মনের আশা রে;
(আমার) আশা বৃক্ষের ডাল
ভাঙ্গিয়া গেল রে
—প্রাণের স্বরূপ রে - - - -

এই কথাগুলি কোন্ সময়ে কে রচনা করিয়াছিল জানি না। কিন্তু আনন্দের বাঁশীর সুরে সেই কথাগুলি যেন তাহারই মর্মতল হইতে বাহির হইয়া আকাশে-বাতাসে ছড়াইয়া পড়িতেছিল। হয়ত এজন্যই রাখালী গান রচনায় কোন গ্রাম্যকবি ভণিতা জুড়িয়া দেয় নাই। কারণ এ গান যে গায়, গান যে তাহারই।

'ও স্বরূপ রে - - - - -' এই কথাটি যখন আনন্দ বাঁশীতে পুরিয়া বাজাইতেছিল তখন আনন্দের অন্তর হইতে কোন যুগ-যুগান্তরের বিরহ-কান্দন যেন অনন্ত শূন্যের পথে গুমরিয়া গুমরিয়া ফিরিতেছিল। চারিদিকের নীরব প্রকৃতি স্তব্ধ হইয়া তাহার বাঁশী বাজান শুনিতেছিল। এই গান শেষ করিয়া আনন্দ আরও একটি রাখালী সুর বাজাইল। সে গানের পদ আমার জানা ছিল না। তাই, সেই সুর আমাকে আরও মুগ্ধ করিল, খুব ভাল সুরের গান যখন আমরা সুকণ্ঠ গায়কের মুখে শুনি তখন কি কথাগুলি একবারও আমাদের মনে হয়? সুর তখন কথা ছাড়াইয়া এক অতিন্দ্রিয় জগতে আমাদিগকে লইয়া যায়। আনন্দের বাঁশী শুনিতে শুনিতে আমার মন যেন কোন অজানা দেশে চলিয়া গেল। মনে হইল, এই বাঁশীর সুর যেন কোনদিন শেষ হয় না। অনন্তকাল বসিয়া বসিয়া আমার যত না-পাওয়ার ব্যথা, যত আঁখিজল, যত কামনা-

বাজনা —সব এই বাঁশীর সুরে ভরিয়া আকাশে-বাতাসে ছড়াইয়া দিতে থাকি।

নৌকার মাঝি বলিল, "কর্তা! রাইত অয়া যাইত্যাছে। আন্দারে নাও-দাঁড়া দেখা যাবি না। এহন চলেন।"

সুতরাং আনন্দকে তাহার বাড়িতে রাখিয়া আমার সেই আত্মীয়ের বাড়ি চৌমুখা চলিয়া আসিলাম। বিদায়ের সময় সেই সুদর্শন ছেলেটি, সেবার যে আনন্দের বাঁশী বাজানর সঙ্গে নৃত্যগীত প্রদর্শন করিয়াছিল তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম।

আনন্দ বলিল, "সে যাত্রাগান গাহিতে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। আবার যখন আসিবেন তাহার সঙ্গে দেখা হইবে।"

ইহার কয়েক বছর পরে আমি তখন আই-এ ক্লাসে পড়ি। স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেনের চেষ্টায় আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ হইতে মাসে ৭০৲ টাকা বেতনে গ্রাম্য-গান সংগ্রহের ভার পাইয়াছি। সেবার ভাঙ্গা হইতে নৌকা করিয়া আনন্দের বাড়ি চৌমুখা বলিয়া রওয়ানা হইলাম। যাত্রা করিবার সময় বৃদ্ধ মাঝি বলিল, সন্ধ্যার আগেই চৌমুখা যাইয়া পৌঁছিতে পারিব। কিন্তু অর্ধেক পথ আসিতেই সন্ধ্যা হইয়া গেল। অন্ধকারে কোন্ নাওদাড়া দিয়া আনন্দের বাড়ি পৌঁছিতে হইবে বৃদ্ধ মাঝি তাহা ঠিক করিতে পারিল না। অনেকক্ষণ নৌকা বাহিয়া মাঝি বলিল, "কর্তা, আইজ আর নৌকা বাইতে পারব না। এইখানে পাড়া গাড়ি।"

একে ত' নৌকায় পানি ওঠে, ঘনঘন সেচিতে হয়, তার উপর রাত্রে যদি বৃষ্টি আসে তখন ভিজিয়া মরিতে হইবে। মাঝিকে বলিলাম, "নিকটে যদি কোন বর্ধিষ্ণু গ্রাম থাকে সেখানে আমাকে লইয়া চল।"

মাঝি বলিল, "সামনে কাইচালের জমিদার বাড়ি দেখা যায়। আপনারে সেহানে রাইখা আসি।"

মাঝির কথামত আমি কাইচালের জমিদার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। জমিদার বাড়ি দুর্গাপূজা হইবে। সেই পূজা উপলক্ষে যাত্রা গানের মহড়া চলিতেছিল, জমিদারের যুবক ছেলে ইহার তদারক করিতেছিলেন। সেখানে যাইয়া সেই সুদর্শন ছেলেটিকে দেখিতে পাইলাম। ইতিপূর্বে আনন্দের সঙ্গে সে অষ্টগানের সখী সাজিয়া ফরিদপুরে গান ও নৃত্য প্রদর্শন করিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া সে হাসিয়া নিকটে আসিল। উপস্থিত সকলের সঙ্গে আমার পরিচয় করাইয়া দিল। দেখিলাম, অল্পদিনের ব্যবধানে তাহার চেহারটি আরও সুন্দর হইয়াছে। উজ্জ্বল শ্যাম-বর্ণের গায়ের রঙ। মুখখানি লম্বাটে। বড়ই মমতামাখান। এদেশের কচি ধান-পাতার সকল সুষমা যেন তার গায়ে মাখা।

সে বলিল, "সেবার আপনি আমাদের গাঁয়ে আসিয়াছিলেন। আমি ছিলাম না। কার্তিক মাসে আবার আসিবেন। আপনাকে প্রাণ ভরিয়া গান শুনাইব।"

আমি বলিলাম, "এবার ত' তোমাদের গাঁয়ে চলিয়াছি। কাল যাইবে আমার সঙ্গে? সেখানে বসিয়া বসিয়া তোমার গান শুনিব।"

ছেলেটি বলিল, "তা' কেমন করিয়া হয়? পূজার শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখান হইতে আমার নড়িবার উপায় নাই। আপনি অবশ্য তিন-চার মাস পরে আমাদের গ্রামে আসিবেন।"

আমার পরিচয় পাইয়া জমিদার পুত্র আমাকে বেশ খাতির-যত্ন করিয়া ফলার খাওয়াইলেন। তারপর রাত বারটা পর্যন্ত গানের মহড়া চলিল।

শুইবার সময় দেখিলাম, সেই সুদর্শন ছেলেটি জমিদার পুত্রের সঙ্গে অন্দরমহলে প্রবেশ করিল। আর আর পাত্র-পাত্রীরা এখানে সেখানে শয়ন করিল। কোন কোন ঈর্ষাতুর বালক সেই সুদর্শন ছেলেটির প্রতি দু'একটা বাঁকা কথা নিক্ষেপ করিয়া পরস্পর তৃপ্তিলাভ করিতেছিল।

আমি আমার বিছানাটি একপা[illegible] মেলন করিয়া গভীর নিদ্রায় নি[illegible] হইলাম। পরদিন সকালে উঠি[illegible] আনন্দের বাড়ি রওয়ানা হইলাম।

সেবার আশ্বিন মাসে পূজার স[illegible] আলিপুরের রাধাকান্ত ঘোষের বাড়ি গা[illegible] দল আসিয়াছে। আমার বড়ভাই [illegible] গান শুনিয়া আসিয়া বলিলেন, "যা[illegible] গানের দলে এমন একজন দোতার বা[illegible] আসিয়াছে তার মত বাজনা কোথাও [illegible] নাই। কাল তোমার সঙ্গে দেখা করি[illegible] আমাদের বাড়ি আসিবে।"

পরদিন সকালে আনন্দ সেই দোতা[illegible] বাদককে সঙ্গে করিয়া আমাদের [illegible] আসিল। আনন্দ সেই গানের দলে আসি[illegible] তাহা আমি জানিতাম না। আ[illegible] দেখিয়াই তাহাদের গ্রামের সমস্ত পরি[illegible] কথা মনে পড়িল। সকলের কুশল [illegible] দিয়া আনন্দ বলিল, "আমার অষ্টগা[illegible] দলে আপনি যে-ছেলেটির গা[illegible] শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন সে আত্মহত্[illegible] করিয়াছে।"

শুনিয়া মনে বড়ই ব্যথা পাইলাম। সে[illegible] সুদর্শন বালকটি, আনন্দের বাঁশীর সু[illegible] যে গান গাহিয়া আর নৃত্য করিয়া[illegible] সমস্ত সহর পাগল করিয়া তুলি[illegible] ছিল। কাইচালের জমিদারবাবুর যাত্রা গানের দলে সে হয়ত রাজপুত্র সাজিয়া অথবা কৃষ্ণ সাজিয়া শত শত শ্রোতার ম[illegible] মুগ্ধ করিয়া বেড়াইত। আহা, এম[illegible] গুণী ছেলেটি মরিয়া গিয়াছে। আন[illegible] আরও বলিল, "সে মরিয়া গিয়া আমা[illegible] অষ্টগানের দলটি কানা করিয়া গিয়াছে[illegible] যেখানেই গান করিতে যাই, সকলে[illegible] তার কথা জিজ্ঞাসা করে।"

আমি প্রশ্ন করিলাম, "বল ত' আনন্দ সেই ছেলেটি কি হইয়া মারা গেল?"

আনন্দ বলিল, "সে কথা আর কি বলিব। আপনি ত' তাকে জমিদারবাড়ি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। জমিদারের ছেলে ওর প্রতি মত্ত ছিলেন। তারপর তিনি যখন অপর একটি সুন্দর ছেলে লইয়া ঘোরা-ফেরা করিতে আরম্ভ করিলেন

ছকে আর কেন জিজ্ঞাসা করিতেন না। তখন আর তা' সহ্য করিতে পারিল না। কোথা হইতে আফিম সংগ্রহ করিয়াছিল জানি না। তাহাই খাইয়া জীবন নাশ করিল।

শুনিয়া আকাশ হইতে যেন পড়িয়া গেলাম। পুরুষের ভালবাসায় বিমুখ হইয়া নারী আত্মহত্যা করিয়াছে ইহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, কিন্তু পুরুষের ভালবাসা না পাইয়া যে কোন পুরুষছেলে আত্মহত্যা করে এমন দৃষ্টান্ত বুঝি আর কোথাও নাই। সেই অল্পবয়স্ক ছেলেটি হয়ত তার [illegible] দিয়া জমিদারের ছেলেটিকে [illegible] ভালবাসিয়াছিল।

এ [illegible] কাহিনী সহ্য করা যায় না। [illegible] প্রসঙ্গান্তরে আসিবার জন্য আনন্দের সঙ্গী দোতারাবাদকের দিকে ফিরিয়া চাহিলাম। নাম তার কানাইলাল শীল। আনন্দের মতই পদধূলি লইয়া আমাকে প্রণাম করিল। আমি বলিলাম, "সকলেই তোমার দোতারা বাদ্যের প্রশংসা করিতেছে। আমাকে একদিন শোনাও।"

কানাই বলিল, "আজ রাতে আমাদের বায়না শেষ হইবে। কালসন্ধ্যার পর আপনাকে বাজনা ও গান শুনাইতে পারি।"

কিন্তু কোথায় গানের বৈঠক দিতে পারি? আমার পিতা নিজে গান-বাজনা অপছন্দ করিতেন না, কিন্তু তিনি বাড়িতে গান-বাজনা হওয়া পছন্দ করিতেন না। আলীপুরে উপেন্দ্র সাহার বাড়ী। উপেনদা বড়ই ভদ্রমানুষ। কালীদাসী বৈষ্ণবী উপেনদার বাড়ীতে থাকিয়া ভিক্ষা করিয়া খায়। সেই উপেনদার বাড়ীতেই গানের আসর বসিবে। চাল-ডাল সবই কিনিয়া দিলাম, কালীদাসী বৈষ্ণবী হাসিয়া রান্নাবান্নার ভার লইল।

রাত আটটার সময় উপেনদার বারেন্দায় গানের আসর বসিল। কানাইয়ের হাতে দোতারা। আনন্দের হাতে খোমক আর হরির হাতে জুড়ি। প্রথমে একটি 'কনসার্ট' বাজাইয়া গান আরম্ভ হইল। সকল গানই কানাই আগে ধরে। হরি, আনন্দ আরও একজন দোয়াকি করে। গানের উপরে গান চলিতে থাকে, মাঝে মাঝে গান থামাইয়া দোতারার বাজনা। প্রাণহীন কাঠের দোতারা আজ যেন কানাইয়ের হাতে জীবন পাইয়া সহস্র স্বরে কথা বলিয়া উঠিতেছে। সে কথা কিছু বুঝা যায়, কিছু বুঝা যায় না। যে বন হইতে কাঠ আনিয়া এই দোতারা বানান হইয়াছিল এ যেন সেই বনেরই ভাষা। শুনিয়া স্থির থাকিবার ক্ষমতা বুঝি আকাশ-ধরণী কাহারও নাই। কানাই ডান হাতে টোকা দিয়া বাম হাতে দোতারার তারটিকে একটু ঘসিয়া দিয়া যে অপূর্ব সুর বাহির করে তাহার তুলনা কোথাও নাই।

কানাই গাহিতেছে বিচ্ছেদ গান। সেই অনন্তকালের রাধা, কৃষ্ণের জন্য ঝুরিয়া ঝুরিয়া সে কাঁদিয়াছিল সেই কান্না ধরিয়া রাখিয়াছিল পল্লীকবি তার কথার খাঁচায় পুরিয়া। সেই কথায় আজ সুরের পাখা বিস্তার করিয়া কানাই আর শ্রোতাদের কোন্ দেশ হইতে কোন্ দেশে লইয়া যাইবে কে জানে। বিলম্বিত লয়ের সুর কেবলি ঘুরিয়া ঘুরিয়া কাঁদে। কানাই গান ধরিল—

"আমার মন যেন আজ কেমন করে
না দেখলে তারে।
তারে না দেখিয়া আমি ছিলাম ভাল,
দেখেই জনম কানতে গেল। - - -

এ কান্না কি সে কোনদিন আসিয়া শুনিবে? কানাই আবার গান ধরিল—

"আমি সাধে কি ভুইলছি সেই রূপ দেখে
এমন সতী নাই এ ব্রজগো মাঝে
ওই রূপ দেখে ঘরে থাকে।
ওগো সজনী।
উরু বাঁকা ভুরু বাঁকা
ও তার চাহনী চঞ্চল বাঁকা গো,
মুখে মৃদু হাসিরে ও তার মুখে মৃদু হাসি।
ওগো সজনী।
যখন আমি নিদ্রাবশে
বন্ধু আমার শিয়রে বসে গো
আমি ঘুমের ঘোরে চমকে চমকে
উঠি রে।

গান শুনিতে শুনিতে চোখের সামনে ভাসে, কোন কাঁচা হলদের বর্ণ মেয়েটি, চাহনী চঞ্চল বাঁকা। কোন সুন্দরীর স্বপ্ন দেখিয়া ঘুমের ঘোরে চমকে চমকে উঠিতেছে।

কানাই আবার গান ধরিল,—
"আমার প্রাণ যারে চায়
সে বা কোথায় গো সখি
পাইনা গো তারে।"

সেই অনন্তকাল হইতেই ত' মানুষের মনে কান্না, যাকে ভাল লাগে তাকে পাই না। গান শুনিতে শুনিতে কোন্ সাত সাগরের কান্নায় আমার বুক ভাসিয়া যায়। কোথা দিয়া যে রাত ভোর হইয়া গেল টেরও পাইলাম না।

সকালে মুখ-হাত ধুইয়া কানাইয়ের পরিচয় লইলাম। ফরিদপুর হইতে পনেরো মাইল দূরে কড়িয়াল গ্রামের অধিবাসী কানাই, জাতব্যবসা করিয়া যাহা উপার্জন করে তাহাতে পেটের খোরাকই জোটে না। বাড়িতে একখানা মাত্র টিনের একচালা ঘর। আমি কানাইকে বলিলাম, "আমি তোমাকে কলিকাতা লইয়া গিয়া তোমার বাজনা রেকর্ড করাইব। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছি, অল্পদিনেই তোমার একচালা টিনের ছাপড়া ঘরখানি আট-চালা ঘরে পরিণত হইবে।" [ক্রমশ।

● শিয়ালকোট রণাঙ্গনের একটি অগ্রবর্তী অঞ্চলে ক্ষতিগ্রস্ত পাকিস্তানী প্যাটন ট্যাঙ্কের উপর দাঁড়িয়ে আছেন জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যপাল ডঃ করণ সিং

চিত্রে সংবাদ ★

● নয়াদিল্লীতে রাশিয়া কর্তৃক ভারতকে ১০০০ কিলোওয়াট মিডিয়াম ওয়েভ ট্রান্সমিটার সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছেন সোভিয়েট দূতাবাসের ডেপুটি কাউন্সিলর শ্রীপ্যাভেল এস ব্যাসোলভ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত শ্রীবেনেডিকটভ, ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারিবৃন্দ

পার্ক সার্কাস ময়দানে নেহরু মণ্ডপের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন শ্রীঅতুল্য ঘোষ। মেয়র ডাঃ শ্রীপ্রীতিকুমার রায়চৌধুরী এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত রয়েছেন

চিত্রতারকা শ্রীমতী অচলা সচদেব ও শ্রীমতী সাধনাকে অভ্যর্থনা জানাচ্ছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীওয়াই, বি, চ্যবন। ভারতীয় বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ এয়ার মার্শাল অর্জুন সিং চিত্রে পরিদৃশ্যমান।

● নয়াদিল্লীতে সোভিয়েত সাহায্যে রুশবিদ্যা ইনস্টিটিউট স্থাপন সম্বন্ধে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা
ভারতের শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা ও সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত শ্রীবেনেডিকটভ

● স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মজয়ন্তী দিবসে উৎসর্গীকৃত চন্দ্রপুরা তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র
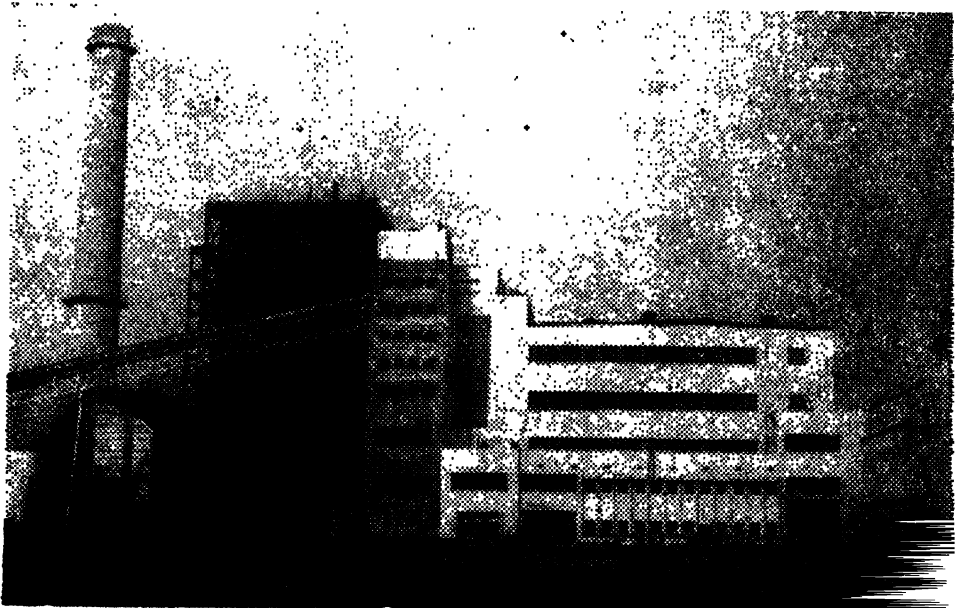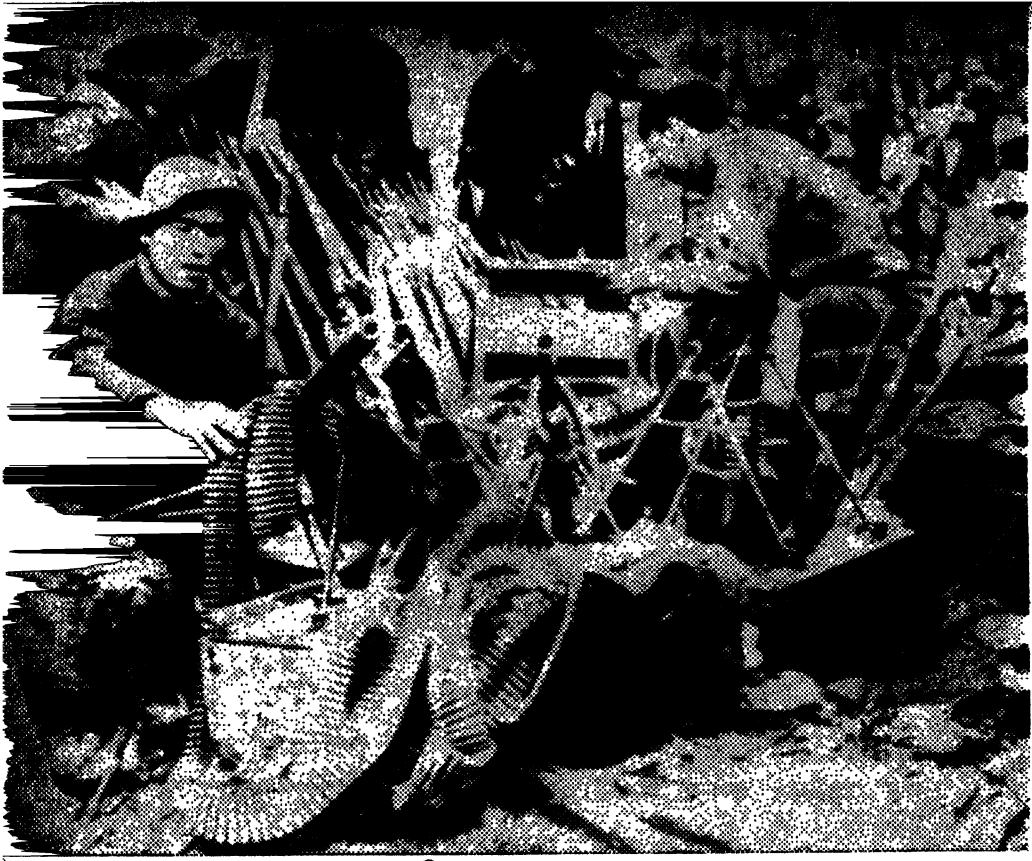
● দক্ষিণ ভিয়েতনামের কোন এক জায়গায় ভিয়েতকংদের কাছ থেকে যেসব অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা হয় তার একাংশ সাজিয়ে রাখা হচ্ছে

● সিকিমের অগ্রবর্তী অঞ্চলে গুলী ছোঁড়ার মহড়ায় রত ভারতীয় জওয়ানবৃন্দ

একটি জীবন—এক সার্থক নিবেদন

১৮৯৫ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসের এক রবিবারের বিকেলবেলার ঘটনা। লণ্ডনের পশ্চিমপ্রান্তে জনৈক নাগরিকের বৈঠকখানায় এসেছে এক আইরিশ কুমারী। তাঁর বয়স উনত্রিশ বছর। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন আরও পনেরো-ষোলজন সমবয়সী।

দারুণ শীত। পথে চলা যায় না। তবু তারা এসে ভিড় করেছেন কেন? এক ভারতীয় সন্ন্যাসীর দর্শনের আশায়, সন্ন্যাসীর বাণী শোনার জন্য। এই সন্ন্যাসী আমেরিকায় বিস্ময়ের সঞ্চার করে এসেছেন—তাঁর মানবপ্রেমের প্রকাশে পৃথিবীতে যেন নূতন যুগের সূচনা হয়েছে। সন্ন্যাসীর বয়স একত্রিশ বছর। চেহারা দেখে মনে হয়, তার চেয়েও কম। মুখের দিকে তাকালে ফোটা পদ্মফুলের কথা মনে পড়ে। বিশাল কপালের নীচে আকর্ণবিস্তৃত চোখ দেখে মনে হয় যেন এইমাত্র তাঁর ধ্যান ভাঙলো।

কুমারী মার্গারেট অপলকনেত্রে দেখে এই সন্ন্যাসীকে। তাঁকে দেখে দেখে আরেকখানি শুচিসুন্দর মুখ মনে পড়ে তার—সে মুখ শিশু যীশুর। সেই মুখেও এমনই এক অপূর্ব স্বর্গীয় জ্যোতি। র‍্যাফেলের আঁকা যীশুর ছবি—ছবি নয়, এক প্রাণবন্ত দেবমানব।

সন্ন্যাসীর দিকে চোখ রেখে সে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলো। হঠাৎ যেন খেয়াল হল তাঁদের দু'জনের চারপাশে অনেক লোক ঘিরে আছে। কিন্তু কেন? কেন এই ভিড়? যিনি বসে আছেন তার সম্মুখে, তাঁর সঙ্গে যেন এই লোকসমাগমের কোনো যোগ নেই।

সন্ন্যাসীর তপস্যার উত্তাপ এসে লাগল কুমারীর দেহে। মর্মভেদ করে চৈতন্যলোকে গিয়ে পৌঁছল ধর্মের আলোক। এক অদ্ভুত অবস্থায় পড়ল কুমারী মার্গারেট। এমন একটি অস্বাভাবিক মুহূর্তের আকাঙক্ষা যেন যুগযুগান্তর ধরে সে করে এসেছে।

সন্ন্যাসীর কথামৃত সকলেই পান করে তৃপ্তিভরে।

কুমারীর হৃদয় স্পর্শ করে এক দিব্য অনুভূতি।

মানুষের সভ্যতা, ধর্ম, নিরবচ্ছিন্ন ঐক্য,—সমস্ত নিয়ে কথা বলে চলছেন সন্ন্যাসী।

কুমারী যেন কোন্ সুরলোকে বসে সঙ্গীতসুধা পান করছে।

দেবভাষা সংস্কৃত—সন্ন্যাসীর বিশুদ্ধ উচ্চারণে পরিণত হয়েছে স্বর্গীয় অমৃতে। যত কানে এসে পৌঁছয়, ততই আরও শুনতে ইচ্ছে করে।

রমা দেবী

(শান্তিনিকেতন)

কুমারী অভিভূত হয়ে ভাবে—সন্ন্যাসী কি স্বপ্ন? এ কি একটি মানুষ মাত্র; না-কি একটি সম্পূর্ণ পৃথিবী?

সভা শেষ হতে চলল। অনেক কথার পর কিছুক্ষণের নীরবতা। সন্ন্যাসী সেই নীরবতা ভঙ্গ করে শুধান সকলকে: "কারও কি কিছু জানবার বাকি আছে আর?"

জানতে চায় তারা প্রাচীন ভারতবর্ষের কত কথাই। পুরোহিতের শাসন, জাতিভেদের কঠোরতা, আচার-বিচারে সংস্কারের জটিলতা—সমস্ত তারা কিছু কিছু জানে আর মনে মনে নানা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে ভারতবর্ষের সম্পর্কে, সুবিধে মতন টিটকারি দিতেও ছাড়ে না।

সন্ন্যাসী চমকিত বিদ্যুতের মতো হৃদয়স্পর্শী ভাষায় তাদের ভ্রান্তি নিরসনের চেষ্টা করে বলেন: ভারতকে তোমরা দেখো নি ভালো করে। কাছে তো যাও নি। পরের মুখে ঝাল খেয়েছ। খুঁজে দেখো নি কোথানে এর প্রাণ এর ধর্ম, এর সত্তা। ভারতের ধর্মের মূল তত্ত্বে না আছে পাদ্রী, না আছে পুরোহিত, না আছে মসজিদ, না আছে গীর্জা। স্বর্গ-নরকও নেই সেখানে। আছে শুধু মানুষ আর তার সাধনার বিচিত্র ধারা।

কুমারী বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সন্ন্যাসীর প্রতিটি উক্তি মনের মধ্যে গেঁথে নিতে থাকে।

সভা ভঙ্গ হয় অতঃপর। সন্ন্যাসীকে ধন্যবাদ দিয়ে সকলে যে-যার ঘরে ফিরে যায়। সেই কুমারীও বিদায় নেয় সকলের শেষে ধীর পদক্ষেপে।

বাড়িতে ফিরে এসে কুমারীর মনে পড়ে সন্ন্যাসীর সাধনদৃপ্ত মুখমণ্ডল। আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত যা কিছু বলেছেন সন্ন্যাসী সমস্ত একে একে মনে পড়তে থাকে। বিবেকের শাণিত তরবারি উদ্যত হয়ে ওঠে সন্ন্যাসীর কোনো কোনো বিপ্লবাত্মক ভাষণে। সকল কথা তাঁর—যেন কুমারী এখন আর স্বীকার করে নিতে পারে না। তাই আবার কামনা করে তাঁর সাহচর্য। সন্ন্যাসীকে জানিয়ে দিতে হবে কুমারীর মনের অভিপ্রায়।

আবার সভা বসে। শ্রোতারা এসে জোটে দলে দলে। প্রশ্ন করে সন্ন্যাসীকে। সন্ন্যাসী গুরুগম্ভীর ভাষায় উত্তর দিতে থাকেন।

আগের অভিভূত অবস্থাটা একটু যেন কাটিয়ে উঠতে পেরেছে কুমারী। সন্ন্যাসী এক ভূয়া শান্তির পিছনে ছুটছেন না তো। কুমারী যন্ত্রচালিতের মতো প্রশ্ন করে বসে সন্ন্যাসীকে।

সন্ন্যাসী পূর্ববৎ উত্তর দিয়ে যান। সকলেই কথা বুঝতে পারে; বুঝতে পারে না শুধু এই কুমারী। এলোপাতাড়ি

প্রশ্ন করে করে সন্ন্যাসীকে জব্দ করার জন্য সে উঠে পড়ে লেগেছে এবার। সন্ন্যাসী পরমসহিষ্ণু। একটুও বিচলিত হন না। শান্ত-সংযত সুমধুরকণ্ঠে উত্তর দিয়ে চলেন সকল প্রশ্নের।

সকলেই মাথা নিচু করে সন্ন্যাসীর পাণ্ডিত্যের কাছে।

কুমারী মার্গারেট নিজেকে অত্যন্ত দুর্বল মনে করে এই সন্ন্যাসীর কাছে। এঁকে স্বীকার করতে গেলে নিজের বর্তমান ভেঙে যায়। অথচ এঁকে প্রত্যাখ্যান করার শক্তিও নেই এই কুমারীর।

নোঙরহীন নৌকার মতো এখন এই কুমারীর অবস্থা।

সন্ন্যাসীর সফর শেষ হয়ে এল।

বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে সন্ন্যাসীর অনুরাগীদের সঙ্গে এলেন কুমারী মার্গারেটও।

একটা অবিশ্বাস্য নীরবতা। কত কিছুই বলবার ছিল তাঁকে, কিন্তু বলা হল না কিছুই। মনের মধ্যে এক অদ্ভুত স্পন্দন। চৈতন্যের ভিতে যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্প। সমস্ত ভেঙেচুরে যাচ্ছে। গড়ে উঠছে বুঝি আরেক নূতন জীবন।

হঠাৎ নতজানু হলেন কুমারী। সন্ন্যাসীর পায়ের কাছে রাখলেন মাথা।

হাতজোড় করে বললেন, "প্রণাম তোমায়।"

আবার সন্ন্যাসী আসবেন এই আশা বুকে নিয়ে অনুরাগীরা ফিরল। ফিরলেন কুমারী মার্গারেট।

সন্ন্যাসীর অচঞ্চল মূর্তি চঞ্চল করেছে কুমারীকে। কিছুতেই ভুলতে পারছে না সেই ক্ষণটি—যখন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী প্রথম এসেছিলেন তার দৃষ্টিপথে।

পরে বছরের মাঝামাঝি সময়ে সন্ন্যাসী আবার এলেন লণ্ডনে। আবার বসলো সভা। আবার এসে ভিড় করল অনুরাগীরা। এলো আবার কুমারী মার্গারেট।

এতোদিনের নীরবতা ও অদর্শন অধীর করে তুলেছিল কুমারীকে। তার প্রতিক্রিয়ায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন বর্ষণ হতে লাগলো কুমারীর মুখ থেকে। এক-একটা প্রশ্ন এক-একটা দৈত্যের মতো ভয়ঙ্কর। তেমনই ও-গুলোর উত্তরও যেন এক-একটা শাণিত তরবারি। কেটে-কেটে এতটুকু ক্লান্তি নেই। সন্ন্যাসীর প্রতিভার ধার কি কিছুতে নষ্ট হতে পারে?

স্বজাতির গর্ব বাঁচিয়ে রাখতে গিয়ে হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে কুমারী সন্ন্যাসীকে বললেন। 'ইংরেজরাই তো লণ্ডনকে করেছে এমন সুন্দর সভ্যতার সৌধস্বরূপ।'

সন্ন্যাসী উত্তর দিলেন—"কিন্তু জানো কি যে এই লণ্ডন সহরকে সুন্দর করবার জন্য লণ্ডভণ্ড করেছে কত জাতকে তোমার ইংরেজ? পুড়িয়ে ছাই করেছে কত শহরকে?"

একটা যেন কতকালের বন্ধ দরজা খুলে গেল কুমারীর সম্মুখে। একঝলক তীব্র আলোর ঝাপটা এসে লাগলো দুই চোখে। এতদিন যেন অন্ধকারে পথ হাঁটছিলেন তিনি। নিজেদের সভ্যতার গর্ব ধূলোয় লুটিয়ে পড়লো। বুঝতে পারলেন যে, পশ্চিম যা জেনেছে যা নিয়ে মেতেছে সে-জানাই চূড়ান্ত জানা নয়; সে মত্ততাই মানবকল্যাণকর নয়, এরপরও জানবার আছে—সেই জ্ঞানও নিয়ে এসেছিলেন এই সন্ন্যাসী।

এই ক্ষণটি থেকেই নূতন ভাবনা—সম্পূর্ণ নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে পরম কল্যাণকে খুঁজে নিতে হবে। যেমন দৃষ্টিতে প্রাচীন ভারতকে দেখতে পেয়েছেন এই নবীন সন্ন্যাসী, তেমন দৃষ্টিতেই কুমারী মার্গারেটও দেখতে চান ভারতবর্ষকে—বিশ্বকে। কিন্তু সেই দৃষ্টিদান করবে কে তাঁকে।

পূর্ব-পশ্চিমের ভেদ ঘুচে যায়। এক অপূর্ব সত্যের আলোকে জাগেন জননী ভারতবর্ষ। বিদেশিনী মার্গারেটের জীবনে এক পরম স্মরণীয় ক্ষণ দেখা দেয়।

সন্ন্যাসীর হৃদয় স্পর্শ করে মার্গারেটের মনের আকুলতা। সন্ন্যাসী ধীরে ধীরে এগিয়ে যান মার্গারেটের কাছে। পর পর তিনটি গল্প বলেন—বুদ্ধদেবের, যীশুখৃষ্টের, শ্রীরামকৃষ্ণের আর শ্রীমা সারদামণির। কেমন করে নিজের যৌবনকে ভুলেছিলেন—তাঁর সাধক স্বামীর জীবনকে সার্থক করতে—শ্রীশ্রীমায়ের সেই গল্পও বলেন বিশদভাবে।

গল্প শুনে আরও অভিভূত হলেন মার্গারেট। যেন তাঁর হৃদয়ে পদধ্বনি শুনতে পেলেন গৌতমবুদ্ধের, যীশুখৃষ্টের, শ্রীরামকৃষ্ণের, সারদামণির। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করার আকুল আগ্রহে তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

সন্ন্যাসী বুঝতে পারলেন সমস্ত। অমৃতমাখা সুরেলা গলায় আস্তে আস্তে তাঁর কাছে এসে বললেন—"কন্যা আমার, শান্ত হোক তোমার অশান্ত মন। বিশ্বাসে পূর্ণ হোক তোমার অন্তরে এখনও যা-কিছু অপূর্ণতা।"...

এইক্ষণ থেকে গতি সম্মুখের দিকে। এক বিদেশিনীর জন্মান্তর হল। এক বিপুল ভাববন্যায় ভেসে এলো এক নূতন কন্যা সাতসমুদ্র তেরোনদীর ওপার থেকে। এখন থেকে তাঁর জীবন সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত হল ভারতবর্ষের কাজে। ভারত-আত্মার প্রতিমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের চরণে জীবন উৎসর্গ করে নূতন নাম গ্রহণ করলেন 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের নিবেদিতা।'

এই নিবেদন যে ব্যর্থ হয় নি তার প্রমাণ আছে ভারতবর্ষের নবজাগরণের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা। ভারতমাতার বরেণ্য সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যাঁকে কন্যা বলে শিষ্যা বলে গ্রহণ করেছিলেন, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ কবি ভারতীয় সুসন্তান রবীন্দ্রনাথ তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন 'মাতা'রূপে। প্রথমে যিনি ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, তিনি শেষে হলেন 'লোকমাতা নিবেদিতা।'

এই মহীয়সী সন্ন্যাসিনীর কথা মনে হলেই মনে পড়ে তাঁর একই জন্মে জন্মান্তরের স্মরণীয় ক্ষণটি—যেই ক্ষণে মহাভারতের মহাসঙ্গীত ধ্বনিত হয়ে সকল বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

অবিশ্বাস্য নয়

আরতি দাস

ওগো ও টেঁপী তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আয় না গো, উদিকে যে বাজনা সুরু হয়ে গেল।

টেঁপী অনভ্যস্ত হিল-তোলা জুতোটাকে কোনরকমে আধপরা অবস্থায় টানতে টানতে আর মাথার জরির প্রজাপতি দেওয়া জালটা জড়িয়ে নিয়ে বললে—তাড়াতাড়ি কেন কর বাপু, যাবে তো সাত তাড়াতাড়ি, তারপর হাত-পা ছড়িয়ে পাঁচটা লোকের জায়গা জুড়ে শুয়ে তো ঘুমবে, আর অপরের গালাগালি কুড়োবে? কেনই যে তোমার যাওয়া তাও বুঝি না। টেঁপী খুব বিরক্তি প্রকাশ করে বৃদ্ধা ঠাকুমার ওপর। সাত পরগণার লোক যেখানে জড়ো হবে, সেখানে একটু সাজগোজ করে যাবো—তা এই বুড়ির তাড়ায় হবার জো নেই গা।

রায়নগরের ঠাকুরতলার মাঠে আজ পাঁচ দিন ধরে যাত্রা হচ্ছে। প্রত্যেক বছরই দোলের সময়ে যাত্রা হয়। রায়নগরের রায়বাবুরা বিরাট বড়লোক, কি নেই তাদের? জুটমিল, কাপড়ের কারবার, কারখানা, দোকান, ছাপাখানা, ওষুধের ব্যবসা—আরো যে কি কি ব্যবসা আছে কেউ তার সঠিক হিসাব দিতে পারে না। কর্মযোগী দর্পনারায়ণ রায়ের কীর্তি এই রায়নগর। প্রায় তিরিশ হাজার লোকের বাস।

দোলযাত্রার উৎসব, রাধামাধবের মন্দিরের ধ্বজা হাওয়ায় পত পত করে উড়ছে, আশেপাশের বহু গ্রাম থেকে ছেলেবুড়ো ভিড় করছে প্রায় প্রতিদিন স্রোতের মত। ছোট্ট একটু মেলাও বসেছে, কিন্তু এ-হেন জিনিষ নেই যা পাওয়া যাবে না। প্রত্যেক বছরের মত এ বছরও অনেকগুলি যাত্রা-পার্টিকে বায়না দেওয়া হয়েছে। দোল-উৎসবের সাড়া পড়েছে রায়নগরের রাস্তাঘাটে, গাছে-গাছে, ছেলে-বুড়োর মুখে মুখে। প্লাকার্ড পড়েছে লাইট-পোস্টে, বাড়ীর দেওয়ালে, মিল-কল-কারখানার গেটে।

বাড়ীর গিন্নিরা এ ক'দিন কিভাবে সংসারের সব দিক বজায় রেখে যাত্রা শুনতে যাবে, তারই পরিকল্পনা চলছে চৌধুরী-গিন্নীর বাড়ীর বারান্দায়, দুপুরের মিঠে রোদে পিঠ করে বসে। বাচ্চা ছেলেমেয়েরা তাদের স্কুলের পড়াটা কখন সেরে ফেললে মায়েদের সাথী হতে পারবে, তাই নিয়ে বচসা করছে সঙ্গীদের সাথে। বৌ-ঝিরা স্বামীদের মনোরঞ্জন করে চলেছে জামা-কাপড় জলখাবার ঠিক সময়ে গুছিয়ে রেখে, কারণ স্বামীজীবনেরা বেঁকে বসলেই ওদিকের যাত্রা শোনা মাথায় উঠবে। উৎসবের প্রথম চারদিন কলকাতার সেরা যাত্রা পার্টি, অম্বিকা যাত্রা, কুণ্ডুনাট্ট কোম্পানী, নদের যাত্রা ও শ্রীদুর্গা অপেরা পার্টি যাত্রা করে গেল, জনস্রোত কাঁদিয়ে, হাসিয়ে, নাচিয়ে, তারা প্রচুর প্রশংসা ও মেডেল নিয়ে চলে গেল।

কিন্তু বিপদ ঘটল পঞ্চম দিনে। মহামান্য দর্পনারায়ণ রায়মশায় [illegible] যাত্রাপার্টি দলকে নিয়ে। কোন কারণে তারা খবর পেয়েছে এখানে সাতদিন সাতরাত যাত্রা হবে। অমনি এসে রায়মশাইকে ধরেছে আমাদের একটা দিন দিতে হবে। আমাদের টাকাকড়ি কিছুই চাই না, খালি ড্রেস-ভাড়া দেবেন। রায়মশাইয়ের বাড়ী হাওড়া জেলার কোন এক অখ্যাত গ্রামে, তরুণ বয়সে বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়ে উত্তর-জীবনে প্রতিষ্ঠাবান হয়েছেন, তাই গ্রামের গর্ব তিনি। এ হেন গ্রামের যাত্রা পার্টিকে এককথায় ফেরান সম্ভব হলো না। অনুমতি দিলেন যাত্রা করবার, কিন্তু কি বই হবে?

অধিকারীমশায় বিনয়ে গলে পড়ে দেহটাকে দুলিয়ে নিয়ে হাতজোড় করে বললেন—আজ্ঞে "মেঘনাদ বধ"।

এই সংবাদ গিয়ে পৌঁছল রায়-মশায়ের অন্দরমহলে। রায়গিন্নী তো হেসেই খুন। বলেন হায় কপাল। তোমার দেশের ঐ রতিকান্ত, শ্যামদাস, যতেবালা, মাণিক কাঁড়ার এরা করবে যাত্রা?

রায়মশায় কিন্তু ছেলেমেয়েদের ডেকে খুব পঞ্চমুখে খিলা যাত্রা পার্টি'র" প্রশংসা করলেন। বললেন, দেখবে কি অদ্ভুত সুন্দর যাত্রা করে

ড্রামের আর ড্রেসগুলো সব নূতন কিনে এনেছে। পেশাদার যাত্রা পার্টির মত রং চটা বাজে জিনিস এদের নয়। যাত্রা আরম্ভ হবার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত রায়মশায়কে বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। হাজার হোক মহামান্য রায়বাবুর দেশের পার্টি বলে ইতিমধ্যে চারিদিকে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেছে। এই ক'দিনের যাত্রার দর্শকের তুলনায় আজ তার দ্বিগুণ লোক হয়েছে, তা প্রায় হাজার চার লোক হবে।

সন্ধ্যা আটটায় যাত্রা আরম্ভ কিন্তু বিকাল পাঁচটা থেকে লোকের আনাগোনা সুরু হয়েছে। বিরাট বড় আসর। কর্মকর্তারা লোক বসাতে ব্যস্ত। শ্রেণী বিভাগ করে জনসাধারণের বসবার জায়গা হয়েছে। আসরের ঠিক মাঝখানে একটু উঁচু করে পাটাতন করা হয়েছে, তার চারি পাশে যাত্রা পার্টির বাজনদার, প্রম্পটার, অধিকারী মশাইদের বসবার স্থান নির্দিষ্ট এর পর ছোট ছোট বালকদের, তারপর দড়ি দিয়ে ঘেরা, সাদা চাদর বিছিয়ে ব্যবস্থা হয়েছে রায়নগরের মালিকের বাড়ীর পুরনারীদের। তার পিছনে অফিসার-গৃহিণীদের। বাকী স্থান সর্বসাধারণের। চার হাজার লোকের বসবার ও দাঁড়াবার মত বিরাট আসর। ঝোলান মাইকের ব্যবস্থা হয়েছে, চারিদিকে ফ্লাড ও ফ্লোরেসিন লাইটে আসর দিনের মত প্রতীয়মান।

সাড়ে সাতটায় বাজনদাররা আসরে প্রবেশ করলেন। এর মধ্যে বিশিষ্ট আসনগুলি ছাড়া বাকী সমস্ত স্থানই প্রায় পূর্ণ। তারের যন্ত্র বাঁধা, তবলার মাথায় চাঁটি মেরে সুর ঠিক করা, ক্লারিয়নেটের পোঁ---ভ্যাঁ---পোঁ----ভ্যাঁ আর বাচ্চাদের চীৎকার। তার ওপর আছে মেয়েমহলে যারা বসতে পায় নি তাদের ওলো, হ্যাঁলা, মাগী সম্বোধন ব্যবহারে আসর একেবারে রম্ রম্ করতে লাগলো। আসল বই আরম্ভ হবার আগে দশ মিনিট ক্লারিয়নেটের দল ভ্যাঁপো ভ্যাঁপো করে দেববন্দনা করলেন। দেবতারা ছুটে না এলেও রায়নগরের বাকী যাঁরা আসতে দেরী করছিলেন তাঁরা দেববন্দনা শুনে ছুটতে ছুটতে আসরে প্রবেশ করলেন।

আজকের বই "মেঘনাদ বধ"। আসরে শান্তিরক্ষা করছেন ফোকলা মোড়ল। লোকটি অনেক দিনের, যতদিন এই রায়নগর, তারও আগে থেকে দর্পনারায়ণের পোষ্য। একটু মদটদ খায়, মাতলামো করে কিন্তু তাহলেও কাজের লোক। কারখানার যত ভারী মাল যেখানে ওঠাতে নামাতে হয় সেইখানে "ফোকলা" বাবুর ডাক পড়ে। কারণ, কুলিদের অনুপ্রেরণা দেবার জন্য হুঙ্কার করে যেসব মিষ্ট সুললিত ভাষা প্রয়োগ করেন, তাতে কুলিদের কষ্ট করে আর মাল তুলতে হয় না, মাল ভয় পেয়ে আপনি ওঠানামা করে। এই ফোকলবাবুর সমস্ত অবয়বের মধ্যে

পশ্চিম জার্মানীর পার্লামেন্ট "বুন্দেস্তাগ"এর দুই সভ্যা। বামে "মিস বুন্দেস্তাগ" উপাধিপ্রাপ্তা ডঃ উরসুলা ক্রিপল

ওঁর গোঁপজোড়াটি হচ্ছে প্রধান। গোঁপই ওঁকে বহুরূপী সাজায়।

বই আরম্ভ হলো, চারিদিক নিস্তব্ধ। যাত্রা পার্টির লোকেরা সত্যই ভাল পার্ট বলছে, চেহারাও সত্যই পেশাদারদের মত নয়, ড্রেসগুলি আনকোরা নূতন, তাই আলো পড়ে ঝক্‌মক্ করছে। প্রথম অঙ্ক শেষ হলো নির্বিঘ্নে। দ্বিতীয় অঙ্ক আরম্ভ হবার আগে বিরতির সময়ে একটি নাচ আরম্ভ হলো। একটি নর্তকী ফুলের ডালি হাতে নাচতে এলো। দেবদাসী-নৃত্য। ক্ল্যারিয়নেটে "দেবতার মন্দিরে অঙ্গনতলে দেবদাসী গো আমি পূজারিণী" সুরটা খুব জোর বেজে চলেছে আর নর্তকী ডাল কেনানোর মত হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঠমকে ঠমকে নেচে চলেছে। নর্তকীকে দেখলে নারী বলে ভ্রম হবে, এমনি সুন্দর গঠন। জনসাধারণ খুব মনোযোগসহকারে এই অপূর্ব নৃত্য উপভোগ করছিল।

হঠাৎ এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক চীৎকার করে উঠলেন—হাই গো গেল গেল সব খুলে পড়ে গেল। জনসাধারণও চমকে উঠল। বাজনদারদের বাজনা অনেকক্ষণ থেমে গেছে, হৈ-হুল্লোড় হাসির রোল। মা-বোনেরা লজ্জায় কেউ মুখ তুলতে পারছেন না। তাঁরা মাথা নীচু করে যে হাসছেন, তাঁদের দেহের কাঁপুনি দেখলেই বোঝা যায়।

ফোকলাবাবু প্রথমটা মেয়েদের দিকে মা, মাসী, বাছা বলে ভদ্রভাষার থামাতে চেষ্টা করলেন। বিনয়ের সঙ্গে বললেন, ওগো বাছারা, তোমাদের ছেলেদের থামাও, নিজেরাও থাম।

কিন্তু কে কার কথা শোনে—উল্টে হাসির ফোয়ারা আরো বেড়ে চলল। ফোকলাবাবু আর নিজেকে ঠিক রাখতে না পেরে অকথ্য গালাগালি শুরু করলেন। লাভের মধ্যে গোলমাল আর বেড়েও উঠল।

যা হোক দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্য শুরু হলো। নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞ করতে বসেছেন। সামনে পূজার উপকরণ, পরনে রক্তাম্বরপট্টবাস। ভারী সুন্দর মানিয়েছে কিন্তু। কিছুক্ষণ স্টেজে বসে পূজার উপকরণগুলি নাড়াচাড়া করবার পর লক্ষ্মণ ও তাঁর দুই অনুগামী আবির্ভূত হলেন। দেবতারা পূজায় সন্তুষ্ট হয়ে যজ্ঞাগারে উপস্থিত হয়েছেন মনে করে ইন্দ্রজিৎ মৃত্যুদূত লক্ষ্মণকে ইষ্টদেব ভ্রমে তাড়াতাড়ি আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—

"হে বিভাবসু, শুভক্ষণে আজি,
পূজিল তোমারে দাস, তেঁই, প্রভু তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে।"

কিন্তু আসন ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আসর হাপ্পরে বলে আঁতকে উঠে এক চীৎকার করেই স্তব্ধ হয়ে গেল।

টেঁপীর ঠাকুমা পা ছড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে ঘুমুচ্ছিল, ওগো কি হলো গো, কি সর্বনাশ হলো গো বলে ককিয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে পড়লো। যারা তখনও ব্যাপারটা কি ঠিক বোঝেননি, তাঁরা ফ্যাল-ফ্যাল করে চারিদিকে তাকাতে লাগলেন। কিন্তু সত্যই তো ব্যাপার কি ?—একি ! ইন্দ্রজিতের বদলে ওখানে কে পুরাতন গ্রীক সভ্যতার নগ্ন মর্মরমূর্তি স্থাপনা করলে ? এদিকে ইন্দ্রজিৎ বলে চলেছে—

কিন্তু কি কারণে কহ তেজস্বি ! আইলা
রক্ষকুল রিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে ? একি লীলা
তব প্রভাময় ?

তখন লক্ষ্মণ বললেন, ইন্দ্রজিৎ তুমি বিবস্ত্র হয়ে পড়েছ।

ইন্দ্রজিৎ ভাবছেন কৈ এরকম "ডায়লগ" তো ছিল না, তবে কি লক্ষ্মণ পার্ট ভুলে গেছে ? আসরে এত গোলমাল হচ্ছে যে লক্ষ্মণের কথা ইন্দ্রজিৎ সম্পূর্ণ শুনতে না পেয়ে বলছেন—অস্ত্র আমি সম্বরণ করেছি দেব।

লক্ষ্মণ পুনরায় বললেন ইন্দ্রজিৎ তুমি বিবস্ত্র, শীঘ্র ফিরিয়া যাও। এতক্ষণে নিজের দেহে দৃষ্টি পড়লো,

● শিশু ক্রোড়ে কাশ্মীরী জননী

আঁতকে উঠে লজ্জায় কোনরকমে গায়ের উত্তরীয়খানা তুলে নিয়ে ছুটে আসর ত্যাগ করলো।

চারিদিকে হাসির ঢেউ, হা হা—হি হি—হু হু -কেউ কেউ হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলল, দু-একজনের হাসতে হাসতে হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল. কেউ অজ্ঞান হলো। সামনের বাচ্চাগুলো উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে হাসতে লাগলো।

ফোকলা মোড়ল হাসতে হাসতে পাশের ভদ্রলোকের ঘাড়ে পড়ে গেলেন। ভদ্রলোকও হাসতে হাসতে ফোকলা-বাবুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, দাদা গো এত হাসলেন কেন?

থামুন—ফোকলাবাবু ভদ্রলোককে খামচে ধরে উঠে পড়ে বললেন, কি বললেন মশাই, আমি হাসছি? কে বললে মশাই, বলি কে এমন কথা বললে?

রক্তচক্ষু দেখে ভদ্রলোক ঘাবড়ে গিয়ে বললেন—আজ্ঞে আপনি হাসেন নি—আমি হাসছি।

ফোকলাবাবু ফোকলা হাসি হেসে বললেন, তাই বলুন। আবার তিনি আসরে শান্তিরক্ষা করতে চেষ্টা করলেন। গোঁপ বেচারা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে শেষ কিছুক্ষণ "প্যারালাল" হয়ে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল।

এরপর "মেঘনাদ বধ" আর জমলো না। প্রত্যেক দৃশ্যেতেই এক না একটা অঘটন ঘটতে লাগল। হঠাৎ দেখা গেল সরমা শাড়ী-গহ পরে বিলাপ করতে করতে ঢু আসছেন কিন্তু পরমুহূর্তেই তাঁ গ্রীনরুমে ফিরে যেতে হলো মাথ চুলের জন্য। কারণ তিনি ভুলক দশাননের পরচুলাটি পরে বেরিয়ে এ ছেন; দশানন আসতে পারছেন না

এইভাবে সেদিনের দর্পনারায়ণে সাধের যাত্রা "মেঘনাদ বধ" একেবারে বধ হয়েছিল।

নরোত্তম দাসের পদে কাব্য সৌন্দর্য

মৃণালিনী ঘোষ

বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য শুধু মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি নয়, চিরকালীন বাংলা সাহিত্যেরও স্মরণীয় সম্ভার। এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, কবিরূপে খ্যাতি লাভ করা বৈষ্ণব পদাবলীর রচয়িতাগণের লক্ষ্য ছিল না। তারা প্রথমে ভক্ত, পরে কবি। একথা তাবৎ বৈষ্ণবকবি সম্বন্ধে সত্য হলেও নরোত্তম দাসের প্রসঙ্গে অধিকতর সত্য। নরোত্তম ধনীর সন্তান, আবাল্য সুখৈশ্বর্যে প্রতিপালিত। সুখের সংসার তিনি ত্যাগ করেছিলেন সংসারাসক্তিকে সার [illegible] সুতরাং পার্থিব ঐশ্বর্যের প্রতি তার মোহ বা মমতা না থাকাই স্বাভাবিক। ভক্তের সহজ বিশ্বাস এবং তাত্ত্বিকের স্বাতন্ত্র্য। অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। তাই জ্ঞানপারম্যবাদকে বাদ না দিয়ে, তাকে পথ হিসাবে বরণ করে ভক্তি-পথের পথিক নরোত্তম দাস কৃষ্ণপারম্যবাদের উপকূলে নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনের যুগল শিবির প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তত্ত্বের ধার এবং ভক্তির ভার নরোত্তম দাসের পদে যথেষ্টই আছে, তবে তত্ত্ব এবং ভক্তিই তাঁর পদাবলীর শেষ কথা নয়। বস্তুত তার পদগুলি তত্ত্বের মৃণালে বিকচ পদ্মিনীর ন্যায় কাব্যরসে মধুর, কাব্যরূপে সুন্দর। এখানে স্মরণীয় যে, এই কাব্য-সৌন্দর্য সম্পূর্ণরূপে অযত্নসিদ্ধ। কবি-প্রতিভার যে উৎস অন্তর্নিহিত ছিল নরোত্তম দাসের মানসলোকে তারই স্বতঃউচ্ছ্বসিত রসধারায় অভিসিঞ্চিত হয়েছে তত্ত্বের তটভূমি। কবি-প্রতিভাকে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ বলেছেন 'নিয়তিকৃতনিয়ম-রহিতা।' নরোত্তম দাসের ক্ষেত্রে এই কবি প্রতিভা শুধু 'নিয়তিকৃতনিয়মরহিতা' নয় 'কবিকর্তানিয়মরহিতা'ও বটে। কেননা, কাব্য-রচনা নয়, ভক্তিসাধনাই নরোত্তম দাসের পদরচনার উৎস। কাব্য সৌন্দর্য নরোত্তম দাসের পদে সম্পূর্ণ উপরি-পাওনা; এ যেন তত্ত্ব তটাভিমুখী নাবিকের সমুদ্রবক্ষে খেলাচ্ছলে ইতস্তত রত্ন-আহরণ। নরোত্তম দাসের পদগুলিতে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সেই আহরিত রত্নগুলির প্রতি রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের লক্ষ্য।

বিরহের শ্রেষ্ঠ পদকর্তা চণ্ডীদাস, পূর্বরাগে বিদ্যাপতির তুলনা নেই; রূপানুরাগে জ্ঞানদাসের দোসর মেলা ভার, অভিসারে গোবিন্দদাস কবিরাজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী, বাৎসল্যে অতুলনীয় কবি বলরাম দাস আর কুঞ্জভঙ্গে শ্রেষ্ঠ কবি নরোত্তম দাস।

রজনী অতিক্রান্ত, নায়ক-নায়িকার বিচ্ছেদ-লগ্ন সমাগত; রাধা বিদায় গ্রহণ করছেন শ্রীকৃষ্ণের কাছ থেকে। কিন্তু গহে প্রত্যাগমনের প্রয়োজন যত তীব্র, ছেড়ে যাওয়ার ব্যথা যে ততোধিক তীব্র। তাই পুনরাগমনের প্রতিশ্রুতি —যা পুনর্মিলনের প্রতীক্ষারই নামান্তর। কিন্তু পুনর্মিলনের স্বপ্ন যত সুন্দরই হোক না কেন, সমুপস্থিত বিচ্ছেদের ব্যথাও যে একান্ত দুর্বিষহ। তাই বিদায়-বাণী—

"কহইতে রাই বচন ভেল গদগদ
শুনইতে আকুল কান,
দুহুঁ মুখ হেরইত দুহুঁ দিঠি ঝরঝর
শাওন জলদ সমান॥" (পদরত্নাকর, ৩২২)

"দুহুঁ দিঠি ঝরঝর শাওন জলদ সমান" তত্ত্বভারে ভারী বা হাল্কা যাই হোক না কাব্য-সৌন্দর্যে অনুপম। শ্রাবণের বকভরা প্রাণ কাঁদানো ভাষায় কল ছাপিয়ে শুধু নায়ক-নায়িকার চোখে নয়, পাঠকের বকে

কুঞ্জভঙ্গের আর একটি পদের প্রথমেই আছে

"নিজ নিজ মন্দিরে যাইতে পুনঃপ
দুহুঁ মুখ চন্দ্র নেহারি
অন্তরে উথলল প্রেম পয়োনি
নয়নে পূরল ঘন বারি॥"

(পদরত্নাকর, ৩৩

চন্দ্রের উদয়ে জোয়ারের বান ডা সমুদ্রের বুকে; মুখচন্দ্র দর্শনে পরস্পরের প্রে সাগরের জোয়ার এসেছে যা হৃদয়ের বেলাভূমি অতিক্রম করে আঁখির তটকেও করেছে উদ্বে রূপরাগ এবং অনুরাগের এমন সর্বাঙ্গসা ব্যঞ্জনা দুর্লভ। কলহান্তরিতার একটি পদে অনুরূপ ব্যঞ্জনা পরিলক্ষিত হয়।

"রাই হেরল যব সো মুখ ইন্দু
উছলিল মন যাহা আনন্দ সিন্ধু।"

—বৈষ্ণব পদলহরী, পৃঃ ৩৮৫-৮৬

মিলনের স্বর্ণলগ্ন সার্থক কাব্যের জন্ম নয় বলেই জানি; কিন্তু নরোত্তম দাসের স জাত কবি-প্রতিভা সেখানেও কলমুখর।

"দুহুঁ ভুজ দুহুঁ জন কণ্ঠহি দেল।
মনমথ তুণ শূন ভই গেল॥"

—পদরত্নাকর, ৩৩০

[illegible]কাব্যের প্রতি অশ্রদ্ধা-উদ্রেককারী কোন অশ্লীল বাক্য-যোজনা নেই, অপরদিকে মিলনের [illegible] কোন কথা উহ্যও নেই। "তৃণ শূন্য [illegible]"—প্রয়োগটি সব্যসাচী ভক্তকবির অব্যর্থ [illegible] যোজনা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মিলনের এই অবস্থার বর্ণনা করতে [illegible] জগতের প্রথিতযশা কবিদেরও অশ্লীলতার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়েছে। শুধু নব-[illegible] কবি ভারতচন্দ্র নন, উজ্জয়িনীর কবি [illegible]র নামেও অশ্লীলতার অভিযোগ আনা [illegible] হরগৌরীর মিলন-বর্ণনার আতিশয্যের [illegible] নরোত্তম দাসের উপযুক্ত পদটিতে [illegible] ও আদিরসের অদ্ভুত সামঞ্জস্য পরি-[illegible] হয়। অপর একটি পদে নরোত্তম দাস [illegible] মিলনকে মণিকাঞ্চন যোগের [illegible] মণিকাঞ্চন জোর"—পদরত্নাকর, ৩২৮) [illegible] করেছেন। তার নিজের লেখনীর [illegible] পদক্ষেপেও ভক্তিরস এবং শৃঙ্গাররস [illegible] জোর।

[illegible] চূড়ান্ত-মুহূর্ত বর্ণনার প্রসঙ্গে কবি-[illegible] নৈসর্গিক জগতের বুক থেকে উপমা [illegible] করেছে বর্ণনীয় বিষয়কে নিঃশেষে [illegible] বলে তোলার জন্য। এখানেও কবির [illegible] সংযত ভাষণে অথচ অব্যর্থ ইঙ্গিতে [illegible]।

"[illegible] পূর্ণিমা চাঁদে পরাগল রাহু"
—পদামৃতমাধুরী, ২য়, পৃঃ ১৫।

[illegible] ভাষণই কবিভাষা। মিলনের চরম [illegible] নায়িকাকে অচেতন হতে দেখি অপর [illegible]। নরোত্তম দাসের রাধা সচেতন [illegible] সুখস্পর্শে।

"অচেতন ছিল রাই সচেতন ভেল।
[illegible] দুখ সব দূরে গেল॥"
(পদামৃত মাধুরী, পৃঃ ৩০১)

[illegible]রাগের বর্ণনাতেও কবির দক্ষতা অনস্বী-[illegible]। শ্রীকৃষ্ণের পূর্বরাগের একটি পদে সাঙ্গ-[illegible] রূপ-মাধুরী যে-কোন রসিকচিত্তের [illegible] ক্ষমতা রাখে।

[illegible] কুম্ভবারি এক ব্রজনারী'কে দেখে-[illegible] শ্রীকৃষ্ণ। সেই কটাক্ষ-ঈক্ষণে শ্রীকৃষ্ণের [illegible] পরবশ। নিম্নোক্ত পদটিতে রয়েছে [illegible] শ্রীকৃষ্ণের রাইরূপের অপরূপ বর্ণনা [illegible] নিজের জবানীতেই।

"[illegible] মন নহে সম্বরণ
কি জানি কি কৈল মোরে।
ভুরু [illegible] দিয়া প্রেম গুণ
বিন্ধিল নয়ন শরে।"
—পদরসসার, ৩২৬।

[illegible] কষ্টকল্পনা নেই, বর্ণনার আতি-[illegible] নেই। শুধু শ্রীরাধার ভুরু-ধনুতে প্রেমের জ্যা-রোপণ করে নয়ন-বাণ ছেড়ে দিয়েছেন কবি —ভেঙ্গে গেছে শ্রীকৃষ্ণের ধৈর্য, ভরে গেছে পাঠকের বুক।

রূপকথার রাজকন্যার হাসিতে মুক্তা ঝরে, কান্নায় পান্না। হাসি-অশ্রু দুই বিপরীত প্রান্তের অধিবাসী নয়, একই ভূখণ্ডের লোক। সাধা-রণভাবে সুখের প্রতীক হাসি, দুঃখের প্রতীক যেমন অশ্রু। কিন্তু সুখ বা দুঃখের চরম অবস্থায় প্রতীক তার প্রতীকত্ব সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলে, মুছে যায় হাসি-অশ্রুর সীমারেখা। কমেডির উঁচু পর্দায় বেজে উঠে ট্র্যাজেডির জলতরঙ্গ। এই মনস্তাত্ত্বিক সত্য কাব্যের সৌন্দর্য রূপায়িত হয়েছে নরোত্তম দাসের একটি পদে।

"দুহুঁ মুখ হেরইতে দুহুঁ ভেল ভোর।
দুহুঁক নয়নে বহে আনন্দ লোর॥"
—পদামৃতমাধুরী, ২য়, পৃঃ ৫৫৪।

অপর একটি পদেও অনুরূপ সৌন্দর্য-সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়।

"দেখি রাই মুখশশী সুধা ঝরে রাশি রাশি
হেরি নাগর অনিমেখে চায়।
ঐছন আরতি দেখি রাইয়ের সজল আঁখি
বাহু পসারিয়া করে কোরে॥"
(বৈষ্ণবপদলহরী, পৃঃ ১৮৬)

"দেখি রাই মুখশশী সুধা ঝরে রাশি রাশি।"—রাধা-রূপ বর্ণনায় কবির সংযম ও সাঙ্কেতিকতা সযত্নে লক্ষণীয়।

আবার শুধু মুখচন্দ্র নয়, নয়নও যে সুধা বর্ষণ করে নরোত্তম দাসের কাব্যপাত্রে তা সযত্নে পরিবেশিত হয়েছে রসিকজনের উদ্দেশে।

"কত সুধা বরিখায় নয়ানে নয়ান (ঐ)।"

রাধা-কৃষ্ণের রূপগত পার্থক্য এবং পার-স্পরিক সম্বন্ধ একটি উপমার আলোকে উদ্ভাসিত করে তুলেছেন কবি।

"হেম বরণী রাই কালিয়া নাগর।
সোনার কমলে জনু মিলিছে ভ্রমর।।" (ঐ)

মিলনের পরিপ্রেক্ষিতে যুগলরূপের অপরূপ আল্পনা অন্যত্রও অতি সযতনে ও অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে অঙ্কিত হয়েছে। কবি প্রতিভাকে সংজ্ঞা দ্বারা নির্দিষ্ট করতে গিয়ে সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ বলেছেন, এ হচ্ছে "অপূর্ববস্তু নির্মাণক্ষমা প্রতিভা"। নিম্নের পদাংশে সেই অপূর্ব বস্তু নির্মাণের প্রমাণ পাওয়া যায়।

"কনকের বেদী ভেদি কালিন্দী বহিল।
হেমলতা ভুজদণ্ডে কানুরে বেড়িল॥"
(পদরসসার, ৩৩৭)

বিরহে দশদশার বর্ণনা শুধু সাহিত্য-দর্পণে নেই, সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বত্রই আছে। বৈষ্ণব পদাবলীতেও এ ধরণের বর্ণনার অপ্রতুলতা নেই। নরোত্তম দাসের পদেও অনুরূপ বর্ণনা পাই। তবে লক্ষণীয় যে, এ বর্ণনা আদৌ গতানুগতিক নয়; প্রত্যেকটি বর্ণনা সম্পূর্ণই অপরিকল্পিতপূর্ব আদ্যন্ত কাব্যরসে সিক্ত।

উৎকণ্ঠিতা রাধা প্রতীক্ষাকাতর। বৃথা হয়েছে তাঁর বাসকসজ্জা, বিফল হয়েছে উৎকণ্ঠিত পথ-চাওয়া। রজনীর আর আর বেশি অবশিষ্ট নেই। রাধা অবশ্য রজনীর শেষ যাম পর্যন্ত প্রিয়তমের প্রতীক্ষা করতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁর প্রাণ যে প্রস্তুত নয় রজনীর শেষ যাম পর্যন্ত তাঁকে সঙ্গ দান করতে। রাধার ইচ্ছা অথচ তাঁর প্রাণের অনিচ্ছা—চমৎকার কবি-কৌশল।

"গগনে উপরে চাঁদ কিরণ উজোর গো
কোকিল কোকিলা ডাকে সাতি
এমন রজনী আমি কেমনে পোহাব গো
পরাণ না হয় তার সাথি।।"
(বৈষ্ণবপদলহরী, পৃঃ ৩৮৪)

বিদ্যাপতির মারফৎ "মাহ ভাদরের ভরা বাদরে" রাধার শূন্য মন্দিরের ব্যথার পরিচয় আমরা পেয়েছি। ভরা বাদরের মিলন-মধুর তরঙ্গধারার উচ্ছ্বসিত প্লাবন পাই নরোত্তম দাসের পদে। এ বাদর, বন্যা বাদলা, নৈসর্গিক নয়, ভাবিক, এ বন্যা জলের নয়, প্রেমের। নৈসর্গিক পাত্রে অনৈসর্গিক প্রেমের সুষমা পরি-বেশিত হয়েছে নিম্নোক্ত পদটিতে। পদটি নান্দ-সৌন্দর্যে আদ্যোপান্ত উদ্ধৃতির দাবী রাখে।

"আজু রসে বাদর নিশি
প্রেমে ভাসল সব বৃন্দাবনবাসী॥
শ্যাম ঘন বরিখয়ে কত রসধার
কোরে বিজুরি রাধা বিজুরি সঞ্চার।
ভাবে পিচ্ছল পথ গমন সুপবক
মৃগমদ চন্দন পরিমল পঙ্ক॥
দিগবিদিগ নাই প্রেমের পাথার
ডুবল নরোত্তম না জানে সাঁতার॥"

রাধার চিন্তায় শ্যামাঙ্গের গৌরাঙ্গ হওয়ার কথা আমরা জানি। অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌরের চৈতন্যতত্ত্ব পণ্ডিতগণ জানেন। কিন্তু রাধার অঙ্গচ্ছটায় নিসর্গজগতের গৌরাঙ্গ হওয়ার তত্ত্ব শুধু মাত্র নরোত্তম দাসের লেখনীরই জানা।

"গৌর যমুনাজল গোর ভেল জলচর
গোর সারস চক্রবাক।
গোর আকাশ দেখি গোর চন্দ তার সাথী
গোর তারা বেড়ি লাখে লাখ।"
(বৈষ্ণবপদলহরী, পৃঃ ৩৮৬)

সত্যেন্দ্রনাথের "কিশোরী" কবিতাটির কথা এই প্রসঙ্গে অনিবার্যভাবেই মনে পড়ে, যদিও "কিশোরী" এবং "রাই কিশোরী"-র পদ-বিন্যাস (রূপ ও ছন্দ উভয়ার্থেই) সম্পূর্ণ পৃথক।

মধ্যযুগীয় বাংলা জীবনীকাব্যে শ্রীচৈতন্য

ষোড়শ শতাব্দীকে পুরাতন বাংলা সাহিত্যের সুবর্ণ যুগ বলা যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্যের শুভ আবির্ভাবে বাঙালীর জীবনে এক অপূর্ব প্রেরণা আসে। তাহারই প্রতিক্রিয়া সমসাময়িক সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া নিতান্ত একটি প্রাদেশিক এবং গ্রাম্য সাহিত্যকে সার্বজনীন সাহিত্যের পথে দাঁড় করাইয়া দিল। ষোড়শ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী এই তিনশত বৎসর ধরিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে সম্প্রসারিত করিয়াছে।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে বাঙালীর সাহিত্য ছিল ব্রতকথা—উপকথা লইয়া। শক্তি পূজা পদ্ধতি, দেবতত্ত্ব বাংলা দেশ ও বাঙালী সমাজকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করিয়াছিল। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর চরিত্র বাঙালীর মন-প্রাণ অভিভূত করিয়া ফেলিল। ব্রতকথা, উপকথা ইত্যাদি ছাড়িয়া বাঙালী কবির লেখনী সমসাময়িক মহাপুরুষের পবিত্র জীবনকথা লইয়া মাতিয়া উঠিল। শুধু বাংলা সাহিত্য কেন সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে ইহা অতি অভূতপূর্ব ব্যাপার। চৈতন্যদেব অবতার বা মহামানব হইলেও তিনি এই মর্ত্যের মানব। তাহার মানব বা ভাগবতলীলা কাব্যগুলি বাংলা সাহিত্যকে মহিমামণ্ডিত করিয়াছে। মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই চৈতন্য জীবনী কাব্য-গুলি অমূল্য সম্পদ। শ্রীচৈতন্যের জীবনী এই

মাণিক পালিত

কাব্যগুলি বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিক ধারাকে অতিক্রম করিয়া এক নবতর সৃষ্টি রূপে প্রকাশ পাইল।

বাংলায় রচিত আদিতম চৈতন্যকাব্য হইতেছে বৃন্দাবন দাসের শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত। ইহা অতি সুললিত ভাষায় রচিত। চৈতন্য ভাগবত তিনটি খণ্ডে বিভক্ত, আদি, মধ্য এবং অন্ত্য। আদিখণ্ডে মহাপ্রভুর গয়া গমন পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যখণ্ড মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণেই সমাপ্তি। অন্ত্যখণ্ডে সন্ন্যাসের পর নীলাচলগ ও নীলাচল বাসকালীন কতিপয় ঘটনার উ করা হইয়াছে। চৈতন্যভাগবতে মহাপ্র দক্ষিণভ্রমণ এবং বৃন্দাবন গমনের কোন উ নাই। চৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবন দাস কোন নি তত্ত্ব আলোচনার অবতারণা করেন নাই। তি আদিপর্বের কাহিনীকে সহজ ভাষায় ও সং ভঙ্গীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। শ্রীচৈত নবদ্বীপলীলা এবং গার্হস্থ্য জীবনের সুন্দর চি ফুটিয়া তোলা হইয়াছে আদি ও মধ্যখণ্ডে। না বর্ণনার মধ্য দিয়া কবি দেখাইয়াছেন নিম পণ্ডিত চৈতন্যদেব হইলেন। চৈতন্যদেব যেম প্রেমের অবতার ছিলেন সেরূপ তাঁহার রুদ্র ছিলেন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যদেবকে ভ উদ্ধারের জন্য অবতারিত করিয়াছেন। তাঁহ প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পাল তিনি চৈতন্যদেবকে এইরূপেই চিত্রি করিয়াছেন।

বৃন্দাবন দাস চৈতন্য ভাগবতকে শ্রীমদ্ভা বতের অনুকরণে রচনা করিয়াছিলেন। কে কোন স্থানে তিনি চৈতন্যদেবের রাধাভাবের ক উল্লেখ করিলেও তাঁহাকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। চৈতন্য ভাগবতে শ্রীচৈত দেবের বাল্যলীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের বাল লীলার সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। চৈতন পুরাতন বাংলা সাহিত্যে একক এব অদ্বিতীয়। শ্রীচৈতন্যের বাল্য ও যৌবন লী এইরূপ সহজ ও সরল অনাড়ম্বর ভাষা চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিলা গোকুলে।
শিশু সঙ্গে গৃহে গৃহে ক্রীড়া করি বুলে॥
জন্ম হৈতে প্রভুরে সকল গোপীগণে।
নিজ পুত্র হইতেও স্নেহ করে মনে॥

বাল্যকালে নিজেকে গোয়ালা বলিয়া ঘোষণা, শিশুকালে হরিধ্বনি শুনিয়া সান্ত্বনা লাভ গোপাল বেশ ইত্যাদি বর্ণনায় চৈতন্য ভাগবতে ভাগবতের প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। বালক নিমাই গঙ্গার ঘাটে স্নানার্থিনী রমণীদে উত্ত্যক্ত করিতেন। তাঁহারা অভিযোগ করিতেন শচীমাতার নিকট—

পুরুবে শুনিল যেন নন্দের কুমার।
সেইমত করে সব নিমাই তোমার॥

উপনয়নের সময় তিনি বামনরূপ দেখাইয়াছেন, সাপের উপর শয়ন করিয়া অনন্তলীলা, পিতৃ-বিয়োগের কালে ক্রন্দনের সময়ে রামভাব দেখাইয়াছেন কবি। শ্রীচৈতন্য আপনাকে ব্রহ্মসনাতন বলিয়াছেন। বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যদেবকে যথার্থ শ্রীকৃষ্ণের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, তাই তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের বরাহ অবতার রূপ, দিব্যরূপ ইত্যাদি দেখাইয়াছেন।

বিদেশী ক্লিনিকে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে বিনা পারিশ্রমিকে শিশুদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে তৎসম্বন্ধীয় উপদেশাদি দেওয়া হচ্ছে।

তিনি শ্রীবাসের নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে, ক্ষীরোদ সাগরে যোগনিদ্রায় মগ্ন ছিলেন অদ্বৈত আচার্যের আহ্বানে তিনি গৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

শয়নে আছিনু মুই ক্ষীরোদ সাগরে।
জগাই আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে॥

চৈতন্যমঙ্গলে লোচনদাস শ্রীচৈতন্যদেবকে ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের ন্যায় অংকন করিয়াছেন। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গলে চৈতন্যদেব ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় বস্ত্রহরণ লীলা করিয়াছেন। লোচনদাস তাঁহার কাব্যে গৌরাঙ্গের নাগররূপের বর্ণনা করিয়াছেন। বরবেশী গৌরাঙ্গকে দেখিয়া নবদ্বীপবাসিগণ চিত্তচাঞ্চল্য অনুভব করিয়াছিলেন।—

নদীয়া—নগরে নাগরী অগোর
রসের সাগর সবে।
গৌরচন্দ্রলীলা দেখিয়া ভুলিলা—
দন্ড চর গেল তবে॥

চৈতন্যজীবনীর আর একটি দিক লোচনদাস তাঁহার কাব্যে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—তাহা হইতেছে গৌরাঙ্গ বিষ্ণুপ্রিয়ার দাম্পত্যজীবন। সন্ন্যাসগ্রহণের একদিন পূর্বে পত্নীকে পরিতুষ্ট করিবার জন্য দাম্পত্যলীলা শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রের সাবলীল বিরোধী। শ্রীঅসিত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন—"যখন চৈতন্যদেব—সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য ব্যাকুল, কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত, সনে মনেও অতিশয় চিন্তান্বিত, সেই সময় তাঁহার এই "নানা রস বিধান" শুধু অবিশ্বাস্য নহে অস্বাভাবিকও বটে।

ইহা ছাড়া লোচনদাস বালক নিমাইয়ের যে সকল দৌরাত্ম্য কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা অতি স্থূল বর্ণনা। বালক নিমাই মুরারির ভোজনকে পরিহাস করিলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ভর্ৎসনা করিলেন।

নিমাইও জানাইলেন—"জানাইব ভোজনের ফল।"

অতঃপর দ্বিপ্রহরে মুরারির ভোজনের কালে নিমাই—

মধ্য ভোজন বেলা ধীরে ধীরে নিয়ড়ে গেলা
পানভরি মূত মুতিল।
কি কি বলি ছি ছি করি উঠিল সে মুরারি
করতালি দিয়া বলে গোরা।
ভক্তি পথ ছাড়িয়া কর শির নাড়িয়া—
যোগবলে এই অভিপ্রায়॥

স্বরূপ দামোদর ব্যাখ্যা করিয়াছেন রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু শ্রীচৈতন্যদেব এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতারস্বরূপ। লোচনদাস তাঁহার কাব্যে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন—

"পাপ মন কলিযুগে না দেখি নিস্তার লোক
দয়া উপজিল প্রভু চিতে।
পালিব ভকত জন আর ধর্ম সংস্থাপন
জনম লভিব পৃথিবীতে॥"

আর একটি—

"রাধাভাব অন্তরে রাধা বর্ণ বাহিরে
অন্তর্বাহ্য রাধাময় হব।
সঙ্গে সখা সখীবৃন্দ আর ভক্ত অনন্ত
বৃজভাবে অখিল মাতাব॥"

শ্রীচৈতন্যদেবের কোন জীবনীতেই তাঁহার তিরোধান সম্পর্কে কোন স্পষ্ট নির্দেশ নাই। কেবলমাত্র লোচনদাস ও জয়ানন্দ শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের কথা বলিয়াছেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে শিশু নিমাইর রূপ বর্ণনা অপরূপ—হইয়াছে—

গলায়ে বাঘনখ পিঠে পাটের থোপনি
হামাগুড়ি দিঞা চলে দ্বিজ শিরোমণি।
কুন্দ কলিকা দুটি দন্ত উঠিল
পাকা তেলাকুচা যেন অধরে ফুটিল।
টাড় বলয় হার চরণে নূপুর—
রাঙা লাঠি সোনার কাঠিরূপের পসরা।
দেখিঞা মোহন ফান্দ চান্দ রহি চাহে
মদন লাখ কোটি রূপে মূর্চ্ছা যাত্র।

চূড়ামণি দাসের ভুবনমঙ্গল কাব্যখানিতে চৈতন্যের নবদ্বীপ লীলার অধিকাংশ আছে। পুঁথি খণ্ডিত বলিয়া জানা যায় না যে চূড়ামণিদাস সমগ্র চৈতন্যলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন কি না। সব জীবনীতে রহিয়াছে মহাপ্রভু কৈশোরে বঙ্গদেশ ভ্রমণে গিয়াছিলেন কিন্তু চূড়ামণিদাস বলিতেছেন যে, তিনি পিতৃভূমি শ্রীহট্টও গিয়াছিলেন।

চূড়ামণিদাসও গৌরাঙ্গের শিশুরূপের অপূর্ব বর্ণনা করিয়াছেন—

অতি সুকুমার অঙ্গ সুকুমার দশা
চলাচল ঝলমল নবরঙ্গ বসা।
আকুল-অলিকুল-বিচিরাস-পানে
সব নব হেরয়ে না আন যোগানে।

পহিরন বিশুদ্ধর অম্বর নীলে
তড়িত জড়িত যেন ঘন মেঘজালে।
নবঘন সুধাকর শ্রীমুখ শোহে
হাসি সুধাবাণি হেরি জগজন মোহে।

গোবিন্দদাসের কড়চায় শ্রীচৈতন্যদেব মিশনারি প্রচারকরূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সকল জীবনীকারগণের মতে শ্রীচৈতন্য আপনাকে বরাবর নারী ও বিষয়িগণের নিকট হইতে দূরে রাখিতেন কিন্তু গোবিন্দদাসের কড়চায় তিনি রাজাদের নিকট ধর্মীয় বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন এবং বারনারীদের বৈষ্ণবী করিয়াছিলেন।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ রচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কেবলমাত্র মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের জীবনকাহিনী পাওয়া যায়। চৈতন্যচরিতামৃত তিনটি খণ্ডে বিভক্ত—আদিলীলা, মধ্যলীলা এবং অন্ত্যলীলা।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যজীবনী-লীলাকে বৃন্দাবনের ষড়গোস্বামীদের আদর্শানুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "চৈতন্যজীবনী অপেক্ষা চৈতন্যতত্ত্ব, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন প্রভৃতি দুরূহ তত্ত্ববাদ ব্যাখ্যাই ছিল তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য।" জীব উদ্ধারের জন্য চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ইহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন এবং চৈতন্যদেব যে রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু ইহার উপরও কবিরাজ গোস্বামী অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। যখন কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃদ্ধ অবস্থায় বঙ্গদেশ হইতে বহু দূরে চৈতন্যদেবের এই জীবনীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন তখন চৈতন্য তিরোধানের অর্ধ শতাব্দী পার হইয়াছে। চৈতন্যদেব তখন অবতাররূপে ভক্তসমাজে পূজিত হইতেছিলেন এবং তখন তাঁহার সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনীরও সৃষ্টি হইয়াছিল। কৃষ্ণদাস বিশেষ তত্ত্বাদর্শ

স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর জন্মদিনে মহিলারা তাঁকে তিলকমালো অভিনন্দিত করছেন।

ব্যাখ্যায় এইসব অলৌকিক কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন।

চৈতন্যদেব যে রাধাকৃষ্ণের মিলিত তনু তাহা তিনি প্রেমাবিষ্ট রায় রামানন্দকে দেখাইলেন এবং তিনি রামানন্দকে এই নিগূঢ় কথা গোপন রাখিতে কহিলেন—

মোর তত্ত্ব লীলারস তোমার গোচরে।
অতএব এইরূপ দেখাইল তোমারে॥
গৌর অঙ্গ নহে মোর রাধাঙ্গ স্পর্শন।
গোপেন্দ্রসুত বিনা তেঁহো না স্পর্শে অন্যজন॥
তাঁর ভাবে ভাবিত আমি করি আত্মমন।
তবে নিজ মাধুর্য রস করি আস্বাদন॥

নীলাচলে শেষ দ্বাদশ বৎসর মহাপ্রভুর বাহ্য চেতনা দিব্যানুভূতিতে লুপ্ত হইয়া যাইত তখন তিনি এই মর্ত্যেই ভাব বৃন্দাবনকে প্রত্যক্ষ করিতেন। চটক পাহাড়কে গিরিগোবর্ধন বলিয়া মনে করিতেন আবার কখনও কৃষ্ণবিরহে স্বরূপ গোস্বামীকে মিনতি করিয়া বলিতেন—

"কাহা করোঁ কাঁহা যাঁও কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
দোহে মোরে কহ সে উপায়।"

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ও গীত গোবিন্দের গান গাহিয়া স্বরূপ গোস্বামী রামানন্দ মহাপ্রভুকে শান্ত করিতেন। অল্প চেতনা পাইলেই তিনি কৃষ্ণপ্রেমে উন্মত্ত হইতেন। শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতরা রাধার যে অবস্থা হইয়াছিল মহাপ্রভুরও সেই অবস্থা হইল।

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়॥

কৃষ্ণদাস দিব্যোন্মাদ অবস্থার বর্ণনা দিয়া মহাপ্রভুর কৃষ্ণার্তির গভীরতা বুঝাইতে চাহিয়াছেন। চৈতন্যভক্তগণের বাসনা ছিল তাঁহার শেষ জীবনের অপার্থিব লীলা কাহিনী শ্রবণ করিবার সে বাসনা চরিতার্থ করিয়াছেন কৃষ্ণদাস।

শ্রীচৈতন্য জীবনীকাব্যগুলি মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অনন্যসাধারণ সম্পদ। কি ইহা কেবলমাত্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নয় সমগ্র বাংলা সাহিত্যের এমন কি ভারত সাহিত্যেরও একটি বিশিষ্ট সম্পদ। এই সব জীবনীকাব্যের নায়ক একজন সর্বত্যা সন্ন্যাসী। শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনের ঘটনা এই জীবনীকাব্যগুলিতে পাওয়া যা

চৈতন্যযুগ ভিন্ন অন্য কোন যুগে অধিক সংখ্যক জীবনীকাব্য রচনা সম্ভব নাই। এইসব জীবনীকাব্যগুলিতে শ্রীচৈ প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক তত্ত্ব ও বিশে সুনিপুণরূপে সুললিত ভাষায় লিখিত হইয়া "মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের শতাব্দী ভুক্তভার মধ্যে চৈতন্যজীবনীকাব্যগুলি মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে।"

আবরণ

সোনালী দেবী

তা তো আবৃত করি না দিয়ে তাই—আবরণ। এ যুগ সে যুগ ছাড়িয়ে পেছোতে পেছোতে যদি আবেক-জানা অস্পষ্ট অতীতে ফিরে যাই, যখন আমাদের পূর্বপুরুষরা শিম্পাঞ্জি-এর স্তর পেরিয়ে 'মানুষ' পদবাচ্য হয়ে উঠছিল ধীরে ধীরে, তা হ'লে দেখা যাবে আবরণ নিছক প্রয়োজনের আবিষ্কার। সভ্যতার সেই আদি উষার ভীষণতর প্রকৃতির হাত থেকে নিজেকে বাঁচানো দুরূহতর, শীত-গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতা, বনবাসী মানুষের আত্মরক্ষা বনজ কাঁটার কবল থেকে, দুষ্টের হাত থেকেও বটে—এ সব মিলে তাকে বাধ্য করেছিল দেহাবরণ খুঁজে নিতে। তখন কোন বনাকীর্ণ পর্বতসানুতে দাঁড়িয়ে দিগন্তের ধূ-ধূ করা রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তচারী মানুষকে দেখে শ্লোক উচ্চারিত হ'ত না, কিংবা আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর যখন অঝোরে ঝরত বৃষ্টিধারা তখন কেউ গেয়ে উঠত না 'এমন দিনে তারে বলা যায়, এমনি ঘনঘোর বরিষায়'—সম্ভব হ'ত না এমনতর অবস্থা। কালোবাজারীর নিত্য উদ্যত লোভপংকিলতা তখন সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে, কিন্তু অকরুণ পারিপার্শ্বিক মানুষকে স্বস্তি দিত না দিনে-রাতে। টিকে থাকার অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে সে স্বাভাবিকভাবেই পশুচর্মের দিকে আকৃষ্ট হ'ল, পশুশিকার তার উদরপূর্তির জন্য অপরিহার্য।

আদি মানবের পরিচ্ছদের উপযোগিতা দু'রকম—প্রাকৃতিক বিপদ থেকে দেহরক্ষা এবং তার সহজ-স্বচ্ছন্দ গতিবিধি বিন্দুমাত্র বাধাগ্রস্ত না করা।

আদি যুগের চর্মাবরণ দিয়ে যে পরিচ্ছদ সুরু তা যুগ-যুগান্তর সরণী বেয়ে অসংখ্য অভাবিত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজকের নয়নভুলানো অতি বিচিত্র অবস্থায় পৌঁছেচে। একই দিনে ঘরে-বাইরে, সকাল-সন্ধ্যায় আজ রকমারী পোষাক অপরিহার্য। শ্রীযুত মনুর আদি সন্তানের গাত্রাবরণ আবিষ্কারের হাজার হাজার বছর পরে উপলক্ষ বুঝে পোশাক পরার রেওয়াজ ঠাঁই পেয়েছে মানুষের মনে। আদম-ইভ-এর কল্পনাতেও ছিল না আজকের অংগাবরণ-বৈচিত্র্যের ছবি :

'When Adam delved and
Eve span,
who was then the gentleman ?'

—এ কথা আক্ষরিক অর্থে এবং রূপকার্থে সত্যি।

পরিবর্তনের হাওয়া কখনও বন্ধ হয়ে যায় না। পলে পলে তার কাজ অবিরাম গতিতে প্রবাহিত। চোখে পড়ে না প্রথমে, তারপর সহসা একদিন যখন বহু বিন্দুর সমষ্টি সিন্ধুর রূপ নেয়, আমরা বুঝতে পারি গতির বেগ—যায় যায়, থামতে-না-জানা সময়স্রোতে কত কি হারিয়ে যায়, ভেসে ওঠে নতুনতর কত কিছু; পরিবর্তন বিরামহীন। এই প্রবহমান সময়ের পথ হেঁটে মানুষ ক্রমে সমাজ-অনুগ হয়ে উঠছিল, সে তাকাতে সুরু করল আশপাশে এবং প্রতিবেশীদের দিকে—হিসেব করার প্রেরণা জানিয়ে দিল তার সূক্ষ্ম অস্তিত্বর বার্তা। প্রতি পদে নিজের পড়শীকে ছাড়িয়ে যাওয়ার বাসনার চিহ্ন তার পোশাকেও ফুটে উঠল খুবই স্বাভা কারণে। অন্যার তুলনায় ভালতর সক চামড়া তার প্রয়োজন, আর তার আ অন্যর তুলনায় ভালতর খাদ্য এবং পো পড়বে এ আকাঙ্ক্ষাও অস্বাভাবিক নয় আ অনেক অ-নে-ক পথ পেরিয়ে এসেছে - হাজার বছর ধরে, কিন্তু আজও কি এ উপহসিত হয়, অ-স্বাভাবিকতার অপবাদ হয় কি এমনতর চিন্তাশীল মানুষকে? বৃদ্ধির ফলে সে যুগের মানুষকে খুঁজে হয়েছিল নতুন নতুন দেশ, ফলে বৈচিত্র্য বেড়ে চলছিল। ক্রান্তীয় অঞ্চলের ঠাণ্ডা দেশে অনেক বেশী পোশাক প্রয়ো দেহটা টিকিয়ে রাখার জন্য। তা সর্দার, শিকারী, পুরোহিত, চাষী প্রমুখ নিজের নিজের বৃত্তিগত চাহিদা অনুযায়ী ভিন্ন পরিচ্ছদ বেছে নিল, যা আবহাওয়া বিশেষ পেশার বিশিষ্ট চিহ্ন দাঁড়াল কা

মানুষের এগিয়ে চলা সুরু হলো আবরণের পরিবর্তন নিয়ে। আদম-এর পাতা তার আর যথেষ্ট মনে হ'ল না, কিছু চাই—যা দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সাজা সাদামাঠা দেহ; আবহাওয়া এবং প্রতিষ্ঠার চাহিদাও মেটাতে পারা চাই।

সূতি এবং পশম আবিষ্কারের সংগে এদিকে মানুষ এগিয়ে গেল অভাবিত যার জের আজও চলছে, কখনও মিটবে মনে হয় না। ব্যক্তি বা সমষ্টিগত চাহিদা রুচি তৃপ্ত করার উপায় সে খুঁজে পেল এই আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। প্রয়ো

তাগিদেই জন্ম নিল পোশাক গড়ার কারিগর, দর্জি, অথচ পরমায়ু নিয়ে।

থেমে নেই মানুষ। থামা সম্ভব নয়। এগিয়ে-চলা সভ্যতার সংগে সংগে এবং জটিলতর জীবনযাপনের জটিলতর অবস্থার সংগেও বটে, মানুষের মধ্যে শ্রেণিগত বিভেদ স্পষ্টতর রূপ নিতে লাগল এবং এই প্রভেদের প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই বহুধাবিভক্ত মানব-সমাজের পোশাক-আশাককেও রেহাই দেয় নি। অনেক সময় যাঁদের হাতে সেইসব সীমজিক পরগাছা অথচ সর্বেসর্বা জমিদারবাবুর দল পোশাকের প্রান্তে ঝালর লাগিয়ে ছন্দায়িত করে তুললেন সাধামাঠা অংগাবরণ, আবরণের আবরণে ছোঁয়া লাগল আভরণের সরসতার। ধাপে ধাপে তা চূড়ান্ত রূপ নিল—আপাদমস্তক ঢাকা পড়ে গেল পরিচ্ছদের ঘটায়। গতরে-খাটা মানুষ, চাষাভূষোদের পোশাক নিতান্তই সরল, পুরোহিতের বৃত্তিসূচক বিশিষ্ট পোশাক, কোর্ট-কাছারিতে যাদের আনাগোনা তাদের পোশাক ভিন্ন। এ ছাড়া দেশরক্ষায় অতন্দ্র-প্রহরী সৈনিকের পোশাক-বৈচিত্র্যও সংলক্ষ্য, তার পোশাক নিছক প্রয়োজন, উপযোগিতা অনুযায়ী তৈরী।

মধ্যযুগে, যখন জীবন কাটত মন্দাক্রান্তা ছন্দে এবং ভূস্বামীদের অবসর ছিল অখণ্ড, তখন আবরণের বৈচিত্র্যসাধনে তাদের দৃষ্টি পড়ল একান্তভাবে। মর্যাদাসূচক হয়ে দাঁড়াল নানা রংয়ের নানা ঢংয়ের পোশাক। নির্দিষ্ট শ্রেণীর বাইরে অন্য কোন মানুষ ঠিক একই রকম পরিচ্ছদে নিজেকে সজ্জিত করার অধিকার পেত না। শেষে এ ঝোঁক দাঁড়াল ...ক এবং আপাদমস্তক সুসজ্জিত জমিদার-বাবুর পক্ষে হেঁটে বেড়ান মুস্কিল হয়ে উঠল। ঘোড়া বা গাড়ির সাহায্য ছাড়া নড়তে পারতেন না মহামান্য বাবুরা আর তাঁদের পুরাংগনারা বহুমূল্য পোশাকের বাণ্ডিলে পর্যবসিত হলেন প্রকৃতপক্ষে। ইউরোপে কোন লেডির পেটি-কোট, কোট, ফ্রক, গোভস ইত্যাদি পরিহিত চেহারা এবং এ দেশে শাড়িতে মোড়া জমি-দারনীর চেহারা মানসপটে ভেসে উঠলেই ব্যাপারটার জবরদস্ত রূপ খানিকটা অন্তত বোঝা যায়। আর, যেসব অনুচর সহচরী এঁদের চারপাশ উজ্জ্বল করে শোভা পেতেন, তাঁদের অংগসজ্জাও কম বাহারে ছিল না আদৌ। যদিও বা নিয়মমত অল্প মূল্যের এবং অপেক্ষাকৃত কম ঝলমলে। মনিব এবং মনিবনীর মান-মর্যাদা বজায় রাখার জন্যই এই ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল পাকাপাকিভাবে। সেদিন আর নেই। হায় রে, কবে কেটে গেছে কালিদাসের কাল! সে-রাজার সংগে সংগে রাজকবিও তাঁর কাব্যিক বাসন্তী-বাস, রঙিন উত্তরীয় নিয়ে কালের গোলকধাঁধায় পথ হারিয়ে ফেলেছেন। কবি-গৃহিণীর তনুলতার পাকে পাকে যে আবরণ ছন্দের মত অনুরণিত হ'ত, তাও নিরুদ্দেশ। এ এক নিষ্ঠুর যুগ। প্রয়োজনের নির্মম কশায় ধনী-দরিদ্র, কবি-অ-কবি সকলেই ঊর্ধ্বশ্বাস: নীরবে-নিভৃতে নিরালায় দু' দণ্ড বসে নিজেকে সাজিয়ে নেওয়ার অবসরও মেলা ভার।

শিল্প-বিপ্লবের গদ্যময় নীরস আঘাতে পাল্টে গেছে সব কিছু রাতারাতি। জীবনের গতি হ'ল দ্রুততর, মন্দাক্রান্তা যেন কবেকার স্বপ্নে দেখা এক মধুর স্মৃতির মত আলতো করে ছুঁয়ে যায় কোন কোন বিরল মুহূর্তে। জটিলতর জীবনের ছন্দে পা মিলিয়ে চলার তাগিদে প্রভু-ভৃত্য উভয়েরই পোশাক সহজতর করে নেওয়া অনিবার্য। মধ্যযুগের লীলায়িত আবরণ যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিদায় নিল আরও সহজকে জায়গা করে দিয়ে। প্যাণ্ট, সার্ট, বড়জোর ধুতি-পাঞ্জাবী, কিংবা পায়জামা-পাঞ্জাবীরই আজ জয়-জয়কার। রাজারাজড়া এবং তাঁদের সমগোত্রীয় মানুষ এ পরিবর্তন মেনে নিতে পারেন নি, তাঁরা শেষ চেষ্টা চালিয়েছেন এর বিরুদ্ধে, তবুও কালের অমোঘ পরিবর্তন তাঁদেরও রেহাই দেয় নি পুরোপুরি, মেনে নিতে হয়েছে কিছু কিছু—ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয়।

যেদিন মেয়েরা এগিয়ে এল পুরুষের সংগে একসংগে এগিয়ে চলার দাবী নিয়ে, এগিয়ে চলল বাধা সত্ত্বেও, সেদিন থেকে তাদের পোশাকেও পরিবর্তনের চিহ্ন ফুটে উঠছে সংগত কারণেই। স্কার্ট বা শাড়ি পড়ার ছন্দ পাল্টেছে, হ্রস্বতর হয়েছে তাদের পোশাক প্রয়োজনের তাগিদের সংগে সমতা বজায় রেখে। আবার ফিরে এসেছে আদিযুগের মূল চিন্তা ঘুরে-ফিরে, বহু পরিবর্তনের ধাপ বেয়ে—আজ মানুষ তার আবরণ তৈরী করে মূলত প্রয়োজনের দিকে দৃষ্টি রেখে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, যে মানুষ নিজের প্রয়োজনে পোশাক তৈরী করেছিল, তার উদ্ভবের সংগে সংগে তার অংগাবরণেরও উদ্ভব ঘটেছে। হয়ত আবার আমরা অনুভব করছি অংগসজ্জা অংগেরই জন্য, পৃথক ভাবে তা মূল্যহীন। অংগের গরবেই গরবিনী অংগসজ্জা এবং আবরণের তুলনায় আবরিত এই মনোবৃদ্ধি শুভ লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

কাজ কমাতে হলে মাপসই ঝাঁটা চাই

উন্নত দেশগুলিতে কাজকমের সুবিধার জন্য আধুনিকীকরণ ও যান্ত্রিক উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও গৃহিণীদের খাটুনি কমে নি। পুরুষদের যেখানে সপ্তাহে চল্লিশ ঘণ্টা কাজ করতে হয়, সেখানে একজন মহিলা, যাকে পরিবারের চারজন মানুষ ও তিনটে ঘর সামলাতে হয়, তাকে গড়ে সপ্তাহে পঁয়ষট্টি ঘণ্টা কাজ করতে হয়। আবার যে গৃহিণী বাইরে চাকরী করে ও ঘরে বাচ্চা সামলায় তাকে কম করে সপ্তাহে আটাত্তর ঘণ্টা কাজ করতে হয়। সুতরাং ...র কাজকর্ম যাতে আরও সহজ হয় ও কাজের সময় কমে সেজন্যে নতুন নতুন পন্থা খোঁজা হচ্ছে।

এ-সম্বন্ধে পশ্চিম-জার্মানীর হামবুর্গে ও হ্যানোভারে দু'দুটো প্রদর্শনী হয়ে গেল। একটি প্রদর্শনীর নাম "আপনি ও আপনার জগৎ" ও অপরটির নাম "দ্বাদশ গৃহ অর্থনীতি প্রদর্শনী"। একটি মেয়েদের পেশা সম্বন্ধে ও অপরটি গৃহের সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে হলেও দুটিরই উদ্দেশ্য মেয়েদের জীবনে বেশ কিছুটা সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আনা।

দেখা গেছে মেয়েদের অনেকটা সময় যায় হয় রান্নাঘরে, নয় ঘরদোর পরিষ্কার রাখতে। ঘর পোঁছা একটা কঠিন কাজ, এতে যেমন সময় লাগে তেমনি পরিশ্রম হয়। দেখা গেছে, ঘরের মেঝে যদি ভালো হয় ও ঘর-সাফ করার উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম থাকে তাহলে কাজটা অনেক সহজ হয়। যদিও আজকাল ঘরসাফ করার বহু সময়-ক্ষেপক যন্ত্র বেরিয়েছে, তবুও সেগুলো গোঁড়া গৃহিণীদের মনে ধরে নি। সবচেয়ে আধুনিক একটি আবিষ্কার হল মেয়েদের বিভিন্ন উচ্চতা অনুযায়ী উপযুক্ত লম্বা ঝাঁটা—

● গবেষণারত ফরাসী তরুণী

যাতে চটপট ঝাঁট দেওয়া যায় ও ঝাঁট দিতে কষ্ট না হয়।
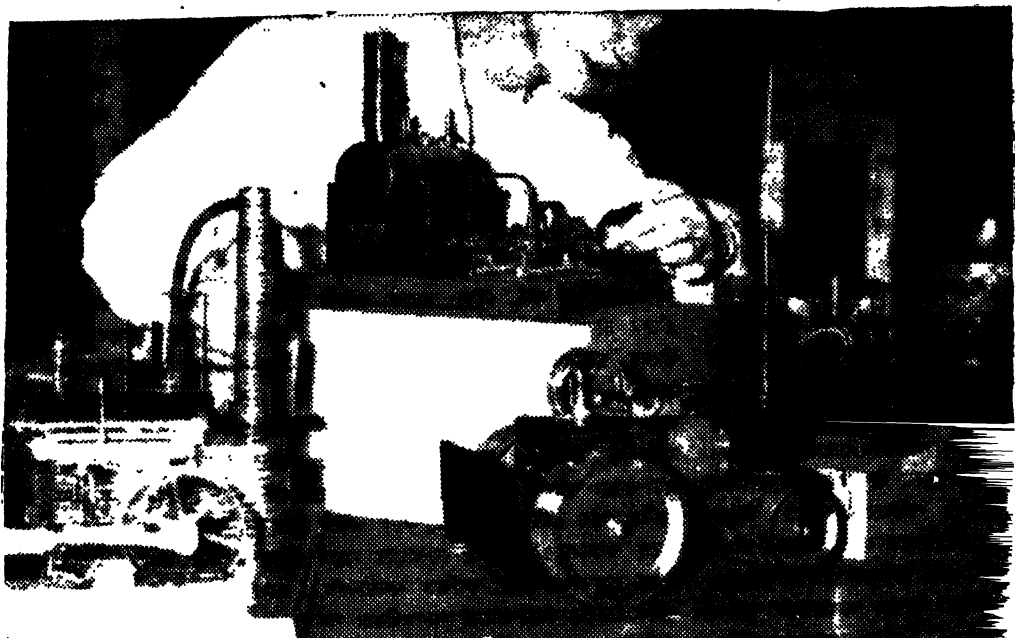
রান্নাঘরও যদি হিসেব করে তৈরী করা যায় ও উপযুক্ত সাজসরঞ্জাম থাকে তাহলে অনেক পরিশ্রম বাঁচে। সেকিলেলী রান্নাঘর হলে উনুন, তাক ও খাবার টেবিলের মধ্যে গৃহিণীকে দিনে ১৮০০ গজ চলাফেরা করতে হয় অথচ একটু পরিকল্পনা করে সবকিছু ব্যবস্থা করলে দিনে ৫৭০ গজ হাঁটাহাঁটি করলেই চলে। তাহলেই দেখুন এই হিসেবে মাসে কতটা সময় ও খাটুনি বেঁচে যেতে পারে।

এ ছাড়া সময় বাঁচাবার আজকাল কতরকম কলকব্জা রয়েছে। যেমন—রেফ্রিজারেটার, ওয়াশিং মেশিন, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, সেলাই কল ইত্যাদি। আজকাল চা তৈরীর কল, পত্রের দাগ তোলার ওষুধ বেরিয়েছে। তবে যদি মেয়ের এমন একটা রোবোট বা মানুষ তৈরী হোক, যে ঘরের কর্ম করে দেবে তাহলে তাদের অনেক দিন অপেক্ষা করতে

অনুভব

তারকপ্রসাদ ঘোষ

দেহে ভব মুক্তধারা, চুলে স্নিগ্ধ সুরভি-সাকর—
কল্পনা-নাপিত মন পলাশের পেলব-সিঁদুরে
ভেসে যায় অহর্নিশ অজানার স্রগ্ধ সুরে-সুরে--
বুকের-বকুলে কাঁপে দুটি পদ্ম নিত্য থরোথর!—

কত ভয় কত লজ্জা কত ভুল ভাবনা-নির্ঝর
অতীন্দ্রিয় মুগ্ধতায় বারে বারে জাগে চিত্তপুরে—
আতসে বরিষ্ঠ ভাষা, আশা যার নিগূঢ় বিধুরে
ক্ষণে ক্ষণে লালসায়—ক্ষুধা হয় সুধার-নিকর!—

এরই লীলা যাত্রা তাই অবিরাম জীবন-সীমায়,
যৌবন নিভ্রান্ত তাই আত্যন্তিক সময়-সমীপে,—
গূঢ়-রক্ত কামনায় কবোষ্ণ-সে প্রাণের-নির্যাস—
তীব্র তীক্ষ্ণ জ্বালাময় কৌতুকের অপূর্ব লীলায়
লীলায়িত সে-কী রূপ অপরূপ স্বরূপ-অধিপে-
সেই সুখ সেই স্বাদ সেই প্রেম পরম-আশ্বাস!—

কোজাগরী লক্ষ্মী

হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

আজকে চাঁদের রোশনায়েতে আঁধার রাতের চেতন
লক্ষ মতির ঝরণা নামে আকাশ বেয়ে ধরার পরে
নদীর বুকে একটি দুটি
কুমুদ কলি উঠলো ফুটি,
রূপের ছটা উথলে পড়ে পল্লীমায়ের জীর্ণ দ্বারে
অমরলোকের কোন দেবী গো আজকে ধরায় চরণ
ধানের ক্ষেতে লুটিয়ে আঁচল সাজি ভরে ধান্য
বনের কুসুম রাতের তারা,
অবাক হয়ে চাইছে তারা,
চরণ তোমার পূজবে বলে জাগছে রাতে সবাই
আকাশ ধরা আলোয় আলো ঐযে মায়ের আনন
ধরার বুকে পড়ছে ঝরে স্নিগ্ধ মুখের অভয়বাণ
কাশের ক্ষেতে চামর দুলে,
শিউলি বধূ ঘোমটা তুলে,
ওগো, দেখবে যদি বাইরে এস কোজাগরী লক্ষ্মী

রাশিয়ায়

মুক্তিকামী শিখনেতা সর্দার গুরুচরণ সিং

জুলফিকার

ভারতবর্ষকে ইংরাজ শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার কঠিন ব্রতে দেশের যে-সমস্ত দুঃসাহসিক বীর সন্তান আত্মনিয়োগ করেছিলেন সর্দার গুরুচরণ সিং তাঁদের অন্যতম। দেশের মুক্তিসংগ্রামে অনেক দেশ-প্রেমী জীবনপণ করে প্রচণ্ড বিপদ-বাধার সম্মুখীন হয়েছেন, আমৃত্যু অসংখ্য নির্যাতন ও দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন, অথচ এঁদের অনেকেরই নাম দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে অনুল্লেখই রয়ে গেছে। সর্দারজী এই উপেক্ষিতদেরই একজন।

ইংরেজদের রুশাতঙ্ক (?)

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রুশ যখন মধ্য এশিয়ায় তার আধিপত্য বিস্তার সুরু করল এবং কিছুদিনের মধ্যেই আফগানিস্থান, কাশ্মীরও চীন সীমান্ত পর্যন্ত তুর্কীস্থানের বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড তার রাজ্যভুক্ত করে ফেলল, তখন ইংরেজদের অনেকের মধ্যেই রুশাতঙ্ক প্রবল হ'য়ে দেখা দিল।

তারা ভাবলেন, বোধহয় এইবার হিন্দুকুশ ও কারা-কোরাম পার হয়ে রুশ ভল্লুক ভারতের দিকে এগিয়ে আসবে। আর্কুহার্ট, ফ্রেজার-টাইলার, রলিনসন, কার্জন প্রমুখ রাজনৈতিক লেখক ও ভাষ্যকারেরা ভারতে সম্ভাব্য রুশ অভিযান বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে ও পুস্তিকা প্রকাশ করে ভারতীয় জনচিত্তে গভীর ত্রাস সঞ্চার করেছিলেন। অনেকে অবিশ্যি ওঁদের এই প্রচারের মূলে রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল বলে সন্দেহ করেন।

ইংরেজদের মত প্রবলপ্রতাপ গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ভারত আক্রমণের মত একটা বিরাট সামরিক অভিযান চালানোর মত প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র, সাজসরঞ্জাম ও শিক্ষিত সৈন্যদল তখন রুশদের আদৌ ছিল না।

বৃটিশ রাজনৈতিক ও সাংবাদিকদের রুশ আক্রমণের কথা ফলাও করে লেখার পেছনে একটা প্রোপাগ্যাণ্ডার ভাব ছিল। রুশদের বর্বরতা ও নৃশংসতার কাহিনীও এইসঙ্গে প্রচার করা হচ্ছিল। উদ্দেশ্য—ভারতবাসীরা সদাশয় ইংরেজ সরকারের সুশাসনে যে অনেক সুখশান্তিতে আছে—সেটা তাদের ভাল করে বুঝিয়ে দেওয়া।

The British Statesman and the British Press stressed on the danger, menacing India from the north, in order to intimidate people of India and justify British expansion.

Prof. I. P. Minayev বলে ইন্দোলজিস্ট এই সময়ে ভারত পর্যটনে এসেছিলেন। ভারতের নানা স্থানে তিনি গিয়েছেন। ১৮৮০ সালে তিনি তাঁর ভারতীয় সফরের রোজনামচায় লিখেছেন,—

'বৃটিশরা রুশদের ভারত আক্রমণ নিয়ে এত বেশী এবং এত দীর্ঘকাল ধরে আলোচনা চালাচ্ছে যে, ভারতবাসীর মনে, এইরূপ একটা অভিযান যে অত্যাসন্ন—এই ধারণাটা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছে।

বহু লোকের মুখ থেকে বহুবার শুনেছি যে, রুশেরা যদি সত্যিই ভারত আক্রমণ করে, তাহলে অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ জনগণের অনেকেই রুশ সঙ্গে যোগ দেবে।---'

মাত্র বছর দশেক হল, দ্বি মহাযুদ্ধের পর মিনায়েভের ডাইরিটি ছাপা হয়ে পুস্তকাকারে হয়েছে—তাঁর দেশে ফেরার পঁচাত্তর বছর বাদে।

জার সরকার যদিও সে স মধ্য এশিয়ায় সামরিক অভি চালাচ্ছিলেন, কিন্তু পামীর পেরি ভারতে আসবার তাঁদের কোন সঙ্কল ছিল না। অদূর ভবিষ্যতে এ কোন ইচ্ছা তাদের মনে জাগ্রত কি সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকা রয়েছে।

রুশ-তুর্কীস্থানে ভারতীয় রাজন্যবর্গে দূত প্রেরণ

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে রাজনৈতিক মুক্তিপ্রয়াসীরা বৈদেশিক সহায়তায় বৃটিশদের বিতাড়িত করবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। শক্তিশালী বিদেশী রাষ্ট্র হিসেবে রুশই ছিল আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। সুতরাং তারই সাহায্য প্রাপ্তির আশায় কয়েকটি দেশীয় রাজ্য (যাদের সার্বভৌমত্ব মাত্র বছরকয়েক আগে লোপ পেয়েছে) তৎপর হয়ে উঠল। ১৮৬৫ খৃস্টাব্দে কাশ্মীরের রাজা রণবীর সিংহের প্রেরিত মিশনের লোকেরা তাসখেণ্টে রুশ সরকারের প্রতিনিধি সামরিক শাসনকর্তা Cheryanev-এর সঙ্গে দেখা করল। দীর্ঘদিন বহু ক্লেশ ভোগ করে এরা তাসখেণ্টে পৌঁছায়। সীমান্তে পাহারাদার বৃটিশ সৈন্য কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে এদের দুজনের মৃত্যু হয়।

রুশ কর্তৃপক্ষ কাশ্মীরের দূতদের

জানালেন যে, আমুদরিয়া নদী পার হয়ে রাজ্য বিস্তারের কোন ইচ্ছাই তাঁদের নেই।---

শেষ পর্যন্ত কাশ্মীরীদের সঙ্গে রুশদের একটা বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হল, রুশদের সঙ্গে কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ মৈত্রী অটুট রাখার প্রতিশ্রুতিতে।

এরপর ইন্দোরের হোলকারের প্রেরিত মিশন ১৮৬৬ সালে লাহোর পেশোয়ার, কাবুল, বামিয়ান ও বাল্খ হয়ে বোখারা প্রদেশের কার্শীতে এসে পৌঁছল। হোলকারের প্রতিনিধিরা তুর্কীস্থানে অস্থায়ী সামরিক শাসক Manteuffel-এর সাথে সাক্ষাৎ করল।

হায়দ্রাবাদের নিজাম, বিকানীর যোধপুর ও জয়পুরের মহারাজা প্রভৃতি রাজপুত নৃপতিদেরও অনেকেরই এই মিশনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। ধরতে গেলে এটা ছিল একটা জয়েণ্ট মিশন এবং দূতেরা ছিলেন কমন এজেণ্ট। হোলকার ছাড়া অন্যান্য রাজাদের পক্ষেও তাঁরা স্থানীয় রুশ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালান।

মৌখিক যথেষ্ট সহানুভূতি ও সদিচ্ছা প্রকাশ করলেও ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটানো ব্যাপারে জার সরকার কোন সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণে আদৌ সম্মত হলেন না।

এরপর ১৮৬৯ সালের অক্টোবর মাসে কাশ্মীর-রাজ্যে দ্বিতীয় প্রতিনিধি-দল দেশ থেকে রওনা হয়ে ১৮৭০ সালে জুন মাসে তাসখেণ্টে উপস্থিত হল। এদের দৌত্যও সফল হল না। রুশেরা যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শন করলেও তাদের নিরপেক্ষ নীতি থেকে বিচ্যুত হতে চাইল না।

বোম্বাইয়ে রুশ রণতরী

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে একখানা রাশিয়ান যুদ্ধজাহাজ বোম্বাই বন্দরে পৌঁছলে ভারতবর্ষের দিকে দিকে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। এ সম্বন্ধে রুশ ঐতিহাসিক A. A. Benediktov লিখেছেন,—

Crowds of people moved to the city to convince themselves of the existence of the Russians, whose help, according to popular belief Nana Shahib went to seek. So great was the excitement of the people and so big was the crowd to the Bombay harbour, that even TIMES OF INDIA was compelled to report these events......

The people began to talk of a quick downfall of the British Yoke which would be castoff by Russia and Nana Shahib.

সর্দার গুরুচরণ সিং

বোম্বাইয়ে রুশ জাহাজের উপস্থিতিতে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে যখন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হল এবং যখন ভারতীয়দের অনেকেই বাইরে থেকে রুশ সাহায্যের প্রত্যাশা করছিলেন, সেই সময় (১৮৭৯ সালে) সর্দার গুরুচরণ সিং নামক একজন বৃদ্ধ শিখ, শিখ-গুরুর কাছ থেকে রুশ তুর্কীস্থানের গভর্নর জেনারেলের কাছে একখানা পত্র নিয়ে তাসখেণ্টে পৌঁছুলেন। একখানা পাতলা নীল কাগজে গুরুমুখী অক্ষরে চিঠিখানা লেখা, নীচেও কারো স্বাক্ষর নেই, যার উদ্দেশ্যে লেখা তার নামেরও কোন উল্লেখ নেই। পত্রের বক্তব্যে বলা হয়েছিল পশুপাখীর গল্পের রূপকের মাধ্যমে (the message was stated in the language of Aesop)। শিখদের ধর্মপুস্তক 'গ্রন্থ সাহেবের' মধ্যে লুকিয়ে চিঠি খানা আনা হয়েছিল।

সর্দার গুরুচরণ ছিলেন একজন যথার্থ দেশপ্রেমিক। তিনি বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে আপোষ-বিহীন সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন।

দিল্লীর ভূতপূর্ব বৃটিশ সরকারের মহাফেজখানায় রক্ষিত গোপনীয় দলিলপত্রথেকে এই বর্ষীয়ান শিখ নেতার সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেছেন, ঐতিহাসিক গবেষক শ্রী পি সি. রায়। রাশিয়ায় ভারতীয় রাজনৈতিক মিশনের বিষয়ে সম্প্রতি রুশ ও ভারত দু'দেশেরই প্রচুর গবেষণা হয়েছে। ভারতীয় ও রুশ-ঐতিহাসিকদের যুগ্ম প্রচেষ্টায় এদেশের স্বাধীনতার ইতিহাসে একটা নতুন পরিচ্ছেদ সংযোজিত হয়েছে।

আফগানিস্থানের সঙ্গে তখন ইংরেজদের যুদ্ধ (দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ) চলছিল। নিপীড়িত স্বদেশকে দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত করবার আকুল আকাঙখায় উদ্বুদ্ধ বৃদ্ধ সর্দারজী (বয়স তখন তাঁর সত্তর বছরেরও বেশী) রুশ সাহায্যের আশায়, সশস্ত্র সীমান্ত-প্রহরী বৃটিশ সৈন্যদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে, সুদীর্ঘ দুর্গম পার্বত্য ও বিপদসঙ্কুল পথ পদব্রজে অতিক্রম করে, ক্ষুধা, শ্রান্তি ও দুর্জয় শীত উপেক্ষা করে, কাবুলের আমীর ও বোখারার খানের রাজত্ব পার হয়ে তুর্কীস্থানে রুশ সরকারের সদর দপ্তরে এসে উপনীত হলেন এবং মহামান্য জারের প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

১৮৪০ সালে পাঞ্জাবে যে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন দেখা দেয়, সর্দার গুরুচরণ তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন।

এরপর তিনি নামধারী নামক এক বিপ্লবাত্মক ধর্মীয় সংস্থায় যোগ দেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রত্যক্ষভাবে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও এদের আসল উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন।

It concealed under a religious cover its political essence and set itself to the task of ousting the British Colonist from India.

বাবা রাম সিং-এর পত্র

সর্দার গুরুচরণ সিং যে লিখন নিয়ে তাসখেণ্টে গিয়েছিলেন, সেটা নির্বাসিত নামধারী আন্দোলনের নেতা বাবা

রাম সিং-এর লেখা, রেঙ্গুন থেকে। কৃপাণধারী, বলিষ্ঠ, দৃঢ়চেতা, স্বাধীনতাকামী শিখ যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে নামধারী আন্দোলন অভূতপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তোলে এবং এই আন্দোলনকারীদের আয়ত্তে আনতে ইংরেজ সরকারের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল, নামধারী নেতা বাবা রাম সিং ধৃত হয়ে ব্রহ্মে নির্বাসিত হলেন, কিন্তু তাঁর অবর্তমানে দলটি ভেঙ্গে গেল না। তাদের বৃটিশ বিরোধী গুপ্ত বৈপ্লবিক কার্যকলাপ তখনও চলছিল।

চিঠিতে বাবা রাম সিং জানিয়েছিলেন যে, গুরু নানকের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হতে চলেছে। নানকজী যে অদূর ভবিষ্যতে রক্তপাতের কথা বলেছেন, সেটা রুশ-ইংরেজ সংঘর্ষেরই ইঙ্গিত। রাশিয়া এই সময় যদি ভারত আক্রমণ করে তবে ইংরেজদের পরাজয় সুনিশ্চিত এবং এর ফলে তারা ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

বাবা রাম সিংয়ের পত্র নিয়ে সর্দারজীর সঙ্গে উচ্চপদস্থ কয়েকজন রুশ-রাজপুরুষের সঙ্গে আলোচনা হয়। সর্দারজী বলেন, গুরু নানক তাঁর ভবিষ্যদ্বাণীতে বলেছেন যে, পশ্চিম থেকে যারা এদেশে আসবে তারা রাজ্য বিস্তারের আকাঙ্খা প্রণোদিত হয়ে আসবে না, শুধু দেশটাকে বিদেশী ইংরেজ শাসকদের কবল থেকে মুক্ত করে দিয়ে যাবে, ওরা আসবে পরিত্রাতার ভূমিকায়। শিখ-সম্প্রদায়ের প্রায় সব লোকই এ কথা বিশ্বাস করে।

পাঞ্জাব বৃটিশ শাসনমুক্ত হলে, তার শাসনভার যেন মহারাজ রণজিৎ সিংহের নির্বাসিত পুত্র দলীপ সিংজীর হাতে তুলে দেওয়া হয়,—পাঞ্জাববাসী শিখদেরই এই আন্তরিক কামনা এবং তাঁরা মহামান্য জারকে এই অনুরোধই জানাচ্ছে।

রুশ সরকারের ঔদাসীন্য

সর্দার গুরুচরণ জেরাভশান জেলার শাসনকর্তা N. A. Ivanov-এর সাথে কথাবার্তা চালান। উপর মহলের রুশ-রাজপুরুষদের সমক্ষে সর্দারজী যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি বলেন—রাশিয়ার ক্ষমতার ওপর পাঞ্জাব তথা ভারতের জনসাধারণের অগাধ আস্থা আছে এবং তাদের একমাত্র পরিত্রাতা হিসাবে তারা প্রত্যাশাব্যাকুল হয়ে চেয়ে আছে রাশিয়ার দিকে। গুরুচরণ সিং ছিলেন প্রখর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি ভিক্ষুকের মত বিদেশীর দ্বারে দয়া ভিক্ষা করতে আসেন নি। একথাটা পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, শৌর্যে-বীর্যে ভারতীয় যোদ্ধারা ইংরেজ বা রুশদের চেয়ে কোন অংশে হীন নয়। নেতাজীর জাপানী সরকারের সহযোগিতার কামনার সঙ্গে সর্দারজীর দৌত্যের তুলনা করা যেতে পারে।

রুশ ঐতিহাসিক N.A. Khalfin এ সম্বন্ধে লিখেছেন,—

'In the speeches of Guru Charan Sing (ভূতপূর্ব জার সরকারের দপ্তরের রক্ষিত কাগজপত্রে এই বক্তৃতার অনুলিপি পাওয়া যায়) we find such confidence in Russian power, such belief that we were destined to liberate the Indian people from the hateful domination of Britain that it is impossible to doubt our great moral impact on the population of British India.'

যা হোক প্রতিবারের মত এবারেও রুশ সরকার তাঁদের নিরপেক্ষ নীতি আঁকড়ে রইলেন। তুর্কীস্থানের গভর্ণর জেনারেল K. P. Kaufman-এর আদেশে গুরুচরণ সিং-এর মারফত প্রাপ্ত বাবা রাম সিং-এর পত্রের উত্তর দেওয়া হল, অত্যন্ত ভদ্র ও সৌজন্যপূর্ণ ভাষায়, সদ্ভাব ও সম্প্রীতি রক্ষার প্রতিশ্রুতি জানিয়ে, সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্পর্শবিহীন বক্তব্যে---।

সর্দার গুরুচরণ ১৮৭৯ খৃস্টাব্দের শেষভাগে দেশের দিকে রওনা হলেম, পথি-মধ্যে তিনি বৃটিশ গুপ্তচরদের হাতে ধরা পড়ে যান। কিন্তু তিনি কৌশলে রুশ সরকারের পত্রটি রেঙ্গুনে বাবা রাম সিং-এর কাছে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন, তাঁর সহচর ও ভাই সর্দার বুধ সিংয়ের হাত দিয়ে।

১৮৮১ সালে গুরুচরণকে গ্রেপ্তার করা হল। অভিযোগ রাজদ্রোহিতা। প্রথমে তাঁকে লাহোর জেলে রাখা হয়েছিল, পরে তাঁর বার্ধক্যের কথা বিবেচনা করে তাঁকে মূলস্থানে অন্তরীণ অবস্থায় রাখা হয়। নির্যাতন নেহাৎ কম হয় নি তাঁর ওপর। কিন্তু অদম্য ছিল তাঁর প্রাণশক্তি, অনির্বাণ ছিল তাঁর দেশপ্রেম। বিপদের সম্মুখীন হয়েও তিনি সঙ্কল্পচ্যুত হন নি।---সর্দারজী পুনরায় রুশ সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন এবং ১৮৮৭ সালে পুনরায় রুশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।

বয়স তখন তাঁর আশী।

আফগানিস্থান ও তুর্কীস্থানে যাবার পাশপোর্টের জন্য বহু প্রকার চেষ্টা করলেন কিন্তু ইংরেজ সরকার তার আবেদন অগ্রাহ্য করলেন। আকাঙ্ক্ষিত রুশ যাত্রা তাঁর ঘটে উঠল না।

দলীপ সিং-এর চিঠি

সর্দার গুরুচরণ যখন দ্বিতীয়বার রাশিয়া যাবার মনস্থ করেছিলেন (১৮৮৭ সালের প্রথম দিকে), সেই সময় রুশ-সম্রাট তৃতীয় আলেকজেণ্ডারের প্রধানমন্ত্রী, নির্বাসিত পাঞ্জাবরাজ দলীপ সিংহের কাছ থেকে একখানা চিঠি পেলেন।

চিঠিতে ভূতপূর্ব মহারাজ দলীপ জানিয়েছিলেন যে, তিনি ভারতীয় রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি হিসাবে রাশিয়ায় আসতে চান এবং তাঁদেরই তরফ থেকে রুশ সরকারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাতে চান। তিনি এটাও জানিয়ে দেন যে, এই সমস্ত দেশীয় রাজাদের হাতে তিন লক্ষাধিক সৈন্য আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। রাশিয়া যদি ইংরেজের বিরুদ্ধে অভিযান

● টাইপ-রাইটারে আঁকা শিবমন্দির
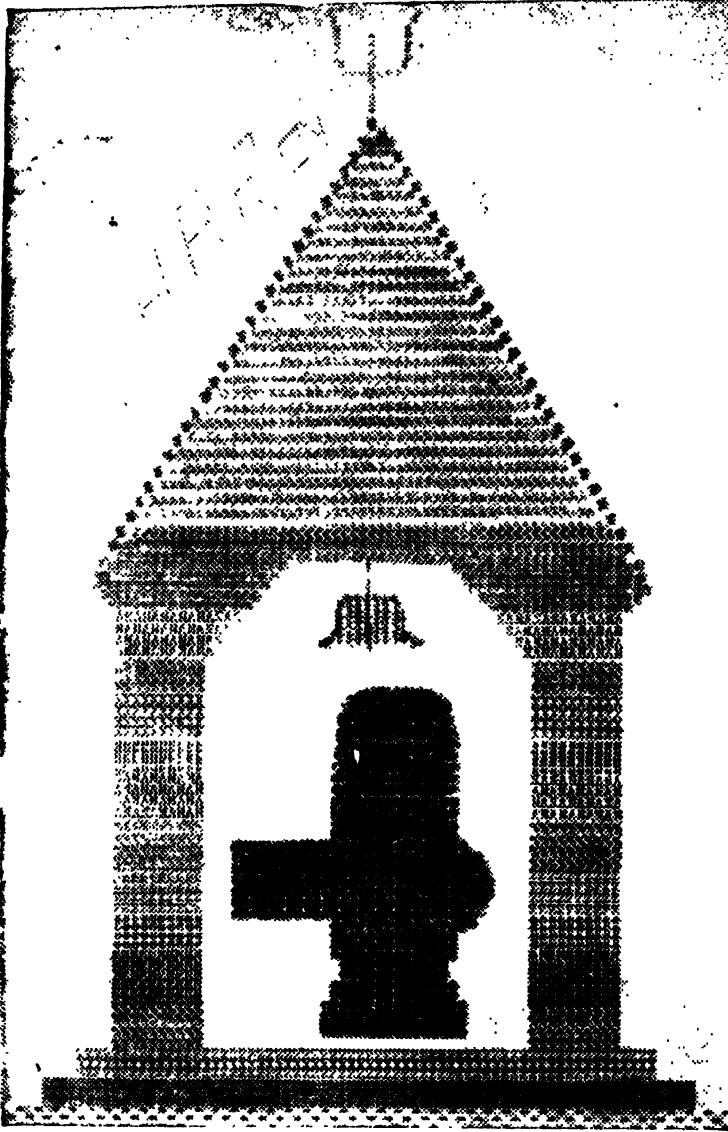
শিল্পী—হরপ্রসাদ রায়

It would be a interestin to investigate the fac ডিপ্লোমেসীর দিক থেকে খাঁ উত্তর,---non comittal এর তাৎপ হচ্ছে এই যে, এই ব্যাপারে আমাদে সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন নেই তবে ওদের কথার সত্যতাটা যাচা করে দেখা যেতে পারে। সম্রাট অবিশি ভূতপূর্ব মহারাজের অনুরোধ অনুযায়ী তাঁকে রাশিয়ায় আশ্রয় দিতে স্বীকৃ হলেন কিন্তু ইংরেজরা দলীপকে বিটেন ছেড়ে অন্যত্র যেতে দিতে কিছুতেই রাজী হল না।

গুরুচরণ সিংয়ের দৌত্যের ব্যাপারে ভারত গভর্নমেণ্টের গুপ্ত নথিপত্র ঘেঁটে অধ্যাপক রায় যে-সমস্ত তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন, তাতে জানা যায়, এই বৃদ্ধ শিখ ভদ্র-লোকটির মত নির্ভীক, আত্মসুখবিমুখ, একনিষ্ঠ, সুচতুর ও মর্যাদাসম্পন্ন দেশ-প্রেমিক সত্যিই বিরল।

রুশ-ভারতীয় সম্পর্ক সম্বন্ধে গবে-ষণারত রাশিয়ান ঐতিহাসিকেরা একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, সদারজীর দেশবাসী যেন তাঁর কথা না ভোলে না। তাঁরা বলেছেন—

......Guru Charan Sing is worthy of being remem-bered as one of the many stubborn fighters for their country's independence.

চালায় তবে এরা সবাই এসে দাঁড়াবে রুশ সৈন্যের পাশে, দেশের মুক্তি-সংগ্রামে যোগ দিতে।

দলীপ সিংয়ের প্রস্তাবে জার আলেকজেণ্ডারের সরকার বিশেষ সাড়া দিলেন না। এ ব্যাপারে বৈদেশিক দপ্তর থেকে সম্রাটকে যে নোট পেশ করা হয় তার ওপর তিনি মন্তব্য করে পাঠালেন, যেটার ইংরেজী করলে দাঁড়ায়---

আদুরে মেয়ে

খগেন দত্ত

কথার মাঝখানে হঠাৎ সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। চোখ তুলে চাইলাম। দোতলা থেকে নেমে আসছে এক যুবক। বছর চব্বিশ-পঁচিশ বয়েস, শুধু আমি নয় সুবীর মুখার্জী ও তাকালেন।

ইতিমধ্যে নীচে এসে গেছে ছেলেটি। আমাদের টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তার দৃষ্টি সুবীরবাবুর চোখে। হাসি হাসি মুখ। কিছু বলবে এমন একটা ভাব, একটা আবেদন একটা আর্জি।

পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিলাম। মোটা লংক্লথের শার্ট গায়ে। ফুল নয়, হাফ শার্ট। পরনে মিলের ধুতি, তাও মোটা, চেহারায় যৌবনের দীপ্তি থাকলেও খানিকটা ম্লান। স্তিমিত, এ বাড়ীর কেউ যে নয় তা বলে দিতে হয় না।

কথা বললেন সুবীরবাবু। এভাবে কাছে এসে দাঁড়ানোর কারণ জানতে চাইলেন: কি হে মাষ্টার, কি খবর?

পরিচয়টা আর রহস্যাবৃত নয়। নাম ধাম না জানলেও জানা গেল এ বাড়ীর সঙ্গে ওর সম্পর্ক। এ পরিবারের মাষ্টার। সুবীরবাবুর ছেলে কিম্বা মেয়েকে পড়ান। বিনিময়ে বড় একটা অঙ্ক, ভাগ্যবান ছেলে বটে। তাহলে সুবীরবাবুর গৃহ-শিক্ষকতা পায়?

আরও একটু এগিয়ে এল। ছেলেটি, দাঁড়াল টেবিলের কাছ ঘেষে। ডান হাতের মুঠোর মধ্যে বাঁ হাতের আঙুলগুলো তুলে নিয়ে কচলাতে কচলাতে অনেকটা কাঁচু মাচু হয়ে বললে: কিছু টাকার দরকার ছিল যে স্যার।

টাকা? সুবীরবাবু সোজা হয়ে বসলেন। চেয়ারের পিঠ থেকে এলানো দেহ তুলে মৃদু হাসির সঙ্গে বললেন: আজ তো মাত্র সাত তারিখ। এরই মধ্যে টাকার দরকার হয়ে পড়ল।

টেবিলে হাত রাখল মাষ্টার। ডান হাতের তর্জনী দিয়ে টেবিলের কাঠে কাঁচড় কাটতে চাইল। এক সময়ে চোখ তুলে শান্ত কণ্ঠে বললে: জরুরী দরকার না হলে চাইতাম না স্যার। দেশের বাড়ীতে মাকে টাকা পাঠাতে হবে।

এখানে থামল না মাষ্টার। টাকার কেন দরকার তা প্রকাশ করতে গিয়ে আরও অনেক কিছু বললে। এটা ছাড়া আরও একটা টিউশনি করে। চাকরীহীন জীবনে এই অবলম্বন। ওর নিজের আর মায়ের সম্বল। একটা টিউশনির টাকা পেয়েছে। তার সদ্ব্যবহার ও হয়ে গেছে। মেস-ম্যানেজারের পকেট ভারী, খাওয়া থাকার অগ্রিম জমা। সুবীরবাবুর টাকাটা মাকে পাঠাবে। সেইজন্যেই এ অনুরোধ, এ আবেদন।

কথাটা আমার ও ভাল লাগল না।

মাকে টাকা পাঠাবে বলেই মাসের সাত তারিখে মাইনের টাকা দিতে হবে। চলতি মাসের টাকা মাসের প্রথম সপ্তাহেই, সাতদিন পড়িয়ে মাসের টাকা অগ্রিম। সুবীরবাবুর হয়ে নিজেই বললাম: মেসে অগ্রিম দেওয়া নিয়ম। টিউশনির টাকা মাসের শেষে। এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন।

উত্তর শুনে আমি হতবাক। এক কথায় অপ্রস্তুত, যে টাকাটা পাওয়ার জন্যে এ কাকুতি-মিনতি এত অনুনয়-বিনয় তা চলতি মাসের টাকা নয়। গত মাসের টাকা, সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত নটা অবধি এক নাগাড়ে খাটুনির মূল্য। হাত মুখ মস্তিষ্ক চালনার বিনিময়।

আমি নিজে অপ্রস্তুত হলেও সুবীরবাবু অপ্রস্তুত হলেন না। তাঁর কথাতেই তিনি স্থির থাকলেন। একটুও পরিবর্তন নয়, পরিবর্তনের মধ্যে শুধু মুখের হাসি নিশ্চিহ্ন, গলার স্বরে খানিকটা দৃঢ়তার আমেজ, বললেন: তোমার টাকা পঁচিশ তারিখ পাবে মাষ্টার।

আজ্ঞে, অত দেরী হলে---আমতা আমতা করলে মাষ্টার।

ভয় নেই মাষ্টার, তোমার টাকা আমি মারবনা----মাষ্টারের মুখ থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে গলার স্বর আরও গম্ভীর করে বললেন সুবীরবাবু।

ছিঃ। ছিঃ। আঁৎকে উঠে জিভ কামড়ে ধরল মাষ্টার। অনেকটা অপরাধীর মতই বললে: আমি ও কথা বলিনি স্যার।

সুবীরবাবুর গলার স্বর চড়তে লাগল পর্দায় পর্দায়. মুখে না বললেও মনে মনে তাই আছে মাষ্টার। আমি তোমার মত হাজার হাজার মানুষ চরিয়ে খাই। বলছি পচিশ তারিখে পেয়ে যাবে।

আরও কি বলতে যাচ্ছিল মাষ্টার। হয়তো সুবীরবাবুর মিথ্যা অভিযোগের উত্তর। ওর কথার ভুল অর্থ করার প্রতিবাদ। কিন্তু তা করবার সুযোগ দিলেন না সুবীরবাবু। আর কোন কথা নয় মাষ্টার, পঁচিশ তারিখের আগে আমি দিতে পারব না।

এতক্ষণ নীরব শ্রোতা হয়ে বসে ছিলাম, চোখের সামনে ব্যাপারটা জটিল হয়ে গেল, দেখতে দেখতে আয়ত্তের বাইরে। বুঝতে পারলাম না কোথা

থেকে কি হয়ে গেল দৃষ্টির সামনে একখানি রহস্যের পর্দা। মনের সামনেও, সুবীরবাবুর হাতে হয়তো এ মুহূর্তে টাকা নেই, নতুন কোন কাজে হয়তো হাত দিয়েছেন। অজস্র টাকার খরচা, কিন্তু কত টাকা মাইনে মাষ্টারের? ত্রিশ চল্লিশ তারও বেশী? কত আর বেশী?

সুবীরবাবুর কাছে এ ক'টা টাকার অভাব? সে অভাব এক রাতের জন্য হতে পারে। কাল বেলা দশটা পর্যন্ত। পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা কেন? কি কারণে কিসের জন্য?

ব্যাপারটা আমার কাছে অস্পষ্ট ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে। তবু মাঝখান থেকে আপাত জটিল মুহূর্তটা ভালোয় ভালোয় মিটিয়ে দেওয়া দরকার। দুপক্ষের মাঝখানে মধ্যস্থতা।

সে দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ফ্যাসাদ, কি বলা যায়? কি করা যায় এ সময়টাতে। শেষ পর্যন্ত কিছুই করতে হলনা আমাকে। মাষ্টারই নিষ্কৃতি দিলে, শিক্ষিত ছেলে, নির্ভীক তেজস্বী, সুবীরবাবুর কড়া কথার জবাব চড়া গলায় দেবে। এক আঙুলের বদলে পাঁচ আঙুল তুলবে এটাই তো স্বাভাবিক।

তার কোনটাই করলেনা মাষ্টার। আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। চোখের সামনে রহস্যের পর্দাটা যেন আরো একটু পুরু আরো একটু মজবুত। বেরিয়ে গেল অথচ জানিয়ে তো গেল না কিছুই। কাল থেকে আর এ বাড়ীতে আসবে কি আসবে না তার কোন প্রকাশ্য উক্তি তো নয়ই, এমন কি সামান্য আভাসও নয়। হয়তো আসবে হয়তো আসবে না। অভাব আর অনটনের মধ্যেই কানাঘোষা করবে তবু এ অপমান নয়, আত্মসম্মান বিসর্জনও নয়।

ওর কথা মন থেকে মুছে ফেলে নিজের কথায় ফিরে আসব ভাবছিলাম। এমন সময়ে সিঁড়িতে আবার শব্দ। এবার ফুটপাথের কেনা ছেঁড়া চটির শব্দ নয় ফ্যাক্টরীর দামী স্যাণ্ডেল। মচমচে আওয়াজ, আওয়াজ তো নয় সুর। গায়ে দামী সিল্কের ফ্রক। আপ-টু-ডেট ডিজাইন। বাহুমূল আর গলার কাছে হাতের সুক্ষ্ম কাজ। বব-কাট চুল। বছর বার-তের বয়েস, দেহের গড়ন আর চোখের দৃষ্টিতে তার নিশানা। মাংসল গড়ন—পুষ্ট বুকে যৌবনের ইসারা।

তবু বড়লোকের আদুরে মেয়ে হলে যা হয়। নাচতে নাচতে নামছে। শুধু যে পা নাচল তা নয়, বব কাট চুল আর ফ্রকেরও দোলন।

সুবীরবাবুর চেয়ারের হাতলে হাত রাখল। ঝুঁকে পড়ল, মুখের দিকে মুখ নিয়ে মিহি গলার আহ্বান: বাবা!

কি মা-মণি? মধুক্ষরা উত্তর।

আজ আমার পুতুলের বিয়ে বাবা ----এবার ঝুঁকে পড়া নয় গলা জড়িয়ে কাঁধের ওপর মুখ ঘষতে লাগল।

আমি কি করতে পারি মা?

পঞ্চাশটা টাকা দরকার যে। অনেক কেনাকাটি করতে হবে। আব-দারের সুরে খুব আস্তে আস্তে কথা-গুলো বললে।

সুবীরবাবুর ঠোঁটে হাসির ঝিলিক, মনে উপ্‌ছেপরা আনন্দের রেশ। কোন কথা নয় তাঁর ড্রয়ার খুললেন। বের করলেন পার্স, একখানা দু'খানা নয়, এক তারা নোট। সাজানো গোছের। সেখান থেকে গুণে নিলেন খান পাঁচ, দিলেন মেয়ের হাতে। নোটগুলো মাঝখানে একটা ভাঁজ। মুঠোর মধ্যে নিয়ে আবার সিঁড়ি ধরল, সে রকম নাচের ভঙ্গিতে। খটখট আওয়াজ উঠতে লাগল উপরের দিকে। হাসি হাসি মুখে সেদিকে তাকিয়ে থাকলেন সুবীরবাবু। যতক্ষণ না দৃষ্টির আড়াল হল, যখন মুখ ফেরালেন তখনও আমি স্তব্ধ। দুটো চোখ স্থির তার চোখে।

সত্যি মানুষের মন বোঝেন সুবীর-বাবু। খবর রাখেন অন্য মনের। আমার চোখে চোখ রেখে বললেন: ভাবছেন বুঝি----এক কথায় মেয়েটির হাতে পঞ্চাশটি টাকা দিয়ে দিলাম কি করে?

আশ্চর্য হলাম। সুবীরবাবুর ক সজাগ মাথা নাড়লাম আস্তে আ বললাম: এক কথায় পঞ্চাশ হাজার দিতে পারেন। সে স আপনার আছে তা আমি বিশ্বসংসার জানে। তবে, দিলেন যে পুতুল খেলায়, এটাই আশ্চর্য।

সুবীরবাবু আবার গম্ভীর হলে অভিজাত ভঙ্গীতে ভ্রূ কোঁচকা বললেন---জানেন পানুবাবু, আমার একটি-মাত্র মেয়ে। তার আবদার আমাকে মাঝে মাঝে এমন অনেক দিতে হয়।

নিজেকে সামলাতে পারলাম আর। বিবেক বিদ্রোহী হয়ে উ বললাম: একটা প্রশ্ন আপনাকে ক পারি সুবীরবাবু?

হাসলেন সুবীরবাবু, অমা হাসি। শান্ত নির্মল, বললেন: করবেন? করুন। আচ্ছা,—জিজ্ঞে করতে গিয়ে একটু থামলাম। বললাম: মাষ্টারের টাকাটা দিলেন কেন? হোহো হাসিতে ফেটে পড় সুবীরবাবু। ঘর ফাটানো হাসি, ক তালা লাগানো। হাসিটা তবু হয়েছিল, সহ্য হল না কথাটা। ব লেন: শিখে রাখুন মশাই---শি রাখুন। বাড়ীর চাকর ঝি—গৃহ-শিক্ষ এদের পাওনা কোনদিন পরিষ্কার ক দিতে নেই। বরাবর কিছু হাতে রাখ হয়। তাঁর কথা আমার সঙ্গে সঙ্গে বললাম: কাল থেকে যদি মাষ্টার আসে? আবার সেই হাসি, ঘর কাঁপ —কাঁপল তাঁর আপাদমস্তক, বললেন এ কি কথা বললেন মশাই? আসবে ন নাই বা এল, মাষ্টারের অভাব আ নাকি! ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হঃ—হাঃ—হাঃ—

আরও কি যেন বললেন সুবীর বাবু। শোনা হল না, কানের পর্দা আসা—এই করল, শুধু মরমে প্রবেশ নয়—মনের সব ভাবনা সব চিন্তা তালগোল পাকিয়ে গেল, সব গোলমাল, নিজের কাজের কথাটাও ভুলে স্তব্ধ হয়ে রইলাম।

এ যুগ বিজ্ঞানের, বরং বলা উচিত প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের। ত্রিলোক আতি-পাতি করে খুঁজে প্রকৃতির রহস্য যবনিকা তুলে হাতের জিনিস বারো মাসের সাংসারিক কাজে লাগিয়ে তা সহজতর করে নেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা এ যুগের বিশেষ লক্ষণ। মানুষ এখন হাতের কাছে যা আছে তাই অনেক বলে খুশী থাকতে গররাজি। এ মনোভাবের প্রতিফলন জীবনের সব ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট, প্রয়োজন মেটানোর যে লাখো উপকরণ বিজ্ঞানের প্রয়োগশালা থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে আসছে বার মাস তিরিশ দিন, তার অধিকাংশই নৈমিত্তিক ব্যবহারের ফলে আমাদের চোখে আর পাঁচটা জিনিসের একটার পর্যায়ে পড়ে। ভুরিভুরি আবিষ্কারের যুগে পঞ্চম আশ্রম পেতে হ'লে চাঁদে পৌঁছনর চেষ্টা ছাড়া উপায় নাস্তি বলেই মনে হয়। ও সবও হোক। ওর প্রয়োজন অস্বীকার না করেই বলা যায় জ্ঞানান্বেষণের তাগিদে আকাশ পানে তাকিয়ে বিভোর হয়ে থাকলেও যেমন মাঝে মাঝে মাটির দিকে চোখ ফেরান অপরিহার্য, অন্যথায় মাটির শরীর বড় ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা, আকস্মিক কোন ঘটনায় বা দুর্ঘটনায়, তেমনি চাঁদে যাওয়ার মহতী প্রচেষ্টার খবর সন্দেশ চাখার ফাঁকে ফাঁকে কয়লা, লোহা বা কাচ জাতীয় বস্তুর খবরাখবর নেওয়াও নিতান্ত সময়ের অপচয় নয়। মুক্ত দুনিয়ার অ্যাংরামশাই চার্চিল নাকি অবসর খুঁজে ছবি আঁকতেন মুখ পাল্টানোর উদ্দেশ্যে। এসব খবর তেমনি রুচি বজায় রাখার একটা উপায় হিসেবেও নেওয়া চলে অনায়াসেই।

কাচের প্রসঙ্গেই আসা যাক। নিতান্ত অপরিহার্য না হ'লেও এ যুগে জনজীবনে কাচের ভূমিকা ফেল্না নয়। গেরস্থালীর টুকিটাকি অনেক জিনিস কাচ দিয়ে তৈরী, গেলাস থেকে কাগজে চাপা দেওয়ার ডেলাটা অবধি।

জ্ঞানান্বেষক

কম জোর চোখের পরমাগতি কাচ। আর, বিজ্ঞানাগারে কাচের আধিপত্য নিরঙ্কুশ; যদিও ধীরে ধীরে প্লাস্টিকের বয়েম ইত্যাদি তৈরী ও ব্যবহার চালু হচ্ছে এক্ষেত্রে।

অসুবিধাও আছে কাচ ব্যবহারের। কাচ ভঙ্গুর, বেশী তাপে টেঁকানো যায় না। এখন আর কাচের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনার উপায় নেই। তাপসহ কাচ প্রায় দু'দশক আগে তৈরী হয়েছে। এ দেশে নয়, ওদেশে; আমেরিকায়।

কাচ সম্বন্ধে ধারণা বদলান দরকার। কাচের মত ভঙ্গুর প্রবাদটার পরমায়ু বোধহয় এতদিনে ফুরোল। কাচ কথা বলে লাফাতে পারে ধাঁ করে, করাত দিয়ে কেটে ওর মধ্যে দিব্যি পেরেক বসান চলে, ইস্পাতের থেকে দৃঢ়তর অথচ এ্যালুমিনিয়ামের তুলনায় হাল্কা কাচ। অর্থাৎ, কাঠ, ধাতু এবং তন্তুজ যেসব চাহিদা মেটাত তা বহুলাংশে মিটিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা-সম্পন্ন কাচ। মেটাচ্ছেও, বহুল পরিমাণেই। যারা কাজে লাগাতে জানে এবং লাগাতে উৎসাহী তাদের প্র[য়োজনে] কাচ ভেল্কী দেখাচ্ছে।

কাচের সঙ্গে মানুষের যোগ দীর্ঘদিনের। মিশরীয়রা পির[ামিড] বানানোর আগেই কাচ ব্যবহার করেছিল, গ্রীকরা কাচ ব্যবহার ক[রত] কিন্তু বেশ কয়েক শতক ধরে ব[্যবহার চলে] আসলেও এর উপযোগিতা যে অপরিসীম, তা আবিষ্কারের ক[ৃতিত্ব] আধুনিক বিজ্ঞানীর। তাঁদের ক[ল্যাণে] এর ব্যবহারোপযোগিতা দিন দিন [বেড়ে] চলবে বলেই মনে হয়।

কাচের কাপড় সিল্কের ম[ত]। কাচের গুলি থেকে তৈরী করা [হয়]। প্রথমে গুলিগুলো গলিয়ে নেওয়া [হয়], তারপর আড়াই হাজার ডিগ্রী ফা[রেন]হাইট উত্তাপে ধাতুময় কাচের [ধা]তুপাতে ওপর সূক্ষ্ম ছিদ্র দি[য়ে] গড়িয়ে [পড়ে]। এখান থেকে [বে]গসম্পন্ন বায়ু প্রবাহ দ্বারা তা হয়ে একটা বেল্টের ওপর ছি[টিয়ে] পড়ে তৈরী হয় সূক্ষ্ম কাচতন্তু। ম[াত্র] বহরের একগজ লম্বা কাচের কা[পড়] করতে দশটারও কম গুলি প্রয়োজ[ন]।

কাচকে প্রথমে গুলিতে রূপান্ত[রিত] করার সুসঙ্গত কারণ রয়েছে। উ[ৎ]পাদকদের কাচের কাপড়ের গু[ণ] সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। [খারাপ] জিনিস বেশীদিন বাজার ধরে রাখ[তে] পারে না। গুলি করার সময় ভা[ল] ভাবে এবং চট্ করে বোঝা [যায়] কোন খুঁত রয়েছে কি না। ফ[লে] তৈরী জিনিস নিশ্চিন্ত মনে পাকাপো[ক্ত] বলে বাজারে ছাড়া যায়।

রান্নাঘরে হঠাৎ পর্দায় আ[গুন] লেগেছে, ব্যস! গেল পুড়ে! শরীর জখম হ'তে পারে যে-কোন মুহূর্তে, কি[ন্তু] তাপসহ কাচের কাপড়ে এমন দুর্ঘট[না] ঘটতে পারে না, দু' হাজার ডিগ্রী তা[প] পর্যন্ত নিশ্চিন্ত। তা ছাড়া ছত্রা[ক] জাতীয় উদ্ভিদ বা উদুকুন্-এর সাধ্য নেই এই পর্দার ক্ষতি করার।

নিজেদের নতুন আবিষ্কারের অভ[ি]গুরতা প্রমাণের উদ্দেশ্যে এক চমকপ্র[দ] পরীক্ষা দেখান কাচ-বিজ্ঞানীরা। দুটো সমতল জিনিসের মধ্যে নতুন কাচ

রেখে তার ওপর হাতী রাখা হ'ল—খেলাঘরের নয়, সত্যিকারের সামান্য ধ্বসে গেলেও ভাঙল না কাচ। আশ্চর্য মনে হ'লেও ঘটনাটা সত্যি।

রেফ্রিজারেটর থেকে দুধের বোতল তুলে উনুনে চাপালে বোতলের কি গতি হয় তা অজানা নয়। কিন্তু এই কাচবর একই অবস্থায় তাপের বিপুল পার্থক্য সহজেই মানিয়ে নেয়, ফাটে না পর্যন্ত।

এ থেকে ব্যবসার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সুবিধে হয়েছে। অন্যান্য যন্ত্র ক্ষয়ে যাওয়ার পর এই কাচ ব্যবহৃত হচ্ছে লাভজনকভাবে। রাসায়নিক কারখানায় নল হিসেবে এর স্থায়িত্ব কয়েক বছর, অথচ অন্যান্য নল দিন ষাটেকের বেশী টেকে না। আর, এ কাচের পিঠে ৫00,000,000 বার ওঠা-নামা করেও আদৌ অকেজো হয়ে যায় না।

এ দিয়ে গেরস্থালীর কাজও চলে। কাচপাত্র বেশ তাপসহ, কাজেই নানান কাজে আসে।

ফোম্‌গেলাস আর এক ব্যবসায়িক আবিষ্কার—এ বস্তু অত্যন্ত নির্ভর জোড়া দেওয়া এবং বিচ্ছিন্ন করা জিনিসগুলোর একটি। সাধারণ কাচের ওজন প্রতি ঘন ফুটে পচাত্তর সেরের মত, অথচ একই পরিমাণ ফোম্‌গেলাস-এর ওজন চার সেরের কিছু বেশী এবং এতে রয়েছে গ্যাসের ১৫,000,000 সেল। কাজেই এত হাল্কা দেখে অবাক হওয়ার কোনও কারণ নেই। টুকরো করে এ দিয়ে দিব্য দেয়াল বা ছাদ তৈরী করা চলে। খুবই নির্ঝঞ্ঝাট আগুন, স্যাৎসেতে আবহাওয়া ইত্যাদি এর কোন ক্ষতি করতে পারে না।

আর এক জাতের কাচ—ফস্‌ফরাস, অ্যালুমিনিয়ামের আর সিলিকন অক্সাইড্‌-এর মিশ্রণ—ঘরে-বসে দেখা ছায়াছবির গুণগত উৎকর্ষ বাড়িয়ে সহজদাহ্য ফিল্ম-এর ধরে ওঠার সম্ভাবনা কমিয়ে দেয় অনেকখানি। এ কাচের ভেতর দিয়ে শতকরা পঁচাত্তর থেকে আশী ভাগ আলো যেতে পারে এবং ঐ সময় মোটামুটি শতকরা পঁয়তাল্লিশ ভাগ উত্তাপ কাচটি শুষে নেয়।

সবরকম গবেষণার ভিড়েও বিজ্ঞানীরা চশমার কাচের কথা কখনও ভোলেন না। এই বস্তুটি না থাকলে যে কী অবস্থা হ'ত তা ভাবাও অস্বস্তিকর। এর অভাবে জীবন হ্রস্ব হয়ে পড়ত, স্বাস্থ্যের হ'ত হাঁড়ির হাল, কেন না, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া ঔষধ-বিজ্ঞান মধ্যযুগীয় অন্ধকার পেরিয়ে অদ্যতন আলোর মুখ চোখে দেখতো কি না সন্দেহ।

কাচের লেন্স্ ছাড়া ছবি, ছায়াছবি, টেলিভিশন ইত্যাকার বড় বাজারে খেলনা চালু করা সম্ভব হ'ত না। দূরবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া জ্যোতিবিজ্ঞানের কী হাল হ'ত ভাবার বিষয়। আজও মানুষ আদি মানবের ভয়, বিস্ময় আর ভয়জাত শ্রদ্ধা নিয়ে তাকাত চাঁদ-সূয্যি আর অন্যান্য নক্ষত্রের দিকে, যদি না দূরবীক্ষণ আবিষ্কৃত হ'ত।

এতেও ক্ষান্তি নেই। কাচ-বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত অনুসন্ধান কী করে কাচকে স্বচ্ছতর করা যায়। তাদের সাফল্য ধরা পড়ে দু' চারটে উদাহরণ দেখলেই—চশমার কাচ, ক্যামেরার লেন্স ইত্যাদি। চিকিৎসকেরও প্রায় নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠচে কাচ, দিনের পর দিন কাচের উপযোগিতা বেড়েই চলেছে এক্ষেত্রে।

আর কথা বলা? ব্যাপারটা আষাঢ়ে শোনালেই সত্যি বটে। একখণ্ড তড়িৎগ্রস্ত আলোর কিরণ-রেখার সামনে দু'টুকরো পোলারয়েড্‌ রেখে একটাকে স্থির রেখে অন্যটাকে ঘোরাতে হয়। নানান গতিতে ঐগুলো ঘুরিয়ে সুরসৃষ্টি সম্ভব, অবশ্য বাড়িয়ে শুনতে হবে। এ থেকেই এক প্রায় আষাঢ়ে ধারণা হয়েছে—কাচের কারখানা জাত সম্পূর্ণ নতুন এক জাতের সুরযন্ত্র হয়ত একদিন মানুষকে তৃপ্তি দেবে। ইতিমধ্যেই এই চিজ্ অন্য কাজে আসছে।

ভাঙা কাচ নাড়াচাড়া করা যে খুব নিরাপদ নয় তা বোধহয় অবিসংবাদিত ছিল, কিন্তু আজ নয়। এখন এমন কাচও আবিষ্কৃত হয়েছে যা হ'লেও শত চাপ সত্ত্বেও ফেটে হৈ-রাখাতে দেবে না---ইচ্ছে থাকলেও না। সৈনিকদের বিমানবন্দরে এর ব্যবহার চালু, ভাঙা টুকরোয় বিমানের রবারের চাকা ফেঁসে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কয়েক ধরণের জানালায় এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে---যেখানে ভাঙা কাচ বিপদস্বরূপ---এ বস্তুটি ব্যবহৃত হয়।

কাচের উপযোগিতা অসীম বলেই মনে হয় ওর ব্যবহারের ক্রমবর্ধমানতা এবং প্রায় অবিশ্বাস্য কার্যকারিতা দেখলে, সৈনিকদের জন্য গুলি-নিরোধক এবং ঠাণ্ডা দেশের অধিবাসীদের জন্য গা-গরম রাখার কাচের পোষাক তৈরী হয়েছে, গেরস্তর জন্য শব্দ-নিরোধক পর্দা, চাষীর জন্য ফার্টিলাইসার ইত্যাদিও কাচ দিয়ে তৈরী হচ্ছে।

এ সব কথা মনে থাকলে কাচ-শিল্পের যুগান্তর সম্বন্ধে কোনও দ্বিধা হওয়া উচিত নয়। এ শিল্পের ভবিষ্যৎ সুউজ্জ্বল। মানুষকে আর একটু বেশী স্বাচ্ছন্দ্য, কিঞ্চিৎ বেশী অবসর, অর্থাৎ নতুনতর সৃষ্টির ভাবনার সময় দিয়ে কাচ মানুষের কম উপকারে আসে নি। মনে হয়, এখনও অনেক কিছু পাওয়ার আছে কাচের কাছ থেকে, এ আশা পূরণের মাত্রা নির্ভর করছে বিজ্ঞানীদের ওপর, যাদের অসাধারণ নিষ্ঠা এবং কৃতিত্ব সম্বন্ধে আজ কারোর মনে কোন সন্দেহ নেই। থাকা উচিতও নয়।

আজ এই পর্যন্ত। চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে, এখুনি চুমুক দিন। তারপর, তাম্রকূট সেবনের আনন্দে তলিয়ে যান চাঁদে পাড়ি জমান জাতীয় খবর পড়তে পড়তে।

মানসী দেবী
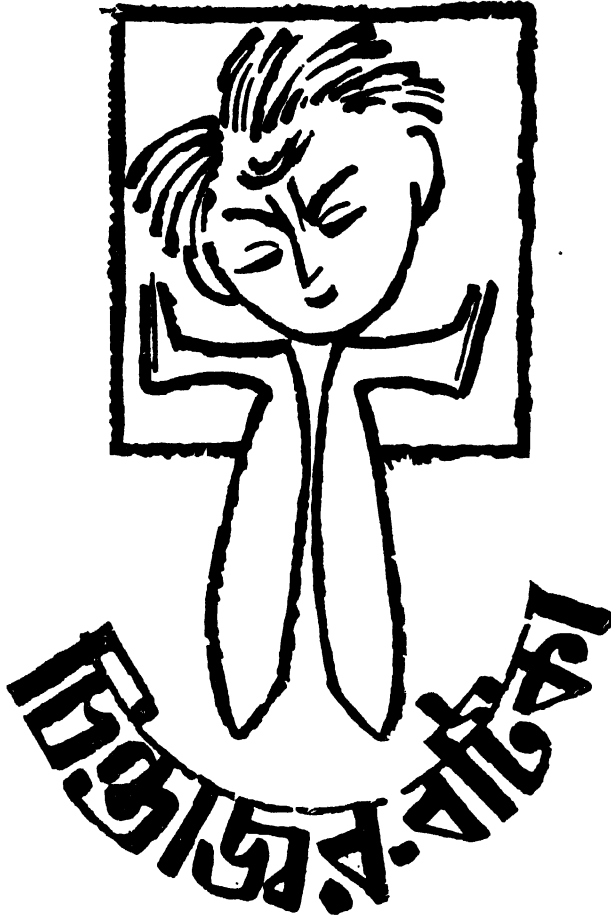
চিন্তা জ্বরো মনুষ্যাণাম্। দৈহিক জ্বরের মত চিন্তার জ্বর মানবজীবনে অবশ্যম্ভাবী। খুঁটিনাটি হাজারো দুশ্চিন্তার পাকে পাকে অন্নময় প্রাণ ব্যতিব্যস্ত, অহোরাত্র। প্রহরের পর প্রহর যায়, দিন—একের পর এক, নিরবচ্ছিন্ন ধারায়, কণ্ঠাগত মহাপ্রাণী চিন্তাহারা দিন আর স্বপ্নহীন রাতের প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত-অধীর। খোলা আকাশের নীচে নিত্য যাওয়া-আসা আনন্দর প্রসন্নতায় ভরে ওঠে না। মুখ তুলে আকাশপানে চাওয়ার অবকাশ যে সুদুর্লভ!

চিন্তার পোকা নাচে করোটির অলিগলিতে। আর কোন শত্রু মানুষকে এমন করে জর্জরিত করতে পারে না অষ্টপ্রহর; সব থেকে ঝানু অঘটনঘটনপটীয়সী দুশ্চিন্তা। এ থেকে ইন্দ্রিয়বিকার ঘটে, ঘটছেই—সাক্ষী এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত অবধি ছড়ান দেহশাস্ত্রের মহামহোপাধ্যায়কুল। অন্যথায়, অ-কেজো কাজে সামর্থ্য খরচা করিয়ে শরীর যে অনিত্য এবং ক্ষয়শীল তা ঘন ঘন জানান দেয়, প্রাণ ধারণের গ্লানি দুঃসহ করে তোলে, আর ভবসাগর তরিয়ে দেয় কিঞ্চিৎ আগেভাগেই।

অথচ সব কবরেজের নিদান দেওয়া এ রোগ সারান রুগীর কবজাগত, কেবল তার পক্ষেই সম্ভব সর্বকর্মনাশা এই মানসব্যাধিটিকে কাণ্ড-গুঁড়ি-শেকড-বাকড় সমেত গঙ্গাগর্ভে নিরঞ্জন। দুশ্চিন্তা মনসিজ, প্রায় সব ক্ষেত্রেই চিন্তা-ভাবনার সুল্‌টো ছেড়ে উল্‌টো ধাওয়া করার ফল। চিন্তার ধরণটা পাকড়াও করে কিঞ্চিৎ এদিক সেদিক করতে পারলে দুশ্চিন্তাকে সঠিক জায়গায় বসিয়ে দিয়ে আলোর ঔজ্জ্বল্য কিছু বাড়ান যায়, মস্তবড় আকাশটার নীলাভাও।

এ জন্য একটা অতি সাধারণ ভ্রান্তি এড়িয়ে যাওয়া চাই আগেভাগে; দুর্বল আর মার-খাওয়া লোকের বৈশিষ্ট্য দুশ্চিন্তা। এতো ভুলতে হবেই মনে রাখা দরকার। এ বস্তু ভেতরকার সামর্থ্যসূচকও হ'তে পারে, বুঝিয়ে দিতে জীবন সচেতনতা, হাতের কাছে যা আছে তাই অনেক বলে, নিষ্ক্রিয় না থেকে সাধ্যমত এগিয়ে চলার গভীর গহন সাধ। জীবনের সব সিঁড়ি পিষে যাঁরা এগোতে এগোতে অনন্তের প্রসাদধন্য, সংসারের দু'-একটা কাঁটা তুলে, দু'-একটা সুর মধুর করে দিয়ে যাঁরা ছুটি নিয়েছেন, তাঁরা সকলেই ভাবনার হাতে হাত রেখে জীবন কাটিয়েছিলেন, ব্যতিক্রম নেই। তবুও ভাবনার কোন না কোন মুহূর্তে তাঁদের ভাবতে হয়েছে—এই ফের, ভাবনাকে হাওয়ায় ভাসিয়ে সুখ না হোক স্বস্তি খুঁজে নিয়েছিলেন তাঁরা।

ব্যক্তিগত সমস্যাকে তা বড় এক বিপর্যয়কর কিছু ভেবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুললে ঊর্ণনাভের নিয়তি ঘাড়ে ভর করে, স্বরচিত জালের বাইরে চিন্তার গতায়াত বন্ধ হয়ে এক দমবন্ধ হওয়া বিকার গড়ে ওঠে। উনিশ শতকের অতিখ্যাত ইংরেজ ধর্মপ্রবক্তা স্পারজিয়ন-এর ব্যাপারটা এ জাতের। প্রথমে অতিমাত্রায় চিন্তিত হয়ে বক্তব্য প্রাণময় করতে পারেননি তিনি। যেই যা হয় হোক ভেবে ফুল্লচিত্তে মঞ্চে উঠলেন, অমনি বলা-কওয়ার ভোল পাল্‌টে গেল। তাঁর খ্যাতির সূচনা ঐ বিশেষ ক্ষণে।

মনে রাখা উচিত দুশ্চিন্তা সাময়িক তীব্রতা বই নয়, কাজেই গুণগর্ভ। তা ক্ষতিকর হয় কেবল যখন নিজেকে আগ্‌ডুম্‌ বাগ্‌ডুম্‌ অলীক কাজে মজিয়ে ফেলে নিরর্থক তখনই একে নেওয়া চাই বেঁচে থাকার অংশ হিসেবে আর অপচয়িত সামর্থ্য ফলপ্রসূ কাজে লাগিয়ে তা কব্‌জা করা দরকার।

এ কাজ সহজতর হয়ে ওঠে হেতুগুলোকে কালির আঁচড়ে দেগে নিলে। দেখা যায় অনেকগুলোই

অলীক, নিরবয়ব, নিরস্তিত্ব, বায়ুভূত নিরালম্ব। ওগুলোর গড় হিসেব কৌতূহলপ্রদ। শতকরা চল্লিশ ভাগ ঠিক অলীক। বিগত টুকিটাকি, যা কি না মুঠো মুঠো চুল ছিঁড়লেও ঠিক করা অসম্ভব, শতকরা তিরিশ ভাগ। অহেতুক স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় উদ্বেগ [illegible] বার ভাগ। খুচরো দুশ্চিন্তার ভাগ শতকরা দশ, আর মাত্র শতকরা [illegible] ভাগ সত্যিকার, যুক্তিযুক্ত দুশ্চিন্তা।

ব্যক্তিগত অস্বস্তিজনক ভাবনা-গুলো ঠাণ্ডা মাথায় তলিয়ে দেখলে খুব বেশি পড়ে থাকে না খোঁচাবার মহৎ উদ্দেশ্য। আমাদের অনেক সহজ সমস্যা, অনেক ভয়ভীতির ক'টা বাস্তবায়িত হয় শেষ অবধি।

ট্রেন চাড়তে দেরী হওয়া, বা ঘরের ছেলে ঠিক সময়মত না ফেরা [illegible] দুশ্চিন্তা কত সহজে কেটে যায় কত তুচ্ছ ব্যাপারে মন ঝুঁকলে তা ভাবলেও শুধু অবাক আর অবাক হতে হয়। দেখেছি, নিছক আধপাগলা [illegible] লোককে নিয়ে কেটে গেছে [illegible] ট্রেন দেরীর মুহূর্তগুলো [illegible]। স্টেশন শুদ্ধ লোক চনকে [illegible] দেরী-হওয়া ট্রেনের তীক্ষ্ণ [illegible]।

[illegible] চিন্তা অবশ্য জবরদস্তভাবে [illegible] অনেককেই, বিশেষ এ দেশে যেখানে রোজগেরেদের গড় আয় [illegible] উপরে ওঠে নি আজও। [illegible] করার সব চেষ্টার পর একটাই পথ খোলা থাকে—তা হ'ল [illegible] উপায়ে দিন গুজরান। মন [illegible] সম্প্রীতি আসে প্রয়োজনের [illegible] ফেলবার, তবে সমস্যা কি [illegible] চুকেবুকে যায় না? [illegible] দেশ, ল্যাতিন আমেরিকা বা [illegible] এ মন্ত্র কতখানি ফলপ্রদ হবে [illegible] বিষয়। তবুও কিছুটা [illegible] হয় তাতে সন্দেহ নেই। [illegible] কি পড়ে না সাংসারিক অর্থে [illegible] অথচ সদাপ্রফুল্ল মানুষ?

আত্মগ্লানি দুশ্চিন্তার আর এক জবর কারণ, কোন প্রীতিপ্রদ আত্মীয়-স্বজনের অসুখ-বিসুখের সময়, এমন কি তাঁরা প্রায় সুস্থ হয়ে উঠেছেন সে ক্ষেত্রেও, শুধুমাত্র আত্মগ্লানি বশে অনেকেই দৈনন্দিন কাজকর্ম ছেড়ে-ছুড়ে নির্বিকার। 'আমার অমুক প্রিয়জন অসুস্থ, আর আমি কি না রুটিন-মাফিক কাজ করব? যেন কিছুই হয় নি।' এই ধরণের মনোভাব তাদের।

এর দাওয়াই একটিই। নিজেকে জগৎ ব্যাপারের কেন্দ্রীয় পুরুষ না ভেবে সঠিক স্থান, পরিবার, সমাজে, পৃথিবীতে খুঁজে নেওয়া। অন্যদের কথাও ভাবতে হয়, যথোচিত গুরুত্ব সহকারে। আঁদ্রে জিদ্ পিয়ানোর সুরের গহনে ভুলে যেতেন নৈমিত্তিক তথাকথিত দুশ্চিন্তার কথা, তন্ময় ভুলতেন স্তেপভূমিতে অস্তায়মান সূর্যের দিকে তাকিয়ে।

অবশ্য দুশ্চিন্তার সব সেরা দাওয়াই কাজ। সকল চিন্তানাশা কর্মচাঞ্চল্য ভুলিয়ে দেয় অনেক গ্লানি, মুছে দেয় অনেক চিন্তার দাগ। এইচ. ডবল্যু বীচার বলেছেন, 'কাজ জীবননাশা নয়। এ কাজটি দুশ্চিন্তার। কাজ স্বাস্থ্য-প্রদ, খুব কম ক্ষেত্রেই কোন মানুষকে অসহনীয় কাজের চাপ দেওয়া সম্ভব। দুশ্চিন্তা ব্লেডের ওপরকার মরচে।'

একটা বড় মজার মত এ ক্ষেত্রে চলে। কেউ কেউ বলেন দুশ্চিন্তা নিরীশ্বরবাদেরই নামান্তর। কেন না, দুশ্চিন্তিত মানুষ পরোক্ষে মেনে নেন ভগবান নেই, তার দুঃখভার লাঘব হওয়ার প্রশ্ন অবান্তর। যীশু বলেছেন, "take therefore no thought for the morrow."

কিঞ্চিৎ কানে লাগে। শুধু কান নয়, পরশু-তরশুর ভাবনাও দশমুখে অষ্টপ্রহর ভাবতে বলে। তারপর হঠাৎ দুশ্চিন্তার ক্ষেত্রে কালকের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও উদাসীন হ'তে বলা হয় ত' খুব ফলপ্রদ নাও হ'তে পারে। যারা বিশ্বাসী, তাদের কৃষ্ণ মিলবে, অন্তত মেনার ভরসাটুকু থাকে জীবনে অন্তিম ক্ষণ অবধি, ওপারে গিয়ে প্রাপ্তি। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী কিংবা অত বিরাট ব্যাপার নিয়ে মাথা চুলকাতে অনিচ্ছুক, তাদের উপায় কি? উপায় বাস্তব দৃষ্টিতে দুনিয়াটার দিকে চোখ বুলিয়ে যুক্তিগ্রাহ্য পথে হাঁটা। তার ব্যক্তিক সুবিধে-অসুবিধেই পৃথিবীর শেষ কথা নয় এবং বসে বসে চুল ছিঁড়লেও সমস্যা সমাধানের পথে এক পাও এগোবে না, কাজেই কর্মনাশা দুশ্চিন্তা সাধ্যমত ঝেড়ে ফেলে উঠতে হবে। জাগতে হবে, তবেই মিলবে শ্রেয়' বস্তু। কোন কিছুই দুর্বলের জন্য নয়। আর, দুশ্চিন্তা মানুষকে দেহ-মনে দুর্বল করে দেয় প্রতিক্ষণে।

এ ক্ষেত্রে অভ্যাসের ভূমিকা অন্যান্য ক্ষেত্রের মতই উল্লেখ্য। প্রাচীনরা বলেছিলেন - - - অভ্যাসো জায়তে নণাং দ্বিতীয় প্রকৃতি শনৈঃ। ধীরে ধীরে, অল্প অল্প করে অভ্যাস মানুষের দ্বিতীয় প্রকৃতি হয়ে ওঠে। অনায়াসভাবে দুশ্চিন্তামগ্ন না থেকে গড়ে শতকরা আটভাগ সত্যিকার দুশ্চিন্তার সঙ্গে মোকাবিলা করা প্রয়োজন কাজের অভ্যাস গড়ে নিয়ে। কর্মযোগ সম্পর্কে শ্রীশ্রীগীতার উপদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় এবং পালনীয়। আর একটা কথা মনে রাখা সবক্ষেত্রেই সহায়ক, সব দিক দিয়ে যে মানুষ স্বার্থমগ্ন হয়ে সংসারের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে সে বাঁচার আনন্দ উপলব্ধিতে অক্ষম। মহাজীবনের তরঙ্গে গা ভাসিয়ে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলাই জীবন। দুশ্চিন্তা আছে, থাকবেও; জীবনের একটা অঙ্গ ভেবে ওকে বিশেষ গুরুত্ব না দিলে গোলযোগ নিশ্চয়ই কমে যায় অনেকাংশে।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান-গুরু মন্ত্রবজ্রাচার্য নাড়পাদ

বৌদ্ধধর্মজগতে যে সকল ধর্মাচার্যের আবির্ভাব হয়, মন্ত্রবজ্রাচার্য নাড়পাদ তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম। ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বিশিষ্ট ধর্মাচার্য, মহাপণ্ডিত ও মহান যোগী রূপে তিনি যেমন শ্রদ্ধার সহিত উল্লিখিত তিব্বত দেশে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের গুহ্যতত্ত্বের আদি উৎস ও বৌদ্ধ দেবতারূপে তেমনি ভক্তিভরে পূজিত।

নাড়পাদ পাল নরপাল প্রথম মহীপাল দেবের (খ্রীঃ ৯৭৮-১০৩০) সমসাময়িক।(১) সুতরাং তিনি খ্রীষ্টীয় একাদশ শতকের প্রথম পাদে আবির্ভূত হন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নানা দিক বিচার করিয়া অনুমান করিয়াছেন, নাড়পাদ সিদ্ধ সম্প্রদায়ের আদি সিদ্ধাচার্য লুই পাদের পূর্ববর্তী।(২) লুইপাদ রাঢ় দেশের অধিবাসী বাঙ্গালী ছিলেন।(৩) সিদ্ধমহাচার্য তিলপাদ তিলদা বিহারের অধিনায়করূপে যেমন 'তিলপাদ', নাড়পাদ নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষরূপে তেমনি 'নাড়পাদ' নামে বৌদ্ধজগতে পরিচিত ছিলেন।(৪) তাঁহার পিতৃদত্ত নাম আজ বিস্মৃতির অতল তলে নিমজ্জিত হইলেও নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষরূপে প্রাপ্ত জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক যে বরণীয় নামে তিনি পরিচিত ছিলেন সেই 'নাড়পাদ' নামই ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ অক্ষরে লিখিত হইয়া আজিও স্মরণীয়। নাড়পাদ তিলপাদের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন।(৫) তিনি তিলপাদকে কিরূপে গুরুরূপে প্রাপ্ত হন, সেকথা আমরা যথা স্থানে লিখিব।

সিদ্ধ তিলপাদ চট্টগ্রামস্থ পণ্ডিত বিহারের অধিনায়ক ছিলেন।(৬) তিলদা বিহারের অধ্যক্ষপদ গ্রহণ করিবার পূর্বে কি পরবর্তী সময়ে তিনি পণ্ডিত বিহারের অধিনায়কপদে অধিষ্ঠিত হন, তাহা অজ্ঞাত। পণ্ডিত বিহার তন্ত্র অধ্যয়ন ও তান্ত্রিক ধর্মানুশীলনের বিরাট কেন্দ্রস্থল ছিল।(৭) তিনি প্রজ্ঞাভদ্র, সিদ্ধ-মহাচার্য ও মহাচার্য উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।(৮) তিনি উড়িষ্যাবাসী ব্রাহ্মণ ছিলেন।(৯) তাহার পাঁচখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়, যথাক্রমে উহাদের নাম, (ক) সহজ সম্বর স্বাধিষ্ঠান, (খ) তত্ত্বচতুরোপদেশপ্রসন্ন (গ) দীপনাম (ঘ) মহাসমুদ্রোপদেশ (ঙ) অন্তর বাহ্য নিবৃত্তি ভাবনাক্রম নাম এবং (চ) দোঁহাকোষ।

নাড়পাদের পূর্বপুরুষগণ কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম সামন্ত শুভ।(১০) তিনি পূর্ব ভারতের রাজা ছিলেন।(১১) তাঁহার জাতি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ আছে। লামা সুমপা বলিয়াছেন, তিনি মদ্য-ব্যবসায়ী শৌণ্ডিকের বংশে এবং লামা তারানাথ বলিয়াছেন, ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।(১২)

তিনি কিংবা তাঁহার পিতা কোন সময়ে কাশ্মীর ত্যাগ করেন, তাহা অজ্ঞাত হইলেও বরেন্দ্র মগধ ও গয়াতে তাঁহার জীবন অতি-

স্বর্গত সুরেশচন্দ্র নন্দী

বাহিত হয়। বরেন্দ্র দেশেই তাঁহার অধিকাংশ জীবন অতিবাহিত হয় বলিয়া ইতিহাসে বরেন্দ্র দেশের অধিবাসী বলিয়া উল্লিখিত।—'বসুধার শীর্ষস্থান।'

বরেন্দ্র দেশে তাঁহার শিক্ষা আরম্ভ হয়। ঐ দেশবাসী সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক ও তন্ত্রাচার্য জেতারি তাঁহার শিক্ষাগুরু ছিলেন।(১৩) সুপণ্ডিত আচার্য জেতারির শ্রীচরণতলে বসিয়া নাড়পাদ তন্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া অশেষ জ্ঞানের অধিকারী হন।

প্রথম জীবনে নাড়পাদ তীর্থিক (হিন্দু) ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পরে বৌদ্ধমতের অনুরাগী হইয়া তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েন। এই সময় তাঁহার তরুণ হৃদয় ও মন আধ্যাত্মিক চেতনায় পরিপূর্ণ হয়। ধ্যানরত তপস্বীর মত সমাহিত চিত্তে বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন। জ্ঞানচর্চা ব্যতীত পার্থিব জগতের কোন বস্তুই তাঁহার প্রিয় বা আকর্ষণীয় ছিল না। তিনি বৌদ্ধ তান্ত্রিক যুগে জন্মগ্রহণ করেন। যুগধর্মানুসারে তিনি তান্ত্রিক ধর্মানুশীলনে প্রবৃত্ত হন।

পুত্রকে সংসারে অনাসক্ত, সর্বদা ধ্যানমগ্ন সমাহিত, সাধনক্রিয়া ও কৃচ্ছ্রসাধনে ব্যাপৃত দেখিয়া মাতা-পিতা চিন্তিত হন এবং পুত্রের বিবাহের উদ্যোগ করেন। পুত্র বিবাহ প্রস্তাব পুনঃ পুনঃ প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে নাড়পাদের পরাজয় হয়। তিনি বিবাহে সম্মতি দান করেন। তিনি পিতা-মাতাকে জানান যে, বিশেষ লক্ষণযুক্ত সৎ বৌদ্ধবংশসম্ভূতা পূত-চরিত্রা এবং সর্বগুণসম্পন্না কন্যাকেই জীবনসঙ্গিনী রূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। নাড়পাদ কথিত বিশেষ লক্ষণ যোগ শাস্ত্রে মুদ্রা বা চিহ্ন বা লক্ষণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাহা বলাই বাহুল্য। তাঁহার মনোগত উক্তি ইহাই প্রকাশ করিয়াছে, এমন জীবনসঙ্গিনীর আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ করেন, যাঁহার সাহচর্যে তিনি মুদ্রা যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন।

নাড়পাদের ঈপ্সিত লক্ষণযুক্ত সাধনজীবন-সঙ্গিনী তাঁহার মাতাপিতা সংগ্রহ করিতে পারিয়া ছিলেন কি না, তাহা অজ্ঞাত হইলেও যিনি তাঁহার আমরণ গার্হস্থ্য এবং সাধনজীবন সঙ্গিনী ছিলেন তাঁহার নাম নিগু। তাঁহাকে লইয়াই তাঁহার গার্হস্থ্য এবং সাধন জীবন আরম্ভ হয়। তাহাকেই সাধনসঙ্গিনী করিয়া নাড়পাদ মহামুদ্রা যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। সাধনজীবনসঙ্গিনী নিগু পূর্বোক্ত বিশেষ লক্ষণযুক্তা ঈপ্সিত সঙ্গিনী কি না তাহা অজ্ঞাত।

গৃহস্থ যোগীরূপে নাড়পাদ তাঁহার গুরু তিলপাদের মত আর্য উপাধিযুক্ত ছিলেন। ভিক্ষুধর্ম অবলম্বন করিয়া যাঁহারা সংসারাশ্রমে বাস করিয়া গৃহস্থ যোগীর জীবনযাপন করিতেন, তৎকাল-প্রচলিত ভিক্ষুধর্মের নিয়মানুসারে তাঁহারা আর্য উপাধিতে ভূষিত হইতেন। এই সকল গৃহস্থ-যোগী শাস্ত্রজ্ঞান পাণ্ডিত্যের শ্রেষ্ঠ

১। History of Bengal, Vol. I P. 420 (Dacca).

২। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩২৩, ২য় সংখ্যা, পৃঃ ৯০।

৩। বৌদ্ধ গান ও দোঁহা পৃঃ ৩৩।

৪। The Buddhism of Tibet or Lamaism. Waddel, P 378.

৫। J. R. A. S. 1936 G. Tucci.

৬। J. A. S. B. 1893 P. 33.

৭। Pag-Sam-Jon-Zang G.Lxii (Index), সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩১২ পৃঃ ১৯০-১৯১।

৮। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩২৬ ২য় সংখ্যা পৃঃ ৮৯।

৯। J. R. A. S. 1936, G. Tucci

১০। Pag-Sam-Jon-Zang Index Cxv. Pp. 63, 124, 135.

১১। History of Bengal P. 316-317 (Dacca).

১২। Ibid.

১৩। History of Pengal P. 420. বিস্তারিত বিবরণের জন্য লেখক লিখিত আচার্য জেতারী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। অর্চনা ১৩৪১ ভাদ্র।

ছিলেন এবং ভিক্ষুদের নমস্য ছিলেন না।(১৪)

তাঁহার স্ত্রী নিগু স্বামীর মত নানা শাস্ত্রে পণ্ডিতা ছিলেন। তাঁহার একাধিক উপাধি ছিল। তিনি শাস্ত্রজ্ঞানবিভূষিতা রূপে 'জ্ঞান ডাকিনী' জ্ঞান ও কর্মকাণ্ডে পণ্ডিতা রূপে কনকধারা(১৫) এবং সকলপ্রকার যোগ সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্তা রূপে 'সিদ্ধি রাজ্ঞী' উপাধিতে ভূষিতা ছিলেন।(১৬)

স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে হেবজ্রের উপাসনা করিতেন।(১৭) বজ্রযানের দেবতা হেবজ্র শক্তি বজ্র যোগিনীর আলিঙ্গনে দৃঢ়বদ্ধ যুগল-মূর্তি।(১৮) জ্ঞান ডাকিনী নিগু যোগসাধন প্রণালী সম্বন্ধে গ্রন্থ-রচনা দ্বারা নিজ মতবাদ প্রচার করেন।(১৯) তিনি হেবজ্র মণ্ডলবিধি এবং মহামুদ্রা বজ্রগীতি নামক গ্রন্থদ্বয় রচনা করেন।

ভগবান বা ভগবতীর ইচ্ছা বা কৃপায় ভক্ত বা সাধক তাঁহার ঈপ্সিত সকল বস্তুই প্রাপ্ত হন, তাঁহারই কৃপায় সাধক গুরু লাভ করিয়া থাকেন। নাড়পাদ ভট্টারিকা দেবী বজ্র যোগিনীর কৃপায় সিদ্ধচার্য আর্য তিলপাদকে গুরুরূপে লাভ করেন। তাঁহার গুরু লাভের বিবরণটি এইরূপ: একদা ভট্টারিকা দেবী বজ্র যোগিনীর ইচ্ছায় ও কৃপায় কতকগুলি শুভচিহ্ন লক্ষণ নাড়পাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয়। তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করেন যে দেবী তাহাকে আর্য তিলপাদের নিকট দীক্ষা গ্রহণের জন্য আদেশ করিয়াছেন। তিনি আরও অনুভব করেন, তাঁহার উপদেশমত সাধন করিলে বজ্র-যোগ সাধনায় পরমা সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন।

প্রত্যাদিষ্ট হইয়া নাড়পাদ সিদ্ধাচার্য তিল-পাদকে ভক্তিভরে স্মরণ করেন। এই সময় হইতে তিনি প্রত্যহ দুই লক্ষবার দেবতা সম্বরের সপ্তাক্ষর বীজ মন্ত্র জপ করেন।(২০)

নাড়পাদ মগধের পশ্চিম অংশে অবস্থিত ফুল্লহরি বিহারে অবস্থান করিতেন। স্থানীয় নামে এই বিহারটি পরিচিত ছিল। এই স্থানটি তাঁহার তন্ত্র সাধন পীঠ ছিল। ফুল্লহরি বিহারে তৎকালে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্যগণ বাস করিতেন।

১৪। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩২৩, ৯৩।

১৫। ঐ

১৬। বৌদ্ধ গান ও দোঁহা।

১৭। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩২৩, পৃঃ ৯৩।

১৮। ঐ পৃঃ ৮৭

১৯। Religion of Tibet P. 71. Sir Charles Bell.

২০। J. R. A. S. 1936, G. Tuccu.

གྲུབ་ཆེན་ནཱ་རོ་པ།

আচার্য নাড়পাদ

এই বিহার বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদের অন্যতম কেন্দ্রস্থল ছিল।(২১)

যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে গুরু তিলপাদ শিষ্য নাড়পাদের "জ্ঞান সিদ্ধি" ও "যশোভদ্র" নামকরণ করেন।(২২) তিব্বতীয় গ্রন্থে তিনি মহামুদ্রাচার্য, মহাচার্য, মহাযোগিন নামে উল্লিখিত।(২৩)

ইহার পরে বজ্রযোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া 'মহাবজ্রাচার্য রূপে চরম সম্মানে সম্মানিত হন। তিনি বজ্রযানপন্থিগণের 'গুভাজু' অর্থাৎ গুরুরূপে পূজনীয় হন। বজ্রযানি গুরুর পাঁচ প্রকার অভিষেক হইত। যথাক্রমে উহাদের নাম; (ক) মুকুটাভিষেক (খ) ঘণ্টাভিষেক, (গ) মন্ত্রাভিষেক, (ঘ) সুরাভিষেক, (ঙ) পট্টাভিষেক। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা গুরুকেই ভগবানরূপে পূজা করিত।(২৪)

বৌদ্ধধর্ম জগতে নাড়পাদের তুল্য শাস্ত্র-জ্ঞানী মহান্ যোগী আর কেহই ছিলেন না।

২১। History of Bengal P. 418, (Dacca).

২২। Pag-Sam-Jon-Zong Index P IV; Cordier ii P. 68.

২৩। P. Cordier, Catalogue du Fond Tibetian P. 33 under no. xii 8.

২৪। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'বৌদ্ধধর্ম' নারায়ণ ১৩২১ পৃঃ ৬৮

(২৫) তিনি বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞানশাস্ত্রে অপ্রতি-দ্বন্দ্বী ছিলেন। এই কারণে বৌদ্ধ ভুবনে চন্দ্র ও সূর্যরূপে শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন।(২৬) তাঁহার সুগভীর শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্য-প্রতিভা যেমন তাঁহাকে বীরদেবের (২৭) পর নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত করিয়াছিল, আগম শাস্ত্রে গভীর পাণ্ডিত্য তেমনি তাঁহাকে বিক্রম-শীলা বিহারের মহান দায়িত্ব ও গৌরবপূর্ণ দ্বার-পণ্ডিতের পদে মনোনীত করিয়াছিল।(২৮) নাড়পাদ যে কেবল বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের

২৫। Indian Pandits in the Land of Snow P. 60 S. C. Das.

২৬। Ibid, P. 63.

২৭। নগর হারবাসী (আধুনিক আফগানি-স্থানের অন্তর্গত খাইবার গিরিসঙ্কটের নিকট-বর্তী প্রদেশ) বেদাদি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ। নালন্দা বিহারের অধ্যক্ষ সত্যবেটির মৃত্যুর পর তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত হন। যৌবনে বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন শেষ করিয়া বৌদ্ধমতের অনুরাগী হইয়া কণিষ্ক বিহারে বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। পরে ঐ বিহারের সঙ্ঘ স্থবির সর্বজ্ঞ শান্তির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের জন্য বৌদ্ধ সমাজে সমধিক শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন। বজ্রাসন তীর্থযাত্রাকালে মগধে উপস্থিত হইল গৌড়-মগধ-বঙ্গের অধীশ্বর দেবপাল তাঁহার চরণ বন্দনা করেন।

২৮। History of Bengal P. 346 (Dacca).

ཇོ་བོ་ཆེན་པོ་དཔལ་ལྡན་ཨ་ཏི་ཤ

অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

দ্বার-পণ্ডিতের পদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন তাহা নহে, নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার-পণ্ডিতের পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।(২৯) নাড়পাদ বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর-দ্বার রক্ষা করিতেন।(৩০) অশেষ জ্ঞানী অদ্বিতীয় পণ্ডিত ভিক্ষু ভিন্ন কেহ এই দায়িত্ব গৌরবময় 'দ্বার-পণ্ডিতের' পদে মনোনীত হইতেন না। বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার-পণ্ডিতের পদ গ্রহণের পূর্বে তিনি ফুল্লহরি বিহারের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।(৩১)।

তিব্বত দেশে নাড়পাদ নারো নামে পরিচিত ছিলেন। শান্ত রক্ষিত (৩২) পদ্মসম্ভব (৩৩) কমলশীল (৩৪) দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রভৃতির মত তিনি বৌদ্ধধর্ম সংস্কার বা প্রচারার্থ তিব্বত দেশে গমন না করিলেও ঐদেশে তাঁহার অসীম প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। ধর্মশাস্ত্র রচয়িতারূপে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি ভারত তথা বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইলেও চির তুষারাবৃত তিব্বত দেশই তাঁহার অন্যতম লীলাচক্র ছিল। পদ্মসম্ভব ও শান্ত রক্ষিতের পরই তিনি তিব্বতিগণের জ্ঞানগুরু ছিলেন।(৩৫) শুধু ইহাই নহে, ঐ দেশে অদ্যাপি বৌদ্ধ দেবতা রূপে ভক্তিভরে পূজিত।(৩৬)

তিব্বত দেশে নারো তান্ত্রিক সম্প্রদায় ঐ দেশে তাঁহার অসীম প্রভাবের উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। এই সম্প্রদায় নাড়পাদ প্রবর্তিত যোগ ও তান্ত্রিক মতবাদের প্রচারক ছিলেন। (৩৭) একদা এই সম্প্রদায় চীনসম্রাট কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া চীন দেশে গমন করে। মহাযোগী নাড়পাদের তান্ত্রিক যৌগিক প্রদর্শন করেন। চীন সম্রাট সপরিবারে যৌগিক প্রক্রিয়া দর্শন করিয়া ঐ সম্প্রদায়ের গুরু যোগীরাজ নাড়পাদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হন এবং সপরিবারে তিব্বতীয় যোগধর্মে দীক্ষিত হন।(৩৮) এই হইতে চীন দেশেও তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত।

তিব্বতিগণের বিশ্বাস বৌদ্ধ ধর্ম বৌদ্ধ দেবতা কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট হইয়া [illegible] শাস্ত্রগ্রন্থ রচনা, উহাদের ব্যাখ্যা—টীকা ও প্রচার করেন। ইহা যে তাহাদের বিশ্বাস তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে উহার [illegible] নিহিত আছে। কারণ, দেখা যায় [illegible] দেবতা আদি বুদ্ধ বজ্রধর তাঁহার [illegible] এবং মতবাদ প্রচার করিবার জন্য [illegible] গুরু তিলপাদকে প্রত্যাদেশ করেন। [illegible] পরে আর্য তিলপাদ বজ্রসাধন প্রণালী [illegible] তত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থোক্ত মতবাদ এবং গুহ্যসাধন [illegible] দেশেই আবদ্ধ ছিল। উহার প্রচার [illegible] গুরু তিলপাদ প্রথমে উপযুক্ত শিষ্য [illegible] হৃদয়ে শক্তি সঞ্চার করেন এবং [illegible] উহা শিক্ষা দেন। শিষ্য পরম্পরা [illegible] বঙ্গদেশ হইতে তিব্বতে, অবশেষে [illegible] নিবৃত্তি লাভ করে। ইহা হইতে [illegible] তাহার প্রভাব কিরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল [illegible] পারা যায়।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ তিব্বত [illegible] গমন করিয়া ঐ দেশের প্রচলিত [illegible] আমূল সংস্কার করেন। তিব্বতিগণকে [illegible] তন্ত্রোক্ত কালচক্রযান, মন্ত্রযান, [illegible] যানে দীক্ষিত করেন। ইহার মূলেও [illegible] প্রেরণা ছিল। গুরু নাড়পাদের [illegible] প্রেরণা যে কেবল অতীশকেই প্রভাবান্বিত ও শক্তিশালী করিয়াছিল তাহা নহে, [illegible]

২৯। Budchism of Tibet P. 61 L. A. Waddel.

৩০। Indian Teachers of udd-hist Universities. P. 51. P. N. Bose.

৩১। History of Bengal, Vol. ?. 420 (Dacca).

৩২। পাল বংশীয় গোপালদেবের রাজত্ব সময়ে (খ্রীঃ ৭০০) গৌড় দেশের কোন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং স্বতন্ত্র মাধ্যমিক সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তিব্বত রাজ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিব্বত গমন করেন। তিব্বত রাজগুরু পদে বৃত হন। তাহারই উপদেশে তিব্বত রাজ কর্তৃক ঐদেশের প্রথম বিহার সাম-ই প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনিই এই বিহারের প্রথম বাঙ্গালী অধিনায়ক। তের বৎসর ঐ দেশে বাস করেন। ৭৬২ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তিব্বতে 'আচার্য বোধিসত্ত্ব' নামে পূজিত ছিলেন।

৩৩। শান্ত রক্ষিতের পর ইনি তিব্বত রাজ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া তিব্বত গমন করেন। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন উড্ডীয়নের রাজকুমার এবং যোগাচার সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক মতবাদের প্রচারক। তিব্বতিগণকে বৌদ্ধ তন্ত্রবাদে দীক্ষিত করেন। ঐ দেশের বন-পা ধর্মের সহিত তান্ত্রিক মতবাদ মিশ্রিত করেন। ইনিও তিব্বত দেশে বৌদ্ধ দেবতা রূপে পূজিত।

৩৪। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক। তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষজ্ঞরূপে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। তিব্বত রাজ কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া শাস্ত্রীয় তর্কবিচারে শান্ত রক্ষিতকে এবং পদ্মসম্ভবকে সাহায্য করিবার জন্য তথায় গমন করেন। চীন দেশীয় শ্রমণ হোসাঙকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন।

৩৫। J. R. A. S. 1936. G. Tucci.

৩৬। Lam ism P 378. L. A. waddel.

৩৭। Journal of the Behar and Orissa Research Society 1940. P. 225.

৩৮। Religion of Tibet P. 74 C. Bell.

মার-পা প্রভৃতিও এই প্রভাব-প্রেরণা হইতে-বঞ্চিত হয় নাই। মার-পা নিজ দেশে যে 'কার গু-পা' সম্প্রদায় গঠন করেন, উহার মূলেও ছিল গুরু নাড়পাদের প্রেরণা—শিক্ষা।

যোগশাস্ত্র ও বৌদ্ধধর্মের গুহ্যতত্ত্বের সম্যক জ্ঞান লাভ করিবার জন্য তিব্বতী শিষ্য মার-পা একাধিকবার তিব্বত দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন।(৩৯) মার-পা যোগসাধনা প্রণালী সম্পর্কীয় গুহ্যতত্ত্ব এবং সাধনপ্রণালী স্বদেশে নিজ শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে আচার্য নাড়পাদই তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্মের মূল উৎস ও আদি।

তিব্বতবাসিগণের উপর নাড়পাদের স্ত্রী নিগুর প্রভাব তাঁহার স্বামীর অপেক্ষা কম ছিল না। তিনি যোগসাধন প্রণালী সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করিয়া নিজ মতবাদ প্রচার করেন। তিব্বত দেশে এই গ্রন্থোক্ত মতবাদ যথেষ্ট প্রসার বিস্তার করে।(৪০) হেবজ্র সাধনপ্রণালী সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ তাঁহারা স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মিলিয়া রচনা করেন।

মগধ ও বঙ্গদেশে বৌদ্ধতন্ত্রের প্রাদুর্ভাব-হেতু এক বিরাট তন্ত্র সাহিত্যের সৃষ্টি হয়। তাঁহাদিগের অক্লান্ত পরিশ্রম, যত্ন, জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-প্রতিভার সমৃদ্ধ হইয়া ঐ সাহিত্য বিরাট আকার ধারণ করে আচার্য নাড়পাদ তাঁহাদিগের মধ্যে অন্যতম ও প্রধান। তাঁহার রচিত অনেকগুলি তন্ত্রগ্রন্থ আছে। তন্মধ্যে "বজ্রপাদসার সংগ্রহ" বিখ্যাত। বাঙ্গলার বৌদ্ধ পণ্ডিতগণের মৌলিক চিন্তা অনুবাদের মাধ্যমে তিব্বত দেশে প্রবেশ করে। ভারতীয় ও বঙ্গীয় বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ রচিত বহুসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত হয়। এই সকল অনূদিত গ্রন্থ যেমন তিব্বতিগণের উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করে, উহাদিগের বৌদ্ধ ধর্মের গুহ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভে তেমনি সাহায্য করে। আচার্য নাড়পাদ রচিত এই গ্রন্থখানি তিব্বতী ভাষার পাণ্ডুলিপি তালিকা গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে।(৪১) পাণ্ডুলিপি-তালিকা গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে তিনি উহা কাশ্মীরের কনক স্তূপ বিহারের ভিক্ষু বিনয় শ্রীমিত্রের অনুরোধে রচনা করেন।(৪২) মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, এই গ্রন্থখানির প্রতিলিপি বঙ্গদেশের রাজা হরি বর্মার রাজত্বকালে প্রস্তুত হয়।(৪৩) মূল গ্রন্থ রচয়িতার নাম যশোভদ্র বলিয়া উল্লিখিত। বলা বাহুল্য, গ্রন্থকার যশোভদ্র আচার্য নাড়পাদ ভিন্ন আর কেহই নহেন। এই গ্রন্থে আচার্য নাড়পাদ গুরুপ্রদত্ত যশোভদ্র নাম ব্যবহার করিয়াছেন। আচার্যদেবের নামকরণের বিবরণ পূর্বেই আমরা আলোচনা করিয়াছি।

আচার্য নাড়পাদ কালচক্র তন্ত্রের অন্তর্গত শিষ্যের দীক্ষা অভিষেক অধ্যায়ের টীকা রচনা করেন। উহা 'সেকোদেশ টীকা' নামে পরিচিত। এই গ্রন্থখানি ইতালীয় পণ্ডিত ডাক্তার এম কেরেল (Dr. M. Careli D.Lt.) কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত তিনি হেবজ্রনাথ তত্ত্বার্থ সংগ্রহ, হেবজ্র সাধন এবং বজ্রগীতি ও নাড়পাদ গীতিকা নামে দুইখানি পদাবলীগ্রন্থ রচনা করেন।

আচার্যদেব নাড়পাদ নিজে যেমন অনন্যসাধারণ শাস্ত্রজ্ঞানী পণ্ডিত ও মহান যোগী ছিলেন, তেমন তাঁহার অনেক মহাজ্ঞানী পণ্ডিত ও মহাযোগী শিষ্য ছিল। শিষ্যবর্গের মধ্যে 'বাঙ্গলার গৌরব' দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, ডোম্বিপা (৪৪) প্রজ্ঞা রক্ষিত (৪৫) মার-পার(৪৬) নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলিয়াছেন, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান জন্মভূমি বিক্রমপুরে আচার্য নাড়পাদের শ্রীচরণতলে বিদ্যাশিক্ষা লাভ করেন।(৪৭) খুব সম্ভব এই সময় আচার্য নাড়পাদ বিক্রমপুরী বিহারে অবস্থান করিতেন। পরে তাঁহার নিকট যোগধর্মে দীক্ষিত (৪৮) হইয়া গুরুর ন্যায় যোগী শ্রেষ্ঠ হন।

আচার্যদেব জ্ঞানরাজ্যের উচ্চতম প্রদেশে অধিষ্ঠিত হইয়া যেমন বৌদ্ধজগতে চন্দ্র ও সূর্যের মত প্রতিভাত ছিলেন, যোগ্য শিষ্য অতীশ দীপঙ্করও তেমনি জ্ঞান পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও ধর্মরাজ্যের অধীশ্বর হইয়া বৌদ্ধ-ভুবন শাসন করিয়াছিলেন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ভারতীয় বৌদ্ধগণের মধ্যে বৌদ্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান শাস্ত্রে এমনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন যে তাঁহার তুল্য জ্ঞানী পূর্বে কেহ তিব্বত দেশে পদার্পণ করেন নাই। এই কারণে তিনি তিব্বত দেশে অদ্যাপি বৌদ্ধ জ্ঞান-দেবতা মঞ্জুশ্রী(৪৯) ও অবলোকিতেশ্বরের(৫০) অবতাররূপে পূজিত।

আচার্যদেব মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে ডুলিতে আরোহণ করিয়া বিক্রমশীলা বিহারে উপস্থিত হন। ডুলি বিহার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলে বিহারবাসী সমস্ত ভিক্ষু সমবেত হইয়া গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তিনি এতই স্থবির হইয়াছিলেন যে, অন্যের সাহায্য ব্যতিরেকে ডুলি হইতে অবতরণ করিতে অসমর্থ ছিলেন। এই কারণে তিনি প্রিয়তম শিষ্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও জ্ঞানশ্রীমিত্রের সাহায্যে ডুলি হইতে অবতরণ করেন। দুই বাহু তাহাদিগের স্কন্ধের উপর রাখিয়া তিনি বিহার মধ্যে প্রবেশ করেন। তিনি উপবেশন করিলে বিহারবাসী প্রত্যেক ভিক্ষু তাঁহার পদ-বন্দনা করেন এই। দৃশ্য যেমন পবিত্র তেমনি রমণীয়। বৌদ্ধ-ভুবনে আচার্যদেব কিরূপ শ্রদ্ধা সম্মানভাজন ও পূজনীয় ছিলেন, এই দৃশ্য হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

বিশ্রামের পর তিনি ধীর গম্ভীর স্বরে প্রিয়তম শিষ্য দীপঙ্করকে বলেন, প্রভু দীপঙ্কর! আমি এক্ষণে অতি স্থবির হইয়াছি। আমার নশ্বর দেহের অবসান ঘটিতে আর বিলম্ব নাই। এতদিন আমি ভগবান বুদ্ধদেবের সদ্ধর্মের আচার্যপদের গুরুভার বহন করিয়াছি। এইবার তাহার শেষ। প্রভু আজ হইতে তুমি সদ্ধর্মের আচার্য ও রক্ষক পদে অধিষ্ঠিত হইলে। ধীর গম্ভীর স্বরে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিয়া তিনি ধর্মাচার্যের সমস্ত কর্তৃত্বভার শিষ্য দীপঙ্করকে অর্পণ করেন।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই সময় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র বিক্রমশীলা বিহারের গৌরবময় সর্বাধিনায়কের দায়িত্বপূর্ণপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি আচার্যদেবকে

৩৯। The Religion of Tibet.

৪০। Ibid.

৪১। Cordier, ii P. 68.

৪২। সাহিত্য পঃ পত্রিকা ১৩২৩ পৃঃ ৭০

৪৩। ঐ

৪৪। পাটলীপুত্রবাসী মৎস্যজীবী। ডোম জাতীয় রমণীকে সাধনসঙ্গিনী করিয়া যোগ-সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

৪৫। নাড়পাদের নিকট তন্ত্র ও যোগশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। তন্ত্রশাস্ত্র এবং তান্ত্রিক ক্রিয়ায় এমনি সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন যে, তুরস্ক অভিযানের সময় মন্ত্রশক্তি দ্বারা কয়েক বৎসর শত্রুগণকে অগ্রসর হইতে দেন নাই।

৪৬। মার-পা ১০১০ খ্রীস্টাব্দে তিব্বতের পশ্চিম অংশে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে গুরুপ্রদত্ত 'কল্যাণকর' ও 'শুভঙ্কর' নামে পরিচিত ছিলেন। মগধের গুরুর নিকট বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করেন এবং তান্ত্রিক যোগধর্মে দীক্ষিত হন।

৪৭। Journal of Behar and Orrissa Research Society Vol. II Part II P. 82.

৪৮। সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ২য় বর্ষ পঃ ৮৯

৪৯। Lamaism P. 35 পাদটীকা : waddel.

৫০। Introduction to Ram Charita P. II ...

বিনীতভাবে ধীর স্বরে বলেন, প্রভু আপনি বৌদ্ধ ধর্মজগতের সূর্য ও চন্দ্র। খদ্যোৎ কি কখনো চন্দ্র-সূর্যের সমতুল হইতে পারে? এই দীন খদ্যোৎ বৌদ্ধজগতের তমোনাশ করিবে কি প্রকারে, প্রভু।

শিষ্যের কথা শ্রবণ করিয়া আচার্যদেব স্নেহগম্ভীর স্বরে বলেন, বৎস! পূর্বেই বলিয়াছি, আমি মৃত্যুর অপেক্ষা করিতেছি। তুমি ব্যতীত ধর্মাচার্যের দায়িত্বপূর্ণ গুরুভার বহন করিবার উপযুক্ত কেহই নাই। হে প্রভু দীপঙ্কর, এই জন্য তোমাকেই আমি এই গুরুভার অর্পণ করিতেছি।

মাত্র কুড়িদিন তিনি বিহারে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই কয়দিন তিনি শিষ্য দীপঙ্করের সহিত ধর্মের গুহ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে কোন-প্রকার আলোচনা করেন নাই। ইহার পর বিহারবাসী আচার্য ভিক্ষু এবং প্রিয়তম শিষ্য দীপঙ্করের নিকট বিদায় লইয়া দক্ষিণদিকে যাত্রা করেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি ১০৪০ খ্রীস্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। (৫১)।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যখন ১০৪২ খ্রীস্টাব্দে তিব্বত রাজের আমন্ত্রণে ঐ দেশের বৌদ্ধধর্ম সংস্কারার্থে তিব্বত যাত্রা করেন, সেই সময় গুরু নাড়পাদের দেহাবশেষ তিব্বতে লইয়া যান। তিব্বতের নেথাঙ প্রদেশে 'থর' নামক পবিত্র গুরুদেবের দেহাবশেষ সমাহিত করেন।(৫২)

তিব্বতে অবস্থানকালে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান পরমগুরু তিলপাদ নিজ গুরু নাড়পাদ এবং গুরুভ্রাতা মার-পার জীবনচরিত রচনা করেন। এই জীবনীগ্রন্থত্রয় তিব্বতীগণের নিকট চতুর্বেদের ন্যায় পরম পবিত্র গ্রন্থরূপে পূজিত হইয়া থাকে।(৫৩)

গুরু নাড়পাদের মৃত্যুতে ধর্মপ্রাণ গুরু-ভক্ত তিব্বতিগণ শোকাভিভূত হন। তিব্বতী শিষ্যগণ যে শোকগাথা রচনা করিয়া তাঁহাদের অন্তরস্থ শোক প্রকাশ করেন, উহা এইরূপ—হে মুক্ত পুরুষ, মুক্তির পথপ্রদর্শক, তুমি আমা-দিগকে পার্থিব জগত হইতে তোমার শ্রীপাদ-পদ্মে মতিস্থির করিয়া দাও। যেন উহাই আমাদের গতি ও আশ্রয় হয়। যেন আমরা তোমার চরণেই সমাধি লাভ করি। হে প্রভু! হে জ্ঞানগুরু! তুমি আমাদের জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দাও।(৫৪)

তিব্বতের গুরুভক্ত শিষ্যগণ জ্ঞানগুরু নাড়পাদের মৃত্যুতে কেবলমাত্র শোকগাথা রচনা দ্বারা তাঁহাদের অন্তরের শোক প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। গুরু নাড়পাদের সহিত পরম গুরু তিলপাদের এবং মঞ্জুশ্রী ও অব-লোকিতেশ্বরের অবতার মূর্তিমান শ্রীজ্ঞান দীপঙ্কর অতীশকে পরম দেবতা জ্ঞানে হৃদি-পদ্মাসনে বসাইয়া তাঁহাদের শ্রীচরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া পূজা করিয়াছে।

এই সকল ধর্মাচার্যগণকে আদি বুদ্ধ দেবতা বজ্রধরের সহিত চিত্রিত করিয়া তাহারা দেবভক্তি গুরুভক্তির যে পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে তিব্বতীয় শিল্পীর অঙ্কিত চিত্রে তাহা পরিস্ফুট। সেই পবিত্র চিত্রটি এইরূপ: চিত্রের সর্বোপরিভাগে বজ্রযান পন্থ-গণের পরম দেবতা আদি বুদ্ধ বজ্রধর বীরাসনে উপবিষ্ট। তাহার এক হস্তে বজ্র, অন্য হস্তে ঘণ্টা। সূর্য ও চন্দ্রদেব বজ্রধরের আজ্ঞা পালনার্থ ব্যগ্রভাবে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান। বজ্রধরের নিম্নে তিলপাদ, তিলপাদের নিম্নে শিষ্য নাড়পাদ এবং দক্ষিণ দিকে শিষ্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এবং বামপার্শ্বে তিব্বতী শিষ্য মার-পা ও মিল পা। তিব্বতীয় শিষ্যগণ ভারতীয় পোষাক পরিহিত (৫৫)।

মন্ত্রবজ্রাচার্য নাড়পাদ তিব্বতীয় বৌদ্ধ ধর্মের গুহ্যতত্ত্বের আদি উৎস এবং জ্ঞানগুরুরূপে কিরূপ পূজনীয় ছিলেন। এই চিত্রে তাহা পরিস্ফুট।

৫১। Indian Pandits in the Land of snow P. 63. S. C. Das.

৫২। Ibid. P. 64·

৫৩। Journal of the Behar and Orissa Research Society 1940. P. 235.

৫৪। Buddhism in Tibet P. 86. Sir Charles Bell.

৫৫। Memoirs of Asiatic Society of Bengal p. 21, 1907.

জীবন-তীর্থে

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ধূসর স্মৃতির আবছা ওড়না ফাঁকে—
জানি না জীবন কেন যে
তোমাকে চায়!
স্বপ্ন-মুকুল বাসি বকুলের মালা
হারানো সুরের মিষ্টি-গন্ধ তায়।
টুকরো মেঘের হতাশা বোঝে না পাখি
স্নিগ্ধ-সকাল আলোর প্রলেপ মাখা;
জীর্ণ সেতুর ভিতটা মাটিতে নাই,
ইন্দ্রধনুর ঠিকানা যায় না রাখা।
সুদূরে ভেনিসে, রোমে, বাগদাদে কত
হীরা জহরৎ পেয়েছি গোলাপ ঘ্রাণ,
সে সব তুচ্ছ, জটিল জলের রেখা;
হাওয়ার হৃদয় গভীরে প্রেমের প্রাণ।
শিল্পী-আকাশ ব্যর্থ হয় না তাই!
রাত্রি সুরভি এখনও মূল্যবান।
লজ্জা-ফুলের সে তিথি জানি না কবে
তোমাকে করেছে পূর্ণ, আয়ুষ্মান!!

অঘ্রাণের আকাশের নীচে

কল্যাণ দে

অঘ্রাণের আকাশের নীচে
ফলন ধানের শব্দ স্তব্ধ হয়ে গেছে;
প্রথম জননী হওয়ার সাধ
তৃপ্ত বুঝি হ'ল আজ।
রোদ শুধু রয়ে গেছে
সোনালী ধানের শীষে;
এসে এসে ফিরে গেছে কতদিন
হাঁটুজল ভরা সেই শ্রাবণের ক্ষেতে;
মেঘ যবে চেয়েছে জড়াতে
কিশোরী ধানের সেই কাঁচা মুখখানি।
আমি বুঝতে পারি নি
মেঘে রোদে কাড়াকাড়ি চলে;
আমি বুঝতে পারি নি
মেঠো ধান হাসে কুতূহলে।
অনুভব রয়ে গেল শুধু—
কি যেন এসেছি দূরে ফেলে,
ছায়াঘেরা অঘ্রাণের এই
নিরালা বিকেলে।

এলো অমাবস্যার রাত্রি

(কিশোর উপন্যাস) (২)

ধীরেন্দ্রলাল ধর

॥ তিন ॥

সকালে রামশংকরের যখন ঘুম ভাঙলো তখন দিব্যি রোদ উঠেছে।

রামশংকর উঠে বসলো, ঘরে কাউকে দেখতে পেল না। খানিকক্ষণ সে চুপ করে বসে রইল সেই মাদুরের উপর।

এক রাশ ফুল নিয়ে দেবী এসে ঢুকলো, হেসে বললো—কী, এই ঘুম ভাঙলো বুঝি? আর দেখ, আমি স্নান সেরে এলাম, ফুল তুলে নিয়ে এলাম।

রামশংকর কোন জবাব দিলে না।

—নাও ওঠো, মুখ-হাত ধুয়ে নাও।

—আমার কিচ্ছু ভালো লাগছে না।

—কেন, কি হলো?

—আমার কান্না পাচ্ছে।

—সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেই কান্না? হলো কি?

—বাবার কাছে যাবো।

—সে তো যাবেই, আগে মন্দিরে চল, মায়ের পূজো দেখবে। তারপর তোমার বাবার কাছে নিয়ে যাবো।

—না, পূজো আমি দেখবো না, আমি আগে বাবার কাছে যাবো।

—ছি অমন কথা বলতে নেই, বামুনের ছেলে

—আমি আগে বাবার কাছে যাবো।

রামশংকর কথাগুলি জোর দিয়ে বললো, তার চোখ ছলছল করে উঠলো। দেবী কাছে এসে তার পিঠে একখানি হাত রেখে বললো—আমি যে সন্ন্যাসিনী ভাই, আমাকে আগে মায়ের পূজা করে তবে অন্য কাজ করতে হয়।

রামশংকরের চোখের জল গড়িয়ে পড়লো গাল বেয়ে।

দেবী বললো—ছিঃ ছিঃ এতো বড় ছেলে, অমন করে কখনো কাঁদে, লোকে দেখলে বলবে কি! এসো মুখ-হাত ধোবে চল।

দেবী হাত ধরে রামশংকরকে বাইরে নিয়ে গেল।

ছোট পাহাড়। পাহাড়ের উপর বিশেষ গাছপালা নেই। উপরে খানিকটা সমতল জায়গা তারই এক-পাশে একটি গুহা, মাথা নীচু করে সেই গুহার মধ্যে ঢুকতে হয়। ভিতরে একটি ছোট কালীমূর্তি। মূর্তির গায় ও পায় অনেক সিঁদুর লেপা। চোখ দুটি কট্‌মট করছে। লাল জিভটা দগ্‌দগে। মূর্তির সামনে একটি পিদিম জ্বলছে। প্রায়-অন্ধকার গুহায় পিদিমের ম্লান আলোয় সে মূর্তি ভয় পাবার মত।

রামশংকরের হাত ধরে দেবী ভিতরে এলো। ফুলের চুবড়িটা সামনে নামিয়ে রেখে বললো, প্রণাম কর।

রামশংকর বললো—বাইরে চল আমার ভয় করছে।

—ভয় কি, প্রণাম কর

রামশংকর কোনমতে একটা প্রণাম সেরে নিয়ে বললো—আমি বাইরে যাই।

রামশংকর তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে এলো।

বাইরে নিশির সঙ্গে দেখা, বললো—কি গো খোকা, ঠাকুর দেখলে?

রামশংকর বললো—বাবা কি অন্ধকার। এ কি মন্দির নাকি? মন্দির কত বড় হয়, কত উঁচু হয়। এখানে ঢুকলে ভয় করে।

দেবী বাইরে এলো, বললো—তুমি বড় ভীতু। বামুন-পণ্ডিতের ছেলে এমন ভীতু হলে চলবে কেন? এতো বনবাদাড় পার হয়ে এলে, এতো লড়াই দেখে এলে, এখনও এতো ভয়?

ঘুপসি অন্ধকার নাকি? বনে আমি অনেক ধুরতে পারি, ভয় করে না।

---ছেলেটি কে রে দেবী?---খনখনে গলা শোনা গেল।

মন্দিরের পিছন থেকে দেখা দিল এক বৃদ্ধা। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, চোখ রক্তিম, পরণে রক্তাম্বর, হাতে সিঁদুর মাখানো একটা ত্রিশূল। মাথায় এলোমেলো জটা। তাকে দেখে রামশংকর আড়ষ্ট হয়ে গেল।

---প্রয়াগের রাজপণ্ডিত মাধবরামের ছেলে রামশংকর।

বৃদ্ধা সামনে এসে রামশংকরের আপাদমস্তক একবার দেখে নিলে, তারপর বললে---বয়স কত হবে?

---বছর দশেক।

---বাবা কোথায়?

---বাবা বাঘের কামড়ে চোট খেয়েছেন, গ্রামে গেছেন চিকিৎসার জন্য।

---ভালই হয়েছে, মা নিয়ে এসেছেন। মায়ের দয়া থাকলে বাবা আর ফিরবে না।

একনিমেষে দেবীর মুখখানি ফ্যাকাশে হয়ে গেল। বললো---ব্রাহ্মণ, উপনয়ন হয়ে গেছে।

বৃদ্ধা বললো---দেখেছি, গলায় উপবীত রয়েছে। মায়ের ইচ্ছায় সবই ঠিক হয়ে যাবে। মা-ই ব্যবস্থা করবেন।

বৃদ্ধা গুহা-মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করলেন।

রামশংকর এবার দেবীর মুখের পানে তাকিয়ে বললো---এ কে? রামায়ণের রাক্ষসী?

---ছিঃ ছিঃ! অমন কথা বলতে নেই, ইনি আমাদের গুরু-মা, এই মন্দিরের ভৈরবী।

রামশংকর দেবীর মুখের পানে তাকিয়ে রইল। দেবী ব্যাপারটা হাল্কা করে দেবার জন্য রামশংকরের মাথায় একটা ঝাকানি দিয়ে চুলগুলি এলোমেলো করে দিল।

বললো---চিনেছে ঠিকই, মন তো অন্তর্যামী।

পূজা শেষ হতে সময় লাগলো। শাঁখ যখন বাজলো তখন এক প্রহর কেটে গেছে।

পাহাড় থেকে নামতে নামতে রামশংকর বললো---এবার গাঁয়ে যাবো তো বাবার কাছে?

---আগে কিছু খাবে না, না খেয়েই যাবে?---দেবী বললো।

---তা কি হয়, ফিরতে সেই সন্ধ্যে হবে, সারাদিন উপোসে যাবে যে!

---যাক্ সারাদিন না খেয়ে আমি খুব থাকতে পারি।

---তুমি পারো, কিন্তু আমি যে পারি না ভাই। দুখানা চাপাটি খেয়ে পেট ঠাণ্ডা করে বেরুবো, সারাদিন ঘুরবো, কোন কষ্ট হবে না।

---তুমি এখন চাপাটি ভাজবে, খাবে, তারপর যাবে? বেশ, তুমি চাপাটি খাও, আমি একা বনে যাবো। এই সোজা পথ তো?

রামশংকর ঠিকরে বনে যাচ্ছিল, দেবী তার হাত ধরলো।

রামশংকর রুদ্ধকণ্ঠে বললো---হাত ছেড়ে দাও, আমি একা যাবো।

---ছিঃ ভাই, রাগ করতে আছে, আমি তো তোমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো বলছি। একা গেলে কোথায় আবার বনের মাঝে হারিয়ে যাবে।

রামশংকরের চোখ ছলছল করে উঠলো।

নিশি আসছিল পিছনে, বললো---কি হলো কি? চোখে জল কেন?

দেবী বললো---এখনি গাঁয়ে যাবে বাপকে দেখতে। তা বলেছি খেয়েদেয়ে একেবারে বেরুবো, তাতেই কান্না।

---তা কাঁদলে কি হবে? গেলে তো আর দেখা হবে না। বদ্যি-খুড়োর ব্যাপার তো জানিস, একবার দেখাসাক্ষাৎ বন্ধ। গেলে তো বা দরজা দেখে ফিরে আসবে।

---বাবার কি অসুখ হ[illegible] নাকি? রামশংকর বললো---ব[illegible] কামড়ে দিলে কি অসুখ হয়?

---চলতে-ফিরতে না পারা অসুখ---নিশি বললো---সে বা[illegible] কামড়াক্ আর জ্বরেই হোঁ হোঁ কর[illegible] সবাইকারই ওই এক ব্যবস্থা-দেখাশুনা বন্ধ।

---তা তো জানি, দেবী বললো, ছেলেমানুষ যখন বলছে একবার যা[illegible]

---যাওয়া-আসার হয়রাণিই হবে।

পিতার মৃত্যুসংবাদ শু[illegible] রামশংকর কাঁদবে, তাই দে[illegible] সকালে নিশিকে এই কথা[illegible] শিখিয়ে দিয়েছিল। এবার সে শংক[illegible] বললো---শুনলে তো, তবু তুমি [illegible] বলছ তখন যাবো। তবে খেয়ে[illegible] গেলে কোন কষ্ট হবে না।

রামশংকর আর কিছু ব[illegible] পারলো না।

নিশি দেবীকে একপাশে ডে[illegible] নিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বললে[illegible] সকালে আমি ওদিকে গিয়েছি[illegible] ওখানে মানুষের চিহ্ন নেই।

---জানোয়ারে টেনে নিয়ে গে[illegible] রাত্তিরে---দেবী বললো।

---টেনে নিয়ে গেলে ঝো[illegible] ঝাড়ের উপর তো দাগ থাকবে, ত[illegible] কোথাও চোখে পড়লো না। মানু[illegible] যেন হাওয়ায় মিশে গেছে।

দেবী কয়েক মুহূর্ত নিশির মু[illegible] পানে তাকিয়ে রইল। তারপর বললে[illegible] যাক্, মরে যখন গেছে দেখে এসে[illegible]

নিশা বললো---পেলে সদ্গ[illegible] হতো, বামুন তো!

---না পেলে আর কি করা যা[illegible] দেবী বললো।

॥ চার ॥

চাপাটি ভাজতে ভাজতে দে[illegible] রামশংকরকে গল্প বলে।

এক ছিল রাণী, মস্ত তার রাজ[illegible]

পাহাড়ের মাথায় ছিল এক কেল্লা, সেই কেল্লায় রাণী থাকতেন। রাণীর ছেলেমেয়ে ছিল না, একটি ছেলেকে তিনি নিজের ছেলের মত মানুষ করেছিলেন। রাণী ছিলেন খুব ধার্মিক। প্রজারা রাণীকে খুব ভালবাসতো। কিন্তু রাণীর বয়স কম, বিধবা। ফিরিঙ্গীরা দেখলে মস্ত সুবিধে। মেয়েমানুষ ভালো লড়াই করতে পারবে না, ভয় দেখিয়ে ওর রাজ্যটুকু কেড়ে নেওয়া যাক্। বলে পাঠালো—মেয়েমানুষ, রাজ্য চালাতে পারে না। এ রাজ্য এখন আমাদের। আমরাই রাজ্য চালাবো।

রাণী বললেন—তোমরা কে? তোমাদের আমি রাজ্য ছেড়ে দোব কেন?

ফিরিঙ্গীরা বললে—সহজে না দাও কেড়ে নোব।

ফিরিঙ্গীরা রাণীর রাজ্য আক্রমণ করলো।

রাণী ভয় পেলেন না। তুমুল লড়াই হলো। রাণীর সৈন্যরা প্রাণ দিয়ে লড়লো। কেল্লার ভিতর যেসব মেয়েরা ছিল তারাও বন্দুক ধরলো, কামান চালালো। ফিরিঙ্গীরা রাণীর কিছুই করতে পারলো না।

শেষে গোলমাল বাধিয়ে দিল এক বামুন। সেই বামুনটিকে দয়া করে রাণী কেল্লায় থাকতে দিয়েছিলেন। ফিরিঙ্গীরা তাকে লোভ দেখালো। বামুন লোভ সামলাতে পারলো না। মাঝরাতে লুকিয়ে সে কেল্লার দরজা খুলে দিলে। হুড়মুড় করে গোরা-সৈন্য ঢুকে পড়লো কেল্লার মধ্যে। রাণী আর কেল্লা রক্ষা করতে পারলেন না। শেষ অবধি কেল্লা ছেড়ে রাণীকে চলে যেতে হলো।

ছেলেকে পিঠে বেঁধে পাঁচিল ডিঙিয়ে রাণী কেল্লার বাইরে বনে গেলেন। মস্তবড় কালো একটা ঘোড়া ছিল রাণীর। বড় বিশ্বাসী ঘোড়া। সেই ঘোড়া রাণীকে পিঠে নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে একদৌড়ে সমস্ত গোরা-সৈন্য পার করে রাণীকে পৌঁছে দিল নিরাপদ স্থানে। ফিরিঙ্গীরা কেল্লা দখল করলো। নগর লুঠ করলো, বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দিলে, ছেলে-বুড়ো যাকে পেলে তাকেই খুন করলে। নগর শ্মশান হয়ে গেল।

রামশংকর বললো—জানি জানি, ফিরিংগীরা ভারী পাজী। কাউকে দেখতে পেলেই গুলী করে, ধরলে পরেই গাছে ঝুলিয়ে দেয়, বাড়ীর মধ্যে থাকলে ঘরে আগুন লাগায়। রাস্তায় আমি দেখেছি, গাছের ডালে ডালে কত মানুষকে লট্‌কে দিয়েছে। মানুষগুলো বাতাসে দুলছে, জিভগুলো বেরিয়ে এসেছে, দেখলে ভয় করে। বাবা তাই রাস্তা ছেড়ে বনের ভেতর দিয়ে এলেন। ওরা আমাদের ধরতে পারলেও মমনিভাবে গাছের ডালে লট্‌কে দিত। বাবা কি বলেন জানো, বাবা বলেন—ওরাই নাকি অসুর, মাঝে মাঝে পাতাল ফুঁড়ে উঠে এসে এমনি অত্যাচার করে, তারপর দেবতারা এসে ওদের মেরে শেষ করে দেয়। দেবতারা নাকি এবার আসবে। কবে আসবে তুমি জানো?

দেবী বললো—না ভাই, তা তো কিছু শুনি নি।

রামশঙ্কর বললো—তুমি কিছু খবর রাখো না। দেবতারা এসে পড়ার আগে যে আমার একটা বন্দুক চাই।

—বন্দুক নিয়ে তুমি কি করবে?

—দমাদম গুলী, ব্যাস সব খতম। একটা ফিরিঙ্গিকেও রাখবো না।

—ওদের কত বন্দুক আছে তুমি জানো?

—থাক্ না। আমি চুপিচুপি গিয়ে আগে ওদের দলের সর্দারটাকে মেরে দোব। সর্দার মার খেলেই বাঁদরের দল পালিয়ে যায় তা তুমি জান না বুঝি? ওরাও বাঁদর, মুখগুলো দেখো, শুধু লেজ নেই। তুমি আমায় একটা বন্দুক দাও না, দেখিয়ে দিচ্ছি।

—আচ্ছা আচ্ছা, সে তখন পরে দেখা যাবে, এখন গল্পটা শোনো—দেবী আবার তার গল্প সুরু করলো।

এক বামুন পণ্ডিত ছিলেন সেই নগরে। বেদবেদান্ত ছিল তাঁর কণ্ঠস্থ; রাণীমা তাঁকে খুব সম্মান করতেন, দূর-দূরান্তর থেকে ছাত্ররা আসতো তাঁর চতুষ্পাঠীতে পড়াশুনা করতে। ফিরিঙ্গী ফৌজ যখন নগর লুঠ করতে সুরু করলো, তখন নগরের বাসিন্দারা সবাই রুখে দাঁড়ালো। ফিরিঙ্গীদের সঙ্গে তারা পেরে উঠলো না, সবাই মরলো, কিন্তু দু-একটা না মেরে কেউ মরলো না। পণ্ডিতমশাইও ছাত্রদের নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। পণ্ডিতমশাই বন্দুক চালাতে জানতেন, বাড়ীতে বন্দুক ছিল। ফিরিংগীরা প্রথমে কোন সুবিধা করতে পারলো না, তখন তারা বাড়ীটাতে আগুন লাগিয়ে দিল।

পণ্ডিতমশাইয়ের একটি ছেলে ছিল আর একটি মেয়ে। তাদের রক্ষে করার জন্যই পণ্ডিতমশাইয়ের যত ভাবনা। ঠাকুরঘরের নীচে এক চোরা-কুঠরী ছিল, সেইখানে তিনি লুকিয়ে রাখলেন ছেলেমেয়ে দুটিকে। বড় বড় দু' কলসী জল আর একহাঁড়ি চিঁড়ে আর গুড় দিয়ে বললেন—আমি যখন এসে ডাকবো তখন বেরুবি, আর আমি যদি না আসি তো যতদিন এই জল আর খাবার থাকবে ততদিন এখান থেকে বেরুবি না।

তারপর সেই বাড়ীর মধ্যে লড়াই শুরু হয়ে গেল। বন্দুকের শব্দ, চেঁচামেচি, দাপাদাপি, শেষে সারা বাড়ীখানাই পুড়ে ভেঙে পড়লো। কিন্তু চোরা কুঠরীটার কিছুই হোল না। ভাইবোন তিনদিন তিনরাত সেই ঘরের মধ্যে বসে রইল। পণ্ডিতের আর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এদিকে কলসীর জল তখন শেষ হয়ে গেছে। আর তো থাকা যায় না। ভাইবোন এবার সেই চোরা-কুঠরী থেকে বেরুবার চেষ্টা করলো।

চোরা-কুঠরীর উপর সারা বাড়ীটা ভেঙে পড়েছিল, একটা সরু পথ ছিল রাস্তার নালার পাশ দিয়ে। চিঁড়ে-গুড় গামছায় বেঁধে নিয়ে [illegible]

সেই পথ দিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। সারা সহর অন্ধকার, কোথাও মানুষের সাড়া নেই। মাঝে মাঝে পথের মাথায় সিপাহীরা আগুন জেলে পাহারা দিচ্ছে, তাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কি করে তারা নগর থেকে বেরুবে, এই হলো ভাইবোনের ভাবনা।

অনেক ঘুরে-ফিরে, ভাঙাচোরা বাড়ী আর দেয়ালের আড়াল দিয়ে অনেক কষ্টে ভাইবোনে নগর ছেড়ে ফাঁকা মাঠে গিয়ে পড়লো। তখন ভোর হয়ে এসেছে।

দিনের আলোয় ফাঁকা মাঠে ভয় বেশ। সহজেই ফিরিঙ্গী ফৌজের নজরে পড়ার কথা। ভাইবোনে ছুটলো সেই মাঠের ওপর দিয়ে।

কিন্তু সেই তেপান্তরের মাঠ ছুটে কি পার হওয়া যায়। যত যায় তবু মাঠ আর ফুরায় না। বিকালের দিকে হঠাৎ দুজনের চোখে পড়লো, মাঠের সীমানায় ধুলা উড়ছে। কোন ফৌজ আসছে মাঠের উপর দিয়ে। ভাইবোন লুকোবার জায়গা খুঁজলো কিন্তু সেখানে আর লুকোবে কোথায়? শেষে মাঠের উপরেই শুয়ে পড়লো। একটু পরেই একদল ঘোড়সওয়ার চলে গেল তাদের পাশ দিয়ে। তারা চলে যাবার পর ভাইবোনে উঠে পড়লো, আবার যেই তারা চলতে সুরু করেছে এমন সময় ফট্‌ফট্‌ করে কয়েকটা গুলী এসে লাগলো তাদের গায়। কিছু ভালো করে বোঝার আগেই ভাইবোনে ঘুরে পড়ে গেল।

দেবী থামলো। রামশংকর বললো—তারপর?

তারপর দেবী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললো—তারপর বোনের যখন জ্ঞান হলো, বোন দেখলো জংগলের মাঝে এক গাছতলায় সে পড়ে আছে। এক সন্ন্যাসিনী তার কাছে বসে আছে। বোন তাকে জিজ্ঞাসা করলো—আমার ভাই কোথায়?

সন্ন্যাসিনী বললো— তোমার ভাইকে গুলী করে মেরেছে। তোমার পায়ে গুলী লেগেছে বলে তুমি বেঁচে গেছ।

সেই দিন থেকে বোন সেই সন্ন্যাসিনীর কাছেই রয়ে গেল।

রামশংকর বললো—বারেঃ এ কেমন ধারা গল্প! ভাইটাকে ফিরিঙ্গি ফৌজে গুলী করে মারলো, আর বোন কিছু করতে পারলো না?

—বোন কি করবে? দেবী বললো—সে একা কি করতে পারে? বন্দুক নেই, কামান নেই, পাইক-পিয়াদা নেই, টাকা-পয়সাও নেই, কি করবে সে?

—তা বটে। বন্দুক না থাকলে কিছু করা যায় না। আমার একটা বন্দুক চাই। খুব জোরালো বন্দুক হবে ঠিক কামানের মত। একবার ছুড়বো, আর দশ-বিশটি ফিরিঙ্গি মরবে। তুমি দেবে আমাকে তেমনি একটা বন্দুক জোগাড় করে?

—আমি বন্দুক কোথায় পাব ভাই, আমি তো সন্ন্যাসিনী। এখন হাত ধুয়ে খেতে বসো, চাপাটি ভাজা হয়ে গেছে।

রামশংকর হাত ধুয়ে এলো, শালপাতায় দুখানা বড় চাপাটি আর খানিক তেঁতুলের চাটনি দেবী ধরে দিলে তার সামনে। রামশংকর রুটিতে একটা কামড় দিয়েই বললো—এই যাঃ, মস্ত ভুল হ'য়ে গেল যে!

—কী?

—জপ করা হলো না।

—তাতে কিছু হয় না, খেয়ে উঠে জপ করো, নয়তো সন্ধ্যাবেলা দুবার জপ করে নিও।

—তা কি হয়, ঠাকুর রাগ করবে।

—ছোট ছেলেমেয়েদের উপর ঠাকুর রাগ করেন না, ঠাকুর তাদের ভালবাসেন।

—তা হলে খেয়ে নিই, সন্ধ্যেবেলা দুবার জপ করবো'খন।

রামশংকর খেতে সুরু করলো। দেবী তার খাওয়া দেখতে দেখতে কেমন যেন আনমনা হয়ে গেল, রামশংকর খানিক পরে জিজ্ঞাসা করলো—অমন করে আমার মুখের পানে তা[illegible] তাকিয়ে কি দেখছ?

—দেখছি, তোমাকে দেখতে [illegible] সেই ভাইটির মত।

—আর বোনকে দেখতে [illegible] ঠিক তোমার মত—ফস্‌ করে রামশ[illegible] বলে বসলো।

—ঠিক তাই, কি করে জা[illegible] বলত?

—বারেঃ, ভাই আমার মত হ[illegible] বোন তোমার মত হবে না? [illegible] হাসলো।

—তাদের ভাইবোনকে [illegible] দেখেছ?—রামশংকর প্রশ্ন করলো।

—হ্যাঁ, খুব ভালো করে দেখে[illegible]

—তবে যে বললে গল্প ব[illegible]

—গল্পই তো, যা দেখেছি [illegible] বললাম।

—তাহলে তোমার ওই রা[illegible] সত্যি?

—ওই তো ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মী[illegible] বাঈ, আর ওই পণ্ডিত গঙ্গাধর [illegible]

—ওঃ! তুমি রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ে[illegible] গল্প বললে; বাবার কাছ থেকে আ[illegible] ওর গল্প অনেক শুনেছি। [illegible] আরো অনেক গল্প জানে[illegible] সাহেবের গল্প, তাতিয়া টোপির গ[illegible] কুনোয়ার সিংয়ের গল্প—[illegible] বলেছেন।

—আচ্ছা, এখন তুমি খেয়ে না[illegible] কথায় কথায় দেরী হয়ে যাচ্ছে, আম[illegible] খিদে পেয়েছে, তোমার খাওয়া হ[illegible] তবে আমি খাব।

—বেশ, আর আমি কথা বলে[illegible] না।

রামশংকর একখানি চাপাটি[illegible] একটা বড় কামড় দিয়ে চিবুতে সু[illegible] ক'রে দিলে। দেবী হেসে ফেললো[illegible]

।। পাঁচ ।।

আহার শেষ করেই রামশংক[illegible] বললো—নাও, তুমি এবার তাড়াতা[illegible] খেয়ে নাও, তারপরেই আমাকে নি[illegible] যাবে বাবার কাছে।

দেবী দুর্ভাবনায় পড়লো। বা[illegible]

কেনাবেচা

—বি আর পানেশর

স্মৃতির রোমন্থন

—চিত্রজিৎ ঘোষ

—নির্মল রায়

॥ আমরা বাঙালী ॥

—মঞ্জু চক্রবর্তী

পাড়ি —বিনয় মুখোপাধ্যা

মাসিক বসুমতী
অগ্রহায়ণ / '৭২

—তপন মুখোপাধ্যায়

—দীপ্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

খোকা-খুকু

বধূ

—শান্তি ভট্টাচার্য

মাসিক

বসুমতী

অগ্রহায়ণ / '৭২

আক্রমণে মাধবরাম মারা গেছে তা সে দেখেই এসেছে। তখন বালক কান্নাকাটি করবে বলে কথাটা বলেনি, ভেবেছিল কদিন ছেলেটাকে ভুলিয়ে রেখে তারপর কথাটা বলবে। কিন্তু দশ বছরের ছেলেকে ভোলানো তো সহজ নয়। তার উপর বাপ ছাড়া যাব আপনার জন আর কেউ নেই।

দুর্ভাবনা থেকে দেবীকে রক্ষা করলো নিশি। আহার শেষ হবার আগেই সে এসে খবর দিলে---ভৈরবী তোমাকে ডাকছে। খেয়েই একবার যেও।

—হঠাৎ এই সময়?

—জানিনে।

নিশি চলে গেল। দেবী তাড়াতাড়ি আহার শেষ করলো। তারপর বললো---শংকর, যাবে আমার সঙ্গে?

—কোথায়? সূর্পণখার কাছে?

—ছিঃ উনি সন্ন্যাসিনী, আমাদের গুরুমা।

---না বাবা, আমি ওর কাছে যাবো না, ওকে দেখলে আমার ভয় করে।

—তুমি তাহলে বসো, আমি ঘুরে আসি।

---তাড়াতাড়ি এসো, আবার বাবার কাছে যেতে হবে।

—যাবো আর আসবো---বলে দেবী বেরিয়ে পড়লো।

রোদের তাপ বেড়েছে। দমকা বাতাসও দেখা দিয়েছে। পথের বালি তপ্ত হয়েছে। পাহাড়ের পাথুরে সিঁড়িতে পা ফেলতে কষ্ট হয়। দেবী তারই মধ্যে যতটা সন্তর্পণে সম্ভব পা বাঁচিয়ে পাহাড়ে উঠে আসে। মন্দিরের সামনে একটি বড় বেলগাছ, এইটিই এখানকার একমাত্র গাছ। সেই গাছের গায় খড়কুটো আর ডালপালা দিয়ে একটা ঝোপ্‌ড়ির মত করা আছে। তারই মধ্যে ভৈরবী বসেছিল, দেবী এসে সামনে দাঁড়ালো, বললো—আমায় ডাকছেন?

ভৈরবী বললো—বসো।

দেবী উবু হয়ে বসে পড়লো। ভৈরবী ভালো করে দেবীর মুখের পানে তাকালো, তার মনের ভিতরটা অবধি দেখে নিতে চাইল। শেষে ধীরে ধীরে বললো—যে ছেলেটাকে বন থেকে কুড়িয়ে এনেছিস, তার কি পরিচয় বললি?

—পরিচয় ঠিক জানি না, তবে ছেলেটির মুখ থেকে শুধু ওর বাবার নামটাই শুনেছি, রাজপণ্ডিত মাধবরাম, আর ওর নাম রামশংকর।

—কোথাকার লোক?

—বারাণসীর বোধ হয়।

---বারাণসীর রাজপণ্ডিত, ঠিক জেনেছিস?

—সেটুকু ওর মুখ থেকে শুনেছি, ওতো সব কথা সাজিয়ে গুছিয়ে বলতে পারে না, ছেলেমানুষ।

—বয়স কত বলেছে?

—দশ বছর।

---হুম্ দশ বছরের ছেলে সাজিয়ে গুছিয়ে কথা বলতে পারে না। দশ বছরের মেয়ে শ্বশুরবাড়ী ভাত রাঁধতে যায়। তোর বুদ্ধি বড় কম।

ভৈরবী চুপ করলো, দেবীর মুখের পানে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললো---রাজপণ্ডিত মাধবরামকে আমি জানি, তবে সে কাশীর নয়, সে প্রয়াগের লোক। সে তাতিয়া টোপির পারিষদ, এখন এই বনভূমিতে আসার কথা নয়। তার কোন ছেলে আছে তা-ও শুনিনি। ছেলেটা তোকে মিথ্যে কথা বলেছে। যাক্, সত্যি মিথ্যে কিছু যায় আসে না। ওর বাপকে তো বাঘে খেয়েছে বললি না?

—হ্যাঁ---দেবী মাথা নাড়লো।

—সবই মা মহামায়ার ইচ্ছা। মা আটভুজী (অষ্টভুজা)র লীলা বড় বিচিত্র, আটভুজীই ওকে এনে দিয়েছেন এখানে। মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

দেবীর বুক দুরুদুর করে উঠলো। ভৈরবীর মুখ থেকে সে শুনেছে, নরবলি দিয়ে মা-কালীর পূজা করলে নাকি সত্বর সিদ্ধি লাভ করা যায়। তার গুরু নাকি সেইভাবেই পূজা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তবে ভৈরবীকে নরবলি দিয়ে পূজা করতে দেবী কখনও দেখেনি। কিন্তু এখন ভৈরবী যে ইঙ্গিত করলেন, তাতে সেই রকমই তো মনে হয়।

সোজা প্রশ্ন করতে দেবীর শঙ্কা হলো, ঘুরিয়ে বললো—কিন্তু ওর তো উপনয়ন হয়ে গেছে।

—সে আমি দেখেছি—ভৈরবী বললো—সে জন্য কোন বাধা হবে না। মা ওকে এনেছেন, মা-ই বুঝবেন।

—ব্রহ্মহত্যা হবে না? —দেবী ফস্ করে বলে বসলো।

---ব্রহ্মহত্যা কিসের? তোর বুদ্ধি বড় কম। মা ওকে নিয়ে এসেছেন, মা ওকে গ্রহণ করবেন। ও মায়ের কাছে আত্মাহুতি দেবে। আমরা উপাসিকা হিসাবে শুধু সেই ব্যবস্থাটুকু সম্পূর্ণ করবো।

ভৈরবী হাসলো। সেই হাসিমুখের পানে তাকিয়ে দেবীর দপ্ করে একটা কথা মনে পড়লো, রামশংকরের কথা 'সূর্পনখা'। রাক্ষসী সূর্পণখার মুখখানা কি ঠিক এমনি ছিল। দেবী ত্রাসে শিউরে উঠলো মনে মনে।

করুণ কণ্ঠে দেবী বললো—ছেলেটাকে দেখতে ঠিক আমার ছোট্ট ভাইয়ের মত।

—ও তোর চোখের ভুল। সব ছেলের মুখই ছেলেবেলায় অমন এক রকম থাকে। বয়সের সঙ্গে আস্তে আস্তে বদলায়। ও সব মায়া —মহামায়ার মায়া। ওতেই তো মানুষ কেবল জড়িয়ে পড়ে, ওই বাঁধন যে ছিঁড়তে পারলো সে-ই মুক্তি পেল। তোকে এতদিন তাহলে শেখালাম কি? সব কিছু থেকে মন তুলে নিয়ে ওই মায়ের চরণে ফেলে দে, ওইখানেই মুক্তি, ওইখানেই সিদ্ধি। আর সব মিথ্যে, সব মায়া।

ভৈরবী চোখ বুজলো। কয়েক মিনিট চোখ বুজে থেকে তারপর চোখ খুললো, বললো—আচ্ছা, তুই এখন যা।
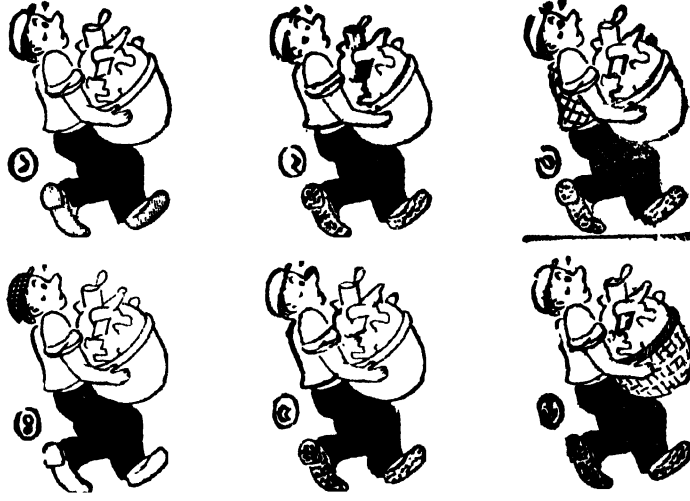
জোড় বার করো

● উপরের এই ছয়টি ছবি আপাতদৃষ্টিতে এক রকমের দেখতে হলেও ঠিক এক রকমের নয়। এর মধ্যে মাত্র দুইটি ছবি এক রকমের। কোন দুইটি তোমরা বার করতে পারো কিনা দেখ।

দেবী অভিভূতের মত পাহাড় থেকে নামতে স্নুরু করলো।

পাহাড় থেকে কিছুটা নেমে এলেই এক পাশে একটি পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর পাশ দিয়ে পথ গিয়ে পড়েছে দেবীদের ছাউনীতে। পুষ্করিণীর এক পাশে একটি বড় অশথ গাছ। সেই গাছের ছায়ায় এসে দেবী দাঁড়ালো। জলের পানে তাকিয়ে সে দাঁড়িয়ে রইল অনেকক্ষণ। তারপর কোন এক সময় বসে পড়লো গাছের নীচে। দেহ ও মন কেমন যেন ভারী হয়ে উঠেছে। ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না। রামশংকরকে আটভূজির কাছে উৎসর্গ করে গুরুমা সিদ্ধিলাভ করবেন। দেবতার পূজায় সিদ্ধিলাভ করতে হলে এক সরল শিশুকে বলি দিতে হবে কেন? প্রয়াগের সঙ্গমক্ষেত্রে কত সাধুকে সে তো দেখেছে, গঙ্গাতীরে ধূনী জ্বালিয়ে বসে থাকেন, তাঁদের মুখে তো কখনও শোনেনি যে, তারা মানুষ বলি দিয়ে দেবতার পূজা করেন। তাঁরা বলেন, একান্তভাবে ডাকতে হবে, সব ছেড়ে ভগবানকে ধরতে হবে, তাহলেই তাঁকে পাওয়া যাবে। কিন্তু ভৈরবী তো কখনো সে কথা বলে না। সুরা পান করে, মাংস খায়---বলে, আমাদের তন্ত্রপূজার পদ্ধতি আলাদা—শক্তি-পূজার রীতি আর সব পূজা থেকে ভিন্ন। কিন্তু ভিন্ন হবে কেন? সাধু-সন্তরা যে বলেন—যে শিব সে-ই শিবা, যে হরি সে-ই হর, একরূপে কৃষ্ণ আরেক রূপে কালী, আমরা শুধু আলাদা ভাবি, দেবতা সবই এক। তবে পূজা-পদ্ধতি ভিন্ন হবে কেন?

সতেরো বছরের মেয়ে দেবী ধর্মের দুরূহ তথ্যের কোন সমাধান খুঁজে পায় না। তার মন তখন অন্য দিকে ঘুরে যায়। ভৈরবীর জন্য রামশংকরকে মরতে হবে কেন? ভৈরবীর সিদ্ধি হোক্ বা না হোক্ তাতে রামশংকরের কি? দেবীই বা ভৈরবীর কথাতে রামশংকরকে হত্যা করতে দেবে কেন? ছেলেটার মুখ-খানা ঠিক তার ছোটভাইয়ের মত। তার ভাই বেঁচে থাকলে আজ ঠিক অমনিই হতো। ঠিক তেমনিভাবেই কথাবার্তা বলে, তেমনি সরল। তাকে কত বিশ্বাস করে, কত সহজে আপনার জন বলে ধরে নিয়েছে। ওকে দেবী রক্ষা করবে। ওই বালককে সে কোন মতেই ভৈরবীর তন্ত্রসাধন[illegible] জন্য বলি হতে দেবে না। যা হ[illegible] হোক্।

হবে না কিছুই, আজ রাত্রেই [illegible] এখান থেকে পালিয়ে যাবে[illegible] রামশংকরের হাত ধরে সোজা চ[illegible] যাবে বনের ভিতর দিয়ে। যেখা[illegible] হোক একটা গ্রামে গিয়ে পৌঁছু[illegible] পারলেই হলো। তখন বোঝা যা[illegible] ভৈরবীর কত ক্ষমতা।

দেবী মনস্থির করে ফেললো

আরো কিছুক্ষণ চুপ করে ব[illegible] থেকে, পুকুরের জলে হাতমুখ ধু[illegible] কিছুটা স্নিগ্ধ হয়ে দেবী ঘরমুখো [illegible] বাড়ালো। সহসা তার নজরে পড়[illegible] সিঁড়ির মাথায় ভৈরবী দাঁড়িয়ে আছে[illegible] তার পানে তাকিয়ে আছে। যে[illegible] একটা বাঘিনী তার উপর ঝাঁপি[illegible] পড়ার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে[illegible] দেবী শিউরে উঠলো। তাড়াতাড়ি পা চালালো বাড়ীর পানে।

এক বছরের বেশি হো[illegible] ভৈরবীর সঙ্গে সে চলাফেরা করছে কিন্তু ওর চোখ দুটোর পানে তাকাতে আজও তার ভয় করে। কি আছে ওই দু'চোখের দৃষ্টিতে কে জানে? [ক্রমশ

১৪ই নভেম্বর

১৪ই নভেম্বর—এই তারিখটি দু'দিক দিয়ে আমাদের কাছে স্মরণীয়। একদিকে এই দিনটিতে ইংরাজী ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু জন্মগ্রহণ করেছিলেন; তাই এই দিনটি নেহরুজীর জন্মদিন রূপে পরিচিত। শুধু জন্মদিনই নয়, এই দিনটি আবার আমাদের কাছে 'শিশু-দিবস' রূপে খ্যাত। তাই শিশুদের কাছে এই দিনটি সত্যই প্রিয়। আর সেইজন্যই তো ছোট ছোট শিশুর দল এই দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে।

এই দিনটির কথা লিখতে বসে মনে পড়ে নেহরুজীর ছেলেবেলার কথা। তিনিও ছেলেবেলায় আর পাঁচটা সাধারণ ছেলের ন্যায় কত দুষ্টুমি করতেন, কত অন্যায় কাজও করতেন, তাই বলে লেখাপড়ায় এতটুকু অবহেলা করেন নি। একবার তাঁর ছেলেবেলার কলম চুরি করার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। তাঁর পিতা মতিলাল নেহরুর টেবিলের উপর ছিল দু'টি ঝর্না কলম। বালক জওহরলালেরও একটা কলম নেবার ভারী সখ হল। তাই কোনরকম না ভেবে একটা কলম তিনি লুকিয়ে রাখলেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁর পিতা ঘরে ঢুকে টেবিলের 'পরে কলম দেখতে না পেয়ে খুব রেগে গেলেন। মহাগোলমাল বেঁধে গেল; সারা বাড়ীতে কলমের খোঁজ করা হতে লাগল কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না, অবশেষে চাকরেরা খুঁজতে খুঁজতে বালক জওহরলালের পকেটে পেল। মতিলাল তো এ-খবর শুনে দারুণ চটে গেলেন। ছেলেকে তিনি শুধু ভর্ৎসনা করলেন, সেই সঙ্গে মারতেও রাখলেন না বাদ।

অসহায় জওহরলাল মায়ের কোলে লুকিয়ে কাঁদতে লাগলেন। মা তাঁকে কত সান্ত্বনা দিয়ে আর আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে মালিশ করে শেষ পর্যন্ত শান্ত করলেন। ভাবতেও অবাক লাগে, এই দুষ্ট ছেলেটিই বড় হয়ে ভারতবর্ষের প্রধান-মন্ত্রী হয়েছিলেন। জওহরলালের ছেলেবেলার এমনি আরও কত চমকপ্রদ ঘটনাই না আছে।

শ্রীপ্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায়

ছেলেবেলায় নির্ভীক জওহরলালের অদম্য সাহসের আর এক চমকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করা যাক। ছেলেবেলা থেকেই জওহরলাল অত্যন্ত সাহসী ছিলেন। ঘোড়ায় চড়াও তাঁর খুব প্রিয় ছিল। একবার বাড়ীর কাউকে কিছু না বলে ঘোড়ায় চড়ে বাড়ীর বাইরে অনেক দূরে তিনি এসে পড়লেন। বাড়ীর সকলে তাঁকে বেশ কিছুক্ষণ না দেখে খুঁজতে লাগল। শেষ পর্যন্ত স্বয়ং মতিলাল ও তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা ঘোড়ায় চড়ে তাঁকে খুঁজতে লাগলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর তাঁরা জওহরলালকে দেখতে পেলেন। জওহরলাল এ ঘটনা তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করে বলেছিলেন—সেদিন যেন তাঁর মনে হয়েছিল তিনি একটা দেশ

● জওহরলাল নেহরু

জয় করে শোভাযাত্রা সহকারে বাড়ী ফিরছেন। সকলের আগে তিনি, তারপর তাঁর পিতা ও বন্ধুবান্ধবদের সারি। জওহরলালের এই অভিযানটি আমাদের কাছে যেমন কৌতুককর, তেমনি আনন্দদায়ক।

ছোটখাটো উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে জওহরলালের সবচেয়ে প্রিয় ছিল তাঁর জন্মদিনের অনুষ্ঠানটি। এই দিনটিতে তিনি আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে প্রচুর উপহার পেতেন; নানা রকমের খাবারও খেতে পারতেন। তাই তিনি তাঁর মাতাকে বলতেন—প্রত্যহ তাঁর জন্মদিন পালন করা হয় না কেন? ছেলেবেলায় নেহরু-জীবনের এই ঘটনাগুলি সত্যই শিশুদের সরলচিত্তে বিস্ময় ও পুলক বহন করে আনে।

এই নেহরুই ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠলেন, প্রচুর পাণ্ডিত্য অর্জন করলেন। প্রধানমন্ত্রীও হলেন; দেশের উন্নতির জন্য কতরকমের পরিকল্পনা করলেন। তিনি ছিলেন বিশ্বশান্তির অগ্রদূত। দেশ-বিদেশে তিনি শান্তির বাণী প্রচার করেছিলেন।

এই বিশ্ববন্দিত ব্যক্তিটি আবার শিশুদের কাছে 'চাচা নেহরু'। শিশুদের সঙ্গে মিশতে বয়সের কোন তারতম্য ছিল না তাঁর কাছে। প্রচুর পাণ্ডিত্য আর প্রধানমন্ত্রিত্ব তাঁকে বাধা দিতে পারে নি, শিশুদের সঙ্গে মিশতে আর তাদের সকল রকমের আনন্দে যোগ দিতে। শিশুদের তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। তিনি মনে করতেন শিশু হচ্ছে সরলতার ও পবিত্রতার মূর্তপ্রতীক। শিশুরা একদিন বড় হয়ে দেশের কর্ণধার হবে। তাই তো তিনি শিশুদের হাসি-আনন্দে নৃত্য-গীতে সকল রকমের খেলায় যোগ দিতেন। ১৪ই নভেম্বরের ঐ বিশেষ দিনটিতে চাচা নেহরু শিশুদের সঙ্গে আনন্দোৎসবে মত্ত হতেন বলে ঐ দিনটি "শিশু-দিবস" রূপে আমাদের নিকট অমর হয়ে আছে। একবার শিশু-দিবসের এক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়ে তিনি বলেন—"আমি শিশুদের মধ্যে থাকতে ভালবাসি। তাদের সঙ্গে আলাপ করতে, খেলতে আমি আনন্দ পাই। মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্যও অ ভুলে যাই যে, আমি এখন বৃদ্ধ, অ শিশু ছিলাম বেশ কয়েক যুগ আগে কিন্তু যখনই তোমাদের জন্য কি কিছু লিখতে বসি তখন আমার বয় কথা ভুলতে পারি না, ভুলতে পা না তোমাদের আর আমার ম বিরাট ব্যবধানের কথা--------।'

শিশুদরদী এই নেহরু আজ অ আমাদের মধ্যে নেই। নেহরুই ভাবতে এই দিনটি প্রতি বৎসর আস এবং যাবে কিন্তু ভারতের লক্ষ ল শিশু আর তাদের প্রিয় মহান নে 'চাচা নেহরু'কে জীবন্ত মূর্তিতে দেখতে পাবে না,---দেখতে পাবে তাঁর হাসি-হাসি মুখখানা আর বুকে শোভমান গোলাপের কুঁড়ি। কি শিশুরা তাঁর স্নেহের কথা কখনো ভুলবে না। শিশুদের মধ্যেই ঐ শিশু-দরদীটি চিরদিন অমর হয়ে থাকবে।

আল্লা-হরি করেন কোলাকুলি

(অপ্রকাশিত)

ভক্তদের খবরাখবর নিতে আল্লা আর হরি স্বর্গ হতে পৃথিবীতে এসেছিলেন। দুজনেরই ছিল ছদ্মবেশ। হরি এসেছিলেন ব্রাহ্মণের বেশে—গায়ে নামাবলি, গলায় পৈতা, মাথায় মোটা টিকির গোছা। আল্লার ছিল দরবেশের বেশ—গায়ে আলখাল্লা, গলায় স্ফটিকের মালা, মুখে ইয়া লম্বা দাড়ি।

পৃথিবীর কাজ সেরে দুজনে ফিরছিলেন। দুদিকের পথে এসে তাঁরা পড়লেন একটা বড় রাস্তার মোড়ে। সেখানে একদল সেপাই টহল দিচ্ছিল। ব্রাহ্মণকে দেখে একজন সেপাই ব'লে উঠল—হল্ট্।

আর-একজন সেপাই দরবেশকে পেছনে ঠেলে দিয়ে বলল—হট্ যাও, কার্ফ্যু টাইম হুয়া।'

সেপাইদের কথা বুঝতে না পেরে হরি চোখের ইসারায় আল্লাকে প্রশ্ন করলেন—কি বল্‌ছে ওরা? আল্লা ঠোঁট বেঁকিয়ে আর হাতের পাতা উল্টে বুঝিয়ে দিলেন—কে জানে ওসব ইণ্ডিল-মিণ্ডিলের মানে।

স্বর্গত কার্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত

মানে না বুঝলেও তাঁদের কিন্তু এগোবার জো রইলো না, সামনে পা বাড়াতেই সেপাই হাতের বন্দুক উঁচিয়ে বাধা দিল। পথ না পেয়ে আল্লা আর হরি ঠিক করলেন—যাওয়া যখন চল্‌লই না তখন রাত্তিরটা পৃথিবীতে কাটিয়ে দেওয়া যাক্। তারা ফিরে গিয়ে দুটো বাড়ীর দাওয়ায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। হরি যেখানে শুলেন সেখানে ছিল এক পীরের দরগা। আল্লা ঘুমোলেন মহাপ্রভুর এক মন্দিরের দাওয়ায়।

ভোরবেলা দরগার মাতোয়ালী বাড়ীর দরজা খুলেই চেঁচিয়ে উঠল—দেখো তো এক দুষমনের কাণ্ড, শুয়ে রয়েছে কাবার দিকে পা দুটো দিয়ে। তোবা---তোবা ব'লে মাতোয়ালী ব্রাহ্মণকে ঠেলে তুলে ইমামের কাছে নিয়ে গেল। ইমাম মাতোয়ালীর নালিশ শুনে হুকুম দিলেন—এ গুনাহর জন্য লোকটাকে রোজা রাখতে হবে, রমজানের মত পুরো এক মাস, আর রোজ পাঁচ ওক্ত পড়তেও হবে কোর-আন-শরীফ।

দরবেশ যে মন্দিরের দাওয়ায় শুয়ে ছিলেন সেখানকার সেবাইত বাইরে এসেই মোহান্তকে ডেকে বলল—দেখুন

এসে এক পাষণ্ডীর কাণ্ড, ঘুমিয়ে রয়েছে মহাপ্রভুর বিগ্রহের দিকে পেছন ফিরে।

মোহান্ত এসে দেখেন সত্যিই তাই। তিনি হুকুম করলেন—লোকটাকে ছত্রিশ প্রহর নামকীর্তন করতে হবে, নইলে এ-পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না।

ইমাম আর মোহান্ত হুকুম দিয়েই নিশ্চিন্ত থাকতে পারলেন না। কিছুক্ষণ পরে দুজনেই দেখতে গেলেন তাঁদের হুকুমমত কাজ হ'লো কি না।

ইমাম দরগায় যেতেই ব্রাহ্মণ বললেন—এ কি কেতাব পড়তে দেওয়া হয়েছে আমাকে। এর গোড়া কোন্‌দিকে আর শেষই-বা কোন্ দিকে? তার উপর কেমন হরপ এতে, সাত-জন্ম চেষ্টা ক'রেও তা পড়ে কার সাধ্য।

মোহান্ত কাছে যেতেই দরবেশ বললেন—গান কি কখনো করেছি আমি যে ছত্রিশ প্রহর কেত্তন গাইবো। ছেলেবেলায় একদিন, একটা গজলের সুর টানতে চেয়েছিলাম। তখন পাড়ার যত নেড়িকুত্তা ঘেউ ঘেউ করে আমাকে তেড়ে এসেছিল। সেদিনই নাক-কান ম'লে দিব্যি করে রেখেছি এ জন্মে এ মুখে আর তাইরে-নাইরে-না আনব না।

নিরুপায় হ'য়ে ইমাম ব্রাহ্মণের অন্য শাস্তির ব্যবস্থা করলেন। তাঁর হুকুম হ'লো—লোকটার টিকি কেটে রেখে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় বের ক'রে দাও।

দরবেশের বেলাও মোহান্ত হুকুম দিলেন—লোকটার গোঁফজোড়াকে চেঁছেছুলে ওকে গোঁফশূন্য দেড়ে বানিয়ে দাও। তারপর মাথায় চাঁটি মেরে তাড়িয়ে দাও রাস্তায়।

যে-সব ভক্ত পীরসাহেবের নামে দরগায় সিন্নি চড়াতে এসেছিল তারা টিকিআলা ব্রাহ্মণের ঘটনাটা সমস্তই শুনতে পেলো। মন্দিরে পুজো দিতে এসে মহাপ্রভুর ভক্তদেরও কানে গেল গোঁফ-দাড়িআলা দরবেশের কাণ্ড। তখন দু-দল ভক্তের মধ্যে মহা হৈ-চৈ পড়ে গেল। পীরসাহেবের ভক্তেরা জিগীর তুলল—একজনের টিকি কেটে দিলেই কি এ গুণাহর সাজা হয়! যেখানে যত টিকিয়ালা আছে সব্বাইর টিকি কেটে এর বদলা নেওয়া চাই।

মহাপ্রভুর ভক্তেরাও চেঁচিয়ে উঠল—একজনকে গোঁফশূন্য দেড়ে ক'রে দিলেই কি এমন পাপের সাজা হ'য়ে গেল। যেখানে যত দাড়িওলা আছে সকলকেই ধরে এনে করতে হবে গোঁফকামানো দেড়ে। দু-দল ভক্তের মুখেই তখন ধর্ ধর্---কাট্ কাট্ শব্দ।

ছাড়া পেয়ে আল্লা আর হরির মনে হ'লো পৃথিবীর হাঁটাপথে গেলে আবার হয়তো কোনো ফ্যাসাদে পড়তে হবে। তাই তাঁরা এবার আকাশের পথে স্বর্গে চললেন। যেতে যেতে দুজনের দেখা। পৃথিবীর হৈ-হল্লোড় শুনে তাঁরা নীচের দিকে তাকিয়ে ভাবলেন—এ কি! এরা কি সৃষ্টি লণ্ডভণ্ড করবে নাকি! আল্লা আর হরি কি যুক্তি করতে লাগলেন। তারপর এক-একজনে এক-একদিকে মুখ ফিরিয়ে এক-একটা ফুঁ দিলেন। অমনি এক তাজ্জব ব্যাপার ঘটে গেল।

আল্লার ফুঁ ইমামের ঘাড়ে গিয়ে পড়তেই তাঁর মুণ্ডটা খসে হরির ফুঁয়ের হাওয়ায় মোহান্তের মুণ্ডুটাও আলগা হয়ে গেল। তক্ষুণি আবার মুণ্ডু দুটো টকাস্ টকাস্ ক'রে লেগে গেল অদল-বদল হ'য়ে—ইমামের কাঁধে মোহান্তের মাথা, আর মোহান্তের ঘাড়ে ইমামের মাথা। ভক্তেরা দ্যাখে ইমামের মাথায় ইয়া-মোটা টিকির গোছা, আর মোহান্তের গালে ইয়া লম্বা দাড়ি! তাঁরা দুজনে তখন ছুটেছেনও দুদিকে,—জয় নিতাই---জয় নিতাই ব'লে ইমাম ছুটেছেন মহাপ্রভুর মন্দিরের উদ্দেশে, মোহান্ত লা-ইলা-আল্লাহ বলতে বলতে চলেছেন দরগা লক্ষ্য ক'রে। যেতে যেতে মাঝপথে দুজনের দেখা। অমনি একজন আর একজনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে মোহান্ত ইমামকে জিজ্ঞেস করলেন—খোস তবিয়ৎ, চাচা?

ইমাম জবাব দিলেন—মহাপ্রভুর দয়ার বলে বাঁচা।

এ-দৃশ্য দেখে ভক্তের দল হতভম্ব হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর কি টিকিয়ালা ইমামকে টিকি কাটতে কিংবা গোঁফ-দাড়িওয়ালা মোহান্তের গোঁফ কামাতে কারুর সাহস হয়।

আল্লা আর হরিও নিশ্চিন্ত হলেন। মনের আহ্লাদে তাঁদের একজন আর একজনকে বললেন—আসুন, ভায়া, আমরাও এবার কোলাকুলি করে বিদায় হই।

আকাশের পথে দাঁড়িয়েই একজন আর একজনকে বুকে চেপে ধরে কোলাকুলি করতে লাগলেন। একবার ডাইনে হেলে, আর একবার বাঁয়ে হেলে তাঁদের সে কোলাকুলি কি সহজে

বিচিত্র পশু ও একটি পোকা

এখানকার ছবিতে দু'টি বিচিত্র পশু ও একটি পোকাকে তোমরা দেখতে পাচ্ছ। পাশের এই শেয়াল

ভোঁদড় বা ভামের মত জীবটির নাম রেকোন। উত্তর আমেরিকায় এদের বাস এবং এরা মাংসাশী। তবে এদের খাবারের সবচেয়ে বৈশিষ্ট্য হ'ল, যে-কোন জিনিসই এরা খাক খাবার আগে একবার জলে ডুবিয়ে তবে খাবে।

রেকোন-এর পাশেই যে পোকাটি রয়েছে তাকে তোমরা সবাই চেনো। এটি প্রজাপতি গোষ্ঠীরই 'মথ' জাতীয় একটি পোকা। এরা রাত্রি ছাড়া খাদ্য সংগ্রহ করতে বেরোয় না।

সবচেয়ে নীচে দাঁতওয়ালা যে কিম্ভূতকিমাকার পশুটি রয়েছে, এটি আফ্রিকার একটি বন্যবরাহ। ইংরেজীতে নাম হ'ল 'ওয়াট হগ'। দেখতে এরা যত বীভৎস, প্রকৃতি সে ধরণের জঘন্য বা হিংস্র নয়। ধরা পড়ার পর কোন জু'তে

এরা অন্য জন্তু বা মানুষের বন্ধুত্ব করতে এগিয়ে যায়।

ছত্রী সৈন্যবাহিনীর মেয়ে কর্পোরাল

পশ্চিম জার্মান সৈন্যবাহিনীতে পুরুষালী নামের একমাত্র মেয়ে কর্পোরাল হল একটি বিদেশিনী ভালুকী। এই সিংহলী ভালুকীর নাম আলফ্রেড। সেনাদলে এর মত আদর যত্ন আর কেউ পায় না। বর্তমানে পশ্চিম জার্মানীর কোন একটি ছত্রী সৈন্য-বাহিনীর প্রতীক হল আলফ্রেড। ঐ বাহিনীর একজন সার্জেণ্ট মেজর শিশু ভালুকীটিকে দোকান থেকে কিনে নিয়ে আসেন এবং দলীয় কমাণ্ডারের অনুমতি নিয়ে সে সেনাদলে থেকে যায়। ঐ কমাণ্ডার নিজের আদ্যনামানুসারে ভালুকীর নাম রাখেন আলফ্রেড। মহড়ার সময় আলফ্রেড ছত্রী সৈন্যদের সঙ্গে বিমানে থাকে তবে তাকে ঝাঁপাতে দেওয়া হয় না। আলফ্রেড রোজ প্রচুর পরিমাণে ফল মূল, শাকসব্জী, ঘন দুগ্ধ, মার্মালেড মধু খায় কিন্তু তার খাবারের পয়সা সে নিজেই যোগাড় করে। সে একজন নামজাদা চিত্রতারকা। অভিনয় থেকে সে যা রোজগার করে, তা সবই তার নামে ব্যাঙ্কে জমা করা হয়।

এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর একটি চিত্র মুদ্রিত হইল। চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন শিল্পী শ্রীঅন্নদা দত্ত।

হরিদ্বার থেকে হৃষীকেশ লোক্যাল ট্রেন যাতায়াত করছে। তবে যাঁরা প্রথম যাচ্ছেন তাঁদের পক্ষে বাসে যাওয়াই ভালো। পথে একটা অনেক পুরাণো শিবমন্দির আছে। ট্রেনে গেলে সেটা দেখা যায় না। বাস মন্দিরের সামনে যাত্রীদের সুবিধার জন্য বেশ খানিকক্ষণ থামে।

এখনকালে হৃষীকেশের রূপরূপ তেমন আকর্ষণীয় নয়। ঘাটে জল নেই। গঙ্গা অনেক দূরে সরে গেছে। স্রোতের বেগ কমেনি। অনেকটা আগেকার রাজার মেজাজখানার মতন। চারদিকে শুধু বালুর ঢিপি। স্রোত কইতে তার দাপটও তেমন কম নয়।

অদূরে হিমালয়।

একদিকে হিমালয়, মাঝখানে বাঁকা তলোয়ারের মতন গঙ্গার স্রোতরাশি ওপারে বাঁধানো ঘাট, দোকান পাট যেন ছোট্ট দেশলাইটির মতন। হৃষীকেশ থেকে টাঙ্গায় চেপে চললাম লছমনঝুলা। কোনোকালে এ ব্রীজটা শুধু বাঁশের ওপরেই দাঁড়িয়ে ছিল। আজকাল পাকা বড় আকারে দোলনার মতন লোহার ব্রীজ। মাঝখানে দাঁড়িয়ে হেলেদুলে নাচলে ব্রীজটাও দুলতে থাকে।

মাত্র মাইল তিনেক পথ। তাও যেন শেষ হতে চায় না। ঘোড়াটার দোষ নেই। পার্বত্য পথ। তার ওপর চড়াইটা মাঝে মাঝে বেশ উঁচু নীচু। মাঝে মাঝে রাস্তাটা এতই অনুন্নত যে, নীচের দিকে তাকাতে ভয় করে। মনে হয়, এই পড়লো বুঝি ঘোড়াটা পা পিছলে টাঙ্গা, যাত্রী, সহিস নিয়ে। পড়ি পড়ি করেও তারা পড়ে না। ঘোড়ার কাছে এ পথ নতুন নয়। সহিস এ পথ অতিক্রম করে চলেছে মোটর, বাস চলার অনেক আগে থেকে।

এ পথ হেঁটেও অতিক্রম করেছি। একাধিকবার। এবার হাতে সময় কম।

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

অভিপ্রায় কোন তীর্থদর্শন নয়। স্বর্গাশ্রমের কাছে একটা কুঠিয়া আছে। সেখানে আছেন একজন প্রবীন সন্ন্যাসী। প্রতিটিবার তাঁর সাথে দেখা করে যাই। ভাবলাম এবারও নিশ্চয়ই দেখা করা উচিত।

পাহাড়ের গা বেয়ে রিমিঝিমি সুরে ঝর্ণার ধারায় জল গড়িয়ে পড়ছে। এগুলো ঠিক ঝর্ণা নয়। উপরে হিমালয়-শিখরে বর্ষাধারা ধীরে ধীরে নেমে আসে পাঠরের গা বেয়ে। দূর থেকে এত সুন্দর দেখায় যেন ছোট্ট ঝর্ণা। কোথাও ফার্ন, কোথাও বা দেবদারু পাইনের সবুজ ঘন বনানী। যেখানে নেই কোন সবুজের ছোঁয়া। এই ঝর্ণার জলধারায় মনে হয় যেন ধ্যানগম্ভীর তাপসের গলায় ঝুলছে তুষার ধবল যজ্ঞোপবীত নিচে কুলু কুলু গঙ্গা।

শিবানন্দ আশ্রম এখন শিবহীন যজ্ঞে দাঁড়িয়েছে। শিবানন্দ দেহরক্ষা করেছেন সম্প্রতি।

গত পনেরোটি বছরে কিছু বদলেছে বলে মনে হল না। হিমালয়ের কাছে আর পনেরোটি বছর কি? মহাকালের কপোলে যেন একটা বিন্দু নয়। লছমন ঝুলার মন্দিরে পূজারীটিও সেই। এমন কি যাত্রীদের রূপটুকুও বদলায় নি। অধিকাংশই গ্রামীণ ভারতবর্ষ। কেউ কেউ হলদে রঙের পোষাক পড়েছেন আবার। উত্তর ভারতে এটাই পরিব্রাজকের চিহ্ন। হলদে পোষাক তীর্থযাত্রীর চিহ্ন। হলুদটা আসলে ডিস্ইনফেকশেস। সংক্রামক ব্যাধি এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে যাতে না যায় তাই প্রাচীন ভারতে প্রচলিত ছিল এই রীতি। গ্রামীণ ভারতবর্ষ আজও সেই ঐতিহ্য আঁকড়ে ধরে আছে।

মাঝে মাঝে নতুন দু-একটা টী-ষ্টল খোলা হয়েছে। পাঞ্জাব প্রত্যাগত শরণার্থীর উদ্যমের প্রশংসা করতে হবে বৈকি। দোকানও চলছে চিমে তেতালা গতিতে। পুণ্যসঞ্চয়ও হচ্ছে---বাংলাদেশের রথদেখা কলা বেচার মতন আর কি।

কুঠিয়ার কাছে আসতেই পরমাত্মীয়ের

নূতন বেরিয়ে এলেন মাধব মহারাজ। কোনোকালে শিক্ষক ছিলেন। দিল্লীতেই আজকাল সন্ন্যাসী বশিষ্ঠানন্দ-শিষ্য।

আমি বশিষ্ঠানন্দের সান্নিধ্য লাভের জন্য এতদূরে এসেছি।

বেশ খানিকক্ষণ কেটে গেল। ছোট্ট হরিণের চামড়াটুকু সামনে রেখে বললাম এইটুকু আপনার নতুন আসন।

সন্ন্যাসীদর্শন কখনও খালিহাতে করতে নেই। বশিষ্ঠানন্দ অর্থ গ্রহণ করেন না।

স্বামীজীর জন্য এনেছিলেন? তিনি তো নেই? দেহরক্ষা করেছেন আজ বছর পাঁচেক হল। আপনি খবর পাননি? কি করেই বা পাবেন?

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। বছর পাঁচেক পূর্বেও এসেছিলাম। তারপর বার দুয়েক ঘুরে গেছি হরিদ্বার। সময়ের অভাবে শুধু স্বর্গাশ্রমে আসা হয়ে ওঠে নি।

সন্ন্যাসীর চোখেও দেখলাম টলমলে অশ্রুবিন্দু। সব ছেড়ে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হলেও মানুষ তো। পাথর কাঠের শরীর তো নয়।

বললাম, তিনি আপনার গুরুদেব ছিলেন, তাই না?

মাধব মহারাজ বললেন, "আজ্ঞে হ্যাঁ।" তাঁর মুখে আপনার কথা অনেক শুনেছি। আপনাকে তিনি অনেক স্নেহ করতেন।

বললাম, সে বিষয়ে আমি ধন্য। তবে, আপনার গুরুদেবকে আপনি নিশ্চয়ই আমার চেয়েও ভালো করেই জানতেন? সন্ন্যাসটা ছিল তাঁর একটা আবরণ মাত্র। তিনি ছিলেন একজন সর্বত্যাগী দেশ-প্রেমিক। দেশের ডাকে কৈশোরে একদিন গৃহত্যাগ করেছিলেন। দেশের মুক্তির জন্য ঘরছাড়া ছেলেদের তিনি অগ্রদূত। নিজের মুক্তির দিকে কখনও তাকান নি। আপনি বোধ হয় জানেন না তিনি আমার সন্ন্যাসী কাকা ছিলেন?

মাধব মহারাজ বিস্মিতভাবে বললেন, এ তো আপনি তাঁর একটা নতুন দিক তুলে ধরেছেন। বলুন না পরিব্রাজক। মঠের আরও দু-একজন ব্রহ্মচারী এসে কখোন আমার চারি পাশে ঘিরে বসেছিলেন ঠিক খেয়াল করিনি।

সবাইকেই খুব আপন বলে মনে হলো। একই পথের পথিক বলে সবার চিন্তাধারার সামঞ্জস্যও আমাকে যেন ইঙ্গিতে বলল, "যাঁর সম্বন্ধে আজ বলতে চলেছো, এই পবিত্র হৃদয়গুলোকে তাঁর সম্বন্ধে আরও কিছু জানতে দাও।"

বলতে শুরু করলাম, "আমরা তখন রাওয়ালপিণ্ডিতে থাকি। আজ থেকে ধরুন ত্রিশ বছর কিংবা তারও কিছুদিন আগের কথা।

রাওয়ালপিণ্ডির পথে হঠাৎ সন্ন্যাসীর বাচনিক ভঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে আমার পিতৃদেব তাঁকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসেন। রাওয়ালপিণ্ডি পেশাওয়ার, বান্নুতে তখন কংগ্রেস-সভাপতি ডক্তর ঘোষের অসামান্য প্রতিপত্তি।

সন্ন্যাসী কিন্তু কিছুতেই বাংলা কথা বলতে চান নি সেদিন। মারাঠী ভাষায় অনর্গল কথায়-বার্তায় তিনি সবাইকে দৃঢ়প্রত্যয় করতে চেয়েছিলেন যে, তিনি মহারাষ্ট্রের সন্তান। কিন্তু পারেন নি।

ওঁদের সিগ্‌ন্যাল আছে। সেই সিগ্‌ন্যালের জবাবে তিনি সিগ্‌ন্যাল দিয়েছিলেন। আমি তখন শিশু। হঠাৎ সন্ন্যাসী আমার পিতৃদেবকে জড়িয়ে ধরেন।

সেদিন থেকে তিনি প্রায় ছ'মাস আমাদের রাওয়ালপিণ্ডির বাড়ীতেই ছিলেন।

হঠাৎ একদিন বাড়ীতে সার্চ হলো। আমরা তখনও মর্নিং ওয়াক্ করে ফিরিনি। রাস্তার মোড়ে কমল সিং ছোট্ট একটা কাগজের চিরকুট নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সন্ন্যাসীকাকা আমাদের সবাইকে আদর করে জলভরা চোখে কোথায় চলে গেলেন। আর তাঁকে রাওয়ালপিণ্ডিতে দেখিনি। পরে শুনেছিলুম পিতৃদেবের কোনো বন্ধুর সাথে তিনি অমরনাথ গিয়েছিলেন। কাশ্মীর থেকে তিনি আমাদের জন্য কা[illegible] "শিকারা" পাঠিয়েছিলেন। বহুদিন [illegible] শিকারা আমাদের ড্রইং রুমে সযত্নে র[illegible] ছিল।

তারপরে সন্ন্যাসীকাকার সা[illegible] সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে দেখা হয়েছি[illegible] দিল্লীর রাজপথে। একটা ঠিকানা দিয়ে তাড়াহুড়ো করে তিনি হরিদ্বারের বা[illegible] চেপে বসেছিলেন।

সেই ঠিকানাটুকু নিয়ে বছর পনে[illegible] পূর্বে হৃষীকেশেরও অনেক আ[illegible] স্বর্গাশ্রমের কুঠিয়াতে তাঁর সাথে গি[illegible] দেখা করেছিলাম।

পরে কিন্তু তিনি সত্যিই সন্ন্যা[illegible] হয়ে গিয়েছিলেন। কেবলমাত্র আমরা জানি, প্রথম জীবনে তিনি মোটে সন্ন্যাসী ছিলেন না। তাঁর নিজে মুখেই তাঁর কাহিনী শুনেছি।

গ্রামের নাম ছিল চন্দ্রহার। লোকের বলত চান্দার। বরিশালের বর্ধিষ্ণু গ্রাম লেখাপড়া, খেলাধুলা, স্বাধীনতা-চেতনা কোনোদিন অনেক গ্রামের অগ্রণী ছিল সেই গ্রামে মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সুনীল চক্রবর্তী, লেখা পড়ায়, খেলাধুলোয়, বাক্ প্রতিযোগিতা দু-পাঁচ গ্রামে তাঁর বেশ খ্যাতি প্রতিপত্তি ছড়িয়ে পড়েছিল।

এমন সময় এলো স্বাধীনতা আন্দোলনের ঝড়। বহু পূর্বে একবার এসেছিল সেই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়ে। লোকেরা ফিস ফিস করে কথা কইছিল। চুপি চুপি নিশাচরের মত কোথায় সব যাতায়াত শুরু করেছিল। কেউ বলত, ওরা স্বদেশী ডাকাত। কেউ বলত---দেশপ্রেমিক নওজওয়ান। দেশের মুক্তি ওঁদের হাতে।

তা ঠিক জানি না। কেমন করে বিপ্লবীদলে যোগদান করলাম আজও ঠিক মনে পড়ছে না। তবে, এটা ঠিক মনে আছে আলোছায়ার ঘনান্ধকারে সেই ছোট্ট মঠে যখন আমি প্রথম পদার্পণ করলাম, খুশির প্লাবনে মন ভরে গেল। বিশ্বাস করো, জীবনে অতো আনন্দ বোধহয় কখনও পাইনি। আত্মবিশ্বাসে, দেশের ডাকে, পার্টিকমাণ্ডারের আমার

ওপর আস্থায় আমি ভারি আনন্দিত হলাম। তাদের কাউকেই আমি চিনতাম না। তবুও মনে হল এঁদের সবাইকেই যেন আমি যুগ যুগ ধরে জানি।

সুকুমারদা মোমবাতিটার ওপর আঙুল রেখে বললেন, "এই দেখো আগুনে আঙুলটা জ্বলে যাচ্ছে। এমনি ভাবে ওরাও তোমার আঙুলে আগুন দেবে। বলেই একটা পিন্ পরপর করে নিজের নখের ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন। আবার এমনি করেও তোমাকে পরীক্ষা করতে পারে। দেশের নামে নিজের রক্তে লিখে দাও কখনও পার্টির কোনো খবর বাইরের কাউকে দেবে না। যদি দাও, জানবে তোমার প্রাণদণ্ড হবে। যাদের এখানে সবাইকে দেখতে পাচ্ছো তাঁরাই তোমার প্রাণদণ্ড দেবেন।

রক্তের অক্ষরে আমি অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষর করলাম—দেশের কাজে এ প্রাণ-উৎসর্গের পুরোহিত ছিলেন সুকুমারদা।

বলেই সন্ন্যাসীকাকা দু-হাত কপালে ঠেকিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন।

তারপর?

তারপর ধীরে ধীরে পার্টির কাজে অংশ পেতে শুরু করলাম। প্রাণে আনন্দ, মুখে আলো, চোখভরা আশা—আমার দেশ ভারতবর্ষ স্বাধীন হবে। আমি সে স্বাধীনতা-যুদ্ধের বীর জওয়ান।

আমার প্রথম কাজ ছিল ডাক বয়ে নেওয়া। এক গ্রাম থেকে অপর গ্রামে চিঠি নিয়ে যেতাম। গিয়ে একদিন অবাক ভাবে দেখি আমাদের স্কুলের থার্ড মাষ্টার তারাপদ বটগাছটার তলায় দাঁড়িয়ে। পিঠে হাত দিয়ে বললেন সাবাস্। এগিয়ে চলো। কোথায়? চিঠিখানা দিতে ভুলে গেলে?

তাঁকে দেখে আমি যেন সব ভুলে গিয়েছিলাম। তারাপদবাবু আমার বাবার বন্ধু।

চিঠিখানা তাঁর হাতে দিলাম। হাত কাঁপছে দেখে হেসে তারাপদবাবু বললেন, "এই হাতে এখন অনেক কিছু করতে হবে, একখানা চিঠি দিতেই কাঁপছে কেন?"

সেদিন তারাপদবাবুকে ভুল বুঝেছিলুম। মনে হয়েছিল তিনি বোধ সরকারী স্পাই। সেজন্য পরে মনে তাঁর কাছে অসংখ্যবার ক্ষমা চেয়েছিলুম। তারাপদ বসু, সুকুমার এঁদের সবার পরে ফাঁসি হয়েছিল।

বেশ কিছুদিন পরে আমাদের বাড়ীতে পুলিশের যাতায়াত শুরু হল দিন নেই রাত নেই কেবল হামলা।

কোথায় সুনীল চক্রবর্তী?

বাড়ী ফিরতে একদিন একটু দেরি হয়েছিল। সেদিন প্রায় ভোরই হয়ে গিয়েছিল। গিয়ে দেখি পুলিশের সাথে বসে বাবা কি আলোচনা করছেন। তৈরিই ছিলুম।

জেরা শুরু হল।

বললাম শ্মশানে গিয়েছিলুম। মধুসূদন মাষ্টারের মা মারা গিয়েছিলে সত্যি সত্যি। আসার পথে তাঁদের সাথে শ্মশানে দেখা। পুলিশ হড়হড় করে টানতে টানতে শ্মশানের দিকে নিয়ে গেল।

সবাই সাক্ষী দিলেন "হ্যাঁ সত্যি সত্যি সারারাত এ আমাদের দলে ছিল।

পুলিশ তাঁদের হুমকি দিয়ে গেল। গ্রামের লোকেরা এমনি করলে তাদেরও বিপদে পড়তে হবে।

বিপদ একদিন এলো। গ্রামের লোকেদের বাড়ীতে নয়। আমাদেরই নিজেদের বাড়ীতে। সব চেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, আমার বাবাই নাকি গিয়ে পুলিশে খবর দিয়ে এসেছিলেন।

আমি তখন পলাতক। মাঝ রাতে বাড়ীতে আসি শুধু দুমুঠো খেতে। মা সারাটি রাত শুধু দরজায় টোকার আশায় বসে থাকেন। কোনোদিন ভুলেও তিনি আমাকে না-খাইয়ে অন্ন তোলেন নি মুখে। সেদিন কি যেন একটা মিষ্টিও তৈরি করেছিলেন। আমি মিষ্টি খেতে ভালবাসতাম।

খেতে ঠিক বসবো। এমন সময় পুলিশ এসে বাড়ী ঘেরাও করে ফেলল।

বাবার কোন দোষ ছিল না। ছাপোষা শান্তিপ্রিয় মানুষ। ঘোর সংসারী। তিন-চারটি প্রাণী তার ওপর নির্ভরশীল। সরকারী চাকরীটুকু ছাড়া আর কোনো সম্বল ছিল না হাতে। তাই বোধহয়, একটির মায়া নেহাৎ নিরুপায় হয়ে ছেড়েই দিয়েছিলেন।

পুলিশ আমাকে বেঁধে নিয়ে গেল। আমার বাবার অবস্থাটুকু ভেবে দেখো—ভেবে দেখো সমাজে, গ্রামে, শহরে, কোথাও তিনি আর মুখ তুলে তাকাতে পারতেন না। বিদেশী শাসক তার প্রভুভক্তির পুরস্কার দিয়েছিল।

সময় কাটিতে চাইতো না জেলে। নির্যাতনকে ভয় পাইনি। পাদুটো উল্টো বেঁধে টাঙিয়ে যখন চাবুক মারতো তখনও মুখ দিয়ে কথা বের করতে পারে নি।

শুনেছিলুম ম্যাজিস্ট্রেট বাবাকে যখন পুরস্কার দিতে চেয়েছিল, হাউ হাউ করে তিনি নাকি তার পাদুটো জড়িয়ে বলেছিলেন, "আমি অভাগা। পেটের দায়ে ছেলেকে জেলে পাঠাই। দেশকে ভালবেসে সে জেল ভুগছে সাহেব। আমি জ্বলন্ত জেলে জ্বলে মরছি। তোমার দেশের দোহাই সাহেব দেখো যেন ছেলেটার ফাঁসি না হয়।

পার্টির ছেলেরাও নাকি তাঁকে একাধিকবার গুলী মারার চেষ্টা করেছিল, পুলিশ তাঁকে রেগুলার গার্ড দিয়েছিল।

দুঃখ হয়েছিল মার জন্য। সেই রাত থেকে তিনি অন্ন ছাড়লেন। বাবার দিকে ফিরেও তাকাতেন না।

একদিন হঠাৎ জেল থেকে পালালুম। জেলেতেও আমাদের লোক থাকতে পারে ভাবতেও পারিনি। একটা প্রহরীকে শুধু কাৎ করতে হয়েছিল। উপায় ছিল না। মার জন্য মনটা কেমন করছিল।

জেলের পোষাক ছিঁড়ে ফেলে শুধু মাত্র কৌপীন পরে পাগলের বেশে দিনের পর দিন হেঁটে গ্রামে হাজির হলাম। গ্রামে গিয়েই খবর পেলাম মা মারা গেছেন। শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কাছে গেলাম। কেউ চিনতে পারলো না। কেউ ভাবতেও পারে নি, আমি কে। একজন আত্মীয় তো পাগল ভেবে প্রায় তাড়িয়েই দিল।

ক'দিন গ্রামে থেকে গ্রাম থেকে বিদায় নিলাম—চিরবিদায়। স্বামীজীর ছবি হাতে নিয়ে ভারতবর্ষের ছবি বুকে এঁকে ঘর থেকে বেরিয়েছিলুম। সেই স্বামীজীকেই আদর্শ রেখে আবার সব কিছু ছাড়লাম। জীবনের বেশ পরিবর্তন করলাম। গেরুয়া মানে জানো তো; ত্যাগ। ত্যাগ থেকেই সুখ। এইটেই হল ভারতীয় দর্শনের মূলমন্ত্র।

হাঁটতে হাঁটতে ফ্রন্টিয়ার পৌঁছে গেলুম। দীর্ঘদিন পুলিশের নজর এড়িয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে চলতে হয়েছে। সে এক দীর্ঘ কাহিনী।

সারাটি রাত জেগে একদিন বশিষ্ঠানন্দর নিজমুখে তাঁর জীবনী শুনেছি। গুরু বিবেকানন্দর ডাকে একদিন সর্বত্যাগী হয়ে দেশের ডাকে বেরিয়ে পড়েছিলেন।

দেশ স্বাধীন হয়েছে। লক্ষ শহীদের রক্তরঞ্জিত পথে শতবর্ষের আরাধনার ধন স্বাধীনতা এসেছে। বরিশালের ছোট্ট চন্দ্রহার গ্রামের পিলসুজের ওপর পিতলের প্রদীপতলে আঁচল বিছিয়ে যে জননী দরজার টোকাটি শোনার জন্য বিনিদ্ররজনী কাটিয়ে, জড়িত চোখে পুত্রের প্রাণভরে আঁতকে উঠতো, শুনেছো কেউ তাঁর বক্ষস্পন্দন।

মায়ের কথা বলতে গিয়ে বৃদ্ধবয়সেও বশিষ্ঠানন্দর চোখ সেদিন জলে ভরে উঠতো।

এতদিন তীর্থস্থান খুঁজে পাইনি। পুণ্যসঞ্চয়েও বিশ্বাস ছিল না।

মাধব মহারাজকে বললাম, "আমি একবার তাঁর সমাধিতে প্রণাম জানাতে চাই।"

ঘনসবুজ বনানীর আড়ালে দেখলাম যেন হারানো মায়ের কোলে প্রশান্ত নিদ্রিত সন্তানের প্রশান্ত মুখখানা।

হিমালয়ের কোলে এত বড় তীর্থস্থান আর কটা আছে কেউ জানো কি?

ব্যবহারযোগ্য অভিনব গাড়ি

ফ্রাঙ্কফুর্টের আন্তর্জাতিক অটোমোবিল প্রদর্শনীতে দুটি নতুন ধরণের মোটরগাড়ি হাজির করা হয়েছিল। একটির নাম "অটোমোভা", এটি স্পোর্টস গাড়ি। সামনের দিক থেকে এটির চেহারা যেন ব্যাঙের চোখ বসানো একটি রকেট আর পেছন থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটি জানলা লাগানো শবাধার। তবুও সব মিলিয়ে গাড়িটির চেহারা বেশ সুন্দর এবং গতি ঘণ্টায় ১২০ মাইল। এর দাম ধরা হয়েছে ৮০০০ মার্ক। অপর গাড়িটির নাম দেওয়া হয়েছে "ক্যাম"। এটি পারিবারিক ব্যবহারের জন্যে। এতে পাঁচজন আরামে বসতে পারে ও মোটঘাট রাখা যায়। এতে ৬০ অশ্বশক্তির মোটর আছে ও সর্বোচ্চ গতি ঘণ্টায় ৯৫ মাইল। এর সীয়ার ও ষ্টিয়ারিং বিমানে যেমন থাকে তেমনি এবং কাজেও সেরকম। পঁচিশ ফুট বেড় নিয়ে এটি ঘুরতে পারে। দুটি গাড়িতেই প্লাস্টিকের 'গার্ডার' আছে-যাতে ধাক্কা লাগলে গাড়ির কোন ক্ষতি হবে না।
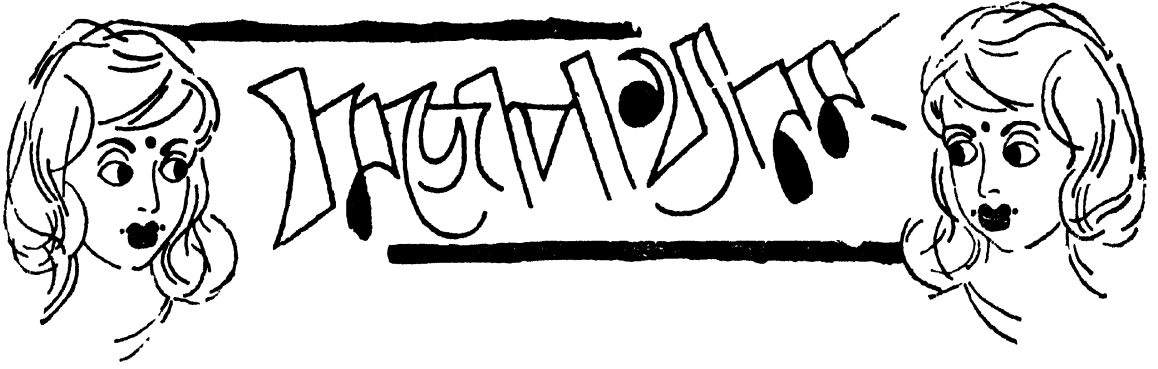
প্রাচীন জড়ভরত এবং অবাচীন জোড়া ভরত দুইয়ের উপাখ্যানই আকর্ষণীয়। দ্বিতীয়টি বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে অনেক বেশি কৌতূহলোদ্দীপক। শ্যামভরত যদি পালোয়ানিতে রপ্ত হয় রোজ ভোরে ডনবৈঠক মেরে, বেচারা রামভরতকেও ইচ্ছেয়-অনিচ্ছেয় ওঠ-বোস করতে হয়।

দুপুরে খাওয়ার পর ছিপ হাতে নিয়ে বেরুবার উদ্যোগ করে শ্যামভরত, কাজেই রামভরতের সারা দুপুর তার পাশে বসে ঢুলুঢুলু চোখে সময় কাটান ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। আয়েস করে বিছানায় গড়ান তার আর ঘটে ওঠে না। শ্যামভরত দারোয়ানী করে, রামভরতকে যিনি মাইনেয় মোতায়েন থাকতে হয় ভায়ের মনিবের দরোজায়। মরীয়া হয়ে সে যখন গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানের সঙ্গে শিক্ষানবিশীর চুক্তি করে তখন শ্যামভরতকে মনিবের দরোজা পাহারা দেওয়ার বদলে ছুটতে হয় ভাইয়ের গোযানের পিছু পিছু। যেদিন সে দরোজা কামড়ে পড়ে, সেদিন রামভরতের কাজ বন্ধ।

এ হ'ল গল্পকথা, হাসির রাজার রাজত্বে হাসির এক টুক্‌রো। এক সঙ্গে যারা সত্যিসত্যি আসে, তাদের উপাখ্যানও কম বিচিত্র নয়। গোটা ব্যাপারটাই রসময়, কণামাত্র রস থেকেই একক, যমক সব কিছুর উৎপত্তি। তার নাম বীর্যকণা, ইংরেজীতে স্পার্ম, একটা ডিমের সঙ্গে তার যোগাযোগে গড়ে ওঠে কোটি কোটি উপাখ্যান—প্রতিটি মানুষই কি এক একটা বৃত্তান্ত নয়? যদি তা' পড়ে নেওয়ার চোখ থাকে? আকর্ষণ তীক্ষ্ণ হ'লে শোনাও যায় বইকি।

যমজোপাখ্যানম্-এর গোড়ার কথার আকর্ষ সার্বজনীন। বাস্তবের অভিন্ন জোড়া ভরতের জীবন সুরু হয় একটি এককে, ডিমের মধ্যে, বীর্যকণার সাহায্যে উর্বর ডিমে। পরে ভ্রূণ একই ধরণের জীন সমেত দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। জীনের কাজ উত্তরাধিকারসূত্রে বৈশিষ্ট্য বজায় রাখা।

নার্স মিত্র

ফলে অভিন্ন যমজদের লিঙ্গ, চেহারা, প্রতিক্রিয়া, শক্তি-দুর্বলতা, বুদ্ধিবৃত্তি একই ধরণের। এরা এক সঙ্গে হাঁটে চলে, ওদের শেখার ধাঁচ ভিন্ন হয় না, এবং সত্যযুগীয় দম্পতিবৎ পরস্পরের ইচ্ছে-অনিচ্ছে সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠে সম্ভবত।

এছাড়া রয়েছে fraternal যমজ। এরা যে-কোন বাপমায়ের দু'টি সন্তানের মতই সাদৃশ্যবান, তার বেশি নয়। ওদের সুরু দু'টো ডিমে, দু'টো বীর্যকণার দ্বারা সমৃদ্ধ ডিমে, এবং উভয়ের যোগাযোগ যে একই সময়ে হবে তার কোন স্থিরতা নেই।

এমন কি 'অভিন্ন' যমজদেরও স্বল্প দৈহিক তফাৎ চোখে পড়ে, সময় সময় তাদের চালচলনেও বেশ তফাৎ দেখা যায়। টনি কোম্পানী তাদের বিজ্ঞাপনের জন্য শ'য়ে শ'য়ে যমজ বোনদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখেছে ওদের একজনই সাধারণত কথাবার্তা চালায়, নির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে আসে। অন্যজন মোটামুটি ধরিত্রীবৎ মূক, শান্ত এবং অধিকতর হৃদয়নন্দক। মনোবিজ্ঞানীদের মতে এ এক আশিস, অন্যথায় ওদের মুখদেখাদেখি বন্ধ হওয়ার উপক্রম ঘটত।

এদের মনের ওপর বিয়ের প্রভাব অসামান্য, কেন না হামাগুড়ির কাল থেকে, জ্যৈষ্ঠের ঝড়ে হাত ধরাধরি করে আম কুড়নোর কাল থেকে ওরা অতি ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সঙ্গে প্রায় একীভূত। ওদের স্বতন্ত্র চালচলন গড়ে তোলার জন্য বাপমাদের উপদেশ দেওয়া হয় ওদের স্বতন্ত্রভাবে দেখতে, সেইমত ব্যবহার করতে। কখনও যেন তারা দু'জনকে এক প্রাণের দু'টো অংশ ভেবে কাজ না চালান। দু'জনকে এক পোশাক পরান ঠিক নয়। এমন কি ওদের ভিন্ন টোলে পাঠান উচিত বলে অনেকে মনে করেন, ওদেরই মঙ্গলের জন্য।

'থাকবো এক সঙ্গে' এই বলে অনেক যমজ এ সমস্যার জড় মেরে দেয় অবহেলায়। আমেরিকার যমজ-দ্বয় বেঞ্জামিন আর হিম্যান রুবিন চমৎকার উদাহরণ। যমজ বোনদের বিয়ে করে ওরা সুখেই ছিলেন।

কোন কোন যমজদের জন্মের পর আলাদা করে ভিন্ন পরিবেশে গড়াপেটা চলতে থাকে। এ থেকে জানা যায়, মানুষের ওপর কিসের দাগ পড়ে' জবরদস্তভাবে—বংশগত বৈশিষ্ট্যের না আশপাশের ধরণ-ধারণের।

বংশগত তর মোড়লরা স্বপক্ষে এক দারুণ নজীর দিয়েছেন। এডুইন আর ফ্রেড দু'ভাই ওরা মানুষ হয়েছিল এক, জন অন্যজনের অস্তিত্ব না জেনে হাজার মাইল দূরে। অথচ দু'জনেই টেলিফোন প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রী, একই বয়সে বিয়ের ফুল ফোটে দু'জনের জীবনে, স্ত্রীও ওদের একই ধরণের। একই বছরে দু'জনেই বাবা হয় এবং দু'জনেরই কুকুর ফকস্ টেরিয়ার, নাম একই —'ট্রিক্সি।'

জনৈক জার্মান গবেষক জোহানেস্ ল্যাং তেরজন যমজ অপরাধীর ইতিহাস খুঁচিয়ে দেখে আবিষ্কার করেন ওদের মধ্যে দশজনের যমজই অপরাধী।

ইংলণ্ড আর ওয়েলস্-এ বাহাত্তরটা নবজাতকের মধ্যে একজোড়া যমজ জন্মায়, আমেরিকায় বিরাশিটায় এক জোড়া, ডেনমার্ক-এ বাষট্টিটায় এক-জোড়া। মেয়ে যমজ ছেলে যমজের তুলনায় ঢের বেশী। কেন না, ওরা গর্ভযন্ত্রণা ছেলেদের তুলনায় বেশী সইতে পারে। মোটামুটি দেখা গেছে, গর্ভস্থ চার জোড়া যমজের মধ্যে মাত্র একজোড়া শেষ পর্যন্ত টিকে থাকে প্রাণান্তকর ধকল সয়ে।

সন্তানবতী মেয়েদের পঁয়ত্রিশের পর যমজ হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। আপাত দৃষ্টিতে পরিণত গর্ভ যমজ হওয়ার অনুকূল, এবং নিয়মমত একটার বদলে দু'টো ডিম বানান এ অবস্থায় খুবই সম্ভাব্য, ফলে যমজ সন্তান হওয়া স্বাভাবিক।

জন্মসূত্রে যমজ সন্তান হওয়ার প্রবণতা আসে নিঃসন্দেহে, কিন্তু এক বংশ পর পর এর আবির্ভাব বলে মনে করার কোন হেতু নেই। যে ডিমে অভিন্ন সন্তান জন্মে তার গোড়া খুঁজতে মায়ের দিকে উজান বাওয়া অনেক ক্ষেত্রেই সফল; কিন্তু ওদের ওপর বাবাগিরি ফলনের প্রবণতা বাপেদেরও থাকে।

রক্ত গ্রুপ করে, হাত, পায়ের ছাপ আর চামড়ার বুনন দেখে যমজ অভিন্ন কি না তা বলা যায়। উপায় এই একটিই। ছাপগুলো এ ক্ষেত্রে এক-রকম, ওদের চামড়া এত অভিন্ন যে, একেরটা অপরের গায়ে জুড়ে দেওয়া চলে পাল্টাপাল্টি করে।

দৈহিক সুমেরু-কুমেরু ফারাক্ ওদের আর এক বিশেষত্ব। যখন ভ্রূণ দু'ভাগ হয় নি তখনই একজন ল্যাটা আর অন্যজন ডানহাত চালাবার পটুত্ব পায় গোড়াগুড়িভাবে, একের চুল হয় ঘড়ির কাঁটার দিকে হেলা, অ... চুল ঠিক উল্টো বাগে বাঁক ...

গর্ভে কিঞ্চিৎ বিপন্ন ... জন্মের পর যমজদের টিকে ... অন্য কোন নবজাতকের মত ... আশা-নিরাশায় দোলে। তফাৎ ... এ ক্ষেত্রে। তবে মা বেচারার ... পাখি খাঁচা ছাড়িছাড়ি করে দু'... একই সঙ্গে আলো-বাতাস দে... আনন্দ সামলানোর গুঁতোয়। জনকে নিয়ে কখনও এত ... পোয়াতে হয় না। অবশ্য মা ... বলেন, তাদের সব ব্যথার কাঁটা ... করে যখন জোড়াফুল হেসে ... নতুন জীবনের আনন্দে তখন ব্যথা ... সার্থক হয় বাড়তি সুখের আমেজে।

তা হ'লে দেখা যাচ্ছে, ... ভরতের আগমন কেবল দুঃখ জ্বালানি ... নয়, সুখদও বটে। স্বীকার ক... সন্তানের মায়েরা। কিন্তু ওদে... বেশ কি হাল? অনেকক্ষেত্রে ... যমজদের মত একজনের নিগ্রহ হা... মাইল দূরের অন্যজনকে যে যন্ত্রণা... করে ফেলে, একজনের অভাব ... ফের অন্যজনকে যে দুর্গতির ... ঠেলে দেয় বিনা দোষে, তা কাটাবে কোন দুর্গতিনাশিনী?

আগামীকে

সুনন্দা দাস

পঞ্চপ্রদীপ জেবলে ভাষাহারা তন্বী তিমির
হারায়েছে প্রকাশ ব্যঞ্জনা
স্বর্গ নেই—
পুঞ্জীভূত যন্ত্রণার মেঘ
নিবিড় নৈঃশব্দ চিরে
ঝরে পড়ে বিন্দু বিন্দু শরৎ শিশির
সিক্ত করে অশ্রুর বেদনা।
সাইপ্রাসের পারে কাজল মেঘের আনাগোনা
তোমার নয়নে তার ছায়া
নীড় ছোট—
এত স্বপ্ন ধরে না সেখানে
গুঁড়ি গুঁড়ি লবণের স্বাদ
পৃথিবীর এককণা সাগরের মত
বয়ে আনে এলোমেলো হাওয়া।

শরাহত মরালের বিরহের শেষ অশ্রুকণা
দশটা পাঁচটা করা কেরাণীর চোখে।
ঝরে না তা—
নগরের বিষাক্ত বাতাসে
ভেসে আসে দীর্ঘশ্বাস
সাতদিন হল আজ ছেলেটার জ্বর ত' ছাড়ে না।
রিক্তনিঃস্ব মন কাঁদে টাকাটার শোকে।
শনিবার ভিড় করে ভাগ্য টলমল
ঘোড়ার পিছনে ছোটে প্রাণ
কিছু আছে—
চৌরঙ্গীর নৈশ অভিসারে
জীবনের ব্যবসায়—
অর্থ খোঁজে রক্তলোভী ড্রাকুলার দল
এবারে ঘৃণায় দীক্ষাদান।
তবু জানি বর্তমান অতীতের দান—
আগামীতে দিতে হবে শুধু তার কল্পনার স্থান।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ধারাবাহিক উপন্যাস

সুলেখা দাশগুপ্ত

লাঞ্চের সময় নমিতা রোজই শিবানীদের ঘরে চলে আসে। আজও এসেছিল। ঘরে-ঢোকবার সময় প্রতিদিনের মত বেশ স্বাভাবিক ভাবেই এসে ঘরে ঢুকেছিল—অন্তত শিবানী ধরে উঠতে পারে নি কোন অস্বাভাবিকতা। নিজ চেয়ারে বসেই তাকে এমনিভাবে কান্না ভেঙ্গেপড়ে টেবিলে মাথা রাখতে দেখে একেবারে হকচকিয়ে গেল শিবানী। কী ব্যাপার? কী হল নমিতার? বাড়িতে ভীষণ কিছু ঘটে যায় নি তো? কিন্তু তবে কী সে অফিসে আসত? অফিসে কিছু ঘটেছে? নমিতার মাথায় হাত রেখে উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল শিবানী, কী হয়েছে নমিতা? কাঁদছিস কেন?

যদিও জিজ্ঞাসা করল কিন্তু জানে নমিতার পক্ষে এখন জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। তাকে একটু সামলে উঠবার সময় দিতে হবে। তাই ওর মাথায় হাত রেখে বসে রইল শিবানী।

মিস জেনি হঠাৎ উঠে কাগজপত্র চাপা দিয়ে বাস্তপায় বেরিয়ে গেল। যেন হঠাৎ তার কোন জরুরি কাজের কথা মনে পড়ে গিয়েছে। ওদের দিকে তাকাবার সময় নেই তার।

বুদ্ধিমতী মেয়ে জেনি—জেনির চলার পথের দিকে সপ্রীতি দৃষ্টি ফেলল শিবানী।

মিস জেনির চলে যাওয়া বুঝতে পেরেই বোধহয় টেবিল থেকে মাথা তুলে আঁচলে চোখ মুছতে লাগল নমিতা। কিন্তু না পারলো জল চোখ শুকোতে, না পারলো গলা সাফ করতে। যতবার চোখ মোছে ততবারই দুচোখ ফের জলে ভরে ওঠে। যতবার কথা বলতে যায় ততবারই গলা ভেঙ্গেচুরে আসে। কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টার পর ফের টেবিলের ওপর মাথা রেখে আকুলভাবে কেঁদে উঠল নমিতা। কান্নার দমকে সমস্ত শরীর কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল ওর।

অসহায়ভাবে আবার ওর মাথায় হাত রেখে শিবানী বললো, আচ্ছা, বলবি তো কী হয়েছে?

কিন্তু নমিতা মাথা তুলল না।

হতাশভাবে ওর শান্ত হবার অপেক্ষায়ই বসে থাকতে হলো শিবানীকে। গালে হাত রেখে বসে ভাবতে লাগল, কিছুক্ষণ আগেই জেনির যাওয়ার দিকে তাকিয়ে বুদ্ধি বস্তুটাকে কতবড় করে দেখেছিল, কিন্তু নমিতাও তো বুদ্ধিমতী মেয়ে—ওর বুদ্ধি এখন কোথায়?

না—যতবড় করেই দেখা যাক, মানুষের অস্ত্র-ভাণ্ডারের সব চাইতে দুর্বল অস্ত্র হলো বুদ্ধি। প্রতিটি বৃত্তি-প্রবৃত্তির সঙ্গে লড়াই-এ সে হারে।

একটা বড় করে শ্বাস টানল শিবানী—বুদ্ধি জিনিষটা ঠিক রুচিবান শিক্ষিত ব্যক্তির মতো। যতক্ষণ তার অনুযায়ী পরিবেশ পায় ততক্ষণই সে বড়। তার বাইরে অসহায়। শিক্ষিত জনের বর্বরের লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করে যাবার মতো তাকেও বৃত্তি-প্রবৃত্তি লাঞ্ছনা নীরবে সহ্য করতে যেতে হয়।

কিছুক্ষণ বাদে নিজেকে সামলে উঠে বসে চোখমুখ মুছে ভাঙ্গাগলায় নমিতা বললো, তোর সঙ্গে আমার দরকারী কথা আছে। এখানে বসে বলা যাবে না। চল বাইরে কোথাও গিয়ে বসি। আমি ছুটি নিয়ে এসেছি। তুইও ছুটি নিয়ে নে।

তা নিচ্ছি। কিন্তু হলো কী রে হঠাৎ?

বলব—

খারাপ কিছু সংবাদ নয় তো?

এখন পর্যন্ত মা ও রতন বেঁচেই আছে।

আছিস তো? আবহাওয়াটা একটু হালকা করতে চাইল শিবানী। কণ্ঠে একটু বীর-সুর টেনে বলল, তবে আর ভয় পাই নে। এক যমকে ছাড়া বিশ্বসংসারে শিবানী কাউকে ডরায় না জানিস তো।

তাই নাকি? একটু হাসল নমিতা।

টেবিলের উপর থেকে এক টুকরো কাগজ টেনে নিয়ে তাতে লিখতে লিখতে বলল, হ্যাঁ। ও দেবতাটির সঙ্গে পাল্লাকষা যায় না।

অন্যদের সঙ্গে যায়?

যায়। হারজিত আলাদা কথা—কিন্তু লড়াই করা যায়। মরে গেলে আর লড়ব কী করে। স্লিপ পেপারে খসখস করে লিখে খুব জোর হাতে কলিং বেলে থাবড়া মারল শিবানী। বেয়ারা দৌড়ে এলো। তার হাতে স্লিপ পেপারটা দিয়ে বলল, ঘোষসাহেব—তারপর উঠে ব্যাগ হাতে নিয়ে বলল, চল।

একটা রেস্তোরাঁর নির্জন টেবিলে গিয়ে মুখোমুখি হয়ে বসল দুজনে। বেয়ারা এলে নিজের খুশীমত খাবারের কথা বলে চলল শিবানী।

নমিতা বাধা দিল, অত কে খাবে রে? আমি কিন্তু খেতে পারব না মোটেই।

খুব পারবি।

বেয়ারা চলে গেলে এবার নমিতার দিকে ঝুঁকে বসল শিবানী। বললো, বল শুনি এবার তোর কেঁদে-ভাসানো দরকারী কথাটা—এমন ছেলেমানুষ রয়ে গেছিস এখনও। একটুতে কেঁদে ভাসাস—

একটুতে—ফের গাল-গলা চোখ-মুখ-ঠোঁট ভেঙ্গেচুরে এলো নমিতার কান্নায়। কোনমতে সামলে নিয়ে কান্নাভাঙ্গা মুখকে বিদ্রূপে রূপান্তরিত করে বললো, আমি তো ছেলেমানুষ রয়ে গেছি। দেখা যাক তুই কত বিজ্ঞ হয়েছিস—আমি কেঁদে ভাসাচ্ছি—তুই শুনে কত হাসতে পারিস।

আচ্ছা, দেখা যাক—

যদিও শিবানী—একমাত্র যার কাছে ও লজ্জা ত্যাগ করতে পারে বিনা দ্বিধায় তবু তার কাছেও কথাটা বলতে সময় লাগল নমিতার। দুই হাতের

তালুতে মাথা চেপে বসে রইল। তারপর এক ঝোঁকে মাথা তুলে বললো, শিবানী আই এ্যম ক্যারিইং—

ক্যারিইং! চাইল্ড? দুই ফেটে-পড়া চোখে জিজ্ঞাসা করল শিবানী।

হ্যাঁ।

বলিস কী!! চাপাকণ্ঠে যেন আর্তনাদ করে উঠল শিবানী।

এবার মলিন হাসল নমিতা। বললো, কই হাসলি নে তো?

কাঁদিও নি। ব্যাপারটার সম্মুখীন হবার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে ফেলল শিবানী।

নমিতা বললো, কাঁদিস নি, আর্তনাদ করে উঠেছিস।

ওটা বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কার শব্দ—বলে চুপ করে রইল শিবানী। টেবিলের উপর থেকে কাঁটাটা তুলে নিয়ে এ আঙুলে ও আঙুলে টিপে ছোট ছোট গর্ত তৈরী করতে আর ছেড়ে দিতে লাগল। প্রথমটায় অপেক্ষা করল এরপর নমিতা কী বলে শুনবার জন্য। কিন্তু ওর দিক থেকে যখন আর কথা এলো না, দেখল সে টেবিলে কনুই রেখে দু' আঙুলে চোখ টিপে বসে আছে তখন ভাবতে লাগল তার দিক থেকে এখন কিছু বলা উচিত। নমিতা হয়ত সে জন্যই অপেক্ষা করছে। কিন্তু সে কী বলে? লোকটাকে এটা সে জানতে চাইতে পাবে। ঘটনাটা কী তা জানতে চাইতে পারে। জানতেও ইচ্ছে করছে—কিন্তু—

বয় এসে দুজনের সামনে খাবার নামিয়ে দিয়ে গেল। শিবানী ন্যাপকিন খুলে কোলে পাতল। কাঁটায় জড়িয়ে চাউমিন তুলতে তুলতে নমিতার দিকে তাকাল। দেখল সেও কোলে ন্যাপকিন পেতে হাতে কাঁটা তুলে নিয়েছে। চাউমিন মুখে পরে জিজ্ঞাসা করল সে, লোকটা পালিয়েছে।

না।

পালায় নি? প্লেট থেকে চোখ তুলল শিবানী।

খাবার নাড়াচাড়া করতে করতে নমিতা বলল, না।

তবে?

চুপ করে রইল নমিতা।

বিয়ে করতে রাজী হচ্ছে না?

তা ত জানি নে।

তাকে বলিস নি?

কোথায় পাব তাকে।

বাঃ! হাতের কাঁটা-চামচ প্লেটে রাখল শিবানী। আশ্চর্য কণ্ঠে বলল, এই বলছিস পালায় নি, আবার বলছিস, কোথায় পাব তাকে—এর মানে কী? ব্যাপারটা তুই বুঝবার আগেই সে অন্য কোথাও চলে গেছে বা তোর সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে? এখন আর তার কোন পাত্তাই তুই জানিস নে?

তবে কী—আর জিজ্ঞাসা করল না শিবানী। নমিতা কিছু বলতে চাচ্ছে না। হয়ত খুব লজ্জার কথা। কিংবা আত্মমর্যাদা হানিকর। চুপ করে গেল শিবানী। এ নিয়ে আর কথা বাড়াবে না সে।

শিবানীকে চুপ করে যেতে দেখে তার দিকে তাকাল নমিতা। ঘটনাটা বললে কী বিশ্বাস করবে শিবানী? কিন্তু বলতে গিয়েও মুখ বন্ধ করে ফেলল সে। না, বিশ্বাস করবে না। এ কেউ বিশ্বাস করতে পারে না। ওর কাছে ট্রামে-বাসে চাপার মতো চারটে পয়সাও ছিল না। তাই ও বালিগঞ্জের দিকে নিরুপায়ভাবে হেঁটে চলেছিল। হঠাৎ ঘনকালো মেঘ করে ঝড় এলো। আর দিশেহারা ওর কাছে তক্ষণি এসে একটা গাড়ী দাঁড়াল। আর ও শুনতে পেল গাড়ীটা বালিগঞ্জেই যাচ্ছে। শুনেই অমনি ও উঠে বসল গাড়ীটাতে। সে গাড়ী ওকে নিয়ে গেল দমদম। আর-----নাঃ, আষাঢ়ে গল্পের মতো লাগছে ওর কাছেই। অপরে বিশ্বাস করবে কেন। শিবানীও করবে না। ওকে যতই বিশ্বাস করুক সেও ভাববে, এক এক সময় এমন অবস্থায় পড়তে হয় যে, যে কখনো মিথ্যে বলে না, তাকেও মিথ্যেকথা সাজাতে বসতে হয়। আজ নমিতাও তাই বসেছে। ঠেকে গিয়ে গল্প তৈরী করছে, না, মিথ্যে বলছি ভাববার চাইতে বলতে চাইছি না কিছু এটা ভাবা অনেক ভাল। গ্লাস তুলে দু' সিপ ঠাণ্ডা জল খেল নমিতা। বললো, ধর লোকটা মরে গেছে। তাকে আর পাওয়া যাবে না। আমাকে বুদ্ধি দে আমি কী করব এখন?---

কিছুক্ষণ একমনে খেল শিবানী। একটা প্লেট শেষ করল। আর একটা প্লেট টেনে নিল। একবার দেখে নিল নমিতা খাচ্ছে কি না। দেখল সেও খাচ্ছে। প্রনবোল—শিবানীর সব চাইতে প্রিয় ডিস—তাতে নুন ছিটিয়ে সস ঢেলে খেতে খেতে এক সময় শিবানী জিজ্ঞাসা করল— এখন ক' মাস হয়েছে?

অনেক। চোখ নিচু করে জবাব দিল নমিতা।

অনেক! এবার বিশেষ দৃষ্টিতে তাকাল শিবানী নমিতার দিকে। তাই। অনেক মাসই। যাকে বলে ভরামাস। ওর বসার ভঙ্গি তাই বলে দিচ্ছে। ওর মুখের ভাঙ্গচোর তাই বলে দিচ্ছে। ওর পাতলা শরীরের দুই বুকের বোঝা তাই বলে দিচ্ছে। একটুও বুঝতে কষ্ট হয় না যে ও সন্তান-সম্ভবা। ও যে বুঝতে পারে নি তার একমাত্র কারণ কোন কুমারী মেয়ের সম্বন্ধে এমন কথা মনেও ওঠে না কারুর। এখন মনে পড়ল এর ভেতর দু-একদিন ওর মনে হয়েছে যে, নমিতা বড্ড মুটিয়ে যাচ্ছে। ভুঁড়ি হচ্ছে। একদিন বলেছিলও যেন সে নমিতাকে—এই নমি সাবধান। ভুঁড়ি হচ্ছে কিন্তু তোর। একবার ভুঁড়ি হলো কী মনে নেই তো। জেনি হেসে উঠেছিল। বলেছিল শিবানী তোমারও কিন্তু একটু ভুঁড়ি হয়েছে ও নিজের দিকে তাকিয়ে দারুণভাবে মাথা দুলিয়ে অস্বীকার করেছিল—না জেনি, আমার একটুও ভুঁড়ি বাড়ে নি। কিন্তু তবু ক'দিন বেশ কম করে খেয়েছিল মনে আছে। কিন্তু সেদিন ওর ঐ কথায় নমিতা কী করেছিল? মনে নেই তো। কি করেছিল নমিতা? ---মনে পড়েছে। ওর আর জেনির মাঝখানে মলিন মুখে বসেছিল। হ্যাঁ, ভীষণ মলিন মুখে। একদম স্পষ্ট হয়ে উঠছে নমিতার সেদিনের মুখটা এখন শিবানীর চোখে। বললো, এতদিন চুপ করে বসেছিলি কেন? আরো আগে আমায় বলিস নি কেন?

প্রথমে নিজেই বুঝতে পারি নি। যখন বুঝলাম, তখন মরণছাড়া আর কোন কথাই ভাবি নি। কিন্তু মা'র জন্য, ছোট ভাইটার জন্য মরণের কথা বাদ দিতে হলো। কিন্তু বাঁচবারও কোন পথ দেখছি নে। তোকে বলার কথা অনেকবার ভেবেছি। বলতেও এসেছি কিন্তু পারি নি বলতে। ফিরে গেছি। এখন যে আর না বললেই নয়—তাই বলতে হলো মরিয়া হয়ে।

এত অল্প সময়ের ভেতর কী করব—আপন মনে ভাবতে লাগল শিবানী।

নমিতা কান্না গিলতে গিলতে বললো, না, করবার কিছু নেই শিবানী এক গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া ছাড়া। তুই মাকে আর ছোট ভাইটাকে দেখিস—

শিবানীর খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। ন্যাপকিন দিয়ে ঠোঁট মুছতে মুছতে মেরুদণ্ড সোজা করে বসল। বললো, মাকে রতনকে দেখব ঠিক আছে। কিন্তু তোকেই বা পথে ছেড়ে দেব কেন? গঙ্গার ঘাট আমি খুব ভাল চিনি। সেখানেও আমিই তোকে পৌঁছে দিয়ে আসব। তুই কেবল নজর রাখবি যেন আমাকে পুলিশের হাঙ্গামায় না পড়তে হয়। যখন দেখবি অনেক দূরে আমার গাড়ি মিলিয়ে গেছে তখন জলে ঝাঁপ দিবি—বাস—ঠিক আছে?

ঠিক আছে। হাসল নমিতা।

তবে আর কী। সমস্যার সমাধান তো হয়ে গেল। এখন খেয়ে নে। আমি গরম কফি দিতে বলছি। গ্লাস ঠুকে বেয়ারা ডাকল শিবানী। বেয়ারা এলে গরম কফি দিতে বলল। বেয়ারা শিবানীর প্লেট-ডিশ তুলে নিয়ে চলে গেল। নমিতা খেতে লাগল। হঠাৎ যেন কেমন একটা হালকা লাগতে লাগল ওর। প্রনবোল তুলে মুখে দিতে গিয়ে অরুচিতে মুখ তেমন আর বিষিয়ে উঠল না। জিভ কিছুটা স্বাদ পেতে লাগল। ক্ষুধা কিছুটা তৃপ্তি করে খেতে লাগল। কেন যে এমন হলো বুঝতে পারলে না নমিতা—কিন্তু হলো।

আসলে ওর অনুভব বুঝেছে আশ্রয় পেয়ে গেছে।

যে স্টেশন ইচ্ছে হয় ধরুন···তারপর শুনে দেখুন কী সুন্দর আওয়াজ!
নতুন নতুন সুদৃশ্য মডেলের
ন্যাশনাল একো
ভারতের অগ্রণী রেডিও-প্রস্তুতকারক ন্যাশনাল-একো সগৌরবে আপনার সামনে উপস্থিত করছে তিনটি নতুন মডেল—ইউ-৮১৯, এ-৮০৬ আর এ-৮২৯। প্রত্যেকটি মডেল উৎকর্ষে নিখুঁত এবং ন্যাশনাল-একো-র উচ্চ গুণমান অনুযায়ী তৈরী···প্রত্যেকটির আওয়াজ সুস্পষ্ট ও শ্রুতিমধুর—ঠিক যেমনটি আপনি চান। আপনার নিকটস্থ যে কোনো ন্যাশনাল-একো রেডিও বিক্রেতার কাছে গিয়ে ইচ্ছেমত স্টেশন ধ'রে নিজের কানে আওয়াজ শুনুন!
মডেল ইউ-৮১৯
৩ ওয়েভ ব্যাণ্ড, ৫ ভাল্‌ভ। ব্যাকেলাইটের ক্যাবিনেট; এসি/ডিসি।
২৯৮৲ টাকা।
মডেল ৮০৬
৩ ওয়েভ ব্যাণ্ড, ৬ ভাল্‌ভ। নতুন স্টাইলের চিকন কাঠের ক্যাবিনেট। মডেল এ-৮০৬ এসি—মডেল ইউ-৮০৬ এসি/ডিসি।
৩১৫৲ টাকা।
মডেল এ-৮২৯
৬ ভাল্‌ভ; ৪ ব্যাণ্ড। পার্মানেন্ট ম্যাগনেট স্পীকার; ৩ পুশ্ বাটন টোন কন্ট্রোল বাস্, ট্রেব্‌ল ও মিডিয়ামের জন্যে; ব্যাণ্ড বদলাবার জন্যে পিয়ানো-কী, এসি
৪৮১৲ টাকা।
জেনারেল রেডিও অ্যাণ্ড অ্যাপ্লায়েন্সেজ লিঃ
কলিকাতা • বোম্বাই • মাদ্রাজ • দিল্লী
ব্যাঙ্গালোর • সেকেন্দ্রাবাদ • পাটনা
মূল্য উৎপাদন শুল্ক সহ; অন্যান্য কর অতিরিক্ত
ন্যাশনাল একো মনসুনাইজ্‌ড রেডিও
ভারতের বৃহত্তম রেডিও কারখানায় তৈরী
JWT/GRA 3033A
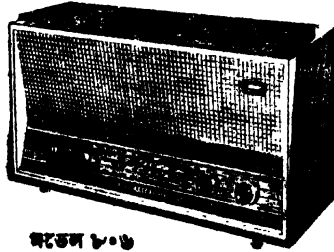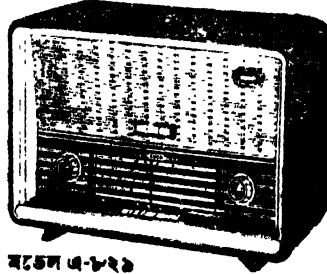
প্লেট-ছুরি-কাঁটা-চামচ সব তুলে নিয়ে গেছে। সেই পরিষ্কার জায়গায় দুহাত রেখে শিবানী বলল, আচ্ছা নমি, তোদের সব আগে মরবার কথাটাই মনে আসে কেন রে?

সব চাইতে সহজ বলে। শিবানীর কথার উত্তর দিয়ে নমিতা একটু হাসলে। বললে, আমরা যে ভীরু।

নমিতার হাসির দিকে তাকিয়ে শিবানীর মনে হলো—কান্না-ভেজা চোখ যখন হাসি খুঁজে পায় তার চাইতে সুন্দর বুঝি কিছু হয় না। বললো, সব চাইতে সহজ মরণ। তোরা ভীরু? তোদের মত সাহসী কে! আমি তো ভাবতেই পারি নি মরে গেছি মনে হলে নিজেই নিজের জন্য কেঁদে মরি। বলেছি তো তোকে—এক ঐ মরণ দেবতাটি ছাড়া কোনো দেবতাকে ভয় করি নে আমি। ঐ নাম আর আমার কাছে করবি নে। আমার কাছে যখন এসেছিস তখন সব ভার আমার। যা করবার আমি করছি। একটু ভাবতে দে। এর মধ্যে আবোল-তাবোল কিছু করে বসবি নে কথা রাখছি—ঠিক তো?

করব না।

কথা দিলি?

চোখ ছলছলিয়ে এলো নমিতার। বললো, মরতে কে চায় বল?

চায়। কিছু বোকা ছেলেমেয়ে আছে। এই তুইও চাইছিলি। আমি না থাকলে হয়ত মরতিস।

মরতাম।

কী লাভ হতো? কী পেতিস মরে?

কী পেতাম? আমরা কেবল হারানো বাঁচিয়ে বেচে থাকতে পারলেই বেঁচে যাই। কিছু হারানো মানেই আমাদের মৃত্যু। টায়রেটির বেঁচে আছি যে। পাওয়া? পাওয়ার আশা করতেও ভুলে গেছি আমি শিবানী।

তবে তো মরেই গেছিস। আবার কী মরতে যাচ্ছিলি।

যা বলেছিস। সত্যটা স্বীকার করল নমিতা ঘাড় কাত করে। বললো, মরে গেছি তাই শরীরটা গঙ্গায় ফেলে দিতে চেয়েছিলাম। তোর আপত্তি না থাকে তো দিই।

আপত্তি আছে। বেয়ারাকে কফি নিয়ে ঢুকতে দেখে থামল শিবানী। সে কফি রেখে চলে গেল। কফির থালাটা সামনে টেনে এনে কফি তৈরী করতে করতে বললো, রোগা দুর্বল—শুধু হাড় ক'খানা রয়েছে এমন শিশুদের বেলায় মা-কাকিমাদের বলতে শুনেছি, "হাড় ক'খানাই বেঁচে থাক। হাড় থাকলেই একদিন মাস হবে।" তেমনি আমি বলি, দেহটা অন্তত থাক। দেহ থাকলেই একদিন প্রাণ ফিরে আসে। কফির কাপ একটা নমিতার দিকে রেখে নিজের কাপে চুমুক দিল শিবানী। বললো, আত্মহত্যাকারীদের স্ট্যাটেসটিক নিয়ে কী দেখা গেছে জানিস? দেখা গেছে, জীবনে বিতস্পৃহ হয়ে যারা আত্ম-হত্যা করতে গিয়েও বেঁচে গেছে তাদের সামনে আশ্চর্যরকম সব ভালো সেজেছিল। তারা কল্পনাও করতে পারে না। জীবন তাদের আশ্চর্য আশ্চর্য উপহার দিয়েছে। কাউকে খ্যাতি, কাউকে সম্পদ। কাউকে সুখ-সংসার আনন্দ, বেঁচে যাওয়ার জন্য দুঃখ করতে হয় নি বরং তখনকার বিভ্রান্তি মনে করে তাদের সুখী জীবন শিউরে উঠেছে। তোর সামনেও জীবন কী উপচার সাজিয়ে রেখেছে তুই তার কী জানিস? হয়ত দেখবি এই সময়টুকু তোর জীবনের এমন একটা বাজে অংশ, যে, অনায়াসে কেটে ডাস্টবিনে ফেলে দিতে পারিস। শ্রেষ্ঠ অংশ প্রতীক্ষা করছে সামনে। বন্ধু হাত বাড়িয়ে আসছে প্রাণ নিয়ে গান নিয়ে।

সবার আসে?

স-বা-র আসে রে নমিতা। শুধু অবেলায় এলে অনেক সময় সে আসা হয়ত ব্যর্থ হয়ে যেতে চায়। তাই তো প্রার্থনা করি, বন্ধু অবেলা করে ফেল না।

নমিতা কফির পেয়ালা থেকে চোখ তুলে শিবানীর দিকে তাকাল।

হাসল শিবানী। বললো, স্বামী? স্বামী বন্ধু হবে এমন গ্যারান্টি আছে? থাকলে তো কথাই ছিল না। বিয়ে করলেই জীবন সুন্দর। কিন্তু না—খালি পেয়ালা ঠেলে রাখল শিবানী। বললো, আমি অন্য কথায় চলে যাচ্ছি। একথা এখন নয়। আমার আশু বলার কথা হলো, এখন আর অফিসে আসবি নে তুই। অসুখ বলে একটা এ্যাপলিকেশন পাঠিয়ে দিবি কাল। ছুটির ব্যবস্থা যা করবার তা আমি করে দেবো। আমার উপর আস্থা রেখে চুপচাপ ঘরে থাক। যখন যাবার আমিই যাব তোর কাছে।

কি বিপদে যে ফেললাম তোকে!

কিছুটি ফেলনি—বোকা তো। গ্লাস বাজিয়ে বেয়ারা ডেকে বিল আনতে আদেশ করল শিবানী। সে চলে গেলে বললো, একটু বুদ্ধি ধরলে কোন বিপদেই পড়তি নে। প্রথম দিকে হলে কত উপায় ছিল—। কিন্তু এখন আমাদের গায়ের জোর বেশী বলেই শিশুটাকে গলা টিপে মেরে ফেলতে পারি নে।

ওরা যখন রেস্তোরাঁ থেকে বের হলো তখন প্রায় পাঁচটা বাজে। অফিস তখনও ছুটি হয় নি বলে ট্যাক্সি পেতে অসুবিধে হল না। নমিতাকে একেবারে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ঘরের পথ ধরল শিবানী। একবার প্রথমে ভাবলে, ললিতার কাছে যাবে। ওকে বলে ওর পরামর্শ চাইবে। ললিতা সঙ্গে থাকলে ও সাহস পাবে। কিন্তু ট্যাক্সিকে ললিতার বাড়ির পথ বলতে গিয়েও বলল না। ললিতা এখন নিজেই খুব অসুস্থ। বাচ্চা হবার সময় হয়ে এসেছে। এ সময়কার নানা অসুখে ধরেছে তাকে। প্রেসার বেড়েছে। হাত-পা-মুখ ফুলেছে। ডাক্তার নুন খাওয়া ভাত খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে ললিতা। কেবল বলছে, শিবানীদি বাঁচব না। ঠিক মরে যাবো। না, এখন ওর কাছে যেয়ে লাভ নেই।

কিন্তু একজন কেউ সঙ্গে না থাকলে একা ও কী করে কী করবে। ট্যাক্সির গদিতে পিঠ ছেড়ে দিল শিবানী। আশ্বাস তো দিয়ে এলো খুব নমিতাকে—এখন? বিশ্বসংসারে কে ওর বন্ধু আছে? কার কাছে বলে সাহায্য চাইতে পারে? কেউ নেই। কেউ না।

বেলা শেষের একটুকরো পড়ন্ত ঠাণ্ডা রোদ শিবানীর কোল থেকে বুকে, বুক থেকে মুখে উঠে এসে ধীরে ধীরে শিবানীর দুই বন্ধ চোখের উপর ঈষৎ উষ্ণ হাতের মতো স্পর্শ করল—চোখ খুলে গদি থেকে পিঠ তুলে সোজা হয়ে বসল শিবানী—অরুণ—অরুণকে পাওয়া গেলে তার উপর নির্ভর করতে পারত। ঐ একমাত্র লোক—যাকে ওর এখন দরকার।

অত্যন্ত জরুরি দরকার।

কিন্তু কোথায় পাবে তাকে?

যে করেই হোক তাকে খুঁজে বের করতে হবে।

পাগল!

গায়ের জোরে কি সব হয়?

কোথায় খুঁজবে তাকে যার নামটুকু ছাড়া কিছুই জানে না।

হঠাৎ পরশ পাথর পেয়ে যাবার মতো চমক খেল শিবানী—ইন্দ্রনাথের কাছে কাজ করেছে। ইন্দ্রনাথের দপ্তরে অরুণের বাড়ি-ঘর নাম-ঠিকানা সবই তো আছে!

কিন্তু যোগাড় করবে কী করে?

ইন্দ্রনাথের সঙ্গে ওর কথা বন্ধ আছে সেই থেকে। কথা বলা থাকলেও অরুণের ঠিকানা সে চাইতে পারত না। কোন সঙ্গত কারণ দেখাতে না পারলে তার ঠিকানা জানতে চাওয়া যেত না।

সঙ্গত কারণ কিছু বের করা যায় না?

কিন্তু তার আগে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্কটা ফিরিয়ে আনতে হবে তো?

বুকের ভেতর একটা অনুরণন অনুভব করল শিবানী। হাওয়ায়-ওড়া চুলগুলি হাতে চেপে ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল সে। শ্লেষ করল নিজেকে—যতই দূরে থাক আর বিরাগ প্রকাশ করো তুমি ইন্দ্রনাথের সম্মোহন থেকে মুক্ত হতে পার নি শিবানী। তাকে দেখে তুমি এখনও মুগ্ধ হও। তাকে দেখে এখনও তুমি আবিষ্ট হও। সে তোমাকে টানে।

টানে। ইন্দ্রনাথ আবাকে আকর্ষণ করে একথা সত্য কিন্তু আবার বিকর্ষণ যে করে তাও তেমনি সত্য—বিরাগে এক এক সময় যে তার দিকে চোখ তুলে তাকাতে ইচ্ছে করে না এর ভেতর ছল নেই শিবানী নিজের শেষকেই যেন জবাব দিল।

গাড়ী জজকোর্ট রোডে এসে ঢুকলো। নির্জন ছিমছাম অভিজাত পথ। অফিস ছুটির ভিড় এ পাড়ায় বোঝা যায় না। ঝকঝকে চকচকে নানা মডেলের নতুন নতুন গাড়ি একটা দুটো করে এসে যার যার বাড়িতে দাঁড়াচ্ছে। দারোয়ান গেট খুলে দিচ্ছে। ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। শিবানী পথ দেখান। গাড়ি এসে ওদের গাড়ি-বারান্দায় দাঁড়ান। তাড়া সিঁড়িয়ে ওপরে উঠে এলো শিবানী।

কাঞ্চি স্নান করব।

মহাখুশী কাঞ্চি। এত তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরেছে শিবানী। শিবানীর স্নানের ব্যবস্থায় লেগে গেল সে। কোন শাড়িটা পরবে মা।

দে যে-কোন একটা।

শাড়ির ব্যাপারে শিবানীর এমন উদাসীন উত্তর কাঞ্চির ভালো লাগে না। তবেই বুঝতে পারে সে মা'র মন-মেজাজ ভাল নেই। কিন্তু ও কী করতে পারে। মার মন-মেজাজ ভাল করতে পারেন একমাত্র সাহেব। কিন্তু—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল কাঞ্চি শিবানীর শাড়ি বের করতে করতে।

সন্ধ্যা পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। সমস্ত বাড়ি নিয়ন আলোয় উজ্জ্বল। স্নান সেরে চুপচাপ বসে আছে শিবানী। বারান্দায়। এতবড় বাড়িটাতে ও একা। নিঃসঙ্গতা যেন ওর নিশ্বাস চেপে ধরতে চায়। ও কেন এত তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে এলো আজ? নমিতার কথা ভাবতে? কই গাড়িতে তবু যা একটু ভেবেছে, বাড়ি এসে ভেবেছে কী নমিতার কথা? ইন্দ্রনাথই তো তার মনে ঘুরছে।

চেয়ার ছেড়ে উঠে বারান্দায় পায়চারি করতে করতে গুনগুন করতে লাগল শিবানী—

সারা দিনের ক্লান্তি আমার
সারা দিনের তৃষা
কেমন করে মেটাবো যে
ভেবে পাই নে দিশা
এ আঁধার যে পূর্ণ তব
সে কথা বলিও—
মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার
পরশখানি দিও—

আবার এক সময় ইজি চেয়ারে গা এলাল শিবানী। মনে মনে বলতে লাগল, পূর্ণ, সব পূর্ণ। সূর্যের আলো পূর্ণ। রাতের অন্ধকার পূর্ণ। শূন্য কেবল মানুষের মন। ঐ তো একরত্তি মন। কিন্তু তার শূন্যতা কী অসীম। মানুষের মন ভরাটের মাটি এখনও পৃথিবী বানিয়ে উঠতে পারে নি।

কিন্তু না—এসব থাক। কী করা যায় ঐ মেয়েটার ব্যবস্থা সব ফেলে এখন আমাকে তাই ভাবতে হবে। শিবানী আবার উঠে পায়চারি করতে লাগল। । ক্রমশ।

★ মাসিক বসুমতীতে লেখা ও ছবি পাঠানোর নিয়মাবলী ★

১। যে কোন প্রকাশযোগ্য রচনা—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, জীবনী, সত্যঘটনা, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা, রহস্য-মূলক রচনা অর্থাৎ পাঠক-পাঠিকার পক্ষে আকর্ষণীয় ও আগ্রহ-উদ্দীপক লেখা আমরা সকল সময়েই প্রকাশার্থে বিবেচনা করে থাকি।

২। দীর্ঘ রচনা বা ধারাবাহিক প্রকাশিতব্য লেখা সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠাবার পূর্বে পত্রযোগে লিখিত মতামত গ্রহণ করতে হবে।

৩। রচনা সচিত্র হলে বা লেখার সঙ্গে ছবি (আলোক-চিত্র বা অঙ্কিতচিত্র) থাকলে সেই লেখা প্রকাশের প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে।

৪। রচনার নকল রেখে রচনাটি পাঠাবেন। কেন না, সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ছাপাখানার কাগজের ভিড়ে রচনা হারিয়ে যেতে পারে। কিংবা ডাকের গোলমালেও রচনা হারিয়ে যেতে পারে।

৫। কোন রচনা বা ছবির মনোনয়ন বা অমনোনয়নের সংবাদ জানতে হলে বা অমনোনীত রচনা বা ছবি ফেরৎ নিতে হলে তৎসহ উপযুক্ত মূল্যের ডাকটিকিট অবশ্যই প্রেরণীয়।

৬। কবিতা সম্পর্কে কোন মতামত জানানো হয় না বা অমনোনীত কবিতা ফেরৎ পাঠানো হয় না।

৭। কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখাই বাঞ্ছনীয়। উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত পাণ্ডুলিপি ছাপাখানার জন্যে অচল।

৮। পাণ্ডুলিপিতে রচনার শেষে লেখক বা লেখিকার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে।

৯। প্রকাশযোগ্য ও যথোপযুক্ত রচনা ও ছবির জন্য সম্মান দক্ষিণা দেওয়া হয়।

১০। প্রতিটি রচনা সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। খামের উপর "মাসিক বসুমতী"—এই কথাটি অবশ্যই লিখতে হবে।

১১। লেখা পাঠালেই তা সঙ্গে সঙ্গে দেখার । লেখা মনোনীত হলেই তা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করার কোন প্রতিশ্রুতি দেওয়া চলে না। প্রত্যহ অসংখ্য লেখা আসে, প্রতিটি পাঠান্তে প্রকাশের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সময়সাপেক্ষ।

১২। আলোকচিত্র বা অঙ্কিতচিত্রের পিছনে ছবির বিষয়বস্তু ও শিল্পীর নাম এবং ঠিকানা অবশ্যই লিখতে হবে।

অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ/গ্রন্থম্

নদীয়ার গোরাচাঁদ, শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর লীলা বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর ছ'বছর কাল যে লীলা করেছেন প্রভু তার নাম মধ্যলীলা, তারপর থেকে আঠারো বছর জীবনান্ত পর্যন্ত যে পর্ব সে পর্বের নাম অন্ত্যলীলা। এই পর্বে শ্রীগৌরাঙ্গ হিন্দুর পরমতীর্থ নীলাচল-বাসী, আলোচ্য গ্রন্থে তাঁর এই সময়কার লীলা কাহিনী বিবৃত হয়েছে। লেখক ভাষার যাদুকর। অননুকরণীয় ভাষার সাহায্যে তিনি কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর তৎকালীন পরিবেশ ও মানসিক বিবর্তনকে রূপ দিয়েছেন, ভক্ত পাঠকের মন উদ্বেল হয়ে উঠবে পড়তে পড়তে আবার শুধু সাহিত্য-রসিকের পক্ষেও স্বাদু লাগবার মত উপাদান এতে যথেষ্ট পরিমাণেই উপস্থিত: কারণ এ রচনা শুধু ভাবাশ্রয়ীই নয়, আঙ্গিকের ঐশ্বর্যও এর বড কম নয়। সুন্দর ছবিটি যেন সুন্দরতর ফ্রেমের আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়েছে। গৌরাঙ্গপ্রভুকে আশ্রয় করে যেসব কিংবদন্তী বা অলৌকিক প্রবাদ প্রচলিত, সুন্দরভাবে সে সবের পরিচয় দেওয়া হয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে মহাপ্রভুর বিখ্যাত ভক্তবৃন্দের অন্তরঙ্গ আলেখ্য; রূপে রসে পরিপূর্ণ এ রচনা যেন পূর্ণ প্রস্ফুটিত এক সহস্রদল পদ্ম, শোভায় চোখ বিমোহিত, গন্ধে মন ভরা। রসজ্ঞ পাঠকমাত্রেই এ রচনাকে সমাদরের সঙ্গে হাতে তুলে নেবেন। গ্রন্থটির আঙ্গিক পারিপাট্যও উপেক্ষণীয় নয়। লেখক—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রকাশক—গ্রন্থম্, ২২।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬, দাম :—সাত টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শঙ্কর নর্মদা / আনন্দধারা প্রকাশন

আলোচ্য গ্রন্থটি ভ্রমণকাহিনী জাতীয় রম্য রচনা। নর্মদা দক্ষিণ ভারতের অন্যতম প্রধান স্রোতস্বিনী, আলোচ্য গ্রন্থে এই নর্মদার রূপায়ণ করা হয়েছে। নর্মদার উৎপত্তিস্থান থেকে তার স্রোতধারাকে অনুসরণ করে চলেছে কাহিনী, নর্মদার ভৌগোলিক অবস্থান থেকে তার ঐতিহাসিক পরিচয় বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে, সেই সঙ্গে উদ্ধৃত করা হয়েছে নর্মদার নামের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা কিংবদন্তীসমূহকে, রূপকথার মতই আশ্চর্য এ কাহিনীর অঙ্গে অঙ্গে যত রূপ তত লাবণ্য। লেখক জাত পরিব্রাজক আশ্চর্য—নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিবেশন করেছেন তিনি তাঁর বক্তব্যকে নর্মদার প্রাণসত্তাকে যেন উপলব্ধি করেছেন, তিনি অনুধাবন করেছেন পূর্ণভাবে। নর্মদা-কূলবর্তী বহু উল্লেখযোগ্য স্থানের সঙ্গেই যে পাঠকের শু পরিচয় ঘটিয়েছেন তিনি, তাই নয়, সেসব জায়গার নিখুঁত মানচিত্র এঁকে ভ্রমণেচ্ছু প্রত্যেক পথিকের পাথেয়ও জুগিয়েছেন; তাঁর চলার পথে যারা তাঁর কাছে এসেছে তারা কেউই তাঁর সহৃদয় সহানুভূতি থেকে বঞ্চিত হয় নি, এজন্যই গ্রন্থোক্ত চরিত্রগুলিও আপনাপন বৈশিষ্ট্যে অনন্য। ভ্রমণকাহিনীমূলক রচনা বহু লেখা হয়েছে আজ পর্যন্ত, আরও হবে; কিন্তু এ গ্রন্থ যে বরাবরই তাদের মাঝে এক মর্যাদাপূর্ণ অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করবে একথা বোধহয় অসংশয়েই বলা চলে। আমরা বইটি পড়ে খুশি হয়েছি ও এ রচনার বহুল প্রচার কামনা করি। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ মনোরম, ছাপাও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রকাশক—আনন্দধারা প্রকাশন, ৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—দশ টাকা।

বাক্স বদল / গ্রন্থম্

প্রখ্যাত কথা-সাহিত্যিক ৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেরই পরিচিত, আলোচ্য গ্রন্থটি তারই এক গল্প-সংগ্রহ। মোট সাতটি গল্প সংগৃহীত হয়েছে এতে, যার মধ্যে কয়েকটি ভাবসম্পদ ও শিল্প-নৈপুণ্যে অসাধারণ। প্রথম গল্পটির নামে গ্রন্থের নাম, বাক্স বদলের ফলে দুটি তরুণ-তরুণী কি করে কাছাকাছি এল, পরিশেষে কি করেই বা পরিণয়ের বন্ধনে ধরা পড়ল তারই কৌতুক মধুর কাহিনী বিবৃত হয়েছে এ গল্পে; সাম্প্রতিক কালে এই গল্পটিকে অবলম্বন করে এক ছায়াচিত্র ওঠানো হয়েছে। প্রসিদ্ধির দিক দিয়ে প্রথম গল্পটিই প্রধানতম হলেও শিল্প-সৌকর্যে ও ভাবসম্পদে গ্রন্থোক্ত আর দুটি গল্পই শ্রেষ্ঠ, এদের নাম যথাক্রমে "বেনীগির ফুলবাড়ী" "খুড়ীমা"। প্রকৃতির উপাসক লেখকের প্র... বন্দনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে "বেনীগির... বাড়ী" শীর্ষক গল্পটির মাধ্যমে। সেই... প্রকাশিত হয়েছে নারী-হৃদয়ের এক শাশ্বত অ... প্রেমের স্বরূপ, মর্ণিয়া চরিত্রটি... শাশ্বত কল্যাণময়ী নারীরই মূর্তপ্রতি...

"খুড়ীমা" গল্পটিতে এক ভাগ্যবিড়ম্বিত... গ্রাম্য তরুণীকে এঁকেছেন লেখক বড়... বড় করুণার সঙ্গে; লেখকের দরদী ... ছোঁয়ায় গল্পটি জীবন্ত ও উজ্জ্বল। এই ... গল্প-সংগ্রহটি প্রকাশের জন্য প্রকাশক ... গ্রন্থটির আঙ্গিক শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ... লেখক—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—গ্রন্থম, ২২।১, বিধান সরণী, ক... দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

Netaji Mystery / গ্রন্থম্

নেতাজী সুভাষের মৃত্যুসংবাদ ... সরকার কর্তৃক সমর্থিত হলেও আজ... এ নিয়ে তর্ক-বিতর্কের অন্ত নেই। বস্তুত... ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মহান বি... জীবনাবসান ঘটেছে বলে কল্পনা ক... নেওয়া হয়, তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে যা... সন্দেহের অবকাশ আছে; আলোচ্য গ্রন্থ... বিষয়েই আলোকপাত করা হয়েছে। সর... খবর হিসাবে বলা হয় যে, ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে... আঠারোই অগাস্ট তারিখে, ফরমোজার... তাইপি নামক স্থানে নেতাজী সুভাষ... হারান, এক বিমানদুর্ঘটনার ফলে; কি... খবর যে সম্পূর্ণ মিথ্যা এ গ্রন্থের লেখক ঘটনা... স্থলে উপস্থিত হয়ে সরেজমিন তদন্ত করে... প্রমাণ পেয়েছেন। আলোচ্য গ্রন্থ তার... অনুসন্ধানেরই প্রামাণ্য দলিল। নেতাজী... অনুরাগীর সংখ্যা আজও বড় কম নয়, ... সকলেই এ রচনাপাঠে আনন্দ লাভ করবে... প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথা... লেখক—ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ, প্রকাশক... গ্রন্থম, ২২।১, বিধান সরণী, কলিকাতা—... দাম—তিন টাকা।

কথাগুচ্ছ / এম সি সরকার

আলোচ্য গ্রন্থটি এক বিরাটাকার গল্প সঙ্কলন। বাংলা গল্পসংগ্রহ অবশ্য আরও আছে এবং তার অনেকগুলিই বিশেষভাবে উল্লেখ্য : কিন্তু তা হলেও বাংলা শ্রেষ্ঠ গল্পের সংগ্রহ হিসাবে বর্তমান সঙ্কলন গ্রন্থটি এক বিশেষ মূল্য পাবার অধিকারী। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে সাম্প্রতিককালের বিশিষ্ট লেখক-বৃন্দ সকলের রচনাই গৃহীত হয়েছে। সেজন্যই বাংলা ছোট গল্পের এক ধারাবাহিক ইতিহাস হিসাবেও গণ্য হবে এ গ্রন্থ। সাহিত্যিকদের মতে বাংলা-সাহিত্যের সবচেয়ে উল্লেখ্য বস্তু হল ছোট গল্প : বাংলা সাহিত্যের প্রাণ-স্পন্দন নাকি ছোট গল্প ও গীতি-কবিতার মধ্যেই নিহিত, একথা যে মিথ্যা নয় এই সঙ্কলন গ্রন্থটি পাঠ করলে তা রসজ্ঞ পাঠক-মাত্রেই উপলব্ধি করবেন। বাংলা গল্প সাহিত্যের বিচিত্র সৌন্দর্য, স্নিগ্ধমাধুর্য এই গ্রন্থের প্রত্যেকটি রচনার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। একথা যদিও সত্য যে, কোন নির্বাচনই সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকাকে সন্তুষ্ট করতে পারে না। কারণ, সকলের ভাললাগা একসূত্রে গ্রথিত নয়, তবু একথা অসংশয়েই বলা যায় যে, বর্তমান সংগ্রহের সম্পাদক মহাশয়টি সফলপ্রযত্ন। এই সঙ্কলন গ্রন্থটি বাংলা শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প সাহিত্যের এক অতুল নিদর্শন স্বরূপই গৃহীত হওয়ার যোগ্য। এই সঙ্কলন গ্রন্থটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন বাংলা সাহিত্যের আসরে গল্পগ্রন্থের এত ছড়াছড়ি ছিল না। বর্তমানে নানা ধরণের গল্পসঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও যে এই পুরানো সঙ্কলন গ্রন্থটির অধ্যায়ে আর এক স্মরণ যুক্ত হল সেটা এর সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষেরই প্রামাণ্য দলিল। পরিশেষে আর একটা কথা নিবেদন করি, সাম্প্রতিককালে বাংলা-সাহিত্যের আসরে এমন অনেকে আছেন যাদের লেখনীর ছোঁয়ায় বাংলা গল্প-সাহিত্যের অনেক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে, এই বিশালকায় গল্পসংগ্রহটির নবতম সংস্করণে তাঁদের রচনাও সংকলিত হওয়া উচিৎ ছিল না কি? আশা করি, বারান্তরে সম্পাদক এ বিষয়ে সম্যক্ প্রতিনিধিত্ব পরিচয় দিয়ে আমাদের সুখী করবেন। অঙ্গসজ্জা অতি শোভন। সম্পাদক শ্রীসুধীরচন্দ্র সরকার, প্রকাশক—এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—... টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শ্রীগীতাসার

হিন্দুর অন্যতম প্রধান ধর্মগ্রন্থ শ্রীমদভগবৎ গীতার সুষ্ঠু ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থে। শুধু ব্যাখ্যাই নয়, সেই সঙ্গে রয়েছে লেখকের প্রত্যক্ষ আত্মোপলব্ধির ব্যঞ্জনা। গীতা পাঠ করে ধর্মজ্ঞ লেখক যে অনুভূতি সংগ্রহ করেছেন, এ রচনার প্রাণসত্তা সেটাই। মহাগ্রন্থ গীতার মূল বক্তব্যের সঙ্গে ধর্মনিষ্ঠ হিন্দুমাত্রেই পরিচিত, কোন অবস্থাতেই যে কর্ম পরিহার করা কর্তব্য নয়, গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনের প্রতি সেই উপদেশই দিয়েছেন। গীতা কর্মযোগেরই অপর নাম, বর্তমান গ্রন্থকার এই মহাসত্যকে তাঁর আপন আলোকে নিপুণভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, মূল শ্লোকগুলিও নির্বিবন্ধভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে গ্রন্থের মুখপাতে, পরে তার বাংলা ব্যাখ্যা ও গ্রন্থকারের টীকা প্রদত্ত হয়েছে : এই মহাগ্রন্থের তাৎপর্য বুঝতে এতটুকুও বেগ পেতে হয় না : সাধারণ ও বিদগ্ধ উভয়বিধ পাঠকের কাছেই গ্রন্থটি সমাদৃত হওয়ার যোগ্য। আমরা এ গ্রন্থের প্রচার কামনা করি।

ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ পরিচ্ছন্ন। লেখক—বরদাচরণ সেন, প্রকাশক—শ্রীকপিভূষণ সেন, ১০, ইনাহিমপুর রোড, কলিকাতা—৩২, দাম—দুই টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

নব নব রূপে / কুইন্স বুক

গ্রন্থখানিতে বিভিন্ন কৌতূহলোদ্দীপক রচনার সন্নিবেশ হয়েছে। লেখকের লেখার সঙ্গে মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকার নিশ্চয়ই পরিচয় আছে, পূর্বে প্রকাশিত কয়েকটি রচনা ও উপন্যাসের মাধ্যমে। গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট "রাজ-সভা ষড়যন্ত্র" ইংল্যাণ্ডের অষ্টম এডোয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগের ও তাঁর প্রণয়িনী সম্পর্কে কাহিনী অতি সুচারুরূপে লিখিত হয়েছে। 'মোহনবাগান ১৯১১' রচনায় বাংলা দেশের খেলাধুলার অতীত গৌরবের স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়। 'পঞ্চ বাহিনীর নায়িকা'তে বিখ্যাত গুপ্তচরী মাতাহারির জীবনেতিহাস, পরিবেশনের অভিনবত্বে পাঠক-মনে রহস্যের খোরাক যোগাবে. এতদ্ব্যতীত বেতারে তাজ্জব ব্যাপার, ইণ্টারপোল, ট্যাক্সি ড্রাইভার, স্টাফ রিপোর্টার, মজাকৌতুক, ভুতুড়ে ক্রিকেট ও মন্তর পড়া ফুটবল ইত্যাদি কাহিনী-গুলি প্রায় গল্পের আকারে লিখিত। আমরা লেখকের কাছে আরও এই ধরণের সত্য ঘটনামূলক দেশী ও বিদেশী কাহিনী প্রত্যাশা করি। লেখকের ভাষা আকর্ষণীয় ও উৎকসতায় পরিপূর্ণ। গ্রন্থখানির বহুল প্রচার আবশ্যক। লেখক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। কুইন্স বুক কোং। ৬২এ, আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৫। দাম : সাড়ে তিন টাকা।

বাতি-ঘর /
সম্বোধি পাবলিকেশন্স

আলোচ্য উপন্যাসের লেখিকা বাংলা সাহিত্যের আসরে অপরিচিতা নন; মিষ্টিমধুর উপন্যাস রচনায় তাঁর হাতযশ আছে। আলোচ্য উপন্যাসটির বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে এক বিয়োগান্ত প্রেমের কাহিনী অবলম্বন করে। নায়িকা সুমিতা অভিজাত ধনী গৃহের সুন্দরী সুশিক্ষিতা কন্যা। বাল্যসখা সুদামের সঙ্গে তার প্রণয় পরিণয়ে সার্থক হতে পেল না কুচক্রীর ষড়যন্ত্রে। জীবনের প্রথম প্রভাতে যে ভুলটি সুমিতা করেছিল, তারই মাশুল গুণে গেল সে সারাজীবন ধরে। ভূমিকায় লেখিকা বলেছেন, কাহিনীর কাঠামো নাকি সত্য ঘটনার ছায়া অবলম্বনে গঠিত, সে যাই হোক এ কাহিনীর ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে দিকহারা মানুষের সুবিপুল হতাশা। অন্ধকারে পথ হারিয়ে আলোর রেখা অন্বেষণের আকুল উৎকণ্ঠা। বর্তমান সামাজিক জীবনের অবক্ষয়ের এক সুন্দর ছবি এঁকেছেন লেখিকা; বিচিত্র মানুষের মিছিল ভিড় করেছে এ গ্রন্থের পাতায় পাতায়; মানুষের মুখোশধারী পশু, ধনীপদলেহী চাটুকার, স্বার্থান্বেষী দালাল, হতাশ অভিনেতা, ব্যর্থ-প্রেমিক, ছলনাময়ী অভিনেত্রী, পথভ্রষ্টা সরলা তরুণী সবেরই দেখা মিলবে এখানে—সেইসঙ্গে আছে আদর্শনিষ্ঠ মানুষ, জ্ঞানতপস্বী ও সাধু মহাত্মা। বৈচিত্র্যের ছোঁয়ায় আকর্ষণীয় কাহিনীটি আগাগোড়া সুখপাঠ্য, পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ওঠা কঠিন। লেখিকার মধুর শৈলী এ রচনাকে এক বিশিষ্ট মর্যাদায় ভূষিত করেছে। আমরা বইটি পড়ে সত্যই আনন্দ লাভ করেছি। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখিকা—বাণি দেবী। প্রকাশনায়—সম্বোধি পাবলিকেশনস প্রাঃ লিঃ, ২২, স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা—১, দাম—দশ টাকা।

অস্কার ওয়াইল্ড / বাক সাহিত্য

আলোচ্য গ্রন্থটি জীবনী সাহিত্যমূলক, গ্রন্থকার এ বিষয়ে প্রখ্যাত, বর্তমান রচনা সে খ্যাতিকে বিস্তৃততর করে তুলবে। বিখ্যাত বিদেশী সাহিত্যিক অস্কার ওয়াইল্ডের নাম বিদগ্ধ পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন; এই মহৎ প্রতিভা সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় বহু গ্রন্থাদি রচিত ও প্রকাশিত হলেও বাংলায় এঁর সম্বন্ধে কোন পূর্ণাঙ্গ রচনা এযাবৎ প্রকাশিত হয় নি, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে এ গ্রন্থের লেখক একটা বিশেষ অভাব দূর করেছেন। ওয়াইল্ড সম্বন্ধে প্রকাশিত বিদেশী জীবনী গ্রন্থসমূহ থেকেই

এ গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করেছেন লেখক; সবিশেষ পরিশ্রমের ফলে যে সব তথ্য-প্রমাণ তিনি যোগাড় করেছেন, তার সাহায্যে প্রামাণ্য হয়ে উঠেছে তাঁর রচনা। অস্কার ওয়াইল্ডের জীবন যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি অভিশপ্ত; যশের শিখরে অবস্থান করার সময় যে অপযশ ও কলঙ্কের পসরা মাথায় নিয়ে তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছিল আলোকোজ্জ্বল জীবনযাত্রার সমালোচনাপূর্ণ দিনগুলির কাছ থেকে, বাকি জীবন কাটাতে হয়েছিল সমাজচ্যুত অপরাধীর ভূমিকায়—তার ব্যথা ও বেদনা লেখকের দরদে মূর্ত হয়ে উঠেছে এ রচনার মাঝে। অস্কার ওয়াইল্ডের সাহিত্য-মানসও প্রস্ফুটিত এ রচনার ছত্রে ছত্রে, তবে শুধু সাহিত্যিক ওয়াইল্ডই নয় মানুষ ওয়াইল্ডকেও দেখাতে চেয়েছেন জীবনীকার তাঁর রচনার মাঝে এবং নিঃসন্দেহে বলা যায়, যে তাঁর সে প্রচেষ্টা সফল হয়েছে। এই জীবনী-গ্রন্থ একাধারে জীবন ও সাহিত্য এ দুয়েরই দাবী মিটিয়েছে। আমরা গ্রন্থটিকে সাদর স্বাগত জানাই। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ যথাযথ। লেখক—ভবানী মুখোপাধ্যায়, প্রকাশনায়—বাক-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯, দাম—পাঁচ টাকা।

আধুনিক বাংলা গীতি কবিতা / প্রাইমা পাবলিকেশন্স

কাব্যে। বিচারে গীতি-কবিতার কোন নির্দিষ্ট সংজ্ঞা দেওয়া বড় সহজ কথা নয়, তবু অন্য জাতীয় কবিতার সঙ্গে পাশাপাশি রেখে বিচার করতে গেলে গীতি-কবিতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে এবং তার কয়েকটি ধারার সঙ্গেও আমাদের পরিচয় ঘটে। আলোচ্য গ্রন্থে বাংলা গীতি-কবিতার সেইসব বৈশিষ্ট্য ও ধারা সম্বন্ধে বিশদ ও প্রামাণ্য আলোচনা করেছেন লেখক। য়ুরোপের বিভিন্ন সাহিত্যে গীতি-কবিতার মোট তিনটি ধারাকে নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুসরণ করা হয়েছে, সেগুলির নাম যথাক্রমে ওড, সনেট ও এলিজি। আধুনিক বাংলার গীতি-কবিতার জন্ম উনিশ শতকে; সেই সময়ে রেনেসাঁসের প্রভাবে শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে দেখা দেয় আত্ম-প্রকাশের অদম্য প্রেরণা, দেখা দেয় কাব্য-সাহিত্যের নতুন রূপ, রীতি, ছন্দ, অলঙ্কার ও ভাষা সন্ধানের প্রয়োজন, আর তারই ফলে জন্ম হয় আধুনিক বাংলা গীতি-কবিতার। পাশ্চাত্য প্রভাবের ছায়ায় জন্ম হলেও বাংলা গীতি-কবিতা যে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ও অনন্য: প্রামাণ্য আলোচনার মাধ্যমে তা প্রমাণ করেছেন লেখক, বাংলার গীতি-কবিতা বিশেষভাবে যে ধারার অনুসরণ করেছে তা ওড-গোত্রীয়, এই ধারাকে অবলম্বন করে যাঁরা বাংলা গীতি-কবিতাকে এক বিশিষ্ট মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তাঁদের নামোল্লেখ করে ও তাঁদের রচনা থেকে উদ্ধৃত করে লেখক যে তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা করেছেন তা বিশেষভাবেই প্রণিধানযোগ্য। এই গ্রন্থ প্রাবন্ধিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে, নিঃসন্দেহে এক উল্লেখ্য সংযোজন। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—জীবেন্দ্র সিংহরায়। প্রকাশক—প্রাইমা পাবলিকেশনস্, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম—আট টাকা।

মানবেন্দ্রনাথ জীবন ও দর্শন / র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট

ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে বিপ্লবী মানবেন্দ্রনাথ রায়ের নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে; আলোচ্য গ্রন্থে এই মহান ব্যক্তিত্বের সার্থক রূপায়ণ করেছেন লেখক। মানবেন্দ্রনাথের জীবনকাহিনী যেন এক আশ্চর্য রূপকথা, তার ঘটনাবলী তিন মহাদেশে বিস্তৃত; এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ ও অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ জীবনের দেখা মেলে কচিৎ কখনও; প্রায় দুদশক ধরে এশিয়া, আমেরিকা এবং ইউরোপের বৈপ্লবিক আন্দোলনে বিভিন্ন সময়ে তিনি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। মূলত কর্মী হলেও বাগ্মী মানবেন্দ্রনাথ ছিলেন এক বিদগ্ধ সুলেখক, যদিও বৈপ্লবিক মতামতকে প্রচার করতেই তিনি লেখনী ধারন করেন প্রধানত। আলোচ্য রচনার মাধ্যমে লেখক মানবেন্দ্রনাথকে এক বিশ্লেষণী বিচারের পটভূমিকায় উপস্থাপিত করে যেন তাঁর মহান ব্যক্তিত্বকে সর্বরকমে যাচাই করে নিয়েছেন। লেখক ব্যক্তিগতভাবে এই প্রতিভাধর পুরুষের সান্নিধ্য লাভ করেছেন দীর্ঘকাল, তাঁর সেই অভিজ্ঞতা রচনাকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে; এই জীবনী-গ্রন্থ শুধু মানবেন্দ্রনাথের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন-কাহিনীমাত্র নয়, এর মাঝে তাঁর জীবন-দর্শনও প্রতিফলিত। বাংলা গবেষণামূলক সাহিত্যের ক্ষেত্রে, এ গ্রন্থ এক অমূল্য সংযোজনরূপেই গৃহীত হওয়ার যোগ্য। কয়েকটি প্রামাণ্য আলোকচিত্র সন্নিবেশিত হওয়ায়, রচনার মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—স্বদেশরঞ্জন দাস, প্রকাশক—র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট মুভমেণ্ট, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২, দাম :—পনেরো টাকা।

মালবিকার মন / কুইন্স বুক

লেখিকা সাহিত্য-ক্ষেত্রে একেবারে নবাগতা নন, মিষ্টিমধুর মেয়েলী উপন্যাস রচনায় তাঁর কৃতিত্ব আছে, আলোচ্য উপন্যাসটিও সেই জাতীয়। সামান্য একটি মেয়ের মন দে নেওয়ার কাহিনীকে অসামান্য মাধুর্যে ম করে প্রকাশ করেছেন লেখিকা। বুদ্ধির ঝল সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের ঘটায় বি এখানে ভারাক্রান্ত নয়, একটি সা মেয়ের সহজ মনে কি করে প্রেমের শতদল ধীরে ধীরে দল মেললো, অত্যন্ত মৃদু ভঙ্গীতে তারই ব্যাখ্যা করে দেখানো হয়ে মালবিকা ও সৌনকের প্রেম ও পূর্বরা ভারি মিষ্টিহাতে পরিবেশন করেছেন লেখি পড়তে পড়তে পাঠকের মনও রসাপ্লু ওঠে। রোমান্টিক উপন্যাস বলতে যা বোঝা গ্রন্থ তাই, কোনরকম ইজমের বালাই নাই রসভোগে কোন বাধাও দেখা দেয় সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর এ র রসমধুর রচনা হাতে পেলে পাঠক বি পাঠিকাদের পক্ষে খুশি হওয়াই স্বাভাবি প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখিকা নীলিমা দাশগুপ্ত, প্রকাশনায়—কুইন্স কোম্পানী। ৬২এ, আহিরীটোলা স্ট্রী কলিকাতা—৫, দাম—তিন টাকা।

ভালবাসি / আর কে পাবলিশ

সাধারণ সুরের এই উপন্যাসটিতে সাধা পাঠকের তৃপ্তির অনেক উপকরণ রয়েছে সস্তা সেন্টিমেন্টালিটির ছোঁয়ায় ভ কাহিনীটিতে প্রেম-মিলন ও বিরহের কথা ব হয়েছে বিশদভাবে। দুপুরবেলা কাজক অবকাশে একটি উপন্যাসের পাঠে ম সংযোগ করতে ভালবাসেন যাঁরা, বিশেষতঃ সেই বাঙালী মহিলা পাঠিকাদের মনোর করার উদ্দেশ্যেই যেন রচিত হয়েছে এ উপন্যা মনে হয় এ রচনা তাঁদের ভাল লাগবে শুভবিবাহে প্রীতি-উপহার দেওয়ার প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক শ্রীরাজেন্দ্র কুমার মিত্র, প্রকাশক—আর কে পাবলিশিং কোং, ১১এ, গোকুল মিত্র লে কলিকাতা—৫, দাম—চার টাকা।

খেলার সাথী / শিশু সাহিত্য সং

'খেলা'র সাথীর লেখক ছোটদের পরম প্রি 'স্বপন বুড়ো'। বইটি ছোটদের কাছে সহজে আদরণীয় হবে। শুধু এর গল্পের আকর্ষণ ন প্রতি পাতায় অপূর্ব রঙীন ছবি। মুকুলের এ থাকা আর খেলার সাথী পাওয়া সবের মধ্যে ছোটরা নিজেদের আর তাদের কল্পনা-জগতে খুঁজে পাবে। ছাপা, বাঁধাই চমৎকার দাম—আড়াই টাকা। শিশু সাহিত্য সং (প্রাঃ) লিঃ। ৩২-এ আচার্য প্রফুল্লচ রোড, কলিকাতা—৯।

মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়

ভারতীয় ভাষা-চর্চার ইতিহাস

ডঃ অশোক চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিম-জার্মানীর হেসেনের ছোট্ট একটি পাহাড়-ঘেরা সহর মারবুর্গ। ভারতের সাধারণ লোকের কাছে এর নাম অপরিচিতই রয়ে গেছে। বার্লিন, হামবুর্গ, মিউনিকের দুরন্ত রবিচ্ছটায় মারবুর্গের এই স্নিগ্ধকৌমুদী দুর্লক্ষ্য, নিকটেই প্রসিদ্ধ বিমানবন্দর ফ্রাঙ্কফুর্টের অবস্থান। সেইজন্য হয়ত এর গৌরব আরও কিছুটা ম্লান। কিন্তু ষাট হাজার লোকের বাসভূমি মারবুর্গ যে কারণে গর্ব করতে পারে সেটি হল এর বিশ্ববিদ্যালয়। এর সব কিছুই বিশ্ববিদ্যালয়ময়, এমন কোন বড় রাস্তা নেই যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক বা একাধিক বিভাগের পঠন-পাঠন হয় না। সহরের এমন কোন অংশ নেই যেখানে ছাত্র-ছাত্রীর হোস্টেল নেই—এমন কোন বই-এর দোকান নেই যেখানে অধ্যাপক-ছাত্র-ছাত্রীরা ভিড় করে না। কাজেই এরা যে এই মারবুর্গকে ইউনিভার্সিটি স্টাট (বিশ্ববিদ্যালয় নগরী) বলে তার মধ্যে বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীষ্মাবকাশে রাত্রির ডালহৌসীর মত এর অবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় বিভাগ বন্ধ,—গ্রন্থাগারগুলি মাত্র কিছু সময়ের জন্যে উন্মুক্ত। অধ্যাপক চলে গেছেন পল্লী অঞ্চলে অবকাশযাপনের জন্য; কলমুখর ছেলেমেয়েরা কোন বড় সহরে হয়ত বা চাকুরিরত। শীতে স্বল্পতোয়া তটিনীর মত মারবুর্গ প্রতীক্ষা করে আগামী বর্ষার। নভেম্বর মাস থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনরারম্ভের সাথে-সাথেই আবার এর সাড়া পাওয়া যায়। পথে পথে প্রাণ-চঞ্চল ছেলের দল, ভারতীয় বেদীমূলে উৎসর্গীকৃত-প্রাণ অধ্যাপক-শ্রেণী ফিরিয়ে আনে মারবুর্গের শিরায় শিরায় নতুন রক্ত। এই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না বার্লিনে, ফ্রাঙ্কফুর্টে, মিউনিকে, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয় আরো বহুর মধ্যে এক—এখানে কিন্তু একের মধ্যে এক এবং অনন্য।

রীতিমত আনুষ্ঠানিকভাবে মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় ১৫২৭ সালে, যদিও তার বেশ কিছুদিন আগে থেকেই আরম্ভ হয়ে গেছে এর পঠন-পাঠনের কাজ এবং প্রায় গোড়া থেকেই ভারতীয় ভাষাচর্চার অনুশীলন আরম্ভ হয়। তখন থেকেই পূর্ব দিগন্তে সূর্য-স্নাত হওয়ার জন্য অধীর আগ্রহ প্রকাশ করে এখানের কিছু কিছু অধ্যাপক ও ছাত্র। যদিও সেদিন থেকেই ভারতীয় ভাষা বিভাগ জাতীয় কোন বিভাগীয় অধ্যাপক নিযুক্ত হন নি, কিন্তু পঠন-পাঠন প্রায় তখন থেকেই আরম্ভ হয়ে যায়, ১৬৫৩ সালে Christian Friedrich Crocius (১৬২৩-১৬৭১) পূর্বদেশীয় ভাষা পঠন-

● কে এফ গিল্ডনার

● ফারডিনণ্ড জাস্টি
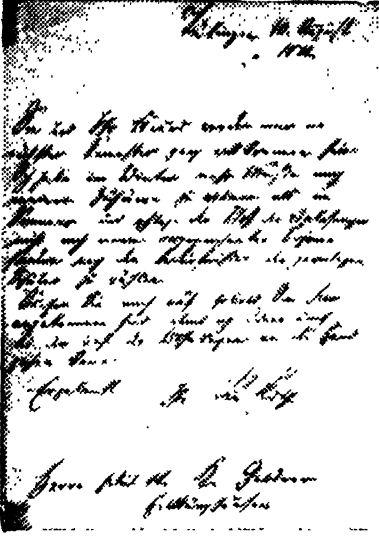
● ছাত্র Geldnerকে লিখিত অধ্যাপক Rudolph Roth-এর চিঠি

পাঠনের ভার পেলেন এবং তার সঙ্গে তাঁরই স্কন্ধে ন্যস্ত হল চিকিৎসা ও ভেষজ বিদ্যা। পুরোপুরি ভারতীয় ভাষাতত্ত্ববিদরূপে প্রথম যিনি এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক পদে বৃত হলেন তাঁর নাম Johannes Gildemeister. প্রথম জীবনে ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের সাধারণ এক কর্মচারী---পরে হলেন তারই প্রধান গ্রন্থাগারিক, শেষে ভারতীয় ভাষা বিভাগের অধ্যাপক। বিস্ময়কর এই অভ্যুত্থানের মূলে যে তাঁর প্রতিভা ও অধ্যবসায় সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। ১৮১২ সালে তাঁর জন্ম। গায়টিঙ্গেন ও বনে অতিবাহিত হয়েছিল ছাত্রজীবন। Lassenকে পেয়েছিলেন অধ্যাপকরূপে—এঁর কাছেই সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম পাঠ। কেবল সংস্কৃত কেন প্রাচীন হিব্রু ও আরবী ভাষা এবং সাহিত্যেও ছিল তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। সেমেটিক ভাষা শেখেন Ewald ও Freitag-এর কাছে। ১৮৪১ সালে 'কালিদাসের মেঘদূত ও শৃঙ্গারতিলক' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পণ্ডিতসমাজে স্বীকৃতি লাভ করেন এবং তিন বৎসর পূর্বে ১৮৩৮ সালে তাঁর ভারতীয় ও আরবী ভাষাতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা গ্রন্থ থেকেই গবেষণা ক্ষেত্রে তাঁর অনুসন্ধিৎসা ও প্রখর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় প্রদান করতে পেরেছিলেন। তবে পরবর্তীকালে কালিদাসের কাব্য-নাটকই তাঁর চিন্তাধারার এক প্রধান অংশ অধিকার করেছিল। ১৮৪২ সালে তিনি আর এক গ্রন্থ লিখে কালিদাসের কাব্য ও নাটকাবলীর ভাষাতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা প্রতিপন্ন করেন যে, খুব সম্ভব কালিদাসের গ্রন্থরাজির মধ্যে শৃঙ্গারতিলক অন্তর্ভূত হওয়াটা সমীচীন নয়। ১৮৪৭ সালে তাঁর ল্যাটিন ভাষায় লেখা অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশিত হল—নাম 'Bibliothecal Sanskrital sine Recensus librorum Sanskritorum hucusque typis vel lapide exscriptorum critici specimen যতদিন Gildemeister ভারতীয় ভাষা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন, ততদিন পর্যন্ত একটি দুটি ছাত্র এসেছে। এখানে গুরুকে বন্দনা করে কেউ নিয়েছেন প্রাকৃত ও অপভ্রংশবিষয়ক পাঠ—কালিদাসের নাটকে। সমাজজীবন নিয়ে কেউ আলোচনা করেছেন। অন্তত কয়েকজনকেও ইনি ভারতের বিভিন্ন ভাষা সম্পর্কে যে উৎসাহিত করতে পেরেছিলেন সে বিষয়ে কোনই দ্বিমত নেই। কিন্তু মারবুর্গের দুর্ভাগ্য এঁকে বেশিদিন ধরে রাখতে পারে নি, এখান থেকে তিনি চলে গেলেন বনে—সেখানের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদর আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারলেন না।
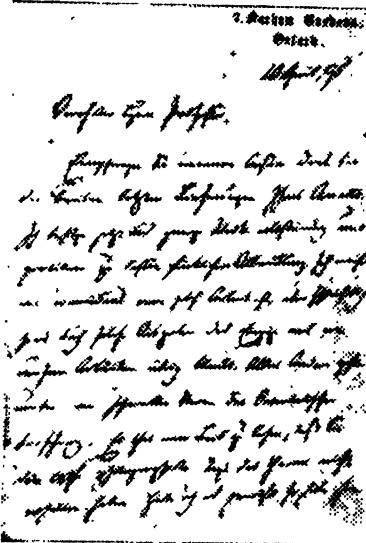
● Geldnerকে লিখিত Maxmuller-এর চিঠি

Gildemeister-এর প্রস্থানের পরে মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত তথা ভারতীয় ভাষা আলোচনার বেগ কিছুটা মন্দীভূত হল। ১৮৭৫ থেকে ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত এর অধ্যাপকপদে নিযুক্ত ছিলেন Konrad Kessler। ইনি Manichaer সম্প্রদায় শীর্ষক এক গবেষণামূলক গ্রন্থ লিখে যশস্বী হল।

এর পরে অধ্যাপকরূপে আমরা যাঁকে পাই তাঁর নাম Ferdinand Justi (চিত্র দ্রষ্টব্য)। সংস্কৃত ও জার্মান ভাষার তুলনামূলক আলোচনাতেই তাঁর অত্যধিক আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল; বোধহয় সেই কারণেই তদানীন্তন সরকারের সুবিবেচনার ফলে তিনি লাভ করলেন আরও একজন অধ্যাপকের সহায়তা, এঁর নাম A. Thumb. এঁদের দুজনের যৌথ প্রচেষ্টায় গুটিকতক গ্রন্থ প্রকাশিত হল।

Justi-র মৃত্যু হয় ১৯০৭ সালে এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে যিনি এই বিভাগের দায়িত্ব বহন করবার জন্যে অগ্রসর হলেন, তিনিই জগদ্বিখ্যাত K. F. Geldner (চিত্র দ্রষ্টব্য)।
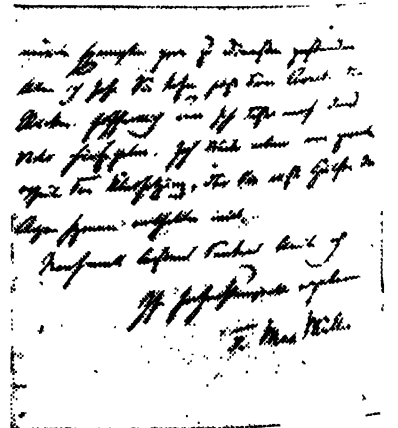
● Geldnerকে লিখিত Maxmuller-এর চিঠি

১৮৫২ সালের ১৭ই ডিসেম্বর থ্যুরিঙ্গেন-এর অন্তর্গত সাফেল্ডে তাঁর জন্ম। বিশ্ববিখ্যাত লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে এলেন ১৮৭১ সালে তরুণ Geldner শিক্ষার্থী হয়ে। 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'—লাইপজিগে তখন বহু বরেণ্য অধ্যাপকের সমাবেশ—সকলেরই জগদ্-জোড়া নাম। তার মধ্যেই Brockhaus ও Windischকে গুরুরূপে বরণ করলেন—সমানে নিতে লাগলেন সংস্কৃত ও আবেস্তা যুগপৎ এই দুয়ের পাঠ। এখানে থাকাকালীন তিনি টুইবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভের জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করে সেখানের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক পণ্ডিত কুলগুরু Rudolph Roth-এর কাছে চিঠি লেখেন। ১৮৭২ সালের ১০ই জানু. টিউবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Roth সাদর আহ্বান জানালেন জ্ঞান-পিপাসু এই নবীন ছাত্রকে। গুরু Roth-এর লেখা একাধিক পত্র এখনও এই Geldner-এর পুস্তকাবলীর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের একটি বিশেষ আধারে সযত্নে রক্ষিত আছে।

নীচের চিত্রটি তারই একটির প্রতিলিপি। অধ্যাপক ছাত্রের এই হার্দিক সম্পর্ক আমাদের প্রাচীন কালের তপোবনের অধ্যয়নরত শিষ্য ও আচার্যের পুণ্য বন্ধন স্মরণ করিয়ে দেয়।

লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ সমাপনান্তে Geldner টুইবিঙ্গেন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করলেন। সেই সময় সমগ্র জার্মানীর মধ্যে এই বিশ্ব-বিদ্যালয়েই সম্ভবত ভবিষ্যতের দিক-পাল ভারতীয় তত্ত্ববিশারদদের সমাবেশ হয়েছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। Geldner-এর অন্যতম প্রধান সতীর্থবর্গের মধ্যে কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এঁরা হলেন Lanman, Garbe, Zimmer, Schroeder, Kaegi. ১৮৭৫ সালে Geldner সাঙ্গ করলেন এখানের পাঠ। ১৮৭৭ সালের 'আবেস্তার ছন্দ' শীর্ষক তাঁর প্রথম গ্রন্থ প্রকাশিত হল। সুধীসমাজ কর্তৃক পরম সমাদৃত ও স্বীকৃত হল তরুণ সাধকের এই সারস্বত কীর্তি। এর পরে প্রায় ১০।১২ বৎসর পর্যন্ত Geldner সমানে আবেস্তা নিয়ে গবেষণা করে চললেন। পার্শী সম্প্রদায়ের এই ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে বোধহয় Geldner-এর অবদানই সর্বাপেক্ষা অধিক। Maxmuller ১৮৯৫ সালে ১০ই এপ্রিলের লেখা এক পত্রে Geldner এর আবেস্তার গবেষণার জন্য উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। এই পত্রটি ভবিষ্যৎ সুধীসমাজে এক পরম মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল ভেবে এর অনু-লিখন সহ যথার্থ প্রতিলিপি প্রকাশ করা গেল। (চিত্র দ্রষ্টব্য)। ১৮৮৭

● নিজ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্বে Geldner কর্তৃক সংশোধিত অংশের নমুনা

সালে এই ৩৫ বয়স্ক গবেষকের সঙ্গে আলাপ হল R. Pischel-এর। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে সে এক পরম শুভক্ষণ। এঁদের যৌথ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সৃষ্টি হল Vedische studien. ১৮৮৯ সালে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। এই সময়ে Oldenberg বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অবসর নিলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই পদের জন্য সাদর আহ্বান জানালেন Geldnerকে। ১৮৯৪ সালে Geldner ঐ পদে যোগদান করে প্রায় ১৩ বৎসর প্রধান অধ্যাপকরূপে বৃত ছিলেন। ১৯০৭ সালে এলেন মারবার্গে।

ভারতীয় ভাষা চর্চার ইতিহাসে সে এক পরম অমৃতময় মুহূর্ত। মরা গাঙে আবার এল জোয়ার, বহু বিদ্যার্থীর সমাবেশ হল জ্ঞান-তাপসের চরণতলে। প্রাচ্যকে জান-বার কী গভীর আগ্রহ—ভারতকে চেনার উদগ্র বাসনা কী অপরিসীম, কৌতূহল আর অবিচলিত নিষ্ঠা। Geldnerকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছিল ভারত সাধন রথচক্র—মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় আবার জগৎসভায় তার স্থান সুনির্দিষ্ট করতে পেরেছিল। মারবুর্গের থাকাকালীনই একে একে তাঁর বিশ্ব-বিশ্রুত সারস্বত অবদান স্পষ্ট হয়েছিল। তার মধ্যে নিচেরগুলি প্রধানত উল্লেখযোগ্য।

(ক) Der Rgveda in Auswahl.

(খ) Zur Kosmogenie des Rgveda.

(গ) Vedismus und Brahmanismus.

(ঘ) Zoroastrishe Religion

(ঙ) Der Rgveda (অনুবাদ)

প্রায় অশীতিপর Geldner ১৯২৮ সালে Lanman-এর আমন্ত্রণে আমে-রিকায় এসে বৈদিক ভাষা ও সাহিত্যের ওপর কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ পাঠ

Die indische Balladendichtung গ্রন্থটি তাঁর প্রকৃত গবেষকোচিত প্রতিভা ও অনন্যসাধারণ তীক্ষ্ণ ধীশক্তির কথাই প্রমাণিত করে। ঋগ্বেদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যা আলোচনা-কালে তিনি সব সময়েই সনাতন ভারতীয় কর্তৃক অনুসৃত সায়নের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন, তা নয়। ঋগ্বেদকে 'যস্য নিচ্ছ্বসিতং বেদাঃ' রূপে তিনি দেখেন নি। বিচার করেছেন এর ভাষাতাত্ত্বিক মূল্য—পর্যালোচনা করেছেন ভারতীয় সমাজ-জীবনের মূল সূত্রপাতে ঋগ্বেদের অবদান কোথায়—বিশ্লেষণ করেছেন ঋগ্বেদের কাব্যমূল্য। এ বিষয়ে Geldner-এর সঙ্গে অনেকের মত-বিরোধ থাকতে পারে এবং বস্তুতপক্ষে তিনি তাঁর অশেষ সম্মানার্হ গুরু Rudolph Rothএর সঙ্গে সকল সময়ে একমত হতে পারেন নি; কিন্তু যখনই আমরা তাঁর গ্রন্থাবলী পাঠ করি এই জ্ঞানাচার্যের অবিচলিত নিষ্ঠা, অসীম অধ্যবসায়, সত্য জিজ্ঞাসা, অক্লান্ত পরিশ্রম ও অভূতপূর্ব বিচার-বিশ্লেষণ-পদ্ধতি এবং অভিনব যুক্তিতর্ক আমাদের অভিভূত করে। আবেস্তা ও পুরাতন পারস্য সাহিত্য ও ভাষায় তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ঋগ্বেদের আলোচনায় তাঁর সহায়তা করেছিল সন্দেহ নেই। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁর লিখিত বহু গ্রন্থের সন্ধান আমাদের দেশে কেন জার্মানীরও অনেকেই রাখেন না। ১৫।১৬ টি প্রকাশিত গ্রন্থ ছাড়াও এঁর লিখিত আরও বহু গ্রন্থ হস্তলিখিত পুঁথির মধ্যেই সীমিত হয়ে মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের শোভাবর্ধন করছে মাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়-গ্রন্থাগারিকের অনুমতিক্রমে সেইসব হস্তলিখিত পুঁথিগুলি অনুসন্ধানের সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। বিশ্বাস করি আরও ৭।৮টি অতি মূল্যবান গ্রন্থ Geldner-এর দুর্বোধ্য হস্তলিখিত পুঁথির মধ্যেই সীমিত আছে। জানি না জার্মান কর্তৃপক্ষ কবে এগুলির প্রকাশনা-বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন। যতশীঘ্র ভারততত্ত্ব জিজ্ঞাসু গবেষকবর্গের এই দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, ততই মঙ্গল। অন্যথায় কালক্রমে বহু গ্রন্থের মত এগুলোও বোধহয় কাল-গর্ভে বিলীন হয়ে যাবে। আর ভারত-বাসী তথা ভারত-তত্ত্বের ইতিহাসের পক্ষে সে হবে এক ঘোর দুর্দিন, এঁর পাণ্ডুলিপি প্রকাশ বিষয়ে কয়েকজন উৎসাহী ভারততত্ত্বের ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে আলাপ করে দেখেছি—সকলেই ইচ্ছা প্রকাশ করে এগুলি প্রকাশিত হোক, কিন্তু দায়িত্ব কেউ বহন করতে চায় না। এই অশীতিপর বৃদ্ধ কিভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্বরচিত কোন গ্রন্থের উন্নতি সাধনের জন্য সযত্নে কয়েক স্থলে কিছু যোগ করেছেন কোন অংশ বা বাদ দিয়েছেন, সেই সম্পর্কে উপরোক্ত চিত্রের প্রতি সুধীসমাজের দৃ আকর্ষণ করি। মুদ্রিত ১২২ ও ১২ পাতার মধ্যে 'ব্রহ্মণ' শব্দটির ব্যাখ নিহিত ছিল। কিন্তু কী ভাবে প্রত্যে মুদ্রিত পৃষ্ঠার সঙ্গে এক বা একাধিক সা কাগজ যোগ করে প্রজ্ঞা-ভারতীর এ অতন্দ্রপ্রহরী স্বীয় অধিকতর বক্ত লিপিবদ্ধ করে গেছেন---প্রকাশি চিত্রের মাধ্যমে তারই কিছু আভা পাওয়া যেতে পারে। সব থেকে কম যুক্ত বা পরিবর্তিত হয়েছে এ পৃষ্ঠাদ্বয়। মসীকণ্টকাকীর্ণ অন্যান্য পৃষ্ঠার কথা নাই বা তুললাম।

একাধিক কৃতী ছাত্র মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে Geldner-এর পদপ্রান্তে উপবেশন করেছে—প্রাচীন ভারতের বেদ পুরাণ, ইতিহাস আর আবেস্তা নিয়ে কাটিয়েছে দিনের পর দিন প্রাচীন বটবৃক্ষকে আশ্রয় করে কূজন করেছে বিভিন্ন দেশের ভারত তত্ত্ব-গবেষকপক্ষী। একাধিক স্রোতস্বিনী বিলীন হয়েছে এই মহামানবের সাগরতীরে। অতি ক্ষুদ্রায়তন কক্ষে গুরু-শিষ্যের চলেছে একই সঙ্গে বিদ্যাহরণ।

Geldner-এর অবসর নেওয়ার পর প্রকৃত অধ্যাপকরূপে কোন মনীষীকে আমন্ত্রণ জানান হয় নি। নিতান্তই প্রধানরূপে কাজ চালিয়েছেন Max Lindenau। ১৯১৩ সালে লাইপজিগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভরতের নাট্যশাস্ত্র সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। ১৯১৮ সালে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয় 'মহাকবি ভাসচর্যা', বহু আলোচিত ও বিতর্কিত ভাস কবির মতই রসিকসমাজে এই গ্রন্থটি আলোড়নের ঢেউ তোলে। এর পরে তিনি অথর্ববেদ ও ভরতের নাট্যশাস্ত্র নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হন। কতগুলি প্রবন্ধ Z. D. M. G এবং Indo Iranian Journalয়ে প্রকাশিত হয়। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের কথা, অথর্ববেদ ও ভরতের নাট্যশাস্ত্রের পূর্ণাঙ্গ অনুবাদের পাণ্ডুলিপি ১৯৪৫ সালের জানুয়ারী

● স্বীয় গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের পূর্বে Geldner স্বহস্তে এভাবে সংশোধন ও পরিমার্জন করেছেন

মাসে তিনি হারিয়ে ফেলেন। এই মর্মে তিনি প্রবন্ধ লেখকের কাছে পত্রযোগে জানিয়েছেন, ক্যায়নিসবার্গ থেকে এদিকে চলে আসার সময় পথে এই বিপত্তি হল। জার্মান গবেষকের ভারতী-সাধনার এক রত্ন-দীপশিখা নির্বাপিত হয়ে গেল। বর্তমানে Lendenau 'হিন্দু, খৃস্ট, ও ইহুদী ধর্ম' সম্বন্ধে এক তুলনামূলক আলোচনায় আত্ম-সমাহিত আলাপ করে দেখেছি ভারতবর্ষ সম্পর্কে কী সুগভীর শ্রদ্ধা—প্রতিভার জ্যোতিতে দেদীপ্যমান চক্ষুদ্বয় সংস্কৃত-ভারতীর লীলাভূমি ভারতের কথা স্মরণ করে অশ্রুসজল হয়ে এল। চুরাশী বৎসরের বৃদ্ধের গীর্বাণবাণী সেবায় কোনই ক্লান্তি নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেখকের সঙ্গে আলোচনা করে চললেন পালী, সংস্কৃত, প্রাকৃত হিন্দী আর বাংলা ভাষা নিয়ে। আগামী বৎসরের মধ্যেই তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের বইটি তিনি শেষ করতে পারবেন বলে আশা রাখেন।

Geldner-এর পরে এই বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপকরূপে বৃত হলেন Johannes Nobel। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হাইডেলবার্গে ১৮৮৭ সালে ২৫শে জুন জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যাবস্থাতেই সংস্কৃত, পালী, আরবী ও তুর্কী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তির পরিচয় প্রদান করে Luders-এর শিষ্যত্ব লাভে ধন্য হন। এঁর কাছেই সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর গবেষণা করে ডক্টর উপাধি ভূষিত হলেন ১৯১১ সালে। সংস্কৃত কাব্যের উৎস ও ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশ নামক আরও এক গ্রন্থ লিখে তিনি বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। এর পরে তিনি মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রতি উৎসাহিত হয়ে ওঠেন এবং সেই সঙ্গে তিনি তিব্বতী, চীনা ও জাপানী ভাষা আয়ত্ত করতে কোন কুণ্ঠা প্রকাশ করেন না। 'কুমারলাত ও অশ্বঘোষ' নিয়ে কিছু গবেষণা করেন। ১৯২৮ সালে ২৬শে মার্চ তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করে মারবুর্গে ভারত ও পূর্ব এশীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক রূপে কাজ করলেন। এইখানেই দীর্ঘ দশ বৎসর ধরে সম্পাদিত হল মহাযানীর সুবিখ্যাত গ্রন্থ 'সুবর্ণ-প্রভাসসূত্র'। ১৯৩৭ সালে এই গ্রন্থের সংস্কৃত সংস্করণ প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮-'৫০ তিব্বতী সংস্করণ আর ১৯৫৭ সালে চীনীয় সংস্করণের জার্মান ও তিব্বতী অনুবাদ জনসমাজে আদৃত হল। এর মধ্যেই ১৯৫৫ সালে উদ্রায়ণাবদান গ্রন্থের তিব্বতী সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। সকল গ্রন্থই গ্রন্থকারের অখণ্ড অধ্যবসায় ও অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় বহন করে। এ ছাড়া বিভিন্ন পৃথিবীবিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধের সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশি। প্রায় আশীটি ভারততত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রন্থের তিনি সমালোচনা করেছেন। একাধিকবার পরিভ্রমণ করেছেন ভারতবর্ষ, তিব্বত, নেপাল, চীন ও জাপান, মঠে-মন্দিরে, শিক্ষায়তনে, গিরি-গুহা-কন্দরে অনুসন্ধান করেছেন—পালি প্রাকৃত সংস্কৃতের মূল্যবান অপ্রকাশিত পুঁথির; বহু পরিশ্রম স্বীকার করেছেন নূতন চীনীয় ও জাপানী পুঁথির তত্ত্ব আহরণের জন্য। একাধিক কৃতী ছাত্র তাঁর সংস্পর্শে এসে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন প্রাচীন ভারতীয় সারস্বত-সাধনার বেদিমূলে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন Wilhelm Rau, (ইনি বর্তমানে গুরুর সুযোগ্য স্থলাভিষিক্ত), Kathe Neumann, Siether Lanenstein, Qurt Quecke. দীর্ঘ সাতাশ বৎসর পরে মারবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারত ও পূর্ব এশীয় বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক পদ থেকে অবসর গ্রহণ করলেন ১৯৫৫ সালে। মাত্র পাঁচ বৎসর পরে ১৯৬০ সালের ২২শে অক্টোবর তাঁর জীবনদীপ নির্বাপিত হয়েছে। জীবন-সায়াহ্নেই তিনি মারবুর্গের গৌরবগাথা প্রত্যক্ষ করেছিলেন : Geldner যে মহীরুহের বীজ বপন করেছিলেন Nobel-এর দীর্ঘ সাধনায় সে মহীরুহ নব পল্লবকুসুমে সজ্জিত হয়ে বিদ্যার্থী মিরেফকে সাদর আমন্ত্রণলিপি পাঠিয়েছে। মারবুর্গের এই সারস্বত-সাধনাবৃত সারা বিশ্বকে সচকিত করেছে। মারবুর্গের বাণী-আরাধনার প্রয়াস আজ জগদ্বিখ্যাত।

Nobel-এর কর্মবিরতির পর কিছুকাল পর্যন্ত এই বিভাগের অধ্যাপকের পদ ছিল অপূর্ণ। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে তাঁরই সুযোগ্য শিষ্য Wilhelm Rau তাঁর স্থান পূর্ণ করেছেন। বয়সে অপেক্ষাকৃত নবীন হলেও জ্ঞানপ্রবীণ Rau ইতি-মধ্যে দুইটি গ্রন্থ রচনা করে বিদ্বৎ-সমাজে যশস্বী হয়েছেন। তাঁর প্রথম সারস্বত-কীর্তি মাঘের শিশুপাল বধ মহাকাব্যের বল্লভদেবের টীকা সম্পাদিত গ্রন্থ। এটি প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫৭ সালে। এটির নাম Staat und Gesellschaft in alten Indien (প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্র ও সমাজ)। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে 'জার্মান ভারততত্ত্ববিদ' শীর্ষক আর এক গ্রন্থ তিনি প্রকাশিত করেছেন। আশা করি Justi, Geldner, Nobel প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষের উত্তর-সাধকরূপে তাঁর সারস্বত-সাধনা গৌরবোজ্জ্বল ও সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠবে। এই বিভাগটি পুরাতন ভবন (চিত্র দ্রষ্টব্য) পরিত্যাগ করে অচিরেই নবনির্মিত বিশাল অট্টালিকার এক প্রধান অংশ অধিকার করবে। তার সঙ্গে এর বিভাগীয় পাঠাগারটিও স্থানান্তরিত হবে—প্রাচীন দুর্লভ বৌদ্ধ-টঙ্ক, নেপালী অক্ষরে লিখিত সংস্কৃত অলঙ্কারের অপ্রকাশিত পুঁথি গুপ্তযুগের পোড়ামাটির মূর্তি ও মুদ্রা এ সকলই বর্তমান পুরাতন আবাস পরিত্যাগ করে নবীন ভবনে প্রবেশ করবে—ভারতীয় ভাষাচর্চা হবে আরও ব্যাপক ও সর্বতোমুখী—মারবুর্গের সারস্বত-আরাধনা হবে সার্থক ও

সংযোগ

শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
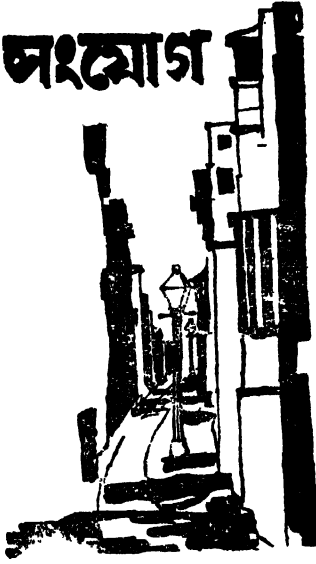
সামনের খোলা জানালাটা দিয়ে ললিতা একদৃষ্টে চেয়ে থাকে নীচের অল্পপরিসর রাস্তাটার দিকে। সন্ধ্যার আর দেরি নেই, চারিদিক ক্রমশ ঝাপসা হয়ে আসছে। দূরে ওই রাস্তাটার সঙ্গে যোগ হয়েছে একটা ছোট্ট গলি। ঠিক তার মোড়টার মাঝখানে একটা জীর্ণ কেরোসিনের ল্যাম্পপোস্ট। ওই ল্যাম্পপোস্টার দিকেই সে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। অপেক্ষা করছে কখন তাতে আলো জ্বলবে।

প্রতিদিন ঠিক এই সময়টাতেই সে তার ঘরের ওই জানলাটা খুলে দাঁড়িয়ে থাকে আলো জলার অপেক্ষায়। এটা তার নিত্য-নৈমিত্তিক কাজের মধ্যেই হয়ে গেছে। এর কোন ব্যতিক্রম নেই। তার মনে হয় ওই আলোই যেন তার প্রাণপ্রদীপ। যতক্ষণ না বাতিওয়ালা ওই ল্যাম্পপোস্টার আলো জালিয়ে দিয়ে যায় ততক্ষণ সে বিমর্ষ হয়ে একদৃষ্টে আবছা অন্ধকারের মধ্যেই চোখ দুটোকে নিবদ্ধ রাখে তার। যদিও দূর থেকে আবছাই দেখা যায় ল্যাম্পপোস্টাকে, কিন্তু আলো জললেই তার দূরত্ব যেন ললিতার কাছে বেশ কিছুটা কমে আসে। মনে হয় সে যেন খুব দূরে নয়।

ললিতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবে,—দিনের বেলা ওই ল্যাম্পপোস্টটা তার চোখে পড়লে মনে হয়: সত্যিই ওটার সঙ্গে কোন সংস্রব নেই এদিকের কারুর—তার সঙ্গেও নয়; কিন্তু দিনের আলো বিদায় নিলে রাতের অন্ধকারে ওই ল্যাম্পপোস্টাই হয় যেন তার অন্ধকারের বন্ধু। সন্ধ্যার মলিন অন্ধকারে তার হতাশা-ভারাক্রান্ত মনের আঁধারে কে যেন এক আশার আলো জালিয়ে দিয়ে যায়—ঠিক যেন তার মনে হয়, সোনার কাঠির ছোঁয়ায় ঘুমন্ত রাজকন্যা ওঠে ঘুম ভেঙ্গে।

দূর থেকে যে আগুনের পরশমণি তার প্রাণে ছুঁইয়ে দিয়ে যায় সে ওই ল্যাম্পপোস্টের বাতিওয়ালা। তার প্রতি অলক্ষ্যে প্রণাম জানায় ললিতা, গভীর কৃতজ্ঞতায় মন তার ভরে ওঠে। দেখার ইচ্ছে করে, কিন্তু অতদূর থেকে ওই আবছা অন্ধকারে তা সম্ভব হয় না। বাতিওয়ালা তার ন্যুব্জ দেহ নিয়ে মই ঘাড়ে করে অন্ধকারের মধ্যে কখন আসে সে বুঝতেই পারে না, কিন্তু যখন চলে যায় তখন সে ঠিকই বুঝতে পারে জলে-ওঠা ওই ল্যাম্পপোস্টা দেখে। এরপর ললিতার সংসারের কাজ শুরু হয়ে যায়। চারিদিকের জানলা-দরজাগুলো খুলে দেয় সে। নিজের ঘরের আলো জালিয়ে দেয়, ঠাকুরের ছবির কাছে ধূপ জ্বেলে ধরে। তারপর আলমারী থেকে লুকানো একটা রংচটা ফ্রেমে বাঁধান ফটো বের করে। একবার দেখে খানিক্ষণ চেয়ে থাকে তার দিকে,—একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে [illegible] ভেতর থেকে। তারপর সেটা হাতে করে নিয়ে জানলায় এসে দাঁড়ায়।

পশ্চিমের একঝলক হাওয়া এসে তার সুবিন্যস্ত চুলে, চোখেমুখে [illegible] পড়ে। অনেকক্ষণ চুপ করে একভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। কতক্ষণ কেটে যায় সে নিজেই বুঝতে পারে না। হঠাৎ বিনয় বাঁড়ুজ্যের বুইক গাড়ীটার হর্নের আওয়াজে তার সম্বিৎ ফিরে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গাড়ীটা এসে ঠিক জানলার নীচেই সদর দরজায় দাঁড়ায়।

ললিতা ফটোটা লুকিয়ে ফেলে, অবিন্যস্ত বেশবাস, প্রসাধন ঠিক করে নেয়। তারপর বিনয় বাঁড়ুজ্যে এসে ঢোকে ঘরের ভেতর, স্মিত-হাস্যে বলে ওঠে—কি খবর ললিতা, ভাল আছ তো?

ললিতা বলে, ভাল না থাকলেও তোমার কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই; সুতরাং ভাল না থেকে উপায় কি বল।

বিনয় বলে, তোমার সঙ্গে তর্কে সত্যিই আমি পেরে উঠি না কোন দিন; তাই আজও সে চেষ্টা করব না। তার চেয়ে আগে বরং কিছু খাবারের ব্যবস্থা কর, তারপর যা বলার হয় বোলো; তখন আর আমি কিছুতেই আপত্তি করব না।

ললিতা তির্যক-ভঙ্গীতে তার মুখের দিকে চেয়ে একট মৃদু হেসে বলে, তবুও ভাল আজ তুমি "খিদে পেয়েছে" বলে জানিয়েছ। তমি তো খিদের বদলে আগে তেষ্টা মেটাও কি না, তাই একটু আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি আজ। আচ্ছা আমি তোমার খাবার নিয়ে আসছি, তুমি চুপটি করে বসে থাক,—বলে সে রান্নাঘরের দিকে চলে যায়।

বিনয় শুধু মৃদু হাসে, তারপর চাকরকে হাঁক দেয়, বংশী।

বংশী এ ডাক ভাল করেই চেনে। তাই ঘরে ঢুকেই একটা সেলাম করে আবার বেরিয়ে যায়। কিছুক্ষণের
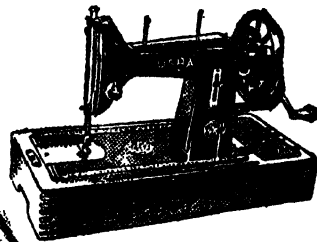
মধ্যেই ফিরে এসে বংশী টিপয়ের উপর ব্র্যাণ্ডির বোতল ও গেলাস সাজিয়ে সোডার বোতোলের ছিপিটি খুলে দিয়ে চলে যায়।

ললিতা রান্নাঘর থেকে রেকাবী সাজিয়ে নিজে হাতে খাবারগুলো নিয়ে ঘরে ঢোকে। ঢুকেই ওই অবস্থায় বিনয়কে দেখে বলে ওঠে, ও: তাই বল ----তোমার খিদে পায় নি আসলে তেষ্টাই পেয়েছে—আজ শুধু একটু নতুন করে গৌরচন্দ্রিকা করলে বোধহয়।

বিনয় বলে, ললিতা তোমার কথা-গুলো বড্ড বাঁকা বাঁকা,—দেখ খিদে আর তেষ্টা দুটোই আমার একসঙ্গেই পায়; তবে বলতে পারো তেষ্টাটা আমার একটু বেশী।

ললিতা আর কোন কথা বাড়ায় না। শুধু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে একটু দূরে সরে যায়।

বিনয় তার চলে যাওয়ার ভঙ্গী দেখে শুধু মৃদু হাসে। তারপর বোতল থেকে গেলাসে মদ ঢালতে থাকে। একের পর এক গেলাস পান করে চলে বিনয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোতলটা শেষ হয়ে যায়। নেশার ঘোরে ললিতাকে আদরের স্বরে বলতে থাকে, ললিতা আমার কাছে এস, তোমায় ভাল করে দেখি। তাকে জোর করে নিজের দুই বাহুর মধ্যে টেনে আনার চেষ্টা করে বিনয়, কিন্তু পারে না।

ললিতা শুধু নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ কিছুই করে না। কারণ সে জানে তার ইচ্ছে-অনিচ্ছে ভালোমন্দ সবকিছু বিসর্জন দিয়ে আজ সে বিনয়ের কেনা সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। তার মনোরঞ্জনের জন্যে আজ সে সব কিছুই করতে প্রস্তুত। বেঁচে থাকতে হলে এছাড়া তো আর কোন উপায় নেই। তাই সে একরকম এগিয়েই দেয় নিজেকে বিনয়ের আকাঙ্ক্ষা-উষ্ণ বাহুযুগলের আবেষ্টনে।

কিছুক্ষণের মধ্যে বিনয় একেবারে অচৈতন্য হয়ে যায়। তারপর ললিতা বংশীর সাহায্যে তাকে খাটের ওপর শুইয়ে দেয়। জোবালো আলোগুলো নিভিয়ে দেয়। সে আবার ফিরে আসে জানলার কাছে। চোখ দুটো তার সজল হয়ে ওঠে। নীচের স্বল্পালোকিত নীরব জনপথের দিকে চেয়ে সে আজ দেখতে থাকে নিজের অতীতকে। দেখে এই রাস্তাটার মতই তার জীবনটা যেন আজ গতিহীন, নিশ্চল, নিথর। দু'চোখ বেয়ে অবিরলধারায় গড়িয়ে পড়তে থাকে তপ্ত অশ্রু। ওই ঝাপসা চোখে তার ফেলে-আসা জীবনের ঘটনা-গুলো যেন ছায়াছবির মত ভেসে উঠতে থাকে তার সামনে। আজ কোথা থেকে কোথায় নেমে চলে এসেছে সে—কত-খানি ব্যবধান সেই অতীত আর এই বর্তমানে। ক'বছর আগের ঘটনা আজ তাকে কোথায় এনে ফেলেছে। ভাবতে ভাবতে সে যেন হারিয়ে ফেলে নিজেকে। তারপর তার চমক ভাঙে বেহালার করুণ সুরের আওয়াজে।

দূরে বস্তির পাগলা মাদ্রাজী বেহালা-ওয়ালা একটা রকে বসে আপন মনে তার যন্ত্রের তারে একটা গভীর দরদ-ভরা সুর হাওয়ার সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়েছে।

বেহালার আওয়াজ থেমে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে জানলা থেকে চলে আসে। গভীর রাত্রি। শুতে হয় এখন। শয্যার কাছে এসে দেখে, বিনয় অঘোরে ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকিয়ে ঘুমে আচ্ছন্ন। ঘরের একপাশে নিজের একটু জায়গা করে নেয় ললিতা।

এমনি করে রাতের পর রাত কাটে, মাস কাটে, বছরের দীর্ঘ সময়ও গড়িয়ে যায় ললিতার।

বাতিওয়ালা জীবনকেষ্টর আবি-র্ভাব হয় ওই ছোট্ট গলিটার ঠিক অন্ধ-কারে। মই কাঁধে নিয়ে ন্যুব্জ দেহধারী ওই ছোট্ট মানুষটি ঠুকঠুক করে কখন যে আসে কেউ সেদিকে নজরও রাখে না, ফিরেও চায় না। নজর পড়ে সবার তখন যখন ওই ল্যাম্পপোস্টায় আলো জ্বলে ওঠে—যখন তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়।

জীবনকেষ্টর দোমড়ান দেহটার দিকে চাইলে বেশ বোঝা যায়, চল্লিশ অনেকদিন আগেই পার হয়ে গেছে। মুখে তার খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ, কপালটা নানা সরু-মোটা রেখায় আচ্ছন্ন, গালের চোয়াল দুটো ঈষৎ একটু ভাঙ্গা। কিন্তু তার গোল গোল চোখ দুটোর আশ্চর্য চাউনি সবাইকে আকৃষ্ট করে রাখে।—এ সুন্দর প্রচ্ছন্ন চাউনি কেমন যেন মানুষকে মুগ্ধ করে। সচ-রাচর ওরকমটি যেন সবার চোখে পড়ে না।

গলি থেকে বেরিয়ে আবছা অন্ধ-কারের মধ্য দিয়ে চলতে চলতে জীবনকেষ্ট দেখতে পায় সামনেই একটা বিয়েবাড়ী। নহবতের সুরে উৎসব-মুখরিত গৃহটির দিকে একবার চেয়ে কিছুদূর গিয়ে একটা রকের ওপর বসে সে। তার কাঁধ থেকে মইটা নামায় —একটু বিশ্রাম নেয়। জীর্ণ পিরানের পকেটের মধ্যে থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরায়। বসে বসে দূরের ওই বাড়ীটার উৎসবের সঙ্গে নিজের বিয়ের রাতটাকে মিলিয়ে নিতে থাকে। মনে পড়ে যায়—তারও ঠিক এইরকম করে তার মামা বিয়ে দেন। সেদিনের সেই জীবনকৃষ্ণর সঙ্গে আজকের জীবনকেষ্ট বাতিওয়ালার কত তফাৎ। সেদিন যা সত্য ছিল, আজ তা সম্পূর্ণ মিথ্যেতে পরিণত হয়েছে। ফেলে-আসা জীবনের কয়েকটি ছেঁড়া-পাতা আজ তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

সে আজ প্রায় বছর দশেক আগের কথা। তখন সে বার্নপুরের কার-খানায় কাজ করত। ছেলেবেলায় বাবা-মাকে হারিয়েছিল জীবনকৃষ্ণ। দূর-সম্পর্কের এক অকৃতদার মামা তাকে মানুষ করেন। তাঁর কাছে থেকে সে ম্যাট্রিক পাশ করে। তারপর তার মামার সাহায্যেই বার্নপুর কারখানায় একটা চাকরিও যোগাড় হয়। কিছুদিন পর মামা তার বিয়ে দিয়েই মারা যান। তখন তার জীবন সুরু হয় স্ত্রী বঙ্কিকে নিয়ে। বঙ্কি তার রূপ-যৌবনের ডালি নিয়ে জীবনকৃষ্ণের জীবন ভরিয়ে তোলে। পরস্পরের দুর্নিবার টানে মায়া-মোহের

স্বপ্নরাজ্যে তারা ডুব দেয়—সব দিক থেকেই অনাস্বাদিত-পূর্ব জীবনের আস্বাদনে তাদের দুটির সংসার ঝলমল করে ওঠে।

কিন্তু বেশিদিন এ সুখ তাদের সহ্য হয় না। অলক্ষ্য থেকে কোন নির্মম নিয়ন্তার ইঙ্গিতে সব যেন ওলট-পালট হয়ে যায়, ধূলিসাৎ হয়ে যায় তাদের সুখের নীড়। হঠাৎ একদিন কোম্পানীর ছাঁটাই-এর কোপে পড়ে চাকরী যায় জীবনকৃষ্ণর। তার সহ-কর্মী বন্ধুরাও সব চাকরী হারায়। একে একে তারা সব চলে যায় বিভিন্ন জায়গায়। কিন্তু জীবনকৃষ্ণর যাবার আর দ্বিতীয় কোন স্থান না থাকায় তাকে সেইখানেই পড়ে থাকতে হয়। কোম্পানীর সাহেব আশ্বাস দেয়—কিছু-দিন পরে গোলমাল মিটলে তাকে আবার চাকরীতে নেওয়া হবে। কিন্তু সে আশাও কিছুদিন পর তাকে ছাড়তে হয়। বেকার হয়ে চাকরীর চেষ্টায় বহু জায়গায় ঘুরে ঘুরে কিছুই হয় না। যা কিছু সামান্য সঞ্চয় ও বহ্নির গহনা ক'খানা ছিল, তাও নিঃশেষ হয়ে যায় কয়েকদিনের মধ্যেই। এমনি করে বছর গড়িয়ে যায়। তারপর শুরু হয় অর্ধা-হার, এই নির্মম দারিদ্র্য ও অনাহারের জ্বালা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে বহ্নি একদিন ছেড়ে চলে যায় জীবনকেষ্টকে। সেদিন সে পাশের ঘরের মদন মিস্ত্রির সঙ্গে মদ খেয়েছিল। ভেবেছিল মদ খেয়ে সে মনের জ্বালা জুড়োবে। যখন নেশার ঘোরে বাড়ী ফেরে তখন বহ্নি এ নিয়ে অনুযোগ করে। আর সে সব কিছু ভুলে গিয়ে অনাহারক্লিষ্ট বহ্নিকে নির্মমভাবে প্রহার করে ও নিজেও নেশার ঘোরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যায়।

যখন তার জ্ঞান ফিরে আসে তখন সে দেখে ঘরে আর কেউ নেই, ঘর শূন্য —বহ্নি ছেড়ে চলে গেছে তাকে। শুধু লিখে রেখে গেছে একটা ছোট্ট চিঠি।

সেই ছোট্ট চিঠির ক'টা লাইন এখনও চোখের সামনে ভাসছে জীবন-কৃষ্ণর।

বহ্নি লিখে রেখে যায়—"তোমায় মুক্তি দিয়ে গেলাম, নিজেও মুক্তি পেলাম। তোমাকে ভাল করে চিনে-ছিলাম তাই তোমার দেওয়া লাঞ্ছনা আমায় আঘাত করলেও নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চাই নি। শুধু বিদায় নিলাম এই কারণে যে, আমার দুঃসহ গুরুভার থেকে তুমি লাঘব পাবে বলে। প্রণাম রইল—বহ্নি।"

সেই ফেলে-আসা জীবনের ঘটনা-গুলো আজ চোখের সামনে বারবার ঘুরে ঘুরে আসতে থাকে তার। সে শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে; চোখটা তার চকচক্ করে ওঠে। সে জানে সেই অতীত কাহিনী মনে করে আজ পুরাতন দুঃখকে নতুন করে টেনে এনে দুঃখ পাওয়া ছাড়া আর কিছু নয়। কাঁধের গামছাটা দিয়ে চোখটা মুখটা মুছে, মইটা কাঁধে তুলে সে উঠে পড়ে অন্ধকারের মধ্যে।

সন্ধ্যা হতে এখনও দেরি আছে। রোজ এই সময় ললিতা চুল বাঁধে, ফর্সা শাড়ী পরে। নিজেকে বেশ ভাল করে সাজায় আয়নার সামনে বসে। তারপর ল্যাম্পপোস্টায় আলো জ্বলার পরেই কিছুক্ষণের মধ্যে বিনয়ের গাড়ীটাকে রাস্তার বাঁকের মুখে সে দেখতে পেয়ে জানলা থেকে ঘরের মধ্যে চলে আসে।

সারাদিন এই বড় বাড়ীটার চার দেওয়ালের মাঝখানে থেকে তার বুকটা যেন হাঁপিয়ে ওঠে। কেবলই মনে হয় কখন বিকেল হবে, কখন সন্ধ্যের আলো জ্বলবে। তারপর সারাদিনের নিঃসঙ্গতার পর হবে বিনয়ের আবির্ভাব। সারাদিন অপেক্ষা করে থাকে সে এই মুহূর্তটার জন্যে। এই মিটমিটে ল্যাম্পপোস্টার আলো জ্বলার প্রতীক্ষায়।

প্রতিদিনের মত আজও সে দাঁড়িয়ে আছে জানলাটায়। দূর থেকে বেহালার সুর তার কানে এসে লাগছে। মাদ্রাজী বেহালাওয়ালা এই দিকেই যেন আসছে। সে দেখতে পায় দূরে একটা বাড়ীর রকে বেহালাওয়ালা এসে বসে আপন মনে একটা দরদভরা গভীর সুর বাজিয়ে চলে।

জানলায় দাঁড়িয়ে সে একমনে শুনতে থাকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ল্যাম্পপোস্টার আলোটা দপ্ করে জ্বলে ওঠে, তার সম্বিৎ ফিরে আসে। সে উঠে পড়ে দৈনন্দিন কাজের তাড়ায়। এতক্ষণ সে যেন সব ভুলেই গিয়েছিল, আলোর সঙ্কেত তাকে মনে করিয়ে দেয় তার নিত্যকার কর্তব্যগুলি।

সে ঘরের জানলা-দরজাগুলি খুলে আলো জ্বালিয়ে দেয়। ঠাকুরের ছবিতে ধূপ জ্বালিয়ে দেয়। তারপর সেই রংচটা জীর্ণ ফটোটা বের করে আলমারি থেকে। এখনও বেহালার সুর ভেসে চলেছে, আরো খাদে নেমে চলেছে যেন তার সেই সুরের মূর্ছনা। ললিতা ফটোটা হাতে করে ফিরে দাঁড়ায় আবার সেই জানলায়। দেখতে পায় বেহালা-ওয়ালাকে ঘিরে অনেক লোক জমেছে, সবাই তার সুরের স্বপ্নজালে যেন আটকে পড়েছে। ললিতাও তন্ময় হয়ে যায়। সময় যে কোথা দিয়ে কেটে যায় সে তা বুঝতেই পারে না।

বেহালাওয়ালা যখন তার বাজনা শেষ করে তখন চারিদিক বেশ অন্ধকার। বাজনা শুনতে শুনতে বাতিওয়ালাও ভুলে যায় তার বাকী কাজের কথা। সে উঠে পড়ে তার মইটা কাঁধে তুলে। রাস্তা পার হতে গিয়ে হঠাৎ তার সামনে ঠক্ করে কি যেন একটা ওপর থেকে এসে পড়ে। সে সেটা তুলে নেয়, আলোর দিকে একটু এগিয়ে এসে দেখে—দেখে চিৎকার করে ওঠে, তার মাথাটা ঘুরে যায়। এমন সময় বিনয়ের বুইক গাড়ীটা বাঁকের মুখ থেকে দৈত্যের মত বেরিয়ে তার সামনে এসে পড়ে। বিনয় প্রাণপণ শক্তিতে ব্রেক কষতে থাকে, কিন্তু গাড়ীটা হুড়মুড় করে তার ওপরেই এসে পড়ে। আর সে ছিটকে পড়ে যায় রাস্তার একপাশে। মুহূর্তের মধ্যে যেন একটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়।

ললিতার হাত থেকে কখন যে ফটোটা অলক্ষ্যে পড়ে যায় তা সে

বিনয়ের গাড়ীটাকে এ্যাকসিডেণ্ট করতে দেখে চিৎকার করে ওঠে। তারপর একটা বিরাট গণ্ডগোল শুরু হয় চারিদিকে। বিনয় গাড়ী থেকে নেমে রাস্তার কয়েকজন লোকের সাহায্যে বাতিওয়ালার রক্তাক্ত দেহটাকে গাড়ীতে তুলে নিয়ে হাসপাতালের দিকে ছোটে।

তারপর সেখানে আহত বাতি-ওয়ালার চিকিৎসার সমস্ত ব্যবস্থা করে ফিরে আসতে তার অনেক রাত হয়ে যায়। ললিতাও ব্যাকুল প্রতীক্ষায় ছট্‌ফট করতে থাকে। সে ফিরে আসতেই ললিতা জিজ্ঞেস করে—কি খবর? মৃদুহেসে বিনয় বলে, খবর খারাপ হলে কি আমি এত সহজে ছাড়া পেয়ে তোমার কাছে ফিরে আসতে পারতাম?

ললিতা অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বলে ওঠে, কি গো বাতিওয়ালা বাঁচবে তো?

সে বলে, হ্যাঁগো হ্যাঁ, আঘাতটা খুব বেশী নয়; আমার নতুন ব্রেকটাই ওকে নিশ্চিত মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছে, আর আমাকেও রাস্তার লোক আর পুলিশের হাত থেকে বাঁচিয়েছে।

ললিতা বলে, সত্যি বলছ না মিথ্যে আশ্বাস দিচ্ছ? —আমার গা ছুঁয়ে বল দেখি—বলে সে তার কাছে এগিয়ে যায়।

বিনয় একটু হেসে ললিতার হাতটা ধরে বলে,—এই তোমায় ছুঁয়ে বলছি সে সত্যিই বেঁচে গেছে। আমার বন্ধু হাসপাতালের চীফ সার্জেন বলেছে যে, আঘাতটা খুব সামান্যই এবং দু-এক-দিনের মধ্যেই তাকে সেখান থেকে ছেড়ে দেবে।

বিনয়ের কথায় ললিতা যেন একটু স্বস্তি বোধ করে। মনে মনে সে ভগ-বানকে বার বার স্মরণ করতে থাকে। তারপর শান্ত হয়ে সে বিনয়ের পাশে এসে বসে।

বিনয় বলে, আজ যা শরীরের উপর দিয়ে গেল—বড্ড ক্লান্তি বোধ করছি। একবার বংশীকে ডাকো তো —একটু চাঙ্গা হয়ে নিই। ললিতা চুপ করে থাকে, পরে আবার বলে ওঠে, আজ যদি বাতিওয়ালার কিছু হ'ত--- তাহলে ওর সংসার বৌ ছেলেপিলের কি হ'ত বলত?

বিনয় বলে, এরকম তো রাস্তায় রোজই হচ্ছে, এ নিয়ে ভেবে কোন লাভ নেই। বিনয় আরো বলে, বাতিওয়ালা লোকটা সত্যিই ভাল। হাসপাতালে তার জ্ঞান ফিরে আসতেই পুলিশ জিজ্ঞেস করে সে কেমন করে চাপা পড়ে। বাতিওয়ালা বলে, যিনি গাড়ী চালাচ্ছিলেন তার কোন দোষ নেই। সে রাস্তা পার হবার সময় ফটো কুড়িয়ে পায়, সেটা হাতে তুলে ধরতেই তার মাথাটা ঘুরে যায় আর সে গাড়ীর সামনে গিয়ে পড়ে। বলতে বলতে সে চিৎকার করে ওঠে, পুলিশের লোকটির হাত দুটো ধরে করুণ আবেগে জিজ্ঞেস করতে থাকে—সেই ফ[illegible] কোথায়?—ওটা আমায় ফিরিয়ে দিন- এতদিন ওটা হারিয়ে গিয়েছিল- ওটা ফিরিয়ে দিন; ওটা আমার বহ্নির বিয়ের ফটো।

বিনয়ের শেষ কথাগুলো ললিতা[illegible] কান যেন বিদীর্ণ করে ফেলতে[illegible] মাথার ভেতর যেন হঠাৎ একটা বিদ্[illegible] প্রবাহ ছুটোছুটি করতে থাকে, স[illegible] উপশিরায় প্রবল রক্তস্রোত সঞ্চা[illegible] থাকে। সে দাঁত দিয়ে তার পা[illegible] ঠোঁটটাকে চেপে ধরে নিজেকে কো[illegible] রকমে সামলে নিয়ে 'আসছি বলে' ঘ[illegible] থেকে বেরিয়ে যায়। বেরিয়ে গি[illegible] রান্নাঘরের অন্ধকারে আছড়ে প[illegible] তার এই অভাবনীয় পরিবর্তন [illegible] চোখে পড়ে কি না [illegible] কারণ তার হাতে [illegible] বোতল।

ললিতার দু'চোখ বেয়ে নেমে আ[illegible] অবিরল ধারায় তপ্ত অশ্রু। দুটো [illegible] দিয়ে মুখটাকে চেপে ধরে অন্ধকারে মাঝে চুপ করে পড়ে থাকে সে।

শুধু তার মাথার মাঝখানে জীব[illegible] নামটা বার বার ঘুরপাক খেতে থাকে

আজ সে বুঝতে পারে একদি[illegible] যাকে সে স্বেচ্ছায় হারিয়েছিল আ[illegible] তাকে খুঁজে পেয়েছে সে, কিন্তু তা[illegible] ফিরে পাবার আর কোন উপায় নেই আজ এই পাওয়ার মধ্যে নিজেই নিজে[illegible] সে হারিয়ে ফেলে।

এসো

লাবণ্য পালিত

এসো আমার গানের সুরে
দুখের আকাশ ছেয়ে,
দিনের শেষে বলবো কি আর
ব্যথার কাঁদন গেয়ে...

অন্ধকারে রূপের মায়ায়
আমার গোপন অশ্রু ধারায়
দেওয়া নেওয়ার বাঁধন হোল
গানের তরি বেয়ে...।

দুখের আকাশ ছেয়ে॥

চাঁদিনী রাত থাক্‌না দূরে
আমার হৃদয় হ'তে।
দুখের ঝড়ে ভাস্‌বো একা
অমানিশার স্রোতে...।

এই জীবনের ব্যর্থ আশা...
বল্‌বো কারে সে কোন ভাষা,
আসবে কবে ওপার থেকে
আমার গানটি চেয়ে...
আমার পারের নেয়ে?

॥ বারো ॥

পিকটন নিশ্চয়ই অত সহজে অব্যাহতি দিতেন না, আকস্মিক অঘটনের এই অ…প্রত্যাশিততা ও বিস্ময়ের ঘোর কাটলেই হয়ত আবার নিজের পৈশাচিক সঙ্কল্পের সূত্র ধরতেন—কিন্তু এ যাত্রা বিধাতাই রক্ষা করলেন করণকে। সেই রাত্রেই ওপরতলার হুকুমে এখানকার ছাউনি তোলাতে হ'ল। প্রতিশোধ-স্পৃহা কিম্বা যেই কোন প্রবৃত্তিটাই চরিতার্থ করার সুযোগ পেলেন না। অবশ্য তাতে খুব ক্ষতিও হ'ল না তাঁর, কারণ শিকার তাঁর জালের মধ্যেই রইল, একসঙ্গেই চলল তাঁর। সময় ও সুযোগমতো নির্যাতন করার কোন অসুবিধা হবে না। …এর কার্যসিদ্ধির আগে করণকে চিরদিনের মতো হাতছাড়া করা তাঁর আদৌ অভিপ্রেত ছিল না।

…এবার ঘাঁটি ছাড়তে হবে—এ গুজব বহুদিন থেকেই শুনছিল করণ সিং। কাবুলীদের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে, ইংরেজ বাহিনী এর নীচে নামে না। জেনারেল কখনও কখনও তাঁর অধস্তন অফিসারদের সঙ্গে যুক্তি করেন—কিন্তু সেক্ষেত্রেও আমন্ত্রিত অফিসারদের পদবী ব্রিগেডিয়ার অবধি এসেই থেমে যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অতও নামে না।

সুতরাং করণ সিংয়ের মতো চুনোপুঁটির পক্ষে সুদূর ও অস্পষ্ট গুজব ছাড়া কিছু জানা কি শোনা সম্ভব নয়। তবে কিছুদিন ধরে কুচ-কাওয়াজের সময় যেভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সঙ্গীন বন্দুকের সাজ্জাঘষায় যে পরিমাণ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে তাতেই সে অনুমান করেছিল যে, গুজবের মধ্যে কিছু সত্য আছে। তবু রওনা হবার হুকুমটা যে এমন আকস্মিক-ভাবে আসবে এবং সে হুকুম যে তদ্দণ্ডেই পালন করতে হবে তা একবারও ভাবে নি করণ। এ সম্বন্ধে তার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না, আশ-পাশে যারা আছে, তারাও ফৌজী কানুনের কথা লোকমুখে শুনেছে মাত্র—লড়াই বাধলে ঠিক কি অবস্থা হয় কারুরই জানা নেই।

কওয়াজে একেবারেই অনভ্যস্ত সে, তার অত্যন্ত কষ্ট হয়। এক এক সময় বিশেষত পাহাড়ীপথে চড়াইয়ের সময় মনে হয় বুকটা ফেটে যাবে।

কিন্তু এতেও পিকটনের সাধ মেটে নি। করণের এক সঙ্গী বেলা সিং তিন চার দিন পরেই হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল—প্রবল জ্বর, সঙ্গে যে চিকিৎসক ছিলেন তিনি সন্দেহ করলেন বুকে সর্দি বসেছে, অবস্থা বেশ খারাপ, নিঃশ্বাস নিতেই কষ্ট হচ্ছে বেচারার। এ ক্ষেত্রে তখনই তাকে ফেরত পাঠানো উচিত ছিল; এ কাজের জন্যে কয়েকটা খাটুলিও থাকে প্রত্যেক দলের সঙ্গে—যাতে প্রয়োজন-মতো সেগুলো লাঠিতে বেঁধে ডুলির কাজে লাগানো যায়। এ সব রোগী বোধহয়েই সঙ্গে নিয়ে যাওয়া উচিত নয়, কারণ পেশোয়ারের পশ্চিমে কোন দাওয়াইখানা, 'হস-পিটল' বা চিকিৎসালয় নেই, পেশোয়ারের ব্যবস্থাও এমন কিছু ভাল নয়, পর্যাপ্ত তো নয়ই। কিন্তু পিকটন সাহেব তাঁর ওপরওলাদের কী

পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ গজেন্দ্রকুমার মিত্র

…স্থান মুলুকে ঢুকে পড়েছে—ভেরা গাজী খাঁ থেকে এদের বিভিন্ন দল বিভিন্ন দিকে এগোবার চেষ্টা করছে—বর্তমান লক্ষ্য জালালাবাদ, তারপর প্রয়োজন হয়তো কাবুল পর্যন্ত এগিয়ে যাবে। যারা এর মধ্যে জামরুদ বা তার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছিল তারা সব আগের দিকে চলে গেছে—এখন অবিলম্বে তাদের স্থান পূর্ণ করা দরকার, যাতে ইংরেজ ফৌজের অগ্রগতি অব্যাহত থাকে, কোথাও ছেদ না পড়ে বা অগ্রগামী বাহিনীর পিছন দিক থেকে না দুশমন আক্রমণ করতে পারে।

কিন্তু তবু এ সব শোনা কথাই হয়েছিল স্বভাবতঃ। সেনানায়কদের কাছে যে খবর থাকে তা ছাউনির ব্যারাক পর্যন্ত পৌঁছয় না। …শ্রেণীর কোম্পানীরাও সব খবর পান না। …জেনারেল ঠিক করেন বা সমর দপ্তর থেকে তার কাছে যে হুকুম এসে পৌঁছয় তা নামতে নামতে বড়জোর লেফটেনান্ট জেনারেল মেজর জেনারেল হয়ে ব্রিগেডিয়ার পর্যন্ত পৌঁছয়—

অভিজ্ঞতা যেমন অভাবনীয় তেমনি কষ্টকর —রাতারাতিই ডেরাডাণ্ডা তুলে—দু' তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সব গুছিয়ে ও বুঝে নিয়ে শেষ রাত্রে রওনা হতে হয়েছে। তারপর সুরু হয়েছে এই অবিরাম পথ চলা—"মারচ করা"—দেশী সিপাহীদের ভাষায়। এর মধ্যে আর কিছু করতে না পারুন পিকটন একটি কাজ করেছেন। রিসালদার থেকে পদাতিক বাহিনীতে নামিয়ে দিয়েছেন ওকে, সাধারণ অশিক্ষিত গাঁওয়ার সিপাহীদের সঙ্গে হাঁটা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই ওর। তাতেও অত দুঃখ ছিল না করণের—যদি আবহাওয়াটা অনুকূল হত। দিনে প্রখর রৌদ্র, রাত্রে প্রচণ্ড শীত। হাত-পা জমে যায় একেবারে। তার ওপর নিজের হাতিয়ার বন্দুকগুলি বারুদ তো বটেই—নিজস্ব মালপত্রের বোঝাও নিজেকে বইতে হয়। রাজপুত্র না হলেও করণ সিং রাজ-পুত্রের মতোই মানুষ হয়েছে—এমনি ব্যায়াম চর্চা বা শাস্ত্রচর্চা যতই করুক, মুটের মতো বোঝা

বোঝালেন কে জানে, হুকুম হ'ল—বেলা সিংকে ডুলিতে শুইয়ে সঙ্গেই নিয়ে যাওয়া হবে। ডুলি বইবে করণ সিং আর আকিল সিং। শুধু বেলা সিংকেই নয়—তার মালও বইতে হবে বলা বাহুল্য, তার মানে আর একটি গুরুভার থলি ও বন্দুকগুলির মালা।

আকিল সিং-এর অবশ্য এটা প্রাপ্য। ফৌজী আইনে কোন গর্হিত অপরাধ করলে তাকে এইভাবেই খাটানোর নীতি আছে। আকিল ইতিপূর্বে দুটো অপরাধের জন্য ঠাণ্ডি গারদে ছিল, কিছু কিছু 'জুরমানা' মেহনৎ ও করেছে। এই সম্প্রতি ও আর একটা কি করেছে, বোধ হয় কোন সুবাদার কি জমাদার সাহেবের মোজা বা ঐ ধরণের কোন জিনিষ চুরি ক'রে হাতেনাতে ধরা পড়েছে। সুতরাং তার ওপর এ হুকুম জারিটা হয়ত এমন কিছু অন্যায় হয় নি কিন্তু করণ সিং-এর কি অপরাধ —তার ওপর কেন এ পীড়ন তা সে নিজে—ন।

করবারও কিছু নেই, ফৌজী আইনে কৈফিয়ৎ চাওয়ার রীতি নেই—হুকুমই যথেষ্ট। এখানে ছুটে গিয়ে আগুনে ঝাঁপ দিতে বললেও কারণ জিজ্ঞাসা করা চলে না, আগুনেই ঝাঁপ দিতে হয়।

অগত্যা করণকেও সেই ডুলির অপর প্রান্ত কাঁধে তুলে নিতে হ'ল। বেলা সিং দীর্ঘ ব্যক্তি নয়, মাংস যত না থাক, চওড়া হাড়ে ওজন পুষিয়ে গেছে। তার ওপর ঐ মিলিটারী থলি ও বন্দুকের বোঝা। নিজের বোঝাই যার কাছে দুঃসহ, তার কাঁধে আরও তিনগুণ অতিরিক্ত বোঝা চাপল। বোঝার ওপর শাকের আঁটি নয়, বোঝার ওপর আরও বড় বোঝাই চাপল, গোটাকতক ধরতে গেলে।

দিন দুই দাঁতে দাঁত চেপে তাও সহ্য করল করণ। তার স্বাস্থ্য ভাল বলেই বোধ হয়—এবং ব্যায়াম করা শরীর বলে একেবারে ভেঙ্গে পড়ল না। আরও কতদিন এমনি বইতে হত কে জানে, হয়ত পথের ধারে মুখ থুবড়ে না-পড়া পর্যন্ত অব্যাহতি মিলত না। ইতি-মধ্যে পিকটনের তরফ থেকে সন্ধির প্রস্তাব এসেছিল, চৌকন সিং এসে—বিশ্রামের সময় পাশে শুয়ে চুপিচুপি জানিয়েছিল যে, সাহেব এখনও তার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করতে রাজী আছেন—চাই কি এখনও তার ঘোড়া ফিরিয়ে তাকে পায়ে চলার দায় থেকে অব্যাহতি দিতে পারেন, দিনকতকের মধ্যে একটা হাবিলদারী জোটাও বিচিত্র না—যদি করণ সিং সাহেবকে বিশ্বাস করে চৌকন সিং হাবেলী ছাড়াছাড়া করতে রাজী থাকে। তার আনাও নষ্টিত করতে চান না সাহেব, যা দাম হবে তার ঠিক অর্ধেকটা উনি টাকাদের সঙ্গে বুঝিয়ে দেবেন করণকে। এমন সুযোগ ছেড়ে দেওয়া নেহাত বোকামি আহাম্মকি হচ্ছে করণের। ইত্যাদি—এই একই কথায় একই উত্তর দিতে দিতে করণ ক্লান্ত, তা ছাড়া সত্যিকথা এরা কেউ বিশ্বাসও করবে না—মিছিমিছি কতকগুলো কথা খরচ করে লাভ কি, সে শুধু নীরবে একটু হেসেছিল চৌকনের কথার জবাবে। বেদনা ও কৌতুকে মেশা সে হাসির অর্থ চৌকন এবং পিকটন দুজনেই ভুল বুঝেছিলেন। তাকে তাচ্ছিল্যের হাসি মনে করেছিলেন। ফলে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিল পিকটনের দৃষ্টি, বিদ্বেষ গিয়েছিল আরও বেড়ে। নির্যাতনের মাত্রাটাও অতঃপর সেই অনুপাতেই বেড়ে যেত, সত্যি সত্যিই হয়ত পথে পড়ে মরতে হত করণকে—যদি না একদিন দৈবাৎ আর এক অফিসারের চোখে পড়ে যেত এই ডুলিবহনের দৃশ্যটা।

সবটাই দৈবের যোগাযোগ। নইলে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জেনকিন্সই বা সেদিন ঐ পথে আসবেন কেন। পিছনেই তো ছিলেন তিনি। পিছনেই থাকতেন—যদি না সহসা মালিক কালু খাঁ বারাকজাই এসে তাঁকে অতি প্রয়োজনীয় একটা সংবাদ দিত শত্রুপক্ষের গতিবিধির। কালু খাঁ তাদের অনুগত, বন্ধুস্থানীয়—তবু এদেশী কাউকেই যাচাই না করে বিশ্বাস না করবার যে নির্দেশ তিনি পেয়েছেন সমর দপ্তর থেকে, নিজেও যতটা চিনেছেন এঁদের—সেই অনুসারেই তথ্যটার সত্য মিথ্যা যাচাই করবার জন্য কালু খাঁকে সঙ্গে নিয়ে অগ্রগামী সৈন্যদলকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন জেনকিন্স।

আর জেনকিন্সই একমাত্র অফিসার এ দলে—পিকটন যাঁকে যমের মতো, ভয় করেন। তার কারণ জেনকিন্স অত্যন্ত রাশভারী আর কড়া মেজাজের লোক, অন্যায় অবিচার—বিশেষ ক'রে তা যদি কোন সিপাহী বা ঐ শ্রেণীর লোকের ওপর করা হয়—একেবারেই বরদাস্ত করেন না। সহজে কিছু ভোলেনও না, হুকুম দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকেন না—তা তামিল হ'ল কি না শেষ অবধি সে খবর রাখেন। কী হুকুম দিয়েছিলেন এবং কবে—এক বছর পরেও তা নির্ভুল মনে থাকে। মাত্র বছর দুই আগেই পিকটন ছ' মাসের জন্য জেনকিন্স-এর সঙ্গে কাজ করেছিলেন—ওঁর প্রত্যক্ষ অধীনে—সেইটুকু সময়ের মধ্যেই নির্দেশ পালনে গাফি-লতি ও অধস্তন কর্মচারীদের প্রতি অসদ্ব্যবহারের জন্য বার দুই তিন ধমক খেয়েছেন। একবার তো শাস্তি দিতেই উদ্যত হয়েছিলেন জেনকিন্স, অতি কষ্টে ওঁর মেমের বলতে গেলে হাতেপায়ে ধরে পরিত্রাণ পেয়েছিলেন পিকটন। সেই থেকেই এই ওপরওয়ালাটিকে প্রাণপণে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেন, আর ইনিও, পিকটন কোথাও আছেন দেখলেই চারিদিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখেন।

সেদিনও পিকটনই এই বিশেষ দলটির অধিনায়ক জেনে—ভাল ক'রে তাকাতে তাকাতেই যাচ্ছিলেন জেনকিন্স আর তাইতেই বেলা সিং-এর ডুলিটা নজরে পড়ে গেল তাঁর। করণ সিং নীরবে ও নিঃশব্দে ডুলি বহন করছিল কিন্তু তার গতি দেখেই বোঝা যায় যে, সহ্যের শেষ সীমায় এসে পড়েছে সে। তাতেও হয়ত অতটা বিচলিত হতেন না জেনকিন্স—যদি না পাশ দিয়ে যাবার সময় ওদের ঘোড়ার পায়ের শব্দে চোখ তুলে তাকাত করণ। সেই একলহ-মাতেই জেনকিন্স যেটুকু দেখলেন তাইতেই বুঝতে পারলেন যে, এই তরুণটির শিক্ষাদীক্ষা ও জন্মপরিচয় আশপাশের এই সমস্ত সিপাহী-দের থেকে স্বতন্ত্র ও উন্নত। চোখের চাহনি ক্লান্ত ও করুণ—কিন্তু তাও সাধারণ অশিক্ষিত গ্রাম্য লোকের মতো নয়, রীতিমতো আভি-জাত্যেরই পরিচয় পাওয়া যায় সে দৃষ্টি থেকে। আরও বুঝলেন, ওর সঙ্গের বাহকটির মতো যদি সাধারণ ঘরের ছেলেই হত তাহলে এই বোঝা বইতেই এতটা ক্লান্ত হয়ে পড়ত না। কখনই বোঝা বওয়া অভ্যাস ছিল না ওর—সম্ভবত হাঁটাও তাই। জেনকিন্স-এর অভ্যস্ত চোখ ও পা ফেলার ভঙ্গী দেখেই সেটা বুঝে নিল।

থমকে দাঁড়ালেন জেনকিন্স। কালু খাঁকে একটু দূরে গিয়ে তাঁর জন্য অপেক্ষা করবার নির্দেশ দিয়ে পথের একপাশে পাহাড়ের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ডুলি নামাবার হুকুম দিলেন।

সকলেই সচকিত হয়ে উঠল। কৌতূহলীও। কিন্তু মার্চ-এর মধ্যে থামবার উপায় নেই, ওপরতলার হুকুম না হলে নয় অন্তত। থামল শুধু করণ ও আকিল সিং, তারাও ডুলিটা পথের একপ্রান্তে একটা কাঁটা গাছের সামান্য ছায়া দেখে নামিয়ে রেখে ব্রিগেডিয়ার জেনা-রেলকে স্যালিউট করে দাঁড়াল।

জেনকিন্স তর্জনীর ইঙ্গিতে করণকে আর একটু কাছে ডাকলেন। প্রথমেই মাত্র পাঁচ সাতটি প্রশ্নে বেলা সিং-এর ব্যাপারটা জেনে নিলেন। তারপর করণকে নিয়ে পড়লেন। সে কোথা থেকে এসেছে, কী পরিচয়, কেন এসেছে, এখানে ঢুকল কি করে—পিকটনের সঙ্গে যোগাযোগ হ'ল কী ভাবে, ঘোড়া চড়তে জানে কি না—ইত্যাদি সমস্ত তথ্য খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানলেন। শুনলেনও সমস্ত ধৈর্য ধরে। তারপর একটু মুচকি হেসে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার ওপর পিকটনের এত আক্রোশের কারণ কি?'

ঠিক এ প্রশ্নটার জন্য তৈরী ছিল না করণ। জেনকিন্স-এর প্রশ্নের উত্তরে সে অনেক কথা, প্রায় সব কিছুই বলেছে—কিন্তু সে সবই তার নিজের কথা—পিকটনের উপর দোষ আসে এমন কথা একটাও বলে নি। তবে কি কোন অসতর্ক মুহূর্তে তার রসনা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল? সে তো একখাটা বলতে চায় নি। লোকটা যত অবিচারই করে থাক—সে তার ওপরওয়ালা; শুধু তাই নয়, লোভে হোক আর যে কারণেই হোক, চরম বিপদের দিনে—যখন উপবাসের ও মৃত্যুর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তখন ঐ লোকটাই তাকে এ চাকরিটুকু ক'রে দিয়েছে। ওর নামে চুকলি সে খাবে না কোনমতেই।

করণ মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল। কিন্তু তার সুগৌর ললাটের রক্তোচ্ছ্বাস ও মুহূর্তে জমে-ওঠা স্বেদবিন্দুর দিকে তাকিয়ে জেনকিন্স বুঝতে পারলেন যে, তাঁর প্রশ্ন নির্ঘাৎ সত্যে পৌঁছেছে। তিনি অপেক্ষাকৃত কোমল কণ্ঠে, অভয়ের সুরে বললেন, 'ভয় নেই, তুমি নির্ভয়ে সত্য বলতে পারো। পিকটন যাতে তোমার কোন অনিষ্ট করতে না পারে আমি তার জামীন রইলুম।'

এবার করণ কথা কইল। বলল, 'হুজুর পিকটন সাহেব দয়া ক'রে আমাকে চাকরি দিয়েছেন। পরম উপকারী তিনি। যদি তিনি কোন কঠোর ব্যবহার করেই থাকেন তো নিশ্চয়তার কোন কারণ আছে মনে করেই করেছেন। পিকটন যে অফিসার হিসেবে যোগ্য ব্যক্তি তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমারই অদৃষ্টের দোষ---আমি তাঁর সুনজরে পড়তে পারিনি। সে জন্যে আমি অপর কাউকে দায়ী করতে চাই না।'

নীরব প্রশংসায় জেন্‌কিন্স-এর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু সে প্রসঙ্গ নিয়ে পীড়াপীড়ি করলেন না আর। ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা তোমার কাছে কি কোন মূল্যবান জিনিস আছে---অর্থের দিক থেকে মূল্যবান? বেশ দামী কোন জিনিস? অথবা কোন গুপ্তধনের সন্ধান জানো তুমি---এমন ভাববার কোন কারণ আছে?'

আরও লাল হয়ে উঠল করণ, আরও বিব্রত। ঘাড় না হেলিয়ে মাথা বেশী হেঁট করা যায় না, আর জঙ্গী কানুনে অফিসারের সামনে দাঁড়িয়ে ঘাড় নোয়ানো নিষিদ্ধ। তাই মাথা আর হেঁট করতে পারল না, সেই অবস্থাতেই---যতটা সম্ভব মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে বলল, 'একটা কিস্‌সা কী করে রটে গেছে যে আমি রিকাবগড় থেকে সেখানকার রাজকীয় জহরৎ চুরি ক'রে পালিয়ে এসেছি। একটা---একটা বহু মূল্যবান হীরে আছে আমার সঙ্গে---'

'কথাটা কি সত্যি?' তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণতর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন জেনকিন্স।

এবার তাঁর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল করণ। স্থির দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'না, সত্য নয়। অতি সামান্য কিছু অর্থ---কয়েকটা টাকা ছাড়া রিকাবগড় থেকে কিছুই আনি নি। সেও আমার নিজস্ব টাকা। আর সে এতোই সামান্য যে ফৌজে চাকরি নেবার আগেই তার শেষ কপর্দকও খরচ হয়ে গিয়েছে। সেদিন চাকরি না পেলে আমাকে উপোস করতে হ'ত।'

'I thought as much' জেনকিন্স হেসে বললেন, 'এরা প্রচণ্ড আহাম্মক---সব কটা a pack of fools---তাই রটনাটা এত সহজে বিশ্বাস করেছে। তুমি যে চুরি করে পালিয়ে আসো নি, সে তোমার মুখের দিকে চেয়েই আমি বলে দিতে পারতুম। তোমাকে জিজ্ঞাসা করার আগেই উত্তরটি আমি জানতুম। চুরি সবাই করতে পারে না---যারা পারে না তুমি তাদের দলের মানুষ। এ একটা obvious সত্য। কিন্তু পিকটন, খুব দুঃখের সঙ্গেই স্বীকার করতে হচ্ছে, দুঃখের সঙ্গে কারণ এ আমাদেরও কলঙ্ক একটা---পিকটন বড় বেশী লোভী। ওকে আমি জানি অর্থের লোভে ওর হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সেই জন্যেই এত বড় ভুলটা করল, টাকার নামটা শুনেই ক্ষেপে উঠেছে; নইলে মানুষ ও কারও চেয়ে কম চেনে না। খালিচোখে আমরা যা দেখতে পাচ্ছি, লোভের পরকলা চোখে পরেছে বলে ও তা দেখতে পাচ্ছে না। however তোমার সঙ্গে এ ব্যবহারের অর্থটা এবার আমার কাছে সরল হয়ে গেল। তুমি যাও, ডুলি নিয়ে এগোও তারপর যা করবার আমি করছি।'---

খুব যে একটা আশ্বস্ত হল করণ তা নয়। বরং দুশ্চিন্তা কিছু বেড়েই গেল আরও। জেন্‌কিন্স পিকটনের চেয়ে অনেক বড়---কিন্তু সেই জন্যেই অনেক দূর। পিকটন একেবারে কাছের লোক। ছোটবেলায় দেওয়ান দুর্গাদাসজীর কাছে শুনেছে সে যে সূর্য ভগবান চাঁদের চেয়ে অনেক বড়, অনেক বেশী তেজী। কিন্তু তিনি অনেক দূরে আর চাঁদ ঢের কাছে থাকেন বলে দুজনেরই আকৃতি জমিন থেকে সমান মাপের মনে হয়। কাছাকাছি থাকেন বলে দুনিয়ার ওপর প্রভাবও চাঁদেরই বেশী। একাদশী অমাবস্যা পূর্ণিমায় মানুষের শরীর ভারী হয়। সাগরে বান ডাকে, জোয়ার জাগে। ---পিকটনও তাদের কাছের মানুষ, তার সঙ্গেই ঘর করতে হবে। হঠাৎ কী করে জেনকিন্স-এর নজর পড়ে গেছে তার অবস্থার দিকে, তাই একটু সহানুভূতি দেখাচ্ছেন, দুদিন পরে মনেও থাকবে না। মাঝখান থেকে এ লোকটা দারুণ চটে থাকবে, হয়ত বা ভাববে করণই চুকলি খেয়েছে। কিম্বা নালিশ করেছে।

তবে সে যাই হোক, এ ক্ষেত্রে তার কিছু করবারও নেই। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। জেনকিন্সকে একথা বলা যায় না যে, তুমি আমার উপকার করো না। কী করবেন তিনি, কতটুকু করবেন তাও সে জানে না। প্রশ্ন করবারও অধিকার নেই, সুতরাং ভাগ্যকে তার নিজের পথে চলতে দেওয়া ছাড়া কোন উপায়ও নেই। ---তা ছাড়া, সে আর পারছেও না, সত্যিই অসম্ভব হয়ে পড়ছে এই কষ্ট সহ্য করা। যদি ক'টা দিনও একটু রেহাই পায় তো সেইটুকুই তার লাভ। ভবিষ্যৎ বলে তার আর কিছু নেই, জিন্দিগী শব্দটাই তার কাছে এখন অর্থহীন। যে দিনটা বাঁচছে সেই দিনটারই অস্তিত্ব বোঝে সে, তার বেশী কিছু জানে না, জানার প্রয়োজনও নেই।

সুতরাং কিছুই বলা হল না, সাহেবকে স্যালিউট ক'রে পিছিয়ে এসে ধীরে ধীরে আবার সে বেলা সিংয়ের ডুলি কাঁধে করল।

আকিল সিং এতক্ষণ ভয়ে বিস্ময়ে চোখ দুটো বড় বড় করে চেয়েছিল ওদের দিকে। খোদ 'বিরগিডিয়ার জানরেল' এত লোক থাকতে এই নালায়েক বেওকুফ লৌণ্ডাকে পথে দাঁড় করিয়ে কী এত বাতচিত্ত করছিলেন? তবে কি আকিলের সম্বন্ধেই কিছু খবর নিচ্ছেন। ওঁর কানে পর্যন্ত পৌঁছেচে নাকি তার কু-কীর্তির কথা। কী সর্বনাশ। তাহলে তো আর রক্ষা থাকবে না তার।

শেষের দিকে ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছিল সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

করণ সিং কাছে আসতেই তাই সাগ্রহে প্রশ্ন করল, 'কী হ'ল? কী বললেন ভাই করণ সিংজী---জানরেল সাহাব? এত কি সলা-পরামর্শ করলেন তোমার সঙ্গে এই একপ্রহর ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে---?'

এত দুঃখের মধ্যেও হঠাৎ একটা দুষ্টবুদ্ধি পেয়ে বসল করণকে। সে মুখখানাকে যতদূর সম্ভব গম্ভীর করে বলল, 'খুব জরুরী সলার জন্যই দাঁড়িয়ে ছিলেন সাহেব, নইলে কি আর ফালতু এতটা সময় নষ্ট করেন?'

'কিসের সলা ভাই---জানতে পারি না? ---আমার, আমার কথা কিছু বল---ছিলেন না তো?'

'তোমার কথাই একটু হ'ল বৈকি। ঝুট বলব কেন। সাহেব খুঁজছেন খুব ভাল সিঁধ দিতে পারে এমন লোক। দরকার হলে যাতে সে লোক সিঁধ কেটে দুশমনের কেল্লায় ঢুকে ফাটক খুলে দিতে পারে। খুব হুঁশিয়ার আর মজবুত লোক চাই ওঁর, পাকা সেয়ানা। তোমার অনেক নামডাক শুনেছেন, তাই আমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, তোমার সম্বন্ধে আমি কিছু জানি কি না, তোমাকে দিয়ে ঐ ধরনের কোনো কাজ হবে কি না।'

'তা তুমি কি বললে?' প্রায় নিঃশ্বাস রোধ করে প্রশ্ন করে আকিল সিং।

ভালমানুষের মতো মুখ করে নিস্পৃহ উদাসীন কণ্ঠে করণ জবাব দেয়, 'আমি বললুম কী জানি হুজুর, কৈ আমি তো এমন কথা শুনিনি যে, আকিল ভাইয়া এ সব কাজ করে---আমি তো ওকে খুব নেক আর সাচ্চা আদমী বলে জানি।'

'কেন বললে, কিসের জন্যে তুমি বানিয়ে বানিয়ে এত কথা বলতে গেলে ঝুটমুট?' ভীষণ উত্তেজিত আর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল আকিল সিং, 'কিসের জন্যে তুমি আমার এই অনিষ্টটি করতে গেলে তাই শুনি।'

যেন আকাশ থেকে পড়ল করণ, 'ঝুটমুট? তার মানে? আমি তো সত্যি সত্যিই ---কিছু ভেবোচিন্তে বানিয়ে বলতে তো যাই নি। তুমি কি সত্যিই এ সব কাজ করো না কি? চুরি-ডাকাতি করা তোমার অভ্যেস আছে? তা তো আমি জানি না। আমি জানি এ সব কাজ যারা করে তাদের ফাটক হয়, তাদের বদনাম করে, সাজা পায় তারা। আরও শুনেছি এখানে যারা কাজ করে, তাদের ওসব কিছু করবার জো নেই।'

ন্যাকো ও সব ন্যাকামি আমার কাছে করতে এসো না। ছাউনীশুদ্ধ লোক যা জানে তা তুমি জানো না।---তোমাকে দেখলে তো ভালমানুষ আর ছেলেমানুষ বলেই মনে হয়, তোমার পেটে পেটে এত বদমাইসী। জেনেশুনে আমার যাতে উপকার না হয় সেই জন্যে ন্যাকা সেজে ঝুট বলেছ তুমি। তোমার বদমাইসী বুঝি না মনে করছ।---কেন, কেন এত রাগ তোমার কেন, আমার একটু উপকার হলে তোমার কি কিছু নুকসান হত?'

করণ হেসে বলল, 'মিথ্যেই তোমার ভাই আকিল নাম, আক্কেল-বুদ্ধি কিচ্ছু নেই তোমার যা দেখছি। আরে ভাইয়া, তুমি শুধু বকশিস আর তলব বাড়ানোই দেখছ, কাজটা দেখছ না। আমি ন্যাকা সেজেছি। তোমার ভালোর জন্যেই একা তোমাকে ঠেলে দেবো দুশমনদের মধ্যে, যদি ধরা পড়ো তো তোমার জানটাই যাবে, ওদের কি ক্ষতি তাতে? যদি তুমি প্রাণ হাতে নিয়ে ঢুকে ওদের কপাট খুলে দিতে পারো তো দয়া করে কিল্লাটা দখল করে বাহবা নিবেন ওঁরা, জান গেলে তোমারই যাবে। এই সহজ কথাটাও মাথাতে ঢুকল না তোমার? কিল্লা থেকে গুলী ছুড়বে---তার মধ্যে একা গিয়ে বসে সিঁধ কাটতে হবে, একাই, ভেতরে গিয়ে অমন দু হাজার দুশমনের মোকাবিলা করতে হবে। ---আর দুশমন বলে দুশমন, কাবুলিরা। শুনেছি মানুষগুলোকে ধরে ধরে আছড়ে মারে—এত গায়ে জোর ওদের। ধরা পড়লে চাই কি কাঁচা চিবিয়ে খেত তোমাকে।'

শুনতে শুনতেই আকিলের মুখটা শুকিয়ে উঠেছিল। সে প্রবল সমর্থনের ভঙ্গীতে ঘাড় নেড়ে বলল, 'তা বটে। তুমি ঠিকই বলেছ করণ ভাইয়া, সাচ্চা দোস্তের কাজ করেছ তুমি। সাহেবের মতলব যে খুব খারাপ তা এখন বুঝতে পারছি। খুব বাঁচিয়ে দিয়েছ তুমি।'

'আরও একটা মতলব তো এখনও বুঝতে পারো নি; তবু।' আরও গম্ভীর মুখে বলল করণ।

'বেশক। তাই নাকি!---আবার কি মতলব ভাইয়া তুমি যে আমাকে ভয় ধরিয়ে দিলে।' পাংশু মুখে প্রশ্ন করল আকিল।

'যা বলছে তাই যে সত্যি তারই বা ঠিক কি-' করণ অতিকষ্টে হাসি চেপে বলল, 'হয়ত ওসব কিছুই দরকার নেই ওর, সোজাসুজি তোমাকে ফাঁদে ফেলবার মতলব। তুমি তো চালাক খুব, সবাই জানে তুমি পাক্কা চোর। কিন্তু তোমাকে হাতেনাতে ধরতে তো পারেনি কখনও। হয়ত সেই মতলবেই এই কথাটা পেড়েছে। আমি তোমার নাম করব---তুমিও স্বীকার করবে যে বড় বিদ্যেটা তোমার জানা আছে---ব্যস, অমনি সঙ্গে সঙ্গে তোমার হাতে দড়ি আর পায়ে বেড়ি দিয়ে সেধে ঠাণ্ডিগারদ পাঠিয়ে দেবে। সাক্ষী-সাবুদ লাগবে না, তোমার মামলা তোমাকে দিয়েই কবুল করিয়ে নেবে।---যদি এই হ'ত আকিল ভাইয়া।'

আকিলকে উদ্দেশ করেই শেষের কথাটা বলল বটে কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকাতে পারল না করণ আর। একটু আগেই কথার ফাঁকে একবার আড়ে একঝলক দেখে নিয়েছিল ওকে, তাতেই যে অবস্থা নজরে পড়েছিল তারপর আর ভাল করে চাইতে সাহস হয় না। ভয়ে বিবর্ণ তো বটেই—কেমন এক রকমের বিকৃত হয়ে উঠেছে আকিলের কুঞ্চিত মুখখানা। এমনিতেই হাসি সামলানো দায়, এখন ওর দিকে চাইলে কিছুতেই হয়ত চাপতে পারবে না—হো-হো করে হেসে উঠতে হবে। তাতে তামাসাটাই মাটি হবে না শুধু, লোকটা চিরকালের মতো শত্রু হয়ে থাকবে।

এমনিতেই তার শত্রুর অভাব নেই, সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ কি? [ক্রমশ।

বাস্তব

শ্রীমতী ভক্তি দেবী

তোমার খসড়া
ভাবার মহড়া
এবার হয়েছে শেষ?
বাকী আছে বাকি
সমাপ্তি খুঁজি
শুধু লেখা পরিশেষ।
এ উপন্যাসে
ভাষা বিন্যাসে
যদি থাকে কোন ছেদ,
কোন অধ্যায়
বাকী থেকে যায়
তাতে রেখো নাকো খেদ।
যদি কোনক্ষণে
বিনা আয়োজনে
করে দিয়ে থাকো ডাক,
সেইটুকু কথা
ক্ষণেকের ব্যথা
এইখানে লেখা থাক্।
যা রহিল বাকী
দিও নাকো ফাঁকি
মেনে নিও তার ব্যবধান
তোমার এ প্লট
নহে উদ্ভট
এইটুকু শুধু সমাধান।

উল, কাঁটা ইত্যাদি

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

উলের কাঁটার ঘর পড়ে গেলে মুখভার হয়,
কবরীবিন্যাসে সেই তৈলাক্ত কাজল সংযোগগুলি
ছিঁড়ে যদি যায়, যদি শতবার লালার প্রলেপে
অভীষ্টহীন খামটির মুখ বোজে নাকো,
তবে বারবার মনে পড়ে যায় পরীক্ষার দিনে
'জুতোয় কাঁকর' বলতে দৃষ্টান্তস্বরূপে এইসব
কেন লিখিনিকো হায় হায়...
কত কিছু অদৃশ্য ও অগোচর, ধীরে টুপ করে
মাকড়সার মত নীচে নেমে আসে গাছ থেকে,
এসব সহসা যদি চোখে না-ই পড়ে
কেবল অন্ধের মত খুব বড় ফ্লাডলাইটের
দিকে চেয়ে থাকি, তবে
দেখি না মুখের হাসি কালো হয়, ভ্রূ কুঁচকে যায় একযোড়া,
দেখি না উলের কাঁটা ঘর ফেলে দিলে
কোন ঘরে আন্দোলন জাগে।

মানব-জীবনে চন্দ্রগ্রহের প্রভাব

প্রশান্তকুমার সেন

ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র গ্রন্থে রবিগ্রহকে পিতৃকারক এবং চন্দ্রকে মাতৃকারক বলা হইয়াছে। ঋষিদের দৃষ্টিকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয় যখন দেখা যায় যে, চন্দ্রগ্রহ মাতার ন্যায়-ই এই জগৎকে পোষণ করিতেছেন, ঠিক যেমনভাবে লৌকিক জগতের মাতা আপন সন্তানকে স্তন্যের দ্বারা লালন-পালন করেন। মাতার অনির্বচনীয় করুণা ও ভালবাসা ব্যতিরেকে সন্তান যেমন বাঁচিতে পারে না, মাতৃস্বরূপা চন্দ্রগ্রহের সঞ্জীবনী সুধার অভাবে এই পৃথিবীও তেমনি প্রাণহীন হইয়া পড়ে। আবার মাতা যেমন, পিতা কর্তৃক কঠোরভাবে দণ্ডিত, পুত্রকে ক্রোড়ে তুলিয়া নানাপ্রকার সান্ত্বনা দান করেন, তদ্রূপ রবিগ্রহের উত্তপ্ত কিরণজালে জগৎ তাপিত ও পীড়িত হইলে চন্দ্র গ্রহই তদীয় স্নিগ্ধ কিরণ দ্বারা জীবের দগ্ধ প্রাণ শীতল করিয়া দেন।

চন্দ্রগ্রহের এই স্নিগ্ধ মাধুর্যমণ্ডিত অপরূপ রূপলাবণ্যে বিমোহিত হইয়া যুগে যুগে কত কবি যে অনবদ্য ছন্দে অপূর্ব কাব্য সৃষ্টির মধ্য দিয়া জীবের অন্তরে ভাবের উদ্রেক করিয়া, জীবকে উন্নততর পথের সন্ধান দিয়াছেন, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। এই যে কাব্য সৃষ্টির প্রেরণা, এই যে ভাবের প্রস্রবণ—ইহার মূলে কিন্তু সুধা-স্বরূপিণী চন্দ্রগ্রহের পরম মংগলকর শুভ প্রভাবই বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহা না হইলে মধুররসসিঞ্চিত যে সমস্ত কাব্য কালকে উপেক্ষা করিয়া আজও সুধীজনের রসপিপাসু চিত্তকে তৃপ্তি দান করিতেছে তাহা অনাদিকালের গর্ভেই বিলীন থাকিত; জগদ্বাসী ঐ কাব্যরস কোনদিনই আস্বাদন করিতে পারিত না।

পার্থিব জগতে যাঁহারা কাব্যসৃষ্টি করিয়াছেন বা করিবেন—প্রত্যেকের ত্রিগুণাময়ী প্রকৃতিতে চন্দ্রগ্রহ নিজে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদের অন্তরে ভাবের প্রস্রবণ সৃষ্টি করেন বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে রসসৃষ্টি সম্ভব ইতঃপূর্বে হইয়াছে এবং ভবিষ্যতেও যে-সমস্ত কবিরা রসোত্তীর্ণ কাব্যসৃষ্টির প্রয়াস পাইবেন, তাঁহাদের পক্ষেও তাহা সম্ভব হইবে। ইহার একমাত্র কারণ হইল মনোরাজ্যের উপর এবং সেই হেতু ভাবরাজ্যের উপর চন্দ্রগ্রহের অবিসংবাদিত কর্তৃত্ব।

শাস্ত্র বলে, মনই মানুষের বন্ধন বা মুক্তির কারণ। একই মন বিষয়াসক্ত হইলে তাহা বন্ধনের কারণ হয়; আবার সেই মন বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে মোক্ষের কারণ হয়।(১) মৈত্রায়নী উপনিষদের এই বাক্যের মর্মার্থ হৃদয়ংগম করা যায় যখন দেখা যায় যে, পাপাচরণকারী ব্যক্তির রাশিচক্রে চন্দ্রগ্রহ পাপ-পীড়িত; পক্ষান্তরে শুভকার্যের অনুষ্ঠানকারীর রাশিচক্রে চন্দ্রগ্রহ শুভগ্রহদ্বারা দৃষ্ট ও শুভস্থান গত। এই তত্ত্ব যাহাদের জানা নাই তাহাদের ভাবিতে রীতিমত বিস্ময় লাগিবে যে, কি করিয়া একজন স্বার্থসিদ্ধির জন্য হীন জঘন্য কার্যে প্রবৃত্ত, আর একজন ভাগবতিক সর্ববিষয়সুখ বিসর্জন দিয়া মোক্ষলাভের জন্য যত্নবান হইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, যে-কার্যে মানুষ সমাধা করুক না কেন—তাহা অধ্যাত্মরাজ্যে প্রবেশের চেষ্টাই হউক বা আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য বীভৎস কর্মের প্রবৃত্তিই হউক—তাহার মূলে রহিয়াছে চন্দ্রগ্রহের অলক্ষ্য প্রভাব। ইহার কারণ—জীবের যাবতীয় কর্ম মনঃপ্রসূত বলিয়া চন্দ্রগ্রহ সেই মনেরই কারক।

যাহা হউক, চন্দ্রগ্রহ মনের কারক এবং সেই হেতু ভাবের কারক বিধায় জীব নিয়তই ভাবাবেগদ্বারা আচ্ছাদিত থাকে। নদীর প্রবাহ যেমন অবিরাম গতিতে চলিতে থাকে, জীবের অন্তরের ভাবও তেমনি বিরামহীন গতিতে অনির্দেশ্যের পানে অবিরত ধাবিত হইতেছে। এই ভাবের প্রবাহের শেষ নাই। ভাবাবেগবশত জীব মনে মনে আশার ইমারত ক্ষণে ক্ষণে গড়িতেছে আর ভাঙ্গিতেছে এবং তাহাতে মোহগ্রস্ত হইয়া কর্মবন্ধনে আটকা পড়িতেছে। পরিণামে ইহা সুখাবহ কি দুঃখাবহ—মায়ামুগ্ধ জীব তাহা একবারও ভাবিয়া দেখিতেছে না। হাসি-কান্নায়, সুখে-দুঃখে, অভাবে-অভিযোগে, জয়ে-পরাজয়ে, হরষে-বিষাদে, জন্মে-মৃত্যুতে—এই ভাবের প্রবাহ অব্যাহতগতিতে চলিয়া জীবকে ভাবে বিভোর করিয়া রাখিয়াছে—ভূমিষ্ঠ হইবার মুহূর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া জীবের উৎক্রান্তি পর্যন্ত।

উৎক্রান্তির পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মায়াময় জগতের অপূর্ণ ভোগবাসনা পূর্ণ করিবার যে-তীব্র চিন্তা জীবের অন্তরে প্রদীপ্ত সূর্যের ন্যায় সততই দেদীপ্যমান থাকে, তাহা ত্রিগুণাময়ী প্রকৃতিসঞ্জাত। চন্দ্রগ্রহ হইলেন সেই

১। মন এব মনুষ্যাণাং
কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং
মুক্তৌ নির্বিষয়ং স্মৃতম্ ॥
মৈত্রায়নী উপনিষদ্ ৪।১১॥

প্রকৃতি। (২) প্রকৃতি-স্বরূপিণী এই চন্দ্র জীবের অন্তরে স্নেহ-মায়া-মমতা প্রীতি-ভালবাসা রূপ আপাতমধুর ভাবের প্রবাহ অন্তরের মধ্যে সৃষ্টি করিয়া জীবকে বিস্মৃত করিয়া রাখিয়াছে তাহার স্বরূপজ্ঞান হইতে,—স্নেহাস্পদ সন্তান যাহাতে আত্মচৈতন্য লাভ করিয়া জননীর ক্রোড় ছাড়িয়া না যায়। অতএব চন্দ্রগ্রহ হইতেছেন সংসারবন্ধ রক্ষয়িত্রী, পালয়িত্রী এবং জগৎ-প্রসবিত্রী। এই কারণেই চন্দ্রগ্রহ হইতে মাতার বিচার করা হয়; মাতৃ-তুল্যা যিনি, তাঁহার বিচারও চন্দ্রগ্রহ হইতে করা হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের যে জরায়ু এবং গর্ভধারণের উপযুক্ত যে ঋতু—তাহার বিচারও জ্যোতিষা-চার্যরা চন্দ্রগ্রহ হইতে করিয়া থাকেন। আবার, যাহারা ধাত্রী বা শুশ্রূষাকার্যে নিযুক্ত—তাহাদের উক্তবৃত্তি অবলম্বনের মূলেও চন্দ্রগ্রহের প্রভাব রহিয়াছে, পণ্ডিতগণ ইহাই বলিয়া থাকেন।

চন্দ্রগ্রহের মধ্যে সঞ্জীবনী সুধা আছে বলিয়া চন্দ্রগ্রহের অপর নাম 'সোম'। এই চন্দ্র জলময় এবং সর্ব রসের আধার।

তাঁহার এই রসাত্মক গুণেই বনস্পতিগণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

'পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ
সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ' ॥

গীতা ১৫।১৩॥

অর্থাৎ সমস্ত রসযুক্ত সোমরূপ হইয়া ওষধিরাশিকে আমিই পরিপুষ্ট করিতেছি। এই কারণেই চন্দ্রগ্রহ-উপাদানপুষ্ট জীব জলপ্রিয় হয় এবং তজ্জন্য নদীমাতৃক দেশগুলিতে ভ্রমণ করিতে ভালবাসে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ যেসকল দেশ, অর্থাৎ যেসকল দেশে সুধাস্বরূপিণী চন্দ্র স্বীয়া সঞ্জীবনী সুধা অপর্যাপ্ত পরিমাণে দান করিয়া বনস্পতিগুলিকে পরিপুষ্ট করিয়াছেন—সেইসব বৃক্ষলতাগুল্ম পরিশোভিত দেশগুলি ভ্রমণ করিতে চন্দ্রগ্রহ-উপাদানপুষ্ট ব্যক্তি অপার আনন্দ লাভ করিয়া থাকে।

রবি-উপাদানপুষ্ট জীব যেমন অসীম আত্মমর্যাদাজ্ঞানসম্পন্ন হয় যাহার ফলে তাহার আচরণ সাধারণ হইতে ব্যতিক্রম হয়, প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বে ও আভিজাত্যে তিনি যেমন হিমালয়ের মতন স্বমহিমায় বিরাজ করেন, সোমরসপুষ্ট ব্যক্তিদের চরিত্রে তাহা কদাচ পরিলক্ষিত হয়। স্নেহ-মায়া-মমতা-প্রীতি ও সরলতা এত অধিক পরিমাণে তাহাদের অন্তরে বিরাজ করে যে, ব্যক্তিত্ব ও আভিজাত্য রক্ষার প্রয়োজনীয়তা তাহাদের নিকট নগণ্যই মাত্র বলিয়া স্বীকৃত হয়। চারিত্রিক এবম্বিধ বৃত্তিগুলির প্রাধান্যবশত সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের সহিত আলাপ করিতে যেমন তাহাদের দেখা যায়; আবার নিম্নতম ব্যক্তিদের সহিত কথোপকথনেও উৎসাহ ততখানি তাহাদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। কৃত্রিমতাবর্জিত স্বভাবসম্পন্ন এইসব সদালাপী ব্যক্তিদের সহিত আলাপে অপরে রীতিমত মুগ্ধই হইয়া থাকে। সমুদ্র তাহাদের প্রিয়, জনসমুদ্র তাহাদের নিকট ততোধিক প্রিয়। জনসাধারণকে অস্বীকার করিয়া তাহারা বাঁচিতে চায় না। এই কারণে চন্দ্র হইতে জনসাধারণেরও বিচার হইয়া থাকে। চন্দ্রগ্রহ প্রবাহের কারক। এই জন্য সমুদ্রের প্রবাহ, নদীর প্রবাহ, লোকের প্রবাহ, ভাবের প্রবাহ, যাহা অব্যক্ত অনির্দেশ্যের পানে ছুটিয়া চলিতেছে—তাহার বিচারও চন্দ্রগ্রহ হইতে করা হইয়া থাকে।

মাতা যেমন সন্তানকে দুঃখের আড়াল হইতে রক্ষা করিয়া সুখদান করিতে ব্যস্ত থাকেন, মাতৃস্বরূপিণী চন্দ্রগ্রহও তদ্রূপ সন্তানকে নানাবিধ অর্থ ও সম্পদ দান করিয়া সন্তানের মনে সুখ উৎপাদন করিয়া থাকেন। সেই হেতু পারিবারিক সুখ ও শান্তি এবং প্রয়োজনীয় অর্থাদির বিচারও চন্দ্রগ্রহ হইতে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ করিয়া থাকেন।

সূর্য হইতে রাজা এবং পিতা—উভয়েরই বিচার হইয়া থাকে। চন্দ্র হইতেও তেমনি রাণী এবং মাতার বিচার হইয়া থাকে। চন্দ্র শক্তি, সূর্য শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই। যেমন রাধা আর কৃষ্ণ, লক্ষ্মী আর নারায়ণ, দুর্গা এবং শিব, ব্রহ্মা ও সরস্বতী ইত্যাদি। সূর্য হইতে রাজানুগ্রহে নানা উন্নতির চিন্তা করা হয়; চন্দ্র-সূর্যের অভেদত্ব হেতু চন্দ্রগ্রহের অনুগ্রহেও অনুরূপভাবে সরকারী বৃত্তি বা রাজানু-গ্রহে নানা উন্নতির ভাবনা করা হয়।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে চন্দ্রগ্রহ জলের কারক। অতএব, জলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত যেসব বৃত্তি মনুষ্য ব্যক্তি গ্রহণ করিয়া থাকে, যেমন নাবিক বৃত্তি, ধীবর বৃত্তি ইত্যাদি, তাহার মূলে চন্দ্রগ্রহের প্রভাবই রহিয়াছে বলিয়া জানিতে হইবে।

স্ত্রীজাতির বক্ষস্থ পয়োধরের উপরেও চন্দ্রের প্রভাব রহিয়াছে—মার্কণ্ডেয় চণ্ডী হইতে তাহা জানা যায়। 'সৌম্যেন স্তনয়োর্যুগ্মং'। সেই জগন্মাতার স্তনযুগল চন্দ্রের তেজে উৎপন্ন হইল। এই কারণে রমণীর স্তনযুগল শুধুমাত্র মাংসপিণ্ড নয়, পরন্তু অমৃতসুধায় পূর্ণ। অতএব চন্দ্রগ্রহ হইতে দুগ্ধেও বিচার করিতে হইবে। চন্দ্রগ্রহ সুধা-স্বরূপিণী সুতরাং উৎকৃষ্ট রসায়ন বা মদ্য এবং তাহাদের ব্যবসায় যাহারা লিপ্ত থাকেন—তাঁহাদের বিচারও চন্দ্রগ্রহ হইতে করার কথা আচার্যরা বলিয়া থাকেন। চন্দ্রগ্রহ রসের কারক। সেই হেতু শরীরস্থ রস অর্থাৎ কফ ধাতুর বিচারও চন্দ্রগ্রহ হইতে হয়। যাহাদের রাশি-চক্রে চন্দ্রগ্রহে পাপ দৃষ্ট বা পাপ মধ্য-গত দুঃস্থানগত, তাহাদের কফ, কাশাদি, আমাশয় ও পাকস্থলী রোগ নিত্যই বিবৃত থাকিতে দেখা যায়।

২। বিজ্ঞানীর সন্ধানী দৃষ্টির কাছে চন্দ্রগ্রহ শুধু জড়পিণ্ড মাত্র; সেই হেতু প্রাণহীন পদার্থ। এতদরিক্ত কোন সত্তা তাহারা স্বীকার করে না। কিন্তু জ্যোতিষীর কাছে স্থূল রূপ গ্রাহ্য নহে। যে-শক্তি ঐ স্থূলকে প্রকাশিত করে—সেই শক্তির যে রূপ তাহাই তাহাদের নিকট গ্রাহ্য।

জ্যোতিষশাস্ত্র গ্রন্থে চন্দ্রগ্রহকে সত্ত্বগুণী বলা হইয়াছে। সত্ত্বগুণ বলিতে কি বুঝায় তাহা জানিতে পারিলে চন্দ্রগ্রহের প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের ধারণা অনেকটা সহজ হইতে পারে। এই নিমিত্ত এক্ষণে সত্ত্বগুণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

জগতে যতকিছু বস্তু দৃষ্ট হয়, মায়া (প্রকৃতি) তাহার মাতৃস্বরূপা এবং ঈশ্বর তাহার বীজপ্রদ পিতা।(৩) এই প্রকৃতির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে তিনটি গুণ রহিয়াছে। প্রকৃতিকে ত্রৈগুণ্যময়ী বলার পশ্চাতে যে কারণ রহিয়াছে, তাহার মূলে রহিয়াছে তিনটি গুণ। সেই তিনটি গুণ হইতেছে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। প্রকৃতির মধ্যে ঐ তিনটি গুণ বিদ্যমান থাকায়, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বস্তুর মধ্যেও ঐ গুণগুলি বর্তমান থাকে। কারণ, কারণে যে গুণ থাকে না, সেই গুণ 'কার্যে' স্বতন্ত্রভাবে উৎপন্ন হইতে পারে না। ছান্দোগ্য উপনিষদেও এই কথাই ব্যক্ত হইয়াছে —"কথমসতঃ সজ্জায়েত"—কি প্রকার যাহা নাই, তাহা হইতে যাহা আছে তাহা উৎপন্ন হইতে পারে? যাহা হউক, যে-কোন বস্তু যাহা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে তিনটি গুণ অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তাহাদের পরিমাণ সমান নয়। প্রকৃতি যখন অব্যক্তাবস্থায় থাকে, একমাত্র তখনই তিনটি গুণ সমপরিমাণে থাকে। 'সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা'। সাম্যাবস্থায় সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টি হইতে হইলে প্রকৃতির সাম্যাবস্থা ভঙ্গ হওয়া দরকার। এইজন্য সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রকৃতি সৃষ্ট্যুন্মুখ হইয়া বিক্ষুব্ধা হইলে, তাহার সাম্যাবস্থা তখন ভঙ্গ হয়। তখন বিষম সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

সৃষ্টবস্তুর মধ্যে যে তিন গুণ মিশ্রণ থাকে, তাহার মধ্যে সত্ত্বগুণ হইল শুদ্ধাবস্থা, তমোগুণ হইল হীনাবস্থা। এই দুই-এর মধ্যকার অবস্থা হইল রজোগুণ। হীনাবস্থা হইতে উচ্চাবস্থায় উপনীত হইবার যে চেষ্টা বা প্রবৃত্তি তাহাই হইল রজোগুণ। বস্তু যখন অপ্রকাশিত থাকে তখন তাহার তমোগুণাবস্থা। যখন প্রকাশিত হইবার চেষ্টা চলে তখন তাহার রজোগুণাবস্থা; পরিশেষে যখন সফলতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশিত হয় তখন তাহার সত্ত্বগুণাবস্থা।

সত্ত্বগুণের লক্ষণ জ্ঞান। অতএব ইহা প্রকাশক। জ্ঞানের আলোতেই সমুদয় বস্তু পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। জ্ঞানের যাহা বিপরীত তাহাই অজ্ঞান। ইহাই তমোগুণের ধর্ম। আর, জ্ঞান ও অজ্ঞানের মধ্যবর্তী যে অবস্থা তাহা হইল রজোগুণের। জ্ঞানের ফল সুখ, অজ্ঞানের ফল দুঃখ, মোহ ইত্যাদি। রজোগুণের ফল সুখ ও দুঃখ মিশ্র।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় 'গুণত্রয়বিভাগ-যোগ'-এ এই তিনটি গুণ সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বলা হইয়াছে। সত্ত্বগুণ সম্বন্ধে পাঠকবর্গের ধারণা যাহাতে স্পষ্ট হয়, তজ্জন্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে এক্ষণে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥
—গীতা ১৪।৬॥

—হে অনঘ! এই তিন গুণের মধ্যে সত্ত্বগুণ নির্মল; এইজন্য ইহা প্রকাশক ও অনাময় (শান্ত ও উদাসীন)। এই সত্ত্ব সুখসঙ্গ ও জ্ঞানসঙ্গ দ্বারা জীবকে বন্ধন করে।

সর্বদ্বারেষু দেহেহস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥
—গীতা ১৪।১১॥

হে পার্থ! যে সময়ে এই দেহের শ্রোত্রাদি সকল ইন্দ্রিয়েই প্রকাশরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, সেই সময় সত্ত্বগুণের উদয় হইয়াছে জানিবে।

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে।
'সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্ ॥
—গীতা ১৪।১৭।

'সত্ত্বগুণ সুখদায়ক।
'সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি ॥'
—গীতা ১৪।৯॥

সাত্ত্বিক কর্মের ফল নির্মল।
'সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলং' ॥
—গীতা ১৪।১৬ ॥

সত্ত্বগুণ সম্বন্ধে সংক্ষেপে যাহা আলোচিত হইল তাহা, চন্দ্রগ্রহ সত্ত্বগুণী হওয়ায় তৎ প্রভাবাধীন ব্যক্তিদের মধ্যে এবম্বিধ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইবে। এইজন্য দেখা যায়, এই গ্রহ-প্রভাবাধীন ব্যক্তি জ্ঞানী, সুখী ও দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ হইয়া প্রত্যেকের শ্রদ্ধার পাত্র হয়। এইসব ব্যক্তিরা লোভশূন্য হয়; এই কারণে অকারণে মোহগ্রস্ত হইয়া দুঃখ সাগরে নিমজ্জিত হয় না। যে কার্য তাহারা করে, জ্ঞানের আলোকে পূর্ব হইতে বিচার করিয়া তাহারা বুঝিতে পারে যে তাহা সফল হইবে কি না। সফল হইবার সম্ভাবনা দেখিলেই তাহারা তাহা করিবে, নচেৎ অগ্রসর হইবে না। এইজন্য তাহারা শোকগ্রস্ত হয় না।

কিন্তু চন্দ্রগ্রহ যদি কোন তামসিক গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয় বা যুক্ত হয় বা পাপ মধ্যগত হয়; অথবা কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী হইতে শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথির চন্দ্র হয়, সেই ক্ষেত্রে সত্ত্বগুণের এই প্রভাব জাতক-জীবনে পরিলক্ষিত হইবে না। অন্যথায় চন্দ্রগ্রহের শুভ সাত্ত্বিক প্রভাব জাতকের জীবনে প্রতিফলিত হইবেই।

এক্ষণে, এই চন্দ্রগ্রহ চালনায় (পাশ্চাত্য মতে) শুভ সম্পর্কে আবদ্ধ হইলে বা ভারতীয় মতে শুভ চন্দ্রের দশান্তর্দশায় কর্মোন্নতি, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, শরীর-মন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। ঐ সময় জল বা জলসন্নিধ স্থানে ভ্রমণ, জলীয়-দ্রব্য ব্যবসায়ে উন্নতি, মাতা বা মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীলোকের আনুকূল্য

৩। তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥
গীতা ১৪।৪

লাভ ও তৎসূত্রে নানা উন্নতি, প্রেম বা বিবাহ, সন্তান লাভ, গৃহে নানা প্রকার মাঙ্গলিক উৎসব, আত্মীয়-স্বজনের সহিত সম্প্রীতি বৃদ্ধি, জনসাধারণের সহিত সংযোগ স্থাপন, নিত্য দুগ্ধ-ক্ষীর ও পায়সান্ন ভোজন, রাজানুগ্রহ লাভ, নির্বাচনে জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ ইত্যাদি হইয়া থাকে। ফলত ঐ সময় সর্বপ্রকার শ্রী, অভ্যুদয় ও আনন্দ হইয়া থাকে। ঐ সময় প্রায়শ স্থান বদল ঘটে থাকে এবং যে পরিবর্তন হয় তাহাতে জাতকের মন প্রসন্ন হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে, চালনায় চন্দ্রগ্রহ যদি অশুভ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় বা ভারতীয় মতে পাপ-পীড়িত কিংবা দুঃস্থানগত চন্দ্রের দশান্তর্দশায় আরম্ভ হয়, তাহা হইলে কর্মস্থলে নানা ঝঞ্ঝাট, কর্মচ্যুতির ভয় বা অস্বাস্থ্যকর স্থানে বদলী, অপমান ভোগ, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহিত বিরোধ বা তাহাদের বিরূপতা অর্জন, আর্থিক অপচয় বৃদ্ধি, ফলে অর্থাভাববোধ, মাতা বা মাতৃস্থানীয়া কাহারও মৃত্যু বা তৎতুল্য গুরুতর পীড়াভোগ, নিজ স্বাস্থ্যহানি, প্রবল মানসিক অশান্তি হেতু মস্তিষ্ক বিকৃতি ভয়, কফজ ও পাকস্থলী সংক্রান্ত পীড়াদি ভোগ, বাসস্থানের পরিবর্তন, পারিবারিক বিরোধিতা, গৃহে নিত্য অসুখ-বিসুখ হেতু ব্যয়বৃদ্ধি, আত্মীয় বিরোধ, স্ত্রীজাতির, বিশেষত বর্ষীয়সী মহিলার বিরূপতা অর্জন প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। চন্দ্রগ্রহ বামনেত্রের কারক। অতএব, ঐ সময় পুরুষের বামনেত্র এবং স্ত্রীলোকের দক্ষিণ নেত্রের পীড়ার ভয় থাকে। জরায়ু সংক্রান্ত রোগ, রজঃকষ্ট প্রভৃতি রোগে স্ত্রীজাতি ঐ সময় সবিশেষ কষ্ট ভোগ করে। পূর্বে শক্তি ও শক্তিমানের অভেদত্ব সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। অতএব, ঐ সময় মাতার যেমন গুরুতর রোগভোগের আশঙ্কা থাকে, সূর্য-চন্দ্রের অভেদত্ব হেতু ঐ সময় পিতার জীবনেও নানা বিপদ, গুরুতর রোগভোগ এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিয়া থাকে। দাম্পত্য-জীবনেও পরস্পরের মধ্যে কলহ, মনোমালিন্য, দাম্পত্য বিচ্ছেদ প্রভৃতির ভয় বিশেষ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। পত্নীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়।

চন্দ্রগ্রহ পীড়িত রহিলে প্রথম চারি বৎসর শিশুর স্বাস্থ্য রীতিমত মন্দা যায়। অতঃপর ১১।২০।২৯।৩৮ ৪৭।৫৬।৬৫।৭৪ বর্ষগুলি সবিশেষ কষ্টদায়ক হইবার সম্ভাবনা থাকে।

চন্দ্রগ্রহের দোষশান্তির জন্য বৈদূর্যমণি অথবা শঙ্খ বা ক্ষীরিকামূল ধারণ করিলে গ্রহদোষ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। শিশু বা বালক-বালিকাদের স্বাস্থ্যে পুষ্টির অভাব দেখা গেলে চন্দ্রপ্রভ কর্কেতন মণি (moon stone) ধারণ করিলে স্বাস্থ্যোন্নতি হইয়া থাকে। শ্লেষ্মাঘটিত রোগেও ঐ মণির উপকারিতা দেখা যায়। আয়ুর্বেদাচার্য বাগভটের মতে চন্দ্রগ্রহ পীড়িত হইলে মুক্তা ধারণ সঙ্গত। যাহাদের জন্ম সোমবারে হইয়াছে তাহারা মুক্তা বা চন্দ্রপ্রভ কর্কেতন (moon stone), বা শঙ্খ বা ক্ষীরিকামূল ধারণ করিলে অনেক অশান্তি হইতে অব্যাহতি পাইতে পারেন।

তোমার সত্তার ঘন......

গোবিন্দ হালদার

তোমার সত্তার ঘন সুবাসে দিয়েছি আমি ডুব।
দ্বিধাদ্বন্দ্ব অতিক্রান্ত সুর্যগন্ধী বাতাসের মন
নিসর্গের রঙ ছানে গোলাপের বুক ছিঁড়ে খুব
নতুন আলেখ্য লিখি বনপথে নিবিড় নির্জন।

পত্রালি মেঘের সার শতনরী হাওয়ায় দোদুল।
স্বল্পায়ু ঋতুর গান এখনো হয়নি জানি শেষ—
রক্তক্ষত দগ্ধশাখে আজিও ত' ধরেছে মুকুল
অবিনাশী কামনার। অঙ্গে কাঁদে অনঙ্গ আবেশ
তোমার সত্তার রূপে চিত্রলেখা বাসনার প্রাণ
দিনে দিনে মূর্ত হয়। ইলোরার শিল্পিত প্রতিমাঃ
আমার আমিত্বে যা'র অস্তিত্বের স্বীকৃতি মহান্
দ্যুলোক ভূলোক তার স্বপ্নাতীত ঘিরেছে মহিমা।
তোমার সত্তার ঘন সুবাসে ডুবেছে মোর মন।
রূপে যেথা রূপাতীত তুমি সেথা ডেকেছ কখন।

কোথায় রাখি আমার উপস্থিতি

সামসুল হক

আমার ভুবন আমার পাশে
শয্যা নিয়েছিল,
যাবার আগে রেখে গেছে
বাগানে বৃক্ষকে;
রাজার পাইক কুড়ুল হাতে
অনিবার্য আসে,
বিকেলে শুক মহাকাব্য কোথায়
ব'লে যাবে।
ন'বছরের বিয়াত্রিচে ভুবন দিয়েছিলঃ
শুধু ভুবন বড়ো শূন্য, বিয়াত্রিচে, তুমি
বৃক্ষ দিয়েছিলে, কিন্তু রক্ষা করার রীতি
রেখে যাওনি, কোথায় রাখি
আমার উপস্থিতি।

গঙ্গাবক্ষে দীর্ঘপথ সন্তরণ

শ্রীশান্ত পাল

[গঙ্গাবক্ষে দীর্ঘপথ সন্তরণ সাঁতারুদের কিরূপ উৎসাহে প্রণোদিত করে তার কিঞ্চিৎ আভাস দেবার চেষ্টা করব এবং সেই সুযোগে কেমনভাবে ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণ সুরু হয় তাও বিবৃত করব।]

গঙ্গাবক্ষে সাঁতারের কথা আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথম আহিরীটোলা সুইমিং ক্লাবের কথা আমাদের মনে পড়ে। এই সমিতির সভ্যরাই ভাগীরথী বক্ষে সর্বপ্রথম দীর্ঘপথ সন্তরণ প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করেন। ১৯১৪ খ্রীঃ অঃ—বাংলার সন্তরণ ক্রীড়ার এক স্মরণীয় বৎসর। ঐ বছরই আহিরীটোলা সুইমিং ক্লাবের সদস্যরা ভাগীরথী বক্ষে (ঘুসুড়ী থেকে আহিরীটোলা ঘাট) যে সন্তরণ প্রতিযোগিতায় আয়োজন করেন তা কোলকাতার যুবকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঐ প্রতিযোগিতায় উক্ত সমিতির সভ্য শ্রীগৌরমোহন সেন বিজয়ী হন।

কোলকাতার সাঁতারের ইতিহাসে আরো একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই, ঐ বছরই ক্যালকাটা সুইমিং ক্লাবের সভ্য মিঃ জেফর্ড নামে একজন ইংরেজ ভারতীয় যুবসমাজকে দূরপাল্লা অর্থাৎ ৪৪০ গজ সন্তরণ প্রতিযোগিতায় সাঁতারুদের শক্তি পরীক্ষার জন্য সদর্পে আহ্বান করেন। স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ সাধুখাঁ এই "চ্যালেঞ্জ" গ্রহণ ক'রে জেফর্ড সাহেবকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন। এই প্রতিযোগিতা কোলকাতার লোয়ার সার্কুলার রোডে "গলস্টন" পার্কের পুষ্করণীতে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯২২ খ্রী অঃ সন্তরণ ক্রীড়ার দ্বিতীয় স্মরণীয় বৎসর। ঐ সময় কোলকাতার সাঁতারুদের সাঁতরে গঙ্গা পারাপার হওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল। দীর্ঘপথ সন্তরণের দ্বিতীয় পরিকল্পনা করেন আহিরীটোলা সুইমিং ক্লাবের সভ্য স্বর্গত ডাঃ বৃন্দাবন ভট্টাচার্য। তিনি উত্তরপাড়া থেকে কোলকাতায় সাঁতরে আসবার প্রস্তাব করতেই আমরা সকলেই তা অনুমোদন করি। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র স্থির হল উত্তরপাড়ার ফেরি-ঘাট থেকে মাণিক বোসের ঘাট—সাত মাইল জলপথ। ঐ বছরেই ২৮শে মে ঐ দীর্ঘপথ সাঁতার অনুষ্ঠিত হয়। আহিরীটোলার সভ্য আশু দত্ত ঐ দীর্ঘপথ ১ ঘঃ ১৩ মিঃ সময়ের মধ্যে অতিক্রম করেন। শ্রীপঞ্চানন মুখোপাধ্যায়, বৃন্দাবন ভট্টাচার্য ও লেখক ঐ সন্তরণ পরিচালনা করেন। বলা বাহুল্য, এই অনুষ্ঠানের অনেক আগে থেকেই নিবারণ দে, রবীন রক্ষিত ও লেখক অনেকবার বরানগর কুটীঘাট থেকে সাঁতরে কোলকাতায় এসেছেন। তবে সে সাঁতার আমাদের সকলের খেয়ালখুশীমতই হতো।

দ্বিতীয় দীর্ঘপথ ১৩ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা খড়দার শ্যামসুন্দর ঘাট থেকে আহিরীটোলা ঘাট, ঐ বছর ৮ই জুলাই মহা আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীআশু দত্ত ২ ঘঃ ৩৫ মিঃ সময়ের মধ্যে ঐ পথ অতিক্রম করে বাংলার সন্তরণ ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেন। পাঠকদের কৌতূহল নিবারণের জন্যে ঐ ১৩ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতার বর্ষানুক্রমিক বিজয়ীদের নামের তালিকা লিপিবদ্ধ করলাম। যথা—১৯২৩-২৪, প্রফুল্ল ঘোষ (সেন্ট্রাল); ১৯২৫, মোহিতমোহন দে (কলেজ স্কোয়ার); ১৯২৬—২৭, রাধাবল্লভ সাধুখাঁ (বাগবাজার), ১৯২৮—২৯ নলিনচন্দ্র মল্লিক (শ্যামানেশ্বর)।

১৯৩০ খ্রীঃ অঃ থেকে অনিবার্য কারণে ১৩ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়। আহিরীটোলা সুইমিং ক্লাবের সভ্যেরা ধীরে ধীরে সন্তরণ ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে যান। ১৩ মাইল সন্তরণ অনুষ্ঠিত হবার পর থেকে সমিতির সদস্যদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটে, ফলে ২২ মাইল সন্তরণের প্রবর্তন হয়। এটি তৃতীয় দীর্ঘপথ সন্তরণ প্রতিযোগিতা বলে প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঐ বৎসর ১৭ই সেপ্টেম্বর আহিরীটোলার কয়েকজন সভ্য মিলে নিজেদের "ইণ্ডিয়ান লাইফ সেভিং সোসাইটি" নামে পরিচয় দিয়ে ২২ মাইল সন্তরণের প্রবর্তন করেন। ঐ প্রতিযোগিতা চন্দননগরের "স্ট্রাণ্ড" থেকে সুরু হয়ে আহিরীটোলা ঘাটে সমাপ্ত হয়। বাগবাজার সুইমিং ক্লাবের সভ্য স্বর্গত বীরেন্দ্রনাথ বসু (বীরা বোস) ৪ ঘঃ ২৪ মিঃ সময়ের মধ্যে ঐ জলপথ অতিক্রম করে বাংলার সন্তরণ ইতিহাসে আর এক অধ্যায় সংযোজিত করেন। এই প্রতিযোগিতার দিনে দুটি ঘটনায় সমবেত দর্শকমণ্ডলীর আনন্দ কিছুটা ম্লান হয়ে যায়। প্রতিযোগিতা সুরু হবার আধঘণ্টার ব্যবধানে শ্যামনগরের কাছাকাছি একটি "মোটর লঞ্চ" ডুবে যায় এবং সেই দুর্ঘটনায় কর্নেল কে কে চ্যাটার্জী (হোতা) প্রাণ হারান।

বর্ষানুক্রমিক বিজয়ীদের নাম—১৯২৩, স্বর্গত বীরেন্দ্রনাথ বসু (বাগবাজার); (বীরা বোস) ১৯২৪, জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় (হাটখোলা); ১৯২৫-২৬, মনোরঞ্জন বসু (লাইফ সেভিং)।

১৯২৩-২৫ খ্রীঃ অঃ বাংলা দেশে সন্তরণ ক্ষেত্রে এক যুগান্তরের সৃষ্টি হয়। ঐ সময় বাগবাজার সুইমিং ক্লাবের গঙ্গা পারাপার, খড়দা-বিষড়া গঙ্গা পার ২৩ মাইল ও ৩০ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়ে বাংলা দেশের সর্বত্রই একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। ১৯২৩ খ্রীঃ অঃ বিষড়ায় অনুষ্ঠিত 'পূর্ণচন্দ্র মেমোরিয়াল কাপটি' প্রফুল্লকুমার জয় করেন। ঐ প্রতিযোগিতা মাত্র তিন বৎসর চালু থাকে।

বর্ষানুক্রমিক বিজয়ীদের নাম :—

১৯২৪, দোয়ারকা দাস মুনজী (কলেজ স্কোয়ার), ১৯২৫ বীরেন্দ্রনাথ দে (সেন্ট্রাল)।

১৯২৪ খ্রীঃ অঃ আহিরীটোলা স্পোর্টিং ক্লাবের সদস্যরা নিখিল ভারত ত্রিশ মাইল সন্তরণ প্রতিযোগিতার প্রবর্তন করেন। হুগলীর ঘোলাঘাট থেকে কোলকাতার কুমারটুলী ঘাট—জলপথ। ঐ বৎসর সাঁতার সমাপ্ত হতে পারে নি। পথিমধ্যে জোয়ার আসায় এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় সাঁতারুদের সিমারে তুলে নেওয়া হয়। ১৯২৫ খ্রীঃ অঃ এই প্রতিযোগিতাটি নূতন উদ্যমে পুনরনুষ্ঠিত হয়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়েছিল।

ত্রিশ মাইল সন্তরণে বর্ষানুক্রমিক বিজয়ীদের নাম :—১৯২৫-২৬, শ্রীগোপীনাথ রায় (হাটখোলা), ১৯২৭-২৮ জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় (হাটখোলা), ১৯২৯-৩০ নলিনচন্দ্র মালিক (শ্যামানেশুর), ১৯৩১, সুধীরচন্দ্র ঘোষ (আহিরীটোলা স্পোর্টিং), ১৯৩২, নলিন চন্দ্র মালিক (শ্যামানেশুর); ১৯৩৩, নারায়ণ সেনুকা (কলেজ স্কোয়ার); ১৯৩৪-৩৬, খেলা হয় নি। ১৯৩৭-এর ৯ই অক্টোবর সেখ কুব্বৎ (আহিরীটোলা স্পোর্টিং)। এই ত্রিশ মাইল প্রতিযোগিতায় বাংলার একমাত্র সাঁতারু সেন্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্যা কুমারী লীলা চট্টোপাধ্যায় ১৯ জন পুরুষ প্রতিযোগীদের ভিতর ষষ্ঠস্থান অধিকার করে সকলকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করেন।

কবি বন্ধু স্বর্গত সজনীকান্ত দাস

কবিতা লীলা ব্যানার্জীকে উপহার দেন—কবিতাটি এই :—

"সলিল সাম্রাজ্যের কুমারী লীলা সুখে
অগাধ স্রোতে তুমি দাও সাঁতার,
পিছনে প'ড়ে আছি বাঁধের বাধমুখে
মোদের চারিদিকে ভীম পাথার।
রাষ্ট্র সমাজে কি শরীর চর্চায়
ধবার খেলাধরে আমরা দীন
দেখ তো পার যদি, তোমার সাধনায়
কালিমা ঘুচে যা'ব একটি দিন।
সকল পরাজয় একটি দিকে যদি
বিজয়ী হয়ে পারি তুলিতে শির
গাহিব তব নাম আমরা নিরবধি
কুমারী লীলা হও সাঁতারে বীর।"

১৯৩৭ খ্রীঃ অঃ ৩০ মাইল শেষবারের মত হয়। এই প্রতিযোগিতায় বাঙলার একমাত্র সাঁতারু সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সভ্যা কুমারী লীলা চ্যাটার্জী নিখিল ভারত সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ১৯-২০ জন পুরুষ সাঁতারুদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ষষ্ঠস্থানের অধিকারিণী হন। এই কৃতিত্ব ও এই মর্যাদা আমার নয়, আমার প্রিয় শিষ্য শ্রীমান শ্যামপদ গোস্বামী ও রাধা-বল্লভ সামন্তর—তাদের এই প্রাপ্য।

আমরা তাঁদের হাতে কুমারী লীলাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম সাঁতারু-দৌড়ের প্রথম থেকেই (ভিড় কাটার জন্য) এমন জোরে সাঁতার কাটতে সুরু করলে যাতে ঘোর আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু তাঁরা আমাকে নৌকো থেকে ফেলে দিতে আসেন। বললেন—আপনি কোনো কথা কইবেন না, চুপ করে ব'সে থাকুন। আমরা যা' ভাল বুঝবো তাই করবো, ইত্যাদি ইত্যাদি—

চন্দননগর পর্যন্ত লীলা সকলের আগে শেষ কুম্বং দ্বিতীয়।

১৯২৫ খ্রীঃ অঃ ২৩ মাইল সন্তরণ প্রবর্তিত হয়। ঐ প্রতিযোগিতাও মাত্র তিন বৎসর খুব আড়ম্বরের সঙ্গে চলে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ছিল ভাটপাড়া থেকে কুমারটুলি ঘাট। স্বর্গত দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এটর্নি এট-ল ছিলেন ঐ মঞ্চের হোতা। প্রথম বৎসর প্রফুল্ল-কুমারের সঙ্গে প্রফুল্ল পেটে খিল ধরায় সে সারা জলপথ এক হাতে সাঁতরান। হাটখোলার জ্ঞান চট্টোপাধ্যায়ের "ডৌ হিট" হয়। ১৯২৬-২৭ জ্ঞান চট্টোপাধ্যায় জয়ী হন।

দীর্ঘপথ সন্তরণের কথা আলোচনা করতে গেলে আনন্দ স্পোর্টিং সুইমিং ক্লাব ও শ্রীরাম-পুরের চিত্তরঞ্জন এ্যাথলেটিক ক্লাবের কথাও বলতে হয়। এ'দের প্রবর্তিত সাড়ে চার মাইল, ৭ মাইল ও ১৩ মাইল—বালি ব্রিজ, পানিহাটির বড় মন্দির ঘাট ও অবশেষে গান্ধীঘাট থেকে বেনেটোলা এবং চিত্তরঞ্জনের হুগলী থেকে প্রবর্তিত সন্তরণ প্রতিযোগিতা বহুদিন ধরে এদেশের যুবকদের সন্তরণ ব্যাপারে উৎসাহিত করে আসছেন। এই প্রসঙ্গে লেখকের সাত-মাইল শীর্ষক কবিতাখানি সমবেত দর্শকদের মধ্যে বিলি করা হয়। নিম্নে একছত্র মাত্র উদ্ধৃত করলাম :—

১৯৩৬

আয় ভাই মদনা কোটকে পাল্লা
লীলা-বাণী কই রে, তাড়াতাড়ি বাল্লা,
ওই শোন হুইসিল বাজছে জোরে
সাব, সাব এইবার দাঁড়া এসে মঞ্চে।
সাত মাইল পাল্লা বালির ঘাট
সাত-জন সাঁতরে দিচ্ছে স্টার্ট।

বর্ষানুক্রমিক বিজয়ীদের নাম :—

১৯৩১ ডি এন দাস (গুশানেশ্বর), ১৯৩২ এস কে দে (ন্যাশনাল), ১৯৩৩ ডি মাল্লিক (গুশানেশ্বর)।

১৯৩৪, এন সি মাল্লিক (ন্যাশনাল); ১৯৩৫ মদন সিং (আনন্দ): ১৯৩৬, ডি দাস (কলেজ স্কোয়ার), ১৯৩৭ মদন সিং (আনন্দ), ১৯৩৯ এস কে চ্যাটার্জী (ভবানীপুর), ১৯৪০, এস চ্যাটার্জী (নন্দলাল ইনস্টিটিউট) ১৯৪১, বি কে ব্যানার্জী (বালি রিভার টমসন স্কুল।)

মুর্শিদাবাদ গঙ্গাবক্ষে দূরপাল্লার সন্তরণ সর্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হয় ১৯২৮ খ্রীঃ অঃ সয়দাবাদ। প্রতিযোগিতার দূরত্ব ছিল ৩ মাইল। তিন বছর অনুষ্ঠিত হবার পর এই প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৮ খ্রীঃ অঃ মুর্শিদাবাদ সুইমিং এ্যাসো-সিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪১ খ্রীঃ অঃ থেকে ঐ এ্যাসোসিয়েশন দূরপাল্লার প্রতিযোগিতা শুরু করে—দূরত্ব ছিল ৭ মাইল। ক্রমে ঐ পথ বাড়িয়ে ১৯৪৪ খ্রীঃ অঃ থেকে ১৩ মাইল করা হয়। জিয়াগঞ্জ সদরঘাট থেকে গোরাবাজার ফেরিঘাট অবধি।

১৯৬১ খ্রীঃ অঃ জঙ্গীপুর ঘাট থেকে গোরাবাজার ফেরিঘাট পর্যন্ত ৪৫ মাইলব্যাপী সাঁতার সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলকভাবে অনুষ্ঠিত হয়। বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতির সভ্য শীতাংশু হাজরা ১০ ঘঃ ৯ মিঃ ঐ পথ অতিক্রম করে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেন। ১৯৬২ খ্রীঃ অঃ থেকে নিয়মিতভাবে ঐ প্রতিযোগিতা প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে।

১৯৪৪ থেকে বর্ষানুযায়ী বিজয়ীদের নাম :—
১৯৪৪-৪৬ সুধীররঞ্জন সান্যাল (বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতি), ১৯৪৭, বিমলচন্দ্র কুণ্ডু (বিবেকা-নন্দ ব্যায়াম সমিতি); ১৯৪৮ লালমোহন হালদার (বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতি)। ১৯৪৯, বিমলচন্দ্র কুণ্ডু (বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতি), ১৯৫০-৫১ খেলা হয় নি; ১৯৫২ সুধীররঞ্জন সান্যাল, ১৯৫৩-৫৪ বিমলচন্দ্র কুণ্ডু (বিবেকানন্দ ব্যায়াম সমিতি); ১৯৫৫ অমিয়কুমার কাৰ্য্যকর্তা (ঐ), ১৯৫৬-৫৯ সুবলচন্দ্র দাস (ঐ); ১৯৬০ [illegible] সাহা (হাটখোলা), ১৯৬১-৬২ নিমাই দাস (হাটখোলা): ১৯৬৩ মহেশচন্দ্র কাপাসী (আগরতলা)।

৪৫ মাইল বিজয়ীদের নাম :—

১৯৬২ দেবীপ্রসাদ দত্ত (স্টেট ট্রান্সপোর্ট) ১৯৬৩ জনার্দন ভট্টাচার্য (আগরতলা), ১৯৬৪ দেবীপ্রসাদ দত্ত (স্টেট ট্রান্সপোর্ট)।

ইংলিশ চ্যানেল সাঁতার

ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ থেকে ইংল্যাণ্ডে ইংলিশ চ্যানেল সাঁতারে পার হবার স্পৃহা জাগে। সাঁতারুদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য পাশ্চাত্য জাতি হাজার হাজার টাকা ব্যয় করতে কুণ্ঠিত হননি। যতদূর জানা যায় ১৮৭২ খ্রীঃ অঃ ২৪শে আগস্ট মিঃ জে বি জনসন নামে একজন ইংরেজী সাঁতারু সর্বপ্রথম ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হবার চেষ্টা করেন। তিনি ডোভার থেকে যাত্রা করে ৬৫ মিঃ জলে থেকে প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যে পড়ে জল ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু তাঁর উদ্যম ব্যর্থ হয়নি। তাঁর প্রদর্শিত পথে ক্যাপটেন ম্যাথুওয়েব ১৮৭৫ খ্রীঃ অঃ ১২ই আগস্ট ডোভার থেকে যাত্রা করে ৬ ঘঃ ৪৫ মিঃ সাঁতরে দুর্ভাগ্যবশত জল ত্যাগ করেন। কিন্তু তিনি এখানেই থামেন

মি। এই ঘটনার পরে তিনি আবার ২১ ঘঃ ৪৫ মিঃ সাঁতার কেটে অবশেষে চ্যানেল উত্তীর্ণ হতে সক্ষম হন। এতে ইংলণ্ডে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

ক্যাপ্টেন ওয়েব যে একজন অসমসাহসী সন্তরণবীর ছিলেন তাহার কোনো সন্দেহ নাই। ১৯৭৪ খ্রীঃ অঃ 'রাশিয়া' নামক একখানি জাহাজ নিউইয়র্ক থেকে লিভারপুল যাচ্ছিল। একদিন প্রবল ঝড়ের সময় জনৈক আরোহী জাহাজের ডেক থেকে অকস্মাৎ সমুদ্রের জলে পড়ে যান। ঐ সময় ক্যাপ্টেন ওয়েব ডেকের উপর বেড়াচ্ছিলেন। তিনি তন্মুহূর্তেই সেই তরঙ্গসঙ্কুল মহাসমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং বহুক্ষণ ধস্তাধস্তি করে নিমজ্জমান ব্যক্তিটিকে হতচৈতন্য অবস্থায় বহু কষ্টে উদ্ধার করেন। ক্যাপ্টেন ওয়েব ১৮৮৩ খ্রীঃ অঃ "নায়াগ্রা ফলসে" সাঁতার কাটতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

এরপর ১৯১১ খ্রীঃ অঃ মিঃ উইলিয়ম বার্জেস নামে আর এক ইংরেজ সাঁতারু বহুবার ব্যর্থতার পর অবশেষে ২২ ঘঃ ৩৫ মিঃ সময়ের মধ্যে চ্যানেল অতিক্রম করেন।

ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ীদের নাম :—

১৯২৩, ৬ই আগস্ট এইচ, সুলিভ্যান—২৬ ঘঃ ৫০ মিঃ; ঐ সনে ১২ই আগস্ট, এম টিরবোচি—১৬ ঘঃ ৩৫ মিঃ, ঐ সনে ৯ই সেপ্টেম্বর পি টোথ—১৬ ঘঃ ৫৪ মিঃ, ১৯২৬, ৬ই আগস্ট মিসেস কর্সন—১৫ ঘঃ ২৮ মিঃ : ঐ সনে ৩০শে আগস্ট, এইচ বিনার কোটার—১২ ঘঃ ৪ মিঃ : ঐ সনে ১০ই সেপ্টেম্বর জি, মাইকেল—১১ ঘঃ ৫ মিঃ, ঐ সনে ১৭ই সেপ্টেম্বর এন এল ডারহাম—১৫ ঘঃ ৫৬ মিঃ; ১৯২৭, ৫ই আগস্ট ই এইচ টেমি—১৪ ঘঃ ২৯ মিঃ, ঐ সনে ৭ই অক্টোবর, মিস গ্লিজে ১৫ ঘঃ ১৫ মিঃ, ঐ সনে ১৩ই অক্টোবর, মিসেস আই ডিজিল—১৫ ঘঃ ৯ মিঃ; ১৯২৮ ১৯শে আগস্ট, মিস আইভি হাউকে, ১৯ ঘঃ ১৬ মিঃ; ঐ সনে ২৪শে আগস্ট মিস হিলডা শার্প—১৪ ঘঃ ৫৮ মিঃ, ঐ সনে ১লা সেপ্টেম্বর, ডুর্নো—২১ ঘঃ ৪৫ মিঃ এবং আরও অনেকেই। আজ পর্যন্ত প্রায় ১০০-র উপর লোক সাঁতরে চ্যানেল পার হয়েছেন।

ডোভার থেকে ফ্রান্সের উপকূল মাত্র ২১ মাইল। কিন্তু চ্যানেল অতিক্রমকারী সাঁতারুদের প্রায় সকলকেই ঝড়, তুফান, মাঝে মাঝেও হিমশীতল স্রোত, কুয়াশা প্রভৃতি নানা বাধা বিঘ্ন কাটিয়ে ৪০।৫০ মাইল পর্যন্ত সাঁতরে যেতে হয়। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ফ্রান্সের উপকূল থেকে ইংলণ্ডের দিকে পাড়ি দিয়েও আসেন। গেট্রু এডেরেল, রেগুা ফিসার, ই টেমি, ফ্লোরেন্স চাডউইক, নেডিবার্ন, মলিন বেল ও মিসেস গ্রেটা এণ্ডারসন এবং আরও অনেকেই উভয়কূল থেকে সাঁতরেছেন।

১৯২৮ খ্রীঃ অঃ ভারতীয়দের মধ্যে হায়দ্রাবাদ কলেজের ছাত্র মহম্মদ সফি ইংলণ্ডে থাকাকালীন চ্যানেলের উপকূল ধরে কিছু কিছু সাঁতার কেটেছিলেন। এরপর শ্রীমিহির সেন, হিমাদ্রি রায়, নীতীন্দ্রনারায়ণ রায়, ডাঃ বিমলচন্দ্র ও পাকিস্তানের ব্রজেন দাস, আরতি সাহা প্রমুখ সাঁতারুদের মধ্যে একমাত্র হিমাদ্রি রায় ছাড়া সকলেই চ্যানেল অতিক্রম করেন।

১৯৫৮ খ্রীঃ অঃ ২৩শে আগস্ট পূর্ববঙ্গের শ্রীব্রজেন দাস (ইনি কোলকাতা সেণ্ট্রাল স্যুইমিং ক্লাবের আজীবন সভ্য) প্রথম প্রচেষ্টায় ব্যাটলিন রেসে ১৪ ঘঃ ৫২ মিঃ সময়ের মধ্যে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে পুরুষ বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ঐ বৎসরেই আবার ইটালীতে ক্যাপরি থেকে নেপলস পর্যন্ত (১৮-১৯ কিলোমিটার জলপথ) সন্তরণ প্রতিযোগিতায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। ১৯৫৯ খ্রীঃ অঃ ২৭শে আগস্ট আবার ব্যাটলিন রেসে ১৩ ঘঃ ৫২ মিঃ সময়ের মধ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন এবং ইংলণ্ড থেকে ফ্রান্স ১৩ ঘঃ ২৬ মিঃ এবং ক্যাপরি থেকে নেপলস অতিক্রম করে বিশ্বের এক নূতন রেকর্ড সৃষ্টি করেন। পরবৎসর ১৯৬০ খ্রীঃ অঃ ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড ১৩ ঘঃ ৪৩ মিঃ আবার ঐ পথ ১১ ঘঃ ৪৮ মিঃ এবং ১৯৬১ খ্রীঃ অঃ ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড ১০ ঘঃ ৩৫ মিঃ সাঁতার কেটে সকলের বিস্ময় উৎপাদন করেন।

১৯৫৯ খ্রীঃ অঃ-এর বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, সেণ্ট্রাল স্যুইমিং ক্লাবের আজীবন সভ্য ডাঃ বিমল চন্দ্র প্রথম প্রচেষ্টায় ফ্রান্স থেকে সাঁতরে ইংলণ্ডে আসেন। তিনি ১০ই সেপ্টেম্বর ভোর ১টা ২০ মিঃ-এ জলে অবতরণ করেন এবং পরদিন বেলা ৩টা ১০ মিঃ সময়ের মধ্যে চ্যানেল অতিক্রম করিতে সক্ষম হন।

ডাক্তার বিমলচন্দ্র 'ব্যাটলিন' রেসে অবতরণকালে যথাসময়ে 'পাইলট বোট' না আসায়, মিঃ ব্যাটলিন জলে নামতে নিষেধ করেন। এই প্রসঙ্গে কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি এখানে উদ্ধৃত করবার লোভ সামলাতে পারলাম না।

মনে পড়ে সেই দিন গভীর নিশীথে,
'কাপ-গ্রিজ'-নে-তে হায়! অসহায় হয়ে
ফরাসীর উপকূলে দুরন্ত সে শীতে
ব্যাকুল দাঁড়িয়েছিলে। কাল গেল বয়ে।
কোথা ডিঙি, কোথা লঞ্চ, নাহি কোনো সাড়া,
ঝাঁপাইতে গেলে জলে একা দিতে পাড়ি,
উপেক্ষি নিষেধের বাণী পাগলের পারা,
'ব্যাটলিন' মৃত্যুর মুখে দিলনাকো ছাড়ি।

১৯৬১ খ্রীঃ অঃ ২২শে সেপ্টেম্বর, আর্জেন্টিনার ৪২ বৎসর বয়স্ক সন্তরণ শিল্পী মিঃ এণ্টনীও আর্বার্টাণ্ডো ইংলিশ-চ্যানেল সাঁতরে যুগপৎ যাওয়া আসা করে ... সাঁতারুদের গৌরব কি... করে দেন এবং বিশ্ববাসীকে বিস্মিত ও চমৎকৃত করেন।

ইংলিশ চ্যানেল সন্তরণে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব প্রদান করেন হাটখোলা স্যুইমিং ক্লাবের সভ্যা কুমারী আরতি সাহা। তিনিও ফ্রান্স থেকে ইংলণ্ড ১৬ ঘঃ ২০ মিঃ সময়ের মধ্যে চ্যানেল অতিক্রম করে সন্তরণে সমগ্র এশিয়ার নারী জগতের মধ্যে অগ্রগণ্যা হয়েছেন। এর পূর্বে তিনি ১৯৫৯ খ্রীঃ অঃ ২৭শে আগস্ট ব্যাটলিন রেসে অবতরণ করেন ইংলণ্ডের উপকূল থেকে প্রায় ৩।৪ মাইল দূরে প্রতিকূল স্রোতে পড়ে উঠে পড়তে বাধ্য হন। কিন্তু ব্যাটলিন রেসের নিয়মানুযায়ী তিনি মহিলা বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকারিণী বলে গৃহীত হয়ে পুরস্কার লাভ করেন।

শুধু ভারতের নয়, সারা এশিয়ার
রাখিলে নারীর মান, তব জয়গানে
সারা বিশ্বে করিতেছে রোমাঞ্চ সঞ্চার,
নব আশা জাগায়েছ বাঙালীর প্রাণে॥

॥ ইন্দ্রসেন ॥

"The banjos rattled, and the tambourines
Jing Jing Jingled in the hands of the Queens."
—Lindsay Nicholas Rachel.

স্থান—গঙ্গানদীর শাখা-প্রশাখা-বেষ্টিত গৌড়ের সংলগ্ন একতালা দুর্গ। কাল—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর। রোশনাইয়ের জৌলুসে দুর্গের ছায়া, নদীর বুকে আলোর ঝিলমিল তুলছে। কেল্লার উচ্চ প্রাচীর-শীর্ষে দীপমালার সারি জ্বলছে। মধুর বাতাসে দীপের শিখাগুলি কাঁপছে ধিকিধিকি। আতস-বাজী পুড়ছে অবিরাম। থেকে থেকে হাউই উড়ছে আঁধার-আকাশে। একটা একটা আলোর ফোয়ারা, খানিক আলো ছড়িয়ে ফুরিয়ে যায় অকস্মাৎ। চোখে যেন ধাঁধা লাগছে। রাশি রাশি তারা, খ'সে পড়ছে শূন্য থেকে। লাল সবুজ সোনালী আলোকধারা, যেন খোদার অকৃপণ আশীষ, ঝ'রে ঝ'রে পড়ে। দূরে কোথায় ঘন ঘন তোপ পড়ছে। মাটিতে কাঁপন লাগছে তোপের আকাশ-ফাটা শব্দে। নহবৎখানায় রোশনচৌকি ব'সেছে। কৌশিকী কানাড়া রাগ ধ'রেছে সানাই। দুর্গাভ্যন্তরে, মহলে মহলে প্রতিটি কামরায়, কণ্ঠে কণ্ঠে অব্যক্ত গুঞ্জনের গুনগুন সুরু হয়। সুরের ইন্দ্রজালে যেন এক অনাস্বাদিত মোহ সৃষ্টি করে। ভাগীরথীর অপর তীর থেকে শোনা যায়, রাতের রাগ ভেসে আসছে।

দুর্গের বাহিরে কড়া পাহারা। সঙ্গীনধারী সিপাইরা মন্থরগমনে পায়চারী করছে।

লোহার ফটক আগলে আছে একদল তুর্কীসওয়ার। কারও হাতে নিশান। কারও হাতে বর্শা। কারও হাতে বন্দুক। ফটকের দু'পাশে গজনল কামান। ক'জন আমীর আর অমাত্য ফটকরক্ষার কাজে নিযুক্ত। চলা-ফেরায় কটিতে ঝুলানো তরবারি ঝনঝনিয়ে ওঠে। প্রস্তর-পথে পদাঘাত করছে অশ্বশ্রেণী। নালের লোহা ধাতব ধ্বনি তোলে।

উৎসবের রাত্রি, প্রহরীরা তাই যেন কিছু বেশী সাবধান, সজাগ নজরে দেখছে এধার-সেধার। অজানা অচেনা মুখ দেখলেই সঙ্গীন বাগিয়ে ধরছে। আগাপাশ-তলা তল্লাশী করছে। প্রমোদ-উল্লাসের সুযোগে কেউ যেন চোখে ধুলা দিতে না পারে। কোন দুশমন বদমায়েস না সিঁদোয় দুর্গ-মধ্যে।

সম্মুখ-যুদ্ধে ভীত নয় সুলতান হোসেন শাহ। যুদ্ধ-বিদ্যায় তিনি সুপটু। অসিচালনায় সিদ্ধ-হস্ত। তবে গুপ্তঘাতক আততায়ীকে বড় ভয় করেন

সুলতান। অতর্কিত আক্রমণের আশঙ্কায় অস্থিরচিত্ত থাকতে হয় হোসেনকে। বিশেষত রাত্রিকালে। শুধুমাত্র ঘাতকের ভয়ে, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যই হোসেন তাঁর রাজধানী গৌড় থেকে একডালায় স্থানান্তরিত করেন। দুর্ভেদ্য এই দুর্গ নির্মিত হয় গঙ্গার আবেষ্টনে।

একেই বাঙলার মসনদের অধিকারীদের ভাগ্য ভারি মন্দ। উপর্যুপরি তিনজন, আততায়ীদের হাতে মৃত্যুবরণ করেছেন। শেষ হাবসী সুলতান মুজঃফর শাহকে হত্যার মূলে যে কার ষড়যন্ত্র, যখন একলা থাকেন হোসেন, তখন মনে পড়লে শিউরে ওঠেন।

প্রথমে যুদ্ধ চলে দুইপক্ষে। দীর্ঘ চার মাস ধ'রে ঘোরতর যুদ্ধ চলতে থাকে। দুইপক্ষের বহু সৈন্যসামন্ত হতাহত হয়। শেষ যুদ্ধে এক লক্ষ কুড়ি হাজার লোক নিহত হল। কিন্তু মুজঃফর শাহের অঙ্গ কেউ স্পর্শ করতে পারে না।

শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ।

শেষে পাইকদের সর্দারকে হাত করলেন হোসেন। প্রচুর অর্থ ঘুষ দিলেন। কয়েক ধামা স্বর্ণমুদ্রা।

সোনাদানার লোভে মুজঃফরের অন্তঃপুরের রাস্তা দেখিয়ে দেয় সর্দার। কয়েকজন অনুচর সঙ্গে যায় হোসেনের। অপ্রত্যাশিত আক্রমণে আত্মরক্ষায় অসমর্থ মুজঃফর আত্মবিসর্জন দিলেন। অঙ্গে অঙ্গে ক্ষুরধার তরবারির আঘাত লাগে। হাবসীর রক্তধারায় স্নান করে ঘাতকের দল। হোলি খেলা চলতে থাকে যেন!

হোসেন শাহ প্রভুহন্তা। তাই পদে পদে অপঘাতে মৃত্যুর ভয়। কে যে কোথায় আত্মগোপন ক'রে লুকিয়ে আছে কে জানে। তার হাতে হয়তো শানানো ছুরি। বুকে রক্তের পিপাসা।

মুজঃফরের শেষ-সময়ে উপস্থিত ছিলেন হোসেন শাহ। স্বচক্ষে দেখেছেন আঘাতে জর্জর মুজঃফরের মৃত্যুযন্ত্রণার বীভৎস রূপ। স্বকর্ণে শুনেছেন মুজঃফরের কাতর আর্তনাদ। মুমূর্ষুর শেষ প্রার্থনা। মুজঃফর বলেন,—একটুকু পানি।

ঘাতকের দল অট্টহাসি ধরে। হাসতে হাসতে আরও কয়েকটা কোপ বসিয়ে দেয় মুজঃফরের দেহে। মৃত্যু নিকটতর হয়। অন্তিমশ্বাস যতক্ষণ না পড়ে, ততক্ষণ রেহাই নেই। রক্তাপ্লুত ধরাশায়ী শরীর। নিস্পন্দ হতে আর কত দেরী? সবুর সহ্য হয় না ঘাতক দলের।

নতুন রাজধানী একডালা আজ বড়ই মুখর চঞ্চল! কোলাহলে পরিপূর্ণ। আলোয় আলোয় সমুজ্জ্বল। কে বলবে যে এখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। সরাই আর লঙ্গরখানা সাধারণের জন্য উন্মুক্ত আছে। যে যত পারো খাও, পান কর'। রুটি মাংস, পোলাও, হালুয়া, বর্ফী, কুলফী, সরবৎ—যার যা মন চায়। অচল শুধু মদিরা। সুলতান হোসেন শাহ মদ্যপানের ঘোর বিরোধী। মদ অমৃত নয়, গরল। সুতরাং বিষবৎ পরিত্যাজ্য।

রাজধানী স্থানান্তর উপলক্ষে পক্ষকালব্যাপী উৎসবের এই আয়োজনে দেশে সাড়া প'ড়েছে। অতিথি-অভ্যাগতদের উপস্থিতিতে একডালা দুর্গ গম গম করছে। সঙ্গীত, নৃত্য, বাদ্য, বাদ্যখেলা, ভেলকি—কিছুই বাদ নেই। সঙ্গে সঙ্গে চলেছে ভূরিভোজ। বাবুর্চিখানার চুল্লীগুলো দিবারাত্র জ্বলছে। হালুইকর মিষ্টান্ন তৈরী করছে।

সুলতানের পক্ষ থেকে প্রার্থনার ব্যবস্থা হয়েছে মসজিদে। সুলতানের জয় হোক। হোসেন শাহ দীর্ঘজীবী হোন। তাঁর সুখ-সম্পদ অটুট থাক।

হারেমে হাসির তুফান চলেছে। বেগম মহলে ভারি ধুম।

রোজনামচা লেখা শেষ হ'লেই সুলতানের আবির্ভাব হবে। হারেমের দুয়োরে দুয়োরে চেড়ী ও স্ত্রী-দারোগা নিযুক্ত আছে। প্রধান দ্বারে মুসরেফ চৌকীদারে রত। মুসরেফের দস্তখতী কাগজ ব্যতীত কোন কাজ হয় না। হারেমের বহির্ভাগে দলে দলে খোজা প্রহরী।

মজলিস-কক্ষটি সর্বদা সুসজ্জিত থাকে। চন্দনকরা টাটকা ফুল পুষ্পাধারে স্তূপীকৃত আছে। চামেলী, চামেলী, সেঁউতি, হেনা, চাঁপা, নাগকেশর, গোলাপ, মালতী ফুলই পুষ্পপ্রিয় সুলতান অধিক পছন্দ করেন। স্বর্ণ ও রৌপ্যের ধূপদানিতে ধূপ, ধুনা, গুগ্গুল, আম্বর, কর্পূর, চন্দনকাঠ জ্বলছে। আতরদানে নানা সুগন্ধি। কস্তুরী, নার্গিস, বেল, গুলাবী, কেওড়া, চামেলী, হেনা। রত্নখচিত গোলাপ-পাশগুলিকে মসনদের পাশে দেখায় যেন ফুলগাছের চারা।

বেগম আর সেবিকার পাল হাসি-ঠাট্টা, টিটকারি, খোস-গল্পে মশগুল। হোসেনের মাত্র চারটি বেগম। তাঁদের হাতে হাতে আয়না। কথা ও হাসির ফাঁকে ফাঁকে আয়না তুলে আপন আপন মুখবিম্ব প্রত্যক্ষ করছেন। যদি কোন ত্রুটি দেখা যায়। সুর্মারেখার টান ছেড়ে গেছে কি! টিপ আর সিঁথি কি ঠিক ঠিক যথাস্থানে আছে? কানে হীরার মাকড়ী কি জ্বলজ্বল করে! বেঁকা খোঁপায় বসানো কাটার গোলাপী মুক্তাগুলি কি নজরে পড়ে! সাতনরী কণ্ঠহার? রত্নময় চিকের সদাচঞ্চল ধুকধুকির হীরকখণ্ড কি কাঁপছে।

সব-নম্ মলমলের শালোয়ার পেশোয়াজ বেগমদের পরনে। যেন সাজ্জা-শিশির অঙ্গে মেখেছেন। এই সব-নম্ ঘাসের ওপর পেতে রাখলে- - -নটী আর সেবিকাদের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ঝুনা মলমল। মাকড়সার সূক্ষ্ম জাল বলেই ভ্রম হয়। ঝুনার ঘাঘরা আর পাজামা।

কখনও হাসির হিল্লোল ওঠে। কখনও বা নূপুরের নিক্কণ শোনা যায়। হাতে হাতে রুলী, চুড়ী, কাঁকন

ঝিম ঝিম বাজায়। নূপুরের কিংকিণী ; ঘুঙুর ঝমঝম বাজতে থাকে।

মাথায় মাথায় বর্ণাঢ্য মসলিনের ওড়নায়, মতির ফুটকি নানা রঙের চিকন তুলছে। কেউ বা আয়নায় লাল অধর দেখছেন। সোনালী তবক দেওয়া মিঠাপানের একটি একটি খিলি মুখে তুলছেন। মধ্যে মধ্যে একেক টিপ সুতি বা জর্দা। ইশারায় ডাক পাড়ে সেবিকাকে। মুখের কাছে সোনার পিকদান তুলে ধরতে হবে।

হাতের বাজুবন্দ শিথিল করতে হবে। কারও কোমর-পাট্টা আলগা হয়েছে, এঁটে না দিলে চলবে না। কিংখাবের তাকিয়া এগিয়ে দিয়ে যাও। বারাণসী কাতানের জরিদার কাঁচলী, হয়তো কোন বেগম আঁটসাঁট বাঁধতে চাইছেন। কেউ চান, ঠাণ্ডা সরবতের পেয়ালা। ফরমাসের শেষ নেই যেন। হুকুমের অন্ত নেই। মিহি মিষ্টি সুরের নারীকণ্ঠের কথা, হাসির ঐকতানে চাপা পড়ে।

—এক পেয়ালা ডালিমের রস চাই।

—যা, খানকতক পেস্তার বর্ফী আন্।

—আঙুরের রস আনতে ভুলিস না

—ক'টা দিলখুশা সন্দেশ আনিস। খান কয় বাদামের চাকতি।

—লেবুর নিমকী চাই।

—কিসমিসের আচার।

ঢাকাই কাজের স্বর্ণপাত্রে ফল আর মেওয়া থরে থরে সাজানো। মন ওঠে না। রসনা চায় না আর। আপেল আর আখরোট কে এখন চর্বন করে!

খাসমহলের লাগোয়া এক কক্ষে সেতারের ঝনন্ শোনা যায়। গজলের সুর বেজে ওঠে। তবলায় চাঁটি পড়ছে। নটীরা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে। মুখ টিপে টিপে হাসছে কেউ কেউ। রূপবতীদের গালে টোল পড়ছে। জরি আর ফুলের মালা জড়ানো বেণী, দুলছে সাপের মত। ঘাঘরা, ঢেউ তুলছে মুক্ত বাতাসে। যেন পাক খাওয়ার বাসনা জানায় ক্ষণে ক্ষণে।

হাসি-তামাসা চলে মাঝে মাঝে বেগমরা আসমানে চোখ মেলছেন। বাজীর বাহার দেখছেন মুগ্ধ চোখে। হাতে সদ্যফোটা রক্তগোলাপ একেকটি, সুগন্ধ সেবন করেন। নাসিকাপ্রান্তে তুলে ধরেন ফুটন্ত লাল কুঁড়ি।

ফুলের ঝুমকো দুলছে লাল চাঁদোয়া থেকে। এক-আধটা পাপড়ি খসে পড়ছে গালিচায়। খাসমহলের স্তম্ভে দেওয়ালে ফুলের তোড়া। গন্ধ-মাতাল হাওয়ায় কাঁপছে ফুল আর পাতা।

হারেমের প্রধান দ্বারে মুসরেফ হাঁক ছাড়ে হঠাৎ। নিমেষের মধ্যে শৃঙখলা ফিরে আসে। তাড়াহুড়ায় ছোটাছুটি লেগে যায়। সুলতানের আগমন-বার্তা ঘোষণা করা হয়। মুসরেফ উচ্চরবে বলে,—নবাব আলা-উদ-দুনিয়া-ওয়াদ-দীন আবুল মুজঃফর হোসেন শাহ হাজির।

সাড়া প'ড়ে যায় হারেমে। জাঁহাপনা এসে পড়েছেন। সেবিকার পাল চীকের আড়ালে লুকিয়ে পড়ে। ওড়নায় মুখ ঢাকে। রেসমী রুমাল তোলে মুখে। আর নয় হাসাহাসি। কথা থেমে যায়। চুপ। চুপ। চুপ। নবাব বেয়াদপি বরদাস্ত করেন না কোন মতে। হারেমের শাসন-শৃঙখলা মানতেই হবে।

কখনও ভীতির কাতরতা, কখনও হাসি-আনন্দের আভাস খেলে, নবাবের শ্যাম মুখে। সভয়ে লক্ষ্য করেন হারেমের প্রবেশ-পথের একটি একটি স্তম্ভ। আড়ালে যদি লুকিয়ে থাকে কোন আততায়ী, গুপ্তঘাতক! কটিদেশে ঝুলানো, খিলাফে ভরা কওতল তরবারী স্পর্শ করেন নবাব। কারেদ ছুরিকা কোমরবন্ধে। হাতীর দাঁতের খাপে, ছুরির হাতোলে চুনী-পান্নার অলঙ্করণ।

দিনের শেষে এই প্রথম দেখা হবে বেগমদের সাথে, সঙ্গসুখের খুশিতে হাসি ফোটে নবাবের চিকালো সুন্দর মুখচন্দ্রে।

দূর থেকে বেগমরা দেখলেন, এক রাশ জেল্লা এগিয়ে আসছে মধ্যগতিতে। নবাবের মাথায় তাজ-মুকুটে ছাঁকা হীরার কলকা। শিখীর শিখা, ময়ূরের পেখম কলকা-চূড়ায়। শুভ্র রেশমের তাকোচিয়ে ও সাটিনের ঝলঝলে পাজামা নবাবের অদ্যকার পরিচ্ছদ! তাকোচিয়েতে নবাবকে দেখতে লাগে ঠিক যেন আলখেল্লাধারী দরবেশ ফকির। বিশ রতি ওজনের একেকটি মুক্তায় গ্রথিত একনরী মালা ঝুলছে বিস্তৃত বক্ষে। সবজা পাথরের খামি মালার মধ্য-অংশে। নবরত্নের কণ্ঠহার। দুই কানে হীরার কুণ্ডল। কুঁচা হীরাবেষ্টিত রক্তমুখী নীলার অঙ্গুরীয়টা যেন বেশি চোখে পড়ে। আরও আংটি আছে কয়েকটা। আছে বৈদুর্যমণি, নারঙ্গবর্ণ গোমেদ, প্রবাল।

নবাবের পিছনে আসছে জনাকয় দেহরক্ষী ও খাসখানসমা। তারা আসছে কুর্ণিশ ঠুকে ঠুকে। নবাবকে বেগম মহলে পৌঁছে দিলেই আপাতত তারা ছুটি পাবে।

চার বেগম পাশাপাশি দণ্ডায়মানা। সাজসজ্জার বহরে যেন চিনতে পারছেন না নবাব। খানিক নূরে হাত বুলাতে থাকেন তিনি। চিন্তাকুল চাহনি ফোটে চোখে। বেগমরা আজ বড় ধোঁকা দিয়েছে সাজ-বিন্যাসে। যেন অচেনা অদেখা তাঁরা। একেবারে আনকোরা। নতুন নতুন। চিবুকে হাত তুলতেই আঙটি ক'টা ঝলমলিয়ে ওঠে। নবাবের হাতে যেন আকাশের এক গুচ্ছ তারা জ্বলছে। মোলায়েম হাসি হেসে নবাব বললেন,—বাঃ। বাহবা। খাসা মানিয়েছে! এই বুড়টাকেই কেবল বেমানান লাগছে হুরীদের পাশে।

স্মিত হাস্যরেখা দেখা দেয় বেগমদের মুখে মুখে। তারা সেলাম ঠুকতে থাকেন। অভিবাদন জানাতে থাকেন নবাবকে। আর মনে মনে আঁচতে থাকেন প্রত্যেকে, আজ নবাবের সমীপে কী কী আরজি পেশ করবেন। কে কি প্রার্থনা জানাবেন। কে কোন্ দৌলত চাইবেন।

সুলতানের উক্তি তো নয়, যেন আক্ষেপ প্রকাশ করলেন। সত্য কথা বলতে কি কিঞ্চিৎ অধিক বয়সেই সিংহাসনে আরোহণ করেছেন হোসেন শাহ। ৮৯৯ হিজরায়। হোসেনের এখন প্রৌঢ়াবস্থা।

নির্দিষ্ট ফরাসে আসীন হলেন নবাব। দুই পাশে ও পিছনে কিংখাবের তাকিয়া, শোভা পায়। সোনালী জরির তুলাভরা আসন। জনৈকা সেবিকা এসে ফরসির নল ধরিয়ে দিয়ে যায় নবাবের হাতে। সোনার হস্তীমুখী নল-মুখ। স্বর্ণ সূতা, কালো আর নীল রেশমের বেড়, প্রলম্বিত নলে। আর এক সেবিকা এসে আতরদানির ঢাকনি খুলে দেয়। পান-তাম্বুল, মেওয়ার রেকাবী এগিয়ে দেয়। আসনের তিন দিকে পুষ্পাধার। তাজা গোলাপের ডালি, মতিবেলের তোড়া। চাঁপার থোকা।

আতরের তুলা কানে পুরতে থাকেন নবাব। এটা সেটা নাকে তুলে পরখ করেন। পছন্দ করেন বাত কী রাণী। শাহনাজ।

—চৈপকচীকে বুলাও।

নবাব হুকুমজারি করলেন নাতিউচ্চস্বরে। চৈপকচী রত্ন-ভাণ্ডারের কোষাধ্যক্ষ।

বেগমদের মুখে হাসির ঝিলিক খেলে। এ ওর মুখপানে তাকায়। হাসির বিনিময় চলতে থাকে।

বার কয় সুখটান টেনে অম্বুরী তামাকের ধোঁয়া ছাড়লেন নবাব। একটা তাকিয়াতে হেলান দিয়ে বসেন। আবার কথা বললেন,—চৈপকচীকে বুলবি, চারখান, সোনার হাতকড়া আনবে।

পর পর দু'জন সেবিকা নিঃশব্দ পায়ে ছুটে দেয়। আঙুলে ভর দিয়ে ছোটে। তাদের পায়ের তোড়া ঝান ঝান আওয়াজ তোলে।

আকর্ণবিস্তৃত চক্ষু হোসেনের। চোখ নিমীলিত করেন নবাব। গজলের সুর কানে আসছে। সেতার বেজে চলেছে মন্থরগতিতে। তবলার সঙ্গত চলে ধীরগতিতে। নবাবের কর্ণকুহরে সুর যেন মধু বর্ষণ করে। নবাব উপভোগ করেন মুদিত নেত্রে।

—হাতকড়া কি হবে?

কথার শেষে প্রধানা বেগম হেসে উঠলেন খিল খিল। মিষ্টি মিষ্টি হাসি। মিসিমাখানো দন্ত-পাঁতি দেখা দেয়। রাঙা অধরের সহাস চঞ্চলতা।

—বেগমদের বন্দী করা হবে।

নকল গাম্ভীর্যের সুরে বললেন, সুলতান। ফরসির নল মুখে তোলেন।

—কসুর কিছু হয়েছে কি জাঁহাপনা?

হাসি চেপে, ঈষৎ ক্ষোভের সুরে বলেন দ্বিতীয়া বেগমসাহেবা। তাঁর চোখে যেন অভিমানের চাউনি।

—আলবৎ। আলবৎ।

উপরে নীচে মাথা দুলিয়ে বলেন নবাবজাদা।

—বেগমবেবানা কী জানাবেন কি, গাফিলতি কি হয়েছে? কি-দোষ কসুর হল?

সভয়ে বলেন প্রধানা বেগম। অপলক চোখে তাকিয়ে থাকলেন। কাবুলি সুর্মা-রেখায় বেগমের চোখ দু'টি নীল পদ্মের পাপড়ির রূপ ধরেছে। সূক্ষ্ম দুই ভুরুর মাঝে সোনার টিপ, আলো ঠিকরোয়।

হাতের নল নাবিয়ে রাখলেন হোসেন শাহ। অম্বুরী তামাকের মৌতাত লেগেছে। খানিক মৌন থাকেন। মেওয়ার রেকাবি থেকে একমুঠো পেস্তা তুলে মুখে ফেলে দেন। কয়েকটা কিসমিস। বেগমমহলে একটা অসহ নৈঃশব্দ বিরাজ করে। সেতারের সুরঝঙ্কার কানে আসে। বাঁয়া-তবলার বাদ্যধ্বনি।

নবাবকে নীরব থাকতে দেখে বেগমরা যেন দিশেহারা হয়ে পড়েন। চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায় তাঁদের মুখে চোখে। যেন ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছেন। দীর্ঘশ্বাস পড়ছে। নাসিকাপ্রান্তে স্বেদবিন্দু ফুটছে। যেন ভোরের শিশির। কেউ হাত-পাখা তোলেন, বাতাস খান। কেউ কোমরপট্টী আলগা করেন ঈষৎ। কেউ ওড়নার আঁচল পাকাতে সুরু করেন চাঁপার কলি

আঙুলে। কেউ দু'টো চিকিসুপারী মুখে তোলেন। এক নিদারুণ আফশোসের শ্বাস পড়ছে ঘন ঘন।

—বৈঠ্ যাও মেরে বুলবুল।

একটু হেসে হোসেন বললেন। মোরব্বার পাত্রটা তুলে নিলেন। সোনার চামচে ধরলেন।

বেগমরা একে একে আসন গ্রহণ করেন সুলতানকে ঘিরে। কাছাকাছি বসলেন পা মুড়ে। কটিতে ঝুলানো রুমাল টেনে আলতো চেপে মুখ মুছতে থাকেন। কড়া-তামুবে ঘাম ফুটছে মিন মিন। গলার খাঁজে, বুকের মাঝে ভিজে ভিজে ঠেকছে। হাত-পাখা চালনার গতি বাড়তে থাকে।

পেয়ালায় কেওড়া-পানি ঢালেন প্রধানা বেগম। সোনার পেয়ালায় চুনী-লাল মিনা ঝকঝক করে। বেগম জানেন, কয়েকটা মোরব্বা খাওয়ার শেষে নবাব ঠাণ্ডা পানি সেবন করেন। তারপর দু'চার টুকরো আপেল কাটবেন দাঁতে।। কস্তুরী সন্দেশ খাবেন, মর্জি যদি হয়।

—বেগমরা বেশ লোভী আছে। জড়োয়া জবা-হিরাৎ দেখলেই কাড়াকাড়ি করে। বেগমদের হাত ক'খানা হাত-সাফাই জানে। তাই হাত-কড়া দিয়ে বন্ধ রাখতে চাই।

কথার শেষে পান পাত্র মুখে তোলেন হোসেন। আকণ্ঠ পান করেন শীতল গন্ধপানি।

বেগমমহলের বাইরে খুস খুস কাশলো যেন কে। আগমন-বার্তা জানিয়ে দিলো শুষ্ক কাশিতে।

—কে আছে ও?

নবাব শুধোলেন আড়-নয়নে তাকিয়ে।

—টেপকচী আছে শাহজাদা। হুজুরের নোকর।

—হাতকড়া কৈ টেকপচী? আও, অন্দরমে আও।

এক রাশ সোনা, বিল্লোরী লণ্ঠনের আলোয় ঔজ্জ্বল্য ছড়ায়। হাত-কড়ার শিকলী ঠুং ঠুং বাজে। টেপকচী রূপার থালিকা নামিয়ে রাখলো নবাবের সামনে। ক'টা কুর্নিশ ঠুকে বললে,—আউর, এই আছে লুটের মাল। জড়োয়া গহেনা আছে শুধু।

লাল শালুব থলিয়া ফরাসে বসিয়ে দেয় রত্নাগারের কোষাধ্যক্ষ। কুর্নিশ ঠুকতে ঠুকতে পিছু হ'টতে থাকে। বেগমমহল থেকে বেরিয়ে অদৃশ্য হয়। তার কাজ ফুরিয়েছে। বমাল পৌঁছে দিয়েছে যথাস্থানে।

লোভী লোভী চোখে বিরাগ ফুটাতে চেষ্টা করেন বেগমরা। জোড়া জোড়া সালঙ্কারা হাত, এগিয়ে ধরেন, আত্মসমর্পণের ভঙ্গীতে। তাঁরা যেন নবাবের দেওয়া অপবাদ মানতে চান না। প্রতিবাদ জানাতেও সাহস করেন না। অপমান, সহ্য করেন করেন নিঃশব্দে।

নরম নরম পেলব হাত। আঙুলে আঙুলে রত্নাঙ্গুরীয়। সূক্ষ্ম নখরে নখরে মেহেদীর রঙ। নধর নিটোল হস্তজোড়া এক করেন বেগমরা। নবাব কড়ার টিপ্‌কলগুলো টিপে টিপে আটকে দিলেন।

কৃত্রিম রাগ, নকল অভিমানের জের আর টানতে পারলেন না বেগমরা। হাসতে শুরু করলেন নবাবের তামাসা দেখে। বেগমদের ঊর্ধ্বাঙ্গ হাসিরচোটে নেচে নেচে ওঠে। কর্ণভূষা, কণ্ঠহার, টায়েরা, সিঁথি হরেক রঙের খেলা দেখায়। খিল খিল হাসির স্বর, বেগমমহলে যেন মুঠো মুঠো মুক্তা ছড়াতে থাকে।

নবাবের মুখমণ্ডলেও মৃদু মৃদু হাসির মিষ্টি রেখা ফোটে। তিনি তখন শালুর থলিয়া উজাড় করছেন স্বহস্তে। গহনা-রাশি ঢালছেন ফরাসে। তাল তাল সোনা আর রাশি রাশি জহরত। বহু অলঙ্কার একত্রে স্তূপীকৃত. যেজন্য ঠিক যেন বাহার খোলে না। পৃথক না করলে চেনা যাবে না কোন্‌টা কি। আকৃতি রূপ ধরা পড়বে না।

রাজধানী স্থানান্তরের পক্ষকালব্যাপী আয়োজনের প্রায় প্রতিটি দিনে হোসেন শাহ দান খয়রাৎ করছেন যাকে যা মন চাইছে। বস্ত্র, অর্থ, অলঙ্কার, ভূসম্পত্তি—যে যেমন সে তেমন পাবে।

হীরা-মুক্তা-মাণিক্যের ছটায় চোখ ঝলসে যায়। তবুও বেগমদের চোখের পলক পড়ে না। মনোহর অলংকরণের নিপুণতায় চোখে যেন আবেশ লাগে। সুলতান একেকটি গহনা হাতে তোলেন, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখেন, ফরাসে সাজিয়ে রাখেন। বেগমরা কল্পনায় নিজেদের অবয়ব দেখতে থাকেন। কোন্ কোন্ অলঙ্কারে বিভূষিতা হ'লে কেমন মানাবে, শুধু সেই চিন্তা। কিন্তু বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না। লোভ, বাসনা দমন করতে হয়। নবাব খুশি-মাফিক যাকে যা দেবেন, নতমস্তকে গ্রহণ করতে হবে। সবই তাঁর মেজাজের 'পরে নির্ভর করছে।

—আহা, কি কারিকরি, কি বাহার। সাবাস গৌড়-বঙ্গালের সেকরা!

স্বগতোক্তি করলেন হোসেন শাহ। একেক জাতের গহনা সারবন্দী রাখেন আর মিটিমিটি হাসতে থাকেন। একটা একটা ভূষণ, চিনিয়ে দেন বেগমদের। বলেন,—এটাকে বলে হংসতিলক। এটা হচ্ছে বালপাশ্যা। ওটার নাম চূড়ামণ্ডন। এটা আপীড়।

যত সব মাথার অলঙ্কার। নারীদের শিরোভূষণ। হংসতিলক স্বর্ণে নির্মিত। দেখতে যেন অশথপাতা। মণিমুক্তা জড়িত। সীমান্তে পরে। হংসতিলক মাথার চুলে জড়াতে হয়। এক প্রকারের মুক্তামালা। চূড়ামণ্ডনের আকৃতি ঠিক কেতকীদলের মত। আপীড়ের অন্য নাম শেখর।

বেগম মহলে বড়ই আবরু। হেথায় সেথায় পর্দা ঝুলছে। কক্ষের বাহির থেকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। বাতাস শুধু বাধা মানে না। গঙ্গার তীর থেকে দমকা হাওয়া আসছে। নির্মল শীতল বায়ুর একেকটা ঢেউ আসছে মাঝে মাঝে। বেগমদের ওড়না কেঁপে কেঁপে উঠছে।

ঝরের ঝরণাল চাঁদোয়াতে ঢেউ খেলছে। ঝুলন্ত বেললণ্ঠন ক'টা দুলছে ধীরে ধীরে।

—এর নাম মুক্তাকণ্টক। এগুলোকে কুণ্ডল কহে। এটাকে বলে কর্ণপুর।

তারিফের ভঙ্গিমা নবাবের মুখে। প্রশংসার দৃষ্টি চোখে। পরিচয় প্রদানের সঙ্গে সঙ্গে নবাব বেগমদের মুখপানে তাকান। কার মুখে কেমন প্রতিক্রিয়া, লক্ষ্য করেন।

মুক্তাকণ্টক সমানাকার। মুক্তা সরু তারের হালিতে গাঁথা। গোলাকার। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পরতে পারে। কুণ্ডল, সোপানের ন্যায় ধাপে ধাপে তৈরী। হীরকপংক্তির দ্বারা খচিত। ছ'টা কিম্বা আটটা নেমী থাকে। কুণ্ডলের অপর নাম কর্ণবেষ্টন। কর্ণপুর ফুলের মত একজাতীয় কর্ণভূষা। এর জাতে পড়ে কর্ণফুল, ঝুমকা, চাঁপা, ঝাঁপা।

—এই দেখ প্রালম্বিকা। গুচ্ছ। নক্ষত্রমালা। অর্ধহার।

কথার শেষে আবার একমুঠা পেস্তা মুখে দিলেন নবাব। এক তাকিয়া ছেড়ে আরেক তাকিয়ায় টেনে দেহের ভার রাখলেন। আঙুলের থোকা তুলে ধরলেন মুখের কাছে। হয়তো কণ্ঠ সিক্ত করতে চান।

নাভি পর্যন্ত লম্বিত স্বর্ণহার প্রালম্বিকা, যাকে বলে ললন্তিকা। বত্রিশ নবী মুক্তাহারের নাম গুচ্ছ। নক্ষত্রমালা সাতাশটি মুক্তায় গ্রথিত একাবলী হার। অর্ধহার বারো লহর মুক্তায় গাঁথা।

—তোবা, তোবা, তোবা।

আবার খুশীর প্রাবল্যে ব'লে উঠলেন হোসেন। রুমালে মুখ মুছলেন। উচ্ছ্বাসে উদ্যমে তাকিয়া ছেড়ে সোজা বসলেন। সহাস মুখে বললেন,—আরে এটা যে পদক। এগুলানকে বন্ধক বলে।

নারীর বক্ষঃস্থলের দুই জাতের ভূষণ। সোনার ষটকোণ বা আটকোনা ফুলের আকার পদকের ধারে ধারে ও মধ্যস্থলে কুঁচা হীরা। রত্নরজ্জুতে ঝুলিয়ে বক্ষঃসন্ধিতে ধারণ করতে হয়।

—বঙ্গাল মুলুকের আমীর ওমরাহ আর অমাত্যগুলা বেবাক বোকা আছে।

কথা বলতে বলতে হঠাৎ হাসিতে ফেটে পড়লেন নবাবজাদা। শিরোপাধারী মাথাটা হাসির চোটে লুটিয়ে পড়লো ছোট বেগমের নধরবক্ষে। খানিক থেমে আবার বলতে থাকেন,—কড়ার দিয়েছিলু তাদেরকে, জমির উপরে যা যা আছে সবই তোমাদিগের পাওনা হবে। জমির তলায় যা যা মিলবে আমি লিব। বেটারা সেক্ রাজী। লুটতরাজ লাগলো দেখতে না দেখতি। বেটারা জানে না, গৌর-বঙ্গের মনিষ্যিরা কেউ জমির উপরে দৌলত ছড়িয়ে রাখে না।

—ঠিক বাত। ঠিক বাত।

বড় বেগম বললেন ঈষৎ হেসে। ক'টা পানের খিলি মুখে দিয়েছেন। তাই কথায় যেন জড়তা।

—তারপর তোরা যখন লুট চালাবি, লুঠেরা পাঠাবি, সেই ভয়ডরে তো আরও জমির তলায় ধনদৌলত চালান করবে মুলুকের তামাম বাসিন্দা। বেটারা সমজালো না, সে গুপ্তধন আমারই হাতে আসবে শেষাশেষি। আগেই বুলছি, জমির তলায় যা আছে আমি লিবো।

আবার হাসির তুফান তোলেন হোসেন শাহ। হাসতে হাসতে লুটিয়ে পড়ছেন যেন। অট্টহাসির শব্দে বেগমমহল ফেটে পড়ছে।

তোপ পড়ছে যখন তখন। যেন বাজ পড়ছে। মেঘ ডাকছে। জ্বলন্ত আতস বাজীর সবুজ রঙে অন্তরীক্ষ আলোকময়। তোপ দাগার দুমদাম শুনে গাছের বাসায় পাখী শিউরে শিউরে ওঠে।

রাজধানীর একডালার ঘরে ঘরে সাজো সাজো রব। রোশনাই দেখতে বেরুবে রাজধানীর তামাম লোক। দূর দূর গাঁও থেকে কাতারে কাতারে জনতা আসছে। আলো দেখবে। খাবে দাবে পিবে। দাম দিতে হবে না এককৌড়ী। বিনামূল্যে মিলবে বিলকুল।

জনতা উল্লাসধ্বনি জানায়। থেকে থেকে হল্লা ওঠে যেন। হাজারো হাজারো মানুষ তারস্বরে চিৎকার করে। জয়ধ্বনি শোনায় নতুন নবাবকে। গৌড়বঙ্গের সদ্য সিংহাসনপ্রাপ্ত সুলতানকে। বলে,—নবাব হোসেন শাহ জিন্দাবাদ। হোসেন শাহ কী জয়।

কয়েক মুহূর্ত যেতে না-যেতে নবাবের ভাব পরিবর্তন লক্ষ্য করলেন চার বেগম। কেমন যেন সহসা আনমনা হ'লেন হোসেন। হাসি ভুলে গেলেন। কি যেন এক ভীষণ দুশ্চিন্তা এসে নবাবকে বেমনা ক'রে দেয়। সমুখে এত ঐশ্বর্য-সম্পদ, হীরা-জবাহিরাৎ, অমূল্যনিধি—যেন আর নজরে পড়ছে না।

—তখৎ পায় অনেকে, রাখতে পারে ক'জনা বড় বেগম? বিশুষ্ক কণ্ঠে বললেন হোসেন শাহ। তিনি যেন অন্য

কোন চিন্তায় বিভোর। কথা বলছেন, অন্য এক দুনিয়া থেকে।

—কে আর পারে? তবে, বিশ্বাস করি, নবাব হোসেন শাহ এক আলাক চাঁদ, তিনি পারবেন। হোসেন মহম্মদের ওয়ারিশ। তার নসাব আলাউদ্দিন।

উঠে বসলেন নবাবজাদা। তাঁর রাজত্বের সীমা ভেসে উঠলো চোখে। রাজত্বের সীমানা, বিস্তার সামান্য নয়। রাজ্যের সীমান্তে যারা আছে, তারা আবার মিত্র নয় ঠিক, শত্রুই বলা যায়।

একদিকে উড়িষ্যা। অন্যদিকে আসাম-কামতাপুর। প্রায় গায়ে গায়ে লাগানো বিহারখণ্ড।

কে জানে, এমন দিন আসবে, হয়তো যুদ্ধ লাগতে পারে। শত্রু একাধিক। কোন দিকে অভিযান চালাবেন হোসেন? কাকে প্রথম আক্রমণ করবেন? দেখা যাক, কে কেমন ব্যবহার করে। কে কোন্‌দিকে চলে।

—তবে, পহেলা বঙ্গাল মুলুকে শান্তি চাই।

হোসেন বললেন দূরদর্শীর দৃষ্টিতে। নবাব যেন অনেক দূরে নজর চালিয়েছেন। পিছনে নয়, সমুখপানে। সামনে দিকে। সমুখে আছে, অজানা ভবিষ্যৎ।

নিজ রাজ্যের কথা ভাবছেন হোসেন। শাসনযন্ত্র নিখুঁত করতে না পারলে কাঠামো ভেঙ্গে পড়তে পাবে। আগে ঘর সামলাতে চাইছেন নবাবজাদা। রাজ্যের সমস্যা আছে অনেক কিছু। কোন্‌ দেশে না সমস্যা থাকে। তাই যদি না হবে দুনিয়া আর বেহেস্তে তফাৎ থাকবে কেন?

লাখো লাখো টাকা চাই। খাজনার আদায় চাই পুরাপুরি। বাকী চলবে না। আর যা বাকী তাই নাকি বরবাদ।

পরগণায়-পরগণায়, মহলে-মহলে পরোয়ানা জারী করেছেন নবাব হোসেন শাহ। খাজনা বাকী রাখলে চলবে না। রাজ্যের প্রাপ্য সময়মত মিটিয়ে দিতে হবে।

যতসব পাকা পাকা লোক বসিয়েছেন নবাব। বড় বড় পদে ব'সেছেন যত্তো পাকাপোক্ত, বিশ্বাসী, সজ্জন। নবাবের মনোনীত পাত্রমিত্র। রাজ্য শাসন অটুট রাখতে হ'লে হিন্দু আর মুসলমানে ফারাক রাখলে চলবে না। যোগ্য লোকের যোগ্য কদর করেন হোসেন।

সপ্তগ্রাম মহলে ব'সেছেন মজুমদারমশাই। শ্রীকান্ত ঘোষ। আরও কেউ কেউ। শাসক বলতে মজুমদার, শোষক বলতে শ্রীকান্ত। একজন পরগণার অধিকারী, অন্যজন হিসাবরক্ষক।

কাছারী ঘরের কাজ মিটিয়ে হাতের কাজ সেরে গভীর রাতে যখন শ্রীকান্ত অন্দরে ফেরেন তখন কেউ আর জেগে থাকে না।

কেবলমাত্র সহধর্মিণী অন্নপূর্ণা অধীর প্রতীক্ষায় প্রহর গুণতে থাকেন। শ্রীকান্তর আহার আগলে ব'সে থাকেন পাষাণী অহল্যার মত।

রাতের আহার। বহুবিধ ব্যবস্থা। নানা উপকরণ। বহু পদ। যতসব সুপেয় সুখাদ্য।

আসন গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকান্ত বললেন,—রামচন্দ্রকে দেবতা-জ্ঞান করবা অন্নপূর্ণা। যা তা না ভাবো। আমাদিগের মহাগুরুর বংশে তার জন্ম। কোথায় সে?

—হয়তো ঘুমে কাতর এখন।

—আহারের কোন ত্রুটি হয় নাই তো? তুমি কি উপস্থিত ছিলে।

—হ্যাঁ মহাশয়। সহাস্যে বললেন অন্নপূর্ণা। একমুখ হাসলেন। বললেন,—মহাশয় যখন হুকুম পাঠায়েছেন।

[ক্রমশ।

নিয়তির সন্তান

১৮৪০ সালের শেষভাগে এক প্রৌঢ় ও বালককে প্রায়ই দেখা যেত পূর্ব-আমেরিকার বিভিন্ন শহরের রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে।

বালকটির দ্বারা চালিত হলেও বয়স্ক লোকটিকে একেবারে নগণ্য বলে মনে হত না, তার শীর্ণ-অসহায় আকৃতির মাঝেও উঁকি দিত এক অখণ্ড ব্যক্তিত্বভাব ছায়া।

এই বৈশিষ্ট্য ও সাথী বালকটির অসামান্য সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে পথচারীরা প্রায়ই একে অন্যকে প্রশ্ন করত, "লোকটা কে হে?"

সেই সময় মঞ্চাবতরণের জন্য তিনি প্রতি রাত্রে একশো পাউণ্ড দক্ষিণা পেতেন, সে সময়ের পক্ষে এক অবিশ্বাস্য অঙ্ক।

সময় বয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হিসাবে অসম্ভব বদলে গেলেন অভিনেতা 'বুথ'। যৌবনে যশের প্রতিই নিবদ্ধদৃষ্টি ছিলেন তিনি কেবল, যশস্বী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে তৃষ্ণা তার কেটে গেল।

নাট্যাপপাসু

দিত তাঁর মধ্যে। একবার অকারণেই 'জুলিয়াস সীজর' নাটকে 'ক্যাসিয়াস' রূপে অবতীর্ণ হয়ে সমস্তক্ষণ পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে চলাফেরা করলেন তিনি; 'ভেনিস প্রিজার্ভড' নাটকে পিয়েরের ভূমিকায় ফিসফিস করে সংলাপ বললেন।

অভিনয় শুরু হওয়ার মুহূর্তে প্রায়ই নিজের সাজঘর থেকে কেটে পড়তেন বুথ; দর্শকদের অত্যন্ত বিরক্ত হওয়ার কারণ এত বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও দর্শকরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতেন তার জন্য যখন চারদিকে লোক ছুটতো তাঁকে খুঁজে পেতে মঞ্চে আনার জন্য।

ও হল অভিনেতা 'মিঃ বুথ'। জুনিয়াস ব্রুটাস বুথ, দেখছ না ও আবার মাতাল হয়ে পড়েছে।"

"আর ছেলেটা?" "ওরই ছেলে 'এডউইন'।"

বছরের পর বছর ধরে ভূমিকালিপিতে 'মিঃ বুথ' এই নামটি ছাপা থাকলে আমেরিকার রঙ্গমঞ্চগুলোতে দর্শকের অভাব হয়নি কোনদিন।

১৮২০ সালে ওই অভিনেতা, (যাঁর অন্যতম পুত্র জন উলকিস বুথ বহু বছর পরে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কনকে হত্যা করে সমস্ত পরিবারের মুখে কালি ছিটিয়ে দিয়েছিল) ইংলণ্ড থেকে আমেরিকায় আসেন, আমেরিকান দর্শককে মঞ্চের মায়ায় মুগ্ধ করতে।

অভিনয়ের শেষে মদিরার আশ্রয় নিতে অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন তিনি ক্রমে ক্রমে।

তারপর যা হয়ে থাকে, অভিনয় আরম্ভে উদ্দীপনা আনার জন্যও দরকার পড়তে লাগল মদিরার, আবার অভিনয় চলতে থাকা কালে ও শ্রান্তি দূর করতে তারই আশ্রয় নেওয়া, এবং পরিণামে মত্ত অবস্থাতেই মঞ্চে অবতরণ করতে শুরু করলেন তিনি।

সে সময় এ ব্যাপারে নতুনত্ব ছিল না। যদিও কিছুই, প্রায়ই অভিনেতারা মদমত্ত অবস্থায় স্টেজে ঢুকতেন, বেরুবার সময় অনেক সময় শিশুর মত চার হাত-পায়ের সাহায্য নিতেও বাধ্য হতেন।

কিন্তু জুনিয়াস বুথের মদ্যপানের প্রতিক্রিয়া হত আরও শোচনীয়, উন্মত্ততার লক্ষণ দেখা

নিউইয়র্কে 'মার্চেন্ট অব ভেনিস' নাটকে অভিনয় চলাকালীন একবারে শাইলকের পোষাকপরা অবস্থাতেই নিখোঁজ হলেন 'বুথ', বেশ কিছুদূরে এক বাড়ীর অগ্নি নির্বাপকারী একটি দলের সঙ্গে কর্মরত অবস্থায় সন্ধান মিলল তাঁর—বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর।

অভিনেতার সন্তানবর্গ পিতার এইসব পাগলামীকে বরাবর দুর্ভাগ্য বলেই বর্ণনা করত। মাতার কাছ থেকে পিতাকে এই অবস্থায় সুকৌশলে সামলে রাখতে শিখেছিল তারা; কিন্তু জনসাধারণের কাছে তো আর অতটা প্রত্যাশা করা যায় না, তিতিবিরক্ত হয়ে লোকে 'বুথ' অসুস্থ হয়ে পড়লেও সেটাকে মাতলামি ছাড়া আর কোন আখ্যা দেয় নি কোনদিন।

শেষ পর্যন্ত যখন তার মদ্যপান ও তৎসংক্রান্ত

উন্মত্ত আচরণের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে উঠল, তখন থেকে তাঁকে আর একলা ছাড়া হত না কোথাও।

● নাট্যশিল্পী বুথ

তৎকালীন আর একজন বিখ্যাত অভিনেতা 'জোসেফ জেফারসন' বালক এডউইনকে প্রথম দর্শনের স্মৃতি ভুলতে পারেন নি কখনও। এডউইনকে অবসাদগ্রস্ত ও অবহেলিত মনে হয়েছিল, ওর মুখে ছিল ক্লান্তির সুস্পষ্ট ছাপ ; কিন্তু জেফারসনের মনে হল যেন পঙ্কিল সরোবরে ভাসা এক রাজহংসকে দেখছেন, এডউইনের মত সুন্দরদর্শন লোক কদাচিৎ দেখেছেন উনি।

এডউইন ওর বাবাকে থিয়েটারে পৌঁছে দিত ও সেখান থেকে নিয়ে যেত। বাপের সঙ্গেই থিয়েটারের ভোজনশালায় বসে আহার্য গ্রহণ করত ও ; মাতাল হয়ে গড়িয়ে পড়ত যখন 'বুথ', তখন বাপের পাশেই শুয়ে পড়ত এডউইন ; বুথের সঙ্গে সঙ্গে বহু বিনিদ্র রাত কেটে যেত তার ছেলের।

বুথ অত্যধিক অশান্ত হয়ে উঠলে নিজের ব্যাঞ্জো টেনে নিয়ে মৃদু-মধুর সুরের ঝঙ্কারে সে অশান্তভাবকে দূর করতে চাইত তার ছেলে।

সাধারণত 'বুথ' মঞ্চে থাকলে সাজঘরে বসে থাকত এডউইন। মঞ্চের উপর থেকে ভেসে আসা কণ্ঠস্বর শুনতে পেত সে, দর্শকের আনন্দোচ্ছল কোলাহল যখন কানে আসত তখন নেপথ্য থেকে উঁকি দিয়ে দেখত এক আধবার।

এডউইনের রক্তে দোলা লাগত বারবার, মঞ্চের মায়া যে কিভাবে অভিনেতার সমস্ত সত্তাকে অধিকার করে, তা যেন ও উপলব্ধি করতে পারত সম্পূর্ণভাবেই।

শেষ অভিনন্দনধ্বনি মিলিয়ে গেলে 'বুথ' যখন ফিরে আসত সাজঘরে, ছেড়ে ফেলত সাজসজ্জা, উন্মুখ এডউইন লাফিয়ে উঠত সতর্কভাবে ; তার কাজ তো এতক্ষণে সবে শুরু হল।

ছেলের রক্ষণাবেক্ষণে একান্ত নিজেকে ছেড়ে দিত বাপ—যদিও তা করার আগে মদ্যপ এক উন্মাদের সহজাত ধূর্তামির আশ্রয় নিয়ে ছেলেকে ফাঁকি দেওয়ার জন্যও সচেষ্ট হত 'বুথ'।

বহুবার গভীর নিশীথে খুঁজে বেড়িয়েছে এডউইন পিতাকে যত্রতত্র, অবশেষে আবিষ্কার করেছে তাকে শহরের নোংরা অঞ্চল থেকে অত্যন্ত হীনসংসর্গে প্রমোদরত অবস্থায়।

একবার হোটেলের ঘরে বন্দী অবস্থায় অবস্থানকালে বুথ একটা পথচলতি ছোঁড়াকে ঘুষ দিয়ে মদ আনিয়ে দরজার চাবি পরানর ফাঁক দিয়ে খড়ের সাহায্যে পান করেছিল। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে এক রাতে এডউইন 'ওথেলো' নাটকে বাপের পাশাপাশি ক্যাসিয়ো চরিত্রে অভিনয় করল।

তার নামও বিভিন্ন ভূমিকালিপিতে ছাপা হতে লাগল এবার থেকে বাপের সঙ্গে সঙ্গে ; নিউইয়র্কে একবার এক পুরোন অভিনেতার সঙ্গে পিতা-পুত্রের সাক্ষাৎ হলে তিনি বুথকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার অভিনয়-প্রতিভার উত্তরাধিকার দিয়ে যাবেন কাকে?"

নিরুত্তরে এডউইনের কাঁধের উপর হাত রাখলেন 'বুথ'।

১৮৫১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নিউইয়র্কের ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনয় চলাকালে এক সন্ধ্যায় বুথ ঘোষণা করলেন যে, অসুস্থতা বোধ করার দরুণ সেদিন আর অভিনয় করবেন না তিনি। সেদিনের নাটক ছিল "তৃতীয় রিচার্ড", এডউইন পিতাকে স্মরণ করিয়ে দিল যে, কত উৎসাহের সঙ্গে ঐ নাটকের ভূমিকা কণ্ঠস্থ করেছেন তিনি, 'বুথ' ঐ একটু হাসলেন শুধু। "আপনি এখন না নামলে যে বড্ড গোলমাল হবে বাবা," বলল সে।

"তুমিই কর পার্টটা।" উত্তর দিলেন বুথ।

মিঃ জন আর স্কটকে রুদ্ধশ্বাসে এ খবর জানাল এডউইন।

"ঠিক আছে," প্রশান্ত স্বরে বললেন মিঃ স্কট, "তুমিই নাম রিচার্ডের ভূমিকায়, তা নইলে আজ থিয়েটার বন্ধ করে দিতে হবে।"

বাপের পোষাক পরে জড়সড় হয়ে, ভূমিকা-লিপি হস্তে প্রম্পটারের পাশ দিয়ে বধ্যভূমিতে নীত মেষশিশুর মত মঞ্চে প্রবেশ করল এডউইন। দর্শকদের কোন পরিবর্তনের কথা জানানো হয় নি, মঞ্চে ঢুকতেই করতালি দিয়ে তারা অভিনন্দিত করল এডউইনকে। করতালি-ধ্বনি মিলিয়ে যাওয়ার আগেই ফিসফিসানি শোনা গেল প্রেক্ষাগৃহে, ভূমিকা-লিপি উল্টেপাল্টে দেখা সুরু হয়ে গেল। ঘোর নিস্তব্ধতার মধ্যে এডউইন মিষ্টি রিনরিনে গলায় সুরু করে দিল ওর পার্ট : শেক্সপীয়রের কাব্যের অমর চরণ ধ্বনিত হল ওর কণ্ঠে।

বাপের ভূমিকার বৈশিষ্ট্য মনে রেখে নিজের ভাবে বিভোর হয়ে অভিনয় করে গেল এডউইন ; ওর আন্তরিকতায় ভূমিকাটি প্রাণবন্ত হয়ে উঠল ; বাপেরই অনুকরণে মুখে বিষাদ ও তিক্ততা নিয়ে যখন চরিত্রটির রূপায়ণ করল খোঁড়াতে খোঁড়াতে এগিয়ে গিয়ে, তখন প্রেক্ষাগৃহ একেবারে নিস্তব্ধ অচঞ্চল। দর্শক গ্রহণ করেছে ওর আন্তরিকতাকে, উত্তীর্ণ হল এডউইন, গৃহীত হল।

দৃশ্যের পর দৃশ্য অভিনীত হয়ে যেতে লাগল ; প্রেক্ষাগৃহ ও মঞ্চের অন্তরাল থেকে সমবেত সকলের প্রীতি ও শুভেচ্ছা যেন মূর্ত হয়ে অভিষিক্ত করে দিল নবীন অভিনেতাকে।

সময় কেটে গেল দ্রুততালে, অবশেষে এল চরম আনন্দের সেই মুহূর্তটি ; এডউইনকে টেনে মঞ্চের উপর এসে দাঁড়ালেন স্কট ; বিজয়ানন্দ কোমলতা মিশ্রিত কণ্ঠে বলে উঠলেন, "আপনাদের সামনে যাকে উপস্থিত দেখছেন, সে, গৌরবান্বিত এক উত্তরাধিকার বহন করে এনেছে" তারপর ফিসফিসিয়ে বললেন এডউইনকে, "ওরা কিন্তু এখনও বোঝে নি তুমি কে"।

করতালিধ্বনিতে কাঁপতে লাগল মঞ্চ ; আর এই করতালিধ্বনিই শুনে গিয়েছিল এডউইন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

ঐ দিনটির আগে পর্যন্ত উকিল হওয়ার স্বপ্ন দেখত এডউইন, ওর বাপেরও অভিপ্রেত ছিল সেটা। আর তা সম্ভব নয়, যেখানেই পালাক না কেন, ওই করতালিধ্বনি আবার টেনে আনবে ওকে।

"তারপর?" বুথ জিজ্ঞেস করলেন ছেলেকে নিজেদের পায়রার খোপের মত জীর্ণগৃহে ফিরে গিয়ে, "কেমন উৎরোল?" এডউইন যেখানে তাঁকে রেখে যায় সেখানেই অপেক্ষা করছিলেন 'বুথ', আজ আর তিনি ছেলের চোখ এড়িয়ে পালানোর চেষ্টা করেন নি ; একসাথেই ঘরে ফিরলেন পিতাপুত্র।

এইভাবে ভাগ্যের খাম-খেয়ালের ফলে এডউইন বুথ ধরা দিল মঞ্চের আলিঙ্গনে, গ্রহণ করল রোমাঞ্চকর নটজীবনকে।

তার ভাগ্যবিধাতা সেদিন পথনির্দেশ ভুল করেন নি একটুও, উত্তরকালে পিতার যশ নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল পুত্রের পাশে ; আমেরিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নট বলে এডউইন স্বীকৃতি লাভ করল।

আমেরিকার মঞ্চজগতে সোনার অক্ষরে লেখা হয়ে গেল একটি নাম চিরতরে, সে নাম 'এডউইন বুথ'।*

---

* বিদেশী সাময়িক পত্র হইতে সঙ্কলিত।

সঙ্গীত ও সঙ্গত

চৌষট্টি কলা বিদ্যার মধ্যে সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। ইহার মধ্য দিয়া মানুষের মনে বিরাট পরিবর্তন করা সম্ভব। নৃত্য-গীত ও বাদ্যের সমন্বয়ে যাহা সৃষ্ট তাহাই সঙ্গীত। এই সঙ্গীতকে প্রাণবন্ত করিতে গেলে যে-সমস্ত জিনিসের একান্ত প্রয়োজন, তাহার মধ্যে সঙ্গতই অন্যতম। ইহা ছাড়া সুন্দর পরিবেশ, রুচিশীল ও গুণী শ্রোতৃবৃন্দ প্রভৃতিরও একান্ত প্রয়োজন। সঙ্গীতে সুরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কাজ ভাবাপ্লুত রসসৃজনে উত্তম নৈতিকতাদায়ক ভাষা প্রভৃতির একচ্ছত্র আধিপত্যের কথা অবিসংবাদিতরূপে স্বীকার করিলেও তালের কথাকে একেবারে প্রাধান্য না দিয়া উপায় নাই।

সুর ও তাল যেন একবৃন্তে দুটি ফুল। একটিকে কল্পনা করিলে আর একটি যেন স্বভাবতই জাগিয়া পড়ে। তবে অনেকে হয়ত বলিতে পারেন যে, সুর ও তাল কি পৃথকভাবে পরিবেশন করা যায় না, নিশ্চয়ই যায়? কিন্তু পৃথকভাবে পরিবেশন একরূপ, আর সুর ও তালের একত্র পরিবেশন কতই সুন্দর, কতই মনোহর কতই প্রাণবন্ত। এই দৃশ্যটি আমাদের নিকটে সুন্দরভাবে প্রতিভাত হইয়া উঠে, যখন আমরা কোন তাল-সমন্বয়ে সঙ্গীত-সহ নৃত্য উপভোগ করিয়া থাকি। সুতরাং সঙ্গীতকে সুন্দর ও প্রাণবন্ত করিতে গেলে সুন্দরভাবে সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে। সঙ্গীতের সহিত উত্তমরূপে সঙ্গতের মধ্য দিয়াই সঙ্গীতের সুন্দর রূপটি ফুটিয়া উঠিবে। এ জগতে সবই নিয়মের অধীন, তবে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ক্ষেত্রবিশেষে আছে বটে, কিন্তু এ জগতে চলিতে হইলে আমাদের সকলকে অল্প-বিস্তর নিয়মের অধীন হইতেই হইবে। সুতরাং সঙ্গতকারকে সঙ্গীতের সহিত সঙ্গত করিতে গিয়া সর্বদা স্মরণে রাখিতে হইবে যে, তাহার সঙ্গত যেন সঙ্গীত পরিবেশনের সময় গায়ককে কাঁটার ন্যায় পদে পদে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে, বরং স্বচ্ছসলিলা গঙ্গার প্রবাহের ন্যায় যেন একে অপরকে একান্তভাবে নির্ভর করিয়া এক স্বর্গীয় পরিবেশ সৃজনে সক্ষম হয়।

সঙ্গতকারকে সঙ্গীতের সহিত সঙ্গতকালীন অবস্থায় গায়কের সহিত সম্পূর্ণ সহযোগিতা করিতে হইবে, অর্থাৎ গায়ক সঙ্গীত পরিবেশন-কালীন যেভাবে সঙ্গীত পরিবেশন করিবেন সঙ্গতকারকেও অনুরূপভাবে তাহার অনুসরণ করিতেই হইবে, নচেৎ সঙ্গীতের আসল উদ্দেশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। একক বাদনের ক্ষেত্রে একথা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সেখানে বাদক একচ্ছত্র সম্রাট অর্থাৎ যে-কোন তালে তিনি যে কোন ছন্দ যে-কোন ঢং প্রদর্শন করিতে পারিবেন, তিনি সেক্ষেত্রে কেবলমাত্র বাঁধা যে তালটি পরিবেশন করিবেন তাহার মাত্রায়।

সঙ্গতকার রুচিশীল শ্রোতা সুন্দর পরিবেশ সঙ্গীতকে প্রাণবন্ত করিতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করে। অনেক সময় ইহা দেখা যায় যে,

শ্রীদামোদর ভট্টাচার্য

সঙ্গতকার যথেষ্ট জ্ঞানী গুণী, তাঁর শিক্ষা বা অভিজ্ঞতাও যথেষ্ট, কিন্তু সঙ্গতকার হিসাবে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না অর্থাৎ শুধুমাত্র সাধনালব্ধ অভিজ্ঞতা বা শিক্ষার দ্বারাই উত্তম সঙ্গতকার হওয়া কখনই সম্ভব নহে। প্রকৃত সঙ্গতকার হইতে হইলে তাঁহাকে তাঁহার অভিজ্ঞতালব্ধ শিক্ষার সহিত গায়কের সহিত অনুশীলন করিতেই হইবে এবং এই অনুশীলনের মধ্য দিয়াই তিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, সঙ্গীতকে সুন্দর ও প্রাণবন্ত করিতে হইলে তাঁহার কি করণীয়। অবশ্য গায়ককে এ বিষয়ে সচেতন হইতে হইবে অর্থাৎ এক কথায় তিনি যেন সঙ্গীতের নীতি ও নিয়মের ব্যভিচার না করেন। সঙ্গতকার ও গায়ক উভয়েই হইবেন সৌন্দর্যের পূজারী এবং উভয়ের মধ্যে যদি শিল্পের প্রতি মমত্ববোধ নীতি নিয়মের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা থাকে তবে সঙ্গীত ও সঙ্গত হইবে সার্থক এবং ইহা রুচিশীল শ্রোতৃবৃন্দ সৃজনে সক্ষম হইবে।

উত্তমকুমার : "কাল, তুমি আলেয়া"র নায়করূপে
আলোকচিত্র : শান্তিময় সান্যাল

নাট্যকার ক্রিস্টোফার ফ্রাই

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

বিংশ শতকের ইংরেজী নাটকের ইতিহাসে যে নবনাট্য আন্দোলনের বান বয়ে এনেছিলেন, ইবসেনপন্থী বার্নার্ড শ তাকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর করে নিয়ে গিয়েছিলেন যথাক্রমে স্যার আর্থার পিনেরো, হেনরী আর্থার জোন্স, অস্কার ওয়াইল্ড, স্টিফেন ফিলিপস প্রমুখ নাট্যকারেরা। জন গল্‌স ওয়ার্দি শ'য়ের ধারার শেষ এবং সার্থক প্রবাহ। তাঁর নাটকে তা ছাড়া আছে গরীবের প্রতি একটা সীমাহীন ব্যথাবোধ। স্যার জেমস ব্যারীও এ যুগেরই একজন খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যকার। মস, কাওয়ার্ড, গ্র্যানভিল বার্কার, প্রিস্টলী, ইয়েটস, সিঞ্জ, লেডি গ্রেগরী, সি এন ও'কেসি প্রভৃতি নাট্যকারেরা বিংশ শতকের ইংরেজী নাটককে একেবারে তার স্বাধকতার সমুদ্রসঙ্গমে এনে পৌঁছে দিয়েছেন। কিন্তু এঁদের প্রায় প্রত্যেকের নাটকেই আমরা পেয়েছি বাগ্মীয় অর্ণবের শক্তিকে। তারা গদ্যের গাদাবোটে বাধা থেকে সময়ে সময়ে এসে পৌঁছেছে নাট্যামোদীর হৃদয়-বন্দরে। এ সময়ের নাট্যসাহিত্যের সীমানা থেকে উধাও হয়েছে দেখি পদ্যের পুষ্পকরথ। কাব্য-নাট্য বা নাট্যকাব্য এ সময়কার ইংরেজী নাট্যসাহিত্যে দর্শন মেলা ভার। ঠিক যেন, দিকে দিকে, সংক্রামিত গদ্যের বীজ, শুকায়েছে কাব্যস্রোত; কর্দমে মেলে না পাদপীঠ। এহেন অবস্থায় ইংরেজী নাট্য-সাহিত্যের আসরে দেখা দিলেন বহুমুখী প্রতিভাধর এলিয়ট। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁর ভূমিকাকে সম্পূর্ণ না হলেও কিছুটা রবীন্দ্র সমপর্যায়ের বলে অভিহিত করতে পারা যায়। যখনই আমাদের বাংলা সাহিত্যের কোন না কোন খাতে দেখা দিয়েছে বন্ধ্যাদশা তখনই সেখানে প্রাণপ্রাচুর্যের সম্ভাবনাকে মুখর করেছেন দেখি একমাত্র রবীন্দ্রনাথ। বাংলা সাহিত্যের এত বিচিত্রতা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেহই সম্ভবত সম্পাদন করতে পারতেন না। তাঁর হাতে পড়েই বাংলা সাহিত্য এমন দিকে দিকে বিস্তারিত হয়েছে। হয়েছে কোমলাভ কান্তিময়ী বিচিত্রবরণী।

আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য ও অনুরূপভাবে এলিয়টের হাতে পড়ে হয়েছে এমন সজীব ও বহুমুখীন। এলিয়টের হাতেই ইংরেজী নাট্যলক্ষ্মী তার কাব্য-নাটকের রূপ গৌরবকে লাভ করেছে। ইতিপূর্বে কয়েকখানি প্রতীকধর্মী নাটককে বাদ দিলে আর কেউই নৈবেদ্য সাজায়নি কাব্য-নাট্যলক্ষ্মীর দেউল প্রাঙ্গণে।

মার্ডার ইন দি ক্যাথিড্রেল, দি ফ্যামিলি রি-ইউনিয়ান, দি ককটেল পার্টি প্রভৃতি নাট্য রচনা ইংরেজী কাব্যনাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে গঙ্গাবতরণ। এলিয়ট তার ভগীরথ।

এলিয়টের স্পর্শে প্রাণ পেয়ে তারই স্ব-ক্ষেত্রে বিচরণ করলেন কবি অডেন ও ক্রিস্টোফার ইশারউড। রচনা করলেন যৌথ প্রচেষ্টার ফলে যথাক্রমে দু'খানা নাটক: দি ডগ বিনিথ দি স্কিন ও দি এ্যাসেন্ট অফ এফ সিক্স। কিন্তু এ রচনাতে পাঠক পেলে না কোন সুজলা সুফলা শস্যক্ষেত্রের সন্ধান। তৃপ্ত হতে পারলে না আগামী দিনের সার্থক কাব্যনাট্যের স্বপ্নে। ইংরেজী নাট্য সাহিত্যের নবযুগের দান যেন গদ্য প্রকাশের মাধ্যমে তার শেষ সম্বলকে উজাড় করে দিয়ে একেবারে দেউলে হয়ে গেল।----পাঠক মনে জেগে উঠলো হতাশা। চারিদিকে একটা বন্ধ্যাদশা যখন ইংরেজী নাট্য-সাহিত্যে সুপ্রকট হয়ে রসিকচিত্তকে মরুভূমির সদৃশ করে তুলতে উদ্যত, ইংরেজী নাট্য সাহিত্যের দিকচক্রবালে শেষ বর্ষণের নীলাঞ্জন রেখাটি পর্যন্ত যখন উধাও হয়েছে, তখন তরুণ নাট্যকার ক্রিস্টোফার ফ্রাই বয়ে নিয়ে এলেন নব মেঘখণ্ড। আশার বারিদে পরিপূর্ণ। শুরু হলো বর্ষণ।

ফ্রাইর প্রথম নাটক "দি বয় উইথ এ কার্ট" লেখা হয় একটা গ্রাম্য গীর্জার প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে। তারপর তিনি লিখেছেন একে একে বহু নাটক। এফোনিক্স টু ফ্রিকোয়েন্ট (১৯৪৬), দি লেডি ইজ নট ফর বার্নিং (১৯৪৮) ভেনাস অবসার্ভড (১৯৫০), এ স্লিপ অফ প্রিজনারস্ (১৯৫১), দি ফার্স্ট বর্ন (১৯৪৬) ইত্যাদি ফ্রাই-এর উল্লেখযোগ্য নাটক। যথাসময়ে এবং যথার্থ অবকাশে তাদের প্রত্যেকটির পৃথক পৃথক আলোচনা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমরা কেবল নবযুগের নাট্য সাহিত্যে ফ্রাই-এর দান কতটুকু তা জেনেই ধন্য হবো। আগেই বলেছি, কাব্য নাট্যের শুষ্কখাতে নাট্যকর্ষণার জন্যই ফ্রাই-এর নাম।

ফ্রাই-ই ইংরেজী নাটকের আগাছার জঙ্গলে রোপণ করেছেন নব মাল্যঞ্চের। সমস্ত অহেতুক বনপাদপকে নিশ্চিহ্ন করে পরিষ্কৃত পরিস্রুত নব উদ্যানে রোপণ করেছেন মাধবী-বিতানের। তার কাব্যনাটকের ময়ূরপঙখীতে চড়ে পাঠক পৌঁছে গেছে যেন এক মুহূর্তে এক সব পেয়েছির দেশে। ইংরেজী সাহিত্যে কাব্য নাটক যখন একটা গুমোট আবহাওয়ায় পড়ে আর্তনাদ করছে ফ্রাই-ই তখন প্রথম বহন করে এনেছেন প্রথমে নবমেঘমালাকে। তারপর মেঘের শেষে বরিষণ-সম্পাতের সাতরঙা রামধনুকে। তাঁরই লেখনী সঞ্চালনে, কাব্যবীণার নিক্কণে ইংরেজী সাহিত্যের

● খ্যাতিময়ী চিত্রতারকা শ্রীমতী নিম্মি
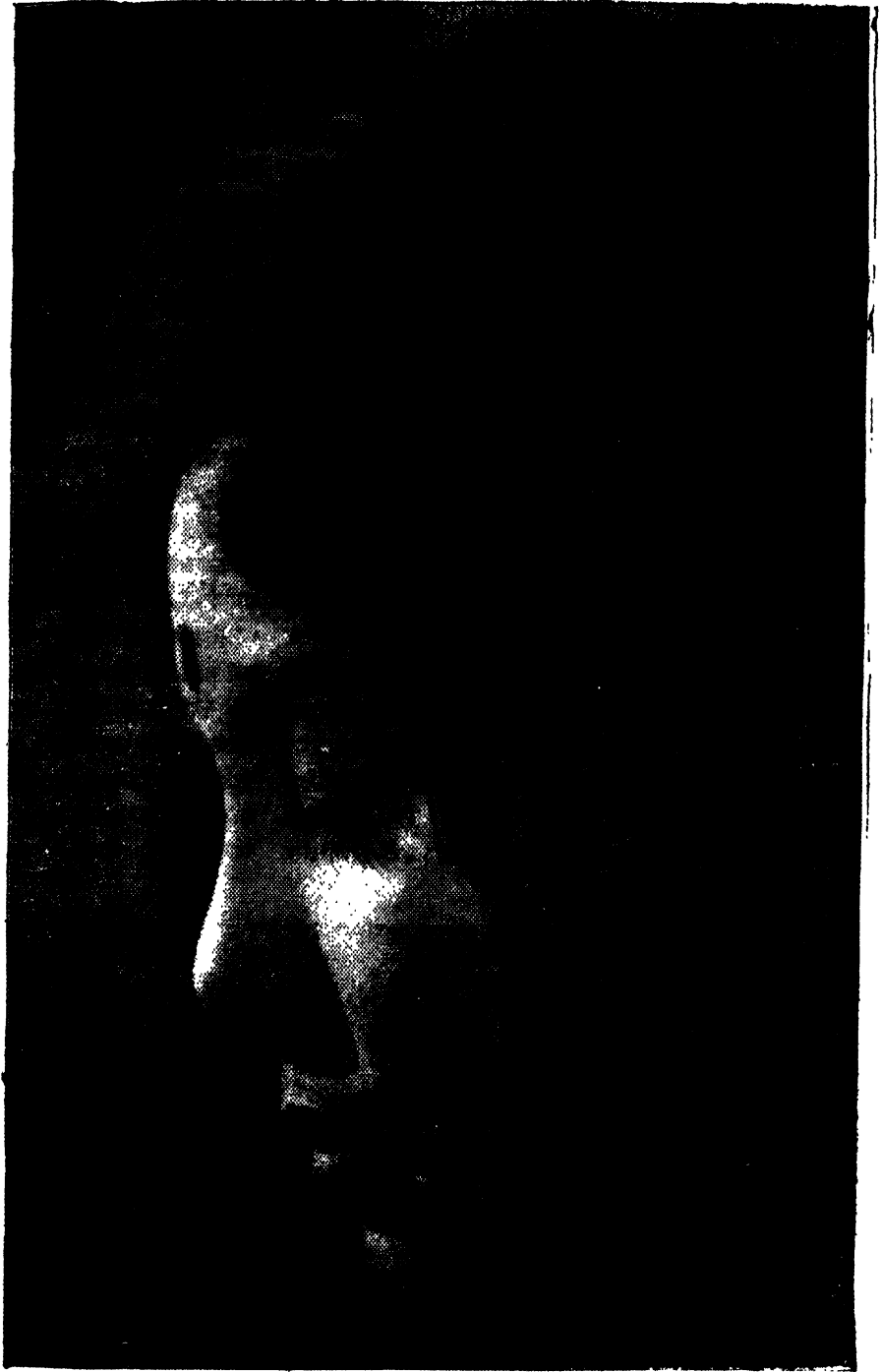
পাঠক শুনেছে মেঘমল্লার। সাহিত্যের একঘেয়ে লঘু ও তরল আধুনিক সুরালাপের মধ্যে তিনিই প্রথম বহন করেছেন ক্ল্যাসিক কাব্যনাটকের ধ্রুপদী মহিমাকে।

যুদ্ধোত্তর ইংরেজী নাট্য সাহিত্যে ফ্রাই'র অবদান অনেকখানি। রসিকের মনে যখন চাতক পিপাসা, ফটিক জলের জন্য দুর্বার পক্ষ বিধূনন তখন তিনিই বয়ে এনেছেন তাদের জন্য এক অনন্ত অমিয়ের সন্ধান। এক আকাশ মধুক্ষরা বৃষ্টি। তারপর সেই বৃষ্টি শেষের নির্মল সূর্যালোক। ফ্রাই-এর মধ্যে গতানুগতিকতার অবসান ঘটেছে। আমরা পেয়েছি এক নবদিগন্তের

। কিন্তু, এ দিগন্ত নোতুন হলেও
রে অপরিচিত নয়। নয় তা,
ও সুদুর্গম। পূর্ব এলিয়টীয়দের
এবং এলিয়টের মধ্যে যার বিদ্যুৎ-
ঘটেই শেষ হয়ে গিয়েছিল, বহুকাল
ফ্রাই তাকেই এনে নবরূপে সজ্জিত
ছন তাঁর নাটকে। কাজেই
রী নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে
এর আবির্ভাবকে আকস্মিক বলতে
তই একটা দ্বিধা জাগে। এই
নাট্যকারের কাছে আদর্শস্বরূপ
সময়ই উপস্থিত ছিলেন সুযোগ্য
তাঁর আসনে উপবিষ্ট স্বয়ং এলিয়ট।
১৯৪৬ সালে যুদ্ধশেষে ফ্রাই যখন
করলেন তাঁর এ ফোনিক্স টু
য়েন্ট নাটকখানা তখন বোঝা
যে, এই দারুণ অস্বস্তির দিনে
ত্রী কাব্য নাটকের শক্তি কতদূর
সঞ্চারী হতে পারে। ইংরেজী
সাহিত্যের ধারাবদ্ধ গুমোট পরি-
তিনিই বহন করে নিয়ে এলেন
ী হাওয়া। বহুভবা উজ্জ্বল
র মাস। ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত
লেডী ইজ নট ফর বার্নিং" ফ্রাই-এর

প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক। এই বছরই লণ্ডনের আর্ট থিয়েটারে এর প্রাথমিক অভিনয় হয়। সাফল্যের মাত্রা একে বহন করে নিয়ে যায় গ্লোব থিয়েটারে। ১৯৫০-এর জানুয়ারীতে প্রকাশিত হয় "ভেনাস অবসার্ভড" নাটকখানি। ফ্রাই-এর কৃতিত্ব হলো এই যে তাঁর নাটকে একই সাথে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে নাটকের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর উপরে। আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যকার ব্যর্থতার সুরটি তাই চির আধুনিক হয়েও ফ্রাই-এর নাটকের মধ্যে বাজে নি। আমার মনে হয়। আমাদের দেশে যাঁরা নব্যধারার প্রবর্তন প্রয়াসী তাঁরা যদি একটু কষ্ট করে এবং একটু মনোযোগ সহকারে ফ্রাই-এর নাটকগুলি অধ্যয়ন করেন তাহলেই অনুভব করতে পারবেন যে, নাট্যকারের সার্থকতা কোথায় নির্ভর করে? একথা খুবই সত্যি যে, নাটকের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল তার মঞ্চায়নে। কিন্তু কেবল মঞ্চসফল হলেই নাটকের মূল্য নির্ধারিত হয় না, যদি না থাকে তার কোন সাহিত্যিক প্রসাদগুণ। ফ্রাই-এর নাটকের প্রসাদগুণ অনেকখানি। নোওয়েল ও কাওয়ার্ডের মতন রঙ্গমঞ্চ যেন তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশেছে। আমাদের দেশের অর্থাৎ বাংলা রঙ্গমঞ্চের মহান ঋত্বিক গিরিশচন্দ্রর মতন তিনিও বলতে পারতেন —

"রঙ্গভূমি ভালবাসি, হৃদে সাধ রাশি রাশি
আশার নেশায় করি জীবন যাপন।"

ফ্রাইপুট চিন্তা করতে পারেন খুব সহজে। তাঁর কাছে সিচুয়েসানও এসে যায় সাবলীলগতিতে। স্থান কাল পাত্র ভেদে সংলাপ জুড়তে তাঁর যেন দোসর নেই। এবং বাড়াবাড়ি না করেও বলা যায় যে, বাংলা নাট্য সাহিত্যের মধুসংলাপী রবীন্দ্রনাথের মতন তাঁরও এক একটি সংলাপ উজ্জ্বল স্বাভাবিক মূল্য লাভ করেছে। একমাত্র সংলাপের জোরেই ফ্রাই সারা দুনিয়ার নাট্যামোদীদের চিত্ত জয় করে হতে পারেন লোককান্ত বরেণ্য শিল্পী। কোথাও দীর্ঘ, কোথাও সঙ্কুচিত, কোথাও তরল সংলাপ ফ্রাই-এর নাটককে দান করেছে একটা সুমহৎ মর্যাদা। তাঁর সংলাপ যেন ঠিক

কিশোর ফিল্মসের "হাম দো ডাকু"র এক দৃশ্যে কিশোরকুমার ও মধুবালার ভগ্নীদ্বয় গঙ্গা ও লীলা

জায়গায় ঠিক কথাটি, তাকে সরিয়ে আর অন্য কোন কথা বসানো যায় না। যেখানে যেমনটি হওয়া দরকার ফ্রাই সেখানে ঠিক তেমনিটি ব্যবহার করেছেন। হাসি আছে, আনন্দ আছে, দুঃখ আছে, বেদনা আছে। ফ্রাই-এর সংলাপ সব কিছুকে নিয়ে রচনা করেছে একটা আশ্চর্য কল্পলোক। তাঁর নাটকে সংহত প্লট এবং সংলাপ একত্র থেকে অব্যর্থ লক্ষ্য স্বাভাবিকতার দিকে উত্তরণ করেছে। ইবসেনের থেকে যে ধারা চলে আসছিল, আধুনিক নাটকের মর্ম-প্রবাহে তাকেই নয়নমনোহর করে রূপময় করেছেন এনে ইংরেজী নাটকের আসরে ক্রিস্টোফার ফ্রাই। ফ্রাই-এর কিছু কিছু নাটকে শেক্সপীয়রের অনিবার্য প্রভাব দেখা যায়। ভেনাস অবসার্ভড নাটকে চরিত্রগুলোর অবস্থান এবং তাদের কার্য-কলাপ আমাদের স্বভাবতই স্মরণ করিয়ে দেয় শেক্সপীয়রের বেনেডিক এবং বিয়াট্রিসকে। স্মরণ করিয়ে দেয় জ্যাকুইস এবং ডিউককে।

ঈর্ষা এবং ঘৃণাকে নাট্যকার ফ্রাই কদাচিৎ বরদাস্ত করেছেন। সহানুভূতি এবং প্রেমই তাঁর নাটকের মর্মবাণী। জীবন সম্পর্কে একটা মহত্তর উপলব্ধি ফ্রাই-এর নাটকে সত্যের দীপাবলী হয়ে জ্বলছে। শেক্সপীয়রের নাটকে যেমন চিরন্তন জীবন সত্যই প্রতিপাদ্য বিষয়, ফ্রাই-এর নাটকেও এই শাশ্বত জীবন মহিমারই সোচ্চার ধ্বনি। এলিয়টের মতন কাব্যনাট্য রচনা করেও মনোভঙ্গিমার দিক থেকে ফ্রাই কিন্তু তাঁর সাথে হাত মেলান নি একবারও। ফ্রাই যেন এলি-য়টের নিষ্ফলা অনাবাদী জমিতেই উৎকৃষ্ট ফসল বপন করেছেন। এলিয়ট যখন জীবনের তুচ্ছতা দেখে, নগ্নতা দেখে বিষণ্ণচিত্ত, মুহ্যমান ফ্রাই তখন আশ্চর্য রকমের শান্ত-স্থিতধী। জীবন-বন্দনার গান তিনি সেই লগ্নেই গেয়ে-ছেন। তাই তাঁর নাটকের কোন চরিত্র-

● "শুধু একটি বছর"-এর স্যুটিং-এর অবসরে অগ্রজ উত্তমকুমারকে খাদ্যপরিবেশনরত অনুজ তরুণকুমার। আলোকচিত্রী বিজয় ঘোষ, পরিচালক সলিল দত্ত এবং নায়িকা সুপ্রিয়া চৌধুরীকে চিত্রে দেখা যাচ্ছে

আলোকচিত্র : শান্তিময় সান্যাল

টাই নিষ্প্রভ নয়, বরং অধিকাংশই যেন আলোকাভিসারী, সূর্যাংশের দিকে সহজ উত্তরিত।

ফ্রাই-এর কাছে জীবন যেন এক আশ্চর্য আনন্দের বস্তু। ভগবানের উপরে তাঁর অসীম বিশ্বাস। অতীতের প্রতি তাঁর একটা সুসহ মমত্ববোধ। বিশেষত হলেও বর্তমানের প্রতিও তাঁর কোন অনীহা নেই। সমকালীন নাট্য-কারদের মধ্যে এতটা সামঞ্জস্যের দৃষ্টি অন্য কারো লেখায় আর চোখে পড়ে না। ফ্রাই সত্য ও সুন্দরের পূজারী। যেখানে মানুষ ভুল করে, সেখানে ফ্রাই উপস্থাপিত করেছেন তার জন্যে ক্ষমা ও সহানুভূতি। তাঁর নাটকের অন্তর-বাহিনী ফল্গুটি হলো তাঁর গভীর জীবনদর্শন। তাঁর মেটাফিজিক্স। নাটকের বহিরঙ্গের চটকের অন্তরালে আছে তাঁর একটা শক্ত অনমনীয় মনোসমীক্ষা।

ফ্রাই-এর কৃতিত্ব হলো এই যে, তাঁর গাম্ভীর্যের অতলে আছে আনন্দ আর আনন্দের অতলে গাম্ভীর্য। সমস্ত আতঙ্ককে বিদায় জানিয়ে জরাজীর্ণতাকে অফুরান প্রাণের বেগে সঞ্জীবিত করে এই তরুণ নাট্যকার আলিঙ্গন করেছেন মধুর সদানন্দ হাসিকে। খবর এনে-ছেন এমন এক পৃথিবীর, যেখানে কবিত্ব প্রেমিকের সংখ্যা অগুণতি এবং তারা সকলেই ভাগ্যের নিয়মে নিতান্তই অমর।

ফ্রাই-এর সাফল্যের সরণী বেয়েই আগামী দিনের নাট্যকারের যাত্রা সুরু হোক্। আশা করছি, এক সাহিত্যের রামরাজত্ব যেখানে সম্ভব হবে সাহিত্যিক এবং পাঠকের মধ্যে একটা সহজ বোঝাবুঝি। নাট্যকার ফ্রাই সেই সাফল্যের প্রাথমিক বর্তিকা জ্বালিয়েছেন। আমরা উচ্চারণ করতে পারছি—

অতীতের তিমির গর্ভে শুধুমাত্র অতীত ছাড়া আর কিছু নেই;
বিশ্ব নিয়ে আনন্দিত হতে পারো তুমি অনিমিত্ত,
তোমারই জন্যে রাখি আমার সুকৃতি।

বর্তমান পৃথিবীর এবং সভ্যতার সঙ্কট দেখে পৃষ্ঠপ্রদর্শনে পলায়ন করেন নি ক্রিস্টোফার ফ্রাই। বরং আশ্চর্য রকমের আধ্যাত্মিক এবং শিক্ষাগত শক্তি নিয়ে তিনিই সদম্ভে আজকের ইংরেজী নাটকের আসরের মধ্যমণি হবেন বলে আশা রাখি।

আমেরিকায় নাট্য মঞ্চের সূচনা ও ক্রমবিকাশ

আমেরিকায় নাট্যরসিক ও নাট্য-পিপাসুদের কাছে নিউইয়র্কের ব্রডওয়ে এক শতাব্দীরও বেশি কাল একটা মর্যাদার আসন অধিকার করে রয়েছে। বস্তুত আমেরিকায় রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যাভিনয়ের মর্মকেন্দ্র হল এই ব্রডওয়ে।

কিন্তু নাট্যমঞ্চের দিক থেকে নিউ ইয়র্ক জাতে ওঠার আগেই আমেরিকার পূর্ব উপকূল বরাবর, বিশেষ করে বষ্টনের ফিলাডেলফিয়া, দক্ষিণ ক্যারোলাইনার চার্লসটন প্রভৃতি শহরে নাট্যমঞ্চের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঘটেছিল। জাতি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা আরও পশ্চিমে, এমন কি সানফ্রান্সিস্কো পর্যন্ত গিয়ে বিভিন্ন শহরে, নদীতীরবর্তী অঞ্চলে আর খনি এলাকায় অভিনয়ের আসর জমিয়ে তুলেছিল। যেখানেই সাধারণ মানুষের বাস, সেখানেই নাট্যাভিনয়ের আদর দেখা গেছে।

আজকের পরিবর্তনশীল মার্কিন রঙ্গমঞ্চের প্রকৃত কাহিনী লেখা হয়েছে

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

এইখানে—শহর থেকে দূরে এইসব পল্লী এলাকায়, যেখানে আড়ম্বর ও জাঁক-জমকের কলকোলাহল নেই, ব্রডওয়ের মত নিয়ন আলোর পসরা সাজিয়ে যেখানে দর্শককে হাতছানি দিয়ে ডাকা হয় না, বাইরের চাকচিক্য দিয়ে দর্শকের মনে চাঞ্চল্য ও উন্মাদনা জাগানো হয় না, সুমার্জিত ও নিখুঁত পরিপাটি পেশাদার নাটক অভিনয়ের জন্য ব্রডওয়ের খ্যাতি অবিসংবাদিত। কিন্তু এখন দেশের সর্বত্র অসংখ্য শহরে নাট্যরসিকের সংখ্যা ক্রমেই বহুগুণে বাড়ছে। আর এ সব শহরে বহু নাট্যমঞ্চ গড়ে উঠছে। এতদিন যদিও তারা টেলিভিশন, বেতার ও চলচ্চিত্রেই সন্তুষ্ট ছিল, এখন তাদের মঞ্চাভিনয়ের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

এখন অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। প্রথম উপনিবেশ স্থাপনকারীরা যখন আমেরিকার নতুন দেশের মাটিতে পদার্পণ করল, তখন এদেশে নাটক বলতে কিছুই ছিল না। যা ছিল তা হল রেড ইণ্ডিয়ানদের উৎসব ও নৃত্যানুষ্ঠান। তবে মার্কিন নাট্যমঞ্চের উদ্ভবের ইতিহাসে এর কোন প্রভাব ছিল বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন না।

এই নতুন দেশের ভূখণ্ডে প্রথম যে নাটকটি মঞ্চস্থ হয়েছিল, তা হল একটি কমেডি। এটি রচনা করেছিলেন স্পেন-দেশীয় একজন কাপ্তেন। ১৫৯৮ সালে এই নাটকটি অভিনীত হয়।

১৬৪০ ও ১৬৫২ সালের মধ্যে ফরাসী নাট্যকার কর্নেব লেখা দু'খানি ট্র্যাজেডি কুইবেকে মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু মার্কিন মঞ্চের ও নাট্যাভিনয়ের বিবর্তনের ইতিহাসে এগুলিরও খুব বেশি প্রভাব ছিল না। যা কিছু ছিল তা ইংরেজ-প্রভাব। উত্তর আমেরিকা মহাদেশের অধিকাংশটাই চলে গিয়েছিল ইংরেজদের অধিকারে। তাই অন্যান্য অনেক কিছুর মত রঙ্গালয়ের সূচনার পিছনেও রয়েছে ইংরেজ-প্রভাব।

১৭৮৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ডের কাছ থেকে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে এবং ১৮১৪ সালে তা পাকা-পোক্ত হয়। কিন্তু এর বহুদিন পর পর্যন্ত মার্কিন রঙ্গমঞ্চ বহু দিক থেকেই ইংরেজদের নাট্যমঞ্চের প্রভাবাধীন ছিল।
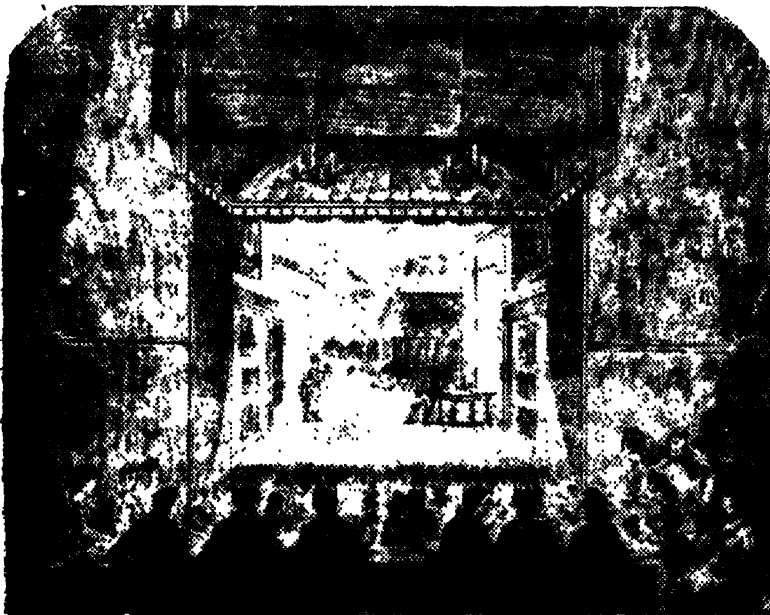
নিউ ইয়র্কের জন স্ট্রীট থিয়েটারের (১৭৬৭) অভ্যন্তর ভাগ

● সত্যজিৎ রায় পারচালত "না.ক"-এর নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় উত্তমকুমার ও শর্মিলা ঠাকুর
আলোকচিত্র : জানকী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রথম ইংরেজ উপনিবেশ স্থাপনকারী দল এদেশে পদার্পণ করে ১৬০৭ সালে। তারা উপনিবেশ স্থাপন করল জেমসটাউনে। তারা নিশ্চয়ই লণ্ডনের গ্লোব প্লে হাউস বা অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহে শেক্সপীয়ার, বেন জনসন, মার্লো প্রভৃতিদের নাটক অভিনয়ের স্মৃতি সঙ্গে নিয়ে এসেছিল। তবে তা বড় রকমের কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। ১৬৬৪ সালে ইংরেজরা ওলন্দাজদের হাত থেকে নিউ ইয়র্ক ও পেনসিলভেনিয়া অধিকার করে। এর পর থেকে এখানে ইংরেজদের আগমন ঘটতে থাকে অব্যাহতধারায়।

প্রথম উপনিবেশ স্থাপনের পর থেকে প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত আমেরিকায় উপনিবেশবাসীদেরও প্রাথমিক সমস্যা ছিল বাঁচার সমস্যা। জীবনের অন্য কোন দিক নিয়ে চিন্তা করার অবসরও তখন তাহাদের ছিল না। তা ছাড়া, সে যুগে তাদের মনও ছিল সংস্কারাচ্ছন্ন, রক্ষণশীল।

তবুও সে যুগেই কিছু কিছু সখের নাটুকে দল গড়ে উঠেছিল। এরা রক্ষণশীল সমাজের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে নিজেদের ও বন্ধুবান্ধবদের চিত্তবিনোদনের জন্য নাটক অভিনয়ের ব্যবস্থা করেছিল। ১৬৬৫ সালে ভার্জিনিয়ার তিনটি যুবক এই রকম অভিনয়ের অপরাধে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিল। পরে অবশ্য তারা মুক্তিলাভ করে।

কঠোর নীতিবাদিতার জন্যে নিউ ইংলণ্ড উপনিবেশের অধিবাসীরা চিত্তবিনোদনের এই শাখাটিকে যেন মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারছিল না। সপ্তদশ শতকের শেষ দশক নাগাদ বস্টনের একজন বিশিষ্ট পাদরী দেখেছিলেন যে, নিউ ইংলণ্ডে মঞ্চাভিনয় শুরু করতে গিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদের সৃষ্টি হয়েছিল। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীর ঠিক মাঝামাঝি সময়ে দু'জন অভিনেতা বস্টনে একটি নাটক অভিনয়ের চেষ্টা করলে ম্যাসাচুসেটস কমনওয়েলথ একটি আইন পাশ করে নাট্যাভিনয় নিষিদ্ধ করে দেয়।

দক্ষিণাঞ্চলের উপনিবেশগুলি এর তুলনায় অনেক বেশি প্রগতিশীল ছিল। পেশাদার নাটুকে দলগুলিকে তারা অনেক বেশি সমাদর করেছিল। ১৭১৬ সালে চার্লস ও মেরী স্টাগ ভার্জিনিয়ার উইলিয়ামসবার্গে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন। এর কয়েক বছর পরে চার্লস টাউনে (আধুনিক নাম চার্লসটন) নাটকের একটা মরশুম চলল। এখানকার প্রগতিশীল অধিবাসীরা যথেষ্ট নাট্য-সচেতনতার পরিচয় দিল, এমন কি একটা প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্যে চাঁদাও তোলা হল। [ক্রমশ।
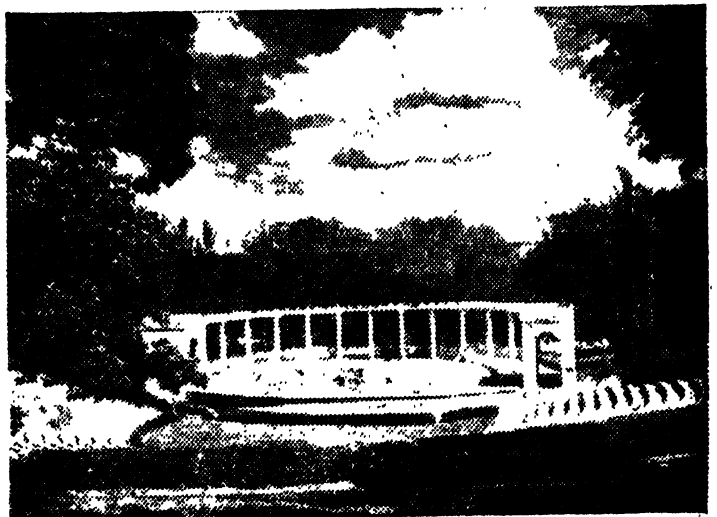
● আরকানসাস বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে মুক্তাঙ্গন নাট্যমঞ্চ

গান-বাজনার গালগল্প

বিশ্ববিজয়ী বিট্‌লস্‌

গত সংখ্যার এই প্রবন্ধের সঙ্গে বিট্‌লস্‌ (The Beatles-)এর যে ছবি ছাপা হয়েছে তাতে দেখা যাবে, বিট্‌লস্‌ দলের শিল্পীচতুষ্টয়—জর্জ, পল, রিঙ্গো আর জন—সবাই বয়সে তরুণ, উৎসাহে উদ্দীপ্ত, প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর। এবার ওদের প্রত্যেকের পরিচয় দিচ্ছি। এরা লিভারপুলের বাসিন্দা, লেখাপড়া গান বাজনা, সব কিছু ওখানে করে ১৯৬০ সালে তারা এক গানের দল বাঁধল—নাম দেওয়া হল—দি বিট্‌লস্‌। রিঙ্গো ঢাক পেটায়, আর তিনজন গীটার বাজায় এবং গলা ছেড়ে গান করে। কেউ শোনে, কেউ শোনে না। লিভারপুলের বাসিন্দারা কিন্তু কিছুটা নিজেদের অজান্তেই ওদের ওই প্রাণ-প্রাচুর্যের প্রশংসা করতে সুরু করে, ভালো লাগতে থাকে ওদের নিজস্ব রচনায় বসানো তেজস্বী সুর, আর প্রাণভরা গলার কসরৎ। সেই ভালো লাগার ছোঁয়াচ লাগল ওদের বর্তমান ম্যানেজার ব্রায়ান এপষ্টিন (Brian Epstein) -এর মনে। তিনি বুঝি আন্দাজ করতে

সন্তোষকুমার দে

পেরেছিলেন, এক নতুন সম্ভাবনার সচেত আছে ওদের মধ্যে। পার্লো-ফোন রেকর্ডে 'পপ্‌' গানের পশরা সাজান জর্জ মার্টিন। তিনিও এপষ্টিনের সঙ্গে একমত হলেন, ফলে পার্লোফোন রেকর্ডে ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বরে বিট্‌লস্‌-এর প্রথম রেকর্ড বেরুল—"Love Me Do" রেকর্ডটি বেরুবার সঙ্গে সঙ্গে তা লিভারপুলে অভূতপূর্ব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল এবং অচিরেই তা সারা দেশে অকল্পনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করে। বলতে গেলে বিট্‌লস্‌-এর বিশ্ববিজয় বাষট্টি সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস হতে সুরু এবং আজও তা সমান ঔজ্জ্বল্য নিয়ে চলছে।

ওদের চারজনের মধ্যে সবচেয়ে অল্পবয়সী—জর্জ হ্যারিসন (George Harrison) এখন তার বয়স মাত্র বাইশ বছর। সে ৫ ফুট ১১´ ইঞ্চি। তার চোখ হাল্কা বাদামী, চুল—গাঢ় বাদামী। লিভারপুল ইনষ্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র সে। নীল আর কালো রং তার পছন্দ খেতে ভালোবাসে ডিম আর আলু-কুচি। সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে পল ম্যাকডাউয়েল, কার্ল পারকিন্‌স্‌ আর আর্থা কিট্‌-এর সে অনুরক্ত। তার শখ রেকর্ড আর গীটারের, বিট্‌লস্‌ দলে সে-ই মূল বাজিয়ে। সোনালী চুলের মেয়েদের তার ভালো লাগে; ভাল লাগে না বাসে চড়তে, আর মাথার চুল ছাঁটতে। তার মাথার লম্বা মেয়েলি চুল অবিন্যস্তভাবে ছড়িয়ে রাখে এবং তাই এখন এক শ্রেণীর ছেলেদের কাছে নতুন ফ্যাসানরূপে চালু হয়েছে।

জর্জের পরে বয়স হিসাবে দ্বিতীয় হল পল ম্যাক-কার্টনি (Paul Mc-Cartney) তার এই সবে তেইশ চলছে। সেও লম্বায় ৫ ফুট ১১´ ইঞ্চি। তারও চোখ আর চুল বাদামী এবং সেও লিভারপুল ইনষ্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র। তার পছন্দ কালো রং-এর পোষাক-আসাক, খেতে ভালোবাসে মাংস আর আলুর কুচি এবং প্রায়ই পোলোখেলার গলাবন্ধ কালো সোয়েটার পরে। সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে তার ভালো লাগে রে চার্লস এবং পেগী

বিমল রায় পিকচার্সের "দু-দুনী-চার" এর একটি দৃশ্যে অসিত সেন ও তনুজা। চিত্রটি পরিচালনা করছেন দেবব্রত সেন

লো, চিত্র জগতে ব্রাণ্ডো, বার্দত, সেলার্স এবং কুইন্। তার শখ—গান লেখা, গান গাওয়া আর চটপটে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করা। তাদের দলে সে ব্যাস (Bass) গীটার বাজিয়ে থাকে, গান রচনা করে, সুর দেয়, আবার গলা ছেড়ে গানও করে।

রিঙ্গো আর লেনন সমবয়সী, উভয়েরই বয়স সবে পঁচিশ। রিঙ্গো স্টার (Ringo Starr) একটু বেঁটে —৫ ফুট ৮॥ ইঞ্চি লম্বা। নীল চোখ, বাদামী চুল। পড়েছে সেণ্ট সাইলাস এবং ডিংলে ভেল সেকেণ্ডারী মডার্ণ স্কুলে। তার পছন্দের মধ্যে আছে কালো রংয়ের পোষাক, মাংস-আলুর কুচি, আঁটসাট প্যাণ্ট আর সরু টাই। সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে রে চার্লস, ডায়না ওয়াশিংটন আর চিত্রতারকাদের মধ্যে নিউম্যান আর বার্ডট তার প্রিয়। শখ হল—মেয়েদের নিয়ে মোটরে ঘোরা আর ড্রাম বাজানো। বিট্‌লস্ দলেও সেই হল ড্রাম বাদক।

বাকি থাকে জন লেনন (John Lennon) তারও এখন বয়স পঁচিশ; লম্বা ৫ ফুট ১০´ ইঞ্চি। বাদামী চুল, বাদামী চোখ, পড়াশুনা করেছে কোয়ারি ব্যাঙ্ক হাই স্কুলে, তার পরে লিভারপুল আর্ট কলেজে। তারও কালো রং পছন্দ। মাংস-আলুর কুচি আর জেলি খেতে ভালোবাসে। সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে কাল পারকিন্‌স্, চাক বেরী এবং বেন ই কিংস তার প্রিয়, চিত্রতারকাদের মধ্যে বার্ডট ব্রাণ্ডো, সেলার্স আর কুইন। অবসর সময়ে গান লেখা, রেকর্ড বাজানো আর গানে সুর দেওয়ার কাজে সে মেতে থাকে। সোনালী চুলের মেয়েদের ভালো লাগে তার।

যা কিছু প্রচলিত প্রথা তারই ব্যতিক্রম ঘটানোই যেন বিট্‌লস্-দের রীতি। তাদের বাহ্যিক পোষাক, কেশ-চর্যা (?)—বিশেষ করে অবিন্যস্ত চুলের ইঙ্গিতটি চোখে আঙুল দিয়ে দর্শককে যেমন তাদের উপস্থিত সম্বন্ধে সজাগ করে দেয়, তেমনি তাদের উদ্দাম গান ও বাজনাও মুহূর্তে শ্রোতাকে বুঝিয়ে দেয় যা সে শুনছে তা অসাধারণ কিছু এবং সহসা শুনলে যা একটা প্রবল সুরপ্রপাতের মত মনে হয়। তাতে অভ্যস্ত হলেই সেই প্রাণচাঞ্চল্যের অমেয় শক্তি ও সৌন্দর্য শ্রোতার চেতনাকে আচ্ছন্ন করে, আবিষ্ট করে ফেলে। তাই বিট্‌লস্-এর গুণগ্রাহীর সংখ্যা পৃথিবীর সব দেশেই ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

প্রকৃতপক্ষে মাত্র তিন বছর বয়স বিট্‌লস্ রেকর্ডের কিন্তু এর মধ্যে তা-যে কেবল দেশ বিদেশের রেকর্ড চার্টে উচ্চ সম্মানের স্থান অধিকার করেছে তাই নয়, বস্তুত তা ব্রিটিশ রেকর্ডিং শিল্পের

সাম্প্রতিক পাক-ভারত সঙ্ঘর্ষ বিষয়ে

রেকর্ডে ভারতের নেতৃবৃন্দের ভাষণ
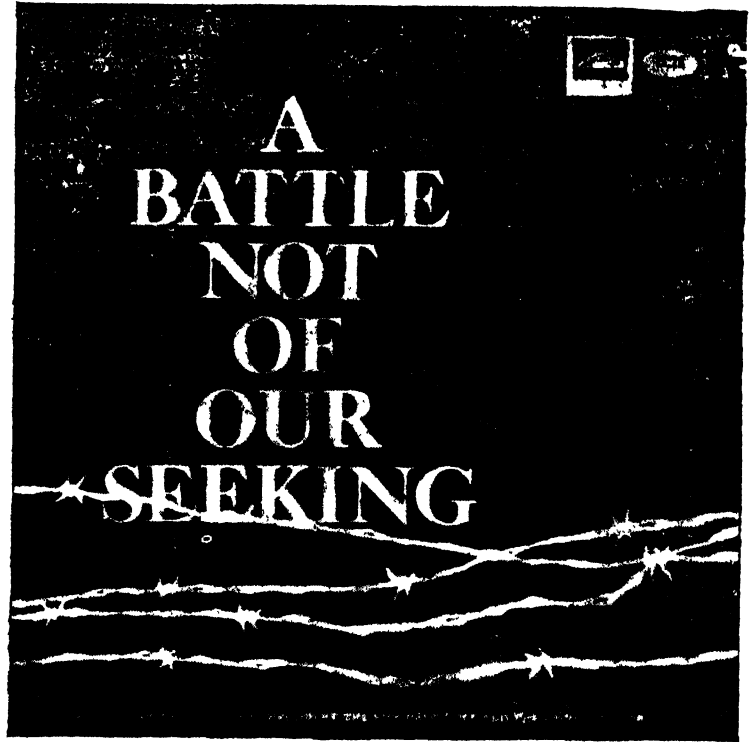
● ভারতীয় নেতৃবর্গের ভাষণের রেকর্ডের কাগজের আধার

সম্প্রতি পাকিস্তান ভারতবর্ষ আক্রমণ করলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সে বিষয়ে জাতির কাছে তথা সমগ্র পৃথিবীর কাছে ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ, উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর জাকির হোসেন এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী আকাশবাণীর মাধ্যমে যে-সকল ভাষণ দিয়েছিলেন তার নির্বাচিত অংশসমূহ সম্প্রতি একখানি লং-প্লেইং রেকর্ডে গ্রামোফোন কোম্পানী প্রকাশ করেছেন। রেকর্ডখানি আমরা বাজিয়ে শুনেছি। এতে ভারতের চিরন্তন শান্তির বাণীই পুনর্বার স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে। রেকর্ডখানিতে কেবল তিনজন শ্রেষ্ঠ মনীষীর কণ্ঠস্বরই বিধৃত হয় নি, পরন্তু একখানি মহামূল্য ঐতিহাসিক স্মারক রেকর্ড হিসাবেও তা আদৃত হবে। আকাশবাণীর সহযোগিতায় প্রকাশিত এই রেকর্ডখানির জন্য ভারতীয় মাত্রেই গৌরবান্বিত বোধ করবেন। রেকর্ডখানির নাম—A Battle Not Of Our Seeking অর্থাৎ 'যে যুদ্ধ আমরা সেধে আনি নি'। ১২" লং-প্লেইং, ক্রমিক সংখ্যা—ECLP 2315.

ভাগ্যের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছে। গ্রামোফোনে তাদের প্রথম রেকর্ডখানিই ১৯৬২।৬৩ সালের সর্বাধিক জনপ্রিয়তার সম্মান লাভ করে। "নিউ মিউজিক্যাল এক্সপ্রেস" নামক সঙ্গীত পত্রিকায় এই গণভোট গৃহীত হয়। তাদের গানের গুণ বর্ণনা করে বিখ্যাত সঙ্গীত সমালোচক টোনি ব্যারো বলেছেন—"Their music is wild, pungent, hard-hitting, uninhibited—and personal". ওয়ার্লড ফেয়ার (World Fair) পত্রিকায় তাদের একখানি রেকর্ডের দশ লক্ষ, পনের লক্ষ সংখ্যক বিক্রয়ের জন্য সাধুবাদ জানিয়ে মন্তব্য করা হয়েছে—"A staggering sales figure such as this has never been attained by any other artiste any where in the world".

পৃথিবীর কোন দেশের কোন গায়কের বা গায়ক গোষ্ঠীর পক্ষে এই অকল্পনীয় জনপ্রিয়তা লাভ সম্ভব না হওয়া সত্যই বিট্‌ল্‌স্ বিশ্ববাসীর বিস্ময় উদ্রেক করেছে।

বিশ্ববিজয়ী বিট্‌ল্‌স্-এর রেকর্ডগুলি ভারতবর্ষেও তৈরী হয়ে থাকে এবং ভারতবর্ষে তার চাহিদাও প্রচুর।

শাওনতলির মাঠে পুতুলনাচের আসর

বুদ্ধদেব রায়

—পুতুল লাচবে গো। পুতুল লাচবে গো ॥

—কোথায় ?

—শাওনতলির মাঠে।

—কখন ?

—সাঁজের বেলা।

হ্যাঁ, ভাদ্রমাসে এই শাওনতলির মাঠেই মনসার ভাসান উপলক্ষে নানা রকমের নাচ গান তামাশার অনুষ্ঠান হয়ে থাকে বছরে বছরে। সেবার ছিল পুতুল নাচ। নামকরা নাচিয়ে দল এসে ঐ শাওনতলির মাঠে ছাউনি ফেলেছিল।

বিরাট ফাঁকা মাঠের খানিকটা জায়গা জুড়ে আসর বাঁধা হয়েছিল। একটা আটচালার ছাউনি দিয়ে তিনদিক ঘিরে পুতুল নাচের মঞ্চ। সামনের দিকটা মানুষের থেকে উঁচু করে আটচালা দিয়ে বাঁখারির বেড় দিয়ে শক্ত করে বাঁধা। বাকীটা ফাঁকা, তবে একটা কালো পর্দা টাঙান। সন্ধ্যের আগে থেকেই লোক জমায়েৎ হতে লাগলো। শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, স্ত্রী—কেউ লণ্ঠন হাতে কেউ চাটাই বগলে করে আগেভাগে এসে জায়গা দখল করে বসতে লাগলো। বড় বড় দুটি হ্যাজাক লাইট টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। মঞ্চের

● "আয়ে দিন বাহার কে"র শিল্পী চন্দ্রিমা ভাদুড়ীকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন প্রযোজক বেদ প্রকাশ। আলোকচিত্র : রবীন গুপ্ত

ভেতরে নীচেও বোধহয় ঐ ধরণের একটা আলো জ্বলছিল। কালো পর্দা ভেদ করে সেই আলো উঁকি দিচ্ছিল। মোড়ল গোছের লোকেরা—তদারকিতে ব্যস্ত। বাচ্চাদের কিচিমিচি, মেয়েদের ফিস্‌ফিসানি ও পুরুষদের গল্পগুজবের কলরব মিলে বেশ একটা পাঁচমিশেলী ঐক্যতান বাজছিল। এছাড়া হাসি-ঠাট্টার ঢেউও মাঝে মাঝে উঠছিল। মোদ্দা আবহাওয়াটা বেশ জমজমাট। হুঁকোয় টান দিয়ে কাশতে কাশতে কে যেন জিজ্ঞেস করলে, আর কত দেরী গো?

সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন, এত তাড়া কিসের?—আর যায় কোথা। লেগে গেল বচসা। তারপর প্রায় হাতাহাতির যোগাড়। মাতব্বর গোছের একজন লোক এসে শান্ত করে। হঠাৎ ঢং করে ঘণ্টা বাজল। অমনি হাজার কণ্ঠে একটানা ও—ও—ও শব্দ শোনা গেল। চীৎকারের রেশ থামতে না থামতেই মঞ্চের কালো পর্দা উঠে গেল। ঢাকের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের বাঁ দিক থেকে একটি পুতুল বেগে বেরিয়ে এলো। মাথায় তার সাপের মুকুট আর বাহুতে সাপের বালা।

ইনিই শিবের মানসকন্যা মনসা দেবী। দৃষ্টি তার দর্শকের দিকে। তার ঐ চোখদুটি আশঙ্কার না প্রতিহিংসার তা বোঝা শক্ত। আলো-আঁধারের মাঝে হঠাৎ এই অদ্ভুত মূর্তির আবির্ভাব উপস্থিত জনতার মনে যুগপৎ ভীতি ও ভক্তির সঞ্চার করেছিল। সমস্ত কলরব থেমে গিয়ে একটা বোবা নিস্তব্ধতা বিরাজ করছিল। মনে হল, ঐ মূর্তি মুহূর্তে সকলকে যাদু করে ফেলেছে। তাদের বাকশক্তি কেড়ে নিয়েছে। কানে একটা মৃদু সঙ্গীতের সুর ভেসে এলো—ছড়া কাটার ঢঙে মঞ্চের ভেতর থেকে কেউ বলে উঠলো:

অনন্ত নারায়ণে পদ্মার মাথার মণি।
বাসুকি নাগে করে দেবী কাঁকালী কাচুনি।
পদ্মা হইল দেবরাজ শিবের নন্দিনী
সেই পদ্মা পাতালেতে হয় সর্পরাণী॥

"জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার"—একটি দৃশ্যে তরুণকুমার ও মাধবী মুখোপাধ্যায়। আলোকচিত্র: জানকী বন্দ্যোপাধ্যায়

বলা শেষ হলে পর্দা ধীরে ধীরে নেমে এলো। হতবাক জনতা আবার গুঞ্জন-মুখর হয়ে উঠলো। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, প্রৌঢ়-প্রৌঢ়ারা দেবীর উদ্দেশে তাদের সভক্তি প্রণতি জানিয়ে মাথা নত করল।

সূত্রধর এবার জনতার দিকে চেয়ে মনসার কাহিনী ব্যাখ্যানের কাজ আরম্ভ করলেন। তিনি বুঝিয়ে দিলেন, কাহিনীর মূল নায়ক চাঁদসদাগর মনসার পুজো করবেন না, কেননা তাঁর উপাস্য দেবতা হলেন শিব। 'মহাজ্ঞান' তাঁর করায়ত্ত। তাঁর কাউকেও ভয় করবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু চাঁদের হাতে পুজো না পেলে মনসার পুজোরও প্রচলন হয় না। দুই শক্তিতে লাগলো সংঘাত। সে সংঘাত চাঁদের অন্তঃপুরেও প্রবেশ করেছিল। লখিন্দর-জননী সনকার বুক কেঁপে উঠলো পাছে কোন অমঙ্গল ঘটে। তিনি চাঁদকে মনসার মনস্তুষ্টির জন্যে অনুরোধ করলেন। কিন্তু চাঁদ অটল। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে যে বিরোধ বাধল তার ফল কি হল তা দেখবার জন্যে আবার পর্দা উঠলো।

দেখা গেল, দুই কোণে দুটি পুতুল—একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী। এরা চাঁদ ও সনকা। জেদী স্বামীকে অনুরোধ করার ভঙ্গীতে সনকা অঙ্গ সঞ্চালন করলেন, কিন্তু বৃথা। গর্বোন্নত-শির চাঁদ মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। ভয়-ব্যাকুল সনকা স্বামী ও পুত্রের ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় অস্থির হয়ে চাঁদের পায়ে মাথা রেখে পুনরায় আবেদন জানালেন:

কিন্তু কে শোনে কার কথা। ঠিক এমনি সময়ে মনসার আবার আবির্ভাব ঘটল। সনকা বিস্মিত, ভয়বিহ্বল —কিন্তু চাঁদের চোখে আগুন। সনকা লুটিয়ে পড়তে চায় মনসার পায়ে—চাঁদের রক্তচক্ষু তাকে পেছনে টানে। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। উপস্থিত জনমণ্ডলীর মুখে কথা নেই। তারা রুদ্ধনিঃশ্বাসে চরম পরিণতির জন্য অপেক্ষা করছে। মনে হচ্ছিল সেই শাওনতলির মাঠের কোন অস্তিত্ব নেই; সে যেন যাদুবলে চাঁদের অন্তঃপুরে পরিণত হয়েছে। —বিস্ময়ের ঘোর কিছুটা কাটলে সনকা আর একবার শেষ চেষ্টা করল কিন্তু চাঁদের জেদ পাহাড়ের মত অটল, ভাঙবার নয়। ওদিকে মনসার স্থির তীক্ষ্ণদৃষ্টি দম্পতির অন্তর্দ্বন্দ্বের প্রতি নিবদ্ধ ছিল। তাঁর বুঝতে বাকী রইল না যে চাঁদকে রাজী করানো সহজ নয়। কিন্তু দেবকন্যা কখনও মানুষের কাছে পরাভব স্বীকার করবে না। তাই চাঁদের উদ্ধত তেজের উপযুক্ত জবাব দিতে তিনি হাত নেড়ে জানালেন চাঁদের পুজোয় তাঁর প্রয়োজন নেই। বলার সঙ্গেই তাঁর অন্তর্ধান। সনকা মূর্চ্ছিতা —চাঁদের মুখে ক্রূর অট্টহাসি।

ধীরে ধীরে পর্দা নেমে এলো, কিন্তু দর্শক তখনও বাক্যহীন।

আবার সূত্রধরের কণ্ঠ শোনা গেল। জনতার উদ্দেশে কাহিনী ব্যাখ্যান সুরু হল। মনসার হাতে চাঁদের লাঞ্ছনার ইতিহাস। সাত নৌকোর এক বহর সাজিয়ে বাণিজ্যে বেরোলেন চাঁদ সওদাগর—মনসার কোপে সব ভরাডুবি হল। চাঁদ কিন্তু রক্ষা পেয়ে গেলেন কারণ মনসা তাঁকে প্রাণে মারতে চাননি প্রাণে মারলে তাঁর পুজো সম্পূর্ণ হয় না —কিছুদিন পর চাঁদের এক ছেলে হল। নাম হল তার লখিন্দর। লখিন্দর বড় হল। তার সাথে বিয়ে হল বেহুলার।

সূত্রধর থামলেন। ধীরে ধীরে আবার পর্দা উঠল। দর্শকদের দৃষ্টি আবার মঞ্চের ওপর নিবদ্ধ হল। দেখা গেল একটি ঘরের খাটের ওপর দুটি পুতুল পাশাপাশি শুয়ে আছে। ওরা বেহুলা-লখিন্দর। হঠাৎ লখিন্দর নড়ে উঠলো, হাত নেড়ে বেহুলাকে কি যেন বললে—তার সমস্ত শরীরে অস্থিরতার চিহ্ন—শাওনতলির মাঠে জনতাও অস্থির—কি হল, লখিন্দরের কি হল?—করুণ কণ্ঠে ভেতর থেকে কেউ গেয়ে উঠলো।

"জাগো ওহে বেহুলা সায়বেনের ঝি
তোরে পাইল কালনিদ্রা, মোরে
খাইল কি?"

নেপথ্যে সূত্রধরের কণ্ঠ—লখিন্দর আর নেই, বিষধর কালনাগের দংশনে তার জীবনদীপ বাসরঘরেই নির্বাপিত হল।—শোকবিহ্বল জনতার বেদনার্ত দৃষ্টির সামনে ধীরে ধীরে পর্দা নেমে এল। সারা শাওনতলির মাঠটা যেন কান্না-মাখানো।

কিছুক্ষণ পর আবার পর্দা উঠতেই দেখা গেল মঞ্চের ওপর একটি ভেলায়

পৃথ্বী পিকচার্স নিবেদিত "গুমনাম" চিত্রের একটি দৃশ্যে প্রাণ, মেহমুদ ও মনোজ
আলোকচিত্র: রবীন গুপ্ত

লখিন্দরের মৃতদেহ আর তার পাশে পুতুল বেহুলা বসে আছে। ভেলাটি ভেসে চলেছে। হঠাৎ আর একটি নারী-মূর্তির আবির্ভাব হল মঞ্চে। বেহুলা হাত নেড়ে সেই নারীমূর্তিকে কিছু যেন বলছে। বড় করুণ এ দৃশ্য।

সূত্রধর আখ্যানভাগ বর্ণনা করে চলেন। এ নারীমূর্তি—স্বর্গের ধোপানী নেতার। বেহুলা আপন মন্দভাগ্যের কথা জানাতে জানাতে নেতার সামনে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ছে।—ইতিমধ্যে পর্দা নেমে এল। দর্শকরা পরবর্তী ঘটনার জন্যে উদ্‌গ্রীব।

সূত্রধরের কাহিনী ব্যাখ্যান সমানে চলেছে।—আশঙ্কায় উদ্বেগে নেতার ঘরে বেহুলার দিন কাটে। নেতাকে সে অনুরোধ করে দেবসভায় নিয়ে যেতে। যাতে দেবতাদের কাছে তার দুঃখের কাহিনী ব্যক্ত করে স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনতে পারে। কিন্তু সে নেতার কাছে জানতে পারে দেবতাদের তুষ্ট করতে না পারলে তা সম্ভব নয়। নেতা বলে বেহুলাকে তার নিজস্ব গুণপনা ও কর্মকুশলতার দ্বারা অভীষ্ট সাধন করতে হবে। বেহুলা নৃত্যপটীয়সী। তাই নৃত্য দিয়েই সে দেবতাদের মন জয় করবে বলে স্থির করল। সে রাজকুল-বধূ, কুলের মর্যাদা ও সম্ভ্রমকে উপেক্ষা করেও সে নাচবে দেবসভায়—কেননা স্বামীর জীবন তার কাছে কুলমানের থেকে ঢের বড়। নেতাও রাজী হয়ে যায়, নিয়ে যায় তাকে দেবসভায়।

সূত্রধরের কথা শেষ হলে আবার পর্দা উঠলো। মঞ্চে দেখা গেল কতকগুলো কারুকার্যখচিত স্তম্ভ আর প্রতিটি স্তম্ভের পুরোভাগে রয়েছেন এক এক জন দেবতা। মধ্যস্থলে বিরাজমান দেবরাজ ইন্দ্র। তারা সবাই স্থাণুর মত নিস্পন্দপ্রায়। এমনি অবস্থায় লাস্যময়ীর বেশে বেহুলার প্রথম পদক্ষেপ এবং সেই পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গেই বেজে উঠলো নূপুরের মধুর নিক্বণ। দেবসভা চমকিত হয়ে উঠলো। নির্বাক বিস্ময়ে সবার চোখ মর্ত্যের রূপময়ী বেহুলার দিকে নিবদ্ধ। আবার এক পদক্ষেপ এবং

বসন্ত চৌধুরী "শঙ্খবেলা"র অন্যতম নায়ক
আলোকচিত্র :—শান্তিময় সান্যাল।

সঙ্গে সঙ্গে আবার নিক্বণ। এ যেন কোন মহৎ সৃষ্টির প্রথম ব্যঞ্জনা। দেবতা-দের চোখে বিস্ময়। মনে কৌতূহল। জানতে চায় কে এই অপরিচিতা। নেতা জানায়, বেহুলা। দেবতাদের কাছে তার নৃত্য-অঞ্জলি দিতে চায়। দেবরাজ হাত নেড়ে ইঙ্গিত করেন নাচ সুরু করতে। অনুমতি পেয়ে বেহুলার হৃদয় আশায় নেচে উঠলো। একে একে দেবতাদের প্রতি প্রণতির ভঙ্গীতে ভক্তি নিবেদন করে তারপর সুরু হল তার অবিশাস্য অপরূপ নৃত্য। তালছন্দ যেন তার চরণে আপনি এসে ধরা দিয়েছে। নাচের তালে দেবসভা দোলে—দেবতাদের চিত্ত উদ্বেল করে। তাঁরা ত্রিভুবন বিমোহিনী উর্বশীর নৃত্য দেখেছেন, কিন্তু সে নৃত্য তো এমন করে তাঁদের মনকে কখনও নাড়া দেয়নি। এ নাচের ভাষায় যেন একটা করুণ প্রার্থনা। জীবনের বিনিময়ে জীবন ভিক্ষার হৃদয় গলানো আকুতি। বেহুলার নাচের বিরাম নেই—যেন মন্দাকিনীর ধারা। প্রতিটি ভঙ্গিমায় যেন স্বর্গের পারিজাত বৃন্তচ্যুত হয়ে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে দেবতাদের উদ্দেশে।—এদিকে জনতাও যেন ভুলে গেছে স্থান-কাল-পাত্র। শাওনতলির মাঠ তখন দেবসভা। বিস্ময় ও কৌতূহল তাদেরও পেয়ে বসেছে, ভুলে গেছে দৈনন্দিন জীবনের দেনা-পাওনার কথা—মন ও দৃষ্টি নিবদ্ধ রয়েছে নৃত্যরতা হতভাগিনী বেহুলার দিকে। হৃদয়ের সমস্ত সহানুভূতি ও

শুভেচ্ছার ধারায় বেহুলাকে স্নান করিয়ে দিতে চায় তারা। মনে মনে হয়তো দেবতাদের কাছে আবেদনও করে---দাও, ওগো ফিরিয়ে দাও ওর জীবনের ধন। দুঃখিনী বেহুলার হৃদয়-ভাঙা আকুল আবেদন সুরলোকবাসীর হৃদয় বিগলিত করল। বিমুগ্ধ দেবরাজ ইঙ্গিত করলেন নাচ থামাতে। বেহুলা নাচ বন্ধ করে, মাথা নত করে দেবতাদের প্রণাম জানায়। দেবাদিদেব কন্যা মনসাকে ডেকে পাঠিয়ে বেহুলার স্বামীর জীবন দান করতে বললেন দেবরাজ। মনসা মঞ্চে এসে অঙ্গভঙ্গী করে জানালেন যদি চাঁদকে তাঁর পূজোয় রাজী করাতে পাবে, তবে বেহুলার স্বামী জীবন ফিরে পাবে। বেহুলা প্রতিশ্রুতি দিয়ে স্বামীর জীবন ফিরে পেল।---পর্দা নেমে আসে। জনতা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল।

কিছুক্ষণের মধ্যে আবার পর্দা উঠে গেল। দেখা গেল, বেহুলা, লখিন্দর এবং অন্যান্য অনেক লোক নদীতে বহর ভাসিয়ে ফিরছে। নেপথ্যে সূত্রধরের কণ্ঠে শোনা গেল, মনসার বরে বেহুলা স্বামী লখিন্দরের সঙ্গে সঙ্গে তার ছয় ভাসুর ও মাঝিমাল্লা সমেত শ্বশুরের বাণিজ্য বহরও ফিরে পেলো।---কথা শেষ হল, পর্দা নামল। আবার উঠলো পর্দা, এই শেষ দৃশ্য। মঞ্চে দেখা গেল, চাঁদ মনসাকে পূজো দিচ্ছেন। নেপথ্যে সঙ্গীতের সুর ক্রমশ জোরে হতে লাগল। তার সঙ্গে যুক্ত হল জনতার হর্ষধ্বনি। মনে হল যেন সত্যিই গঙ্গা-তলির মাঠে মহা ধূমধাম করে মনসার পূজো দিচ্ছেন চাঁদ। শেষবারের মত পর্দা নেমে এলো।

অনিল চট্টোপাধ্যায় ও সুমিতা সান্যাল—"নতুন জীবন" চিত্রের এক দৃশ্যে
আলোকচিত্র :—জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

আর্নেস্ট ড্যুস প্রসঙ্গে

জার্মানার নাট্যদিকপালের সংক্ষিপ্ত জীবনালোচনা

গত ১৬ই সেপ্টেম্বর পঁচাত্তর বছর পূর্ণ হল আর্নেস্ট ড্যুসের জীবনের। একটি শতাব্দীর তিন-চতুর্থাংশ হল অতিক্রান্ত। আজকের দিনের জার্মান নাট্যশালা যাঁদের কল্যাণে দিকদিগন্তে আপন সৌরভ বিস্তারে সমর্থ হয়েছে এই প্রবীণ নট তাঁদেরই একজন। শুধু গতানুগতিকভাবে অভিনয়েই নয় অভিনয়ের ক্ষেত্রে একটি নতুন ধারার সূত্রপাতের মাধ্যমে সমগ্র জার্মান নাট্যশালার সমৃদ্ধিসাধন ড্যুসের জীবনের এক শ্রেষ্ঠকীর্তি।

চল্লিশ বছর পূর্বে জার্মান অভিব্যক্তিবাদের অভিনব ভাষ্যকাররূপে তাঁর ভূমিকা আজও স্মরণীয়। সে ভূমিকা গ্রহণেরও তাঁর শক্তিমত্তা প্রকট। নাট্যশালা তাঁর জীবন, নাটক তাঁর প্রাণবায়ু না হলে এক সেরা ব্যবসাদারের পরিবারে জন্ম নিয়ে ব্যবসায়িক পরিবেশে এবং দৃষ্টিভঙ্গীতে পুষ্ট হয়ে কেন তিনি পিতৃ-পুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে আসবেন এই নতুন জগতে---সেই নব ভুবনের দিগন্তের পরিধি বিস্তার করতে। যে পরিবেশে তিনি লালিত সে এক ভিন্ন পৃথিবী। সেখানকার মানুষ ও তাদের ধ্যানধারণা ভিন্নতর। অতএব তার মধ্যে কেমন করে তিনি পেলেন নাটকের হাতছানি, কোন সোনার কাঠি তাঁর সুপ্ত শিল্পিসত্তাকে জাগিয়ে দিলে কোন অমোঘ আকর্ষণে

তিনি এসে দাঁড়ালেন পাদপ্রদীপের সামনে? সঙ্গে সঙ্গে গোটা জার্মানীর নাট্যশালার ইতিহাসটাও যেন বদলাতে আরম্ভ করল। মুখে মুখে এক কথা—অপূর্ব, অভূতপূর্ব। সাড়া তুললেন ড্যুস জনতার দরবারে, রসিকের পরিমণ্ডলে।

বাণিজ্যজগতে তাঁকে প্রলোভিত করতে পারল না। তাঁকে একদিন একজন খোলাখুলি জিজ্ঞাসাই করলেন —আপনি যদি মিলিওনেয়ার হন তা হলে কি করবেন।—উত্তর এল, থিয়েটারে অভিনয় করব। একটি স্পষ্ট উত্তর, বলিষ্ঠ, সুদৃঢ়, অনমনীয় মনোভাবের এক সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনি। এই থেকেই বোঝা যায় যে জন্মসূত্রেই তিনি নাট্য-প্রীতি নিয়ে এসেছেন। এ আসক্তি তাঁর সহজাত।

"নাথান দ্য ওয়াইস"-এ তাঁর প্রতিভার চরম বিকাশ ঘটেছে বলে অনেকের ধারণা। এর মাধ্যমে তাঁর খ্যাতি দূরদূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল, দেশের বাইরে পরিব্যাপ্ত হল। জার্মানীর ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রইল না। বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের রসিক-সমাজে তিনি এক নিত্য আলোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়ালেন।

ড্যুস জন্মেছেন প্রাহায়। চেকো-শ্লোভাকিয়ার রাজধানীতে। আকৃতিতে তাঁর প্রাচ্য দেশীয় ছাপ। যৌবন তাঁর প্রাহাতেই অতিবাহিত। প্রথম জীবনেই তিনি সান্নিধ্যে এলেন তাঁর পরবর্তী জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ঔপন্যাসিক ফ্রাঞ্জ ওয়েফেল এবং ফ্রাঞ্জ কাফকার। তাঁর গৌরবময় নাট্যজীবনের সূত্রপাত ভিয়েনায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন সবে সুরু হয়েছে। ড্যুস সেই সময়ে তাঁর নাট্যজীবনের অ, আ, ক, খ, আরম্ভ করলেন ভিয়েনার ভোক্সথ্যুনে। এই থিয়েটারটি সেদিন আরও অনেক তরুণ স্বপ্নবান নাট্য-শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করে এনেছিল। সময়ের ব্যবধানে যাঁদের মধ্যে অনেকেই একদিন দেখা দিল জনপ্রিয়তার শীর্ষস্থানে, দেখা দিল নাট্য জগতের তারাভরা আকাশের এক-একটি উজ্জ্বল তারকারূপে। অনেক নামই এই তালিকায় এসে যায়—বহুর মধ্যে এ্যাগনেস স্ট্রান, মেরিয়া ফেন এই দুটি নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য।

১৯১৬ সাল। ড্রেসডেন এ্যাল-বার্ট থিয়েটারে মঞ্চস্থ হল ওয়াল্টার হ্যাসেন ক্লেভারের নাটক "দ্য সন।" এই নাটকটি তরুণ ড্যুসের খ্যাতি ছড়িয়ে দিল চতুর্দিকে। তাঁর অসাধারণ পরিচয় পৌঁছে গেল সেদিন ঘরে ঘরে।

শুধু দেশের ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যেই নিজেকে গুটিয়ে রাখেন নি ড্যুস। দেশের বাইরে নানা জায়গায় তিনি পাড়ি জমিয়েছেন, দীর্ঘকাল তাঁর কেটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর আবার তিনি পা দিলেন স্বদেশের মৃত্তিকায়। আবার এসে দাঁড়ালেন দেশের রঙ্গমঞ্চের পাদ-প্রদীপের সামনে। আবার সেই রঙ্গমঞ্চ থেকেই তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন সমগ্র দর্শককে বিস্ময়ে অভিভূত করে তাঁর অনবদ্য রূপায়ণে। দেখা গেল সময়ের দুস্তর ব্যবধান তাঁর বয়সকে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছে ঠিকই প্রৌঢ়ত্বের গণ্ডীতে তখন তাঁর অবস্থান শেষ হয়ে আসছে, বার্ধক্য প্রায় উপনীত —সেই সঙ্গে অর্থাৎ বয়সের সঙ্গেই আরও অনেকখানি এগিয়েছেন সাধনার ক্ষেত্রেও। তাঁর অভিনয় আরও অভিনব, আরও উজ্জ্বল, আরও বিস্ময়কর।

'গম্ভীর অভিনয়ে দক্ষতা থাকলেই কৌতুক-চরিত্র ফোটান যায়'—

—হরিধন মুখোপাধ্যায়

[সাক্ষাৎকার]

রূপালী পদায় যাঁর আবির্ভাব ঘটামাত্র বা পাদপ্রদীপের সামনে যাঁর পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই প্রেক্ষাগৃহে হাসির জোয়ার আসে, হাসির তুফান বয়ে যায়, ছাব্বিশ-সাতাশ বছর আগেও তিনি যখন পাদপ্রদীপের সামনে নব-নব ভূমিকায় দাঁড়াতেন তখনও দর্শকের ঠোঁটে হাসির ঝিলিক বইত, তবে সে হাসির জাত আলাদা, তার উৎস ভিন্ন, সে হাসি মুগ্ধতার হাসি, তার জন্ম গাম্ভীর্যের মধ্যে। এই পরিবর্তনের কারণ কি? কারণ আছে। আজ দর্শক সাধারণ যাঁকে কৌতুকশিল্পী হিসাবে অভিনয় জগতে দেখছেন সেদিন পাদ-প্রদীপের সামনে তিনি দাঁড়াতেন গম্ভীর চরিত্রের শিল্পী হিসাবে। হরিধন মুখোপাধ্যায়ের কথা বলছি। এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৌতুকশিল্পী শ্রীযুক্ত হরিধন মুখোপাধ্যায়কে সেই বিগত যুগে দেখা গেছে সাজাহান, ঔরংজীব, আলমগীর-এ আমলগীর, প্রায়শ্চিত্ত-এ ধনঞ্জয় বৈরাগীর প্রমুখ চরিত্রগুলিতে অবতীর্ণ হয়ে দর্শকচিত্তকে কানায় কানায় ভরিয়ে তুলতে তাঁর অনবদ্য অভিনয় দক্ষতায়। তাই এই পরি-বর্তনের মধ্যে একটি বিষয় বিশেষরূপে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অর্থাৎ প্রমাণিত হয় যে অভিনেতা হিসাবে হরিধন মুখোপাধ্যায় কতখানি ক্ষমতার অধিকারী। শুধু অভিনয় দক্ষতাই নয় বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী তিনি। আবৃত্তি ও সঙ্গীতে তাঁর দক্ষতা সমান। নাট্য-শিক্ষকরূপেও তাঁর কৃতিত্ব অবিদিত নয়। প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে তাঁর বাল্যকাল থেকেই। বালক হরিধনের কানে যখনই কোন গান প্রবেশ করেছে তখনই তা কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে প্রাণ করে তুলেছে আকুল। দ্বিতীয়বার সে গান আর তাঁর শোনার

দরকার হয় নি। একেবারে অবিকৃত ও নিখুঁতভাবে সেই গান তারপর ধ্বনিত হয়েছে তাঁর কণ্ঠ থেকে। অর্থাৎ একবার মাত্র শোনার ফলেই সমগ্র গানটি তাঁর মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যেত। আবৃত্তিও করতেন কোনরকম নির্দেশ না নিয়ে। আপন বিচারে এবং বিশ্লেষণে বাল্যকাল থেকেই তিনি অপূর্ব আবৃত্তি করে থাকেন। শ্যামবাজার এ-ভি স্কুলের ছাত্র ছিলেন হরিধন। আবৃত্তিতে পারদর্শিতার জন্য এই সময়ে তিনি বিশেষ স্নেহ অর্জন করেন রসরাজ অমৃতলালের।

স্ত্রী-চরিত্র অভিনয়েও তাঁর পারদর্শিতা বহুজনবিদিত। ইন্‌স্টিটিউটে "জনা"য় নাম-ভূমিকায় দেখা দিলেন হরিধন মুখোপাধ্যায়। কৈশোর হয়তো তখন সবে শেষ হয়ে যৌবনের রাজ্যে ছাড়পত্র লাভ হয়েছে এই অভিনয়ে অবশ্য বিনা শিক্ষায় তিনি অবতীর্ণ হন নি। শিক্ষা নিয়েছেন স্বয়ং তারাসুন্দরীর কাছে। ১৯৪১ সালে "আলিবাবা"য় মর্জিনার চরিত্রটিও অভিনয়ে প্রাণবন্ত করে তোলেন হরিধন মুখোপাধ্যায়।

১৯২৪ সাল। কত আর বয়স তখন—সাবালকত্বের গণ্ডীতেও তখন বোধহয় পা পড়ে নি। অসিতকুমার ঘোষাল এবং আরও কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সহযোগে অসিতকুমারের নলিনী সরকার স্ট্রীটস্থ ভবনে প্রতিষ্ঠা করলেন "দীনবন্ধু সম্মিলনী।" বহু বছর ধরে অসংখ্য নাটক অভিনয় করে এই সৌখীন নাট্য প্রতিষ্ঠানটি একদা যথেষ্ট সুনাম এবং প্রসিদ্ধি অর্জন করে। ১৯৩০ সালে এঁরা মঞ্চস্থ করলেন আলমগীর। সেই অভিনয়ে দর্শকদের মধ্যে এই ক'টি নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য—নটগুরু শিশিরকুমার ভাদুড়ী, বাঙলা ছায়াচিত্রের জনক ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (ডি জি), প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া, দেবকীকুমার বসু, দীনেশরঞ্জন দাস প্রভৃতি। রূপসজ্জায় দায়িত্ব নেন স্বয়ং ডি জি। "পতিব্রতা"য় কালীনাথের ভূমিকায় আলোড়ন আনলেন হরিধন মুখোপাধ্যায়। কোন কোন পত্রিকা-সমালোচক তরুণ শিল্পীর অভিনয় তুলনা করলেন লব্ধপ্রতিষ্ঠ নট ও আচার্য নরেশচন্দ্র মিত্রের অভিনয়ের সঙ্গে।

● হরিধন মুখোপাধ্যায়

প্রিন্স দ্বারকানাথের ভাগনা নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৌত্র এবং শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথের জামাতা নির্মল মুখোপাধ্যায়ের "মিলনীতে" কিছুদিন পর যোগ দিলেন হরিধন। এখানে প্রায়শ্চিত্ত, বৈকুণ্ঠের খাতা, সাজাহান প্রভৃতি নাটকগুলিতে অভিনয়ে তিনি অংশগ্রহণ করেন। সাজাহান অভিনয়কালে পূর্বেই বলা হয়েছে হরিধন হয়েছিলেন ঔরংজীব আর দারার ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন পরবর্তীকালের বাঙলার অভিনয়জগতের গর্ব ও গৌরব ছবি বিশ্বাস।

বিশিষ্ট সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান বাসন্তী বিদ্যাবীথির প্রতিষ্ঠার মূলেও তাঁর অবদান কম নয়। অসিত ঘোষালের বাসভবনে ছোট মেয়েদের নিয়ে দাশরথি রায়ের পাঁচালি গানের দল তিনি গঠন করলেন। বাঙলা দেশে মেয়েদের সমন্বয়ে গঠিত এ জাতীয় একটি সম্প্রদায় এই সর্বপ্রথম। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কন্যা এবং শ্রীসিদ্ধার্থ রায়ের জননী শ্রীযুক্তা অপর্ণা দেবীর কীর্তনের দল তারিখ বিচারে এরপর গড়ে ওঠে। যাত্রাভিনয়েও হরিধন তাঁর স্বকীয়তার এবং অনন্যতার পরিচয় দিয়েছেন।

১৯৪২ সাল। কলকাতা মহানগরীতে বোমা পড়ল। সেই বছরই পেশা হিসাবে অভিনয়বৃত্তি গ্রহণ করলেন হরিধন। জীবনের চলার পথের একটা নতুন দিকচিহ্ন চোখে পড়ল যেন। "মায়া" নাটক মঞ্চস্থ করবেন শিশিরকুমার। সেই নাটকের নায়ক তখনও মনের মত তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। চরিত্রটিও সহজ নয়, দুরূহ চরিত্র, অতএব শিল্পীও চাই তেমনই শক্তিমান। এই চরিত্রে অবতীর্ণ হওয়ার প্রস্তাব নিয়ে হরিধনের কাছে এলেন তারাকুমার ভাদুড়ী এবং রামচন্দ্র চৌধুরী। প্রস্তাব গ্রহণ করলেন হরিধন। তারপর ক্রমে শিশিরকুমারের এক অশেষ স্নেহের ছাত্র ও প্রীতির পাত্রে হলেন পরিণত।

চলচ্চিত্রে তাঁর প্রথম আবির্ভাব তাঁর বাল্যবন্ধু অসিত ঘোষালের পিতৃব্য-পুত্র বিখ্যাত চিত্রনির্মাতা ঘোষাল ভ্রাতৃবৃন্দের "সন্ধি" চিত্রে। হরিধন অভিনীত প্রথম পেশাদারী নাটক এবং ছায়াছবি উভয়ই এক কথায় হিট। আজ পর্যন্ত তাঁর অভিনীত ছবি ও নাটকের সংখ্যা সব মিলিয়ে প্রায় দেড়শ' হবে।

সেদিন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন হরিধন মুখোপাধ্যায়। তারই মধ্যে আমার জন্যে আধঘণ্টার মত সময় তিনি নির্দিষ্ট রেখেছিলেন। ঘরের মধ্যে, একাধিক জনের আগমন, নিষ্ক্রমণ ঘটছে, অনেকে তাঁর কাছেই আসছেন, তবু তারই মধ্যে আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দিয়ে চলেছেন পঞ্চাশোত্তীর্ণ শিল্পী। বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কৌতুক শিল্পীকে জিজ্ঞাসা করি, যে-কোন গভীর বিষয়কেই হাস্যরসের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায় অর্থাৎ যত গাম্ভীর্যমণ্ডিতই হোক সে জাতীয় বক্তব্যের প্রকাশের পটভূমি হিসাবে হাস্যরস কি বিবেচিত হতে পারে?

নিশ্চয়ই পারে, উত্তর আসে শিল্পীর কাছ থেকে। কথাটি বলেই আপন ধারণাকে আরও প্রাঞ্জল করার উদ্দেশ্যে উল্লেখ করলেন স্ব-অভিনীত পতিব্রতাব খলনায়ক কালীনাথ চরিত্রটির কথা। তবে তাঁর মতে এখনকার ছবিতে বা নাটকে হাস্যরসের ঠিক যথার্থ এবং রীতিসম্মত প্রয়োগ হচ্ছে না। একটু থেমে বললেন, তা ছাড়া আরও দেখ একালে ঠিক পুরোপুরি সিরিও-কমিক কোন ছবিও তো হচ্ছে না।

আমি পরবর্তী প্রশ্ন করতে যাব, নিজেই আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, দাঁড়াও একটু চা আসুক। যথাস্থানে যথানির্দেশ দেওয়ার পর বললেন, বল কি বলছিলে? জিজ্ঞাসা করি— শক্তিমান অভিনেতার প্রকৃত পরিচয় কি?— একটি সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে উত্তর দিলেন, দ্রুত পরিবর্তনের ক্ষমতা যাঁর যত বেশী আয়ত্তে থাকবে শিল্পী হিসাবে তিনি তত শক্তিমান। জিজ্ঞাসা করি, শ্রেষ্ঠ কৌতুক শিল্পীর লক্ষণ কি? উত্তরে জানা যায় গম্ভীর অভিনয়ে যথেষ্ট পরিমাণ প্রতিভার অধিকার, গম্ভীর অভিনয়ে যথেষ্ট দক্ষতা না থাকলে কৌতুক চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলা যায় না।

আমার পরবর্তী প্রশ্ন বিগত যুগের তুলনায় এখন আপনার মতে শিল্পীরা কি বেশী সম্মান পেয়ে থাকেন? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসে নিশ্চয়ই। সে যুগ ভেবে দেখ আর এ যুগ ভাব। দুটি যুগের মধ্যে লক্ষ্য কর বিরাট রূপান্তর। সে যুগে অভিনেতারা যথাযোগ্য কোন মর্যাদাই পান নি, কি রকম জান লোকে অভিনয় দেখত, অভিনয় ভাল লাগলে সেটা স্বীকারও করত, শিল্পীর অভিনয়-প্রতিভা স্বীকার করতেও দ্বিধা করত না, কিন্তু ঐ পর্যন্তই তার বেশী নয়। তাই বলে আর কোন মূল্য, সম্ভ্রম মর্যাদা সেদিন শিল্পীদের জন্যে নির্দিষ্ট ছিল না। তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা এবং দৃষ্টিভঙ্গীই এর কারণ বলতে পার।

প্রশ্ন করি, সে যুগের তুলনায় এ যুগের অভিনয় জগতে আঙ্গিকে, প্রয়োগ পদ্ধতিতে, বিশ্লেষণে যে বিরাট পরিবর্তন এসেছে এই পরিবর্তন কি আপনার মনে আনন্দ বা পরিতৃপ্তির ছোঁয়া লাগিয়েছে। একটি উত্তর এল না। জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে থাকি শিল্পীর দিকে। ধীরে ধীরে শিল্পী বললেন, দ্যাখ, সে যুগের সাধনা-সমৃদ্ধ অভিনয়াদি যাঁরা দেখেছেন তাঁদের সেদিক দিয়ে এ যুগ তুলনামূলকভাবে আনন্দ দিতে পারবে না।

বাদ সাধল সময়। মঞ্চাবতরণের সময় তাঁর এসে গেল। আর সাজঘরে বসে থাকার সময় তাঁর নেই। তিনিও উঠলেন, আমিও উঠলুম। তিনি প্রবেশ করলেন মঞ্চে, আমি বেরিয়ে আসছি, প্রেক্ষাগৃহের পার্শ্ববর্তী পথ ধরে এগোচ্ছি, কানে ভেসে এল সমগ্র প্রেক্ষাগৃহ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত হাসির শব্দ। বুঝলুম, রূপসৃষ্টির অভিসার - তখন শিল্পীর আবার সুরু হয়ে গেছে।

'নব নব রূপসৃষ্টিই শিল্পীর কর্তব্য'—

(সাক্ষাৎকার)

সময়ের পরিধি কিন্তু দীর্ঘ নয়। বড়জোর ঘণ্টাখানেক। তারপর আর শিল্পীকে আটকে রাখা চলবে না। তার অব্যবহিত পরেই তাঁকে মঞ্চে প্রবেশ করতে হবে। মুহূর্তের মধ্যে তখনই ঘটবে রূপান্তর, তাঁর নিজের সত্তার ভিতর দিয়ে আর একটি সত্তার আবির্ভাব ঘটবে। যতক্ষণ সেই মঞ্চের উপর তিনি থাকবেন ততক্ষণ তাঁর মধ্যে সেই দ্বিতীয় সত্তারই প্রকাশ প্রতি মুহূর্তে পরিলক্ষিত। দ্বিতীয় সত্তাই থাকবে পুরোভাগে প্রথম সত্তা তার পিছনে। অভিব্যক্তি, সংলাপ, চলাফেরা, অঙ্গসঞ্চালনে তখন সব দিক দিয়ে লাগবে পরিবর্তনের ছোঁয়া।

শিল্পী?—গীতা দে। বর্তমান যুগের বাঙলার শক্তিময়ী অভিনেত্রীদের অন্যতমা। প্রচুর দক্ষতা এবং ভগবানদত্ত সহজাত অভিনয়-প্রতিভার এক অধিকারিণী।

অগত্যা। সেই অল্প সময়ের প্রশ্নোত্তরে পালা শেষ করতে হয়।

নাট্যজগতের প্রতি আকর্ষণ তাঁর রক্তের মধ্যে আছে। তাঁর মা রেণুকা দেবীও ছিলেন সে যুগের বিশিষ্টা অভিনেত্রীদের একজন। পাদপ্রদীপের সামনে গীতা দে প্রথম যেদিন দাঁড়ালেন সেদিন তাঁর বয়স কত?—না তখন তাঁর প্রথম যৌবন নয়, কৈশোরও নয়, বাল্যকাল নয়, শৈশব। ছ' বছরের শিশু গীতা দে প্রথম নটরাজের পাদপদ্মে নিবেদন করলেন আপন অভিনয়-অঞ্জলি। যে নাটকটিকে কেন্দ্র করে নাট্যজগতের সঙ্গে তাঁর প্রথম যোগাযোগ ঘটল বা পরবর্তী শিল্পী-জীবনের প্রথম সূচনা পরিলক্ষিত হল যে নাটকটির মধ্যে তার নাম কালিন্দী। বলা নিষ্প্রয়োজন, কালিন্দী এ যুগের ভারতীয় কথা-সাহিত্যিক-জগতের এক মধ্যমণি, বাঙলার সাহিত্য-সমাজের শ্রদ্ধেয় নায়ক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে অবিস্মরণীয় রচনাগুলি তাঁকে অমরত্বের আসনে করেছে অধিষ্ঠিত 'কালিন্দী' তাদেরই অন্যতম। এই "কালিন্দী"র অভিনয় হচ্ছে তখন নাট্যনিকেতনে। আসলে গান শেখার উদ্দেশ্য ছিল তাঁর। গান শেখার সঙ্কল্প নিয়ে

গীতা দে

তিনি রঙ্গালয়ে আসতেন ঘটনাচক্রে হয়ে গেলেন অভিনেত্রী। ভবিতব্য কখনও খণ্ডন করা যায় না। নাট্য-ভারতীতে তারাশঙ্করের আর একটি অসামান্য রচনা "দুই পুরুষ"-এও গীতা দে অভিনয়ে অংশ নিয়েছেন। তাঁর অভিনীত প্রথম ছবির নাম 'দম্পতী।'

সময় এগিয়ে চলে। ঘটনার ঘনঘটা বয়ে যায়। ভবিষ্যৎ আসে বর্তমানের রূপ নিয়ে, পলকের মধ্যে বর্তমান হয়ে যায় অতীত। বালিকা গীতা দে দেখতে দেখতে পা ফেলেছেন যৌবনের গণ্ডীতে। এর মধ্যে কিছুকাল রঙ্গজগতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছিল। কিন্তু যে অমোঘ আকর্ষণে তিনি শৈশব থেকেই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত সেই রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে ক্ষণকালের সম্পর্ক-শূন্যতা কি কখনও চিরকালের হতে পারে?— কয়েক বছর পর আবার তিনি ফিরে এলেন রঙ্গজগতে, কত আর বয়স তখন, বছর কুড়ি বড়জোর।

শিশিরকুমার তখন তখত-এ তাউস নিয়ে ব্যস্ত। শ্রীরঙ্গমে গীতা দে যোগ দিলেন। সে যুগের সার্থকনাম্নী অভিনেত্রী শেফালিকা দেবীর কন্যা অভিনেত্রী পর্ণা দেবীর মধ্যস্থতায়। মহড়া দিলেন মাত্র সাতদিন। তখত-এ তাউসে লালকুঁয়ারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। স্বয়ং শিশিরকুমারের বিপরীতে নায়িকার ভূমিকাভিনেত্রী এই প্রায় নবাগতা শিল্পীকে দর্শক সাধারণও সেদিন ভরিয়ে তুলেছিলেন অজস্র অভিনন্দনে ও বিপুল সাধুবাদে। সার্থক হল তার সাধনা। সস্নেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন শিশিরকুমারের। নটগুরু কাছে টেনে নিলেন অফুরন্ত সম্ভাবনাময়ী এই তরুণী শিক্ষার্থিনীকে---যার সঞ্চয়ের ঝুলিতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর যার সাধনায় নেই তিলমাত্র ফাঁকি। নটগুরুর পদপ্রান্তে অভিনয়ের নানা দিক, নানা খুঁটিনাটি সম্বন্ধে আলোকিতা হতে থাকেন গীতা দে।

বছর পনের পূর্বে নতুন করে যে সাধনা তিনি শুরু করেছিলেন তার ধারা আজও অব্যাহত, এই দীর্ঘসময়ে আপন দক্ষতা ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়ে দর্শকসমাজে তিনি লাভ করেছেন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা এবং স্বীকৃতি। তাঁর অসাধারণ অভিনয়-প্রতিভা সম্বন্ধে দর্শকচিত্তে আজ কোন আর দ্বিধা নেই। তাঁর ঈশ্বরদত্ত এবং স্বানুশীলিত শক্তি আজ সর্বতোভাবে প্রমাণিত

খ্যাতি, যশ তিনি পেয়েছেন তবে এ কথা মিথ্যা নয় যে, যতটা তাঁর পাওয়া উচিত ছিল তা তিনি পান নি। সহজ, প্রেমমধুর অন্তর্দ্বন্দ্ববিহীন চরিত্রগুলি রূপায়ণ অপেক্ষা জটিল, দুরূহ এবং মনস্তাত্ত্বিক চরিত্রগুলি ফুটিয়ে তোলা আরও অনেক বেশী শক্তি এবং প্রতিভার প্রয়োজন। গীতা দের অভিনয় প্রমাণ করেছে যে সেই শক্তি এবং প্রতিভা তাঁর অনায়ত্ত নয়। যে খ্যাতি-যশ আজ তিনি পেয়েছেন তাও কুসুমাকীর্ণ পথে তাঁর কাছে আসে নি, তা এসেছে কণ্টকসমাকীর্ণ পথ বেয়ে দীর্ঘ নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় তা এসেছে, তার জন্যে দিতে হয়েছে বা এখনও দিতে হচ্ছে অনেক মূল্য।

কথায় কথায় প্রশ্ন করি, কোন ধরণের চরিত্র আপনি ফুটিয়ে তুলতে আনন্দ পান---উত্তরে গীতা দে জানালেন করুণ এবং মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র আমার সবচেয়ে বেশী ভাল লাগে---তবে কি জানেন বলে একটু থামলেন শিল্পী---আবার বলতে শুরু করলেন, সুযোগ আমি পাই নি, আমার সাধনা হয় তো খুব বিরাট বা সমৃদ্ধ নয়, তবে

আমি নিজের বুকেই এটুকু বলতে পারি যে, তার মধ্যে কোন ফাঁকি নেই তাই এ ব্যথা ভয়ানক।—স্মরণ থাকতে পারে কিছুকাল আগে "ডাইনী" চিত্রে গীতা দের অভিনয় আলোড়ন এনেছিল দর্শকসমাজে, একটি বিস্ময়কর চরিত্রে আশ্চর্য নৈপুণ্যের সঙ্গে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন—সেদিনকার কথাপ্রসঙ্গে "ডাইনী" ছবিটির কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন।

কথা বলতে বলতেই তিনি জানালেন যে আমার অধিকতর প্রিয় করুণ এবং মনস্তাত্ত্বিক চরিত্র এ কথা ঠিক, তেমনই এও ঠিক যে, অন্য জাতীয় চরিত্রের প্রতিও আমার বিন্দুমাত্র অবহেলা বা নিরাসক্তি আছে এ কথা মনে করবেন না। শিল্পীর কাছে সব চরিত্রই সমান। আমি যে চরিত্রই পাই সমান মর্যাদা এবং আন্তরিকতার সঙ্গেই সে চরিত্র গ্রহণ করি। জিজ্ঞাসা করি---শিল্পী হিসাবে আপনার প্রধান কর্তব্য সম্বন্ধে আপনি কি মনে করেন?—একটু ভেবে উত্তর দিলেন। শিল্পীর কাজই সৃষ্টি করা, সৃষ্টির সাফল্যেই তার সাধনার সিদ্ধি, চরিত্রের নতুন নতুন রূপ দেওয়া নব নব ধারায় তাকে পরিবেশন করাই আমার মতে শিল্পীর মুখ্য কর্তব্য। শিল্পীর ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অভিমত জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলেন, দর্শকের সেবা করাই আমাদের ধর্ম, ফাঁকি দিয়ে, বঞ্চনা দিয়ে তাদের ঠকানোর চেয়ে বড় অধর্ম আর কিছু নেই। তাদের সেবা করাই শিল্পীর ধর্ম, তাদের ঠকানো নয়।

জিজ্ঞাসা করি---আপনার মতে এ যুগে শিল্পীরা কি তাঁদের যথাপ্রাপ্য সম্মান পান। নেতিবাচক উত্তর আসে গীতা দের কাছ থেকে।

গীতা দের নিজের বক্তব্যে জানা যায় যে, অভিনয়ের পূর্বে চরিত্রের সঙ্গে তিনি একাত্ম হয়ে যান। তখন তাঁর মধ্যে তার অভিনেয় চরিত্রের মধ্যে কোন পার্থক্যই থাকে না নিজেকে মিলিয়ে দেন সেই চরিত্রের মধ্যে। নাটক তাঁর প্রাণ, নাটকে আবেদন তাঁর কাছে অনতিক্রম্য। নাটক তাঁর শখ নয়, ঘটনাচক্রে আর অভিনয় তাঁর পেশা হলেও আসলে মনের দিক দিয়ে নাটক তাঁর ধ্যান জ্ঞান, স্বপ্ন, চিন্তা, সাধনা, এক কথায় সবস্ব---তাই যখনই অভিনয় করতে আসেন তখন অভিনেত্রীর মন নিয়ে আসেন না। আসেন পূজারিণীর মন নিয়ে। নাট্যশালা তাঁর কাছে মন্দির-বিশেষ।

সংবাদ-বিচিত্রা

বাঙলা ছবিতে নার্গিস

ভারতীয় চিত্রজগতের স্বনামধন্যা তারকা এবং ভারতীয় তারকা জগতের প্রথম শ্রেণীর একটি বিশেষ আসনের অধিকারিণী শ্রীমতী নার্গিস এবার একটি বাঙলা ছবিতে অভিনয় করবেন। বাঙলা ছবির প্রধান ভূমিকায় এই তাঁর প্রথম অবতরণ হলেও বাঙলা ছবির তারকা হিসাবে পূর্বেও তাঁকে দেখা গেছে। স্মরণ থাকতে পারে ১৯৫৬ সালের মুক্তিপ্রাপ্ত রাজকাপুর অভিনীত 'একদিন রাত্রে' চিত্রের সমাপ্তির দিকে ক্ষণকালের জন্য রূপালী পর্দায় এই অশেষ জনপ্রিয়তার অধিকারিণী প্রতিভাময়ী শিল্পীকে একটি নির্বাক ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করতে দেখা গিয়েছিল। বর্তমানে যে বাঙলা ছবিতে তিনি অভিনয় করবেন সেই ছবিটি বিমল মিত্র রচিত কাহিনী থেকে রূপ নিচ্ছে। এই পরিকল্পিত ছবিটিতে শোনা যাচ্ছে, নার্গিসের বিপরীতে আত্মপ্রকাশ করবেন উত্তমকুমার। বাঙলা ছবিতে শ্রীমতী নার্গিসের অবতরণ বাঙলা দেশের চিত্রামোদী সমাজে এক বিপুল আনন্দসঞ্চার করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

জাতীয় প্রতিরক্ষায় শিল্পীদের অর্থ সংগ্রহ

দেশ আজ বিপন্ন, বহিঃশত্রুর নির্লজ্জ এবং অন্যায় আক্রমণে দেশের শান্তি নিরাপত্তা আজ বিঘ্নিত, দেশের সর্বস্তরের সন্তানরা আজ এগিয়ে এসেছেন এই চরম দুর্যোগের হাত থেকে দেশকে মুক্তি দিতে, রক্ষা করতে দেশ জননীর সম্ভ্রম। সকল সম্প্রদায়ের নরনারী এ বিষয়ে বিভিন্নভাবে সহায়তা করে চলেছেন সরকারের সঙ্গে। চিত্র-জগতের সঙ্গে যাঁরা জড়িত---এ ক্ষেত্রে তাঁদের অবদানও অনস্বীকার্য। গত ২১-এ নভেম্বর নয়াদিল্লীতে তারকা'কণ্ঠ-শিল্পী এবং সুরকারের দল মিলিতভাবে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন। বলা বাহুল্য, এ সংগ্রহ জাতীয় প্রতিরক্ষা ভাণ্ডারের জন্য।

অভিনেত্রী সাক্ষী : নাথু-লায় উপনীতা প্রথম ভারতীয় মহিলা

বর্তমান কালের রাজনৈতিক বিচারে নাথু-লা গিরিবর্ত্ম এক অশেষ গুরুত্বের অধিকারী। সাত বছর পূর্বে ১৯৫৮ সালে স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর একদা সেখানে পদার্পণ ঘটেছিল। সম্প্রতি একজন ভারতীয় মহিলা নাথু-লা ঘুরে এলেন। ইনি শ্রীমতী সাক্ষী--বিশিষ্ট অভিনেত্রী হিসাবে সর্বসাধারণে তিনি সুপরিচিতা। ভারতীয় নারীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম এই অঞ্চলে পদার্পণ করলেন। সেই কারণেই তাঁর নাথু-লা ভ্রমণও অশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

রাজ-পুত্রের চিত্র-পরিচালনা শিক্ষারম্ভ

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও চিত্র-নির্মাতা রাজকাপুরের পুত্র 'ডাবু' নামে সমধিক খ্যাত রণধীর রাজকাপুর চিত্র পরিচালনার শিক্ষা গ্রহণে উদ্যোগী হয়েছেন। ভবিষ্যতে চিত্র-পরিচালক হওয়ার তাঁর বাসনা। তাই চলচ্চিত্রের প্রতিটি বিভাগ সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান

অর্জন তাঁর অভিপ্রায়। এ কারণে পরিচালক লেখক ট্যাগুনের সহকারিত্ব তিনি গ্রহণ করেছেন। ট্যাগুনের পঞ্চম সহকারী হিসাবে নির্মীয়মাণ রোমিও চিত্রটির সঙ্গে রাজ-পুত্র নিজেকে সংযুক্ত করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, ট্যাগুন নিজে একদা ডাবুর পিতা রাজকাপুরের পঞ্চম সহকারী ছিলেন।

বিদেশে ভারতের প্রচার-ব্যবস্থা

ভারতের বাইরে ভারত এবং তার পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে প্রচারের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় তথ্য ও প্রচার-দপ্তর যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ফিল্ম ডিভিশানের একটি করে কার্যালয় প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব করেছে। এই প্রচেষ্টা বাস্তবে পরিণত হলে বিদেশে ভারতের প্রচার-ব্যবস্থা আরও দৃঢ় ফলপ্রসূ ও কার্যকর হবে।

চিত্র-পরিচালনায় প্রথম সিংহলী মহিলা

সিংহলের খ্যাতনাম্নী শিল্পী ফোরিডা জয়ালাত এবার পরিচালনার ক্ষেত্রেও অগ্রসর হলেন। "সুইপ টিকেট" ছবিটি তাঁরই পরিচালনায় রূপ নিচ্ছে। চিত্রে নায়িকার ভূমিকায়ও তিনি স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করছেন। সিংহলী মহিলাদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম চিত্র পরিচালিকা হিসাবে দেখা দিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয় পৃথিবীর প্রথম এবং আজ পর্যন্ত একমাত্র মহিলা প্রধানমন্ত্রীও সিংহলী মহিলাদেরই একজন।

চ্যাপলিনের প্রত্যাবর্তন

চলচ্চিত্র জগতের বিস্ময় চার্লি চ্যাপলিনকে আবার বহুদিন পরে চিত্র নির্মাণে উদ্যোগী হতে দেখা গেল। এই মহান শিল্পী, অবিস্মরণীয় স্রষ্টার কাছ থেকে এবার পৃথিবীর অসংখ্য চিত্রামোদী যে ছবিটি উপহার পেতে চলেছেন—সেই ছবিটির নাম কাউণ্টেস্। এই ছবিতে অভিনয় করবেন মার্লন ব্র্যাণ্ডো এবং সোফিয়া লোরেন। আগামী বছরের ১৭ই জানুয়ারী এই চিত্র নির্মাণ আরম্ভের দিন হিসাবে নির্দিষ্ট হয়েছে।

চার্চিলের জীবনী-নাট্য রচনায় চার্চিল-কন্যা

এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান স্যার উইনস্টন চার্চিলের অসামান্য গৌরবোজ্জ্বল, ঘটনা সমাকীর্ণ জীবনের অনবদ্য কাহিনী অবলম্বনে একটি নাটক রচনায় মিলিতভাবে ব্রতী হয়েছেন চার্চিল-কন্যা অভিনেত্রী সারা এবং অভিনেতা ডেভিড হেমিংস। নাটকটির নামকরণ হয়েছে "স্যার উইনস্টন চার্চিলের জীবন ও যুগ।" নাটকটি মঞ্চস্থ হবে আগামী নববর্ষের পর লণ্ডনের ওয়েষ্ট এণ্ডে।

একটি বিস্ময়কর সংবাদ

"মাই লাস্ট ডাচেস" ছবিটিকে কেন্দ্র করে একটি চমকপ্রদ সংবাদ প্রচারিত হয়েছে। ভারতীয় চিত্রজগতের কথা ছেড়ে দেওয়া যাক, হলিউডের চিত্র জগতেও এ সংবাদে আশ্চর্য হয়ে গেছে এই ছবির শিল্পী পঞ্চাশোত্তীর্ণা তারুণ্যময়ী সা-সা-গেবর বলেছেন যে ছবিতে টৌনি কার্টিসের (৪০) সঙ্গে তাঁর শয়নের এমন একটি দুটি দৃশ্য আছে যা তাঁর দৃঢ় ধারণায় হলিউডের সেন্সর বোর্ডও সাধারণ্যে প্রদর্শনের জন্য অনুমোদিত করবেন না।

প্রমোদকর মুক্ত রাজা রামমোহন

ছবির রাজ্যে প্রমোদকর সৃষ্টি হওয়ার পর এই সর্বপ্রথম একটি বাঙলা ছবি প্রমোদকর মুক্ত বলে ঘোষিত হল। বাঙলা ছবির ইতিহাসে নিঃসন্দেহে এ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত ১৬ই নভেম্বর এক বিজ্ঞপ্তি দ্বারা "রাজা রামমোহন" চিত্রটিকে প্রমোদকরের এলাকা বহির্ভূত করেছেন। এই সিদ্ধান্তে চিত্রটির প্রতি সরকারের যুগপৎ সমাদর ও সহানুভূতিই সূচিত হয়। এই সর্বাঙ্গসুন্দর সার্থক ছায়াচিত্রটির আরও ব্যাপক প্রচার এবং অপ্রতিহত জয়যাত্রা কামনা করি।

কৌতুক শিল্পীদের দ্বারা চন্দ্রগুপ্ত অভিনয়

বাঙলার ঐতিহ্যপূর্ণ রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের "চন্দ্রগুপ্ত" অন্যতম এই বিখ্যাত নাটকটির বিভিন্ন চরিত্রে বিভিন্ন দিকপাল শিল্পীর অভিনয়ে দর্শকচিত্তে অমর হয়ে আছে। বর্তমানে বাঙলার কৌতুকশিল্পীদের দ্বারা এই নাটকটি মঞ্চস্থ করার আয়োজন চলছে। চাণক্য, সেলুকস, কাত্যায়ন প্রভৃতি এই নাটকের স্মরণীয় চরিত্রগুলি এবং অন্যান্য চরিত্রগুলিও লব্ধপ্রতিষ্ঠ কৌতুকশিল্পীদের দ্বারা অভিনীত হবে। এই প্রচেষ্টাটির আমরা সর্বতোভাবে সাফল্য কামনা করি।

সৌখীন সমাচার

সাহিত্যিক

চুঁচুড়ার কল্লোল সাংস্কৃতিক সঙ্ঘের উদ্যোগে বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যিক' নাটকটি অভিনীত হ'ল। চরিত্রগুলির রূপদান করেন চঞ্চল রায়চৌধুরী, মৃন্ময় অধিকারী, বিমল গুহ, শুকদেব চট্টোপাধ্যায়, অমল বসু, শশাঙ্ক বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় নন্দী, জয়শ্রী মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

ঋণমুক্তি

বারাণসী ধামের দীনবন্ধু নাট্যসংস্থা সম্প্রতি অনিল কাঞ্জিলালের "ঋণমুক্তি" নাটকটি দর্শক সমীপে নিবেদন করলেন। বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন গোপাল বসু, মধুসূদন অধিকারী, নারায়ণ দত্ত, গৌর দাস, সুবোধ চট্টোপাধ্যায়, ভারতী চক্রবর্তী প্রভৃতি।

কালিমাখা কাচ

নটতীর্থদের প্রযোজনায় সাধন চট্টোপাধ্যায় রচিত "কালিমাখা কাচ" নাটকটি মঞ্চস্থ হল। নাটকের চরিত্রগুলির প্রাণসঞ্চারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অশোক ভাদুড়ী, অবিনাশ মিত্র, আশুতোষ মণ্ডল, সন্তোষকুমার ঘোষ, মায়া ঘোষ, অঞ্জলি ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

ভারত-পাক সম্পর্ক প্রসঙ্গে

ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সাম্প্রতিক অঘোষিত যুদ্ধ সমাপ্ত হইয়াছে ঠিকই কিন্তু ভারতের ক্ষতি-সাধনে পাকিস্তানের তৎপরতা বন্ধ হওয়া তো দূরের কথা, তিলমাত্র কমে নাই বরং সময়ের অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিতেছে।

ক্রমশই ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক তিক্ত হইতে অতীব তিক্ত হইয়া উঠিতেছে ? ঐতিহাসিক সত্যকে উপেক্ষা করিয়া তাহার বিকৃত রূপ পরিবেশনের চেষ্টা করিয়া বিশ্বের বুদ্ধিজীবী, চিন্তাশীল, কল্যাণকামী

রাষ্ট্রপতি ডঃ রাধাকৃষ্ণণ

প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী

রাষ্ট্রনায়কদের মন্তব্য এবং অভিমত উপেক্ষা করিয়া পাকিস্তান ক্রমশই যে ক্রিয়াকলাপ চালাইয়া যাইতেছে তাহা তাহার নীচতা, নির্লজ্জতা এবং কাণ্ডজ্ঞানহীনতাকেই সূর্যালোকের মত প্রকাশ করিতেছে।

যুদ্ধ-বিরতির যে-সকল চুক্তি হইল তাহা মানিয়া চলিবার প্রয়োজন পাকিস্তানের দ্বারা উপলব্ধ হইল না। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ইহা ঘোরতর অন্যায়। কিন্তু যে রাষ্ট্রের কর্ণধারগণের নিকট নীতি, বিবেক, সত্য প্রমুখ শব্দগুলি অপরিচিত তাঁহাদের এবম্বিধ আচরণে অবশ্য আশ্চর্য হওয়ারও কিছু নাই। কিন্তু আশ্চর্য লাগে তখনই যখন আয়ুব খাঁ এবং জুলফিকর আলী ভুট্টো মুখে শান্তির বাণী উচ্চারণ করেন, দুয়ারে দুয়ারে যখন ঘোষণা করেন যে, শান্তি স্থাপনের জন্য তাঁহাদের আহার-নিদ্রা ঘুচিয়াছে শুধু ভারতের জন্যই তাহা সংস্থাপিত হইতেছে না এবং এই শান্তি স্থাপনের প্রতিবন্ধকতার জন্যই যেন তাঁহাদের মক্কা যাত্রাটি আটকাইয়া আছে। আমরা বহু প্রকার ছলনা, প্রতারণা, কপটতার কথা শুনিয়াছি, ব্যক্তিগত জীবনে প্রত্যক্ষও করিয়াছি কিন্তু এ-জাতীয় কৃত্রিমতা দেখিয়াছি বা শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। শান্তির নীতিতে প্রতিষ্ঠিত যে রাষ্ট্র সমগ্র বিশ্ব হইতে বিদ্বেষ-বৈষম্যের বীজের মূলোচ্ছেদ করিতে বদ্ধপরিকর, একমাত্র শান্তির ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়াই পাকিস্তানের বৎসরের পর বৎসরব্যাপী সহস্র অন্যায় কার্য যে অসীম ঔদার্যের দ্বারা বরদাস্ত করিয়া আসিয়াছে আজ তাহারই বিরুদ্ধে শান্তিভঙ্গের অভিযোগ। ইহা অপেক্ষা বিচিত্র আর কি আছে জানি না।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে এখনও প্রায় প্রতিদিনই পাকিস্তানের কোন না-কোন অন্যায় কর্মের সংবাদ মিলিবে এবং ইহা নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারেই পর্যবসিত হইয়াছে। এক তুরস্ক ও ইরাণ পাক-

আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা মন্ত্রী অশোককুমার সেন

প্রেমে গদগদ। ইঙ্গ-মার্কিন সহানুভূতিও প্রচ্ছন্নভাবে পাকিস্তানের জন্য সঞ্চিত, কিন্তু ইহারা ছাড়া পৃথিবীর অসংখ্য রাষ্ট্র ভারতের স্বপক্ষেই তাঁহাদের মনোভাব ঘোষণা করিয়াছেন। তন্মধ্যে রাশিয়া ও ফ্রান্স বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভারতের সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত দূত হিসাবে কয়েকজন বিশিষ্ট নেতা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে

প্রেরিত হইয়াছিলেন বিদেশী রাষ্ট্র-নায়কগণের নিকট ভারতের প্রকৃত অবস্থা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার জন্য। স্বয়ং লোকবরেণ্য রাষ্ট্রপতিও এই উদ্দেশ্যে কয়েকটি রাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেন। এই তালিকায় একটি উল্লেখযোগ্য নাম শ্রীঅশোককুমার সেন। ভারতের সুযোগ্য এবং বিচক্ষণ আইন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। অদ্যাপি এই উদ্দেশ্যে যতজন নেতা বিদেশে প্রেরিত হইয়াছেন শ্রীসেন তাঁহাদের তালিকায় একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম এই কারণে যে তাঁহার এই ভ্রমণতালিকা সকলের তুলনায় দীর্ঘ। আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহ, লাতিন, আমেরিকান দেশসমূহ এবং যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপ প্রভৃতি এই ভ্রমণতালিকার অন্তর্গত। এই সকল রাষ্ট্রগুলিতে দৌত্য কার্যে শ্রীসেন যে পারদর্শিতা এবং সফলতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা তাঁহার অসীম কৃতিত্ব এবং বুদ্ধির পরিচায়ক।

আজ ভারতের অনুকূলে বিশ্বের একটি বিরাট অংশের যে মনোভাব প্রকট হইয়া উঠিতেছে ইহার ফলে জোর করিয়া বলা চলে না যে পাকিস্তান বিচলিত হয় নাই। অতএব আয়ুব-ভুট্টো এখন আদা-জল খাইয়া শুরু করিয়াছেন শান্তির এবং তৎসহ ভারত-বিরোধী প্রচারকার্য। তাঁহারাও এখন দেশে দেশে গমন করিয়া আপন বক্তব্য বুঝাইতে উদগ্রীব। কিন্তু, তাঁহাদের পক্ষে যাহা নিতান্ত দুঃখের কারণ হইবে যে তাঁহাদের এই অত্যাভিনব ভাষ্য কোন সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন রাষ্ট্র-নায়কই গ্রহণ করিবেন না। এই রাষ্ট্রের স্বরূপ আজ কাহারও জানিতে বাকী নাই। অশান্তি-বিপর্যয় চিরদিন তাহারাই ডাকিয়া আনিয়াছে, তাহারাই ভারতের সর্বনাশ সাধনে অগ্রণী হইয়াছে। ভারত বহু সহ্য করিয়াছে এবং সহ্যসীমা অতিক্রান্ত হওয়ার পরই আক্রমণ প্রতিরোধার্থে অস্ত্রগ্রহণ করিয়াছে এবং প্রমাণ করিয়াছে যে, কি ঔদার্যে এবং কি শৌর্য-বীর্যে সে কাহারও অপেক্ষা দুর্বল নয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে, তিরাশী বৎসর বয়স্ক লর্ড এ্যাটলি (ভারতের স্বাধীনতাকালীন এবং ভারত বিভাগ-কালীন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী) মন্তব্য করিয়াছেন যে কাশ্মীর পাকিস্তানেরও নয়, ভারতেরও নয়। আজ ভারত-বাসীর নিকট এই স্থবিরের মতবাদের কোন মূল্যই নাই। ভারতীয়ের জীবনে তাঁহার প্রভাব কোনদিনই ছিল না, এখনও নাই (পাকিস্তানের থাকিতে পারে) তাই তাঁহার মন্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা আমরা নিরর্থক বলিয়াই মনে করি।

ভারতের নেতৃবৃন্দ যাহা বারংবার বলিতেছেন আমরাও তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি যে, শান্তির পথ সকল সময়ই খোলা। ভারতবর্ষ কোনদিন স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রতিবেশী রাষ্ট্রের দিকে গ্রাসধর্মী বাহুযুগল বাড়াইয়া দিবে না। সে প্রীতির হস্তই সম্প্রসারিত করিতে জানে এবং তাহাই তাহার অন্যতম ধর্ম। কিন্তু অন্যায় আক্রমণও সে আর বরদাস্ত করিবে না এবং এখনও যদি পাকিস্তানের চৈতন্যোদয় না হয় তাহা হইলে তাহার জন্য---এই অতীব হঠকারিতার জন্য তাহাকে চরম মূল্য দিতে হইবে। অশান্তিকে দূরে রাখিবার জন্য ও কল্যাণকামী ভারত এই মর্মে তাহাকে বারংবার সতর্ক করিতেছে। ফল হয় ভাল, না হয় তো তখন ভারত আবার প্রমাণ করিবে যে, দেশরক্ষায় সে অসমর্থ নয়।

শিক্ষা ও সাম্প্রদায়িকতা

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান সর্বতোভাবে মন্দিরের সহিত তুলনীয়। মন্দিরের ন্যায় একটি শিক্ষাগারও যথেষ্ট পবিত্রতার অধিকারী। যে স্থান হইতে শিক্ষার ও জ্ঞানের আলো বিতরিত হইয়া মানুষকে সর্বতোভাবে আলোকিত করিয়া তোলার সহায়তা করা হয় সে স্থান যেমনই পবিত্র তেমনই গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণেই একটি শিক্ষাগার হইতে শতহস্ত দূরে রাখা উচিত গ্লানি, পঙ্কিলতা এবং সঙ্কীর্ণতাকে।

সম্প্রতি বারাণসীর হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নবনামকরণকে কেন্দ্র করিয়া যে-সকল ঘটনা ঘটিয়াছে তাহা কাহারও অজানা নয়। ঐ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সহিত 'হিন্দু' পদটি যুক্ত থাকায় সাম্প্রদায়িকতার একটি চিত্র যেন বিশেষভাবে ধরা পড়ে। বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা

শিক্ষামন্ত্রী এম, সি চাগলা

অবলুপ্ত করার মানসে হিন্দু শব্দটি উহার নাম হইতে বিবর্জিত করা হইল এবং নবনামকরণে উহার প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গত দেশনায়ক মদনমোহন মালব্যের নাম যুক্ত হইল।

একটি বিশ্ববিদ্যালয় সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে পরিচালিত হউক বা তাহার নামের মধ্যে এমন কোন অংশ থাকুক যাহা সাম্প্রদায়িক সীমাবদ্ধতা সূচিত করে, ইহা অবশ্যই কোন আলোক-প্রাপ্ত উদার ব্যক্তির কাম্য হইতে পারে না। সরস্বতীর আঙ্গিনা সর্বমানবের জন্যই উন্মুক্ত, সেখানে জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় কখনও বিভেদের প্রাচীর তুলিতে পারে না। সেখানে প্রবেশের অধিকার নরনারীর সহজাত। অতীতের ইতিহাসে দেখা যায় (শুধু

কেন, বর্তমানেও ঘটিতেছে এবং ভবিষ্যতেও ঘটিবে) যে শিক্ষালাভের মানসে মানুষ দেশ-দেশান্তরে গিয়াছে, পৃথিবীর কত দেশের মানুষ স্মরণাতীত কাল হইত ভারতের পবিত্র মৃত্তিকায় পদার্পণ করিয়াছে জ্ঞান আহরণের জন্য, আবার সেই সুদূর অতীতেও ভারতের সন্তান শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যেই পাড়ি জমাইয়াছে বিদেশে। ইহারই ফলে এই আদান-প্রদানের পরিণতিস্বরূপ বৃহৎ পৃথিবী আজ ধরা-ছোঁয়ার গণ্ডীর মধ্যে আসিয়াছে। জ্ঞানের রাজ্যে মানুষের প্রবেশাধিকার ঘটিয়াছে, ভাবধারার, দৃষ্টিভঙ্গীর বিনিময়ে মানুষের অন্তর ভরিয়া উঠিয়াছে কাণায় কাণায়, অজানা আসিয়াছে জ্ঞানের সীমায়। অচেনা হইয়াছে চেনা, ফলত সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া এক আন্তর্জাতিক মানবতা-বোধসম্পন্ন মহামানবগোষ্ঠী গড়িয়া উঠিয়াছে।

তবে বারাণসীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ সম্বন্ধে এক্ষেত্রে কিছু বলার অবশ্যই আছে। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপকার হিসাবে শুধু জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে অনবদ্য অবদানের গুরুত্বে মালবীয়জী জাতীয় ইতিহাসের একটি বিশেষ অধ্যায় অধিকার করিয়া আছেন এবং জাতির বিপুল শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূত নমস্কার তাঁহার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট। তাঁহারই অমর কীর্তি তাঁহার নামে পরিচিত হউক এ প্রস্তাব নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। মদনমোহনের নাম এখানে যুক্ত হওয়ায় আমরা অতীব আনন্দিত। কিন্তু 'হিন্দু' শব্দ বর্জনেই ক্ষোভ দেখা দিয়াছে। ইহার এ অর্থ নয় যে, এই বিক্ষোভের জন্য সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা হইতে। আসলে ইহার পূর্বে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম হইতে যদি মুসলিম শব্দটি বাদ দেওয়া হইত, তাহা হইলে বারাণসীর এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে কেন্দ্র করিয়া আজ কোনপ্রকার গোলযোগেরই সৃষ্টি হইত না এবং তাহাকে কেন্দ্র করিয়া এইভাবে

আগামী সংখ্যা হইতে

অরণ্যকাণ্ড-পালা

(অপ্রকাশিত)

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রায় প্রতিদিন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ হইত না।

সাম্প্রতিককালেই দেখা গিয়াছে যে, আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে সাম্প্রদায়িকতার বীজ কিভাবে মহীরুহে পরিণত হইয়াছে এবং এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি সাম্প্রদায়িকতার চিহ্ন পরিপূর্ণরূপে বহন করিতেছে এবং তদনুসারে তাহার কার্যাবলী পরিচালিত হইতেছে। অথচ সুখের বিষয়, বারাণসীর এই বিশ্ববিদ্যালয়টি এই জাতীয় গ্লানি হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

এখন স্বভাবতই বিক্ষোভ রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে, যে ক্ষেত্রে দেখা গেল যে আলীগড়ের ক্ষেত্রে নাম পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই আসিল না অথচ রাতারাতি বারাণসীর বেলায় নামটি বদলাইয়া দেওয়া হইল। সাম্প্রদায়িক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্র যেটি---সেখানে সব কিছু সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া যাওয়া হইল অথচ সাম্প্রদায়িকতার গ্লানিমুক্ত যে তাহারই অঙ্গে লাগানো হইল পরিবর্তনের স্পর্শ।

শিক্ষাক্ষেত্রকে পরিচালিত করা উচিত এক পরম উদার মন লইয়া। যে স্থান ভাবীকালের মহামানবের মিলনক্ষেত্র জাতীয় জীবনে যাহার গুরুত্ব অসাধারণ, যে প্রাঙ্গণ হইতে মানুষ জীবনের যাত্রাপথ পরিক্রমায় রসদ সংগ্রহ করে, সেখানে কোন কিছু করার প্রাক্কালে যথেষ্ট পরিমাণ চিন্তা প্রয়োজন; হঠাৎ কোন কিছু সিদ্ধান্ত করিয়া আইনের সাহায্যে তাহা কার্যকর করা এক্ষেত্রে কোনমতেই বিবেচ্য নয়। ইহাতে মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়। সাম্প্রদায়িকতা অবসানের নামে সাম্প্রদায়িকতাকেই প্রকারান্তরে আরও দৃঢ়ভাবে এ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করা হইল। ছাত্র-ছাত্রীদের মনে স্বভাবতই এ জন্য এক বিরাট প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে এবং নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, তাহার ফল শুভ নয়।

ভারতের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা আন্তর্জাতিক খ্যাতির অধিকারী। বর্তমান কালের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রথম সারিতেই তাঁহার আসন সসম্মানে সুনির্দিষ্ট। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা এবং সুচিন্তিত যুক্তিসমৃদ্ধ সিদ্ধান্তের প্রতি আমাদের আস্থাই আছে। তাই, তাঁহাকে বিষয়টি সম্বন্ধে পুনর্বার ব্যাপকভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি। শিক্ষা জগত ভেদাভেদ, দ্বন্দ্ব-বিবাদের ক্ষেত্র নয়, তাহা পূজার যজ্ঞ, অতএব তাহার পবিত্রতা যাহাতে যথাযথ সুরক্ষিত থাকে সেদিকে যথাযোগ্য দৃষ্টি দেওয়া হউক।

আজকের খাদ্যনীতি

"চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য
দেশ-বিদেশে বিতরিছ অন্ন।"

ঋষি কবির অমর লেখনী নিঃসৃত এই দুইটি পংক্তির দ্বারা দেশের তৎকালীন একটি চিত্র সম্বন্ধে মনের মধ্যে এক সুস্পষ্ট ধারণা করা অসম্ভব হয় না। কিন্তু তৎকালীন এই 'চিত্রটির' সহিত একালীন চিত্রের গরমিল যে কতখানি তাহাও আজ আর কাহারো বুঝিতে বাকী নাই। সোনার বাঙলার সীমাহীন আকাশ-ছোঁয়া প্রান্তরে সোনালী ধানের শীষ পৃথিবীর যে-কোন অনুভূতিবান ব্যক্তির রসপিপাসু হৃদয়ে যে কতখানি গভীরতাসহ এক অপূর্ব মোহময় অনুভূতির সৃষ্টি করিয়াছে তাহার তুলনা মেলা ভার। দূর-দূরান্তের কত ভিনদেশী পথিককে যে তাহা আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছে তাহার হিসাব রাখা দুঃসাধ্য। কিন্তু কালের নির্মম বিধানে আজ সব কিছুরই এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। কোথা হইতে যে কি করিয়া এত বড় একটা ওলোট পালোট ঘটিয়া গেল তাহা ভাবিলে কোন কূলকিনারা পাওয়া যায় না। সময়ের অগ্রসরণে বাঙলার আভ্যন্তরীণ চিত্র আজ একেবারে বিপরীত। কোথায় সেই গোলাভরা ধান, কোথায় সেই অফুরন্ত খাদ্যসম্পদ, কোথায় সেই ঘরে ঘরে প্রাচুর্যের সমারোহ। আজ তাহা নিছক স্মৃতিমাত্র, শুধু ইতিহাসের বোবা পৃষ্ঠাতেই আজ তাহাদের স্থান।

দেশের খাদ্যাবস্থা আজ ক্রমশই যেভাবে অবনতির দিকে চলিতেছে তাহা যথেষ্ট পরিমাণ আশঙ্কা ও উদ্বেগের জন্ম দেয়। ভারতবর্ষের জনসংখ্যা আজ যেভাবে ক্রমবর্ধমান, সেই অনুপাতে আমাদের উৎপাদন কম। যে পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়, তাহা প্রতিটি নরনারীর জঠরের জ্বালা নিবারণ করিতে সক্ষম নয়। ফলে বিদেশের নিকট আমাদের প্রত্যাশী হইতে হয় এবং বিদেশ হইতে খাদ্যশস্য আমদানী করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর থাকে না। অবশ্য, অভাব যতটা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে প্রকৃত অভাব হয় তো ঠিক ততখানিই নয়, এই অভাবের সুযোগ লইয়া এক শ্রেণীর মুনাফাখোর কালোবাজারী আপন বিত্তবৈভব বাড়াইয়া চলিতেছে অর্থাৎ প্রচুর খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিয়া লোকের চাহিদার সুযোগ লইয়া চড়া দামে সেগুলি বিক্রী করিতেছে, ফলে প্রকৃত অভাব দ্বিগুণ হইয়া জনসাধারণের নিকট প্রতীয়মান হইতেছে।

কিছুকাল যাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হইতে যে খাদ্যশস্য আমরা আমদানী করিয়াছি তাহার জন্য আমাদের মূল্যও দিতে হইয়াছে প্রায় তিন হাজার কোটি টাকা। তৎসত্ত্বেও আমরা যে পরিপূর্ণরূপে খাদ্যাভাবমুক্ত তাহাও বলিতে পারি না। খাদ্যের চাহিদা তখনও অটুট থাকে। কাহারও মতে সত্তর লক্ষ, কাহারও মতে পঁচাত্তর লক্ষ, আবার কাহারও মতে এক কোটি টন খাদ্যের অভাব বর্তমান। পরিসংখ্যান যাহাই হউক সত্যভাব যে আমাদের বর্তমান এ বিষয়ে কোনপ্রকার সন্দেহ নাই।

এখন ইহাও অনুমিত হইতেছে যে, এইবার এক কোটি টন খাদ্যের অভাব ঘটিবে। এক কোটি টন খাদ্যে পাঁচ কোটি লোকের ক্ষুধার নিরসন হয়। অর্থাৎ এক কোটি টন খাদ্যের অভাব মানে পাঁচ কোটি লোকের উপবাসবরণ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্যের উপর খুব বেশী নির্ভর করা চলে না। কারণ আমরিকার পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। সাম্প্রতিক পাক-ভারত যুদ্ধের দোহাই পাড়িয়া এই পি-এল ৪৮০ চুক্তিকে কেন্দ্র করিয়া আমেরিকা কি চুক্তি বা সর্ত উপস্থাপিত করিবে বলা যায় না, এমন কি শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র হইতে খাদ্য আগমন বন্ধও হইবে কি না সে সম্বন্ধে যথেষ্ট পরিমাণ সন্দেহের অবকাশ আছে।

এখন যদি তাহাই হয়, সেজন্য তাহার বিকল্প ব্যবস্থা অনুসারে সরকার খাদ্যনীতির পরিবর্তন ও পরিমার্জন সাধন করিলেন। র‍্যাশন ব্যবস্থার দ্বারা খাদ্যের পরিমাণ সংযত করা হইল এবং খোলাবাজারে ধান্য বিক্রয় বন্ধ করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হইল। স্থির হইল যে উৎপন্ন ধান্যের একটি অংশ উৎপাদক নিজে রাখিয়া বাকী সমগ্র অংশ সরকারকে দিবেন। ঐ ধান্য সরকার সংরক্ষণ করিবেন এবং উহার বণ্টন সরকারী ব্যবস্থায় হইবে। ধান্য উৎপাদকের দল পাইকারীভাবেও ধান্য বিক্রয় করিতে পারিবেন না। উহাও তাঁহাদের সরকারের নিকট অথবা সরকার-নিযুক্ত এজেন্টের নিকট বিক্রয় করিতে হইবে।

তবে, এই ব্যবস্থাপনা উৎপাদকমহলে আশার সঞ্চার করিতে পারে নাই। তাঁহারা এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছেন না কারণ তাঁহাদের জন্য যে ব্যবস্থা করা হইতেছে তাহা তাঁহাদের ধারণার নির্ভরযোগ্য নয়। যে পরিমাণ ধান্য তাঁহাদের থাকিবে তাহা প্রয়োজনানুপাতে অপ্রচুর, তাহার উপযুক্ত কোন বিকল্প ব্যবস্থার ও নির্ভরযোগ্য কোন আশ্বাস তাঁহারা পান নাই।

এখন ইঁহাদের বক্তব্যও সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা চলে না। পরীক্ষামূলকভাবে সরকার যে নীতি গ্রহণ করিয়াছেন তাহা যদি উৎপাদকমহলে এই প্রকার নৈরাশ্যের সৃষ্টি করে, তাহা হইলে সমস্যার সমাধান হইল কোথায়? খাদ্য সমস্যার সমাধান করিতে যাইয়া খাদ্য উৎপন্নকারকদের মধ্যেই যদি দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করা হয় তাহা হইলে সামগ্রিকভাবে অবস্থা তো যে তিমিরে সেই তিমিরে।

এদিকে র‍্যাশনিং-এও ক্রমশই

খাদ্যের পরিমাণ কমানো হইতেছে, যেটুকু প্রয়োজন জীবনধারণের পক্ষে, জীবন-সংগ্রামে অবিচল থাকার ক্ষেত্রে, সেটুকু যদি মানুষ না পায় এবং তাহার ফলে তাহাকে যদি অনন্যোপায় হইয়া মৃত্যুবরণ করিতে হয়, তাহা হইলে এত ব্যবস্থা, এত চিন্তা, এত পরিকল্পনা কাহার জন্য?

সমস্যার অস্তিত্ব আমরা অস্বীকার করি না, যে-কোন কারণেই হউক সমস্যা আজ সত্যই মাথাচাড়া দিয়া উঠিয়াছে এবং উদ্ভূত যখন হইয়াছে তখন অবসানও তাহার ঘটাইতেই হইবে। কিন্তু অন্য কোন পথ কি নাই? এখনও এত আইনের ফাঁকেও যে-ভাবে গোপনে কালোবাজারের জয়যাত্রা অব্যাহত রহিয়াছে, তাহার দমন করিলে মনে হয় বহুল পরিমাণে সমস্যার নিরসন হইবে, এখনও শস্যোপযোগী যে সকল জমি খালি রহিয়াছে সেগুলি যদি শস্যফলনের কাজে ব্যবহার করা যায় তাহা হইলে দেশের উৎপন্ন খাদ্যদ্রব্যের পরিমাণ অনেক বৃদ্ধি পাইবে, সমস্যার সমাধানও হইবে এবং সর্বনাশা ক্ষতিকর সিদ্ধান্তসমূহও গ্রহণ করার প্রয়োজন হইবে না।

এ বিষয়ে আমরা সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি ও বিষয়টি সম্পর্কে বিশেষভাবে চিন্তা করিতে অনুরোধ করি।

সাম্প্রতিক মিষ্টান্ন নীতি

সুদূর অতীতের ইতিহাসে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখা যায় যে, সেদিন সমগ্র অযোধ্যানগরী সহসা আনন্দরসে পরিপ্লাবিত হইয়া উঠিল। দলে-দলে, পথে-প্রান্তরে, নগরে-গ্রামে, শুধু স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দের বিকাশ। প্রজাপ্রিয় যুবরাজ রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের সংবাদ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনে আনিয়াছিল এক নবজীবনের স্পন্দন। প্রতিটি গৃহ, বিপণীতে নূতন প্রাণের স্পর্শে দ্বিগুণ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কিন্তু মাত্র একটি রাত্রি গত হইতে না-হইতেই ভোজবাজীর মত মিলাইয়া গেল সেই অফুরন্ত আনন্দ। বিগত সেই সন্ধ্যার বিরাট উদ্দীপনার তিলমাত্রও পরবর্তী প্রভাতের জন্য অবশিষ্ট রহিল না। যে ঘরে গত সন্ধ্যায় হাসির তুফান বহিতেছিল, সেই গৃহে পরবর্তী প্রভাতে কান্নার রোল উঠিল। মাত্র একটি রাত্রি সমগ্র পরিবেশটিকে বদলাইয়া দিল। কোন অজানা যাদুকরের যাদুদণ্ডে নগরীর সমগ্র চিত্র, মানুষের মনের অবস্থা পরিপূর্ণরূপে বদলাইয়া গেল---রাজসিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। যাহার মাথায় রাজমুকুট উঠিবার কথা, তাঁহার দেহে অতঃপর শোভা পাইবে জটাবল্কল। রাজ-সিংহাসনের পরিবর্তে চতুর্দশ বৎসর বনবাস নির্দিষ্ট হইয়াছে রামচন্দ্রের জন্য।

সময় আগাইয়া চলে। অগ্রসরণই কালের নিয়মানুযায়ীই তাহার ধর্ম। কিন্তু ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে, একটু ভিন্ন ধরণে কিন্তু তাহার মূল একই।

সেদিন কলিকাতার জাতীয়জীবনে একটি ঘটনার সহিত সেই পুরাতন রামায়ণী-কাহিনীটির এক আশ্চর্য সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইতেছিল। সেই ঘটনাটি বারংবার আমাদের মনে করাইয়া দিতেছিল রামায়ণের সেই চিরপুরাতন (এবং চিরনূতনও) ঘটনাটি।

কিছুকাল পূর্বেই সন্দেশের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হইয়া গিয়াছে। বাঙলার একটি সাংস্কৃতিক সম্পদ সরকারী সিদ্ধান্তের ফাঁসিকাষ্ঠে বলি হইয়াছে, জনসাধারণের এবং মিষ্টান্ন বিক্রেতা অনুরোধ-উপরোধ যুক্তিতে সরকারী পক্ষ কর্ণপাতও করেন নাই। হঠাৎ একদিন সন্দেশ পুনর্জীবন লাভ করিল। আবার দোকানীদের মুখে মুখে হাসি ফুটিল। ভাঙা ঘর আবার যেন জোড়া লাগে---পৌষের ঝরাপাতার পর যেন ফাল্গুনের পুষ্পোদ্গম, আনন্দে বিভোর মিষ্টান্ন বিক্রেতারা সেদিন স্বপ্নেও মুহূর্তের জন্যও ভাবিতে পারিলেন না যে কি ভয়ঙ্কর সর্বনাশা সংবাদ বহন করিয়া আগামী প্রভাত তাঁহাদের জীবনে আসিতেছে। রাত্রি আসিল অনন্ত ঐশ্বর্যের পশরা বহন করিয়া, প্রভাত আসিতেছে নিরন্তর বেদনার প্রতিশ্রুতি বহন করিয়া। রামায়ণের রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেকের মুহূর্তেই যেমন বনবাস ঘটিল, এখানেও সন্দেশের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই শুধু সন্দেশই নয় এতাবৎ দুগ্ধজাত অন্যান্য যে-সকল মিষ্টান্ন সরকারী নিষেধাজ্ঞার আওতার বাইরে ছিল তাহারাও তাহার অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল।

মিষ্টান্নের দোকানগুলির ঝাঁপ বন্ধ হয় হয়। গত রাত্রির আনন্দের রেশ তখনও তাহাদের মন হইতে সম্পূর্ণরূপে অপসৃত হয় নাই এমনই সময়ে পরদিবস তাহারা জানিল যে কি সর্বনাশ তাহাদের ঘটিয়া গেল।

দেশের যখন প্রকৃত কোন দুর্যোগ উপস্থিত হয় তখন তাহার জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে দেশপ্রেমীমাত্রেই প্রস্তুত থাকেন এবং দেশের বৃহত্তর স্বার্থে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দেওয়া প্রকৃত দেশপ্রেমীর এক মহান কর্তব্যবিশেষ। কিন্তু এখানে যে কারণে এই নিষেধাজ্ঞা প্রদত্ত হইল, তাহারই সূত্র ধরিয়া একথা বলা অযৌক্তিক হইবে না যে, এই নিষেধাজ্ঞা প্রদান বোধ করি অপরিহার্য ছিল না, সমস্যা যাহা দেখা দিয়াছে এই ভয়ঙ্কর পথ ছাড়া কি তাহার সমাধানের অন্য কোন পথ সম্মুখে খোলা নাই। এই সমস্যা সমাধানের জন্য

...রও কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলে সত্যই ...ক অন্য কোন কল্যাণকর উপায় ...ভাবিত হইত না ?

মিষ্টান্ন-বিলাস বা মিষ্টান্নের লালসা ...খানে প্রশ্ন নয়, এখানে প্রশ্ন এই ...য় মিষ্টান্নের ব্যবসায়ে যে বিরাট ...খ্যক লোক জঠরের জ্বালা নিবারণ ...রিত, অতঃপর তাহারা কোন উপায়ে ...ধার অসীম জ্বালা হইতে অব্যাহতি ...ইবে? তাহাদের জন্য বিকল্প কোন ...বস্থা করাও তো প্রয়োজন এবং ... ব্যবস্থাও যাহাতে কার্যকর এবং ...ল্যাণকর হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখা ...রকার। একটি সমস্যা নিবারণ ...রিতে যাইয়া দশটি সমস্যার উদ্ভব ...খানে ঘটে সেখানে আর যাহাই হউক ...দক্ষতা-বুদ্ধি ও দেশপ্রেমের পরিচয় ... আদৌ মেলে না এ সম্বন্ধে সন্দেহের ...লমাত্র অবকাশ নেই।

এই নিষেধাজ্ঞায় শুধু যে মিষ্টান্ন বিক্রেতাদেরই ক্ষতি হইল তাহা নয় ইহার সহিত আনুষঙ্গিকভাবে আরও অনেকেরই ক্ষতি হইল, দোকানে দোকানে যাহারা দড়ি, ঠোঙা, শাল-পাতা, ভাঁড় প্রভৃতি সরবরাহ করে তাহাদের ব্যবসাও স্বভাবতই ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

শুধু মিষ্টান্নকে কেন্দ্র করিয়াই নয়, সারা বাঙলার খাদ্যাবস্থা আজ ক্রমশই ভয়াল, ভয়ঙ্কর ও নিদারুণ হইয়া উঠিতেছে। এ সম্পর্কে অনেক বক্তৃতা, আলোচনা ও ব্যবস্থাদি হইতেছে বটে কিন্তু কোন কার্যকর ব্যবস্থা এখনও দৃষ্ট হইল না, র‍্যাশনের পরিমাণ ক্রমশই কমিতেছে, দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকারে মানুষ প্রস্তুত কিন্তু ইহাও ভাবিয়া দেখা উচিৎ যে দিনের পর দিন অনির্দিষ্টকালের জন্য মানুষ যদি ক্রমশই আধপেটা বা তাহারও অপেক্ষা কম খাইয়া কালাতিপাত করে তাহা হইলে কতক্ষণ সে সংগ্রামশীল থাকিবে, জীবনীশক্তি নিঃশেষিত হইতে তাহার আর বিলম্ব কত? ক্রমশই এইভাবে ক্ষয়ের দিকে সে অগ্রসর হইলে তাহার হতভাগ্য জীবন-নাট্যের শেষ করুণ অঙ্ক বেদনাদায়ক যবনিকাপাতের মুহূর্ত আর কত দূরে? একে দ্রব্যমূল্যের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি তাহার উপর নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যের অভাব। এই অবস্থার বিষময় পরিণতি কি বুদ্ধিজীবী, দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের এখনও বুঝাইয়া বলার দরকার?

১১৭৬ সালের মন্বন্তর আগামী চার বছর পরেই দ্বিশত বর্ষে পদার্পণ করিবে। এই অবস্থা অব্যাহত থাকিলে মনে হয় সারা দেশ জুড়িয়াই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের দ্বিশতবার্ষিকী সার্থকভাবেই (?) উদ্‌যাপিত হইবে।

১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৭২।

শোক-সংবাদ

নরেন্দ্রনাথ লাহা

ভারতীয় ইতিহাস-কংগ্রেসের প্রাক্তন ...পতি, মহারাষ্ট্রীয় প্রাক্তন শেরিফ বিশিষ্ট

● নরেন্দ্রনাথ লাহা

...ও এবং শিল্পপতি ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা ২৯-এ কার্তিক ৭৯ বছর বয়সে লোকান্তরিত ...ন। কলকাতার প্রখ্যাত লাহা-পরিবারের ইনি স্বনামধন্য সন্তান। স্বগত রাজা হৃষীকেশ লাহার পুত্র নরেন্দ্রনাথ ১৯১৬ এবং ১৯২২ সালে যথাক্রমে প্রেমচাদ রায়চাঁদ স্কলারশিপ ও ডক্টরেট অর্জন করেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখায় এবং বিশেষত ভারত তত্ত্বে ইনি যথেষ্ট পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। বহুকাল তিনি ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিক্যাল কোয়ার্টালি সম্পাদনা করেছেন। বাণিজ্য জগতেও তাঁর অবদান অনন্য। ইংরাজী ও বাঙলা ভাষায় প্রায় আঠারোখানি অশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক গ্রন্থের তিনি রচয়িতা। ইনি বঙ্গশ্রী কটন মিলের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার চেয়ারম্যান এবং বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভার সভাপতির আসনসমূহ অলঙ্কৃত করে গেছেন। প্রথম ও দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে ইনি ভারতের অন্যতম প্রতিনিধি ছিলেন। তাঁর লোকান্তরে দেশের মনীষীমহলে একটি বিশেষ আসন শূন্য হয়ে গেল।

দুর্গামোহন ভট্টাচার্য

বেদ এবং সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী দুর্গামোহন ভট্টাচার্য গত ২৬-এ কার্তিক ৬৭ বছর বয়সে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ১৯৫৯ সালে অথর্ববেদের লুপ্তপ্রায় "পিপ্পলাদ" আবিষ্কার তাঁর জীবনের এক অতুলনীয় কীর্তি। ইনি কাব্য-সাঙ্খ্য-পুরাণতীর্থ ও ভাগবতরত্ন উপাধির অধিকারী ছিলেন। শেষ জীবনে ইনি সংস্কৃত কলেজের বেদ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক, গবেষক ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত অধ্যাপক ছিলেন। কয়েকটি মূল্যবান গবেষণা গ্রন্থের তিনি রচয়িতা ছিলেন।

প্রসাদ সিংহ

বিশিষ্ট চিত্র সাংবাদিক প্রসাদ সিংহ গত ১৪ই অঘ্রাণ মাত্র ৪৪ বছর বয়সে গতায়ু হয়েছেন। ইনি উল্টোরথ ও সিনেমা-জগৎ পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার ছিলেন এবং চিত্র-প্রযোজনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।
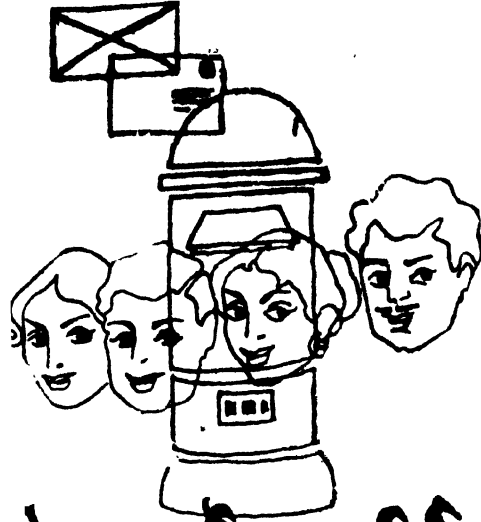
পাঠক পাঠিকার চিঠি

পাঠকা সমালোচনা।

সম্পাদক মহাশয়,

'মাসিক বসুমতী'র গত আশ্বিন সংখ্যায় শিল্পী শ্রীসুনীলমাধব সেনগুপ্তের প্যাস্টেলে আঁকা 'কবরী রচনা' ছবিটি দেখলাম। ছবিটি শিল্পী 'ডেগাসে'র অনুকরণে আঁকা, কিন্তু কোনরূপ স্বীকারোক্তি না করেই শিল্পীর মৌলিক সৃষ্টি বলে ছবিটি ছাপানো হয়েছে। এরূপ অবৈধ কাজ একজন শিল্পীর পক্ষে সত্যই নিন্দনীয়। ছবিটি Little Library of Art, Methuen & Co. Ltd থেকে Mourice Serullar কর্তৃক প্রকাশিত 'Degas women dressing নামক পুস্তিকার ছবি। (Nude women combing her hair (Pastl) 1889---1890.)

নমস্কারান্তে, গোপাল রায়, খড়গপুর।

মহাশয়,

কার্তিকের মাসিক বসুমতী দেখছি, পড়ছি। করেছেন কী! এ যে বিরাট ভোজ। কয়েকটি লেখা চমৎকার। প্রভাতবাবুর রবীন্দ্রনাথের বন্ধুবৃন্দ, চিত্তরঞ্জনবাবুর ডাঃ জনসন, শান্তিপ্রিয়র একটি টেস্ট ও চারটি ইনিংস, রেবা দেবীর অনুবাদ পুরুষদের যেভাবে দেখছি—রচনাগুলি অত্যন্ত মনোগ্রাহী হয়েছে। মাসিক বসুমতী যখন প্রথম আপনার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, তখনও চমক লাগিয়ে দিয়েছিলেন—অনেক দিন হল, কিন্তু এখনো বেশ মনে [illegible]

...সহ বিস্ময়কর পরিবর্তনের কথা। তারপর থেকে সমানে আপনার পরিকল্পনায় মাসে মাসেই নানা নতুনত্বের পরিচয় দিয়ে চলেছে মাসিক বসুমতী। আপনাকে আবার অভিনন্দিত করি। ইতি—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। এস, সি, সরকার এণ্ড সন্স (প্রাঃ) লিঃ, ১সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২।

মহাশয়,

আমি মাসিক বসুমতীর ১৩৭২ সনের ভাদ্র সংখ্যায় মিনতি গঙ্গোপাধ্যায়ের 'অবিশ্বাস্য যা ঘটেছিল' ঘটনালিপি পড়ে অত্যন্ত রোমাঞ্চিত এবং উত্তেজিত বোধ করছি। কখনো কখনো প্ল্যানচেট্-এর এ ধরণের ঘটনা শুনেছি। কিন্তু জানি না—আমার দুর্ভাগ্য কিনা কোন প্রত্যক্ষদর্শীর পরিচয় পাই নি আজও। যখনই শুনেছি—শ্রোতা অকপটে জানিয়েছেন এটা আমার "অমুকে"র মুখে শোনা। শ্রীমতী গঙ্গোপাধ্যায়ের যদি আপত্তি না থাকে—তা হলে আপনার কাছ থেকে এই সহযোগিতা আশা করছি। লেখিকার সংগে পত্রযোগে তাঁর বর্ণিত ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ জানবার সুযোগ করে দেবেন। লেখিকার সংগে পত্রে সরাসরি যোগাযোগ করার ব্যবস্থা করা সম্ভব কিনা দয়া করে জানাবেন। আশা করছি এ চিঠির প্রাপ্তি সংবাদ এবং আপনাদের কিছু করা সম্ভব কিনা জানাবেন। নমস্কারান্তে, তাপসকান্তি তালুকদার, ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী আদালত, বর্ধমান।

মাসিক বসুমতীর বর্ধিত আকার দেখিয়া আমরা মনে মনে খুবই খুশী হইয়াছি। আমরা 'মাসিক বসুমতী'র মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে মোটেই অসুখী নয়,—বরং বিশেষভাবে সুখী হইয়াছি। আমরা কখনও মনে করি না যে, ১৭২ পৃষ্ঠার বসুমতীর মূল্য ১.২৫ পয়সাতেই সীমাবদ্ধ থাকুক। ইহার মূল্যবৃদ্ধি হইয়াছে, খুবই ভাল হইয়াছে। আর একটা কথা সম্পাদক মহাশয়কে আমরা জানাতে চাই যে, প্রত্যেক মাসে নূতন নূতন চিন্তাশীল প্রবন্ধ, রম্যরচনা, অনুবাদ জীবনী, পরীক্ষামূলক ছোটগল্প প্রভৃতির মারফতে বসুমতী জ্ঞান ও সংস্কৃতির মন্দির হিসাবে পাঠকমহলে বিরাজ করুক। সেকেলে ঢং-এর মাসিক বসুমতী আর আমরা চাই না। মাসিক বসুমতীর কোন এক সংখ্যা থেকে চ্যাপলিনের 'My Autobiography' অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে বাহির করা হোক। মাসিক বসুমতীর কোন এক সংখ্যায় বাংলা ও বাঙালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করা হউক। অন্নদাশঙ্কর রায়, হরপ্রসাদ মিত্র, রথীন্দ্রনাথ রায়, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র বাগল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির লেখা, চিন্তাশীল প্রবন্ধ, রম্যরচনা, পরীক্ষামূলক ছোটগল্প ও উপন্যাস প্রত্যেক মাসের বসুমতীতে পাইতে চাই এবং আশা করি নিশ্চয়ই পাব। মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে একটি বিভাগ মাসিক বসুমতীতে খোলা হোক। সৎ-চলচ্চিত্র চিন্তা বসুমতী মারফৎ প্রচার করা হোক। ইহাই আমাদের আশা এবং বক্তব্য, মনে রাখবেন। ইতি—শ্যামল মজুমদার, মণি দত্তগুপ্ত। কলিকাতা-২৬

।। গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই ।।

The Librarian, R. K. Mission Ashrama Library, P. O. Narendrapur, 24 Pgs. * * * The Secretary, Enayetpur Rural Library, P. O. Enayetpur, Dt. Malda, W. Bengal. * * * Sm. Manjusri Sen Gupta, C/o B. K. Sen Gupta Balurghat Acrodrome, P.O. Bejoysri, Dt. W. Dinajpur, W. B. * * * Dr. Nalini Bhusan Banerjee, Durgapur Health Centre, P.O. Chotkhanda, Dt. Burdwan Via Memari * * * Sri Pramatha Nath Das, Vill. Jagannathpur, P.O. Rajarampur, Via Lalgola, Dt. Murshidabad, W. Bengal. * * * S. K. Sirkar Esqr. R A S M. S.E. Rly. P.O. Nagbhir, Dt. Chanda, M.S. * * * Girish B. Shah. 'Saraiya Nivas', Mukati Maidan, Maninagar, Ahmedabad-8 * * * Sri Manas Mohan Mukherjee, Librarian & Asstt. Secretary, Paikar Satyendra Public cum Govt Sponsored Rural Library, P.O. & Vill. Paikar, Dt. Birbhum * * * The Headmistress, Dharmanagar Girls' Higher Secondary School, P. O. Dharmanagar, Dt. Tripura, India.

I am sending the yearly subscription of Rs. 15/-for the esteemed Monthly Basumati. Please send the magazine regularly. Hony. Secretary, Hasimara Indian Club. Hasimara, Jalpaiguri.

Sending the amount of Rs. 15/- being the annual subscription of the Monthly Basumati. Please send the magazine every month. Mrs. Sudhira Ghosal, 62/z, c Luxa. Varanasi City.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ পাঠান হইল। প্রতিমাসে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী প্রভারাণী পাহাড়ী, গ্রাম ও ডাকঘর—মহেশপুর, মেদিনী .র।

এক বৎসরের চাঁদা ১৫৲ মনি অর্ডারযোগে পাঠান হইল, প্রাপ্তিস্বীকারে বাধিত করিবেন, শ্রীমতী এস, বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্রামপুর কলিয়ারী, সুরগুজা, এম, পি।

Sending herewith the annual subscription of Rs. 15/- (fifteen) for the Monthly Basu : ati. Please send the magazine every month regularly. Dr. A. K. Ghosh M. B. B.S. 39, Pratapaditya Road, Cal-26.

I am remitting the amount of Rs. 15/- towards the annual subscription of the Monthly Basumati. Kindly send the magazine regularly. H. P. Roy. B-1-583 Gun Factory. Hyderabad. A. P.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। প্রতি মাসে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।—শ্রীরাধারঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাকঘর—দেবগ্রাম, জেলা—নদীয়া, পঃ বঙ্গ।

The amount of Rs. 15/- is sent herewith as a contribution to the Monthly Basumati. Please accept and acknowledge the receipt, Headmaster, Nalhati Hari Prasad High School. Po. Nalhati. Dt. Birbhoom.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। আশা করি, নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী উমা রায়, অবধায়ক ডাঃ পি, সি, রায়। ২২০ডি, দেবী মার্গ, বাণী পার্ক, জয়পুর, রাজস্থান।

আপনার মাসিক বসুমতীর জন্ম অন্ত মনি-অর্ডারযোগে বার্ষিকমূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। নিয়মিত প্রতি মাসে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, শ্রীচন্দ্রমাধব সিংহ। অবধায়ক ডাঃ বি, এন সিংহ, এম-বি, পাটনাবাজার, জেলা—মেদিনীপুর।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। যথারীতি প্রতিমাসে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবী, অবধায়ক —সূর্যগোপাল তেওয়ারী, রাধিকা সুন্দরী কুটীর, গ্রাম ও পোঃ—পারকুণ্ডি, বীরভূম।

Receive Rs. 15/- being the annual subscription of the Monthly Basumati. Kindy send the magazine every month. S. Guhathakurta, Manager, Bendapani T. E. Po. Bendapani. Dt. Jalpaiguri.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। প্রতি মাসে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী প্রতিমা মুখোপাধ্যায়, অবধায়ক বি কে মুখোপাধ্যায়, সেণ্ট্রাল অফিস, ডাকঘর—ভাওরা। জেলা—ধানবাদ

Remitting herewith the annual subscription of Rs. 15/- for the monthly Basumati. Please send the magazine regularly every month. —The Secretary, Everest Club, Kymore, Po Kymore, M. P.

আমার প্রিয় মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠান হইল, প্রতি মাসে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইবেন ও টাকার প্রাপ্তি-স্বীকারে বাধিত করিবেন। শ্রীমতী রমা মুখোপাধ্যায়, সর্বোদয় হাসপাতাল এস্টেট, প্লট নং ৩২, ব্লক নং—৯, ঘাটাকোপার মহুল রোড, ডাকঘর—চেম্বুর, বোম্বাই—৭১, এ এস

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। প্রতি মাসে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী অমলা বসু, অবধায়ক এ, টি, বসু, ম্যাণ্টন এণ্ড কোং, সিন্ধিয়া হাউস, নিউদিল্লী।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
৫০। কলা-কাকলি—			
(ক) মণিপুরী নৃত্য	(প্রবন্ধ)	সুরেন্দ্র সিন্‌হা ...	৪৯০
(খ) মুখোস	(প্রবন্ধ)	আশীষ বসু ...	৪৯২
(গ) আমেরিকায় নাট্যমঞ্চের সূচনা ও ক্রমবিকাশ	(প্রবন্ধ)	প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৪৯৫
(ঘ) জার্মান ছায়াচিত্রের নবযুগ	(প্রবন্ধ)	... ...	৪৯৮
(ঙ) আমাদের সময় ছবির বাজারে আকাঙ্খা ছিল শিল্পময়—এখন তা বাণিজ্যধর্মী	(সাক্ষাৎকার)	সুশীল মজুমদার ...	৫০২
(চ) গান-বাজনার গালগল্প	(প্রবন্ধ)	সন্তোষকুমার দে ...	৫০৪
(ছ) বোম্বাই সমাচার	...	নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত ...	৫০৬
(জ) সংবাদ-বিচিত্রা	...	... ...	৫১১
(ঝ) সৌখীন সমাচার	...	... ...	৫১২
(ঞ) নির্মীয়মাণ ছবি	...	... ...	ঐ
মহারাজা প্রতাপ-আদিত্য	(ঐতিহাসিক উপন্যাস)	ইন্দ্রসেন ...	৫১৭
৫১। সমিতি-সমাচার	...	প্রিয়ব্রত ...	৫২০
৫২। সম্পাদকীয়—	...	... ...	৫২২
৫৩। শোক-সংবাদ—	...	... ...	৫২৬

বিদগ্ধ ও সহৃদয় পাঠক-পাঠিকার সঙ্গে বাঙলা দেশের সর্বজনপ্রিয় পত্রিকা মাসিক বসুমতীর যোগাযোগ যেন অবিচ্ছেদ্য। অনুরাগী পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা, পাঠক-পাঠিকার সহযোগিতা ও আশীর্বাদধন্য মাসিক বসুমতী বর্তমান ৪৪ বর্ষে পদার্পণ করেছে। গত কয়েক বছরের মূল্যবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির দুর্দিনে প্রয়োজনীয় সকল কিছুর দাম উচ্চহারে বর্ধিত হয়েছে—কিন্তু আপনাদের অতি প্রিয় মাসিক বসুমতীর মূল্য (মুদ্রণব্যয় ও কাগজ-কালি ইত্যাদির দাম বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও) যথাপূর্ব রাখতে আমরা চেষ্টা করেছি।

মাসিক বসুমতীর পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, মাসিক বসুমতীর আকার গত সংখ্যা থেকে বৃহত্তর রূপ গ্রহণ করেছে। পত্রিকার আয়তন বৃদ্ধি হওয়ায় আমরা আশা করি, আরও অনেক ভাল লেখা ও ছবি পত্রিকায় মুদ্রিত হবে। পাঠক-পাঠিকা উপকৃত হবেন।

সম্প্রতি মাসিক বসুমতীর মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে পাঠক-পাঠিকার মতামত চাওয়া হয়। অত্যন্ত সুখের বিষয়, আমরা অগণিত পাঠক-পাঠিকার সমর্থন পেয়েছি। অনেকে পত্রযোগে আমাদের এই প্রস্তাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মাসিক বসুমতীর আকার বৃহত্তর হওয়ার জন্য এবং বর্তমান মুদ্রণব্যয়, কাগজ, কালি ইত্যাদির মূল্যবৃদ্ধির কারণে বর্তমান সংখ্যা থেকে প্রতি খণ্ডের মূল্য এক টাকা পঁচিশ পয়সার পরিবর্তে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা ধার্য হইল!!

পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা ও এজেন্টগণ অবহিত হোন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

(খাজুরাহো হইতে)

(ভুবনেশ্বর হইতে)

নারী-মূর্তি

—শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত অঙ্কিত

॥ ৪৪ বর্ষ, পৌষ ১৩৭২ ॥ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥

দণ্ডে দণ্ডে মানুষ মরে বাঁচে

দক্ষিণেশ্বরে বিরাজ করিলেও গ্রীষ্মসমাগমে কোন কোন বৎসর ঠাকুর জন্মভূমি কামারপুকুরে গমন করিতেন। শিবের সংসার (দারিদ্র অকথা) জানিয়া মথুরানাথ তাঁহার আবশ্যকীয় দ্রব্যসম্ভার, এমন কি, খড়কেটি পর্যন্ত সংগ্রহ করিয়া সঙ্গে দিতেন। কমল ফুটিলে সৌরভে আকুল হয়ে ভ্রমর যেমন উপস্থিত হয়, তদ্রূপ ঠাকুরের দিব্য দর্শন এবং তাঁহার মুখে ভগবৎ-কথা শ্রবণ করিতে শত শত নর-নারী আগমন করিত। এই কারণে নিকটস্থ ফুলুই শ্যামবাজার গ্রামের গোস্বামিগণ কোন এক পর্ব উপলক্ষে তাঁহাকে তাঁহাদের আলয়ে লইয়া যান। হরিনাম-সংকীর্তনে ভাবসমাধি হয়, ইতিপূর্বে ঐ অঞ্চলের লোক কখনও দেখে নাই। সুতরাং ঠাকুরের এই ভাব-আবেশের বিষয় প্রচারিত হইলে, "এক দিব্য মানুষ হরিনামে দণ্ডে দণ্ডে মরে, বাঁচে", দেখিবার আকাঙ্ক্ষায় এতই জনতা হয় যে, স্থানাভাবে অনেকে নিকটস্থ ঘরের চালে ও বৃক্ষশাখায় আরোহণ করিয়া নয়ন ও জীবন সার্থক করে। শ্রীমুখে শুনিয়াছি, সপ্তাহব্যাপী কীর্তনানন্দে বিভোর হওয়ায়, শরীরে এতই অবসাদ হয় যে, গৃহে প্রত্যাগত হইয়া সুস্থবোধ করিতে প্রায় পক্ষকাল লাগিয়াছিল।

ভাবসাগর

অধ্যবসায় সহকারে সাগরতলস্থ দ্রব্যনিচয়ের অনুসন্ধান বরং সম্ভবপর; কিন্তু অতল রামকৃষ্ণ-সমুদ্রে কি আছে বা কি নাই, তাহার অভিজ্ঞান একরূপ অসম্ভব। কোন এক আত্ম-চৈতন্য মহাপুরুষ কহিয়াছেন যে, তাঁহার এক-একটি ভাবের প্রচার উদ্দেশ্যে শ্রীভগবানকে বার বার অবতীর্ণ হইতে হইয়াছে। কিন্তু আভাস পাইতেছি যে, এই পুরুষোত্তমে বৈদিক যুগের নারায়ণ ঋষির অপূর্ব তপস্যা, রামচন্দ্রের সত্য-পালন, শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম-সামঞ্জস্য, শংকরের মায়াবাদ এবং শ্রীচৈতন্যদেবের দাস্য-ভক্তি প্রভৃতি ভাবের আশ্চর্য সমাবেশ।

নব্যগণ

ভাবময় ঠাকুর অপার করুণায় যাহাদিগকে আপন করিয়া লইয়াছেন এবং আদর করিয়া যাহাদিগকে কহিয়াছেন, শ্রীমন্দিরে আরতির ঘড়ি ঘণ্টা বাজলে কেঁদে ডাকতাম, ওরে! তোরা কে কোথায় আছিস আয়, তবে ত তোরা এসেছিস। আর তোদের চিত্র আমার চিত্তে অঙ্কিত থাকায়, একে একে আসিলেই চিনতে পেরেছি—তোরা আমার! এখন আপনার সেই পরিচিত অনুচর নব্যগণের শুভ কামনায় তাহাদের সহিত একাসনে বসিয়া কহিলেন, তোরা সব ইয়ং বেঙ্গল, তোদের সঙ্গে সারাদিন ধর্মকথা কহিলে, তোরা আমাকে লাইক করবিনি। এই বলিয়া এমন হাস্যরসের অবতারণা করিলেন যে, *তাহার বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া ভবনাথ কহিল, ক্ষান্ত দিন মহাশয়! আর হাসতে পারছি না, পেটের নাড়ীগুলোয় বেদনা হয়েছে। চ্যাংড়া হইলেও তদ্‌গত প্রাণ কি না!* তাই এই মধুর আচরণের প্রকৃত ভাব বুঝিতে অক্ষম হইয়া, পাছে কেহ তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে, এই আশঙ্কায় সতর্ক করিলে বলেন, ওরে! লোক না পোক, কিন্তু তোরা যে আমার।

অভিনয়

অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড জননি তব বিগ্রহং, এমন যে জগন্মাতাকে, ক্ষুদ্র হতেও ক্ষুদ্র তোমা কি ক'রে ধ্যান-ধারণা

করবি! পচা মাছ ঝাল দিয়ে রেঁধেছি, খেয়ে আনন্দ কর। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে না হয় বড় জোর ২।৩ ঘণ্টা ধ্যান করলি, বাকি সময়টা ত বাজে গেল। যাতে তোদের মন আমাতে ষোল আনা আকৃষ্ট হয়, তাই, তোদের ভালর জন্যই এই রঙ্গরস। মনে করিস না, আমি বোকা, আর তো শালারা সেয়ানা। তোদের এমন ক'রে যাব যে, যে অবস্থায় থাকিস বা যা দেখিস না কেন, সব সময় তোদের আমাকেই মনে পড়বে, আর আমারই মুখ দেখবি। যদি তোদের এমনটি না হ'ল ত, হ'ল কি?

আবার অভিনয় আরম্ভ হইল, কিন্তু এবার একটু মাত্রা চড়াইয়া, খেউড়-খিস্তি কথায়। বলিলেন, রমণী অঙ্গ-বিলাস জন্য যে রাগ, এই সব শুনলে অনেকটা কেটে যাবে। ঠাকুর তখন অর্ধবাহ্য অবস্থায় জগন্মাতাকে কহিতে লাগিলেন, "মা! তুই ত পঞ্চাশৎ বর্ণরূপিণী, তবে বেদ-পুরাণের ক, খ, আর খেউড়-খিস্তির ক, খ, কি আলাদা" বলিয়া, যোনি শব্দটি জপ করিতে করিতে গভীর সমাধিস্থ হইলেন। বহুক্ষণ পরে বাহ্যাবস্থায় আসিয়া আমাদিগকে কহিলেন, দ্যাখ! যোনি বলিলেই জগদ্‌যোনি মা ব্রহ্মময়ীকে দেখে তাঁতে ডুবে যাই। শিষ্ট শান্ত বালকের ন্যায় ভক্তিভরে ভগবৎস্তুতি করিতে করিতে অন্তরে দিব্যভাবের উদয় হয় বটে, কিন্তু দুষ্ট ছেলের মত কুরুচি হইয়া যথেচ্ছ অশ্লীল কথা জ'পে যে ভাবসমাধি হয়, ইহা ত মানবে কখনও সম্ভব নয়; এবং ইতিহাসও এরূপ প্রমাণ করে নাই।

বেদান্ত

ঠাকুর যখন দেখিলেন যে, ঔষধ প্রয়োগের সুফল হইয়াছে অর্থাৎ নব্যরা তাঁহাতে একেবারে তন্ময় হইয়াছে, তখন কহিলেন, বেদান্ত শুনবি? ওরে! বেদান্ত তিনটি কথা মাত্র —অস্তি, ভাতি, প্রিয়, সৎ চিৎ আনন্দ। অস্তি অর্থাৎ ঈশ্বরো অস্তি। কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কয়জন বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে? তাই রামপ্রসাদ বলেছে, আমার প্রাণ বুঝেছে, মন বুঝে নাই। যদি কেউ অন্তরের সঙ্গে বলতে পারে—ঈশ্বরো অস্তি, ঈশ্বর আছেন, অমনই সে দেখবে ঈশ্বরো ভাতি, অর্থাৎ সর্বভূতে তাঁর প্রকাশ। যাই দেখল ঈশ্বর বিদ্যমান, অমনই ঈশ্বরকে প্রিয় অর্থাৎ অতি আপনার জেনে আনন্দে বিভোর হয়ে গেল। আবার কহিলেন, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা বললেই কি এই জাজ্বল্যমান জগৎটা মিছে হয়ে যায়, তা নয়। যতক্ষণ অজ্ঞান, জগৎটা ততক্ষণ সত্য, এর অভাব নাই; কিন্তু সদ্‌গুরুর কৃপায় আর প্রাণপাত সাধনায় যখন ব্রহ্মজ্ঞান হয়, তখন সাধক দেখে সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মই জীব-জগৎ হয়েছেন। তখন তাঁর কাছে জগৎটা মিছে হয়ে গেল। আর জীবঃ শিবো সনাতন, জীবই শিব। পাশবদ্ধ ভবেৎ জীবঃ, পাশমুক্তঃ সদাশিবঃ। কথাগুলি এমন দিব্যভাবে বলিলেন, যাহাতে আমাদের মন এক অপূর্ব-ভাবে পরিপূর্ণ হইল। এ দৃশ্যটি জীবনে ভুলিবার নহে। ঠাকুর বলিতেন, টিয়ে পাখী সারাদিন রাধাকৃষ্ণ বলছে, যাই বেরালে ধরল, অমনিই নিজের রব ক্যাঁ ক্যাঁ করতে লাগল; কিন্তু প্রভুর কৃপায় এই বেদান্তজ্ঞান চিরদিনের মত আমাদের ভেলাস্বরূপ হইয়াছে।

কর্তাভজা মত

আবার কর্তাভজার বিষয় বলিতেছেন, কর্তা কি না ভগবানকে ভজনা করা। প্রকৃতি নিয়ে সাধন এদের একটা পথ, বড় কঠিন ব্যাপার, যেন সাপে-নেউলে খেলা। তাই এরা বলে, মেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোজা, তবে হ'গে যা কর্তাভজা। আরও বলে, সাপের মাথায় ভেকেরে নাচাবি, সাপ না খাইবে তায়। অমিয়-সাগরে সিনান করিবি, কেশ না ভিজিবে তায়। রন্ধন করিবি ব্যঞ্জন বাটিবি, হাত না ধুইবি তায়। নির্লিপ্তের ভাব। বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী এই মতের সাধক ছিল, একদিন আমাকেও তাদের আখড়ায় নিয়ে গিয়েছিল। তোদের কিন্তু ও পথ নয়।

জগদ্‌গুরু-উপদেশপ্রসূত গুরুবাদ

জন্মগত সংস্কার-প্রভাবে বিচিত্র প্রকৃতি স্বতঃসিদ্ধ। যিনি প্রজ্ঞাবলে তাহার মনোবৃত্তি লক্ষ্য করিয়া, অনুকূল পথ প্রদর্শনে তাহাকে ঈশ্বরাভিমুখী করিয়া দেন, তিনিই প্রকৃত গুরু। এই গুরুবাদ সনাতন মতের একটি বিশেষত্ব; এবং এই উদ্দেশ্যে একেশ্বরের বিবিধ নাম, রূপ ও তৎপ্রাপ্তির উপায়ের অবতারণা হইয়াছে। অন্যথা একই পরিচ্ছদে বিভিন্ন ব্যক্তির অঙ্গ সুশোভন প্রচেষ্টায় অশোভন করাই হয়।

ঠাকুর বলিতেন, কালী কল্পতরু, সদাশিব জগদ্‌গুরু। সুতরাং কল্পতরুমূলে কঠোর সাধনায় যে প্রভু নিজ অস্তিত্বকে ঈশ্বরের বিরাট অস্তিত্বে নিমজ্জন করিয়াছেন, তিনিই শিব-গুরু ও বিশ্বগুরু। অন্যথা কাণে ফুঁ ব্যবসায়ী শিষ্যের বিত্তাপহারক গুরু। আবার বলিতেন, মানুষ গুরুমন্ত্র দেয় কাণে, জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেন প্রাণে। আরও বলিতেন, মানচিত্র দেখে কাশী বুঝান যেমন, শাস্ত্র পড়ে তাঁর (ভগবানের) বিষয় বলাও ঠিক তেমন। তবে সাধকের তীব্র ব্যাকুলতা আসিলে, (জলমগ্ন ব্যক্তির কোনমতে জলের উপর ভাসিয়া নিশ্বাস ফেলিবার জন্য যে প্রচেষ্টা অর্থাৎ আকুপাঁকু করা তাহারই নাম ব্যাকুলতা) ভগবানই কোন না কোনরূপে উপদেশ বা দীক্ষা দিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা বিরল।

মন্ত্র-দীক্ষা

ঈশ্বরের মহিমাবাচক যে মহাবাক্য—যাহা মনকে ত্রাণ করিয়া দিব্যভাবে ভাবিত করে, তাহারই নাম মন্ত্র ও দীক্ষা। ঠাকুর কহেন, কর্তাভজারা বলে, মন্তর মন্তর বলছিস কি? মনই হচ্ছে মনতর। গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের তিনের দয়া হল। একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল॥ অর্থাৎ মন যদি আগ্রহসহ ভগবানের ভজন না করে, তাহা হইলে গুরুমন্ত্র ও ইষ্ট কি করিবেন? গুরু বীজ দিবেন মাত্র, কিন্তু শিষ্যকে যত্ন দ্বারা তাহাকে বৃক্ষতে পরিণত করিয়া ফলবান করিতে হইবে। আবার কখন কখন আক্ষেপ করিয়া কহিতেন, গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা না মিলে এক। আমি যেমন অঙ্গের বসন পর্যন্ত ফেলে দিচ্ছি, অর্থাৎ ঈশ্বরলাভজন্য সর্বত্যাগী হয়েছি, একটা চেলা পেলাম না যে এমনটি করে।

ভার গ্রহণ

আবার বলছেন, দীক্ষা দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়, শিষ্যের ইহ ও পরকালের সকল বোঝা বহিতে হয়। একেই ত আমি ক্ষুদ্র মানুষ, জোর না হয় দুচারজনের ভার সইতে পারি, অনেকের ভার নিতে গেলে চাপে মারা যেতে হবে। ছোট ছোট কাঠ দু'একজন নিয়ে জলে ভাসতে পারে, কিন্তু বাহাদুরি চকোর অনেককে নিয়ে ভেসে যায়। মানুষ দু'পাঁচজনের ভার টানতে পারে, কিন্তু ইঞ্জিন গাড়ী বিশ-পঁচিশখান মাল-গাড়ী টেনে নিয়ে যায়। তবে যে একেবারে মন্ত্র দিই না এমন নয়, দু'দশজন যারা নিহাত নাছোড়বান্দা হয়েছিল, তাদের দিতে হয়েছে, তবে কাহাকে কাণে ফুঁকে, কাহার জিবে লিখে বা কাহাকে স্পর্শ করে। সাধুর বহু শিষ্য করা দোষ, মহাপ্রভুও বলেছেন—বহু শিষ্য না করিবে। তবে উপগুরু হতে পারি, এতে বিশেষ ঝোঁক পোয়াতে হয় না, উপদেশ দিয়েই ছুটী। যার কাছে যা কিছু সদুপদেশ পাওয়া যায়, তিনিই উপগুরু। অবধূত চব্বিশটি উপগুরু করেছিলেন।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত হইতে।

ঘানার দু'টি কবিতা

এশিয়ার আধুনিক সাহিত্যগুলি যেমন এখানকার স্থানীয় ভাষায় অভিব্যক্তিলাভ করেছে, আফ্রিকার ক্ষেত্রে ঠিক এমনটি হয়নি। সাম্প্রতিক আফ্রিকার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যপ্রতিভার অধিকারী যাঁরা তাঁরা অনেকেই কোনো না কোনো ইউরোপীয় ভাষাকে নিজেদের প্রকাশমাধ্যম হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন। এই মহাদেশের বেশির ভাগ অঞ্চলই ফরাসী সংস্কৃতির অধীন বলে হয়তো গুণতিতে বেশির ভাগ কবিই ফরাসী ভাষাতে সাহিত্য রচনা করেছেন। তা বলে স্থানীয় ভাষাতে যে কাব্য-উপন্যাসাদি লেখা হচ্ছে না, তা নয়। বরং অতি সাম্প্রতিককালে তার অতিপ্রাচুর্যই লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

ইউরোপীয় ভাষায় আফ্রিকানদের সাহিত্যকৃতিতে একটি যে সাধারণ লক্ষণ ধরা পড়বে সেটি হলো আত্মপ্রত্যয়। মোটামুটিভাবে বলা যায়, এই একটি সুর যা সকল লেখকের বিশেষ করে কাব্যসংগ্রহগুলিতে সঞ্চারিত রয়েছে। কয়েক শতাব্দ একদিকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রশক্তির চাপে পিষ্ট থেকে ও অন্যদিকে ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞানের উদার আবহাওয়ায় আলোকিত হয়ে এখানকার চিন্তাশীলগণ ইউরোপীয় সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব নামক একটি বস্তুর সাক্ষাৎলাভ করেছেন। কখনও কখনও উদার জ্ঞানবিজ্ঞানের শিক্ষা আফ্রিকার মহান জাতীয়তাবোধকে উপযুক্ত খাদ্য সরবরাহ করতে পারেনি। সঠিক শিক্ষা ও দর্শন তাকে সৃষ্টি করে নিতে হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে বোধ করি। স্বদেশ আর স্বদর্শনের বোধই এই আত্মপ্রত্যয়ের ভূমি।

ইউরো-আফ্রিকান কবিতার দ্বিতীয় সাধারণ লক্ষণ আমি যা বুঝেছি তা হলো এই: পীড়ক-রাষ্ট্র ও দর্শনশক্তিকে নির্মমভাবে উন্মোচন করা। এবং এর জন্যে কিছু কঠিন ও কর্কশ ইমেজ বা চিত্রকল্প প্রয়োগ সাধারণ রীতিতে দাঁড়িয়েছে। শকুন নখর চাবুক নির্বোধ ফণিমনসা ইত্যাদি শব্দের বা চিত্রকল্পের পুনঃ পুনঃ আবির্ভাব তাই লক্ষ্য করবো। কখনও কখনও কোনো কোনো রচনা পুরোপুরি প্রচারধর্মী ও ঘোষণার কবিতা বলে মনে হবে। কিন্তু অনেক কবিতাই বলিষ্ঠ ও সূক্ষ্ম জিজ্ঞাসায় উজ্জ্বল ও সমাহিত। সৌন্দর্যে ও বিচিত্রতায় মনোরম ও কবিত্বময়।

ইংরেজি সংস্কৃতি-অধীন ঘানার দুই আধুনিক শক্তিধর কবির দুটি রচনা নিচে তর্জমা করে দেওয়া গেলো॥

সন্ধান

অতীত
বর্তমানের
ছাই বই তো নয়
ভবিষ্যৎ
ধোঁয়া
মেঘে মোড়া আকাশে
পালিয়ে যাওয়া
শান্ত হও, করুণা কর, প্রিয়তমা
কেননা বাক্য হয় স্মৃতি
আর স্মৃতি
ভাঁড়ের হাতে যন্ত্র
যখন প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা নির্বাক
কেননা তাঁরা পড়েছেন
যীশুর করপত্র
তথাগতের মুখে
তাই প্রজ্ঞার দিকে তাকিয়ো না
অথবা বাণীর
ইঙ্গিতের দিকে, প্রিয়তমা
যিনি তাঁদেরকে শিখিয়েছিলেন
নির্বাক হ'তে
সেই অগ্নি
আমাদেরকেও শেখান
বৃষ্টি এলো
যখন তুমি আমি ছিলাম ঘুমিয়ে
রাত্তিরের বোঝা আমাদের আবেগের
তাঁদের সদ্য আবিষ্কৃত প্রজ্ঞা
দ্রুত বিদ্যুৎ ছটায়
তুলে ধরলে সত্য
তাঁরা ছিলেন
নির্বোধের দাস॥

—কোয়েসি ব্রেউ
(জন্ম ১৯২৭)

বুদবুদ

তোমার শৈশব এখন এক স্মৃতির দেয়াল
পঙ্গপালে ছায় আকাশ
শুষে খায় ক্ষেতের ঘাম
আর উদ্বেল সমুদ্র চুরমার করে দ্যায় নৌকোগুলো
এদিকে মধ্যাহ্নেই পাল তুলে ছোটে জেলেরা

অধৈর্য কৈশোরে তোমার
কিন্তু স্বপ্নগুলো ছিলো তো
বুকে আগুন নিয়ে
ভাণের মুখোস ছিঁড়ে

অপসৃত নির্জন তোমার ভ্রূণে
আর তোমার বাহুর প্রত্যয়
উড্ডীন ঈগলের চোখে
টুকরো টুকরো করে অজ্ঞানের কাঁচ
তোমার শৈশব এখন স্মৃতির দেয়াল

এর সামনে তুমি কীটের মতো
বৃথাই কিমাকার স্বপ্নের উপর ঝুঁকে আছো
এদিকে গোখরোগুলো লকলকে জিবে
ফণিমনসার তাপিত ফুলগুলোকে চেটেই চলেছে॥

—এলিস আয়িতেই কোমেই
(জন্ম ১৯২৭)

অনুবাদক—পৃথ্বীন্দ্র চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের সহচরবৃন্দ

(৩)

রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও মননে ক্ষিতিমোহনবাবুর প্রভাব যে বিশেষভাবে পড়েছিল, তার প্রমাণ রয়ে গেছে 'কবীরে'র ইংরেজী অনুবাদে। ক্ষিতিমোহনবাবুই বাঙালীর কাছে মধ্যযুগের সন্তদের কথা বাংলা ভাষার মাধ্যমে এনে দিয়েছিলেন। আজ হিন্দী নিয়ে 'শিখতেই হবে'র ও 'শিখবো না'-র জিদ্ দেশকে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করতে চলেছে—কিন্তু আমাদের মনে সে প্রশ্ন আসে নি; কারণ হিন্দী সন্তদের পরিচয় পেলাম 'ঠাকুরদা'র কাছ থেকে। তাঁর সেই মোটা মোটা গলায় হিন্দী গান শুনেছিলাম। কখনো মনে করতে পারি নি, ভাষাটা শেখবার মতো নয়। আমার নিজের লাইবেরীতে তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' আছে, আমি তা সুর করে পড়তে পারি; কখনো মনে হয় না ওটা শিখলে আমার বাঙালিত্ব কমে যাবে। রবীন্দ্রনাথ বহুকাল থেকে শান্তিনিকেতনে হিন্দী চর্চার পরিবেশ রচনা করেছিলেন, তখনো দিল্লী, নাগপুর থেকে হিন্দী 'ম্যানিয়াক'দের জুলুমবাজি সুরু হয় নি। ক্ষিতিমোহন শান্তিনিকেতনে সেই হিন্দী প্রীতির পরিবেশ রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহনের 'দাদু' গ্রন্থের যে ভূমিকা লিখেছিলেন, তা প্রত্যেক বাঙালীর পড়া উচিত।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

(শান্তিনিকেতন)

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে তাঁর সমস্ত সাহিত্য যদি কালস্রোতে নিশ্চিহ্ন হয়, তাঁর গান বাঙালীর কণ্ঠে চিরকাল থাকবে। সেই গানের ধারক বাহক দিনেন্দ্রনাথকে বহু বৎসর পাই শান্তিনিকেতনে। নিঃসন্তান ছিলেন—তাই তাঁর সমস্ত স্নেহপ্রীতি ছাত্রদের জন্য যেন উৎসর্গীত ছিল; স্কুলে ইংরেজী পড়াতেন, গান শেখাতেন। গান শেখাতেন তাঁর ঘরে বসে, কখনো শালবীথির তলে সতরঞ্চ পেতে। রবীন্দ্রনাথ নূতন গান রচনা করে যার কণ্ঠে সামান্য সুর আছে তাকে শিখিয়ে দিতেন। গানটা না শিখিয়ে দিলে তো মুস্কিল। সুর হারিয়ে যাবে। মনে আছে একদিন রাত্রে আমি লাইব্রেরীতে বসে পড়ছি আপন মনে, হঠাৎ দেখি লণ্ঠন হাতে গুটি গুটি কবি সেখানে হাজির। বললেন, 'দিনুকে পেলাম না; তুমি তেজেশকে ডেকে আনো তো।'

তেজেশচন্দ্র সেন আমাদের সহকর্মী, গান গাইতে পারতেন, বেহালাও বাজাতেন নিজের মতো করে। তাকেই গানটা শিখতে হলো—সকালে দিনুকে যেন শিখিয়ে দেয়। কবির জীবনে দেখেছি এক এক সময়ে গান রচনার যেন বন্যা আসতো, দিনুবাবুকে সেই গান তুলে নিতে হতো—অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ছিল গান বিষয়ে।

দিনুবাবু গান শিখে এলে, তাঁর ঘরে আমরা সমবেত হতাম,—নূতন গান

শোনবার জন্য; তখন কয়জনই বা আমরা —কয়জনারই বা গান শোনবার শখ। সুতরাং দিনুবাবুর টালির ঘরে (লাইব্রেরীর পাশে আদি কুটিরের অংশ এখন নিশ্চিহ্ন) জমায়েত হতাম। একদিন দেখি সেখানে এসেছেন অতুলপ্রসাদ সেন লক্ষ্ণৌ থেকে বেড়াতে। মজলিশ জমলো সেই ছোট ঘরেই। অতুলপ্রসাদের নিজ কণ্ঠের গান শুনবার সৌভাগ্য হলো—বেশ কয়েকটা গান হলো। অজিতকুমার সেখানে ছিলেন—সুতরাং গানের আবহাওয়াটা কী রকম জমেছিল—তা কল্পনা করা আজকাল একটু কষ্টকর; কারণ এখন আমরা সর্বত্র গান গাই না, ও তাছাড়া এখন গান গাওয়া হয় ঘড়ি ধরে, শোনা হয় ঘড়ি ধরে। অবকাশ কম সবারই। যাক্ সে কথা।

রবীন্দ্রনাথের সহচর যাঁরা শান্তিনিকেতন গড়তে সহায়তা করেছিলেন তাদের সংখ্যা তো কম নয়; সবার কথা বলা তো আর একটা প্রবন্ধে সম্ভব নয়, তাই আর দুই-একজনের নাম করবো। কবির বিলাত যাত্রার পূর্বের পর্বে আমরা আলোচনাটা সীমিত রাখলাম।

পুরানো কথা অসম্পূর্ণ থাকবে সন্তোষচন্দ্র মজুমদারের নাম না করলে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আদিযুগের ছাত্র, কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের সহপাঠী। ১৯০৬ সালে দুই বন্ধুতে আমেরিকায় যান; ফিরে এসে সন্তোষচন্দ্র শান্তিনিকেতনের সেবায় নিযুক্ত হন। সেটা যে কত বড় ত্যাগ—তা আজকাল আমরা কল্পনা করতে পারি নে। এখন বিশ-পঁচিশ টাকার জন্য স্থান বদল, চাকুরির ভোল বদল হামেশাই হচ্ছে। 'ভালো কাজ পেয়ে চলে গেলেন' শুনি; অর্থাৎ শান্তিনিকেতনের কাজটা ছিল উচ্চমঞ্চে উঠবার পাদপীঠ। সন্তোষচন্দ্র যে যুগে (১৯১০) আমেরিকা থেকে ফিরে আসেন, তখন বড় সরকারী কাজ অনায়াসে পাওয়া যেতো। তাঁর পিতা সরকারী চাকুরী করবার সময়ে মারা যান বলে সরকারী চাকুরী পাবার সম্ভাবনা খুবই ছিল। কিন্তু সন্তোষচন্দ্র সে পথ খুঁজলেন না—কবির সেবায় ও ছাত্রদের সেবায় জীবন অতিবাহিত করে দিলেন। অকালে তাঁর মৃত্যু হয়।

নগেন্দ্রনাথ আইচের নাম কেউ জানে না আজ; অথচ এই মানুষটি যতদিন কর্মক্ষম ছিলেন সেবা করেছিলেন; তাঁর কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না, কী করে ছাত্রদের ভালো করে পড়াবেন, তাদের বিনোদনপর্বে ভালো ভালো গল্প শোনাবেন—এই ছিল তাঁর ধ্যান জ্ঞান।

তেজেশচন্দ্র সেন আমারই বয়সী ছিলেন, মৃত্যু হয় শান্তিনিকেতনেই। শিশুদের পড়াতে তাঁর পরম আনন্দ ছিল। আমি শিশুদের পড়ানো নিয়ে জীবন আরম্ভ করি শান্তিনিকেতনে; কিন্তু সেখানেই সীমিত থাকি নি। তেজেশচন্দ্র কখনো ধন, মান, খ্যাতির জন্য ছুটে যান নি,—তাঁর বিলাস ছিল শিশুদের শিক্ষাদান ও উদ্যান রচনা। আজ বিশ্বভারতীর উদ্যান রচনায় কত লোক নিত্য কাজ করছে, কত কর্মচারী বিশেষজ্ঞ, একস্পার্ট। কিন্তু তখন ফলবাগান দেখতেন তেজেশচন্দ্র, আর তরকারীর বাগান দেখতেন জগদানন্দ রায়। জগদানন্দবাবুর তরকারী বাগানে স্নানের ফালতু জল, রান্নাঘরের নোংরা জল ব্যবহৃত হয়ে যেতো। তেজেশচন্দ্র তরকারী বাগানের সরকারী মালিকে মাঝে মাঝে ছিনিয়ে এনে ফুলের বাগানে লাগাতেন। তাঁর সৌন্দর্যপ্রিয়তার স্মরণ চিহ্ন রয়ে গেছে মন্দিরের পাশে তালধ্বজা মাটির ঘর টুকুতে। আজ শক্ত জালের বেড়ার আড়ালে সেই ঘরটিতে কি এক আপিস বসেছে।—পথচারী বা আশ্রমবাসীর কেউ জানে না যে সেখানে একদিন তেজেশচন্দ্র একা একা ত্রিশ বৎসর কাটিয়ে দিয়েছিলেন।

সমসাময়িক আর একজনের নাম করবো—শরৎকুমার রায়—বরিশালের লোক। সতীশচন্দ্র রায় বরিশালের লোক ছিলেন বলে কবির ধারণা হয় বরিশালের লোকেরা খুব কাযক্ষম; তাই এক সময়ে বহু শিক্ষক-কর্মচারী এসেছিলেন শান্তিনিকেতনে—শরৎকুমার, বঙ্কিমচন্দ্র রায়, সত্যেশ্বর নাগ, শ্রীশচন্দ্র রায়, বীরেশ্বর নাগ, রাজেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি। শরৎকুমার ছিলেন ব্রজমোহন কলেজের ছাত্র, জগদীশ মুখুজ্যের শিষ্য, সেখান থেকে আদেশ নিয়ে আসেন শান্তিনিকেতনে। শরৎকুমার বাংলা সাহিত্যে তাঁর দান রেখে গেছেন। অসাধারণ পরিশ্রমী লোক ছিলেন। স্কুলে পড়াতেন অঙ্ক, বাংলা, ইতিহাস; বই লেখেন শিখগুরু ও শিখজাতি; শিবাজী ও মারাঠা জাতি এবং আরও কয়েকটি। রবীন্দ্রনাথ ভূমিকা লিখে দেন ইতিহাসের বইতে। এ সব তো একটা দিক।

কিন্তু তাঁর ফালতু কাজ ছিল অনেক। তখন সকলকেই আশ্রমের ফালতু কাজ করতে হতো। বিশেষ করে একটা কথা বলা প্রয়োজন—এসব ফালতু কাজের জন্য ফালতু পয়সা তখন কেউ প্রত্যাশা করতো না। 'ছাত্রদের জন্য

অগস্ত্যের পারণ!
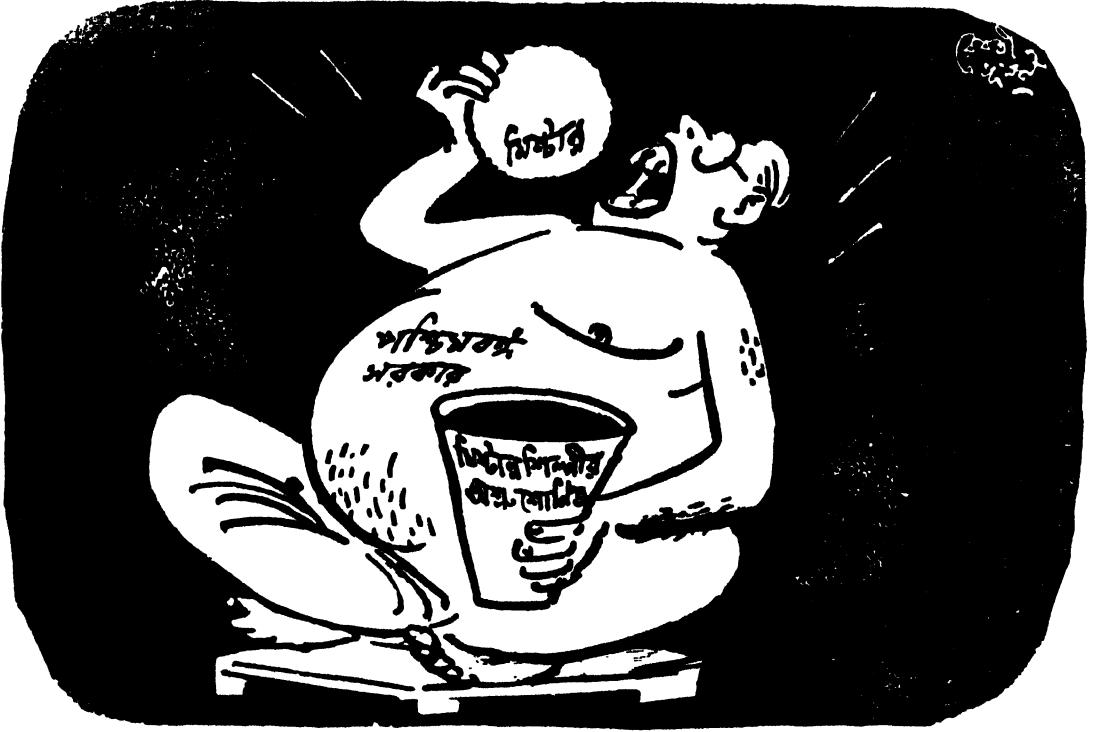
শিল্পী—রেবতীভূষণ ঘোষ

এসেছি, যে-কাজ দরকার করবো।’সে সেবাব্রত ও কর্তব্য বোধ থেকে শরৎ-কুমার অমানুষিক পরিশ্রম করতেন। ভোর রাত্রে উঠে জল তোলাদের ডেকে তুলতেন চৌবাচ্চায় টাটকা জল ভরবার জন্য; রাধুকে ডেকে উনুন ধরাতে বলতেন—ভোরবেলায় গরম লুচি অথবা হালুয়া খাবে ছেলেরা। পেঁড়া কি, বোঁদে আগের রাত্রে তৈরী করিয়ে রাখতেন। শরৎবাবু রান্নাঘরের ‘মেনু’ করতেন, খাবার লাইন দেখতেন—ঠিক সময়ে ছাত্র-শিক্ষকদের হাজির হতে হতো—কঠোর নিয়ম-শৃঙখলা মানাতেন। দশ মিনিট পরে গেটে তালা দিয়ে দিতেন, তারপর কেউ আর ঢুকতে পেতেন না। —কি ছাত্র, কি শিক্ষক। রান্না ঘরের সব হিসাব তিনিই দেখতেন। আজ ভাবি সে-জাতের মানুষ কোথায়?

শান্তিনিকেতন কবির মানস-পুত্র কিন্তু তাকে পুষ্ট করেছে বহুজনে। সেই বহুজনের মধ্যে অনেকেই মৃত্যু যবনিকার অন্তরালে চলে গিয়েছেন; যাঁরা আছেন, তাঁদের অনেকেই স্থবির হয়ে এসেছেন। নূতন যুগ এসেছে। কবিতায় পড়েছিলাম another Athens sha.l arisc, সত্যই নূতন জগৎ চলেছে; এখন এখানে None but the brave deserves the fair.—খাটছে না। এখন মনে পড়ছে সোনার তরীর ভাবটা—জীবন ভোর খেটেছে, ধান কেটে নৌকায় উঠিয়ে দিয়ে যখন ঠাঁই চাইলো—তখন দেখলো

> ‘ঠাঁই নাই,
> ঠাঁই নাই
> ছোট এ তরী।
> আমারই সোনার ধানে
> গিয়েছে ভরি।’

আমার জীবনের সব কিছু দিলাম, কিন্তু মহাকাল নৌকায় স্থান দিল না। মানুষের স্মৃতিপট থেকে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। আজ যে অন্ন মুখে দিলাম, সে যে কে উৎপন্ন করে আমার কাছে পৌঁছে দিয়েছে—তা জানি নে, জানবার কৌতূহল হয় না, কোন কৃতজ্ঞতার কথা মনে উদিত হয় না। কিন্তু আপশোষ করবো না

—মানুষ কি যুগযুগান্তের স্মৃতিভার বহন করে চলতে পারে? আর সেই ভার মনের উপর থাকলে কি আগামীকালকে সমাদর করতে পারে? যাই হোক, যেটা ভুলবার বা যাকে ভুলবার—তা শত মেমোরিয়াল মিটিং করেও টিকিয়ে রাখা যাবে না। কিন্তু সাধারণের মধ্যে ‘অবিস্মরণীয়’ চরিত্র আছে—যাঁদের ভুলে গেলে জীবনে ভুল করা হবে।

[এই প্রবন্ধে জীবিতদের কথা বাদ দিয়েছি। আর কবির বিলাত যাত্রার পরে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের কথাও বলি নি। বারান্তরে প্রয়োজন হলে বলা যাবে যদি সম্পাদকমশায় তাগাদা দেন।]

জসীম উদ্‌দীন

(২)

কলিকাতা আসিয়া গ্রামোফোন কোম্পানীর প্রতিনিধি বন্ধুবর হেমচন্দ্র সোমের সঙ্গে কানাই এবং তার দলের গানের বিষয়ে আলাপ করিলাম। হেমবাবু বলিলেন, "তাদের গান নিজে না শুনিয়া এখন আমি কিছুই বলিতে পারি না। তবে যদি তাদের গান ভাল মনে করি, নিশ্চয়ই রেকর্ড করাইব এবং যথারীতি পারিশ্রমিক তাহারা পাইবে।"

তখন আমি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রামতনু লাহিড়ী সহকারী গবেষক। সামান্য যাহা মাসে মাসে পাই তাহা হইতে কিছু টাকা জমাইয়া কানাই ও তার দলকে কলিকাতা লইয়া আসিলাম। হেমবাবু কানাই এবং তার দলের গান শুনিয়া বলিলেন, "ইহাদের কাহারও গলার স্বর কলিকাতার গায়কদের মত ঘষা মাজা নয়। ইহারা উচ্চ পর্দায় গান গাহে বলিয়া ইহাদের কণ্ঠস্বরের অনেক জায়গা চিরিয়া গিয়াছে। এদের গান রেকর্ড করিলে সেই ক্ষতচিহ্নগুলি আরও প্রকট হইয়া উঠিবে। রেকর্ড বাজারে বিক্রি হইবে না। এদের গানের ভাবালুতা দেখিয়া আপনি মুগ্ধ হইয়াছেন। রেকর্ডের গানে ঘষা-মাজা কণ্ঠস্বর চাই। ভাবালুতার দাম এখানে অল্পই।

হেমবাবুর কথা শুনিয়া আমি ত' আকাশ হইতে পড়িলাম।

মেগাফোন কোম্পানীর জে এন ঘোষের কাছে কানাইদের লইয়া গেলাম। মিঃ ঘোষ হরির গান পছন্দ করিলেন। আরও কয়েকটি রেকর্ডের গানে ইহারা বাজাইবার সুযোগ পাইল। সুতরাং ইহাদের কলিকাতা আসা-যাওয়ার খরচ পোষাইয়া গেল। গ্রামোফোন কোম্পানী হেমবাবুও ইহাদিগকে কয়েকটি রেকর্ডের গান বাজাইবার সুযোগ দিলেন। ইহাদিগকে রেকর্ড বাজাইবার জন্য কত পারিশ্রমিক দেওয়া হইবে না হইবে, তাহা লইয়া গ্রামোফোন কোম্পানীর কর্মকর্তারা ইংরেজীতে আমার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিতেছিলেন। আমি সব সময়ই ইহারা যাহাতে বেশী পারিশ্রমিক পায় সেই চেষ্টা করিতেছিলাম। এই আলাপ-আলোচনা যদি ইহাদের সামনে বাঙলায় হইত তবে ত' কোন কথাই উঠিত না। এই সরল বিশ্বাসী গ্রাম্য লোকদের চিরকালই লোকে ঠকাইয়া আসিয়াছে। তাই ইহাদের মনে সন্দেহ হইল, আমি বুঝি কোম্পানী হইতে বেশী পারিশ্রমিক আদায় করিয়া ইহাদিগকে কম দিতেছি। আমার আড়ালে ইহারা পরস্পর কানাঘুষা করিতে লাগিল। তাহা আমি কিঞ্চিৎ টেরও পাইলাম। আনন্দ ত' আমাকে একদিন বলিয়াই ফেলিল, "আমরা ত' জানিনা আপনি কি দিয়া কি করিতেছেন। আপনি আমাদিগকে ঠকাইবেন না। আপনি ইংরেজীতে কি বলেন, কোম্পানী আমাদের ঠিক পারিশ্রমিক দেয় না।"

আমি আনন্দকে বলিলাম, "আমি সব সময়ই তোমরা যাহাতে বেশী পারিশ্রমিক পাও সেইজন্য কোম্পানীর সঙ্গে ইংরেজীতে কথা কাটাকাটি করি। ঠকাইবার জন্য আমি তোমাদিগকে কলিকাতা ডাকিয়া আনি নাই।"

আমার কথা আনন্দ বিশ্বাস করিল কি না জানি না। ইতিমধ্যে আরও একটি ব্যাপার লইয়া খটকা লাগিল। গ্রামোফোন কোম্পানী হইতে তাহাদিগে একত্রে পারিশ্রমিক দেওয়া হইত এখন ইহাদের মধ্যে সেই সব টাক ভাগ-বাটোয়ারা হইবে কি ভাবে কানাই বলিল, "আনন্দ খোল বাজায়, হরি বাজায় জুড়ি। ইহাদে মধ্যে আমার দোতারা বাদাই প্রধান সুতরাং আমার পারিশ্রমিক বে হইবে।"

আনন্দ বলিল, "কবি সাহেব আমরা যখন গ্রাম-দেশে কোথাও গা বাদ্য করিতে যাই, আমরা যাহা পা সমান ভাগ করিয়া লই। সুতর এখানেও যাহা পাইব সমান ভা করিয়া লইব।"

আমি পড়িলাম মহা সমস্যায় ভে ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলাম, "ইতিপূ গানবাদ্য করিয়া যখন তোমরা সমান ভা লইয়াছ, এখানকার টাকাও তোমর সমান ভাগ করিয়া লও।"

আমার এই মধ্যস্থতা একদেশদর্শ বলিয়া কানাই মনে করিল। ে বড়ই মনঃক্ষুণ্ণ হইল। (এখানে বলিয় রাখি, বর্তমানে ঢাকার গ্রামোফো কোম্পানী বাদ্যকরদিগকে প্রত্যেককে সমান পারিশ্রমিক দিয়া থাকে। তখন বন্ধুবর আব্বাস উদ্দীন সাহেবে সঙ্গে আমার ভাল ভাব চলিতেছিল না আব্বাস উদ্দীনের রেকর্ডে দোতার বাজাইয়া ইতিমধ্যেই কানাই তাহা সঙ্গে পরিচিত হইয়াছিল। আব্বাস কানাইকে বুঝাইল, পারিশ্রমিকে টাকাটা সমান ভাগ করিয়া দিয়া আ কানাইর উপর অবিচার করিয়াছি।

আরও একটি ব্যাপারে কানাই সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হইল আমি প্রচলিত কোন কোন গ্রাম্য গানে প্রথম পদটি লইয়া পরবর্তী পদগুলি নিজে রচনা করিয়া রেকর্ড করাইতেছিলাম

ইহার মধ্যে কানাইর কাছে শোনা, প্রাণ সখিরে। ওই শোন কদম্ব-তলায় বংশী বাজায় কে' গানটিও ছিল। তাহা ছাড়া আমার পূর্ব সংগৃহীত আরও কয়েকটি গ্রাম্য গানকে আমি পরিবর্তিত করিয়া বিভিন্ন কোম্পানীতে রেকর্ড করাইয়াছিলাম। এই গানগুলিতেও কানাই দোতারা বাজাইয়াছিল। তখন কানাইর ধারণা হইল, সেই সব গান ত' তারও জানা। সেই গানগুলির সঙ্গে কয়েকটি নতুন পদ জুড়িয়া দেওয়ার মধ্যে আর বাহাদুরি কিসের? কানাই বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানীতে যাইয়া বলিতে লাগিল, আমার রচিত গ্রাম্য গানগুলি সবই কানাইর নিকট হইতে লওয়া। এ সব গানের মধ্যে আমার কোনই কৃতিত্ব নাই। বন্ধুবর আব্বাস উদ্দীন কানাইর সঙ্গে যোগ দিলেন।

গ্রামোফোন কোম্পানীগুলিতে গান রেকর্ড করাইয়া আমি রয়ালটি পাইতাম। তাহাতে কোন কোন রেকর্ডে আমার দুই-তিন শত টাকার বেশীও প্রাপ্য হইত। কানাই গান শিখাইয়া মাত্র পাঁচ টাকা পারিশ্রমিক পাইত। সুতরাং গ্রামোফোন কোম্পানীগুলি কানাইর গান লইয়া experiment করিতে প্রস্তুত হইল। ইতিমধ্যে বিভিন্ন কোম্পানীতে আমার বহু গান ট্রেনিং দেওয়া ছিল। সেই গানগুলি রেকর্ড করা স্থগিত রহিল।

কানাই আমার মেস হইতে উঠিয়া আব্বাস উদ্দীনের মেসে চলিয়া গেল। আনন্দ আর হরি আমার সঙ্গেই রহিল।

ইহার কিছুদিন পরে ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বাঙলা বিভাগের অধ্যাপক হইয়া আমি ঢাকায় চলিয়া আসিলাম। কানাই যেসব গান রেকর্ড করাইল তাহা তেমন বিক্রী হইল না। কারণ, বহুদিনের অভিজ্ঞতায় আমি জানিতাম, গ্রাম্য কোন্ সুরটি রেকর্ড করাইলে শ্রোতারা খুব পছন্দ করিবে। হয়ত একটি গান পাওয়া গেল তার প্রথম লাইনটি খুব সুন্দর, সুরও হৃদয়গ্রাহী কিন্তু পরবর্তী লাইনগুলি অশ্লীল। আমি সেখানে নতুন পদ জুড়িয়া দিয়া গানটিকে শ্রোতাদের কাছে আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতাম। গুরুবাদে এখন লোক বিশ্বাস করে না। আমি গুরুবাদের গানগুলি রেকর্ড করাইতাম না। কানাই আব্বাস উদ্দীনকে দিয়া কয়েকটি গুরুবাদের গান রেকর্ড করাইয়াছিল। সেগুলি তেমন চলে নাই। এইসব কারণে অল্পদিনেই রেকর্ড কোম্পানী-গুলির ভ্রম ভাঙিল। তাঁহারা আমার গান রেকর্ড করিবার জন্য বিশেষভাবে উৎসুক হইলেন; কিন্তু তখন আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হইয়া কলিকাতা ছাড়িয়া আসিয়াছি। নতুন গান রেকর্ড করাইবার আর আমি বেশী সুযোগ করিতে পারিলাম না।

যদিও কানাই গান রেকর্ড করাই-বার তেমন সুযোগ পাইল না, সে বিভিন্ন গ্রামোফোন কোম্পানীতে গ্রাম্য গানে দোতারা বাজাইয়া বেশ কিছু উপার্জন করিতে লাগিল।

স্বাধীনতার পরে বন্ধুবর আব্বাস উদ্দীন এবং আমি মিঃ বোখারিকে ধরিয়া ঢাকা রেডিওতে কানাইর জন্য একটা চাকরীর ব্যবস্থা করিলাম। কানাই বর্তমানে এখানেই কাজ করিতেছে। তার সেই কণ্ঠস্বর আর নাই। সহরে আসিয়া সে দোতারায় অনেক উচ্চাঙ্গের সুর বাজাইতে অভ্যাস করিয়াছে। কিন্তু সদ্য-গ্রাম হইতে আসিয়া দোতারা বাদ্যে সে যে মধুর গ্রাম্যসুর বাহির করিত এখন আর তাহা শুনিতে পাই না। পাঠক, আমার পরিচালিত 'জলে ঢেউ দিও না' অথবা 'বদল বাঁশী' প্রভৃতি গানের রেকর্ডে কানাই যে অপূর্ব দোতারা বাজাইয়াছিল তাহার সহিত তাহার বর্তমান দোতারা বাদ্যের তুলনা করিলে আমার কথার সত্যতা বুঝিতে পারিবেন। তবু বলিব পূর্ব-পাকিস্তানে কানাই সর্ব-শ্রেষ্ঠ দোতারা বাদক। তাহার দোতারাটি সাধারণ দোতারা হইতে কিছু লম্বা। ইহাতে তারের উপরে সুরের ঢেউ খেলাইতে বেশ সহায়তা করে। চর-ভদ্রাসন নিবাসী গুরুপ্রসাদ সাধুর নিকট কানাই দোতারা বাদ্য শিখিয়াছিল। গুরুপ্রসাদের দোতারাটিও কানাইর দোতারার মত লম্বা ছিল। কিন্তু গুরুর নিকট শিক্ষা করিয়া নিজ অভ্যাস ও অনুশীলনের গুণে কানাই দোতারা বাদ্যে গুরুকে ছাড়াইয়া যায়। ত্রিপুরার আফতাব উদ্দীন ও তাঁহার বংশধরদের দোতারা বাদ্য শুনিবার সুযোগ আমার হইয়াছে। তাঁহারা দোতারাতে নানা তার সংযোজনা করিয়া বিভিন্ন উচ্চাঙ্গের সুরের যে তেলেছমাতি তৈরী করেন কানাই তাহা পারে না; কিন্তু গ্রাম্য সুরের বাজনায় কানাইর হাতে যে ঢেউ খেলিত তাহা কানাইর শিষ্য আনন্দের দোতারা বাদ্য কিছুটা পাওয়া যায়। সঙ্গীত কলার বিচারে ব্যক্তিগত মনো-মালিন্যকে আমি কোনদিনই প্রাধান্য দেই নাই। কানাই আমার প্রতি যেমনই ব্যবহার করুক না কেন একথা আমি উদাত্তকণ্ঠে স্বীকার করি, তাহার মত দোতারাবাদক আমাদের দেশে একজনও নাই। সেবার আমেরিকা হইতে এক-জন যাজবাদক আসিয়াছিলেন। আমে-রিকার কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ যাজবাদক বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। বস্তুত আমেরিকা ছাড়া অন্যান্য দেশে যাজবাদ্য খুব কমই বাজান হয়। সেই হিসাবে কানাইকে আমরা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ দোতারাবাদক বলিতে পারি। কিন্তু আমেরিকার সেই যাজবাদকই তাঁর জীবনে যে স্বীকৃতি পাইয়াছে কানাই কি তাহা পাইয়াছে। কানাই এখন বৃদ্ধ। তার হাতের এই মিষ্টি বুলি হয়ত তার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হইয়া যাইবে। ঢাকায় বুলবুল, নিক্বণ প্রভৃতি কয়েকটি সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এই সব প্রতিষ্ঠান যদি কানাইকে শিক্ষক করিয়া লইতেন তবে সে হয়ত তাহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে তাহার মিষ্টি হাতের কিছুটা চিহ্ন রাখিয়া যাইতে পারিত।

দেশের রুচি বদলাইতেছে। এখনকার শিক্ষার্থীরা দোতারা বাদ্যের চাইতে বিদেশী গীটার বাদ্য শেখার জন্য বেশী আগ্রহশীল। কিন্তু আমাদের দেশী গান বাজাইতে দোতারায় যে

অপূর্ব সুরের ঢেউ খেলান সম্ভব হয় গীটারে তাহা কখনও সম্ভব হয় না। সমস্ত দেশ কাঞ্চন ফেলিয়া কাচ লইয়া বেসাতী করিতে মাতিয়া উঠিয়াছে। কাকে দোষ দিব! মনের দুঃখে শুধু নিজের কপালেই আঘাত করিতে পারি। যা হোক কানাইর সঙ্গে যদিও আমি পূর্ব-হৃদ্যতা রাখিতে পারিলাম না, আনন্দ আর হরির সঙ্গে আমার অন্তরের আত্মীয়তা কোনদিনই ক্ষুণ্ণ হয় নাই। ইহাদের গান শোনা আমার একটি নেশায় পরিণত হইল। ঢাকা হইতে যখনই দেশে গিয়াছি আনন্দ ও হরিকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছি। তাহারা গ্রাম হইতে আরও দুই একজন গায়ক সঙ্গে লইয়া আসিয়া সারারাত্র জাগিয়া আমাকে প্রাণ ভরিয়া গান শুনাইয়া গিয়াছে।

সেবার গান শুনিতে যাইয়া উপস্থিত হইলাম কড়িয়াল গ্রামে হরির বাড়িতে। হরি বড়ই গরীব। জাতি ব্যবসা খেউড়ি করিয়া সে যাহা উপার্জন করে তাহাতে কোনরকমে দিনাতিপাত চলে। একবার মেগাফোন কোম্পানীতে হরির গান রেকর্ড করাইয়াছিলাম। তাহার গান বাজারে চলিল না। আমার কিন্তু হরির গান বড়ই ভাল লাগে। সহরে আসিয়া যাহারা লোকসঙ্গীত গাহে তাহাদের মধ্যে এক মমতাজ আলীর গান ছাড়া আর কাহারও গানে আমি তেমন তৃপ্তি পাই না। গ্রাম্য গায়ক গান গাহিয়া অন্তরের যে স্থানটিতে প্রবেশ করে সহরের গায়ক সেখানে পৌছাতে পারে না। আলী বাবার কাহিনীর চিচিং ফাঁকের মত সহরের গায়কের কণ্ঠে গ্রাম্য সুরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিচ্যুতি ঘটিলেই তাহার গান অন্তরের দরজা খুলিতে পারে না। সাধারণ শ্রোতার কানে এই ভুল ধরা পড়ে না। যাহারা ভাবুক লোক তাহারাই মাত্র ইহা বুঝিতে পারে।

তাই হরির গান আমার খুব ভাল লাগে। সহরে কত যাত্রা থিয়েটার সিনেমার ছড়াছড়ি। কিন্তু সেগুলি শুনিয়া আমার অন্তর ভরে না। তাই আমার বাড়ি হইতে পনেরো ষোল মাইল পথ অতিক্রম করিয়া হরির গান শুনিতে কড়িয়াল আসিলাম। ঘর বলিতে হরির একখানা মাত্র টিনের ছাপড়া, সামনে একটু বারান্দা সেই বারান্দা ঝাড়িয়া পুছিয়া হরি আমার বিছানা পাতিয়া দিল।

আমি হরিকে বলিলাম, "তোমার এখানে ত' আমার জায়গা হইবে না। তোমার পাড়ার যদি আর কারও কাচাড়ি ঘর থাকে সেখানে আমার জায়গা কর।" হরি জোড় হাত করিয়া বলিল, "দাদাবাবু! আপনি যখন গরীবের বাড়িতে পদধূলি দিয়াছেন তখন আমার যা সাধ্য তাই দিয়াই সেবা গ্রহণ করেন। অবশ্য আপনার খুব কষ্ট হইবে। কিন্তু আপনাকে অন্য বাড়ি পাঠাইলে মনে বড় ব্যথা পাইব।"

সুতরাং হরির বাড়িতেই আমাকে আস্তানা গাড়িতে হইল। হরির অল্পবয়স্কা রাঙা টুকটুকে বউটি গলায় আঁচল জড়াইয়া আমাকে প্রণাম করিল। ঘরে ত' কিছুই নাই। সামান্য কয়টি চাউল ভাজিয়া আনিয়া আমার সামনে ধরিল। ওদিকে হরির বিধবা খুড়িমা দুইটি উনানে ডাল-ভাত চড়াইয়া দিল। দুপুরে তৃপ্তির সঙ্গে আহার করিলাম। আহার্য সামগ্রী তুচ্ছ হইলেও এই দরিদ্র পরিবারের আন্তরিকতা এবং হৃদ্যতা দেখিয়া আমার সমস্ত ভরিয়া গেল।

রাত্রে হরির উঠানে গানের আ বসিল। আমার খবর পাইয়া আ তাহার দোতারা লইয়া আসিয়া আর আসিয়াছেন বাণীকণ্ঠ দা ইনি জাতিতে বারুই। কবতিন ক করেন। বৃদ্ধ লোকটি বহুদি অনাহারে কঙ্কালসার। কিন্তু হাড়গোড় সর্বস্ব মানুষটির অন্তর হই যে অপূর্ব সুর সৃষ্টি হয়, তাহার সুর বহুদিন আগেই আমি পাইয়াছিলা আমি তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আলিঙ্গ করিলাম। তারপর সমাদর করি বসাইয়া বলিলাম, "আপনার উ আমার হিংসা হয়। সহরে থাকি রেডিও গ্রামোফোন আর ছাপাখান সাহায্য লইয়া আমি যে সব গান রচ করি তাহা ভদ্র সমাজে আদৃত হ কোন কোন গান গ্রামেও লোকপ্রি হয়। কিন্তু রেডিও গ্রামোফোন ছাপাখানার সাহায্য ব্যতিরেকে আপন গানগুলি বাংলা দেশের যে কোন গ্রা যাইয়া শোনা যায়। আপনার গা গুলি সুরের পাখা মেলিয়া আমাদে গ্রামগুলিতে ঘুড়িয়া বেড়াইতেছে।"

আমার প্রশংসা শুনিয়া বৃদ্ধ লজ্জা মাথা নত করিলেন। হরির আঙ্গিনা গানের জলসা বসিল। আনন্দ এখ আর বাঁশী বাজাইতে পারে না। বয় হইয়া কয়েকটি দাঁত পড়িয়া গিয়াছে তাই বাঁশীর সুর তেমন করিয়া বাজাইতে পারে না। সে আজ দোতারা লইয় বসিয়াছে। কানাইর মত তালে মা তত কৌশলী না হইলেও তাহার বাদে গ্রাম্য সুরের ঢেউগুলি বড়ই সুন্দর রূপ পায়। [ক্রমশ

গায়ত্রী পাহাড়ে

মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

গায়ত্রী পাহাড়ে যাই—ছুটে যাই পশ্চিমে এখন
পারিজাত পুষ্প নিয়ে কে দাঁড়ায় অমল সুন্দর
শোভনা ইচ্ছায় বলে—বোসো তুমি এই বীথিকাতে
পুষ্করের শুভ্র হ্রদে দেখো তুমি গায়ত্রীর মন।

শতাব্দীর অবিশ্বাস—অন্ধকার—আমি প্রেমহীন
বিবর্ণ অসুখ মনে—অথচ পবিত্র হতে চাই—
হ্রদের শীতলে নামি—হাসি আমি ভোরের আলোতে
তারপর পুষ্করের গায়ত্রী পাহাড়ে উঠে যাই।

চন্দেল্ল স্মৃতি ॥

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

॥ তেরো ॥

লোকের মুখে মুখে ডাকনাম হয়েছে খাজুরাহো। আসল নাম খর্জুরবাহক। শিলালিপিতে এই খর্জুরবাহক নামটি পাওয়া গেছে। নগরীর মহাদ্বারের দু' পাশে দুটি সোনার খেজুর গাছ এককালে শোভা পেত। খেজুর গাছ ছিল এই নগরীর প্রতীক। হয়তো সে সময় বহু খেজুর গাছ ছিল এ অঞ্চলে। এখন কোনো খেজুর গাছেরই সন্ধান নেই।

পশ্চিম মন্দির গোষ্ঠীর বাঁ দিকে আছে মিউজিয়াম। রাস্তার উপরেই তার প্রবেশদ্বার। মাটিতে খসে-পড়া মূর্তি সাজিয়ে প্যানেল জুড়ে মিউজিয়ামের সুন্দর গেটটি তৈরি হয়েছে। দু' পাশে জোড়া জোড়া মূর্তি, সুরসুন্দরী মূর্তি, দেবমূর্তি, মিথুন মূর্তি। মিউজিয়ামটি পাঁচিল ঘেরা খোলা চত্বর, খাজুরাহোর নানা মন্দির থেকে খসে-পড়া ভাস্কর্য-নিদর্শনগুলি এখানে সংরক্ষিত।

১৯১০ সালে মিউজিয়ামটির স্থাপনা হয়। তখন বুন্দেলখণ্ডের পোলিটিক্যাল এজেন্ট ছিলেন জার্ডিন নামে এক ইংরেজ। তারই নামে মিউজিয়ামটির নাম জার্ডিন মিউজিয়াম।

এদিন সকালবেলা বেশ ভিড়। স্পেশাল বাসে করে দুটি বড়ো দল এসেছে পান্না থেকে। কয়েক ঘণ্টা থাকবে, মোটামুটি দেখে বিকেল বেলাই ফিরে যাবে। চায়ের দোকানে, মন্দির দ্বারে মিউজিয়ামে জমায়েত মন্দ নয়। পুরাতত্ত্ব বিভাগের ছাপা ছবি ও পরিচয়-পুস্তিকা বেশ বিক্রী হচ্ছে।

মিউজিয়ামের মধ্যে সংগৃহীত মূর্তিগুলি ঘুরে ঘুরে দেখছি। মিউজিয়ামই খাজুরাহোর সম্বল নয়। এমন মন্দির যেখানে বর্তমান, সেখানে মিউজিয়ামের সংগ্রহ না দেখলেও কিছু এসে যায় না। তবে যেসব মূর্তি হারিয়ে যেত, চুরি হয়ে যেত, সেগুলিকে সুষ্ঠু পাহারার মধ্যে একত্র জড়ো করে রাখাও দরকার। সেই জন্যেই এই মিউজিয়াম।

তবে এই সংগ্রহশালার একটি নিদর্শন দেখে খাজুরাহোর শিল্প-সৃষ্টির পরিপূর্ণতা উপলব্ধি করা গেল। খাজুরাহোর শিল্পী শুধু নরনারীর মিথুনমূর্তি আঁকে নি—সন্তান ও মাতার মূর্তিও গড়েছে। একটি আশ্চর্য মাতৃমূর্তি জার্ডিন মিউজিয়াম আলো করে রয়েছে। আদিরসের সাগরে বাৎসল্য রসের অমৃতভরা শতদলের মতো মূর্তিটি ফুটে আছে।

মমতাময়ী জননী ও সন্তান। পালংকের উপর জননী ডানপাশ ফিরে শুয়ে আছেন। উপাধানের উপর শিথিল কবরী। ডান হাতটিতে মাথা রেখে বুকের নিচে শুয়ে আছে সুকুমার দর্শন তাঁর শিশুটি। বাঁ হাত দিয়ে তার কোমর জড়িয়ে তিনি তাকে আদর করছেন, মাতৃবক্ষ দুটি অমৃত রসভারে টলটল করছে। দক্ষিণ চুচুকে ঠোঁট লাগিয়ে সন্তান পরম হর্ষে স্তন্যপান করছে। সার্থক নারী নিমীলিত দু' চোখ ভরে তাঁর সন্তানকে দেখছেন।

এমন বাস্তব ও পরমাশ্চর্য মাতৃমূর্তি কোথাও দেখা যায় না। ক্লোদ ও ক্লেয়ার-দম্পতিকে কাছে ডেকে আনলাম। তাঁরা আনন্দ বিস্মিত চোখে সেই মূর্তি দেখলেন।

সৃষ্টির আর এক লীলা। পরম লীলা। এই লীলাকে খাজুরাহোর শিল্পী যে অনুপম মাধুর্য দিয়ে প্রকাশ করেছে, তেমন ভাবে আর কেউ তা করতে পেরেছে বলে জানি নে। নারীর পয়োধর পুরুষকে মাতাল করে আর সেই পয়োধরই সৃষ্টিকে পালন করে, বিচিত্রময়ী প্রকৃতির এই অনির্বচনীয় পরিপূর্ণতা দেখে আমি ধন্য হলাম।

প্রৌঢ়া মিসেস ক্লেয়ার মূর্তিটির সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন। তাঁর দুচোখ জলে ভরে গেল।

এ পথে কোনো ভিড় নেই, কদাচিৎ কোনো পর্যটক এই পথে পা মাড়ায়। আমি চলেছি একলা, পশ্চিম মন্দির গোষ্ঠীকে পিছনে রেখে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে। এদিকটা গ্রাম নেই, ক্ষেত্র নাই, জনবিরল এবড়ো-খেবড়ো তৃণভূমি। খাজুরাহোর খর্জুর বীথির চিহ্নমাত্র নেই, শীর্ণ পায়ে চলার পথ, মাঝে মাঝে কয়েকটা ঝাঁকড়া কাঁটা-বাবলা গাছ।

ক্লেয়ার-দম্পতি গিয়েছেন জৈন মন্দিরগুলি দেখতে,—ক্লোদ গেছে তাদের সঙ্গে। আমি

● মিথুনাসন

যা দেখতে চলেছি তাতে কোনোর উৎসাহের কোনো কারণ নেই। তার হাতে সময় অল্প, দ্বিতীয়বার হয়তো খাজুরাহো দেখতে জীবনে আসবে না। পার্শ্বনাথ মন্দির আবার সে দেখুক, তারপর বাকি দিনটা একলা একলা ফাটাক কাণ্ডারিয়া, জগদম্বা, চিত্রগুপ্ত আর লক্ষ্মণ মন্দিরের পাশে পাশে ঘুরে ঘুরে।

শিবসাগরকে পাশে রেখে আমি এগোলাম। ডানদিকে কাণ্ডারিয়া মহাদেব মন্দিরের চূড়া। পশ্চিম মন্দির গোষ্ঠির ঘেরা এলাকার মধ্যে। সেই এলাকার বাইরে বাইরে আমি চলেছি। খাজুরাহোর প্রাচীনতম মন্দিব চৌষট্টি-যোগিনীব অভিমুখে।

ভিড়াঘাট-জব্বলপুরের ক্ষণসঙ্গিনী সরযূর কথা মনে পড়ছে। মধ্যপ্রদেশ ভ্রমণে এসে এই খাজুরাহোর কথা প্রথম হয়েছিল সরযূর সঙ্গে। ভিড়াঘাটে, চৌষট্টি-যোগিনীর মন্দিরে। সে মন্দিব নির্মাণ করেছিলেন চেদী-কলচুরি রাজারা—খাজুরাহোর এই চৌষট্টি-যোগিনী মন্দির চন্দেল্লদের।

সে মন্দিরের মতো এ মন্দিরও আকাশের নিচে উন্মুক্ত চত্বর। চত্বরের ভিতর দিকে দেয়ালের গায়ে গায়ে চৌষট্টিটি ছোট ছোট খুপরি। প্রত্যেকটি খুপরির মাথায় পিরামিডের মতো ছাদ, প্রতিটি খুপরিব মধ্যে একদা এক একটি যোগিনীব মূর্তি বসানো ছিল।

ভিড়াঘাটেব চৌষট্টি যোগিনীর চত্বর গোলাকার, এখানকার চত্বর একটি আয়তক্ষেত্র, কিঞ্চিদধিক একশো ফুট লম্বা ও ষাট ফুট চওড়া। মাটি থেকে প্রায় পঁচিশ ফুট উঁচুতে এই আয়তক্ষেত্রটি প্রতিষ্ঠিত। এক একটি যোগিনী গুহা তিন ফুট গভীর, আড়াই ফুট চওড়া ও তিন ফুট উঁচু। মাত্র দুটি গুহায় যোগিনী মূর্তি আছে, অন্য গুহাগুলি ফাঁকা।

খাজুরাহোর অন্য মন্দিরগুলির সঙ্গে চৌষট্টি যোগিনীর তুলনা করাচলে না। প্রথমত, এ-মন্দির চূড়াহীন, ছাদহীন। দ্বিতীয়ত, খাজুরাহোর অন্য সব মন্দির যে পাথর দিয়ে তৈরী,—এ-মন্দির সে পাথর দিয়ে তৈরি নয়। খাজুরাহোর অন্য সব মন্দির বাদামী বালি পাথরের। পুরোপুরি কষ্টিপাথর দিয়ে চৌষট্টি-যোগিনীর নির্মাণ। পণ্ডিতরা অনুমান করেন,—এই মন্দির খাজুরাহোর প্রাচীনতম স্থাপত্য-নিদর্শন। অষ্টম কি নবম শতাব্দীতে এই মন্দির নির্মিত হয়েছিল। মনে হয় চত্বরের মাঝখানে তখন শিব বা শক্তির আসন ছিল যার চারধারে চৌষট্টি-যোগিনী আসন নিয়েছিলেন।

মহাদেবীর চণ্ড সহচরী চৌষট্টি-যোগিনী। এই মহাশক্তি মহামাতৃকা, তিনি যখন অসুর দলন করেন তখন এই যোগিনীরা তাঁর সঙ্গিনী হন। চন্দেল্লদের আদি অধিষ্ঠাত্রী মনিয়া দেবী এই মাতৃকা ভাবনায় বিলীন হয়েছেন। চন্দেল্লরা শিবভক্ত ছিলেন। এই শক্তি শিবজায়া। চন্দেল্ল লিপিতে এই দেবী মহেশ্বরী, ভবানী, গিরিজা, পার্বতী, কালী, ভারতী, মহিষাসুরমর্দিনী প্রভৃতি নানা নামে বিভূষিতা। চন্দেল্লরা চামুণ্ডা প্রভৃতি সপ্তমাতৃকা ও অষ্ট শক্তিরও আরাধনা করতেন। চন্দেল্ল লিপিতে শিবও বহু নামে উল্লিখিত, যেমন, রুদ্র, শম্ভু, মহেশ্বর, বিশ্বেশ্বর, মরকতেশ্বর, চন্দ্রমৌলি, ইন্দ্রমৌলি, পঞ্চানন, ত্র্যম্বক ইত্যাদি। আদি চন্দেল্ল মধ্যভারতের আদিবাসী নায়ক ছিলেন। শিবশক্তির প্রসাদেই তাঁরা রাজগোঁড়দের মতো আর্য মাহাত্ম্য লাভ করেন। রাজশক্তি যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হল তখন চন্দেল্ল ধর্মে পুরাণের পরম দেবতা বিষ্ণু আসন পাতলেন।

খাজুরাহোর মন্দিরে কয়েকটি বিচিত্র লিঙ্গ বন্ধনের মূর্তি আছে। প্রধান মন্দির কাণ্ডারিয়া মহাদেবের বহির্গাত্রে এমনি ক' মূর্তি সহজেই চোখে পড়ে। নরনারী স্বাভাবিক দেহালিঙ্গনের চিত্র এগুলি নয় অস্বাভাবিক মিথুন-আসন, সেগুলিকে আমাদে চোখে অত্যন্ত বীভৎস ও অশ্লীল লাগে এইগুলির জন্যে খাজুরাহোর ভাস্কর্য অনে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে।

এই সমস্ত মিথুনাসন যখন মন্দির গাে স্থাপিত হয়েছিল, তখন নিশ্চয়ই এগুলি কেউ অশ্লীল বা বীভৎস বলে মনে করে নি কোনো ভক্ত কোনো যাত্রী কোনো পূজার্থ এগুলিকে দেখে শিউরে ওঠে নি। নিষ্পা নিষ্কলঙ্ক দৃষ্টিতে এগুলির দিকে তাকিয়েছিল এই সমস্ত তথাকথিত বীভৎস দৃশ্য তাদে দেবদর্শনে কোনো বাধা সৃষ্টি করেনি।

একটি প্রধান আসন মূর্তির বর্ণনা দিই

● মিথুনাসন

ধ্যানের দিকে মুখ করে পুরুষ দীর্ঘাসনে সমাহিত। পরম যোগীর মুখভাব। দৈহিক বাসনা-কামনার চিহ্নমাত্র সেই সমাধিস্থ মুখে নেই। নিমীলিত চক্ষু, ভাবগম্ভীর মুখে পূর্ণানন্দের মৃদুহাসি। তাঁর উৎক্ষিপ্ত ক্রোড়দেশে বিপরীত দিকে মুখ করে প্রকৃতি উপবিষ্ট। দু' পাশে দুই যোগ-সহচরীর গলা তিনি জড়িয়ে আছেন। সহচরীরা তাঁর উরুদ্বয়কে রক্ষা করছে। ঘন-সন্নিকৃষ্ট পুরুষ-প্রকৃতির লিঙ্গযোগী।

আর একটি আসন। দণ্ডায়মান পুরুষ। দুই হাতে তাঁর কণ্ঠলগ্ন হয়ে দুই উরু দ্বারা তাঁর কটিদেশ আকর্ষণ করে তাঁর বক্ষোদেশে প্রকৃতি সংশ্লিষ্ট—উভয়ের মুখে বাসনা কামনাহীন তাপস-তপস্বিনীর ভাবগম্ভীর অভিব্যক্তি।

আপাতদৃষ্টিতে ভঙ্গিগুলি অশ্লীল। কিন্তু মুখমণ্ডলে কোথাও অশ্লীলতার আভাসটুকু নেই। যোগী-যোগিনী যেন সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতাকে পরিহার করে নিশ্চল গম্ভীর তপস্যায় নিরত রয়েছেন। পুরুষ-প্রকৃতি মিলনের প্রস্তরীভূত ধ্যানরূপ যেন।

কাম-বীভৎসতার প্রচারের জন্যে খাজুরাহোর মহান শিল্পীরা এইসব মূর্তি গঠন করেন নি। নরনারীর লৌকিক মিলনের অতীন্দ্রিয় যোগরূপকে তাঁরা এইসব বিচিত্র আসন মূর্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন। শিবশক্তির প্রতীক রূপ লিঙ্গযোনি। শিবশক্তির প্রকটরূপ এইসব আসন মূর্তি।

শিব তন্ত্র মহাদেব। তিনি পরম যোগী। শক্তির সঙ্গে তিন যোগাসনে মিলিত। সেই মিলনেরই মূর্তি। অনেকে বলেন, সে যুগের গোপন কৌল-কাপালিক প্রক্রিয়ার চিত্র এগুলি। শিবভক্তি ও তন্ত্রসাধনা সৃষ্টি করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। তন্ত্র নিম্নগামী হয়ে হিন্দুবৌদ্ধ উভয় সম্প্রদায়ের সাধককেই ভ্রষ্টাচারের পথ দেখিয়েছিল। চন্দেল্লদের রাজকবি ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র। তিনি প্রবোধ চন্দ্রোদয় নামক এক রূপক নাট্য রচনা করেন। বৌদ্ধ-জৈন ও কাপালিক সাধুরা কীরূপ ভ্রষ্টাচার ছিল, তা তিনি এই নাটকে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু সেই ধিক্কৃত ভ্রষ্টাচারকে জনসমক্ষে প্রচার করবার জন্যে খাজুরাহোর সার্থক শিল্পীরা দেবমন্দিরের উদার গাত্রকে ব্যবহার করেন নি, তা নিশ্চয়।

খাজুরাহোতে অসংখ্য মিথুনমূর্তি আছে। কিন্তু কোনো মূর্তির মুখভাবে জান্তব লালসার চিহ্নমাত্র নেই। খাজুরাহোর শিল্পী ঘোষণা করেছে পুরুষ-প্রকৃতির মিলন সৃষ্টির চিরন্তন আনন্দলীলা। এই লীলা-সমুদ্রের চঞ্চলতা যেখানে স্তব্ধ,—সেখানে মিথুন ভোগোত্তীর্ণ যোগের পরম সাধনা।

চন্দেল্ল-স্মৃতির প্রাচীনতম নিদর্শন চৌষট্টি-যোগিনী থেকে পায়ে পায়ে ফিরে আসছিলাম। দু'ধারে শস্যহীন অনুর্বর মাঠ, মাঝখানে রুক্ষ কঠিন পায়ে চলার পথ। বর্তমান খাজুরাহো এক অত্যন্ত শ্রীহীন দরিদ্র গ্রাম। দীনতম কৃষক ও ক্ষেত-মজুরের বাস। মুষ্টিমেয় অধিবাসী, অর্ধভগ্ন তাদের চালাঘর। শিক্ষা নেই, অর্থ নেই, স্বাস্থ্য নেই। সম্পন্নতার কণামাত্র উপচার নেই। আছে ক'টি আধভাঙা প্রাচীন মন্দির, হাজার বছরের পুরাণো।

হাজার বছর আগে এই খাজুরাহো ছিল চন্দেল্ল গরিমার উজ্জ্বল ভাতি। সেই গরিমা-সূর্য কবে অস্তমিত হোলো? শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিস্মৃত ইতিহাসের অন্ধকারে কেমন করে মুখ লুকিয়ে রইল খাজুরাহো?

ত্রয়োদশ শতাব্দীর সূচনাতে চন্দেল্ল শক্তির মাথায় কালোছায়া ঘনিয়ে এল। চন্দেল্ল বংশের ভাগ্যাহত রাজা পরমার্দিদেব মারা গেলেন, চন্দেল্লদের দুর্গনগরী কালঞ্জর মুসলমানদের অধিকারে এল। সমসাময়িক মুসলমান লেখক হাসান নিজামী লিখছেন,—কালঞ্জরের বিধর্মীদের মন্দিরগুলি চূর্ণ করা হোলো, পৌত্তলিকতাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হোলো, কালঞ্জর জয় করার পর কুতবুদ্দিন চন্দেল্ল রাজধানী মহোবা জয় করলেন।

কালঞ্জর ইতিহাস-বিখ্যাত স্থান, পুরাণ-প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। মহাভারতের বনপর্বে কালঞ্জরের উল্লেখ আছে, পদ্মপুরাণ শিবপুরাণ প্রভৃতি বিভিন্ন পুরাণেও কালঞ্জরের নাম। কালঞ্জর অতি প্রাচীন শৈবতীর্থ, এখানে নীলকণ্ঠেশ্বর মহাদেব আসীন।

চন্দেল্লরা গুর্জর প্রতিহারদের সামন্ত নায়ক ছিলেন। কালঞ্জর দুর্গজয়ের সঙ্গে তাঁদের সার্বভৌমত্বের সূচনা। কালঞ্জরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সৌভাগ্য-রবির অস্তাচলযাত্রা।

পরমার্দিদেবের পরবর্তী রাজা ত্রৈলোক্য বর্মণের কালে নির্বাপিতপ্রায় প্রদীপ আবার জ্বলজ্বল করে উঠেছিল। কুতবুদ্দিনের নিয়োজিত শাসনকর্তার হাত থেকে ত্রৈলোক্য বর্মণ কালঞ্জর দুর্গ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। মুসলমান অভিযাত্রীরা মহোৎসব নগরী মহোবাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছিল। সেই হতশ্রী মহোবাকে আবার তিনি অধিকার করতে পেরেছিলেন। সমসাময়িক কলচুরি রাজকে পরাজিত করে তিনি পূর্বাঞ্চলে কিছুটা রাজ্য বিস্তারও করেছিলেন। প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেছিলেন ত্রৈলোক্য বর্মণ।

ত্রৈলোক্য বর্মণের পর ছত্রিশ বছর ধরে রাজত্ব করেছিলেন বীর বর্মণ। বীর বর্মণের পর ভোজ বর্মণের সংক্ষিপ্ত কাল। তারপর চন্দেল্ল বংশের শেষ রাজা হাম্মীর বর্মণ। হাম্মীর বর্মণের রাজত্বকাল বাইশ বৎসর।

পরমার্দিদেবের মৃত্যু থেকে হাম্মীর বর্মণের রাজত্বের অবসান এক শতাব্দীর কিছু অধিককাল। এই একশো বছরে ভারতে সুলতানী সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হোলো। এই ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন কুতবুদ্দিন। তিনি মহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস, ভারতে তুর্কী দাসবংশের প্রতিষ্ঠাতা। পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের কয়েক বৎসরের মধ্যে সারা উত্তর ভারতের অধিকাংশ মুসলমানদের কুক্ষিগত হোলো। পৃথ্বীরাজের দিল্লী হোলো তুর্কী সাম্রাজ্যের রাজধানী। জয়চাঁদের রাজধানী কনৌজ ধ্বংস হোলো। পশ্চিমে চালুক্য-রাজধানী অনহিলবাড়া, পূর্বে বারাণসী আর দক্ষিণে মহোবা ও কালঞ্জর লুণ্ঠন করলেন কুতবুদ্দিন। এদিকে বাংলা-বিহার জয় করলেন বক্তিয়ার খিলজী, প্রাচ্য ভূখণ্ডের শ্রেষ্ঠ বিশ্ব-বিদ্যালয় নালন্দা তিনি নির্মমভাবে ধ্বংস করলেন। কুতবুদ্দিনের পরবর্তী সম্রাট ইলতুৎমিস মালব আক্রমণ করলেন ও পুরাণ-প্রসিদ্ধ উজ্জয়িনী নগরী অধিকার করে মহাকাল মন্দির ভূলুণ্ঠিত করলেন।

কুতবুদ্দিনের হাতে পরমার্দিদেবের পরাজয়ের পর থেকেই চন্দেল্ল রাজ্যের কালমেঘ ঘনিয়ে এসেছিল। ত্রৈলোক্য বর্মণ কালঞ্জর পুনরাধিকার করলেও মহোবা রাজ্যভ্রষ্ট হয়েছিল। ত্রৈলোক্য বর্মণ ও তাঁর পরবর্তী রাজারা সম্ভবত অজয়গড়কে তাঁদের নূতন রাজধানী করেছিলেন। উত্তর-পশ্চিম দিকে তুর্কী শক্তি তখন পাকা হয়ে বসেছে, তাই ত্রৈলোক্য বর্মন পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন, কলচুরিদের সঙ্গে যুদ্ধ করে সেই রাজ্যের কিছুটা অংশ নিজের রাজ্যের অঙ্গীভূত করেছিলেন।

খিলজী বংশীয় সম্রাট আলাউদ্দিন ও হাম্মীর বর্মণ সমসাময়িক। এই সময় সমস্ত উত্তর ভারত মুসলমান কবলিত হোলো। আলাউদ্দিন গুজরাট রাজপুতনা ও মালব গ্রাস করলেন, তারপর বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে মুসলমান শক্তি দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হোলো।

উত্তর ভারতের হিন্দু শাসনের এই পূর্ণগ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে চন্দেল্ল শক্তিরও অবসান। চন্দেল্ল রাজবংশের ইতিহাসের প্রধান উপাদান বিভিন্ন শিলালেখ। হাম্মীর বর্মণের পর শিলালিপি খুঁজে আর কোনো উল্লেখযোগ্য চন্দেল্ল রাজার নাম পাওয়া যায় নি।

চারদিক ঘিরে মুসলমান সাম্রাজ্য,—তার মাঝখানে চন্দেল্ল রাজ্যের আয়তন ক্রমেই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে এসেছিল। তবে মনে হয়, চন্দেল্লশক্তির হৃতবল উত্তরাধিকারীরা কালঞ্জর আর অজয়গড়ের আশপাশের অঞ্চল নিয়ে আরো প্রায় তিন শতাব্দী টিম টিম করে জ্বলেছিলেন। কেন না ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত মুসলমানরা কালঞ্জর দুর্গ অধিকার করেছিল বলে জানা যায় নি। গড়হা-মান্দলার বীর রাণী দুর্গাবতী যিনি সম্রাট আকবরের সঙ্গে যুদ্ধ করে

● [illegible] মা ও শিশু

রণক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করেছিলেন,—তিনি ছিলেন চন্দেল্ল রাজকুমারী।

১৫৪৫ সালে শেরশাহ কালঞ্জর দুর্গ আক্রমণ করেন ও এই আক্রমণের সময় তাঁর মৃত্যু হয়। কালঞ্জরের অধিপতি ১৫৬৯ সালে সম্রাট আকবরের আনুগত্য স্বীকার করেন।

চন্দেল্লদের ইতিহাস পাঁচ-ছ'শো বছরের ইতিহাস। এই বংশে বহু কীর্তিমান পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছেন। চন্দেল্ল রাজারা বীর ছিলেন, কূটনীতিক ছিলেন। সুশাসক ছিলেন। জাতিধর্মনিবিশেষে প্রজাপালনে তৎপর ছিলেন। যথারীতি পার্শ্ববর্তী হিন্দুরাজাগুলির সঙ্গে তাঁরা কখনো মিত্রতা, কখনো শত্রুতা করেছিলেন, যুদ্ধে কখনো জিতেছিলেন, কখনো হেরেছিলেন, ফলে তাঁদের রাজ্যসীমা কখনো বেড়েছিল, কখনো কমেছিল।

মুসলমান অভিযানের বিরুদ্ধে হিন্দু রাজারা এক হতে পারেন নি। নিজেদের মধ্যে

হিংসা ও হানাহানি, একের প্রতি অপরের বিশ্বাসঘাতকতাই ছিল বিদেশী আক্রমণের মুখে মধ্যযুগের হিন্দু রাজাদের পরম দুর্বলতা। এই দুর্বলতা চন্দেল্ল রাজাদেরও ছিল। এই দুর্বলতার জন্যেই হিন্দু রাজ্যগুলি একে একে তুর্কী-কবলিত হয়েছিল,—বা তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীনতা স্বীকার করে ক্ষীণশক্তি বশংবদ সামন্ত কর্তৃত্ব নিয়ে নিজেদের ম্লান অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। চন্দেল্লদেব ভাগ্যেও অন্যরূপ ঘটেনি।

মধ্যভারতের এই চন্দেল্ল রাজ্যের চেয়ে আয়তনে, সম্পদে ও শক্তিতে অনেক বড়ো বড়ো রাজ্য তখন ছিল। গুজরাটে চালুক্য রাজ্য, আজমীর-দিল্লীতে চৌহান রাজ্য, কাশী-কনৌজে গাহড়বাল রাজ্য, মালবে পরমার রাজ্য, দাহলে চেদীরাজ্য, পূর্বভারতে পাল ও সেনরাজ্য। চন্দেল্ল রাজ্যের ইতিহাস নিয়ে কোনো পণ্ডিত কোনো ঐতিহাসিক মাথা ঘামাতেন বলে মনে হয় না,—যদি খাজুরাহো না থাকত,—যদি খাজুরাহোর ভুবনমোহন মন্দিরগুলি না থাকত।

পরধর্মবিদ্বেষী মন্দিরধ্বংসী মুসলমানদের পাঁচশো বছরের অধিকারের মধ্যে খাজুরাহোর মন্দিরগুলি কী করে টিঁকে রইল একথা ভাবতে আশ্চর্য লাগে। দেবমন্দির ধ্বংস ও লুণ্ঠন করা তুর্কী ও মোগল সম্রাটরা ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কর্তব্য বলে মনে করতেন। একমাত্র মোগল সম্রাট আকবর ছাড়া কোনো সম্রাটই বোধহয় এই পুণ্য কর্মকে বাদ দেননি।

ভারতে প্রথম মুসলমান অভিযাত্রী গজনীর সুলতান মামুদ। প্রবাদ যে, তিনি সতেরো বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি থানেশ্বর, মথুরা, কনৌজ, সোমনাথ প্রভৃতি বিখ্যাত হিন্দুতীর্থ লুণ্ঠন করেন ও মন্দির ধ্বংস করেন। ১০২২ সালে তিনি কালঞ্জর দুর্গ আক্রমণ করেন। মামুদের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসেন মহাপণ্ডিত আবু রিহান আলবিরুনী। সুলতান মামুদের চন্দেল্ল রাজ্য আক্রমণের সময় আলবিরুনী সম্ভবত তাঁর সঙ্গে ছিলেন। আলবিরুনী তাঁর গ্রন্থে খাজুরাহোর বিবরণ দিয়েছেন। সোমনাথ বিধ্বংসী মামুদ এতো কাছাকাছি এসেও খাজুরাহোর মন্দির পর্যন্ত পৌঁছন নি।

সুলতান মামুদ ভারতে স্থায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চান নি। পৌনে দুশো বছর পরে সেই উদ্দেশ্য নিয়ে ভারত-অভিযান করলেন মহম্মদ ঘোরী। তাঁর সেনাপতি কুতুবুদ্দিন চন্দেল্ল রাজ্য আক্রমণ করলেন। কালঞ্জর তিনি জয় করলেন,—মহোবার বহু হিন্দুকীর্তি তিনি ধ্বংস করলেন। কিন্তু মাত্র কয়েক মাইল দূরের খাজুরাহোর মন্দিরগুলি অব্যাহতি পেল। আলাউদ্দিন খিলজি মালব, গুজরাট, রাজপুতানা ও দেবগিরি আক্রমণ করেন,—কিন্তু এই ক্ষুদ্র চন্দেল্ল রাজ্য ও তার মন্দির-নগরী খাজুরাহো তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নি।

মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকালে আফ্রিকা মহাদেশের মরক্কো অধিবাসী বিখ্যাত পর্যটক ইবন বতুতা ভারত ভ্রমণে আসেন। তিনি তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে খাজুরাহোর কথা লিখেছেন। খাজুরাহোর বিশাল সরোবর ও হিন্দু মন্দিরের কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। মহম্মদ-বিন তুঘলক ভারতবর্ষকে ভালোভাবে জানতেন। তিনি হিসাব করে বার করেছিলেন যে, দেবগিরি তাঁর সাম্রাজ্যের ঠিক কেন্দ্রে অবস্থিত,—তাই দেবগিরিতে তিনি সাময়িকভাবে তাঁর রাজধানী সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু খাজুরাহোর প্রতি তাঁর নজর পড়ে নি।

হুমায়ুনের সঙ্গে যুদ্ধের সময় শেরশাহ বারাণসী-কনৌজ অঞ্চল নিষ্ঠুরভাবে লুঠ করেন। গোয়ালিয়র, রণথম্ভর, রাইসিন প্রভৃতি দুর্ভেদ্য দুর্গ তিনি জয় করেন। কিন্তু কালঞ্জরে তাঁর কাল হলো। খাজুরাহো তাঁর চোখে পড়ল না।

সম্রাট আকবরের মৃত্যুর পর হিন্দু বিদ্বেষের দাবাগ্নিকে নতুন করে প্রজ্বলিত করেন আওরংজেব। হিন্দু প্রজাদের উৎপীড়ন করা ও হিন্দু দেবমন্দির ধ্বংস করা আওরংজেবের রাজনীতি ও ধর্মনীতির প্রধান অঙ্গ। সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সমস্ত বিখ্যাত হিন্দুতীর্থ ও হিন্দু মন্দির তাঁর আদেশে কলুষিত ও বিধ্বস্ত হয়েছিল। আওরংজেবের রাজত্বকালে মুঘল-শাসনের নাগপাশ ছিন্নভিন্ন করার দীর্ঘ চেষ্টা করেন বুন্দেলা নেতা চম্পক রায় ও তাঁর পুত্র ছত্রশাল। এই খাজুরাহোর আশেপাশে আওরংজেবের বাহিনীর সঙ্গে ছত্রশালের বহু যুদ্ধ হয়েছিল। আওরংজেবের মৃত্যুর পর ছত্রশাল স্বাধীন বুন্দেলা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু

এতো যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যেও আওরংজেব ও তাঁর সেনাপতিরা খাজুরাহোর মন্দিরের সন্ধান পান নি।

আর্যাবর্তের প্রায় সমস্ত প্রধান মন্দির যখন মুসলমান যুগে ধ্বংস হয়েছে, তখন খাজুরাহোর মন্দিরগুলির অব্যাহতিলাভের জন্যে ভাগ্যের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার সীমা নেই। চন্দেল্লদের প্রথম যুগে খাজুরাহো রাজধানী ছিল। পরে রাজধানী মহোবায় স্থানান্তরিত হয় ও খাজুরাহোর রাজনৈতিক গুরুত্ব চলে যায়। সুলতান মামুদের আক্রমণের পরে আর কোনো বিশিষ্ট মন্দির খাজুরাহোতে নির্মিত হয় নি। চন্দেল্ল বংশের যেসব শিলালিপি খাজুরাহোতে পাওয়া গেছে তাও, এই প্রাক্ মুসলিম যুগের রাজাদের। পরমার্দিদেব ও তাঁর পরবর্তী রাজাদের অনেকগুলি শিলালিপি মহোবায় কালঞ্জরে ও বুন্দেলখণ্ডের নানা স্থানে পাওয়া গেছে। কিন্তু খাজুরাহোতে পাওয়া যায় নি। মুসলমান অনুপ্রবেশের পর মহোবা ও কালঞ্জর এবং পরে অজয়গড় ঘিরেই চন্দেল্ল-ইতিহাস। খাজুরাহোর নাম একেবারে চাপা পড়ে গেছে।

রাজানুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে খাজুরাহোর বৈভব ধীরে ধীরে বিলীন হয়েছিল। রাজপুরুষ ও শ্রেষ্ঠীরা খাজুরাহো থেকে অন্য শহরে সরে গিয়েছিলেন। ভাস্কর ও স্থপতিরা নূতন কাজের অভাবে খাজুরাহো পরিত্যাগ করেছিলেন। কথিত আছে, উত্তর ভারতের শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ নগরীর পরমাসুন্দরী নর্তকীরা খাজুরাহো দেবমন্দিরে দেবদাসীর পদ পাওয়া মহাভাগ্য বলে মনে করত,—এই দেবদাসীদের নূপুর-নিক্বণ ক্রমে নীরব হয়ে গিয়েছিল। ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে এসেছিল ভক্ত-সমাবেশ। মুসলমান অনুপ্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু চিন্তা-ধারায় বলিষ্ঠ জীবনবোধ ও সহজ সৌন্দর্যবোধও বিকৃত হতে শুরু করেছিল। খাজুরাহোর পরমরমণীয় ভাস্কর্যলীলা ক্রমে মুখ লুকিয়েছিল সামাজিক সংস্কার আর অবহেলার অন্তরালে।

সেই সকালবেলা জার্ডিন মিউজিয়ামে ক্লোদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারপর সারাদিন তার পাত্তা নেই। ইংরেজ-দম্পতির সঙ্গে সে গিয়েছিল জৈনমন্দিরে, আমি একলা একলা গিয়েছিলাম চৌষট্টি যোগিনী দেখতে। দুপুর-বেলা পশ্চিম মন্দিরগোষ্ঠীর চত্বরে একলা ঘুরছিলাম। ক্লোদকে দেখেছিলাম। দেবী জগদম্বা মন্দিরের চাতালে সে পা মুড়ে বসে আছে। একমনে বসে কোলের উপর খাতা মেলে একটি মূর্তির পেন্সিল স্কেচ করছে।

আমি পাশ দিয়ে চলে গিয়েছিলাম,—বিরক্ত করি নি তাকে।

সন্ধ্যেবেলা বাস স্ট্যাণ্ডের পাশে সেই বেঞ্চি পাতা চায়ের দোকানে বসেছিলাম। আশা ছিল, ক্লোদ দিনান্তে আমার খোঁজ করবেই। সার্কিট হাউসে আমাকে না পেয়ে, পায়ে পায়ে এখানে আসবে। হাসিমুখে পাশে বসে হাত বাড়িয়ে মাটির ভাঁড়ের গরম চা চেয়ে নেবে।

দেখি বাস স্ট্যাণ্ডের দিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে খারে চলেছে। আমি গলা বাড়িয়ে তাকে ডাকলাম।

খারে দাঁত বার করে হাসল। কাছে এসে বললে,—কী দাদা, অভিসারিকার প্রতীক্ষা করছেন বুঝি?

আমি হেসে তার পিঠ চাপড়ে দিলাম। বললাম,—ঠিক ধরেছ,—কিন্তু তুমি কী করে জানলে?

হাঃ, আমি জানব না? জানাই তো আমার কাজ। সার্কিট হাউসের কেয়ারটেকার আমি। গেস্টদের শুধু দৈহিক সুখসুবিধে নয়,—তাদের মনের অলিগলির খোঁজ পর্যন্ত আমাকে রাখতে হয়।

● পার্শ্বনাথ মন্দির

একটু অপ্রতিভ ভাব দেখালেই এক্ষেত্রে ভালো দেখায়, তাই আমি দেখালাম। তাই প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বললাম,—

তা তুমি সন্ধ্যেবেলা এখানে কেন খারে? সার্কিট হাউসে তোমার কাজ নেই?

না, এখন একটু হালকা। তা ছাড়া আপনার জন্যেই তো এলাম।

কিন্তু আমি তো এখন যাব না।

জানি দাদা—জানি, আপনি এখন যাবেন না। এই আলো—আঁধারির নিভৃত-নির্জন পরিবেশে সুরসুন্দরীর প্রতীক্ষা করবেন। আমি তারই দূত হয়ে এসেছি।

ব্যাপার কি খারে?

সার্কিট হাউসে ক্লোদ আপনাকে খুঁজছিল। আমাকে বললে,—লোকটা কি কালকের মতো মোড়ের মাথায় চায়ের দোকানে বসে আছে নাকি? আমি বললাম,—ঠিক আছে, আমি এগিয়ে গিয়ে দেখছি। যদি পনেরো মিনিটের মধ্যে না ফিরি, বুঝবে লোকটা আছে, আমিও তার সঙ্গে জমে গেছি। তখন গরম কার্ডিগানটা গায়ে চাপিয়ে তুমিও এসো।

আমি বললাম,—তোমাকে অনেক ধন্যবাদ খারে।

খারে হেসে বললে,—না দাদা, ধন্যবাদটা এখন তোলা থাক। ক্লোদ এলে আপনাদের দুজনকে রেখে আমি যখন কেটে পড়ব তখন পুরোপুরি ধন্যবাদটা দেবেন।

খারের ডানহাতটা আমি ধরলাম। বললাম,—না খারে, পুরোপুরি ধন্যবাদ কখনোই তোমাকে আমি দিয়ে উঠতে পারব না। ক্লোদ এখনো আসেনি, ভালোই হয়েছে। বিদেশী মেয়ের সামনে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারব না তোমাকে নিয়ে। সত্যি, তুমি আমার যে কী উপকার করেছ তা বলার নয়। বিনা নোটিসে সার্কিট হাউসে আশ্রয় দিয়েছ, ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মন্দির দেখিয়েছ, তোমার সঙ্গে কথা বলে কতো আমি জেনেছি,—কতো শিখেছি,—কতো ধন্যবাদ তোমাকে দেব?

খারে তেমনি হাসি হেসে বললে,—থাক, থাক দাদা, খাজুরাহোতে এসে ধন্যবাদ যদি দিতেই হয়,—আমাকে নয়, কাউকে নয়,—কানিংহাম সাহেবকে দিন।

মজার কথার মাঝখানে হঠাৎ একটা সীরিয়স কথা বলল খারে। পুরোপুরি ধন্যবাদ কানিংহামেরই প্রাপ্য,—যিনি ছিলেন ভারতের পুরাতত্ত্ব সন্ধানের প্রথম সার্ভেয়র ও পরে প্রথম ডিরেক্টর-জেনারেল। ভারতের প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলির সন্ধান ও তা নিয়ে গবেষণার সত্রপাত করেন স্যর আলেকজাণ্ডার কানিংহাম। তিনিই প্রাচীন খাজুরাহোকে আধুনিক জগতের কাছে তুলে ধরেন,—তাঁর রিপোর্টই খাজুরাহো সম্পর্কে এ যুগের প্রথম প্রামাণ্য দলিল। পরবর্তী কালে খাজুরাহো ও চন্দেল্ল ইতিহাস সম্বন্ধে কতো গবেষণা হয়েছে,—কিন্তু সব পণ্ডিতই তাঁদের কাজ কানিংহাম-রিপোর্ট দিয়ে শুরু করেছেন ও পূর্বতন সুধী কানিংহামের প্রতি সম্মান ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।
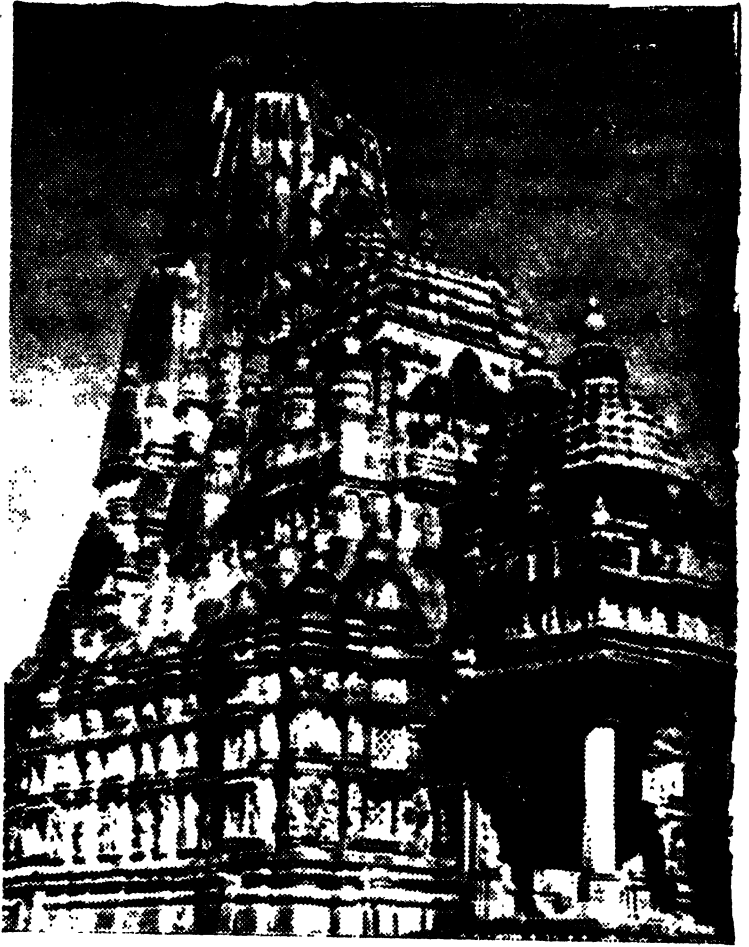
খারেকে অবশ্য আমি বললাম,—

আমি কিন্তু ভাবছিলাম, অন্য কথা। কানিংহামকে ধন্যবাদ দেব, না ধন্যবাদ দেব আওরংজেবকে?

আওরংজেবকে কেন?

তিনি কষ্ট করে মন্দিরগুলি খুঁজে বার করে ভাঙেন নি বলে। আমি সারাদিন ভাবছি সারা মুসলমান যুগে খাজুরাহোকে ধ্বংস করল না কেউ? কেমন করে পার পেয়ে গেল।

খারে কিন্তু সহজে দিল এ ধাঁধার উত্তর। বললে,—আওরংজেব হয়তো পারেনি, তবে তাঁর আগে অনেক তাঁহা-তাঁহা মোগল পাঠান রাজা-রাজড়া খাজুরাহোর সন্ধান পেয়েছিলেন বৈকি। কিন্তু খাজুরাহোর গায়ে হাত দেওয়া কি সহজ? খাজুরাহো যে সারা অঙ্গে বজ্রধর বর্ম পরে বসে আছে।

আমি বললাম,—

বজ্রধর বর্ম? সে আবার কী?

বুঝছেন না দাদা? খাজুরাহোর ঐ মিথুন। অনেক জাঁদরেল কালাপাহাড় খাজুরাহোতে এসেছিলেন,—আর একঝলক ঐ যুগলমূর্তি দেখেই তওবা তওবা করে পালাবার পথ পান নি!

আমি চোখ পাকিয়ে বললাম,—

এ কথা কি ইতিহাস বলে?

আবার দাঁত বার করে প্রাণখোলা হাসি হাসল খারে। বললে,—

ইতিহাস না বলুক, কিন্তু আমি কেমন বললাম বলুন তো? তারিফ করার মতো কথা নয়?

[ক্রমশ।

।। ধারাবাহিক উপন্যাস ।।

একজন লামা ও মানস সরোবর

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

।। চার ।।

গ্রামের ছেলে টাসি খেনদুপ জেদ ধরেছে, লামা হব।

পাঁচ বছরের জেদী ছেলে। মায়ের পরনের ছুবধা টেনে ধরে ঝুলে বলছে, লামা হব। ঐ গোম্ফায় গিয়ে পুঁথি পড়ব।

কাঠ আর পাথরে তৈরি ছোট গোম্ফাটা নিচে থেকে কী সুন্দর দেখায়। ভোরবেলায় কুয়াশায় ঢেকে থাকে সব কিছু। আবহাওয়া একটু একটু পরিষ্কার হয়। যখন রোদ ওঠে, তখন রূপোর মতো ঝকঝক করে ওঠে পলদেন গোম্ফা। কোনদিন বিকেলে ঝড়ের মেঘ আসে ঘনিয়ে। অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় চারিদিক। হলদে আলো বিদ্যুৎ তো নয়, যেন রূপোর তীর, অন্ধকারে লুকিয়ে থেকে কেউ সাঁই-সাঁই করে ছুড়ছে। বড় বড় মানুষের বুকও ভয়ে দুরদুর করছে। কিন্তু গোম্ফায় যারা থাকে তাদের একজনেরও বুকে এতটুকু ভয় নেই। কেন ভয় হবে! অবলোকিতেশ্বর বুদ্ধ আছেন সগৌরবে দাঁড়িয়ে। বিরাট মূর্তি। তাঁর সামনে বিরাট পিলসুজ, আর চমরীর মাখনের প্রদীপ জ্বলছে উজ্জ্বল শিখায়। ধূপের উগ্র গন্ধে নিঃশ্বাসে টান ধরছে।

দেওয়ালের গায়ে মস্ত শানাই, কাড়া নাকাড়া। চালের মতো মস্তবড় করতাল। কিন্তু কেউ বাজাবে না। নিঃশব্দে সারি দিয়ে আসবেন লামারা। সারিবদ্ধ হয়ে বসবেন। বড় লামা মন্ত্র পড়বেন উদাত্তস্বরে। অন্য সবাই চোখ বুজে সেই মন্ত্রপাঠ শুনবেন। তারপর আসবে ছাতু আর চা। সবাই তো মদ খায় না, মাংসও খায় না। জীবন কাটায় শুধু ছাতু আর চা খেয়ে, চমরীর দুধের দই আর মাখন। কী শান্ত-সমাহিত জীবন ঐ গোম্ফার ভিতর।

কিন্তু বাহিরে?

জীবনধারণের জন্য সে কী ভীষণ যুদ্ধ। গ্রীষ্মে পাথর আর শীতে বরফ, তারই উপর ফসল জন্মাতে হবে। সারা বছরের ফসল। যে শস্য ঘরে তোলবার মতো পুষ্ট হবার আগেই নামবে শিলাবৃষ্টি। সেদিন দূরের পাহাড়ে ঙাক-পার নৃত্য দেখা যাবে। পাহাড়ের উপর সে লাফাবে পাগলের মত, চিৎকার করে, ঢিল ছুড়বে আকাশের গায়ে। তারপর রাগে ক্ষোভে মাথার চুল ছিঁড়বে, নিজের জামা-কাপড় পর্যন্ত কুটি কুটি করে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দেবে।

কেন এমন করবে?

না করে যে তার উপায় নেই। ঐ ঙাক-পার উপরেই যে সমস্ত গ্রামের ফসল রক্ষার ভার। গ্রামের সমস্ত লোক যে তাকে ফসলের ভাগ দেয়, প্রতি বছর দেয়। হয় সে মাঠের ফসল রক্ষা করবে, নয় পেতে দেবে সারাবছর ধরে, তা না হলে সে কেমনতরো ঙাক-পা। শিলাবৃষ্টি যদি না হয়, যদি অল্পেই থেমে যায় ঝড়, তাহলে তার সুখ্যাতি ছড়াবে চারিদিকে। আরও দশটা গ্রাম তাকে মানবে। শিলাবৃষ্টি তো দেবতায় করে না। এ অপদেবতার কাজ। শক্তিমান ঙাক-পাই তাদের তাড়াতে পারে। তারা পাথরের নুড়ি কুড়িয়ে মাটির ঢেলা তৈরি করে রাখে। ঝড়বৃষ্টি সুরু হলেই যুদ্ধ সুরু করে সেই অপদেবতাদের সঙ্গে। কিছু পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে। সে কি যার-তার কাজ।

গ্রামের লোকেরা এ সমস্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখে। আর ভয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। সারা বছর লড়াই; চারিদিকে অপদেবতা। শীত অজন্মা রোগ খুনোখুনি। প্রাণটা যে কোথায় কী ভাবে বেরুবে, তা কারও জানা নেই।

শান্তি শুধু এক জায়গায়। ঐ পলদেন গোম্ফার ভিতর। নির্ভয় নিঃশঙ্ক চিত্তে লামারা সেখানে বাস করছেন। বুদ্ধের পায়ে আত্মসমর্পণ করে তাঁরা জীবন-যুদ্ধ এড়িয়ে চলবার ছাড়পত্র পেয়েছেন। কী নিশ্চিন্ত জীবন। পরম দুর্দশার দিনে গ্রামবাসীরা চেয়ে থাকে ঐ গোম্ফার দিকে। বিস্ময়ে শিশুরা অবাক হয়, নানা প্রশ্ন করে বাপ-মাকে। ওখানে কারা থাকে? কেন সবাই থাকে না? কেন আমরা থাকি না?

একদা তিব্বতের সমস্ত পুরুষ লামা হতে চেয়েছিল। পাহাড়ের গুহায় ছোটবড় গোম্ফায় অগণিত অশিক্ষিত মানুষ ঢুকেছিল পেটের তাড়নায়। অসাধুতা ও অসংযমও তারা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। তারপর বেরিয়ে এসেছে অনেকে। কঠিন নিয়ম যাদের বরদাস্ত হয় নি, তারা বেরিয়ে এসেছে। নতুন করে সংসার পেতেছে। শুরু হয়েছে নতুন জীবন-যুদ্ধ।

শিশুরা এত সব বোঝে না। যেটুকু বোঝে, সেইটুকুই তাদের আকর্ষণ করে। গোম্ফার দেওয়ালে ঢোল সাজানো আছে সারি সারি। ঘণ্টা আছে। পাশ দিয়ে যাবার সময় ঘুরিয়ে দিতে হয়, নাড়িয়ে দিতে হয়।

কেউ না-কেউ সারাক্ষণ ঘোরাচ্ছে। সারাক্ষণ সেগুলো মুখর হয়ে আছে। কত রঙ, কত রঙ্গ, কত অদ্ভুত ব্যাপার। শুক্‌কু উৎসব একবার দেখলে সে আর ভোলা যায় না।

গ্রামের ছেলে টাসি খেনদুপও একদিন জেদ ধরল। আমি লামা হব।

পাঁচ বছরের জেদী ছেলে টাসি খেনদুপ। মায়ের ছুব্বা ধরে টানতে লাগল, আমি লামা হব।

মা ভয় দেখিয়ে বললেন, কার কাছে থাকবি?

কেন, লামাদের কাছে।

কিন্তু আমি তো সেখানে থাকব না।

নাইবা থাকলে। আমি রোজ এসে তোমায় দেখে যাব।

মা বললেন, ভারি বিপদ তো!

বাবা বললেন, চুপ করে থাকো, দুদিন পরেই ভুলে যাবে।

কিন্তু ছেলে ভুলল না। গোম্ফার ভিতরে ঘুরে বেড়ায় আর ভাব করে লামাদের সঙ্গে। বড় লামার কোলে বসে পুঁথি পড়ে, আর দই মেখে ছাতু খায়। একদিন বড় লামা বললেন, তুই সারাদিন তো তুই মঠেই থাকিস, বড় হয়ে করবি কী?

খুশী হয়ে খেনদুপ বলল, লামা হব।

লামা হবি!

বড়লামা তাঁর ছোট ছোট চোখ আরও ছোট করে হাসলেন।

খেনদুপ বলল, কেন, আমি লামা হতে পারব না?

কিন্তু লামা হবি তুই কোন্ দুঃখে।

বুক ফুলিয়ে খেনদুপ বলল, আমি বড় লামা হব, আর তোমার মতো তক্তে বসে বই পড়ব। ছাতু খাব দই মেখে; আর কাঠের বাটি ভরে মাখন মেশানো স্যেজা।

স্যেজা মানে তিব্বতী চা। চীন থেকে চা আসে ইটের থানের মতো। জলে ফুটিয়ে সে চা ঢালা হয় একটা চোঙের ভিতর। তার সঙ্গে চমরীর মাখন আর নুন। তারপর পিচকিরি চালানোর মতো কসরৎ করে সেই চা তৈরি হয়। তারই নাম স্যেজা।

চোখ বন্ধ করে বড় লামা বললেন, সাবাস!

খেনদুপ তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল। বলল, মাকে তুমি বল না একবার। সন্ধ্যেবেলায় আমায় যেন ধরে নিয়ে না যায়।

বড় লামা হাসছিলেন মৃদু মৃদু।

খেনদুপ বিজ্ঞের মতো বলল, আর না হয় লুকিয়েই রাখ না। তোমার তো অনেক জায়গা আছে গোম্ফার ভেতর।

চোখ ছোট ছোট করে বড় লামা বললেন, তাহলে তো ছ্যাতেনেরও বড় কষ্ট হবে। সেও আর তোকে খুঁজে পাবে না।

পাশের বাড়ির প্রায় সমবয়সী মেয়ে ছ্যাতেন তার খেলার সঙ্গী। কিন্তু এই দুঃসংবাদে খেনদুপ একেবারেই বিচলিত হল না। বলল, তাকেও আমার সঙ্গে আনব।

আর একজন লামা ছিলেন বড় লামার কাছে। এতক্ষণ তিনি শুধু হাসছিলেন। এবারে বললেন, তাকে তো এখানে থাকতে দেওয়া হবে না।

কেন?

খেনদুপ জানতে চাইল উদ্বিগ্নভাবে।

লামা বললেন, ছ্যাতেন হল মেয়ে। মঠে তাদের জায়গা নেই।

গম্ভীর ভাবে খেনদুপ বলল, আমি জায়গা দেব।

বড় লামা হাসছিলেন। কোন কথা কইলেন না। উত্তর দিলেন অন্য লামা। বললেন, আমরা তো পারব না, তুমি দিলে তোমারও জায়গা হবে না।

খেনদুপ অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, কিন্তু ছ্যাতেন তো কোন দোষ করেনি, তবে কেন তাকে থাকতে দেবে না?

খেনদুপকে লামা এ কথার উত্তর দিতে পারলেন না। বড়লামাকে বললেন, এ ছেলেটা ভারি তার্কিক হবে। এই বয়সেই এত কথা কইছে—

কিন্তু বড়লামার মুখের দিকে চেয়ে কথাটা তিনি শেষ করতে পারলেন না। বড় বিষণ্ণ, বড় চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল তাঁকে। খেনদুপ তাঁকে ব্যস্ত করে তুলল, বলল কই, আমায় উত্তর দিলে না?

লামা তাকে ধমক দিলেন, কী ডেঁপো ছেলেরে বাবা!

কিন্তু বড় লামা তাকে বুকের কাছে টেনে নিলেন। মনে হল, এই ছোট ছেলেটার কাছে আজ তিনি হেরে যাচ্ছেন। যুদ্ধে জেতবার মতো কোন ভাল অস্ত্র তাঁর হাতের কাছে নেই। চোখ বন্ধ করে খেনদুপের মাথার উপর সস্নেহে হাত রাখলেন।

এই স্নেহের স্পর্শ পেয়ে খেনদুপ খুশি হল, বলল, তাহলে ছ্যাতেনকেও তুমি থাকতে দেবে তো?

বড় বিব্রত বোধ করলেন বড় লামা, বললেন, আমরা আর কদিন আছি। তোরা থাকতে দিস।

এই উত্তর পেয়েই খেনদুপ খুশি হল, কিন্তু আশ্চর্য হলেন অন্য লামা। নিজের ক্ষুদে চোখজোড়া বিস্ফারিত করে বললেন, এ কী বলছেন আপনি!

গম্ভীরভাবে বড় লামা বললেন, বুদ্ধের কী ইচ্ছা জানিনে।

নিশ্চয়ই এ তাঁর ইচ্ছা নয়।

তবে এরা নতুন কথা ভাবছে কেন!

উত্তর দেবার সময় বড় লামার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

বাড়িতে খেনদুপকে ডাকতে এসেছিল তার বাবা।

তার আনন্দ আর ধরে না। শুধু নিজের নয়, ছ্যাতেনেরও থাকবার ব্যবস্থা করেছে। পলদেন গোম্ফার। পথে বাবাকে বলল, আর বাড়িতে ফিরে মাকে বলল এই কথা। দৌড়ে গিয়ে ছ্যাতেনকেও বলে এল। তারপর বলল, কাল সকালেই আমরা গোম্ফায় যাব।

মা হেসে ফেললেন।

খেনদুপ বলল, হ্যাঁ, সত্যি বলছি বড় লামা কথা দিয়েছেন আমাকে।

মা বললেন, বুঝেছি। ওঁরা তোমাকে ভোলাবার চেষ্টা করেছেন।

ভোলাবার চেষ্টা কী। খেনদুপ তা বোঝে না। শুধু এইটুকুই বুঝে এসেছে যে, ছ্যুতেন আর সে দুজনেই মঠে থাকবে, আর লেখাপড়া করে লামা হবে। খেনদুপ জেদ ধরল। কালই আমরা মঠে যাব তো?

মা বিরক্ত হলেন, এ ভারি জ্বালা হল।

ও পাশের বাড়ি থেকে ছ্যুতেনের বাবাও এলেন এ বাড়িতে। বললেন, এ সব কী গোলমেলে কথা শুনছি বলতো।

খেনদুপের বাবা অভিজ্ঞ লোক, বললেন, তুমিও কি ছেলেমানুষ হলে নাকি!

ছ্যুতেনের বাবা বললেন, ছেলে মানুষ কেন হব! কিন্তু এরা যা বলছে সেকথাটা ভাল নয়। কাল সকালে একবার গোম্ফায় যেতে হবে।

তুমিও যেমন।

মন্তব্য করলেন খেনদুপের বাবা।

ছ্যুতেনের বাবা ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, কিন্তু লামা হয়ে তাঁদের এমন কথা বলা উচিত। ছ্যুতেনের বয়েস তো বছর চার পাঁচ হল। সে যে ছেলে নয়, সে কথা বেশ বুঝতে শিখেছে। তার মাকে বলছিল তুমিও চল।

খেনদুপ এসে তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছিল, বলল, আমিও আমার মাকে নিয়ে যাব।

অভিভাবকেরা হতবুদ্ধি হয়ে মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। গোম্ফার ভিতরে স্ত্রীলোক স্থান পাবে, অধ্যয়ন করবে, লামা হবে, এসব এমন অবিশ্বাস্য কথা যে, কল্পনা করতেও ভয় হয়। পৃথিবীর কোথাও বুঝি কেউ কখনও একথা ভাবতে পারে না। পাঁচ বছরের ছেলে টাশি খেনদুপ আজ পলদেন গোম্ফায় বড় লামাকে ভাবিয়ে এসেছে। বিস্ময়াবিষ্ট করেছে নিজের বাপ-মা ও গ্রামবাসীকে। এমন অদ্ভুত কথা বুঝি খেনদুপের আগে কেউ কখনও ভাবে নি।

পাহাড়ের পিছন থেকে অন্ধকার এগিয়ে এসেছিল। ঘরের ভিতরে কাউকে চেনা যাচ্ছিল না। খেনদুপ বলল, বাতিটা জ্বালব বাবা?

এ কথার উত্তর সেদিন খেনদুপকে কেউ দেননি।

•

লেখাপড়া শিখে টাশি খেনদুপ লামা হবেই। ছ্যুতেনকেও লামা করবে। সে ভাবে, ছেলেমানুষ পেয়ে সবাই তাকে বোকা বোঝাচ্ছে। একসঙ্গে থাকতে পারে, একসঙ্গে খেলতে পারে, তাতে দোষ নেই। আর একসঙ্গে পড়াশুনো করে লামা হলেই দোষ। মা লামা হয় নি, ছ্যুতেনের মাও লামা হয় নি, নাই বা হল। ছ্যুতেনের যখন ইচ্ছা আছে, আর তারও ইচ্ছা, তখন দোষটা কোথায়? এ সমস্তই বড়দের ফন্দি। তার সঙ্গে ভাব রাখতে দেবে না। এই হল আসল কথা। খেনদুপ ভাবে, বড়লামা মানুষটা এদের চেয়ে ঢের ভাল। তিনি কিছুতেই না বলেন না। কিন্তু দুষ্টুও বেশ আছেন। হাঁও বলেন না কোন কথায়।

খেনদুপের বাবার ইচ্ছা ছিল না ছেলেকে লেখা পড়া শেখাবার। তার কী দরকার আছে। ঘর সংসারই যদি করতে হয় তো মঠের ভিতরে কয়েকটা বছর নষ্ট করে লাভ কী! তার চেয়ে সংসারের কাজই ভাল করে শিখুক। ইয়াকগুলো ইচ্ছামতো চরে বেড়ায়। ফেরেও না সময় মতো। সেগুলোকেও একটু পাহারা দেওয়া দরকার। তার উপর একপাল ছাগল আছে। ইয়াক না পারুক, ছাগল চরাবার বয়স তো তার হয়েছে। মায়ের ফাইফরমায়েসও কি কম! একটা মেয়ে থাকলে তাঁর ভাবনা ছিল না।

কিন্তু খেনদুপ নাছোড়বান্দা। বড় লামার কোল থেকে নামতে চায় না। শেষ পর্যন্ত নামতেও হল না। বড় লামার আগ্রহেই খেনদুপের বাবা মত দিলেন। ঠিক হল, খেনদুপ লেখাপড়া শিখবে। তারপর সংসারে ফিরবে। তিব্বতে এই নিয়মই ছিল। সেখানে স্কুল বলতে মঠ, আর মাষ্টার বলতে লামা। লেখাপড়া শিখতে চাইলে মঠে যেতে হবে। লামাদের হাতে প্রচুর মার খেতে হবে। মার না খেলে নাকি মানুষ হয় না তিব্বতের ছেলে। তার পরেও যদি কেউ মঠে থাকতে চায় তো সে লামা হয়ে থাকবে। বাকি ছেলেরা সংসার করতে ফিরে যাবে।

ছ্যুতেন এ অধিকারে বঞ্চিত। দিন কয়েক কেঁদেছিল, তারপর সব ঠিক হয়ে গেল। মাঝে মাঝে খেনদুপকে দেখতে মঠে আসত। খেনদুপ তাকে সান্ত্বনা দিত, ঘাবড়াসনে, আমি তোকে নিয়ে আসব। আমি লামা হলে এদের আইন কানুন সব ভেঙ্গে দেব।

মঠে এসে খেনদুপ কথা বলতে শিখছে শুনে শুনে। লামারা তাকে আইন কানুন শেখাচ্ছেন। না শুনলে বকুনি, না মানলে মার, না শিখলে নাকি বিপদ আরও বেশি। খেনদুপ তাই সবাইকে সাহস দেয়। আমি লামা হলে এদের নিয়ম সব ভেঙ্গে দেব। একদিন এক লামা শুনতে পেয়েছিলেন এই কথা। কানটা তার ছিঁড়ে নিতে চেয়েছিলেন। বলেছিলেন, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা। বল্ আর কখনও বলবি না।

খেনদুপ কোন উত্তর দেয়নি, নিঃশব্দে মার খেয়েছে পড়ে পড়ে। তবু বলে নি, আর বলব না। বড় লামা এসে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে গেছেন। জিজ্ঞেস করেছেন, লেগেছে খুব?

গোমরা মুখে খেনদুপ বলেছে, না।

তার শুকনো চোখ কিন্তু ছলছল করে উঠেছে। আঘাতের বেদনার চেয়ে সমবেদনায় দুঃখ বুঝি বেশি। বড় লামা যে তাকে স্নেহ করেন, খেনদুপ সে কথা অনুভব করে।

মঠে খেনদুপের অনেক কাজ। সে তো একা নয়। আরও অনেক বালক আছে তারই মতো। আশপাশের গ্রাম থেকে তারা এসেছে, কিন্তু তার মতো

শিশু কেউ নয়। কিন্তু সে তার কথার মতো কাজেও তাড়াতাড়ি বাড়ছে। বড় লামার পোষাকের উপর তার বড় লোভ। অমন সুন্দর হলদ রঙের শাটিনের জামা, তার উপর কত কারু কার্য। আর মাথায় তাঁর মুকুটের মতো টুপী। সাধারণ লামাদের মতো একটা পোষাক পেলেও তার এখন চলে যায়। গাঢ় লাল রঙের জামার উপর হলদে টুপীটা মন্দ দেখায় না। খাতিরও বেশ আছে। গ্রামের লোকেরা তো খাতির করেই, মঠেও তাদের প্রতিপত্তি। একদল ছেলে পড়তে এসেছে। লামাদের পরিচর্যা করে আর বেপরোয়া মার খেয়েই বুঝি তারা মানুষ হবে।

এক এক সময় খেনদুপের মনে হয় যে, তারা না থাকলে মঠ চলত না, কোন উৎসব হত না মঠে। লামারা শুধু নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, মঠ চালাচ্ছে ছোট ছোট ছেলেরা। মঠে উৎসব হবে? কোথায় ছেলের দল? ভারে ভারে চমরীর মাখন আনছে গ্রামবাসীরা, সে সব তুলে রাখ। যেখানে সেখানে রাখলে চলবে না। প্রার্থনার ঘরে ধাপের উপর পিতলের দীপাধারে প্রদীপ জ্বলছে। বিরাট পাত্র আছে তারই পাশে। সেই পাত্রে মাখন থাকবে। তেমনি করে দই-এর জায়গায় দই, ছাতুর জায়গায় ছাতু, শুখনো মাংসও আসবে কিছু। বড় লামা মাংস খান না। যাঁরা খান, তাঁরা নিজের ঘরে লুকিয়ে খান। বলতে বারণ করেন বড় লামাকে।

চমরীর মাখন জ্বলে মোমের মতো। বড় স্নিগ্ধ আলো। তার সঙ্গে গোলাপী ধূপের গন্ধ। সে তেমন মিষ্টি নয়, বড় উগ্র। বেশিক্ষণ কাছে থাকলে নিঃশ্বাসে টান ধরে।

তেমনি বাজনা। এত বড় বড় বাদ্য-যন্ত্র কারও বাড়িতে থাকে না। পিতলের সানাইটা কম করেও হাত চারেক লম্বা হবে, বড় মানুষের হাতের মাপে। যার গাড়ির চাকার মতো বড় বড় করতাল। তারই সঙ্গে নানানসই কাড়া নাকাড়া। বেদীর বাম দিকে ধর্মচক্র। সেই দিকেই সাধারণ প্রবেশ-দ্বার। সেই পথ দিয়ে যন্ত্র-শিল্পীরা এসে যখন বাজাতে শুরু করবে, তখন সে বাজনাকে আর মিষ্টি লাগবে না। ঐ বাজনার চেয়ে বড় লামার কণ্ঠে স্তোত্রপাঠ শুনতে অনেক ভাল লাগে।

উৎসবের দিন লামারা সব সাজতে বসবেন। নিজেদের জামা কাপড়ের উপর পরবেন লামার পোষাক। প্রার্থনা সভায় আসবেন নানা দিক থেকে নানা কায়দায়। সে সব কায়দায় ভুল হলে চলবেনা। সামরিক বাহিনীর কুচ-কাওয়াজ হচ্ছে, এই রকম মনে হওয়া চাই। তারপর সারিবদ্ধ হয়ে সবাই অপেক্ষা করবেন বড় লামার।

বড় লামা আসবার আগেই সবাই জানতে পারবে যে তিনি আসছেন। যাকে সেনাপতির মত দেখতে, তিনি আস্ফালন শুরু করে দেবেন। উৎসবের পোষাকে কী সুন্দর দেখায় বড় লামাকে। মানুষটা ভাল বলেই বোধহয় অমন সুন্দর দেখায়। ভাল পোষাক তো আরও অনেকে পরেন, কিন্তু তাঁদের তো ভাল দেখায় না। বরং এক এক জনকে বড়ই বেয়াড়া দেখায়। কেন তাঁরা লামা হয়েছেন। সেই কথা খেনদুপ ভেবে পায় না।

বড় লামা সভায় আসতেই অন্য লামারা তাঁকে নমস্কার করবেন, স্তুতি করবেন। শুধু মাথা নত করে বড় লামা তাঁদের উত্তর করবেন। বেদীর কাছে এলে একজন তাঁর পায়ের লামখো খুলে দেবেন। বড় লামা বেদীতে বসবেন। টুপী খুলে খুলে অন্য লামারাও বসবেন তাঁদের আসনে। তারপর সেই সেনাপতি সাজের লামা আবার খানিকটা আস্ফা-লন করবেন।

যাঁর মন্ত্রপাঠ শুনতে ভাল লাগে, তিনি বেশিক্ষণ পাঠ করেন না। একটুখানি পড়েই থেমে যান। তার-পর সমস্ত লামারা একসঙ্গে আবৃত্তি সুরু করেন। কেন তাঁরা গলার স্বর বিকৃত করে নাকিসুরে পাঠ করেন, খেনদুপ তা বোঝেনা। বড় লামাকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি শুধু হাসেন। ভারি উৎসাহ লামাদের। এক টানা একঘেয়ে সুরে চেঁচিয়েই যান। কিছুতেই যেন থামতে চান না। খেনদুপ বড় লামা হলে তাঁদের চেঁচাতে দিত না। একদিন একটা ছেলে দোতলার কাঠের বারান্দা ভেঙ্গে নিচে পড়ে গিয়েছিল। দাঁত কপাটি লেগে অনেকক্ষণ ধরে সে গোঁ গোঁ করেছে। লামাদের মন্ত্রপাঠ শুনলে খেনদুপের সেই গোঙানির কথা মনে পড়ে।

বড় লামা এ সমস্ত নিশ্চয়ই বোঝেন না। তা না হলে নিজে কেন এঁদের সঙ্গে গোঙান না, ওঁরা থামলে কিছুক্ষণ তিনি চোখ বুজে ধ্যান করেন। তারপর একটুখানি পাঠ।

বাস, এই পর্যন্ত লামাদের কাজ। তারপর দরকার খেনদুপদের। চার পাঁচ সারিতে লামারা বসে আছেন। কাঠের তক্তার উপর লাল আসন। সাত আটটি করে আসন। প্রত্যেকের সামনে হাতখানেক উঁচু এক-একটি কাঠের চৌকি। খেনদুপরা জলের পাত্র আর চায়ের বাটি অনেক আগেই রেখে গেছে। এবারে তারা ধরাধরি করে বড় বড় চামড়ার পাত্র এনে বেদীর বাঁ দিকে জমা করবে। কাঠের বালতিতে ঘন দই, বারকোশে ছাতুর স্তুপ, লামারা এইসবেরই অপেক্ষা করছেন। কেউ সামনের পাত্রগুলো ঠিক করলেন। কেউ বা জামার ভিতর থেকে লাল রঙের রুমালে জড়ানো নিজের পাত্র বার করলেন। রূপো বাঁধানো কাঠের পাত্র।

খেনদুপরা সকলের আগে চা দেবে। তারপর ছাতু। দই পরি-বেশনের পর আর একবার ছাতু দেবে। বড় লামা এখানে খান না। চায়ের বাটিটা একবার ঠোঁটে ঠেকিয়ে নামিয়ে রাখেন। অনেকদিন খেনদুপ দেখেছে যে, পিছনের সারিতে যে লামারা বসেন তাঁরা তাঁদের জামার ভিতর থেকে শুকনো মাংস বার করে রসিয়ে রসিয়ে দই ছাতু খান।

আহারের পর সবাই রুমালে মুখ

যোছেন। কিন্তু পাশে দাঁড়িয়ে খেনদুপ লক্ষ্য করেছে যে কয়েক জনের ভিতর-পকেটে একখানা করে বই-এর মতো পাটকরা রুমাল আছে। তার বাইরেটা লাল, কিন্তু খুললেই দেখা যায় যে ভিতরটা চটের। লামারা খক করে থুতু ফেলে মুড়ে সেটা পকেটে রাখেন। আশ্চর্য হয়ে খেনদুপ ভাবে, সেকি বুকের ভিতর রাখবার জিনিষ।

একদিন বড় লামাকে খেনদুপ এই কথা জিজ্ঞাসা করেছিল, তিনি হেসে বলেছিলেন, বেশ তো, বুদ্ধকে তুমি বুকের ভিতর রেখো।

বুদ্ধকে কি বুকের ভিতর রাখা যায়।

খেনদুপের চোখের তারায় কৌতূহল উছলে উঠল।

তার মাথায় হাত বুলিয়ে বড় লামা বললেন, কেন যাবে না। বুদ্ধ তো বুকেই জিনিষ। সকলের বুকে আছেন।

কই, আমি তো দেখতে পাই নে।

পাবে, দেখতে চাইলেই পাবে।

আমি তো রোজ দেখতে চাই।

বড় লামা তার মাথায় হাত বুলুতে বুলুতে বললেন, আরও ভাল করে চাইতে হবে।

খেনদুপ তখন আর পাঁচ বছরের শিশু নয়। কিশোর খেনদুপ মনোযোগ দিয়ে শুনল বড় লামার উত্তর। ভাবল, এই ভাল করে চাইবার ব্যাপারটা আর একদিন সে ভাল করে জেনে নেবে। বড় লামা বোধহয় আজ সে কথা বলবেন না।

খেনদুপ লক্ষ্য করেছে যে, যারা মঠে আসে, তারা একটা অন্ধকার ঘর ঘুরে যাবেই। সেই ঘরে একটা মানুষ-প্রমাণ কাঠের ঢাক উপুড় করা আছে, লোহার একটা দণ্ডের উপর দাঁড় করানো। মানুষের চেয়েও উঁচু। আর বাহিরটা নানা চিত্রে শোভিত। কয়েকগাছা দড়ি আছে। সেই দড়ি ধরে সবাই ঢাকটাকে ঘুরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। তাতে ঘণ্টার ধ্বনি হয়। মঠে এলে এই ঘরে ঢুকতে কেউ ভোলে না। খেনদুপের কিন্তু আশ্চর্যও লাগে এইসব দেখে।

একদিন বড় লামাকে সে এর কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল। উত্তরে বড় লামা শুধু হেসেছিলেন। মসৃণ করে মুড়োনো মাথা, মুখে কয়েকগাছা গোঁফ আর দাড়ি সোনালি থেকে সাদা হয়ে এসেছে। ধীর-স্থির সৌম মুখ। কথা না বলে হাসি দিয়েই সব কাজ সেরে দেন। ভাল করে হাসলে তাঁর ছোট ছোট চোখ একেবারে বুজে যায়। খেনদুপ এখন বড় হয়েছে। বলল, এমন করে এড়িয়ে গেলে চলবে না।

বড় লামা হেসে বললেন, সময় হলেই সব বুঝতে পারবে।

কখন সময় হবে?

আরও বড় হও।

এই কথায় খেনদুপের আত্মাভিমানে আজকাল আঘাত লাগে। কয়েকটা বছর মঠের ভিতর কাটিয়েও কি সে বড় হল না। বড় লামার কথার উত্তর দিতে তার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু জানবার ইচ্ছা ছিল আরও বেশি। বলল, আমি তো প্রায় তোমার সমান হয়েছি।

উত্তরে বড় লামা হাসলেন।

হই নি?

হয়েছ বৈকি, লম্বায় হয়েছ।

তবে বল।

বড় লামা তার গালে হাত দিলেন, বললেন, আমার মতো গোঁফ-দাড়ি গজাক, পাকুক সেগুলো, তখন সবই বুঝতে পারবে।

খেনদুপ কিন্তু নাছোড়বন্দা। জোর করেই সে জেনে নিয়েছিল যে ঐ সমস্ত ঢাক-ঢোল অজ্ঞান মানুষের জন্য। যারা দুদণ্ড স্থির হয়ে বুদ্ধের কথা ভাবতে পারে না, তারা ঐ ঢাক বাজিয়ে যায়। একদা বুদ্ধদেব নূতন ধর্মচক্র প্রবর্তন করেছিলেন। যে তা গ্রহণ করে তার স্মরণ নেবে, সে নির্বাণ লাভ করবে। স্থূলবুদ্ধি মানুষের জন্য ঐ ঢাক-ঢোলের সঙ্কেত।

খেনদুপ তখনই জানতে চাইল, তাহলে জপের মণিচক্রও কি তাই?

প্রশ্ন শুনে বড় লামা কিছু বিস্মিত হলেন। কোন কিশোরের মুখে এসব প্রশ্ন যেন শোভা পায় না। এ সমস্ত আলোচনা খুব ভাল নয়, নিরাপদও নয়। বড় লামা কোন উত্তর দিলেন না।

খেনদুপ বলল: ঐ মণিচক্রের মধ্যে বুদ্ধের নাম লক্ষবার লেখা আছে। একবার মণিচক্র ঘোরালে লক্ষবার জপের ফল। আচ্ছা তুমিই বল, এর চেয়ে একবার বুদ্ধকে স্মরণ করা কি ভাল নয়?

কী বিপদ এইসব ছেলে নিয়ে। মনে মনে লামা বুঝি প্রমাদ গণেন। উত্তর না দিয়ে চোখ বন্ধ করেন।

খেনদুপ অপেক্ষা করতে শিখেছে। বড় লামা ক'দিন আর তাকে ফাঁকি দেবেন। শক্ত করে চেপে ধরলে বুড়োর কাছে জবাব একদিন পাওয়া যাবে।

মঠের ভিতরে আর একটা অন্ধকার স্যাঁৎসেতে ঘর আছে। এক জায়গায় একটা বেদী। তার উপর পিতলের বুদ্ধমূর্তি আর ঝকঝক করে না। ছোট বড় আরও অনেক মূর্তি আছে। সেগুলো ধুলায় ও অযত্নে মলিন। তার চেয়েও বেশি ধুলো জমেছে তাকের উপর, তাকের পুঁথিগুলোর উপর। দেওয়ালের গায়ে সারি সারি কাঠের তক্তা। তার উপরে নানা আকারে পুরানো পুঁথি সাজানো আছে স্তরে স্তরে। লাল সূতোয় বাঁধা, কাঠের মলাটের উপর নানা রঙের চিত্র আঁকা। বিরাট আকারের বইও আছে অনেক, সে সমস্ত লাল কাপড়ে বাঁধা। খেনদুপ প্রথম যেদিন সেই ঘরে ঢুকেছিল, সেদিন তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। এমন গুমোট যে ঢুকতে ভয় করে। হাতে বাতি নিয়ে সে এই ঘরে ঢুকেছিল। সেদিন ঐ বড় বড় লাল পুঁথিগুলোকে সে কালো রঙের দেখেছিল।

ওসব কী পুঁথি?

জিজ্ঞাসা করেছিল বড় লামাকে।

সংক্ষেপে বড় লামা বলেছিলেন আমাদের শাস্ত্র।

শাস্ত্র কী?

ঐ ঘরে আছে, তার নাম হল শাস্ত্র।

তুমি পড়েছ তো সব?

বড় লামা গম্ভীরভাবে শুধু মাথা নাড়লেন।

খেনদুপ বলল, আমিও পড়ব।

তাকে সম্মতি দেবার সময় বড় লামা বুঝতে পারেন নি যে কী বিপদ তিনি ঘাড়ে নিলেন। খেনদুপ দিন কয়েকের ভিতরেই ঘরটাকে ঝকঝকে তকতকে করে ফেলল। আর এক-একখানা পুঁথি এনে বসতে লাগল বড় লামার সামনে। তাঁর কোলে বসে পড়বার বয়স তার উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। এখন তাঁর সামনে বসে পড়ে। বড় লামা একটা কাঠের স্ট্যাণ্ডের উপর পুঁথি রেখে পড়েন। খেনদুপও একটা জোগাড় করে নিল।

রোজ সে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ে। আর বুঝতে না পারলেই মানে জিজ্ঞাসা করে বড় লামাকে। উত্তর না দিয়ে উপায় নেই। ক্লান্ত হবার ভাণ করেও তিনি নিষ্কৃতি পান না। অন্য লামা তাঁর ক্লান্তি দেখলে বলেন, কেন এত প্রশ্রয় দিচ্ছেন ওকে?

উত্তরে বড় লামা শুধু হাসেন।

কিন্তু অন্য কোন লামা হাসেন না। তাঁরা গম্ভীরভাবে সরে যান। আড়ালে পেলে খেনদুপকে বকতে বাকি রাখেন না। নানারকম নির্যাতনও করেন। সমবয়সী বন্ধুরাও তাকে কথা শোনায়।

বড় লামাকে এসব কথা খেনদুপ কোনদিন বলে না। তিনি হয়তো দুঃখ পাবেন। দুঃখের ভাগ কাউকে দিতে নেই। বড় লামা তো এই কথাই তাকে বলেছেন। বলেছেন, তাঁর কথা মেনে চললে বুদ্ধের সমস্ত উপদেশ তাকে শিখিয়ে দেবেন। সুকর্মের দশটি নির্দেশই তো বুদ্ধের শেষ কথা নয়, সে বোধহয় প্রথম কথা। বুদ্ধের সব কথা জানবার ইচ্ছা প্রতিদিন খেনদুপের বেড়ে যাচ্ছে। বড় লামাকে অসন্তুষ্ট করলে এখন চলবে না। তার জন্যে নীরবে নির্যাতন সওয়া ভাল।

খেনদুপ বড় হচ্ছে।

॥ পাঁচ ॥

হোটেলে ফিরেই আমাকে আমাদের দলপতি মিস্টার ধীরের সম্মুখীন হতে হল। দূর থেকেই আমি দেখতে পেয়েছিলাম যে মায়া ধীর দৃষ্টি রেখেছে পথের দিকে। আমাকে দেখতে পেয়েই ভিতরে সংবাদ দিয়েছে। মিস্টার ধীরের পিছনে গোটা দলটা আমাকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এলেন। গম্ভীর গলায় মিস্টার ধীর বললেন: কোথায় যাওয়া হয়েছিল?

আমিও গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলাম: নন্দাদেবীর মন্দিরে।

পিছন থেকে মায়া ধীর বলে উঠল: মিথ্যেকথা ভাইসাবেহ। আমি ওঁকে লামার সঙ্গে যেতে দেখেছি।

ডিফামেশন। আমি মানহানির মামলা করব। মিথ্যাকথা আমি বলি না।

মায়া বলল: আমি প্রমাণ করে দেব ভাইসাব, উনি লামার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলেন। যান নি? বলে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম: লামার সঙ্গেই নন্দাদেবীর মন্দিরে গিয়েছিলাম।

প্রবল কণ্ঠে মিস্টার ধীর হেসে উঠলেন। কিন্তু মায়া চটে উঠল, বলল: দলে এই রকমের ইনডিসিপ্লিন তুমি মেনে নিচ্ছ। তোমার শাসন কড়া না হলে এতগুলো মানুষকে তুমি সামলাবে কী করে।

হাসতে হাসতেই মিস্টার ধীর বললেন: সে ভার তোমার উপরেই দেব।

মিসেস ধীর আমাদের চায়ের টেবিলে টেনে আনলেন।

চা খেতে খেতে মিসেস মাথুর বললো: আপনার লামাও কি আমাদের সঙ্গে যাবেন নাকি?

বললাম: আমাদের সঙ্গে নয়, তবে দলের সঙ্গে থাকবেন শুনেছিলাম।

এখন কি অন্য কিছু শুনলেন?

অভয় দিলে বলতে পারি।

বলে আমি মায়ার দিকে তাকালাম। উত্তর দিলেন মিসেস মাথুর, বললেন: আমি আপনাকে অভয় দিচ্ছি।

বললাম: মিস ধীরকে দেখে লামা ভয় পেয়ে গেছেন।

কেন?

ড্রাকেন নামে লাব গ্রামের একটি মেয়ের কথা মনে পড়ে গেছে, ভারি মিস নাকি দুর্জনের চেহারার।

নিমেষে মায়ার হাত উঠল তার নাকের উপর, আর মিস্টার ধীর আবার উদ্দামভাবে হেসে উঠলেন। মিসেস মাথুর বললেন: না না, অমন ঠিকলো নাক মায়ার, ওকে তিব্বতীর মতো বলবেন না।

বললাম: আমি তো বলি নি, বলেছে সেই লামা। নিশ্চয়ই কোন মিল দেখেছে, না দেখলে বলবে কেন।

মায়া বলল: থাকলেই বা মিল, তাতে ভয় পাবার কী আছে?

ওই মেয়েটার ভয়েই দেশ থেকে পালিয়ে এসেছে কি না, সেই কথা জেনে নিতে হবে।

মিসেস মাথুর বললেন: লামারা সন্ন্যাসী বলে শুনেছি, ওদের সঙ্গে আবার মেয়েদের সম্বন্ধ কী।

আমি গম্ভীরভাবে বললাম: মেয়েদের ব্যাপার আপনারাই ভাল বুঝবেন। এ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা নিতান্তই কম।

মিস্টার ধীর যে হাসতে ভালবাসেন, আবার তার প্রমাণ দিলেন।

চা খেয়ে আমরা শহর দেখতে বেরুলাম। এ শহরে রাজপথ বলতে একটিই, তারই উপরে মোটর চলাচল করে। এই পথেই আসে রাণীক্ষেতের বাস, কাঠগোদামের বাসও আসে। আবার এইখান থেকেই চলে যায় কৌশানি আর পিথোরাগড়। আরও অনেক জায়গার বাস ছাড়ে। সেসব জায়গার নাম আমাদের জানা নেই।

এই রাজপথের আর একধাপ উপরে একটা সমান্তরাল পথ আছে। তারই উপরে বাজার-হাট, কোর্ট-কাছারী। এই পথ সমতল নয় বলেই কোন

যানবাহন চলাচল করে না। শহরের মধ্যে দর্শনীয় স্থান কিছু নেই। যা আছে তা সব দূরে দূরে। সেও সব পাহাড়। যাঁরা মানস সরোবর ও কৈলাস যাবেন বলে আলমোড়ায় এসেছেন, তাঁদের সেসব পাহাড় দেখবার কোন মানে হয় না।

কথায় কথায় আমরা সদর রাজ-পথের উপরেই নেমে এসেছিলাম। বাস স্ট্যাণ্ডে অনেকগুলো বাস দাঁড়িয়ে আছে। পাশেই একটা বড় বাড়ির একতলায় বুকিং ও রিজার্ভেসন অফিস।

মিস্টার ধীর বললেন : রিজার্ভেসন আজ করে রাখলেই বোধহয় ভাল হত।

মিসেস মাথুর বললেন : কাল হয়তো দেরি হয়ে যাবে।

মিস্টার মাথুর বললেন : দেরি হলে জলে পড়বার ভাবনা নেই।

মিসেস ধীর বললেন : বরং দেরি না হলেই জলে পড়া হবে।

মিস্টার মাথুর এই মন্তব্য শুনে ভারী খুশি হলেন, বললেন : সে কথাটা এঁরা বুঝলে ভাল হত।

মায়া বলল : দু'দলের কথাই আমি বুঝতে পারছি। আর মিস্টার রায়ের কথাও, ওঁকে একখানা মোটা খাতা আর পেনসিল কিনে দেব।

কেন?

ফাউন্টেন পেনের কালি তো নেওয়া হচ্ছে না, কলমের কালি ফুরিয়ে গেলে ওঁকে মুস্কিলে পড়তে হবে।

বললাম : পাতা ফুরোয় না এমন খাতা আমার কাছে আছে, আর খাতায় লিখতে পেনসিলেরও দরকার হয় না।

মিসেস ধীর জিজ্ঞাসা করলেন : সে আবার কী রকম খাতা?

আমি হেসে বললাম : মন। মনের খাতায় পেনসিল দিয়ে লিখতে হয় না।

মিস্টার মাথুর বললেন : বেশ বলেছেন, জীবনের কোন কথাই তো আমরা লিখে রাখি না, কিন্তু সব কথা মনে থাকে। সময়মতো ঠিক মনে পড়ে যায়।

বললাম : সত্য কথার গুণই তাই, সে কখনও ভুল হবার নয়। মানুষ ভুলে যায় মিথ্যেকথা, অনেক চেষ্টা করেও মনে রাখতে পারে না।

আমার মনে পড়েছিল থেনদুপ লামার কথা। কত বছর আগে সে তার গোম্ফা ছেড়ে চলে এসেছে, কিন্তু আজও কিছু ভুলতে পারে নি। পাঁচ বছর বয়সের কথাও ভোলে নি একটিও। তার গোম্ফার বর্ণনা শুনে আমার মনে হয়েছে যে, তার ছবি সে তার চোখের সামনে আজও স্পষ্ট দেখতে পায়। সত্য এই রকমই। সত্যের মৃত্যু নেই, নেই বিস্মৃতি।

বাস স্ট্যাণ্ড ছেড়ে আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম। রিজার্ভেসন করা আর আমাদের হয় নি। মিস্টার ধীর বললেন : ঠিক আছে, কাল সকালে এসেই ব্যবস্থা করে যাব।

মিসেস মাথুর বললেন : প্রয়োজন হলে রাতে এসেই বাসে উঠব।

পুরাকালের ব্যবস্থা ছিল অন্য-রকম। পিথোরাগড়ের উপর দিয়ে আস্কোট পর্যন্ত মোটরের রাস্তা তখনও তৈরি হয় নি। কৈলাসের পদযাত্রা আলমোড়া থেকেই আরম্ভ হত। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষে আষাঢ়ের প্রথমে কৈলাস যাত্রার প্রশস্ত সময়। তার আগে থেকেই যাত্রীরা এসে আল-মোড়ায় জমা হত। হোটেল ও যাত্রী-নিবাসগুলো যেত ভরে। অশক্ত ও মহিলাদের জন্য ডাণ্ডি ভাড়া পাওয়া যায়। কিনতেও পাওয়া যেত প্রায় একই খরচে। সরকারের তহশীলদারী অফিসে টাকা জমা দিলে ঘোড়ার ও কুলির ব্যবস্থা হত। সীলমোহর দেওয়া পরওয়ানা পাওয়া যেত। যারা সস্তায় ঘোড়া চাইতেন, তারা স্থানীয় লোকের সাহায্যে সস্তায় ব্যবস্থা করতেন। এ ব্যবস্থা কৈলাস পর্যন্ত নয়। আলমোড়ায় কুলি ও ঘোড়া ধারচুয়ার তপোবন পর্যন্ত যেত। গার্বিয়াং নামে একটা জায়গা পর্যন্ত যায় ধারচুয়ার কুলি আর ঘোড়া। গার্বিয়াং থেকে তিব্বতের তাকলা কোট আর সেখান থেকে কৈলাস যাতা-য়াতের ব্যবস্থা।

একটি মালবাহী ঘোড়া মণ দুই ওজন বইতে পারে। এই মালের জন্য কুলি নিলে তিনজনের দরকার। গার্বিয়াং থেকে টব্বু পাওয়া যায়, তিব্বতীয়রা বলে ইয়াক। গার্বিয়াং থেকে গাইডের দরকার। তারও মজুরী ও খোরাকী বহন করতে হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে যাঁরা কৈলাস দর্শনে গেছেন তাঁদের মাথাপিছু খরচ পড়ত একশো থেকে তিন-শো টাকা। দুজনে একটা ঘোড়া নিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে বিনা গাইডে গেলে একশো টাকার মধ্যেই খরচ কুলতো। ঘোড়ায় চেপে আরাম করে গেলে খরচ পড়ত দুশো, আর তিনশো টাকার বেশি লাগত ডাণ্ডিতে চেপে গেলে। এখন কত খরচ পড়বে, সে সম্বন্ধে আমার কোন ধারণা নেই। সর্বত্র সব জিনিষের দর বেড়েচে। ঘোড়ার ভাড়া বেশি, কুলি খরচ বেশি, খাদ্যদ্রব্যের অগ্নিমূল্য। তার উপর অনেক বেশি বিলাস-ব্যসনে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আজকাল কোন সাধারণ দেশী হোটেলে একমাস থাকতে হলে আড়াই শো থেকে তিনশো টাকা খরচ। অথচ সে-যুগের কৈলাসযাত্রীরা মাসিক কুড়ি টাকা খাই-খরচই যথেষ্ট মনে করতেন। এই টাকাতেই তাঁরা মিছরি আর মেওয়া খেতেন পথে। দেশে তখন দারিদ্র্য এমন উগ্র ছিল না।

একটা বড় দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে মিস্টার ধীর বললেন : আমাদের দলের নতুন বন্ধুর জন্য কিছু কিনতে হবে না?

মায়া বলল : একটা গগ্লস্ নিশ্চয়ই চাই।

আমি বললাম : খুঁজলে হয়তো বাক্সে একটা পাওয়া যাবে।

মায়া বলল : নিজের জিনিষপত্র কি আপনি সামলে আনেন নি?

হেসে বললাম : সে অভ্যাস নেই।

কে সামলায় তবে?

দেশে আমাকেও সামলাবার মানুষ আছে।

আমার কথা শুনে মহিলারাই বেশি

...র্ষ হবেন। মিসেস ধীর বললেন : ...আপনি একা বেরিয়েছেন কেন ?

বললাম : কী করব বলুন, তিনি নিয়েছেন দু' মাসের। দু' মাসের ...গ আমার দেশে ফেরা চলবে না।

মিস্টার ধীর বললেন : এর মধ্যে ...টু হেঁয়ালি আছে বলে মনে হচ্ছে।

আমি বললাম : হেঁয়ালি কিছুই ...। সারা বছর তিনি আমাকে ...লান, কিন্তু বছরে একবার ছুটি দিতেই ...। সাধারণত একমাস, দেশে বিয়ে-সাদী ...লে দু' মাস। এবারেও গোরখপুর পর্যন্ত তিনি আমাকে সামলে এনেছেন।

মায়া আমার দিকে তাকিয়েছিল কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে, আর মিসেস ধীর বললেন : আশ্চর্য তাঁকে আপনি গোরখপুরে, ফেলে এলেন।

তাঁর বাড়ি যে সেখানে। বছরে একবার তাঁকে ছুটি না দিলে সারা বছর তিনি আমাকে সামলাবেন কেন।

মিস্টার ধীর এবারে দলপতির মতো গাম্ভীর্য নিয়ে বললেন : আপনি কার কথা বলছেন বলুন তো।

আমি অত্যন্ত সবিনয়ে বললাম : কেন, আমি আমার ভৃত্য বাবুলালের কথা বলছি।

সকলেই একসঙ্গে হেসে উঠলেন।

মিসেস ধীর বললেন : আমরা ভেবেছিলাম, আপনি নিজের স্ত্রীর কথা বলছেন।

আমি লজ্জিতভাবে বললাম : ছি ছি, আপনারা সেকথা কেন ভাবলেন।

মিস্টর ধীর আর একবার হেসে বললেন : রিয়েল জোক্।

[ক্রমশ।

শিল্পদ্রব্যের বাজার দর-

শু... আজকে নয়, বরাবরই কোন শিল্প-সৃষ্টির নিছক উৎকর্ষ ক্রেতার ওপর প্রভাব ফেলতে অক্ষম। কোন সৃষ্টিকে ...র্ণ', 'বিস্ময়কর' বলা এক কথা, আর ওই ...ষ্টই পকেট খালি করে কিনে নেওয়া অন্য ...পার। বাজার দরের ক্ষেত্রে সব থেকে বেশি ...ভাবশালী সম্ভবত সমকালীন রুচিবোধ। আজ ...কাল কলা-উৎসাহী মানুষ যখন কোন ছবি, ...র্য বা অন্য জাতের শিল্পসৃষ্টি ট্যাঁকের কড়ি ...দিয়ে কেনার কথা ভাবেন, তখন নিশ্চয় ...গত যুগের নামকরা কোন সৃষ্টির তুলনায় ...মানে বাজারে সোরগোল তোলা সৃষ্টি ট্যাঁকস্থ ...তে বেশি উৎসাহ বোধ করবেন। অবশ্য ...জ যা সোরগোলে মাতিয়ে রেখেছে, তা' ...ত গতকালের বা গত পরশুর সৃষ্টি—তা' ...ক, আসল কথা অদ্যতন মাতামাতি। এ ...শেব পুনর্মূল্যায়ন যুগে যুগে ঘটেছে, বারবার। ...জই, মোটের ওপর বলা চলে যে, শিল্প-বাজার দর নির্ভর করে সেই বস্তুটি কেনার কালে কতটা মাতামাতি ...ছে, তার ওপর।. অর্থবিদ্যার নানান ...ত্ত্ব, যা বাস্তবে ভাবিয়ে তুলছে বিত্তবানদের ...যেমন, মুদ্রাস্ফীতি, মূলধনের ওপর দেয় ...রের ক্রমবৃদ্ধির প্রবণতা ইত্যাদিও শিল্পের ...বারে বেশ প্রভাবশালী। এ ব্যাপারে অবশ্য সঠিক খবর পাওয়া অসম্ভব, তবে কিছুদিন আগেও 'ইউরামেরিকা'র শিল্প-বস্তুর বাজার দর পর্যালোচনা করলে দেখা যায় দর বাড়ছে, কমার কোন লক্ষণই দৃষ্টিগোচর নয়। একটা দিকে নজর চালালে দরদামের সাধারণ প্রবণতাটুকু অন্তত বোঝা সম্ভব : পোর্সেলিন—গত কয়েক বছর ধরে ইউরোপীয় পোর্সেলিন বেশ আকর্ষণীয় সামগ্রী হয়ে উঠছে। ১৭৩০ থেকে ১৭৭০—এই ক'বছরের পোর্সেলিন কেনার হুজুগ উঠেছে অনেক বেশিসংখ্যক ক্রেতার মধ্যে। সে সময়ের যে-কোন ভালো জিনিসেরই দাম বেশ চড়া। এ ধরণের ক্রেতা কেবল আমেরিকায় নয়, ইউরোপে এবং ইংলণ্ডেও বহু।

অবশ্য সব জাতের পোর্সেলিন মূর্তি ইত্যাদির দাম বাড়ে নি। দেখা গেছে, Gold anchor chelsea'-র দাম বিশ শতকে হু-হু করে বেড়ে গিয়েছিল, আর 'elaborate meissen' পোর্সেলিন (১৭৪০-৫৫-র) ১৯১৪-র আগে বাজার দরে অন্যগুলোকে টেক্কা দিয়েছিল। কোন সৃষ্টির যত উঁচু দরের হোক না কেন, —তা সে ভাস্কর্যই হোক বা ছবিই হোক,—তার বাজার দর নির্ভর করে যুগ-বিশেষের রুচির ওপর। এক যুগে যার জন্য ক্রেতা অসম্ভব দাম দিতেও গররাজী নয়, যুগান্তরে তার দাম হয়ত কানাকড়িও নয়। প্রশংসার অভাব কোন সার্থক সৃষ্টির সাধারণত ঘটে না, কিন্তু দর বস্তুটার হালচাল কিঞ্চিৎ ভিন্ন। অন্তর্নিহিত শিল্পমূল্যের ওপর তা' প্রায় কোন সময়েই নির্ভর করে না। যেমন, ম্যাজোলিকা (majolica)—এক সময় এর দাম চর চর করে ওপরে উঠলেও, কিছুদিন আগেই তা' বেশ নেমে গেছে। পোর্সেলিন দলের মধ্যে একটা বিশেষ ভঙ্গীর—ফরাসী sivres এবং Valenciennes-র দর নিয়মিত উর্ধ্বমুখী। রুচির রাজ্যে এ ধরণের পালাবদল নিত্য নৈমিত্তিক। গত কয়েক বছর ধরে সতেরো শতকের ফরাসী ছবির কদর আমেরিকায় খুব বেশী হচ্ছিল, আর বিশ শতকের গোড়ার দিকের 'Fauves' -দের (উদ্দাম, বেপরোয়া মানুষ) সৃষ্টি কয়েক বছর আগেই বড় বাজারে ঠাঁই পেয়েছে একই দেশে। ডেরেইন (Derain) এবং ভলামিংক-এর (Vlaminck) ছবি ১৯৩৯-এ ১৫০ পাউণ্ড দামে বিক্রি করা সহজ ব্যাপার ছিল না, অথচ কিছুদিন আগে মোটামুটি ১০০০ পাউণ্ড দামে সহজেই বিক্রি হয়েছে। সুতরাং রুচিবোধ এবং বাজার দর সব সময়েই চঞ্চল, সব সময়েই অবস্থান্তরে ঘোরাফেরা করছে এবং করবে বলেও মনে হয়।

॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

[এ-যুগের শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র কামারপুকুর। মথুরা, নদীয়া, অযোধ্যা, বেথেলহেম, কপিলাবস্তু, মক্কা-মদিনাকে এক করেছে বাংলার এই নিভৃত পল্লী। কামারপুকুরের দীপশিখা আজ হিংসোন্মত্ত সমগ্র তিমিরাচ্ছাদিত ধরণীর একমাত্র আলোকবর্তিকা। 'জীবই শিব' যাঁর নতুন জীবন দর্শন, 'যত মত তত পথ' তাঁরই পথনির্দেশ। কামারপুকুরের এ অভিনব কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখছেন বসুমতীর পাঠকের পরিচিত লেখক বিবেকরঞ্জন। এই উপন্যাস রচনাকালে তিনি আপন গুরু পরম পূজনীয় স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী পান। আমরা বিশেষ দুঃখিত এই উপন্যাস মহারাজকে মুদ্রিতাকারে দেখাতে পারলাম না। গুরুপরম্পরায় যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা মানবেন ঠাকুর তাঁর পূর্ণ শক্তি দিয়ে গেছেন সম্প্রদায়ের প্রভুকে। আজ আমরা নতুন প্রেসিডেণ্ট মহারাজকে প্রণাম জানিয়ে এ-উপন্যাস শুরু করছি। পাঠকদের এ উপন্যাস কেমন লাগছে জানলে খুশী হব। —সম্পাদক, মাসিক বসুমতী]

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

কামারপুকুর।

ছোট্ট ছায়াঘন গ্রাম। বর্ধমান থেকে খুব বেশী দূরে নয়। দক্ষিণ-পশ্চিমে পুরী। বহু তীর্থযাত্রীর পদধূলি পড়েছে এই গাঁয়ের সোনার মাটিতে।

শুধু জগন্নাথজীর মন্দিরের পথ নয়। এই নিরালা রাঙা মাটির পথে হেঁটে গেছে শত সহস্র যাত্রী। কেউবা পুরোটা পথ দণ্ডি কেটে—মহাপবিত্র জাগ্রত বাবা তারকনাথের মন্দিরে। তারকেশ্বর-যাত্রী সেই পুণ্যকামীদের পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণ ধ্বনি আজও এই গাঁয়ের আকাশ-বাতাস করে রেখেছে মুখরিত।

সেই কামারপুকুর।

তাঁতির ছিল তাঁত। কুমোরের ছিল হাটভরা হাতে-গড়া বিপণি। চাষীর ছিল গোলাভরা ধান। সবার মুখে ছিল হাসি। মনভরা খুশী। হাসিখুশী মিলে গ্রামখানাকে দিয়েছিল একটা নতুন জিনিষের স্বাদ—যাঁর খোঁজ নিতে পারে শুধু সেই মন, যে মনে নেই কোন কালো।

বারো মাসে তেরো পাবণ লেগেই ছিল সেই গাঁয়ে। পৌষের ফসল কেটে সে গাঁয়ের চাষী উৎসব-মুখরিত প্রাণে সময় কাটাত নগর সঙ্কীর্তনে।

ছিল না কোন ভেদাভেদ। শিবের গাজন গাইতেন যে পীর আজও তাঁর আজান শোনা যাবে শেষ রাতের ভগ্ন দেউলের কাঁসর-ঘণ্টার সাথে। সেই কামারপুকুরে পা পড়লো যে সব পথিকের তাঁর মুখের এ জ্যোতির উৎস কোথায়? জ্যোতির্ময় যাত্রীর রূপের সাথে এ গ্রামের পরিচয় নতুন নয়। কলসী মাথায় যে নির্বাক যাত্রী চলার পথে এ গাঁয়ে পা বাড়িয়েছে তার মুখজ্যোতিও তো কোনদিন নেহাৎ কম ছিল না। কোন্ দূর দূরান্ত পল্লী-প্রান্ত থেকে আত্মীয়স্বজনের বিদায় গ্রহণ করে জলভরা মৃৎপাত্র মাথায় নিয়ে সে মহান্ তীর্থক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছে কে জানে? তার মনের অটল সঙ্কল্প, হৃদয়-দেবতাকে সেইদিনই কি তার সামনে দাঁড় করিয়ে দেয় নি?

নির্বাক যাত্রীর মুখে সেদিন এ গাঁয়ের লোকেরা যে জ্যোতি দেখেছিল, অদূরের দণ্ডিধারী যে পথচারীর অচেনা মুখের রূপচ্ছটায় মুগ্ধ হয়েছিল আজকের এ নবাগত পথিকের মুখমণ্ডলের জ্যোতি তাদের ভাস্বর উজ্জ্বল্যকে ম্লান করে দিচ্ছে কি করে?

মাথায় জলের কলসী নেই বটে, দণ্ডি কেটেও তিনি চলছেন না; তারকেশ্বর মন্দিরে বা পুরীধামের দিকে তিনি অগ্রসর হচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে না। গ্রামের দু-পাঁচজন এগিয়ে এলো পথচারীকে জানাতে সম্ভাষণ। আন্তরিকতায় সমুদ্ভাসিত মনে তারা পথিককে জানাল প্রীতি-আলিঙ্গন।

কীর্তনীয়া কীর্তন ছেড়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইলো কাঞ্চনোজ্জ্বল সৌম্যকান্ত পথিকের দিকে। না, এটা নবদ্বীপ তো নয়। এ যে কামারপুকুর। তবে কেন অকারণ মন হরণ করছে এ প্রৌঢ় পান্থ? কেউ বলতে পারবেন কি? গাঁয়ের সবার মুখ পরিচিত। শুধু উৎসব আসরেই নয়। শনি-মঙ্গলবার বসে গাঁয়ের হাট। শুধু এ গাঁয়ের নয়। তারাহাট, বদনগঞ্জ, সিহড়, দেশড়া থেকে গ্রাম-বাসীর দল। কারুর মাথায় সুতো। কারুর কাঁধে গামছা। কারুর বা হাঁড়ি, কলসী, কুলো।

একদিকে ভাঙা মন্দিরের ইট হাঁ করে তাকিয়ে আছে। যেন বলতে চায় সে-যুগেও এখানে ছিল পাকাবাড়ী। শুধু কি তাই? মাণিক রাজার বাড়ীতে এই গাঁয়েতে পড়েছে একাধিকবার লক্ষ ব্রাহ্মণের পদধূলি। বাংলা দেশের কে না জানে?

এদিক-ওদিক স্নিগ্ধশীতল জলের পুকুর। কোনোটা বড়। কোনোটা ছোট। কোনটাতে শুধু স্ফটিকস্বচ্ছ জল। কোনটা ঢাকা পদ্ম-কুমুদে—যেন গ্রামলক্ষ্মীর হাসিভরা মুখ। মাণিক রাজা শুধু ব্রাহ্মণ ডেকেই খুশি হন নি। গাঁয়ের সবার জন্য তিনি তৈরী করেছেন আমকুঞ্জ, পথচারী পাবে শ্রমহারা ছায়াতল। ক্ষুধার্ত পাবে রসাল ফল। আর জল? জলের জন্য মাণিক রাজা কেটে গেছেন দু-দুটো প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা।—সুখ সরোবর, হাতী সরোবর। তা ছাড়া ছিল একাধিক ছোট বড়োর পুকুর। হালদার পুকুরটার জনপ্রিয়তার কারণ শুধু তার অমলিন জল। আর? আর তার আকার।

কামারপুকুরের পাশে অনেকগুলো গ্রাম। তার ভিতর একটার নাম দেরে। জমিদার রামানন্দ রায়ের জমিই ছিল শুধু, জমিদারের মন তার কোনদিনই ছিল না। রামানন্দ রায়ের ভজন জানত না, গাঁয়ে তাই ছিল না আনন্দ। রায় সে নিজের ইচ্ছে মতনই দিত। রামানন্দ রায়ের দেরে গ্রাম তুই ধীরে ধীরে হয়ে দাঁড়াল অভিশপ্ত।

যেখানে রাজাই প্রজা, প্রজাই রাজা, শান্তি সেখানে বাঁধা। লক্ষ্মী সেখানে অচলা। সেখানকার মাটিতে সোনা ফলে। যেখানে রাজা শুধু রাজা সেখানে সে শুধু তারই রাজা। প্রজারা তার নাগালের বাইরে। রামানন্দ জীবনে কাউকে আনন্দ না দিয়ে যেদিন রামের সাথে মিলিয়ে গেল, সেদিন সবাই দেখলো তার ভিটেতে সন্ধ্যা-প্রদীপ জ্বালবার কেউ নেই।

কিন্তু কোনোদিন ছিল। এই দেরে গ্রামে ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায় মাণিক রাজা না হলেও তাঁর প্রাণ মাণিকটা রাজার ধনকেও ছাড়িয়ে যেত। মাণিকরাম দেরে গ্রামে দিবাযামিনী পুজো নিয়েই থাকতেন ব্যস্ত।

রঘুবীর বিগ্রহ তখনও স্থাপনা হয় নি। বাড়ীতে নিত্য উপাসনা হতো রঘুকুলতিলক রামচন্দ্রের। বাড়ীতে ছিল পুকুর। ছিল শিবমন্দির।

মাণিকের ছেলের নাম ক্ষুদিরাম। সুন্দর কান্তি। গৌরাঙ্গ। ধ্যানমগ্ন নয়ন। তিতিক্ষা, সংযমের প্রতীক। সহধর্মিণী চন্দ্রমণি—চন্দ্রা। দেরে গ্রামে সবাই স্নেহসিঞ্চিত ভক্তির সাথে মানত। যেন কৈলাশের হর-পার্বতী।

পতি-পত্নী পূজার্চনা নিয়েই ব্যস্ত। পার্থিব জীবনের ছায়াটুকুর মায়া ছেড়েছেন বহুদিনের সাধনায়। পাঁকে থেকেও পাঁকমুক্ত।

মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা করা যাদের পেশা তাঁদের বলা হয় উকীল। যেখানে তারা এই ভানুমতীর খেল দেখান তাকে বলা হয় আদালত। যার মাধ্যমে এটা সম্পন্ন হয় তাকে বলা হয় মোকদ্দমা। এই মোকদ্দমার কল্যাণে বহু বড়সন্তান সর্বস্বান্ত হয়েছেন। বহু লোককে পথভ্রান্ত করেছেন।

দেরে গ্রামের রামানন্দর নেশা ছিল শুধু শান্তির নীড় ভেঙে গাঁয়ের লোকের ডেকে-আনা দুঃখে আনন্দ করা, মানুষের বেদনায় শোকে-দুঃখে যে হতভাগার দল আনন্দ উপভোগ করে রামানন্দ রায় ছিল তাদের দলে। শ্মশানে তাণ্ডব নৃত্য ছিল মন ভোলানোর খেলা। দম্ভে ভরা ছিল অশান্ত চিরচঞ্চল ছোট্ট মনটুকু।

বিদেশী শাসক ব্যস্ত ছিল নিজের পুঁজি সংগ্রহে। প্রজার দুঃখ-দৈন্য-কষ্ট দেখার সময় তার ছিল না। সে কাজের ভার জমিদারের হাতে দিয়ে রাজপ্রতিনিধি ব্যস্ত ছিল আপন প্রমোদ-কাননে। তাই আইনের অজুহাতে কানুনের বলিকাঠে ঝুলেছে বহু নিরপরাধ প্রাণ। মাঝে মাঝে প্রজাদের ভিতরও শক্ত লোক রুখে দাঁড়াত অন্যায়ের প্রতিবাদে। রামানন্দ আদালতে প্রজার বিরুদ্ধে জানায় নালিশ। জানে জয় তার নিশ্চিত। তবুও বিদেশী বিচারক চায় খাঁটি প্রমাণ। যীশুর সন্তান বিচারক, সত্য প্রতিষ্ঠায় দৃঢ়সঙ্কল্প। রামানন্দ সত্যের সন্ধান জানবে কি করে? মিথ্যা নিয়ে তার কাজ যে।

গাঁয়ের মাতব্বররা সবাই বলে দেরে গ্রামের ধর্মপ্রাণ নিষ্ঠার প্রতীক ক্ষুদিরাম। জীবনে মিথ্যে বলেন নি। শুধু এ গাঁয়ের নয়, শহরতলীর সবাইও জানে একথা। তিনি যদি বিচারালয়ে কোনো কথা বলেন, সেকথা বেদবাক্যের মতন গৃহীত হবে। জমিদারের জয়ের অপরাজেয় অমোঘ শক্তি।

সে আর শক্ত কি?

রামানন্দ রায় আলবোলাতে মৃদু টান দিয়ে ঘুমায়িত চোখে হুকুম দিল, "কে আছো? খবর দাও বাহ্মণ ক্ষুদিরামকে। জানাও তাঁকে অবিলম্বে, বিচার নয়ে তাঁকে সাক্ষ্য দিতে হবে। কিছু নয়, শুধু দু-চারটে কথা বললেই হবে। তিন পুরুষের অন্ন সংস্থান হয়ে যাবে এক সাক্ষ্যদানে।

পরমোল্লাসে ছোটে আরক্ষীর দল। লাভের অংশ চাই তাদের। লোভ তাই নেহাৎ কম নয়।

কিন্তু এ কি? কেউ শুনেছো কখনও এমন কথা? "জমিদারের হুকুম।" দরিদ্র ব্রাহ্মণকে তারা আবার বলে, "জানো এর ফল? জমিদারের হুকুম তোমার ওপর। বিচারালয়ে শুধু হাজির হতে হবে। শুধু বলবে তুমি সেখানে ছিলে। তুমি নিজে দেখেছো এ ঘটনা ঘটতে। বাস তাই বললেই তোমার কাজ শেষ।"

ব্রাহ্মণ নির্বাক। স্ফটিকস্বচ্ছ চোখ দুটো থেকে যেন ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন।

ভয়ে আরক্ষী চোখ বজে ফেলে।

ব্রাহ্মণ অটল। সঙ্কল্পে দৃঢ়।

মিথ্যা উচ্চারণ এ মুখে নয়। প্রাণ যায় যাক, ধর্মের মান বাঁচাতেই হবে।

শুনল সব রামানন্দ। নিজে ভীরু কাপুরুষ। আগুন ছোঁয় নি জীবনে। তাই আগুনকে ভয় পায়। মিথ্যা নিয়ে তার ব্যবসায়। সত্যের স্বাদ সে হতভাগা জানবে কি করে? হুকুম দিল, ক্ষুদিরামের নির্বাসনের—গ্রাম ছেড়ে যেতে হবে।

মাত্র জমিদার তাও শুদে।

আইনের যূপকাষ্ঠে নিরপরাধকে কি করে বলি দিতে হয় মধু রামানন্দর তা অজানা নয়।

বিচারের দোহাই দিয়ে সেদিন দেরে গ্রামে এ-যুগের সবচেয়ে বড় অবিচার হয়ে গেল। সেদিন দেরে গ্রামে গ্রামবাসীর চোখের জলের প্লাবন বয়েছিল, সেদিন দেরে গ্রামের আকাশে-বাতাসে ছিল অসত্য, অন্যায়ের অট্টহাসির রোল, সেদিন দেরে গ্রামের গ্রামলক্ষ্মীর মুখের হাসিটুকু ম্লান হয়েছিল। দুর্যোগের ঘনঘোর ঘটায় সাথীহারা পাখী নীড় হারালো। ধর্মনিষ্ঠ সত্যবান ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম হলেন নিরাশ্রয়। মন তবুও অটল। ঘর হারালেই বা কি! মাথার ওপর ঘন নীলাকাশ। পায়ের নীচে শ্যামলিমা ধরণী। ভয় কিসের?

অসহায় গ্রামবাসীর দল সেদিন ছিল শুধু এ অবিচারের নীরব সাক্ষী। বিদেশী শাসকের শৃঙ্খলে, যুগ যুগ দাসত্বের বন্ধনে তারা বধির, মূক, পঙ্গুর সামিল হয়েছিল। তারা সেদিন ভুলে গিয়েছিল অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে, বিধাতার ঘৃণা তাদের সমভাবে তৃণসম দহে।

এ যেন জীবনের চরম পরীক্ষা। ক্ষুদিরাম সহায় সম্বলহীন। জীবন যাত্রার মূলধন শুধু একটি সত্যনিষ্ঠ হৃদয়।

না। না। বিপদে রক্ষা করো এ কভু তাঁর প্রার্থনা নয়। বিপদকে যেন কোনদিন ভয় না হয় এইটুকুই তাঁর আবেদন। সমাজ সংসার মিছে সব। মিছে এ-জীবনের কলরব। মাথার ওপর আকাশ। পায়ের নীচে মাটি। ভয় কাকে? দুঃখের রাতে নিখিল ধরা করুক না তাঁকে বঞ্চনা। তাঁর প্রতি যেন কোনোদিন কোন সংশয় না জাগে? কে তিনি? রঘুবীর থাকতে তাঁর কাকে ভয়?

সত্য-প্রীতির চরম দণ্ড দিয়ে ক্ষুদিরাম স্ত্রী-পুত্র-কন্যার হাত ধরে প্রাণের প্রিয়তম ভিটে-মাটির মায়া ছেড়ে এলেন এ নতুন গ্রামে। কামারপুকুর। সেই কামারপুকুর। কলিতীর্থ কামারপুকুর।

তাঁকে দেখেই কীর্তনীয়া কীর্তন ছেড়ে হাঁ করে তাকিয়েছিল কাঞ্চনোজ্জ্বল গৌরকান্তি পথিকের দিকে। না এটা তো নবদ্বীপ নয়। এ যে কামারপুকুর।

পথহারা পথিক পেল পথের সন্ধান। সাথীহারা পাখী পেল নীড়। বন্ধুর পথে এলো বন্ধু। ক্ষুদিরাম দেখলেন জীবনযাত্রার পথে পাশে বন্ধু সুখলাল গোঁসাই। জীবনসখা। স্বর্ণোজ্জ্বল হৃদয়। বজ্রকঠিন সঙ্কল্প। বন্ধুকে আনতেই হবে আপন গ্রামে। হোক না দারিদ্র্য তাঁর সাথী। সেই দারিদ্র্যই তাঁরা ভাগ করে নেবেন দুজনে।

বন্ধু সুখলাল গ্রামের সবার সাথে করিয়ে দেন পরিচয়—গোবিন্দ, হলধর, মদন, তাঁতি, কামার, চাষী। কেউ ব্রাহ্মণকে এনে দেয় গামছা, কেউ বা হাঁড়ি, কলসী, কুলো। চাষী এসে হাল ধরে—পারিশ্রমিক শুধু হৃদয়ের প্রীতি, ভালবাসা।

ক্ষুদিরাম বলেন, "তা কেন ভাই। আমিও চাষ করব। এসো রঘুবীরের নাম নিয়ে আমিও তোমাদের সাথে সাথে চাষ করি। এসো।"

ছোট্ট কুটীর। পর্ণ কুটীর। সামনে কাঁচা আমগাছ, খেজুর গাছ, নারকেল গাছ। কুটীরের পিছনে ছোট্ট ভগ্ন জলাশয়। কুটীরের পিছনে দু ধারে দুটি বিরাট তালগাছ। যেন প্রকৃতির দেওয়া দুটি শক্ত প্রহরী। দেবতাই যেন অকূলে কূল দিলেন। মাথার ওপর এলো একটু ছায়া। আগামী দিনে এই ছায়াই বিশ্ব-ভুবনে একদিন আড়াল করে রেখেছিল বেদনাঘন সহস্র লক্ষ অশান্ত মন। বাংলার ছোট্ট একটি নিরালা ছায়াঘন গ্রাম কামারপুকুর—বিশ্বের অশান্ত মনের শান্তিবাণী এসেছে যার শিশির-ভেজা মাটি থেকে।

ক্ষুদিরাম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বন্ধু সুখলাল গোঁসাইর দিকে হাসিভরা মুখে বলেন, "আঃ কি আরাম তোমার এই গ্রামে সুখলাল। ভারী স্নিগ্ধ শীতল দীঘিটার জল।"

দেরে গ্রামের রামানন্দ রায় গভীর নিশুতি রাতে ঘুমের ঘোরে চেঁচিয়ে ওঠে, "মেনেছি, হার মেনেছি। ঠেলতে গেছি তোমায় যত, আমায় তত হেনেছি।"

সুখলাল বলেন, "হাঁ বন্ধু। ভারী শীতল এর জল। জানো এ দীঘিটার নাম? হালদারপুকুর।"

॥ দুই ॥

দিন যায়। কোনদিন উপবাসে, কোনদিন অর্ধাশনে।

সুখলাল জিজ্ঞাসা করেন কেমন কাটছে দিন?

বন্ধুকে পরিহাসচ্ছলে বলেন, "দিনগুলো ভালোই কাটছে ভাই। কোনদিন আমি কাটাই। কোনদিন রঘুবীর।"

ধর্মপ্রাণ বন্ধু ব্রাহ্মণের মুখে একথা শুনে অবাক। হঠাৎ এ অহমিকা কেন?

সুখলাল সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাকান।

ক্ষুদিরাম বুঝতে পারেন বন্ধুর প্রশ্ন। হেসে বলেন, "আমি কাটাই বলাতে মনে খটকা লেগেছে না? আসল কথাটা কি জানো? যেদিন অন্ন জোটে সেদিনটা রঘুবীরই কাটান। যেদিন সেটা জোটে না সেটা আমিই কাটাই। রঘুবীর তো আর কাউকে উপবাসী রাখতে পারেন না।"

দুই বন্ধুর প্রাণখোলা হাসিতে হালদার পুকুরের তরঙ্গমালা নেচে ওঠে। শান্তির চেয়েও অশান্তি ভাগ করার যার দাবী আছে জীবনে সেই ধন্য। শুধু সব কিছু পাওয়ার ভিতরই নেই প্রকৃত আনন্দ। না পাওয়াতেও সে বেদনার অংশীদারভাগী যার আছে সে অশান্তিকে জয় করেছে। শুধু ক্ষুদিরামই নন। না-পাওয়ার বেদনা সংসারে আরও একজনকে স্পর্শ করতে পারে নি। চন্দ্রার মনে লেশমাত্র অভিমান আঁচড় কাটে নি। ধর্মপ্রাণ স্বামী তাঁর সখা, গুরু, জীবনসাথী। যেন একটা প্রাণই দুটো শরীরে চলা।

সম্বল মাত্র বিঘাখানেক জমি। তাও বন্ধুর দেওয়া দান। জায়গাটার নাম কিন্তু ঠিকই দেওয়া হয়েছিল। লক্ষ্মীজলা। ধীরে ধীরে লক্ষ্মীজলার ধানে ঘর ভরে উঠলো। নিজ হাতে উপ্ত ক্ষেতে স্বর্ণবরণ ধানের শিষ দেখে ক্ষুদিরাম ভারী খুশী। পড়শীদের বলেন ধান তুলে আনতে। ধান কেটেছে তারা জীবনভরে। এমন মিষ্টি ব্যবহারটুকুর স্বাদ তারা কখনও পায় নি জীবনে। যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা নিজহাতে ধান তুলে দিচ্ছেন তাদের হাতে। এরজন্য একটু কাজ করতে পারলে তারা ধন্য।

ব্রাহ্মণের সাথে তারা কথাটুকু বলতে ভয় পায় কেন? এত মৃদুভাষী আপনজন তবুও মনে হয় যেন নাগালের বাইরে। তা তো হবেই। মনটা যে তাঁর ঘুরে বেড়াচ্ছে বহু উঁচুতে। ধ্যানস্তিমিত চোখদুটো খুলেও যেন খোলে না। চারদিকে কখন কি ঘটছে কে তার পিছু পিছু ছোটে? একাধিকবার চন্দ্রার এ ভুল হয়েছে। দূর থেকে দেখেছেন রক্তিম আভা যেন একটা লাল দ্যুতি। কাছে এসে দেখেছেন প্রার্থনারত স্বামীর বক্ষভেদ করে বেরুচ্ছে এ-জ্যোতি। ধ্যানমগ্ন স্বামীর পদপ্রান্তে জানিয়েছেন প্রণতি।

চিরদিন কারুর দুঃখে যায় না। দুঃখকে যাঁরা ভয় পান না তাঁদেরও। ক্ষুদিরামের ভগিনী রামশীলা। রামশীলার পুত্র রামচাঁদ। মেদিনীপুরে ভালো চাকুরে। মাতুলের কষ্টে তাঁর মনে আঘাত হানল। রামচাঁদ মেদিনীপুর থেকে মাস খরচ পাঠাবার বন্দোবস্ত করলেন। মাসে পনরো টাকা। টাকায় তখন মণেক চাল। পনেরো টাকার দাম অনেক। রামচাঁদের নাম করে যেন গৃহদেবতা রঘুবীরই ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য মোচনের বন্দোবস্ত করলেন। মন-প্রাণ-শরীর অর্পণ করে যে তোমায় ডাকে তুমিই বলেছিলে না রঘুবীর তুমি তার ভার নিয়ে থাকো?

কামারপুকুরের দুঃখী, দরিদ্র হতভাগাদের অনশন ঘুচলো। সবাই জানতো গ্রামে অন্তত একটি ঘরে গেলেই নিশ্চয়ই অনশন ভাঙবে। দু মুঠো অন্ন দেবার অন্নপূর্ণা এসেছেন গ্রামে—নাম তাঁর চন্দ্রা। কে না জানে?

রামচাঁদ তখন মেদিনীপুরে।

বহুদিন খবর আসে না। কি ব্যাপার? কে খবর আনবে? দূরত্বও নেহাৎ কম নয়। অন্তত চল্লিশ মাইল তো হবেই।

সকালের পূজার্চনা শেষ করে ক্ষুদিরাম একদিন পায়ে হেঁটেই যাত্রা করলেন মেদিনীপুরের দিকে। চার-পাঁচ ঘণ্টা পায়ে চলার পর ক্ষুদিরাম একটি গ্রামে পৌঁছে একটি অতি প্রিয় জিনিষের সন্ধান পেলেন। শীত তখন গেছে। বসন্ত বাংলা পল্লীর দ্বারে ঠিক হাজির হয় নি। গাছের পাতাগুলো বেশ কিছুদিন হল ঝরে পড়েছে। নতুন সবুজ পাতার উঁকিঝুঁকি দেখা দেয় নি গাছের ডালে। গ্রামটিতে সবুজ বেলপাতার নৃত্যচ্ছন্দে পথিকের মন ভুললো।

তাই তো?

কতদিন হল এই বেলপাতা জোটে নি পূজার উপাচারে। মাথা পেতে যে মহাদেব বেলপাতা নেন, তিনি এসে ক্ষুদিরামের পথ রুখে দাঁড়ালেন যেন। এ কি? পথ রুখে দাঁড়ালো কে?

গামছা ভর্তি বেলপাতা সংগ্রহ করে ব্রাহ্মণ গ্রাম ছেড়ে মেদিনীপুর যাত্রা স্থগিত করে কামার-পুকুরের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন। অভুক্তই ছিলেন। সব কাজ ছেড়ে আবার বসলেন যোগাসনে—যোগী মহেশের পূজায়। এই গভীর একান্ত ভাবের জন্যই কি রঘুবীর শালগ্রাম শিলারূপে স্বপ্নে তাঁর কাছে নিজেকে ধরা দিয়েছিলেন?

কামারপুকুরের রঘুবীর শালগ্রাম শিলার প্রতিষ্ঠার কাহিনী বাংলা কেন ভারতবর্ষের কে না জানে? কে না জানে ক্ষুদিরাম হৃদয়-দেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন কামারপুকুরের জনদেবতারূপে? কে না জানে আগামীকালে সেই রঘুবীরই এসে ধরা দিলেন কামারপুকুরের মাটিতে কাঙালের সখারূপে?

এ-কাহিনী আজকের নয়। প্রায় দেড়শ বছর দেখতে দেখতে কেটে গেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় শতক। যানবাহনের সুবন্দোবস্ত তখনও গ্রামকে স্পর্শ করে নি। শকটযান [illegible] যাতায়াত সুগম করেছিল। [illegible] দায়ের জন্য ছিল পাল্কী। আর [illegible] কোনটাতেই পড়েন না তাঁদের জন্য [illegible]। ইচ্ছাতে সব কিছুই হয়। তাই শকট [illegible] ছাড়াও লোকেদের যাতায়াত আটকে থাকত না। নৌকো-বজরা ছাড়াও তারা আসমুদ্র কুমারিকা ভ্রমণ করতেন পদব্রজে। চাই শুধু অটল সঙ্কল্প।

জ্যেষ্ঠপুত্র রামকুমার ধীরে ধীরে সংসারের ভার একটু একটু লঘু করতে শুরু করলেন। কন্যা কাত্যায়নীকে গৌরীদান করা হয়ে গেছে। কয়েক বছরের ভিতর কামারপুকুর গ্রামের বিশেষ কোনো পরিবর্তন না হলেও ক্ষুদি-রামের ছোট্ট পরিবারে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। রামকুমার বিবাহের সাথে সাথে পাঠ সমাপন করলেন। ব্যাকরণ, সাহিত্য, স্মৃতি। তিনটি বিষয়ে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করা রামকুমারের পক্ষে এ ছোট্ট সংসারের ভার নেওয়ার মতন অর্থোপার্জনের কোনই অসুবিধা রইল না।

শুধু তাই নয়।

মনটা ক'দিন থেকেই একটু উদাস। অকৃত্রিম বন্ধু সুখলাল দেহরক্ষা করেছেন। তাই একবার বাইরে ঘুরে আসা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু কোথায়? তীর্থদর্শন ছাড়া এ মন কিছুতেই শান্তি পাবে না।

অনেক ভেবেচিন্তে ক্ষুদিরাম ঠিক করলেন পদব্রজে দক্ষিণাবর্তের তীর্থদর্শনেই মনে প্রকৃত শান্তি আসবে। তাই রামকুমারের হাতে নিত্য পূজোর ভার দিয়ে তিনি যাত্রা করলেন রামেশ্বরমের পথে।

দীর্ঘ পথ। সম্বল শুধু সঙ্কল্প। আর? আর হৃদয়ের অকৃত্রিম শুদ্ধাভক্তি।

এলো গাঁয়ের তাঁতি, কুমোর, কামারের দল। এলো চাষী, জেলে, ব্রাহ্মণ। এ ক'বছরে ক্ষুদিরাম গ্রামখানার হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। সবারই চোখে জল। কে জানে এ-তীর্থযাত্রী ফিরে পদার্পণ করবেন কি না এ-গ্রামে। কে জানে পথে কে এ পথিকের সহায় হবে? কে জানে ক্ষুদিরাম কামারপুকুরকে কতটুকু ভালবাসেন?

হৃদয়ে তাঁর শুধু রঘুবীরের ছবি। সেখানে কামারপুকুর জায়গা পেয়েছে কি? কে জানে? *

পরিব্রাজককে সবাই বিদায় দিলেন। একে একে সবাই চলে গেল। চন্দ্রার ভারী সখ ছিল মনে স্বামীর সাথে তীর্থ ভ্রমণের। দুখিনী ব্রাহ্মণী। কোন্ জায়গাটাই বা দেখা হলো। তা না হোক। শরীর দুটো হলেও মন দুটো যে এক। স্বামী

নিজের ফিরে এলেই তিনি সুখী, তিনি নিশ্চিন্ত। পতির পুণ্যেই হোক সতীর তীর্থ।। সবার মনে যে ভয় উঠেছে পরিব্রাজকের নিঃসম্বল দুর্গম যাত্রায় সে আতঙ্ক ব্রাহ্মণীকে ছোঁয় নি। তিনি জানেন তীর্থভূমি যতদূরই হোক না কেন, তাঁর স্বামীর পর্যটনের পথে নেই কোনো বিঘ্ন, নেই কোনো ভয়। সমস্ত পথটুকু তাঁকে আগলে করে রাখার যে না-দেখা শক্তির উপস্থিতি তিনি অনুভব করেন এ কামারপুকুর গ্রামে কে তাঁর নাগাল পেয়েছে?

ধীর শান্ত, আনন্দঘন মনে চন্দ্রা ভগবতী প্রণামে ক্ষুদিরামের যাত্রাপথ ধরে দেন মাঙ্গল্যপূর্ণ শিবময়।

সেই রঘুবীরের হাতের ছোঁয়া লেগে রয়েছে সেতুবন্ধ রামেশ্বর মন্দিরে। সমস্ত ভারতের তীর্থ ঘুরলে যে ফল, একমাত্র রামেশ্বরে ঘুরে এলে তার পরিপূর্ণ ফল। কেন? এই মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্র নিজহাতে শিবপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারত-সিংহলের মাঝখানে সেতু দিয়ে যে রাজা এ মন্দিরের পথ সুগম করেছিলেন ইতিহাসে তাঁর বংশ আজও সেতুপতি নামে পরিচিত।

চারিদিকে শুধু বাবুল নারকেল গাছের ঘন বনানী। স্বচ্ছ জলের সরোবর পাশে উঁচু ভূমি 'পরে এ মন্দির দূরাগত পথিককে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে। সীতার অন্বেষণে শ্রীরামচন্দ্র যখন চারিদিকে দিশেহারা ভাবে ঘুরছিলেন তখন সেতুবন্ধে শিব প্রতিষ্ঠিত করে তিনি রাবণের সাথে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন। রঘুবীরের আপন হাতে প্রতিষ্ঠিত শিব বিগ্রহ। ক্ষুদিরাম পথের ক্লান্তি ভুলে যান। শ্রান্ত পা দুখানা যেন নিজে থেকেই এগিয়ে যায়। চোখ দুটো বন্ধ করলো যেন তিনি দেখতে পান আজকাল রঘুবীর নিজে বসে চন্দনকুসুমে দেবাদিদেবের অর্চনা করছেন। পথিকের দল তাকিয়ে দেখে পরিব্রাজকের মুখ থেকে বেরুচ্ছে এক অপরূপ জ্যোতি। নিরাভরণ বক্ষ থেকে যেন নির্গত হচ্ছে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

[ক্রমশ।

অমৃত

শ্রীভুবনমোহন দাস

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
জানন্তু বিশ্বে অমৃতস্য সত্তা।
পশ্যন্তু সর্বে অমৃত স্বরূপম্
গচ্ছন্তু সর্বে অমৃতম্ নিধানম্
—সত্যালোকম্

হে অমৃতের পুত্রগণ, অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর, একরস অমৃতের সত্তা পরিজ্ঞাত হও, সত্তার সম্বেদন বা অনুভূতি হইলেই, অমৃতের স্বরূপ প্রত্যক্ষ কর এবং অমৃতের সত্তায় স্বকীয় ক্ষুদ্র জীবাত্মীয় সত্তা মিলাইয়া দাও।

কি সেই অমৃত? যে প্রাণ তুমি আমি ও জগৎ সাজিয়াছে, সেই অন্তর্যামী আত্মাই অমৃত, আমার প্রাণ বিশ্বেরও প্রাণ।

অন্তরে যে নানাভাব ও রূপ অনুভব করিতেছি সে আমার ঐ প্রাণ ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিতেছে।

বাহিরে যে বিভিন্ন বস্তু দেখিতেছি সেও আমার ঐ প্রাণ ভিন্ন ভিন্ন মূর্তি ধারণ করিয়াছে, আমি নিজেকে ঐরূপ আকারিত করিয়া ঐ ঐ বস্তু দেখিতেছি।

এইরূপ অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র ঐ প্রাণই বহুভাবে, বহুনামে ও বহুরূপে, বহু বৈচিত্র্য দর্শন করাইতেছেন।

ঐ প্রাণ বা আত্মাই অমৃতরূপী মা। ওঁকে গুরু, ভগবান, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, দুর্গা, বা কালী, যা বলিতে ইচ্ছা হয় বল।

উনি শুধু তোমার মা বলে ডাকার অপেক্ষায় তোমাকে উদ্ধারের জন্য তোমার পানে চাহিয়া আছেন।

মা-ই দৃশ্যরূপে ব্রহ্মা, প্রাণরূপে বিষ্ণু ও কর্তারূপে শিব বা মহেশ্বর এবং ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর ও তোমাকে লইয়া ব্রহ্মময়ী বিশ্বমাতা শুধু মা।

মা-ই যে ত্রিভঙ্গিমায় ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে তোমাকে আমাকে ও ব্রহ্মাণ্ড পরিচালনা করিতেছেন।

একমাত্র মা বা পরমাত্মাই—সর্বভূতে আত্মরূপে হৃদয়ে অধিষ্ঠিত। সর্বভূতকে যন্ত্রারূঢ় পুত্তলিকার ন্যায় মায়ার দ্বারা চালিত করিতেছেন।

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাম্ হৃদ্দেশে অর্জুন তিষ্ঠতি
ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্ত্ররূঢ়ানি মায়য়া।
১৮।৬১

যে সর্বভূতে আত্মাকে ও আত্মাতে সর্বভূতকে দেখে অর্থাৎ যে আত্মস্বরূপ ভগবানকে সর্বত্র দেখে এবং সর্বভূতকে আত্মস্বরূপ ভগবানে দেখে,—সে সর্বব্যাপারে পরমাত্মাতেই বিরাজ করে এবং কখনও ভগবানের দৃষ্টির বহির্ভূত হয় না।

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র, সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি, স চ মে ন প্রণশ্যতি।
৬।৩০

যিনি সর্বভূতে সকলের আত্মা বাসুদেব আমাকে দর্শন এবং সর্বাত্মা আমাতে ব্রহ্মাদি সর্বভূতকে দর্শন করেন, তাঁহার ও আমার একাত্মতাবশত আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না এবং তিনিও আমার অদৃশ্য হন না।

এই বিশ্বাত্মা বাসুদেব অমৃতের সত্তা, তুমিও যে ঐ অমৃতের পুত্র, তাঁহার সত্তায় সত্তাবান হইয়া তাঁহাকে জান। তাঁহার স্বরূপ দেখ এবং তাঁহার সত্তায় আপনার সত্তা মিলাইয়া দাও।

[গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন জার্মানীর আর্থার শোপেনহাওয়ার। কিন্তু তিনি শুধু দার্শনিকই ছিলেন না। সাহিত্য সম্বন্ধেও তাঁর চিন্তা ও মতামত সারা বিশ্বে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বহু যুগ আগে লেখা ও বলা তাঁর সেই চিন্তার ফসল আজো সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে অপরিমিত মূল্যের অধিকারী বলে মনে করি। কয়েকটি নমুনা উদ্ধার করে দিলাম। আজকের দিনের পাঠক ও লেখক উভয়েই এই লেখাগুলির মধ্যে রস পাবেন আশা করি।---লেখক]

গ্রন্থকার

শোপেনহাওয়ার বলেন গ্রন্থকার আছেন দু'রকমের। একদল আছেন, যাঁরা লেখেন বিষয়বস্তুর জন্যে, অন্য দল আছেন যাঁরা লেখেন স্রেফ লেখবার জন্যেই।

নিজের চিন্তা বা অভিজ্ঞতা বা কল্পনা---জগতকে উপহার দেবার উপযুক্ত মনে করে প্রথম দল গ্রন্থ রচনা করেন।

দ্বিতীয় দল চান টাকা। তাঁরা লেখেন টাকার জন্যে। তাঁদের চিন্তাকে তাঁরা গ্রন্থরচনা ব্যবসায়ের মূলধন বলে বিবেচনা করেন।

টাকার লোভে বই লেখা মানে সাহিত্যকে জলাঞ্জলি দেওয়া।

কি অপরিমেয় সৌভাগ্যই না আমাদের হ'ত, যদি সাহিত্যের সকল বিভাগে বই থাকতো খুব অল্পসংখ্যক—শুধু যেগুলি উৎকৃষ্ট। যতদিন লেখকরা টাকা রোজগারের চেষ্টায় (শুধু সেই চেষ্টায়) বই লিখবেন, ততদিন সে ভাগ্য আমাদের হবে না।

বড় বড় লেখকদের শ্রেষ্ঠ রচনা তখনই হয়েছে, যখন তাঁরা কেবল লেখবার প্রেরণায় লিখেছেন—টাকার জন্যে নয়।

আর একদিকে শোপেনহাওয়ার লেখকদের তিনভাগে ভাগ করেছেন।

প্রথম দলে আছেন তাঁরা, যাঁরা না ভেবে চিন্তেই লেখেন। নিজস্ব চিন্তার বালাই তাঁদের নেই। পুঁথিগত বিদ্যাই তাঁদের সম্বল। সময় সময় তাঁরা আবার সেরা বিদ্যার আশ্রয়ও নিয়ে থাকেন, অর্থাৎ অপরের বই থেকে বেমালুম আত্মসাৎ করেন। বাজারে এঁদের ভিড়ই সব থেকে বেশি।

অমরেন্দ্রনাথ মখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় দলে আছেন তাঁরা, যাঁরা লিখতে লিখতে চিন্তা করেন, অর্থাৎ লেখার জন্যেই তাঁদের যা কিছু চিন্তা, তাঁদের মনের চিন্তা দানা বাঁধে না, তাই তাঁদের চিন্তার মধ্যে প্রগাঢ়তা থাকে না। এঁদের সংখ্যাও কম নয়।

শেষের দলে আছেন সেই সব লেখক, যাঁরা নিজেদের ভবিষ্যৎ রচনা সম্বন্ধে এবং তার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অনেক মৌলিক চিন্তার পর লিখতে শুরু করেন। এঁদের সংখ্যা অতি অল্প।

সচরাচর সাধারণ লেখকরা কি করেন? তাঁরা যে বিষয়ে লিখতে মনস্থ করেছেন, সেই বিষয়ে যেসব ভাল ভাল বই ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে, সেগুলি আগেভাগে প'ড়ে নেন, তাঁদের চিন্তাকে ক্রিয়াশীল করবার জন্যে তাঁরা অন্যের চিন্তাধারার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ফল হয় এই যে, পূর্বগামী শক্তিমান লেখকের চিন্তাধারার প্রভাব তাঁদের বুদ্ধিবৃত্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, তারই ফলে তাঁরা আর কোনদিন শত চেষ্টাতেও কোন যথার্থ মৌলিক রচনা সম্পাদন করতে পারেন না, তাঁদের মৌলিকতা চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়।

পুস্তক-প্রস্তুতকারক, গ্রন্থ-সংকলয়িতা সাধারণ ইতিহাস-লেখক এবং এমনি ধরণের লেখকের দল (যাঁদের নিজস্ব কোন চিন্তা নেই) সটান অন্য বই থেকে তাঁদের লেখার বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে থাকেন। ফলে তাঁদের লেখা স্বভাবতই এমন বিশৃঙ্খল ও অস্পষ্ট হয়ে দাঁড়ায় যে, তাঁরা যে কী বলতে চাইছেন তা বুঝতেই পাঠককে গলদঘর্ম হ'তে হয়।

তাঁরা বলবেন কি? তাঁদের নিজস্ব চিন্তাই যে কিছু নেই। তাঁদের রচনা হয়---একটা ছাঁচ থেকে নেওয়া আর একটা ছাঁচের মত—চোখ-মুখের রেখা-

...লির এমন অবস্থা হয় যে, আসল ...তিটিকে হয়ত আর চেনাই যায় না।

কোনো বিশেষ বিষয়ে লেখা যে ...ট গুল আসলে বেরিয়েছে, তা তার ...বর্গামী বইয়ের তুলনায় অধিকতর ...ৎকৃষ্ট এবং সুসংস্কৃত, আর পরিবর্তন ...ানেই প্রগতি—এর চেয়ে ভ্রান্তধারণা ...ার কিছু নেই।

...হিত্যকারের চিন্তানায়ক ও সুধী ...নয়মের ব্যতিক্রম। কিন্তু সংসারে ...নিষ্টকারী অপদার্থের সংখ্যাই বেশি। ...না যথার্থ গুণী লেখকের পরিণত মত-...বাদকে বাদ দে এঁরা সাহিত্যে নতুনত্ব ...এনেছি এই কথা জাহির করেন। এইসব কপট এবং অন্তঃসারশূন্য লেখকদের সাবধানে এড়িয়ে চলা উচিত।

শোপেনহাওয়ার বলছেন, যদি ...কোনো বিশেষ বিষয়ে লেখা বই ...পড়বার ইচ্ছা হয় আপনার, তাহলে ...আপনি সেই বিষয়ে লেখা সাম্প্রতিক-...তম ও নতুনতম বইগুলির প্রতি আকৃষ্ট ...বেন না এই ভেবে যে, জ্ঞান-বিজ্ঞান ...র্বদাই উন্নতিশীল এবং নতুন বই লেখা ...হবার সময় ঐ বিষয়ে লিখিত পুরানো ...বইগুলির মর্মকথার ও সারবস্তুর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

তা হয়ত হয়েছে। কিন্তু কেমন করে? নূতন বই-এর লেখক হয়ত পুরানো বইগুলির সঠিক মর্ম উপলব্ধি ...রতেই পারেন নি। তত্রাচ তিনি ...সব ভাল বইগুলির ভাষা ও ভাবের ...রিবর্তন করে নিজের বইয়ে চালিয়ে ...দিয়েছেন। তার ফল যা দাঁড়াল ...তা সহজেই অনুমেয়। নতুন লেখক ...ন্ত বিশ্রীভাবে সেই সেই কথাগুলি ...র বইয়ে লিপিবদ্ধ করলেন, যেগুলি ...নেক সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে পূর্ববর্তী লেখক ...জের বইয়ে লিখে গেছেন।

নতুন লেখক অনেক সময় পুরানো ...কের সেরা কথা, চমৎকার উপমা ...সুন্দর যুক্তিগুলিকে ছেঁটে বাদ ফেলেন। কারণ, তাদের রস এবং ...উপলব্ধি করবার মত জ্ঞান লেখকের হয়ত নেই।

অনেক সময় দেখা গেছে, একখানা নতুন এবং অপকৃষ্ট বই বেরিয়ে সেই বিষয়ে লেখা পুরানো এবং উৎকৃষ্ট বইকে কিছুদিনের মত বাজার থেকে হটিয়ে দেয়। নতন বইখানার বিজ্ঞাপনের বাহার আর বাহ্যিক চাকচিক্য কিছু-কালের জন্যে পাঠকমহলে ধাঁধা লাগায়।

সাহিত্যে যখন একটা নতুন স্রোত আসে, তখন অনেক সময় এমনিতর আড়ম্বরের ঘটা দেখা যায়। কিন্তু যা মেকী তা বেশিদিন চলে না। গিলটির রং যেমন অল্পদিনের মধ্যেই উঠে যায়, সত্যবস্তুশূন্য লেখার স্বরূপও তেমনি কিছুদিনের মধ্যেই প্রকট হয়ে পড়ে, তখন সাহিত্য-সংসারে তার আর স্থান থাকে না।

শোপেনহাওয়ার বলছেন, নতুন বস্তু সচরাচর ভাল হয় না। কারণ, ভাল জিনিষ অতি অল্পদিনের জন্যই নতন থাকে।

If a thing is new, it is seldom good ; because, if it is good it is only for a short time new.

চিঠির যেমন ঠিকানা, বই-এর তেমনি শিরোনাম। চিঠির ঠিকানার মত বই-এর শিরোনামের উদ্দেশ্যও হওয়া উচিত তাকে ঠিক ঠিকানায় পৌঁছে দেওয়া অর্থাৎ যাঁরা ঐ রকম বই পড়বার জন্যে অপেক্ষা করছেন, তাঁদের জানান দেওয়া। বই-এর নাম সেই কারণে সুব্যক্ত হওয়া দরকার। এবং তার আকার ছোট বলে তা সারগর্ভ এবং অল্পশব্দক হওয়া প্রয়োজন। দুর্বোধ্য বা ভ্রান্ত শিরোনামযুক্ত পুস্তকের অবস্থা হয় ভুল ঠিকানা-লেখা চিঠির মত, মাঝপথে এড়িয়ে যায়, গন্তব্যস্থলে পৌঁছোয় না। অর্থাৎ সেই বই-এর সম্ভাব্য পাঠকরা তার খোঁজ পান না।

সবচেয়ে খারাপ শিরোনাম হচ্ছে সেইগুলি যেগুলি অপহৃত হয়েছে, অর্থাৎ যারা পূর্ববর্তী বই-এ আগেই কোন লেখক কর্তৃক ব্যবহৃত হয়েছে, প্রথমত তা হল রচনা চৌর্য ; দ্বিতীয়ত, লেখকের মৌলিকতার অভাবের অভ্রান্ত প্রমাণ। একটি নতুন তাজা শিরোনাম উদ্ভাবন করবার মতো মৌলিকতা যাঁর মাথায় নেই তিনি যে তাঁ। বই-এ কোন নতুন কথা শোনাতে সক্ষম হবেন, তা সহজে বিশ্বাস করা যায় না।

তারপর লেখার রীতি বা স্টাইল। শোপেনহাওয়ার বলছেন, লিখনভঙ্গী লেখক-মনের যথার্থ পরিচয় এবং মুখের চেয়ে অধিকতর নিশ্চিতরূপে লেখকের চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলে।

Style is the Physiognomy of the mind and a safer index to character than the face.

অন্য লেখকের স্টাইল অনুসরণ করা আর উৎসব সভায় মুখোশ পরে আনন্দ বিতরণের চেষ্টা করা—দুই সমান। মুখোশ যতই ভাল হোক, দীর্ঘ সময় তা দর্শকদের ভাল লাগতে পারে না, কারণ তা প্রাণহীন? জীবন্ত মুখ, সুন্দর না হলেও প্রাণহীন মুখোসের চেয়ে ঢের সহনীয়।

দেখা গেছে, সাধারণ লেখকরা অনেক সময় তাঁদের স্বাভাবিক স্টাইলকে মুখোশ দিয়ে ঢাকেন। তারা মনে করেন, তাঁদের লিখনভঙ্গী হয়ত ভাল নয়, তার চেয়ে একটা কোন আড়ম্বরযুক্ত স্টাইলের আশ্রয় নিলে তাঁদের লেখা দামী বলে মনে হবে। এই ভেবে তাঁরা সময় সময় অন্য কোন স্টাইলসম্পন্ন লেখকের লেখার কায়দা অনুকরণ করেন, নয়ত বা বড় বড় কথা দিয়ে তাদের লেখাকে খুব জমকালো করবার চেষ্টা করেন—বাহ্যিক চাকচিক্যের মোহ দিয়ে তাঁরা পাঠক চিত্তকে আকৃষ্ট করতে অভিলাষী হন।

কিন্তু যাঁরা বড় দরের লেখক তাঁরা তাঁদের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত স্টাইলে লিখতে কিছুমাত্র ইতস্তত করেন না। নিজেদের শক্তির উপর বিশ্বাস আছে বলেই তাঁরা তাঁদের চিন্তাকে অকুণ্ঠ এবং অবাধ গতি প্রদান করতে বারেকের জন্যেও দ্বিধান্বিত হন না।

যাঁদের নিজের শক্তির উপর বিশ্বাস জন্মায় নি, যাঁদের চিন্তাশক্তি দানা বাঁধে নি, তাঁরা লিখতে গিয়ে অনেক সময়েই ধার করা স্টাইলের সাহায্য নেন। আজ একরকম স্টাইলে লিখলেন কাল আবার অন্য এক স্টাইলে। নিজের শক্তির উপর বিশ্বাসহীন হয়ে পরের দ্বারস্থ হলে এইরকম মনোভাবই হয়। অন্য ধাতুর সংমিশ্রণে সোনা বানাবার ব্যর্থ চেষ্টার মত, এইসব লেখকও পাঁচরকম লিখনভঙ্গীর সাহায্যে সত্য-সুন্দর সৃষ্টি করবার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরেন।

স্টাইলের সারল্য এবং অকৃত্রিমতা লেখকের বিশেষ গুণ, তার দ্বারায় বোঝা যায়, লেখক নিজের যথার্থ রূপটিকে জগতের কাছে প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত নন। সরলতা পাঠককে মুগ্ধ করে। কৃত্রিমতা বিরক্তি আনে। সরলতা সত্যের চিহ্ন এবং তা প্রতিভার পরিচায়কও বটে।

স্টাইল ভাবের পার্শ্বচিত্র। লিখন-ভঙ্গী যদি জড়তাপূর্ণ বা অস্পষ্ট হয় তাহলে বুঝতে হবে লেখকের বুদ্ধি স্থূল এবং মস্তিষ্ক বিভ্রান্ত।

এই রকম জড়তাপূর্ণ বা অস্পষ্ট স্টাইল যে-লেখকের তাঁর কখনো সুনাম হয় না।

দেখা গেছে প্রায়শই ভাবের অস্পষ্টতা থেকেই এই জড়তা বা অস্পষ্টতার সৃষ্টি। শুধু ভাবের অস্পষ্টতাই নয়, হয়ত ভাবটিই আসলে ভ্রমাত্মক। তাই যে স্টাইল একটি ভ্রমপূর্ণ ভাবকে প্রকাশ করতে চায় তা যে আপনা থেকেই অস্পষ্ট এবং কায়ক্লিষ্ট হয়ে দাঁড়াবে তাতে আর আশ্চর্য কি।

স্টাইলকে মনোহারী করবার জন্যে অনেকে বাড়িয়ে লেখেন, বেশী লেখেন। কিন্তু অনেক সময়ে দেখা গেছে, আমরা যা বলতে চাই, অতিরঞ্জন-দোষে তার বিপরীত অর্থ প্রকাশিত হয়ে পড়েছে।

একথা সত্যি যে, ভাবকে প্রকাশ করবার জন্যেই শব্দের সৃষ্টি। কিন্তু তার ব্যবহারের যথারীতি সীমা আছে। শব্দসমষ্টি যদি সেই সীমা লঙ্ঘন করে তাহলে তাদের ভারে ভাবের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ঘটে।

মনের ভাবটি যথাযথ এবং অখণ্ড-রূপে, অবশ্য প্রয়োজনীয় বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা—এই হচ্ছে স্টাইলের একমাত্র কাজ।

সুতরাং ঘোরালো বচনবিন্যাস বাগাড়ম্বর অতিরিক্ত ভাষার কারদানি —এগুলি একান্ত বর্জনীয়। পাঠকের সময়, ধৈর্য এবং মনোযোগের মূল্য আছে, আপনার নামের জোরেই হোক বা কলমের জোরেই হোক তাদের উপর অত্যাচার করা বিধেয় নয়।

বাজে কথা লিপিবদ্ধ করার চেয়ে সময় সময় দু'চারটে ভাল কথা বাদ দেওয়াও ভাল।

যেসব লেখক তাড়াহুড়ো করে লেখেন বা অযত্নসহকারে লেখেন তাঁদের প্রতি শোপেনহাওয়ারের মনোভাব অত্যন্ত কঠোর। তিনি বলেন, যেমন নিজের পরিচ্ছদের প্রতি অবহেলার দ্বারা আমি যে সমাজে নিমন্ত্রণে গিয়েছি সেই সমাজকে অবজ্ঞা দেখাই, তেমনি, যে লেখক হেলায়-অশ্রদ্ধায় লেখেন তিনি পাঠকবর্গের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেন।

সমালোচকদের উদ্দেশ করে শোপেনহাওয়ার বলছেন, এ বিষয়ে পুস্তক সমালোচকদের লিখনভঙ্গী বাস্তবিকই হাস্যোদ্দীপক,—নিজেদের মন্দ এবং বিশৃঙ্খল লিখনভঙ্গী দিয়ে তাঁরা অপরের লেখাকে মন্দ এবং বিশৃঙ্খল বলে তীব্র সমালোচনা করেন। এ ঠিক যেন, বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতি বিচারকক্ষে এলেন তাঁর নৈশ-পরিচ্ছদ পরিধান ক'রে।

স্টাইল সম্বন্ধে শেষ কথা বলছেন শোপেনহাওয়ার: যে মানুষ নোংরা পোষাকে ভূষিত তার সঙ্গে আলাপ করতে যেমন সঙ্কোচ বোধ করি, তেমনি একখানা বই হাতে নিয়ে যদি তার লিখনভঙ্গীর মধ্যে যত্নাভাব এবং শ্রীহীনতা লক্ষ্য করি তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেই লেখা আর লেখকের প্রতি মন বিক্ষুব্ধ হয় এবং সেই বই পড়বার আর আগ্রহ থাকে না মোটেই।

হারিয়ে পাইনি যাকে

শ্রীজগৎকুমার বিশ্বাস

স্বপ্নের তূণীর থেকে এনে দিলে তীর পরাজয়,
স্মৃতির সৌরভ, শোনো, ত্যাগ কর ক্ষুব্ধ অভিমান;
যন্ত্রণার নিষ্পেষণে বিলম্বিত হবে নিরাময়
যদি না নিবৃত্ত হয় এই বেলা অন্ধ উপাখ্যান।

পাথরের নুড়ি ভেবে যাকে আমি ভ্রান্ত অবিশ্বাসে
নিক্ষেপ করেছি জলে—বাসনার প্রদীপ্ত প্রভায়
মুক্তা হয়ে জ্বলে উঠে প্রসন্ন পরিহাসে
আমাকে করলো ব্যর্থ দেহে, মনে, অবচেতনায়।

জানি না কেন যে এল অকস্মাৎ বাসনা দুর্বার;
অথবা, সে ছিল সুপ্ত হৃদয়ের গভীর কোরকে
বয়স্থা কন্যার মত, বিবাহের পরমুহূর্তে যার
আসন প্রতিষ্ঠা হয় জননী—ধাত্রীর মায়ালোকে?

তবুও বাঁচতাম যদি এখানেই গল্প শেষ হোত,
যদি না এ পৃথিবীতে চিত্রায়িত হোত পরাজয়:
অঙ্গারে হীরক হয় সত্য—তবু হীরা কখনো ও
নক্ষত্র হয় নি জানি অপার্থিব নীল দ্যুতিময়!

কোন মায়ামন্ত্রে, বলো, জন্ম নিয়ে হীরকের দেহে
জননীর দৃষ্টি পেলে নির্নিমেষ সজল করুণ?
পৃথিবীর অশ্রু তুমি? অথবা এ ব্যথাক্লিষ্ট গেহে
দুঃস্বপ্নদলিত রাত্রে ভবিষ্যের প্রসন্ন অরুণ?

বুঝেছি নিস্তব্ধ কেন সুমধুর আকাশী সংরাগ
প্রপাতের তীব্র স্রোতে যার হোত স্নিগ্ধ অভিষেক।
দুঃস্বপ্নের মৃত্যু হোক, আনো নীল আকাশের ফাগ,
অন্ধকার মুছে যাক, ব্যথা হোক অতীতের তুচ্ছ কোন
ভাব-অতিরেক!

রেডিও কার্বন ডেটিং

কার্বন নেই, এমন জীবন্ত প্রাণী বা গাছপালা গ্রহান্তরে আছে কি না জানি না, তবে পৃথিবীতে অন্তত সে রকম কিছু হঠাৎ পাওয়া যাবে না; জীববিজ্ঞানীরা অবশ্য তাই বলেন গাছপালা কার্বন সংগ্রহ করে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস থেকে। সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস আর জল মিশিয়ে গাছ তার খাবার তৈরি করে নেয়। গাছপালার একটু একটু ক'রে সংগ্রহ করা কার্বন ভোগ করে প্রাণীরা।

জীবন্ত প্রাণী বা গাছপালার কার্বনের মধ্যে সামান্য তেজস্ক্রিয় কার্বন (Radio active Carbon) থাকে; অর্থাৎ সেই কার্বন পরমাণুর কেন্দ্রিন (Nucleus) ধীরে ধীরে বিভাজিত হ'তে থাকে বহু বছর ধ'রে। মৃত্যুর হাজার হাজার বছর পরেও প্রাণীদেহের ঐ তেজস্ক্রিয় কার্বনের তেজস্ক্রিয়তা বজায় থাকে। বহু বছর আগে মৃত্যু হ'য়েছে এরকম প্রাণীর হাড় এবং মাংসে তেজস্ক্রিয় কার্বনের খোঁজ পাওয়া গেছে। পুরনো কাঠের নৌকোতে ... পোষাকে, জুতোর চামড়ায় এবং আরও বহু জৈব পদার্থে তেজস্ক্রিয় কার্বনের সন্ধান পাওয়া গেছে।

বর্তমান শতাব্দীতে মৃত জীবদেহের তেজস্ক্রিয় কার্বনের সাহায্যে তাদের বয়স মাপবার একটা উপায় আবিষ্কার ক'রেছেন। মৃতদেহের সামান্য অংশ নিয়ে, তার তেজস্ক্রিয়তা মেপে সেগুলোর বয়স প্রায় ঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হ'য়েছে ঐ উপায়ে। প্রাগৈতিহাসিক

শ্রীবিশু দাস

যুগের অনেক জিনিসের বয়সও নির্ভুলভাবে মাপা সম্ভব হ'য়েছে।

যে তেজস্ক্রিয় কার্বন পরমাণুর সাহায্যে এই নতুন বয়স নির্ণয় পদ্ধতি সম্ভব হ'য়েছে তার পারমাণবিক ওজন ১৪। এদের বলা হয় কার্বন ১৪ পরমাণু। কার্বনের মধ্যে বেশীর ভাগ পরমাণুই হচ্ছে ১২ পারমাণবিক ওজনের। এদের কোন তেজস্ক্রিয়তা নেই।

তেজস্ক্রিয় কার্বন পরমাণু তৈরি হ'লে পৃথিবী ছাড়িয়ে আমাদের যেতে হবে বায়ুমণ্ডলের অনেক ওপরে। এখানে সমস্ত বিরল গ্যাসের (Rare gases) পরমাণুর গায়ে এসে অনবরত আঘাত ক'রছে মহাজাগতিক রশ্মি—সম্ভবত এই রশ্মি আসে আমাদের ছায়াপথের বাইরের কোন জায়গা থেকে।

ঐ রশ্মি বায়ুমণ্ডলের অসংখ্য পরমাণুর গায়ে আঘাত ক'রে তাদের কেন্দ্রিন (Nucleus) গুলোকে বিভাজিত করে। কেন্দ্রিনের একটা উপাদান নিউট্রন কণা। মহাজাগতিক রশ্মির দ্বারাতে কেন্দ্রিন বিভাজিত হবার পর, মুক্ত নিউট্রন কণা ইতস্তত ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে।

বাতাসের শতকরা ৭৮ ভাগই নাইট্রোজেন গ্যাস। নাইট্রোজেন গ্যাসের ১৪ পারমাণবিক ভারবিশিষ্ট পরমাণুরা খুব তাড়াতাড়ি মুক্ত নিউট্রন কণাগুলোকে শোষণ ক'রে নেয়। নাইট্রোজেন পরমাণু একটি নিউট্রন কণা গ্রহণ করার পর একটা প্রোটন কণা নির্গত হয়; সুতরাং নাইট্রোজেন পরমাণুর ওজন সেই ১৪ই থেকে যায়, কিন্তু নাইট্রোজেন পরমাণুটা

মহাকাশচারী লোভেল ও বোরম্যান মহাকাশযাত্রা আরম্ভ করেছেন

তেজস্ক্রিয় কার্বন পরমাণুতে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়।

তেজস্ক্রিয় কার্বন (Radio active Carbon) যাকে প্রায়ই রেডিও কার্বন বলা হয়, তার অর্ধজীবন কাল (Half life) ৫,৬০০ বছর। তার মানে, আমরা যদি একশটা তেজস্ক্রিয় কার্বন পরমাণু নিয়ে কাজ আরম্ভ করি, ৫,৬০০ বছর পর মাত্র ৫০টি পরমাণু অবিভাজিত থাকবে, অর্থাৎ ঠিক অর্ধেক। বাকি-গুলোর তেজস্ক্রিয়তা নষ্ট হ'য়ে যাবে। পরবর্তী ৫,৬০০ বছরে বাকি ৫০টি পরমাণুর ২৫টি হারাবে তাদের তেজস্ক্রিয়তা। এইভাবে এগিয়ে চ'লবে তেজস্ক্রিয়তা হারাবার পালা।

মহাজাগতিক রশ্মি কোটি কোটি বছর ধ'রে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলকে আঘাত ক'রছে এবং ফলে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন তেজস্ক্রিয় কার্বন তৈরি হচ্ছে। আবার তেজস্ক্রিয় কার্বন পরমাণুগুলো বিভাজিত হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে। ব্যাপারটা অনেকটা ফুটো চৌবাচ্চায় জল ভর্তি করার মত। চৌবাচ্চা ভর্তি থাকবে তখনই যখন যতখানি জল বেরুবে ঠিক ততখানিই জল ঢুকবে।

কার্বন ১৪ পরমাণুর পরিমাণ বিশ্লেষণ ক'রে বিজ্ঞানীরা ব'লেছেন যে পৃথিবীতে যে কোন সময়েতেই প্রায় ১০০ টন তেজস্ক্রিয় কার্বন থাকে পৃথিবীপৃষ্ঠের প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটা জায়গায় প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ২'৪ তেজস্ক্রিয় কার্বন পরমাণু বিভাজি হচ্ছে—অর্থাৎ ২'৪টি তেজস্ক্রিয় কার্ব পরমাণুর ঘটছে মৃত্যু। পৃথিবী এ খানি তেজস্ক্রিয় অথচ আমরা কিছু টের পাই না। কারণ বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয় কার্বন পরমাণু তৈরি হ'ে তা প্রচুর পরিমাণে সাধারণ কার্ব পরমাণুর সাথে মিশে থাকে।

পৃথিবীপৃষ্ঠের তেজস্ক্রিয় কার্বি পরমাণুগুলোর কি হয়? আম জানি যে, সাধারণ অবস্থায় তেজস্ক্রি হীন কার্বন বাতাসের অক্সিজেনের সা মিশে জ্বলতে থাকে এবং তার ফ কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হ (অক্সিজেন কম পেলে হয় কার্ব মনোক্সাইড)। উদাহরণ হিসাবে বল যায়, আমরা যেমন কয়লা জ্বালাই, যা প্রধান উপাদানই কার্বন। সুতরাং ধ'রে নেওয়া যায় যে, আগে হোক, আ পরেই হোক পৃথিবীপৃষ্ঠের তেজস্ক্রি কার্বন পরমাণুরা অক্সিজেনের সাথে মিশে তেজস্ক্রিয় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের অণু তৈরি করে (কিছু পরিমা কার্বন মনোক্সাইডও তৈরি হয়।)।

বাতাসে সব সময়েতেই প্রচু পরিমাণে তেজস্ক্রিয়াহীন কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস থাকে। বায়ুপ্রবাহ এই কার্বন ডাইঅক্সাইডের সাথে তেজস্ক্রি কার্বন ডাইঅক্সাইডকে মিশিয়ে দিচ্ছে অনবরত। গাছ সাধারণ কার্বন ডাই অক্সাইডের সাথে তেজস্ক্রিয় কার্বন ডাইঅক্সাইডও কিছু পরিমাণে গ্রহণ করে। সুতরাং সেই সব গাছপালাতে এবং যে সমস্ত প্রাণী ঐ গাছপালা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে তাদের শরীরে তেজস্ক্রিয় কার্বন প্রবেশ করে।

উদ্ভিদ বা প্রাণী যতদিন বাঁচে ততদিন তেজস্ক্রিয় কার্বন গ্রহণ ক'রতে থাকে; মৃত্যুর পর থেমে যায় এই

আলোকচিত্র

হুড্রো প্রপাত
(রাঁচী)

—সুবীর গুপ্ত

উল্লম্ফন
—বিভূতি চৌধুরী
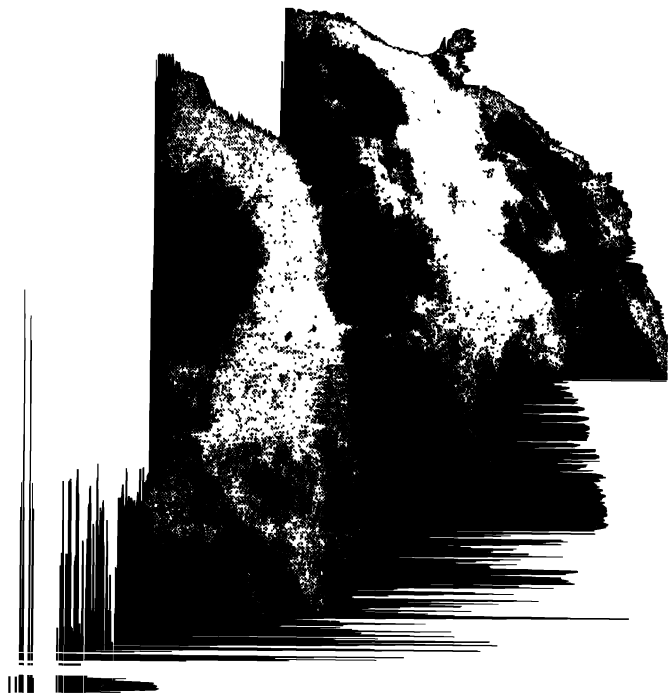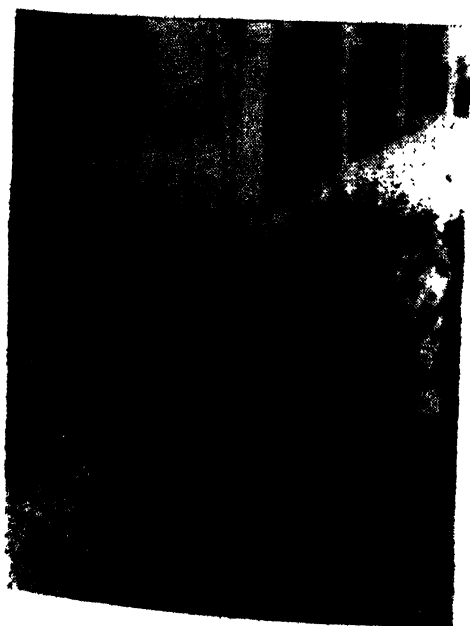
প্রতিচ্ছায়া

-বিনয় মুখোপাধ্যায়

সূর্য্যম্পশ্যা

-জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মাসিক

বসুমতী

পৌষ / ১৩৭২

ঝর্ণা-তলার অঙ্গনে —আশীষ মিত্র

ফিরকাটি

—ভোলানাথ দেব
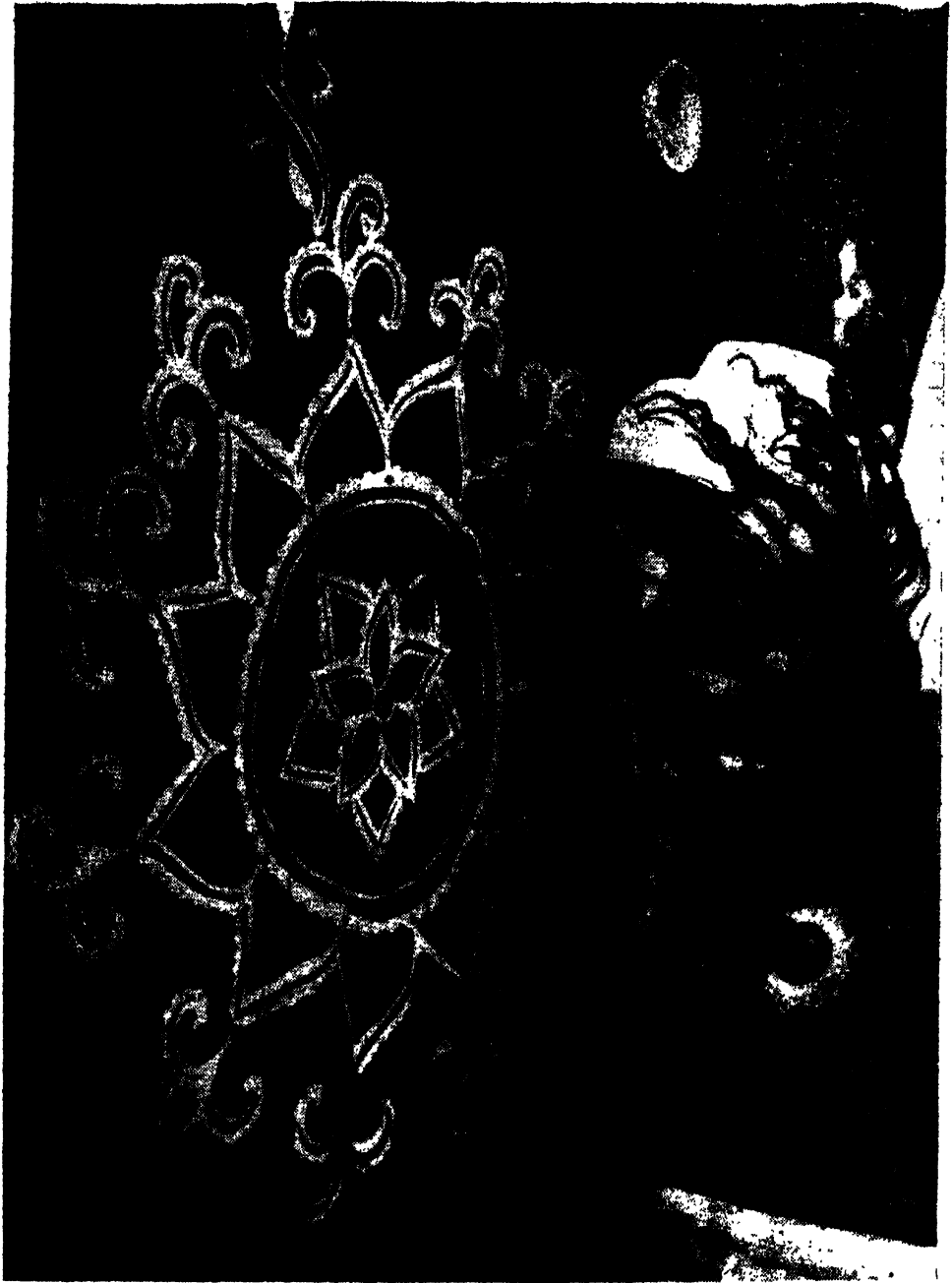
ক্রিয়া। সুতরাং মৃত্যুর ঠিক আগে যে তেজস্ক্রিয় কার্বন পরমাণু শরীরে থেকে যায় সেগুলোই বিভাজিত হ'তে থাকে, প্রতি ৫,৬০০ বছরে অর্ধেক হিসেবে, সে ক্ষতি আর পূরণ হয় না।

প্রাণীদেহে যতদিন প্রাণ থাকে ততদিন প্রতি গ্রাম কার্বনের প্রতি মিনিটে ১৫'৩টি হিসাবে পরমাণু বিভাজিত হ'তে থাকে। মৃত্যু-সময় থেকে ৫,৬০০ বছর পর বিভাজনের হার দাঁড়ায় প্রতি মিনিটে ৭'৬৫টি পরমাণু, আগের ঠিক অর্ধেক। মৃত্যুর ১১,২০০ বছর পরে বিভাজনের হার দাঁড়ায় প্রতি মিনিটে ৩'৮৩টি। এই ভাবে চ'লতে থাকে বিভাজনক্রিয়া। ২০,০০০ থেকে ৩০,০০০ বছরের শেষে বিভাজনের হার এত কম হ'য়ে আসে যে তখন তা মাপা অত্যন্ত কষ্ট-কর হ'য়ে দাঁড়ায়। কোন বস্তুতে তেজ-স্ক্রিয় কার্বনের বিভাজনের হার দেখেই তার বয়স হিসেব করা যায়—অর্থাৎ মৃত্যুর পর কত বছর পার হ'য়েছে সহজেই বোঝা যায়। এইভাবেই তেজস্ক্রিয় কার্বনের সাহায্যে বয়স মাপার পদ্ধতি বার করা হ'য়েছে।

তেজস্ক্রিয় কার্বনের পরমাণুর বিভাজন হার মাপবার জন্যে বিশেষ ধরণের গাইগার গণনা যন্ত্র (Geiger Counter) ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রটা দেখতে লম্বা নলের মত। মাঝখান বরাবর থাকে লম্বা একটা সরু তার। নলটা গ্যাসে ভর্তি করা থাকে। ঐ তার এবং নলের দেওয়ালের মধ্যে নির্দিষ্ট মাত্রার বৈদ্যুতিক চাপ (Electrical Potential) সব সময় রক্ষা করা হয়, অর্থাৎ যন্ত্রটা বিদ্যুৎগ্রস্ত করা থাকে। তেজস্ক্রিয়

● চিত্রে দৃশ্যমান এই উপগ্রহটি (তিন পর্যায়ে ডায়মণ্ড রকেটের উপর স্থাপিত) ফ্রান্স সম্প্রতি মহাকাশে উৎক্ষেপণ করে

কার্বন সমন্বিত বস্তুকে গাইগার গণনা যন্ত্রের নলের মধ্যে রাখা হয়।

একটা তেজস্ক্রিয় কার্বন পরমাণু বিভাজিত হয়, উৎপন্ন হয় একটি 'বিটা' (B) কণিকা। ঐ কণিকাটি নলের গ্যাসপূর্ণ স্থানের ভেতর দিয়ে যাবার সময় একটি অতি ক্ষীণ বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ (Electrical spark) উৎপন্ন করে; যার ফলে গাইগার গণনা যন্ত্রের সাথে যুক্ত মাপকযন্ত্রে একটি বৈদ্যুতিক ঘাত (Electrical impulse) সৃষ্টি হয়। অত্যন্ত স্পর্শকাতর যন্ত্রটির নলের ভেতর দিয়ে যতগুলি বিভাজিত কণা যায় মাপকযন্ত্র প্রত্যেকটার হিসেব রাখে।

কিন্তু, একমাত্র তেজস্ক্রিয় কার্বনই গাইগার গণনা যন্ত্রে বিকিরণের উৎস নয়। এমন কি তেজস্ক্রিয় কার্বন গাইগার যন্ত্রের নলের মধ্যে রাখবার আগেই বাইরে থেকে আসা বিকিরণের দ্বারাতে প্রতি মিনিটে প্রায় ৬০০ ঘাত লিপিবদ্ধ হয়।

ইউরেনিয়াম এবং থোরিয়াম জাতীয় তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকীর্ণ বস্তুকণা শোষণ করার জন্য গাইগার গণনা যন্ত্রের চতুর্দিকে ৬ ইঞ্চি বা ৮ ইঞ্চি পুরু লোহার পাত দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। কিন্তু বাইরের বিকিরণের আর একটি প্রধান উৎস মহাজাগতিক রশ্মির (Cosmic ray) ভেদন ক্ষমতাকে ঐ পুরু লোহার পাতও রোধ ক'রতে পারে না। সুতরাং গাইগার গণনা যন্ত্রকে আবৃত ক'রে রাখার চেষ্টা

জন্য ক'রে বাইরের বিকিরণের হারকে হিসেব থেকে বাদ দেওয়া হয়। লোহার আবরণের ভেতর পরস্পর সংযুক্ত কয়েকটি গাইগার যন্ত্র পাশাপাশি সাজিয়ে রাখা হয়, যে যন্ত্রটার ভেতরে তেজস্ক্রিয় কার্বন থাকে তার চতুর্দিকে। বাইরের গাইগার যন্ত্রগুলোকে ইলেক-ট্রনিক মাপক-যন্ত্রের সাথে যোগ ক'রে দেওয়া হয় যাতে যে কোন একটার ভেতর দিয়ে মহাজাগতিক বিকিরণের ঘাত প্রবাহিত হবার সময় কেন্দ্রীয় গাইগার যন্ত্রটাকে এক মুহূর্তের সামান্য ভগ্নাংশ সময়ের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া যায়।

লোহার আবরণ, এবং সমকেন্দ্রিক-ভাবে সাজানো গাইগার গণনা যন্ত্র ব্যবহার ক'রে বাইরের বিকিরণের দ্বারাতে উৎপন্ন প্রতি মিনিটে ৬০০ ঘাত কমিয়ে প্রতি মিনিটে ৫ থেকে ৬টি মাত্র ঘাতে নামিয়ে আনা যায়। তারপর প্রায় নির্ভুলভাবে বিশ্লেষণের কাজ চালানো সম্ভব।

৪৮ ঘণ্টা ধ'রে কোন বস্তুর নমুনা পরীক্ষা ক'রে মোটামুটি নির্ভুলভাবে সেটার বয়স বার করা সম্ভব। পরীক্ষার ফলাফলে যুক্ত এবং বিযুক্ত চিহ্ন এক সঙ্গে (±) সামান্য ত্রুটি নির্দেশ করে।

ধরে নেওয়া যাক কোন একটি নমুনা পরীক্ষা ক'রে তার বয়স স্থির করা হ'লো ১১,০৪৪±৫০০ বছর, তাহলে সেটার বয়স হবে ১০,৫৪৪ থেকে ১১,৫৪৪ বছরের মধ্যে।

ইতিহাসে বয়স উল্লেখ করা আছে এরকম পুরানো বস্তুর তেজস্ক্রিয়তা পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে লিখিত বয়সের সাথে নির্ণেয় বয়স প্রায় সমান। তেজস্ক্রিয় কার্বনের পদ্ধতির দ্বারাতে ৫০০০ বছরের মধ্যে যাদের বয়স সেই সমস্ত জিনিসের বয়স প্রায় নির্ভুল-ভাবে মাপা সম্ভব হ'য়েছে (মানুষের প্রাচীনতম প্রামাণ্য ইতিহাসের বয়স প্রায় ৫০০০ বছর)। প্রাগৈতিহাসিক বস্তুর বয়স ঠিকভাবে মাপা হ'লো কি না মিলিয়ে দেখবার অবশ্য কোন উপায় নেই। সুতরাং যাদের বয়স জানা আছে সে রকম কতকগুলো জিনিসের বয়স মেপে মিলিয়ে দেখে নেওয়া যায় এই পদ্ধতি কতখানি সার্থক।

এই পদ্ধতিতে, সামান্য একটু কাঠের টুকরো বা একমুঠো জৈব পদার্থ, যেমন পিট, একটুকরো কাপড় বা একটা সুরক্ষিত শামুকের খোলা ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। নমুনাটিতে কমপক্ষে আধ আউন্স কার্বন থাকা দরকার; সুতরাং নমুনার আকার নির্ভর করে তাতে কতখানি কার্বন আছে তার ওপর। সাধারণত যে সব নমুনা ব্যবহার করা হয় তাতে আধ আউন্সের বেশী কার্বন থাকে।

এই পদ্ধতিতে বিজ্ঞানীরা ইতি-মধ্যেই অজস্র বস্তুর বয়স স্থির ক'রে-ছেন। তাদের প্রাপ্ত ফলাফল মিলিয়ে দেখার ভার প'ড়েছে অভিজ্ঞ পুরাতত্ত্ববিদ পণ্ডিতদের ওপর। নীচে সামান্য কয়েকটা নমুনা দিচ্ছি:

যেখানে পাওয়া গেছে সেই জায়গার নাম	নমুনার আকার এবং ধরণ	বয়স (বছরে) তেজস্ক্রিয় কার্বন পদ্ধতিতে মাপা
মিশর	সাককারায় জোসারের সমাধি থেকে পাওয়া বাবলা কাঠের একটি কড়ি থেকে পাওয়া এক-টুকরো কাঠ। এই সমাধির ইতিহাসসম্মত বয়স ৪,৬৫০±৭৫ বছর।	৩৯৭৯±৩৫০
মিশর	সম্রাট তৃতীয় সিসোসত্রিসের সমাধি থেকে পাওয়া বিরাট কাঠের জাহাজ থেকে প্রাপ্ত একটি টুকরো। ইতিহাসসম্মত বয়স ৩,৭৫০ বছর। ঐ জাহাজটা বর্তমানে শিকাগোর প্রাকৃতিক ইতিহাসের যাদুঘরে সংরক্ষিত; লম্বা প্রায় ১২ ফুট। এতে ৬ ফুট লম্বা একটা কাঠের কড়ি লাগানো আছে। জাহাজের ডেকে ছিদ্র ক'রে নমুনা সংগ্রহ করা হ'য়েছে।	৩,৬২১±১৮০
মিশর	ফায়িয়াস প্রদেশের এক গোলাঘরের ধ্বংসাবশেষ থেকে পাওয়া কয়েক দানা গম ও যব থেকে পাওয়া নমুনা।	৬০৯৫±২৫০
ফ্রান্স	ফ্রান্সের মণ্টিগনেক-এ লাসকক্স গুহায় পাওয়া কাঠকয়লার টুকরো। প্রস্তরযুগের পশু-পাখীর রঙীন ছবি আঁকা আছে ঐ গুহার দেওয়ালে।	১৫,৫১৬±৯০০,
ইংলণ্ড	ইয়র্কশায়ারের পিকারিং হ্রদের ধারে, যেখানে মানুষ বাস ক'রতো এক সময়ে, সেখান থেকে প্রাপ্ত বার্চকাঠের একটি তক্তা থেকে।	৯,৪৮৮±৩৫০
যুক্তরাষ্ট্র	অরিগনের লোটরক গুহা থেকে পাওয়া তিনশ' জোড়া দড়ির তৈরী চটী থেকে। সুন্দরভাবে তৈরী ঐ চটীগুলিই বয়স মাপবার কাজে লাগানো হ'য়েছে।	৯,০৫৩±৩৫০

[বিদেশী রচনা থেকে]

ডাঃ পঞ্চানন ঘোষাল
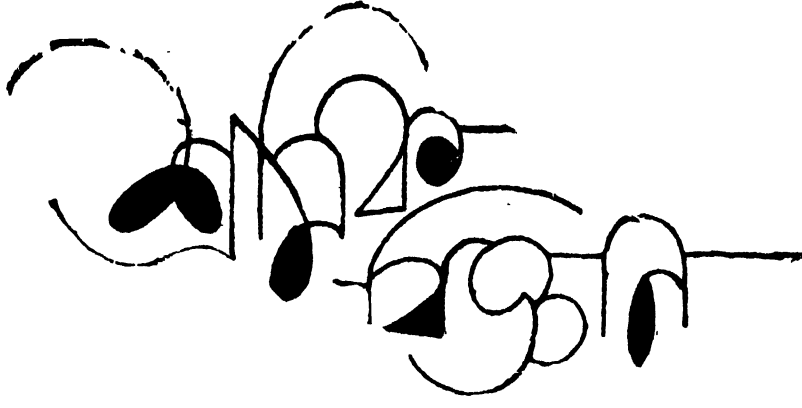
এইবার ঐ দৈব-দুর্ঘটনার উগ্রতা (Frequency) বার করার উপায় সম্বন্ধে আমি আলোচনা করবো। কোনও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক কর্মী-সম্বলিত ফ্যাক্টরিতে সংঘটিত দৈব-দুর্ঘটনার সংখ্যা দ্বারা এই দৈব-দুর্ঘটনার উগ্রতা নির্ধারিত হয়। ধরা যাউক সম্বৎসরের মধ্যে এক হাজার কর্মী-সম্বলিত ফ্যাক্টরিতে পাঁচশত দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হলো। এখানে দৈব-দুর্ঘটনার বাৎসরিক উগ্রতা (দুর্ঘটনা উগ্রতা) ধরা যেতে পারে (১০০০-৫০০ = ৫০০) পাঁচশত। কিন্তু এতো সহজে ফ্যাক্টরিতে দৈব-দুর্ঘটনার উগ্রতা সুচারুরূপে নির্ণয় করা যায় না। কারণ, বৎসরের প্রতিটি দিনের প্রতিটি ক্ষণ ঐ সংখ্যক শ্রমিকরা ফ্যাক্টরিতে শ্রম করে নি। ধরা যাউক, এক হাজার শ্রমিক সপ্তাহে মাত্র এগারো সিফটে কাজ করেছে। এরপর দেখতে হবে তারা ঐরূপ কতো সপ্তাহ কাজ করেছে। ধরা যাউক, অনুসন্ধানে জানা গেল যে তারা বৎসরে মাত্র ঐ ভাবে সপ্তাহ প্রতি ১৮ সিফট করে ৫১ সপ্তাহ কাজ করলো। এই ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে সারা বৎসরে মাত্র (৫১ x ১১ x ১০০০ = ৫৬১০০০) পাঁচ লক্ষ একষট্টি হাজার ওয়ার্কার সিফট কাজ করেছে। এইভাবে অঙ্ক কষে বুঝা যায় যে, এক হাজার শ্রমিক বৎসরে পাঁচ লক্ষ একষট্টি হাজার সিফট কাজ করে মাত্র পাঁচশত দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে। কিন্তু দৈব-দুর্ঘটনার ফ্রিকোয়েন্সি বা দুর্ঘটনা-উগ্রতা বার করতে হলে প্রতি সিফটে কতো ঘণ্টা কাজ করা হলো তা অগ্রে বার করা দরকার। ধরা যাউক, এই শ্রমিক বৎসরে একান্ন সপ্তাহ এবং প্রতি সপ্তাহে আটচল্লিশ ঘণ্টা কাজ করেছে। তাহলে তারা এক হাজার ঘণ্টা কাজের মধ্যে কতোগুলি দৈব-দুর্ঘটনা ঘটালো? এই তথ্যটি দৈব-দুর্ঘটনার ফ্রিকোয়েন্সি বার করার জন্য প্রথমে জেনে নিতে হবে। (৫১ x ৪৮ x ১০০০)। এই হিসাবমত ঐ ফ্যাক্টরির বাৎসরিক দৈব-দুর্ঘটনার উগ্রতা হবে $\frac{৫১ \times ৪৮}{১০০০}$ —২'৪৪৮। এইভাবে দৈব-দুর্ঘটনার বাৎসরিক উগ্রতা (Frequency) অনুধাবন করে ফ্যাক্টরিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন।

খনি-গর্তের দৈব-দুর্ঘটনার জন্য অধিক ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকরা দায়ী থাকেন (কোনও স্থানে বিপদজ্ঞাপক পাগলা ঘণ্টার ব্যবস্থা আজও করা হয় নি। উপরের সাথে নীচে টেলিফোনের সংযোগও থাকে না।) মালিকের অতি মুনাফা লাভের স্পৃহা দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ হয়। এইজন্য মজবুত শালবল্লী ছাদে লাগিয়ে উহার ধ্বস নিবারণ করা হয় না। বহু ক্ষেত্রে খনিজদ্রব্য অপসারণের পর উহার ফাঁক যথাযথভাবে বালু দ্বারা ভর্তি করা হয় নি। এমন কি স্বাভাবিক কয়লা বা খনিজদ্রব্যের স্তম্ভগুলি পর্যন্ত অপসারণ করা হয়। (মাটির তলাতে দ্রব্য না থাকলেও মালিকরা কর্মীদের বলেন যে, উহা আরও বেশি উঠানো হয় না কেন?) সামান্য গ্যাসজাত হলে উহার বৃদ্ধি অনুধাবন না করে উহাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে। ইলেকট্রিক টর্চের আলোর বদলে আজও কেরোসিনের আলো ব্যবহার করা হয়। ধূমপান-আদি সেখানে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় না। দায়িত্বশীল অফিসারগণ কখনও মাটির উপর হতে উহার নীচে নামতে চান না। শ্রমিকদের আত্মরক্ষার্থে গ্যাসমাস্ক প্রভৃতি এবং অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রাদি তাদের সাথে দেওয়া হয় না।

খনিগর্ভে একটি অক্সিজেনপূর্ণ হলঘর রাখলে আপদকালে শ্রমিকরা সেখানে উদ্ধারের অপেক্ষাতে আশ্রয় নিতে পারে। উপর হতে নীচে পর্যন্ত টেলিফোনসহ অক্সিজেন সরবরাহের নল এর সাথে যুক্ত রাখা যেতে পারে।

খনি-আইন লঙ্ঘন করার জন্যে অধিক ক্ষেত্রে দৈব-দুর্ঘটনার কারণ হয়। কনট্রাক্টারের অধীনে নভিশ কর্মী নিয়োগ খনি-দুর্ঘটনার অপর এক কারণ।

॥ দশ ॥

সাধারণত ফ্যাক্টরীতে কর্মের প্রয়োজনে কোনও এক পদ (post) সৃষ্ট হয়। এখানে কর্মের প্রয়োজনে পদ সৃষ্টি করে ঐ পদের প্রয়োজনে কর্মী সংগৃহীত হয়। অধুনা দেখা গিয়েছে যে, স্বজন-পোষণের জন্য প্রথমে একজন কর্মী (মানুষ) ঠিক করা হয় এবং তারপর ভাবা হয় যে তাকে তার উপযুক্ত কি পদ দেওয়া হবে। এর পর ঐ পদের উপযুক্ত কোনও কর্ম ঠিক করা হয়। এখানে কর্মীর প্রয়োজনে পদ এবং ঐ পদের প্রয়োজনে কর্ম তৈরি হয়েছে। সাধারণত স্বজন-পোষণ (নেপোটিজম) বললে আমরা যা বুঝি তদপেক্ষা এই ব্যবস্থা আরও ক্ষতিকর। এখানে কয়েকজন ব্যক্তিকে নিষ্প্রয়োজনে কাজে বহাল করে অর্থের অপচয় করা হয়।

(কয়েক ক্ষেত্রে স্টল কণ্ট্রোলারকে ফিসারি এক্সপার্ট এবং ফিসারি এক্সপার্টকে স্টল কণ্ট্রোলার করা হয়। এরূপ অবস্থাতে ফলাফল সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক। মহাযুদ্ধের সময় এরূপ ঘটনার বিষয় শুনা গিয়েছে। এর ফলে কাজ মন্দ না হলেও ভালো হয় নি। কারণ ঠাট বজায় রাখতে অযথা ব্যয়ভার বেড়ে গিয়েছে। এই অবস্থাতে হেড ক্লার্করা সেখানে প্রকৃত কর্মকর্তা হয়ে উঠে।)

বহুস্থলে কাজ-কর্মে অপারক ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হয়। ফলে সহকর্মীদিগকে নিজেদের কাজ-কর্মের সাথে ঐ ব্যক্তিরও কাজ-কর্ম করে দিতে হয়। উপরন্তু তার ভুল কাজ এবং অকাজগুলি সারবার জন্যে তাদেরকে বাড়তি পরিশ্রম করতে হয়। এই অবস্থাতে কর্মচারীদের বোধ-আনুগত্যের (morale) হানি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সাম্প্রদায়িক নিয়োগ প্রথার প্রচলন থাকাকালীন প্রায়ই এইরূপ ঘটনা ঘটতো। ভুলে গেলে চলবে না যে শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহও কোনও এক দয়া-দাক্ষিণ্যের স্থান নয়।

কারখানাসমূহে তিনটি প্রধান উপাদানের প্রয়োজন। যথা—(১) কাঁচামাল, (২) যন্ত্রপাতি এবং (৩) মানুষ। ইংরাজিতে একে পঞ্চ 'এম্' কার (M) বলা হয়,—যেন্ (men), মনি (money), মেসিন, মাইণ্ড ও মেটিরিয়াল। এই প্রবন্ধে আমি মাত্র উপরোক্ত কয়টি প্রধান

রীতিনীতি আলোচনা করবো। উদ্যোগ-শিল্পে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য প্রত্যেক উপাদান বাছাই-এর কাজে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বিত হয়। কারখানার বীক্ষণাগারে কাঁচামালসমূহ পরীক্ষা না করে তা ক্রয় করা হয় নি। উপরন্তু কর্মকর্তারা ঐ কাঁচামালের বাজারদর সম্বন্ধে যাচাই করে তবে তা ক্রয় করেন। কোন যন্ত্রপাতি ক্রয়কালে ইঞ্জিনিয়ারগণ দ্বারা উহাদের উৎকর্ষতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কারখানার প্রকৃত সম্পদ শ্রমিক বাছাই করার কোনও সুব্যবস্থা এদেশে নেই।

এদেশের ফ্যাক্টরির মালিকরা ভুলে যান যে, সকল ব্যক্তি সকল কাজের উপযুক্ত হতে পারে না। যে ব্যক্তি করনিকরূপে অকৃতকার্য হয়েছেন, সেই ব্যক্তি একজন দক্ষ কারিগররূপে খ্যাতিলাভ করেছেন। একজন যন্ত্রবিদ ফ্যাক্টরির এক বিভাগে দক্ষতা দেখালেও সে উহার অন্য বিভাগে অনুরূপভাবে দক্ষতা দেখাতে পারে নি। এজন্য সমান সুযোগ সুবিধা ভোগী দুই ব্যক্তি পাশাপাশি বসে কাজ করেও সমান দক্ষতা দেখায় নি। এর কারণ এই যে, প্রতিটি মানুষের মানসিক ও দৈহিক শক্তি-সামর্থ্য ও উহাদের গঠন প্রতিটি কাজের পক্ষে উপযুক্ত হয় না, এই কারণে বহু ব্যক্তি ফ্যাক্টরির কাজে অসফল হয়ে কর্মত্যাগ করে চলে যায়। কিংবা কর্তৃপক্ষ লোকসান বাঁচাবার জন্যে তাকে কর্ম হতে বরখাস্ত (পদচ্যুত) করতে বাধ্য হয়।

এই কারণে উপযুক্ত ব্যক্তিকে তার উপযুক্ত কর্মে নিয়োগ না করলে মালিকরা সবিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন। প্রথমত এতে তাঁদের ফ্যাক্টরিতে উৎপাদিত উৎকৃষ্ট দ্রব্য-সামগ্রীর সংখ্যা কমে যায়। দ্বিতীয়ত সেখানে অযথা শ্রমিকচ্যুতির হার (লেবার টার্ন আউট) অতি মাত্রাতে বেড়ে যায়। এই শ্রমিকচ্যুতির হার না কমলে উদ্যোগ-শিল্পের উন্নতি অসম্ভব। এই শ্রমিক-চ্যুতির জন্য মালিকরা নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকেন।

(শ্রমিক প্রবেশের সহিত শ্রমিক নির্গমনের তুলনা করে ফ্যাক্টরিসমূহের বাৎসরিক শ্রমিক-চ্যুতির হার বার করা হয়ে থাকে। নিম্নোক্তরূপে অঙ্ক কষে শ্রমিকচ্যুতির বাৎসরিক হার নিরূপিত হয়।

শ্রমিক প্রবেশ	—	১০০
শ্রমিক নির্গমন	—	৬০
		——
শ্রমিক চ্যুতি	—	৪০

সারা বৎসর ১০০ জন শ্রমিক ভর্তি হলে এবং ঐ সময়ের মধ্যে ৬০ জন শ্রমিক চলে গেলে ঐ ফ্যাক্টরির বাৎসরিক শ্রমিকচ্যুতির হার হবে ৪০ জন। ইংরাজিতে এইরূপ শ্রমিকচ্যুতিকে বলা হয় লেবার টার্ন আউট। এই বাৎসরিক শ্রমিকচ্যুতির হার বেশি হলে বুঝতে হবে যে ঐ শিল্পের প্রশাসন ব্যবস্থাতে গলদ ঢুকেছে। এর আশু প্রতিকার না হলে সর্বনাশ আগতপ্রায়।)

বিঃ দ্রঃ—কর্মক্ষেত্রে কাজ-কর্মে অপারক হলে সকল শ্রমিক তাদের কাজে ইস্তফা দিয়ে চলে যায় না। কিংবা তারা অদক্ষতার জন্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিতাড়িত হয় না। কেউ কেউ কোনও প্রকারে অন্নসংস্থানার্থে তদারকি কর্মীদের অনুগ্রহে কিংবা অনন্যোপায় হয়ে সকল অসুবিধা সহ্য করে স্বস্থানে রয়ে গেছে। কিন্তু মনের দিক হতে তারা সকল সময় পলায়নপর থাকে। জোর করে কর্মরত থাকাতে তাদের কাজকর্ম ভালো হয় না। শেষ-বেশ এদের বহু ব্যক্তি সুবিধামত অন্যত্র কাজ নিয়ে চলে যায়। তার ফলে উৎকৃষ্ট পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন অতি মাত্রাতে ব্যাহত হয়। বহু ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের অবিচার ও উৎপীড়নের জন্য বহুজন পদত্যাগ করেছে। এইরূপে শ্রমিক নিষ্ক্রমণের হারকেও বলা হয় শ্রমিক-চ্যুতি।

শ্রমিক-চ্যুতির হার বেশি হলে উদ্যোগ-শিল্পে ক্ষতি অসীম। শ্রমিক-চ্যুতিজনিত ক্ষতি সম্বন্ধে মালিকদের কোনও ধারণা নেই। এজন্য এই বিষয়ে তাঁরা মনোযোগী হন নি। বরং প্রয়োজনানুযায়ী নিষ্ক্রান্ত শ্রমিকদের স্থলে তাঁরা অবলীলাক্রমে নূতন শ্রমিক নিয়োগ করেছেন। এঁদের কেউ কেউ এ'ও মনে করেন যে এতে লাভ বৈ ক্ষতি নেই। নূতন শ্রমিকের পে-স্কেল নিম্ন হতে শুরু হওয়ায় এতে তাঁরা লাভবান। উপরন্তু স্থায়ীপদে নিযুক্ত হতে এঁদের দেরি হলে কোম্পানীর যথেচ্ছাচারের সুবিধা। এ'জন্য কেউ ফ্যাক্টরির কর্মে ইস্তফা দিয়ে চলে গেলে এঁরা উদ্বিগ্ন হন না। (আজকাল একবার ভর্তি করে শ্রমিক ছাঁটাই-এর আইনগত অসুবিধা আছে।)। কিন্তু অন্য দিক হতে এঁরা এজন্য ভীতিপ্রদরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকন। এই ক্ষতি সম্পর্কে বিবিধ তথ্য নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো। এতে বুঝা যাবে যে, শ্রমিক চ্যুতির ফলে লাভের স্থলে লোকসান হয়ে থাকে।

(১) প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও শিক্ষার অভাবে নূতন শ্রমিকরা ক্ষিপ্রগতিতে স্বল্পকালে উৎকৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদন করতে পারে নি। স্বল্পসময়ে উৎকৃষ্ট দ্রব্যোৎপাদনের জন্য যে কর্মচাতুর্য ও ক্ষিপ্রতা (ক্ষিপ্রগতি) প্রয়োজন তা অর্জন করা সময়সাপেক্ষ হয়ে থাকে। বহু ক্ষেত্রে যন্ত্রের উৎকর্ষতার অভাব দক্ষ শ্রমিকরা কর্মচাতুর্য দ্বারা পূরণ করে নেয়। কিন্তু পুরাতন শ্রমিকদের স্থলাভিষিক্ত নবাগত শ্রমিকরা এই বিষয়ে অপারক হয়।

(২) প্রয়োজনীয় অভ্যাস, দক্ষতা ও শিক্ষার অভাবে দৈব-দুর্ঘটনার সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। বহু শ্রমিক এইরূপ দুর্ঘটনাতে আহত হলে কাজ-কর্মের অসুবিধা হয়। (অভিজ্ঞতার অভাবে মেসিনসমূহ এরা ভাঙলে দ্রব্যোৎপাদনের ক্ষতি হয়ে থাকে।) উপরন্তু এজন্য ক্ষতিপূরণ বাবদ মালিকদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আনে। এমন কি দুর্ঘটনা সকল শ্রেণীর শ্রমিকদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া আনে। এমন কি সুদক্ষ কারিগরদের মনেও উহা ভীতির সঞ্চার করে।

(৩) শ্রমিক-নিয়োগ বিভাগের কর্মীদের শ্রমিক নিযোগ কালে উহাদের সহিত মূলাকাত (প্রার্থী-সাক্ষাৎ) করতে হয়। এই বাছাই-এর কাজে তাদের যথেষ্ট মেধা ও সময় নষ্ট করতে হয়েছে। উপরন্তু সংশ্লিষ্ট করনিকদের এই জন্য বহু কাগজ-পত্র (ফর্ম) নষ্ট ও সময় ব্যয় করতে হয়েছে। যে-কোনও কারণে ফ্যাক্টরিতে শ্রমিকচ্যুতি হোক না কেন সাধারণ দৃষ্টিতে উহা শ্রমিক-ছাঁটাই-এর পর্যায়ভুক্ত হয়। এইজন্য মালিকদেরও এতে কম বদনামের ভাগী হতে হয় নি। চতুর্দিকে রটে যায় যে অমুক প্রতিষ্ঠানে কোনও ভালো লোক টিকে থাকতে পারে না।

(৪) বিতাড়িত শ্রমিকদের স্থলাভিষিক্ত নবাগত শ্রমিকদের শিক্ষাদানের জন্য ফোরম্যান ও বড়ো মিস্ত্রিদের বহু কর্মকাল অযথা নষ্ট হয়। এই সময় বারে বারে এদের কাজের উপর লক্ষ্য রাখতে হওয়ায় তারা নিজেদের নির্দিষ্ট কাজ-কর্ম ভালো করে করতে পারে নি। সারা বৎসর এইভাবে মূল্যবান সময় বিনষ্ট হলে মালিকগণ সামগ্রিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। উপরন্তু শিক্ষণকালে এরা যথেষ্ট কাঁচামাল নষ্ট করে। এই সময় এরা বহু বাতিল সামগ্রী ও নিম্নমানের দ্রব্য তৈরী করে।

উদ্যোগ-শিল্পের উপরোক্তরূপ আর্থিক ক্ষতি ব্যতীত এর দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে। এইভাবে বারে বারে বরখাস্ত ও বিতাড়িত হলে তরুণ শ্রমিকদের মনে অক্ষমতার গ্লানি ও আত্মধিক্কার আসে। অথচ উহারা জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে সফল হতে পারতো। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মেধাবী বালকরা বারে বারে এইভাবে বরখাস্ত হলে বেপরোয়া হয়ে এদের অনেকে অপরাধী-জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়। এক শ্রেণীর অপরাধী সৃষ্টির ইহা অন্যতম কারণ। বলা বাহুল্য যে, না-পাওয়ার চেয়ে পেয়ে হারানো আরও কষ্টকর। কয়েক ক্ষেত্রে ইহা দেশের মধ্যে অযথা বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করেছে।

উত্তর বসন্ত

সাবিত্রী দেবী

বেদনা-বিধুর রিক্ততা আর গোপন মর্মদাহ
জীবনের শেষ প্রান্তে আমার হইয়াছে দুঃসহ।
অর্থ-বিত্ত লভিয়াছি যাহা বহুশ্রমে আজীবন
পঞ্চ-ভূতের হইবে ভোগ্য হাহাকার করে মন।

মোহ-মুদ্গর হানিয়া আমারে মোক্ষের করি ব্যাখ্যা
প্রাপ্তির আশে প্রার্থীরা দেয় ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা।
নিশি-দিন শুধু ধ্বনিছে কর্ণে স্বার্থের কোলাহল
লক্ষ্মীর ঝাঁপি লুণ্ঠিছে মোর লুব্ধ পেচক দল।

সখাত সলিলে মজিয়াছি আমি ছিল যবে যৌবন
মাতার অশ্রু করিয়াছি হেলা পিতার আকিঞ্চন।
আজি পঞ্চাশে কেহ নাহি পাশে দিতে তৃষ্ণার জল
ব্যাকুল-হৃদয়া সেবা ভরা মন নিষ্ঠায় অবিচল।

দীঘল দুইটি নয়নে মাখান প্রদীপের আলো স্নিগ্ধ
সুষমায় ভরা পুষ্পিত বালা করেছিল মোরে মুগ্ধ।
হাসি-উজ্জ্বল মুখখানি তার কৃষ্ণ অলক পুঞ্জ
দোলা দিয়ে যায় আজিও আমার স্মৃতির বেদনা কুঞ্জ।

দু-হাতে পরায়ে শঙ্খ-বলয় বাঁধিয়া মিলন রাখী
আমি যে তাহারে ডাকি নাই ঘরে আঁখিতে মিলায়ে আঁখি
ভ্রান্তি-প্রবাহে গিয়াছে ভাসিয়া আমার মানস-প্রিয়া
শুষ্ক এ প্রাণে মূর্ত মাধুরী আত্মার আত্মীয়া।

স্বার্থ গন্ধে আজও আসে নারী অকৃতদার জানি
হৃত-যৌবনা রুচি-বিকৃতা সজ্জিত দেহখানি
সহানুভূতির কত কথা বলে অর্থের লালসায়
ক্ষুধিত নয়নে লোল কটাক্ষ দেখি শুধু ঘৃণা হয়।

নববধূ লয়ে বন্ধুপুত্র ফিরিয়াছে আজ ঘরে
মধুর আলাপে মত্ত সানাই স্বাগত জানায় তারে।
মোর গৃহে কভু বাজিবেনা বাঁশী বৃথা উৎসব আলো
ঘনাইবে শুধু ধূসর সন্ধ্যা নীরব রাত্রি কালো।

আপন খেয়ালে আত্মার দাবী করিয়াছি প্রতিরোধ
আত্মজ লাগি হাহাকার আজ প্রকৃতির প্রতিশোধ।
গভীর নিরাশা প্রতীকার-হীন বিদ্রূপ করে বিত্ত
অনুশোচনার তুষানলে মোর জ্বলিছে নিয়ত চিত্ত।

শাসন-তাড়িত পৌত্র দামাল আসিবেনা ছুটি পাশে
গলাটি জড়ায়ে ধরিবে না মোর স্নেহ-প্রশ্রয় আশে
টুক-টুকে সাড়ী পরিয়া রঙ্গে বসিবেনা কেহ কোলে
কপট কলহ করিবেনা জায়া কপট ঈর্ষা ছলে।

একদিন যবে যাইব ঝরিয়া জীর্ণ পত্র সম
ব্যথিত হৃদয়ে করিবে না কেহ স্মৃতিতর্পণ মম।
স্নেহময়ী মোর জননী পৃথিবী তোমার অশ্রুজল
স্মরিয়া আমারে প্রভাত শিশিরে করে যেন ছল-ছল্।

অধুনা শ্রমিক আইনে একবার কোনও শ্রমিককে ভর্তি করা হলে তাহাকে সহজে কর্মচ্যুত করা যায় না। তাকে চার্জসিট দিয়ে বহু কানন মেনে লেখাপড়ার পর বরখাস্ত করতে হয়। এতে বিচার-বিভাগীয় তদন্তের অনুসরণ করতে হওয়ায় বহু কাল অতিবাহিত হয়। এতদ্‌ব্যতিরেকে বরখাস্ত শ্রমিকদের শ্রমিক-আদালতে অভিযোগ দায়ের কবারও অধিকার আছে। এই বাবদ আইনজীবী দ্বারা মালিক পক্ষ সমর্থনের ব্যাপারে বহু অর্থ ব্যয় হয়ে থাকে। এই বিচার বা তদন্ত শেষ না হলে তাদের স্থানে কর্মী নিয়োগ সম্ভব নয়। (উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে কনসিলিয়েশন অথরিটিও আছেন। এঁরা নানাভাবে বরখাস্ত শ্রমিককে পুনর্বহাল করানোর চেষ্টা করেন।) উপরন্তু সঙ্ঘগুলি হতে এইরূপ বরখাস্ত কালে প্রচণ্ড বাধার সৃষ্টি করা হয়। হঠাৎ কর্মচ্যুত হলে বরখাস্ত কর্মীদের স্ত্রী-পুত্রের অশেষ দুর্গতি হয়। এরা আত্মীয়বর্গের আশ্রয় থেকে বার হয়ে ঐ সময় স্বাধীনভাবে বাস করায় পুনরায় তাদের পূর্ব-স্থানে তারা ফিরে যেতে পারে না। এই জন্য তখন তাদের পুনর্বাসনের প্রশ্ন আসে। অন্যত্র চাকুরি যোগাড় করাও অনেক দিন পরে তাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠে। এইভাবে কাউকে বরখাস্ত হতে দেখলে কর্মরত দক্ষ শ্রমিকরা সহকর্মীদের উপর সহানুভূতিশীল হয়ে উঠে। মূল কারণ বুঝবার চেষ্টা না করে তারা মালিকদের উপর বিরূপ হয়। তারা ফ্যাক্টরির লাভ-লোকসানের সহিত সম্পর্ক রহিত হওয়ার জন্য এইরূপ ঘটে।

উপরোক্ত কারণে খুব বেশি অসহনীয় না হলে কর্তৃপক্ষ কোনও শ্রমিককে একবার ভর্তি করে তাকে ছাঁটাই করতে আগ্রহী হন না। ব্যবস্থাপকগণ ও তদারকী কর্মীরা বহুক্ষেত্রে ঝামেলা এড়ানোর জন্য এদের বরদাস্ত করেছেন। এর ফলে বহু অদক্ষ কর্মী তাদের কর্মে বহাল থেকে গিয়েছে। আজকাল টিম্ ওয়ার্ক ব্যতীত ফ্যাক্টরিতে ভালো কাজ হয় না। বহু দক্ষ কর্মীর সাথে মাত্র চারজন অদক্ষ কর্মী নিযুক্ত থাকলেও ঐ টিম কর্মীদের যৌথকর্মে অবনতি ঘটে। এর ফলে সামগ্রিকভাবে কাজ কমে নীচুমানের আবির্ভাব হয়।

সুষ্ঠুভাবে (বৈজ্ঞানিক পন্থাতে) উপযুক্ত কর্মী নিয়োগ দ্বারা মাত্র এই ভয়ঙ্কর অবস্থা হতে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব। সুষ্ঠুভাবে কর্মী নিয়োগার্থে বহু প্রকার পদ্ধতির প্রচলন আছে। সাধারণত প্রার্থী-সাক্ষাৎ, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পরীক্ষা, অ্যাপ্রেন্টিস গ্রহণ এবং বুদ্ধি পরিমাপ প্রভৃতি দ্বারা দক্ষ কর্মীদের নিয়োগ করা হয়। একমাত্র বৈজ্ঞানিক পন্থাতে নির্বাচিত উপযুক্ত কর্মীদের বিভিন্ন প্রকার ফ্যাক্টরির উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলা সম্ভব। এইবারে আমি এই প্রার্থী-সাক্ষাৎ এবং বুদ্ধি-পরিমাপ প্রভৃতিতে অবলম্বিত কলা-কৌশল এবং রীতিনীতি সম্বন্ধে এই পুস্তকের পৃথক পৃথক অধ্যায়ে আলোচনা করবো।

[ক্রমশ।

গেলে ঐ ফ্যাক্টরির [illegible]

শকুন্তলা এলো। ইংরেজীর অধ্যাপক ডক্টর অলক সেন দু'চোখ তুলে ওকে একটিবার দেখে নিলেন। এ মেয়েকে সাহায্য করতে মুহূর্তের মধ্যে মনটা তাঁর প্রস্তুত হয়ে গেল। মেয়েটির চোখের মধ্যে আলোর দীপ্তি দেখতে পেলেন অধ্যাপক সেন। চেষ্টা করলে হয়তো ভালো রেজাল্টই করতে পারবে। গম্ভীর অথচ সস্নেহ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'তোমারই নাম বুঝি শকুন্তলা।'

—'হ্যাঁ, শকুন্তলা চ্যাটার্জী।' মৃদু হেসে জবাব দিল শকুন্তলা। একটু থেমে আবার বলল, 'আপনি কি পারবেন আমাকে একটু সাহায্য করতে? ভারনাবাবু এই চিঠি দিয়ে আমাকে পাঠিয়েছেন।'

—'তিনি আমাকেও বলেছেন তোমার কথা।'

সলজ্জ সপ্রশ্ন দৃষ্টি তুলে তাকাল শকুন্তলা। অধ্যাপকের জবাবের জন্য আকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করছিল শকুন্তলা।

—'তা আমার অবসর সময়ে এলে একটু আধটু সাহায্য করতে পারব বৈকি,' বলেছিলেন ইংরেজীর অধ্যাপক অলক সেন।

---- প্রথম প্রথম তাঁর অবসর সময়েই শকুন্তলাকে আসতে হলো। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই অন্যরকম হয়ে গেল, শতকর্ম ফেলেও অলক সেন বসে থাকেন তাঁর লাইব্রেরী ঘরে। বিকেল চারটা থেকে ছ'টার মধ্যে শতবার পদশব্দ শুনতে পান। এইটে শকুন্তলার আসবার সময়।

আজ শকুন্তলা এলো। খাতা ও বই টেবিলের ওপর নীরবে রেখে কপালের ক্লান্তির চিহ্নটুকু মুছে ফেলতে চেষ্টা করল রুমাল দিয়ে। অলক সেন উঠে পাখার রেগুলেটারটা ঘুরিয়ে দিলেন। শকুন্তলার কপালের ওপরকার চুলগুলো এখন আর শাসন মানতে চায় না। বার বার হাত দিয়ে গুছিয়ে রাখে সে।

শকুন্তলার মুখোমুখি এসে বসলেন অলক সেন। তারপর ছোট ছোট কুশল প্রশ্নের ফাঁক দিয়ে এক সময় কাজের কথায় চলে আসেন। পড়াতে আরম্ভ করেন ওকে। গম্ভীর ছন্দে একটা কবিতার কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করতে থাকেন। তারই মাঝখানে দক্ষিণদিকের দরজার পর্দাটা নড়ে ওঠে। এই মুহূর্তে কে ঘরে ঢুকবে অনায়াসে বুঝতে পারে

কল্যাণী ঘোষ

শকুন্তলা। মিসেস সেন ঘরে ঢুকে অদ্ভুত মিহিগলায় বলে, 'আমি একটু বেরোচ্ছি, ফিরতে আজ বেশি দেরী হবে না, দশটা নাগাদ ফিরে আসব।'

—'আচ্ছা,'—হেসে অত্যন্ত ভালো-মানুষের মত জবাব দিলেন অলক সেন। আর শকুন্তলা মিসেস সুনীতা সেনের উৎকট আধুনিক সাজসজ্জার দিকে এবং তার চলে যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইল। সংসারের প্রাত্যহিক প্রবঞ্চনা থেকে তার অধ্যাপককে নিশ্চয়ই মুক্তি দিতে পারেনি এই মহিলাটি। অনেকবার তাকে দেখেছে সে। বাড়ি থেকে বেরোবার সময় স্বামীকে জানান দিয়ে যাওয়া তার পবিত্র কর্তব্য।

---- স্বেচ্ছাচারী হয়ে অধ্যাপক শকুন্তলাকে প্রশ্ন করেন, 'কি যেন বলছিলাম?' শকুন্তলা নির্নিমেষে চেয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে। কাঁচা-পাকা চুলের স্তবক নেমে এসেছে ঘাড় পর্যন্ত, চোখ দুটির মধ্যে স্তরে স্তরে মেঘ জমা হয়ে দারুণ কালো হয়ে উঠেছে। অনন্ত শূন্যের মধ্যে বিধাতার দেওয়া একরাশ বেদনার আনন্দ যেন। শকুন্তলার ঔদাসীন্য লক্ষ্য করে অধ্যাপক নিরুৎসাহ হলেন। পড়াতে আজ আর ইচ্ছে করছে না। অনেকদিনের জমে ওঠা অনেক কথা ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল। হয়তো সেটাকে রোধ করবার জন্যই একগ্লাস জলের জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। ডাক

দিলেন চাকরটাকে, 'বিষুয়া একগ্লাস জল দিয়ে যা।'

কিন্তু তার সাড়া পাওয়া গেল না।

শকুন্তলা উঠে গিয়ে গ্লাসে জল গড়িয়ে অলক সেনের সামনে ধরল। যন্ত্রচালিতের মত প্রশ্ন করলেন তিনি, 'আমি খাব?'

—'হ্যাঁ। আপনি এইমাত্র জল চাইলেন যে।'

জলটা নিঃশেষ করে স্থির হয়ে বসলেন অলক সেন। মনে হলো অনেক কাল পরে হঠাৎ একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। বড় ভালো লাগলো। অলক সেনের যৌবনোত্তর চোখ দুটি একটিবার শকুন্তলার দিকে দৃষ্টি মেলল। তাঁর দৃষ্টির মধ্যে কি ছিল শকুন্তলা জানে না। তবু তাকে মুখ নীচু করতে হলো।

সেদিন আর পড়া হলো না।

—'চা খাবে শকুন্তলা?'

শকুন্তলা বলল, 'আপনি খেলে খেতে পারি।'

—'কিন্তু তৈরী করবে কে? দাঁড়াও আমি দেখে আসছি বিষুয়া কোথায়।'

অধ্যাপকের বিব্রত ভাব দেখে শকুন্তলা বলল, —'আমিই তো করে নিতে পারি। বিষুয়াকে দিয়ে কি হবে?'

ফ্যাল ফ্যাল করে অবোধ শিশুর মত চেয়ে রইলেন অলক সেন, তারপর মুগ্ধকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'তবে তো আর ভাবনা নেই। এসো---'

একটা অনির্বচনীয় আনন্দে ঝলমল করতে লাগল শকুন্তলাও। অধ্যাপকের সঙ্গে তাঁর শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকল। এককোণে হিটার চায়ের সরঞ্জাম ইত্যাদি ছড়ানো রয়েছে। সেই দিকে দেখিয়ে দিলেন শকুন্তলাকে।

স্তব্ধ হয়ে গেল শকুন্তলা। এ মানুষটাকে এমন অমর্যাদা করতে পারা যায় কিনা ভাবছিল সে। ডঃ সেন তাঁর অন্তঃপুরে এতখানি অসহায় জেনে দুঃখ পেলো শকুন্তলা।

----চায়ের জল হিটারে বসিয়ে ঘরের এটা ওটা গুছাতে লাগলো শকুন্তলা। সেটা ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তা নিজেই বুঝতে পারল না সে।

—'তোমার পছন্দ হয়নি বুঝি আমার এ ঘর?' অদ্ভুত একটা সহজ সুরে জিজ্ঞেস করেন অলক সেন।

—'এমন করে কেউ রাখে?' ত্রস্ত হাতে খোলা বইগুলো বন্ধ করে এক ধারে সরিয়ে রাখে শকুন্তলা। ওদিকে গরম জল হয়ে গেছে। কেটলী থেকে হিস হিস শব্দ করে বাষ্প উঠছে।

শকুন্তলার হাত থেকে চায়ের কাপটা তুলে নিতে গিয়ে অলক সেনের মনে সন্দেহ জাগে, এ আমার তো? চাকর বাকরের সংসারে হঠাৎ এ বড় বিস্ময়কর লাগে তাঁর কাছে। সুনীতা আজ তাড়াতাড়ি ফিরবে। তাও রাত দশটার আগে নয়। বিষুয়া ভাত ঢাকা দিয়ে রাখবে; পড়াশোনার শেষে তাই বিনা অভিযোগে খেয়ে নেবে অলক সেন। আজ হয়তো সুনীতা এসে কাছে বসবে। অনেকদিন তাও হয় না। তার জন্য দুঃখ নেই, সকলের জন্য সব জিনিস সম্ভব নাও হতে পারে। দুঃখ কিসের?

-----কিন্তু আজ চায়ের কাপে ঠোঁট ডোবাতে গিয়ে অলক সেনের মনে হলো তুচ্ছ এককাপ চায়ের মধ্য দিয়ে শকুন্তলা যেন তাকে সেবা করবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। জীবনের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে এ কি এক পুলক-বিহ্বল অনুভূতি। কিন্তু অলক সেন সেই মুহূর্তে হঠাৎ যেন জীবনের প্রায় ফুরিয়ে যাওয়া চেহারাটা স্পষ্ট দেখতে পান, চমকে উঠে চোখ বোজেন তিনি। তাঁর মুখ দিয়ে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে---

'The wine of life keeps
oozing drop by drop
The leaves of life keep
falling one by one'

শকুন্তলার মুখে কোন কথা আসে না। এ কথার উত্তর কি দেয়া যায়?

লাইব্রেরী ঘরে গিয়ে আবার পড়ার টেবিলে এসে বসল দুজনে। অলক সেনের নির্মম নিঃসঙ্গতা অনুভব করে শকুন্তলার দু'চোখ জ্বালা করে উঠল। সপ্রশ্ন একটা দৃষ্টি তুলে অলক সেনকে কি একটা জিজ্ঞাসা করতে চাইছে সে। শকুন্তলার ওই দৃষ্টির সম্মুখে আজকের দিনটা অযাচিত, মূল্যহীন বলে আর দূরে সরিয়ে রাখতে পারে না অলক সেন। একটি নারীর পাশে আত্মহারা হয়ে বসে থাকার আনন্দ তাঁকে আস্তে আস্তে স্পর্শ করে। হোক না যৌবনোত্তর অনুভূতি। কিন্তু এর মধ্যে তিনি বেঁচে থাকার একটা আশ্বাস পেয়ে যান। ব্যাকুলকণ্ঠে বলে ওঠেন, 'Come, fill the cup.'

শকুন্তলা দেখতে পেল ডঃ অলক সেনের চোখ দুটি কি যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে। আশ্চর্য চোখ দুটি—টানা টানা, ভাসাভাসা। শূন্যদৃষ্টির আকাশে যে মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল, তাতে বিদ্যুৎ ঝিলিক মেরে উঠেছে।

কোন প্রতিবাদ এলো না শকুন্তলার চোখে। ধীরে ধীরে তারও দুচোখে মুগ্ধদৃষ্টি জেগে উঠল।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

।। তেরো ।।

রেল স্টেশনটাও জেলা সহরেই যেখানে গিয়ে ওরা সকালে টেলিগ্রামটা করে এল। বারো-তেরো মাইলের পথ। অন্যান্য বারে অন্য রকম ব্যবস্থা করা হোত, অবস্থা বুঝে; এবার জীপটা রয়েছে, তাইতে করেই নিয়ে আসবার কথা উঠল। প্রস্তাবটা করল অবশ্য লোকেশই, তারই জীপ; তবে দুই বন্ধুর পরামর্শেই।

নিতান্ত নিরর্থক জেনেও। শুধু একটা অতি ক্ষীণ আশা, যদি সকালের জরুরী টেলিগ্রামটা না পৌঁছে থাকে। শুধু লোকেশের কাছেই। তাও তো আশঙ্কার সঙ্গেই।

একটা অসহ্য অবস্থা চলেছে, এই অভিনয়। এবং যতই দিনটা এগুচ্ছে, অবশ্যম্ভাবী পরিণামটা সামনে এসে পড়েছে, ততই যেন আরও হয়ে উঠছে অসহ্য। দুরূহ হয়ে উঠছে একটা কৃত্রিম প্রসন্নতার মুখোস পরে বাড়ির চারিদিকের আনন্দমুখরতার সঙ্গে তাল রেখে যাওয়া। তবে সেও শুধু লোকেশেরই।

নিশার ধাতটাই একটু অন্য রকমের। তা ভিন্ন সেই এই নাট্যের রচয়িতা বলে, নাট্যকারের মতোই তার যেন একটা নির্লিপ্ততার ভাব রয়েছে নিজের সৃষ্টির সঙ্গে।

গাড়িটা সন্ধ্যা ছ'টা বাইশে। জীপে ঘণ্টাখানেকও পথ নয়, তবু বেলা তিনটের সময়ই বেরিয়ে পড়ল দুজনে। লোকেশের তাগিদেই।

তার যে দম বন্ধ হয়ে আসছে এটা অবশ্য নিশানাথ বুঝল, তবে বাড়িতে একটা মনগড়া জবাবদিহি দিতে হোল। সহরটা দেখা নেই, যখন যাচ্ছেই, একবার ঘুরে ফিরে দেখে নেবে লোকেশ। তাই হাতে একটু সময় রাখা। সহরে প্রবেশ করে ঘুরলও খানিকটা, সময়টা তো কাটাতে হবে কোন রকমে, তবে কি দেখল না-দেখল সেদিকে বিশেষ খেয়াল নেই। মনটা পড়ে রয়েছে কূর্ণায়, তার উৎসবের মাঝে; সেখানকার সব হাসা-চপলতা যেন উপহাসের মতো এসে কানে বাজছে।

আরও অসহ্য হয়ে উঠল যখন এই মর্মন্তুদ অভিনয়ের সময়টা দিতে হোল বাড়িয়ে। যখন এ গাড়িটা বেরিয়ে যাওয়ার পর নিশানাথ বলল---এর পরের গাড়িটা না-এসে পড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে।

বিনা প্রয়োজনে, শুধু সময় কাটানর জন্যে প্ল্যাটফরমটা বার দুই চক্কোর দিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে নিশানাথ যখন বলল কথাটা, লোকেশ শুধু বিস্ময় নয়, খানিকটা . ক্তির সঙ্গেই প্রশ্ন করল—"তার মানে।"

আজ বেরিয়ে পর্যন্ত দুই বন্ধুতে কথাবার্তা খুবই কম হয়েছে। লোকেশ স্বল্পবাক বলে নিশাও তাই থেকে গেছে, তবে একটুও টসকায়নি। ওর প্রশ্নে বেশ সহজ, কতকটা ওর রুক্ষ পদ্ধতিতেই বলল—"কেন তা একটু নিজে ভেবে দেখলেই তো বুঝতে পারবি। এটায় এলো না, এর পরেরটায় তো আসতে পারে, তাই ভাববেন না সেখানে তাঁরা?"

"তাহলে —তোর ভেতরে যদি এই মতলব ছিল তো আমায় সেখানেই বলে দেওয়া উচিত ছিল, আসতাম না।

"সেটা জানি বলেই তো বলিনি সেখানে।"

"না হ'ক তাঁদের দুশ্চিন্তার মেয়াদটা বাড়িয়ে দেওয়া"—বেশ মুখটা গোঁজ করে বলল লোকেশ।

"বাড়িয়ে দেওয়া কি কমিয়ে দেওয়া ভেবে দেখলেই তো বুঝতে

পারবি। তার ভাগ্য খুঁজবের বুদ্ধির পরিচয়,—গেলো অথচ পরের গাড়িটা দেখে এল না।"

"খুব এক বুদ্ধিমানের পাল্লায় পড়েছি!"—ওর হালকা জবাবে আরও উত্তপ্ত হয়ে জবাব দিল লোকেশ।

একটু চুপচাপই গেল, এরপর। প্রথম ঝোঁকটা কেটে গেলে লোকেশও বুঝল পরের ট্রেনটা দেখে যাওয়াই যুক্তিসঙ্গত হবে। স্টেশন রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করে চা-টোস্ট খেতে খেতে এর যৌক্তিকতাটুকু আরও স্পষ্টই হয়ে উঠল মনে। তবে মেজাজের অবস্থা তখনও এমন যে, স্বীকার করে এর যশটুকু প্রাণ ধরে দিতে পারল না বন্ধুকে। একবার বরং ব্যঙ্গের স্বরেই বলল—"তার পরেও তো গাড়ি আছে, সেটাই বা দেখে যাব না কেন তাহলে?"

নিশানাথ জবাবটা দিলও অনেকটা ঐ ধরণেরই। গম্ভীরভাবে বলল—"সে তুই বুঝবি নি।" তারপর আরও গম্ভীর হয়ে গিয়ে বলল—"লুচি মাংস ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।"

—অর্থাৎ হাজার বোকা হলেও সে-কথাটা লোকে বুঝতে পারে। ব্যঙ্গটা আরও তীক্ষ্ণ করে দিল।

ঐ ওর স্বভাব। রাগ করা যায় না ওর ওপর; কিম্বা রাগ বা বিরক্তি এসে পড়লেও পুষে রাখা যায় না, মনের এমনই একটা স্বচ্ছতা আছে ওর। এ স্বচ্ছতার জন্যই যা বলে তাতে তীক্ষ্ণতা থাকলেও তিক্ততা থাকতে পায় না। হদ্দ, ওর একটা রোগ—এই বলে নিজের মনকে মানিয়ে নিতে হয়।

রাস্তাটা বেশ ভালোই এল ওরা। নিজের সঙ্কল্পে অটুট বিশ্বাসের জন্য নিশানাথের অনুপাতের কোন বালাই-ই নেই, মুক্ত আকাশের নীচে রাত্রির স্নিগ্ধতার মধ্যে সমস্ত ব্যাপারটা ভালো করেই যাচাই করবার অবসর পেয়ে লোকেশেরও মনটা বেশ শান্ত হয়ে এসেছিল, বাড়ি পৌঁছে আবার একটু ধাক্কা খেল। বাড়ির সামনে বড় প্রাঙ্গণটায় প্রবেশ করেই। দুটো পেট্রোম্যাক্স আলো টাঙিয়ে যেন দিন করে দেওয়া হয়েছে। সমস্ত বাড়িটা বারান্দায় এসে জড়ো হয়েছে। ছেলে-মেয়েদের উৎসবের সাজে বারান্দায় এমুড়ো-ওমুড়ো সবটা ঝলমল করছে, ওরা উঠানটায় প্রবেশ করতে একটা দল ঠেলাঠেলি করে সিঁড়ি বেয়ে এল নেমে। চোখে বেশি করে পড়ল মলিনা, বড় বলেও তা ভিন্ন ওর হাতে একটা শাঁখ। মুখে তুলেই ছিল, তত-ক্ষণে জীপটা ঘুরে সিঁড়ির সামনে এসে পড়তে হাতটা আস্তে আস্তে নামিয়ে শূন্য দৃষ্টিতে খালি জীপটার দিকে রইল চেয়ে। প্রথমেই চোখাচোখি হোল লোকেশের সঙ্গে। কোন প্রশ্ন করতে পারল না। আরও কারুর কোন প্রশ্নের আগেই নিশানাথ জীপ থেকে নামতে নামতে বলল—'-এল না। আমরা পরের গাড়িটাও দেখে নিয়ে তবে আসছি।"

উৎসব-বাড়িটা হঠাৎ যেন এলিয়ে গেল। চড়া স্বরে বাঁধা তারটা হঠাৎ কি ক'রে যেন ঢিলা হয়ে গেছে।

কর্তা নিজের ঘরেই ছিলেন, একটু নির্লিপ্ত প্রকৃতির মানুষ; স্বল্প বাকও, বেরিয়ে এসে শুধু বললেন—"এল না তো?"

—প্রশ্ন নয়, প্রশ্নের আকারে মন্তব্য যেন জানা কথাই।

ওঁর কথার সঙ্গে সঙ্গেই দয়া-দেবীও বেরিয়ে এসেছেন। কিছু না বলে ওঁর কথাটিরই উত্তর কি দেয় শোনবার জন্য নিশানাথের মুখের দিকে চাইলেন। নিশা বলল—"পরের গাড়িটাও তো দেখলাম। কৈ?"

এতক্ষণে, শুধু ওঁর মুখের পানে চেয়েই যেন একটু অপরাধীর ভাব ফুটল নিশানাথের।

কনককেও দেখল, ওরা যখন ওপরে উঠে যাচ্ছে, বোধহয় বদনের সঙ্গে কোথাও ছিল, এরা উঠছে, ও—ও আস্তে আস্তে এসে সিঁড়ির রেলিঙে হাত রেখে দাঁড়াল। কেমন যেন একটা লজ্জা-লজ্জা ভাব। তার অর্থ—হয়তো এই যে, যা হোল সেটা অন্তত লোকেশের সামনে না হ'লেই ভালো ছিল।

শুধু, কোন বিকার নেই তার মনে, যাকে কেন্দ্র ক'রে এই ব্যর্থতা, এই মনস্তাপ।

বাড়ির উৎসব-কলরবটা হঠাৎ স্তিমিত হয়ে যেতে বদনেরও কারণটা বুঝতে বাকি নেই। কনক এসে দাঁড়াবার পরেই ও-ও ছাতের ওদিকে কোথা থেকে একটু চঞ্চল ভাবেই বেরিয়ে এল। বেশ বোঝা গেল নীচেই যাওয়ার উদ্দেশ্যে। এদের দেখে একটু থমকে দাঁড়িয়ে বলল—"ব্যাপার কি?—তিনজনে মুখ অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে আছেন যেন কত বড় একটা রাজ্য খোওয়া গেছে?"

খুব বড় সৌভাগ্যের মতো দারুণ দুর্ভাগ্যকেও মানুষে চট করে বিশ্বাস করতে পারে না। কনক একটু আশা যেন কোথায় ধরে রেখেছিল মনে এদের দু'জনকে না দেখা পর্যন্ত বলল—"এল না তো ওরা এবারেও।"

"এরই এত দুঃখ? আমি তো খুশিই হয়েছি।"

"দুঃখ আমারও নেই, কিন্তু এত খুশিটা কিসের বুঝছি না তো?"—প্রশ্ন করল নিশানাথ। যেমন পিসিমার সামনে তেমনি বদনের সামনা-সামনি হয়ে ও যেন গেছেই একটু অস্বস্তিতে পড়ে, তা সে যতোই অল্প হোক। কথাটাও এমন বলল যার বিশেষ কোন তাৎপর্য নেই, কিছু একটা বলতে হয় তাই বলা।

বদন বলল—"বাঃ খুশী হব না! কেউ আজ পর্যন্ত পারল না আনতে, আপনি গেলেন আর নিয়ে এলেন—এ বাহাদুরি সহ্য করতাম কি করে?"

সঙ্গে সঙ্গে লোকেশের দিকে চেয়ে বলল—"মাফ্ করবেন, আপনাকে ধরে মোটেই বলছি না ----"

"এলে অবশ্য তখন অন্য রকম!—" লোকেশের দিকে চেয়ে টিপ্পনি করল

নিশানাথ। বলল—"তখন বলত—বাঃ কি পয়মন্ত লোক। দেবদূতের মতন গেলেন আর সঙ্গে সঙ্গে এসে হাজির করলেন।"

"বলতুমই তো, কারুর হিংসে হয় তো করব কি?"—একটু যেন লজ্জায় রেঙে গিয়ে তখনই আবার তাড়াতাড়ি উল্টে নিল কথা বদন, বলল—"তা উঠে আসুন। একটু চা-টা খাবেন তো, এতটা মেহনৎ ক'রে এলেন।"

"সে সব আমাদের হয়ে গেছে"—নিশা বলল—"তোমায় ভাবতে হবে না। চা-টোস্ট-চপ-অমলেট-ফ্রাই---।"

"ওরে শোন কনক।"—দু'হাতে মুখের অর্ধেকটা ঢেকে একেবারে ফুকরে হেসে উঠল বদন, বলল—"এই মানুষকে পাঠান হয়েছিল তাদের আনতে। নিজের খ্যাটের চিন্তা থেকেই ফুরসৎ নেই চর্বচোষ্য---"

হঠাৎ থেমে গেল, নিশ্চয় লোকেশের কথা মনে পড়ে যেতেই। চাপা হাসি সামলাতে সামলাতেই আঁচল দিয়ে চোখ দুটো মুছে নিয়ে একটু লজ্জিতভাবেই বলল—"কি জ্বালায় পড়েছি। উনিও যে কি মনে করছেন —না বলেও পারা যায় না,—তুই এক কাজ কর সই --ভাই কনক—দেখ একটু এঁদের —আমি নীচে যাই, নেমন্তন্নর সবাই এসে পড়ছে---ওদিকটা ঢিলে পড়ে যাবে---"

বলতে বলতেই সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল, নিশ্চয় পালিয়ে বাঁচবার জন্যই। একেবারে নীচের দিকে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে গলা তুলে বলল—"কিছু না তো একটু চা নিশ্চয় খাইয়ে দিবি ঘরে নিয়ে গিয়ে।"

সেদিনটা লোকেশের একরকম এইখানেই শেষ হয়ে গেল। চায়ের হাঙ্গাম করতে দিল না কনককে। বদন কাছে না থাকলে দুই সখীরই অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ে; মলিনা অবশ্য একেবারেই কাঠের পুতুলের মতো।

নেমে গিয়ে বাঁচল কনক। ও চলে গেলে জামা-জুতো ছাড়ার সঙ্গে দুই বন্ধুতে অল্প একটু কথাবার্তা হোল, সাধারণত ব্যাপারটা সম্বন্ধে বাড়ির প্রতিক্রিয়া নিয়ে, বিশেষ করে বদনের দিক থেকে, তারপর নিশানাথও নেমে গেল। নিমন্ত্রিতরা এসে পড়ছে, ওদিকটা সামলাতে হবে।

লোকেশ আর নামল না। কিছুক্ষণ পায়চারি করল বারান্দায়। নিজের চিন্তা নিয়ে; মাঝে মাঝে রেলিঙের ধারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। উৎসবটাতে হঠাৎ শুধু যে ভাঁটা পড়ছে তাই নয়, যা কানে এসে পৌঁছাচ্ছে, যা চোখে পড়ছে তাতে ট্রাজেডিটা আরও যেন গাঢ় হয়ে উঠছে ওর কাছে। মেয়েদের মধ্যে সহানুভূতি, যতদূর আন্দাজ করছে যেন আহার করতে বসেই যার জন্যে শুধু কৃত্রিমতাই নয়, সে সহানুভূতির মধ্যেকার ব্যঙ্গটুকুও প্রকট হয়ে উঠছে।---সামনের বারান্দায় এসে দ্যাখে বয়স্ক গোছের জন তিনেক ভদ্রলোক কর্তার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন কিছু না আহার করেই। ভালোই লাগল লোকেশের। কাণ্ডজ্ঞান আছে, তবে এতেও তাদের দরদের সঙ্গে কর্তাকে বুঝিয়ে বলা, তার সঙ্গে কড়া পেট্রোম্যাক্সের আলোয় কর্তার মুখের অপ্রতিভ ভাব ট্রাজেডির একটা দিক যেন আরও ফুটিয়েই তুলেছে। সরে এসে বারান্দার কোণে দাঁড়াল এটা এই টানা বাড়ির শেষ। নীচের দিকটা অবহেলিতই, কেন্দ্র থেকে দূরে হওয়ায় পেট্রোম্যাক্সের আলোটাও এসে পৌঁছায় নি ভালোরকম।

জনচার-পাঁচ যুবা একত্র হয়েছে, একটু দৃষ্টি এড়িয়ে ধূমপানের জন্য। হয়তো উৎসব-বাড়িরই টিনের কৌটার অভিজাত সিগারেট, গন্ধ ভেসে আসছে ওপরে। তার সঙ্গে ওদের বিশ্রম্ভালাপ—

"বোকামি ওঁদের-- বাঃ, তা'হলে খ্যাঁট বাদ দিতে হবে?---হি-হি, ঐ রকম একটা---মেয়ে জীওনো থাকে গাঁয়ে"---

।তকটা নিজের চিন্তার সঙ্গে অন্যমনস্কভাবেই. শুনে যাচ্ছিল লোকেশ, ছাড়াছাড়া হয়ে কানে আসছে, এর পর আর দাঁড়াতে পারল না।

চলে এল ভেতরের দিকের বারান্দায় তাড়াতাড়ি, যেন আরও শোনবার ভয়ে পালিয়েই।---বদনের গলা। কর্মব্যস্ত বদন, বোধহয় পরিবেশন নিয়ে পড়েছে, মুক্ত কণ্ঠ, এতটুকু স্খলন নেই কোথাও বা এতটুকু জড়তা, একটু যেন চটুলও।

এ আবার ট্রাজেডির আর একদিক সত্যই কতখানি মুক্ত বদনের মন? গোপন করতে হচ্ছে নিজেকে স্বাচ্ছন্দ্যতার একটা প্রলেপ দিয়ে? নিজের জীবন নিয়ে কতখানি পরিহাস রয়েছে এর মধ্যে?

সমস্ত দিন মনের ওপর একটা অসহ্য ভার, যাওয়া-আসার ক্লান্তি, তার ওপর এই সব, দেহমন একেবারে অবসন্ন করে এনেছে। বুঝছে নীচে গিয়ে একটু সাহায্য করলে ভালো হোত। ঐ বয়সের কিছু আরও লোক হয়তো বিদায় নিয়ে গেছে, কিছু স্ত্রীলোকও হয়তো; বাকি সবাই তো রয়েছেই। বিশেষ করে ছেলে-ছোকরা, যুবক-যুবতী এবং আরও খানিকটা উর্দ্ধ বয়সের যারা। গ্রাম্য সমাজ, বিশিষ্ট পরিবার, পাকা দেখার খাওয়ানো হ'লেও বিবাহের ভোজের মতই দাঁড়িয়েছে প্রায়। এবারে দয়াদেবী খানিকটা স্থির নিশ্চিন্তও ছিলেন।

ভালো হোত গিয়ে একটু কাজে ভিড়ে গেলে।

কোনমতেই কিন্তু পারল না মনটাকে যুক্তি দিয়ে রাজি করতে। এক সময় ক্লান্তিতে-অবসাদে, তার সঙ্গে কতকটা আর কিছু দেখাশোনার অনীহার জন্যও ঘরের ভেতর গিয়ে খাটে শরীর এলিয়ে দিল।

[ক্রমশঃ

সকলের মা সারদামণি

বর্তমান কালকে নিঃসন্দেহে যুগ-সন্ধিক্ষণ বলা চলে। একদিকে বরাভয়, অপর দিকে ধ্বংস। আধুনিক সভ্যতা বিজ্ঞানের প্রসাদে দৈনন্দিন জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়াবার চেষ্টা করুক না কেন, অশান্তির আগুন ক্রমেই যেন বেড়ে চলেছে। প্রত্যেক মানুষ আজ শান্তি খুঁজছে।

এইরকম প্রতিকূল পরিবেশে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ যে উন্মার্গগামী হয়ে উঠবে এ কথা শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বহু আগেই বুঝেছিলেন। সাধারণ মানুষ কিভাবে দেবতার স্তরে উঠতে পারে তার পথ তিনি প্রশস্ত ক'রে দিয়ে গেছেন। পরমহংসদেবকে অবতার ব'লে যদি স্বীকার না-ও করা যায়, তাঁর দেবদুর্লভ আচার ও আচরণ চিরকাল ধ্রুবতারার মতো মানুষের ইতিহাসে উজ্জ্বল হ'য়ে থাকবে। আর অবিস্মরণীয় হ'য়ে থাকবে মানুষকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর নিরলস প্রয়াস।

অন্তরঙ্গ শিষ্যদের তিনি রেখে গেছেন উত্তরকালের লক্ষ্যভ্রষ্ট মানুষের জীবনে আশার আলো দেখাবার জন্য। আর রেখে গেছেন ভারতীয় নারীর আদর্শের প্রতিমূর্তিরূপে মা সারদামণিকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের দেহরক্ষার পর সারদামণি পৃথিবীতে থাকতে চান নি। স্বপ্নে ঠাকুর তাঁকে বলেন যে, তাঁরই আরব্ধ কাজ শেষ করার জন্য মাকে পৃথিবীতে কিছুদিন থাকতে হবে। যে কাজ ঠাকুরের সম্পন্ন করা হয় নি, মা সেই কাজ শেষ করবেন।

প্রত্যেক মানুষ চায় একটি আশ্রয়। শোক-দুঃখে জর্জরিত হ'য়ে হৃদয় জুড়োবার জন্য আমরা কার কাছে ছুটে যাই? মায়ের কাছে। সারদামণি হলেন সেই পরম আশ্রয় সকলেরই মা।

ভাবীকালের মেয়েদের মধ্যে মাতৃভাবের অভাব ঘটবে, একথা ঠাকুর জেনেছিলেন। নারীর চরম সার্থকতা মাতৃত্বে। মায়ের মত এমন আপনজন সংসারে আর কেউ নেই। সন্তান মাতৃগর্ভে আসার সূচনা থেকে গর্ভধারিণীকে অসীম ধৈর্য ও কষ্টের মধ্যে অপেক্ষায় দিন কাটাতে হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার পূর্ব মুহূর্তের যন্ত্রণা একনিমেষে জননীকে ভুলিয়ে দেয়, এমনই মহিমা মাতৃস্বাদের।

সন্তানের কাছে আজীবন মা পালয়ত্রী, শিক্ষয়িত্রীরূপে নিজেকে বিলিয়ে দেন। মায়ের কাছে অকপটে সন্তান নিজেকে ব্যক্ত করতে পারে। কোনও সঙ্কোচ, কোনও দ্বিধা থাকে না মা ও সন্তানের মধ্যে। যত অন্যায়,

শ্রীমিনতি গঙ্গোপাধ্যায়

যত দোষই করুক না কেন, সন্তান জানে মায়ের কাছে তার ক্ষমার শেষ নেই।

এই প্রসঙ্গে মহাকবি গিরিশচন্দ্রের একটি কথা মনে পড়ছে। একদিন সখেদে ঠাকুরকে তিনি বলেছিলেন, "যদি আগে জানতুম তুমি আসবে, তবে চুটিয়ে পাপ ক'রে নিতাম আরও।"

ঠাকুর সহাস্যে উত্তর দেন, "পাপ কি রে? তোর এত অহঙ্কার কেন? তুই কত পাপ করতে পারিস যা আমার মা ক্ষমা করতে পারে না? তুলোর পাহাড় যে রে, একফুঁয়ে সব উড়ে যায়।"

মহাকবি যেন আশ্বাস পেলেন। ভরসা এলো তাঁর, সত্যিই মায়ের করুণার কোনও ইতি নেই। সন্তানকে বুকে তুলে নেবার জন্যে মহামায়া তো সব সময়ে এগিয়ে আসেন। কিন্তু সে আশ্রয় খোঁজে ক'জন?

শ্রীরামকৃষ্ণ একটি উৎকৃষ্ট ও সহজ উপায় মানুষের কাছে তুলে ধরলেন, ভগবানকে মাতৃভাবে অর্চনা করা। অবোধ শিশুর সমস্ত নির্ভরতাই তার মায়ের ওপর। পার্থিব জীবনে আমরা ভগবানকে মায়ের আসনে বসিয়ে যদি সম্পূর্ণভাবে নিজেদের ভার তাঁর ওপর ছেড়ে দিতে পারি, তবে শান্তি আসতে পারে আমাদের জীবনে। শ্রীঅরবিন্দ এই পন্থাকেই বলেছেন 'আত্মসমর্পণ।'

ভালবাসায় আর ভক্তিতে পাথরের মূর্তিও যে সজীব হ'য়ে ওঠে, ঠাকুর দেখালেন তাঁর সাধনায়। নিজের সমস্ত 'অহং' মায়ের পায়ে বলি দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে পারলে মা যে সব ভারই নেন—তাও অনেকেই প্রত্যক্ষ করলেন ঠাকুরের শিক্ষায়।

জাতি সংগঠনে প্রয়োজন সুশিক্ষিতা জননীর। শিক্ষিতা বলতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীর অধিকারিণী বোঝায় না।

যে, শিক্ষায় প্রকৃত মানুষ তৈরি করতে পারা যায়, বর্তমানকালে মেয়েদের সেই শিক্ষারই প্রয়োজন। পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলতে গিয়ে মেয়েদের বিশেষ গুণগুলি নষ্ট হ'য়ে যেতে বসেছে। গার্হস্থ্য জীবন ক্রমেই বিপন্ন হ'য়ে উঠছে। নিজেদেরই সৃষ্ট সমস্যায় আজ বেশির ভাগ গৃহস্থই বিপর্যস্ত। পরিবারের মধ্যমণি গৃহিণী গৃহ-বিমুখ হ'লে এ ভাঙ্গন রোধ করা শক্ত।

আদর্শচ্যুত হ'য়ে হিন্দুনারীর নানাদিক থেকে অধঃপতন ঘটেছে। অনেক পরিবারই আজ বাঁচবার উপায় খুঁজছে। তথাকথিত আধুনিক শিক্ষায় দূষিত আবহাওয়া থেকে আমাদের এখন রক্ষা করতে পারেন মা সারদামণি। স্বধর্মচ্যুত নারীসমাজকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে এসে সম্মানে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে তাঁর মত ও পথ।

মা সারদামণির ঠোঁটে রং নেই, নখে পালিশ নেই, পরিচ্ছদে কোনও বাহুল্য না থাকলেও শরীর অনাবৃত নয়, বর্তমান যুগে নারীর এমন রূপ কল্পনা করাও বোধহয় কঠিন। কিন্তু এই নিরক্ষরা গ্রাম্য মেয়েটি যাঁদের পুজো পেয়েছিলেন তা ভাবলে লজ্জায় মাথা হেঁট হ'য়ে যাবে অনেক আধুনিকার। দেশ-বিদেশের মনীষীরা এখনও তাঁকে বুঝে উঠতে পারলেন না। মা সারদামণির সামান্য ইচ্ছাটুকু প্রকাশ করামাত্র স্বামী বিবেকানন্দ তা পূরণ করার জন্যে তৎপর হ'য়ে উঠতেন।

সারদামণি সকলেরই মা। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, ইতর-ভদ্র সবাই ভেবেছে মা তার নিজের। কোথাও ভালবাসার তারতম্য নেই। প্রত্যেকেরই ধারণা, মা তাকেই বেশি ভালবাসেন, তার মঙ্গলই বেশি চান। বাস্তবিক, এমন সমুদ্রের মতো বিশাল হৃদয় আর কোথাও পাওয়া যাবে না।

হাজার হাজার দুঃখ-ক্লিষ্ট রোগ-জীর্ণ সন্তান সেই বিশাল হৃদয়ের করুণা কণা পেয়ে ধন্য হয়েছে। মধ্যরাত্রে মাতালের ডাকেও মা উঠে এসে জানলায় দেখা দিচ্ছেন। বস্তিতে কুলিসর্দার বউকে মারছে, চেঁচিয়ে ব'কে তাকে থামাচ্ছেন। দুর্দান্ত স্বামীর অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মেয়েরা এসে কেঁদে পড়ছে। তাদের সান্ত্বনা দিয়ে মা বলেন : "মেয়েদের এ অবস্থা থাকবে না, এরা একদিন উঠবেই, কিন্তু তার ফলও ভাল হবে না।"

মায়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে।

তাঁর মন যে কতো বড় তার কোথাও তুলনা নেই জগতে। ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে এক আসনে বসে গল্প করা তখনকার দিনে অভূতপূর্ব ব্যাপার ছিল। বিদেশিনীকে স্পর্শ করলে জাত যাবে এমন সংস্কার কেন মায়ের থাকবে? বিদেশিনীও যে তাঁর মেয়ে। আমজাদের উচ্ছিষ্ট তুলতেও মায়ের কোনও দ্বিধা হয়নি। মুসলমান ব'লে ঘৃণা হয়নি, সে-ও তো মায়ের ছেলে।

সন্তানদের যেভাবে সেবা করেছেন মা, তা যেমন বিস্ময়কর তেমনই শিক্ষণীয়। দর্শনার্থীর কি ক'রে পথ-ক্লান্তি দূর করবেন, মা যেন তা ভেবে পেতেন না। নিজের শরীর যতই খারাপ থাকুক না কেন, কেউ দর্শন না পেয়ে মনোকষ্টে ফিরে যাবে তা মা সহ্য করতে পারতেন না। সন্তানের মনে শান্তির প্রলেপ দেবার জন্যে মা সর্বদা উদ্‌গ্রীব হ'য়ে থাকতেন। তাঁকে উদ্দেশ ক'রে ভক্ত অঞ্জলি দিতে পারেন :

"সকল দুঃখের বোঝা বয়ে নিয়ে,
আমারে করিতে সুখী
জননী আমার, দিবস রজনী
রয়েছে যে উন্মুখী।"

যুগে যুগে অবতারের সঙ্গে তাঁর লীলাসঙ্গিনী এসেছেন পৃথিবীতে। সমাজে ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হ'লে নারায়ণ স্বয়ং আসেন 'দুষ্টের দমন আর শিষ্টের পালন' করার ভার নিয়ে। নররূপী নারায়ণ একলা আসেন না, সঙ্গে আসেন শক্তিরূপিণী মা। শ্রীরাম-অবতারে সীতা, শ্রীকৃষ্ণ-অবতারে রাধা, শ্রীচৈতন্য অবতারে বিষ্ণুপ্রিয়া আর শ্রীরামকৃষ্ণ অবতারে সারদামণি। এঁরা পৃথিবীতে আবির্ভূতা হয়েছেন সকলের মধ্যে শক্তি সঞ্চারের জন্যে, ত্যাগ ও সেবার ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যে। এঁরা এক একজন ধৈর্য আর সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। এই শক্তিরূপিণী মায়েরই অংশ হ'লো প্রত্যেক নারী। বর্তমানে সেই শক্তি নানা কারণে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে। মাতৃজাতির অন্তর্নিহিত শক্তিকে পুনরুদ্দীপিত ক'রে তোলার জন্যে চাই ঐকান্তিক নিষ্ঠা আর অভীপ্সা।

যাঁরা মা সারদামণির পথ বেছে নেবেন তাঁদের ভয় নেই। তিনিই তাদের হাত ধরে নিয়ে যাবেন সার্থকতার তীর্থে। তাঁর আধ্যাত্মিকতা বা সমাধি—এসব সাধারণ মেয়ের কাম্য নয়। তাকে অনুধ্যান করলে সব সংশয়ের কবল থেকে মুক্ত হ'য়ে সকলেই পরম অভীষ্ট লাভ করতে পারবেন।

এই আশ্বাস স্বয়ং ঠাকুরই দিয়ে গেছেন।

আশার সমাধি তরে আমি বেঁচে রই

আলেকজাণ্ডার পুশকিন

আশার সমাধি তরে আমি বেঁচে রই
আমার সকল স্বপ্ন ধূলিসাৎ ওই।
বাকি যাহা আছে তাহা, শূন্য এ চিতে,
নিষ্ফল আগুন শুধু ছাই করে দিতে।

নিয়তির বজ্রাসম ক্রূর অভিমানে
বসন্ত-কুসুম চূড়া ম্লান করে আনে ;
রুদ্ধদ্বারে হতবাক স্তব্ধ একা আমি,
বিদায়ের এল শেষ যবনিকা নামি।

পরাজিত, শেষ হিম বাতাসের চাপে
শনশন শীত যবে আকাশেতে কাঁপে,
একেলা উন্মুক্ত এক তরুশাখা 'পর
পড়ে থাকা শেষ পত্র কাঁপে থরথর।

অনুবাদিকা—অজন্তা সান্যাল

চেনা শোনার বাইরে

অমিতা রায়

॥ এক ॥

১৪ই আগস্ট ১৯৫৯। শরৎ তখন সবে এসেছে, অথচ বর্ষা একেবারে—বিদায় নেয় নি। তিন-চারদিন ধরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি আর কালো মেঘের ভ্রূকুটির পর সেদিন সকালবেলা চারদিক ঝলমলিয়ে রোদ উঠল আর উজ্জ্বল আকাশের পটে জল-ঝরানো সাদা মেঘগুলোর ভেসে বেড়ানো দেখে মনের দুশ্চিন্তাও গেল কেটে।
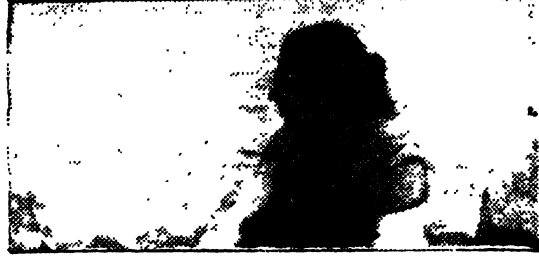
কিন্তু একেবারে স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল তখনই, যখন ঠিক টাইম-টেবলের টাইম ধরে 'ক্যানটাসের' প্লেনটা মাটি ছেড়ে উঠে এক-পলকের মধ্যে সেই মেঘগুলোকে নিচে ফেলে চলে গেল আরো ওপরে—একেবারে দিগন্ত-নীলিমার মাঝখানে। সিট-বেল্টটা খুলে ফেলে নড়েচড়ে বসলুম। ব্যাগের মধ্যে আর একবার দেখে নিলাম—পাসপোর্ট, হেল্থ সার্টিফিকেট, ট্রাভেলার্স চেকের বই—সব ঠিক আছে। সেই সংগে আছে বুখারেস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশপত্রটাও। গত দু' মাস ধরে এই ক'খানা কাগজের জন্য কত লেখা-লেখি, কত হাঁটাহাঁটি। অবশেষে সব ঝঞ্ঝাট চুকল। এখন ভবিষ্যৎ। এমন দেশে চলেছি যার সম্বন্ধে কোন খবর জানা নেই, কোন বই নেই, চেনা-অচেনা কোন লোকের মুখে কোন বিবরণ পাই নি। এর আগে আর কোন ভারতীয় মেয়ে ওখানে থেকেছে ব'লে শুনি নি, বিশ্ববিদ্যালয়ে তো পড়ি-ই নি। কি যে আছে সেই লৌহ-যবনিকার অন্তরালে কে জানে।

প্লেন ছাড়তে না-ছাড়তেই সাদা স্কার্ট সাদা ব্লাউজ পরা, ষব করা কোঁকড়া চুল, এয়ার হোস্টেস এগিয়ে এলেন। রাঙানো ঠোঁট স্মিতহাস্যে বিকশিত ক'রে বললেন: Set your watch at Karachi time, please.

একোরিয়ের সমুদ্রতীরে লেখিকা
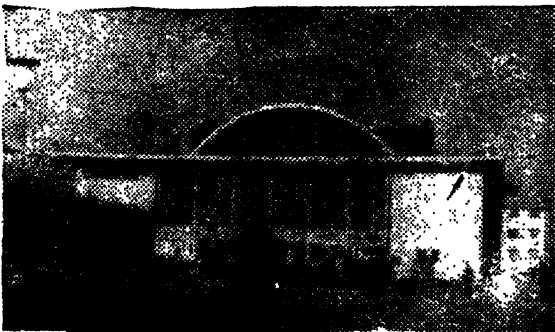
একটু থেমে আর একটু হেসে যোগ করলেন—3 P. M. আমার ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখলাম তার কাঁটা নির্দেশ দিচ্ছে সাড়ে তিনটে। কোলকাতার সময়। পাশ্চাত্যের অগ্রগতির সংগে তাল রাখার প্রথম পদক্ষেপ কি হবে সময় পিছিয়ে দেওয়া। ভাবতেই মজা লাগল। এয়ার হোস্টেস বোধহয় সেটা বুঝতে পেরেই বললেন:

—It is a terrible feeling, isn't it?

Terrible-ই বটে। কত সন্ধ্যায় রেডিওতে লণ্ডনের খেলার ধারা-বিবরণী শুনতে শুনতে উজ্জ্বল দিনের আলোর কথা শুনে মজা পেয়েছি। ভূগোল-বিজ্ঞানের সাধারণ জ্ঞান বিস্ময়কে মারতে পারে নি। কিন্তু পৃথিবীর সংগে সূর্যের এই গোলমেলে সময়ের খেলায় যে নিজেই একদিন জড়িয়ে পড়ব তা' কি তখন জানতুম। এই তো আধঘণ্টা আগে তিনটের সময় দমদমের ওয়েটিং রুমে ব'সেছিলুম। আর আবার এখন এই দ্বিতীয় পর্যায়ের তিনটের 'বি-ও-এ-সি'র 'ক্যানটাস' প্লেনে ব'সে ভাসছি শূন্যে—এই দুই 'তিনটে' কি এক।

হারানো সময়-ও তাহলে ফিরে পাওয়া যায়? অন্তত জীবনে একবারের মতন তো আধঘণ্টা সময়ও ফিরে পাওয়া গেল। আর সেই হারিয়ে-পাওয়া সময়টুকু ভরিয়ে দিল অনন্ত শূন্যের অপার নীলিমা। এরই মধ্যে কতদূরে দমদম। যারা তুলতে এসেছিল তারা বোধহয় এখনো বাড়ি পৌঁছায় নি। আর আমি এখন—না জানি কোনখান দিয়ে চলেছি। শুধু জানালা দিয়ে দেখছি—নিচের মেঘলোক কখনো হচ্ছে নিবিড় কালো আর কখনো ভরে যাচ্ছে স্বচ্ছ আলোয়। বোঝা যাচ্ছে পৃথিবীতে কোথাও নামছে বৃষ্টি আর কোথাও হাসছে সূর্যের আলো।

এমনি করতে করতে কখন এসে পড়লাম দশদিকের দিগন্তজোড়া নানা রঙের সমারোহের মধ্যে—বুঝলাম, গোধূলি-আকাশ এখন আমার যাত্রাপথ। আর তার একটু পরেই সব রঙ মুছে দিয়ে দিন-শেষের সূর্য গেল অস্তাচলে। নামল অন্ধকার। ভুল বললাম—সূর্য কি কখনো দিনের হয়? বরং সে-ই তো দিন সৃষ্টি করে। আমরাই বরং সূর্যালোকের দেশ ছাড়িয়ে এসে পড়লাম সূর্যাস্তের পারে। অন্ধকারের সীমানায়।

প্লেনের ভেতর আলো জ্বলে উঠল। মুছে গেল বাইরের মহাশূন্য। জানলার কাচে ফুটে উঠল যাত্রীদের ছবি। ভেতরে চোখ ফেরালাম। সারি সারি বিদেশী মুখ—লাল-গোলাপী-পীত। প্লেনটা আসছে সিডনী থেকে দূরপ্রাচ্য হ'য়ে—যাবে লণ্ডন। মনে পড়ল—দমদমে বিমান-কর্মচারী বলেছিলেন যে, এই প্লেনে আমিই একমাত্র ভারতীয় যাত্রী। কিন্তু পেছনের দিকে ঐ যে আরো দুটি তামাটে মুখ—ওঁরা-ও তো নিশ্চয়ই ভারতীয়। ওঠবার সময়কার উত্তেজনায় কাউকেই লক্ষ্য করি নি। কিন্তু ভাসা-ভাসা মনে হল দমদমের ওয়েটিংরুমে যেন এঁদের দেখেছি। মনে খটকা লাগল।

সাররাত ধরে আসন্ন পূর্ণিমার চাঁদের পাশাপাশি ভাসতে ভাসতে শেষ রাতে এসে

কমলাপুর রেলস্টেশন

● সিনাইয়া প্রাসাদ

পৌঁছলুম কাইরোয়। যাত্রীনির্দেশকের অঙ্গুলি-সংকেত অনুসরণ করে এসে উঠলাম শ্বেত-পাথরের দোতলা বাড়িটার বিরাট একটা হলে।

সেই দু'জন যাত্রী নিজে থেকেই এগিয়ে এলেন। গায়ের রঙেই দেশের পরিচয়। হর্ষোচিত পুলকিত হয়ে জিগ্যেস করলাম—আপনারা নিশ্চই ভারতীয়।

—No—ইংরাজিতে উত্তর দিলেন তাঁদের মধ্যে একজন—We are from East Pakistan, going from Dacca to London.

শেষটুকু যোগ করলেন নিজে থেকেই।

I see.

এ ছাড়া আর আমার বলার কি থাকতে পারে? এ তো শেখবারই জিনিষ। বিমান-কর্মচারীর কথাই ঠিক। প্লেনে ভারতীয় যাত্রী আমি একাই। ভারতবর্ষ এই দু'জন বাঙালীর En-route Country। কোলকাতায় এঁরা ছিলেন Transit Passanger আমি যেমন হব এথেন্সে। এঁদের সংগে আজ আমার সম্পর্ক শুধু আন্তর্জাতিক সোবাত্রের।

সকালে কোন এক সময় চারদিক আলো হয়ে উঠল আর সাদা মেঘের নিচে ভূমধ্য-সাগরের নীলজল সেই আলোয় ঝিকমিক করতে লাগল। মাইকে ভেসে এল পাইলটের কণ্ঠস্বর—

—সুপ্রভাত সহযাত্রীরা! গতরাত্রের সুনিদ্রার পরে তোমরা এখন চলেছ—এথেন্সের পথে—চলেছ ভূমধ্যসাগরের ওপর দিয়ে। একটু পরেই দেখতে পাবে গ্রীস উপকূলের সপ্তদ্বীপমণ্ডলী।....

আমার পাশের সিটে কাইরো থেকে উঠেছেন এক লম্বা-চওড়া আমেরিকান ভদ্রলোক। প্রভাতী আমার সংগে সংগে বিনা পরিচয়েই তিনি আলাপ জমিয়ে নিলেন। ভদ্রলোক আমেরিকার এক ব্যবসায়ী প্রতি-ষ্ঠানের প্রতিনিধি। সপ্তাহে একবার করে কাইরো আসা তাঁর বাঁধাধরা কাজ।

আমার বিস্ময়ের চমক তিনি লক্ষ্য করেন নি, তাই রুটিতে মাখন মাখাতে মাখাতে বলে চললেন: মাঝে মাঝে এত অসুবিধা হয়। ঝড়-বৃষ্টি হলে প্লেন ছাড়তে দেরি করে। লণ্ডনে গিয়ে কানেকটিং প্লেন পাই না আবার অপেক্ষা করতে হয়। পেন চেঞ্জ করার জন্যে কত যে সময় নষ্ট হয়!

আমার হাতের রুটি হাতেই রয়ে গেল। মুখে কথা জোগাল না। কোলকাতা থেকে আটাশ ঘণ্টায় বুখারেস্ট যাওয়া যাচ্ছে বলে আমি নিজেকেই ভাবছি কত গতিশীল। তাও তো আবার চার ঘণ্টা সময় চুরি করে। আর নিউ ইয়র্ক থেকে কাইরো, এক রাতে যাওয়া যাচ্ছে না ব'লে এদের সময় নষ্ট হচ্ছে! কত দ্রুত এদের জীবনের গতি যে, দ্রুততম প্লেনের গতিও তার কাছে মন্থর।

এমন সময় এয়ার হোস্টেস এসে দাঁড়ালেন। মাঝ রাস্তায় আমার সোনার পিনটা হারিয়ে গেছে। হোস্টেস বললেন, যদি কোথাও পাওয়া যায়, তাহলে কোন ঠিকানায় পাঠানো হবে, সেটা যেন লিখে দিই।

ঠিকানাটা লিখছি, পার্শ্ববর্তী সহযাত্রী জিগ্যেস করলেন: জিনিষটা কি খুব দামী?

—তোমাদের ভাষায় খুব দামী বলতে কি বোঝায় তা' তো জানি না। তবে কুড়ি-পঁচিশ ডলার দাম তো হবেই।

—Never mind—সান্ত্বনা দিলেন তিনি—গেছেই যখন, তখন আর কি করবার আছে? পথে অমন কত কি হারায়। আমার তো একবার এক এয়ার-পোর্টে দুটো আনকোরা নতুন ক্যামেরা হারিয়ে গেল—একটা মুভি, আর একটা স্টীল।

তাঁর ক্যামেরার সংগে আমার পিনের অনুপাত, তাঁর সংগে আমার সমানুপাতে পড়ে কি না, হিসেব করা সম্ভব নয়। বললুম—দামের কথা ছাড়াও Sentimental value-ও তো আছে। ওটা আমার মায়ের স্মৃতিচিহ্ন।

এবারে সান্ত্বনা দেওয়া দূরে থাক—হেসে উঠলেন ভদ্রলোক: মাকে হারানো সইল আর তার স্মৃতিকে হারানো সইবে না? জীবনটা কি শুধু স্মৃতিরই বোঝা?

তা বটে। কিন্তু স্মৃতির বোঝা বাড়িয়ে দেবে তেমন গতি কোথায় আমাদের জীবনে?

আমাকে নির্বাক দেখে সহযাত্রী আবার বললেন: এই যে ইজিপট। সমস্ত দেশটা ভর্তি খালি অতীতের সমাধি-স্ফিংকস আর পিরামিড। সেইটাই তাদের গর্ব। সমস্ত জীবনটাই যেন 'মামি'। আমাদের 'পিরামিড' নেই, রোম্যাণ্টিক মরুভূমি নেই, কিন্তু আছে জীবন।

অতীত ঐতিহ্যের প্রতি আমেরিকার এই মনোভাব আর তার পক্ষে বিপক্ষে অনেক যুক্তি কাগজপত্রে পড়েছি, কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যা সম্বল করে মতামত প্রকাশের ইচ্ছে হল না। অন্য পাঁচ কথায়, এথেন্সের ঘড়ির সাড়ে নটা বাজল।

বি-ও-এ-সি প্লেন আর তার চার ঘণ্টার সহযাত্রীকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে এথেন্সে নামলাম।

॥ দুই ॥

নামতে না-নামতেই এক মহিলা এসে ধরলেন—হ্যাল্লো—তুমিও তো এখানে যাত্রাভঙ্গ করছ, তাই না? তারপরেই দুজনে একসঙ্গে একপ্রস্থ প্রশ্ন বিনিময় করলুম। বলা বাহুল্য, কোন

● বিশ্রাম ও সংস্কৃতি পার্ক, বুখারেস্ট

একটাই সদুত্তর দিতে পারলুম না। অতএব তার ছ'ফিট দেহখানি নিয়ে তিনি দীর্ঘ পদক্ষেপে অফিস-ঘরের দিকে রওনা হ'লেন---পেছু পেছু আমিও। অবলীলাক্রমে তিনি আমার স্থানীয় অভিভাবিকা ব'নে গেলেন আর আমিও শহর দেখার লোভ ছেড়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ওয়েটিং-রুমে এসে উঠলুম। ততক্ষণে জানা হয়েছে যে, তিনি যাচ্ছেন সিডনী থেকে 'নেওগ্রাদ'। আমরা যাকে বলি বেলগ্রেড। যুগোশ্লাভিয়ার রাজধানী। 'আথেনা' অর্থাৎ এথেন্স থেকে তাঁর প্লেন ছাড়বে বেলা একটায়। আমার প্লেন ছাড়বার পনেরো মিনিট আগে। এখনো চার ঘণ্টা সময়।

কাচের দেওয়াল-ঘেরা ওয়েটিংরুমে এসে কৌচে গা এলিয়ে দিয়ে ব'সে পড়লুম। রীতিমত গরম। সমুদ্রতীরের বালুবেলায় এমনি কাচের ঘর কোথায় যেন দেখেছি। মাদ্রাজের 'মরিনা'তে বোধ হয়। আবহাওয়াও মাদ্রাজের মতনই। আর পারিপার্শ্বিক? তাও তো প্রাচ্য ধরণেরই। ঐ যে একপাশের দেওয়ালে ঝোলানো যত 'কিউরিও'---প্রাচীন যুগের সব অস্ত্রশস্ত্র---এখনকার যুগে যেগুলো শুধু ঘর সাজানোর কাজেই লাগে---ও'তো আমাদেরও মুজিয়মে দেখেছি। তারপরে ঐ আয়না-বসানো হাতব্যাগ---ও তো কিছুদিন আগেও আমাদেরই হাতে হাতে ফিরেছে। 'গ্রীক বিউটি'র দর্শন খুঁজলে অবশ্যই হতাশ হতুম। কিন্তু ছেলেমেয়ে সবাযেরই বেশ মিষ্টি চেহারা। এমন কি যে বৃদ্ধা বালতির জলে কাপড় ডুবিয়ে শ্বেতপাথরের সিঁড়ির ধাপগুলো মুছছে---তারও।

আমার সংগিনী বা অভিভাবিকা---তাঁর ব্যঞ্জনবর্ণসংকুল নামটি আমি তিনবার শুনে তিনবারই ভুলে গেছি---আয়েস ক'রে সিগারেট ধরিয়ে বসলেন। আরেকটি বৃদ্ধ অস্ট্রেলিয়ান-দম্পতি আমেরিকা থেকে লণ্ডন হ'য়ে সিডনী যাবার পথে মাঝরাস্তায় প্লেনের গোলমালে এখানে এসে আটকে পড়েছেন। তাঁরাও এসে বসলেন। আমার যুগোশ্লাভিয়ান সহযাত্রিণীও সিডনীতে থাকেন। দশ বছরের ওপর ওখানে ডাক্তারী করছেন---ওঁর ন্যাশনালিটি এখন অস্ট্রেলিয়ান। অস্ট্রেলিয়ান পাসপোর্টে যুগো-শ্লাভিয়ার ভিসা নিয়ে দেশে যাচ্ছেন---বাবাকে দেখতে

শুরু হল গল্প। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই দুই মহাদেশের নারীর অসীম কৌতূহল মেটাবার ভার নিতে হল আমাকে। আর বলা বাহুল্য তার অধিকাংশই পরিচ্ছদ আর অলংকার নিয়ে। অস্ট্রেলিয়ান বৃদ্ধা আমার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত কোথায় কি প্রতীকচিহ্ন আছে আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হ'লেন আর যুগোশ্লাভিয়ার ডাক্তার তার সঙ্গে যোগ করলেন বৈজ্ঞানিকসুলভ কৌতূহল। ইনি যদি বলেন---তোমার হাতের বালাটা কি 'কাস্টের' চিহ্ন, তো উনি জিজ্ঞাসা করেন---ছোটবেলা থেকে বালা পরতে পরতে তোমাদের হাত সরু হয়ে যায় না? আবার ইনি যদি বলেন, চুলের মধ্যে ঐ লাল রঙটা কি স্থায়ী না 'ওয়াশেবল' তো উনি বলেন, মাথার চামড়ার ওপরে ঐ রঙের প্রতিক্রিয়া নিয়ে তোমাদের দেশে কোন গবেষণা হয় নি?

● সিনাইয়া প্রাসাদে লেখিকা ও লেখিকার পিতা

বৃদ্ধ বোধ হয় কথাবার্তা বেশ উপভোগ করছিলেন। এক সময় হাসতে হাসতে ব'লে উঠলেন---আচ্ছা, প্লেনে উঠতে কি তোমার সিঁড়ির দরকার হ'ল, না, একেবারে হাতীর পিঠ থেকে লাফিয়ে উঠে পড়লে?

সবাই সমস্বরে হেসে উঠলুম। এবারে দড়ির খেলা দেখাতে না বললে বাঁচি। নাকি বলে বসবে---এয়ারব্যাগের ভেতর থেকে সাপের ঝাঁপি বার করো।

একটা বাজল। আমার ক্ষণিকের বান্ধবীকে নিয়ে উড়ে গেল নেওগ্রাদমুখী যুগোশ্লাভ প্লেন। আমারও সময় হ'য়ে এল। রুমানিয়ার উড়ো-জাহাজ প্রতিষ্ঠানের নাম 'তারোম'। 'তারোম' প্লেনের টাকমাথা সহাস্যবদন প্রৌঢ় প্রতিনিধি এসে বললেন: তৈরী থাক। এখুনি এসে ডেকে নিয়ে যাব। চারঘণ্টার পান্থনিগমের প্রতি শেষ চাওয়া চেয়ে নিয়ে দুটো মালপত্র বোঝাই ব্যাগ আর আধমণি ওভারকোট-ওয়াটার-প্রুফের বোঝা ঘাড়ে ক'রে খটখটে রোদে বাইরে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগলুম। সীমাহীন উদ্বেগের সেই ক'টা মিনিটও পেরোল। পথনির্দেশক এসে ডাক দিলেন---প্লেন এসে মাঠে দাঁড়িয়েছে।

তিনি ধীরেসুস্থে হেঁটে চললেন আর আমি তাঁর পিছু পিছু বিরাট বোঝা নিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটলুম। ভাষাজ্ঞানের সেই প্রথম তালিম হ'ল---আমাদের ভাষায় যার নাম ছোটা---রুমানিয়ান ভাষায় তার নাম হাঁটা।

এখানে আর বাঁধাধরা রিজার্ভ করা সিট নেই। যার যেখানে খুশি বসে পড়ুন। মনে হ'ল এবারের যাত্রীরা সবাই মধ্য ইউরোপীয়। সবাই বেশ হৈ-চৈ করতে করতেই উঠলেন আর উঠেও হাসিঠাট্টা হৈ-হৈ করতেই লাগলেন।

প্লেনটা আস্তে আস্তে আকাশপথে উঠল আর ডানা মেলে উড়তে শুরু করল পশ্চিম থেকে পূবে---অদৃশ্য লৌহযবনিকার এপার থেকে ওপারে।

শুনলুম, আসছে ২৩শে আগস্ট রুমানিয়ার গণতন্ত্র দিবসের উৎসবে নিমন্ত্রিত হয়েই বেশির ভাগ যাচ্ছেন। এঁদের মধ্যে আছেন বিভিন্ন দেশের কম্যুনিস্ট পার্টির শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধি। দু' একজন লেখক-লেখিকাও আছেন। আমার সামনের সিটে যে অতি-আধুনিকা মহিলাটি বসে একটার পর একটা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছেন, তাঁর টানা টানা কালো হরিণ চোখ, টিকলো নাক আর শ্রাবণের মেঘের মতন ঘন কালো পুঞ্জ পুঞ্জ ঘন চুল দেখে তাঁকে ঠিক ইউ-রোপীয় ব'লে মনে হ'ল না। আরো মনে হ'ল না এই কারণে যে, তাঁর হাবভাবের আধুনিক-তার মধ্যে 'আমাকে দেখ' ভাবটা বড় বেশি প্রকাশ পাচ্ছিল। আধুনিকতা যাদের দেশে পুরোনো হয়ে গেছে---তাদের হাবভাবে এটা প্রকাশ পায় না। পরে যখন জানলুম ইনি আসছেন সংযুক্ত আরব গণতন্ত্র থেকে, তখন বুঝলুম, আমার ধারণাই ঠিক। এ 'জেনানা' সদ্য 'বোরখা'-খোলা। [ক্রমশ।

ধ্যান-সুন্দর কবি করুণানিধান-

শ্রীভাগ্যলক্ষ্মী রায়

ইংরেজী সাহিত্যে সৌন্দর্যসাধের কবি কীটস্। সৌন্দর্য রসাস্বাদের এমন মানস-পরিমণ্ডল রচনা সমগ্র ইংরেজী সাহিত্যে বিরল। শুধু সাহিত্য-রস নিবেদনেই তাঁর সৌন্দর্যতন্ময়তার সাক্ষ্য বহন করে না। কেমন করে খাবার খেলে সুন্দর দেখায় কবি তার প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। মনে হয়, কবি কোন ইংরেজ-জননীর গর্ভে জন্মেন নি, সৌন্দর্যলক্ষ্মীর সুন্দর কক্ষে এই কবিশিশু জন্ম নিয়েছিলেন। অনুরূপভাবে বাঙলার কোমল মাটিতে, শ্যামল মেঘের নিচে সবুজ ক্ষেত ও সোনালী ধানের পাশে, তুলসীতলে সন্ধ্যেবেলায় সাঁজ প্রদীপটি ঘেঁষে এক রূপদক্ষ কবি জন্মেছিলেন। তিনিই কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর রূপ-পিপাসার একখানি কবিতার নমুনা তুলে ধরছি :

> বর্ষা যখন ছড়িয়ে দেবে
> মোতির 'সাত-নরী',
> কদম-কেশর শিউরে উঠে,
> পড়বে ঝরি' ঝরি'।

প্রকৃতিজগতে এই সৌন্দর্য-সাধনা একটি অপরূপ বিগ্রহ সৃষ্টি করেছে। বর্ষাবিন্দুর পতন আমরা দেখি। কিন্তু কবি দেখছেন মোতির সাত-নরী টপ্ টপ্ করে পড়ছে। আবার কদম-কেশরও রোমাঞ্চিত হচ্ছে। বর্ষার সঙ্গে কদম কুসুমের মিতালী। বর্ষাবিন্দু প্রকৃতি দেবীর আঁখিজল নয়তো ? ফোঁটা ফোঁটা অশ্রুবিন্দু যেন রজতশুভ্র মোতির বর্তুল। রূপদক্ষ কবি গ্রামবাঙলার কেমন সুন্দর একখানি ভাষাচিত্র এঁকেছেন :

> ভাসিল পুকুর আউসের ভুঁই,
> পালায় কাত্‌লা কালবোস্ রুই,
> আঙিনায় জল করে ছলছল,
> কই যায় কানে হেঁটে।

ঝরঝর অঢেল বর্ষায় মাঠঘাট, দীঘিপুকুর কানায় কানায় ভেসে গেছে। পুকুরের জল। আউস ক্ষেতের অনতি-গভীর ঢাল-গর্তের জল। রুই-কাতলা ও কালবোস ভিন্ন ভিন্ন জলস্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়ে কোথায় যেন ভেসে চলেছে। গেরস্থের আঙিনা জলে ডুবুডুবু হয়েছে। কইমাছ কানে হেঁটে চলেছে। হাঁটা শব্দের সঙ্গে পায়ের যোগ রয়েছে। কিন্তু কইমাছ যে কানে হাঁটে তা কবির দৃষ্টি এড়ায় নি। দিগন্ত-জোড়া বর্ষার চিত্র-বর্ণনায় কবি মুখর হয়ে উঠেছেন। তিনি রূপের অর্ঘ্য সাজিয়ে চলেছেন :

> কাঁঠালি-চাঁপার তীব্র সুবাসে
> মাতাল করেছে বাদল-বাতাস ;
> গাছভরা জাম সুচিকণ শ্যাম
> রসে পড়ে যেন ফেটে।

এ এক অপূর্ব চিত্রকল্প। নিসর্গ-লোকের এমন চারুচিত্র বাঙলা কাব্যে একমাত্র রবীন্দ্রকাব্যে ছাড়া অন্যত্র দুর্লভ। তীব্র গন্ধযুক্ত কাঁঠালি-চাঁপার পাপড়ি বাদলা বাতাসে সিক্ত হয়ে যে সুরভি ঢেলে দিচ্ছে তাতে আনন্দে মাতাল না হয়ে উপায় থাকে না। ডালে ডালে যে মসৃণ কালোজাম ঝুলে পড়েছে তা রসে টল টল করছে। কবি আশঙ্কা করছেন এই রস-নিটোল জাম বুঝি রসের ভারে ফেটে পড়ে যায় আরকি ! সম্ভবত কবি কীটসের শারদীয় 'ওডের' সঙ্গে করুণা-কবির এই কাব্যের রূপগত একটা ঐক্য রয়েছে।

প্রখ্যাত কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার করুণানিধানের কবিকর্ম সম্পর্কে যে বিদগ্ধ মন্তব্য করেছেন এখানে তা উল্লেখযোগ্য।

'কবি যেন মূর্তিমতী বাগদেবতার আরাধনায় তন্ময় হইয়া, প্রকৃতির রূপভাণ্ডার হইতে বর্ণালোক আহরণ করিয়া, অতি ধীরে সংযত হস্তে সুনিপুণ তুলিকা ক্ষেপে বাগ্‌দেবতার বেদীপট্ট অলঙ্কৃত করিতেছেন।' করুণানিধান বাণার চারুচত্বর খানি সৌন্দর্য শিল্পে পূর্ণ করেছেন। সৌন্দর্য-রসিক কবি প্রকৃতি-সুন্দরীর ধ্যানে ক্ষণ-সুন্দরের [illegible] ধরে চির-সুন্দরের স্বর্ণ দুয়ারে উপনীত হয়েছেন।

বার্লিনে রাষ্ট্রপতিভবন "স্লস বেলেভু"তে পশ্চিম জার্মানীর রাষ্ট্রপতি লুবকের সঙ্গে আলোচনারত শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

নতুন পেশা ঃ 'গৃহধাত্রী' সম্বন্ধে দু-চার কথা

মহিলাদের জন্যে একটি নতুন পেশা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করতে চলেছে। এই পেশা হল গৃহধাত্রী। সুইডেন ও সুইজারল্যাণ্ডে অনেকদিন ধরেই এর প্রচলন ছিল ; এবার পশ্চিম-জার্মানীতে দেখা দিয়েছে। যেখানে মায়েরা অসুস্থ হয়ে পড়ে, ছেলেপুলে জন্মায় ও পরিবারের অন্যান্যদের কিছুদিন দেখাশোনা করার দরকার হয়, গৃহধাত্রীর প্রয়োজনীয়তা সেখানে দেখা দেয় এবং এসব কাজে সে সম্পূর্ণ পারঙ্গম।

এসব দেশে গৃহধাত্রীদের শিক্ষা ব্যবস্থা আছে। শিক্ষাকাল ছ'মাস। পাঠ্যধারার মধ্যে আছে রন্ধন, সীবন, গৃহস্থালী, পথ্য তৈয়ারী, শুশ্রূষা তথা মনস্তত্ত্ব, শিশু-শিক্ষা, পুষ্টিবিজ্ঞান, সঙ্গীত ও ব্যায়াম কিন্তু এতোগুলি পাঠক্রম তো ছ'মাসের মধ্যে আয়ত্ব করা সম্ভব নয়, সেজন্য সাপ্তাহান্তিক আলোচনাচক্র ও সভায় পরবর্তী ছ'মাস হাতে-কলমে কাজ শেখানো হয়। এরপর একটি পরীক্ষা হয় ও পুরো একবছর হাতেকলমে কাজ করার পর গৃহধাত্রী তার সার্টিফিকেট পায়।

পশ্চিম-জার্মানীতে বর্তমানে পুরো সময়ের জন্যে ৩০০০ ও আংশিক সময়ের জন্যে ১২০০০ গৃহধাত্রী আছে। গৃহধাত্রী বিদ্যা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে সারাদেশে ২২টি স্কুল আছে। ভালো বেতন সত্ত্বেও পশ্চিম-জার্মানীর মেয়েদের মধ্যে এই পেশা এখনও খুব আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেনি ; তাই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে যাতে শিক্ষার সময় আরও হ্রাস করা যায়, বেতন বৃদ্ধি হয় ও এই পেশার সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি পায়।

জার্মানীর ঘরে ঘরে বড়দিনের প্রস্তুতি চলছে

পশ্চিম-জার্মানীতে গৃহধাত্রীদের নিয়োগ করেন বিভিন্ন দাতব্য কল্যাণ সংস্থা ও সমাজমঙ্গল কর্তৃপক্ষ এবং তাঁরাই এদের বেতন দেন তবে যেসব পরিবারে এদের কাজের জন্য পাঠানো হয় তাদের আয় অনুসারে এঁদের ব্যয়ের অংশ বহন করতে হয়।

শহরে বা গ্রাম্য-পরিবারে হোক কিংবা পঙ্গু শিশুদের দেখাশোনা করাই হোক, গৃহধাত্রীদের প্রথম থেকেই তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে হয়। তবে এই সচেতনতা যেন সব সময় খুব কঠোর না হয় সেদিকে সতর্ক থাকা উচিত। আরেকটা কথা, শুধু উপার্জনের দিকে লক্ষ্য না রেখে, আর্ত-মানুষের সাহায্যের আদর্শ নিয়ে একাজে এগিয়ে এলে তবেই এই পেশায় সফল হওয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ বাসুদেব

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

"আমি সংবাদ পেয়েছি," কংস বললো পুতনাকে, "বিগত কয়েক মাসের মধ্যে গোকুলব্রজে অনেক শিশুসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে। আমার মনে হয় তাদের কোনোটিকেই বেশিদিন জীবিত থাকতে দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। একে একে প্রত্যেকটিকেই নিহত করতে হবে। তোমার একলার পক্ষে যদি সম্ভব না হয়, তাহলে তুমি দু-তিনজন সহকারিণী নিযুক্ত করতে পারো।"

"না, না", হঠাৎ তীব্রকণ্ঠে পুতনা বলে উঠলো, "অন্য কেউ শিশুদের স্তন্যদান করবে আপনার দ্বারা নিযুক্ত হয়ে, এ আমি সহ্য করতে পারবো না।"

কংস বিস্মিত হোলো,—"কেন পুতনা?"

"আপনার মঙ্গলের জন্যে যেসব শিশুর জীবন উৎসর্গ করা হচ্ছে তাদের আমি আপনার সন্তান বলেই গণ্য করি। মহারাজ, যারা আপনার সন্তান, তারা আমারও সন্তান। তাই তাদের স্তন্যদান করতে পারি শুধু আমিই। আমার নিজের সন্তান ভেবেই আমি তাদের জীবন উৎসর্গ করতে পারি আপনার চরণে। আপনার মঙ্গলের জন্যে অন্যের সন্তানকে আমি কি করে মৃত্যুর কোলে সমর্পণ করতে পারি মহারাজ?"

কংস বিস্ময়দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো পুতনার দিকে। তারপর বললো, "পুতনা, তোমার কথাবার্তা আজ বড্ড অসংলগ্ন। তুমি যা বলছো, তার কোনো অর্থ নেই। হয়তো তুমি নিজেই বুঝতে পারছো না তুমি কি বলছো। তুমি অত্যধিক সুরাপান করেছো। হয়তো এতখানি প্রমত্ত হয়ে উঠেছো সুরার প্রভাবে।"

পুতনা কংসের দিকে তাকালো বেদনাহত দৃষ্টিতে। জিজ্ঞেস করলো, "আমি কি বলতে চাইছি আপনি বুঝতে পারেন নি?"

কংস চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। চষকে সুরা পরিবেশন করলো পুতনা। কংস পান করতে লাগলো অল্প অল্প করে।

মহাগোপুর থেকে শোনা গেল রাত্রি দ্বিপ্রহরের ঘণ্টাধ্বনি।

চষক নামিয়ে কংস জিজ্ঞেস করলো মৃদুকণ্ঠে, "পুতনা, তুমি আমায় খুব ভালোবাসো, —না?"

পুতনা তার মুখখানি রাখলো কংসের পায়ের উপর। তার সারা শরীর কেঁপে উঠলো একটুখানি।

"গোকুলব্রজে তুমি ক'দিন থাকবে পুতনা?"

"কেন মহারাজ?"

"পুতনা, এখন আমার মনে হচ্ছে তোমাকে আমি জীবনে কোনোদিনই চোখের আড়াল করতে পারবো না।"

পুতনা ধীরে ধীরে উঠে বসলো। শান্তকণ্ঠে বললো, "চেষ্টা করবো কাল সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসতে। যদি না হয় তো পরদিন সকালে নিশ্চয়ই ফিরবো।"

"একদিনের মধ্যেই তোমার সব কাজ শেষ হবে?"

"হ্যাঁ, মহারাজ।"

"এতগুলি শিশু—?" কংসের মতো নির্মম ব্যক্তিও প্রশ্ন শেষ করতে পারলো না।

বারীন্দ্রনাথ দাশ

পুতনা স্থিরদৃষ্টিতে তাকালো কংসের দিকে। তারপর বললো, "প্রভু, আমি আর পারছি না।"

ঈষৎ কাতর শোনালো পুতনার কণ্ঠস্বর।

কংস ভাবলেশবিহীন কণ্ঠে বললো, "এ সব তো তোমারই পরিকল্পনা।"

"সুতরাং এবার ক্ষান্ত হওয়ার পরিকল্পনাও আমার," পুতনা উত্তর দিলো।

"কিন্তু দেবকীর অষ্টম সন্তান যে নিহত হয়েছে সে সম্বন্ধে তো আমি নিশ্চিত হতে পারছি না।"

"দেবী দেবকীর অষ্টম সন্তান ইহলীলা সংবরণ করে থাকুক কি জীবিত থাকুক, তাতে কিছু এসে যায় না।"

"কি বলছো পুতনা? লোকের মনে যে একটা ধারণা আছে দেবকীর অষ্টম সন্তান আমার মৃত্যুর কারণ হবে, সেই ধারণা নির্মূল করতে না পারলে আমার শান্তি নেই।"

"মহারাজ, হয়তো আমাদের সন্দেহ অমূলক। দেবী দেবকীর সন্তানকে কারাগৃহের বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। এ শুধু আপনার শত্রুপক্ষের রটনা। লোকের মনে মনে যে আশা আছে, সে যাতে নির্বাপিত না হয় সেই উদ্দেশ্যেই একথা প্রচার করছে আপনার শত্রুরা। আপনার মৃত্যুর কারণ যারা হবে; তারা আপনার চারপাশেই আছে। মহারাজ, অমূলক ভয় পরিহার করে এবার তাদের সম্বন্ধে সতর্ক হলে ভালো হয়।"

"পুতনা, তুমি বলছো দেবকীর অষ্টম সন্তান সম্বন্ধে আমার ভয় অমূলক?"

"শুধু অমূলক নয় মহারাজ, অত্যন্ত অশোভন, সত্যি কথা বলবো? আমার প্রগলভতা মার্জনা করবেন, কিন্তু আমি আপনার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলেই সত্যভাষণ করতে ভয় পাই না, সে যতোই রূঢ় হোক।"

"বলো পুতনা, তোমার কথা শুনে আমি রাগ করবো না।"

"মহারাজ, আপনার মনে একটা অপরাধবোধ আছে। কেন এই হীনমন্যতা আমি জানি না। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারি যে, এই অপরাধবোধ থেকে আপনার মনে সৃষ্টি হয়েছে একটা গ্লানি, সেই গ্লানি ভয়ের রূপ পরিগ্রহণ করেছে। কিন্তু দেব দানব মানুষ যক্ষ অসুর পিশাচ, কাউকে আপনি ভয় পান না। আপনি শক্তিমান, আপনি মহাবীর, আপনি ক্ষমতাশালী, আপনি কাকে ভয় পাবেন? কিন্তু আপনার ভয় পাওয়ার একটা পাত্র চাই। সুতরাং আপনার মন একটা কল্পিত শিশুকে অবলম্বন করে—"

"পুতনা," হঠাৎ গর্জে উঠলো কংস। "আমি আর শুনতে চাই না।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো পুতনা। তারপর বললো, "মহারাজ, আমি ভাবছি গোকুলব্রজে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন আর নেই।"

কংস সুরাকষায়িত দৃষ্টিতে তাকালো পুতনার দিকে, গম্ভীরকণ্ঠে বললো, "পুতনা, নন্দ ঘোষের পুত্রসন্তানের জন্ম হয়েছে সেই অষ্টমী তিথির নিশাতেই।"

"হ্যাঁ, আমি জানি," উত্তর দিলো পুতনা।

"সে যে দেবকীর অষ্টম সন্তান নয়, কি করে বলা যায়?"

"মহারাজ, গোকুলব্রজ ও মথুরার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে যমুনা নদী, সেদিন দুর্যোগের রাত্রিতে যমুনার যা উত্তালরূপ হয়েছিলো, কোনো মানুষের পক্ষে সে নদী অতিক্রম করা অসম্ভব। আমাদের সন্দেহ একেবারে ভুল।"

"পুতনা—!"

"আদেশ করুন প্রভু।"

"নন্দ ঘোষের এই সন্তানকে বাঁচতে দেওয়া যেতে পারে না। কাল সন্ধ্যার মধ্যেই আমি যেন জানতে পারি যে তুমি তাকে স্তন্যদান করে নিহত করেছো।"

বিষমিশ্রিত স্তন-বিলেপনের পুটিকা আবার পুতনার দিকে এগিয়ে দিলো কংস, কিন্তু পুতনা এবারও নিলো না। ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো।

"কি হোলো পুতনা?"

"এবার আর আপনাকে ছেড়ে কোথাও যেতে ইচ্ছে করছে না।"

কংস নীরবে অবলোকন করলো পুতনার মুখখানি, তারপর কণ্ঠস্বর কোমলতর করে জিজ্ঞেস করলো, "আজ তোমার কি হয়েছে পুতনা?"

"আমি আর পারছি না।"

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো কংস। পুতনা আবার কংসের পায়ের উপর রাখলো তার মুখখানি।

"পুতনা, এর আগে তো তুমি কোনোদিন অধীর হও নি," বললো কংস।

"আগে আমার ভালো লাগতো—" পুতনা মুখ তুলে উত্তর দিলো।

পুতনার শান্তশীতল কণ্ঠে এ কথা শুনে কংসের মতো ব্যক্তিও শিউরে উঠলো। চষকে সুরা ঢেলে সবটা পান করলো একচুমুকে।

পুতনা বলে গেল, "আপনি আমার পরম প্রিয়, কিন্তু আপনার সন্তানের জননী হবার অধিকার আমার নেই। তাই অন্য কোনো নারীর কোলে স্তন্যপানরত শিশুসন্তান দেখলে আমি সহ্য করতে পারতাম না। আমার একবার ইচ্ছে করতো সেই শিশুকে নিজের কোলে নিয়ে স্তন্যদান করতে, পরমুহূর্তেই আবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা হোতো শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা করতে। কি করে এই বীভৎস কামনা আমার মনকে আবিষ্ট করলো তখন বুঝতে পারি নি। কিন্তু এর গুরুভার আর সহ্য করতে পারছিলাম না।"

"সেজন্যেই কি—", সম্পূর্ণ প্রশ্নটা কিছুতেই নির্গত হোলো না কংসের মুখ থেকে।

মৃদুকণ্ঠে পুতনা উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, হয়তো সেজন্যেই স্তনাগ্রভাগ বিষ-প্রলেপিত করে শিশুদের স্তন্যদান করার পরিকল্পনা জানিয়েছিলাম আপনাকে।"

হঠাৎ অট্টহাসি হেসে উঠলো কংস। বললো, "পুতনা, তুমি উপভোগ করতে—।"

"হ্যাঁ মহারাজ, আপনার অনুমতি পেয়েছিলাম। তাই উপভোগ করতাম। প্রত্যেকটি শিশুর মুখের ভিতর যখন স্তনাগ্রভাগ প্রবিষ্ট হোতো, আমার মন ভরে যেতো একটা আশ্চর্য আনন্দে। মনে হোতো আমি যেন আপনার সন্তানের জননী। আমার সেই নিজের সন্তানকেই আমি স্তন্যদান করছি। ধীরে ধীরে অবোধ শিশুর শরীর নীল হয়ে যেতো, সে ঢলে পড়তো নিদ্রাতুর হয়ে। সে ঘুম আর ভাঙতো না। অসহ্য ব্যথায় খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙে যেতো আমার মন। তখন আমি ভাবতাম আমারই সন্তানের প্রাণ আমি উৎসর্গ করছি আপনার কল্যাণের জন্যে। বেদনা আর তৃপ্তিতে মিশে সে এক আশ্চর্য অনুভূতি।"

কংস হঠাৎ আবার শিউরে উঠলো, বললো, "না, না, পুতনা, আর বোলো না, আর বোলো না, আমি আর শুনতে চাই না—।"

এবার হেসে উঠলো পুতনা।

কংস আত্মসংবরণ করে সংযতকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, "তারপর হঠাৎ আবার মনের পরিবর্তন হোলো কিভাবে?"

পুতনা শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলো, "আজ সন্ধ্যেবেলা হঠাৎ তীব্র বক্ষবেদনা আরম্ভ হোলো। অক্রূর তখন সেখানে উপস্থিত ছিলো। প্রায় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলছিলাম। কয়েক মুহূর্তের জন্যে যেন মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলাম। মহান সুন্দর মনে হয়েছিলো মৃত্যুর নীল অন্ধকার রূপখানি। তবু মৃত্যুর আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলাম

না। ভাবলাম, আমি তো এখন মৃত্যু চাই না। আমি ভালোবেসেছি, ভালোবাসা পেয়েছি, কিন্তু আমার সমস্ত কামনা এখনো অতৃপ্ত থেকে গেছে। আপনাকে এখানে রেখে তো এই সুন্দর পৃথিবী থেকে আমি বিদায় নিতে পারি না। মহারাজ, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠলাম। অক্রূরকে কিছু বুঝতে দিলাম না, তার সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলাম খুব সহজভাবে, কিন্তু আমার মনের মধ্যে তখন একটা পরিবর্তন অনুভব করতে শুরু করেছি। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জীবনকে হঠাৎ বড়ো বেশি ভালোবেসে ফেললাম। জীবনকে নতুন করে এত ভালোবাসলাম বলেই মনে হোলো, আর তো আমার পক্ষে অন্য কোনো প্রাণ মৃত্যুর কোলে তুলে দেওয়ার অধিকার নেই। তাই বলছিলাম, আমি আর পারবো না। আমার মনের ভার নেমে গেছে। আপনি আমার কতো আপন সে মুহূর্তেই উপলব্ধি করতে পারলাম। তখন বুঝলাম কেন আমার মনের গূঢ় কামনার প্রকাশভঙ্গি অতো নির্মম রূপ পরিগ্রহণ করেছিলো। সে অধ্যায়ের সমাপ্তি হয়েছে। এখন আমাকে অন্যভাবে জীবন উপভোগ করার সুযোগ দিন, আপনার কাছে এই আমার মিনতি।"

কংস নীরবে শুনছিলো পূতনার কথা। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললো, "বেশ, তোমার অনুরোধ আমি রাখবো, তার বিনিময়ে আমার একটি অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে।"

"অনুরোধ কেন প্রভু, আপনার আদেশ বলে আমি মাথা পেতে নেবো।"

"আদেশ বা অনুরোধ যা ইচ্ছে মনে করতে পারো।"

"বলুন।"

"নন্দ ঘোষের শিশুসন্তানকে তোমায় স্তন্যদান করতে হবে", বলে কংস পূতনার হাতে তুলে দিলো বিষাক্ত স্তনবিলেপনের পাটিকা।

সে স্তব্ধ হয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, "মহারাজ, প্রথম যেদিন মনে মনে নিজেকে আপনার পায়ে সমর্পণ করেছিলাম, সেদিন দেবগৃহে পূজায় বসে একথা জানিয়েছিলাম বিধাতাকে যে, ধর্ম কর্ম পূজা অর্চনা সবই আমি ছাড়লাম এখন থেকে। মহারাজ কংসই আমার ধর্ম, তিনিই আমার পূজা, তিনিই আমার অর্চনা। তাঁর চরণসেবা করতে করতেই আমি যেন চরম মুক্তি পেয়ে যাই শেষ পর্যন্ত। সেই যে সেদিন দেবগৃহ থেকে বেরিয়ে এলাম, তারপরে আর ঢুকি নি। প্রভু, আপনার আদেশ আমি অমান্য করতে পারি না। কাল আমি গোকুলব্রজে যাবো আপনার অভিলাষ পূরণ করতে। কিন্তু, এই শেষ। আর নয়। আর কোনোদিন এরকম আদেশ আমায় দেবেন না।"

পূতনার কথা শুনে কংস আশুতোষ করলো। হাসি দেখা দিলো তার মুখে। স্বর্ণচষকে সুরা ভরে দিয়ে সে তুলে দিলো পূতনার হাতে।

পূতনা সেদিন নিশিযাপন করলো কংসের কেলিগৃহে। পরদিন ঊষাকালে সেখান থেকে যাত্রা করলো গোকুলব্রজের উদ্দেশে।

কংসের সমস্ত দিন কাটলো একটা দুর্বোধ্য উদ্বেগের মধ্যে; রাজকার্যে মন দিতে পারলো না, বার বার মনে পড়লো পূর্বরাত্রির কথা। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর যখন দেবী অস্তি ও দেবী প্রাপ্তি এলো সঙ্গদান করতে, তাদের সঙ্গে ভাল করে বাক্যালাপও করলো না। কংস নিজে আনমনা ছিলো বলে বোধ হয় লক্ষ্য করলো না যে অস্তি ও প্রাপ্তি দু'তিনবার পূতনার সংবাদ জানতে চাইলো। লক্ষ্য করলে হয়তো ঈষৎ অস্বাভাবিক মনে হোতো তাদের এই আগ্রহ।

দিবা তৃতীয় প্রহরের পর থেকেই কংস পূতনার কাছ থেকে সংবাদ প্রত্যাশা করছিল। মন্ত্রগৃহে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলো চেদিরাজ দমঘোষ এবং প্রাগজ্যোতিষপুরের নৃপতি ভগদত্তের দূতবৃন্দ। তাদের সঙ্গেও ভালো করে বাক্যালাপ করতে পারলো না। যমুনার তীরে ঘাটের উপর লোক নিযুক্ত করা হোলো কংসের নির্দেশে পূতনা নিজে কিংবা তার কাছ থেকে কোনো সংবাদ এলেই যেন অবিলম্বে কংস জানতে পাবে।

সূর্যাস্ত পর্যন্ত কোনো সংবাদ এলো না। বাতায়নে দাঁড়িয়ে কংস দেখলো নগরীর ঘরে ঘরে সন্ধ্যার আলো জ্বলে উঠেছে। প্রাসাদের আন্তর্বংশিক এসে জানালো চাণূরের উদ্যানবাটিকায় যাত্রা করার আয়োজন প্রস্তুত। সেখানে যাওয়ার কথা শুনে কংস প্রথমটা বিস্মিত হোল। তারপর মনে পড়লো। সে ভুলেই গিয়েছিলো আজ সায়াহ্নে যমুনার তীরে চাণূরের মনোরম উদ্যানগৃহে সুরাপানোৎসবের আয়োজন হয়েছে। রাজধানীতে সমাগত দুজন অধিমিত্র নৃপতি বাণ এবং ভৌমের সংবর্ধনার উপলক্ষে। রাজ্যের তীর্থবর্গ এবং অভিজনবর্গ পত্নীদের সমভিব্যাহারে সেখানে সম্মিলিত হবে। রাজা কংস স্বয়ং উপস্থিত হয়ে উৎসব সভার মর্যাদা বৃদ্ধি করবে বলে আশ্বাস দিয়েছে চাণূরকে।

দেবী অস্তি, দেবী প্রাপ্তি, কঙ্ক, ন্যগ্রোধক, দেবী মেখলা এবং দেবী বসুদামার সঙ্গে শোভাযাত্রাসহকারে চাণূরের উদ্যানবাটিকায় আগমন করলো রাজা কংস। চাণূর এবং তার পত্নী পিঙ্গলাক্ষী প্রধান অমাত্য হস্তিপক এবং সেনানায়ক হংস ও ডিম্বকের সঙ্গে আনিদ্বারে এসে কংস ও তার দুই পত্নীকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে গেল উদ্যানের অভ্যন্তরে। দীপমালায় সুসজ্জিত করা হয়েছে উৎসবমণ্ডপ। মহার্ঘ বসনভূষণ সুসজ্জিত অভিজনবর্গ এবং উগ্র প্রসাধনশোভিতা পারাবত বসনা পুরস্ত্রীরা চারদিকে বসে আছে, [illegible] উপাধান সমন্বিত বেত্রাসন ও বেত্রমঞ্চে। কলকণ্ঠ শিলালাপে উদ্যানবাটিকায় বিস্তীর্ণ তৃণভূমি মুখরিত হয়ে আছে। সবার হাতে রৌপ্য চষক। সুন্দরী কিঙ্করী সুরাভৃঙ্গার হাতে ঘুরে ঘুরে মহার্ঘ বিদেশলব্ধ সুরা পরিবেশন করছে অতিথিদের। বিভিন্ন স্থানে আয়ত কাষ্ঠফলকের উপর রক্ষিত আছে থালিপূর্ণ সুমিষ্ট খণ্ডখাদ্য এবং শূলপক্ব মৃগমাংস। এক এক সময় অতিথিরা এসে তাদের রৌপ্য থালিকায় তুলে নিচ্ছে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য।

শোভাযাত্রাসহকারে রাজা কংস উপস্থিত হতে অতিথিবর্গ উঠে দাঁড়ালো একসঙ্গে। অন্তরালস্থিত বন্দি ও মাগধগণ বন্দনা গীত গাইলো। বিদেশাগত অধিমিত্র রাজা বাণ, রাজা ভৌম, অনার্য নৃপতি দ্বিবিদ এবং তাদের পত্নীদের সামনে উপস্থাপিত করলো প্রধান অমাত্য হস্তিপক। চেদি এবং প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজদূতেরাও এসে অভিবাদন করলো কংসকে।

তৃণভূমির একপ্রান্তে নটী ও যন্ত্রিবৃন্দ গীত-বাদ্য-নৃত্য সহকারে সমাগত অতিথিবৃন্দের মনোরঞ্জন করার প্রয়াস করছিলো। কিন্তু অতিথিরা কেউ সেদিকে মন দিলো না। সুরাপান সমাপ্ত করতে পরস্পরের সঙ্গে বাক্যালাপে মগ্ন হোলো সবাই। পুরস্ত্রীবর্গের মধ্যে আরম্ভ হোলো অতি সাম্প্রতিক সজ্জা এবং প্রসাধনরীতির আলোচনা এবং বিভিন্ন অভিজাত নারীর অবৈধপ্রণয় কাহিনীর শ্রুতিমধুর সংবাদ বিনিময়, নানা প্রকার সুরার তুলনামূলক আলোচনায় এবং নগরের বিভিন্ন নাট্যশালার নাট্যাভিনেতা নটনটীদের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হোলো অনেকে। শুধু কংস, বাণ, ভৌম এবং দ্বিবিদ প্রভৃতি রাজাদের চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছিলো যেসব বিশিষ্ট তীর্থবর্গ তারা আলোচনা করতে লাগলো বৃষ্ণিদেশের বিভিন্ন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি।

হস্তিপক, হংস, ডিম্বক, প্রলম্ব, নরক, তৃণাবর্ত, অঘাসুর, কেশী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সবাই দাঁড়িয়েছিলো কংসের চারপাশে। মহার্ঘ সুরা পান করতে করতে অনেকে আলোচনা করছিলো মথুরা নগরের খাদ্যাভাব এবং পুরবাসীদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষের প্রসঙ্গ। কংস শুনলো তৃণাবর্ত চেদি এবং প্রাগজ্যোতিষপুরের রাজদূতদের বলছে যে, দেশব্যাপী অজন্মার ফলে খাদ্যশস্যের কিছু অভাব হয়েছে বটে, কিন্তু হাহাকার করার মতো এমন কি, নয়। শুধু বিরোধীপক্ষীয় যাদবকুলের নেতারা কংসের শাসনকে লোকচক্ষে হেয় করবার জন্যে পরিস্থিতি অতিরঞ্জিত করে খোঁচাচ্ছে রাজ্যের নির্বোধ প্রজাদের এবং তারই ফলে কোনো কোনো পুরবাসী উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার

করছে। অসাম্যর রাজা বাণ ও রাজা ভৌমকে জানালো যে পরিস্থিতির অবনতি যাতে না হয় তার জন্যে আরক্ষাধিকরণকে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনেক রাজদ্রোহী যাদবকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে। রাজার শত্রুদের কঠোরভাবে দমন করার জন্যে মন্ত্রিবৃন্দ কৃতসঙ্কল্প।

কেউ যেন জিজ্ঞেস করলো,—পুতনা কেন আসে নি সুরাপানোৎসবে। কংস শুনতে পেলো প্রলম্ব উত্তর দিচ্ছে, পুতনা অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে ঈষৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাই কয়েকদিনের জন্য উদ্যানবিহারে গেছে গ্রামাঞ্চলে।

সূর্যাস্তের পর ছয়-সাত দণ্ড অতিবাহিত হয়েছে। রাত্রি প্রথম প্রহরের অধিক বিলম্ব নেই। পুতনার কোনো সংবাদ নেই এখন পর্যন্ত। কংস চঞ্চল হয়ে উঠলো। নরককে ডেকে জিজ্ঞেস করলো। সে কিছু বলতে পারলো না। যমুনার ঘাটে লোক পাঠাও নির্দেশ দিলো কংস। তারপর মনের উদ্বেগ ভুলবার জন্যে অপরিমিত সুরাপান আরম্ভ করলো।

ক্রমশ সুরাপ্রমত্ত হয়ে উঠেছে উৎসব-মণ্ডপের স্ত্রী-পুরুষ সকলেই। নৃত্যমণ্ডপে বাদ্যযন্ত্রের উচ্চ নিনাদের সঙ্গে উদ্দণ্ড নৃত্য করছে অসংযত নর্তকী। উচ্চকণ্ঠে বাক্যালাপ করছে সবাই। স্ত্রী ও পুরুষ কণ্ঠের অশালীন হাস্যরোল সচকিত হয়ে কুলায় প্রত্যাগত পক্ষিকুল থেকে থেকে কলরব করে উঠছে চারদিকের বৃক্ষরাজির অভ্যন্তরে।

সুরার প্রভাবে হর্ষাপ্লুত হয়ে কংস চাণূরের পত্নী পিঙ্গলাক্ষীকে একপাশে ডেকে নিয়ে কাঁধে হাত রেখে কিছু যেন বলছিলো এবং বার বার প্রগল্ভ হাসিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠছিলো পিঙ্গলাক্ষী। চাণূর দেখেও দেখছিলো না। সে তখন চেদির রাজদূতের পত্নীর সঙ্গে রসালাপে নিমগ্ন।

এমন সময় এক ব্যক্তি এসে নরকের কানে কানে কিছু বললো। নরক স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো দু-তিন মুহূর্ত। তারপর সবার অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালো কংসের কাছে। তার ইঙ্গিতে পিঙ্গলাক্ষী সরে গেল সেখান থেকে। মৃদুকণ্ঠে নরক সংবাদ দিলো কংসকে। কংস স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো পাষাণমূর্তির মতো। হাত থেকে পড়ে গেল সুরাপূর্ণ চষক।

অন্যের গৃহে সুরাপানোৎসবে রাজা অধিক-কাল থাকে না। সুতরাং কংস যখন চলে গেল, কারো কিছু অস্বাভাবিক মনে হোলো না।

দেবী অস্তি ও দেবী প্রাপ্তির মুখে পুলকের অভিব্যক্তি। কিন্তু কংস লক্ষ্য করলো না। ওরা চলে গেল শয়নগৃহে। কংস একলা চলে এলো কেলিগৃহে। অনুচর কিঙ্করী কাউকে ভিতরে আসতে দিলো না। একলা বসে রইলো রুদ্ধদ্বার গৃহে। যেই উপাধানে মস্তক ন্যস্ত করে বিগত নিশীথে শয়ন করেছিলো পুতনা, সেটিতে মুখ রেখে পড়ে রইলো কংস। উপাধানে পুতনার অলকের স্নিগ্ধসৌরভ তখন লেগে আছে; চক্ষু মুদিত করলে যেন মনে হয় পাশেই আছে পুতনা।

কি করে এমন হোলো? এমন কি করে সম্ভব?—বার বার নিজেকে প্রশ্ন করলো কংস। কোনো উত্তর পেলো না। বার বার মনে হোলো, সে যেতে চায় নি, তবু আমি তাকে পাঠিয়েছি। হাহাকার করে উঠলো কংসের মন।

আমি সারাদিন তার কথা ভাবছিলাম,—ভাবলো কংস,—সেও কি ভাবছিলো আমার কথা?

সে ভাবতেও পারে নি যে শেষ মুহূর্তে পুতনার একবারও মনে পড়েনি কংসের কথা। গোকুল ব্রজ তখন সোনালী রোদে ঝলমল করছিলো। পুতনার রূপ দেখে যশোদা ও রোহিণী বিমোহিত হয়ে গেছে। আর কৃষ্ণের নিদ্রানিথর রূপ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছে পুতনা। দু হাতে তাকে তুলে নিয়ে অঙ্কে স্থাপন করলো। হাসিমুখে তাকিয়ে রইলো যশোদা আর রোহিণী। পুতনা যখন স্তন স্থাপিত করলো কৃষ্ণের মুখে, তখনও কিছু বললো না। নিরীক্ষণ করে রইলো হৃষ্টচিত্তে।

সেই ইন্দ্রনীলকান্ত নয়নমোহন শিশু পুতনার স্তন ধারণ করে স্তন্যপান করতে লাগলো ধীরে ধীরে। একটা অনির্বচনীয় বাৎসল্যে ভরে গেল পুতনার মন। সে যেন একাত্ম হয়ে গেল বিশ্বজননীর সঙ্গে। ভুলে গেল সে এখানে এসেছে, একবারও মনে পড়লো না যে স্তন-বিলেপন মাখানো আছে স্তনাগ্রভাগে। শুধু ভাবলো, আগে স্তন-বিলেপনের বিষের প্রভাবে আমার স্তনও একটু একটু জ্বালা করতো, কিন্তু এবারের নতুন বিলেপন মাখিয়ে তো সেরকম জ্বালা করছে না। কিন্তু মনে এমন এক অনাস্বাদিতপূর্ব আনন্দ যে, এ চিন্তা আর রইলো না। বার বার কামনা করলো,—ভগবান, এই আনন্দসাগরে আমায় চিরকাল ডুবে থাকতে দাও।

হঠাৎ অনুভব করলো তীব্র বক্ষবেদনা। চোখের দৃষ্টি যেন ঝাপসা হয়ে গেল। তাড়াতাড়ি বসনের অন্তরাল থেকে বার করবার চেষ্টা করলো ঔষধপুটিকা। সেটি পেলো না। মনে পড়লো সেটি কাল রাতে কোথায় হারিয়ে গেছে।

তাহলে বুঝি মরণ আসন্ন? তাড়াতাড়ি নামিয়ে রাখতে গেল সেই শিশুকে। কিন্তু পারলো না। শরীরের সমস্ত শক্তি যেন ঝরে গেছে। সংজ্ঞা চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পুতনা মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কৃষ্ণ তখনো স্তন্যপান করছে। পুতনা আর কোনো বেদনা অনুভব করলো না, আলোকময় হয়ে উঠেছে সমস্ত মন; এক শীতলস্নিগ্ধ ঘননীল আলো। পুতনা ভাবলো,—স্তন্যদান করে আমার জীবনের এক আশ্চর্য সমাপ্তি, ভগবান, এই আমার সিদ্ধি; এই আমার মুক্তি। [ক্রমশ।

পেঁপে

আমার নিজের অভিজ্ঞতায় দেখতে পাই অনেক পতিত জমি পড়ে আছে—যেখানে অন্য ফসলের অপেক্ষা পেঁপে সামান্য খরচে ও অল্প পরিশ্রমে প্রচুর ফলানো যেতে পারে। পেঁপে এমন একটি ফল যা পক্ব-অপক্ব দুই অবস্থাতেই খাওয়া যেতে পারে। পেঁপের চাট্‌নী অত্যন্ত আগ্রহের সহিত খায় নি এমন লোক বিরল। পেঁপের মোরব্বা অত্যন্ত সুস্বাদু। উপকারের দিক দিয়ে দেখতে গেলে ডিস্‌পেপ্‌টিক্‌ লোকদের পক্ষে কাঁচা ও পাকা পেঁপে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। টাট্‌কা পেঁপের আঠা দু-তিন ফোঁটা ক'রে বাতাসার সঙ্গে খেয়ে বহু লোক ডিস্‌পেপ্‌সিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছেন। পাকা পেঁপের গুণের কথা কে না জানে। তা ছাড়া বৈজ্ঞানিক প্রথায় বায়ুহীন টিনে প্যাক্‌ করে চিনির রসের সঙ্গে ডাঁসা পেঁপের ছোট ছোট টুকরোগুলি আমাদের সৈনিক ভাইদের কাছে দূর দেশে পৌঁছে দেওয়া যেতে পারে।

বিহার অঞ্চলে যেমন—রাঁচী, বৈদ্যনাথধাম (দেওঘর), জশিডি, শিমুলতলা, বাংলা দেশে যেমন কলাইকুণ্ড, ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, খড়গপুর, নেফায়, লেখাবলি, কোহিমায় এবং শিলং ও আসামের বহু অঞ্চলে পেঁপে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে পেঁপের চারা তৈরী করে নিতে হয়। ছোট নার্সারী বেডে হাল্কা ঝুরঝুরে মাটির সঙ্গে ছাই ও গোবর সার মিশিয়ে বীজ ছড়িয়ে চাপা দিয়ে জল দিতে হবে। চারা তৈরী হবার আগে ১২´ ফুট অন্তর ৩´×৩´ গর্ত ক'রে সেই গর্তের মধ্যে মাটি, গোবর সার ও কিছুটা ছাই মিশিয়ে ভর্তি ক'রে দিন (৩ : ২=১)। চারাগুলি ৩´।৪´ ইঞ্চি হলে এক একটি গর্তের মধ্যে একটি ক'রে চারা পুঁতে দিন।

প্রতিদিন জল দিতে হবে, যতদিন না তারা বেশ বড় হয়ে ওঠে। তারপর বৃষ্টির জলের উপর ছেড়ে দিলেই চলবে।

যদি জলের কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে বর্ষা সুরু হবার পর চারাগুলি পুঁততে হবে। পেঁপে গাছের গোড়ায় যদি জল জমে তাহলে কিন্তু তারা পচে যাবে; সুতরাং ঐরূপ ক্ষেত্রে জল নিষ্কাশনের পাকা-

লক্ষ্মীনারায়ণ বিশ্বাস

পাকি ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। একটু উঁচু ও শুক্‌নো জায়গাতেই পেঁপে ভাল হবে।

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে যেসব চারা লাগানো হয় সেই সব গাছে বসন্তকালে পাকা ফল পাওয়া যাবে।

পেঁপে সাধারণত দুই জাতের হয়, একটি লম্বা অপরটি গোল; ওজনে অনেক সময় এক একটি ৫।৬ কেজিরও বেশী দেখা যায়।

প্রতি দু' বছর অন্তর নতুন গাছ লাগালে ফল ভাল হয়।

আলোকচিত্র—এস. এম. হায়দার

স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্

অতনু

সোপেনহাওয়ার বলেছিলেন স্ত্রী-চরিত্রের মৌল ত্রুটি তার বিচার-শক্তিহীনতা। তামা-তুলসী হাতে নিয়ে এমন কথা বলতে সাহস পাই না। কিন্তু সন্ধ্যার মেঘের মত যে তাদের পলকে পলকে রূপ বদলায় তা বলা চলে। পরিবর্তিত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে, তাদের সবটুকু আজও পুরুষের মুঠিতে আসে নি—আসে নি তাই রক্ষে—তাই জল্পনাও অবাধ। তাই অবসরের ক্ষণগুলো এটা সেটার জাল বুনে মন্দ কাটে না। তলিয়ে দেখার দুরূহ সৌভাগ্য সকলের হয় না; কিন্তু এক-আধটা বৈশিষ্ট্য নাড়াচাড়া মন্দ নয়। বিশেষ যখন স্ত্রীচরিত্র-বিশেষজ্ঞের বয়ান হাত বাড়ালেই মেলে।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ফসল থেকে নারীচরিত্র সম্বন্ধে মোদ্দা কথা অনেকেই বলেছেন, প্রাচীন যুগ থেকে আজ অবধি। বাট্‌লার বলেছিলেন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যোষিতাত্মা, কেউ কেউ ভাবেন তা আদৌ নেই। কেউ নারীর কোমল মধুর প্রাণের পরিচয়ে মুগ্ধ, আবার কেউ তার বিশ্বাসভংগের বেদনায় আর্ত, বীতশ্রদ্ধ আজীবন। এ হ'ল ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার আলোকে এক রহস্য বোঝার চেষ্টা। এ সবেরই প্রাপ্য আংশিক সত্যের গৌরব। তলিয়ে দেখলে, সামগ্রিকভাবে স্ত্রী-চরিত্র কব্জা করার ইচ্ছে বেশীক্ষণ থাকে না। কেবল এই নয়, কোন জিনিসই বা ধরা পড়েছে সমগ্রতার অখণ্ড আলোয়?

দেহের আবরণে গোপন নারী মন বহু বিচিত্র। তার স্বাদও স্বভাবতই বৈচিত্র্যময়। কবি, দার্শনিক এ বস্তু চেখে আসছেন যুগে যুগে নানাভাবে, আজও তা ক্লান্তিহীন। তাঁদের মন-সায়রে যে ঢেউ ওঠে অবলা অংগনার রহস্যের ছোঁয়ায় তা সৃষ্টির ফসল ফলায় তাঁদের মানসতটে। বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভংগী ভিন্নতর। মনের গহনে তার পদপাত শুধু অনুভূতি বা চিন্তাভিত্তিক নয়। তিনি তথ্যনিষ্ঠ। অনুমান, বিশ্লেষণ—তারপর মতপ্রতিষ্ঠা। নারী মানসের নানাদিক নিয়ে তথ্যবহুল গবেষণার ঢেউ উঠেছে আজ য়ুরোপ আমেরিকায়। ফলে, অনেক আপাত-রহস্যের গুণ্ঠন খসে পড়ছে একটু একটু করে। যা ছিল গোধূলি আলোর আলোছায়ায় লীন, তা নিজেকে মেলে ধরেছে দিনের আলোয়।

স্ত্রী-চরিত্রের একদিক—তার নিপীড়িত হওয়ার গুঢ়বাসনা এ প্রবন্ধে আলোচ্য।

নাটক-নভেলে প্রায়ই এমন এক মুহূর্ত আসে যা মহিলাদের পরমপ্রিয়। তাঁরা চঞ্চল হয়ে ওঠেন, দুলতে থাকে তাঁদের হৃদয় কমল। যখন নায়িকা ধরা পড়ে নায়কের বলিষ্ঠ বাহু-বন্ধনে, নায়ক তার পৌরুষে জয় করে নেয় নায়িকাকে, তার সম্মতি নিয়ে, কিংবা উদ্ধত যৌবনের অনায়াস দুঃসাহসিকতায় মতামতের কোন পরোয়া না করে।

এই মানসিকতা কি নারীর বাস্তব-জীবনে কাম্য? শুধু কাম্য নয়, একান্ত কাঙ্ক্ষণীয়। বলছেন পণ্ডিতরা, মেয়েদের মন ছিঁড়েখুঁড়ে দেখা যেসব পণ্ডিতদের ধ্যানজ্ঞান এবং এ সভ্য রমণী-মোহনরা যত শীগগির বোঝেন ততই মংগল, উভয়তই। তাঁদের মতে সাম্প্রতিক মানুষ বড় দীর্ঘসময় ধরে বড় বেশি ভদ্র, আর এতে আদৌ মোহিত হন না রমণীকুল: তাঁরা বিরক্ত হন, ঘৃণা করেন এ ধরণের মানসিকতা।

মনোবিকলনের ঘরে অনেক মহিলাকেই বলতে শোনা গেছে, আক্ষেপের সুরে, 'ওঁর কী হয়েছে বলুন ত? যেন কিছুতেই কিছু হয় না, এ এক জ্বালা হয়েছে আমার। বড় বেশি ভালমানুষ, মুখের কথা খসাতে না-খসাতেই তা তামিল করার জন্য একপায়ে খাড়া। যেন নিরুত্তাপ। সহ্য হচ্ছে না আর। বেশ শক্ত হয়ে চলবে, আমায় নিপীড়িত করে আপন করে নেবে, তা নয়----।'

কেন মেয়েরা এভাবে নিপীড়িত হ'তে চায়?

মানুষ এবং মানুষী মূলত দু'টি আবেগ চালিত: যৌনাবেগ এবং লাঠি ঘুরিয়ে জবরদখল করার উৎকণ্ঠা। মাত্রাভেদে সকলের মনেই এরা

সাক্রয় ; কিন্তু বিশ্লেষণে ধরা পড়ে পুরুষের মনে দ্বিতীয়টি এবং মেয়েদের মনে প্রথমটির প্রভাব অন্যটির তুলনায় বেশ বেশি।

ফলত দম্পতির মধ্যে পুরুষের পক্ষে বেশি আক্রমণাত্মক হওয়াই স্বাভাবিক, যদিও মেয়েদের পুরুষ-সামার বেগে তারা না কি মাত্রানুগ পাড়নের আনন্দ থেকেও বঞ্চিত।

এর একটা কারণ, পুরুষের মনে মেয়েদের সম্পর্কে কিঞ্চিৎ ভয়, আর তারা দিনে দিনে ভয়মুক্ত হওয়ার প্রবণতা হারিয়ে ফেলেছে। এ ভয় আদ্যিকালের। নানা কারণে তা চলে আসছে নারীর সন্তানবতী হওয়ার ক্ষমতা-কেন্দ্রিক আদিযুগের যাদু থেকে।

বহু শতক পরে আজ তা আধেক-বলা ভয়ে রূপান্তরিত। আলংকারিক শব্দগুচ্ছে এ ভয় আজও সংলক্ষ্য। 'ছোকরা মজেছে, খুব সাবধানে না চললে ডুবতে বিশেষ দেরী হবে না'। এমন উক্তি কোন সদ্য-প্রেমেপড়া ছেলের সম্বন্ধে শোনা যায় অহরহ। নারী কামনার প্রতীক। নরকের সিংদরজা। তার রূপ মোহিত করে পুরুষকে, অজগরের দৃষ্টিও করে নাকি? কোন প্রেমিক কবি প্রেমিকার ভুজ-বন্ধনে বন্দী হয়েই সুখ পান, তাকে ভুজবন্ধনে বন্দী যদি সে করে' তা হলে সুখের অন্ত পান না তিনি। তবুও তা যে বন্ধন সে অনুভব হারায় না। আর, কোন সমাজপতি যদি কোন মেয়েকে বলতে শোনেন—

'উরুযুগলের আশ্লেষ মাগো যদি
স্তনযুগ মরে কেঁদে।—
তৃষ্ণাকাতর বলে কি বন্ধু
এখনিই যাবে চলে?
কানায় কানায় পূর্ণ এ-বুক।
উছলে তোমার তরে—।
নাও নাও, তুমি নাও।
আজ অপরূপ দিন।'

—তা' হ'লে সর্ব্বোনাশ! হুজুর ভাগিনীর অবস্থা ভাবতেও তনু রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। এক যুগ আগে হ'লে তার ডাইনী অপবাদ এবং

আনুষংগিক অপঘাত-মৃত্যু রোধ করা বোধহয় বিধাতা-পুরুষের পক্ষেও দুঃসাধ্য হ'ত।

রমণীর যৌনাবেগ গভীরতর, হয়ত সব সময় তা রমণীয় নয়। উপায় নেই। প্রকৃতি তাকে নিজের হাতে দিয়েছে ওই গুণটি জাতের বংশরক্ষার উদ্দেশ্যে। দেহ এবং মনের গড়নে নারী-পুরুষের পার্থক্য আছে, থাকবেও। যতই চেঁচান ছোক তাদের পুরুষসাম্যের স্বপক্ষে; কেন না, তা অ-বাস্তব। নেহাৎ বরাৎ জোর। ভাবুন ত'মেয়ে-মদ্দায় কোন প্রভেদ নেই----

এই আবেগ সৃষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর সংগেও জড়িত। নবাগতকে টিকিয়ে রাখতেই হবে। এজন্য মেয়েরা হাসতে, কাঁদতে ছোটকাজ করতে, অনুনয় করতে, চুকলি কাটতে কোন কিছুতেই পেছপা নয়। জনন এবং রক্ষণাবেক্ষণ মেয়েদের আওতায়। পরিবার গড়ে তুলতে তার প্রয়োজন একজন পুরুষ। আর, তা বাঁচাতে দরকার সেই লোকটিকে পোষ মানিয়ে রাখা।

কাজেই লুটের মেজাজ, আকর্ষণ করার ক্ষমতা তার সহজাত। হয়ত এ সব মোহনরূপে, বচনে তাদের পথ খোঁজে; তবে তা হোক বা নাই হোক, এদের অস্তিত্ব আছেই।

পুরুষ কিঞ্চিৎ ভীতিপ্রবণ নারী সম্পর্কে। সারাজীবন দায়িত্ব তাকে একলা বইতে হয়। কিন্তু দু'জনের নিখুঁত সাম্য কারও পক্ষেই সুখদ নয়। এতে কেউই তাঁদের মৌলিক চাহিদা

চুটু পর্যন্ত মেটাতে পাবেন না তৃপ্ত মনে।

হৈ-হৈ করে এগিয়ে চলা, দায়িত্ব নিয়ে, পরিকল্পনা করে তা সেরে গেলে নিজের কাজ নিয়ে কিঞ্চিৎ বুক চাপড়ানর মধ্যে পুরুষের অগাধ মানস-তৃপ্তি। আর, জনন এবং সংরক্ষণ নির্বিঘ্নে চলছে দেখলে মেয়েরা সুগভীর সুখতৃপ্ত। যদি তার নিরাপত্তার খুঁটি-নাটি ভেবে পুরুষ উদ্যোগী হয়ে এগিয়ে আসে সাহায্য করতে, তা হ'লে তার সহযোগিতা মেলে প্রতি পদে, প্রাণঢালা সহযোগ।

সংশয় তখনও থাকবে ঠিকই। খুঁতখুঁতোনি, অভিযোগও বন্ধ হবে না। তখন দাবড়ে দেওয়া প্রয়োজন, মোক্ষমভাবে। মনে মনে তা হ'লে সে কৃতজ্ঞ হবে। অন্যথায়, দৌড়ঝাঁপ করে সব কিছু করতে হ'লে, তার পক্ষে দুর্ভোগ বাড়ে, পুরুষের পক্ষেও সে এক বিষম অস্বস্তিকর পরিস্থিতি। এই অস্বাভাবিকতা তাকে অসুখী করবে, আর পুরুষও গভীর অসন্তোষে ভুগবে তার দৌড়ঝাঁপ করে সব কিছু করার অধিকার বঞ্চিত হয়ে।

নিজেদের স্বাধীনতা খর্ব হয় বলে পুরুষবর্গ স্ত্রীর সম্বন্ধে ভীতি-প্রবণ। বিয়ের পর তারা এই আপাত দাবী মুখর ব্যক্তিত্ব থেকে পালিয়ে বেড়ায়, কোন সখ তৈরী করে, কিংবা নির্জনে চুপচাপ সময় কাটায়। আত্মরক্ষার্থে এভাবে পালিয়ে বেড়ান পাগলামি বৈ নয় এবং তা বিশেষ [illegible]

এর একটিই সমাধান --নিজেকে মেয়েদের হাতে ছেড়ে দেওয়া। প্রকৃতির কাছে আত্মসমর্পণ ছাড়া গত্যন্তর নেই (প্রকৃতিই জিতে যায় শেষ অবধি); তারপর ঐ অবস্থাকে যতদূর সম্ভব নিজের অনুকূলে কাজে লাগানো একান্ত প্রয়োজন।

পুরুষ যে নারীর সহচর হবে তা খুবই 'স্বাভাবিক', প্রকৃতিই তার নিপুণ বন্দোবস্ত করে রেখেছে। কিন্তু তারপর শুরু পুরুষের পালা।

পরিবার রক্ষার অর্থ বাইরে বেড়িয়ে দুনিয়াটাকে- - - -ফেলা। আদিযুগের প্রতি মুহূর্ত নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশংকা বর্তমানে প্রায় নেই; অদ্যতন মানুষের কাজ নিতান্তই ছকে বাঁধা। কিন্তু অবসর সময়ের দাক্ষিণ্যে সে নিজের পরিবার এবং স্ত্রীর উন্নতি এবং সুখের কথা ভাবতে পারে। গুহামানবের এ সব নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না বিন্দুমাত্র।

একই কথা দাঁড়াল অবশ্য—নিজের অনুকূলে ঘটনার মোড় ঘোরান। বৌকেও খানিকটা- - -করা বই কি, কেন না এ সব তার পছন্দসই—করিৎকর্মা ওস্তাদ পুরুষের ছায়ায় সে অনেক বেশি নিরাপদ অনুভব করে, তার দুশ্চিন্তা লঘু হয় এবং পুরুষও সুখী, কেন না করিৎকর্মা হওয়ার আনন্দ তার মূলগত মানসচাহিদা মিটিয়ে দেয় গণ্ডায়-গণ্ডায়।

কাজেই স্ত্রীর ইচ্ছে হওয়ার আগেই বারকয়েক চুমু খাওয়া উচিত। আবারও ইচ্ছে হলে হাঁক উঠবে—'কই এস দেখি একবার---'। কিন্তু

এ ক্ষেত্রে 'মানে---বলছিলাম কি, যদি কিছু মনে না কর'—জাতীয় বয়ান নিতান্তই অচল।

ছোটখাট ব্যাপারে বেশ শক্ত হওয়া প্রয়োজন। বেরুবার সময় হেঁকে দিন—রাত্রি ন'টার পর ফিরছি। যদি ফিরতে ন'টা হয়ে যায়, তোমার কি খুব অসুবিধে হবে 'যদি---' জাতের বুখনী পরিত্যাজ্য, ভাবারই দরকার নেই।

ভাবা দরকার স্ত্রীর সত্যিকার আকাঙ্ক্ষা। তার ভাল লাগবে—'চল, বেড়িয়ে আসি।' কিন্তু আধেক-বলা, সংকোচময় প্রস্তাব কদাপি বরণীয় নহে। ওতে শুধু গণ্ডগোল বাড়ে, বলেছেন বিশেষজ্ঞরা।

সেই হাণ্ট-এর প্রেমিকযুগল, যারা—

'Interchanging words
and sighs,
Lost in the heaven of
one another's eyes'

---তাদের প্রশ্ন আলাদা।

এ ক্ষেত্রে ঝাঁপ দেওয়ার দায় পুরুষের, চিরকাল। মনে থাকলে মন্দ হয় না শেক্‌সপীয়র-এর কথাগুলো—

'She is a woman, there-
fore may be wooed;
She is a woman, there-
fore may be won;
She is Lavinia, therefore
must be loved.'

খুঁজে নিতে কোন Laviniaকে। এ ভার পুরুষের। কাজটা সম্ভবত খুব ভয়াবহ নয়। কারণ, কোন মেয়েই তার প্রেমে পড়ার অপরাধে পুরুষকে ঘেন্না করে না। কিন্তু অনেকেই তাদের নিছক বন্ধুরূপে পেতে অত্যন্ত বিরক্ত হয়। এ বয়ান আলেক-জাণ্ডার পোপ-এর। আর এক মহাজন বাক্যও এ প্রসংগে স্মরণ করা চলতে পারে---'If a man knew what a woman was thinking, he'd be much bolder than he is.'

হারিয়ে যেতে সাধ

শক্তি মুখোপাধ্যায়

ইচ্ছে হয় হারিয়ে যাই, হারিয়ে যেতে সাধ
অনেকদিনের; পিপাসার্ত নদী
ভাঙছে মনের তীর।

ঝঞ্ঝা তবু আসবে দুঃসময়ে
মনের দেয়া নেয়ার হাটে ঘাটে
যে নৌকাটা ভিড়িয়েছিল—দ্যাখো,
মাঝ-দরিয়ায় রাক্ষুসী ঘূর্ণিতে
পড়বে গিয়ে ঠিক।

ইচ্ছে হয় হারিয়ে যাই, হারিয়ে যেতে সাধ
অনেকদিনের; নতুন ভালোবাসার গহিন বনে।
বাইরে থেকে অন্ধকার—অন্ধকারে দ্যাখো,
কেমন করে হৃদয়ে দীপ জ্বলে!

হারিয়ে যাবার সাধ আছে অন্তরে
সাত সমুদ্র তের নদীর কূলে
ঘিঞ্জি শহর বন্দরে গঞ্জেতে—
মনে হচ্ছে একা, বড়ই একা।

দ্যাখো,—আমার চতুর্দিকে বেড়া,
বেড়া চতুর্দিকে;
পিছুটানের বেড়া ভেঙে কোথায় বলো হারাই।

ভারতে রেলপথের প্রসার ও সূচনা

সঞ্জীবকুমার বসু

বিগত ১৮২৫ সালে ইংলণ্ডের স্টকটন শহর থেকে ডার্লিংটন পর্যন্ত যে একটি ক্ষুদ্র রেলপথ স্থাপিত হয় তাই হ'ল জগতের সর্বপ্রথম রেলপথ। এরপর ১৮৩০ সালে লিভারপুল শহর থেকে ম্যাঞ্চেস্টার শহর পর্যন্ত বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের সাহায্যে যে রেলপথ প্রতিষ্ঠিত হয় তাকেই প্রকৃতপক্ষে জগতের আধুনিক ধরনের রেলপথের সূত্রপাত বলা যেতে পারে। ভারতে ১৮৪৪ সালে রেলপথ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে ভারতের শাসক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে এত অর্থ ছিল না যে, তারা নিজেদের টাকা দিয়ে রেলপথ স্থাপন করেন। এদিকে দেশেও তখন একরূপ অবস্থা ছিল না যে, দেশের ভিতর থেকে ঋণ গ্রহণ করে রেলপথ স্থাপন করা যায়। সেইজন্য তখনকার কোম্পানী গভর্নমেণ্ট ভারতে রেলপথ স্থাপনের জন্য লণ্ডনে গঠিত "ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানী" এবং "গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার কোম্পানী," নামে এই দুইটি কোম্পানীকে ভারতে রেলপথ প্রতিষ্ঠার ভার দেন। এই দুটি কোম্পানীর যাতে কোন ক্ষতি না হয় তার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর তরফ থেকে তাদের গ্যারিণ্টি দেওয়া হয় যে, রেলপথের জন্য নিয়োজিত মূলধনের উপর যদি সন্তোষজনক লাভ না হয়, তাহলে তার জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ক্ষতিপূরণ করে যাতে এই দু'টি কোম্পানী নিয়োজিত মূলধনের উপর একটা নির্দিষ্ট হারে লাভ পায় তার ব্যবস্থা করা হবে। এই দুটি কোম্পানীর মধ্যে "গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার কোম্পানী" কর্তৃক নির্মিত বোম্বাই শহর থেকে থানা শহর পর্যন্ত একটি ২১ মাইল লম্বা রেলপথ ১৮৫৩ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে খোলা হয়। রেলপথ। এরপর ই, আই, আর কোম্পানী কর্তৃক নির্মিত হাওড়া থেকে হুগলী পর্যন্ত ২৩ মাইল লম্বা একটি রেলপথ ১৮৫৪ সালের ১৫ই আগস্ট তারিখে খোলা হয়। ইহা ভারতের দ্বিতীয় রেলপথ। এইভাবে ভারতে রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হলেও ভারতে রেলের প্রসারের কাজ তেমন সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হয় নি। তারপর লর্ড ডালহৌসী ভারতে বড়লাট হয়ে আসার পর তিনি ভারতে রেলপথের দ্রুত প্রসারের কথা জানিয়ে ১৮৫৩ সালে ইংলণ্ডে একটি স্মারকলিপি প্রেরণ করেন। কিছুদিন পরে ১৮৫৭ সালে ভারতে সিপাহী বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং এর ফলে এখানকার শাসনভার কোম্পানীর হাত থেকে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের হাতে অর্পণ করা হয়। বিদ্রোহের সময় রেলপথের অভাবের জন্য ভারতের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সৈন্য প্রেরণে যে অসুবিধা দেখা দিয়েছিল তা লক্ষ্য করে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভারতে রেল বিস্তারের আশু প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এজন্য ১৮৬৯ সালে গভর্নমেণ্ট উপরোক্ত দু'টি রেল কোম্পানী ছাড়া ইংলণ্ডের আরও দু'টি রেল কোম্পানীকে তাদের লাভ ও মূলধনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে গ্যারাণ্টি দিয়ে তাদের উপর ভারতে রেল বিস্তারের দায়িত্ব অর্পণ করেন। এর ফলে ১৮৫৩ সাল থেকে ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত এই আটটি রেল কোম্পানী কর্তৃক ভারতে সাড়ে চার হাজার মাইল পরিমিত স্থানে রেলপথ স্থাপিত হয়।

কিন্তু এই ধরনের ফলে ১৬।১৭ মাইল লম্বা রেলপথ স্থাপিত হলেও এই ব্যবস্থায় ১৮৬৯ সাল পর্যন্ত ভারত সরকারকে রেল কোম্পানীগুলিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ দিতে গিয়ে ১ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ক্ষতি দিতে হয়। কারণ মূলধনের নিরাপত্তা ও নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ পাবার পক্ষে ভারত গভর্নমেণ্টের গ্যারাণ্টি থাকায় এই সময়ে রেল কোম্পানীগুলি রেলপথ স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে অযথা ব্যয়বাহুল্যের প্রশ্রয় দিয়েছিল। এই জন্য ১৮৬৯ সাল থেকে সরকার ভারতে রেলপথ স্থাপনের জন্য বৃটিশ কোম্পানীগুলিকে গ্যারাণ্টি দেওয়া বন্ধ করে দেন এবং তাঁরা স্বয়ং লণ্ডনের বাজারে টাকা ধার করে সেই টাকার সাহায্যে ভারতে রেলপথ স্থাপন আরম্ভ করেন।

এইভাবে ১৮৭৯ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন গ্যারাণ্টি প্রাপ্ত কোম্পানী এবং ভারত সরকার এই উভয়ের স্থাপিত রেলপথের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ৯ হাজার মাইল। কিন্তু এই সময়ে পাউণ্ডের হিসাবে টাকার মূল্য হ্রাস, দেশের নানাস্থানে দুর্ভিক্ষ এবং আফগানিস্থানের সাথে যুদ্ধের ফলে ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। এদিকে দুর্ভিক্ষ তদন্ত কমিশন এরূপ সুপারিশ করেন যে, ভারতের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খাদ্যপণ্য রপ্তানী করে দুর্ভিক্ষের প্রতিরোধ করতে হলে গভর্নমেণ্টের অন্তত আরও ৫ হাজার মাইল নূতন রেলপথ স্থাপন করা প্রয়োজন। অবস্থা দেখে ভারত গভর্নমেণ্ট ১৮৭৯ সাল থেকে পুনরায় বৃটিশ কোম্পানীগুলিকে গ্যারাণ্টি দিয়ে ভারতে রেলপথ স্থাপনের জন্য নিয়োগ করার প্রয়োজন বোধ করলেন। তবে এবারকার গ্যারাণ্টির সর্ত ১৮৪৪-৬৯ সালে প্রদত্ত গ্যারাণ্টির সর্ত অপেক্ষা গভর্নমেণ্টের দিক থেকে

ক্রমশঃ

ফলে ১৯০০ সাল পর্যন্ত ভারতে স্থাপিত রেলপথের দৈর্ঘ্য দাঁড়ায় ২৪ হাজার ৭৫২ মাইল। তবে বর্তমান শতাব্দীর প্রথম থেকে ভারত সরকার ভাবতে রেলপথের বিস্তারের জন্য আর কোন বৃটিশ কোম্পানীকে গ্যারাণ্টি দেওয়া প্রয়োজন বোধ করে নি। এই সময় থেকে গভর্নমেণ্ট কোম্পানী পরিচালিত রেলপথগুলি স্বহস্তে গ্রহণ করাব এবং দেশে রেলপথ প্রসারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাদের চেষ্টায় ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত ভারতে ১৮ হাজার মাইল নূতন রেলপথ খোলা হয় এবং এই বছরের ৩১শে মার্চ তারিখে ভারতে মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য দাড়ায় ৪৩ হাজার ১২৮ মাইল। কিন্তু এই বছর বহ্মদেশ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ভারতের রেলপথগুলির মধ্যে ২০৬৭ মাইল রেলপথ ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। ১৯৩৭ সালের পর বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের আশঙ্কায় এবং পরবর্তীকালে যুদ্ধের জন্য ভারতে রেলপথের প্রসার কেবল মন্দীভূতই হয় নি, যুদ্ধের সময়ে ভারতের বহুসংখ্যক ছোটখাট রেলপথ তুলে দিয়ে অন্যত্র সমস্ত রেল সরঞ্জামের ব্যবহারের জন্য ভারতে রেলপথের পরিমাণ কিছু কমে যায়। এরপর ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলেও ভারতের রেলপথের মধ্যে ৬৭৪৮ মাইল রেলপথ হস্তচ্যুত হয়। ১৯৫৪ সালের ৩১শে এপ্রিল পর্যন্ত ভারতে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৪ হাজার ১২০ মাইল।

ভারত স্বাধীনতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে দেশ-বিভাগজনিত বিশৃঙ্খলা, ভারতে লক্ষ লক্ষ আশ্রয়প্রার্থী সমাবেশ, দেশব্যাপী খাদ্যাভাব, পাকিস্তানের মনোভাবের ফলে দেশের সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করার আশু প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি কারণে ভারত সরকারকে এত অর্থব্যয় করতে হয় যে, সেই সময় আসাম লিঙ্ক প্রতিষ্ঠা ছাড়া দেশে রেলপথ প্রসারের উল্লেখযোগ্য চেষ্টা হয় নি। এমন কি প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাতেও উন্নতির জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। যুদ্ধের সময় এবং যুদ্ধাবসানের পরবর্তী কয়েক বছরে ভারতের রেলপথসমূহে নিয়োজিত জীর্ণশীর্ণ ইঞ্জিন, যাত্রীগাড়ী, মালগাড়ী ইত্যাদির বদলে নূতন ইঞ্জিন, যাত্রীগাড়ী, মালগাড়ী ইত্যাদি আমদানীর একপ্রকার ব্যবস্থাই ছিল না। এই সময় রেলের লাইন, পুল, বাড়ীঘর ইত্যাদি সংস্কারেরও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা হয় নি। এইজন্য ১৯৫১ সালের মার্চের শেষে দেখা যায় যে, ভারতীয় রেলপথসমূহে নিয়োজিত ইঞ্জিনের মধ্যে ১০৫০টি ইঞ্জিন, ৫৫১৪টি যাত্রীগাড়ী এবং ২১৪১৮টি মালগাড়ীর বদলে নূতন ইঞ্জিন, যাত্রীগাড়ী ও মালগাড়ী সংগ্রহ করা অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া প্রত্যেক বছরে আরও অনেক নূতন ইঞ্জিন, যাত্রীগাড়ী ও মালগাড়ী অকেজো হয়ে পড়েছে। সেই হিসাবে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে ভারতের রেলপথগুলির জন্য ২০৯২টি ইঞ্জিন, ৮৫৩৫টি যাত্রীগাড়ী এবং ৪৭৫৩৩টি মালগাড়ীর প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী ও তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে রেলওয়ের প্রভূত উন্নতি করা হয় এবং এখনও সেই প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। রেলপথগুলি থেকে সরকার প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা লাভ করেন। বর্তমানে দশ লক্ষের উপর লোক এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত আছেন। তাদের প্রায় ১৩০ কোটি টাকা বছরে বেতন দিতে হয়। দেশের বেকার সমস্যার সমাধানের পথে রেলের অবদান এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

ছবির সংগ্রহ-

মৃত্যুঞ্জয় মাইতি

এতো যে বিরাট ছবি আঁকা আছে পথে মাঠে গ্রামে,
শীতের বিকেল বেলা সে সংগ্রহে আকাশের
অপার্থিব নীরবতা নামে।
চিত্ত শান্ত স্থির হলে মাঝে মাঝে কেন মনে হয়,
একবার ডুবে যাই, খুঁজে দেখি কী পুণ্য সঞ্চয়
সমাহিত ছবির গভীরে,
এমন সুন্দর বর্ণে রসে প্রকাশিত প্রকৃতির
মৃত্যুহীন যৌবন শরীরে!

হয়তো সেখানে শুধু আদিগন্ত শূন্যতার ভাষা,
হয়তো সেখানে শুধু অনিদ্রিত আত্মার জিজ্ঞাসা,
অতলান্ত সমুদ্রের তীর,
হয়তো সেখানে বাজে ঘন মৌন মন্দ্র কোন এক
স্তব্ধতম দূর পৃথিবীর!
আকাশ দেয়ালে আছে বহুবর্ণ ছবির সংগ্রহ
দিগ্বিদিকে শব্দহীন সুরে,
চিত্ত শান্ত স্থির হোক, অন্ধকার নামুক মাটিতে;
স্পর্শ পাব পরম বন্ধুরে!!

চন্দ্রশেখর লাহিড়ী

ধূমকেতুর নাম শুনেই মনে হয় ধোঁয়ার নিশান তুলে কোন কিছু বুঝি আসছে। ধূমকেতুতে আসলে ধোঁয়ার নিশান নেই। ধূমকেতু হচ্ছে অসংখ্য ছোটবড় বস্তুপিণ্ডের সমষ্টিমাত্র। এর মধ্যে লম্বায় কোনটি দু-এক ফুট, কোনটি আবার দু-তিন মাইল।

ধূমকেতুর আগমনে দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রভৃতি অনেক অমঙ্গলের বিশ্বাস অতি প্রাচীনকাল থেকেই পৃথিবীর সব দেশে প্রচলিত আছে।

মহাভারতে দেখতে পাই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় এক বিরাট ধূমকেতুর (সম্ভবত হ্যালির ধূমকেতু) আবির্ভাব হয় এবং এর ফলস্বরূপ বলা হয়েছে যে, ধূমকেতুর আগমনের জন্য কুরুকুল ধ্বংস হবে এবং কৌরব ও পাণ্ডব উভয়পক্ষের বহু সৈন্য হত হবে। ফার ফেলাসের যুদ্ধক্ষেত্রে সিজার এবং পম্পির মধ্যে যে লড়াই হয় তাতে পম্পির পরাজয় হয়। ঐতিহাসিক প্লিনি এই পরাজয়ের জন্য এক ভীষণদর্শন ধূমকেতুকে দায়ী করেছেন। জুলিয়াস সিজারের মৃত্যু একটি ধূমকেতু আগমনের ফল বলে কথিত আছে। নেপোলিয়ানের নিষ্ফল রাশিয়া অভিযানের সাথেও একটি ধূমকেতু জড়িত রয়েছে।

ধূমকেতুর জন্মস্থান এবং উৎপত্তি নিয়ে বিজ্ঞানীমহলে নানারূপ মতভেদ রয়েছে। বিজ্ঞানী জিন্স এই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন যে, মহাকায় এক নক্ষত্রের আগমনে সূর্য থেকে গ্রহসৃষ্টির কথা আমাদের কারও অজানা নেই। সেই সময় ছিন্নভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলি স্থানে স্থানে জমাট বেঁধে উল্কা এবং ধূমকেতুতে পরিণত হয়েছে। অনেকের ধারণা গ্রহ থেকেই ধূমকেতুর উৎপত্তি। সৃষ্টির প্রারম্ভে আমাদের গ্রহগুলি এখনকার মত জমাট বেঁধে কঠিন অবস্থায় ছিল না। সেই সময় মধ্যে মধ্যে এর ভিতরকার বস্তুকণা খুব জোরে উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে এবং এইসব বস্তুকণা গ্রহদের মাধ্যাকর্ষণ ছিন্ন করে ধূমকেতু-রূপে সূর্যের চারদিক ভ্রমণ করতে থাকে।

বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি অতিকায় গ্রহগুলির ভিতর আজও অসংখ্য বিস্ফোরণের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় এবং এইসব গ্রহের জ্যোতির তারতম্য এখনও পরিলক্ষিত হয়। সেইজন্য অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা যে, বর্তমানেও এইসব অতিকায় গ্রহগুলি থেকে ধূমকেতু উৎপন্ন হচ্ছে।

ধূমকেতু ইলিপস, প্যারাবোলা বা হাই প্যারাবোলা পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ধূমকেতুর চলার পথের অতি সামান্য অংশই দেখতে পাওয়া যায় বলে এর কক্ষপথ নির্ণয় করা বেশ একটু কঠিন কাজ। অধিকাংশ ধূমকেতুই সূর্যকে প্যারাবোলা পথে প্রদক্ষিণ করে। সেইজন্য অনেকে মনে করেন অধিকাংশ ধূমকেতুই সৌরজগতের বাহিরের অধি-বাসী এবং এইসব ধূমকেতু সাধারণ দর্শকের মতই মাত্র একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলে যায়।

যে সমস্ত ধূমকেতু ইলিপস্ পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তাদের প্রত্যেকেই যে ফিরে আসবে, এমন কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। পর্যবেক্ষণের ত্রুটিও আছেই উপরন্তু গ্রহদের আকর্ষণের প্রভাবে ধূমকেতুর গতিপথ পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে। বড় বড় গ্রহগুলির কক্ষ সূর্যের খুব নিকটে চলে এলে এদের শক্তির প্রভাবে ধূমকেতুর বস্তুপিণ্ডগুলি একেবারে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে উল্কাখণ্ডেও পরিণত হতে পারে।

এইরকম একটি ধূমকেতু "বিয়েলার ধূমকেতু" ১৮২৬ সালে এটি আবিষ্কার হয়। সূর্যের চারপাশে ঘুরে আসতে এর প্রায় ছয় বছর করে সময় লাগতো। ১৮৪৬ সালে এটি হঠাৎ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ১৮৫২ সালে বিয়েলার ধূমকেতুর যুগলকে আবার দেখা গেল। কিন্তু এরপর এই দুই ধূমকেতু আর আজ পর্যন্ত ফিরে আসে নি। ১৮৬৬ সালে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দূরবীণগুলির দ্বারা তন্ন তন্ন করে খোঁজ করেও এটিকে পাওয়া যায়নি। কিন্তু ১৮৭২ সালের ২৭শে নভেম্বর পৃথিবী যখন নিজকক্ষ এবং বিয়েলার ধূমকেতুর কক্ষপথের মিলন-স্থানে এসে উপস্থিত হয়, তখন অসংখ্য উল্কাপাত হতে দেখা গেল। ২৭শে নভেম্বরের সেইদিনে খালি চোখে প্রায় এক হাজারের উপর উল্কা গণনা সম্ভব হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের অনুমান বিয়েলার ধূমকেতু চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে অসংখ্য উল্কাপিণ্ডে পরিণত হয়েছে। আজ অবধি প্রতি বছর ২৭শে নভেম্বর পৃথিবী যখন বিয়েলার ধূমকেতুর কক্ষপথ অতিক্রম করে তখন প্রচুর উল্কাপাত হতে দেখা যায় এবং এই উল্কাপাত প্রতি ছয় বছর অন্তর অতিরিক্ত হয়ে থাকে।

সূর্যের কাছাকাছি না আসা পর্যন্ত কোন ধূমকেতুকেই দেখা সম্ভবপর নয়। ধূমকেতুর নিজের আলো নেই একথা একেবারে বলা চলে না। তবে অধিকাংশই সূর্যের কাছ থেকে ধার করা আলো।

ধূমকেতু যখন সূর্যের কাছ থেকে দূরে থাকে, তখন এর পুচ্ছ থাকে না কেবল একটি পিণ্ডমাত্র। সূর্যের কাছাকাছি এলে এদের এক বা একাধিক পুচ্ছ জন্মায়। ধূমকেতু সূর্যের যত কাছে আসে পুচ্ছও তত বড় হয় এবং সূর্য থেকে যত দূরে যেতে থাকে পুচ্ছও তত সঙ্কুচিত হতে থাকে। ধূমকেতুর এই পুচ্ছ সূর্যের সবদা বিপরীত দিকে থাকে। এইজন্য ধূমকেতু যখন সূর্য থেকে দূরে সরে যেতে থাকে তখন এর পুচ্ছই আগে আগে চলে।

ধূমকেতুর ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বোধহয় হ্যালির ধূমকেতু। এটি একটি অতি প্রাচীন ধূমকেতু। খৃষ্টজন্মের বহু বছর আগেও এর হদিশ পাওয়া গেছে। পঁচাত্তর-ছিয়াত্তর বছর অন্তর এটি সূর্যকে একবার করে প্রদক্ষিণ করছে। অতিক্রম গ্রহগুলির প্রভাবের জন্য হ্যালির ধূমকেতুর সূর্য প্রদক্ষিণ কাল একেবারে নিখুঁতভাবে গণনা করা সম্ভব নয়।

সাধারণত গ্রহ এবং ধূমকেতুগুলি পশ্চিম থেকে পূর্বদিক দিয়ে প্রদক্ষিণ করে কিন্তু হ্যালির ধূমকেতু পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিক দিয়ে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। হ্যালির ধূমকেতু বোধহয় একমাত্র ধূমকেতু যার পুচ্ছের ভিতর দিয়ে পৃথিবী একেবারে সরাসরি চলে গিয়েছিল।

আজ থেকে চুয়ান্ন বছর আগে ১৯১০ সালে হ্যালির ধূমকেতু পৃথিবী থেকে শেষ বিদায় নিয়েছে; কিন্তু আমাদের সাথে তার সম্বন্ধ আজও একেবারে শেষ হয়ে যায় নি। পৃথিবী প্রতি বছর এপ্রিলের শেষে এবং মে মাসের প্রথমে হ্যালির ধূমকেতুর কক্ষপথ অতিক্রম করে। এইজন্য প্রতি বছর এপ্রিলের শেষ সাতদিন এবং মে মাসের প্রথম সাতদিন বেশ কিছু উল্কাপাত হতে দেখা যায়।

★ মাসিক বসুমতীতে লেখা ও ছবি পাঠানোর নিয়মাবলী ★

১। যে কোন প্রকাশযোগ্য রচনা—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, জীবনী, সত্যঘটনা, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা, রহস্য-মূলক রচনা অর্থাৎ পাঠক-পাঠিকার পক্ষে আকর্ষণীয় ও আগ্রহ-উদ্দীপক লেখা আমরা সকল সময়েই প্রকাশার্থে বিবেচনা করে থাকি।

২। দীর্ঘ রচনা বা ধারাবাহিক প্রকাশিতব্য লেখা সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠাবার পূর্বে পত্রযোগে লিখিত মতামত গ্রহণ করতে হবে।

৩। রচনা সচিত্র হলে বা লেখার সংগে ছবি (আলোক-চিত্র বা অঙ্কিতচিত্র) থাকলে সেই লেখা প্রকাশের প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে।

৪। রচনার নকল রেখে রচনাটি পাঠাবেন। কেন না, সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা সত্বেও ছাপাখানার কাগজের ভিড়ে রচনা হারিয়ে যেতে পারে। কিংবা ডাকের গোলমালেও রচনা হারিয়ে যেতে পারে।

৫। কোন রচনা বা ছবির মনোনয়ন বা অমনোনয়নের সংবাদ জানতে হলে বা অমনোনীত রচনা বা ছবি ফেরৎ নিতে হলে তৎসহ উপযুক্ত মূল্যের ডাকটিকিট অবশ্যই প্রেরণীয়।

৬। কবিতা সম্পর্কে কোন মতামত জানানো হয় না বা অমনোনীত কবিতা ফেরৎ পাঠানো হয় না।

৭। কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখাই বাঞ্ছনীয়। উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত পাণ্ডুলিপি ছাপাখানার জন্যে অচল।

৮। পাণ্ডুলিপিতে রচনার শেষে লেখক বা লেখিকার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে।

৯। প্রকাশযোগ্য ও যথোপযুক্ত রচনা ও ছবির জন্য সম্মান দক্ষিণা দেওয়া হয়।

১০। প্রতিটি রচনা সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। খামের উপর "মাসিক বসুমতী"—এই কথাটি অবশ্যই লিখতে হবে।

১১। লেখা পাঠালেই তা সংগে সংগে দেখার বা লেখা মনোনীত হলেই তা সংগে সংগে প্রকাশ করার কোন প্রতি-শ্রুতি দেওয়া চলে না। প্রত্যহ অসংখ্য লেখা আসে, প্রতিটি পাঠান্তে প্রকাশের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সময়সাপেক্ষ।

১২। আলোকচিত্র বা অঙ্কিতচিত্রের পিছনে ছবির বিষয়বস্তু ও শিল্পীর নাম এবং ঠিকানা অবশ্যই লিখতে হবে।

● জওয়ানদের আগ্রা যাত্রার প্রাক্কালে নয়াদিল্লীতে তাজ এক্সপ্রেসের মধ্যে জওয়ানদের সঙ্গে আলোচনারত কেন্দ্রীয় রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রী এস কে পাতিল

● নারী স্বেচ্ছাসেবিকাবৃন্দের সঙ্গে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

● ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ও নেপালের রাজদম্পতিকে ভোজে আপ্যায়ন সময় শ্রীমতী ললিতা দেবী ও নেপালের রাণী শ্রীমতী রত্না দেবী

● রাষ্ট্রপুঞ্জের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল ডঃ বি আর সেন সংস্থার ১৩তম অধিবেশনে বক্তৃতা দিচ্ছেন

● স্পেনের রাষ্ট্রপ্রধান জেনারেল ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কোর নিকট পরিচয়পত্র পেশ করছেন স্পেনে নবনিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত জয়পুরের মহারাজা সৈনসিং বাহাদুর

ভারতীয় নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ ভাইস এডমিরাল শ্রী বি এস সোমান বিশাখাপত্তনমে এক অনুষ্ঠানে হুগলী জাহাজের কম্যাণ্ডিং অফিসার ও কলিকাতাস্থ রেসিডেণ্ট নৌ-অফিসার ম্যালকম ক্রেটন রেলীকে নৌসেনা পদকে ভূষিত করছেন

মাসিক
বসুমতী
পৌষ / '৭২

কলিকাতায় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাবৃন্দের এক বিরাট মৌন শোভাযাত্রা

কলিকাতায় সূর্যগ্রহণ দর্শনরত ভাগীরথীর তীরে বিরাট জনতা

মাসিক

বসুমতী

পৌষ / '৭২

বোম্বাই জাহাজ বন্দরে ভারতীয় ফ্রিগেট ব্রহ্মপুত্র
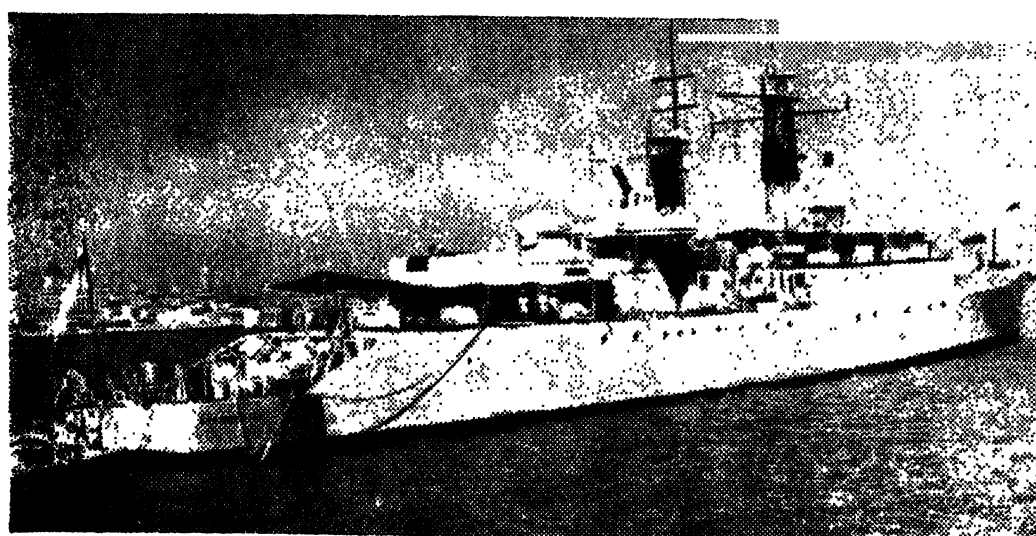
অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা ও ভারতীয় বিজ্ঞান সভা

"Men may come, men may go
But I go on for ever and for ever"

শ্রীনলিনাক্ষ সিংহ

এ পৃথিবীতে কতই না মানুষ জন্মগ্রহণ করিতেছে, আবার আয়ু শেষ হইলেই পৃথিবী ছাড়িয়া, আত্মীয়-স্বজন ছাড়িয়া পরলোকে গমন করিতেছে কে ইহার হিসাব-নিকাশ রাখিতেছে—কারণ এ ত' পৃথিবীর নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার, কিন্তু যে পুরুষসিংহ পৃথিবীতে আসিয়া আর পাঁচজনের মত আপনার বা আপন পরিবারবর্গের স্বার্থের জন্য, সুখ বিধানের জন্য খাটিয়া খাটিয়া জীবন অতিবাহিত না করিয়া দেশের জন্য, দশের জন্য, সমাজের বা পৃথিবীর জনগণের কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া যান, প্রকৃতির নিয়মে তিনি কালের কোলে চলিয়া পড়িলেও চিরজীবী কীর্তির মধ্যেই তিনি চিরকাল জীবিত হইয়া থাকেন। "কীর্তির্যস্য স জীবতি" তিনি সকলেরই হৃদয় জয় করিতে সক্ষম হইয়াছেন—তাঁহার স্মৃতি দেশবাসীর মনে মনে ঘুরিয়া বেড়াইয়া থাকে—তাই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহা-প্রয়াণে বলিয়াছিলেন :—

"এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

আত্মা অবিনশ্বর, দেহ লয়প্রাপ্ত হইলেও আত্মার বিনাশ নাই। চিত্তরঞ্জনের মরদেহ বিলীন হইয়া গিয়াছে, সত্য কিন্তু তাঁর অমর আত্মা দেশের ঘরে ঘরে প্রত্যেক নরনারীর অন্তরে মিশিয়া আজও বিরাজ করিতেছে এবং ভবিষ্যতেও বিরাজ করিবে।

আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে যে পুরুষসিংহের কথা আলোচনা করিতেছি তিনিও এই বিরাট পুরুষেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন, অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার অন্তরেও বাল্যকাল হইতেই দেশপ্রেম জাগিয়া উঠিয়াছিল। [illegible]। [illegible]কে তিনি সাড়া দিয়াছিলেন কিন্তু নানারূপ ঘটনার সংঘর্ষে তাহার এদিকে স্ফুরণ না হইয়া অন্য এক বিরাট ব্যাপারে রূপায়িত হইয়াছিল। বিশ্ব-নিয়ন্তার অপূর্ব কৌশলে তাঁহাকে রাজনীতির ক্ষেত্র হইতে বিশ্বনীতির ক্ষেত্রে নামিতে হইয়াছিল। তাঁহার নিজের নয়, দেশের নয়, দশের নয়, সারা বিশ্বের আত্যন্তিক মঙ্গল সাধিত হইয়াছিল। ইহার পরিচয় দেশবাসীর সকলেই পাইয়াছেন।

জন্ম ও বাল্যকাল: সকলেই জানেন অধ্যাপক সাহার জন্ম হইয়াছিল ঢাকা জেলার এক "অজ" পল্লীগ্রামে। গ্রামখানি ঢাকা সহর হইতে ত্রিশ-বত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত। পিতার আর্থিক অবস্থা মোটেই সচ্ছল ছিল না, মুদীখানার দোকানে যাহা আয় হইত পল্লীগ্রামে কায়ক্লেশে তাহাতেই জীবিকা নির্বাহ হইত—জাতিতে বৈশ্য-সাহা। অজ পাড়াগাঁয়ে লেখাপড়ার চলন কোন সংসারেই ছিল না বলিলেই চলে—প্রাথমিক লেখাপড়াই যথেষ্ট বলিয়া সে আমলে বিবেচিত হইত—পিতা জগন্নাথ সাহারও তাহাই ইচ্ছা

● ডঃ মেঘনাদ সাহা

ছিল—কিন্তু ভাগ্যবিধাতার নির্বন্ধ অন্যরূপ। গভীর অরণ্যে ফুল ফুটিলেও তাহার সুবাস যেমন লোকালয়ে আসিয়া পৌছায় তেমনি মানুষের প্রতিভা কখনও লুক্কায়িত হইয়া থাকে না, তাহা একদিন না একদিন গুণগ্রাহীর চক্ষে ধরা পড়িবে এবং তাহার যথাযোগ্য কদর হইবে। অধ্যাপক সাহার গ্রাম্য পাঠশালাতেই গুণের সম্যক পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

"morning shows the day."

প্রাতঃকালই যেমন সমস্ত দিনের আভাস দান করে থাকে তেমনি বাল্যকাল হইতেই মানুষের ভবিষ্যৎ জীবনের কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। অধ্যাপক সাহারও বাল্যজীবনে অনন্য-সাধারণ প্রতিভা বিকাশ পাইয়াছিল। তাঁহার শিক্ষক ও হিতৈষীদের চক্ষে ধরা পড়িয়াছিল তাঁহার অস্বাভাবিক মেধাশক্তি—তাঁহাদের সমবেত চেষ্টায় ও অধ্যাপক সাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা জয়গোপাল সাহার বিশেষ আগ্রহে তাঁহার উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হইয়াছিল।

শিক্ষা—দারুণ অর্থাভাব, সুতরাং নানা বাধা-বিঘ্নের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল—তিনি শেষে ঢাকা জুবিলি স্কুল হইতে প্রবেশিকা ও ঢাকা কলেজ হইতে তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়া ইণ্টার মিডিয়েট পরীক্ষোত্তীর্ণ হন ও ১৯১১ সালে আরও উচ্চশিক্ষার জন্য কলিকাতায় আসেন ও কোন রকমে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হইলেন—এখানে যাঁহাদের সহপাঠী পাইয়াছিলেন তাঁহারা এক একজন মহা জ্যোতিষ্ক—উত্তর কালে তাঁহারা শিক্ষা ও সরকারী অন্যান্য ক্ষেত্রে এক একজন মহারথী হইয়াছিলেন। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নিখিলরঞ্জন সেন ও অধ্যাপক প্রশান্ত মহলানবিশের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তখন অধ্যাপক জগদীশ বসু পদার্থ বিজ্ঞান, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রসায়ন, অধ্যাপক ডি এন মল্লিক গণিত-শাস্ত্রে অধ্যাপনা করিতেন। বহু জন্মের সাধনার ফলে মেঘনাদের ভাগ্যে এরূপ বিশ্ববরেণ্য গুরু জুটিয়াছিল। পূর্বোক্ত সহপাঠীদের মধ্যে অধ্যাপক এস এন বসু ও তিনি এম-এস-সি পরীক্ষায় মিশ্র গণিত লইয়া উত্তীর্ণ হন। অধ্যাপক বসু প্রথম এবং অধ্যাপক সাহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

কর্মজীবন (প্রথম অধ্যায়)—এম-এসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও মেঘনাদের অর্থকষ্ট দূর হইল না—এতদিন কোন না কোন ছাত্রকে বাড়ীতে পড়াইয়া যাহা বেতন পাইতেন তাহাতেই নিজের ভরণ পোষণ ও শিক্ষার ব্যয় চালাইতেন। তখনও কিছু দিন তাঁহাকে এইভাবেই কাটাইতে হইয়াছিল। অভাবে স্বভাব নষ্ট—তাঁহার স্বাধীন মনেও আলোড়ন দেখা দিয়াছিল। তিনি দায়ে

টাকিয়া অর্থ কষ্ট দূর করিবার জন্যই ফাইনান্স (Finance) পরীক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন; কিন্তু তিনি দেশকে ভালবাসিতেন—দেশমাতৃকার পরাধীনতার দুঃখ তিনি কোন দিন ভুলিতে পারেন নাই, বৃটিশের চণ্ডনীতি তাঁহাকে কাতর করিয়া তুলিয়াছিল—পরাধীনতার নাগপাশ হইতে দেশকে মুক্ত করার এক সদিচ্ছা তাঁহার অন্তরের গোপন স্তর হইতে মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারিত। তিনি বাঘা যতীন প্রমুখ বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশিতেন—এই সব অপরাধের সংবাদ পুলিসের অগোচর ছিল না। পুলিসের অনুগ্রহে কিন্তু সুফলই ফলিয়াছিল; কারণ যে স্বাধীন মনপ্রাণ লইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার বিন্দুমাত্রও অপচয় হইল না। দাসত্ব-জীবনের দুঃসহনীয় ভার তাঁহাকে বহিতে হইল না।

স্যার তারকনাথ পালিত ও স্যার রাসবিহারী ঘোষের দানে তখন সবেমাত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তরুণ যুবক মেঘনাদকে ফলিত গণিত বিভাগে গবেষক ছাত্র হিসাবে গ্রহণ করা হয়। মেঘনাদ কিছুকাল পরেই গণিত বিভাগে ছাড়িয়া দিয়া পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে চলিয়া আসিলেন। তখন পদার্থ বিজ্ঞানের কোন পদেই অধ্যাপক ছিলেন না। মিঃ ভেঙ্কটরমণ পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগে পালিত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হইলেও তখনও এই পদে তিনি যোগদান করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক ডি এম বোস প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে জার্মানীতে অন্তরীণ ছিলেন—কাজেই ইহাদের সাহায্য তাঁহার অদৃষ্টে জুটে নাই—বোধ হয় ইহাও বিধাতার ইচ্ছা ছিল না, কেন না সাহার মত স্বাধীনচেতা মানুষ স্বাধীনভাবে নিজের বিবেক-বুদ্ধিকে চালনা করিবার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই কাহারও সাহায্য না লইয়াই পদার্থ বিভাগের বহু বিষয়ের সম্যক জ্ঞানার্জন করিলেন এবং বন্ধু ও সহপাঠী অধ্যাপক এস এ বসুর সহায়তায় আইনষ্টাইনের আপেক্ষিক মতবাদ (Theory of Relativity) জার্মান ভাষায় লিখিত মূল প্রবন্ধগুলিকে ইংরেজী ভাষায় তর্জমা করেন। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করে। ইহা ছাড়া আলোর চাপ (The pressure of light) শীর্ষক প্রবন্ধও তিনি বিদেশীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এখন হইতে জ্যোতিষ বিজ্ঞানের অনেক তথ্যই (Astrophysics) তিনি আবিষ্কার করিয়া প্রবন্ধাকারে দেশী বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করিতে থাকেন। ইহার ফলে প্রথমে তিনি ডক্টর অফ সায়েন্স উপাধিতে ভূষিত হন ও পরে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিও লাভ করেন।

ইহার পর তাঁহার উত্তাপ পরমাণু, তাপ সমীকরণ (Thermal Ionisatism) প্রভৃতি বিষয়ের বহু প্রবন্ধই বিদেশীয় পত্র-পত্রিকায় বাহির হয় এবং তাঁহাকে দেশী-বিদেশী সুধী-সমাজের স্বীকৃতি দান করে। অতঃপর তিনি বিলাত যাত্রা করিয়া প্রথমে ইংলণ্ডে ফাউলারের গবেষণা-কেন্দ্রে ও পরে জার্মানীতে অধ্যাপক নারষ্টের (Prof. Nernst) বহুদিন গবেষণা করেন এবং তদানীন্তন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় সার আশুতোষের আহ্বানে খয়রা অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। এবং পদার্থ বিজ্ঞানে বিশেষত জ্যোতিষ বিজ্ঞানের (Astrophysics) বহুমূল্য তথ্য আবিষ্কার করেন।

কর্মজীবন দ্বিতীয় অধ্যায়—১৯২২ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যাপকের পদ লাভ করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়া এলাহাবাদ গমন করেন এবং নিবিড়ভাবে গবেষণার কার্য সুরু করেন; কিন্তু এখানে প্রথমত নানারূপ অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল—গবেষণা-উপযোগী যন্ত্রপাতি অথবা আধুনিক যুগের বিজ্ঞানের পুস্তক ও মাসিক পত্র-পত্রিকা ছিল না; কিন্তু অধ্যবসায়ী যুবক মেঘনাদ সমস্ত দোষ-ত্রুটি অগ্রাহ্য করিয়া এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনার গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপন করিলেন। এখানে তাঁহাকে নানাভাবে পরিশ্রম করিতে হইত। B. Sc. শ্রেণীতে পর্যন্ত পড়াইতে হইত—তবুও তিনি এখানে গবেষণা করিবার যথেষ্ট সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণার একটি মুখ্যকেন্দ্রে পরিণত হইল এবং হিন্দুযুগের নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। ভারতবর্ষের বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষা-কেন্দ্র হইতে শিক্ষার্থীরা দলে দলে তাঁহার অধীনে গবেষণা করিবার জন্য এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটিত; বস্তুত অধ্যাপক রমনের মতই তিনিও এক ছাত্রমণ্ডলী রচনা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার ছাত্রেরা উত্তরকালে সরকারী বা বেসরকারী মহলে নানারকম পদে নিযুক্ত হইয়া যশস্বী হইয়াছেন। এ সকলের মূলে ছিল অধ্যাপক সাহার অসাধারণ প্রেরণা, উচ্চ প্রশংসাবাদ ও অকাট্য যুক্তি। তিনি এলাহাবাদে সতের-আঠার বৎসর কাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং এই স্থান হইতেই তাঁহার বহু মূল্যবান তথ্যগুলি আবিষ্কৃত হইয়া জগতের শ্রেষ্ঠ গবেষক-মণ্ডলীর সমাদর লাভ করিয়াছিল। এই স্থান হইতেই তিনি ১৯২৭ সালে ইংলণ্ডের রয়েল সোসাইটির সদস্য (fellow) নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং এই স্থান হইতেই তাঁহার মূল্যবান প্রবন্ধগুলি রচিত হইয়া বেঙ্গল এসিয়েটিক সোসাইটির মুখপত্র ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিন, ফিজিক্যাল রিভিউ, নেচার, রয়েল সোসাইটি অফ লণ্ডন প্রভৃতি দেশী-বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অনেক প্রবন্ধ আবার জার্মান ভাষায় রচিত হইয়া Zeitschrift für Physik. Physikalische Berichte Physikalische Berichte প্রভৃতি বিদেশী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। এই স্থান হইতে তাঁহার মূল্যবান পুস্তকগুলি (1) Treatise on heat (2) Treatise on Modern Physics রচিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কার্য করিবার সময় তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর অনেকটা সান্নিধ্য আসেন এবং তিনি নানাভাবে পণ্ডিতজীর সাহায্য পাইয়াছিলেন।

কলিকাতা প্রত্যাবর্তন—১৯৩৮ সালে কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের পালিত অধ্যাপক ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের সর্বময় কর্তা হইয়া তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৩৩ সালে অধ্যাপক রমন বাঙ্গালোর ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সের সর্বময় কর্তা (Director) হইয়া বাঙ্গালোর গমন করিলে অধ্যাপক ডি এম বসুকে এই পদে বহাল করা হয়। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর মহাপ্রয়াণে বোস ইনষ্টিটিউটে ডিরেক্টারের পদ খালি হয়। অধ্যাপক ডি এম বসুকে ঐ পদে নিযুক্ত করা হয়। কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়া অধ্যাপক সাহার বহুমুখী প্রতিভা দিকে-দিকে কর্মক্ষেত্র খুঁজিতে লাগিল এবং এখানে কর্মজীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি যে সংগঠন-মূলক কার্য করিয়া গেলেন তাহা তাঁহার নাম বিজ্ঞান-জগতে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

বিদেশ যাত্রা—অধ্যাপক সাহা ১৯১৯ সালে সর্বপ্রথম বিলাত যাত্রা করিয়াছিলেন। এ সময়ে তিনি কিছুদিন ইংলণ্ডে ও পরে জার্মানীতে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তারপর আবার ১৯২৭ সালে ইংলণ্ড ও ইতালিতে আন্তর্জাতিক পদার্থ বিজ্ঞানিগণের সম্মেলনে যোগদান করেন। কয়েক বৎসর পরে হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া আমেরিকা গমন করেন এবং এখান হইতে তিনি কোপেনহেগানে অধ্যাপক নীল্স বোরের (Prof. Neils Bohr) গবেষণার পরিদর্শন করেন ও সেখানে আণবিক (Nuclear) পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা পর্যবেক্ষণ করিয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর আরও একবার কার্যোপলক্ষে তাঁহাকে পাশ্চাত্য দেশে যাইতে হয়। তিনি একবার রাশিয়া দেশ পরিভ্রমণে যান ও সেখানকার নানা ব্যাপার বেশ মনোজ্ঞভাবে এদেশীয় পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য দেশ পরিভ্রমণ করিয়া তিনি যে অমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেকটি তিনি দেশের নানরূপ কার্যে লাগাইয়া ছিলেন। গঠনমূলককার্যে তাঁহার মত সুদক্ষ বিজ্ঞানী সে আমলে আর কেহ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব ইহাতেই তিনি চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হইয়া থাকিবেন।—

গঠনমূলক কার্য—এলাহাবাদে থাকিবার সময়েই তিনি সেখানে ন্যাশনাল একাডেমি অফ সায়েন্স নামে একটি বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলেন। তারপর ন্যাশনাল ইনিষ্টিটিউট অফ সায়েন্সও তাঁহার উদ্যম ও বহু পরিশ্রমের ফলে গড়িয়া উঠে। ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশন ও সায়েন্স এণ্ড কালচার নামক বৈজ্ঞানিক পত্রিকাখানির তিনিই প্রতিষ্ঠাতা এবং তিনি তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহার সম্পাদনা করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা থাকার কিছুদিন পরেই তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সহিত একযোগে কাজ করেন। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলির পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার করিয়া দেখেন—তাঁহারই পরামর্শানুসারে ভারতবর্ষের নদীগুলির উপর বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল বিদ্যুৎ উৎপাদন কল্পে বাঁধ (Jam) দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আজকাল যে সকল জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত হইয়া কার্যে রূপায়িত হইতেছে তাহাদের মূলে ছিল অধ্যাপক সাহার অসামান্য অবদান। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। অধ্যাপক সাহার চিন্তাধারা বহুমুখী। তিনি দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সবার উপর বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নের কথা সর্বদা নিবিড়ভাবে চিন্তা করিতেন এবং অনেক সময় তিনি যেরূপ ভাবিতেন ফলও তদনুরূপ ফলিত। তাঁহার বহু আশা আকাঙ্ক্ষাই পূর্ণ হইয়াছিল। এক এক সময় মনে হইত—যেন ভবিষ্যতের চিত্রগুলি তাহার চক্ষের সুমুখে ভাসিয়া বেড়াইতেছে। কার্যে সিদ্ধির বিষয়ে তিনি সুনিশ্চিত।

অধ্যাপক সাহার সর্বাপেক্ষা সুমহান কীর্তি দুইটি। একটি হইল নিউক্লিয়ার বিজ্ঞানের (আণবিক) শিক্ষা ও গবেষণার জন্য "ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স" নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন, অন্যটি ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভার নূতনভাবে সংগঠন। এই দুইটি ব্যাপারেই তিনি যে বিজ্ঞতা ও কর্মকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইউরোপের কোপেনহেগেনে অধ্যাপক বরের গবেষণাগারে তিনি এই আণবিক পদার্থ বিজ্ঞানের নূতনতম শাখার শিক্ষা, শিক্ষণ ও অনুশীলনের উদ্যোগ আয়োজন দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং ভারতে ইহার অনুরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার তীব্র আকাঙ্ক্ষা তখন হইতে তাহার সংগঠনশীল মস্তিষ্কে ক্রিয়া করিতেছিল। তিনি সুযোগ সুবিধার প্রতীক্ষায় ছিলেন, ভগবানের অশেষ অনুগ্রহে সুযোগও উপস্থিত হইয়াছিল তিনি পণ্ডিত জহরলালজীর সাহায্যে জামসেদজী টাটা কোম্পানীর নিকট হইতে বেশ কিছু অর্থ সাহায্য পান। তারপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও শেষে স্বাধীন ভারতের অর্থ ভাণ্ডার হইতে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য পাইয়া এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি ইহার আজীবন সর্বময় কর্তা ছিলেন (Director)। তাঁহারই অশেষ চেষ্টায় এই বিশেষ বিষয়টি এম এস সি'র পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তদানীন্তন অন্যতম প্রধান নেতা ও স্বাধীন ভারতের স্বনামধন্য শ্রম-সচিব স্বর্গীয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এই গবেষণাগারের ভিত্তিস্থাপন করেন এবং জগদ্বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী ম্যাদাম কুরীর কন্যা এই প্রতিষ্ঠানটির দ্বার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্ঘাটন করেন।

এই প্রতিষ্ঠানটির জন্য তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং ইহার উন্নতির জন্য কত যে চিন্তা করিতেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভায় অধ্যাপক সাহার অবদান—১৯২২।২৩ সালে যখন তিনি বিজ্ঞান কলেজে (University College of Science) পদার্থ বিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপকের পদে অধিষ্ঠিত তখন হইতেই এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত তাঁহার সংযোগ ঘটে—সেই সময়েই তিনি ইহার আজীবন সদস্য নির্বাচিত হন এবং প্রায়ই অবসর সময়ে এখানে আসিয়া নানারূপ পুস্তক বিশেষ জার্মান ভাষায় লিখিত মাসিক পত্র-পত্রিকা অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহাকে প্রায়ই (Zeitschüft für Physik, Physikalische Zeitschrift Analen Du Physik Physikalische Berichte) পড়িতে দেখা যাইত। ইহার পর তিনি এলাহাবাদে চলিয়া গেলেও যখনই কলিকাতায় আসিতেন তখনই একদিন না একদিন এখানকার পুস্তকাগারে আসিয়া নানা ভাষায় লিখিত পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা পড়িয়া যাইতেন। তিনি কোনদিনই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারেন নাই—তাঁহার একটা কিছু করা চাই।

১৯৩৩ সালে অধ্যাপক রমণ বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অফ সায়েন্সের ডিরেক্টর হইয়া বাঙ্গালোরে গমন করিলে প্রধানত তাঁহারই প্রচেষ্টায় স্যার নীলরতন সরকার এই প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি এবং অধ্যাপক এস কে মিত্র ইহার অবৈতনিক কর্ম-সচিব নির্বাচিত হন। অধ্যাপক কে এস কৃষ্ণণকে মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। ১৯৩৮ সালে তিনি বিজ্ঞান কলেজের পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় ফিরিবার পর হইতেই বিজ্ঞান সভার সহিত তাঁহার আরও ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে। তিনি ইহার প্রতিটি সভা-সমিতিতে যোগদান করিতেন এবং ইহার কার্যকরী সমিতিরও একজন বিশিষ্ট সদস্য নির্বাচিত হইয়াছিলেন এবং ৪১-৪২ সালে তিনি ইহার অবৈতনিক কর্ম সচীব নির্বাচিত হন। এই সময় হইতেই বিজ্ঞানসভার জীবনে নব অধ্যায়ের সূচনা হয়। অধ্যাপক সাহা তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের শিক্ষা বিভাগের কর্মসচিব ডাঃ ডি এম সেনের সহিত পরামর্শ করিয়া যাদবপুরে তিন বিঘার মত জায়গা সংগ্রহ করেন এবং এই স্থানেই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানটিকে স্থানান্তরিত করিবার সংকল্প করেন।

অধ্যাপক রমণের আমলে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে (Science Association)-এ, শুধু বিজ্ঞান লইয়াই গবেষণা চলিয়াছিল রসায়ন বা উদ্ভিদ বিদ্যার বিভাগগুলি একে একে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল—অধ্যাপক সাহার প্রচেষ্টায় প্রথমত এখানে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি (Physical Chemistry) ও পরে জৈব রসায়ন (Organic Chemistry) বিভাগ খোলা হয় ও পূর্ণোদ্যমে গবেষণা করার ব্যবস্থা হয়। এই সময়টি যুগ-সন্ধিক্ষণ বৃটিশ সরকার ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে, জাতীয় সরকার সবে মাত্র গড়িয়া উঠিয়াছে অধ্যাপক সাহার অশেষ চেষ্টায় এবং ডাঃ এস এস ভাটনগর, ডাঃ ডি এম সেন প্রমুখ শুভানুধ্যায়ী বন্ধুগণের সহায়তায় বিজ্ঞানসভার রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের গবেষণার জন্য প্রায় একলক্ষ টাকার মত বাৎসরিক অর্থ সহায্য বা বৃত্তি (Recurring grant in aid) কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট হইতে আদায় হয় কিন্তু পদার্থ বিজ্ঞান এবং রসায়ন এই দুইটি বিভাগের গবেষণা কার্য চালাইবার মত পর্যাপ্ত স্থান বহুবাজার স্ট্রীটের বাড়ীতে ছিল না এখানে যে সকল ঘর ছিল তাহা পদার্থ বিজ্ঞানের পরীক্ষাগারের (Laboratory) যন্ত্রপাতিতেই পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। বক্তৃতা গৃহে সাময়িকভাবে জৈব রসায়ন কেমিস্ট্রীর পরীক্ষাগার খোলা হইল। ইহাতে অধ্যাপক সাহার তৃপ্তি হইল না। হয়ত এই বাড়ীর উপর দোতালা ও তিন-তলায় আরও ঘর নির্মাণ করিলে কার্য চলিয়া যাইত কিন্তু অধ্যাপক সাহা এই বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানটির জন্য আধুনিক প্রথায় এমন একটি হর্ম্য নির্মাণ করাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন যাহাতে প্রয়োজন হইলে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখারও গবেষণা চলিতে পারিবে। এই বাড়ীখানি যাহাতে একটি আদর্শস্থানীয় গবেষণাগারের উপযোগী হয় ইহাই ছিল তাঁহার আন্তরিক অভিলাষ। যাই হউক ভগবান তাঁহার এ ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছিলেন—তিনি ইহা নির্মাণের জন্য ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার ও বাংলা সরকারের নিকট যথেষ্ট অর্থ সাহায্য পাইয়াছিলেন এবং বহুবাজারের পুরাতন বাড়ীখানি বিক্রয় করিয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছিল তাহাও এই বাড়ীখানির নির্মাণ কার্যে ব্যয়িত হইয়াছিল।

বেশী কথা যাদবপুরের বিস্তৃত নারিকেল বাগানে যে আধুনিক পদ্ধতিতে বিশাল অট্টালিকা নির্মিত হইল তাহা একদিকে যেমন মনোহর অন্যদিকে ইহার কক্ষগুলিও তেমনি প্রশস্ত এবং পরীক্ষাগারের সম্পূর্ণভাবেই উপযোগী। এখানে একদিকে পদার্থ বিজ্ঞানে X'-Ray (বহন রশ্মি বিভাগ) magnetism, Raman Effect ও Theoretical Physics-এর বিভাগ খোলা হইল—অন্যদিকে Physical Chemistry, Organic Chemistry (জৈব রসায়ন) ও In-organic Chemistry (অজৈব রসায়ন) বিভাগও খোলা হইল। এখানে সকল বিভাগে পূর্ণোদ্যমে কার্য চলিতে লাগিল। ভারতের স্বাধীন সরকার অধ্যাপক সাহাকে এই বিশাল গবেষণাগারের সর্বময় কর্তা নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তবুও অধ্যাপক সাহার বিরাম বিশ্রাম নাই। তাঁহার অহরহ চিন্তা কেমন করিয়া এই গবেষণাগারটিকে পাশ্চাত্যের আদর্শে গড়িয়া তুলিবেন। কেমন করিয়া এই ভাবে পাঠাগারের কার্যাবলী আদর্শস্থানীয় হইবে। প্রতিদিন সকালেই তিনি এখানে ছুটিয়া আসিতেন। পুস্তকাগার হইতে নানারূপ পুস্তক, সাময়িক বৈজ্ঞানিক পত্র-পত্রিকা পাঠ করিতেন—আবার দুপুরে হাজির হইয়া অধ্যাপকগণের সহিত মিলিত হইয়া গবেষণা সম্বন্ধে নানারূপ আলাপ-আলোচনা করিতেন। আবার ইহার জন্য অর্থসংগ্রহ করিতে শিল্পপতি ও রাজ্য সরকারের দপ্তরে দরবার করিতেন। এগুলি যেন তাঁহার দৈনন্দিন সাংসারিক কাযেই পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যের কথা কোনদিনই চিন্তা করিতেন না।

চোখেমুখে ঠাণ্ডা জল দিয়া আসিতেন। আমাদের একান্ত অনুরোধে কখন বা একটু ফাঁকা হাওয়ায় খানিক বসিয়া থাকিতেন কিন্তু দশ মিনিট থাকিয়াই আবার কার্যের মধ্যে ডুবিয়া যাইতেন।

ছাত্র বৎসলতা—অধ্যাপক সাহা ছাত্রদের নিজের পুত্রের মতই স্নেহ করিতেন। কেহ অসুস্থ হইয়া পড়িলে বা কাহারও বিপদ-আপদ ঘটিলে তিনি নানা প্রকারে তাহাকে সাহায্য করিতেন। ছাত্রেরা যাহাতে ভাল চাকরি-বাকরি পায় বা জীবনে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্য তাঁহার চেষ্টার অন্ত ছিল না। নিজের ছাত্র ছাড়াও সাধারণ ছাত্রের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট স্নেহ ছিল। আমরা একবার একজন দুঃস্থ ছাত্রের ভর্তি ব্যাপারে তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম—ছেলেটি বি-এস-সি পরীক্ষায় পাশ কোর্সে উত্তীর্ণ হয়—এম-এস-সি পড়িবার তাহার প্রবল ইচ্ছা কিন্তু বি-এস-সি ডিসটিংশনে পাশ করা ছেলেরও এম-এস-সিতে ভর্তি হইবার উপায় ছিল না। সেবারের ছাত্রের সংখ্যা খুবই বেশী ছিল—আমি ছেলেটিকে লইয়া আসিয়াছিলাম—তিনি উহার সহিত খানিকক্ষণ আলাপ করিয়াই উহার দরখাস্তে দস্তখৎ করিয়া দিয়াছিলেন।

আপাতদৃষ্টিতে অধ্যাপক সাহাকে একটু রূঢ় প্রকৃতির লোক বলিয়া মনে হইলেও তাঁহার অন্তর ফুলের মতই কোমল ছিল। একবার তাঁহার সহিত আলাপ হইলেই তাঁহাকে আপনজন বলিয়া মনে হইত। তিনি নানাভাবে পরোপকার করিতেন—তিনি দেশকে যেমন ভালবাসিতেন তেমনি ভালবাসা ছিল দেশের প্রতিটি মানুষের উপর। প্রতিটি নর-নারীই তাঁহার আত্মীয়-ভাই-ভগ্নী। দেশ বিভাগের ফলে কত নর-নারীকে তাঁহাদের পিতৃ-পিতা-

সুষ্ঠুভাবে বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে বর্ষ-পঞ্জিকা সংকলন করিয়া—তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

মৃত্যু :—পূর্বেই উক্ত হইয়াছে—তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ রক্তের চাপ বৃদ্ধি (Blood pressure) রোগে ভুগিতেছিলেন কিন্তু শরীরের দিকে লক্ষ্য দেওয়ার মত তাঁহার অবসর ছিল না। কাজের মানুষ তিনি—সর্বদা কাজেই ডুবিয়া থাকিতে ভালবাসিতেন—কিন্তু সকলেরই একটা সীমা আছে, সকলেরই একটা বাঁধাধরা নিয়ম আছে—একটা মাপকাঠি আছে—ডাঃ সাহা প্রকৃতির একনিষ্ঠ সাধক হইয়াও নিজের ক্ষেত্রে প্রকৃতির ইঙ্গিত উপেক্ষা করিয়াছিলেন। বিশ্রাম লইবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করেন নাই সুতরাং বিশ্রাম লওয়া তাঁহার জীবনে কোনদিন ঘটিয়া উঠে নাই। শারীরিক বা মানসিক সকল প্রকার কার্যেই তাঁহার সমান উৎসাহ ছিল। কি সাইক্লোট্রন ল্যাবটারী কি বিজ্ঞান সভার ল্যাবরেটরী সকল স্থলেই তিনি ঘুরিয়া বেড়াইয়া ছাত্রদের উৎসাহ দিতেন। কায়িক পরিশ্রমেও তিনি কখনও পশ্চাৎপদ হইতেন না। একবার বিজ্ঞানসভার একঘর হইতে অন্য ঘরে একটি বড় টেবিল লইয়া যাইতে হইবে ঐ টেবিলটির উপর কি-যেন একটি যন্ত্র বসিবে। কুলি পাওয়া যাইতেছিল না অথবা কুলি আসিতে বিলম্ব হইতেছিল—ডাঃ সাহার বিলম্ব সহ্য হইল না—তিনি নিজেই টেবিলটার একদিক ধরিলেন এবং হাসিতে হাসিতে ছাত্রদের বলিলেন চুপ করিয়া মুটের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিলে কি গবেষণার কার্য চলে—ছাত্রেরা উৎসাহিত হইয়া ধরাধরি করিয়া টেবিলখানি অন্যঘরে লইয়া গেল। বলা

প্রিয়তমাসু

গোবিন্দপ্রসাদ বসু

সুরে তোমার পরশ দিয়ে জাগিয়ে দিলে
কৃষ্ণচূড়ার রঙে আকাশ রাঙিয়ে দিলে।
ইন্দ্রধনুর শোভা যে ওই ফুলের বনে,
ছোঁয়া কি তার লাগলো আমার গোপন মনে?

জাগিয়ে দিলে আমায় তুমি গভীর সুখে,
অনুরাগের রক্তগোলাপ দুলছে বুকে!
তোমার গানের সুরের নদী, সুরঞ্জনা
আজকে আমার বুকের মাঝে কলস্বনা॥

কয়েকদিন যাবৎ তিনি রক্তের চাপবৃদ্ধি রোগে ভুগিতেছিলেন (Blood pressure) কিন্তু সেদিকে তাঁহার মোটেই ভ্রূক্ষেপ ছিল না। মুখখানি লাল হইয়া উঠিত—কান মাথা দিয়া যেন আগুনের স্ফুলিঙ্গ বাহির হইয়া আসিতেছে, মাথা ধরিয়াছে—চোখে হাত দিয়া বসিয়া আছেন—আমরা তাঁহাকে কতদিন বিশ্রাম লইবার জন্য অনুরোধ করিয়াছি। তিনি কখন একটু হাসিয়া বলিতেন ও কিছু নয় কাল ভাল ঘুম হয় নাই এমনি সারিয়া যাইবে। কখন বা উঠিয়া

মহের বাস্তু ছাড়িয়া ভারতে আশ্রয় লইতে হয়—তাহাদের পুনর্বসতি ও সুযোগ-সুবিধার জন্য তিনি তাঁহার কত মূল্যবান সময় নষ্ট করিয়া রাজ্য সরকারের সহিত দরবার করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে উদ্বাস্তুদের জন্যেই তিনি লোকসভায় গমন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের নানাভাবে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন।

উপসংহার :—ডাঃ সাহার শেষ কার্য হইল বর্ষপঞ্জিকা সংকলন। পণ্ডিত জহরলালের আহ্বানে তিনি এই কার্যের ভার লইয়া বেশ

বাহুল্য তিনি তখন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানের সর্বময় কর্তা—কুলির কাযে তাঁহার আত্মসম্মানে আঘাত লাগিল না বরং তিনি ইহাতে শ্লাঘাই অনুভব করিতেন কিন্তু তাঁহার এত গুণগ্রাম সত্ত্বেও প্রকৃতি তাঁহাকে ক্ষমা করিল না, নিয়তির কোলে ঠেলিয়া দিল। তাই আকস্মিকভাবে দিল্লীর রাজপথের মাটিতে তিনি একদিন ঢলিয়া পড়িলেন। পল্লীর মানুষ তিনি—মাটিতে পড়িয়া শৈশব বা বাল্যকাল কাটিয়াছে, তাই পবিত্র মাটির উপর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

এশিয়া, আফ্রিকায় আজও বুনো জনপদের অভাব নেই, জঙ্গলের সংখ্যাও ফেলনা নয়। তার কোণে কোণে রহস্য, আতংক আর মরণের হাতছানি। অগণ্য বন্যপশুর লীলাভূমি বন। এসব দেশের মানুষ আজ কিছুটা এগোলেও এ কাহিনী যে সময়ের তখন ঢের পেছিয়ে ছিল, আজকের তুলনায়ও। বনের প্রাণী থাক, মানুষ নিজেকে কতটা সভ্য করতে পেরেছে সত্যি সত্যি?

যাক্! আজ বলতে বসেছি এক অ্যাডভেঞ্চারপ্রিয় মহাপ্রাণ ইংরেজ ইঞ্জিনীয়ার এবং আর তাঁরই একজন বিপরীতধর্মী স্বদেশবাসীর কাহিনী।

ডিক আরবুথনট ভারতের এক বিখ্যাত কর্নেল-এর নাতি। পিতামহ ভারতবাসীদের সম্বন্ধে অকৃতজ্ঞতার অভিযোগ করেছিলেন, কিন্তু তরুণ আরবুথনট ওই কথাটি বাদ দিতে চেয়েছিলেন। কেন না, তাঁর কাছে এদেশে ইংরেজদের কার্যকলাপ "mission" বই নয় এবং তিনিও তরুণবয়সে স্বদেশ ছেড়ে ভারতে পাড়ি জমিয়েছিলেন তাঁর ঐ প্রতীতি বাস্তবায়নের মহৎ উদ্দেশ্যে। এঞ্জিনীয়র আরবুথনট এ দেশে বিরাট কিছু করার আশায় এসে নেপালের ভেতর দিকে আস্তানা গেড়েছিলেন। ইচ্ছা, হিমালয় পেরিয়ে তিব্বত থেকে নেপালের মধ্য দিয়ে কলকাতা পর্যন্ত রেল চলাচলের ব্যবস্থা। এই আপাত-অসম্ভব পরিকল্পনা স্বাভাবিক নিয়মেই অনেকে কিঞ্চিৎ সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেছিলেন।

কিন্তু, ওয়াকিবহাল ইংরেজরা তাঁকে দেখতেন শ্রদ্ধা-বিস্ময় মিশ্রিত দৃষ্টিতে আর দেশী মানুষ তাঁকে টেনে নিয়েছিল অন্তরঙ্গভাবে। ডিক সাহেবের খ্যাতি তাদের মুখে মুখে আনাচে কানাচেও ছড়িয়ে পড়েছিল। শুধু ইংলণ্ড নয়, ন্যু ইয়র্ক-এর কাগজেও তাঁর রেলরাস্তার খবর বেরুত। সব সন্দেহ প্রায় ঘুচিয়ে শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা বেশ রূপায়ণ-যোগ্য বলে মনে হ'ল সন্দেহ-বাতিকগ্রস্তদের কাছেও।

চারপাশে অকরুণ প্রকৃতি নির্মম। অত্যুচ্চ পর্বতশীর্ষ থেকে গলে আসা বিধ্বংসী স্রোত কাউকে ক্ষমা করে না। প্রাণ বাঁচাতেই যেখানে প্রায় প্রাণান্ত সেই পরিবেশে আরবুথনট আপাত-অসম্ভব রূপায়িত করার কল্পনায় বিভোর। তিনি যুবক আর ব্রতোদ্‌যাপনের সুদৃঢ় সঙ্কল্পে বলীয়ান। যৌবন আর সঙ্কল্প— দুই অমোঘ শক্তি চরম প্রাকৃতিক বাধা-বিপর্যয় ভেঙে-চুরে নতুন জীবন স্পন্দন সৃষ্টির কর্মোদ্যগে অবিচল। জঙ্গলের মধ্যে প্রধান কার্যালয় স্থাপিত। তাই ঘিরে চারদিকে অবিরাম কর্মচাঞ্চল্য। নকাদি সব আঁকা শেষ। শেষ প্রস্তুতি চলছে বন্য প্রকৃতির অন্দরমহলে।

তথ্যান্বেষী

হঠাৎ সব কিছু ওলোটপালট হয়ে গেল। যার অবিশ্বাস্য আশায়, উদ্যমে, যোগ্যতায় আপাত-অসম্ভবের সীমানা পেরিয়ে যাওয়ার সন্ধিক্ষণে এসে পৌঁছেছিল অনেক মানুষ, অনেক পেছিয়ে-পড়া এগিয়ে যেতে উৎসাহী মানুষ তার ললাটে অমোঘ বিধিলিপির মত আঁকা হয়ে গেল ছোট্ট, উজ্জ্বল এক গোখরো সাপের চুম্বন। যে মানুষ একদিন প্রমিথিয়ুস্-এর মত সব বাধা-বিপত্তির বিরুদ্ধে মানব মঙ্গলের জয়শঙ্খ হাতে করে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর দীর্ঘ সাবলীল অনিন্দ্য শরীর লুটিয়ে পড়ল একুশে আইনের পরিহাসে। একজন মহৎ মানুষ প্রাণ হারালেন অরণ্যচারী এক ক্ষুদ্রকায় গোখরো সাপের আঘাতে।

সমস্ত পৃথিবীতে সেদিন বেদনার রোল উঠেছিল।

কিছুদিন পরে সিংহলে এক খ্যাত-নামা দ্বিপ-শিকারী এলেন অবসরের ধূসর ক্ষণগুলোকে রঙিন করার সদিচ্ছা নিয়ে। জাতে ইংরেজ। খর্বকায়, দামী পোষাকে সর্বাঙ্গ ঢাকা, কাছাকাছি একজোড়া ধূসর কুৎকুতে চোখ। নাম স্যার র‍্যালফ্ রিংগ্রোস্। বারণ বধ তখন আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু এই বৃটিশ অভিজাত চূড়ামণি অস্ত্র ব্যবসায়ে সম্পদ এবং খেতাব জুটিয়ে তার জোরে বিশেষ সরকারী অনুমতি নিয়ে এসেছিলেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে যা দণ্ডযোগ্য অপরাধ, তা নিশ্চয়ই অ-সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয় এবং এই মহাশয় ব্যক্তিটিকে অন্ধিসন্ধি বাতলানর দায়িত্ব পড়েছিল সিংহলের এক পশুপ্রেমী জেলা অফিসারের ওপর। ভদ্রলোকের ট্রেসি হাচিনস্-এর ঐ জেলার হস্তিকুল বড় প্রিয় ছিল। ওদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর কর্তব্যের অন্তর্গত। ওরা এত মূল্যবান যে এদের রক্ষা করা হ'ত সযত্নে। দ্বিপযূথ বড় ভাল—ওরা অসাধারণ পরিশ্রমী, পোষ মানলে বড় শান্ত, আজীবন খুব সংযত আর স্নেহ-প্রবণ।

স্যার রিংগ্রোস্-এর লক্ষ্য ছিল এক অতিকায় দলপতি হত্যা। ওরা অত্যন্ত দুর্লভ এবং বোধহয় সব জন্তুর সেরা,—এমন রাজকীয় মহিমা আর কোনও জন্তুর নেই। গজপতি বনপতিও বটে—তার পেছনে হস্তিযূথ, তার বিপুল মাথা আর শুঁড় সবার ওপরে, দলের যে-কোন বিপদে অসীম বলে প্রতিরোধ করতে সদা-উদ্যত।

সেই জংগলের সব সেরা হাতীটিকে ডাকা হ'ত সাহেব নামে—সমস্ত বন তন্নতন্ন করে খুঁজলেও তার জুড়ি মিলবে না। তখনও তার পূর্ণ যৌবন, অসীম বলশালী এই অরণ্যরাজ তখনও বহু বছর দর্শনীয় হাতীর জনক হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতাসম্পন্ন। সিংহলী মানুষের মুখে মুখে ফিরত তার গল্প, তার মহত্ত্ব, বীরত্ব, কাণ্ডজ্ঞান আর উপস্থিত বুদ্ধির কাহিনী।

হঠাৎ মুখে মুখে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল 'সাহেব' হত্যার ক্রুর সংবাদ। বীরপুঙ্গব মাননীয় স্যার র‍্যালফ রিংগোস আচমকা তার মাথায় গুলী করে বীরত্বর আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েছিলেন। মাথায় গুলী লাগায় দ্বিপশ্রেষ্ঠ 'সাহেব' কী যে হল বোঝার আগেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। তার সুবিপুল চলমান ধূসর দেহে আর কখনও পাতার ফাঁক গলে আলো ঝিকিয়ে উঠবে না, আর কখনও দেখা যাবে না তাকে—সমুন্নত দেহী 'সাহেব' আর শুঁড় উঁচিয়ে স্বজাতীয়দের রক্ষা করতে সদা-উদ্যত ভঙ্গীতে চলাফেরা করবে না সিংহলের বনে। তার উত্তরপুরুষ মানুষের বহু কাজে এসেছে।

অথচ একজন মানুষ—জনৈক মানবক বিশেষ যে হয়ত জীবনে কারুর কোনও মঙ্গল করে নি, সেই মাথা ঠারো মুহূর্তের উল্লাসে লোলুপতায় এক গুলীতে এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছিল অন্যতম বারণপতির মমতাময় সুবিপুল মস্তিক।

সমস্ত বনে সেদিন বেদনার রোল উঠেছিল।

রোবটের সাহায্যে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ

সেকেলে শহরের কথা ছেড়ে দিলেও, হালের সুপরিকল্পিত শহরগুলিতেও ভবিষ্যতে যানবাহন চলাচল দুরূহ হয়ে পড়বে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন। অপ্রশস্ত পথের দরুণ সময় ও জিনিষপত্রের অপচয় ছাড়াও লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এর একমাত্র সুরাহা হতে পারে যদি ভবিষ্যতে ইলেকট্রোনিক্যাল বা বৈদ্যুতিন ব্যবস্থায় পথে যানবাহন চলাচল পরিচালিত করা যায়। মিউনিখ, পশ্চিম বেলিন, স্টুটগার্ট ইত্যাদি পশ্চিম জার্মানীর বড় বড় শহরে ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থা গ্রহণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

একদিন ছিল যখন পুলিস তার খেয়ালখুশিমত রাজপথে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করত, তারপর তার স্থান দখল করল অটোমেশন বা আলো দিয়ে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, কিন্তু সে ব্যবস্থাও এখন প্রায় অচল হয়ে উঠছে কারণ পথে গাড়ি থাকুক বা নাই থাকুক আলোগুলি একটি নির্দিষ্ট সময় অন্তর যানবাহন নিয়ন্ত্রণের কাজ করে যায়, কিন্তু বৈদ্যুতিন ব্যবস্থায় যানবাহনের সংখ্যা বুঝে ট্রাফিক বা গাড়ির ভিড় নিয়ন্ত্রিত হবে।

ভবিষ্যতে যখন বৈদ্যুতিন ব্যবস্থায় যানবাহন নিয়ন্ত্রিত হবে, তখন একটি কমপিউটার যন্ত্রে পথে বা পথের সংযোগস্থলে গাড়ির সংখ্যা হিসেব করে নিয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হবে। অর্থাৎ "ট্রাফিকের নাড়ি' বুঝে গাড়িগুলিকে থামিয়ে রাখা হবে, চলতে দেওয়া হবে অথবা ঘুরিয়ে অন্য পথ দিয়ে চালাতে বলা হবে। ভবিষ্যতে যখন পশ্চিম জার্মানীর বড় বড় শহরে এই ব্যবস্থা হবে, তখন ধরাবাঁধা ব্যবস্থায় লাল, সবুজ আলো না জ্বলে বিভিন্ন পথে ও মোড়ে গাড়ির ভিড় বুঝে আলোর সঙ্কেত নিয়ন্ত্রণ করবে বিভিন্নমুখী যানবাহনের গতিবিধি।

॥ তেরো ॥

আশা এমনই জিনিষ যে তার কিছুই অবশিষ্ট নেই ভেবে যখন নিশ্চিন্ত হয় মানুষ বা হবার চেষ্টা করে তখনও তা মনের কোন এক অজ্ঞাত কোণে থেকেই যায়, কিছুতেই সম্পূর্ণ বিদায় নেয় না বা নিশ্চিহ্ন হয় না। 'কোন আশা রাখি নি' বলে মানুষ যখন সরবে প্রচার করে তখন সে প্রকাশ্যেই আশার অপরাজেয়ত্ব স্বীকার করে। সে ঘোষণা নিজের পরাজয়েরই ঘোষণা আর যখন নীরব থেকে মনকে আশ্বাস দেয় যে এই বিশেষ ক্ষেত্রে সে কণামাত্র আশা রাখে নি, সবটুকু খুইয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছে—তখনও সে আত্মপ্রবঞ্চনা করে মাত্র। অথবা অবচেতনে তখনও সেই অমর অস্তিত্বের সঙ্গে যুদ্ধই করে আসলে। আশা নিশ্চিহ্ন হয় না কখনই, কোন-দিনই—মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত সে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে। মরবার সময়ে শেষ আশা

ওপরওলার পক্ষে এই 'মার্চ' চলতে চলতে পিকৃটনকে খুঁজে বার ক'রে নতুন আদেশ বা নির্দেশ জানানো সময়সাপেক্ষ—এসব যুক্তিতেও মনকে আর প্রবোধ দিতে পারছিল না।

কিন্তু অকস্মাৎ, সন্ধ্যার কিছু আগে—যখন সেদিনের মতো চলার বিরতি ঘোষিত হ'ল; পাহাড়ের কোলে অপেক্ষাকৃত একটা খোলা জায়গায় ওদের রাত্রিবাস করার হুকুম হ'ল—কোনমতে এক জায়গায় ডুলিটা নামিয়ে সেই খানেই পরিষ্কার বা অপেক্ষাকৃত আরামদায়ক কোন স্থান খোঁজবার চেষ্টা না ক'রেই—ক্লান্তিতে প্রায় পা ভেঙ্গে মুখ গুঁজড়ে পড়েছে করণ—তখন একেবারে অপ্রত্যাশিতভাবে এতক্ষণের একান্ত প্রত্যাশিত সংবাদ এসে পৌঁছল।

আশপাশের বিশ্রামরত সিপাহীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল কিছু আগেই—করণ তখনই টের পেত যদি না অবসাদে সে অমন অজ্ঞানের মতো হয়ে পড়ত। কোন অনুভূতিই তার ছিল না তখন, সমস্ত স্নায়ু শিথিল হয়ে

চেয়ে রইলেন তার দিকে। চোখের দৃষ্টিতে যদি সেকালের মতো সত্যি সত্যিই ভস্ম করা সম্ভব হ'ত তো তখনই পুড়ে ছাই হয়ে যেত করণ—নেহাৎ পৌরাণিক যুগ নয় বলেই অব্যাহতি পেল সে। কিন্তু চোখের দৃষ্টিতে যাই থাক—শেষ পর্যন্ত পিকৃটন যখন মুখ খুললেন তখন দেখা গেল—ইংরেজের মনোভাব গোপন করার যে আশ্চর্য শিক্ষা তা তিনি বিস্মৃত হন নি। ধমক দেওয়া বা গালিগালাজ করার স্থানকাল এটা নয় তা বুঝেই বোধ হয়—একেবারে ভাব-লেশহীন কণ্ঠে, সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিকভাবে নূতন আদেশ নির্দেশ জানালেন তিনি। শুধু, এ নির্দেশ তাকে নিজে এসে দিতে হ'ল কেন, আর্দালী দিয়ে ওদের ডেকে পাঠিয়েই যা জানানো চলত (আর তাই-ই তো চলে থাকে সর্বক্ষেত্রে) অনায়াসে অথবা লোক মারফৎ জারী করা চলত—তাঁর জন্য সাহেবকে স্বয়ং কেন আসতে

মানুষের—সে পরলোকে সুখ পাবে, শান্তি পাবে, মৃত্যুর পরেও লোকে তাকে মনে রাখবে, তার জন্য শোক করবে, বিলাপ করবে, শ্রদ্ধা জানাবে। মন যতক্ষণ সক্রিয় থাকে আশাও ততক্ষণ নিজের কাজ করে যায়।

করণও যতই মনে করুক কোন আশা সে রাখবে না—রাখে নি, একটু আশা তার অবচেতন মনের মধ্যে থেকেই গিয়েছিল। কী করবেন জেনকিন্স সাহেব, কিছু করতে পারবেন কি না, পারলেও কতটুকু পারবেন—এই চিন্তাটা সে এ সম্বন্ধে কিছু ভাববে না—এই দৃঢ় সঙ্কল্পের ফাঁকে ফাঁকে বরাবরই চলছিল। আর কিছু না হোক—এই অসহ্য কষ্টের সামান্য কিছু আসান আশা করছিল। কিন্তু তবু এতটা সে ভাবেনি কখনও। বরং সকাল থেকে দুপুর এবং দুপুর থেকে এক সময় যখন অপরাহ্ণ পর্যন্ত বেলা গড়িয়ে গেল—বোঝা নামাবার বা কাঁধ বদল করার অবধি কোন সুযোগ মিলল না তখন সে সত্যি সত্যিই হতাশ হয়ে উঠছিল একটু একটু করে। সরকারী চাকা ঘুরতে দেরি হয়; অতবড়

এলিয়ে পড়েছিল যেন—একটা সব একাকার করা সুষুপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল; কিছু-ক্ষণ পূর্বের অসহ্য তৃষ্ণা ও প্রবল ক্ষুধাবোধও যেন বহুদূর কোন কষ্টদায়ক স্মৃতিতে মাত্র পর্যবসিত

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

হয়েছিল। তাই কিছুই টের পায় নি সে, কিছুই বুঝতে পারে নি। তার প্রথম হুঁশ হল একেবারে যখন তার মাথার কাছে কাঁকরের ওপর ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ উঠল—তখনই।

কষ্ট করেই চোখ খুলতে হল—পাতা-গুলোকে টেনে ছাড়াবার মতো করেই—কিন্তু চোখ মেলে চেয়ে সাক্ষাৎসমন স্বয়ং পিকৃটনকে শিয়রের কাছে ঘোড়া থেকে নামতে দেখে—নিমেষে তন্দ্রায় শৈথিল্য দূর হয়ে গেল তার, ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

পিকৃটন নামলেন কিন্তু তখনই কোন কথা বলতে পারলেন না। কিছুক্ষণ শুধু নীরবে

হল সেইটেই কেউ বুঝতে পারল না, না করণ না তার পাশের সঙ্গীসাথী সহকর্মীরা।

নতুন আদেশ খুবই সংক্ষিপ্ত; কিন্তু আকৃতিতে ছোট হলেও প্রকৃতিতে সামান্য নয় তা। ফৌজে এমনটা কখনও ঘটে না, থুথু ফেলে আবার তা চেটে নেওয়ার রেওয়াজ নেই এখানে। সেই জন্যে বেশ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হলেও বহুক্ষণ সময় লাগল সকলের সে আদেশের মর্মার্থ বুঝতে। বোঝবার পরও কোথায় কী একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে, প্রচণ্ড একটা কি ঘটনা—তা নইলে এমন অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটত না; অকস্মাৎ করণ সিংয়ের কে এমন শক্তিশালী হিতৈষী জুটল—তার সঙ্গে ওর কী সম্পর্ক আর কতটাই বা তিনি আশ্রয়-প্রশ্রয় দিতে পারবেন ওকে—এই নিয়েই চিন্তার অন্ত রইল না।

আদেশটা এই :

বেলা সিংকে আর এভাবে নিয়ে যাওয়া হবে না, ওকে অবিলম্বে চিকিৎসার জন্য পেশোয়ারে ফেরৎ পাঠানো হবে। ডুলিতেও নিয়ে

খাওয়া হবে না, খচ্চরের পিঠে একটা খাটুলি বেঁধে তাতেই চাপিয়ে দেওয়া হবে ওকে, সঙ্গে যাবে আকিল সিং আর চৌকলসিং। করণ সিংকে ওদের সঙ্গে তো নয়ই—এদের সঙ্গেও হেঁটে যেতে হবে না, কাল সকালেই তার ঘোড়া পেয়ে যাবে সে। এতকাল যেমন যোগাযোগ রক্ষাকারী হিসেবে কাজ করছিল, তেমনই করবে অতঃপর।

আদেশ দেবার পর আর একমুহূর্তও দাঁড়ালেন না পিক্‌টন, পুনশ্চ ঘোড়ায় চেপে, যেমন এসেছিলেন তেমনিই চলে গেলেন।

এই রকমই হুকুম ছিল জেনকিন্স-এর, নিজে এসে এই নির্দেশ জানিয়ে যাবার।

এটাই পরোক্ষ শাস্তি পিক্‌টনের, আর তিনিও তা জানেন।

ছোকরা চুকলি খেয়েছে তো নিশ্চয়ই, পথে দেখা হওয়া এবং প্রায় পনেরো মিনিট ধরে কথাবার্তা হওয়ার সব ইতিহাসই শুনেছেন তিনি। এ চুকলি খাওয়ার ওষুধও তিনি জানেন কিন্তু এখন কিছুই করা চলবে না। জেনকিন্স সাঙঘাতিক লোক, এতক্ষণে হয়ত গোয়েন্দাই লাগিয়ে দিয়েছে তাঁর পিছনে।

ধৈর্য ধরতে জানেন পিকটন, অল্পে বিচলিত হবার লোক তিনি নন।

সামান্য অপমানেই যে হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হয়—সে মূর্খ।

হাতিয়ার নয়—মাথাটাই মানুষের সবচেয়ে বড় অস্ত্র। ও বস্তুটা সকল অবস্থাতেই ঠাণ্ডা রাখা দরকার।

দেহ যতক্ষণ বোঝা বইতে ব্যস্ত ছিল মন ততক্ষণ মাথা তোলার বিশেষ অবকাশ পায় নি। এখন দেহটা একটু বিশ্রাম পেতেই চিন্তা তার সহস্র ফণা বিস্তার করল।

অনেক কিছুই শুনেছে সে, কিন্তু সে সব যেন এতদিন ভাল করে মাথাতে ঢোকে নি, এবার সেইগুলোই তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করে নতুন ক'রে। কত কী ঘটনা ঘটে গেছে এই ক'মাসে আফগান মুলুকের মাটিতে। ছোটবড় বহু ইতিহাস রচিত হয়েছে, তার কিছু কিছু হয়ত ভাবীকালের পুঁথিতে স্থান পাবে, ইতিহাসের পণ্ডিতদের গবেষণার বিষয় হয়ে থাকবে—কিছু অন্তত হারিয়ে যাবে লোকের স্মৃতি থেকে; অনেক সময় ঘটনাটা টিকে থাকে। কিন্তু তার মূলে যারা যারাকাজ করে—তাদের কথা পুঁথিপত্রে স্থান পায় না। অল্প দু'চার জনের জ্ঞান-অভিজ্ঞতা তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়ে যায়।...

ইংরেজ ফৌজ জালালাবাদ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে, সে শহর এখন সম্পূর্ণ এদের দখলে। জালালাবাদের রূপই নাকি পালটে গেছে—যা ছিল অপরিষ্কার খোঁয়াড়বিশেষ তা এখন সভ্য জনপদের চেহারা নিয়েছে। রাস্তাঘাট নালা নর্দমা তৈরী করে প্রাচীর মেরামত করে নিজেদের ঘাঁটি সুদৃঢ় করেছে ইংরেজরা। কিন্তু শুধু শহরের পথ-ঘাট তৈরী করেই ক্ষান্ত হয়নি এরা, পেশোয়ার থেকে জালালাবাদ পর্যন্ত যাতায়াতের রাস্তাঘাটও মোটামুটি ঠিক ক'রে নিয়েছে —সে পথ পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। টেলিগ্রাফের তার পেতে যাচ্ছে। শত্রুরা না হঠাৎ মাঝখানে এসে পড়ে অতর্কিত আক্রমণ করতে বা সরবরাহ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত করতে পারে সেজন্য নিজস্ব পাহারার ব্যবস্থা তো হয়েছেই—পথের দুদিকে যেসব লোকালয় আছে তাদের অধিবাসীদেরও কাউকে টাকা দিয়ে কাউকে ভয় দেখিয়ে হাত করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে এই গত অগ্রহায়ণের শেষের দিকে আমির শের আলি কাবুল ছেড়ে তুর্কীস্তানের দিকে পলায়ন করেছেন। ইংরেজ জালালাবাদ দখল করার পর মিটমাট করার একটা শেষ চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু তার মধ্যে কোন আন্তরিকতা ছিল না বরং কিছু চালাকী করারই প্রয়াস ছিল। এদের বিশ্বাস করতে বা সোজাসুজি এদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে ভরসা হয় নি তাঁর—তিনি প্রস্তাব করেছিলেন যে বেশী লোককে তিনি যেতে দেবেন না—তবে এদের নেতৃস্থানীয় জনাকুড়ি লোক যদি কাবুল যায় তো তিনি সন্ধিশর্ত আলোচনা করতে পারেন। হয়ত ভেবেছিলেন যে মাথামাথা লোকগুলোকে আটকে এদের চাপ দিলে এরা সিধে হয়ে যাবে। সম্ভবত সে সন্দেহ এঁদেরও হয়েছিল, এঁরা সে প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। তখন লড়াই করার মতো অবস্থাও আর ছিল না শের আলির—ফৌজের আকার শীর্ণ থেকে শীর্ণতর হয়ে উঠছিল ক্রমশ—বহু সেনা ও সেনাপতিই তাঁকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল। আমিরের মাইনে-করা ফৌজ খুব বেশী ছিল না, তারা উপজাতীয় মালিক বা সদারদের ওপরই বেশী নির্ভর করতেন, আপৎকালে তারা দলবল নিয়ে এসে হাজির হ'ত—আমিরের হয়ে লড়াই করত। কিন্তু এরা মাইনের চাকর নয় বলেই এদের ওপর পুরো নির্ভর করা বিপজ্জনক ছিল। সামান্য কোন অসন্তোষের কারণ ঘটলে অতি তুচ্ছ কারণেও রণক্ষেত্র ছেড়ে সদলবলে চলে যেত এরা। এইভাবেই শের আলীর বাহিনী ছেড়ে লোক চলে গিয়েছিল, তাদের শাসন করা বা ফিরিয়ে আনার কোন ব্যবস্থাই করতে পারেন নি। তখন শেষ যা করণীয় ছিল তাঁর—তাইই করেছিলেন। কাবুল ও কাবুলের সিংহাসন অদৃষ্টের হাতে ছেড়ে দিয়ে নিজের পথ দেখেছিলেন।...

শের আলীর পর কাবুলের গদীতে বসেছেন সর্দার ইয়াকুব খাঁ। ইংরেজরা এ খবর পাওয়ার পর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই চেষ্টা করেছিলেন তাঁর সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনের কিন্তু সেদিকে কোন সুবিধা হয় নি। দেখা গেল ইয়াকুব [illegible] চান, বোঝাপড়াটা শক্তি পরীক্ষার মধ্য দিয়েই করার পক্ষপাতী। সে ব্যবস্থাও নাকি—গদী দখল করার সঙ্গে সঙ্গেই সুরু করে দিয়েছেন। কাবুল শহরেই ছয় ডিভিশন সৈন্য এনে জড়ো করেছেন, তার ওপর আফগান মুলুকের সব চেয়ে দুর্ধর্ষ উপজাতি খিলজাই মালিকদের ডেকে পাঠিয়েছেন, খবর দিয়েছেন তারা যেন লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়ে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে চলে আসে।

যদি তারা সত্যিসত্যিই নতুন আমীরের আদেশ পালন করত তো ইংরেজরা খুব বিপদে পড়তেন, অন্তত জালালাবাদ রাখা মুশকিল হয়ে পড়ত। কিন্তু খিলজাইদের মালিকরা আমীরের হুকুম তামিল না করে বরং ইংরেজদের সঙ্গে সখ্য স্থাপনেই ব্যস্ত হয়ে পড়ল। খাস কাবুলে তারা গোপনে ইংরেজদের কাছে দূত পাঠাতে লাগল। বিশেষ করে পৌষের শেষের দিকে যখন খবর পাওয়া গেল কান্দাহারও ইংরেজদের দখলে এসেছে—তখন কুনারের সৈয়দ সাহেব স্বয়ং এসে স্যার স্যাম ব্রাউনের সঙ্গে দেখা করলেন। এ অঞ্চলে সৈয়দ সাহেবের প্রভাব ও প্রতিপত্তির কথা সর্বজনবিদিত, ইংরেজরাও তা জানে। মোমান্দরা ওঁকে দেবতার মতো জ্ঞান করে, ওঁর কথায় তারা অনায়াসে আগুনে ঝাঁপ দিতে পারে, শের আলি একদা এই সৈয়দ সাহেবকে হাত করেই জেহাদ ঘোষণার স্বপ্ন দেখেছিলেন।...

এ সব ঘটনাতে অবশ্য করণ সিংয়ের এত চিন্তার কিছু নেই। বস্তুত সে আদার ব্যাপারী —তার কাছে এ সব জাহাজের খবরের মতো অপ্রয়োজনীয়। পেটের দায়ে তাকে চাকরী করতে হচ্ছে—সে যুদ্ধ করতে এসেছে সেটা চাকরির অঙ্গ বলে। দরকার হলেই তাকে গুলী গোলার সামনে দাঁড়াতে হবে, প্রাণ যায় যে যাবে—কিন্তু সে প্রাণ কেন যাচ্ছে বা তা কোন মতে বাঁচানো যায় কি না—সে প্রশ্নে তার অধিকার নেই। এ যুদ্ধ যারা বাধিয়েছে এবং যারা চালাচ্ছে তারা অনেক ওপরতলার লোক, করণদের থেকে বহুদূর উঁচুতে থাকে তারা। যুদ্ধের কারণ তারাই জানে, এদের তা জানবার কথা নয়।

অবশ্য সেজন্য খুব উৎসুক বা কৌতূহলীও নয় করণ, বাঁচা কিম্বা মরা, দুইই তার কাছে সমান হয়ে পড়েছে এখন। তা ছাড়া সে হুকুমের চাকর, খুবই সামান্য পদবীর লোক, এত খবরে তার প্রয়োজনও নেই, অধিকারও নেই।

না, মাথা সে ঘামাত না আদৌ—যদি না এই খবরের সঙ্গে জড়িয়ে আর একটা খবর তার কানে এসে পৌছত।

আর একটি মানুষের খবর।

যে মানুষটিকে করণ এখনও চিনতে পারে নি হয়ত—কিন্তু সে করণকে চেনে।

অন্তত সে ওকে খুঁজে বেড়িয়েছে ছাউনীতে

ছাউনীতে, বুঝি ওকে অনুসরণ করেছে দূর থেকে, ধরাছোঁয়া না দিয়ে।

মনে হয় সে করণের কিছু কিছু খবরও রাখে।

সে মানুষ —হরি সিং বলে অজ্ঞাত পরিচয় একটি কিশোর। নিতান্তই—অল্পবয়সী এখনও তার ফৌজে ঢোকবার বয়স হয় নি।

অন্তত সেই রকমই শুনেছে করণ।

এই ছেলেটি সম্বন্ধে বহু গল্পই শুনেছে সে বহু বিচিত্র কাহিনী। অজাতশ্মশ্রু বালক, দেখলে মনে হয় ভঙ্গুর কোমল দেহ—কিন্তু সে পারে না এমন কাজ নেই। দুর্জয় তার সাহস, অদ্ভুত তার পরিশ্রমের শক্তি। ক্লান্তি বলে শব্দ-টার সঙ্গেই বুঝি পরিচয় নেই তার। চব্বিশ ঘণ্টা একাদিক্রমে ঘোড়ায় বসে থাকতে পারে সে, দু-তিনরাত না ঘুমোলেও অবসাদ বোধ করে না। আর তেমনিই তার ক্ষুরধার বুদ্ধি ;কেউ উপমা দেয় বৃহস্পতির সঙ্গে কেউ বা চাণক্যের নাম করে।

আরও শুনেছে করণ।

এ যুদ্ধে ইংরেজদের এই সাফল্য বা অগ্রগতির মূলে হরি সিং-এর দান নাকি অনেকখানি। সে কোথা থেকে এসেছে তাও যেমন কেউ জানে না, এখানে ঠিক কি করে তাও জানা নেই কারও। নিয়মমাফিক ফৌজী চাকরি তার নয়, সেভাবে ঢোকেও নি। অকস্মাৎ দেখা গেল সে সাহেবদের অন্তরঙ্গ—তাঁদের প্রিয়পাত্র। বড় বড় গোয়েন্দার থেকে এই ছেলেটির ওপর ভরসা তাঁদের বেশী। কোথা থেকে খবর সংগ্রহ করে আনে সে, কোথায় কোথায় কী ভাবে খবর বয়ে নিয়ে যায় তা কেউ বুঝতে না পারলেও সে যে সাহেবদের কাজে আসে সে বিষয়ে কারও সন্দেহ নেই। তাঁদের অগাধ বিশ্বাসভাজন হয়ে উঠেছে সে, অবাধ স্বাধীনতা তার। কখন আসে-যায়—তা, আইনত যারা তার প্রত্যক্ষ ওপরওলা, তারাও খবর পায় না। হঠাৎ আসে, হঠাৎ যায়। কখনও কখনও হয়ত বেশ কয়েক দিনই দর্শন মেলে না তার। কোথায় গিয়েছিল কেন আসে নি—একথা জিজ্ঞাসা করারও কোন অধিকার নেই।

এই ছেলেটি সম্বন্ধে যত কথা রটেছে তা হয়ত সব সত্যি নয়,হয়ত বেশির ভাগই গুজব। কিন্তু, যদি অর্ধেকটাও সত্যি হয়, –তাহলেও অবিশ্বাস্য বলতে হবে ; প্রায় ঐশ্বরিক ক্ষমতা। এই হরি সিংই নাকি সোজা কাবুলে গিয়ে শের আলির পলায়নের সংবাদ সংগ্রহ করে আনে। জালালাবাদ দখলের পরিকল্পনাও নাকি তার। সবচেয়ে দুঃসাহসিক কাজ—একা ঘিল জাইদের আড্ডায় গিয়ে তাদের বুঝিয়ে ইংরেজদের বশ্যতা স্বীকার করানো এ যে কী দুর্জয় সাহসের কাজ—তা এই আফগান মুলুকে কাটিয়ে ভালভাবেই বুঝেছে করণ সিং।

এখন কথা হচ্ছে কে এ? কোথা থেকে এ সাহস পায় সে? এতখানি শক্তি এবং শিক্ষাই বা কোথায় পেল—ঐটুকু একফোঁটা ছেলে।

কৌতূহল হবার মতোই কথা, কিন্তু করণের এতখানি মাথাব্যথার আরও কারণ আছে। ব্যক্তিগত কারণ।

এই ছেলেটি নাকি একাধিক ছাউনিতে, বিভিন্ন তাঁবুতে ঘুরে ঘুরে করণের খোঁজ নিয়েছে, তার গতিবিধির, তার জীবন-যাত্রার খবর সংগ্রহ করেছে। একথা একাধিক লোকের মুখে শুনেছে সে, এই মার্চ-এর মধ্যে তিনচার জন বলেছে তাকে।

তার সঙ্গে ও ছোকরার কী সম্পর্ক? তার কথা জানলই বা কেমন করে? এত আগ্রহই বা কেন ওর?

কাছাকাছি থাকে—অন্তত মধ্যে মধ্যে কাছে আসে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবু, সামনে আসে না কেন? যদি পরিচয়ই থাকে তো প্রকাশ করতে বাধা কিসের?

কিছুই ভেবে পায় না করণ, অনেকক্ষণ ধরে ভাবতে ভাবতে একসময় হাল ছেড়ে দেয় সে।

শুধু তো হরি সিংয়ের চিন্তাই নয়—আরও একটা ভাবনা এসে জুটেছে যে তার সঙ্গে। আরও একটা সমস্যা।

সমস্যা না বলে রহস্য বলাই উচিত।

ঐ চাবুকটা।

চাবুকটার কথা কিছুতেই ভুলতে পারছে না করণ।

কোথা থেকে এল, কে ব্যবহার করল ঐ চাবুক।

করণকে রক্ষা করার জন্য কার এমন সজাগ সতর্কতা, কার এত উদ্বেগ?

যা মনে হয় যার কথা মনে হয়, তা সে ভাবতে চায় না। আর যারই হোক— তার কথা নয়। আভাসে ইঙ্গিতেও যোগাযোগটা মনে এলে যেন শিউরে ওঠে, সত্যি সত্যিই হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিতে চায় ভাবনাটাকে মন থেকে।

সুদূর কল্পনাতেও আসতে দিতে রাজী নয় সে চিন্তাটা।

তার চেয়ে এ রহস্য চিররহস্য হয়ে যাবে, সেও ভাল।

অনেক সহ্য করেছে সে, অনেক দুঃখ, অনেক হতাশা—কিন্তু এতবড় ব্যর্থতা তার সহ্য হবে না।

হে রণছোড়জী রক্ষা করো।

এই সম্ভাবনাটা থেকে অন্তত বাঁচাও করণকে। [ক্রমশ।

সমস্যাহীন জীবন হয় না। প্রতিটি প্রাণীর জীবনের নানা পর্যায়ে সমস্যা, বিশেষত মানব-জীবনের প্রায় প্রতি পদক্ষেপ সমস্যা-জড়িত। লোকভেদে, সমাজভেদে এবং দেশভেদে এর রূপ পাল্টায় ঠিকই—রামের সমস্যা আর রহিমের সমস্যা ঠিক এক নয়, উঁচুতলার সমস্যা নীচুতলার সংগে ঠিক মেলে না, এ দেশের সমস্যাবলী আর আমেরিকার সমস্যাগুলো একই পর্যায়ভুক্ত করা যায় না। তবুও সমস্যা আদৌ নেই এমন অবস্থা কোনকালে ছিল না, এখনও রয়েছে এবং থাকবে বলেই মনে হয় অতীত এবং বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে যাচিয়ে দেখলে। সমস্যাহীন জীবন-কল্পনা অবাস্তব। আর যদি কেউ সব সমস্যা মিটিয়ে দেওয়ার আশ্চর্য প্রদীপ দিতে চাইত, তা হ'লে মানুষ কি তা অম্লান বদনে গ্রহণ করত? না, সেই জার্মান দার্শনিকের মত বলত সমাধান চাই না, চাই সমাধান খোঁজার পথ।

নানা মানবিক সমস্যার সমাধান করতে গিয়ে আমরা মনে করি সমাজ গড়পড়তা মানুষের সমবায়, মোটামুটি তারা একইরকম। কিন্তু বস্তুত সমাজের অধিকাংশ মানুষই অস্বাভাবিক। কেন না, আমরা সকলেই এক বা একাধিক দিক দিয়ে অপ্রাকৃত। যদি প্রত্যেকের মধ্যে যে গভীর মানস-পার্থক্য সমরণে থাকে তবে মানবিক সম্পর্ক বুঝতে অনেক বেশী সুবিধে হয়। এই তফাতের জন্যই প্রত্যেকের কাজ, চিন্তাধারা এবং অনুভব অন্যান্যদের চেয়ে পৃথক।

স্বাদ গ্রহণের উদাহরণ নেওয়া যাক। বিজ্ঞানীদের এক বিরাট দল ফিনাইল থিওকারবিমাইড্ চেখে-ছিলেন। কেউ কেউ বললেন ওটা তেতো, অন্যান্যরা জোরের সংগে বলেছিলেন ওটা স্বাদহীন। প্রত্যেক ছোট দলই সন্দেহ করেছিলেন বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা হয় মিথ্যে বলছেন, না হয় ওঁদের কোন বিশেষ শারীরিক ত্রুটি বর্তমান। এঁদের একজন নিজের স্ত্রীকে বারবার চাখতে অনুরোধ করে-ছিলেন ওর স্বাদহীনতা প্রমাণ করার জন্য—ভদ্রমহিলার তেতো লেগেছিল ফিনাইল থিওকারবিমাইড্। এ-ধরনের পার্থক্য সাধারণ ব্যাপার এবং সব ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারেই তা ঘটতে পারে; কাজেই সহজেই বোঝা যায় এ ধরনের পারস্পরিক বিবাদবিসংবাদ এমন সব দৈহিক কারণসম্ভূত যার ওপর আমাদের কোন হাত নেই।

এমন মানুষের অভাব নেই যিনি হয়ত কোন একটি বিশেষ গন্ধ ছাড়া অন্যান্য সবগুলো স্বাভাবিকভাবে বুঝতে এবং একটার থেকে অন্য একটা পৃথক করতে পারেন। রংয়ের ব্যাপারে পার্থক্য আরও ঢের বেশী সংলক্ষ্য। সবুজ রং হয়ত কারো কারো নাড়ীর

বস্তুবন্ধ

গতি বাড়িয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হয় না, রক্তচাপও বাড়িয়ে তোলে; আবার তাদের ওপর হলুদে রংয়ের প্রভাব হয়ত ঠিক উল্টো। কেউ কেউ বিশেষ কোন রংয়ের ব্যাপারে অত্যন্ত স্পর্শ-কাতর, অন্যরা উদাসীন, বাকী কিছু মানুষ তা দেখে আরাম পান হয়ত। দিন শেষ হয়ে আসছে, অস্তরাগের ঝিলিমিলি- চলছে নারকেলের চিক্বণ পাতায়, অট্টালিকার শীর্ষে শীর্ষে মুঠো মুঠো আবীর কে যেন ছড়িয়ে দিয়েছে অন্তরীক্ষে—এ দৃশ্য কারো কাছে দৃষ্টিনন্দক, হৃদয়স্পর্শী, অন্য কেউ হয়ত তাকিয়ে দেখারও তাগিদ অনুভব করেন না।

বহু দৃষ্টিপার্থক্য সৃষ্ট হয় চোখের তফাতের জন্য। গোলাকৃতি ক্ষীণ দৃষ্টিসমন্বিত মানুষ প্রায় সোজাসুজি না তাকালে কিছুই তার দৃষ্টিপথে আসে না। ধরুন দু'জন লোক কাগজের কোন খবর দেখতে চাইছেন, এক-জনের পূর্বোক্ত দৃষ্টি, অপরজনের দৃষ্টি বেশ সবল, তা হ'লে শেষের জন আগের ভদ্রলোকের আগেই দেখতে পাবেন। আবার, গলফ্ খেলার সময় প্রথম জনের সুবিধে হবে, কেন না, শেষের ভদ্রলোকের মনোযোগ ক্ষুণ্ণ হবে অনেক কিছু দেখতে পাওয়ার ফলে। চালক বা পদাতিকের প্রথমোক্ত প্রকার দৃষ্টি সম্ভবত দুর্ঘটনার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ।

ওষুধের ব্যাপারেও প্রতিক্রিয়ার হেরফের হয় অনেক ক্ষেত্রে। মরফিন সাধারণত প্রায় সব ক্ষেত্রেই ঘুম-পাড়ানী। কিন্তু এক ভদ্রলোককে এমন তাতিয়ে দিয়েছিল যে, তিনি যন্ত্রণার সংগে দুরন্ত চিন্তার স্রোতে হাবুডুবু খেয়েছিলেন। ক্যাফিন-এর প্রতিক্রিয়ার পার্থক্য হয় খুব বেশী, দেখা গেছে কেউ কেউ কয়েক কাপ র-কফি খেয়েও নাক ডাকাতে পারেন নিশ্চিন্তে, আবার অন্য কোন মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঘুমুতে দেয় নি অল্প পরিমাণ কফি। নিকোটিন সম্বন্ধেও একই কথা প্রযোজ্য: কেউ কেউ সারাদিন তাম্রকূট ফুঁকতে থাকেন, তাঁদের শরীর বিন্দুমাত্রও অসুস্থ হয়ে পড়ে না; আবার, ভোজবিজ্ঞানীরা বলেন, অনেক মানুষেই কখনই হরদম তামাক চালাতে পারেন না কোন দিনই।

আমাদের প্রত্যেকের স্নায়ুতন্ত্র নিদ্রা এবং জাগরণের ছন্দে ভিন্নভাবে সক্রিয়। যখন গভীরতরভাবে জানা যাবে নিদ্রার প্রকৃতি তখন ঘুম এবং জাগরণের সময়টুকু আরও ভালভাবে

কাজে লাগানোর সমস্যা-সমষ্টির মোটামুটি সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া সম্ভব হবে। তার আগে কেউ যদি বেশীক্ষণ ঘুমোন বা কারোর যদি অতি সামান্য ঘুমেই দেহ সুস্থ থাকে তাদের অ-স্বাভাবিক ছাপ না দেওয়াই ভাল।

যৌনসংগীদের মধ্যেও রীতিমত পার্থক্য রয়েছে। তিরিশের কোঠার জনৈক ভদ্রলোক মিলনের পর কয়েক-দিন ধরে ক্লান্তি অনুভব করেন। অন্যদিকে আবার সত্তরের বেশী বয়স্ক জনৈক ভদ্রলোক ডাক্তার দেখান ভয়ে ভয়ে, কারণ দিনে দু'বারের বেশী মিলিত হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় এবং তিনি মনে করেন এটা হয়ত পুরুষত্বহীনতার লক্ষণ।

বিয়েব ফ্যাকড়া অসংখ্য, আর এতক্ষণ যত পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে তা বিবেচনা করলে কিঞ্চিৎ অবাক না হয়ে উপায় নেই এই ভেবে যে, কী করে অসংখ্য বিয়ে হচ্ছে নিত্যি নিত্যি। কিন্তু পার্থক্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা এবং বিয়ের দৈহিক ভিত্তিটুকু দু'জনকেই সহনশীলতর করে তোলে।

মানুষেব পরিবারের কাউকে বুদ্ধিমান আর কাউকে গাড়ল বললে কোন কোন ক্ষেত্রে সুবিধে হয় ঠিকই, কিন্তু এই ছাপ বৈজ্ঞানিক তথ্যভিত্তিক নয় আদৌ।

যাদের অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলা হয় তারা যে সব ব্যাপারেই একই রকম হবে তার কোন মানে নেই। কোন-ক্রমেই ভেবে নেওয়া উচিত নয় যে, আইনস্টাইন সব দিকেই প্রতিভার বরপুত্র। মানসাংকে দুর্বল বহু দুঁদে আংকিক আছেন; আইনস্টাইন-এর ছোটবেলার গল্প থেকে মনে হয় তিনিও এই দলে। সত্যি বলতে কি ছোটবেলায় কথা বলায় রপ্ত হ'তে তাঁর এত সময় লেগেছিল যে তাঁর বাবা-মা ভেবেছিলেন তাঁর পরিণতি অস্বাভাবিক হওয়া।

কোন ব্যক্তিকে কোন বিশেষ কাজে তার মানসক্ষমতা দিয়ে যাচিয়ে নেওয়া চলে—তার উচ্চারণক্ষমতা, কণ্ঠস্থ করার শক্তি, অংক করতে পারার সহজ প্রবণতা ইত্যাদি। কিন্তু সামগ্রিকভাবে বলা চলে না রামের বুদ্ধি ১ নম্বর, শ্যামের ২ আর যদু বেচারা নিতান্তই তৃতীয় শ্রেণীর বুদ্ধি-বৃত্তির অধিকারী।

বুদ্ধিশুদ্ধির ব্যাপারে মগজের প্রমাণ দিতে হ'লে একটা তথ্য এড়াবার উপায় নাস্তি: প্রত্যেক মানবমন অনেক (সম্ভবত তিনশ'র মত) পৃথক পৃথক মানসক্ষমতা, প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য ইত্যা-দির সংমিশ্রণ, কোন না কোন একটা আছেই, স্বল্প বা প্রচুর পরিমাণে।

ভাবা যাক সাধারণ বুদ্ধি যাদের খাটো বুদ্ধি বা নির্বোধ বলে উপহাস করে তাদের কথা। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বিশেষ লক্ষণীয় মানসিক ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে।

একুশ বছরের এক ভদ্রলোককে পরীক্ষা করে দেখা গেল তিনি একটি কুষ্মাণ্ড বই নয়। বুদ্ধিবৃত্তির কয়েক স্তরে, পড়াশুনোর ব্যাপারে তাঁর মনের বয়স শিশুকল্প। দেখা গেল, তালা-সারান, সাইকেলের ঘণ্টি ঠিক করা এবং অন্যান্য নানা কারিগরী বিদ্যায় তিনি পটু। তাই কারিগরী প্রবণতা পরীক্ষায় প্রমাণিত হ'ল ও ব্যাপারে তিনি সুদক্ষ। এ ধরণের আরও অনেক উদাহরণ রয়েছে। এঁদের অনেক সময়ই তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তি থাকে। ওহিওর এক বোকা ছেলে টেলিফোন ডিরেক্টরি কণ্ঠস্থ করেছিল, বহু লোকের অটোমোবাইল লাইসেন্স-এর সংখ্যাও তার কণ্ঠস্থ হয়ে যায়। টেকসাস্-এর এক গাড়ল কাউকে দেখলে তার জন্মতারিখ, তার বাবা-মার জন্মতারিখ ইত্যাদি জিজ্ঞেস করত। কয়েক বছর পরে দেখা গেল সে সমস্ত গড়গড় করে বলতে পারে। তার স্মৃতিশক্তি এত নিখুত ছিল যে গাঁয়ের তথ্যাদি যথেষ্ট পরিষ্কার না হ'লে তাকে ডেকে জেনে নেওয়া হ'ত।

এসব ঘটনা থেকে মনের নানান ক্ষমতার স্বাধীন সত্তা ফুটে ওঠে। মানুষের বিভিন্ন মানসিক গুণাবলীতে অত্যন্ত বেশী পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

স্কুলে সকলকে একসঙ্গে পড়ান কারখানায় পাইকারি হার উৎপাদনের মত, চেষ্টা চলে সব কিছুই সংখ্যাতত্ত্বের উঠোনে ভিড়িয়ে [illegible]য়ার। বাচ্চাদের শেখানর ব্যাপারে বই বা প্রবন্ধ রয়েছে ঝুড়ি ঝুড়ি, কিন্তু ওদের প্রত্যেককে আলাদা এবং ভিন্ন রুচিসম্পন্ন মানবক মনে করে শিক্ষা দেওয়ার ওপর জোর দেওয়া হয় নি বলতে গেলে। শিক্ষার একটা প্রধান কাজ ছাত্রকে নিজের ঠিক জায়গা খুঁজে নিতে সাহায্য করা। কাজেই পাইকারি শিক্ষায় তা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়।

আমাদের দেহমনের উন্নতির জন্য পার্থক্যগুলো ভালভাবে বোঝা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

মনে রাখা দরকার সমাজের বৃহত্তর প্রয়োজনে নেতা দরকার—শিল্প, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সরকারী কাজকর্ম এবং অন্যান্য সব দিকেই নেতা অত্যাবশ্যক। কিন্তু ঝাল-ঝোল-অম্বল সব ব্যাপারেই একতম নেতার চিন্তাও হাস্যকর। এ ধরণের মানুষ জন্মানো সম্ভব নয়। আশুতোষকে যদি সেনাবাহিনীর প্রধান করা হ'ত? কিংবা রবিঠাকুরকে টাটা কোম্পানীর টেকনিক্যাল সুপার-ভাইজার?

ডিক্টেটর জন্মায় এই ভুলের সূত্র ধরে কোন ব্যাপারে কেউ লক্ষণীয় গুণপনার পরিচয় দিলে ধীরে ধীরে মনে করা হয় সর্ব ঘটেই তার সগুণ অধিষ্ঠান। কাজেই সব সমস্যায় তাকে মনে করা হয় মূর্তিমান সমাধান। এটা ভুল, নিতান্ত ভুল। মানুষের ক্ষমতা সম্বন্ধে নির্ভুলতার জ্ঞান এ অবস্থা সৃষ্ট হ'তে দেয় না কখনও। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে সমস্যা আছে, থাকবেই। কেন না, পৃথিবীতে সব মানুষই অল্পবিস্তর অ-স্বাভাবিক, কারোর ক্ষমতাই সীমাহীন বা সর্বজ্ঞ হ'তে পারে না। এ কথাটা মনে থাকলে অনেক অবাঞ্ছিত ঘটনা বা দুর্ঘটনা এড়ান সম্ভব হয়।

এলো অমাবস্যার রাত্রি

(কিশোর উপন্যাস)

ধীরেন্দ্রলাল ধর
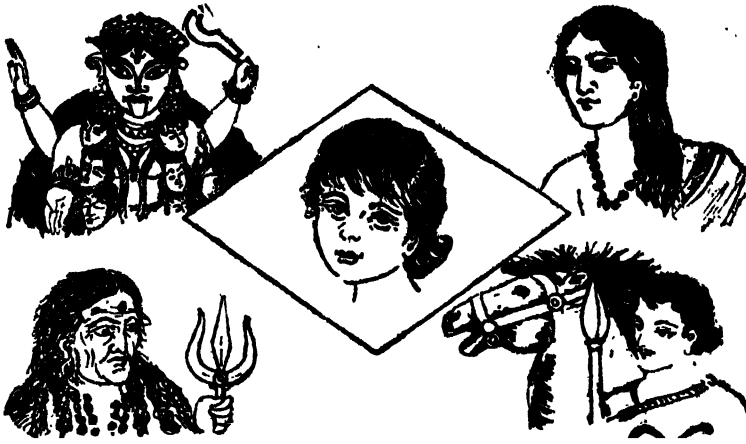
।। ছয় ।।

পাহাড়ের মাথায় একখানি বড় পাথরের আড়ালে একটি লোক বসেছিল। পাথর ও গাছের আড়ালে তার সাদা পোশাক হারিয়ে গিয়েছিল। উৎসুকভাবে সে তাকিয়েছিল নীচের উপত্যকার পানে, দূরের দিগ্বলয়ের সীমায়।

সহসা বাঘের চীৎকারে তার চমক ভেঙে গেল। চারপাশে ভালো করে তাকিয়ে নিয়ে সে উঠে দাঁড়ালো। মানুষটি সশস্ত্র। কোমরে তলোয়ার, কটিবন্ধে একখানি ছুরিকা, হাতের পাশেই ছিল একটি দীর্ঘ বল্লম। বল্লমটি সে তুলে নিল। তারপর পাথরখানি পাশ কাটিয়ে সে গাছের আড়াল দিয়ে গিয়ে এলো পাহাড়ের কিনারায়। পথের একটা অংশ এতক্ষণ আড়ালে ছিল। এবার চোখে পড়লো সেইটুকু।

খাদের পাশ দিয়ে পথটা যেখানে বাঁক ফিরেছে, সেইখানে একটি লোক একটি তীক্ষ্ণ বল্লম দিয়ে একটি চিতাবাঘকে চেপে ধরেছে। পথের উপর বাঘটা ছটফট করছে। ধ্যাঁক ধ্যাঁক করে ডাকছে কিন্তু মানুষটি যেভাবে তাকে গেঁথেছে, বাঘটির কোন শক্তি নেই তা থেকে মুক্ত হবার। কয়েক মিনিট হাত-পা ছুঁড়ে বাঘটির ডাক ক্ষীণ হয়ে গেল, বাঘটি স্থির হয়ে গেল, একঝটকায় বল্লমটি খুলে নিয়ে লোকটি একপাশে সরে এলো। সেখানে একটি ছোট ছেলে দাঁড়িয়েছিল, তাকে ডেকে মাথার পাগড়িটা খুলে দিল তার হাতে। পাগড়ি দিয়ে ছেলেটি তাঁর বাঁ কাঁধে পটি বেঁধে দিল। তারপর ছেলেটির হাত ধরে মানুষটি এগিয়ে গেল পথ ধরে। পাহাড়ের উপর থেকে মানুষটি শান্তভাবে সব দেখলেন, তারপর আপন মনে বললেন---শক্তিমান পুরুষ।

আবার তিনি ফিরে এসে বসলেন নিজের সেই পাথরখানির উপর। আবার পূর্বের মত দৃষ্টিনিবদ্ধ করলেন দূরের উপত্যকাভূমির পানে। এবার তিনি দেখতে পেলেন, পথের ওদিকে ঝর্ণার পাশে সেই মানুষটি যেন শুয়ে পড়েছে। ছেলেটি দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে। দ্রষ্টার দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠলো। আবার বল্লমটি হাতে নি- তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সোজা না নেমে এসে, গাছের আড়াল দি- পথের সমান্তরালেই তিনি পাহাড়ে উপর দিয়েই অগ্রসর হলেন।

ঝর্ণার সমান্তরালে এসে বল্লমধা- যখন নেমে আসার উপক্রম করছে এমন সময় পথের উপর এক যোগি- ধারিণী সন্ন্যাসিনী তাঁর নজরে পড়ে। বল্লমধারী গাছের আড়ালে আত্মগো- করলো। সন্ন্যাসিনী বালকের হা- ধরে চলে গেল। মানুষটি সেইখানে পড়ে রইল।

সন্ন্যাসিনী বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর বল্লমধারী পাহাড় থে- নামলো। শায়িত মানুষটির পাশে এ- দাঁড়ালো। সন্ধ্যার স্তিমিত আলোকে লোকটির মুখের পানে তাকালো, পর ক্ষণেই পাশে বসে পড়ে তার ধমনী গতি পরীক্ষা করলো। হাতে নাড়ী পে- না, তার বুকের উপর কান পাতলো। তারপর দীর্ঘ বেনিয়ানের বুক পকেট থেকে একটি ছোট থলি বের করলো। থলির ভিতর থেকে ছোট ছোট কাপড়ে বাঁধা কয়েকটি পুরিয়া বেরুলো। একটি পুরিয়া খুলে রক্তাভ চূর্ণ একটিপ তুলে নিয়ে অচেতন মানুষটির মুখের মধ্যে দিয়ে দিল। মানুষটির মাথার পাশে একখানি গামছা পড়েছিল, সেই গামছাখানি নিয়ে বল্লমধারী ঝর্ণার জলে ভিজিয়ে আনলো। গামছা নিংড়ে কয়েকফোঁটা জল তার মুখে দিল, তারপর ভিজে গামছাখানা তার কপালের উপর রেখে দ্রুতপদে বনের মধ্যে ঢুকে গেল।

কয়েক মিনিটের মধ্যে বল্লমধারী

ফিরে এলো, হাতে একটি গাছের ডাল। ডাল থেকে পাতাগুলি ছাড়িয়ে নিল। তারপর অচেতন মানুষটির কাঁধের পটি খুলে ফেললো। বাঘের কামড়ে অনেকখানি দাঁতের ক্ষত। রক্ত জমে গেছে। বল্লমধারী গাছের পাতাগুলি সেই ক্ষতের উপর ভালো করে বিন্যাস করে নতুন করে পটি বেঁধে দিল। তারপর আহতের বুকের উপর আবার কান পেতে শুনলো। বুকের স্পন্দন আগের চেয়ে দ্রুত হয়েছে। আহতের ডান হাতখানি তুলে নিয়ে সে ধমনীর গতি ফিরে আসার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলো।

ইতিমধ্যে সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এলো।

কোন এক সময় পথিক উপত্যকার নীচের দিকে তাকালো। মনে হলো যেন পথের শেষ মুখে পাহাড়ের নীচে কালো ধোঁয়ার মত কি একটা দেখা যাচ্ছে। বল্লমধারীর দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠলো। ধোঁয়া নয়, ধুলো। ধুলোটা এগিয়ে আসছে। কোন অশ্বারোহী এগিয়ে আসছে এই পথে। বল্লমধারী ধমনীর গতি পরীক্ষা করতে ভুলে গেল, সেই অগ্রসরমান ধুলোর পানে তাকিয়ে রইল একদৃষ্টে। কিন্তু সেই ঘনায়মান অন্ধকারে ভালো করে কিছুই ঠাওর করা গেল না।

কিন্তু বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। কয়েক মিনিটের মধ্যে অশ্বারোহী সেখানে এসে পড়লো। ঝর্ণার কিনারায় এসে অশ্বারোহী ঘোড়া থেকে নামলো। ঝর্ণার জলে হাত-মুখ ধুয়ে, পাহাড়ের পানে মুখ তুলে চিলের মত তীব্রস্বরে ডেকে উঠলো।

এবার বল্লমধারী সাড়া দিল, দত্তবাবু!

এবার অশ্বারোহীর নজর পড়লো পথের পাশে গাছের নীচে। সেই ঘনায়মান অন্ধকারে বল্লমধারীর সাদা পোষাক লক্ষ্য করে সে এগিয়ে এলো, সামনে এসে সে বললো—গুরুজী আপনি এখানে? এ কে? মল্লিকবাবু নাকি?

—না মল্লিকবাবু নয়, এ মাধবরাম।

—বারাণসীর মাধবরাম?

—হ্যাঁ, বাঘের হামলায় আঘাত পেয়েছে। চল, দুজনে একে তুলে নিয়ে যাই উপরে, তারপর তোমার খবর শুনবো।

দুজনে ধরাধরি করে মাধবরামকে নিয়ে পাহাড়ের উপর উঠতে সুরু করলো। উপরের বড় পাথরখানিকে পাশ কাটিয়ে কিছুটা উঠতেই একটি ঝোপের পাশে একটা গুহার মত দেখা গেল। তারই একপাশে একটি লোক বসে বসে চাপাটি ভাজছিল। দুজনে তারই পাশে এসে মাধবরামকে নামালো।

তাদের পিছু পিছু দত্তের ঘোড়া এসে দাঁড়ালো, পোষা কুকুরের মত দত্ত তার ঘাড়ে একটা চাপড় মেরে আদর করে বললো—যা বেটা, তো এখন ছুটি।

ইতিমধ্যে মাধবরামের ধমনীর গতি পরীক্ষা করে বললো—মল্লিকবাবু, দুধ আছে তো?

—আছে।—রন্ধনকারী জবাব দিল।

—আগে একটু দুধ গরম করে দাও, একে খাওয়াতে হবে।

মল্লিকবাবুর হাতের কাছেই দুধের লোটা ছিল, টেনে নিল।

॥ সাত ॥

বিন্ধ্য-অঞ্চলের পার্বত্য বনভূমি বহুদূর অবধি বিস্তৃত। একদিকে বরাবর পশ্চিমে গিয়ে সাতনা মাণিকপুর হয়ে মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ডে গিয়ে পড়েছে, আরেক দিকে শোণ নদের তীর অবধি বরাবর চলে গেছে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ অবধি। মাঝে মাঝে বড় বড় নগর ও জনপদ আছে সত্য কিন্তু বনভূমির বিস্তারের তুলনায় জনপদের ব্যাপকতা গণ্য নয়।

এই বনভূমির মধ্যে নানা দরিদ্র-

জাতির বাস। নগরের বিলাসের সঙ্গে সমতা রেখে তারা চলতে পারে না, বনের মধ্যে প্রকৃতির কোলে নির্ঝঞ্ঝাটে তারা থাকতে চায়। তাদের সরল সহজ জীবনধারাকে নগরের বিলাস-বহুল বাসিন্দারা অবজ্ঞা করে, বলে—অসভ্য, বুনো!

আমাদের এই আটভুজির মন্দিরের পাহাড়তলি ঘিরে এমনি এক বুনো জাতির বাস। এই পাহাড়টির নীচেই গঙ্গার তীরে খানিকটা জায়গা জুড়ে ঘন গাছের জঙ্গল। একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে সেই জঙ্গলের মধ্যে ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া আমগাছের নীচে এলোমেলো অনেকগুলি মাটির ঘর নজরে পড়ে। ঘরগুলির কোন জানালা নেই, ছোট ছোট দরজা, খানিকটা তফাৎ থেকে বড় বড় উইয়ের ঢিবির মত দেখায়।

একটি আমগাছের নীচে একখানি বাড়ীর গায় লাল সাদা ও হলুদ রঙের নানা আলপনা আঁকা, বাড়ীর সামনে উঁচু করে বেশ চওড়া খানিকটা দাওয়া, নিকানো-চুকানো তকতকে। একনজরে বোঝা যায় এই বাড়ীখানি আর সব বাড়ী থেকে পৃথক। সর্দারের বাড়ী বলেই এই পার্থক্য।

সন্ধ্যার পর এই দাওয়ার উপর মজলিশ বসে। গ্রীষ্মের সন্ধ্যা হলে মজলিশ চলে অনেকক্ষণ, তারপর চাঁদনি রাত হলে তো কথাই নেই। শীতকালে বেশী রাত অবধি বাইরে থাকা চলে না, হিম পড়ে তার উপর আকাশে চাঁদ না থাকলে ভূতের ভয় আছে। এদের মধ্যে অন্ধকারে বাঘ-সাপের চেয়ে ভূতের ভয়টাই বেশি।

আজও মজলিশ বসেছিল। মুখে বড় বড় শালপাতার চুরুট নিয়ে বসেছিল ক'জন। সামনে অর্জুন সর্দার।

আজকের মজলিশ ভিন্ন ধরণের। ঘরের ভিতর থেকে রেড়ির তেলের লণ্ঠন এসেছে বাইরে, সেই লণ্ঠনের আলোয় এক শিল্পী হাতীর দাঁতের কাজ দেখাচ্ছে সর্দারকে। বাহাদুরীর কাজ কিছু নয়। সাধারণ হাতীর দাঁতের পাতের উপর দেবদেবীর মূর্তি খোদাই করে তার উপর রং বুলানো। গ্রাম-সমাজে এই ধরণের পটের চাহিদা আছে, অনেকেই ঠাকুরঘরে এই পট রাখে, রংটা ফিকে হয়ে গেলেও, খোদাই করা পটখানি দীর্ঘকাল থাকে।

অর্জুন সর্দার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখছে, দেখছে আশপাশের পার্ষদরা। সর্দার বললো জিনিষগুলি বেশ হয়েছে। তবে আমি তো এতো কিছুই রাখবো না। তবে আমি একটা কালীর পট রাখবো, মা মহামায়ার পট ঘরে রাখা ভালো।

শিল্পী সবিনয়ে বললো—যা আপনার পছন্দ হবে তাই রাখবেন, আমি তো বিক্রী করতেই এসেছি।

—একখানি পট বেচে তোমার মেহনতের মজুরী পোষাবে না।

—আপনি একখানি কিনবেন, আরো তো অনেকে এখানে রয়েছেন, তাঁরা কি কিছু নেবেন না?

—ঠাকুর-দেবতার পট তো কিনলেই হয় না, ওকে রোজ পূজো করতে হবে, ফুল চাই, এলাইচ দানা চাই, অতো ঝামালা কেউ পছন্দ করে না। রোজ স্নান করে পূজা করতে হবে, অনেকের তো সারাদিন স্নান করারই সময় হয় না। আমারও সেই অবস্থা, তবে তুমি এসেছ, একখানা না কিনলে তোমার মজুরী পোষাবে না। এতটা বনের পথ আসা-যাওয়া কম তক্লিফের ব্যাপার তো নয়।

—আজকালকার দিনে এই বনের পথই ভাল সর্দারজী। রাতে বাঘ-ভালুকের ভয় আছে বটে তবে ওরা মানুষের চেয়ে ভাল। নগরের পথে সিপাহীদের সামনে পড়লে মারধোর করে সব লুঠে নেবে, আবার ফিরিংগীদের সামনে পড়লে গলায় দড়ি দিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দেবে। বনের পথে সে-বিপদ নেই। রাতে একটু আগুন জেলে বসে থাকলে বাঘ ভালুক আসবে না। আমি এখন বনের পথই বেশী পছন্দ করি।

—ফিরিংগীরা খুব অত্যাচার করছে, না?

—আমি প্রয়াগে যা দেখেছি তা না বলাই ভালো, যা সামনে পড়ছে কিছু আর রাখছে না, দেশটাকে শ্মশান করে দিলে।

—তুমি প্রয়াগ থেকে আসছ বুঝি?

—না, আমি এখন আসছি পাটনা থেকে।

—ওদিকে খুব লড়াই হয়েছে বলে শুনলাম।

—হ্যাঁ, কুমার সিং ওদিকে খুব লড়ছে, কিন্তু জিততে পারে নি একবারও। লড়াইটা এখন কানপুর প্রয়াগ কাশী থেকে ওইদিকেই গিয়ে পড়েছে, বড্ড হুজ্জুৎ চলছে ওই দিকে, সেই সব দেখেই তো আমি সরে এলাম এই বনে।

—তোমার দেশ কোথায়?

—বারাণসী।

—তোমার নাম?

—আবদুল জব্বর খাঁ।

—বছর পাঁচেক আগে বারাণসীর আরেকজন শিল্পী এসেছিল এখানে এমনি সব পট নিয়ে তার নাম ফজলুর রহমন খাঁ। তাকে তুমি চেনো?

—ভালো চিনি। সে তো আমাদের গ্রামের লোক। তবে বছরখানেক তার কোন পাত্তা মিলছে না। বেঁচে আছে কি না খোদাই জানেন।

—তা তোমার এই একখানি পটের দাম কি দিতে হবে বল?

—টাকা-পয়সা চাই না সর্দারজী, আপনি মেহেরবানি করে একটা গাধা আমায় দিন। আমি আর মালপত্তর বইতে পারছি না।

—একখানা পটের বদলে একটা থাধা, দামটা খুব বেশি হলো না।

—এ তসবীরের দাম নয় সর্দারজী, এ তসবীর আমি আপনাকে নজরানা দিচ্ছি। আপনি একজন গরীব শিল্পীকে একটা গাধা খয়রাতি করুন। খোদা আপনাকে অনেক দেবেন। আপনারা না দিলে আমরা কাদের ভরসায় বাঁচি বলুন, আপনাদের দয়াতেই তো আছি।

সর্দার হাসলো, বললো—তুমি শুধু হাতের কাজই জান না সাহেব, বেশ মিষ্টি কথাও বলতে পার।

কুর্ণিশ করে জব্বর বললো—কথা আর কাজ এই দুটোই তো আমাদের সম্বল সর্দারজী। এই কথা বলতে না জানলে আমায় উপোস করে মরতে হতো। এই কথা বলার কায়দা দেখেছি মীর লখনৌর দিলপসায় নবাব ওয়াজেদ আলি শা'র দরবারে। আর দেখেছিলাম কানপুরে নানা সাহেবের মজলিশে। কথা শুনলে মন জুড়িয়ে যায়।

—তুমি নবাব ওয়াজেদ আলি শা'কে দেখেছ?

—বড় ভালো লোক ছিলেন নবাব সাহেব। মাটির মানুষ। নাচ-গানের বড় সমঝদার ছিলেন, নিজে গান বাঁধতেন, ছবি আঁকতেন। গরীবের দুঃখ দেখতে পারতেন না। যখনই গিয়ে দাঁড়িয়েছি তখনই বখ্‌শিস্ দিয়েছেন তসবীরের দাম কখনো জিজ্ঞেস করেন নি। তা আমাদের বরাতে অমন মানুষ সইল না, আংরেজরা তাকে ধরে নিয়ে গেল কলকাতায়।

—নানা সাহেব কেমন লোক?

—বিঠৌরের পেশোয়া ধনুধুপন্থ নানা সাহেব। ভারী সৌখীন মানুষ। ঘোড়া চিনতে আর পোলো খেলতে তাঁর মত মানুষ হিন্দুস্থানে আর কেউ নেই। মেজাজও দিল-খোলা, দরবারে গিয়ে সেলাম দিলেই ইনাম মিলে যাবে। আমাকে একবার বলেছিলেন—শিল্পীর সব কাজ ভালো হয় না, কিন্তু শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে শিল্পীকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। শিল্পী বেঁচে থাকলে একদিন তাকে দিয়ে ভালো কাজ পাওয়া যাবে।' গরীবের উপর অতো দরদ আমি আর কারও দেখি নি- সর্দারজী। তাকেও আংরেজ-লোগ্ শান্তি দিল না, ভাল মানুষের দুনিয়া নয় সর্দারজী।

—কিন্তু নানা সাহেব তো লড়াই ভালো বোঝেন না, আজ অবধি কোন যুদ্ধ জিততে পারলেন না।

—জিতবেন কেমন করে? অনেক রাজা-মহারাজা যে আংরেজের সঙ্গে দোস্তি করে রেখেছে। তারা পাইক-পেয়াদা জুগিয়ে দিচ্ছে আংরেজকে। দেশের মানুষের উপর যদি দেশের লোকের দরদ না থাকে, তাহলে একা মানুষ আর কি করতে পারে?

—নানা সাহেব তো একা নন তার সঙ্গে তো আরো কতজন ছিল,—তাতিয়া টোপি, আজিমুল্লা, ঝাঁসীর রাণী, দিল্লীর বেগম সাহেবা, আমাদের কুমার সিং, আরো কতজন।

—কিন্তু এতো বড় হিন্দুস্থানের মধ্যে তারা আর ক'জন? বেশির ভাগ রাজা-মহারাজাই তো তাদের 'গদী' যাবার ভয়ে আংরেজের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেলেছে।

অর্জুন সর্দার একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শিল্পীর মুখের পানে তাকালো, তারপর বললো—খাঁ সাহেব, তুমি শুধু শিল্পকর্মই বিক্রী করো না, রাজ-রাজড়ার খবরদারিও করো দেখছি।

—রাজা-মহারাজা নিয়েই তো আমার কেনা-বেচা সর্দারজী। তাদের দরবারে যাই, নানা খবর শুনি, তাতেই অনেক কিছু জানতে পারি।

—রাজা-মহারাজার খবরও তো তুমি নিয়ে যেতে পার, তাতে উপরি রোজগার হয়, বখশিস্ মেলে।

—তাও কি আর করিনি, অনেক-বার করেছি। কিছু কিছু ইনামও মিলেছে। আবার অনেক সময় টাকা পয়সা ছাড়াই অনেক কাজ করেছি। দিল্লীর ফটকের সামনে বাদ্‌শাজাদাদের গুলী করে মারা হলো, তখন তো আমি সেখানে হাজির ছিলাম, সে খবর আমি সবার আগে পৌঁছে দিলাম তাতিয়া টোপিকে। সেজন্য তো এক পয়সা বখ্‌শিশ মেলে নি। আংরেজেরা যেদিন ঝাঁসী নগর লুঠ করলে, পণ্ডিত নন্দদেব রাওয়ের সাত আট বছরের ছেলেটা গুলি খেয়ে মরলো তখন তার পনেরো বছরের মেয়েটাকে আমিই তো এক গাঁয়ে পৌঁছে দিয়ে আসি, সেজন্য কেউ আমাকে কোন ইনাম দেয় নি।

—এখন তুমি কার সংবাদ নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?

—তা সত্যি কথা বলতে কি, একটা খবর আছে, তাতিয়া টোপির একটা সংবাদ আছে অর্জুন সর্দারের কাছে।

—অর্জুন সর্দার? মানে, আমার কাছে?

খাঁ সাহেব মাথা দুলিয়ে বললো—আপনিই যখন অর্জুন সর্দার। তখন আপনারই কাছে।

—কি সংবাদ বলত?

—গুরুজী অর্জুন সর্দারকে বলেছেন কুমার সিংহকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে।

—কুমার সিং তো আংরেজদের কাছে হেরে পালিয়ে গেছেন শুনেছি।

—ঠিকই শুনেছেন। তবে তিনি পালিয়ে যান নি পিছিয়ে গেছেন। এবার আংরেজদের সঙ্গে ভালো করে লড়াইয়ের জন্য তিনি তৈরী হচ্ছেন। এখন তাঁকে সাহায্য করার জন্য গুরুজী বলেছেন।

—কোথায় লড়াই হবে?

—এই অঞ্চলেই লড়াই হবে। তবে ঠিক যে কোথায় লড়াই হবে তা আমি জানি না। আর জানার দরকারই বা কি? আমি তো সংবাদ বাহক মাত্র। খবরটুকু পৌঁছে দিলেই তো আমার ছুটি।

—খবর কি মুখে জানিয়েছেন না পত্র আছে।

—পত্র আছে।

খাঁ সাহেবের হাতে একটি পাকা বাঁশের লাঠি ছিল, লাঠির মাথায় একটি টাঙীর ফলা লাগানো। এইটাই ছিল

তখন সাধারণ পথিকের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। বন্দুক সবাই কিনতে পারতো না। তাছাড়া কারও হাতে বন্দুক দেখলে তখন যে কোন দলের সিপাহীরা তা কেড়ে নিত। লাঠির নীচের দিকে একটা লোহার আংটা লাগানো ছিল। জব্বর খাঁ সেই আংটাটি কৌশলে খুলে ফেললো। ভিতরে ছোট একটি কৌটার মত। তার মধ্যে থেকে গোল করে পাকানো একটুকরো কাগজ বেরুলো। কাগজখানি সর্দারের দিকে এগিয়ে দিয়ে জব্বর বললো—তাতিয়া সাহেবের পাঠ্য আছে।

সর্দার চিঠিখানা হাতে নিয়ে দেখলো। চিঠির এক কোণে জোড়া তলোয়ারের ছাপ দেওয়া, এইটিই তাতিয়া টোপির মোহরের ছাপ। চিঠিখানি উর্দুতে লেখা। সর্দার লেখাপড়া জানতো না। চিঠিখানি জব্বরের হাতে ফেরৎ দিয়ে বললো—গুরুজী কি লিখেছেন তুমিই পড়।

জব্বর হাসলো। তারপর চিঠিখানা পড়লো—

সর্দারজী, আংরেজের অত্যাচারের কথা তুমি শুনেছ। তাদেরকে এদেশ থেকে তাড়াবার জন্য আমরা লড়ছি। কয়েকটা লড়াইয়ে আমরা হেরে গেছি বটে তবে শেষ অবধি আমরা জিতবো। দিল্লীর তখ্ত-তাউসে আংরেজদের বসতে আমরা দোব না। হিন্দুস্থানে আবার হিন্দু বাদশা হবে। আপনার কাছ থেকে আমরা সাহায্য চাই। জগদীশপুরের কুমার সিংকে আপনি সাহায্য করুন। এখনকার মত হাজার দুয়েক তীরন্দাজ হলেই চলবে। পরে এই বনভূমিতে আপনাকেই রাজা বলে ফরমান দেওয়া হবে। বিশ্বনাথ আপনার কল্যাণ করুন।—ইতি—তাতিয়া টোপি।

—কোথায় সৈন্য নিয়ে যেতে হবে তা তো কিছু বলেন নি—সর্দার প্রশ্ন করল।

—সেকথা আমায় বলেছেন। জগদীশপুরে।

—কদিনের মধ্যে,—এমন কিছু বলেছেন?

—এখন যত তাড়াতাড়ি হয় ততই সুবিধে। উনি বলেছেন দু'তিন দিনের মধ্যে হলেই ভালো হয়।

—দুদিনের মধ্যে দুহাজার লোক সংগ্রহ করা তো সহজ নয়। আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি, কাল সকালে জবাব দোব।

—যদি আপনার আরো কিছু জানার থাকে তো বলুন।

—না, এখন আগে নিজের সামর্থ্য বুঝে নিই, তারপর কাল সকালে কথা হবে। আজ রাতে তুমি বিশ্রাম করগে। ওরে, খাঁ সাহেবকে ধরমশালায় নিয়ে যা—

এক যুবক এগিয়ে এলো! গাঁয়ের একপাশে গঙ্গার তীরে একখানি ছোট ঘরে জব্বরকে পৌঁছে দিয়ে গেল। তখনকার দিনে গ্রামে, নগরে ও তীর্থস্থানে অতিথি ও যাত্রীদের থাকার জন্য মন্দির বা ধর্মশালা থাকতো। সম্রাট ধর্মাশোক এই ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। এখনকার দিনে গ্রামে ও নগরে সে ব্যবস্থা নেই, তীর্থস্থানে রয়ে গেছে। ঘরের ঝাঁপ খুলে দিয়ে যুবক বললো, বসুন, খাবার ও আগুন নিয়ে আসছি।

।। আট ।।

নগরমুখী সভ্যতা তখনও হিন্দুস্থানে ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে নি গ্রাম ছিল জনসমাজের প্রাণকেন্দ্র। আর গ্রামের অবকাশে ছিল বনভূমির বিস্তার। আসামের পার্বত্যভূমি থেকে যে বনভূমির সুরু তা বাংলা বিহার অতিক্রম করে মধ্যভারত থেকে গুজরাট অবধি ছায়াচ্ছন্ন করে রেখেছিল। মাঝে মাঝে কয়েকটি বড় বড় নগর সেই বনভূমির যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছিল শুধু। এই সব বনাঞ্চলে নানা জাতির বনবাসী বাস করতো। আকারগত মিল থাকলেও ভাষাগত গরমিল তাদের ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে পরিচিত করেছিল। কোল, ভীল, মুণ্ডা, ওঁরাও, সাঁওতাল, মাউলি প্রভৃতি। ভাষা, খাদ্য, পোশাক অথবা আকারেও পার্থক্য ধরা পড়তো। প্রত্যেক অঞ্চলে রাজা তাঁর প্রত্যন্ত অঞ্চলের বনবাসীদের খুশি রাখার চেষ্টা করতেন, তাতে রাজ্য সীমা নিরাপদ থাকতো, প্রতিবেশীর দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কমতো। বনবাসী সর্দাররা রাজনীতির কুটিলতার চেয়ে সহজ সারল্যই পছন্দ করত বেশী। বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতা দিয়ে এদের বশ করতে পারলে এরা কোনদিনই কোন স্বার্থে বিশ্বাসহন্তা হতো না। মেবারের রাণারা ভীল সর্দারদের সহায়তায় বহু যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। শিবাজী মহারাজ মাউলি সর্দারদের সহযোগিতায় মারাঠা রাজ্যের পত্তন করেছিলেন। তীরন্দাজ হিসাবে বনবাসীরা ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এবং এদেশে তখনও তীরন্দাজের কদর ছিল।

শোন ও গঙ্গার মধ্যবর্তী ব্যাপক বনাঞ্চলে বনবাসীদের সর্দার ছিলেন অর্জুন দাস। সর্দারের ছেলে হিসাবে অর্জুন সর্দার হয়েছিল, বিশেষ কোন শক্তি বা সামর্থ্যের দাবী তার ছিল না, তবে চারিদিকের সব রকম সংবাদ রাখা ও নানা কুটিল ফন্দি ফিকিরে সে ছিল অদ্বিতীয়। এ সম্পর্কে তার গুরু ছিল এক বাঙালী—মধু মল্লিক। মধু সন্ন্যাসী সপ্তগ্রামের লোক। তপ সাধনা করতে এসে কয়েক মাস বিন্ধ্যাচলে রয়ে গিয়েছিল। তখনই অর্জুন দাসের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। তারই কাছে অর্জুনের রাজনীতির দীক্ষা। মধু সন্ন্যাসী কথায় কথায় বলতো—পাড়া পড়শির খবর না রাখলে তুমি টিকতে পারবে না সর্দার, তোমাকে ফিরিঙ্গীদের সিপাই দলে নাম লেখাতে হবে। বাঁচতে চাও তো চারি পাশে কি হচ্ছে খবর রাখো।

কুমার সিং-এর সঙ্গে মধু সন্ন্যাসীই তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

তারপর কুমার সিং এই পথে যেদিন প্রয়াগের দিকে চলে গেল সেদিন মধু সন্ন্যাসীও গেল, বললো—কিছুদিন লড়াই দেখে আসি।

সেই যে গেল, বছর ঘুরে গেল, আর মধু মল্লিকের দেখা নেই।

অনেক দিন পরে আজ মধু মল্লিকের কথাটাই অর্জুনের মনে উঠলো মধু সন্ন্যাসী থাকলে তাতিয়া টোপির এই চিঠিখানা সম্পর্কে একটা যুক্তি-পরামর্শ করা যেতো।

অর্জুন সর্দার ভাবনায় পড়লো। চুপচাপ কয়েকটি তালপাতার চুরুট ফুঁকে নিলো, কোন কথা বললো না। পার্ষদরা চিঠিখানা সম্পর্কে দু একটা কথা বলতে চাইল, কিন্তু সর্দারের মুখের পানে তাকিয়ে কোন কথা বলার সুযোগ পেল না। মজলিশ আর জমলো না। তারা একে একে উঠে গেল।

কোন এক সময় অর্জুন সর্দারও উঠে পড়লো। হাতের কাছেই বল্লমটা ছিল, তুলে নিয়ে গঙ্গার তীর ধরে অগ্রসর হলো। গ্রাম ছাড়িয়ে বনের পথ ধরলো।

রাত্রির প্রথম প্রহর পার হয়ে গেল। এইমাত্র শিয়ালের ডাক সমগ্র বনভূমিকে সরব করে তুলেছিল। জ্যোৎস্নালোকিত বনভূমি রহস্যময়। অষ্টভুজীর পাহাড়টি একটা জমাট অন্ধকারের মত। পাহাড়ের মাথায় মন্দিরের সামনে একটি গুহার মুখে কাঠ-কুটোর আগুন জ্বেলে বৃদ্ধা ভৈরবী বসে আছে। অর্জুন সর্দার ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দাঁড়ালো। ভৈরবী বৃদ্ধা হলেও চোখের দৃষ্টি ধারালো। এক নজরেই সর্দারকে চিনলো, বললো—কে, অর্জুন সর্দার। বসো।

আগুনের পাশে অর্জুন বসলো।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে অর্জুন বললো—তোমার কাছে একটা কথা জানতে এলাম।

ভৈরবী গম্ভীরস্বরে বললো—তুমি আসবে আমি জানি, তোমার জন্যই বসে আছি।

ব্যাপারটা গুরুতর। কুমার সিং আমাকে অনুরোধ করেছে, জগদীশপুরে হাজার তীরন্দাজ নিয়ে যাবার জন্য।

—আমি জানি, মা অষ্টভুজি আমায় জানিয়ে দিয়েছেন।

—এখন আমার কি করা কর্তব্য ঠিক বুঝতে পারছি না। ফিরিঙ্গীরা তো দিল্লীর তখ্‌ত অবধি দখল করে বসেছে, এখন তাদের বিরুদ্ধে লড়তে যাওয়া কি ঠিক হবে। যতগুলো লড়াইয়ের খবর জানি সব কটাতেই তো আমরা হেরেছি।

—যুদ্ধে হারজিত আছে। যারা ঠিকমত লড়তে পারবে না, তারাই হারবে।

—সেইজন্যই তোমার কাছে এসেছি, তুমি মাকে একবার জানাও. মা যা নির্দেশ দেবেন সেইমত চলবো।

—মায়ের নির্দেশ আমি জানি।

অর্জুন জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে ভৈরবীর মুখের পানে তাকালো।

ভৈরবী কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে ধীরকণ্ঠে বললো—মা বলেছেন, ফিরিঙ্গীরাই দেশের রাজা হবে। তোমরা যতই লড়ো ওদের কিছুই করতে পারবে না। নানাসাহেব, তাতিয়া টোপি, লক্ষ্মীবাই কেউ ওদের সঙ্গে যুঝে উঠতে পারলো না, কেউ পারবেও না। কুমার সিং আর একা কি করবে? দেবতা এদের উপর প্রসন্ন নন। কাশী বিশ্বনাথের মন্দির যেদিন মসজিদ বানানো হয়েছে, মোগলদের বাদশাহী সেইদিন থেকেই খতম হয়েছে। দেবশক্তি তো একদিনে কিছু করেন না, ধীরে ধীরে হয়; এতদিনে সব শেষ হলো। দিল্লীর বাদশাকে ওরা ধরে নিয়ে গেছে, দিল্লী দরোযাজার সামনে বাদ্‌শার ছেলেদের গুলী করে মেরেছে। দিল্লীর তখ্‌ত যে দখল করেছে সে-ই তো হিন্দুস্থানের বাদ্‌শা, কুমার সিং তার সঙ্গে ছোটখাটো দু-চারটে লড়াই লড়ে আর কি করবে? যদি জেতেও, দিল্লীর তখ্‌ত কি দখল করতে পারবে?

—সেও তো একটা কথা, তাহলে তো চিঠির জবাব না দিয়ে চুপ করে বসে থাকাই ভালো।

—চিঠি লিখেছে?

—গুরুজী চিঠি দিয়েছেন।

—তাতিয়া টোপি? তাতিয়া তাহলে এখন কুমার সিংয়ের সঙ্গে আছে?

—চিঠি পড়ে তাই তো মনে হলো।

—তাতিয়ার উপর ফিরিঙ্গীদের রাগ সবচেয়ে বেশী। অনেক রাজামহারাজা ওর শিষ্য, তাঁদের সবাইকে ও ক্ষেপিয়েছে। লড়াই ও জিততে পারতো, কিন্তু মুসলমানদের দলে নিয়েই ও খারাপ করলো, দেবতা বিরূপ হলেন। যারা একটার পর একটা মন্দির ভেঙেছে, দেবদেবীকে গাল দিয়েছে, দেবতা কখনও তাদের উপর প্রসন্ন থাকতে পারে না। তাতিয়া তাই বার বার হেরেছে।

—কিন্তু মুসলমানরা তো ভাল লড়াই করে, হিন্দুর চেয়ে অনেক বেশী তেজী।

—কে বললে? রাজপুত, মারাঠী আর শিখদের তেজ কিছু কম? তারা সবাই এক হয়ে লড়লে দিল্লীর তখতে মোগলপাঠান কোনদিন বসতে পারতো? নিজেদের মধ্যে মিল নেই বলেই তো বাইরের বিধর্মীরা সুবিধে পেয়েছে। যাক, সে যা হবার হয়ে গেছে, এখন চাকা ঘুরে গেছে, এখন হিন্দুও নেই মুসলমানও নেই, দিল্লীর মসনদে এখন বসবে ফিরিঙ্গী। এখন এই ফিরিঙ্গীদের বিপক্ষে যে যাবে, সেই সমূলে বিনাশ হবে। নিজের ভালোমন্দ এখন নিজে বুঝে চল।

ভৈরবী চুপ করে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে অর্জুন সর্দারের মুখের পানে তাকালো।

অর্জুন কিছুক্ষণ চুপ করে রইল, ভৈরবী তার মনের কথাটা ধরে ফেললো, বললো, চিঠির জবাব কি দিয়ে দিয়েছ?

—না, কাল সকালে দোব বলেছি।

—বেশ, বলে দিও, তৈরী হচ্ছি, কয়েক দিন সময় লাগবে। ইতিমধ্যে তুমি নিজের খুঁটি শক্ত করে নাও।

—কিন্তু গুরুজীর চিঠি . .

—আত্মরক্ষাই হলো ধর্ম। তার উপর রাজা মহারাজা ও সর্দারদের আরেক ধর্ম আছে—সে হোল প্রজাদের রক্ষা করা। তুমি ফিরিঙ্গীদের বিরোধী হলে তারা চারিদিক থেকে এই বনভূমি ঘিরে ধরবে, তখন কে তোমায় রক্ষা করবে, কোথায় তুমি সহায়তা পাবে? গুরুজী তখন কোথায় থাকবেন, যদি থাকেনও তিনি

একা কি করতে পারবেন ? তিনি তো ঝাঁসীর রাণীর সঙ্গে ছিলেন, নানা সাহেবের সঙ্গে ছিলেন, তাঁদের কি হলো ? দুর্দিনে খুব বিচার বিবেচনা করে এগোতে হবে, খুব বুঝে চলতে হবে। হঠাৎ কিছু করে বসলে পরে আর আপশোসের শেষ থাকবে না।

কথাগুলো অর্জুনের মনে লাগলো, বেশ, তাহলে তোমার কথামতই কাল বলে দোব—তৈরী হতে সময় লাগবে।

ভৈরবী হাসলো, বললো—আর ক'টা দিন চুপ করে বসে থাকো, তারপরেই দেখবে সব ঠিক হয়ে গেছে। এই অমাবস্যায় আমি মহা উপচারে মা আটভুজির পূজা করবো, তোমার নামে সঙ্কল্প করে তোমার কল্যাণ কামনা করবো। তোমার উত্তরোত্তর ভালই হবে। আমি আছি তোমার কোন ভয় নেই।

—পূজার উপকরণ কি কি প্রয়োজন বলুন।

—মহাপূজায় কোন উপকরণ প্রয়োজন হয় না, সামান্য যা দরকার হয় তা আমিই সংগ্রহ করে নোব। যদি পার তো কিছু কারণবারি সংগ্রহ করে দিও। মহুয়াই ভালো, তা-ই পাঠিও। তবে কাউকে কিছু জানিও না, তাতে মহাপূজায় বিঘ্ন ঘটতে পারে। মহাপূজায় সাধককে একা থাকতে হয়, সামান্য চিত্তবিকার ঘটলেই পূজা পণ্ড। আচ্ছা, তুমি এখন যাও, আমি জপে বসবো। মা, করালবদনা, লোলজিহ্বা, নৃমুণ্ডমালিনী মা, তোরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক।

ভৈরবী চোখ বুজলেন। অর্জুন সর্দারও উঠে দাঁড়ালো।

পাহাড় থেকে নেমে অর্জুন বনপথে পড়লো। পরদিন সকালে কিভাবে জব্বর খাঁকে সাজিয়ে গুছিয়ে কথাটা বলবে, তাই সে চিন্তা করছিল। স্তিমিত চন্দ্রালোকে ছায়াচ্ছন্ন বনভূমিতে বেশী দূর নজর চলে না। অন্ধকারে পথের পাশে একটি ঝোপের আড়ালে একজন মানুষ যে লুকিয়ে আছে তা অর্জুনের নজরে পড়লো না। গঙ্গাতীর ধরে তাকে একা চলতে দেখে জব্বর খাঁ তার অনুসরণ করেছিল।

অর্জুন চলে যাবার পর জব্বর খাঁ বড় বড় পাথরের আড়াল দিয়ে অতি সন্তর্পণে পাহাড়ে উঠতে সুরু করলো।

ছোট পাহাড়, কিছুটা উঠেই জব্বর খাঁ থামলো। একখানি পাথরের আড়াল থেকে চোখে পড়লো—উপরে ভৈরবী একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছে। জব্বর খাঁ বড় পাথরখানির আড়ালে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো। ঢালু পাহাড়ের সঙ্গে সে মিশে গেল। [ক্রমশ।

বেতাল পঞ্চবিংশতি

শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায়

বেতাল পঞ্চবিংশতি। একখানা উপাদেয় গল্পের বই। সংস্কৃত ভাষায় লেখা। ঐ বইয়ে পঁচিশটি গল্প আছে। বেতাল নামে একটি অদ্ভুত ভূতের বলা। বেতাল বলেছিল মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে হ্যাঁ, এই বিক্রমাদিত্যই হচ্ছেন মহারাজ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। ভারত ইতিহাসের একজন বিশিষ্ট নরপতি। তোমরা ইতিহাসে নিশ্চয়ই পড়েছো। তাঁরই সভাকবি ছিলেন কবিশ্রেষ্ঠ কালিদাস। নবরত্নের একটি উজ্জ্বল রত্ন তাই না।

মহারাজ বিক্রমাদিত্যই তাল-বেতাল সিদ্ধ হয়েছিলেন। তা তোমরা হয়তো শুনে থাকবে। বেতাল সিদ্ধ হবার সময় অমাবস্যা রাতে মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে বেতালভূত পঁচিশটি গল্প বলেছিল এবং প্রতিটি গল্পের শেষে মহারাজকে একটি করে প্রশ্ন করেছিল। মহারাজ প্রতিটি প্রশ্নেরই ঠিক ঠিক জবাব দিয়েছিলেন; তাই তো তিনি এই বেতাল ভূতটিকে তাঁর আজ্ঞাকারীরূপে পেয়েছিলেন।

একটা কথা তোমাদের জানিয়ে রাখি, বেতাল পঞ্চবিংশতির গল্পগুলিকে বাংলা ভাষায় তোমাদের জন্যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ই মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হতে অনুবাদ করে গিয়েছেন অতি সুন্দরভাবে—অতি সহজ ভংগীতে। বড় হয়ে এই বইখানি জোগাড় করে পড়লে তোমরা নিশ্চয়ই আনন্দিত হবে এবং গল্পের উপদেশগুলি স্মরণ রাখলে ভবিষ্যৎজীবনে নিশ্চয়ই উপকৃত হবে।

এখন আমি তোমাদের এই বেতাল পঞ্চবিংশতি হতে একটা গল্প বলছি। মন দিয়ে শোনো, কেমন। হ্যাঁ, আমিও তোমাদের এই গল্পটি বাংলা ভাষাতেই বলছি এবং অতি সহজ করেই বলছি, কেমন? তবে একটা কথা তোমাদের আগেই বলে রাখি; গল্পের শেষে যে প্রশ্ন বেতাল করেছিল মহারাজকে—মহারাজ সংগে সংগেই তার উত্তর দিয়েছিলেন। আমি তোমাদের গোটা দুটো দিন সময় দিচ্ছি—উত্তরটা বেতালের বদলে আমাকেই জানিয়ো তোমরা।

উজ্জয়িনী। একটা দেশের নাম। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যের রাজধানী। এইখানেই একজন ব্রাহ্মণ বাস করতেন, ব্রাহ্মণের দুই গুণধর পুত্র ছিলেন। দুইজনের দুইটি বিশেষ গুণ ছিল। একজন ছিলেন ভোজনবিলাসী আর অন্যজন ছিলেন শয্যাবিলাসী। ভোজনবিলাসী ভোজনে এমনই বিলাসী ছিলেন যে, খাবারে সামান্য দোষত্রুটি থাকলেও তিনি তা অনায়াসে বলে দিতে পারতেন। আর শয্যাবিলাসী শয়ন ব্যাপারে এমনই বিলাসী ছিলেন যে, বিছানায় সামান্য কোনো ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকলে তিনি তা অতি সহজেই বলে দিতে পারতেন।

তাঁদের এই অদ্ভুত গুণের কথা মহারাজের কানে গেল। মহারাজ তাঁদের ডাকালেন। তাঁর রাজত্বে এমন দুইজন গুণী আছেন অথচ মহারাজ

তাঁদের সম্মানিত করবেন না এ কি কখনো হতে পারে, না হয়েছে কখনো? তিনি তাঁদের পরীক্ষা করে যথাযথ পুরস্কার দেবেন অবশ্যই।

প্রথম ব্রাহ্মণ কুমারকে ডাকা হোলো। মহারাজ তাঁকে বললেন: 'তোমাকে আমি পরীক্ষা করতে চাই—পরীক্ষায় কৃতকার্য হলে তোমাকে অবশ্যই পুরস্কৃত করা হবে।'

'আপনার যেরূপ অভিরুচি। মহারাজ আমি পরীক্ষা দিতে তৈরী আছি।'

'ভালো—ভালো।'

মহারাজ রন্ধনশালার ঠাকুরকে ডাকলেন আর ভোজনবিলাসীকে পরিপাটি খাদ্য পরিবেশন করতে বললেন। তাঁর কথামতই কাজ হোলো। ঠাকুর ভোজনবিলাসীকে পরিপাটিরূপে খাদ্য পরিবেশন করলো। মহারাজ ভোজনবিলাসীকে খেতে বসতে বললেন: বসো, এই সুন্দর পরিপাটি খাদ্যে নিশ্চয়ই কোনো খুঁৎ নাই।'

'খেয়ে তবে বলতে পারি মহারাজ।'

'নিশ্চয়ই, তুমি আহারে বসো।'

'বসছি মহারাজ।'

ভোজনবিলাসী খেতে বসলেন। ...দর ফুলের মতো একমুঠো ভাত ...খ তুলেই তা থুথু করে ফেলে দিলেন।

মহারাজ অবাক হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা ...লেন: 'কি হোলো—কোনো খুঁৎ ...ছ নাকি?'

'হ্যাঁ মহারাজ।'

'কি এমন খুঁৎ যে ভাত তুমি মুখে ...তেই পারলে না?'

'মহারাজ! অধীনের অপরাধ নেবেন ... ঐ ভাতে মড়ার গন্ধ পেলাম। ...র মনে হয় এই ভাতের চাল যে ...ত হয়েছে তার ধারেকাছে নিশ্চয়ই ...ন আছে।'

'সত্যি?'

'হ্যাঁ মহারাজ, আমি মিথ্যা বলি নাই।'

মহারাজ অবাক হয়ে খানিকক্ষণ ভোজনবিলাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর মন্ত্রীকে ডেকে ভোজনবিলাসীর কথার সত্যমিথ্যা যাচাই করতে বললেন।

মন্ত্রীমশাই তদন্ত করে জানালেন ভোজনবিলাসীর কথাই ঠিক বটে, ওই চালের জমির কাছেই একটা শ্মশান আছে।

মহারাজ ভোজনবিলাসীর গুণে অতিশয় মুগ্ধ হলেন আর তাকে নিজের গলার মুক্তার মালা দান করলেন।

এরপর ডাকা হোলো শয্যা-বিলাসীকে। মহারাজ তাকেও পরীক্ষা করার জন্য রাজবাড়ীর শয্যাকরদের ডেকে পাঠালেন এবং সোনার পালঙ্কে তার জন্যে সাতখানা মখমলের গদি বিছিয়ে পরিপাটি এক বিছানা করতে আদেশ দিলেন। তাঁর কথামতই শয্যা পাতা হোলো। চমৎকার দুধের মতো বিছানা—পাখীর পালকের মতো হালকা আর নরম। মহারাজ শয্যাবিলাসীকে বললেন: 'তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে।'

'আমি প্রস্তুত মহারাজ।'

'তবে শুয়ে পড়ো—আমার মনে হয় এই বিছানা তোমাকে আরাম দেবে, আনন্দ দেবে: এতে নিশ্চয়ই তুমি কোনো খুঁৎ খুজে পাবে না।'

'পরীক্ষা করে বলতে পারি মহারাজ।'

'অবশ্যই।'

শয্যাবিলাসী বিছানায় শুয়েই উঠে পড়লো। একটা দারুণ যন্ত্রণায় চাৎকার করে উঠলো শয্যাবিলাসী।

মহারাজ তো একেবারে অবাক। জিজ্ঞাসা করলেন তিনি শয্যাবিলাসীকে; 'কি হোলো তোমার, উঠে পড়লে যে? কোনো খুঁৎ আছে নাকি এই বিছানাতে—যা তোমার আরামে ব্যাঘাত ঘটালো?'

'হ্যাঁ, মহারাজ। এই বিছানার সপ্তম গদির তলায় একগাছা চুল আছে এবং তাই আমাকে ক্লেশ দিয়েছে।'

মহারাজ যার-পর-নাই অবাক হলেন। শয্যাকরকে তিনি শয্যা-বিলাসীর কথার সত্যাসত্য পরীক্ষা করার জন্য সাতখানা গদির নীচে একগাছা চুল আছে কি না দেখতে বললেন। শয্যাকর সাতখানা গদির তলা হতে সত্যই একগাছা চুল পেল। মহারাজ, শয্যাবিলাসীর গুণে মুগ্ধ হয়ে তাকে আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন আর তাকে তাঁর হাতের হীরক অঙ্গুরীয় দান করে বললেন: 'সত্যিই তুমি শয্যা-বিলাসী, আমি তোমার গুণে মুগ্ধ এবং গর্বিত।'

শয্যাবিলাসী আনন্দে হীরার আংটি নিয়ে নিজের ঘরে গেল। বেতাল প্রশ্ন করেছিল মহারাজ বিক্রমাদিত্যকে 'এই দুই বিলাসীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বিলাসী?'

বিক্রমাদিত্য তখুনি বেতালের প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন।

তোমরা ভেবে বলতো এদের মাঝে কে শ্রেষ্ঠ বিলাসী? প্রশ্নটা কিন্তু আমার নয়, বেতালের: সেকথা ভুলো না।'*

---

*[কথিকাটি ১১-৪-৬২ তারিখে কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতে প্রচারিত এবং লীলা মজুমদারের সৌজন্যে 'বসুমতী'তে প্রকাশিত হইল]

সিগারেটের ছবি

শ্রীএলা মুখোপাধ্যায়

ডাকটিকিট জমানো বা দেশলাই-এর ছবি জমানোর মত সিগারেটের ছবি জমানোর রেওয়াজও এককালে খুব ছিল। এককালে বললুম এই জন্যে যে, আজকাল এ রেওয়াজ উঠে গেছে। বিলেতে আইন করে এ ব্যবস্থা বন্ধ করে দিতে হয়।

নানা সিগারেট কোম্পানী তাঁদের সিগারেটের প্যাকেটের মধ্যে সিগারেটের সঙ্গে নানা ধরণের ছবি দিত। ভারি সুন্দর ছোট ছোট এই ছবিগুলি নানা রঙে রঙা থাকতো এবং তার মধ্যে নানা বিষয়ে শিক্ষণীয় বস্তুও থাকতো প্রচুর। এক এক সময় এইগুলির উপর ভাল পুরস্কারও ঘোষণা করা হত। যেমন এখনও কোন কোন কোম্পানী তেলের কুপন বা মাখনের কুপন সংগ্রহ করে দিলে পুরস্কার দিয়ে থাকে, তখনও তেমনি একটি সিগারেট কোম্পানীর একশোটি অথবা তার চেয়ে বেশী কুপন সংগ্রহ করে দিলে সেই অনুপাতে সংগ্রহ-কারীদের নানাবিধ পুরস্কার দেওয়ার রীতি ছিল।

এক-একটি কোম্পানী আবার কোন কোন ছবির সিরিজ বার করতো; কেউ করতো তাসের সিরিজ, কেউ হয়ত নামকরা সৈনিকদের ছবি, কেউ তখনকার বিখ্যাত খেলোয়াড়দের, রাজা-মহারাজাদের, জীবজন্তুর, থিয়েটার বা সিনেমার নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রী, খ্যাতনামা মনীষী ও ধর্মযাজক প্রভৃতির।

বাপ-খুড়ো-জ্যাঠারা এই সিগারেট খেয়ে ছবিগুলি সংগ্রহ করলেও এগুলি জমাতো কিন্তু বাড়ির ছেলেমেয়েরা। এই ছবিগুলির এক-একটি সিরিজ সম্পূর্ণ করার মধ্যে পুরস্কার পাবার যেমন আগ্রহ থাকতো, তেমনি জমানোর মধ্যে থাকতো অদম্য কৌতূহল। একটি এ্যালবামে ফটো বা স্ট্যাম্প জমানোর মত এগুলিকেও নানা দেশের ছেলে-মেয়েরা তখন সেঁটে রাখতো। আমাদের দেশেও, ছোটবেলায় এ-রকম অনেক ছবি জমাতো অনেকে। আজ এই সিগারেটের ছবির প্রচলন না থাকলেও, বিলেতে অনেক সংগ্রহকারীদের মধ্যে সেই পুরাতন বিভিন্ন সিরিজের ছবি-গুলির এখনও কেনা-বেচা হয়—পুরোন ডাকটিকিট কেনা-বেচার মত। এক-একটি সম্পূর্ণ সিরিজের ছবি, সংখ্যায় সেগুলি পঞ্চাশ, ষাট বা একশো, সেগুলি এখন চার-পাঁচশো থেকে হাজার দেড় হাজার টাকাতেও বিক্রি হয়ে থাকে।

গত যুদ্ধের সময়, অর্থাৎ ১৯৪১ সালে, আমাদের দেশেরই একজন

বাঙালী ভদ্রলোক তাঁর এমনি একটি সিগারেটের ছবির এ্যালবাম একজন আমেরিকান সৈনিকের কাছে পাঁচশো টাকায় বিক্রি করেছিলেন।

ব্যাপারটা সত্যিই খুব মজার। পুরোন ডাকটিকিটের মত সিগারেটের ছবিও যে এককালে এইভাবে বিক্রি হতে পারে, প্রথম সেটা কেউ ভাবতেই পারে নি। বৃটিশ সিগারেট কোম্পানীগুলির যেসব ছবির সিরিজ বেরিয়েছিল, তাদের সর্বসমেত সংখ্যা প্রায় তিন হাজার এবং যারা এগুলি বিক্রি করে তাদের কাছে এইসব ছবির দামসমেত ক্যাটলগও পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এইসব ছবি নিলামে বিক্রি হয় এবং খরিদ্দাররা ডাক দিয়ে এক-একটি সিরিজ কেনে। মধ্যে মধ্যে এদের দাম চড়ে এবং খরিদ্দার না থাকলে পড়ে যায়।
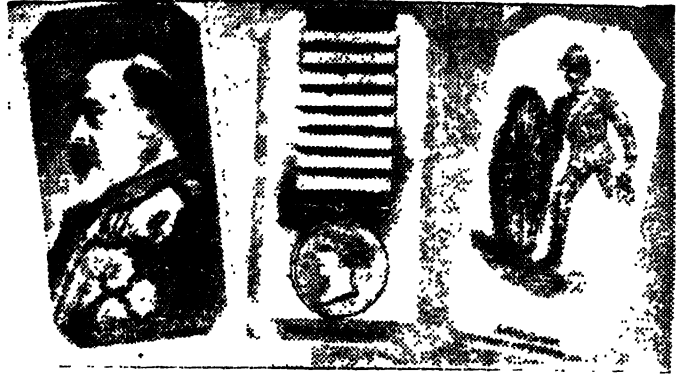
এখানে আমি নামকরা কয়েকটি সিরিজের কয়েকটি ছবি তোমাদের জন্যে প্রকাশ করলুম। তোমাদের মধ্যে কারুর এখনো এই ধরণের জমানো ছবি থাকলে নিশ্চয় আনন্দবোধ করবে।

গল্প হলেও সত্যি-

শ্যামাপ্রসাদ পাল

১৮১৬ খৃস্টাব্দ। প্যারিসের এক জনবিরল পথ দিয়ে হেঁটে চলেছেন এক ভদ্রলোক। মাথার টুপীটা সামনের দিকে ঝুঁকে মুখটাকে আড়াল করেছে। ওভারকোটের পকেটে দু'হাত ঢুকিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন একটানা। মাঝে মাঝে তাঁর ভুরু দুটো কুঁচকে উঠছে দুর্ভাবনায়।

পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ একজন পথিক তাঁকে চিনতে পেরে নীচু হয়ে অভিবাদন করল। কিন্তু ভদ্রলোক তার দিকে একবার ফিরেও তাকালেন না।

তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পথ হাঁটছেন আর চিন্তা করছেন তাঁর এক রোগিণীর কথা। অসম্ভব মেদবহুল এই রোগিণীর হৃদযন্ত্রে নানারকম জটিলতা দেখা দিয়েছে, কিন্তু বাইরে থেকে তা পরীক্ষা করার কোনরকম উপায় নেই এমন কি তার হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক গতিও অনুভব করা যাচ্ছে না। অথচ হৃৎপিণ্ডের গতিবিধি না জানলে চিকিৎসা কেমন করে সম্ভব?

হঠাৎ একদল বাচ্চার চেঁচামেচিতে তাঁর চিন্তার খেই হারিয়ে গেল। তিনি মাথা তুলে দেখলেন এক মজাদার কাণ্ড। রাস্তাসংলগ্ন এক পার্কে কতগুলো ছোট ছেলেমেয়ে এক অদ্ভুত খেলায় মেতে উঠেছে। ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে পড়লেন এবং সাগ্রহে শিশুদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করতে থাকলেন।

শিশুদের মধ্যে একজন একটা বিরাট তক্তার একদিকে পাথর দিয়ে খুব জোরে জোরে ঠুকছে আর তার সঙ্গীরা তক্তার অপর প্রান্তে কান দিয়ে আওয়াজ শুনে আনন্দে ছুটোছুটি করছে এটা যেন ওদের কাছে এক নতুন খেলা।

ডাক্তার ভদ্রলোক সেখানে আর একমুহূর্ত দাঁড়ালেন না। তিনি চলে এলেন তাঁর সেই রোগিণীর কাছে। একটুকরো লম্বা কাগজ চেয়ে নিয়ে তাকে গোল করে পাকালেন। এরপর গোলাকার একটা ছোট টিনের কৌটার সঙ্গে পাকান কাগজের একটা দিক শক্ত করে আটকে দিলেন। তারপর রোগিণীর বুকের ওপর কৌটটা রাখলেন আর কাগজের অপর প্রান্ত কানে দিয়ে হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ শুনতে চেষ্টা করলেন। হয়েছে। তিনি এবার হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন। তাঁর মুখ হাসিতে ভরে উঠল।

এই ডাক্তার ভদ্রলোকটি কে জান?

এঁর নাম রেনে লানেক। ইনি জাতিতে ফরাসী। বুক ও পিঠ দেখার যন্ত্র 'স্টেথিসকোপ' আবিষ্কার করে ইনি চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

ডাকটিকিটে চিত্রকলা

কিছুদিন আগে ইন্দো-আমেরিকান সোসাইটির ৫ম বার্ষিক ডাকটিকিট প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান সোসাইটি প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। ছবিতে একটি বালিকাকে (মৈত্রেয়ী ঘোষ) 'সার্টিফিকেট অফ মেরিট' লইতে দেখা যাইতেছে। এবারেও ডিসেম্বর মাসে সোসাইটির ৬ষ্ঠ বার্ষিক ডাক-টিকিট প্রদর্শনী হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে

'ডাকটিকিটের উপর চিত্রকলা' (Fine arts on Stamps) নিয়ে ডাকটিকিট সংগ্রহ করা অতি আধুনিক সংগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষত চিত্ররসিকের কাছে আরও লোভনীয়। ছোট্ট একটা কাগজের টুকরা যার কাড়াকাড়ি পড়ে যায় সারা জগৎ জুড়ে—ডাক-সংগ্রহকারীদের কাছে ডাকটিকিট এক দেশের দূত হয়ে সমগ্র বিশ্বে ভ্রমণ করে।

ডাকটিকিট সংগ্রহ দুই রকম ভাবে করা যায়। এক হচ্ছে সাধারণভাবে সংগ্রহ (General Collection)। অর্থাৎ এই সংগ্রহতে পৃথিবীর প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক রকমের ডাকটিকিট থাকে। কোন একটি বিশেষ বিষয়ের উপর ঝোঁক থাকে না। আর হচ্ছে কোন একটি বিশেষ বিষয়ের উপর সংগ্রহ করা (Thematic Collection). যেমন, পশু-পাখী, নরনারী, খাদ্য, 'ক্ষুধা' হইতে মুক্তি, (freedom from hunger) খেলাধূলা, রেডক্রস চিত্রকলা ইত্যাদি ইত্যাদি। অর্থাৎ এইসব বিষয়ের কোন একটির উপর পৃথিবীর প্রত্যেকটির দেশের প্রত্যেকটি ডাকটিকিট সংগ্রহ করা।

সম্প্রতি চিত্রকলার ডাকটিকিট সংগ্রহ একটি বিশেষ জনপ্রিয় সংগ্রহ হয়ে দাঁড়িয়েছে। জার্মান গণতন্ত্র, নেদারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ইত্যাদি বহু দেশ এই বিষয়ের উপরে ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, চিত্রকলা কি? ভাবের রেখাময় মূর্তিই চিত্রকলা। কোন কিছু মুখে বা লিখে প্রকাশ না করে কতকগুলি রেখার দ্বারা প্রকাশ করা। লেখা ও দেখা দুই একই জিনিষ---কেউ কোন জিনিষ লিখে প্রকাশ করে, আবার কেউ রেখার দ্বারা প্রকাশ করে। যেমন, আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের লেখাগুলির মধ্যে মানবজীবনের ব্যর্থতা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-উৎসাহ ইত্যাদি। যদিও চিত্রকলার উপর বহু ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু ভারতে এখনও চিত্রশিল্পের উপর কোন ডাকটিকিট প্রকাশিত হয় নাই।

দীপ্তিময় ঘোষ

প্রাচীনকালে প্রত্নপ্রস্তর যুগে (Palaeolithic age) যখন লোকেরা ছিল অসভ্য-বর্বর, কথা বলতে পারত না, গুহায় বাস করত, তখন তারা মনের ভাব প্রকাশ করত ছবি এঁকে। যখন মানব সভ্যতা ক্রমে উন্নতির চরমে উঠতে লাগল তখন চিত্রশিল্পেরও প্রভূত উন্নতি হতে লাগল। প্রথম রোমে এবং গ্রীসেই চিত্র রীতির বিকাশ হয়। ভারতের অজন্তা ও ইলোরাতে এর কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে যিনি বিশ্ববিখ্যাত চিত্রকররূপে পরিচিত ছিলেন, তিনি হলেন ইটালীর লিওনার্দো দা ভিঞ্চি। তা ছাড়া তিনি ছিলেন ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, গায়ক ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁর "মোনা লিসা" (Mona Lisa) নামক একটি হাস্য-মুখরিত মুখ ইতিহাসে একটি বিশ্ববিখ্যাত ছবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। 'মোনা লিসা' এই হাস্য মুখরিত মর্তটিতে কি যে প্রকাশ করতে চেয়েছে

।। আর্জেন্টিনার ডাকটিকিট ।।

● বাঁদিকের তৈলচিত্রখানি অঙ্কিত করেন কার্লস মরেল

পৃথিবীর কেউ এখনো তার সঠিক উত্তর দিতে পারে নি।

১৯৩২ সনে ইটালী তাঁর সম্মানে নানান রকম ডিজাইনের দুইটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে; তা ছাড়া দা-ভিঞ্চির ছবি-সম্বলিত একটি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। টিকিটটির দাম হ'ল ১০০ লায়ার। এটি নীল ও অলিভ রংয়ে ছাপা। লিওনার্দো-দা-ভিঞ্চির পাঁচশত জন্ম-বার্ষিকী উপলক্ষে পশ্চিম জার্মানী (Dutsche Bundes post) 'মোনা লিসা'র প্রকৃতি সম্বলিত একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

১৯৩০ সনে স্পেন (Espana) বিখ্যাত চিত্রকর ফ্রান্সিসকো গোয়ার (Francisco Goya) সম্মানে তাঁর প্রকৃতি সম্বলিত বহু ডাকটিকিট প্রকাশ করে। তাঁর [illegible]বার্ষিকী উপলক্ষে প্রায় ত্রিশটি ডাক-টিকিট প্রকাশিত হয়, বিভিন্ন মূল্যের বিভিন্ন ছবি-স[illegible]।

[illegible] সনে ফ্রান্সে, আগস্ট রোডিনের (August Rodin) প্রতিকৃতি সম্বলিত ও [illegible] উপর কয়েকটি ডাকটিকিট প্রকাশি[illegible]। পল [illegible]ানের (Paul Cezanne) [illegible]বার্ষিকী উপলক্ষে [illegible] সনে একটি ডাকটিকিট প্রকাশ [illegible]

[illegible] জন্য নেদারল্যাণ্ড [illegible] রেমব্রাণ্ট (Rembrandt) [illegible] Titus'-এর উপর কিছু ডাকটিকিট প্রকা[illegible] ১৯[illegible] সনে নেদারল্যাণ্ড আবার রেম্ব্রাণ্টের প্রতিকৃতি-সম্বলিত কিছু ডাক-টিকিট প্রকাশ করে।

সম্প্রতি কিউবা (Cuba) তাদের জাতীয় যাদুঘরের (National Museum) সম্মানার্থে চারিটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। ডাক-টিকিটগুলি হ'ল (১) ২ সেণ্ট মূল্যের একটি মূর্তি—এটা এঁকেছেন Engenio Rodrigues (২) ৩ সেণ্ট মূল্যের "Sun flowers" এটা এঁকেছেন ভিক্টর ম্যানুয়েল (Victor Manuel), (৩) ১০ সেণ্ট একটি এ্যাবস্ট্রাক্ট চিত্র এঁকেছেন Wilfredolam এবং (৪) ১৩ সেণ্ট মূল্যের "Children" এঁকেছেন Enrique Ponce.

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি চিত্রশিল্পী জন কপলের (John Copley) স্মরণে তাঁর অঙ্কিত একটি ছবি নিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। ছবিটি হচ্ছে তাঁর হাতে আঁকা তাঁর মেয়ের ছবি। ডাকটিকিটের ছবিটির বাঁপাশে লেখা John Copley—American Artist ছবিটি [illegible] ও চকলেট রংয়ে ছাপা। আর ডান দিকে লেখা আছে United States Postage 5 cents. [illegible] অঙ্কিত বহু ছবি [illegible] এখনও [illegible] পাওয়া যাবে। তিনি তাঁর শেষ [illegible] ইংলণ্ডে [illegible] করেন। তিনি [illegible] আমেরিকা [illegible]র প্রথম বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। তিনি ১৭৩৮ খৃঃ বোস্টনে এক [illegible] করেন। তাঁর [illegible] (Irish)। তাঁর সম্পূর্ণ নাম হল—John Singleton Copley.

কিছুদিন আগে আর্জেন্টিনা (Argentina) চিত্রকলার উপর কিছু ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। তার মধ্যে একটি হ'ল চার পেসো মূল্যের Market place at Monserrat Square এই তৈলচিত্রখানি অঙ্কিত করেন আর্জেন্টিনার বিখ্যাত চিত্রকর কার্লো মরেল (Carlos Morel)। অন্য দুটি ডাকটিকিটের একটি সেই জাতীয় শিশুকল্যাণ তহবিলের জন্য ছাপা হয়। প্রথম টিকিটটাতে 'Cardenal' পাখীর ছবি; মূল্য '4×2 Pesos' এবং অন্যটিতে 'Golondrina' পাখীর ছবি; মূল্য 18×9 Pesos"।

গত ৪ঠা অক্টোবর ১৯৬১ সনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র চিত্রশিল্পী Frederis Remington-এর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর অঙ্কিত একটি ছবি নিয়ে ডাকটিকিট প্রকাশ করে। তারপর ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৬২ সনে চিত্রশিল্পী Wilson Home X(1836-1910)-এর সম্মানার্থে, তাঁর অঙ্কিত একটি ছবি নিয়ে ডাক-টিকিট প্রকাশ করেছে। তা' ছাড়া গত ৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৩ সনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র চিত্রশিল্পী জন জে অডুবন (John J. Audubon)-এর সম্মানার্থে একটি ডাকটিকিট প্রকাশ করেছে। টিকিটটার ছবিটা হ'ল একটা ডালে দুইটি পাখী বসে রয়েছে। টিকিটটি নীল ও হাল্কা চকলেট রংয়ে ছাপা।

বালখিল্য দমকল বিভাগ

বাচ্চারা যখন খেলাচ্ছলে বড়দের কাজকর্ম অনুসরণ করে, তখন তাদের সে উৎসাহ ও ব্যগ্রতা দেখার মত! পশ্চিম জার্মানীর উত্তর সাগরের ফ্যাইবার্গে গত আশি বছরেরও বেশি ছোটদের একটি দমকল বিভাগ আছে। গতিকাদের প্রয়োজনের সময় এরা যে কাজ দেখিয়েছে, তা এতোকাল মানুষকে বিস্মিত করেছে। অত্যন্ত ধ্যানসাধের সঙ্গে এরা আগুন নেবাবার কায়দাকৌশল শেখে। প্রতিবছর এই বালখিল্য দমকল বিভাগের নেতা নির্বাচনের সময় দমকল বিভাগের একটি অনুষ্ঠান হয়। এবছরও হয়েছে। এই নির্বাচনে প্রাচীন প্রথা অনুসৃত হয়, অর্থাৎ "বিভাগীয় কর্তৃত্ব" গ্রহণের পূর্বে নতুন নেতাকে দলের অন্যান্য সভ্যদের হাতে উত্তমমধ্যম প্রহার সহ্য করতে হয়। নেতা হবার যোগ্যতা অর্জনে এর চেয়ে কঠিন পরীক্ষা আর কি হতে পারে?

অমিতদ্যুতি কুমার

A tale of smile is perhaps with a tear.

হাসির পেছনেই কান্না আছে। কান্না ছাড়া কি হাসি হয় না? নিশ্চয়ই হয়, তবে স হাসি ওজনে অনেক কম, তার আবেদন ম, উত্তাপ কম—তাই-ই হোলো হাল্কা হাসি। হাসি শুধু হাসির জনাই—আর কিছু র। এ হাসি তাই হাস্যকর। কিন্তু এ হাসিরও প্রয়োজন আছে। নির্মল আনন্দের উৎস এ হাসি।

মানুষের সামাজিকতার সঙ্গে হাসির এবং াস্যবোধের একটা সম্পর্ক আছে। তাই মাজের বিবর্তনের সাথে হাসির ধারা ও উৎসরও বর্তন ঘটে। এইখানেই কারুণ্য এবং াস্যরসের পার্থক্য। কারুণ্যের আবেদন শ-কাল-সমাজ রীতির উর্ধ্বে। কিন্তু হাস্য-সের সঙ্গে দেশ-কাল সমাজের একটা ঘনিষ্ঠ র্ক আছে। ঈশ্বর গুপ্তের যুগের াস্যরস পরবর্তী যুগে অর্থহীন, অশ্লীল, গ্রাম্য ও রুচিকর মনে হতে পারে।

হাস্যরসের শ্রেণী-বৈচিত্র্যে কৌতুকরসই লভাবে উপভোগ্য। কৌতুকরস যুক্তিহীন নানির্ভর হাসির উৎস। অপরিণত মানসিকতার ছে এ হাসির দাম অনেক। এ হাসিকে ল্কা হাসি বলা চলে।

বাংলা গদ্য-সাহিত্যের রূপকার বঙ্কিম-। ছোট গল্পের শিল্পমাধ্যম গদ্যভাষা। ব্যের মধ্যে যে গল্প বলা যায় না, তা নয়। ন্তু প্রকাশভঙ্গীর বিশিষ্ট রীতিতে তারা গল্প ণিভুক্ত নয়। কাজেই বাংলা সাহিত্যে গল্প ং স্বভাবতই হাল্কা হাসির গল্প বঙ্কিম ও ঙ্কমোত্তর যুগের সৃষ্টি। হাল্কা হাসির গল্প রিবেশনের জন্য সব থেকে বেশি প্রয়োজন াশভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য। আর প্রয়োজন ঘনিষ্ঠ নবোধ এবং মানব-মন সম্পর্কে সম্যক লব্ধি। হাল্কা হাসি যুক্তিহীন ঘটনানির্ভর । অদ্ভুত, অবান্তর এবং অপ্রাসঙ্গিক া বা বস্তু বা প্রাণীর বর্ণনা হাল্কা হাসির । কাহিনীর উদ্ভট মৌলিকতা, অস্বাভাবিক াগুলির সুকৌশল গাঁথুনি এবং সরস বর্ণনা —এই হোলো হাল্কা হাসির উপাদান।

আমাদের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত এবং প্রাচীন বহু পুস্তকের মধ্যে হাল্কা হাসির ছড়াছড়ি দেখা যায়। কিন্তু তাদের প্রকাশ-মাধ্যম গল্প নয়—কাব্য। প্রাচীন গদ্য সাহিত্যের হাল্কা হাসির প্রকৃষ্ট উদাহরণ কথা-সাহিত্যের গল্প, ঠাকুরমার ঝুলি, গোপাল ভাঁড়ের গল্প ইত্যাদি। বহুদিন পর্যন্ত এগুলি লোক-মুখে প্রচলিত ছিল, পরে পুস্তকাকারে গ্রথিত হয়েছে। কথাসাহিত্যের গল্পের হাসির উৎস উদ্ভট কতকগুলি চরিত্র, যেমন হবুচন্দ্র রাজা, গবুচন্দ্র মন্ত্রী, ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী, দেড় আঙুলে এবং এদের অদ্ভুত প্রকৃতি এবং দেহবৈচিত্র্য। এর সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে শব্দ প্রয়োগের চাতুর্য। গোপাল ভাঁড়ের গল্পগুলির হাসির উৎস বাক্-চাতুর্য এবং গোপালের সুচতুর প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব শাণিত শরসন্ধানী উক্তি এবং অব্যর্থ লক্ষ্য টীকাটিপ্পনী। গোপালের চেহারা কমিক কিন্তু বাকচাতুর্য অন্যের বিশিষ্টতা, চরিত্রের কোনো বিশেষ দিক ইত্যাদির ওপর ব্যঙ্গবিদ্রূপ পাঠককে হাসির সন্ধান দেয়। গোপালের ব্যঙ্গবিদ্রূপ সাধারণভাবে মার্জিত হলেও স্থানবিশেষে অশ্লীল এবং গ্রাম্য। ঠাকুরমার ঝুলির গল্প ঘুম-পাড়ানিয়া গল্প। এ গল্পের মধ্যে একাধারে স্থান পেয়েছে কৌতুক, রোমাঞ্চ, শৌর্য। হাসির উৎস এখানেও অবাস্তব ঘটনা, যেমন শেয়াল-পণ্ডিতের পাঠশালা, বাঘের সাথে রাজকন্যার বিয়ে, অবাস্তব চরিত্র, অবাস্তব জিনিষযেমন বারহাত কাঁকুড়ের তেরহাত বীচি, হাড়মুড়মুড়ি ব্যারাম আর অদ্ভুত প্রকাশভঙ্গী। দাশু রায়ের পাঁচালী, ছেলে ভুলানো ছড়া—এগুলিও অবশ্য পরিকল্পিতভাবে গ্রথিত নয় এবং এতে যদিও হাল্কা হাসির গল্প পরিবেশন করা হয়েছে, শিল্পমাধ্যম পদ্য ভাষা বলে আমাদের আলোচ্য সূচীর অন্তর্গত নয়।

উনবিংশ শতাব্দীর দুজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা গদ্য সাহিত্য ঈশ্বরচন্দ্রের কালে একান্ত অবহেলিত। সাময়িক পত্রের সঙ্গে এঁরা দু'জনেই যুক্ত ছিলেন। কাজেই হাস্যরসের অন্যতম প্রধান উপাদান—মানব-মন এবং সমাজ-রীতি সম্পর্কে এঁরা যথেষ্ট ওয়াকিবহাল ছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টির ভাষামাধ্যম কাব্য ভাষা, তাই আমাদের আলোচনার বাইরে। ভবানীচরণ সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে আদর্শবাদী, চিন্তাশীল, নিষ্ঠাবান পুরুষ ছিলেন। কাজেই তাঁর সৃষ্টিতে নীতি ও আদর্শের ছাপ দেখা যায়। ঠিক হাল্কা হাসি বলতে যা বোঝায় তা ভবানী-চরণের রচনায় ছিল না বললেই চলে। তবে ব্যঙ্গবিদ্রূপ এবং রসিকতা যথেষ্টই ছিল। মোটা-মুটিভাবে 'নববাবু বিলাস', 'কলিকাতা কমলালয়' ইত্যাদির আখ্যানভাগে হাল্কা হাসির ছিটে-ফোঁটা উপাদান আছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নক্সা'র জায়গায় জায়গায়, প্যারী-চাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল', দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিক' ইত্যাদির মধ্যে ব্যঙ্গরসাশ্রিত গল্প পরিবেশিত হলেও এমন কি মূল আখ্যান থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েও এদের হাল্কা হাসির গল্প, আখ্যা দেওয়া যায় না। কিন্তু হাসির উপাদান ঈশ্বর গুপ্ত থেকে শুরু করে ভবানীমোহন - কালীপ্রসন্ন - প্যারীচাঁদ-দীনবন্ধুর মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হল। তাই বাংলা সাহিত্যের হাল্কা হাসির গল্পের পটভূমি রচনা করেছে। ঈশ্বর গুপ্তের রসিকতার মূল উপাদান ছিলো আদিরস, দীনবন্ধুর রচনার হাস্যরসের উৎস মানব-বৈচিত্র্য। বাংলা হাস্য-রসের সাহিত্য বর্তমান রূপ পেতে আরম্ভ করে বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে। বঙ্কিমের 'কমলাকান্তের দপ্তরের একাধিক অংশকে, যেমন কমলাকান্তের জবানবন্দী, ঢেঁকি, কাকাতুয়া ইত্যাদিকে স্বতন্ত্রভাবে হাল্কা হাসির গল্প আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। 'কমলাকান্তের জবানবন্দী'কে যদি গল্প বলা যায়, তবে তা বাংলা হাল্কা হাসির গল্পের প্রথম এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলা যেতে পারে। একই কথা 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' এবং বঙ্কিমের অনেকগুলি উপন্যাস সম্পর্কে প্রয়োগ করা যেতে পারে। হাল্কা হাসির প্রথম বাঙালী-গল্পকার ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। হাস্য

রসের যে-ধারা বঙ্কিমের মধ্যে রূপ পেলো, তাই আধুনিক বাংলা হাসির গল্পের উৎস। হাল্কা হাসির গল্প বঙ্কিমের আপন হাতে রূপ পায় নি, ত্রৈলোক্যনাথের মধ্যে সে হাস্যরসের ধারা হাল্কা হাসির গল্পে রূপ পেয়েছে। ত্রৈলোক্যনাথের স্বভাবজাত প্রবণতা ছিল অতিপ্রাকৃত। এইজন্যেই তাঁর অধিকাংশ গল্পেই ভূত-প্রেত ইত্যাদির উপস্থিতি ও ভূমিকা আছে। হাল্কা হাসির গল্প হিসেবে চাঁদের শিকড়, একটাকার ভূমিকম্প, ঘ্যাঘোঁ, ভূত কোম্পানী, ব্যাঙ সাহেব ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। ঘটনা এবং পরিবেশ সৃষ্টির জন্যই ত্রৈলোক্যনাথের গল্পকে হাল্কা হাসির গল্পের মর্যাদা দেওয়া যায়' তাঁর ভাষা খুব সাবলীল ছিল না, অন্যথায় প্রকাশভঙ্গীর গুণে গল্পগুলি আরো সরস হয়ে উঠতে পারতো। মুবল গড়গড়ির গল্পের একটাকার ভূমিকম্প এবং তৎপরবর্তী বিচিত্র অতি লৌকিক ঘটনাগুলির সামগ্রিকতা হাসির সৃষ্টি করে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাশৈলীর প্রতিটি ছত্রে হাল্কা হাসির ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়' গল্পে, ঘটনার সামগ্রিকতার থেকে প্রকাশভঙ্গীর সরসতাই হাস্যরসের উৎস। একই কথা বলা চলে 'কমলাকান্তের জবানবন্দী' সম্পর্কে। ত্রৈলোক্যনাথের ঘটনাগুলি অবাস্তব। কাজেই এতে ঘনিষ্ঠ জীবনবোধের পরিচয় নেই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের হাসির ঘটনাগুলি সাধারণভাবে বাস্তব এবং যুক্তিগ্রাহ্য। পরিবেশনের গুণে তা 'অদ্ভুত' হয়ে উঠেছে এবং হাসির সৃষ্টি করেছে।

এই কালের আরেকজন হাল্কা হাসির গল্পকার ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উপন্যাস এবং প্রহসনেই তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন বটে কিন্তু তাঁর নক্সা, চুটকী এবং উপন্যাস ও প্রহসনের আখ্যানভাগের কিছু কিছু অংশকে হাল্কা হাসির গল্পের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে। উল্লেখ-যোগ্য গল্পাংশ হিসেবে 'পাঁচু ঠাকুরের' দুয়েকটি নক্সা, 'বঙ্গীয় ভারত হিতৈষীর ঘোষণাপত্র', 'মান', 'গোরাচাঁদ' ইত্যাদি আখ্যায়িকার উল্লেখ করা যায়। ইন্দ্রনাথের অনুগামী যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুও হাস্যরসাশ্রিত সাহিত্যের একজন সিদ্ধপুরুষ। প্রধানত তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক। 'চিনিবাস চরিতামৃতের' চিনিবাস চরিত্র নিয়ে লেখা আখ্যানের দুয়েকটি অংশ, 'মডেল ভগিনী', 'বাঙালী চরিত'-এর প্রথম ভাগে প্রার্থনা গল্পটি দ্বিতীয় ভাগের বড়বাবু, গদাধর, ক্যাবলচন্দ্র ইত্যাদি চরিত্র উল্লেখ করা যেতে পারে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রকাশভঙ্গীও সাবলীল ছিলো না। তাঁর লেখায় 'ছদ্ম গম্ভীর' ভাষার সাহায্যে হাস্যরস সৃষ্টির প্রয়াস দেখা যায়।

শ্রেষ্ঠ জীবন-শিল্পীদের সাথে জীবনের যোগ সুনিবিড়। তাই তাঁদের সৃষ্টিতে যেমন থাকে জগতের সূক্ষ্মতম সৌন্দর্যের আলোক-নির্ঝর, তেমনি থাকে আশা-আকাঙ্ক্ষা-ভালোবাসা, দুঃখ-কান্না-হাসির সমন্বয়। রবীন্দ্রনাথ একজন সার্থক জীবনশিল্পী। তাই একদিকে যেমন জীবনের গভীরে ডুব দিয়ে চয়ন করেছেন জীবন-রহস্যের শুক্তি, সৃষ্টিতে যেমন একদিকে সঞ্চার করেছেন উচ্ছ্বসিত বেদনার ভোগবতী-ধারা, তেমনি জীবনপ্রবাহের আলোকোজ্জ্বল উদ্দেশ্যহীন তরঙ্গগুলির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছেন হাসির অলকানন্দায়। রবীন্দ্রনাথের হাসির গল্পে একই সাথে স্থান পেয়েছে হাস্যরস ও করুণারস। সৃষ্টি হয়েছে জীবনরস। গল্প-গুলির মধ্যে আনন্দ-বেদনার গঙ্গা-যমুনার সুগভীর হৃদয়রসের ধারা প্রবাহিত হয়েছে বলে হাস্যকৌতুকের স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট রূপটি আমরা দেখতে পাই না। নিছক হাসির গল্প হিসেবে 'ইচ্ছা পূরণ', 'গেছোবাবা' ইত্যাদির নাম করা যেতে পারে। কিন্তু যদিও তাঁর অনেক গল্পে উপন্যাসগুলির আখ্যানভাগে একাধিক ঘটনা সংঘাতে কৌতুক সৃষ্টি হয়েছে, তবুও এই আনন্দের গঙ্গাধারার সাথে বেদনার যমুনা-ধারার সহাবস্থান নিছক হাসির উদ্রেক করে না। হাস্যকৌতুক-এর প্রহসনগুলির অধিকাংশ সম্পর্কে একই কথা বলা চলে।

বাংলা-সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা করুণহৃদয় সম্পন্ন লেখক শরৎচন্দ্রের হাস্যরস প্রধানত চরিত্রনির্ভর। কিন্তু ঘটনা পরম্পরা এবং ভাষার চাতুর্যে হাল্কা হাসির এক দীর্ঘ অনুভূতি লাভ করা যায়। শরৎচন্দ্রের হাল্কা হাসির গল্প বলতে গেলেও উপন্যাস থেকে বিচ্ছিন্ন আখ্যানের আশ্রয় নিতে হয়। 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের মেজদার অধ্যয়ননিষ্ঠা এবং রয়েল বেঙ্গল টাইগার, পিশেমশাই ও তাঁর দুই বেটার 'বাপ-বেটায় চীৎকার করার পাল্লা দেওয়া, মেজদার আঁ আঁ শব্দে প্রদীপ উল্টিয়ে আর খাড়া না হওয়া, মেঘনাদ বধের অ-পূর্ব অভিনয়---ফুটলাইটের পাঁচ ছটা ল্যাম্প উল্টিয়ে লম্ফ দিয়ে স্টেজে প্রবেশ ও কোমরবন্ধ ছেঁড়া, শ্রীকান্ত দ্বিতীয় পর্বে জাহাজে ওঠার সময় যাত্রীদের বর্ণনা, নন্দ মিস্ত্রী ও টগর গোস্বামী ইত্যাদি অফুরন্ত নিশ্চিন্ত হাসির উৎস। নতুনদার বাবুয়ানা কুকুরের ভয়ে শীতের গঙ্গায় গলা ডুবিয়ে বসে থাকা, 'বড় দিদি'র সুরেন্দ্রনাথ ইত্যাদিও হাল্কা হাসির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

প্রমথ চৌধুরী বীরবলের রসিকতাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে বলেছিলেন, 'আমি বাঙালী জাতির বিদূষক মাত্র'। প্রমথ চৌধুরীর হাসিতে কোনো স্থায়ী প্রভাব ও গভীর উদ্দেশ্য পরিস্ফুট নয়। তবে তাঁর হাসিকে পুরোপুরি হাল্কা হাসিও বলা যায় না। তাঁর গল্পগুলি কবিতাগুলি অপেক্ষা খাপছাড়া, বিচ্ছিন্ন ও অপ্রাসঙ্গিক কথা-কণ্টকিত, তার কারণ বেশীর ভাগ গল্পই বৈঠকী পরিবেশে রচিত। 'নীল-লোহিত', 'ঘোষাল' ইত্যাদি চরিত্রের সাহায্যে তিনি অনেকগুলি সরস হাসির গল্প পরিবেশন করেছেন। এর মধ্যে 'চার ইয়ারী কথা'র গল্প-গুলিতে হাল্কা হাসির আমেজ পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি গল্পই প্রেম এবং রোমান্সঘটিত। হাসির যথেষ্ট উপাদান থাকা সত্ত্বেও তাঁর বেশীর ভাগ গল্প সার্থক হাল্কা হাসির গল্প হতে পারেনি, তার মূল কারণ তাঁর বিচারশক্তি, বা তাঁর সরস সৃষ্টিশক্তি অপেক্ষা বড় ছিল। বাংলা হাল্কা হাসির গল্পের আরেকজন নাম পরশুরাম। পরশুরামের কৌতুকরসের উৎকর্ষ স্বীকার করেও ত্রৈলোক্যনাথের উপাদান ও রচনাশৈলীর সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করতে হয়। খোশগল্প ও আড্ডার পরিবেশেই হাসির গল্প জমে ভালো। ত্রৈলোক্যনাথ ও পরশুরামের গল্পে তা ভালোভাবেই প্রমাণিত হয়েছে, অথচ প্রমথ চৌধুরীর বেলায় বৈঠকী পরিবেশ গল্পের মধ্যে অহেতুক বিচ্ছিন্নতা ও খাপছাড়া ভাব এনে দিয়েছে। এই পার্থক্যের কারণ রাজশেখর বসু (পরশুরাম) ও ত্রৈলোক্যনাথের ঘটনা-সংহতি। পরশুরামের প্রবলতম কৌতুক-রসের পরিচয় পাওয়া যায় উদ্ভট ও অপ্রাকৃত পরিবেশে রচিত গল্পগুলির মধ্যে। 'গড্ডালিকা'র ভূশণ্ডীর মাঠে, 'কজ্জলী'র জাবালি', 'হনুমানের স্বপ্নে'র মহেশের মহাযাত্রা, প্রেমচক্র, 'ধুস্তরী মায়া'র দুই বুড়োর রূপকথা, ভরতের ঝুমঝুমি, রেবতীর পতিলাভ, বদন চৌধুরীর শোকসভা, যদু ডাক্তারের পেশেণ্ট, ষষ্ঠীর কৃপা, গল্পকল্পের গামানুষ জাতির কথা, রামরাজ্য, তিন বিধাতা চিরঞ্জীব, কৃষ্ণকলি, জটাধর, বকশী, বালখিল্যগণের উৎপত্তি ইত্যাদি হাসির জন্যই গল্প। অদ্ভুত ও অতিলৌকিক, অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য ঘটনার আঘাতে এইসব গল্পে বুদ্ধি ও বিশ্বাস পথ খুঁজে পায় না এবং অদম্য কৌতুকবৃত্তিতে হৃদয় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। শিবুর তিন জন্মের তিন স্ত্রী এবং নৃত্যকালীর তিন জন্মের তিন স্বামীর ডবল ত্র্যহস্পর্শ, প্রেমচক্র রাহুর মাখন সহযোগে চাঁদে কামড়, গরম গরম সূর্য্যি খাওয়া, হিন্দুস্থান ও পাকিস্থান হওয়ার পর দুর্বাসার দাড়ি থেকে ভরতের ঝুমঝুমি বের হওয়া, বলরামের স্ত্রী রেবতীকে লাঙলের সাহায্যে ছোট করা আবার পা ধরে টেনে বড় করা জটিরামের ধড়ে পক্ষীর মাথা আর পক্ষীর ধড়ে জটীরামের মাথা লাগানো ইত্যাদি ঘটনার কোনো বিশেষ অর্থ নেই। একমাত্র এদের কাজ নির্জলা হাসির সৃষ্টি। পরশুরামের হাস্যরসের একটি

প্রধান উৎস তাঁর নিজস্ব নানা সরস মন্তব্য ও চমৎকার টিপ্পনী। পরশুরামের অনেকগুলি ধারালো, সংক্ষিপ্ত অথচ বিপর্যয়কারী উক্তি আমাদের হাস্যাবেগকে প্রবলভাবে উচ্ছ্বসিত করে। যেমন চিকিৎসা সঙ্কটের সেই উক্তি—'হয় Zানতি পারো না'। কোথাও বা সংস্কৃত, প্রাকৃত হিন্দী ভাষার মিশ্রণে হ্যগাখিচুড়ী-গোছের উক্তি হাসির সৃষ্টি করে।

জীবন সম্বন্ধে যে বহুল অভিজ্ঞতা ও অপক্ষপাতী দৃষ্টিভঙ্গী শ্রেষ্ঠ রসিক লোকের অবলম্বন, সেগুলি কেদারনাথের মধ্যে যথেষ্ট ছিল—ইনি এ-যুগের আরেকজন শ্রেষ্ঠ হাস্য-রসিক। কেদারনাথের গল্পেও হিন্দী এবং ইংরাজীর বিকৃত ব্যবহারে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন 'দাদার দুরভিসন্ধি', 'দুর্গেশনন্দিনীর দুর্গতি', 'আই হ্যাজ' নামক উপন্যাসের আখ্যানভাগের একাধিক অংশ। কেদারনাথের লেখার মধ্যে কারুণ্যের উপস্থিতি আছে। তাই প্রমথ চৌধুরীর মত তাঁর অধিকাংশ গল্পও সার্থক হাল্কা হাসির গল্প হয়ে উঠতে পারে নি, যদিও হাসি ও কৌতুকের উপস্থিতি আছে।

বাংলা হাল্কা হাসির গল্পে আর এক যুগের সূত্রপাত হয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখনী-স্পর্শে। প্রভাতকুমার ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হলেও তাঁর উপন্যাসগুলি এককেন্দ্রিক না হয়ে একাধিক ছোট গল্প ও খণ্ড আখ্যানের সমাবেশ বলেই মনে হয়। প্রভাতকুমারের ছোট গল্পে বাঙালীর সহজ জীবনের প্রসন্ন কৌতুকরস খেয়ালী কল্পনার রঙিন বুদবুদ-বিলাস ছোট ছোট পারিবারিক বিরোধের ক্ষণিক আলোড়ন ও মুহূর্ত পরের অবসান, ক্ষুদ্র অসংগতির আত্মপ্রকাশ ও হাস্যকর ফলশ্রুতির মধ্যে সংশোধন—এগুলি রূপ পেয়েছে। তাঁর বলবান 'জামাতা গল্পটি সেক্সপীয়রের Commedy of erross' দ্বারা অনুপ্রাণিত হলেও খাঁটি দেশীয় পরিবেশে তার কাঠামোর পরিবর্তন এবং নাম ভুল করে অন্য লোকের শ্বশুরবাড়ীতে ওঠা ইত্যাদি ঘটনার মাধ্যমে যে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়েছে, তা প্রকৃত হাল্কা হাসির গল্পের মেজাজ বহন করে। 'মাষ্টার মশায়' গল্পে বাঙালী সমাজের স্পর্শ-কাতরতার বিশদ এবং বিংশ শতকের প্রথম পাদের বাঙালী জীবনের অগভীরতা রূপ পেয়েছে, কিন্তু এ-গল্পটিও একটি সার্থক হাল্কা হাসির গল্প।

বিংশ শতকের প্রথমার্ধের এবং দ্বিতীয়ার্ধের বর্তমান অংশ পর্যন্ত বাংলা হাল্কা হাসির গল্পের চরিত্র লক্ষ্য করলে একটা কথা বোঝা যায় যে, এই যুগের হাল্কা হাসির গল্পের মেজাজ এমন যে, অনায়াসে যে-কোন রকমের আবাল-বৃদ্ধবনিতা এগুলির রস গ্রহণ করতে পারে। এ-যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গল্পকার বিশেষ করে ছোটদের জন্য যে হাসির গল্প সৃষ্টি করেছেন, তা যে কোন বয়সের নারী-পুরুষের উপভোগ্য। লেখকদের মনে ছোটদের কথা থাকার জন্যই কোন বিকৃত মানসিকতা, জটিল তত্ত্ব বা অশ্লীলতা স্থান পায় নি। অথচ প্রকাশ-ভঙ্গীর গুণে, ঘটনা-বৈচিত্র্যে এই যুগে বাংলা সাহিত্যে অসংখ্য হাল্কা হাসির গল্প সৃষ্ট হয়েছে। সম্ভবত সমস্ত ছোট গল্পকারেরই একাধিক গল্প হাল্কা হাসির রসে সমৃদ্ধ।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটদের জন্যে লেখা গল্পগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি এবং 'বুড়ো আংলা', 'ক্ষীরের পুতুল' ইত্যাদি শিশু উপন্যাসের আখ্যানভাগের একাধিক অংশকে এই পর্যায়ে ফেলা যায়। অবনীন্দ্রনাথের কৌতুক-রসেরও মূল উপাদান অবাস্তব চরিত্র, যেমন বুড়ো আংলার 'রিদয়', ক্ষীরের পুতুল। কিন্তু গল্প-উপন্যাসগুলি ঘনিষ্ঠ মানবতার দিকে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় হাসি তেমন দানা বাঁধে নি। একসঙ্গে তাঁর 'কাঁচায় পাকায়' গল্পটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এক রাজার সব পাকা দাড়ির মাঝে একটিমাত্র কাঁচা দাড়ি এবং রাণীর কালো চুলের পাহাড়ে একটিমাত্র পাকা চুল নিয়ে রাজারাণী মায় দেশবাসী বিব্রত। গল্পের উপজীব্য এই দাড়ি এবং চুলকে তুলে দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়—কিন্তু একটি ছড়ার মধ্যে এর যে কী আশ্চর্য সমাধান হল, তাকে নিয়েই হাসি। গল্পটি ঘটনাবহুল না হওয়াতে হাসির চরিত্র উচ্ছ্বসিত নয়। অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অন্তত একটি গল্প—'কিনী খাওয়াব গল্প' হাল্কা হাসির পর্যায়ে পড়ে।

এরপরে আসে সুকুমার রায়ের কথা। সুকুমার রায় বাংলার শিশু-সাহিত্যের একজন পথিকৃৎ। তাঁর প্রায় সব লেখাই হাসির গল্প। 'হ-য-ব-র-ল' একটি আশ্চর্য হাসির গল্প—এ ধরণের মৌলিক হাসি বাংলা সাহিত্যে খুব কমই সৃষ্টি হয়েছে। 'শ্রীকাকেশ্বর কুচকুচে'র হিসাব, ছাব্বিশের দুয় নামলো, হাতে রইলো পেন্সিল, দাগ ওঠা ফিতের গলা বুক ছাতি ছাব্বিশ ইঞ্চি করে দেওয়া, কুমীরের সেই বিচার সভা, প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি লাইন হাসির সৃষ্টি করে। এ হাসির জন্যে কিছু ভাবতে হয় না, হেসেও কিছু ভাবতে হয় না, এ হাসি তাই সত্যিকারের হাল্কা হাসি। তাছাড়া দাশু আর তার নাটক অভিনয় নিয়ে নানা কীর্তি, নবীনকে সাজা দেওয়ার জন্যে মাথায় ধুচুনি দিয়ে গায়ে কাদা জল ছিটিয়ে ডাকাত সেজে ভয় দেখানো এ সবই অনবদ্য হাল্কা হাসির গল্পের জন্ম দিয়েছে। অনেকে অবশ্য একথা বলেন সুকুমার রায়ের হ-য-ব-র-ল-এর এবং 'আবোল-তাবোল'-এর কবিতাগুলির কয়েকটি চরিত্র নাকি ইংলণ্ডের কোন বিখ্যাত লিমেরিক লেখকের লিমেরিক ধরণের কবিতা থেকে নেওয়া। সে কথা সত্য হলেও দেশীয় আকারে সেগুলিকে পরিবেশনের যে কৃতিত্বটুকু সুকুমার রায়ের প্রাপ্য, তাতেই তিনি ভাস্বর। ইদানীংকালেও তাঁর জনপ্রিয়তাই তাঁর সাফল্যের দ্যোতক।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের আর একজন শক্তিমান হাস্যরসিক সৈয়দ মুজতবা আলি। সৈয়দ মুজতবা আলির কৌতুককে ঠিক হাল্কা হাসির পর্যায়ে ফেলা যায় না। তাঁর লেখার ধরণও বৈঠকী চংয়ের। মুজতবা আলির কৌতুক সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে আছেন 'চাচা'। তাঁর রম্যরচনাধর্মী উপন্যাস এবং বৈঠকী আলোচনার কোনো কোনো অংশে সরস হাসির উপস্থিতি থাকলেও গভীর এককেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী তাদের হাল্কা হাসির গল্পে রূপ পেতে দেয় নি।

শিবরাম চক্রবর্তী সম্ভবত জীবিত বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যে সব থেকে বেশী হাস্যরসিক। সাধারণ হাসির গল্পকারদের মত কিন্তু শিবরামের হাসির উৎস অদ্ভুত ঘটনা ও চরিত্র নয়। শিবরামের অপূর্ব প্রকাশ ভঙ্গীর জন্যেই তাঁর বেশীর ভাগ গল্প হাল্কা হাসির মাধুর্যে অনুপম হয়ে উঠেছে। শিবরাম চক্রবর্তীর বেশীর ভাগ লেখাও শিশু ও কিশোর পাঠ্য। শব্দ চয়নের দক্ষতায় বিশেষ মুহূর্তে তিনি এমন অনুপ্রাসের সৃষ্টি করেন, সেগুলিই সেই সব ক্ষেত্রে হাসির উৎস হয়ে দাঁড়ায়। জীবনের উপকরণগুলি করায়ও হলেও শিবরাম কখনো তাঁর কৌতুক সাহিত্যে মহৎ কিছু দেবার বা কোনো বিশেষ লক্ষ্যে উপনীত হবার চেষ্টা করেন নি। যার ফলে হাসি সৃষ্ট হয়েছে নিছক হাসির জন্যেই। এই কারণেই গল্পগুলি সত্যকার হাল্কা হাসির গল্পের মর্যাদা লাভ করেছে। 'জন্মদিনের উপহার' 'বর্ধন ব্রাদার্সের 'ম্যাড্ভেঞ্চার', 'উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে' ইত্যাদি গল্প গ্রন্থগুলির প্রতিটি গল্পই উল্লেখ-যোগ্য। এদের কোনো ঘটনাটিকেই অস্বাভাবিক বলা চলে না অথচ প্রকাশভঙ্গীর গুণে অপূর্ব সরসতায় সমুজ্জ্বল। 'বর্ধন ব্রাদার্সের ম্যাড্ভেঞ্চার'-এর উপাদান 'মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল চ্যারিটি ম্যাচের কটি টিকিট। জনৈক ভদ্রলোক সেগুলি অসংখ্য প্রার্থীর মধ্যে কাকে দেবেন ঠিক করতে না পেরে যে অদ্ভুত 'প্রতিযোগিতা'র ব্যবস্থা করেন, তাই গল্পের উপজীব্য। একটি গল্পে চোর ধরার যে আশ্চর্য পদ্ধতির কথা বললেন, পুজো করার নাম করে চোর বেচারাকে তীরকাঠির বন্ধনে আবদ্ধ করে, তা একটুও অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। 'একটি ভুতুড়ে কাণ্ড' গল্পে,—এক পাহাড়ী রাস্তায় বিকল গাড়ী ঠেলে আনতে গিয়ে এক ভদ্রলোক কি নিদারুণ

দুরবস্থায় পড়েছিলেন এবং লেখক তাঁর দুরবস্থাকে ভৌতিক কাণ্ড ভেবে তাঁর দুরবস্থাকে কিভাবে আরো বাড়িয়ে তাঁর দুর্গতির চরম করেছিলেন তাই নিয়েই সৃষ্টি হয়েছে অনবদ্য হাস্যরস। তার গল্পগুলি ছোট-বড় সবায়ের কাছে সমান আবেদন রাখে।

সুনির্মল বসু এ-যুগের আরেকজন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক। সুনির্মল বসুও মূলত শিশু-সাহিত্যিক। তার বেশীর ভাগ গল্পের উপজীব্য শিশু ও কিশোর চরিত্র। তবে সাধারণভাবে গল্পগুলো নিছক হাসির জন্যে লেখা নয় বলেই পুরোপুরি হাল্কা মেজাজের হাসির গল্প হয়ে উঠতে পারে নি। তার বেশীর ভাগ লেখাই কিশোর চরিত্রের কোনো বিশেষ দিক নির্দেশের উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেছে। 'কীর্তিপদর কীর্তি' তার সাধারণ রচনাশৈলীর একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম এবং এটি একটি সার্থক হাল্কা হাসির গল্প। বদেশপুরের কাগজ 'ডাণ্ডমে'র কাটতি নেই। 'ডাণ্ডমের' সহ-সম্পাদক কীর্তিপদ কিভাবে আজগুবি খবর ছেপে 'ডাণ্ডমের' কাটতি বাড়িয়ে তুললো, তাই নিয়েই গল্প এবং হাসি।

বাংলা হাল্কা হাসির গল্পে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অবদান অসামান্য। নারায়ণবাবুর হাসির গল্পের মুল চরিত্র চারটি---টেনিদা, প্যালারাম হাবুল সেন আর ক্যাবলা। টেনিদা বারকয়েক ম্যাট্রিক ফেল করে দলের সর্দারি করে, হাবুল সেন নিখাদ বাঙাল, ক্যাবলা পড়াশুনোয় ভালো আর প্যালারাম পেটে পিলে ক্ষীণজীবী মানুষ। এই চার মূর্তিকে নিয়ে বাংলা হাল্কা হাসির গল্পের এক অপরিমেয় ঐশ্বর্য ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। হাসির উৎস অস্বাভাবিক ঘটনা নয়, সাধারণ ঘটনা, যা প্রকাশভঙ্গীর চাতুর্যে অদ্ভুত হয়ে উঠেছে। বেশীর ভাগ সময় টেনিদার বুক্কা ভাঙা হয়েছে অদ্ভুত ঘটনা সংযোগে, কোথাও বা প্যালারামের করুণ অবস্থা, কোথাও আবার হাবুল সেনের বাঙাল ভাষা, এইসব নিয়েই রস। 'চার মূর্তির অভিযান' এই চার মূর্তির কীর্তিকথা। ছোট ছোট ঘটনার সংযোগে এটি গড়ে উঠেছে। আখ্যানভাগের এই সমস্ত ঘটনা, যেমন, হনুমানের মাথা চুলকোনো, বিকট চেহারার বাগানরক্ষককে দেখে টেনিদার মূর্চ্ছা যাওয়া, ইত্যাদি স্বতন্ত্রভাবে হাসির উৎস হিসেবে উল্লেখযোগ্য। তাঁর কতকগুলি বিখ্যাত হাসির গল্প, 'দুর্ধর্ষ মোটর সাইকেল', 'ডিলা গ্র্যাণ্ডি', 'দধীচি', পোকা ও বিশ্বকর্মা'। কিছুকাল আগে নারায়ণবাবু শিশু মাসিক 'শিশুসাথী'তে নিয়মিত লিখতেন। সেই সময় 'চার মূর্তি' অন্তত কুড়িটি কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে এবং এর মধ্যে অনেকগুলি নাটকে রূপান্তরিত করে অভিনয়ও করা হয়েছে। নারায়ণবাবুর হাসির গল্পে কোন অস্বাভাবিক ঘটনাকে আশ্রয় করে হাসি পরিবেশিত হয় নি, চরিত্রের বিশেষ দিকে বিশেষ মুহূর্তের আলোকপাতে হাল্কা হাসির আমেজ সৃষ্টি হয়েছে। কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নিতে হয় না বলে এ হাসি সকলের কাছেই সমান উপভোগ্য। ছোট গল্পকার হিসেবে নারায়ণবাবু বাংলা সাহিত্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী। তাঁর ছোট গল্প অপূর্ব দৃষ্টিকোণ থেকে জীবন মাধুর্যের বিবরণে ভাস্বর। এর পরিবেশ তাই ঈষদবিবৃণ্ণ উচ্চারণে,---মননালোকিত ভাষায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। হাসির গল্পের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে হাসির জন্যেই, তাই এর সঙ্গে ভাবগভীরতার কোন সম্পর্ক নেই। একই সাথে উভয় ক্ষেত্রে, দুটি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী জীবন বিবৃতির পৃষ্ঠায় তিনি অপূর্ব দক্ষতার সাথে অঙ্গুলি চালনা করেছেন।

আরেকজন জনপ্রিয় শিশু-সাহিত্যিক ধীরেন্দ্রলাল ধরও হাল্কা হাসির গল্পের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করে রয়েছেন। তাঁর গল্পে হাসির উৎস অস্বাভাবিক বা অদ্ভুত ঘটনা বা চরিত্র নয়। বড়দের বিভিন্ন ব্যাপারকে ছোটরা কিভাবে দেখে, তাদের সেই অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গীর বিবরণেই তাঁর বেশীর ভাগ হাসির গল্পের হাসি। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য মৌলিক গল্প, 'অমরের আইডিয়া'। 'নিখিল ভারত ফেল করা ছাত্র সঙ্ঘের সভাপতি অমর কিভাবে পরীক্ষকদের জব্দ করার জন্য উত্তট প্রশ্নপত্র রচনা করে এবং তাদের পরিকল্পনার পরিণতি, এই নিয়েই গল্পটি। চিন্তাধারার অদ্ভুত ধরণের মৌলিকত্বে গল্পটি পড়ে প্রাণখুলে হাসতে হয়। বর্তমান বাংলার আর একজন হাস্যরসিক বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। 'বিরূপাক্ষ' ছদ্মনামে ইনি লেখেন এবং বর্তমানে আকাশ-বাণীর কোলকাতা কেন্দ্র থেকে সপ্তাহে একদিন হাসির নক্সা পরিবেশন করেন। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ হাসির উপজীব্য আধুনিক সমাজের নরনারী, তাদের চরিত্রের বিশেষ বিশেষ দিক। নক্সাগুলি মোটামুটি কটাক্ষধর্মী এবং এতে হাল্কা হাসির মেজাজ রয়েছে। প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে 'বিরূপাক্ষের বিষম বিপদ', 'বিরূপাক্ষের আরো বিপদ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর বিজ্ঞান সাহিত্যধর্মী ঘনাদার কাহিনীতে ঘনাদার চরিত্রের বিশেষ দিকে আলোকপাতে কয়েকটি অনবদ্য হাল্কা হাসির গল্প সৃষ্টি করেছেন। 'ফুটো', 'গুবরে পোকা', ইত্যাদি এ ধরণের গল্প। ঘনাদার চরিত্রের চালিয়াতির সঙ্গে নারায়ণ গাঙ্গুলীর টেনিদার চরিত্রের অনেকটা মিল আছে। আবার নারায়ণবাবুর 'ডি-লা গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিসের' শেষাংশের সঙ্গে ত্রৈলোক্যনাথের 'একটাকার ভূমিকম্পের অনেকটা মিল রয়েছে।

বাংলা শিশু-সাহিত্যের আরেকজন দিকপাল 'স্বপন বুড়ো'র ছোট গল্পে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে ধীরেন্দ্রলাল ধরের মতো কিশোর চরিত্রের বিশেষ দিকের উপর বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকপাতে। স্বপন বুড়োর 'আত্মহত্যা' এবং ধীরেন্দ্রলালের 'অমরের আইডিয়া'র পরিকল্পনাগত মিল লক্ষ্য করবার মতো।

হাল্কা হাসির গল্পসম্ভারে কমবেশী প্রায় সমস্ত সাহিত্যিকেরই অবদান আছে। বনফুল, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কামাক্ষী চট্টোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, সমুদ্র, আশা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী এঁদের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলা হাল্কা হাসির গল্পের ধারাটি লক্ষ্য করলে প্রতীয়মান হয়, হাসির গল্পের প্রথম যুগে অর্থাৎ বঙ্কিম-পূর্ব যুগে হাসির উপাদান ছিল অতি লৌকিক ঘটনা, আদিরস এবং অসামঞ্জস্য, বঙ্কিম এবং বঙ্কিমোত্তর যুগের হাসির উপাদান ঘটনাবৈচিত্র্য এবং অস্বাভাবিক মানব চরিত্র, আধুনিক যুগে হাসির একমাত্র উপাদান পরিবেশন বৈচিত্র্য। সাধারণ ঘটনার বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার, সাধারণ চরিত্রের অদ্ভুত বিশ্লেষণ এবং চরিত্রের বিশেষ দিক, সমাজ ও সভ্যতাকে নিয়ে কটাক্ষ এই হোলো আধুনিক হাসির উপাদান। হাসির গল্পের এই তিনটি কালের প্রথম দুটিতে শিশু-সাহিত্যের কোনো নির্দিষ্ট পরিসীমা ছিল না। নির্মল আনন্দ অশ্রু এবং অপেক্ষাকৃত সরল মনোবিশ্লেষণ নিয়ে শিশু-সাহিত্যের বর্তমান ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। স্বভাবতই বর্তমান বাংলা সাহিত্যের হাল্কা হাসির গল্পে শিশু-কিশোর যুবক-বৃদ্ধের কাছে সমভাবে উপভোগ্য হওয়ায় সাধারণভাবে তাদের কিশোর সাহিত্য বলে অভিহিত করা হয়। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। তবে প্রয়োগরীতির বৈচিত্র্যে স্বাদ বিভিন্নতায় বাংলা হাল্কা হাসির গল্প আধুনিক পৃথিবীর হাস্যরসাত্মক সাহিত্যের সমান মানসম্পন্ন।

সঠিক ঠিকানা

আমাদের দেশে প্রায়ই দেখা যায় যে, কোন সাঙ্ঘাতিক খুন-খারাপী কিম্বা কোন ভয়ঙ্কর মারী বা মড়কে বাসিন্দারা নির্বংশ হলে কিম্বা অন্য কোন অপরিহার্য কারণে দীর্ঘকাল অব্যবহৃত হয়ে পড়ে থাকলে এমন কি আপাত-বোধ্য কোন সম্ভবপর কারণ না থাকলেও অনেক সময়েই দেখা যায় এক-একটা নিরালা বাড়ীর অদ্ভুত সব দুর্নাম রটে যায়। তখন সে বাড়ীতে আর কোন ভাড়াটে আসতে চায় না। জলের দামেও তার খদ্দের জোটে না। সুতরাং ক্রমে তার উঠোনে বাগানে আগাছা জন্মায়। দেওয়ালে চুণবালি খসতে থাকে, কড়ি বরগায় নোনা ধরে। ঘরে ও বারান্দায় গোলা-পায়রা বাসা বাঁধে।

তখন বাড়ীটার বেওয়ারিশের সুযোগ নিয়ে সেই অঞ্চলের বখাটে ও আড্ডাবাজ ছোকরারা মাঝে মাঝে এসে জুয়ো খেলে, ভাড়ি ও ধেনো খায়, পাড়াপড়শীর হাঁস-মুরগী, ছাগল-ভেড়া চুরি করে নিয়ে এসে 'ফিষ্ট' করে। কখনো বা সন্ধ্যের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে ঘাড়ে-রোঁ ফোলানো কোন বুড়ো শালিক বৎস ঝখাট পুইয়ে ও ঝুঁকি মাথা করে কোন অন্ত্যজ স্বৈরিণীর সঙ্গে দাওয়া...

এমন কি স্পেন, পর্তুগাল, বৃটেন ফ্রান্স ... প্রভৃতি দেশেও পাহাড়ের গায়ে, পরিত্যক্ত খনি অঞ্চলে এ ধরণের রহস্যময় বেওয়ারিশ বাড়ীর কথা অনেক সময়েই শোনা যায়। একদিন সমুদ্রতীরে এ জাতীয় বাড়ীগুলিতে বোম্বেটে ও শুল্ক ফাঁকিবাজ চোরাচালানীরা আড্ডা গাড়তো। ইদানীং কালের জীপ ও অটোমেটিক পিস্তল, ভ্যান ও রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহারকারী আধুনিক ডাকাতরাও অনেক সময় ঐ ধরণের অবরেকা ও পরিত্যক্ত বাড়ীগুলিতে বসে তাদের অভিযানের ফন্দি পাকায়। লুঠের মাল ভাগ বাঁটোয়ারা করে। অভিযানে আহতদের চিকিৎসা করে। তাকে বুঝে লুকিয়ে থাকে। জেল পালানো ফেরারীদের আশ্রয় দেয়। দলের কেউ দুষমনী করলে তাকে খুন করে পুঁতে রাখে।

ইংল্যাণ্ডের সর্বপশ্চিম প্রান্তের পাহাড়, টিলা লালমাটির বন্ধুর প্রান্তরবহুল কর্ণওয়াল জেলার শেষ সীমা ল্যাণ্ডস এণ্ডে দৈত্যের পায়ে ঘেষো কড়ে আঙুলের মত আটলান্টিক মহা-সমুদ্রের একটি সরু, ঘোলা, উচ্ছিষ্ট মাছের আঁশ ও কাঁটার দুর্গন্ধে ভরা একটি খাড়ির উঁচু

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়

পাড়ের উপর ঠিক তেমন একটি বাড়ীতে পা দিয়েই আইলীন রের বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো। স্থিরদৃষ্টিতে তার স্বামী এ পি রের দিকে তাকিয়ে বললো, 'এ ধরণের বাড়ী খুন করার কাজেই লাগতে পারে।'

আইলীন রে,—একদা পাণিহাটির অভয়পদ রায় এবং বর্তমানে লণ্ডনের রীতিমত ধনী ব্যবসায়ী, এ পি রে'র আইরীশ পত্নী, চিরদিনই এমনি স্পষ্টভাষিণী। অভয়পদ আইলীনের কঠোর টিপ্পনীতে একটু থতমত হয়ে গেল। ঢোক গিলে বললো, 'ইদানীং তুমি চব্বিশ ঘণ্টা যত সব রদ্দি খুন-খারাপীর বই পড়ছো বলে ঐ কথা মনে হচ্ছে। কেন, বাড়ীটা তো বেশ, একটু সারিয়ে ও সাজিয়ে নিলেই চমৎকার হবে। ঠিক কিনা বলুন মিঃ হলিন্স।'

মিঃ হলিন্স বাড়ীর দালাল—সঙ্গে সঙ্গে মাথা নেড়ে বললো, "হ্যাঁ নিশ্চয়ই। একটু মেরামত আর সাজানো থাকলে বাড়ীটা কবে ভাড়া হয়ে যেত। আজকাল নির্জন সমুদ্রের ধারে বাড়ী পাওয়া রীতিমত শক্ত।'

উৎসাহ পেয়ে অভয়পদ আইলীনকে বললো, 'দেখ দেখি টিলার কোলে বাড়ীটি কেমন চমৎকার করে বসানো। সামনে সমুদ্রের খাড়টাই বা কী সুন্দর। জোয়ারের সময় ওর ধমনীতে চাঞ্চল্য জাগে। আর টিলাটা পেরিয়ে মাইল-খানেক গেলেই তো অকূলপার মহাসমুদ্র।' তার পর একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে বললো, 'আর এই টাটকা বাতাস। কর্ণওয়ালের সমুদ্রতীরে একটা বাড়ী কিনে মাঝে মাঝে এসে থাকবো এ কী আমার আজকের সাধ।'

অভয়পদর প্রগলভতায় আইলীন একটু অবাক হলো। প্রয়োজনে সাদামাটা টো. একটা আটপৌরে কথা ছাড়া আজ কত দিন তাদের মধ্যে এমন আলাপ প্রায় বন্ধ ছিল।

'হ্যাঁ, টাটকা বাতাস বলতে যদি তুমি মেছোগন্ধ বোঝ তা হলে এমন একটা জায়গা অবশ্য অনেক খুঁজেই বের করতে হয়। আর টিলার কথা বলছো? ঐটাই হচ্ছে এ বাড়ীর কাল। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত ওটাই সূর্যের সব আলো আড়াল করে রাখবে।'

অভয়পদ স্ত্রীর কথার উত্তর না দিয়ে বাড়ীর দালাল হলিন্সের দিকে তাকিয়ে বললো, 'বাড়ীটা নেবার আগে চলুন একবার ভালো করে ভেতরটা দেখেই আসা যাক।---আপনি তো বলছিলেন যে সেণ্ট্রাল হিটিংয়ের জন্যে মাটির নীচের কুঠরীটায় একটা কয়লার চুল্লী আছে।'

'নিশ্চয়ই আছে স্যার। এ অঞ্চলে গোটা কুড়ি বাড়ীতেও সেণ্ট্রাল হিটিং আছে কি না সন্দেহ। এখনই ঠাণ্ডা বোধ করবেন তখনই চুল্লীটা জ্বালিয়ে দেবেন। দেখবেন আধ ঘণ্টার মধ্যে বাড়ীটা গরমে চনচন করছে।

হলিন্স এর পরে রে-দম্পতীকে নিয়ে গিয়ে বাড়ীটা ঘুরিয়ে দেখালো। মাটির নীচে চুল্লীর কুঠরীটায় নিয়ে গিয়ে চুল্লী ধরানোর কৌশলটা দেখিয়ে দিল। বললে, 'কুঠরীর মেঝেটা অবশ খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু একবার সান বাঁধিয়ে নিলেই চমৎকার হয়ে যাবে।'

'ঠিক বলেছেন।' অভয়পদ উল্লসিত হয়ে বললো। 'সান বাঁধিয়ে নিলেই চমৎকার হয়ে যাবে। এই বিশ্রী মেঝেটা একেবারে ঢাকা পড়ে যাবে।" বস্তুত এই বিশ্রী মেঝেটার সব কিছু ঢাকা পড়ে যাবার সম্ভাবনায় অভয়পদ এমনি উৎসাহিত হয়ে উঠলো যে হলিন্স বিশেষ করে আইলীনকে বিস্মিত করে সে প্রায় নাচের ভঙ্গীতে একপাক ঘুরে গিয়ে বললো; 'মিঃ হলিন্স আমার খুব পছন্দ হয়েছে। এ বাড়ী আমি নেব।'

এতক্ষণ আইলীন চুপ করেছিল। এবার ভ্রূকুটি করে বললো, 'ওঁকে কথা দেবার আগে একবার আমার মতামতটা জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল না কি? কারণ বাড়ীটাতে তো আমাকেও থাকতে হবে?'

আবার অব্যক্ত রূঢ়তার সঙ্গে স্ত্রীকে

উপেক্ষা করে অভয়পদ হলিন্সকে জিজ্ঞাসা করলো, 'বাড়ীটা কিনে নেওয়া যায়?'

'কিনে নেওয়া?—বিক্রী করার কথা অবশ্য ওঠেনি। বাড়ীর মালিক মিঃ হ্যানিংটন বাড়ীটি বেচতে তেমন আগ্রহী নন।---'

ভদ্রলোক অবসরপ্রাপ্ত লোহার কারবারী। বছর পাঁচেক আগে আপনারই মত হাওয়া বদলের জন্যে এখানে এসে বাড়ীটি কেনেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় মিসেস হ্যানিংটনের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হলো। মিসেস হ্যানিংটন শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে গ্লাসগোয় তাঁর বোনের সঙ্গে বসবাস করতে চলে গেলেন।

মিঃ হ্যানিংটন অবশ্য এখনো আশা ছাড়েন নি। বলেন যে, স্ত্রী হয়তো একদিন তাঁর মত বদলাবেন। তখন আবার তাঁরা এখানে এসে বসবাস করবেন। একটা 'ভাবপ্রবণতা' আর কি।

'তবে আমার সঙ্গে শেষ আলোচনার পর এতদিন হয়তো তাঁর মত বদলে থাকতেও পারে। আমি একবার খোঁজ নিয়ে দেখবো।'

'বেশ তো! তাই করুন না মিঃ হলিন্স? ইতিমধ্যে আমরা অবশ্য বাড়ীটা ভাড়া নেব। ---মনে হয় সপ্তাহ শেষেই আমরা এখানে উঠে আসতে পারবো।---তাই না? কি বলো তুমি আইলীন।'

আইলীন মুখে কিছু না বলে তার দিকে তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকালো।

হলিন্স বিদায় নিলে রে-দম্পতিও মাইল চল্লিশ দূরে সেন্ট আইভসে তাদের হোটেলের দিকে যাত্রা করলো। গাড়ীতে আইলীন আবার অভয়পদর মুখের দিকে তীক্ষ্নভাবে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, 'লণ্ডন ছাড়ার পর থেকেই তুমি এমন অদ্ভুত ব্যবহার করছো কেন? ---এর পেছনে কি সেই টাইপিস্টটা রয়েছে নাকি?'

একেবারে অবাক হয়ে অভয়পদ জিজ্ঞাসা করলো, 'কোন টাইপিস্টটা? সেই চাঁপা রঙের চুল?--- না চুলটা তার সোনালী। আহা! যদি দেখতে গত মাসে ছাড়িয়ে দেবার আগে বেচারা কেমন করে কেঁদে ফেলেছিল।--- কে জানে বেচারার শেষ পর্যন্ত কি হলো?'

সোজা পথের দিকে তাকিয়ে আইলীন বললো, 'বেশ ভালো কথা, আমি তোমায় কথা দিয়েছিলাম, তিন মাস কর্নওয়ালে থাকবো। সে কথা আমি রাখবো। কিন্তু তিন মাসের আর একটি দিনও বেশী আমি ওখানে থাকতে পারবো না। অতএব বাড়ীওয়ালার খোঁজ নিয়ে বাড়ীটা কেনার চেষ্টা করার কোন প্রয়োজন নেই।'

'নিশ্চয়ই আছে প্রিয়ে। নিশ্চয়ই আছে। কারণ তুমি মত বদলাবে এবং বদলাবেই যে তা আমি জানি।'

সন্ধ্যেবেলায় সেন্ট আইভসে সেই বিশাল বিলাস হোটেলের বর্ণাঢ্য লাউঞ্জের একটি কোণে এসে অভয়পদ একাকী বসলো। সামনে, বিরাট বাতায়নের ওপারে গলফ খেলার সবুজ মাঠ। তারপরে খানিকটা লাল মাটির উর্মিল প্রান্তর। প্রান্তরের শেষে দিগন্তজোড়া অতলান্তিক মহাসমুদ্রের অনন্ত ঢেউ সাদা ফেনার মুকুট মাথায় করে এসে অবিশ্রান্তভাবে আছাড় খেয়ে পড়ছে। মাটির কঠিন স্থাবর ঢেউয়ের শেষে জলের চির চঞ্চল, চিরউদ্দাম ঢেউ। এমন নিরুপম পরিবেশের দিকে নিরুদ্দেশভাবে চেয়ে থাকতে থাকতে অভয়পদর মনে কোন মহত্তর চিন্তার উদয় হলো না। কোন সুখস্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠলো না মন। এমন কি তার লণ্ডন অফিসে সেই চাঁপা রঙের চুল তরুণী টাইপিস্টটির মুখচ্ছবি ভেসে উঠলো না।

সামনের অভিরাম নিসর্গ দৃশ্যের ওপর দুঃস্বপ্নের মত জেগে উঠলো বত্রিশ বছর আগেকার নোংরা মশা-মাছি ও দুর্গন্ধে-ভরা পাণিহাটির একটি অভিশপ্ত মধ্যবিত্ত পরিবার। বাপ হেঁপো রুগী, আফিংখোর। জীর্ণ স্বাস্থ্যের জন্যে অকালে চাকরী থেকে অবসর নিয়েছেন। কিঞ্চিদধিক একশ' টাকা পেনসন পান। বড়ভাই কাপড়ের দোকানে কাজ করে মাইনে চল্লিশ টাকা। ইতিমধ্যেই চারটি সন্তানের জনক। মেজভাই বাউণ্ডুলে---নেহাৎ বেঘোরে না পড়লে বাড়ী আসে না। এলে এটা-ওটা হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়ে। তারপরে দু' বোন। দু'জনের বিয়ে হয়ে গেছে এবং বহু সন্তান নিয়ে কষ্টের সংসার করে। এদের পরে সেজোভাই। আই-এ পাশ, পেশা তার টিউশানী, নেশা তার ব্যায়াম। তার দেহের বহুল পেশীর খ্যাতি সারা পাণিহাটি জুড়ে। কিন্তু সেই খ্যাতির খেসারত দিতে সারাটা পরিবার প্রায় খাবি খেত। অসম্ভব স্বার্থপর ও ছোঁৎমার্গী ছিল সেই ভাই। তার বিছানা বালিশ জিনিষপত্র কারুর ব্যবহার তো দূরের কথা ছোঁবার অধিকার ছিল না কারুর। সকালে উঠে আদা ও ছোলা ভিজে, তার পর মুর্গীর ডিম গোলা একগ্লাস দুধ ইত্যাদি স্বাস্থ্যরক্ষার উপাদানগুলি তার ছিল নিয়মিত ও নিশ্চিত। বাড়ীতে হাজার অনটন হলেও তার ব্যতিক্রম হতো না। কেউ সে বিষয়ে কোন কথা তুললে হুঙ্কার করে সে আলাদা হয়ে যাবার ভয় দেখাতো।

এরপরে অভয়পদ এবং তারপরে আরো একটি ভাই। ম্যাট্রিক পর্যন্ত পড়ে অনেক দিন বাড়ীতে বসেছিল অভয়পদ। সেই 'বসে থাকার' মর্মান্তিক লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ও গ্লানির কথা মনে পড়লে আজো অস্থির হয়ে ওঠে সে।

অবশেষে অনেক ধরাধরি করে এক মাল-বাহী জাহাজে কাজ পেল অভয়পদ। কিন্তু সে কাজ পাওয়া কী কঠিনই ছিল। একে সে বাঙালী, তায় ব্রাহ্মণ ও মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে। ওরা এসব কাজে আসে না, এলেও টেকে না। তবু সত্যি সত্যিই পায়ে ধরে তার কাজ হলো।

কিন্তু সে কী কাজ। পরিশ্রমে জাহাজের দোলানীতে, গরমে ওপরওয়ালার হুকুমে ও মেজাজে ক'দিনের মধ্যেই সে আধমরা ও অসুস্থ হয়ে পড়লো। সমুদ্রে লাফ দিয়ে পড়া ছাড়া সেই মরণ-যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণের আর কোন উপায় আছে কি না---এই যখন সে ভেবে ভেবে ক্লান্ত ও দিশেহারা হয়ে পড়েছে তখন সেই জাহাজেরই বয়স্ক খালাসী আজিমল্লা তাকে বাঁচার পথ বাতলিয়ে দিল। বলে দিল জাহাজ লণ্ডনের ডকে ভিড়লে 'ইস্ট লণ্ডনে'র এক এঁদো গলিতে তার চাচাতো ভাই রহিমুল্লার খাবার দোকানে আশ্রয় নিতে।

অভয়পদ তাই নিয়েছিল। সেই বিচিত্র অজানা অচেনা সহরে বত্রিশ বছর আগে সেই একটি সহায়, সম্বলহীন বাঙালী তরুণের মনে, সেদিনের সেই শঙ্কা, উৎকণ্ঠা ও অনিশ্চয়তার কথা ভাবলে আজো হর্ষ জাগে।

তবে রহিমুল্লা তাকে সত্যিই দেখেছিল। বড় ভাইয়ের স্নেহ তার কৈশোরে বিলীন। কৈশোরোত্তর জীবনে ভাইদের সঙ্গে অভাব-অনটনের সংসারে ছিল ক্ষুদ্র স্বার্থ ও অসহিষ্ণুতায় তিক্ত, প্রায় শত্রুতার পর্যায়ে অবনত। রহিমুল্লা অর্থাৎ রহিম মোল্লা এই দূর দেশে অভাবিত-পূর্ব বিপর্যয়ের মধ্যে তাকে সেই বড়ভাইয়ের স্নেহ দিল। বললো, 'একটা কিছু কাজের কাজ শিখে নাও আমি খরচ দেবো। পরে দেনা শোধ করবো।'

তাই হলো, অভয়পদ একবছর ধরে ইলেক-ট্রিকের কাজ শিখলো। পরে কাজ নিলো। আইনের মধ্যে থেকে যতটা সম্ভব ওভারটাইম করলো। তারপরে আইনে ফাঁকি দিয়ে আরো কাজ করে আরো রোজগার করতে লাগলো। রহিমুল্লার দেনা শোধ হলো। আরো টাকা জমিয়ে নিজেই কারবার খুললো। লোকাল পেপারগুলিতে অর্থাৎ পল্লীর কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে কাজ জোগাড় করতে লাগলো। যে-কোন কোম্পানীর চেয়ে সস্তায় দ্রুত কাজ করে দিতে লাগলো। এ ধরণের কাজের আরেক সুবিধা ওভার টাইমের আইনের বাঁধাধরা নেই। শনি-রবিবার নেই। সবচেয়ে বড় কথা আয়-কর ফাঁকি দেওয়া চলে।

কারবার চালু হবার পরেই সারা ইউরোপ জুড়ে রণদামামা বেজে উঠলো। লণ্ডন সহরের

তখন জার্মান বোমারু বিমানের তাণ্ডব সুরু হলো। সেই ভয়ঙ্কর ধ্বংসোৎসবের সর্বনাশের মধ্যে অভয়পদের দুটি জিনিষের অভাব হলো না। এক কাজের দুই পয়সার। ঠিক এই সময়ই তার জীবনে এলো আইলীন। সেই ভয়াল দুর্দিনে সে শুধু সঙ্গ দিলো না তার কাজ ও ব্যবসায়ের প্রধানতম মন্ত্রণাদাত্রী ও সহকারিণী হয়ে উঠলো। তারই মন্ত্রণায় অভয়পদ প্রায় জলের দামে একে একে তিনটি বাড়ী কিনলো যুদ্ধের ক'বছরে।

যুদ্ধ শেষ হলো। অভয়পদর তিনটি বাড়ীর দাম দেখতে দেখতে পাঁচ সাত দশগুণ বেড়ে গেল। অভয়পদ একটি বাড়ী বেচে রীতিমত বড় ব্যবসা ও অফিস খুলে বসলো। দেখলো যুদ্ধোত্তর বৃটেনের চাহিদা অফুরন্ত, ব্যবসায়ের সুযোগ অনন্ত। ওদিকে কয়েক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো। অভয়পদের ততদিনের পরিপক্ক ব্যবসায়িক বুদ্ধিতে বুঝলো যে আরো বিশালতর সুযোগের দ্বারোদঘাটিত হলো। সে ভারতবর্ষে প্রথমে বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি, পরে সব রকমের কলকব্জা রপ্তানী, ভারতবর্ষ থেকে খেলার সরঞ্জাম ও বস্ত্র আমদানীর ব্যবসা সুরু করলো। পাঁচ বছরের মধ্যে ব্যাঙ্কের সঞ্চয় স্ফীত হয়ে উঠলো। লণ্ডনের উপকণ্ঠে তার বাগান-ঘেরা বাড়ী ও ডেমলার গাড়ী হলো। পাণিহাটির অভয়পদ রায় আর লণ্ডনের বিত্তশালী ভারতীয় ব্যবসায়ী এ কে রের মধ্যে পাণিহাটি আর মে ফেয়ারের তফাৎ হয়ে গেল।

মে ফেয়ারে অভয়পদর অনেক কিছু অচল হলো। পুরোণো ধরণের সাজ পোষাক, খাওয়া-বসা, পরিচয় ও বন্ধুবান্ধব আরো কত কী। কিন্তু সবচেয়ে অচল হলো আইলীন। অবস্থার স্বচ্ছলতার সঙ্গে তার আলাপ-আচরণ ও শরীর বিবর্তিত হওয়া তো দূরের কথা বরং বয়সের চাপ পড়ে আইলীনের পা দুটি পাশ-বালিশের মত মোটা মোটা হয়ে উঠতে লাগলো। মুখে রীতিমত গোফদাড়ি গজাতে লাগলো। হাতের নখ ক্ষয়া-ক্ষয়া, আঙুলগুলো ফাটা-ফাটা হয়ে উঠতে লাগলো। ইউরোপের বিশেষ করে বৃটেনের মেয়েদের মধ্যবয়সে উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ কুৎসিত উপসর্গগুলি দেখা দেওয়া অতি সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু সাধারণত্বকে অস্বীকার করে অসাধারণত্ব অর্জন করাই তখন অভয়পদর জিদ ও নেশা। সুতরাং আইলীনকে নিয়ে মে ফেয়ারের সামাজিকতায় যেতে অভয়-পদর প্রথম প্রথম সঙ্কোচ ও লজ্জা পরে বিরক্তি ও ক্রোধ হতো। ক্রোধ ও বিরক্তি ক্রমশ মনের মায়া-মমতা ও বিবেচনা বোধকে জ্বালিয়ে দিল। অভয়পদ মনে মনে অনেক যুক্তির অবতারণা করলো। নিজেকে বললো, 'ওর চেহারার পরিবর্তনের জন্যে তো ও দায়ী নয়।' মনের আরেক কোণ থেকে দপ করে উত্তর জ্বলে উঠলো। 'নিশ্চয়ই নয়।' কিন্তু চেহারাটা মাজিত করবার জন্যে এতটুকু চেষ্টা ওর আছে?

'আর শুধু কি চেহারা নাকি?' আরেক ক্রুদ্ধ প্রশ্ন জেগে উঠলো, কথাবার্তা হাবভাব? 'কিন্তু অভয়পদ ভুলো না ও ছিল তোমার দুর্দিনের সহায়। আজ যে ঐশ্বর্য নিয়ে তোমার এত দম্ভ তার পেছনে ওর স্বার্থত্যাগও কম নয়।

"নিশ্চয় নয়। রহিম মোল্লার আরো বেশী কিন্তু তাই বলে রহিম মোল্লা তো আমার জীবনে অবিচ্ছেদ্য হতে পারে না। আজ যদি আমি রহিম মোল্লার ঠিকানা জানতাম তা হলে তাকে পাঁচ শো গিনির একটি চেক পাঠাতাম। কিন্তু তাই বলে তাকে নিয়ে লর্ড মেয়রের পার্টিতে যেতাম না।'---

দুঃখের বিষয় রহিম মোল্লাকে আমার চেক দেওয়া হয় নি। কিন্তু আইলীনকে আমি তো কিছু কম দিই নি।---তারপরেই ক্ষুব্ধ মন ঝাঁঝিয়ে ওঠে 'আরো তো দিতে রাজি আছি। ও আমাকে নিষ্কৃতি দিক।'

একটা সময় ছিল ঘুমন্ত আইলীনের কপালের বলিরেখা, উপরোষ্ঠের গোঁফ ও গলার গলকম্বলের ধর দেখে অভয়পদর মনে মনে কেমন একটা মায়া হোত। অথচ অন্য অনেক সময় আইলীনের অনুপস্থিতিতে অফিসে বসে গাড়ী চালাতে চালাতে, ককটেল পার্টিতে,—নানা বিচিত্র স্থানে বিচিত্র মুহূর্তে তার সেই চেহারাই মনে করে অভয়পদর মনে বিদ্বেষ ফণা তুলে ধরতো, কপালে ভ্রূকুটি দেখা দিত।

সমস্যার সমাধান না হোক, একটা মীমাংসা হয়তো হতে পারতো নরনারী সম্পর্কে আইলীন যদি একটু উদার হতো। কিন্তু তা সে একেবারেই নয়। জানতে পারলে পার্টিতে সে যাবেই, গিয়ে এক মুহূর্তের জন্যে তার সঙ্গ ছাড়বে না। কোন মেয়ে, বিশেষ করে সে যদি সুন্দরী ও তরুণী হয় তবে অভয়পদকে কিছুতেই তার কাছে ঘেঁষতে দেবে না। রাত্রি হলে কৈফিয়ৎ চাইবে। এমন কি তার অফিসের টাইপিস্ট, সেক্রেটারীদের ওপরও তার নজর কড়া। এই নিয়ে কতবার কত বিসদৃশ ঘটনা ঘটেছে। ক্ষিপ্ত ক্ষুব্ধ উত্ত্যক্ত হয় অভয়পদ নিজের মনে মনে, তীব্র তীক্ষ্ণ মাথার মধ্যে ঝনঝন করা প্রশ্ন করেছে। সে প্রশ্ন নিতান্ত অসহায় ও আর্ত, 'কি করবো আমি কি করবো? নিষ্কৃতি, কোন রকমেই কি আমার নিষ্কৃতি নেই?'

---এরও অনেক পরে উভয়ের সম্পর্কের প্রীতির শেষ বিন্দুটুকুও বিদ্বেষের আগুনে পুড়ে গেল, তখন এলো তার অফিসে সেই চম্পকবর্ণ চুল মেয়েটি। স্নেহ-প্রেম সুন্দরী নারীর সাহচর্য উন্মুখ অভয়পদ মন তার প্রশ্রয় ও উৎসাহেই উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। ছটি মাস অতিক্রান্ত হবার আগেই অভয়পদ তাকে পাবার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠলো। সেও রাজী হলো। বয়সের ব্যবধান তুচ্ছ হলো।

আইলীনের সতর্কদৃষ্টি এড়িয়ে তারা কখনো ক্যাবারেতে, সিন্ধুতীরে, শৈলশিখরে অভিসারে যেতে লাগলো। একদিন বিহ্বল মুহূর্তে বিয়ের প্রস্তাব উঠলো। চম্পক কুন্তলা জানালো বিয়ের পথ যে বন্ধ।

অভয়পদ আইলীনকে ডিভোর্স দিতে অনুরোধ করলো। বললো, সারাজীবন স্বচ্ছন্দে থাকবার মত ক্ষতিপূরণ দিতে সে রাজী। বিবাহ বিচ্ছেদের প্রস্তাব এই নতুন নয়। এর আগে বহু বিতণ্ডায়, তিক্ত মুহূর্তে সে প্রস্তাব উঠেছে।

প্রতিবারের মত এবারও আইলীন জানিয়ে দিল, 'কিছুতে নয়, প্রাণ থাকতে নয়।'— [illegible] উত্তরের সঙ্গে তীক্ষ্ণ শ্লেষ।---অভয়পদর বুঝতে বাকি রইলো না যে আইলীন এবারের প্রস্তাবের গুহ্য কারণটা জানে।

পরের দিন অফিসে তার চম্পকবর্ণা এলো না। বেলা হলে ফোন করলো বিকালে রিজেণ্ট পার্কের সেই নির্দিষ্ট কোণটিতে দেখা হবে।

দেখা হলো। সে বিমর্ষ। মুখ শুকনো, কি ব্যাপার? সে অন্তঃসত্ত্বা। 'না, না---নাও তো হতে পারে।'

'হ্যাঁ। নাও হতে পারে। কিন্তু হওয়াই সম্ভব। নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা করেই সে বলছে। আজ ক্লিনিকেও সে গিয়েছিল।'

'বেশ তো একটা ব্যবস্থা হবেই। ভয় কি?'

—'ভয় যথেষ্টই। কিন্তু ব্যবস্থা একটা হতে পারে। সে হচ্ছে মাতৃত্ব। সন্তান নষ্ট করতে দেবো না।

---এই নাটকীয় পরিণতির জন্যে অভয়পদ তৈরী ছিল না। খানিকক্ষণ সে দিশেহারা হয়ে পড়লো। তারপরই একটা আশ্চর্য অনুভূতিতে তার মন ভরে গেল, তার বিবাহিত স্ত্রী আই-লীন তাকে সন্তান দেয়নি। যে দিল সে তার বিবাহিত নয়। এতদিন সে নিজেকে সন্তান জন্ম দিতে অক্ষম ভেবেছে। ঐ লাবণ্যময়ী তার সে ভুল ভাঙিয়ে দিল। অথচ জনসমাজে সে কথা প্রকাশ করার উপায় নেই।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত সেই তরুণীর সাহচর্যে কাটিয়ে অভয়পদ বাড়ী ফিরলো। রাত করে বাড়ী ফেরাটা সাধারণ ব্যাপার। তা নিয়ে কোন কথা ওঠার কারণ ছিল না। কিন্তু কথা তুললো অভয়পদ একেবারে ইচ্ছে করে। বললো, 'আইলীন আমায় ডিভোর্স দাও।'

কেন---কারণ অনেক আছে। তার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে তুমি আমার

নিঃসন্তান করে রেখেছো। আমার এ সম্পত্তি, এত টাকা কার কাজে লাগবে।'

'সে কী! এতদিন তো বলে এসেছো যে তোমার দেশের কোন ভালো কাজে তুমি দিয়ে যাবে। আজ হঠাৎ সম্পত্তির ভবিষ্যৎ নিয়ে এত চিন্তা কেন?----'

'আর নিঃসন্তান করে রাখা? তা তুমিই আমাকে করে রেখেছো। আমি ডাক্তার দেখিয়েছি, খুব ভালো ডাক্তার। তারা বলেছে আমার দোষ নেই। তুমিই সন্তানের জন্ম দিতে অক্ষম।'

অভয়পদ আর তর্ক করে নি। কিন্তু অনেক প্রহর পর্যন্ত সে রাত্রে বিছানায় গড়াগড়ি করতে করতে অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগীর মাথায় রক্ত চাপার মত একটা ভয়ঙ্কর, কিন্তু পরিণামে মুক্তির ও নিষ্কৃতির চিন্তা তার মনের মধ্যে জেগে উঠতে লাগলো। সে রাত্রে সেই সুরু। তারপর থেকে সেই চিন্তা তাকে ভর করে বসেছে। যখন তখন তার মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। আর যতই সে চিন্তা করে ততই মনে হয় নিষ্কৃতি কতই না সহজলভ্য। একটু সুযোগ, একটু সংগঠন। তারপরেই তার জীবনের পালা বদল।----

॥ দুই ॥

সপ্তাহ শেষে শনিবারে রে-দম্পতী যথাসিদ্ধান্ত সেই খাড়ির পাড়ের বাড়ীটিতে উঠলো। কিন্তু সান্নিধ্য ও পরিচয় বাড়ীটি সম্পর্কে আইলীনের মনের বিরুদ্ধভাব দূর করা তো দূরের কথা আরো কঠিনতর করে তুললো। টিলার আড়ালে এখানে রোদ আসে না। বাতাস এখানে কেমন যেন গুমোট, ভ্যাপসা, ভারী। কখনো বা যদি একটা বাতাসের দমকা পথ ভুলে এদিকে এসে পড়ে, তো তা খাড়ির পাড়ের গাছের আঁস কাঁটার দুর্গন্ধে বিশ্রী বোঁদা হয়ে আসে। ক'দিন পরেই আইলীন অভয়পদকে বললো, 'দেখো আমি জানি এই বাড়ীই আমাদের কাল হবে। তবু যখন কিছুতেই এখান থেকে যাবে না তখন তোমার বড় সাধের চুল্লীটাই না জ্বালো। সেদিন তো চুল্লীটা দেখে প্রায় নেচেই উঠেছিলে।'

কাগজের আড়াল থেকে অভয়পদ উত্তর দিল, 'আমার তো এখানে খুব ভালোই লাগছে। বেশ নির্জন, অথচ মাইলখানেকের মধ্যে ছোট্ট গ্রাম, বাজার, পোস্টাপিস সব কিছু।'

----'হ্যাঁ, তবে ঠাণ্ডা একটু আমারও লাগছে। আজই চুল্লীটা জ্বালিয়ে দেবো।'

'দেখো ঠিক ঠাণ্ডা লাগার জন্যেই নয়।' আইলীন উৎকণ্ঠিতভাবে বললো 'এ বাড়ীটায় এমন একটা কিছু আছে যা সব সময়ে যেন আমার মনে হানা দিচ্ছে।---বিশেষ করে রাত্রে। ভেতর থেকে কেমন যেন একটা কাঁপুনী লেগে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায় আর মনে হয় যত তাড়াতাড়ি এ বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে পারি ততই ভালো।---এ বাড়ী যেন চিরকাল খালি পড়ে থাকে।'

অভয়পদ সে কথার উত্তর না দিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে উঠলো এবং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো। বেরিয়ে যাবার সময় শুধু বললো, 'আমি চুল্লীটা জ্বালিয়ে দিচ্ছি।'

মাটির নীচে কুঠরীটায় গিয়ে অভয়পদ খানিকটা চেষ্টা করেই আগুনটা জ্বালিয়ে ফেললো। চুল্লীর ভেতরে আগুনের শিখা সোল্লাসে নেচে উঠলো। সেই অগ্নিশিখার উল্লাস নৃত্যের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে অভয়পদ কি ভাবলো। তারপর এদিক-ওদিক ঘুরে কুঠরীটাকে ভালো করে দেখলো। চুল্লীর পেছনে একটা নালামত রয়েছে। ছাইপাঁশে অর্ধেকটা ভরা। কাছেই একটি কোদাল পড়ে আছে। কী ভেবে সে কোদালটা তুলে নিল। নালাটার ছাইপাঁশ কিছুটা সরালো। আবার যেন অন্যমনস্ক ভাবেই কিছুটা কোদাল দিয়ে, কিছুটা পা দিয়ে সরানো ছাইপাঁশ আবার নালাটার মধ্যে ভরে দিল।

পরের দিন সূর্য উঠলো। বাড়ীটার ভ্যাপসা ভারী আবহাওয়াটা কেমন যেন হাল্কা হয়ে গেল। কিন্তু আইলীনকে কোন কিছু স্পর্শ করতে পারলো না। বিকেলের দিকে অভয়পদকে সেই পুনরায় বললো, 'দেখো, এখানে আমার কোন কিছুই ভালো লাগছে না। চলো আমরা এখান থেকে চলে যাই। তুমি যেখানে চাও আমি যেতে রাজী, শুধু এখানে নয়।'

'কিন্তু আমরা যে লীজ সই করেছি।' অভয়পদ উত্তর দিল, 'ছ'মাসের লীজ।'

'তা হোক। ও লীজ থেকে আমাদের উদ্ধার পেতেই হবে। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও, আমি একটা উপায় খুঁজে বের করবোই।' আইলীন নির্বন্ধকণ্ঠে বললো।

ঈষৎ দৃঢ় ও রূঢ়কণ্ঠে অভয়পদ উত্তর দিল, 'তার কোন উপায় নেই। লীজের সর্ত বড় কড়া।'

'তবু একটা উপায় কিম্বা অজুহাত খুঁজে বের করা যাবে ঠিকই। আমি বাড়ীর মালিক হানিংটনের স্ত্রীকে চিঠি লিখে বাড়ীটার ইতিহাস জানবার চেষ্টা করবো। মিঃ হানিংটন অবশ্যই কিছুই ফাঁস করবেন না। কিন্তু মিসেস হয়তো তা করবেন। আর যদি তা করেন তা হলে তার থেকে একটা না-একটা অজুহাত খাড়া করে সর্ত থেকে রেহাই পেতে হবে।'

'---ভালো কথা দালাল ভদ্রলোক বলছিলেন না যে মিসেস হানিংটন এখন গ্লাসগোয় থাকেন?'

পরের দিন বিকালে অভয়পদ গাড়ী করে কাছের গ্রামে গেল দালাল মিঃ হলিন্সের খোঁজে। তার সঙ্গে দেখা হতে সে [illegible] করলো বাড়ীর মালিক বাড়ীটি বিক্রী [illegible] কিছু জানিয়েছে কি না।'

'না, এখনো জানায় নি বটে, তবে যেকোন দিনই তাঁর কাছ থেকে একটা উত্তর আশা করছি।' হলিন্স হেসে, ঘাড় নেড়ে [illegible] উত্তর দেয়।-----'ভালো কথা [illegible] দোকান করতে এসে আপনার স্ত্রীও এসেছিলেন আমার কাছে মিসেস হানিংটনের ঠিকানা সংগ্রহ করতে। কিন্তু আমি যখন বললাম [illegible] আমি তাঁর ঠিকানা জানি না তখন তাঁর [illegible] যদি দেখতেন! হঠাৎ মিসেস হানিংটনের ঠিকানার এত জরুরীর দরকার হয়ে পড়লো কেন বলুন তো?'

পরের দিন সকালে অভয়পদ আবার চুল্লী কুঠরীতে গিয়ে নালাটা পরিষ্কার করতে লাগলো। তারপর ওপরে এসে আইলীনকে বললো, 'চলো নীচে গিয়ে দেখবে এ বাড়ীর যত নোংরা জল বেরিয়ে যাবার জন্যে নীচের কুঠরীটায় কেমন একটা নালা কেটেছি।'

সেদিনে কি একটু পরিষ্কার করছিল আইলীন। একটু অবাক হয়েই বললো, 'আমার দেখে লাভ? আর মোটে কয়েক মাসের জন্যে যদি থাকি এ বাড়ীতে তো পরিশ্রম করেই বা লাভ কী?'

'না বাড়ীটার উন্নতি করতে পারলে বেশি দিনও তো থাকতে পারি। দাঁওয়ে পেলে কিনেও নিতে পারি। তা চলই না একবার দেখবে।'

'চল।' নিস্পৃহের ভঙ্গীতে আইলীন বললো।

নীচে চুল্লীটার ওধারে গিয়ে আইলীন মুখ বিকৃত করে বললো, 'ছিঃ কি নোংরা ভ্যাপসা গন্ধ।---তুমি আশা ছেড়ে দাও। এ বাড়ীতে থাকার আশা ত্যাগ করো।'

অকস্মাৎ জোরের সঙ্গে বলে উঠলো অভয়পদ, 'না। অত সহজে ত্যাগ করছি না আশা।'

আইলীন পেছন ফিরে দেখতে গেল হঠাৎ অভয়পদর এত উত্তেজনার কী হলো। কিন্তু তার আগেই মাথায় প্রবল একটা বাড়ি খেয়ে সে নর্দমার মধ্যে লুটিয়ে পড়লো। সমস্ত শক্তি দিয়ে অভয়পদ কোদালটা তার মাথায় বসিয়ে দিয়েছে। প্রথমে তীব্র ফিনকি তারপর গলগল করে রক্ত বেরুতে লাগলো আইলীনের ফাটা, ভাঙা মাথাটা দিয়ে। কিন্তু মুখে সে একটি টুঁ শব্দও করলো না। বা করবার অবসর পেলো না। আর করলেই বা লাভ কি হতো? সেই নির্জন, বিশ্রী বাড়ীটার দেওয়ালে-দেওয়ালে ধাক্কা খেয়েই তার অপমৃত্যু ঘটতো।

ঘণ্টাখানেক পরিশ্রম করে অভয়পদ আইলীনের তাজা মৃতদেহটা সেই নালাটার মধ্যে পুঁতে ফেললো। তারপর কোদালটিকে পরিষ্কার করে ধুলো। নিজে স্নান করলো।

॥ মাসিক বসুমতী

পৌষ, ১৩৭২ ॥

দুষ্টু ছেলে

বিনয় মুখোপাধ্যায়

নৃত্যের তালে তালে

—দিলীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

মাসিক

বসুমতী

পৌষ, ১৩৭২

সাঁচীস্তূপ —অভিজিৎ দাশগুপ্ত

কাণ্ডারী
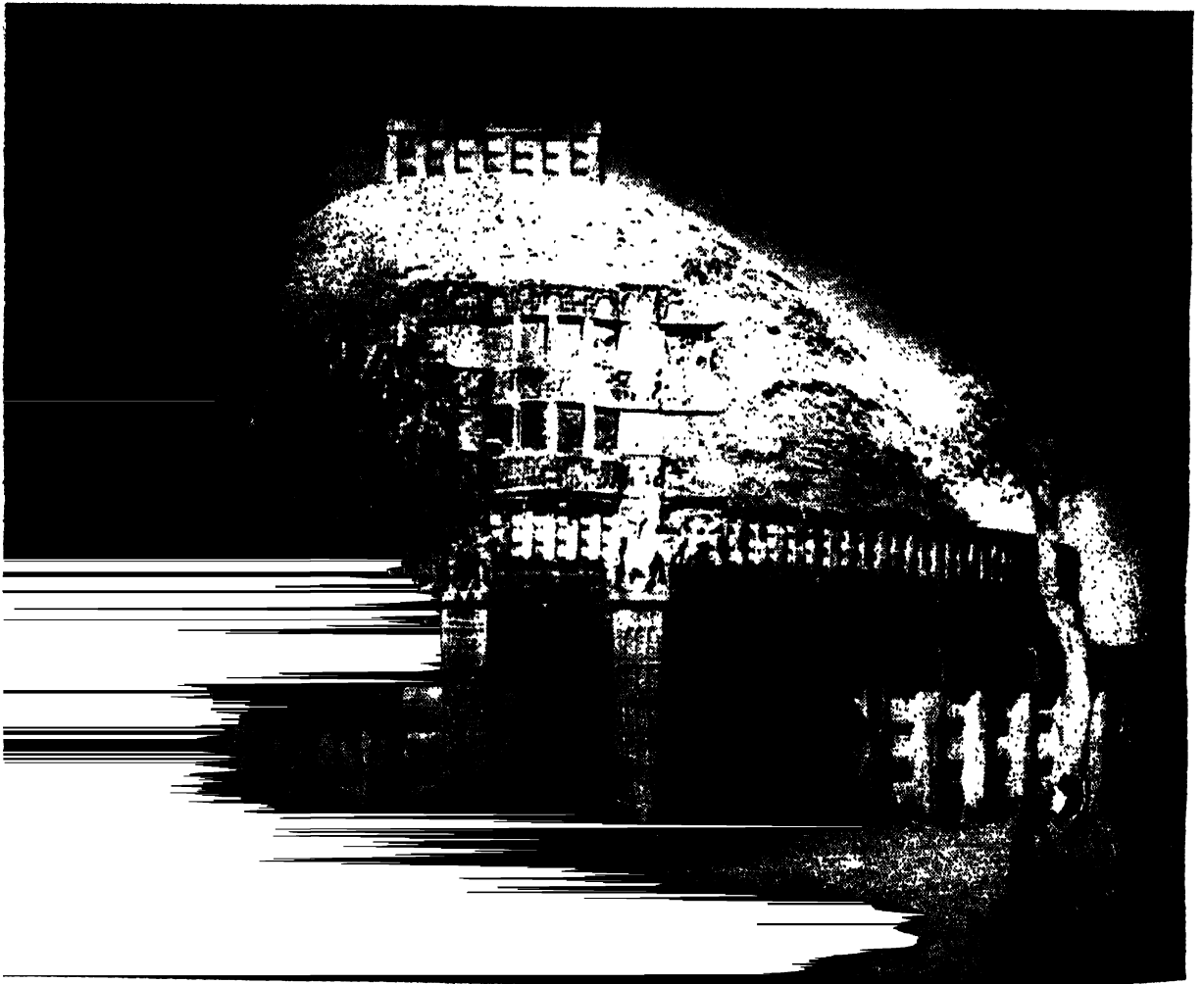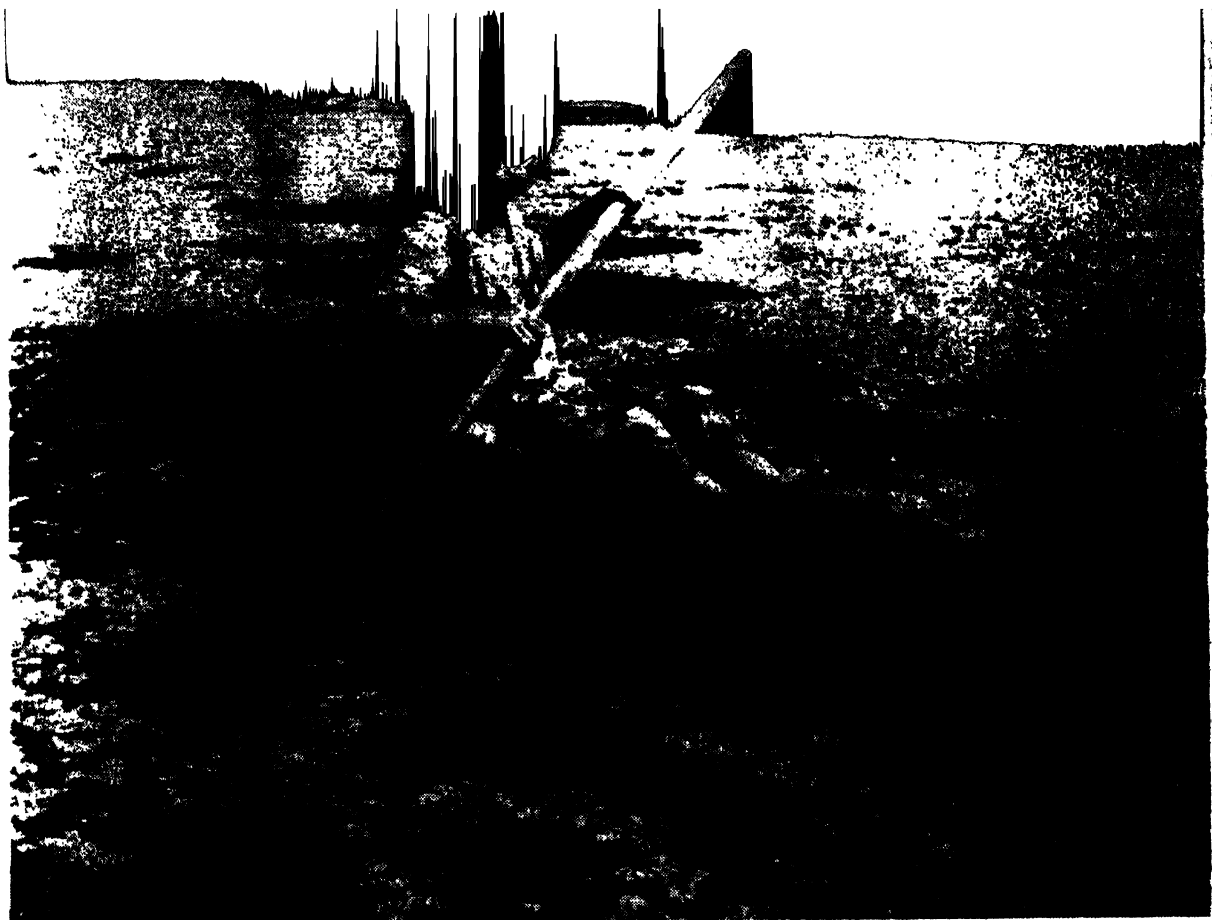
—সাগর রক্ষিত

মাসিক

বসুমতী

পৌষ, ১৩৭২

সাঁঝের প্রদীপ

—জি, ডলি, এম-এ

মাসিক বসুমতী

পৌষ, ১৩৭২

কেনের দিকে আইলীনের মালপত্র একটি কে বোঝাই করে গ্রামে গেল। গ্রামের মাল লানী কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবস্থা করে সেই অনির্দিষ্টকালের জন্য গুদামজাত করে খবার জন্যে লণ্ডনের একটি ঠিকানায় পাঠিয়ে ল।

সেখান থেকে বেরিয়ে সে গেল মিঃ লিন্সের দালালী অফিসে। হলিন্সের ঙ্গে দেখা হতে অম্লানবদনে বললো, 'শেষ র্যন্ত বনলো না মিঃ হলিন্স, আমার স্ত্রীর ঙ্গে আপোষে আসতে পারলাম না। তিনি চ্ছুতেই ওবাড়ীতে থাকতে রাজী হলেন । ঝগড়া করে বিদায় নিলেন।'

হলিন্স সব শুনে আফশোষ করলেন। ললেন, 'কেন জানি না মেয়েরা ঐ বাড়ীটা চ্ছুতেই পছন্দ করে না।'

পরের দিন বিকেলে হলিন্স নিজেই এলো ভয়পদর কাছে। বললো, 'ঘণ্টাখানেক আগে ঃ হানিংটনের ফোন পেলাম। বাড়ীটা তিনি চতে রাজী হয়েছেন। কিন্তু টাকাটা নগদ ই। মনে হয় কোন কারণে খুব টাকার টানাটানি পড়েছে।'

নগদের পরিমাণটা শুনে অভয়পদ কয়েক নিট ভেবে নিল। তারপর জানালো রাজী। হলিন্স দলিলপত্র বের করলো, দেখেশুনে অভয়পদ একটি চেক খে দিলো।

হলিন্স বিদায় নিলে অভয়পদ খানিকক্ষণ গানে গিয়ে পায়চারী করলো। একটু গুন্ন্ করে গানও গাইলো। তারপর ঘরে এসে ঠি লিখতে বসলো। লিখলো তার চম্পকঙ্গুলা তরুণী প্রণয়িনীকে,—

'প্রিয়তমা মলু,

তোমাকে দেবার মত একটা বিরাট আনন্দ বাদ আছে। আইলীনের সঙ্গে আমার ঝগড়া যছে। সে আমায় ছেড়ে চলে গেছে। শীঘ্র মাদের বিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। সে নিজেই করবে। অতএব আমার প্রিয়তমা প্রিয়ে। মরা শীঘ্রই মিলিত হচ্ছি। সেই মিলনের গ্য আয়োজন আমি করেছি। অতলান্তিক দ্রতীরে একটি বাড়ী কিনেছি।

আইলীন ও আমার বিবাহ বিচ্ছেদের মধ্যে টুকু সময় যাবে তার মধ্যে এ বাড়ী আমি ংকার করে সাজিয়ে-গুছিয়ে ফেলবো। ইরেটা রঙ, ভেতরের দেওয়ালের কাগজও ঝের কার্পেট বদল আর চুল্লী কুঠরীর মেঝেটা দান বাঁধিয়ে ফেলা। ব্যাস। চমৎকার প্রণয়-নীড়।

আর মাত্র কয়েকটা দিন। তারপর এই অতলান্তিক সমুদ্রতীরে তুমি আর আমি। আমি আর তুমি।'

—চিঠি খামে পুরে অভয়পদ পায়ে হেঁটেই গ্রামের পোস্ট অফিসে সেটা ফেলতে গেল। এদিকে-ওদিকে সমুদ্র তীরে খানিকটা ঘুরে বেড়ালো। তারপর বাড়ী ফিরে গেল।

বাড়ীর ফটক পেরিয়ে ঢুকেই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বারান্দার ওপর একজন পুলিশ সার্জেন। সঙ্গে তার দুজন পুলিশ। তাদের হাতে কোদাল ও সাবল।

অভয়পদকে দেখে সার্জেনটি এগিয়ে এলো। দরজা খুলে জোর করে ঢুকিনি মিঃ বে। ওয়ারেণ্ট নেই, তাই আপনি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলাম। আশা করি আপনি বিনা আপত্তিতেই আমাদের ভেতরে যেতে দেবেন। আইনের পথ রুখে দাঁড়াবেন না।'

অভয়পদ ধীরে, যেন নৈরাশ্যের কোন অতল গর্ভ থেকে উত্তর দিল, 'না।'---তারপর এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বললো, 'যান, আপনারা ভেতরে যান।'

সার্জেনটি তার পুলিশ দুজনকে বললো, 'যাও, তোমরা ভেতরে চলে যাও। কোথায় গিয়ে খুঁড়তে হবে তা তো তোমরা জানোই।'

তারা চলে গেল। খানিক পরেই নীচে থেকে মাটি কোপানোর শব্দ হতে লাগলো। এতক্ষণে শুকনো গলায় অভয়পদ সার্জেনকে জিজ্ঞাসা করলো, 'কি করে আপনারা সব জানতে পারলেন তা বলবেন কি?'

'আপনার স্ত্রী। কী আশ্চর্য বুদ্ধিমতী। কিন্তু দেখে বোঝার উপায় নেই। গতকাল তিনিই আমাদের বলে আসেন।'

বিস্ময়ে বিস্ফারিত চক্ষু অভয়পদর মুখ দিয়ে শুধু বেরুলো 'গতকাল, আমার স্ত্রী!'

অভয়পদর বিস্ময়ে কিছুটা বিস্মিত সার্জেন উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ আপনারই স্ত্রী।---'

'প্রথমে আমরা ভেবেছিলাম মেয়েমানুষের কল্পনা। আপনি তো জানেনই মেয়েদের মাথায় একটা কিছু ঢুকলে আর রেহাই নেই।'

অভয়পদ এবার অসহায়ের মত বললো, 'মাপ করবেন আমি কিছুই বুঝতে পারছি না' তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেছে।

'কেন তিনি কি আপনাকে কিছুই বলেন নি?' সার্জেন জিজ্ঞাসা করলো। 'আপনি কি জানেন না তিনি বাড়ীর মালিক হানিংটনের স্ত্রীকে চিঠি লেখবার চেষ্টা করছিলেন?'—

'হ্যাঁ, হ্যাঁ তাতো জানি।' অভয়পদ আপ্রাণভাবে বলবার চেষ্টা করলো।

'আরে, সেই চিঠি লেখবার চেষ্টা করতে গিয়েই তো তিনি পোস্টাপিস থেকে আবিষ্কার করলেন যে মিসেস হানিংটনের বদলকরা ঠিকানা নেই। তাঁর থাকার কথা গ্লাসগোয় অথচ তাঁর নামে চিঠিপত্র এলে তা যায় মিঃ হানিংটনের কাছে কার্ডিফে।'

'সে কী?' অভয়পদ জিজ্ঞাসা করলো; 'তাঁরা সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন।'

'আরে অনেকেই তা জানে। আপনার স্ত্রী তো সেই সূত্র ধরেই তর্ক জুড়লেন যে কোন স্ত্রী তাঁর স্বামীর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করার পর স্বামীর ঠিকানায় চিঠি পাঠাতে বলবে; —একথা কোন অতিবড় মূর্খও বিশ্বাস করবে? নিশ্চয়ই সে এমন কোন ঠিকানা দিয়ে যাবে যে মিসেস হানিংটন মারা গেছেন। আর যদি তিনি মারা গিয়েই থাকেন তা হলে মিঃ হানিংটনই তাঁকে খুন করে একটা মিথ্যে গল্প রটিয়ে দিয়েছেন।'

'মিঃ হানিংটন? তিনিও ঐ কাজ করেছেন?' অভয়পদ প্রায় চীৎকার করে উঠলো।

"হ্যাঁ, মশায়, হ্যাঁ। মিঃ হানিংটন। আমরা বিশ্বাস না করা পর্যন্ত আপনার স্ত্রী নাছোড়বন্দা হয়ে লেগে থাকলন। শেষ পর্যন্ত মশাই এক রকম নিরুপায় হয়ে আমি কাল কার্ডিফে তার পাঠালাম। কার্ডিফ পুলিশ গিয়ে হানিংটনকে খানিকটা জেরা করার পরই তিনি সব কবুল করে ফেললেন। তিনি তাঁর স্ত্রীকে খুন করে চুল্লী কুঠরীর মেঝেয় পুঁতে রেখেছেন। অত সহজে কবুল করার একটা কারণ হতে পারে যে তিনি ভেবেছেন যে ঘটনা-চক্রে নতুন ভাড়াটেরা হয়তো মাটি খুঁড়ে লাসটা খুঁজে পেয়েই পুলিশে খবর দিয়েছে। ভাল কথা মিসেস রে কোথায়, তাঁকেই সর্ব প্রথম ধন্যবাদ জানানো উচিত। কোথায় তিনি?'

মনের কায়াকল্প

আগের দিনে কারো 'ইনসমানিয়া' হলে একটা গুঞ্জন শোনা যেত দরদী আত্মীয়-[illegible] মহলে—কৌতুহলী পাড়াপড়শীর মুখে। [illegible]ত কোন একটা ব্যক্তিগত গুরুতর কারণের [illegible] থাকত নিদ্রাহীনতার পেছনে। বৈদ্য ডাকা [illegible]ত, লোকে খবর করত রোগীর। এখন [illegible]মরা পাইকারি হিসাবে বিনিদ্ররজনী কাটাচ্ছি [illegible]কই বা কার খবর করে! নিঃসঙ্গ নিশুতি রাতে [illegible]ছানায় এপাশ ওপাশ করে যন্ত্রণার হাত থেকে [illegible]রিশেষে রেহাই পাই একটা ট্রানকুইলাইজার [illegible]খে পুরে। 'কান্তি চানে অঙ্গ মম প্রিয়ার [illegible]নতি সম'—এমন ধারা একটা স্বভাবমধুর [illegible]ন নয়, ওষুধের অবরদখলে দেহ-মনের চলে [illegible]ড়ার প্রতি রজনীর করুণ চিত্র। উদ্বেগ [illegible]শমনের বড়িতে বাজার ছেয়ে গেছে।

তবু উদ্বেগ রোজই বাড়ছে—রোজই [illegible]বার কলাও বিজ্ঞাপনে তীব্র [illegible]কে তীব্রতর ট্রানকুইলাইজারের আবির্ভাব [illegible]চার প্রচারিত হচ্ছে অসহায় [illegible]ভাগাদের কাছে। ধাতস্থ হয়ে যাচ্ছে [illegible]ষুধ, কিন্তু রোগ নিষ্পত্তি হচ্ছে না। ঢেউর [illegible] ঢেউ অবিরত আছড়ে পড়ছে জীবনের [illegible]পর। নানা সমস্যায় জর্জরিত দিশেহারা [illegible]ক্ষুব্ধ জীবন, আর দৈন্যের করুণ ছায়ায় [illegible]ন হতে ম্লানতর গহ্বর পরিবেশ। শুধুই [illegible]ক একটা আকস্মিক উপসর্গ? জীবন-সংগ্রামে [illegible]টিল থেকে জটিলতর পরিস্থিতির চক্রে [illegible]নন্দিন ঘুরপাক খেয়ে আর মাথাটায় একটা [illegible]কম্প কোলাহল বহন করে আধপাগলার মত [illegible]ন সন্ধ্যায় বাড়ী ফেরার একটা একটানা [illegible]ত্তব কাহিনী। তখন তপ্ত স্নায়ুগুলি ঠাণ্ডা [illegible]রার আর কোন উপায় থাকে কি সর্বনাশা [illegible]ড়ির সাময়িক ইন্দ্রজাল ছাড়া? কিন্তু তারপর?

এরকম করে তো বাচা চলে না। একটা জাগ্রত [illegible]চণ্ড মানসিক শক্তির সাহায্যে ব্যক্তি-সত্তাকে [illegible]থাসম্ভব স্থির করে বাধা-বিপত্তিগুলি অতিক্রম [illegible]রবার সাধনা মানুষকে করতেই হবে যদি [illegible]কে বেঁচে থাকতে হয়। এই সাধনা সম্পর্কে [illegible]ই একটি কথা এবং ব্যক্তিজীবনের গভীর [illegible]শ্চিন্তা ও উদ্বেগের মুহূর্তগুলিকে অনেকটা [illegible]হজ করে তোলবার কয়েকটি সাধারণ যৌগিক [illegible]ক্রিয়ার আলোচনা তাই হয়ত অপ্রাসঙ্গিক [illegible]বে না।

এটি জানা কথা যে মনের বাইরের [illegible]ঢেউগুলি এসে লাগে যার ফলে মন বিক্ষুব্ধ [illegible]য়ে উঠে, অশান্তি যন্ত্রণা শুরু হয়। রেডিও রিসিভিং সেটের মতই মন বহিরাগত তরঙ্গগুলি ধরে বাজতে থাকে। বিকিরণ কেন্দ্র ও মন—বাইরেও তার তরঙ্গ পাঠায়। অপরের তরঙ্গে প্রতিহত হয় সে, আবার নিজের তরঙ্গে প্রতিহত করে অপরকে। জ্ঞাতসারেই হউক, আর অজ্ঞাতসারেই হউক, মনের অনবরত কম্পন চলেছে আর তরঙ্গ গ্রহণ ও উৎক্ষেপ হচ্ছে।

মনকে যেমন শুভ তরঙ্গগুলি গ্রহণ করবার জন্য 'টিউন' করা দরকার, তেমনি প্রয়োজনানুসারে কিছু সময়ের জন্য তাকে নিউট্রন' করে বাইরের তরঙ্গমুক্ত করাও একান্ত আবশ্যক। এতে পূর্ণ বিশ্রামের পরিবেশটি সৃষ্টি হয়।

শ্রীশ্রীনিবাস সেনমজুমদার

স্বপ্নবিহীন গভীর নিদ্রায়ও একরকমের নিউট্রেল বা বিযুক্ত অবস্থা আসে। আর আসে অন্যরূপে, একটি বিশিষ্ট অবস্থায়, যখন পূর্ণ চৈতন্যময় একটা অদ্ভুত নিদ্রা-বিহীন নিদ্রায় একটি ভাব নিয়ে কেউ নিজের অন্তরে ডুব দেয়। সেই ভাবটির জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন অনুভূতি বা সংস্কার তখন থাকে না। চৈতন্য এখানে পজিটিভ, সুনির্দিষ্ট ভাবাশ্রয়ী। জাগ্রত অবস্থার মত চেতনা চারদিকে ছুটাছুটি করে মন ও মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করে তোলে না। ভাব অনুযায়ী লাভ। একজন গণিতজ্ঞ একটা গূঢ় তত্ত্ব নিরূপণের জন্য একান্তমনে আঁক কষতে কষতে তন্ময় হয়ে গেলেন, টেবিলের পাশ দিয়ে কে এল, কে গেল, তার খবর নেই।

সেতার বাজাতে বাজাতে শ্রীসুরসাগর এমন এক সুরলোকে চলে গেলেন যে কখন যে রাত ভোর হয়ে গেল তা' টেরই পেলেন না। একটা ভাব এঁদের এমনভাবে ধরে রেখেছিল অনেকক্ষণ যতক্ষণ তাঁদের ঐভাবটি ছাড়া আর কোন জ্ঞানই ছিল না। মাজায় ব্যথা থাকলেও ঐ সময়টুকুতে তাঁদের ব্যথার অনুভূতি ছিল না, বাড়ীতে কারো অসুখ থাকলেও রোগীর কথা মনে হয় নি, ঘরে চাল বাড়ন্ত সে চিন্তা বা উদ্বেগের তরঙ্গ ঐ ভাবলোকের প্রাকার ভেদ করতে পারে নি।

গভীর ধ্যানে উপাস্য দেবতাটিও এইরূপ একটা সমাহিত অবস্থায়ই সাধকের অন্তরে বিরাজ করেন। সাধক যখন 'জেগে' উঠেন, তখন তাঁর একটা পরিপূর্ণ তৃপ্তি ও প্রশান্তির অবস্থা—যেমনটি হয় গাঢ়ঘুম শেষে জেগে উঠার পর বা স্নান করে উঠার পর। আমাদের অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানে মনোজগতের অনেক কিছু নিগূঢ় তত্ত্বের কথাই রয়েছে। অবাক বিস্ময়ে শুনি যদি কোন পণ্ডিত তত্ত্বগুলি বলেন। কিছুটা বুঝি, কিছুটা না। হরিসভা থেকে বাড়ী ফিরতে ফিরতে আবছায়া হয়ে আসে সব; তারপর দুষ্পাচ্য বলে ভয়ে আর ওদিক মাড়াই না। তাই, সাগরে ঝাঁপ না দিয়ে ছোট পুকুরটায়ই প্রথম সাঁতার কাটার অভ্যাস করাটা ভাল। একের পর দুই। ছোট পুকুরটার কথাই বলছি।

যদি উত্তপ্ত স্নায়ুগুলিকে রোজ একবার স্নিগ্ধ করে দেহ ও মনের গ্লানি ধুইয়ে দেওয়া সম্ভব হয়, যদি ভিতরের ডামাডোল কিছুটাও করা যায় শান্ত কোন একটা টেকনিকে, তা' হলেও কম লাভ হল না। এমনি একটা বিশ্রামে মন ও মস্তিষ্ক যে বেশ টাটকা হয়ে উঠবে তাতে ভুল নেই। শক্তিও সঞ্চয় হবে অনেকখানি। মৃতসঞ্জীবনীর মতই এই শক্তি রজনীপ্রভাতে যোগাবে কার্যকরী চিন্তা, আর ফলপ্রসূ কর্মের নৈপুণ্য। টেকনিকটির গোড়ার কথা কনসেনট্রেশন। এতে মনের যে 'টোন' হয় এবং দেহের উপর তার যে প্রচণ্ড প্রভাব পড়ে, তার একটি উজ্জ্বল প্রতিফলন সুন্দর স্বাস্থ্যে। শরীরটা সহজে ভেঙ্গে পড়ে না; বয়সের ছাপও পড়ে না চট করে। তাছাড়া কনসেনট্রেশনে ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ হয় আর আত্ম-বিকাশের মণিকোঠার দ্বারটি খুলে যায়, যাতে করে দুর্গম পথের বাধাবিপত্তিগুলি যায় তলিয়ে; যাত্রী পায় চলার ক্ষমতা আর পথের আলো। প্রসঙ্গত সেই পুরানো কথাই আবার বলতে হয়, এই ঘটেই ব্রহ্মাণ্ড। যে শক্তি বিশ্বে, সেই শক্তি আত্মায়। অনন্ত শক্তির উৎস আত্মা। অনন্ত সম্ভাবনা নিয়ে মানুষ জন্মেছে। শক্তির স্ফুরণ সাধনায়। সাধনার গতিবেগে কিলো-ওয়াটের বৃদ্ধি। কিন্তু চাবিকাঠিটি কোথায়? সূচনা হবে কিরূপ?

প্রস্তুতি-পর্ব

কনসেনট্রেশন—(১) ঘরে সুবিধামত একটি নিভৃতকোণে আসন করে বসুন, যে রকম আসনে স্বচ্ছন্দে বসে থাকতে পারেন। তিন ফুটখানেক দূরে সামনের দেয়ালে একটা টেনিস বলের মত বড়, ২½ ইঞ্চি চওড়া, গোলাকার গাঢ় সবুজ বর্ডার দিন। এই বৃত্তের ঠিক মাঝখানে মার্বেলের মত বড় স্নিগ্ধ সাদা রং-এর একটি গোল তারা আঁকুন এবং তার চারদিকে সবুজ বর্ডার পর্যন্ত সবটুকু যায়গা হাল্কা নীল রং-এ ঢেকে ফেলুন। তারপর, একটা স্তব্ধ শান্ত পরিবেশে সাদা রং-এর তারাটির দিকে তাকিয়ে থাকুন—চোখের পলক না ফেলে যত বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকা সম্ভব হয়। পলক পড়লে আবার তাকান। পলক না ফেলে থাকার সময়ে

...র (Duration) ক্রমশ অভ্যাস বাড়িয়ে নিন। চোখের পলক যত কম ...়, মন তত স্থির হবে। সাদা তারার দিকে প্রথম কয়েকদিন পাঁচ মিনিট তাকাবার ...স করুন। তারপর মোট সময় ধীরে ধীরে ...তে থাকুন, আধ ঘন্টাখানেক পর্যন্ত। ... দুটিকে পীড়িত না করে অক্লান্তভাবে ...ণ পারেন ততক্ষণই এই প্রক্রিয়াটি ...ন। ঐ তারাটিতেই মনকে ডুবিয়ে ভুলে যান আর সব।

(২) কিছুদিন এক নম্বর প্রণালী অনু...ন দৃষ্টি অনেকটা স্থির হয়ে আসলে এবং মোটামুটি একাগ্র হলে, সামনে একটা ...া রেখে আয়নায় প্রতিফলিত নিজের ...র তারার দিকে তাকিয়ে থাকুন যেমন ...রে তাকিয়েছিলেন। নিজের মুখে যতক্ষণ ...বেন, তক্ষণ ভাবুন আমি সুন্দর, আমি ...ময়, আমি আনন্দঘন। চোখের তারায় ...লো ঠিকরে পড়ছে তা' আমার আত্মারই ---এই দ্যুতিতে আমি উদ্ভাসিত। ক্রমশ দুটি প্রশান্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। ভাবুন, দ্যুতিতে বিদ্যুৎ বিকীরণ হচ্ছে। এই ...শক্তি আমার অন্তর্নিহিত মহাশক্তির উৎস ... আসছে, বেশী, আরো বেশী, অনেক ... প্রচণ্ড শক্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে---আমি ...লাম।

(৩) উপরের দুই নম্বর মোটামুটি অভ্যাস ...লে একটি ছোট স্ফটিকের গোলক ...করুন। স্ফটিকটি মসৃণ হওয়া চাই। আকারে একটা সুপারির চেয়ে বড় হবে না। চেয়ারে ... সামনের টেবিলে গোলকটিকে এক ...া ভাবি কালো কাপড়ের উপর চোখের ...লেভেলে আড়াই ফুট খানেক দূরে উঁচু ... কিছুর উপর রাখুন। আপনার দৃষ্টির সম-...টেবিলের উপরস্থিত এই স্ফটিক গোলকের একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকুন। এক ও দুই ...অভ্যাস করার পর দেখবেন বিনায়াসে আপনা-...ন বেশ কিছুক্ষণ পলক না-ফেলে থাকতে ...ন। ক্রমশ সময় বাড়িয়ে আধঘন্টা পর্যন্ত ...য়ে থাকার অভ্যাস করুন। অবশ্য এত ... অনেকবার পলক পড়বে। স্ফটিকে দৃষ্টি ... করে থাকার অভ্যাসটা এমনভাবে করুন ...কোন অস্বস্তিবোধ না হয় এবং চোখ পীড়িত ...়ে পড়ে। যখন আধ ঘন্টা স্বচ্ছন্দভাবে ...কের দিকে তাকিয়ে থাকার অভ্যাস হয়ে (পনেরো দিন থেকে এক মাসেই হতে ...) তখন আরো পনেরো দিন এই সাধনা রাখুন। তারপর কিছুদিন পর পর আবার ...কদিন এই সাধনার পুনরাবৃত্তি করলেই ...টা কায়েম থাকবে। স্ফটিকের দিকে ...য়ে থাকবার পর স্ফটিকটিকে হাত দিয়ে করবেন না। কালো কাপড়টা দিয়ে স্ফটিকটিকে আলগোছে জড়িয়ে তুলে নেবেন, আবার দরকার মত কালো কাপড়ের টুকরা সমেত সাধনার সময় সামনে রাখবেন। স্ফটিকটি এমন স্থানে রাখা দরকার, যেখানে অন্য কেউ এটিকে কোনরূপ স্পর্শ না করতে পারে। একাগ্র দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে স্ফটিকটি 'ম্যাগনেটাইজড' হয়। নিজের কোন অঙ্গের সরাসরি (direct) স্পর্শে ম্যাগনেটিজম নষ্ট হয়, অন্যের কোনরূপ স্পর্শের তো কথাই নেই। পর্যায়টি পর্যন্ত আলোচিত তিনটি পর্যায়ের এই অনুশীলন ঠিকমত হয়ে গেলে একাগ্রতা আর ইচ্ছাশক্তি অদ্ভুত বাড়বে। স্ফটিকটির দিকে তাকিয়ে থাকবার সময় ভাবুন, ব্রহ্মাণ্ডের সমগ্র শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়েছে এই স্ফটিক-গোলকে, আর তারই বিদ্যুৎ-প্রবাহ আপনার মধ্যে প্রবেশ করছে আপনার তীব্র আকর্ষণে, আপনার চোখের তারা দিয়ে। স্ফটিকের গোলকে পজিটিভ বিদ্যুৎ, চোখের দৃষ্টিতে নিগেটিভ। দেহ-মনটি 'ক্ষেত্র', যাতে পজিটিভ-নিগেটিভ মিলিত হয়ে শক্তি তরঙ্গে রূপায়িত হচ্ছে। এই শক্তি প্রচণ্ড ও দুর্বার। আপনার আজ্ঞাবহ।

উল্লিখিত এই তিনটি পদ্ধতি হিন্দুযোগ-মার্গের ত্রাটকযোগেরই ছায়া। দস্তুরমত ত্রাটক অভ্যাস করা অনেকটা কঠিন হবে। তাই উচ্চাঙ্গের ত্রাটকের আলোচনা করা হল না। 'উইল পাওয়ার'ই বলুন আর 'অটোসাজেসনই' এই প্রণালীর নামকরণ করুন, তাতে কিছু এসে যায় না। তবে গোটা প্রণালীটি বিলিতি মোড়কে বাঁধা শুধু 'ক্রিস্টেল গেজিং' জাতীয় একটা বস্তুতে সীমিত নয়। এই বিজ্ঞান হিন্দু যোগগন্ধী। অধ্যাত্মশক্তির অধ্যাত্মচেতনার ও আত্মবিকাশের অনুশীলনের পাদপীঠ। এই সাধনার শ্রেষ্ঠ সময় রাত্রিতে অথবা অতি ভোরে সাধনা শব্দটি শুনলে আমরা অনেকেই একটা দুরূহ বা অদ্ভুত ব্যাপার বলে মনে করি। তাই, সাধারণ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে ভেবে এই বস্তুটিকে ভ্রাতৃবধূর মত সম্ভ্রমে এড়িয়ে চলি। কিন্তু সাধারণ মানুষমাত্রেই একটু চেষ্টায় একটা মোটামুটি সহজ প্রণালীতে নিঃসন্দেহে যে একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারেন তা' বলাই এখানে উদ্দেশ্য। চঞ্চল মন যে পরিমাণে স্থির হতে থাকবে সেই পরিমাণে আসবে প্রশান্তি, অভিনিবেশ ও দৃঢ়তা, আর হবে ইচ্ছাশক্তির স্ফুরণ। এভাবে ক্ষেত্রটি তৈরী হতে থাকলেই ধীরে ধীরে হবে আত্মবিকাশ, বীজের ভিতর লুকিয়ে থাকা বিরাটের ক্রমশ প্রকাশ। সামান্য ব্যাপারে শক্তির প্রয়োগে শক্তির অপচয় হয়, অধ্যাত্মশক্তি নষ্ট হয়। সুতরাং শক্তির বিকাশ হতে থাকলে তাকে সংহত করে রাখুন। কলসীর জল সহজে ফুরিয়ে যায়, পুকুরের জল অফুরন্ত।

দ্বিতীয় স্তর। উপরে বর্ণিত প্রথমস্তর বা প্রস্তুতিপর্বে একাগ্রতার অভ্যাস ও শক্তি-সঞ্চয়ে খানিকটা অগ্রসর হয়েই, সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় স্তরে নিম্নে উল্লিখিত বিষয়গুলির অনুশীলন সুরু করতে পারেন।

রাত্রের আহার লঘু করুন। খাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে শোবার ঠিক আগে জড়তা-বর্জিত হয়ে যাতে একটু বসতে পারেন এরূপ খাওয়া দাওয়া করুন। বিছানায় যে কোন রকমের একটা স্বাচ্ছন্দ আসন করে বসুন। ধরে নিলাম মনটা প্রায়ই কমবেশী ভারাক্রান্ত থাকবে দিনের আবর্জনা কুড়িয়ে। অথবা আবর্জনা বলতে যদি আপত্তি থাকে, তবে বলব আমাদের সেই অপরিহার্য সঙ্গগুলি যা' আনন্দ ও তৃপ্তির পরিবর্তে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে উদ্বেগ বহন করে আনে, একটা যন্ত্রণা সৃষ্টি করে দুঃস্বপ্নের মত---চালায় দেয় ইনসমনিয়ার ভূত!

আসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে কী মনে ভেসে আসছে? আপনার দৈনন্দিন সঙ্কট সমস্যা, বাধা-বিপত্তি, ব্যর্থতা-গ্লানি বা কোন ভুলচুক, গোলযোগ? আপনার বিচিত্র সংস্কারগুলি, নানা কথা, নানা ভাবনা? না অনেক কিছু মিলে একটা হুলস্থূল কাণ্ড! দেহ ক্লান্ত, মনও অবসন্ন, কিন্তু মাথায় বোলতার চাক। মনকে চট করে গুটিয়ে নিয়ে একটা কোলাহলহীন প্রশান্তির কল্পলোকে ডুব দেওয়া কি চারটেখানি কথা! প্রস্তুতিপর্বে আপনি যে কনসেনট্রেশন অভ্যাস করেছেন তা অবশ্যই অনেকটা সাহায্য করবে, মনকে একটা শান্ত অবস্থায় সমাহিত করতে। এক মুহূর্ত ভাবুন, ভাবনার মূল নিদানটি কি? হয়ত শেষ কথা---অক্ষমতা, পর্যাপ্ত শক্তির অভাব। তা' হলে চাই শক্তি। একটা প্রচণ্ড শক্তি। বুদ্ধির শক্তি, দক্ষতার শক্তি, সংগ্রামের শক্তি, স্থৈর্যের শক্তি,---সর্বশক্তির মূল আধ্যাত্মশক্তি। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা তখন করবেন না। দুশ্চিন্তার কারণটির অলিগলি বেয়ে, ঘাঁটাঘাঁটি করে, ফেনিয়ে, ফাঁপিয়ে কোন সমীক্ষা বা বিশ্লেষণ করতে যাবেন না। তাতে মন আরো বেশী ভারাক্রান্ত হয়ে উঠবে, রাত্রে আর ঘুম আসবেই না, বা শেষ পর্যন্ত আজেবাজে তাল-গোল পাকানো স্বপ্ন-দুঃস্বপ্ন-কণ্টকিত তন্দ্রা হবে। জেগে উঠার পর স্বপ্নটির কথা মনে না থাকলেও আপনার অবচেতন মন যে একটা দুঃসহ অবস্থার ভিতর দিয়ে পরিক্রমা করেছে, তার স্বাক্ষর স্বরূপ থাকবে প্রভাতের গ্লানি। রাত্রে কোন সমস্যার সমাধান হতে পারে না, কারণ আপনার মস্তিষ্ক অসুস্থ। আঁকা-বাঁকা অনেক রেখা পড়ে গেছে মাথার খিলুতে, মন দুঃসহ নাগরদোলা খাচ্ছে। দীর্ঘকাল আগের একটা ক্ষুদ্র ঘটনার কথা বলব? আমার এক বন্ধু বলেছিলেন, 'জান, কাল রাত্রে একটা ইণ্টারেস্টিং স্বপ্ন দেখছি। কার্পেটের উপর আমি

অস্থির হয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছি—সামনেই অসংখ্য কি যেন কতগুলো ছড়ানো জিনিষ ধরবার জন্য। জিনিষগুলি দৌড়াতে লাগল, আমার হামার দৌড় ও বাড়ল। ক্রমশ জিনিষগুলি বুলেটের মত সামনের দিকে ছুটতে লাগল, আমিও যেন আমার এলসেসিয়ানটার মতই ছুটতে লাগলাম পেছনে পেছনে ভীষণ 'ক্রল' করতে করতে। হাঁটুর চামড়া ছড়ে গেল, পায়ের মাংসগুলি ছিটকে বেরিয়ে যেতে লাগল, জিভ বেরিয়ে গেল হাঁফাতে হাঁফাতে। প্রোসেসটি কিন্তু চলতেই লাগল—জিনিষগুলি ছুঁতে পারলাম না।' আমি বললাম, নিশ্চয়ই অপূর্ণ কোন বাসনার রূপক। তিনি হেসে বললেন, 'কতকটা তা-ই। আমার যা' রিডিং—বস্তুগুলি হল, এই দু'শো ফাইল, যা মেঝের উপর পড়ে আছে। টুরে থাকতে এগুলি জমেছে। কিছুতেই ম্যানেজ করতে পারছিলাম না বলে কাল রাত্রে ডিনারের পর কাজ করতে করতে একটা ভীষণ ওয়ারি হয়েছিল।' ক্ষ্যাপা কুকুরের দলের মত দিনের দুর্ভাবনাগুলি নির্ঘাত তাড়া করে আসে ঘুমের মাঝে নানা অবাঞ্ছিত রূপে। দুর্ভাবনা দুঃখের আসল কারণ হল, বাইরের যে সংঘাত আসছে তার অনেক গুলিই হয়ত আপনি অতিক্রম করতে পারছেন না, বা অতিক্রম করতে যেয়ে যে ধাক্কা খাচ্ছেন, তা' সামলে উঠতে পারছেন না। আপনার শক্তির তুলনায় সংঘাতের তীব্রতা বেশী, হাল ধরবার দক্ষতাকে ছাপিয়ে উঠেছে ঝড় আর ঢেউ। অথবা বুদ্ধি হার মেনেছে খাঁচায় বাঁধা অসহায় পাখীর মত। তা' হলে আপনাকে মাথা ঠাণ্ডা করে এমন একটা শক্তির অনুশীলন করতে হবে যা'তে করে প্রতিকূল অবস্থাটা অতিক্রম করতে পারেন; না পারলে, ঢেউ কেটে কেটে বুঝতে পাবেন একটা দীর্ঘ মেয়াদী লড়াই। বাঁচতে হলে এমনি একটি সংঘাত-প্রতিরোধ-ক্ষেত্র আপনাকে তৈরী করে নিতে হবে বাইরে ও ভিতরে। বাইরের দিকটার কথা আলোচনা করব না, তার বিস্তার ও কার্যক্রম ভিন্ন। ভিতরের দিকটার কথাই বলছি। ভিতরের দিকটা ঠিক হয়ে গেলে যে সুস্থ, শান্ত অথচ বলিষ্ঠ নূতন মানুষটি আপনার মধ্যে জন্ম নেবে, সে বাইরের ক্ষেত্রেও হবে কর্তী। পারিপার্শ্বিক অবস্থা মানুষকে সৃষ্টি করে, আবার মানুষই নূতন পারিপার্শ্বিকের স্রষ্টা,—হয়তো কতকটা সময়-সাপেক্ষ।

ধ্যান আসনে বসার কথা বলতে যেয়ে অনেক দূর পরিক্রমা করে ফেলেছি, যেমন আসনে বসে মনস্থির করবার ভূমিকাতেই হাজার জোনাকি নানাদিক থেকে উড়ে এসে ঝিকমিক করতে থাকে মনে। মনের পর্দায় যে অবাঞ্ছিত কম্পনগুলি উঠে, সেগুলিকে 'নিউট্রেলাইজড' করতে না পারলে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী ভেঙ্গে পড়তে হবে একটা ঝড় ঝাঁকুনির পর ঝাঁকুনিতে। আকাশ পাতাল চিন্তায় বিনিদ্র রজনী কাটিয়ে কোন কিছুরই তো সুরাহা হবে না,—এই ভাবটি মনে এলে মনের দৃষ্টিকোণের একটা পরিবর্তন হবে। মনস্তত্ত্বের দিক দিয়ে দেখলে, এই অবস্থাটি আসার সঙ্গে সঙ্গে বহুমুখী চিন্তার বা মনের অবাধ বিচরণের একটা যতি পড়বে। এই বিরতি হয়ত হবে ক্ষণ-স্থায়ী। তারপরই মনে হবে, তা' হলে উপায়? উপায়ের চিন্তা সুস্থমনে—রজনীপ্রভাতে। উপায় মনের কায়কল্পে, নবজীবনের জোয়ারে, —সব কিছু ভাসিয়ে নিয়ে চলার দুর্বার শক্তিতে। গভীর নিশার এই মুহূর্তে প্রয়োজন পূর্ণ বিশ্রাম। কথা আপাতত শেষ হল। আবার ডাইনে বাঁয়ে উঁকি দিয়ে বিতর্ক করবার সুযোগ দেবেন না মনকে। কথার ছেদের সঙ্গে সঙ্গেই চোখ দুটি বুজে মনকে পৃথিবীর মাটি থেকে নিমেষে মহা শূন্যে নিক্ষেপের কল্পনা করুন। মহাশূন্য—নীলাভ নয়, বিপুল শুভ্র রূপের কল্পনা। দিগন্তবিহীন শ্বেত—শুধুই স্নিগ্ধ নির্মল শুভ্ররূপের সাগর, পূর্ণিমার চন্দ্রকিরণের মত; আর তার মাঝে মানবশিশু অর্থাৎ আপনি স্থিরাসনে। আপনার নিজের মূর্তিটি আপনি তথায় দেখুন। ভাবুন, আপনার দেহও শীতল শুভ্র হয়ে আসছে আপনারই চারপাশের তুষাররাভ শ্বেত সাগরের মত। তারপর—তারপর, আপনি শুধুই একটি স্নিগ্ধ শুভ্রপুঞ্জ; দেহের আকার, আউটলাইন বা অবয়বের সমস্ত রেখা বরফের মত গলে যাচ্ছে—দ্রুত বিলীন হয়ে যাচ্ছে—আপনি বিলীন হয়ে যাচ্ছেন—বিলীন হলেন —হারিয়ে গেলেন অন্তহীন শুভ্র স্নিগ্ধতার মাঝে। 'হিপনটিক ড্রাগের মত মহাশূন্য আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল তার প্রশান্ত কোলে। যদি চট করে ঘুম না আসে, থাকুন এভাবে ক্ষণিক সময়। মন সচেতন হয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গেই আবার ডুব দিন, হারিয়ে যান আবার স্নিগ্ধ শুভ্রতায়, থাকুন 'প্যাসিভ' (Passive) হয়ে। এই অনুশীলনে অল্প সময়েই ঘুম এসে যাবে। এটিও ধ্যানগন্ধী। কিছুদিন অভ্যাস করার পর এই প্রণালীতে একটু ভাববার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুম আসবে এবং অনেক সময় এত তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়বেন যে হয়ত জানতেই পারবেন না। বসে বসে ঘুমিয়ে পড়লে কাঁচা ঘুম থেকে এক তিল বাদেই জেগে উঠবেন, যদিও চোখে থাকবে জড়তা। তা-ই ঘুমের ভাব আসার সঙ্গে সঙ্গেই সটান শুয়ে পড়ুন। গাঢ় ঘুমে রাত্রি কেটে যাবে। প্রভাতে জাগার পর মনে হবে আপনি শিশির-ভেজা ফুলের মতই টাটকা। রাত্রির সুস্নিগ্ধ প্রশান্তি অমৃতের মত সর্বদেহ মন জুড়ে। আপনি নওজোয়ান। জীবন-সংগ্রামে স্থিরবুদ্ধি আর দৃপ্ত-শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ুন, অধিকতর সাফল্য

এর পরে বলব শ্বাসনিয়ন্ত্রণ ও প্রাণায়াম সম্বন্ধে দু' একটি কথা, যাতে অসাধারণ শক্তির বিকাশ হয়। প্রাণায়াম বলতে এমন একটা যৌগিক টেকনিকের আবছায়া মনে আসে যাতে বড়দের আসর থেকে কুণ্ঠায় দূরে-পালিয়ে-যাওয়া শিশুর মতই সম্ভ্রমে সরে দাঁড়াই। ব্রিদিং একসারসাইজ বললে কথাটা যেন সহজ হয়ে উঠে, মনে হয় বুঝি এক-আধটু পরিচয় পেলাম। বিলিতি 'সেল' আর ভারতীয় আত্মা যেমন এক পদার্থ নয়, তেমনি প্রাণায়াম ও ব্রিদিং এক্সার-সাইজে তফাৎ অনেকখানি, যেমন শিশুতে আর প্রাপ্তবয়স্কে। তবু ষটচক্রভেদের ব্যাপারটার ঠিক নাগাল না পেয়ে উড্রফ সাহেবের 'সার্পেণ্ট পাওয়ার' বইখানা নিয়েই নাড়াচাড়া করি। দুঃসাধ্য যে প্রাণায়ামের সাহায্যে 'কোটিসৌদা-মিনীভাসাং স্বয়ম্ভুলিঙ্গবেষ্টিতাম্' কুণ্ডলিনী শক্তি প্রবুদ্ধা হন—যার ফলে মানুষ একটা অলৌকিক অবস্থায় পৌঁছাতে পারে, আর আয়ুও বৃদ্ধি হয়, সেই কঠিন প্রাণায়ামাভ্যাস সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, নিরাপদও নয়। সেজন্য পদপ্রদর্শক গুরুরও প্রয়োজন। গুরুতেও হরেক ভেজাল; পথও দুর্গম। সুতরাং সহজসাধ্য এবং মোটামুটি নিরাপদ দুই-একটি শ্বাসনিয়ন্ত্রণ প্রণালী এবং বিধিবদ্ধ কিছুটা ছোটখাটো প্রাণায়ামের কথাই আলোচনা করব। এগুলি সাধারণ হলেও শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রণালীবদ্ধ নিয়ন্ত্রণের ফলে মন স্থির হতে থাকবে এবং শক্তি বাড়বে। প্রাণায়াম সম্বন্ধে তন্ত্রে বলা হয়েছে—

"পূরয়েৎ ষোড়শৈর্বায়ুং ধারয়েচ্চ চতুর্গুণৈঃ।
রেচয়েৎকুম্ভকার্ধেন অশক্ত্যা তত্তুরীয়কৈঃ।
তদশক্তৌ তচ্চতুর্থঃ স্যাদেবং প্রাণসংযমঃ॥"

ষোলবার জপদ্বারা নিঃশ্বাস গ্রহণ (পূরক), চৌষট্টিবার জপে শ্বাস ধারণ কুম্ভক, এবং বত্রিশবার জপে শ্বাস ত্যাগ (রেচক)। এই সংখ্যায় অশক্ত হলে, এক-চতুর্থাংশ, তাও না পারলে তারও চতুর্থাংশ বিধি। শেষ সংখ্যাটি, অর্থাৎ চার, ষোল, আটই সবচেয়ে লঘু প্রাণায়াম। ব্রিদিং একসারসাইজও খুব একটা সংখ্যা বা মাত্রা আশ্রয় করেই অভ্যাস করতে হবে। হার্টের কোন পীড়া থাকলে এ সব একসারসাইজ বা কোন প্রাণায়াম করবেন না।

ব্রিদিং একসারসাইজ। (১) ধৌতি। হৃদপিণ্ড ও ফুসফুসটাকে ধুয়ে বিশুদ্ধ করে নেওয়ার জন্য তিনটি পূর্ণ শ্বাস নিয়ে ফুসফুসটা ভর্তি করে ফেলুন। তিনটি পূর্ণশ্বাস তিনবার নয়, একবারে একটানা সমান প্রবাহে নিঃশ্বাস টেনে। একটি পূর্ণশ্বাস নিতে যে সময় লাগে তার তিনগুণ সময়ে শ্বাস টানুন। নিঃশ্বাস নেওয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত মোট সময়ের অর্থাৎ নিঃশ্বাস টানতে মোট যে সময় লেগেছিল তার চতুর্গুণ সময়ে শ্বাস ধারণ

ঠোঁটের মাঝে ক্ষুদ্রতম ছিদ্রপথে খুব জোরে সমান একটানা তালে ভিতরের যতটুকু সম্ভব বায়ু বের করে দিন। নাক দিয়ে নয়, দুই ঠোঁটের ছিদ্রপথে। মনে হবে যেন সবটুকু বায়ু বেরিয়ে গেল। কিন্তু তবু ভিতরে অবশিষ্ট একটু না একটু বায়ু থেকে যাবে। দুই গুণতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ করে থাকুন। তারপরই আবার সজোরে চেষ্টা করে অলক্ষিতে থাকা অবশিষ্ট বায়ুটুকু পূবের মত কুঞ্চিত ঠোঁটের ছিদ্রপথে বের করে দিন। একবার এই সম্পূর্ণ প্রণালীটি করে দুই তিন মিনিট বিশ্রাম করুন। বিশ্রামের সময় অবশ্য স্বাভাবিকভাবে শ্বাস-প্রশ্বাস চলবে। পুনরায় প্রণালীটি করুন। এই ভাবে একসঙ্গে বার তিনেক করুন, বেশী নয়। আর, দিনে একবারই এই প্রণালীটি করা উচিত। একটু অভ্যাসে দেখবেন, প্রণালীটি করার পর নিঃশ্বাস নিতে অনেকটা স্বচ্ছন্দ বোধ করছেন, ভালো লাগছে। একটা কথা বিশেষ লক্ষ্য রাখা দরকার যে, আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের একটা স্বাভাবিক ষ্ট্যাণ্ডার্ড বা মান আছে। দীর্ঘদিন প্রাণায়াম অভ্যাসে অবশ্য মানটির পরিবর্তন হয়, অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস হ্রস্ব হয়ে আসে, কিন্তু সে পৃথক কথা। যে একটা কালে স্বাভাবিক যে মানটি থাকে, উপরোক্ত একসারসাইজের মাঝে সেই মানটির পরিবর্তন করবেন না। অর্থাৎ গোটা প্রণালীটি করার সময় প্রথমবারে মোট যে সময় লেগেছে সম্পূর্ণ শ্বাসটা নিতে, দ্বিতীয় বার পুনরাবৃত্তির সময়ও সেই সময়টুকু ঠিক রাখবেন এক কথায় প্রত্যেকবারেরই মোট মাত্রা সমান হবে, ছন্দটিও থাকবে ঠিক। সামনে ঘড়ি রেখে হিসেব ঠিক রাখতে পারেন। এই প্রণালীটি অনুসরণে শ্বাসের প্রবাহ সহজ হয়ে আসবে আর ভিতরের একটা ধোয়া বা সাফাই হবে। শ্বাসপ্রবাহ সহজ ও একছন্দে হলে মনের চাঞ্চল্যও উল্লেখযোগ্যভাবে কমবে।

(২) এক নম্বরের ধৌতির প্রণালীটি কিছু দিন করার পর সহজসাধ্য ছোট একটি প্রাণায়াম করুন। এই প্রাণায়ামটিকে আমরা লঘু প্রাণায়াম বলতে পারি।

যে রংটি সাধারণত আপনার সবচেয়ে প্রিয়, চোখ বুঝে নিরবচ্ছিন্ন সেই রংটি দেখছেন কল্পনা করুন। তারপর চার সেকেণ্ড সময়ে একটানা সমানতালে নিঃশ্বাস টানুন। ছন্দটি ঠিক রাখবেন। নিঃশ্বাস নেওয়া হয়ে গেলে, ষোল সেকেণ্ড সময় ঐ বায়ু ভিতরে ধারণ করুণ। নিঃশ্বাস নিবেনও না, ফেলবেনও না। তারপর, আট সেকেণ্ড সময়ে শ্বাস ত্যাগ করুন। এইরূপ তিনবার করুন। প্রথমবারে ডান নাক ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে চেপে বাম নাকে নিঃশ্বাস নিন। তারপর ডান নাকে বুড়ো আঙুল ও বাম নাকে অনামিকা ও কনিষ্ঠ আঙুল দিয়ে উভয় নাক চেপে বায়ু ধারণ করুন। প্রোসেসটি হয়ে গেলে বাম নাক অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা চেপে ডান নাকে শ্বাস ত্যাগ করুন। দ্বিতীয়বারে ঠিক তার উল্টো। অর্থাৎ বাম নাক চেপে ডান নাকে নিঃশ্বাস গ্রহণ ইত্যাদি। তৃতীয়বারে প্রথমবারের মত। আঙুলে এক দুই ইত্যাদি সংখ্যা গুণে সময়ের পরিমাণ ঠিক রাখতে পারেন। (যাঁরা জপ করেন, তাঁরা জপসংখ্যা দ্বারাই সময় ঠিক রাখেন)। নিঃশ্বাস টানবার সময় ভাবুন, অমৃতস্বরূপ পূর্ণ প্রাণশক্তি আপনি নিজদেহের ভিতর আকর্ষণ করে নিয়ে আসছেন। বায়ু ধারণের সময় ভাবুন, আপনার প্রতি অঙ্গে, সমগ্র দেহে, সেই প্রাণশক্তি ব্যাপ্ত হয়েছে। সমগ্র দেহ প্রাণবন্ত, শক্তিসঞ্চারিত ও অমৃতময় হচ্ছে,—আপনি সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত। শ্বাস ত্যাগ করবার সময় ভাবুন, দেহের সমস্ত গ্লানি, বিষ ও আবর্জনা ধুয়ে মুছে বেরিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন এই প্রাণায়াম অভ্যাসে জীবনীশক্তি ও তেজ বৃদ্ধি হবে, মনে সাহস ও জোর আসবে, বুদ্ধি পরিষ্কার হবে এবং দেহমন প্রফুল্ল হবে।

(৩) যখন কোন কারণে হঠাৎ মনে একটা ধাক্কা লাগে বা কোন ব্যাপারে হঠাৎ ঘাবড়ে যান অর্থাৎ নার্ভাস হয়ে পড়েন, যেমন কোন সময় পরীক্ষার হলে, বা চাকুরীর ব্যাপারে নির্বাচনী বোর্ডের সামনে দাঁড়ালে, অথবা ঐ রকম একটা উত্তেজনার মুহূর্তে—তখন একটানা একটা পরিপূর্ণ নিঃশ্বাস টানুন, যতটুকু পর্যন্ত বায়ু টেনে নিতে পারেন সমান প্রবাহে। তারপর বায়ু ধারণ করুন। গুণুন, রাইট ওয়ান, রাইট-টু ইত্যাদি টেন পর্যন্ত। তারপর ধীরে একটানা সমানপ্রবাহে (ধাক করে বা থেমে থেমে নয়) নাক দিয়ে শ্বাস ত্যাগ করে ভিতরের সবটুকু বায়ু বের করে দিন। যতক্ষণ বায়ু ধারণ করে রাখছেন এবং গুণছেন ততক্ষণ ভাবতে চেষ্টা করুন। আপনার সমগ্র সত্তাটি একটি সুদৃঢ় দুর্গ। আপনি নির্ভীক ও অবিচলিত। দরকার হলে দুই-তিনবার এই প্রক্রিয়া করুন। একবার শেষ হলে, কয়েকবার স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়ার পর আবার প্রক্রিয়াটি করুন।

শ্বাস-প্রশ্বাসের অনেক অদ্ভুত তত্ত্ব রয়েছে স্বরোদয় শাস্ত্রে। এমন কি, শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর শুভাশুভ নির্ণয় ও অসুস্থতার পূর্বাভাস ইত্যাদি ব্যাপারগুলিরও কতকটা হদিস পাওয়া যায়। কৃত্রিম উপায়ে এক নাক থেকে অন্য নাকে শ্বাস পরিবর্তনে রোগ-যন্ত্রণার সাময়িক লাঘব হয়। শ্বাসনিয়ন্ত্রণে আরো নানা অদ্ভুত ব্যাপার সম্ভব। কিন্তু সেই আলোচনার স্থান এখানে নয়।

তৃতীয় স্তর। আগেই বলেছি মন একটা বিকিরণ কেন্দ্রও বটে। বাইরে তার তরঙ্গ পাঠায়। ইথারে চলমান শব্দতরঙ্গের মতই শক্তিমান মনের তরঙ্গ একটা অদৃশ্য শক্তিতে বার্তা বহন করে নিয়ে যেতে পারে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির আছে। পারিপার্শ্বিকের উপরও সেই তরঙ্গের প্রভাব পড়ে। তরঙ্গগুলি আঘাত করে নির্দিষ্ট জন বা অবস্থাকে। প্রেরিত তরঙ্গ কতটুকু শক্তিশালী হল, তা' অবশ্যই নির্ভর করে ইচ্ছাশক্তির জোরের উপর এবং কনসেনট্রেশনের ক্ষমতায়। সেই শক্তি মোটামুটি সঞ্চয়ের কয়েকটি প্রণালীর ইঙ্গিত পূর্বে করা হয়েছে। এভাবে মনটি তৈরী হয়ে গেলে, এই মনই ক্রমশ একটি শক্তিমান তরঙ্গবিক্ষেপক যন্ত্রে পরিণত হবে। শক্তিশালী শুভতরঙ্গ প্রেরণে অশুভ একটা অবস্থা প্রতিহত করা যায়। সুনির্দিষ্ট ও সুনিয়ন্ত্রিত চিন্তার অদৃশ্য অথচ শক্তিসঞ্চারিত (Charged) প্রভাবশীল একটি সূক্ষ্ম রূপমূর্তি (Thought form) মনোজগত থেকে প্রেরণ করা অবশ্যই সম্ভব। চিন্তার বিশিষ্ট রূপমূর্তিটির চালনায় বাইরের জীবনের পাশে এসে দাঁড়ানো একটি অবাঞ্ছিত রূপকে ক্রমশ সম্মোহিত করে তার গোটা রূপটিকেই পাল্টে দেওয়া যেতে পারে। অন্যের মন বা আগন্তুক একটা অবস্থাকে আঘাত বা 'হিট' করবার জন্য শক্তিশালী চিন্তাপ্রবাহকে এমন একটি পরিচ্ছন্ন ভাবরূপ দিতে হয়, যে রূপটি আপনার কাম্য। ধারণা পরিষ্কার হলে রূপমূর্তি নিখুঁত হবে। মহিষাসুর বধের সময় দেবগণের দেহনির্গত সুমহৎ তেজরাশি একস্থ হয়ে এক নারীমূর্তি ধারণ করল।

'অতুলং তত্র তত্তেজঃ সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥"
—চণ্ডী॥

কেন্দ্রীভূত প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তির অর্থাৎ উগ্র চিন্তা বা ভাবের রূপমূর্তি, তথা বাস্তব প্রকাশ, দেবীর আবির্ভাবে। উক্তিটি প্রণিধানযোগ্য। মাটির মানুষ আমরা, দেবতা নই। কিন্তু মাটির জগতে মাটির মানুষের চিন্তা কি কোনই রেখাপাত করতে পারে না? ইউরোপে রেনাইসান্স সময় নবজাগরণের চিন্তাতরঙ্গগুলি পরস্পর দূরবর্তী বিভিন্ন অঞ্চলের মহামানবদের মনে যুগপৎ সঞ্চারিত হয়েছিল। এ যুগের মত ভাবের আদান-প্রদানের কোন বাহন বা যোগসূত্র ছিল না, কিন্তু নবজাগরণের একটা চিন্তাধারা অদৃশ্য শক্তিতে ছড়িয়ে গেল চারদিকে। প্রবাসী ছেলের গুরুতর অসুখ হলে কম্পন লাগে মায়ের মনে। নিজের জীবনের বিনিময়ে বাবর প্রার্থনা করলেন মুমূর্ষু পুত্র হুমায়ুনের জীবন। প্রার্থনা সফল হল। প্রাণের আশীর্বাদ আর আহতের ক্রুদ্ধ অভিশাপ—সূক্ষ্ম জগতে উভয়েই নেয় রূপমূর্তি ল্যাবরেটরীর টেস্ট টিউবে ধরা পড়ে না এগুলি।
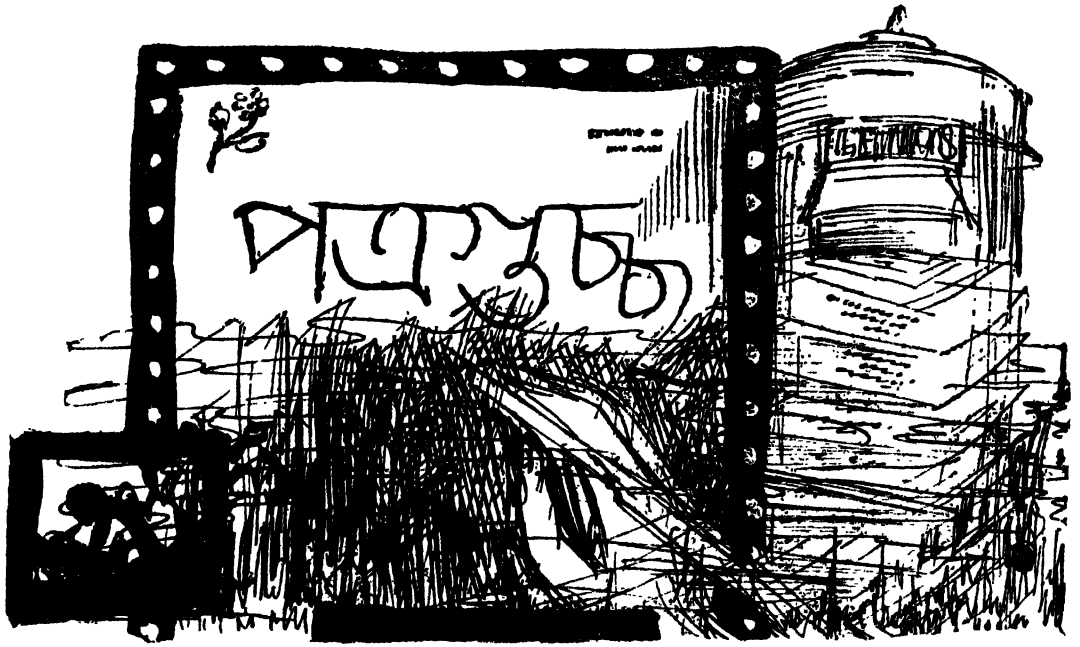
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দুইখানি পত্রকাব্য

শিলংয়ের চিঠি

শ্রীমতী শোভনা দেবী ও শ্রীমতী নলিনী দেবী—
কল্যাণীয়াসু।

ছন্দে লেখা একটি চিঠি চেয়েছিলে মোর কাছে,
ভাবছি ব'সে এই কলমের আর কি তেমন জোর আছে।
তরুণ বেলায় ছিল আমার পদ্য লেখার বদ-অভ্যাস,
মনে ছিল হই বুঝি বা বাল্মীকি কি বেদব্যাস,
কিছু না হোক 'লঙ্‌ফেলো'দের হবো আমি সমান তো,
এখন মাথা ঠাণ্ডা হ'য়ে হয়েছে সেই ভ্রমান্ত।
এখন শুধু গদ্য লিখি, তাও আবার কদাচিৎ
আসল ভালো লাগে খাটে থাকতে প'ড়ে সদা চিৎ।
যা-হোক একটা খ্যাতি আছে অনেক দিনের তৈরী সে,
শক্তি এখন কম প'ড়েছে তাই হ'য়েছে বৈরী সে;
সেই সেকালের নেশা তবু মনের মধ্যে ফিরছে তো,
নতুন যুগের লোকের কাছে বড়াই রাখার ইচ্ছে তো।
তাই ব'সেছি ডেস্কে আমার ডাক দিয়েছি চাকরকে,
"কলম লে আও, কাগজ লে আও, কালি লে আও ধাঁ বর্‌কে।"
ভাবছি যদি তোমরা দু'জন বছর তিরিশ পূর্বেতে
গরজ করে আস্‌তে কাছে, কিছু তবু স্থর পেতে।
সেদিন যখন আজকে দিনের বাপ-খুড়ো সব নাবালক,
বর্তমানের সুবুদ্ধিরা প্রায় ছিলো সব হাবা লোক,
তখন যদি বল্‌তে আমায় লিখ্‌তে পয়ার মিল ক'রে
লাইনগুলো পোকার মতো বেরত পিল্‌-পিল্‌ ক'রে।
পঞ্জিকাটা মানো না কি, দিন দেখাটায় লক্ষ্য নেই?
লগ্নগুলি সব বইয়ে দিয়ে আজ এসেছো অক্ষণেই।
যা হোক তবু যা পারি তাই জুড়্‌বো কথা ছন্দেতে,
কবিত্ব-ভূত আবার এসে চাপুক আমার স্কন্ধেতে।
শিলংগিরির বর্ণনা চাও? আচ্ছা না হয় তাই হবে,
উচ্চদরের কাব্যকলা না যদি হয় নাই হবে;—
মিল বাঁচাবো, মেনে যাবো মাত্রা দেবার বিধান তো;
তার বেশী আর ক'র্‌লে আশা ঠকবে এবার নিতান্ত।

গর্মি যখন ছুট্‌লো না আর পাখার হাওয়ায় সরবতে,
ঠাণ্ডা হ'তে দৌড়ে এলুম শিলঙ্‌ নামক পর্বতে।
মেঘ-বিছানো শৈলমালা গহন-ছায়া অরণ্যে
ক্লান্তজনে ডাক দিয়ে কয়, "কোলে আমার শরণ নে।"
ঝর্‌না ঝরে কল্‌কলিয়ে আঁকাবাঁকা ভঙ্গীতে,
বুকের মাঝে কয় কথা যে সোহাগ-ঝরা সঙ্গীতে।
বাতাস কেবল ঘুরে বেড়ায় পাইন্‌ বনের পল্লবে,
নিঃশ্বাসে তার বিষ নাশে আর অবল মানুষ বল লভে।
পাথর-কাটা পথ চলেছে বাঁকে বাঁকে পাক দিয়ে;
নতুন নতুন শোভার চমক দেয় দেখা তার ফাঁক দিয়ে।
দার্জিলিঙের তুলনাতে ঠাণ্ডা হেথায় কম হবে,
একটা খদর চাদর হলেই শীত-ভাঙানো সম্ভবে।
চেরাপুঞ্জি কাছেই বটে, নামজাদা তার বৃষ্টিপাত;
মোদের 'পরে বাদল মেঘের নেই ততদূর দৃষ্টিপাত।

এখানে খুব লাগ্‌লো ভালো গাছের ফাঁকে চন্দ্রোদয়,
আর ভালো এই ছাওয়ায় যখন পাইন-পাতার গন্ধ বয়;
বেশ আছি এই বনে বনে, যখন-তখন ফুল তুলি
নাম-না-জানা পাখী নাচে, শিস দিয়ে যায় বুলবুলি।
ভালো লাগে দুপুরবেলায় মন্দমধুর ঠাণ্ডাটি,
ভোলায় রে মন দেবদারু-বন, গিরিদেবের পাণ্ডাটি।

ভালো লাগে আলো-ছায়ার নানারকম আঁক কাটা,
দিব্যি দেখায় শৈলবুকে শস্য-ক্ষেতের থাক কাটা।
ভালো লাগে রৌদ্র যখন পড়ে মেঘের ফন্দীতে
ছবির গায়ে ইন্দ্র মেলেন নীল সোনালীর সন্ধিতে।
নয় ভালো এই গুর্খাদলের কুচ্-কাওয়াজের কাণ্ডটা,
তা ছাড়া ঐ ব্যাগ্‌পাইপ নামক বাদ্য-ভাণ্ডটা।
ঘন ঘন বাজায় শিঙা-আকাশ করে সরগরম,
গুলী-গোলার ধড়্‌ধড়ানি, বুকের মধ্যে থরথরম্।
আর ভালো নয় মোটর-গাড়ির যোর বেসুরো হাঁক দেওয়া,
নিরপরাধ পদাতিকের সর্বদেহে পাঁক দেওয়া।
তা ছাড়া সব পিসু মাছি কাশি হাঁচি ইত্যাদি,
কখনো বা খাওয়ার দোষে রুখে দাঁড়ায় পিত্তাদি;
এমনতরো ছোটখাটো একটা কিম্বা অর্ধটা
যৎসামান্য উপদ্রবের নাই বা দিলাম ফর্দটা।
দোষ গাইতে চাই যদি তো তাল করা যায় বিন্দুকে,
মোটের উপর শিলঙ্ ভালোই যাই না বলুক নিন্দুকে।
আমার মতে জগত্‌টাতে ভালোটারই প্রাধান্য,—
মন্দ যদি তিন-চল্লিশ, ভালোর সংখ্যা সাতান্ন।
বর্তমানে শান্ত করি অনেকগুলো কাজ বাকি,
আছে চায়ের নেমন্তন্ন, এখনো তার সাজ বাকি।

ছড়া কিম্বা কাব্য কভু লিখ্‌বে পরের ফরমাসে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জেনো নয় কো তেমন শর্মা সে।
তথাপি এই ছন্দ র'চে ক'রেছি কাল নষ্ট তো;
এইখানেতে কারণটি তার ব'লে রাখি স্পষ্টত,—
তোমরা দু'জন বয়েসেতে ছোট-ই হবে বোধ করি
আর আমি তো পরমায়ুর ষাট দিয়েছি শোধ করি।
তবু আমার পক্ব কেশের লম্বা-দাড়ির সম্ভ্রমে
আমাকে যে ভয় করোনি দুর্বাসা কি যম ভ্রমে,
মোর ঠিকানায় পত্র দিতে হয় নি কলম কম্পিত,
কবিতাতে লিখ্‌তে চিঠি হুকুম এলো লম্ফিত।
এইটে দেখে মনটা আমার পূর্ণ হলো উৎসাহে
মনে হলো, বৃদ্ধ আমি মন্দলোকের কুৎসা এ।
মনে হলো আজো আছে কম বয়সের রঙ্গিমা,
জরার কোপে দাড়ি-গোঁপে হয় নি জবড়-জঙ্গিমা।
তাই বুঝি ছোটো যারা তা'রা যে কোন্ বিশ্বাসে
এক-বয়সী বলে আমায় চিনেছে এক নিশ্বাসে।
এই ভাবনায় সেই হতে মন এমনিতরো খুশ্ আছে
ডাকছে ভোলা "খাবার এলো" আমার কি আর হুঁশ আছে?
জানলা দিয়ে বৃষ্টিতে গা ভেজে যদি ভিজুক তো,
ভুলেই গেলাম লিখ্‌তে নাটক আছি আমি নিযুক্ত।
মনকে ডাকি "হে আত্মারাম, ছুটুক তোমার কবিত্ব,
ছোট দুটি মেয়ের কাছে ফুটুক রবির রবিত্ব।"
শিলং
২৬ জ্যৈষ্ঠ. ১৩৩৩।

● কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীমান্ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর—

কল্যাণীয়েষু,

দূর প্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় বাসায় ফিরে এনু,
হঠাৎ যেন বাজ্‌লো কোথায় ফুলের বুকের বেণু।
আতি-পাতি খুঁজে শেষে বুঝি ব্যাপারখানা,
বাগানে সেই জুঁই ফুটেছে চিরদিনের জানা।
গন্ধটি তার পুরোপুরি বাংলা দেশের বাণী,
একটুও তো দেয় না আভাস এই দেশী ইস্পানী।
প্রকাশ্যে ত'ার থাক না যতই শাদা মুখের চঙ্,
কোমলতায় লুকিয়ে রাখে শ্যামল বুকের রঙ্।
হেথায় মুখর ফুলের হাটে আছে কি তার দাম?
চারুকণ্ঠে ঠাঁই নাহি তা'র ধূলায় পরিণাম।।

যূথী বলে, "আতিথ্য লও, একটুখানি বোসো।"
আমি বলি চম্‌কে উঠে, আরে রোসো রোসো;
জিতবে গন্ধ, হারবে কি গান? নৈব কদাচিৎ।
তাড়াতাড়ি গান রচিলাম; জানি নে কার জিৎ।
তিন্‌টে সাগর পাড়ি দিয়ে একদা এই গান,
অবশেষে বোলপুরে সে হবে বিদ্যমান।
এই বিরহীর কথা স্মরি গেয়ো সেদিন দিনু,
জুঁই বাগানের আরেক দিনের গান যা রচেছিনু!

ঘরের খবর পাইনে কিছুই গুজোব শুনি নাকি
কুলিশ-পাণি পুলিশ সেথায় লাগায় হাঁকাহাঁকি
শুনছি নাকি বাংলা দেশে গান হাসি সব ঠেলে
কুলুপ দিয়ে ক'রছে আটক আলিপুরের জেলে।

হিমালয়ে যোগীশ্বরের রোষের কথা জানি,
অনঙ্গেরে জালিয়েছিলেন চোখের আগুন হানি।
এবার নাকি সেই ভূধরে কলির ভূদেব যারা
বাংলা দেশের যৌবনেরে জালিয়ে ক'রবে সারা।
সিমলে নাকি দারুণ গরম শুনছি দার্জিলিঙে
নকল শিবের তাণ্ডবে আজ পুলিশ বাজায় শিঙে॥

জানি তুমি বলবে আমায়, থামো একটুখানি,
বেণু-বীণার লগ্ন এ নয়, শিকল ঝম্‌ঝমানি।
শুনে আমি রাগ্‌বো মনে, কোরো না সেই ভয়,
সময় আমার আছে ব'লেই এখন সময় নয়।
যাদের নিয়ে কাণ্ড আমার তা'রা তো নয় ফাঁকি,
গিল্‌টি করা তক্‌মা-ঝোলা নয় তাহাদের খাকী।
কপাল জুড়ে নেই তো তাদের পালোয়ানের টিকা,
তা'দের তিলক নিত্যকালের সোনার রঙে লিখা।
যেদিন ভবে সাঙ্গ হবে পালোয়ানির পালা
সেদিনো তো সাজাবে জুঁই দেবার্চনার থালা।
সেই থালাতে আপন ভাইয়ের রক্ত ছিটোয় যারা,
লড়্‌বে তারাই চিরটাকাল? গড়বে পাষাণ-কারা?
রাজ-প্রতাপের দম্ভ সে তো একদমকের বায়ু,
সবুর ক'রতে পারে এমন নাই তো তাহার আয়ু।
ধৈর্য বীর্য ক্ষমা দয়া ন্যায়ের বেড়া টুটে
লোভের ক্ষোভের ক্রোধের তাড়ায় বেড়ায় ছুটে ছুটে।
আজ আছে কাল নাই ব'লে তাই তাড়াতাড়ির তালে
কড়া মেজাজ দাপিয়ে বেড়ায় বাড়াবাড়ির চালে।
পাকা রাস্তা বানিয়ে বসে দুঃখীর বুক জুড়ি,
ভগবানের ব্যথার 'পরে হাঁকায় সে চার-ঘুড়ি।
তাই তো প্রেমের মাল্য গাঁথার নাইকো অবকাশ,
হাত-কড়ারই, কড়াকড়ি, দড়াদড়ির ফাঁস।
শান্ত হবার সাধনা কই, চলে কলের রথে
সংক্ষেপে তাই শান্তি খোঁজে উল্‌টোদিকের পথে।
জানে সেথায় বিধির নিষেধ, তর সহে না তবু,
ধর্মেরে যায় ঠেলা মেরে গায়ের-জোরের প্রভু।
রক্ত-রঙের ফসল ফলে তাড়াতাড়ি বীজে,
বিনাশ তা'রে আপন গোলায় বোঝাই করে নিজে।

রাহুর দম্ভ, রাহুর মতো একটু সময় পেলে
নিত্যকালের সূর্যকে সে এক-গরাসে গেলে।
নিমেষ পরেই উগ্‌রে দিয়ে মেলায় ছায়ার মতো,
সূর্যদেবের গায়ে কোথাও রয় না কোনো ক্ষত।
বারে বারে সহস্রবার হ'য়েছে এই খেলা,
নতুন রাহু ভাবে তবু হবে না মোর বেলা।
কাণ্ড দেখে পশু-পক্ষী ফুক্‌রে ওঠে ভয়ে,
অনন্তদেব শান্ত থাকেন ক্ষণিক অপচয়ে।।
টুট্‌লো কত বিজয়-তোরণ, লুট্‌লো প্রাসাদ-চূড়ো,
কত রাজার কত গারদ ধুলোয় হ'ল গুঁড়ো।
আলিপুরের জেলখানাও মিলিয়ে যাবে, যবে
তখনো এই বিশ্ব-দুলাল ফুলের সবুর স'বে।
রঙীন কুর্তি, সঙীন মূর্তি রইবে না কিছুই,
তখনো এই বনের কোণে ফুট্‌বে লাজুক জুঁই
ভাঙ্‌বে শিকল টুকরো হ'য়ে, ছিঁড়বে রাঙা পাগ,
চূর্ণ-করা দর্পে মরণ খেলবে হোলির ফাগ।
পাগ্‌লা আইন লোক হাসাবে কালের প্রহসনে
মধুর আমার বঁধু রবেন কাব্য-সিংহাসনে।
সময়েরে ছিনিয়ে নিলেই হয় সে অসময়,
ক্রুদ্ধ প্রভুর সয় না সবুর, প্রেমের সবুর সয়।
প্রতাপ যখন চেঁচিয়ে করে দুঃখ দেবার বড়াই,
জেনো মনে, তখন তাহার বিধির সঙ্গে লড়াই।
দুঃখ সহার তপস্যাতেই হোক্ বাঙালীর জয়,
ভয়কে যারা মানে তারাই জাগিয়ে রাখে ভয়।
মৃত্যুকে যে এড়িয়ে চলে মৃত্যু তা'রেই টানে,
মৃত্যু যারা বুক পেতে লয় বাঁচতে তা'রাই জানে।
পালোয়ানের চেলারা সব ওঠে যেদিন ক্ষেপে,
ফোঁসে সর্প হিংসা-দর্প সকল পৃথ্বী ব্যেপে,
বীভৎস তার ক্ষুধার জালায় জাগে দানব ভায়া
গর্জি বলে আমিই সত্য, দেব্‌তা মিথ্যা মায়া;
সেদিন যেন কৃপা আমায় করেন ভগবান,
মেশিন্‌-গান্‌-এর সম্মুখে গাই জুঁইফুলের এই গান—
বুয়েনোস্ এয়ারিস্,
২০ ডিসেম্বর, ১৯২৪।

(বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

পুতুলখেলা

শ্রীমঞ্জুষ দাশগুপ্ত

পুতুল নাচের খেলা লোকটা দেখায়
[illegible]লিকা সুতোর টানে—মুগ্ধ হয় দর্শকেরা জানিঃ
[illegible]রতালি দেয় উপহার
[illegible]র সাথে সিকি পয়সা আনি ও দুয়ানি
[illegible]ন্তুর একটি ছবি ফুটে ওঠে তার চোখে মুখে
[illegible]নবে তার শিল্পরীতি অনন্যভুবনে—
জীবিকার দ্বন্দ্বময় সকালে বিকালে
একটি আশ্চর্য খুশী চিল হয়ে ওড়ে তার মনে।

অথচ এ লোকটাই হয়ে যায় হঠাৎ পুতুল
একটি মেয়ের কোনো চোখের ইঙ্গিতে—
যার হাতে দিয়েছিল একদিন নীল ভালোবাসা
এবং উষ্ণ আশা থরোথরো অঘ্রাণের শীতে।
অতএব যে নাচায়—সেও নাচে—একথা স্বীকৃত
পুতুল নাচের খেলা পৃথিবীতে চলে নিয়মিত।

বুদ্ধ গায়েন দিশা—
জলপত্তি সুরয়: সবে
ধর্মো রক্ষতি ধার্মিকম্ ॥
॥ গীত ॥
সুরপুরে সুরগণ বলিভুজ
কেহ দ্বিভুজ, কেহ চতুর্ভুজ
সংখ্যাতে অল্প না
করেন কল্পনা জল্পনা
গুজ গুজ ফুস্ ফুস্।
দোহার। বড় গোল বেঁধেছে অন্তর্যামী
ইন্দ্ররাজার সিংহাসনের একটা কোণে
হাতির দাঁতে টোল খেয়েছে।
নারদ। কংস করোতি কল্যাণং
কংস কুঞ্জর কেশরী
কালিন্দী জল কল্লোল
কোলাহল কুতুহলী।

মূল গায়েন গীত—
কি জানিবেন বিশ্বকর্মা, অগোচর শিব ব্রহ্মা
অকস্মাৎ বজ্রাঘাত উৎপাত বা কি আসে কি জানি
হয় লয় নয় প্রলয় নয় প্রণয় ঘটিত ব্যাপার জানি।
ভুড়ি জুড়ি নারদ গীত—
প্রভাতেই মেঘাড়ম্বরে ঝড় চলে ঝাপটা দিয়া
মনটা বলছে হয়তো করছে
কোথাও কেউ বা বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।
কোনো ঋষি কারু শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়ছে
কিম্বা করছে একাদশী, কেউ মান ভরে ঘরে খিল দিয়া।
॥ প্রবেশ মাতলি, ইন্দ্র, ইন্দ্রাণী, বাল্মীকি ॥
দেবতাদের গীত—
কে জানে কোন সে ঋষি
কো জানন্তি ঋষি কি ঋষি করতেছেই বা কি
চলেছে এখানে কল্পনা জল্পনা
দিবা নিশি শনি যেন গেল গেল দিশি দিশি

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অপ্রকাশিত রঙ্গব্যঙ্গকাণ্ডপালা

দোহার। রোল তুলেছে গোলমেলে হাওয়ায়
গোলোকপতিরও ঘুম ভেঙেছে
নারদ। ওহে, গোলটা কিসের জানো তো বল। সবাই বলছে গোল বেঁধেছে। ওহে ও বৃহস্পতি শুক্র শনি রবি সোম মঙ্গল বুধ, সাড়া শব্দ নেই—পতুলের মতো বসে যে মুহ্যমান হয়ে—ব্যাপারটা কি?
॥ গীত ॥
রবি আছেন আচ্ছন্ন ধূপ
সোম সোমপাত্রে দিচ্ছে না মুখ।
মঙ্গল যেন দেখছেন অমঙ্গল
হতবুদ্ধি চেয়ে আছেন বুধ
গুরু গম্ভীর বৃহস্পতি
ত্র্যহস্পর্শ পেয়ে যেন মতিভ্রষ্ট চুপ
শুক্র শুষ্ক মুখ কিন্তু যেন উগ্র
শনি যেন অশনির ভয়ে এতটুক।
নারদ। বলি ওহে বিশ্বকর্মা, ব্যাপার কি? স্বর্গের দ্বারে বিশ্বকর্মগণের গগনভেদী চিচ্‌কার শুনলেম না? ইন্দ্রবাণীর রন্ধনাগার হতে বিশ্বগন্ধ সুবাসিত ধূম কুণ্ডলায়িত হয়ে সুরসভা গন্ধায়িত করছে না? বলি ক্রিয়াকাল উপস্থিত তবু বিশ্বকাগণের সকাতর কুক্কুরব শ্রুতিগোচর হচ্ছে না? বিশ্বপর্ণি বিশ্বকেশনা নন্দন বনের কোণে কাঁদছে—ব্যাপার কিছু জানো?

আশঙ্কায় সোম না তলায়
পায় পায় অমঙ্গল গণি দেব ঋষি
নারদ। এ কি দেবরাজ এমন কাতর দেখছি কেন? মহর্ষি বাল্মীকি, দেবযানী হঠাৎ কি ব্যামোই উপস্থিত হল?
বাল্মীকি। সুররাজকে আমি এসে অবধি ম্রিয়মান দেখছি। বোধহয় রামচন্দ্রের বনগমন শুনে মন চঞ্চল হয়েছে।
ভুড়ি জুড়ি নারদ গীত—
সুররাজ বল হে আজ কেন বিরস বদন
কি কারণ হলে এমন
কি জন্য দুঃখ মনে, বিষণ্ণ কি কারণে
নীরধার অজস্র সহস্র নয়নে
ঘটিল কি বা অলক্ষণ, দেখি সকাতর তোমারে বিলক্ষণ।
ইন্দ্রাণী ও অপ্সরাগণের গীত—
কি অভাবে হল এমন ভাবান্তর
ভাবিয়া না পাই কি জন্য সদাই কাতর
হৃদয় বেদনা প্রকাশি বল না
নিরব রয়োনা অধীনার পর।
ইন্দ্রের গীত—
ভাঙলো কপাল এতকাল পরে
মরি যাতনা ভরে সকাল বিকাল
প্রতিক্ষণ বলিতেছে মন, পুন নির্বাসন
ঘটিবে আমার আবার সত্বরে

নৃত্য করে অর্ধনগ্ন শত দক্ষিণ নয়ন
অন্ধকার স্বরগ ভবন করি নিরীক্ষণ
অমৃত পাত্র হয়ে করধৃত হয় ঘন কম্পিত
ভয় বিকম্পিত মন কেবলি অস্থির
হাহাকার অবিরত কর্ণে আসে ঘর্ম ঝরে
ত্রস্ত করে ত্রাসে
বিধির এ বিড়ম্বন কে নিবারণ করে?

দেবতাদের গীত—
থাকতে বাজ দেবরাজ সভয় এত কি কারণে?
দৈব বলে বলীয়ান যে কি তার ভয় ত্রিভুবনে?
হে দেব সুরপতি সহস্রাক্ষ
সহায় তব কৈলাসপতি বিরূপাক্ষ
পক্ষে তব যতেক যক্ষ ধনাধ্যক্ষ
অলক্ষ হয়েছে অসুরগণে।

নারদ। এই কথা? আমি আসছি একবার পৃথিবীটা দেখে।
জানা যাবে কোথায় কি ঘটছে।

ইন্দ্রের গীত—
ঠাকুর আপনি ছেড়ে যাবেন কোথা
একা রেখে আমায় হেথা?
একা আমি থাকতে ডরি
ছায়া দেখলে আঁৎকে মরি
মন নাহি বসে কোথা।

নারদের গীত—
আমায় ছাড়ান দাও হে এবার সহস্রলোচন
ঘুরে দেখে আসি একবার ত্রিভুবন
কোথায় কি হতেছে সংঘটন।

ইন্দ্র— সব গোলমাল ঠেকছে আমার
উদাসীন হয়ে যেতে চাচ্ছি বন।

বাল্মীকি। ওহে মাতলি, তুমি কিছু জানো তো কও।
মাতলি। জানেন তো হৃদকম্প রোগ চিরকালই আছে।
বানর হয়ে রামলীলায় নামতে হবে সে একটা দুর্ভাবনা;
তার উপর হঠাৎ এই পৃথিবীর দিক থেকে কেমন
একটা এলোমেলো হাওয়া লাগল গায়ে, সেইদিন
থেকে এই প্রকার হয়ে পড়েছেন।

ইন্দ্রাণীর গীত—
মর্তের একটা গর্তে বসে কে জানে কি মন্তর জপেছে
স্বর্গে এখানে অন্তর্যামী ইন্দ্ররাজার কাঁপ ধরেছে
কে জানে কোন তাপসী পঞ্চতপায় গেছে বসি
এখানে তারই তাপ চড়েছে
পুরন্দরের ধন্ধা ঘটেছে।

বল দেখি নারদ, কি আছে উপায়?
আমার কর্ম দোষে মর্মবেদন—বুঝি প্রাণ যায়
মৃত্যু নাই, আমায় ভুলেছে শমন।

বাল্মীকি। ঘোর সঙ্কটে পড়া গেল। কিচকিন্ধ্যা কাণ্ড এগিয়ে
এলো, এই সময় এই ব্যাঘাৎ?

ইন্দ্রাণী। এ নিশ্চয় কোনো রাক্ষসী-মায়ায় পড়েছেন ইন্দ্র।
উনি যাতে না ঋষ্যমুখে যান সেই চেষ্টা করছে রাবণ।

বাল্মীকি। রাবণ এ কাজ করলে আমি জানতেম আগে।
রামায়ণে যখন এ কথা ওঠেনি, তখন এজন্যে ভাববার
কারণও নেই।

নারদ। কি জানি যদি—আমার তো মনে হয় কবিগুরু আপনি
তাড়াতাড়ি মহাকাব্য লিখতে এ ঘটনাটা ফেলে গেছেন।

বাল্মীকি। তা হয় না। ইন্দ্রত্ব ওলটাতে পারে, রামায়ণের এক ছত্র ওল্টানোর সাধ্য স্বয়ং বিধাতারই নেই। রাবণের হাত এতে নেই আমি বলছি।

নারদ। অধ্যাত্ম রামায়ণে বোধ করি—

বাল্মীকি। কি বল। সপ্তকাণ্ড ছাড়া কি রামায়ণ হতে পারে?

নারদ। শুনেছি ক্ষপণকী রামায়ণও বেরিয়েছে রাবণের সভা থেকে। তাতেও ইন্দ্রের এই ঘটনা থাকতে পারে।

বাল্মীকি। এ হতে পারে। ইন্দ্রের ভীরুতা প্রকাশ করার চেষ্টায় এমন কুৎসাপূর্ণ ঘটনাসমন্বিত একটা পুস্তিকা প্রকাশ করা সেই দুর্দান্ত কাপুরুষ লঙ্কেশ্বরের পক্ষে অত্যাশ্চর্য নয়।

রাজ্য হল অসহ্য শয্যা কই শয়ন করি
বাক্য না সরে বদনে
কাঁপে অঙ্গ সঘনে, সুখ নাই শয়নে
ত্রিভুবন অন্ধকার নয়নে হেরি।

মাতলি। গুপ্তচরেদের সন্ধানে পাঠানো হয়েছিল মর্তলোকে, তাঁরা ফিরেছেন, তাঁদের একবার ডাক দিয়ে খবর নিলে হতো।

ইন্দ্র। প্রবেশ করাও। শুনি তাঁরাই বা কি বলেন।

(হুজুগ ও গুজুবের প্রবেশ)

॥ গীত ॥

জয় হোক দেবতার, দেবতার জয় জয় কার
দ্যুলোকের দুই দুই অফসার

নারদ। ওহে অশ্বিনীকুমারেরা। দেখ তো মর্তের কোনো আধিব্যাধি কি না?

অশ্বিনী। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে গায়ের বর্ণ পীত, নাড়িতে বায়ু এবং শ্লেষ্মার প্রকোপ যথেষ্ট রয়েছে। বোধ হচ্ছে এটা হিস্ত্রীয় নামক যাবনিক রোগ। অনবরত সোম-পান এবং অপ্সরাগণের নৃত্যগীতাদি শ্রবণ ও দর্শন হচ্ছে এর মহৌষধ।

ইন্দ্রাণী। যেমন রোগী, বৈদ্যও জুটেছে তেমনি। রসায়নের মধ্যে সোমরস আর পঞ্চমকারের পাঁচন শিখেছেন।

[প্রস্থান।

ইন্দ্রের গীত—

যায় প্রাণ এখন কি করি
এ যন্ত্রণা আর সহেনা সহেনা মরি, ম'রি

হুজুগদারি গুজুবকারি কারবার।
দুই ভাই দুই কাজে দড়
ছোট আর বড়
হুজুগ ধরি গুজুব করি যেদিন পড়ে পালা যার।
কাজটাতে বিশেষ কিছুই লভ্য নাই এমন
পুরস্কার, এনতার ঘোরাঘুরি ত্রিভুবন
খুব পাই ধরা গেলে দোমারে মার বেদম
মোরা নয় যেমন তেমন অফসার
হুজুগ গুজুব মিথ্যে সত্যির বেনামদারি খরিদ্দার।

হুজুগ। অযোধ্যাতে গেলাম, রামচন্দ্রের বনবাস দেখে এলাম অযোধ্যা কাণ্ডের চুকেছে হুজুগ, অরণ্যকাণ্ডের চলেছে উদ্যোগ, রাবণ বধের বিলম্ব আছে জেনে এলাম।

ইন্দ্র। মন্দের ভাল বুঝে নিলাম।

গুজুব। হুজুর শুনে এলাম মস্ত গুজুব
বালখিল্যদের অত্যাচারে জাবালি মুনি অতিষ্ঠ হয়ে
চটে গিয়ে হাড়ে হাড়ে
হয়ে নিরাশ—পরিত্যাগ করেছেন অযুদ্ধার বসবাস।

ইন্দ্র। ঋষির উপর অত্যাচার—এ কি সর্বনাশ।
মাসাধিক কাল হল ঋষি
হিমালয়ের সানুদেশে কিরাতগণের মধ্যে বসি
নিযুক্ত হয়েছেন ঘোরতর তপস্যায় শতক্রর চরে
দিনান্তে একটিমাত্র রোহিত মাছ আহার করে
পঞ্চতপা করেন দিবানিশি।

ইন্দ্র। যা ভেবেছিলাম তাই। ইন্দ্রত্ব যায় বুঝি এবার।

বৃহস্পতি। দিনান্তে একটি রোহিত মৎস্য—নির্মৎস্যর তপস্যাই তো বটে।

ইন্দ্র। পঞ্চতপার চেয়ে কঠিন তপে বসেছেন ঋষি, মতলব কি শুনলে কিছু?

গুজুব। অভিসন্ধি এখনও প্রকাশ পায়নি। হুজুব যে রামচন্দ্রের বনগমন যাতে না হয় এবং রাবণ বধ নিবারণ হয় সেই কল্পে—

বৃহস্পতি। তবু ভাল ইন্দ্রত্বের উপরে দৃষ্টি নেই তো।

ইন্দ্র। বুঝছ না, এর মধ্যে কূট রাজনীতি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। রাম থাকুন অযোধ্যায়, রাবণ থাকুন লঙ্কায়, ইন্দ্র থাকুন ঘাস কাটতে চিরকাল রাবণের অশ্বশালে, জাবালি এসে সুড় সুড় করে বসুন অমরাবতীতে বত্রিশ সিংহাসন দখল করে।

বাল্মীকি। এ কাজে জাবালিকে নামাবার মূল কারণ হল বালখিল্যগণ আর তাদের অত্যাচার।

বৃহস্পতি। এ রকম ছেলেখেলা বালখিল্যগণেরই শোভা পায়।

ইন্দ্র। এখন উপায়? এ অবস্থায় স্বর্গরাজ্য ছেড়ে অঙ্গদ যুবরাজ হয়ে ঋষ্যমুখে,তো রামলীলায় আমার যাত্রা করা চলে না হে বাল্মীকি কবি।

বাল্মীকি। কেন, কেন, তাহলে যে রামায়ণ লেখাই আমার বৃথা হয়ে যায়—এ হতে পারে না।

ইন্দ্র। তা তো বুঝছি, কিন্তু উপায় কি? অমরগণই বা আমায় একলা ফেলে বানবাবতারে যান কি বলে?

দেবতাদের গীত—

> ধরায় যাবো কেমনে?
> আমার নিতান্ত ভয় যে মনে
> রাজ্য যায় এখানে
> আমারে তুমি ক্ষমা কর কবীশ্বর
> পারবো না কপি অবতারে হতে অগ্রসর।

বাল্মীকি। জান না জন্মেছেন জগতের ঈশ্বর, মানবলীলায় দশরথ ভবনে? রাম করেছেন পরশুরামের দর্পহরণ—শেষে কি তোমারো অদৃষ্টে ঘটবে মরণ?

ইন্দ্র। কি জানি কি ঘটে?
এ সঙ্কটে তারণ করিবে কে এ জনে?
এখন কি করা যায় হে নারদ জাবালি বসেছেন ঘোরতর তপস্যায়।

নারদ। রোগ ধরা গেছে, এখন জাবালির ধ্যান ভঙ্গ কর, চুকে যাক ল্যাঠা।

ইন্দ্র। মাতলি, নটাচার্য ভরত মুনিকে শীঘ্র আসতে বল, জরুরি কাজ।

বাল্মীকি। আমার কি হবে তাহলে? কিচকিন্ধা কাণ্ডটাও নিকট।

ইন্দ্র। আপনি এখন আশ্রমে যান. আমি সব এদিককার ব্যবস্থা করে নিই।

বাল্মীকি। যাই দেখো বাপু, বিলম্বে কার্যহানি না হয়। জয়ন্ত।
(প্রস্থান)

ইন্দ্র। যাক এখন—

(ভরত মুনির প্রবেশ)

ভরত। দেবরাজের জয়—

ইন্দ্র। জয় কোথায়, পরাজয় নিকটবর্তী। দেখুন, আমরা অন্তর্যামী বটে কিন্তু রাজকার্যে মনুষ্যগণের ন্যায় অনেক ক্ষেত্রে গুজবের উপরে নির্ভর করে কাজ করতে হয় আমাদেরও। শুনছি জাবালি সম্প্রতি ঘোরতর তপস্যায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁকে নিরস্ত করবার জন্যে উর্বশীকে একবার পাঠাতে হচ্ছে মর্তধামে।

ভরত। উর্বশীকে পাওয়া অসম্ভব। কাব্যলোকে কল্পবাস করছে পুরূরবার সঙ্গে। গুমোরে মাটিতে সে আর পা ফেলতেই চায় না।

ইন্দ্র। হুঁ তার ভারি তেজ হয়েছে।

নারদ। মর্তের কবিগুলোই স্তুতিবাদ করে ওর মস্তকটি ভক্ষণ করেছে। এখন কিছুকাল তারে বিরাম দাও।

ভরত। দিনকতক অমরাবতীতে আবদ্ধ রাখলে আপনিই সে মর্তে ফেরার জন্যে আবদার ধরবে তখন—

ইন্দ্র। তখন পর্যন্ত অপেক্ষার সময় নেই আমাদের, শীঘ্র রামলীলায় যাত্রা করতে হবে—কবিগুরু তাগাদা দিয়ে গেছেন। উর্বশী না হয় অন্য কোনো অপ্সরীকে পাঠানো চাই অবিলম্বে।

ভরত। মেনকা তাঁর কন্যাকে দেখতে গেছেন। তিলোত্তমাকে অশ্বিনীকুমারেরা এখনো তিনমাস—

অশ্বিনী। থাক না ও কথা।

ভরত। অলম্বুষা তো পা মচকিয়ে পড়ে আছে—নাচানো চলবে না।

ইন্দ্র। খঞ্জ অপ্সরীতে কাজ হবে না। রম্ভা? রম্ভা কোথায়?

ভরত। অষ্টাবক্র দেবগণের উপর বক্রভাবাপন্ন হওয়ায় রম্ভা তাঁকে সিধে করতে গেছেন।

ইন্দ্র। আরো যে অনেকগুলি অপ্সরী ছিল—তিত্তিড়ি,বেগুনী, পলংগী, নারঙ্গী, ডাড়িম্বা, তেলাকুচি, গান্ধালী, গোলালু, সব মরেছে নাকি? নাগদন্তা, হেবা, সোমা, নীলোৎকরী, হুরনুরী, ডানাকাটি প্রভৃতি প্রায় তিন শত?

ভরত। লঙ্কেশ্বর অপহরণ করেছেন। বাকি আছে কেবল মিশ্রকেশী ও ঘৃতাচী।

ইন্দ্র। আঃ! আমারে না জানিয়ে যত্রতত্র অপ্সরাদের কেন পাঠানো হয় যার তার ধ্যানভঙ্গ করতে। এতে করে মার্নবর্ষি প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে, থেকে থেকে ক্রমাগত ধ্যানে বসতে আরম্ভ করেছে ওদের দেখাদেখি মোহান্ত সাধু-সন্ন্যাসী যে যেখানে আছে। এখন কর্তব্যেস্মিন কর্মণি। কি করা যায়, কাকে পাঠানো যায়? মিশ্রকেশীর অর্ধেক মাথায় টাক, অর্ধেক কেশ পাকা।

নারদ। আমার কাছে জাবালির বয়েস ধরা আছে। তিনি তো যুবা নন একটু গৃহিণী বাহিনী অপ্সরাই তাঁকে ক্রমান্বয়ে বশ করতে পারবে।

ইন্দ্র। বয়েস হয়ে গেছে বলেই তো বলছি মিশ্রকেশী চলবে না, বরং ঘৃতাচীকে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হোক। একপ্রস্থ চীনাংশুক আর উপযুক্ত অলঙ্কারাদিতে সাজিয়ে পাঠাও তাকে। যাও মাতলি —আর দেখ, ওখানে নন্দনে কন্দর্প ও বসন্ত রয়েছেন, তাঁদের প্রেরণ কর সত্বরে। শশধর কোথায় মাতাল?

মাতলি। আজ্ঞে পৃথিবীতে এখন বুলন পূর্ণিমা---সেখানে চন্দ্র—

ইন্দ্র। তা হোক; মেঘগণকে পাঠাও, শীঘ্র তাঁর ছুটি করে পাঠাক। ভরত, তুমি সকলের ভার নেবে যথাযথ উপদেশ দিয়ে। এইখান থেকে যাও মর্ত্যলোকে নেমে সোজা জাবালির আশ্রমে। আর দেখ, এই যে কন্দর্প, তোমারও যেতে হবে জাবালির দর্প চূর্ণ করতে। তোমার সেই অভ্ররচিত অঙ্গাবরণটা পরে নিও---দ্বিতীয়বার ভস্ম হবার ভয় থাকবে না। আ, বসন্ত যে! দেখ, তুমি একশত কোকিল পিক এবং মধুচক্রসুদ্ধু মধুকর ও পুষ্পাদি—বুঝলে?

বসন্ত। বুঝেছি।

॥ গীত ॥

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর বিনে

মধুহীন মর্ত্যভূমি হইয়াছে এতদিনে

যেরূপ আদেশ করছেন তাই হবে।

ইন্দ্র। যাক নিশ্চিন্ত হলাম। ঘৃতাচী কই?

মাতলি। মর্ত্যে যাবার নামে তিনি ঘন ঘন মূর্চ্ছা যাচ্ছেন।

ইন্দ্র। নটাচার্য, ওর এবার উপর বিশ্বাস নেই, জনদুই নতুন অপ্সরীকে সঙ্গে নেবেন প্রস্তুত করে। এ কাজে এখন থেকে ওদেরও সুশিক্ষিতা করা চাই।

নারদ। তা আর বলতে? আমিও যাচ্ছি সঙ্গে—একশত কোকিলাদি তো যাবেই, সেই সঙ্গে পিঞ্জরভর্তি গ্রাম্য কুক্কুট আদি মায় ডিম কাচ্চা বাচ্চা নেওয়া চাই। আজকালের ঋষি তাতে জাবালি একটু বেশ ছিষ্টিছাড়া মতের মানুষ।

ইন্দ্র। নিশ্চয়। উপরন্তু কুম্ভ কুম্ভ ঘৃত, দধিস্থালী গুড় দ্রোণী এবং ঋষি-পত্নীর জন্য বোম্বাই সাটিকা চোলিকা প্রভৃতি, বুঝলে নটাচার্য যেমন করে হয় জাবালিকে নিরস্ত করা চাই। গান বাজনা সমস্ত বিষয়ে রীতিমত মহলা দিয়ে তবে কাজে অগ্রসর হবে। মাতলি, ঐরাবত প্রস্তুত রাখ এদের পৌঁছতে।

মাতলি। কোথায় পৌঁছব সেইটেই তো বুঝলেম না।

ইন্দ্র। কেন?

মাতলি। কোন অরণ্যে জাবালি আছেন সেটা—

ইন্দ্র। ঠিক তো!

নারদ। আমি যাচ্ছি ঠিক খুঁজে নেব। চল বিলম্বেনালম।

ইন্দ্র। চল আমরা যে-যার স্থানে যে-যার কাজে অগ্রসর হই।

দেবদুন্দভি গীতবাদ্য---

স্থৈর্য ধৈর্য শৌর্য বীর্য গাম্ভীর্য আকর

সংগ্রামে দুর্গম্য যিনি গুণের সাগর

বহুবিধ বেদ বাদে বিপুল বিদ্বান

অস্ত্রশস্ত্র মন্ত্রতন্ত্রে সতত সন্ধান

মহৈশ্বর্য দেবপূজ্য দেব পুরন্দর

চর্বচোষ্য লেহ্যপেয় পানেতে তৎপর

জয় জীবতু জয় জীবতু যাবচ্চন্দ্র দিবাকর।

(সকলের প্রস্থান)

॥ নট-নটীর গীত পিঁজরা ও আটাকাঠি হাতে ॥

ও আমার যাদু বাছা কোন বনেতে যাও

পিঁজরাতে বসি ময়না চিকণ দানা খাও।

খায় দায় পাখিটি, বনের দিকে আঁখিটি

উড়িয়া যাইতে ময়না ফিরিয়া না চায়।

মূল গায়েনের দিশা—

প্রবিশ্যতু মহারণ্যং রাম রাজীবলোচন

বিরাধং রাক্ষসং হত্বা শরভঙ্গং দদর্শ হঃ।

তড়িজুড়ি গীত--

নানা মৃগ গণাকীর্ণ মৃক্ষ শার্দূল সেবিতম্

ধ্বস্ত বক্কলতাগুল্ম দুর্দর্শ সলিলাশয়ম্

নিষ্ক্রমান শকুনি ঝিল্লিকাগণনাদিতম্

লক্ষ্মণানুচরো রামো বনমধ্যং দদর্শ হঃ।

(রাম, লক্ষ্মণ, সীতার প্রবেশ)

রাম। ভাই লক্ষ্মণ, এই কি দণ্ডক বন?

রাম সীতা লক্ষ্মণ তিনজনে—
গহন বন গাছপালা, দিবানিশি নীল ঢালা
উপরে নীচে উড়কুড় নাই
হরিণ চলে অলি গলি
জল ঢেকেছে পদ্মকলি
সম্মুখেতে গিরিশৃঙ্গ দেখিবারে পাই।

মূল গায়েনের গীত—
দিনে ওঠে হেথা ঝিল্লির রব
নিঃশব্দে বয় বায়ু কি যেন করিয়া অনুভব।
তমোময় ক্রম নিশ্চল নিঝুম।
হেলা দোলা ক্ষান্ত দিয়া স্থির আছে সব।

সীতা। ঘনাইয়া আছে বন আঁধার পাতিয়া
ভয়ের দুর্গ দশদিক করি একাকার

লক্ষ্মণ। শাখা ঠেকে গায়, বাধা নাহি পায়
বিষম ঠোকর খাই পথ চলা ভার

সীতা। ডাকিলে সাড়া দিবার নাহি লোক

রাম। মর মর ধ্বনি করিছে বায়ু পেয়ে যেন শোক
দারুণ ব্যাপার, অরণ্য অপার
শাখা বাহু উদ্যমিয়া খেদায় আলোকে।

তুড়িজুড়ির গীত—
হা রে কভু বাদুড়ের পাখা ঝাপটি তরু শাখা
গতি করিয়া বাঁকা বাজিয়া যায়
কভু বা বনবিড়াল বাহিয়া উঠিছে ডাল
লইয়া লুটের মাল লাফায় ঝাঁপায়
গরজন সুবিকট হল শুনি সন্নিকট
গো মৃগ ঝটপট খুঁজে আড়াল
ডালপালা ঝোপঝাড় করিয়া তোলপাড়
পলায় দুদ্দাড় মৃগের পাল।

সীতা। সম্মুখে চাহিয়া দেখ তাকাইয়া
আঁধার মূরতি এক আছে দাঁড়াইয়া ;
হাতে লাঠিগাছ, যেন তালগাছ
উচ্চে উঠিয়াছে শির বন ছাড়াইয়া।

রাম। রাক্ষস না জানোয়ার বুঝে ওঠা ভার
কেবা ওই দেখা দিল সম্মুখে কিম্ভূতকিমাকার।

লক্ষ্মণ। ওষ্ঠমাস ঠেলি দন্ত আছে মেলি
চিমসিয়া অঙ্গুলিতে বক্র নখ ধার

তুড়িজুড়ির গীত—
দেখি কি বা মূরতি ভীষণ, অতি ঘোর দরশন
পিঙ্গল নয়ন দুটি, ঘন দন্ত কটমটি
জ্বলিছে উদর মাঝে ঘোর হুতাশন।
লোল জিহ্বা বিকৃত দেহ, কারো প্রতি নাহি স্নেহ
পশু নাশি করে শোণিত শোষণ
নাহি রুচি নাহি শুচি বিষম দুর্জন।

(বিরাধের প্রবেশ)

বিরাধ। কে রে তোরা অল্পপ্রাণ চীরবাস পরিধান
দণ্ডক বনে ঘর, আমি নিশাচর, বিরাধ আমার নাম।

রাম। ইক্ষ্বাকু বংশীয় ক্ষত্রিয় বনচারি নাম শ্রীরাম

লক্ষ্মণের গীত—
কে তুই বল কিসের কারণ
ঘোরতরে বনে করিস ভ্রমণ
বল তোর পরিচয়
জানিবার ইচ্ছা হয়
আমার নাম ভাই লক্ষ্মণ।

বিরাধ। বিরাধ আমার নাম
বিরোধ বাধাই, পথরোধ করি আমি
হস্তী গিলে খাই
তিনটা কেশরী চারটা শার্দূল
দুই বৃক দশ মৃগ আছে মোর শূলে গাঁথাই
যবের তনয় আমি, মাতা মোর শতহ্রদা
তপেতে প্রসন্ন ব্রহ্মা মোর 'পরে সদা
নিপাত নাই সহজেতে
অস্ত্রাঘাতে আমি না ডরাই
আমি এই সুন্দরীকে চাই
এই দেখ লয়ে পালাই।

সীতা। গেলাম গেলাম গেলাম ওহে
হা রাম হা লক্ষ্মণ মারা যাই।

বিরাধের নৃত্যগীত—
ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি, হাড় গোড় ভাঙ ঘাড়
ছাড় ছাড় আর ছাড়, জাঙ্গাল উড়ে পার

(বিরাধ ও সীতা অদৃশ্য)

॥ রামের গীত ॥
দেখি ঘোর অন্ধকার
তরজে গরজে মেঘ বারম্বার
হুহুঙ্কার বজ্র শব্দ, পশুপক্ষী রয় স্তব্ধ
আতঙ্কে হতেছে ভঙ্গ ভরসা আমার
বুঝিবা বৈদেহীরে হারানু এবার

(নেপথ্যে—গেলাম গেলাম গেলাম, ওহে)

লক্ষ্মণ। চল চল ভাই, ত্বরা করে ঐ ধারে যাই।

রাম। প্রাণপণে খোঁজ এ বন সে বন
ভাই লক্ষ্মণ, সীতারে কোথা পাই।

লক্ষ্মণ। দূরে যায় নাই, চল ওই ধারে যাই।

রাম। না না ভাই হোথা সীতা নাই
ওই ধারে যদি পাই।

রামের গীত—
হায় রে লক্ষ্মণ এ কি অলক্ষণ দেখি বিলক্ষণ
জনক সুতা আমার দয়িতা
নিশাচর অপহৃতা এইক্ষণ

বিমাতা কৈকেয়ীর হে লক্ষ্মণ বীর
বুঝি চিরসাধ হল সম্পূরণ।

লক্ষ্মণ। আর্য! এই চিরদাস তব সহচর
সকলের নাথ তুমি বীর রঘুবর
কি হেতু একণে তবে অনাথের মতো
আকুল হইয়া শোক কর অবিরত
আজ আমি রোষভরে একমাত্র বাণে
এই দুষ্ট নিশাচরে বধিব পরাণে
আজ বসুমতী এ উত্তপ্ত শোণিত
পান করিয়া হইবেন অতি হরষিত।

রাম। জননী কৈকেয়ী আমাদের তরে করিল সঙ্কল্প যাহা
যেইরূপ বর চাহিয়া লইল পূর্ণ হইল তাহা।

লক্ষ্মণ। রাজ্যলোভী ভরতের উপর আমার
হয়েছিল যেই মহাক্রোধের সঞ্চার
আজ সেই ক্রোধ আমি দাদা মহাশয়
নিক্ষেপিব এর প্রতি নিশ্চয় নিশ্চয়।
মম এ বাহুর বলে বেগবান হয়ে
পড়ুক এ শরদণ্ড ইহার হৃদয়ে।
দেহ হতে প্রাণ এর করুক হরণ
ঘুরায়ে ফেলুক ভূমে, ঘটুক মরণ।

(বাণত্যাগ)

(অন্যপথে বিরাধের প্রবেশ)

বিরাধের গীত—
কি মার মারবা তুমি
মারকে মার দিব আমি।
তুমি কি সেই মার দিতে পারো
যে মার খেয়ে মরব আমি?
বেমার পেয়েছি বেহ্মার বরে
আর কি আমি ডরাই মারে?
কই হে রাম তোমারে—তুমি তো শুনি অন্তর্যামী!
বাপু লক্ষ্মণ, এই নাও তোমার শর, ওসব পাখি
মারতে রেখো। শূল শেল ভিন্দিপাল ঝাড়লেও
আমার কিছু করতে পারছ না। হুঁ।

লক্ষ্মণ। ফিরে যদি আস হেথা
পাষাণে ভাঙ্গিব মাথা।

বিরাধ। বেশ চললেম, সীতাকে পাচ্ছ না!

রাম। হা কোথায় সীতা, কোথায় সীতা
আমার জ্বলছে প্রাণে রাবণ চিতা।
কোথায় আছ অপহৃতা চকিতা সচকিতা ভীতা!

বিরাধ। জায়া সনে কেন দণ্ডক কাননে আইলি করিয়া ছল
গায়ে নাই কিছু বল,
শিরষে তোদের শোভে জটাজুট চীরবাস পরিধান
মুনি ঋষি যেন করে ধনুকে পিঠে কেন তূণপূর্ণ বাণ!
সীতা সুন্দরীরে দেব নাকো ফিরে এই তোরে কহিলাম।

রাম। রে ক্ষুদ্র অতীব তুই নীচ দুরাচার
ধিক তোরে ধিক তোরে ধিক শতবার
নিজেই নিজের মৃত্যু আনিলি ডাকিয়া
তোর মত মূঢ়মতি না পাই ভাবিয়া
থাক এবে মোর করে মরিবি নিশ্চিত
রামায়ণ মতে তোর মৃত্যু নির্ধারিত।

(বাণত্যাগ)

—যুদ্ধ—

॥ গীত—১ ॥

হ হ হ অ হ হ তিষ্ট তিষ্ট
রাক্ষসটাতো বড় অশিষ্ট
ঘটালো অনিষ্ট
লাগছে কেমন মিষ্ট মিষ্ট
হ হ হ বালক হয়ে লড়বি হা অদৃষ্ট!
রাক্ষস তোরে পাওয়াবো কৃষ্ণ।

বিরাধ। তবে বাধাই এবার রঙ্গ

॥ গীত—২ ॥

লাগ ঝমাঝম ঝামকিড়ি, বাণ ছাড়ি সাঁই
পাশ কাটাই ধাই কিড়ি শূল মারি ফেঁটকিড়ি
কিড়ি মিড়ি তিড়ি বিড়ি চিতা বাড়ি ধাঁই কিড়ি

বিরাধ। হাঁউ মাউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ
হাড় চিবাউ কড় মড়াউ
দন্তে গুড়াউ কিড়িমিড়ি।

॥ গীত—৩ ॥

আউ মাউ খাঁউ বাঁউ কসাকসি পাঁউ তারা
চাঁউ কটম টিকাঁউ রাঙা
কোস্তাকুস্তি ধস্তাধস্তি
লাতা লাতি হাতা হাতি হাতি মারা

(রাম লক্ষ্মণকে ধারণ)

বিরাধ। বালক লড়তে এসেছো রাক্ষসের সঙ্গে। চল আজ
শূলপক্ক করব দুটোকে। হুঁ। নরমাংস অনেক
দিন হয়নি।

॥ দুজনকে কাঁধে তুলে নৃত্য ও গীত ॥

ধাঁ ধাঁ দুম দুমা দুম
ধুন্ধা হোতা তুলা ধুনতা হোতা
দুম দাম গুম গাম
শরদ হোতা জব্দ হোতা
তুরুপ্ সোয়ার তুরুপ লাগা
রক্ষ যক্ষ রক্ষ রক্ষ
চক্ষ চক্ষ ভক্ষ ভক্ষ
ত্বক্ষ রক্ত গলতা হোতা
উপক্রপ হোতা হোতা
ত্রাম ক্রম গ্রাম গৃম।

(প্রস্থান)

মূল গায়েন দিশা—
তাবারোপ্য ততঃ স্কন্ধং রাঘবৌ রজনীচরঃ
বিরাধো বিনদন্ ঘোরং জগামাভি মুখোবনম্।

সীতার গীত—

হায় কোথা গেলে একা ফেলে আমারে
হৃদয় বেঁধে পাষাণে এই মরু শ্মশানে।
তোমার আমার আপনার আর কেহ নাই
বড় দুঃখী দুই জনাই
চল আমিও যাই তুমি গেছ যেখানে।

(শরভঙ্গের প্রবেশ)

শরভঙ্গ। জনক-নন্দিনী মা চল আমার আশ্রমে! সেখানে রাম লক্ষ্মণ নিরাপদে পৌঁছেচেন এতক্ষণ। বিরাধ রাক্ষস শাপমুক্ত হয়ে গন্ধর্বলোকে যাচ্ছে।

(প্রস্থান)

(তুম্বুর গন্ধর্ব ও বাল্মীকির প্রবেশ)

বাল্মীকী। মা নিষাদ: প্রতিষ্ঠাং ত্বমগম: শাশ্বতী সমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চ মিথুনাদেকমবধিঃ কামমোহিতম্।

(গন্ধর্ববেশে বিরাধের প্রবেশ)

বিরাধ। নমস্তেস্তু।

বাল্মীকি। কো ভবান্?

গন্ধর্ব। তুম্বুর নামে গন্ধর্ব—
কুবেরের অনুচর রম্ভাসক্ত গন্ধর্বরাজ
তোমা প্রসাদে শাপমুক্ত হলেম আজ
রাম সীতারে পৌঁছে দেহি শরভঙ্গাশ্রমে
লক্ষ্মণ আছেন সাথে সাথে রক্ষণাবেক্ষণে
রামায়ণ রচয়িতা তোমার কৃপায়
শাপমুক্ত বিরাধ গন্ধর্বলোকে যায়।

বাল্মীকি। স্বস্তিবোস্তু। যাবার পথে ইন্দ্রকে বলে যেও রাম দ্রুত চলেছেন ঋষ্যমুখের দিকে। তাঁরা কপিরূপ ধরে অবতীর্ণ হতে বিলম্ব না করেন। সূর্পণখার নাসিকা কর্তন, মায়ামৃগ বধ হয়ে অরণ্যকাণ্ড শেষ--তার পরই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড বুঝলে?

(বিরাধের প্রস্থান)

(ইন্দ্র, রাম, লক্ষ্মণ, সীতা সঙ্গে তাপসীগণ ও শরভঙ্গের প্রবেশ)

॥ গীত ॥

আজ মুক্তি দিন শরভঙ্গ প্রধান
যাবেন রঙ্গে সপ্তস্বর্গে পেরিয়ে মহাচীন
আজ হেরে রাম সীতা প্রবেশ করিবে চিতা
চলে যাব ইন্দ্ররথে চন্দ্র সূর্যে করি প্রদক্ষিণ
ধ্রুবলোকে ঘুরি ব্রহ্ম পদে হব লীন।

বাল্মীকি। কহ তপোধন কিসের কারণ সুররাজ শচীপতি আগত তব তপোবনে?

শরভঙ্গ। বরদাতা বাসব আমায়
লইবারে ব্রহ্মলোকে আইলেন ধরায়

(রামের প্রতি) অমর সেবিত ব্রহ্মলোক সবার উপর
গমন করিব আমি তাহে বীরবর
বহু সংখ্য লোক হল আয়ত্ত আমার
এক্ষণে বাসনা চিত্তে জাগে অনিবার
প্রতিগ্রহ করি তুমি সেই সমুদায়
পূরবর আনন্দিত করহ আমার।

রাম। তপোধন। নিজে আমি তপস্যার বলে
সংগ্রহ করিব দিব্যলোক সে সকলে
এবে বনমাঝে গিয়া আশ্রয় কোথায়
লইতে হইবে তাই বলুন আমায়।
আমি কোথা থাকি কোথা যাই, একা সঙ্গের সঙ্গী নাই
এসেছি বিদেশে হে
এবে যাতে প্রয়োজন তাতে অনাটন
স্থানে স্থানে ভ্রমি বাসা পাইনে।

শরভঙ্গ। আমি তো চললেম। তুমি আমার আশ্রমে থাকতে পার। কাছেই আছেন সুতীক্ষ্ণ মুনি শরশয্যা পেতে শরবনে বসে, চলো আমি তোমাকে পথ দেখিয়ে স্বর্গারোহণ করব।

রাম, সীতা, লক্ষ্মণ। প্রণমামি কবিগুরু।

বাল্মীকি। ইমাং মন্দাকিনীং রাম প্রতি স্রোতমনুব্রজ
নদীঃ পুলীপাড়ু পবহান্ ততস্তত্র গমিষ্যসি।

তাপসদের গীত—

রাম হও আগুসার
অবিদূরে মন্দাকিনী কুসুমবাহিনী বঙ্কিমগামিনী
উজান পথে তার
বেঁধে লবে চল আশ্রম আপনা, হও আগুসার।

তাপসীদের গীত—

আছে নদীর পারে এলান দিয়ে বনকাপাসী বনখানি গো
বন-গাঁ বাসী রাজ তাপসী ঘর বাঁধো গা তারি কাছে।
কাশফুলে বেড়ান দেওয়া ও-ঘরখানি বাগান ঘেরা ফুল ফোটানি।
বাঁধতে চল বাতাস মুখে কানন ঘেঁসে। (প্রস্থান)

ইন্দ্র (বাল্মীকির প্রতি)। মনে আছে সে কথা, ব্যস্ত হবেন না।

বাল্মীকি। হ্যাঁ দেখো বিলম্ব না হয়। শরভঙ্গকে ব্রহ্মলোকে দিয়েই অবতীর্ণ হতে চাও ঋষ্যমুখে।

(সকলের প্রস্থান)

(ক্রমশঃ)

প্রতীক্ষা

নৃপেন্দ্র ভট্টাচার্য

কাল বোশেখী ঝড়
উড়িয়ে দিল ধুলো, পুরোন সব খড়।
সামনে ছিল মেঘ
ঝড়ে, শঙ্কা ত্রাস অনেকটা উদ্বেগ॥

জাগলো কেকাস্বর
বদল করে খড়, নতুন হলো ঘর।
গাঢ়তা কণ্ঠে ঢেলে
মেঘেরে বক্ষ ডাকে, পথের চিত্র মেলে॥

অনেক অঙ্গীকার
ভোট নিতে দেওয়া, পূর্ণ হয় না আর।
বসন্ত হোক গত
বোশেখী ঝড় আসে; প্রতীক্ষা অনাগত॥

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

ধারাবাহিক উপন্যাস

হৃদয় পাতে

সুলেখা দাশগুপ্ত

কার্তিক মাস। ছোটবেলা। এ সন্ধ্যাটাকে রয়েসয়ে মেজাজের সঙ্গে উপভোগ করার উপায় নেই। সন্ধ্যা হতে না হতে রাত। অন্ধকার একেবারে সন্ধ্যার কোমর জড়িয়ে এসে উপস্থিত হয়। সুন্দর স্লেট রং-এর সায়ংকালটিতে এসে বারান্দায় বসেছিল শিবানী। বসতে না-বসতে একটা কালোরাত হুমড়ি খেয়ে পড়ল বারান্দায়। বেয়ারা এসে সুইচ টিপে দিয়ে গেল। দপ করে একসঙ্গে জ্বলে উঠল বিদ্যুতের টুকরোর মতো নিয়নের সারিগুলো। রাস্তার বাতি, ওদের গেটের বাতি বাগানের বাতি—বোধ হয় অনেক আগে থেকেই জ্বালান ছিল। অন্ধকার হতে সেগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল; বারান্দার রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ শিবানী রাস্তা দেখল। রাস্তার গাড়ীর যাওয়া-আসা দেখল। আশেপাশের বাতিগুলির বাতি জ্বলে ওঠা, চলাফেরা করা দেখল। দূর থেকে দৃষ্টি এনে বাগানে ফেলল। কতক্ষণ সব ভুলে বাগানের মৌসুমী ফুলের বাহার দেখল। ইন্দ্রনাথের কথা, নমিতার কথা ভুলে গেল। ফুলের রাস্তা ধরে ধরে একসময় চোখ গিয়ে পড়ল ওদের আউট হাউসের দিকে। যেখানে বাইরের লোকজন থাকে। অফিস কর্মচারী থাকে। অরুণ থাকত।

অরুণ। ইস্ অরুণকে যদি এখন পাওয়া যেত তবে আর ওর ভাবতে হতো না। যা করবার সেই করত।

এত বিশ্বাস ওর তার ওপর কিসের?

কতটুকু দেখেছে সে তাকে?

খুব কম। একদিন—না একদিন নয়—একবেলা—না তাও নয়, কয়েক ঘণ্টা মাত্র; কিন্তু তাতে হয়েছে কী। মাটি আর পাথর চিনতে কত সময় লাগে?

কিন্তু ঐ লোকটা কে? সুখপার পায়চারি করতে করতে ভাবতে লাগল কে লোকটা—এমনি করে মেয়েটাকে বিপদের ভেতর ডুবিয়ে রেখে পালাল? নমিতা কিছুতেই নাম বললে না। জোর করে ওর কাছ থেকে ধমকে ধামকে নামটা বের করবে নাকি? এ সব মন্দ লোককে চুপচাপ ছেড়ে দেওয়া অন্যায়। এতে করে এদের সাহসও বেড়ে যায় দিনকে দিন। একে শাস্তি দেওয়া উচিত।

একটু থামল শিবানী—নিজেকে সম্বোধন করে বললে, শিবানী তুমি তোমার লাইনের বাইরে চলে যাচ্ছ। তোমার সমস্যাটা এখনকার ব্যক্তির চরিত্র ঠিক করা নয়—একটি মেয়েকে বিপদ থেকে উদ্ধার করা। তার কথাই ভাবো।

আবার হাঁটতে আরম্ভ করল সে—না, এমন কিছু অফ লাইনে চলে যাই নি আমি। লোকটাকে আমি নমিতাকে বিয়ে করতে বাধ্য করতে পারি। আর তা হলেই তো আর কোন সমস্যা থাকে না। সব সমাধান হয়ে যায়।

বিয়ে করতে বাধ্য করতে পারো মানে? জোর করে বিয়ে দেবে?

আপত্তি কী? এ সব লোকদের তাই করতে হয়।

কী পাগলের মতো ভাবছে ও—অবসন্ন হাতে মুখের উপরের উড়ো চুলগুলি পেছনে ঠেলে দিল শিবানী।

মন্দজনের শাস্তির কথা ভাবতে গিয়ে, ভালোজনের কথা ভুলেই গেছে। এ সব লোকের সঙ্গে কী কেউ জীবন বাঁধে। নমিতাও যে এটা চায় না সে তো স্পষ্টই। সে তার নামও উচ্চারণ করে নি। হয়ত ঘৃণায়। হয়ত বিরাগ-বিতৃষ্ণায়। তবে তো সম্পর্কের শেষ হয়েই গেছে।

কিংবা—

আবার থমকালো শিবানী—

কিংবা হয়তো লোকটা বিবাহিত। স্ত্রী আছে। সন্তান আছে। আজকাল তো কোন কিছু নয়।—যা খুশী করলেই হলো। কোন সম্পর্কের প্রতি সম্মান দেওয়া নেই, শ্রদ্ধা দেওয়া নেই। সন্তানের মতো সম্পর্কেও যে মমতার সঙ্গে লালন পালন করে বাড়িয়ে তুলতে হয়; সে শিক্ষাটুকু পর্যন্ত নেই।—বর্তমানের বুদ্ধিজীবী জগৎ প্রজ্ঞাকে বনবাসে পাঠিয়ে বুদ্ধিকে সার করেছে। প্রজ্ঞাহীন বুদ্ধি আর শয়তান সমান। তাই বর্তমান কাল শয়তানের।

আবার চিন্তাকে বে-লাইনে চালাচ্ছ শিবানী? ঠিক তো।

গা ঝাড়া দিল শিবানী। যাক গে—মরুক গে। যেখানে যাবার সেখানে চলে যাক লোকটা। ও তার দিকে আর তাকাবে না। নমিতা বলেছে; ধর লোকটা মরে গেছে। ও তাই ধরে নিচ্ছে। বাস। নমিতাকে কী করে পার করে আনা যায় এ ছাড়া আর কিছু দেখবার দরকার নেই ওর।

আচ্ছা, ওকে কোথাও পাঠিয়ে দিলে কেমন হয়?

সঙ্গে যাবে কে? দেখাশুনা করবে কে?

হয় না।

এখানেই করতে হবে যা করবার। টাকায় কী না হয়। একজন ডাক্তারের কাছে সব বলে করুণাভিক্ষা করা যেতে পারে। হাতে টাকার তোড়া গুঁজে দিতে দিতে করুণাভিক্ষা কিছু নীরস প্রার্থনা নয়। হয় না?

এটা হয়।

কোন নার্সিং হোমে ভর্তি করে দেওয়া যেতে পারে বিবাহিত বলে?

এটাও হয়।

পারে কোথাও ফ্ল্যাট নিতে। কলকাতা কার খবর কে রাখে? আর সে মধ্যবিত্ত পাড়ার ঘিঞ্জি জায়গায় ফ্ল্যাট নিচ্ছে না। নেবে অভিজাত পাড়ায় নির্জন পরিবেশের নির্জন

ফ্ল্যাট। এমন জায়গা হবে সেটা যে সেখানে কেউ হেঁটে পথ চলে না। হুস করে সামনে দিয়ে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যায়। মুখ চেনাচেনি হতেও সময় লাগে সেখানে। ততদিনে ওরা ওখান থেকে পার।

হয় না?

চমৎকার হয়।

একজন ডাক্তার কিছু টাকা আর ও—হয়ে গেল তো।

যত দুরূহ ঠেকছিল তত দুরূহ নয় দেখে খুব খুশি হয়ে উঠল শিবানী। হাঁক ছাড়লে, কাচ্চি চা।

উঃ কী আরামই না লাগছে। আর ভয় পাইনে—বারবার কথাগুলি বলতে ইচ্ছে করছিল শিবানীর। সবারই তাই করে। বারবার খুশির কথাগুলি বলে বারবার সুখের ঢেউ তুলতে চায় বুকে। কিন্তু শিবানী কাকে বলবে? অগত্যা হাঁক ছাড়লে, কাচ্চি চা—

সন্তোষ প্রকাশের কোন বাহ্যিক পথ খুঁজে পাচ্ছে না কিন্তু কিছু না করেও থাকতে পারছে না, এমন অবস্থায় ওর চা চাই। বলার মতো কাছের মানুষ যদি নেই, চায়ের পেয়ালাটাই কাছে থাক। নিঃসঙ্গতায় চমৎকার সঙ্গী সে। একা বসে থাকলে একা লাগে কিন্তু এক কাপ চা কাছে থাকলে আর একা লাগে না।

কী শক্তই ঠেকছিল। কিন্তু কী আর—কেউ টেরই পাবে না। সাতদিন বাদে অফিস করতে পারবে ফের নমিতা।

বাচ্চাটা!!

এতক্ষণ হুঁশ হলো শিবানীর, বাচ্চাটা।

নিজের কপালে থাপ্পড় মারলে শিবানী —আসল সমস্যা যাকে নিয়ে তাকে ভুলে কেমন অপূর্ব সমাধান করে খুশিতে নাচছে রে।—

—ললিতার তো শিগগিরই হবে—কোন ভাবে ম্যানেজ করা যায় না ওর যমজ হয়েছে বলে?

দূর। হয় না।

নিয়ে আসবে ও?

—পাগল। ইন্দ্রনাথ ছুড়ে ফেলে দেবে রাস্তায়।

ইন্দ্রনাথ কী খুব নির্দয় প্রকৃতির লোক? নিষ্ঠুর হতে বাধে না তার?

না বরং উল্টোটা। নিষ্ঠুর হতে সে পারে না সে সহৃদয়। কিন্তু তাই বলে পিতৃপরিচয়হীন সন্তান ঘরে এনে তোলে কোন ভদ্রলোক?

কোন ভদ্রলোক তোলে না—চিবুকের কোণে বিষঢালা হাসি ফুটে উঠল শিবানীর। পুরুষের হাতেগড়া সমাজ—তার পরিচয়-পত্রটি ঠিকমত দাখিল না করা পর্যন্ত কোন শিশুকে ঘরে তুলতে দেয় না সে। তাদের একজন কেউ অবশ্যই আছে এই নারীর মা হবার মূলে, এ সত্যে কিছু হয় না। সে কে? কী নাম তার? পুরুষ দরজা আটকে দাঁড়িয়ে চোখ রাঙিয়ে কেবল শুধোবে, কী নাম এর বাবার? যতক্ষণ জবাব না মিলবে ততক্ষণ লক্ষপুরুষ লক্ষ দরজা আটকে দাঁড়িয়ে থাকবে। না দেবে সন্তানকে ঘরে ঢুকতে, না দেবে সন্তান বুকে আঁকড়ে দাঁড়িয়ে থাকা কম্পিত নারীকে ঘরে ঢুকতে—কিন্তু 'মা' এই নাকি নারী জীবনের শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

হঠাৎ ভীষণ জোরে হেসে উঠল শিবানী—ওর হাসির শব্দে চকিত হয়ে উঠল সমস্ত বাড়ি। বাবুর্চির হাত চলকে কিছু ভিনিগার বেশী পড়ে গেল পাত্রে। যদিও তার বাবুর্চিখানা থেকে বারান্দা তাকালেও দেখা যাবে না। তবু তার দৃষ্টিটা সে দিকে ঘুরে এলো। আবদুল সাহেবের ঘর ঝাড়ছিল। তার হাতের ঝাড়ন নেমে গেল। মালী ফুল নিয়ে উপরে আসছিল সে থমকাল। কাচ্চি চা বানাচ্ছিল শিবানীর জন্য। সে ছুটে এলো। চোখ বড় করে জিজ্ঞাসা করল, কী মা, কী হয়েছে?

কুপিতদৃষ্টিতে শিবানী তাকাল কাচ্চির দিকে চোখ মুখ ও রকম করছিস কেন? হাসছি দেখতে পাচ্ছিস না?

একা একা হাসছ যে।

একা হাসছি বলে হাসিটা ভয়ের হয়ে গেল? একা বসে কাঁদা গেলে একা বসে হাসা যাবে না কেন?

এ কথার জবাব কাচ্চির ভাণ্ডারে নেই।

আবার আক্রমণ করলে শিবানী কাচ্চিকে, কী একা যদি কাঁদা যায় হাসা যাবে না কেন—বল? দুঃখ হলে যেমন কান্না পায়, খুশি হলে তেমনি হাসি পায়—তাতে চোখমুখ অমন ছানাবড়া হয়ে উঠবে কেন?

কাচ্চি গোঁজ মুখে বললে, সে কী মা অত জোরে হাসে কেউ।

বুঝতে পারছি তুই কী বলতে চাচ্ছিস। তুই বলতে চাচ্ছিস, হাসির কথা মনে পড়ে যে হাসি আসে তা গাল পর্যন্ত আসে, মানুষের কান পর্যন্ত যায় না। তা ঠিক। তবে হাসির কারণটা যদি খুব জোর হয় তবে বুঝছিস না হাসিটাও জোরে হয়ে পড়ে—এই আর কী। কিন্তু আমার চা কই?

চা'ই তো ঢালছিলাম। এক্ষুণি দিয়ে আসছি মা। কাচ্চি গেল আর তক্ষুণি চায়ের কাপ হাতে ফিরে এলো।

চায়ের কাপে চুমু দিয়ে শিবানী বললে, কেন হাসছিলাম শুনবি? বোস তবে।

শিবানীর ঐ হাসি থেকে কথা বলার রহস্যপূর্ণ ভঙ্গি থেকে কাচ্চি বুঝে নিয়েছিল তাকে বসিয়ে অনেক কথা বলবে শিবানী। তাই পায়ে মাথার ল্যাভেণ্ডারের লোশন নিয়ে তৈরী হয়েই এসে বসেছিল। শিবানীর কাছে কাজে কোন না কোন পরিচর্যা তার সে করেই। শিবানীর পা কোলে টেনে নিয়ে মেঝের বসল কাচ্চি।

এমন বৈঠক তাদের মুজরাতে হয়। কখনও কাচ্চি কথা বলে, শিবানী শ্রোতা। কখনো শিবানী কথা বলে, কাচ্চি শ্রোতা। শিবানীর কথা কাচ্চি বুঝে উঠতে পারে তা নয়। কাচ্চিকে বলাটা যদিও শিবানীর কখনও নিজের সঙ্গেই কথা বলা—কখনো বিষয়টা নিজের কাছেই পরিষ্কার করে তোলা—তবু তার চাইতে কিছু বেশীও। শিবানী দেখেছে ওর বক্তব্যের ভাবার্থটা ঠিক ধরে নেয় কাচ্চি।

ললিতার কবে বাচ্চা হবে রে?

আরো মাস দু-এক বাকি। সেদিন ললিতা দিদিমণিকে দেখতে গয়েছিলাম মা।

খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে সে।

শিবানীর পায়ের তলায় লোশন ভেজানো হাত বুলোতে বুলোতে কাচ্চি অভিজ্ঞের ভঙ্গিতে বললে, এ সময় ও রকম কত কী হয়, কিছু হয় না তাতে।

এখন আমার একটা বাচ্চা না হলে ভালো লাগছে না—তাই না?

তুমিই বল মা তা কী ভাল লাগে? শিবানীকে এমন স্পষ্ট করে কথাটা বলতে শুনে উৎফুল্ল হয়ে উঠল কাচ্চি—বাচ্চা কাচ্চা না হলে কী নিয়ে সংসার করা মা বল?

আচ্ছা?

মায়ের কোলই শোভে না বাচ্চা না থাকলে।

মায়ের কোল নয় বল নারীর কোল। শোভে না নয় বলি নারীজন্মই সার্থক হয় না, মা না হওয়া পর্যন্ত।

ঠিক কথা বলেছ মা।

মা না হলে আর মেয়েমা হওয়াটা কী? সব কিছুই না রয়ে গেল যে। তাই না?

তাই তো মা আমিও দিন রাত প্রার্থনা করছি তোমার কোল ভরুক। সে দিন কালী বাড়ি পুজো দিয়ে এসেছি আমি।

আরে—

হ্যাঁ মা খুব সত্য কালী। তার কাছে পুজো দিয়ে মানত রাখলে ফল হবেই। দেখো, ভগবান আমার ডাক শুনেছে। বলে এক গাল হাসে কাচ্চি। তোমার শিগগিরই ছেলে হবে—

চায়ের শূন্য কাপ মেঝেয় রেখে, কাচ্চির কোল থেকে পা টেনে সোজা হয়ে বসল শিবানী এতই যদি একটা বাচ্চা না হলে একটা মেয়ের সব ব্যর্থ হয় অর্থাৎ একেবারেই না চলে তবে আমার জন্য ভগবানকে ডাকছিস, তোর নিজের হোক না কেন?

হতভম্বদৃষ্টিতে শিবানীর দিকে তাকিয়ে রইল কাচ্চি।

কী বলছিস? তোর স্বামী নিরুদ্দেশ যে—এই তো?

এতকথা বলছিল যে কাঞ্চি তার মুখ দিয়ে আর বাক্য সরল না। অমন পাগলের মতো হেসে উঠেছিল। এখন কী যা-তা বলছে—শঙ্কিত সন্দিগ্ধ চোখে সে তাকিয়ে রইল শিবানীর দিকে।

উত্তেজিতভাবে শিবানী বললে, স্বামী নিরুদ্দেশ তাতে—হয়েছেটা কী? একটা মেয়ের জীবন যখন ছেলেমেয়ে না হলে ব্যর্থ তখন হবে ছেলেমেয়ে। স্বামী চলে গেছে বা মরে গেছে বা বিয়ে হয়নি বলে একটা মেয়ে ব্যর্থ হয়ে বসে থাকবে নাকি? ঐ যে দুটি বোন এক-সঙ্গে অফিসে যায় আসে দেখেছিস তো তুই? চেহারা নিতান্তই খারাপ বলে দু বোনের এক বোনেরও বিয়ে হয়নি। বেশ, কুৎসিত বলে যদি বিয়ে না হলো কি আর করা—না হলো। কিন্তু কুৎসিত বলে মা হতে তো বাধা নেই? আর মা হলেই যখন মেয়েজন্ম সার্থক—তখন তারা মা হয়ে জন্ম সার্থক করুক—না তাও হতে পারবে না। এতো বড় তাজ্জব কথা। তার স্বামী নেই। ঘর নেই। একটা ছেলে মেয়ে হলে ঢোল মরণ হয়—না তা হতে পারবে না।

একটা নিঃশ্বাস টানল শিবানী—কিন্তু আমার স্বামী আছে। ঘর আছে। সাজান সংসার রয়েছে—এর নাকি কিছুই কিছু নয় যতক্ষণ না বাচ্চা হবে। অপূর্ব!

উত্তেজনায় শিবানী যেন আর বসে থাকতে পারলে না। উঠে পড়ল সে কেদারা থেকে। উঠতে উঠতে বললে, নিজেদের মতলব দিয়ে সুখ-দুঃখ, চরিতার্থতা ব্যর্থতা বানিয়ে মেয়েদের মনগুলিকে তা দিয়ে এমন ঠেসে রেখেছে পুরুষ যে, একেবারে যা-তা হয়ে গেছে মেয়েগুলি। কোন পদার্থ নেই আর তাদের ভেতর। সত্যি-কারের সুখ সফলতা ব্যর্থতাকে চেনেই না। পুরুষের মতলবের তৈরী কতকগুলো সুখ-দুঃখের মালা গলায় পরে হাসে কাঁদে। কখনও বাচ্চা বাচ্চা ক'রে পাগল হয়। কখনো বাচ্চা হলে গলা টিপে মেরে ফেলে। এয়োস্ত্রী হয়ে মাছ না খেলে তার স্বামী মরে। বিধবা স্ত্রী মাছ খেলে, নরক বাস হয়—হাউ রিডিকুা-লাস।

প্রথম দিকে শিবানীর কথাগুলো কাঞ্চির দুচোখ ক্রমেই ছানাবড়া হয়ে উঠছিল। বুকের মধ্যে ধবাস ধবাস শব্দ হচ্ছিল; সাহেব বাড়ি থাকলে ছুটে গিয়ে ডাক্তার ডাকতেই হয়তো বলে ফেলত। যদিও শিবানী কিছুক্ষণ থেকেই আর ওর দিকে তাকিয়ে কথা বলছিল না। সত্যি সত্যি আপন মনের সঙ্গেই কথা বলে যাচ্ছিল। তবু কাঞ্চির ছানাবড়া চোখ যেন আস্তে আস্তে এবার শান্ত হয়ে আসতে লাগল—শিবানীর কথার মর্ম গ্রহণ করতে পারছে যেন সে। ওর বুকের নিপীড়িত সত্তা যেন পীড়নের বেদনায় কেঁদে উঠতে চাচ্ছে।

ছটফটে হাতে হাত ঝাড়া দিল শিবানী—না—না এ সব কথা তুই বুঝবি নে। ক'টা শিক্ষিত মেয়ে বুঝবে। আমারও শক্তি নেই বোঝাবার। অস্থিরকণ্ঠে আক্ষেপে ভেঙ্গে পড়ল শিবানীর, আমি যা বলতে চাই তা গুছিয়ে বলতে পারছি নে। সে ক্ষমতা আমার নেই। যতদিন না মেয়েদের বলার সেই শক্তি আসবে, যতদিন না মেয়েরা তাদের নিজেদের সুখ দুঃখ সার্থকতা নিষ্ফলতার কথা বুঝে নিজেদের পথ নিজেরা তৈরী করে না নেবে, ততদিন তাদের এই পুতুল জীবনই কাটাতে হবে। অর্থই বল আর অর্থ-নৈতিক স্বাধীনতাই বল কোন কিছুই সুখ এনে দিতে পারবে না। যা —চা নিয়ে আয়।

আর কত চা খাবে মা!

একটা কিছু তো করব। মাত্র আটটা—এখন তো ভাত খেয়ে ঘুমোতে যেতে পারি নে। বসে বসে তো একটা কিছু করতে হবে?

কেন তোমার বই পড়ো।

না, আজ বই পড়া হবে না। মাথায় অনেক চিন্তা। আর চা না হলে চিন্তা করা যায় না। যা চা নিয়ে আয়।

অফ দি পয়েণ্ট—না, ভাবনার প্রয়োজনীয় গণ্ডি ছাড়িয়ে বেলাইনে বহুদূর চলে গেছি। এ ভাবে যদি এক ভাবনার ভেতর আর এক ভাবনা এনে ফেলে লাফালাফি করি তবেই হয়েছে।

অনেক পায়চারি করলে। অনেক ভাবলে। কিন্তু কোন কূল দেখতে পেলো না শিবানী। বাচ্চাটাকে মেরে ফেলবে? অসম্ভব তা সে পারবে না। এক সময় শেষে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল নমিতারই ওপর—যেমন বোকা তেমনি শাস্তি। ভোগ কর।

শাস্তিটা কী?

ও জানে না।

কিন্তু তা বললে কী হয়। ও যে জানে নমিতা মরবে।

মরাটা এতো সোজা নয়। মুখে বললেই আর মানুষ গিয়ে মরে না।

কিন্তু তাই তো হয়। এ সব ঘটনায় নিজে মরে নয়তো বাচ্চাটাকে মারে। যে ব্যাপারের যা নিয়ম। এ ঘটনার এটাই নিয়ম। সমাজ-ব্যবস্থা তাই। তবে আর ও কী করবে। কিছু করার নেই ওর।

না, এ বললেও চলবে না। সব দায়িত্ব তারপর পেছোনো চলবে না। যা করার ওকেই করতে হবে এবং ও করবে। [ক্রমশ।
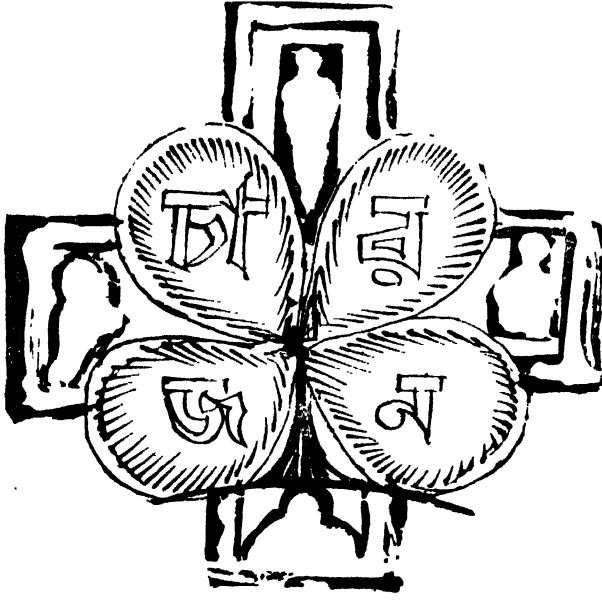
শ্রীপ্রিয়নাথ মিত্র

[বর্ষীয়ান শিক্ষাব্রতী, সুপ্রবীণ আইনজ্ঞ]

একশ' বছরে পদার্পণের আর মাত্র বারোটি বছর বাকি। এই দীর্ঘজীবনের প্রায় সারাটি অংশই শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মিত্রের কেটেছে কর্মে। লোককল্যাণকর নানাবিধ কর্মে। আইনের অনুশীলনে, শিক্ষাবিস্তারে, শাস্ত্রের ভাষ্য রচনায়, সমাজসেবায়, মানুষের কল্যাণসাধনে যাঁরা জীবনে ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেন, লোক-হিতকর কার্যে যাঁরা নিজেদের ওতপ্রোতভাবে যুক্ত করেন, যার মধ্যে মঙ্গলের বীজ নিহিত তার বিকাশে যাঁরা সর্বশক্তি নির্দ্বিধায় প্রয়োগ করেন বর্ষীয়ান শিক্ষাবিদ ও আইনরথী শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ মিত্র তাঁদেরই অন্যতম।

১৮৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে উত্তর কলিকাতার শোভাবাজারস্থ পৈত্রিক ভদ্রাসনে প্রিয়নাথের জন্ম। পিতৃদেব স্বর্গত যদুনাথ মিত্র ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের এক বিশিষ্ট আইনজীবী। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ছাপরায় বাসা বাঁধেন ও পরবর্তীকালে দক্ষ আইনজ্ঞরূপেও সেখানে তিনি যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির অধিকারী হন ও সেখানকার বার-এ্যাসোসিয়েশানের সহকারী সভাপতি নির্বাচিত হন।

ছাপরাতেই স্কুলজীবন অতিক্রান্ত হয় প্রিয়নাথের। ছাপরা জেলা-স্কুলের ছাত্র হিসাবে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় তিনি উত্তীর্ণ হলেন ১৮৯৩ সালে। ভর্তি হলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে। ১৮৯৮ পর্যন্ত ঐ কলেজে তিনি পাঠ নেন। পদার্থ এবং রসায়ন শাস্ত্রে যুগ্ম

● প্রিয়নাথ মিত্র

অনার্সসহ সসম্মানে তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এবং এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন পদার্থ বিদ্যায়। তাঁর গৌরবময় ছাত্র-জীবন সম্পর্কে আলোচনাপ্রসঙ্গে যে বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সেটি হল যে সময়ে তিনি গুরুরূপে লাভ করেছেন এ যুগের দুই শ্রেষ্ঠ মনীষী আচার্য জগদীশচন্দ্র এবং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে। প্রেসিডেন্সী থেকে রিপন। রিপন কলেজ থেকে ১৮৯৯ সালে আইন পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে হাত মেলালেন তিনি। ছাত্রজীবন শেষ হল। কলকাতা থেকে আবার ছাপরা। পিতৃদেবের নিকট শিক্ষানবিশী করার উদ্দেশ্যেই ছাপরা যাত্রা। অল্পকাল মুন্সেফের কাজ করলেন। দ্বারভাঙ্গায় জেলা-জজের আদালত স্থাপিত হল ১৯০৬ সালে—আজ থেকে ষাট বছর আগে সেই আদালতেই ওকালতি আরম্ভ করলেন আঠাশ বছরের যুবক প্রিয়নাথ—প্রতিভার একাগ্রতা এবং নিষ্ঠাকে সম্বল করে। অল্পদিনের মধ্যেই বিপুল খ্যাতি, সুনাম ও প্রসিদ্ধি জনপ্রিয়তা তাঁর করায়ত্ত হল। দেওয়ানী মামলা পরিচালনায় তাঁর দক্ষতার কথা চতুষ্পার্শ্বে কোথাও অবিদিত রইল না। ১৯২২ সালে দ্বারভাঙ্গা জেলার সরকারী উকীল নিযুক্ত হলেন প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথের চরিত্রে একটি দিক বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তিনি অত্যন্ত আত্মসম্মানসচেতন এবং স্বাধীনচেতা। যে কাজে তিনি বিবেকের সমর্থন পান না কোন কিছুর বিনিময়েই তিনি তা নির্বাহে অগ্রসর হন না। যেখানে ন্যায়, নীতি, বিবেক অনুপস্থিত তাঁর সীমানা থেকে প্রিয়নাথ যোজন যোজন দূরে। মতে মিলল না। মন যেখানে সায় দিচ্ছে না সে কাজে যুক্ত থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ল প্রিয়নাথের পক্ষে। সরকারী প্লিডার পদে ইস্তফা দিলেন তিনি। ১৯৩৫ সালে প্রিভি কাউন্সিলে মামলা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ইনি লণ্ডন যান এবং এই যাত্রায় তিনি ইয়োরোপ পরিভ্রমণ করেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজার আমন্ত্রণে তিনি তাঁর (মহারাজার) সিনিয়ার রিটেণ্ড এ্যাডভোকেটের কর্মভার গ্রহণ করেন। স্বাধীনভাবে ওকালতি করার সঙ্গেই রেলপথের সিনিয়ার এ্যাডভোকেটের দায়িত্বও তিনি পালন করে

গেছেন তিরিশ বছর যাবৎ। ১৯৪৫ সালে দ্বারভাঙ্গায় অনুষ্ঠিত বিহার প্রাদেশিক আইনজীবী সম্মেলনের প্রথম অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হন প্রিয়নাথ। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন অগ্রজ স্বনামধন্য উকীল হেমচন্দ্র মিত্র। ১৯৫২ ও ১৯৫৪ সালে যথাক্রমে ভাগলপুর ও পাটনায় অনুষ্ঠিত বিহার প্রাদেশিক আইনজীবী সম্মেলনের প্রধান সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রিয়নাথ। বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ল' ফ্যাকাল্টির ও বিহার রাজ্য আইন কমিশনের সদস্যপদও তাঁর দ্বারা অলঙ্কৃত হয়েছে। দ্বারভাঙ্গা বার-এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতির আসনে আজও তিনি সগৌরবে সমাসীন।

দক্ষ আইনজ্ঞ প্রিয়নাথের শিক্ষাজগতের সঙ্গে যোগাযোগও অতি ঘনিষ্ঠ। শিক্ষাজগতও তাঁর দ্বারা নানাভাবে সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হয়ে উঠেছে। শিক্ষার বিস্তারে ও প্রসারে তাঁর উৎসাহ এবং সক্রিয় সহযোগিতার অন্ত নেই। অসহযোগ আন্দোলনের সময় মহারাণী লক্ষ্মীশ্বরী বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। দীর্ঘদিন ঐ বিদ্যালয়ের কার্যকরী সমিতির সভাপতি ছিলেন প্রিয়নাথ। স্থানীয় প্রবাসী বাঙালী বালকদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হেকন ইনষ্টিটিউশানের সম্পাদক ও সভাপতির আসনে বহুকাল যাবৎ অধিষ্ঠিত দেখা গেছে। ১৯৩৮ সালে দ্বারভাঙ্গা শহরে একটি মহাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব দেখা দেয়, সেই প্রস্তাবটির বাস্তব রূপায়ণের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অল্পমূল্যের নয়, এই ভাবেই মিথিলা কলেজের (বর্তমান চন্দ্রধারী মিথিলা কলেজ) জন্ম। প্রিয়নাথ নির্বাচিত হলেন এই কলেজের প্রথম সভাপতি। দ্বারভাঙ্গার স্বর্গত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ডঃ স্যার কামেশ্বর সিংহের বদান্যতায় ১৯৬১ সালে স্থাপিত হল সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ঐ কলেজের সঙ্গে প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার হিসাবে যুক্ত ছিলেন প্রিয়নাথ।

বিহার প্রদেশের সমবায় আন্দোলনেও নিজেকে যুক্ত করেন প্রিয়নাথ। একাদিক্রমে কুড়ি বছর তিনি দ্বারভাঙ্গা জেলার সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভে অবৈতনিক সেক্রেটারীর দায়িত্ব পালন করেন ও জেলার কৃষক সমাজের আর্থিক উন্নয়নের জন্যে যথেষ্ট চেষ্টার পরিচয় দেন।

সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনবিষয়ক গবেষণার জন্য স্থাপিত দ্বারভাঙ্গার মিথিলা রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের কার্যকরী সমিতির তিনি সদস্য। দ্বারভাঙ্গার থিয়োসফিক্যাল সোসাইটির উনি সভাপতি। নিজেও তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত। যথেষ্ট ব্যুৎপত্তির অধিকারী। শাস্ত্র, সাহিত্যের চর্চায়, অনুশীলনে এবং বিশ্লেষণে তাঁর নৈপুণ্য ও কুশলতা অপরিসীম। স্মৃতিশাস্ত্রে "বিবাদ চিন্তামণি" গ্রন্থের একটি ভাষ্যগ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ভাষ্য তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রগাঢ়তার এক প্রকৃষ্ট পরিচায়ক।

বিহারের বিখ্যাত আইনজ্ঞ স্বর্গত হেমচন্দ্র মিত্র এবং কলিকাতা হাই-কোর্টের অন্যতম বিচারপতি স্বর্গত ডঃ দ্বারকানাথ মিত্র ছিলেন তাঁর অগ্রজদ্বয়। পাটনা এ্যাডভোকেট এ্যাসোসিয়েশানের সভাপতি স্বর্গত বৈকুণ্ঠনাথ সেন ছিলেন তাঁর অনুজ। প্রসঙ্গত লক্ষণীয় যে, আইনজ্ঞ যদুনাথ মিত্রের চার পুত্রই আইনজ্ঞরূপে যথেষ্ট যশ অর্জনে সমর্থ হলেন।

শোভাবাজারের সুবিখ্যাত মহারাজা নবকৃষ্ণের প্রপৌত্র ও মহারাজা স্যার নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুরের পুত্র মহারাজকুমার মানবেন্দ্রকৃষ্ণ দেববাহাদুর, ব্যারিস্টার-এট্-ল'র কন্যার সঙ্গে প্রিয়নাথ পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ।

শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়

[প্রখ্যাত শিল্পপতি ও সমাজসেবী]

বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের সুনাম এবং শ্রীবৃদ্ধিসাধনে বাঙলার যে-সকল বিখ্যাত পরিবারের গৌরবময় ভূমিকা অবিস্মরণীয় খিদিরপুরের "বকুলিয়া হাউস-"এর প্রখ্যাত মুখোপাধ্যায় পরিবার সেই তালিকায় একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং উজ্জ্বল নাম। দেশের বাণিজ্যিক গৌরব বিবর্ধনে এই পরিবারের অবদান বিশেষ উল্লেখের দাবীদার। এই বংশের স্বনামধন্য সন্তানেরা আপন আপন দক্ষতায় ও শক্তিমত্তায় পরিবারের মুখ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর করে তুলেছেন।

১৮৪০ খৃস্টাব্দ থেকে এঁদের বাণিজ্যিক অভিযানের সূত্রপাত। অর্থাৎ যেদিন তাঁদের প্রথম যাত্রারম্ভ ঘটল সেই মুহূর্তটি থেকে আজ একশো পঁচিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে, এই অন্তর্বর্তী সময়ে জগতে কত পরিবর্তনের ঢেউ বয়ে গেল কত পতন-অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে। কত আনন্দ-বেদনার স্পর্শে পৃথিবী কোথা থেকে কোথায় এগিয়ে গেল, ইতিহাস তার শ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য, সেই বীজ পরিণতি পেল এক মহীরুহের, অজস্র শাখা-প্রশাখা ছায়া-সম্বলিত এক বিরাট মহীরুহের পরিচর্যা সাধন করে চলেছেন সেই বীজ বপনকারীদের সুযোগ্য উত্তরপুরুষেরা। তাঁদের অপূর্ব পরিচর্যায় সেই মহীরুহের ছায়া ক্রমশই আরও সুবিস্তৃত হয়ে চলেছে—যার আওতায় আরও অনেক মানুষ ক্রমশই এসে জমায়েৎ হচ্ছে।

এই রচনার আলোচ্য পুরুষ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মুখোপাধ্যায় এই পরিবারেরই এক মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান, যাঁর খ্যাতি এবং নৈপুণ্য আজ শুধু এক পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ নেই যা ছড়িয়ে পড়েছে সারা দেশ জুড়ে, যে নৈপুণ্যের ফল আজ সারা দেশের পটভূমিতেই প্রতীয়মান। শুধু পারিবারিক পরিসরেই সীমাবদ্ধ নয়।

বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। ১৯১৪ সালের ৩রা মার্চ তাঁর জন্ম। স্বর্গত ক্ষীরোদগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়

তাঁর পিতৃদেব। খিদিরপুর এ্যাকাডেমীতে তাঁর পাঠারম্ভ হল। ঐ বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে ১৯৩০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন কেদারনাথ। স্কুল জীবন শেষ হয়ে গেল, শুরু হল কলেজ জীবন। যোগ দিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। আই-এস-সি পরীক্ষায় একাদশ স্থান অধিকার করলেন। বি-এস-সিতে অনার্স নিলেন পদার্থ বিদ্যায়। ১৯৩৬ সালে সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন এম-এস-সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম স্থানটি অধিকার করে।

ছাত্রজীবনের পর এইবার কর্মজীবনের আহ্বান এসে গেল। বংশের ধারা অনুযায়ী ব্যবসায়তেই আত্মনিয়োগ করলেন কেদারনাথ। বিজ্ঞানের কৃতী ছাত্র ব্যবসায়কেই জীবনের প্রকাশের পথ হিসাবে নির্বাচিত করলেন। একটু বিচার করে দেখলেই দেখা যায় যে কলা ও বিজ্ঞান কোনটির সঙ্গেই বাণিজ্যজগৎ সম্পর্ক শূন্য নয়। দু'য়ের সঙ্গেই ব্যবসায় জগতের অতি ঘনিষ্ঠ সংযোগ অকাট্য বললেও হতে হয় না অতিরঞ্জনের দোষে দুষ্ট।

প্রথমে পারিবারিক প্রতিষ্ঠান জি ডি ব্যানার্জী এ্যাণ্ড কোম্পানীতে যোগদান করে আপন বাণিজ্যিক জীবনের জয়যাত্রা সূচিত করলেন কেদারনাথ। ১৯৪৬ এবং ১৯৬০ সালে তাঁর অবর্ণনীয় উদ্যম এবং অক্লান্ত নিষ্ঠায় জন্ম নিল যথাক্রমে ভারতীয় রবার এবং টায়ার নির্মাণকারী আজকের দিনে বিখ্যাত প্রতিষ্ঠান দু'টি। এই প্রতিষ্ঠানদ্বয় ন্যাশনাল রাবার ম্যানুফ্যাকচারার্স এবং ইঙ্কেক টায়ার্স লিমিটেডের নামে আজ তাঁর গঠনকুশলতার প্রমাণ দিয়ে চলেছে। এই প্রতিষ্ঠানযুগল পরিপূর্ণরূপে ভারতীয়। এদের স্বত্ব এবং পরিচালনভার সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়ের হাতে এবং পূর্বে এমন কোন রবার ও টায়ার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গে ছিল না—যার স্বত্ব এবং পরিচালন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়ের অধীনে ছিল। বর্তমানে কেদারনাথ প্রথমটির ম্যানেজিং ডিরেক্টার এবং দ্বিতীয়টির ডিরেক্টার।

● শ্রীকেদারনাথ মুখোপাধ্যায়

কেদারনাথের কর্মদক্ষতার স্বাক্ষর আজ বহু প্রতিষ্ঠানে পরিব্যাপ্ত হয়েছে। দেশের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্যতম কর্ণধাররূপে তিনি জড়িত।

কল্যাণী স্পাইনিং মিলস লিমিটেড, এ্যামেরিকান রেফ্রিজারেটার কোম্পানী লিমিটেড, ইস্ট এণ্ড পেপার ইণ্ডাষ্ট্রীস লিমিটেড, ইণ্ডিয়ান মেকানিজেশান এ্যাণ্ড এ্যালিড প্রোডাক্টস লিমিটেডের তিনি চেয়ারম্যান। বৃটিশ ইণ্ডিয়া করপোরেশান লিমিটেড, ইণ্ডিয়া কারবোন লিমিটেড, উলকম্বার্স অফ ইণ্ডিয়া লিমিটেড, সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া কোলফিল্ডস লিমিটেড, দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিমিটেডের তিনি ডিরেক্টার।

এ ছাড়া, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার পরিচালিত বহু সংস্থার শীর্ষস্থানেও তিনি সগৌরবে সমাসীন। বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাস্ট্রি ও ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ইকনমিক এ্যাফেয়ারের তিনি প্রাক্তন সভাপতি। ইণ্ডিয়ান রোপ ম্যানুফ্যাকচারার্স এ্যাসোসিয়েশান ও ওয়েস্ট বেঙ্গল বিজনেস কনভেনসানের তিনি সভাপতি; ওয়েস্ট বেঙ্গল ফিনান্সিয়াল করপোরেশনের তিনি ডিরেক্টার। কমিটি অফ দ্য ফেডারেশান অফ ইণ্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রী, কাস্টমস এ্যাণ্ড সেণ্ট্রাল এক্সাইস এ্যাডভাইসারী কাউন্সিল (নয়াদিল্লী), ক্যালকাটা স্টেট ট্রান্সপোর্ট করপোরেশান, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার স্থানীয় বোর্ডের ডিরেক্ট ট্যাক্সেস এ্যাডভাইসারি কমিটি (নয়াদিল্লী), ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি কনসালটেটিভ কাউন্সিল এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল প্ল্যানিং এ্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট বোর্ডের তিনি সদস্য।

এ ছাড়াও অর্থাৎ শিল্পবাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সমাজ-কল্যাণ, বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর নাম জড়িত। তাঁর সুচিন্তিত উপদেশ এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্ব বহু প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধি এবং উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। ভারতীয় রেডক্রস সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার কার্য-নির্বাহক সমিতির তিনি চেয়ারম্যান। ইণ্ডো-এ্যামেরিকান সোসাইটির তিনি ডিরেক্টার। ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অরগানিজেশান এয়ার ইণ্ডিয়া এ্যাডভাইসারি কমিটির তিনি সদস্য; কলকাতার রোটারি ক্লাবের তিনি প্রাক্তন সভাপতি।

শ্রীমতী লক্ষ্মী মুখোপাধ্যায় তাঁর জীবনসঙ্গিনী। সেদিন অর্ধঘণ্টাব্যাপী তাঁর সঙ্গে আলাপের অবসরে তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম ব্যবসায় ক্ষেত্রে বাঙালীর মান পূর্বের ন্যায় কি আজ অক্ষুণ্ণ আছে?

উত্তর আসে, না। ব্যবসা ক্ষেত্রে বাঙালী পিছিয়ে যাচ্ছে, যে বাঙালী একদিন ইংরেজের গুলীর সামনে অকুতোভয়ে বুক পেতে দিয়েছে—তারাই আজ ব্যবসায়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, অবশ্য এর কারণও আছে। একটু থেমে বললেন—সে যুগে ব্যবসায় আবার সমাজে অপাংক্তেয় ছিল, যে ব্যবসা করে সে তার জন্য কোন যথোচিত মর্যাদা পায়নি, সমাজের কাছ থেকে, আমাকেই শুনতে হয়েছে—এত লেখাপড়া শিখে শেষে ব্যবসাদার হ'লে—বহু বছর এর জের চলেছে।

নানা কথা, নানা আলাপের ফাঁকে ফাঁকে তাঁর যে আন্তরিকতা, অমায়িক ও নম্র মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছিল, তার স্মৃতি সহজে মন থেকে বিলুপ্ত হওয়ার নয়।

শ্রীমতী আরতি দত্ত

[আন্তর্জাতিক বিশ্বগ্রামীণ মহিলা সঙ্ঘের প্রথম এশীয় সভানেত্রী]

হাজারের কথা নয়। দু'চার বা দশ-বারো লক্ষও নয়। সত্তর লক্ষ। বিশ্বগ্রামীণ মহিলা সঙ্ঘ (এ্যাসোসিয়েটেড কান্ট্রি উইমেন অফ দ্য ওয়ার্ল্ড বা A. C. W. W.)-এর সদস্যসংখ্যা আজ সত্তর লক্ষে পৌঁছেছে। বিরাট বিশাল প্রতিষ্ঠান। সারা জগৎজোড়া এর বিস্তৃতি। পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছড়িয়ে আছে এর শাখা-প্রশাখা। পৃথিবীর যত নন্দিনী, যত ঘরণী, যত জননী, বর্তমানে তাঁদের একটি বিরাট অংশ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্তা। এর সদস্য সংখ্যাই এ উক্তির প্রকৃষ্ট প্রমাণ। পৃথিবীর নারী সমাজের এ এক মহামিলন সেতু, উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে, পশ্চিমে, ঈশানে, নৈঋতে, বায়ুতে, অগ্নিতে যাঁরা ছড়িয়ে আছেন তাঁদের সম্মিলন ঘটছে এই প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে। অসংখ্য রেখা যেন মিলিত হচ্ছে একটি বিন্দুতে। সম্প্রতি ডাবলিনে অনুষ্ঠিত এঁদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে সঙ্ঘের সভানেত্রী নির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ করলেন শ্রীমতী আরতি দত্ত। বাঙলার মেয়ে, বাঙলার বধূ। সারা বাঙালীর পক্ষে এ আজ কম গৌরবের কথা নয়, তাঁর এই সম্মান তাঁকে আজ সমগ্র এশিয়ার এক বিরাট গর্বে পরিণত করেছে। যাঁদের কল্যাণে দেশের খ্যাতি ও সুনাম আন্তর্জাতিক পটভূমিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় ও বৃহত্তর জগতে ব্যাপ্ত প্রসারিত হয় সেই তালিকায় শ্রীমতী দত্ত আজ এক উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর এই গৌরবে আজ তাই সারা বাঙলার অধিকার।

বিগত যুগে রাজনৈতিক নেতৃমহলে যাঁরা শীর্ষস্থানে সমাসীন ছিলেন বাঙলার তদানীন্তন বিধান পরিষদের সভাপতি ও দিল্লীর তৎকালীন বিধান সভার সদস্য স্বর্গত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। সেই সুপ্রসিদ্ধ জননায়কের একমাত্র সন্তান আরতি দত্ত। পৃথিবীর আলো, বাতাস, মাটির সঙ্গে তাঁর প্রথম যেদিন পরিচয় ঘটল সেই তারিখটি ছিল ২৩-এ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ (আশ্বিন ১৩৩১)।

● শ্রীমতী আরতি দত্ত

ছাত্রী হিসাবেও তিনি প্রমাণ করেছেন যে তিনি মেধাশূন্যা নন। লোরেটো কলেজ থেকে তিনি আই-এ এবং আশুতোষ কলেজ থেকে বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন সসম্মানে। বি-এ-তে অনার্স নেন দর্শনশাস্ত্রে। ডাচ সরকারের ফেলোশিপ নিয়ে তিনি হল্যাণ্ড গেলেন। সেখানে ইনস্টিটিউট অফ সোস্যাল স্টাডিস এ সমাজ কল্যাণ সম্বন্ধে শিক্ষাগ্রহণ করেন ও সে বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ করলেন "ক্রেডিট" সহ।

সমাজসেবার ক্ষেত্রে তাঁর যে দক্ষতা ও প্রসিদ্ধি আজ তাঁকে আন্তর্জাতিক নামে পরিণত করেছে তাঁর শুভসূচনা ঘটে সরোজনলিনী দত্ত নারী মঙ্গল সমিতিতে। এই সুবিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর ব্যাপক শ্রীবৃদ্ধির মূলে এঁর অক্লান্ত উদ্যম ও অবদান বিশেষভাবে স্মর্তব্য। শ্রীমতী দত্তের নৈপুণ্য ও কুশলতায় প্রতিষ্ঠানটি ক্রমশই শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠছে। মহিলা সমিতির সচিব হিসাবে দীর্ঘদিন ইনি পল্লী অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে কাজ করেছেন। এই প্রতিষ্ঠান শহরে দুঃস্থা মহিলাদের জন্য কারিগরী শিক্ষার বিদ্যালয় ও গ্রামাঞ্চলে বহু মহিলা সমিতি পরিচালনা করে। এই মহিলা সমিতিরই প্রতিনিধি হিসাবে ইনি প্রথম সংযুক্ত বিশ্বগ্রামীণ মহিলা সঙ্ঘের আন্তর্জাতিক সম্মেলন উপলক্ষে কলম্বো যান। সঙ্ঘের এডিনবরা সম্মেলনে আরতি দত্ত নির্বাচিতা হলেন এশিয়া মহাদেশের আঞ্চলিক সহকারী সভানেত্রী। সঙ্ঘের পরবর্তী আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত) আরতি দত্ত পুনরায় ঐ সম্মান অর্জনে সমর্থা হন। প্রতি তিন বৎসরের ব্যবধানে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান বর্ষে অনুষ্ঠিত ডাবলিন সম্মেলনে তাঁকে সঙ্ঘের সভানেত্রীর আসনে অধিষ্ঠিতা করা হল। এশীয় মহিলাদের মধ্যে ইনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করলেন।

সঙ্ঘের বিভিন্ন কাজে আরতি দত্ত সমগ্র দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, ইয়োরোপ, কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র পরিভ্রমণ করেছেন। আফ্রিকার প্রগতিশীল দেশগুলি পরিভ্রমণ করার একটি পরিকল্পনা তাঁর আছে।

UNESCO ও UNICEF-এর বিভিন্ন সভায় সঙ্ঘের প্রতিনিধি হিসাবে তিনি যোগদান করেছেন।

আঠার বছর বয়সে তাঁর নন্দিনী জীবনের অবসান। কন্যা সেদিন বধূ হলেন। সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার ভাগীদার হিসাবে চলার পথের চিরন্তন সহযাত্রী হিসাবে সেদিন তাঁর জীবনে এলেন শ্রীবীরেন্দ্রসদয় দত্ত। বীরেন্দ্রসদয় কেম্ব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় সগৌরবে উত্তীর্ণ। এই বন্ধুবৎসল সদালাপী মানুষটি বাঙলার স্মরণীয় সন্তান স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্ত ও স্বর্গীয়া সরোজনলিনী দত্তের পুত্র।

শ্রীমতী দত্তের ভাবীজীবন উত্তরোত্তর আরও বর্ণাঢ্য ও ঘটনাবহুল হতে থাকুক এই আমাদের কাম্য।

ডাঃ দিলীপকুমার সেন

[যক্ষ্মারোগ বিশেষজ্ঞ ও কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালের অধ্যক্ষ]

“বললে হয়তো বিশ্বাস করবেন না যে যক্ষ্মারোগ বংশগত রোগ নয় এবং বংশানুক্রমে তার বিস্তৃতিও হয় না। বাংলা দেশে হাজারে দশ থেকে পনের জন ঐ রোগে আক্রান্ত। তবে দুঃখ হয় যে সমস্ত যক্ষ্মাক্রান্ত ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে আরোগ্যলাভ করেছেন, সমাজে তাঁদের পুনর্বাসন এখনও সমস্যাসঙ্কুল, ফলে বহু রোগীই সম্পূর্ণ নিরাময় হওয়া সত্ত্বেও হাসপাতালে বছরের পর বছর পড়ে থাকেন—এ ব্যাপারে সমাজ-নেতা এবং সমাজকর্মীদের সচেতন হওয়া দরকার”—বললেন ভারতের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ যক্ষ্মারোগ বিশেষজ্ঞ ও কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালের প্রধান ডাঃ দিলীপকুমার সেন।

বৃটিশের আমলে পূর্ববঙ্গের যে জেলায় একদা অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়েছে সেই চট্টগ্রামের সন্তান ডাঃ সেন। ঐ জেলার খ্যাতনামা ব্যারিস্টার ৺পূর্ণচন্দ্র সেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারক সমরনাথ সেনের পরিবারভুক্ত ও বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ সেনের দ্বিতীয় সন্তান দিলীপকুমার। ১৯১৫ সালে নিজ জেলার সারোয়াতলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ডাঃ সেন। বিদ্যালয় ও কলেজ জীবন কেটেছে চট্টগ্রামের জেলাতেই। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট বিদ্যালয় থেকে ১৯২৯ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ১৯৩১ সালে আই-এস-সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন চট্টগ্রাম কলেজ থেকে। তারপরে ভর্তি হন কলিকাতা মেডিকেল কলেজে এবং ১৯৩৭ সালে এম-বি পরীক্ষা পাশ করেন। ১৯50 সালে দিলীপকুমার দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি-টি, ডি-ডি অর্থাৎ যক্ষ্মারোগ ও যক্ষ্মারোগ সংক্রান্ত ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৫৪ সালে তিনি আমেরিকার ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় অন্তর্গত কলেজ অব চেস্ট ফিজিসিয়ানের ফেলো নির্বাচিত হন।

অবশ্য ইতিমধ্যে তিনি মেডিকেল

● ডাঃ দিলীপকুমার সেন

কলেজ হাসপাতালে হাউস সার্জেন হিসাবেও কাজ করেন। লোকসেবাই তাঁর জীবনের ব্রত কিন্তু তখনও তিনি জানতেন না যে আরও বৃহৎ ও ব্যাপক পরিসর তাঁর জন্যে অপেক্ষা করে আছে, বহু মানুষের জীবন-মরণের প্রশ্নও জড়িত। তারপর দিলীপকুমার মেডিকেল কলেজের চেস্ট বিভাগে শিক্ষানবিশী হিসাবে যুক্ত হলেন এবং তিনি কিছুকাল মেডিকেল স্কুল ও হাসপাতালের চেস্ট ক্লিনিকেও অনারারী ফিজিসিয়ান হিসাবে নিযুক্ত হন।

অসামরিক বিভাগ থেকে সাময়িক ভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে ১৯৪১ সালে দিলীপকুমার সামরিক বিভাগে অর্থাৎ আই-এম-এস-এ যোগ দেন এবং স্বীয় যোগ্যতানুযায়ী ‘মেজর’ পদে উন্নীত হন। সামরিক বিভাগে তিনি মেডিকেল স্পেশালিস্ট বলে গণ্য হতেন। সামরিক বিভাগ থেকে মুক্তি নিয়ে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫১ অবধি ডাঃ সেন নেপাল সরকারের টি-বি স্যানেটোরিয়ামে অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ করেন। ১৯৫১ সালে স্বদেশবাসীর সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন এবং বেলেঘাটা যক্ষ্মা হাসপাতালের ভার গ্রহণ করেন।

১৯৫৩ সালের শেষভাগে দিলীপকুমার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিচালিত কাঁচড়াপাড়া হাসপাতালে আবাসিক চিকিৎসক হিসাবে যোগদান করেন এবং পরে অর্থাৎ ১৯৬১ সালে সরকারী কর্মচারী হিসাবে জলপাইগুড়ি জেলার সরকারী হাসপাতালে ‘জেলা মেডিকেল অফিসার’ হিসাবে নিযুক্ত হন। ১৯৬৩ সালের প্রারম্ভে ডাঃ সেন ধুবুলিয়া যক্ষ্মা হাসপাতালে অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন এবং কয়েকমাস পূর্বে রাজ্য সরকার তাঁকে একহাজার শয্যাবিশিষ্ট বাংলা দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ যক্ষ্মা হাসপাতাল কাঁচড়াপাড়া যক্ষ্মা হাসপাতালের প্রধান হিসাবে ভারার্পণ করেন।

তাঁর স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকেই ডাঃ দিলীপকুমার সেন বলেন যে, যে সমস্ত রোগীদের রোগ নিষ্ক্রিয় অবস্থা ও জীবাণুমুক্ত বলে চিকিৎসকরা অভিমত দিয়াছেন তাঁদের সমাজে সাধারণভাবে গ্রহণ করা সকলেরই কর্তব্য। আত্মপ্রত্যয়, আত্মনির্ভরতা ফিরে পাবার জন্য রোগীদের প্রতি জনসাধারণ ও জনসমাজের বিশেষ দায়িত্ব আছে। উপার্জনক্ষমতা ও উপায় যাদের রয়েছে তারা যত শীগগির সম্ভব চিকিৎসকের পরামর্শানুযায়ী কাজকর্মে ফিরে যেতে পারেন তার ব্যবস্থা করা দরকার। রোগমুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বহু রোগীর মধ্যে সাধারণ শ্রমবিমুখতা ও শ্রমজনিত রোগ পুনরাক্রমণের আশঙ্কা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এই ভীতি দূর করা একান্ত প্রয়োজন বলেই তিনি মনে করেন।

প্রসঙ্গত ডাঃ সেন বলেন যে, এই হাসপাতালেই অনেক সুস্থ ও সবল ব্যক্তি বহু বছর ধরে আছেন যাঁরা সম্পূর্ণ রোগমুক্ত। তাঁদের ধারণা যে তারা সমাজে স্থান পাবেন না এই আতঙ্কে তাঁরা হাসপাতাল ত্যাগ করেন না ফলে বহু রোগাক্রান্ত ব্যক্তি চিকিৎসার অভাবে দিনের পর দিন বিনা চিকিৎসায় পড়ে থাকেন হাসপাতালে ভর্তি হতে পারেন না। এই সকল সমস্যার সমাধান হওয়া একান্ত প্রয়োজন এবং এর জন্য সমাজের দায়িত্বের কথাও ডাঃ সেন বলেন।

মধুসূদন রচনাবলী / সাহিত্য সংসদ

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ মাইকেল মধুসূদনের নাম সাহিত্য-ক্ষেত্রে অমর হয়ে আছে; মধুসূদনের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে আধুনিক বাঙালীর মননের তিনিই দিশারী, পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে বাঙ্গলা সাহিত্যের মিলনের তিনিই অগ্রদূত, মধুসূদনের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার মান নির্ণয় করতে বসলে এই কথাটিকেই মনে রাখতে হবে। বর্তমান সঙ্কলন গ্রন্থটিতে মধুসূদনের সমস্ত রচনা সংগৃহীত হয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে তাঁর জীবন ও সাহিত্য সাধনার সংক্ষিপ্ত অথচ প্রামাণ্য পরিচয়। অমিত্রাক্ষর ছন্দের জনক মধুসূদন সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে একদিন যে চমক লাগিয়েছিলন আজকের সাহিত্যিক মানদণ্ডের মাপে তার কতখানি টিকবে একথা বলার আগে তাঁর সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন, এই সঙ্কলন গ্রন্থটির মাধ্যমে সে প্রয়োজন অবশ্যই সিদ্ধ হবে। মধুসূদনের ইংরাজী রচনাবলী যা এযাবৎ প্রায় অপ্রাপ্য ছিল বললেই চলে, সেইসব রচনা সন্নিবেশিত হওয়ায় এই সুন্দর সংগ্রহটির মূল্য যথোচিত ভাবেই বেড়ে গিয়েছে। এই মূল্যবান সংগ্রহটির প্রকাশক অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। সাহিত্যের ভাণ্ডারে এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক মূল্যবান সংযোজন। গ্রন্থটির প্রচ্ছদ শোভন, ও আঙ্গিক উচ্চমানের। প্রকাশনায়—শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিঃ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা—৯। দাম—পনেরো টাকা।

সাংস্কৃতিকী / (২য় খণ্ড)

বাক-সাহিত্য

আলোচ্য গ্রন্থটি প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রচিত। এতে যে প্রবন্ধাদি সঙ্কলিত হয়েছে তা লেখক বিভিন্ন বিষয়ে, বিভিন্ন সময়ে রচনা করেছেন। চিন্তার ক্ষেত্রে লেখকের যে গভীর মৌলিকতা বর্তমান, আলোচ্য রচনাগুলি তারই ধারক ও বাহক। এরা যে শুধু লেখকের বহুমুখী পাণ্ডিত্যেরই নিদর্শন তা নয়, তথ্যনির্ভর ও প্রামাণ্য। গ্রন্থোক্ত প্রবন্ধগুলি পাঠ করলে অনুসন্ধানী ও বিদগ্ধ এই উভয়বিধ পাঠকই তৃপ্তি লাভ করবেন। প্রাবন্ধিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে এ গ্রন্থ নিঃসন্দেহে এক অমূল্য সংযোজন। প্রচ্ছদ শিল্প শোভন। ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশনায়—বাক্-সাহিত্য, ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা—৯, দাম—ছয়টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

আজন্ম-সুরভি / এম সি সরকার

আলোচ্য গ্রন্থটি এক কাব্যসঙ্কলন। শক্তিমান লেখকের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের স্বাক্ষরে কবিতাগুলি সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠতে পেরেছে। মোট চৌত্রিশটি কবিতা একত্র সঙ্কলিত হয়েছে এই গ্রন্থে। কবিতাগুলির অধিকাংশই একান্ত সময়োচিত। কারণ ভারতের প্রতিবেশী-রাষ্ট্র পাকিস্তান ও কম্যুনিস্ট চীনের ভারত আক্রমণের পটভূমিতেই এরা আত্মপ্রকাশ করেছে। লেখকের বক্তব্যে কোন অস্পষ্টতা নেই। সমস্ত পৃথিবীর কাছে কম্যুনিস্ট চীন যে এক ভয়াবহ বিপদ। উজ্জ্বল ভাষায় দৃপ্তভঙ্গীতে সে কথা ঘোষণা করেছেন তিনি; 'পীত প্রেম'ও 'দুর্দিন' এই কবিতা দুটির মাধ্যমে এ কথা সোচ্চার হয়ে উঠেছে। তাই তিনি যখন বলেন—

"প্রাণে কোন দ্বিধা নয়, চ্যুতি নয়,
ভ্রান্তি নয়, নয় গড়িমসি,
প্রতিজ্ঞায় তীক্ষ্ণ করো, ঋজু করো,
দৃপ্ত করো অসি,
থাকো রাত্রিদিন, অচল-কঠিন,
সমক্ষ সংঘাতে সম্মুখীন,
—অন্তস্থল ভেদ করো, নির্লজ্জ শত্রুর।"

তখন পাঠকের মন এক অবিমিশ্র শ্রদ্ধায় ভরে ওঠে। লেখকের বক্তব্য এতই দীপ্ত যে, কোন সংশয় কোন দ্বিধাই স্থান পায় না পাঠকের মনে। অকুণ্ঠ স্বীকৃতি জেগে ওঠে মনে, তাঁর সঙ্গে গলা মিলিয়ে বলতে ইচ্ছা করে—

"এরই নাম চীন,
পৃথিবীর মলিন দুর্দিন"।

প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। প্রকাশনায়—এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা।

অথবা কিন্নর / এম সি সরকার

প্রখ্যাত কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই কাব্য সংগ্রহটি হাতে পেয়ে কাব্যামোদী-জন মাত্রই খুশী হয়ে উঠবেন। আধুনিক কাব্যধারার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলে গৃহীত হওয়ার যোগ্য এই গ্রন্থ। লেখকের রোমান্টিক মননের ছোঁয়ায়

প্রতিটি রচনা উজ্জ্বল ও আকর্ষণীয়। ভাষার অপরূপ লালিত্যে, ভাবের অনন্য ব্যঞ্জনায় কবিতাগুলি যেন সরস দ্রাক্ষা-গুচ্ছের মতই লোভনীয়। সেই সঙ্গে জড়ানো আছে মিষ্টিসিজমের অধরা ইঙ্গিত। কবির বক্তব্য মুখর নয় যদিচ তিনি যা বলেন তা আভাসেই বলেন, রসিকজনের কাছেই শুধু সে কথা বলা যায়। আর যা বলেন তার চেয়েও যা বলেন না তার আবেদনই বেশী। মানুষের কাছেই কবির যত প্রত্যাশা, যত প্রার্থনা তাই তিনি সোচ্চার হয়ে উঠেছেন মানব বন্দনায়। "সমস্ত ভাবী-কাল যাতে রঞ্জিত, সেই সূর্য মাঝে মাঝে চমকায়। শুধু মানুষেরই মধ্যে।" এই চরণ কটির মাঝেই যেন নতুন করে আবিষ্কার করা যায় কবিসত্তাকে। নাগরিক জীবনের দৈনন্দিন ক্লান্তি বুঝিবা কখনও কখনও আচ্ছন্ন করে ফেলে কবির সামগ্রিক সত্তাকে, হতাশার সুর তখন তাঁর কণ্ঠে, "যাদের তুমি চিনতে তারাও হারিয়ে যাবে, এই শহরে। শহর বড় কঠিন।" রোমান্টি-জমের উদ্গাতা কবির এই হতাশা সহজেই মনকে ছুঁয়ে যায়। প্রচ্ছদ অতি শোভন। নবীনত্বের প্রতীক, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—প্রেমেন্দ্র মিত্র। প্রকাশক—এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম-তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সতীনাথ বিচিত্রা / প্র

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে "সতীনাথ ভাদুড়ী" এক স্মরণীয় নাম, এঁর প্রথম উপন্যাস 'জাগরী' আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া জাগিয়েছিল সাহিত্য-রসিক সমাজে, যে প্রত্যাশা সেদিন তিনি জাগিয়েছিলেন পরবর্তীকালে তা সফল হয়েছিল। পর পর দেখা দিয়েছিল আরও বহু রচনা যারা এককালে পাঠকের প্রত্যাশাকে তৃপ্ত করে, লেখককে অধি-ষ্ঠিত করেছিল সাহিত্যের অঙ্গনে রাজকীয় মর্যাদায়। আলোচ্য গ্রন্থটি সতীনাথের গল্প, কবিতা, নাটক ও লঘুগুরু প্রবন্ধের এক অনবদ্য সঙ্কলন, লেখাগুলি ইতিপূর্বে কোন গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। লেখকের সামগ্রিক রচনারীতির সঙ্গে পরিচয় ঘটবে এ গ্রন্থের মাধ্যমে। বস্তুত সাহিত্যকার হিসাবে সতীনাথ যে কত-খানি শক্তিমান ছিলেন, বর্তমান সঙ্কলন গ্রন্থটির পাতায় পাতায় তার প্রমাণ মিলবে। বেশী উল্লেখ্য অবশ্য গ্রন্থোক্ত ছোট গল্প-গুলি, স্বল্প পরিসরে লেখকের অন্তর্দৃষ্টি ও সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ভঙ্গীর উজ্জ্বল স্বাক্ষর হয়ে এরা আত্মপ্রকাশ করেছে; এদের ঔজ্জ্বল্যে সত্যই মুগ্ধ হতে হয়। এই শক্তিধর লেখক আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কাল প্রায় অকালেই তাঁকে হরণ করেছে। এ সময় এই সঙ্কলন গ্রন্থটি প্রকাশ করে প্রকাশক সময়োচিত কাজই করেছেন। কারণ লেখককে শ্রদ্ধা জানাবার প্রকৃষ্টতম উপায়ই তো তাঁর রচনাকে সমাদর করা। এই সুন্দর সঙ্কলন গ্রন্থটি স্বর্গত লেখকের অনুরাগি-বৃন্দকে প্রভূত সান্ত্বনা জোগাবে। প্রচ্ছদ সুন্দর, ছাপা ও বাঁধাই উচ্চাঙ্গের। লেখক—সতীনাথ ভাদুড়ী। প্রকাশক—প্রকাশ ভবন, ১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—আট টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সকাল-সন্ধ্যা রাত্রি / মিত্র ঘোষ

সুখ্যাতা লেখিকা বাণী রায়ের এই নূতন উপন্যাসটি হাতে পেয়ে তাঁর অনুরাগী পাঠকমাত্রই খুশী হবেন। এক অভিজাত পরিবারকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে কাহিনী। উত্তর-বঙ্গের বিখ্যাত জমিদার পরিবার রায় গ্রামের রায়েরা। এই পরিবারের পুত্র-কন্যারাই কাহিনীর প্রধান পাত্র-পাত্রীর দল, সেইসঙ্গে আছে আরও অসংখ্য চরিত্র যারা এদের সঙ্গে কোন না কোন সূত্রে জড়িত, তবে প্রাধান্যে তারাও বড় কম যায় না; বস্তুত লেখি-কার চরিত্র সৃষ্টির ক্ষমতা সত্যই বিস্ময়-কর। বিরাট কাহিনীর ধাপে ধাপে যত জনকে তিনি এনেছেন তারা কেউই হারিয়ে যায় না। প্রত্যেকে আপন বৈশিষ্ট্যের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রেখে দেয় পাঠকের মনে। জমিদার-তনয়া শ্রীলতা, সন্ধ্যা, মালতী প্রভৃতির পাশে পাশে নগণ্যা দাসী, হারানী কুড়ানী, বাসিনী প্রভৃতিও উজ্জ্বল হয়ে নিজেদের অস্তিত্বের ইঙ্গিত জানায়। প্রাচীন আভিজাত্য বোধের সঙ্গে সংস্কারবিহীন আধুনিক সমাজবোধের সংঘর্ষ বড় সুন্দরভাবে উপস্থাপিত এই রচনার মাধ্যমে। লেখিকার দৃঢ় আত্ম-প্রত্যয়ের আভাসে তা আরও সমুজ্জ্বল। ঘটনাবহুল কাহিনীর মাধ্যমে। সবার উপর মানুষ সত্য এই নীতিকেই যেন প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন লেখিকা এবং বলা বাহুল্য নির্ভীক ও শিল্পময় শৈলীর প্রাসাদে তাঁর এ প্রচেষ্টা বহুলাংশে সফলও হয়ে উঠতে পেরেছে। মননশীল ও বোদ্ধা পাঠকের কাছে এ রচনা সমাদরের সঙ্গেই গৃহীত হবে। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই ভাল। লেখিকা বাণী রায়, প্রকাশক—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২, দাম—দশ টাকা।

গীতিগুচ্ছ / সারস্বত লাইব্রেরী

আলোচ্য গীতিগুচ্ছের লেখক, তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের মধ্যেই সাড়া-জাগানো কবি-খ্যাতির অধিকারী হতে পেরেছিলেন। আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে 'সুকান্ত ভট্টাচার্য' নিঃসন্দেহে এক চিহ্নিত নাম। বিদ্রোহী এই কবির আগুন-জ্বালা কাব্যের সঙ্গেই শুধু যাঁরা পরিচিত, আলোচ্য গানগুলির মাঝে এক কোমল কান্ত নতুন ধারার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় ঘটবে। সাধারণের সঙ্গে সুর মিলিয়ে যে কমরেড কবি চাঁদকে একখণ্ড ঝলসানো পাঁউরুটি বলে বর্ণনা করেছিল তিক্ত হতাশায়, এখানে সে অনুপস্থিত। এ আর এক আগন্তুক যে বলে—"এই নিবিড় বাদল দিনে, কে নেবে আমায় চিনে, জানিনে তা। এই নব ঘন ঘোরে, কে ডেকে নেবে মোরে, কে নেবে হৃদয় কিনে, উদাস চেতা?" সুকান্তর অন্তর্নিহিত রোমান্টিক কবিসত্তা এই অল্প কয়েকটি গানের

মাধ্যমে পারপূর্ণভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, আমরাও যেন তাকে নতুন করে চিনলাম। প্রচ্ছদ, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—সুকান্ত ভট্টাচার্য। প্রকাশক—সারস্বত লাইব্রেরী, ২০৬, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬, দাম—একটাকা পঞ্চাশ পয়সা।

অন্য নয়ন / এস সি সরকার

জনপ্রিয় লেখকের এই নবতম রচনা বাঙ্গালী সাহিত্যরসিক মাত্রেকেই আনন্দিত করে তুলবে। আলোচ্য গ্রন্থটি একটি গল্পসংগ্রহ। মোট তিনটি গল্প স্থান পেয়েছে এতে। 'অন্য নয়ন' 'অন্য জীবন' ও 'অনন্যা'; লেখক বাঙালী মধ্যবিত্ত জীবনের এক সার্থক রূপকার, তাঁর রচনায় যে সব মানুষকে দেখতে পাওয়া যায় তারা আমাদের অপরিচিত নয়, আর হয়ত সে জন্যই তাঁর রচনার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠতে পারি আমরা সহজেই। বর্তমান গ্রন্থেও তার নজির মিলবে। এই গল্পগুলিতে যারা ভিড় করেছে তাদের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না স্পর্শ করে মনকে, 'অন্য নয়নের' নায়িকা পূরবী যেন আমাদেরই ঘরের একটি মেয়ে। হতাশ প্রেমে তার মনোবিকলনকে অতি সুকুমার ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছেন লেখক। বঞ্চিতা পূরবী যেমন সমবেদনায় কাতর করে তোলে মনকে, গল্প শেষে তার সার্থক জীবনের উত্তরণের ইঙ্গিতেও তেমনি প্রসন্ন হয়ে ওঠে মন। অনাবিল মাধুর্যই বর্তমান সংগ্রহের গল্পগুলির সর্বোত্তম সম্পদ, সাধারণ ঘরোয়া বিষয়বস্তু ও লেখকের যাদুকরী লেখনীর প্রসাদে অসাধারণ সৌন্দর্যে মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী ভঙ্গীতে নর-নারীর মনের গভীরে লুকোনো অনেক আশা অনেক আকাঙ্ক্ষাকে যেন মূর্ত করে উপস্থাপিত করেছেন লেখক পাঠকের মননে।

সার্থক রচনাটিই অত্যন্ত সুপাঠ্য, আমরা এর সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদে অভিনবত্ব আছে। ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রকাশনায়—এস সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড। ১-সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। দাম—তিন টাকা।

পদ্মরাগ-বুদ্ধ / এস সি সরকার

রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের যাদুকর 'হেমেন্দ্রকুমার রায়' নামটি বহুকালাবধিই আমাদের পরিচিত। পদ্মরাগ-বুদ্ধ তাঁর রচিত আরও অনেক এই জাতীয় রচনার অন্যতম। লেখকের বহু রহস্য-কাহিনীর নায়ক প্রখ্যাত গোয়েন্দা জয়ন্ত ও তার সুযোগ্য সহকারী মাণিককে আবার এই রচনার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে দেখে বাঙ্গালী পাঠক বিশেষত কিশোর সম্প্রদায় নিঃসন্দেহে খুশী হয়ে উঠবেন। সুন্দরভাবে রহস্যের জাল বুনে কাহিনীকে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছেন লেখক। পড়তে পড়তে পাঠকের মন উত্তেজনা ও কৌতূহলে ভরে ওঠে। যেজন্য শেষ পাতাটিতে না পৌঁছনো পর্যন্ত থামা সম্ভব নয়। থ্রিল বা রহস্য কাহিনীর উৎকর্ষতা নির্ভর করে এই ঔৎসুক্য সৃষ্টির মধ্যেই যে বিষয়ে লেখক সিদ্ধহস্ত। আলোচ্য গ্রন্থটিও এই কারণেই শ্রেষ্ঠ রহস্য-রোমাঞ্চ সাহিত্যের ভাণ্ডারে গৃহীত হওয়ার যোগ্য। প্রচ্ছদ শোভন, ছাপা ও বাঁধাই যথাযথ। লেখক—হেমেন্দ্রকুমার রায়। প্রকাশক—এস সি সরকার, অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড। ১-সি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা।

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া / এস সি সরকার

বাঙ্গালীর ঐতিহ্যে শ্রীচৈতন্য-দেবের স্থান বড় কম নয়। আজও শ্রীচৈতন্যের জন্মভূমি নবদ্বীপ, বাঙ্গালীর কাছে কাশী-বৃন্দাবনের মতই মহাতীর্থ বলে পরিগণিত। কিন্তু গৌরাঙ্গ লীলাকে যিনি পূর্ণাঙ্গ করেছেন, করেছেন এক বিষাদময় গরিমায় আবৃত সেই গৌরাঙ্গ সহধর্মিণী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া সম্বন্ধে আজও আমরা সম্যকরূপে সচেতন নই। আলোচ্য কাব্য-গাথাটির মাধ্যমে লেখক উপেক্ষিতা সেই মহীয়সী নারীকেই পাঠকের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। আত্মকথা বলার ভঙ্গীতে বিষ্ণুপ্রিয়া এখানে আত্মপ্রকাশ করেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেম, বিরহ-মিলন কথা, তাঁর অন্তহীন বেদনা যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে কাব্যটির মাধ্যমে। শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের পূর্ণ বিকাশের পথে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার দান যে কতখানি এ কাব্যখানি পড়লে তা উপলব্ধি করা যায়। অত্যন্ত সহজ শৈলীতে প্রকাশিত এ রচনা ভাবমাধুর্যে ও ব্যঞ্জনায় সহজেই পাঠকের মনে একটা দাগ এঁকে দেয়। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সাধারণ। লেখক—শ্রীবিষ্ণু সরস্বতী। প্রাপ্তিস্থান—এস সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স, প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম— দুই টাকা।

ভারত আমার / বিদ্যাভারতী

ভারত আমাদের দেশ কিন্তু স্বদেশ সম্পর্কে আমরা কি সম্যক অবহিত? এই গ্রন্থে ভারত সম্বন্ধে তথ্যনিষ্ঠ আলোচনা করেছেন লেখক। ভারতের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক পরিচয়, ভারতের বৈশিষ্ট্য, ভারতের সংবিধান। ভারতের সাংস্কৃতিক অগ্রগতি, ভারতের বিজ্ঞানসাধনা ইত্যাদি নানা বিষয়েই সংক্ষিপ্ত অথচ মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। স্বল্পপরিসরে সব জ্ঞাতব্য বিষয়ই সন্নিবেশিত করেছেন লেখক। এক কথায় বইটিকে ভারতের সংক্ষিপ্ত এনসাইক্লোপিডিয়া বলা যেতে পারে। শিক্ষার্থী ও অনুসন্ধিৎসু এই উভয়বিধ পাঠকই বইটি পড়ে আনন্দিত হবেন। আমরা বইটির সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি। প্রচ্ছদ বিষয়োচিত। ছাপা ও বাঁধাই পরিচ্ছন্ন। লেখক—অমরনাথ রায়। প্রকাশক—বিদ্যাভারতী, ৮-সি, ট্যামার লেন, কলিকাতা—৯। দাম—তিন টাকা।

নমিতা চক্রবর্তী

॥ এক ॥

খবরের কাগজ পড়তে পড়তে জুড়িয়ে জল করে ফেলা স্মরজিৎ রায়ের নিত্যকার অভ্যাস এবং আজও তার ব্যতিক্রম হয় নি। স্ত্রী আবার নূতন চায়ে পেয়ালা ভরেছেন, মেয়ে গাল ধরে টানছে বাবার। প্রসাদলোভী জ্যাকি করুণ মুখের দিকে চেয়ে ছোট্ট ডাক দিল---ভৌ-উ-উ- - -। অগত্যা কাগজ ফেলে দিলেন স্মরজিৎ রায়। অনেকক্ষণ ধরে প্রত্যাশা করেছিল ছেলে, এবার কাগজ তুলে নিল হরিত হাতে, উৎসুক চোখ রাখল খেলার পাতায়।

পর পর দু' পেয়ালা চা পান করলেন স্মরজিৎ; টোস্টের অর্ধেক পেল জ্যাকি। উঠে দাঁড়ালেন, পা বাড়ালেন দরজার দিকে। কিন্তু চলতে গিয়ে থেমে গেলেন তিনি। মনে পড়ল দরকারী কথা---

---'শোন', স্ত্রীকে উদ্দেশ করলেন স্মরজিৎ।---'আজ এগারোটার ট্রেনে সবু আসছে'।

---'সবাণী আসছে? বিস্মিত হয়ে তাকাল স্ত্রী।

—'হ্যাঁ। দেশে ছেলেটার পড়াশুনা হচ্ছে না ঠিকমত। এখানে থাকাই ভাল'।

—'এখানে? এখানে কোথায় থাকবে শুনি?' শোনা গেল কল্যাণীর তীক্ষ্ণ গলা।

—'থাকবে সে কোন একটা ঘরে'। কথা না বাড়িয়ে চলে গেলেন স্মরজিৎ রায়। বেশী কথা বলা স্বভাব নয় তাঁর, কিন্তু তা বলে এমন একটা অদ্ভূত ব্যাপারেও কথাবার্তা অর্থাৎ কথা কাটাকাটি হবে না এই বা কেমন কথা!

রেগে একটু চেঁচিয়ে—এ বাড়ীর পক্ষে অসঙ্গত উচ্চকণ্ঠে বলল কল্যাণী রায়---'কক্ষণো, কক্ষণো এ বাড়ীতে থাকবে না সর্বাণী'।

কোন ফল হল না প্রতিবাদের। স্মরজিৎ ততক্ষণে পৌঁছে গেছেন অফিস ঘরে, বোধ হয় খুলেও ফেলেছেন জরুরী কোন ফাইলের টেপ।

দশ বছরের মেয়ে চিত্রিতা মায়ের মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেল—উঃ। কি লাল হয়েছেন মা। কিন্তু খুশীও হল সে মনে মনে। সবু পিসি আসছে, দেশ হতে বারে বারে কত কুলচুড়, তিলকুট পাঠায় পিসি। সরের নাড়ু কি চমৎকার। কেক, পেস্ট্রি? ছাই লাগে খেতে। ইচ্ছা হল তার মাকে বলে—পিসি আসছে বলে তুমি রাগ করোনা মা, পিসি খুব ভাল। চিত্রা কতবার বাবার সঙ্গে গিয়েছে তাদের দেশের বাড়ীতে। কি যে সুন্দর দেশটা।

গাড়ী গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে ধরে লম্বা দৌড় লাগায়, তারপর থামে এসে ছায়া ছায়া উঠান-মেলা বাড়ীর সামনে। দেওজীলাল দোর খুলবার আগেই ছটফট করে চিত্রা। সবু পিসি এসে তাকে কত আদর করে। বাবা জলচৌকী পেতে বসে চকচকে সোনার মত কাঁসার নস্ত বড় গ্লাসে ডাবের জল খান। সে? সে তো কত কিছু খায় শক্ত দাঁত-ভাঙ্গা চিঁড়ের মোয়া, নারকেল নাড়ু।

খুব ভাল ভাল খাবার দেয় পিসি কিন্তু চিত্রা চালাক মেয়ে। সে জানে সবু পিসি গরীব, তার থানের শাড়ীটা ছেঁড়া, আর ছেলে শক্তির খালি পায়ে পরবার চটিও নেই। মগ্ন হয়ে ভাবছিল চিত্রিতা, চমক ভাঙ্গল মায়ের গনগনে করে কথা বলা শুনে। কল্যাণী ছেলেকে উদ্দেশ্য করে কথা বলছিল বড় হয়েছে তো ছেলে। ষোল বছরের পড়ছে বিজ্ঞানের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে।

—'দেখলি দিবু। তোর বাবার কাণ্ড? সেই যে সর্বাণী—তোর ঠাকুমার সইয়ের মেয়ে, ঐ যে চাঁপাতলায় থাকে—তাকে এনে তুলছেন এই বাড়ীতে'।

---'কেন চাঁপাতলার বাড়ী বিক্রী করা হবে'?

নব যৌবনের ভাঙ্গা গলায় জানতে চাইল ছেলে দিব্যজ্যোতি।

—'তা কেন। শুনলি না সর্বাণীর ছেলের ওখানে থেকে পড়াশুনা ভাল হচ্ছে না, চোখের সামনে রেখে মানুষ করবেন ছেলেকে'।

'—ছেলে? ও! সবু পিসির হ্যাংলা ছেলেটা?'

চিত্রিতা চুপ করে শুনছিল এতক্ষণ, এবার তার রাগ হল।

—'মোটেও না, মোটেও না। শাক্ত একটুও হ্যাংলা নয়, খুব ভাল'।

দিব্য অবজ্ঞার চোখে তাকাল ানের দিকে। অনেক ছোট তার য়ে চিত্রা, ছ' বছরের ছোট। ড়ছে নোটে ফোর্থ ফরমে। কিন্তু থা-বার্তা চাল-চলনে এমন সর্দার ন বাড়ীতে সবাই ছোট ওর য়ে। তারপর বাবার আদরে য়াড়াও হয়েছে কিছুটা। বাবার স্ত্রী তো চিত্রাই। দুপুরের াগেই সর্বাণী এসে সাদার্ন অ্যাভি-নউর মস্ত বড় বাড়ীতে পৌঁছাল। ঙ্গে দু' একটা পোঁটলা-পুঁটলী আর চাদ্দ বছরের ছেলে শক্তি। মায়ের ্খের মত সাদা রং আর বাপের ন্দর শরীরের উত্তরাধিকারী হয়েছে চলে।

সমরজিতের বাড়ী তখন প্রায় ালি, অর্থাৎ কর্তা ব্যক্তিরা কেউ নেই াড়ীতে। সমরজিৎ তো কাঁটায় কাঁটায় াড়ে দশটায় চলে যান অফিসে, পথে ায়েকে নামিয়ে দেন গোখেল ইস্কুলে। আর দিব্য ন'টায় বাসে ঝুলতে ঝুলতে প্রেসিডেন্সী কলেজে। কল্যাণী তার অনেক পরে, বান্ধবীদের টেলিফোন করে, গড়িয়ে, বই পড়ে, এমন কি টুকটাক বাজার সেরে তারপর খেতে বসে বেলা দু'টো বাজিয়ে। আজ কিন্তু ছেলের সঙ্গেই খেয়ে নিয়েছে সে, তারপর ট্যাক্সি ডেকে চলে গিয়েছে বোনের বাড়ী—গ্রে স্ট্রীটে। তবে ব্যবস্থা করে গিয়েছে সব। আছে পুরান ঝি-চাকর। মনিবের মান রাখতে জানে তারা। তারাই সম্বর্ধনা করবে স্বামীর পাড়াতুতো বোনকে। জলটল ঠিক আছে, আছে ফুটি আর কলা—আসবার দিনটা বেছেছে সর্বাণী ভাল—একাদশী, অর্থাৎ নূতন জায়গায় এসে রান্না-বান্নার হাঙ্গামে যেতে হবে না।

তা সম্বর্ধনা হ'ল মন্দ না। নিস্তার আর মদনমোহন একগাল হেসে পিসিমাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করল, নিয়ে এল একতলার দাক্ষিণ দুয়ারী ত্রিমছাম একখানা বড় ঘরে এবং সবিস্তারে বিবৃত করল গৃহিণীর অনুপস্থিতির গুরুতর কারণসমূহ। শক্তি লাজুক লাজুক মুখ করে খাটের উপর বসে রইল। ছোট্ট টি-পয় টেনে এনে সেখানেই তাকে ভাত এনে দিল মদন। খাবার ব্যবস্থা ভালই। মাছ, ডিমের লাল ঝোল আর শেষ পাতে ফ্রিজারে রাখা ঠাণ্ডা দৈ। সর্বাণী কিন্তু স্নান করতে ঢুকে আর নিজেকে সামলাতে পারল না। কল্যাণীর অনু-পস্থিতির কারণ বুঝতে তার একটুও ভুল হয় নি। ভাল করেই তাকে জানে সর্বাণী। সে যে একজন আশ্রিতা এ কথা কল্যাণী নিজেও কখনো ভোলে না, সর্বাণীকেও ভুলতে দেয় না। আগে তবু দেখা হত কয়েক ঘণ্টার জন্য মাঝে মাঝে, তার মধ্যেই তীব্র আলো দেখা গেছে কল্যাণীর চোখে। এখন দীর্ঘ একত্র বাসের
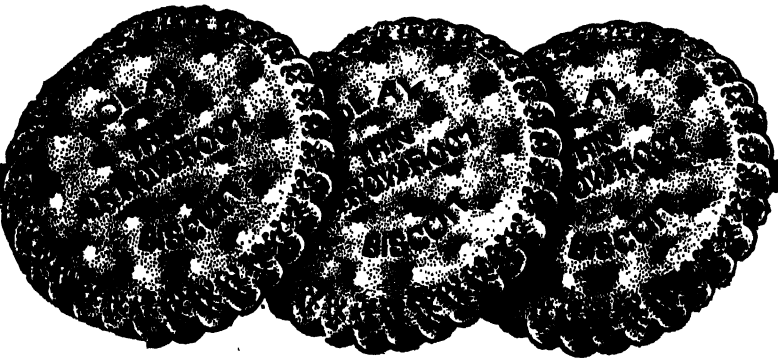
নিরবচ্ছিন্ন দিনে কেমন করে সর্বাণীকে সহ্য করবে কল্যাণী।

চাঁপাতলায় ভালই ছিল সর্বাণী। বাড়ী, মস্তবড় বাগান। মালী আছে দেখাশুনা করতে। সর্বাণীকে মা বলে ডাকে সে। ক'টা বছর সুখে না হোক শান্তিতে কেটেছে সর্বাণীর কিন্তু শান্তি কি ভাগ্যে আছে তার?

মাসকয়েক আগে মস্তবড় এক ফ্যাক্টরী হয়েছে ওখানে। হরেক রকমের গাড়ী, লরী আর জনসমাগমে সরগরম হয়েছে চাঁপাতলা। জমির দাম গিয়েছে বেড়ে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় বিপন্ন হয়ে পড়েছে সর্বাণী। মোটা থান থান কাপড়ে শরীরটাকে মুড়ে তার অস্তিত্ব একেবারেই ভুলে গিয়েছিল সে। হঠাৎ চমকে দেখল এত ঝড় খেয়ে, আগুনে পুড়েও তার বত্রিশ বছরের শরীরটা এখনো বেশ ভাল আছে। দুষ্ট লোক অরক্ষিত পেয়ে চেষ্টা করছে ঝঞ্ঝাট বাধাতে। শিস, দুপুরবেলা ঢিল, অশ্লীল গান—সব দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করল সর্বাণী। না করে উপায় কি? দেহাতী বুড়ো মালীটার কিন্তু এতটা সহ্য হল না। মার দিল এবং মার খেয়ে শয্যাশায়ী হল সে।

ব্যাপারটা এতদিনে গোচরে এল স্মরজিতের। একবার মাত্র জীবনে কর্তব্য স্থির করতে দেরী হয়েছিল, তারপর হতে কুইক ডিসিশন নেবার জন্য নাম আছে তাঁর। দু' দিনের মধ্যে চাঁপাতলার বাড়ী ছেড়ে সর্বাণীকে চলে আসতে হল স্মরজিতের বালীগঞ্জের বাড়ীতে। অশান্তি? হাঁ, অশান্তির কথাও ভেবেছেন বই কি তিনি। কিন্তু অশান্তি হবে না, হতে দেবেন না এ বিশ্বাস নিজের উপর না থাকলে মা মারা যাবার পর চাঁপাতলার বাড়ীতেও সর্বাণীকে রাখতেন না স্মরজিৎ।

সর্বাণীর সঙ্গে স্মরজিতের সম্পর্ক কি আজকের। সেই কতযুগ আগে, তার বাবা তখন মাত্র প্রথম মুনসেফের পোস্টে প্রমোশন পেয়েছেন বরিশালে। সেবার তার ম্যাট্রিক পরীক্ষা। বাবার বদলীর চাকরী বলে বরাবর সে কলকাতার সেণ্টপলস স্কুলের বোর্ডিং-এ থেকে আসছে। পরীক্ষার পর বাবার কাছে গেল স্মরজিৎ বরিশালে। ঠাকুমা বেঁচে। নাতিকে দূরে রাখবার জন্য ছেলের উপর অভিমানের অন্ত নেই তাঁর। কাছে পেলে নাতির উপর আদরের বান ডেকে যায়। এবারও ব্যতিক্রম হল না। উপরন্তু গোলগাল ধবধবে সাদা সর্বাণীকে সামনে বসিয়ে দিয়ে বললেন—'দ্যাখ খোকোন, কেমন পরীর মত মেয়ে, তোর সঙ্গে বিয়ে দেব।'

—'ধ্যাৎ' বলে স্মরজিৎ ঠাকুমাকে ধমকাল কিন্তু লজ্জা পেল না। ন' বছরের একটা পুঁচকে মেয়েকে দেখে লজ্জা পাবার কথা মনেও হ'ল না তার।

সর্বাণীর দিদিমা ছিলেন ঠাকুমার সই—মনের কথা। বাবা নেই জন্মের দু'মাস আগে হতে। সম্প্রতি মাও গেছে মেয়েটার। খুড়তুতো মামা পাঠিয়ে দিয়েছে নিরাশ্রয় সর্বাণীকে ঠাকুমার কাছে। আহা। বেল ফুলের মত মেয়েটা! স্মরজিৎ শুনল সব ইতিহাস। কেউ নেই সর্বাণীর। কেউ নেই? কেন? তারাই ত' আছে। তার ঠাকুমা, বাবা, মা, সে নিজে—সবাই আছে সর্বাণীর।

সারাটা ছুটি ভরে সর্বাণীকে অঙ্ক আর ইংরেজী শেখাল স্মরজিৎ, আর তার সব দরকারগুলো। চলে এল সর্বাণীর হেপাজতে। দু' হাতে ধরে আসছে কাচের বড় গ্লাস ভরে ঠাণ্ডা জল। কাঁচা আমে কাসুন্দি মিশিয়ে করছে মুখরোচক, বালিশের ওয়াড়ে ফুল তুলে লিখে দিচ্ছে 'সুইট ড্রিম'।

ম্যাট্রিক পাস করল স্মরজিৎ খুব ভাল করে। আই-এস-সি। শিবপুর। সব পাসটাস করে কৃতী মানুষের পর্যায়ে এসে পৌঁছাল স্মরজিৎ। বিদেশে যাবার কথা চলছে, যাত্রার সময়ও প্রায় ঠিকঠাক। হঠাৎ একদিন অশ্রুব্যাকুল সর্বাণীর কাছে শোনা গেল তার বিয়ে। বিয়ে? বাঃ বেশ ভাল তো। বিয়েতে কান্নার কি আছে? কত আলো, শানাই, ভোজ।

স্মরজিতের খাবার দিতে এসেছিল সর্বাণী, একবার তাকিয়ে চলে গেল সে। স্মরজিৎ পরিপাটি করে খাবার শেষ করে, বেরিয়ে পড়ল মোহন-বাগানের খেলা দেখতে। ইস্টবেঙ্গল গোল খেল, স্মরজিৎ হাততালি দিল, খেল ঠাণ্ডা হ্যাপিবয় বন্ধুদের সঙ্গে। কিন্তু কি যেন একটা কাঁটা খচখচ করতে লাগল সর্বক্ষণ বুকের মধ্যে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে খোলা জানালার আকাশে বাইরের আকাশ দেখল স্মরজিৎ, আর যত দেখল তত ভাবল। ভাবল সাত বছরের ফেলে আসা দিনগুলি। তেইশ বছরের তরুণ হৃদয় উদ্বেলিত হ'ল।

মনে হল সর্বাণীর বিয়ের খবরের সবটাই হাসি আর আনন্দ নয়। কোথা হতে যেন তার চোখেও জল আসতে চাইছে। প্রায় সমস্ত রাত জেগেই কাটল স্মরজিতের। পরদিন সকালে আটটার ঘুমভাঙা মনে প্রথম ভাবনা উঁকি দিল—ঠাকুমা নেই।

কিন্তু ঠাকুমা না থাকলেও মা আছেন আর আছেন এক প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বাবা। বাবা সদ্য রিটায়ার করেছেন, জজসাহেবী মেজাজ একটুও নরম হয় নি এখন পর্যন্ত। স্মরজিৎ বুঝল প্রবল বাধার সম্মুখীন হতে হবে তাকে। প্রতিবাদ আসবেই আর সে জয় করবে সেই প্রতিবাদ। মায়ের অসীম স্নেহ সর্বাণীকে, কিন্তু কড়া চোখে চাইলেন স্মরজিতের বাবা। ছেলের আবেদনের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন তিনি। একমাত্র সন্তান হলেও ছেলেকে বেছে নিতে বললেন দুটি পথ—হয় নিজের খেয়াল ত্যাগ করবে, নয়তো বেরিয়ে যাবে সর্বাণীকে সঙ্গে নিয়ে। স্মরজিৎ বেরিয়েই যাচ্ছিল কিন্তু মায়ের করুণ মুখখানির দিকে চেয়ে একটু থমকে গেল, আর এই থমকে যাবার অবকাশে জীবনের সবচেয়ে [illegible] কাজটি সেরে

ফেললেন জজসাহেব। দিব্যি কান্তিমান এক ডাক্তার এনে মহাধূমধাম করে সর্বাণীর বিয়ে দিয়ে দিলেন চৈত্র মাসের লগ্নছাড়া দিনেই।

সর্বাণী আর কাঁদল না, হাসতেও কেউ দেখল না তাকে। স্বামীর পিছন পিছন চলে গেল তার ঘরে—সেই কোন জোগ্রামে, যেখানে হাসপাতালের ডাক্তার আদ্যনাথ মিত্র।

তারপর? তারপর তো ইংল্যাণ্ড। নূতন দেশ, সেখানে জীবনের গতি বড় দ্রুত। প্রত্যাশা সেখানে ফুরোয় না, ভেঙ্গে যায় না মন, যদি ভাঙ্গে তবে আবার ভরে ওঠে নূতন আলোতে। স্মরজিৎ সর্বাণীকে ভুলে গেল। ভুলতেই হ'ল তাকে। মনে পড়বার অবকাশই ছিল না যে। তিন বছর পর স্মরজিৎ ফিরল দেশে। ভাল চাকরী—উন্নতির পর উন্নতি। চাকরী ছেড়ে ব্যবসা। বাবা মারা গেলেন। রূপ অর্থ আর আভিজাত্যের সম্মিলন ঘটিয়ে বাবা এনেছিলেন কল্যাণীকে, এল দিবা, এল চিত্রা। মানুষ যা কামনা করে সব পেল স্মরজিৎ—সুখ সম্মান।

মা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সেবার জন্য প্রচুর দাস-দাসীর ব্যবস্থা থাকলেও দরকার ছিল একটি সেবাস্নিগ্ধ হাতের। চিরদিন মা চুপচাপ, এবার কিসের প্রেরণায়,—হয় তো বা নিঃসঙ্গতাই তাঁকে বাধ্য করল মুখ ফোটাতে। ছেলেকে ডেকে একদিন বললেন তিনি—'সর্বাণীকে আনিয়ে নেব খোকোন'?

—সর্বাণী। চমকে উঠলেন স্মরজিৎ। কত অন্ধকার মহল পার হয়ে, বিস্মৃতির কুয়াশা ভেদ করে নামটি তাঁর মনের দুয়ারে দাঁড়াল। অন্যমনস্ক হয়ে উত্তর দিলেন,—'সে আসবে কেন মা, তার ঘর-সংসার ফেলে'?

'ঘর-সংসার।' মা একটু একটু করে ছেলেকে সব বললেন। সর্বাণীর স্বামী মারা গেছে, টাকা-পয়সা কিছু নেই। একটি মাত্র ছেলে। বড় কষ্টে পড়েছে সর্বাণী। এখানে এলে সেও আশ্রয় পাবে, মাও একটু আরাম বোধ করবেন।

স্তব্ধ হয়ে সব শুনলেন স্মরজিৎ। তীব্র কোন অনুভূতি মনে না জাগলেও বার বার উচ্চারণ করলেন—আহা! বেচারী! বেচারী সর্বাণী।

তারপর কবে সর্বাণী এল, কি হল খোঁজ রাখে নি স্মরজিৎ। কয়েকমাস পর একদিন মা ডেকে বললেন—'আজ তোমার জন্মদিন। বিকেলে তাড়াতাড়ি ফিরো খোকোন, আর বাইরে হতে খেয়ে এস না।'

হাসলেন স্মরজিৎ—'জন্মদিন? আমার আবার জন্মদিন কি মা? ও তোমার দিবুর করো।'

মুখে মাকে বলল বটে, কিন্তু সারাদিন ধরে নিজেকে কেমন যেন ছেলেমানুষ ছেলেমানুষ মনে হল। অফিস-বয় দু'টো বাচ্চা ছেলে। কি কাজে তাদের একজন ঘরে এলে, দু' টাকার একটা নোট দিলেন তাকে। আশ্চর্য হয়ে বয়টা গিয়ে সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করল—'সাহেব আজ এত খুশী কেন রে?'

সব শুনে বন্ধু বলল—'নিশ্চয় মেমসাহেব বাপের বাড়ী নয়ত দার্জিলিং গেছেন। মেমরা বাড়ী না থাকলেই সাহেবদের মেজাজ-পত্তর খুশী থাকে জানবি।'

ছ'টার সময় মায়ের ঘরে ঢুকে খুশী মনে খেতে বসে গেলেন স্মরজিৎ। সুস্বাদু রকমারী খাদ্য, কিন্তু দু' এক গ্রাস মুখে তুলেই গলা বন্ধ হয়ে এল স্মরজিতের। কাঁপা কাঁপা হাতে পরিবেশন করছে ও কে? দীর্ঘ দশ বছরের ব্যবধান, তবু ভালো—বেশ ভালো করেই চেনা গেল। দু'টি নিরাভরণ হাত আর একেবারে সাদা শাড়ী। সমস্ত রং সর্বাণীর জীবন হতে নিঃশেষে মুছে গিয়েছে।

জন্মদিনের ভোজ্য আর গলাধঃকরণ হ'ল না স্মরজিতের। মনের গহীন অতল হতে উঠে এল কৈশোরের প্রথম ভালবাসা, হারায় নি তার একটি কণাও বিবর্ণ হয় নি। গভীরতায় উদ্বেল হল বুক। ইঞ্জিনীয়ারের কঠিন চোখ বেয়ে নামল বর্ষার জল।

ছেলের চোখের জল দেখে যে বউয়ের চোখে বিদ্যুৎ চমকাবে তাই ভেবে প্রমাদ গণলেন মা। বারবার ধিক্কার দিলেন নিজের অবিমৃশ্যকারিতাকে। ছেলেকে অনেক বুঝিয়ে সর্বাণীকে নিয়ে চলে গেলেন চাঁপাতলার বাড়ীতে। ছেলেকে ছেড়ে এসে সুখের কিছু অভাব ঘটলেও শান্তিতেই কাটালেন মা শেষের চারটি বছর। শান্তিতে ছিল সর্বাণীও, কিন্তু জীবনের আগুনে দিনগুলো পেরিয়ে এসে বিপদে পড়ল এই উত্তর বেলায়। ছেলে শক্তি স্কুলের পড়া শেষ করবে শীগগির। চোখ-কান বুজে আর কয়েকটা বছর কাটালেই হয়ত উঞ্ছবৃত্তি শেষ হত সর্বাণীর। বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ। আরো প্রত্যক্ষভাবে তাকে আসতে হল স্মরজিতের আশ্রয়ে। কল্যাণীর ঠাণ্ডা চোখের দিকে চেয়ে বুক হিম হয়ে গেল সর্বাণীর। ছেলে শক্তিও সঙ্কুচিত হল। এতদিন পরের বাড়ী হলেও চাঁপাতলায় ছিল সর্বাণীর নিজের সংসার। মাসের প্রথমেই টাকা নিয়ে একবার যেতেন স্মরজিৎ। ব্যবস্থা যা করবার, সেদিনই ঠিক হ'ত, তারপর একেবারে স্বাধীন। কদাচিৎ কল্যাণী যেত বটে, কিন্তু সে তো কয়েক ঘণ্টার মামলা।

বালীগঞ্জের বাড়ীতে জাঁকজমক আলো, পাখা, ছেলে ভর্তি হ'ল ভাল কলেজে। কোন অভাব যেমন নেই, স্বাধীনতাও তেমনি নেই একফোঁটা। পিছনের দরজা দিয়ে শক্তি বাইরে যায়; সর্বাণী নিজের ঘরে বসে থাকে চুপচাপ। কয়েক মাস স্তম্ভিত থেকে কাজে নামল সে, নামতেই হল তাকে। কর্মিষ্ঠা নারী জানালা ধরে দাঁড়িয়ে রাস্তা দেখে সময় কাটাতে পারে না। রান্নাঘরের সর্বেসর্বারা বিরক্ত হলেও খাবার টেবিলে যে বৈচিত্র্যের ব্যঞ্জনা দেখা দিল, তাতে খুশী হলেন উপরতলার

মালিকের দল। চিত্রিতা কলরব করে আনন্দ জানাল। দিব্য গম্ভীর মুখে রস আস্বাদন করল রসপুলি আর পাটিসাপটার। কল্যাণীর চোখ চিক-চিকাল মাছ-পাতুড়ি দেখে। স্মরজিৎ আহার সংযম করেছেন ডাক্তারের শাসনে, কিন্তু সেখানেও একটু স্বাদ উঁকি মারল। কল্যাণীকে খুশীই করে ফেলল সর্বাণী। ভাঁড়ারের চাবি চলে এল তার জিম্মায়। সংসারের সমস্ত ব্যাপারে অপরিহার্য হয়ে উঠল সর্বাণী। কাছে ডেকে কথা বলা, বৃতনিয়মে খোঁজ-খবর রাখা—গৃহিণীর সব কর্ত্তব্য সর্বাণীর উপর করতে ভালই লাগল কল্যাণীর। সর্বাণীর জন্যই সর্বাণীকে একেবারে ভুলে গেলেন স্মরজিৎ আর সে ভুলে যাওয়া একটুও বানানো দেখায় না।

কল্যাণী শক্তির উপরও খুশী। শক্তি বুদ্ধিমান ছেলে। কল্যাণীর সখ বাগানে—দুষ্প্রাপ্য অর্কিডে। কোন্ কোন্ মল্লুক ঘুরে সব যোগাড় করে, ক্যাকটাস, ডালিয়ার কাটিং। পড়া-শুনায় ভাল, আর কি সুন্দর ছেলেটা। চিকন গৌরবরণ। পুরুষালী বলিষ্ঠতা তার দেহে এসে পৌঁছাতে এখনো কিছু দেরী আছে কিন্তু নওল কিশোর তো বটেই। দিব্য স্মরজিতের স্বভাব পেয়েছে, গম্ভীর। বয়সের উচ্ছলতা কম তার মধ্যে। পড়াতে সেও ভাল, স্কলারশিপ পাওয়া ছেলে। শক্তির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না, কিন্তু স্বভাবের বৈষম্য তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে, উঠতে পারে নি। সবু পিসির সঙ্গে বরং দিব্যর কথাবার্তা বেশী। বাইরে হতে এসে ডাক দেয়—'কই পিসি, বার কর তোমার বরিশালী থলি থেকে জাদুকের কারসাজি'।

দিব্য বন্ধু নিয়ে এসে খবর পাঠায়—পিসিদিন পাঁচ থালা নূতন খাবার'। পিকনিকের টিফিন বাক্স সাজাতেও দিব্য পিসির শরণাপন্ন হয়,—রকমারী খাবারে বন্ধুদের লুব্ধ করবার যাদু সর্বদা মজুদ থাকে সর্বাণীর ভাঁড়ারে।

সর্বাণীর ছোটবেলার গল্প শুনতেও ভালবাসে দিব্যজ্যোতি। কালো জল ভরা দুর্গাসাগর—মাধবপাশার রাণী দুর্গাবতীর কালো চোখের মত টলটলে আর গহীন। গা ডুবিয়ে বসলে পৃথিবীর নরম ঠাণ্ডা এসে জড়িয়ে ধরবে। মস্ত বড় আমবাগান ছিল সবু পিসির মামার। বৈশাখের তোলপাড় ঝড়ের সন্ধ্যাতে এক পাল মেয়ে মিলে বাতাসের বিপরীত আঁচল দিয়ে জাল খাটাত সর্বাণীরা। বাতাস লেগে ফুলে ফুলে উঠত আঁচল আর ছুটত তারা। ধুপধাপ পড়ত কাঁচা আম। বাড়ীতে কত ফুলের গাছ। গন্ধরাজের ঝোপের মধ্যে মরে পড়েছিল সর্বাণীর মিনি—তার কথা বলতে এখনো গলা ধরে আসে। তারপর দিব্য শুনত লবণ আইন অমান্যের কথা। নারকোল পাতার ছাই ধুয়ে লবণ বানাত সবাই। এককোঁটা সেই লবণ বিক্রী হ'ত অনেক টাকায়।

সে কি দিন। সর্বাণী থেমে থেমে বলত, ছেলেরা পিকেটিং করত, মার খেত, জেলে যেত। সতীন সেনের কথা বলতে গিয়ে কপালে হাত ঠেকাত সর্বাণী—তিনি কি মানুষ ছিলেন? দেবতা, দেশের জন্য দধীচির মত প্রাণ দিয়েছেন।

দিব্য শুনত। স্বাধীন ভারতের ছেলে, স্বাধীনতা সংগ্রামের মর্মান্তিক ইতিহাস হয়ত গ্রহণ করত না তেমন করে, তবু ভাল লাগত তার সবু পিসির মুখের গল্প—আর এক পথের পাঁচালী। টগবগে ছটফটে চিত্রা কিন্তু খুব মিশে গেল শক্তির সঙ্গে।

টফি আচার চাখতে চাখতে কোথা দিয়ে যে কেটে গেল ক'টা বছর আরো। আই, এস, সি পাস করে শক্তি ইন্টারভিউ দিল মেডিকেল কলেজে। তার বাবা ডাক্তার ছিলেন, স্মরজিৎ বললেন সেও ডাক্তার হোক বাবার মত। এদিকে স্কুল ফাইনাল দিয়ে তিন মাসের জন্য বেকার হয়ে, পড়ল চিত্রিতা। মেলা আজে-বাজে বই পড়তে লাগল সে। ভীষণ ভীষণ সব খারাপ কথা আছে তাতে। পড়বার সময় তেমন কিছু মনে হয় না, কিন্তু শেষ হলে ভয়ানক বিশ্রী লাগে। মনে হয় দাদা, শক্তি—সব ছেলেরা এমন কি বাবা পর্যন্ত খারাপ মানুষ।

বৈশাখ মাসের একটা না-ফুরান মণ্ড বিকেল বেলায় চিত্রিতা মন খারাপ করে বাইরের ঘরে বসেছিল। বলতে গেলে সেই তখন বাড়ীর মালিক। বাবা দাদা তো এমন সময় বাড়ীই থাকে না। আজ মাও গেছেন কোথায়। খালি বাড়ীতে চিত্রিতার রীতিমত মন কেমন করছিল। বৈশাখের এই ধুমন্ত দিনগুলো একটুও পছন্দ নয় তার। সূর্য যেন সারা রাত ভরে চক্রান্ত করে, পরের দিন পৃথিবীর লোককে জ্বালিয়ে মারবে। সকাল আটটাতেই দুপুর বেলা সন্ধ্যাতেও কি আরামের জো আছে। আসবে ঝড়—দুমদাম এলোমেলো। সে এক বিপুল কাণ্ড।

পায়ের শব্দ। ঘরে এসে ঢুকল শক্তি, খুশী হয়ে চিত্রিতা নড়েচড়ে বসল।

—'কোথায় টো টো করছিলে?'

—'টো টো'? হাসল শক্তি দু' চোখে আলোর দীপ জ্বেলে।

—'একটা দরকারী কাজে থাকার মানে টো টো করা নাকি?'

—'আহা। কি দরকারী কাজের মানুষ? ক্যারম খেলবে?'

—'ক্যারম? ওতো ছোটবেলা খেলতাম। মামিমা কই? তাঁর জন্য যা চমৎকার একটা অর্কিড এনেছি।' বাঁ হাতের পাতলা কাগজ জড়ান বস্তুটির অবগুণ্ঠন মোচন করল শক্তি দেখা দিল একটি স্বর্ণাভগুচ্ছ।

—'সত্যি তো। কি সুন্দর। মা যা খুশী হবেন। তোমাকে হয়ত হাতের কঙ্কণই বকশিস দিয়ে ফেলবেন।' খুশী হয়ে বলল চিত্রিতা কথা বলতে পেরেই ভাল লাগল তার। মালির হাতে অর্কিড অর্পণ করে শক্তি এসে বসল চিত্রিতার পাশে। গোলাপী মুখের রং, কালো চোখ

চোখ ভারি সুন্দর দেখতে শক্তি। তাই বলল চিত্রিতা।

---'তোমার চোখ ভারি সুন্দর শক্তি'।

শক্তি একটা ঢোক গিলল-- 'তোমারও ইয়ে খুব সুন্দর।'

—'আমার আবার কি সুন্দর?' আগ্রহে জিজ্ঞেস করল চিত্রিতা।

—'তোমার?' যদিও ষোল ছুঁই ছুঁই তবু এখনো শাড়ী পরছে না চিত্রিতা। আঁট অন্তবাস হাঁটুর কিছু উপরে, হলদে উরুর কাছে আটকে আছে। হাঁটু পর্যন্ত অরগ্যাণ্ডির ফ্রক, দেখা যাচ্ছে গোল গোল শক্ত গোলাপী প সেখানে চোখ আটকে গেল শক্তির।

—'তোমার পা দু'টো খুব সুন্দর।'

কথাটা শুনবার জন্য মুখ বাড়িয়েছিল চিত্রিতা। ত্বরিতে সরে গেল। কি রকম চাইছে দেখ। ঠিক মোপাসাঁর বইয়ের খারাপ লোকগুলোর চোখ।

পা আবার সুন্দর। সুন্দর হয়ত প্রণাম কর। আগুন জ্বলল মাথায়। এক ঝটকায় উঠে পড়ে ঢেউয়ে ঢেউয়ে ঘরের বাইরের দিকে চলল চিত্রিতা। একটুও আর শক্তিকে ভাল লাগছে না, অতি বাজে ছেলে। ও আবার ডাক্তার হবে কি সর্বনাশ! ডাক্তার হবে? তার মানে কি! সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল চিত্রিতার। কেন যে ডাক্তার হয় মানুষ! কারোর গোপন কিছু থাকতে পারবে না, সব জেনে নেবে ডাক্তাররা শরীর নেড়েচেড়ে কেটে কুটে, বুঝে নেবে, দেখে নেবে সব। নিজের ঘরে এসে ছিটকে খাটের ওপর শুয়ে পড়ল চিত্রিতা সে বুঝেছে—পা নয়, তার পায়ের উপর দিকটাই দেখছিল শক্তি। কি অসভ্য ছেলে। ঝিম মেরে শুয়ে শুয়ে ঘামল চিত্রিতা, ঘামতে ঘামতে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম, ঘুম, নিঃসাড়ে ঘুম। জাগল একেবারে রাত সাড়ে ন'টায়। ব্যস্ত হয়ে সবু পিসি ডাকছে তাকে—এক্ষুনি সবাই খেতে বসবে, আর এত ঘুম কি। অসুখ করেনি তো। নাঃ গা ঠাণ্ডা।

'ওঠ, মুখে চোখে জল দে'। পিসি চলে গেল আর খুব ভাজা চোখে এমন চিমটি দিল আলো', যে চোখে হাত চাপা দিতে হল চিত্রিতাকে। কি যেন, কি যেন হয়েছে তার? মনে করতে চেষ্টা করল চিত্রিতা। মনে পড়ল শক্তির চোখ—

সে বড় হয়ে গিয়েছে। রাগের বদলে এবার গালে রঙ লাগাল চিত্রিতার। নিজের বড় হওয়াকে ভাল করে জানবার জন্য আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়াল সে। অমনি কাঁচের মধ্য দিয়ে থোপা থোপা চুল, ফোলো চোখের এক দীঘল মেয়ে তার দিকে উঁকি দিল। কবে---কবে এত বড় হয়ে উঠল চিত্রিতা? বুক উদ্ধত হয়ে উঠেছে, থরে থরে মাংস আর মেদ লাবণ্যে ভরে দিয়েছে হাত-পা, পিঠ, নিতম্ব কোমর সরু হয়ে গিয়েছে, তার পা? সত্যি! ফ্রকটা একটু গুটিয়ে দেখল চিত্রিতা, সত্যি তার পা দুটো খুব সুন্দর। তাদের বাগানের কলাগাছের মত কচি, নধর আর রসালো। কিন্তু সুন্দর বলে সবাই চেয়ে চেয়ে দেখবে নাকি? রাগ হল চিত্রিতার, ভীষণ রাগ।

মায়ের আলনা হতে শাড়ী সংগ্রহ করে নিজেকে সাধ্যমত ঢেকে চিত্রিতা যখন খেতে এল তখন সবার খাওয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। মেয়ের সাজ-বদল দেখে চমকে গেল কল্যাণী।

—'ওমা! একি কাণ্ড! আমার শাড়ী পরেছিস কেন? দেখ, দেখ, তোমার মেয়েকে কেমন দেখাচ্ছে।'

ভয়ে ভয়ে বাবার দিকে চাইল চিত্রিতা। হয়ত বাবার চোখেও দেখতে পাবে শক্তির চোখের সেই লোভী লোভী দৃষ্টি। স্মরজিৎ এক ঝলক মেয়ের দিকে চাইলেন—

'অবিকল আমার মায়ের মত দেখাচ্ছে খুকুকে।' আঃ! সর্বাঙ্গ জুড়িয়ে গেল চিত্রিতার। বাবা! বাবা! তার বাবার মত এমন ভাল কেউ কি পৃথিবীতে আছে? এবার বড় হওয়াটা কেমন যেন ছেলেমানুষী বলে মনে হতে লাগল। আর শাড়ী পড়বার জামা কি-কর। কি-যে গরম লাগে, শীতের দিন এলে আরম্ভ করা ভাল। ভাত মাখতে মাখতে ভাবল চিত্রিতা।

॥ দুই ॥

চিত্রিতাকে কিন্তু বড় হতেই হল। কি যে ভূতে পেয়েছে শক্তিকে—দেখা হলেই কেবল চেয়ে চেয়ে দেখবে, আর গুনগুন করবে—'সুন্দর, তুমি সুন্দর।' দিন, মাস, বছর গেল কিন্তু শক্তির দেখা আর বলা ফুরাল না। ক্রমে তার দেখা, বলা ভাল লাগল চিত্রিতার, ভাল লাগল শক্তিকে। শক্তি যখন তাকে ছুঁয়ে দিল, ছুঁলো তার লাল গাল, টসটসে ঠোঁট তখন তো শক্তিকে ভালই বেসে ফেলেছে চিত্রিতা। যে ভাললাগা ছিল মুহূর্তের অনুভবে, তা ব্যাপ্ত হল, আকীর্ণ হল সমস্ত জীবন-ভরে। অণু হতে জন্ম নিল ভূমা এক তীব্র আনন্দে নিজেকে আবিষ্কার করল, সে শক্তিকে ভালবাসে। কেমন করে, কতদিন ধরে ভালবাসা এসে তার মনে বাসা বেঁধেছে জানে না, কিন্তু দেখল, প্রেম উড়িয়েছে তার জয়ধ্বজা।

আই-এস-সি পাস করে চিত্রিতা বলল—'ডাক্তার হব।'

—'বেশ' রাজী স্মরজিৎ।

কিন্তু বাধা দিল কল্যাণী। বলল— 'না।'

—'কেন না? মেয়ে ডাক্তারের কত দরকার দেশে। দাদা ইঞ্জিনীয়ার, বোন ডাক্তার হবে।'

তবু রাজী নয় কল্যাণী কিছু আন্দাজ করেছিল বুঝি মায়ের মন। বলল স্বামীকে—'চিত্রিতার বিয়ে দাও এবার।'

—'বিয়ে এখনি কি?' আকাশ হতে পড়লেন স্মরজিৎ।

—'মোটে সতের বছর বয়স তো খুকুর।'

কল্যাণী কখনো তেমন জেদ করে না, এবার কঠিন হল। বাধ্য হয়ে স্মরজিৎ পাত্রের তল্লাস আরম্ভ করলেন। বছরখানেক হল, মারা গেছে সর্বাণী। শক্তিকে ডাক্তার দেখে যাওয়া

তার ভাগ্যে হয় নি। শক্তি তোষেলে থাকে পড়ার সুবিধার জন্য। সব শুনে মুখ শুকাল তার। থার্ড ইয়ার, আর দুটো বছর গেলেই স্বাধীন, কিন্তু এ দুটো বছর কাটবে বলে মনে হচ্ছে না।

—'কি হবে চিত্রা?'

—'কি আবার! বিয়ে হবে।'

রেষ্টুরেন্টে বসে দুজনের কথা চলছিল। বড় টুকরো মাছ মুখে পুরল চিত্রিতা।

—'বিয়েটা কার সঙ্গে' জানতে চাইল শক্তি।

—'বরের সঙ্গে। এঃ!' এক ফোঁটা ঝোল পড়ে সাদা জর্জেটে, হলুদ গোল একটি দাগের সৃষ্টি হল।

—'শোন চিত্রা!'

—'শুনছি তো। ইস্ কি বিশ্রী একটা দাগ হল শাড়ীটাতে দেখছ?'

রাগ হল শক্তির। মেয়েটা কি বাজে! এই সময়ে শাড়ী নিয়ে বিলাপ, আর সে রকম শাড়ী ওর বোধ হয় ডজন ডুই আছে। শক্তিকে চুপ দেখে মুখ তুলল চিত্রিতা।

—'এত ভাবনার কি আছে, তুমি গিয়ে তো সব বলবে।'

—'কাকে বলব?' শিউরে উঠে জিজ্ঞেস করল শক্তি।

—'কাকে?'

—'কাকে আবার? মাকে। না না, মাকে নয়, বাবাকে বলবে।'

—'আমি বলব?'

—'বারে! তুমি নয়ত কে আবার বলতে যাবে আমাদের কথা।'

—'কবে বলব?'

—'কবে? আজ রাতেই বলতে হবে। কাল নয়ত কাদের সঙ্গে যেন কথাবার্তা ঠিক হবে। ওকি! ভয় পাচ্ছ নাকি তুমি?'

—'ভয়?' বাইশ বছরের শক্তি খর চোখে তাকাল।

—'ভয় আমি কাউকে পাই না তা জান? ভয় তো তোমারি।'

—'সে কি! আমি ভয় পাব কেন?'

—'কেন পাবে না, লক্ষপতির মেয়ে, ভিখারীর গলায় মালা দিতে যাচ্ছ। তোমার মা ক্ষেপে যাবেন একেবারে।'

—'আঃ! শক্তি! কি বলছ যা তা।' ঠোঁট ফোলাল চিত্রা। তরুণ জীবন, পৃথিবীকে চেনে বড কম। জীবন-যুদ্ধের ভয়, হেরে যাবার ভয়, আরো কত ভয় যে আছে তার খোঁজ রাখতে শেখেনি এখনো। এখন শুধু ভালবাসা। চকিত স্পর্শে এখন টঙ্কার জাগে শরীরে, রোমে রোমে হরষের হরখিলা। মা কি বা জানে। মনে মনে ভাবল চিত্রিতা মায়ের রাজ্যে কেবল সোনা-মাণিকের সিফন, কাতানের কথা। শক্তি একবার কানে কানে ডাকলে যে কত বেণু-বীণা বাজে, চোখে চোখ রাখলে কত চুনি ঝরে পড়ে তার খবর রাখে কি মা? আচ্ছা! মায়েরও তো আঠার বছর বয়েস ছিল বাবার বাইশ। তখন? তখন কি হত? চিত্রিতা মাঝে মাঝে তার

কাক পক্ষ-কেশ বাবাকে ভাবে। বাবার চোখে তখন কি আলো জ্বলত? আর তাই দেখে মায়ের চলায় কি নাচের ছন্দ লাগত? তার অমন সুন্দর মা। আসন্ন প্রৌঢ়ত্বেও কি সুন্দর! স্থমিতশ্রী।

'কি ব্যাপার? শক্তিকে একটু বেমানান ভাবে ঘরে এসে কাছে দাঁড়াতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন স্মরজিৎ রায়। শক্তি ভয় পায়নি একটুও। ভয় কেন? সে কি দোষ করেছে, না পাপ করেছে? ভালবাসা যদি পাপ হয় তবে অবশ্য পাপী শক্তি।

—'আমি চিত্রাকে বিয়ে করতে চাই।' ঝড়ের মত বলে ফেলল শক্তি।

—'তুমি? বিয়ে? খুকুকে? বসো, বসো, ব্যাপার কি?' মেয়েকে ডেকে পাঠালেন স্মরজিৎ। চিত্রা এসে বাবার চেয়ারের পিছন ধরে দাঁড়াল।

—'ক্ষেপেছিস নাকি তোরা? কি বিয়ে বিয়ে আরম্ভ করেছিস?'

—'আমরা কোথায়? তোমরাই তো উঠে পড়ে লেগেছ আমার বিয়ের জন্য।'

—'আরে তোর মা শোনেন না যে।'

—'আর তুমি বুঝি শুনছ? চুপ করে আছ?'

মেয়ের কলকণ্ঠে হেসে ফেললেন স্মরজিৎ—'তা, তুই তো দেখছি বিয়েতে রাজী। কেবল পাত্র বদলালেই হয়।'

হঠাৎ লজ্জা পেল চিত্রিতা। বেশ পরিপক্ক যুবতীর মত প্রেমের জন্য লড়াই করতে এসেছিল চিত্রিতা, কেমন করে যেন বাবার খুকু হয়ে গেল সে। 'যাও' বলে বাবার পিঠের মধ্যে মিলিয়ে গেল চিত্রিতা।

ননসেন্স! মনে মনে বলল শক্তি, মেয়েটা কি ন্যাকা! এক গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে, এখন বাবার সঙ্গে খুকুপনা।

—'যাও তো জানি, কিন্তু তোর মা যে ভীষণ রেগে যাবেন।' মেয়েকে সামনে আনবার চেষ্টা করলেন স্মরজিৎ।

ভীষণ রেগেই গেল কল্যাণী। শক্তি? কে সে? বাড়ীর আশ্রিতা একটু ভদ্রঘরের ঝি ছাড়া আর কি ছিল সর্বাণী? তার ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে? কক্ষনো, কক্ষনো নয়। অন্তত কল্যাণী বেঁচে থাকতে তো নয়।

কল্যাণীর চেঁচামেচিতে ব্যাপারটা ছড়িয়ে পড়ল। ইসারায় আলোচনা করতে লাগল চাকর-দাসীরা। আত্মীয়-মহল উদ্বিগ্ন হবার ভাব দেখিয়ে যাতায়াত ও টেলিফোন আরম্ভ করল ঘন ঘন। এমন চাটনি কি মিলবে সহজে। নাক উঁচু কল্যাণী রায়ের একমাত্র মেয়ে বিয়ে করছে ঝিয়ের ছেলেকে। শয্যাধরা হল কল্যাণী।

ব্যতিব্যস্ত হলেন স্মরজিৎ। মস্ত বড় ব্রীজের কনট্রাক্ট পাওয়া গিয়েছে। বাপ ছেলে ব্যস্ত দু'জনে। বাড়ীর ঝঞ্ঝাট বিরক্ত সঞ্চার করল মনে।

—'তোমার মাকে বোঝাও।' ছেলেকে বললেন বাপ। দিব্য মাথা চুলকাল।

—'মাকে তুমি বোঝালেই তো ভাল হয়। আমি কি ঠিক পরিষ্কার করে সব এক্সপ্লেন করতে পারব? আর মাকে কনভিন্স করা'—

চুরোট ধরিয়ে মিটিমিটি হাসলেন স্মরজিৎ —'ভারটা নিলে পারতে। ভবিষ্যতে খুকু তোমার ওকালতনামা নিয়ে জোর লড়াই দিত।'

আরম্ভ হ'ল তরুণ ইঞ্জিনীয়ার। অনুরাধার সঙ্গে ব্যাপারটা বাবার কাছে অজানা নেই। মুস্কিল! কিন্তু বাবার ইঙ্গিত অবহেলা করল না দিব্যজ্যোতি। অনু প্রায় গরীব ঘরের মেয়ে। চিত্রা যদি কনভেনসন ব্রেক করতে পারে, তার বেলায় ঝঞ্ঝাট কম হবে। সুতরাং মাকে বোঝাবার চেষ্টায় লাগল দিব্য। দেখা গেল বয়স কম এবং সাংসারিক বুদ্ধি বিশেষ না থাকলেও পলিটিক্স-এ সে কম যায় না। প্রথমে চটল কল্যাণী।

—'ঝি-এর মেয়ের সঙ্গে বোনের বিয়ে দিতে চাস?'

সর্বাণী বাড়ীর ঝি কিম্বা আর কিছু ছিল সে তর্কে গেল না দিব্য।

—'শোন মা, সেকেলেপনা করবার চেষ্টা করো না তুমি। আজকাল আর কুল-কৌলীন্যের দিন আছে নাকি? বিত্ত-কৌলীন্যের যুগ এখন। শক্তি চমৎকার ছেলে। বিলেতটা ঘুরিয়ে আন। ওয়েল ফারনিসড্ এয়ার কণ্ডিসণ্ড ঘরে বসিয়ে দাও জামাইকে আর মেয়েকে। দুই স্পেশালিষ্ট মিলে হোল ক্যালকাটা ক্যাপচার করে নেবে। সবার চোখ টাটাবে তখন।'

—কেন? ওকে টাকা খরচ করে তৈরী করবে। কেন? লোকের কাছে পরিচয় দেবার উপায় নেই—সে হবে জামাই।' চোখ লাল কল্যাণীর।

—'সিলি গার্ল! তুমি তো আর্টিষ্ট মা। অমন বাগান করেছ—আর একথাটা বুঝছ না কেন? ইচ্ছে করলে তুমি তো টাকা দিয়ে নার্শারী হতে তৈরী বাগান কিনে আনতে পার। কেন তবে অতকষ্ট করে বীজের যোগাড়, মালি, হ্যান ত্যান? আসলে তৈরী করার আনন্দে সব কর তুমি। এ ক্ষেত্রেও অবিকল তাই। শক্তি ভাল কাটিং তা স্বীকার করতেই হবে। তোমার জল সিঞ্চনে সে যখন মস্ত বড় হয়ে শোভা বিস্তার করবে, তোমার সেদিনের গর্ব আর আনন্দের কথাটা ভাব একবার।'

দিব্যর কাছে হার মানল কল্যাণী। ক্যাটালগ নিয়ে বসল নবতম বাজুবন্ধের নক্সা আবিষ্কারে। বাবার চুক্তি—চিত্রিতা পড়া ছাড়তে পারবে না। ডাক্তার তাকে হতেই হবে।

—'বারে! পড়া ছাড়ব কেন? ডাক্তার তো হবই আমি। দেখ না কি সব ওষুধ আবিষ্কার করে ফেলি।'

—'দু'জনে মিলে তো?' নিরীহ প্রশ্ন করলেন বাবা।

—'আঃ বাবা।'

প্রচুর খরচপত্র করে বিয়ে হল। খুব ধুমধাম। নিমন্ত্রিতের দল যতই সমালোচনা করুক, বরের রূপে মুগ্ধ সবাই। না, বেশ জামাই হয়েছে। তবে পড়াটা শেষ করে বিয়ে হলেই ভাল হত।

ভাল যে হত বিয়ের পর মনে মনে সে কথা স্বীকার করল চিত্রিতাও। কথা ছিল বাড়ীতে চিত্রিতা আর শক্তি থাকবে যথারীতি তার হষ্টেলে পড়ার সময়টা।'

যেকারণে দেখা গেল তাতে অসুবিধা নেক। শক্তি প্রায়ই চলে আসছে বাড়ীতে। এখন জামাই সে, সুতরাং নিয়মমাফিক কল্যাণীর ব্যস্ত হওয়া উচিত। কিন্তু একে তো ঢিলেঢালা স্বভাব, তারপর দীর্ঘদিনের পোষ্যও ছিল, আপ্যায়নের বাড়াবাড়ি তাই হয় না একদম। শক্তি কিন্তু অতিরিক্ত মনোযোগের প্রত্যাশা করে, আর সেটা না পেয়ে তার মুখ অতিরিক্ত গম্ভীর হয়ে যেতে থাকে। চিত্রিতাকে তাই অতি-মাত্রায় সতর্ক থাকত হয় এবং তাতে কষ্টও আছে। এরপর আবার নব-দম্পতির অনুষ্ঠান। বাবার গাড়ী নিয়ে সব বাবার পর, ডায়মণ্ডহারবার নয় তো দীঘা যেতে হ'ল। সিনেমা, বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণ-উৎসব লেগেই আছে। ফলে চিত্রা যদিও উৎরে গেল পরীক্ষায়, শক্তি ফেল করে বসল পরিপাটিরূপে।

শক্তির পক্ষ হতে চিত্রিতাকে অপয়া বলার কেউ ছিল না। চিত্রা নিজেই জল চোখে বার বার নিজেকে দোষী সাব্যস্ত করল। বাবা গম্ভীর, মা ম্লান করলেন। দিব্যজ্যোতিও বিমর্ষ হল।

'ব্যাপার কি চিত্রা! শক্তিকে এভাবে ফেল করিয়ে দিলি? এ'-টা তো হ'ত সেই আদিম যুগে। এ পড়া বর শুনেছি নোলক-নূপুরে সজ্জিতা একাদশী বধূর মধ্যে এমন কিছু হয়ে যেত, যে ফেল করা তখন টা ট্র্যাডিসন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই শতকের শেষ বেলায় এমন সেকেলে বাধালি?

চিত্রার চোখ ছল ছল করছিল, এবার সে কেঁদে ফেলল। কাছে বসে গম্ভীর মুখে বলল—

'কান্নার কি আছে! নিজে তো করেছেই।' কথাটা একটুও ঠাট্টার শোনাল না।

দিব্য বিস্মিত অপ্রস্তুত বোধ করতে শুরু করছিল কিন্তু পরিস্থিতি ঠিক আনবার জন্যই হেসে বলল—

'তুমি একেবারে বুদ্ধু শক্তি! বোঝ না। নিজে পাস করলে কি হবে, পতিদেবতার দুঃখে কি চিত্রার বুক ফেটে যাচ্ছে না?'

শক্তি কোন কথা বলল না। জীবনের প্রথম অকৃতকার্যতা তাকে এমন অপ্রকৃতিস্থ করে দিয়েছিল যে পরবর্তী কয়েক মাস ধরে চিত্রিতার সঙ্গে তার ব্যবহারে মাধুর্য প্রায় লোপ পেতে বসল প্রথমে আশ্চর্য হল চিত্রিতা। মেডিকেল কলেজে এক বছর ফেল করাটা ভীষণ কিছু ব্যাপার নয়। শক্তির চেয়ে ভাল ছেলেও ফেল করে থাকে। ছ' মাস পরই পরীক্ষা। অবশ্য লজ্জা পাবার কারণ আছে শক্তির। চিত্রিতা ভেবেছিল লজ্জা ভাগ করে নেবে দুজনে। কিন্তু শক্তি এমনভাবে চিত্রিতাকে পরিহার করে চলতে লাগল যে তার আচরণ লক্ষ্যের বস্তু হয়ে হয়ে উঠল সবার।

—'এমন করছ কেন?' জিজ্ঞেস করল চিত্রিতা।

—'কি করছি?' পাল্টা প্রশ্ন শক্তির।

—'বাড়ী যাও না, কথা বলতে চাও না আমার সঙ্গে। কেন শক্তি! আমি কি করেছি? তুমি পাস করতে পারনি, কিন্তু তাতে কি আমার দুঃখ হয়নি?'

শক্তি প্রথমে চুপ করে রইল। মনে হল সে বুঝি মেনে নিল চিত্রার কথা একটু পরে বলল।

—'আমার ফেল করাতে দুঃখ পেয়েছ, পাওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তার জন্য বাস্তবে কিছু করেছ কি?'

অবাক হল চিত্রিতা। বাস্তবে সে শক্তি ফেল হবার জন্য কি করতে পারে? কান্নাকাটি? তা ও তো কতদিন ধরেই মন খারাপ করেছিল; এখনো কি ভাল লাগছে নাকি? মুখে বলল।

---'দুঃখ দেখাবার জন্য মানুষ বাস্তবে আর কি করতে পারে বল?'

—'কেন, তুমি অন্তত একবার ফেল করতে পার।'

—'ফেল করব? ইচ্ছে করে? তাতে কি হবে? আর আমি ফেল করলে তোমাকে পাস করিয়ে দেবে নাকি?'

কোন কথা না বলে উঠে চলে গেল শক্তি। এমন ভ্রূকুটিও তাহলে করতে পারে সে। হতভম্ব হয়ে বসে বসে বসে ভাবতে লাগল চিত্রিতা।—সে ফেল করলে শক্তির কি উপকার হত, এবং ইচ্ছে করে কেউ ফেল করে কিনা। চিত্রার আরো হতভম্ব হবার কারণ ঘটল অচিরে। শক্তি জানাল সে পড়া ছেড়ে দেবে।

—'সে কি পড়া ছাড়বে কেন?'

'কারণ বোঝা অতি সহজ। ফেল করে পরের পয়সায় পড়তে লজ্জা আছে।'

—'বারে! বাবা বুঝি আমাদের পর?'

—'তোমার বাবা।' অর্থাৎ স্মরজিৎ রায় যে কেউ নন তাঁর, এ একখাটাই বোঝাতে চাইল শক্তি। কিন্তু সে দিকটা চিত্রা উপেক্ষা করল। উদ্বেগে তার বুক শুকিয়ে গিয়েছে। এতদিনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়েও শক্তির এই অনমনীয়তা তার অজানা ছিল। সম্প্রতি এর দেখা মিলছে অনবরত, আর বুঝেছে চিত্রা যে জেদী শক্তি পড়া ছেড়ে দিতে পারে অনায়াসে, চুরমার করে দিতে পারে চিত্রার সব স্বপ্ন।

—'আমার বাবা তো তোমারও বাবা শক্তি। আমার বাবা মা, দাদা সব কি আমাদের দু'জনের নয়'?

অবেদনের সুরে বলল চিত্রা।

---'না'। স্পষ্ট উত্তর দিল শক্তি। 'জব্বলপুরে মাষ্টারী পেয়েছি একটা। সামনের পয়লা হতে জয়েন করব।'

---'এম-বি পড়া ছেড়ে দেবে, মাষ্টার হবে শক্তি।' চোখে অন্ধকার দেখল চিত্রিতা।

—'আর আমি?'

—'তুমি? তুমি পাসটাস করে বিলেত যাবে, ডাক্তার হবে বড়।'

---'শক্তি! লক্ষ্মীটি! এমন করে কথা বলো না।' স্বামীর কাছে ঘন হয়ে এল চিত্রা—'ফেল কি কেউ করে না? কেউ দেয় পড়া ছেড়ে তারজন্য? দুটো, মোটেত দুটো বছর। তারপরই তো পড়া শেষ। এমন করো না

তুমি। আমার কত কষ্ট লাগছে বোঝ না তুমি?

—'কষ্টের কথা নয় চিত্রা, সম্মানের প্রশ্ন'। ভারি গলায় বলল শক্তি।—
—'ফেল করে স্মরজিৎ রায়ের টাকায় পড়তে আমার আত্মসম্মানে বাধে।'

স্মরজিৎ রায়! এতদূরে চলে গেছেন বাবা! আর আত্মসম্মান! শক্তিকে এতটা বড় করল কে! কে এনে দিল প্রায় সার্থকতার দরজায়? চিত্রিতার বুকে ধাক্কা লাগল। বাবা, তার বাবার মত মানুষ আর আছে পৃথিবীতে? কত স্নেহ, কি কনসিডারেশন। চোখের জল মুছে ফেললে সে।

—'বেশ। বাবার টাকা নিয়ো না। আমি তোমায় টাকা দেব।'

—'সে তো তোমার বাবারই টাকা। আজ না হোক কাল জানবে সবাই। সোজাসুজি মুখে না নিয়ে হাত ঘুরিয়ে খাবার খাচ্ছি। এমন ঝামেলা বাঁধাবে তুমি জানলে, তোমাকে বলতামই না কিছু। উঠি এখন। যাবার আগে আসব একবার।'

—'শোন, শোন।' প্রায় আর্তনাদ করে, দু' হাত ধরে উঠতে উদ্যত শক্তিকে বসাল চিত্রিতা।

—'পড়া ছেড় না তুমি। বাবার টাকা না নিয়েই তোমার সব খরচ আমি চালাব।'

—'পাবে কোথায় টাকা?'

—'কোথায় পাব?' একটু ভাবল চিত্রিতা। 'আমি পড়া ছেড়ে চাকরী নেব।' এতবড় স্বার্থত্যাগের কথা বলতে গিয়ে চোখে জল এল, গলা কাঁপল চিত্রিতার।

—'চাকরী নেবে? পড়া ছাড়বার কথা উচ্চারণ করতেই কাঁদছ, ছাড়লে তো অজ্ঞান হয়ে যাবে। ওসব বাজে কথা থাক। মাষ্টারীও একটা কাজ, আর তা করতে আমার কোন দুঃখ হবে না।'

—'না না। আমি কাঁদছি না। শোন।' এবার শক্তির মতই দৃঢ়স্বরে বলল চিত্রিতা —'কক্ষণো তুমি পড়া ছাড়তে পাবে না। আমি একটা অফিসে চাকরি নেব।'

—'তোমার বাবা দিতে দেবেন চাকরী?'

আবার বুকে ঘা লাগল চিত্রিতার। তার বাবা-মা অনুমতি দিলেই হল? শক্তির একটুও কষ্ট লাগবে না সে পড়া ছাড়লে? বাবার যে বুক ফেটে যাবে।

—'মা-বাবা জানতেই পারবেন না।'

—'তারপর'?

—'তারপর'? এবার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল চিত্রিতার। 'তুমি পাস করে বেরুলে তখন আমাকে পড়াবে। কি বল, ভাল হবে না?'

—'ভাল হবে, খুব ভাল হবে'।

সব মেঘ কেটে গেল। শুধু জ্যোৎস্না, শুধু হাসি, শুধু ভালবাসা।

চাকরী পাওয়া সোজা নয়। চিত্রিতা অ্যাপ্লিকেশন করল। ইনটারভিউ পেল কিছু, কিন্তু কোয়ালিফিকেশন কি তার? আই-এস-সি—ফার্ষ্ট ডিভিসন? লেটার ম্যাথমেটিক্স, কেমিষ্ট্রীতে? নো, নো, দ্যাট্স নো কোয়ালিফিকেশন্স ফর এ ক্লার্ক। স্টেনোগ্রাফী জান? টাইপ?

শক্তি দেখল চিত্রার ক্লান্ত হয়ে ওঠা মুখ।

একটু হাসি, বিদ্রূপ। তারপর এগিয়ে এল প্রত্যক্ষ সাহায্যে।

—'ওয়াই, ডবলিউ, সিতে ভর্তি হয়ে যাও। তিন মাসে তোমাকে এক্সপার্ট করে দেবে ওরা'।

—'কিন্তু এই তিন মাস'? উদ্বিগ্নমুখে জিজ্ঞাসা করল চিত্রা।

—'আচ্ছা। এই তিন মাস নয়তো তোমার জন্যে হিউমিলিয়েশন স্বীকার করে পরান্নেই পালিত হব।'

খুব একটা স্বার্থত্যাগের ভঙ্গী করল শক্তি।

চিত্রিতা কৃতার্থ হয়ে গেল—কি ভালো। আর তাকে কত ভালবাসে শক্তি। কিন্তু মা বাবাকে লুকিয়ে পড়া ছাড়া কি কষ্টকর। কলেজের বন্ধু শান্তা ভয় দেখাচ্ছে—সব বলে দেবে বাড়ীতে। হাত পায়ে ধরে তাকে থামাল চিত্রিতা। ঠিক সময়ে বাড়ীর বাইরে চলে যেতে হয়, ঘুরতে হয় এখানে সেখানে। কি যে জ্বালা!

চার মাস পর প্রার্থিত ফল মিলল। চাকরী হল চিত্রিতার। শক্তি দুই গালে চুমো দিল তার।

'দেখ, আমি পাস করে নেই,—তোমাকে বিলেত পাঠিয়ে দেব। এই পচা কলেজে পড়েই বা কি হবে। এখানের পাস করা ডাক্তারদের চাইতে একটা নার্সও উপার্জ্জন বেশী করছে'। চিত্রা সব শুনল, বুঝতে চেষ্টা করল—কিন্তু মনটা যে কেবল হু হু করে। দশটা হতে পাঁচটা—ছটা। ডিকটেশন নাও, টাইপ কর। মাঝখানে আবার বিশ্রী টিফিন রুমে যাওয়া। মেলা মেয়ে কাজ করে। যুদ্ধের পর সব অফিসেই মেয়ে কাজ করছে দেদার। কি যে তারা বলতে চায়—আর বলে সেও একটা অজানা ব্যাপার চিত্রার কাছে। বদলে গিয়েছে সে। বাড়ী ফিরে এলে কেমন যেন ছোট মনে হয় নিজেকে, এ বাড়ীতে আর মানায় না বুঝি তাকে।

দু' মাস কাটল নির্বিবাদে, বিপদ ঘটল তৃতীয় মাসে। আলিপুর হতে ফিরছিলেন স্মরজিৎ রায়, পথে পেট্রোলের অনটন জানাল ড্রাইভার পেট্রোল পাম্পে গাড়ী ঢুকতে দেখা গেল বিব্রত মুখে দাঁড়িয়ে ডঃ বোস—স্মরজিতের বন্ধু এবং চিত্রিতার প্রফেসর।

'কি ব্যাপার প্রফেসর তৈলাভাব তোমারও?'

—'আর বল না বিভ্রাটের কথা তেল ভরে এখন ড্রাইভার বলছে চাকা পাংচার—ঐ দেখ না।'

—ষ্টেপনি লাগতে ব্যস্ত ড্রাইভারকে দেখালেন ডাক্তার।

—'তোমার কাণ্ডটা কি স্মরজিৎ। চিত্রিতার পড়া বন্ধ করে দিলে? সুন্দর রেজাল্ট করছিল মেয়েটা।'

—'পড়া বন্ধ করে দিলাম? সেকি? খুকু তো পড়ছেই।'

—'কোথায়। টার্মের প্রথমেই নাম উইথড্র করে নিয়েছে। কারণ জিজ্ঞেস করতে কিছু না বলেই পালিয়ে গেল।'

অস্থির হলেন স্মরজিৎ। খুকু পড়া

ছেড়ে দিয়েছে? কেন? কি কারণ? বাড়ী এসেই খোঁজ করলেন মেয়ের। চিত্রিতা আজকাল সাধ্যপক্ষে বাবার সামনে পড়তে চায় না, স্মরজিৎ সর্বদা ব্যস্ত কাজে। আজকে সব ফেলে বসে রইলেন মেয়ের অপেক্ষায়। রাত আটটায় দেখা পাওয়া গেল চিত্রার। বাবা ডাকছেন শুনে বিবর্ণ মুখে ঘরে এসে ঢুকল সে।

মেয়েকে কাছে বসিয়ে ভাল করে দেখলেন বাবা। 'কেমন পড়াশুনা হচ্ছে খুকু? পরীক্ষা তো এসে গেল, না?' নতচোখে বসে রইল চিত্রিতা। বুকের মধ্যে ঢিব ঢিব, ঘেমে উঠল কপাল। এবার সে কি বলবে তার বাবাকে? অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন স্মরজিৎ। তারপর বললেন— 'পড়া ছেড়ে দিলি খুকু? তার আগে আমাকে একবার জিজ্ঞেস করতেও ইচ্ছা হল না?'

চিত্রা এবার উবুর হয়ে বাবার কোলে মুখ গুঁজে কেঁদে ফেলল।

একটু একটু করে সব শুনলেন স্মরজিৎ। সর্বাণীর ছেলে, খুকুর স্বামী বাপের সাহায্য নিতে চায় না। কেন? কেন? মায়ের অভিমান আত্মপ্রকাশ করল ছেলের মধ্যে এতদিন পর? বাপের সাহায্য নিয়ে দরকার নেই, না হয় টাকাটা যেন ফিরিয়ে দেয় পরে, তাও না? তাও না? চাকরী করেই হবে। চিত্রাকে পড়া ছেড়ে দিতে হবে? বলবার, করবার কিছু, একেবারে কিছুই নেই?

শক্তিকে ডেকে পাঠালেন স্মরজিৎ। একটু বিলম্বে এল সে। ঋজু, সুন্দর চেহারা, মেডিকেল ইয়ার ভাবী ডাক্তার। বোঝাতে চাইলেন তাকে, বহুযুক্তি তর্কের অবতারণা করলেন স্মরজিৎ কিন্তু একেবারে অনমনীয় শক্তি। বহু সাহায্য নিয়েছে, আর নেবে না, পারবে না নিতে। চিত্রিতার ভবিষ্যৎ? সেও শক্তিই দেখবে। পড়বে বই কি চিত্রিতা, তবে অন্যের টাকায় নয়। শক্তি পড়াবে চিত্রিতাকে। রূঢ় ভাষায় নয়, সংযত, শান্ত, ভদ্রভাবে স্মরজিতের প্রত্যেক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল শক্তি। তারপর ঘটনা অন্য পথে ঘুরে গেল।

অফিসের পথে, সপ্তাহখানেক পর শক্তি ধরল চিত্রাকে 'সব গুছিয়ে নিয়ো। ফ্ল্যাট পেয়েছি।'

---'ফ্ল্যাট কেন?' আশ্চর্য হল চিত্রা।

---'কেন আবার? থাকবার জন্য। ও বাড়ীতে আর থাকা চলবে না তোমার। তোমার বাবা আমাকে অপমান করেছেন।'

---'সে কি! বাবা তোমাকে অপমান করলেন কি করে'? ব্যাকুল হল চিত্রা।

---'অপমান বুঝবার ক্ষমতা তোমার আছে নাকি। শোন চিত্রা! যদি বাবার বাড়ী হতে চলে আসতে না চাও, আমাকে বাদ দাও'।

---'তোমাকে পেতে হলে বাবাকে ছাড়তে হবে'?

---'একে ছাড়া বলে না। বিবাহিতা মেয়ে স্বামীর ঘরেই থাকে, তুমি তাই করবে মাত্র'।

চিত্রিতার ইচ্ছা হল জিজ্ঞাসা করে —তার স্বামীর ঘরটা কোথায়, কিন্তু নিজের জিহ্বাকে সংযত করল সে।

চিত্রা ভেবেছিল তার চলে যাওয়া নিয়ে বুঝি ঝড় উঠবে বাড়ীতে। হয়তো চেয়েছিল হোক ঝড়। একটা কিছু বোঝাপড়া হবে তাহলে। কিন্তু তেমন কোন বাধা এল না বাপ-মায়ের কাছ হতে। স্মরজিৎ অনেক দূর দেখতে পাচ্ছিলেন, বুঝছিলেন—আঘাতে তিনি পারবেন না। চিত্রার মধ্যেই নেই শক্তিকে প্রতিহত করবার ক্ষমতা। শক্তির চোখে এক কণা আগুন। সেই কিশোর অনুপম সর্বাণীর ছেলে আর নেই যে, তার মধ্যে জেগে উঠেছে আদ্যনাথ ডাক্তার, যে লাথি মেরে হত্যা করেছিল পূর্ণগর্ভা প্রথমা স্ত্রীকে।

কল্যাণী প্রায় খুশী। মেয়ের বাপের বাড়ীর বাস নিয়ে আত্মীয়-স্বজনদের টীকা টিপ্পনীতে অস্থির ছিল সে। থাক, নিজের ঘরে থাকুক গিয়ে মেয়ে। কষ্ট? কষ্ট কিসের? কল্যাণী আছে না! একটিমাত্র মেয়ে, তার কত সাধ আহ্লাদ—কিছুই মিটল না। এমন নিসে করে কেউ? মেয়ের বুদ্ধি আর মায়ের কপাল।

স্মরজিৎ হাসিমুখে সম্মতি দিলেন। তিনি জানছিলেন বিপদের রেখা দেখা দিয়েছে দূর দিগন্তে। বিরূপতার হাওয়া দিয়ে সে বিপদকে ত্বরান্বিত করতে মন চাইল না পিতার। চিত্রিতা কিন্তু যাবার সময় ভেঙ্গে পড়ল। মেয়েকে ত্রস্তে বুকে টেনে নিলেন স্মরজিৎ।

---'বোকা মেয়ে। চোখের জল মোছ'।

---'বাবা'।

---'ঠিক আছে'। শান্ত হল চিত্রিতা বুঝল সব ঠিক আছে। তার বাবা আছেন,—বিপদের নির্ভর দুঃসময়ের পরিত্রাতা। দুঃসময় যে এসে গিয়েছে তা বুঝেছে চিত্রা। ভালবাসার বাঁধ বারে বারে ভেঙ্গে যাচ্ছে, ভরাভাদ্রেই টান পড়েছে জলে, আভাস মিলছে আবর্জনার। [ক্রমশ।

এ মাসের প্রচ্ছদপট

এই সংখ্যার প্রচ্ছদে শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর একটি চিত্র মুদ্রিত হইল। চিত্রটি অঙ্কিত করিয়াছেন শ্রীঅন্নদা মুন্সী।

ক্রিকেটের রাজপুত্র

ফ্রাঙ্ক ওরেল

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ডবলিউ জি গ্রেস—দি ফাদার অফ ক্রিকেট, ক্রিকেটের জনক, আর ফ্রাঙ্ক ওরেল—ক্রিকেট রাজকুমার। ফাদার আর প্রিন্স। সুতরাং দু'জনের মধ্যে মিল থাকাই স্বাভাবিক। না থাকলেই হয়তো জাগতো অস্বাভাবিকতার প্রশ্ন। কিন্তু যেখানে প্রশ্নই নেই সেখানে উত্তর খুঁজতে যাওয়া বিড়ম্বনা। তবে সে ভয় নেই এখানে। কি অদ্ভুত মিলই না আছে ক্রিকেট খেলার জনকের সঙ্গে ক্রিকেটের রাজকুমারের। অথচ কি অস্বাভাবিক বিপরীতধর্মী এই দুটি চরিত্র। একজন আত্মপ্রকাশের আসনে আসীন আর অপরজন নিজেকে জানতে না দেবার আবরণের আড়ালে রুদ্ধ।

ডবলিউ জি গ্রেস আর ফ্রাঙ্ক ওরেলের মধ্যে আছে অদ্ভুত মিল। হয়তো পৃথিবীর প্রতিভাবানদের মধ্যেই এ মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। ওরেল হাসতে ভালোবাসেন। ভীষণ ভালোবাসেন হাসতে। কিন্তু তাঁর সে হাসির মধ্যে আছে সংযত স্বভাবজ মিষ্টতা। আছে বিদ্যুতের চমক। ওরেল হাসছেন। কালো পাথরে কোঁদা চেহারার মধ্যে সাদা চকচকে দাঁতের সারি ঝলমলিয়ে ওঠে। অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা ওরেলের হাসি দেখার জিনিস। কিন্তু ডবলিউ জি গ্রেস। বুঝি হাসির মধ্যেই তিনি বিশেষভাবে মূর্ত হয়ে উঠেছেন। গ্রেসের হাসি যেমন বহুদূর থেকে শোনা যেতো, তেমনি তার মধ্যে দিয়েই মূর্ত হয়ে উঠতো গ্রেস চরিত্রের একটি বিশেষ দিক। তাঁর হাসি একবার যাঁর কানে গেছে, তিনি বোধহয় চিরকাল ধরে শুনেছেন প্রকাণ্ড চেহারার আর দাড়ি-গোঁফে ভরা একটি প্রাণবন্ত মানুষের উদ্দাম হাসি—হেঃ হেঃ হেঃ----।

যাক সে কথা। আমরা এখানে ওরেল আর গ্রেসের মধ্যে মিল খুঁজতে বসেছি। কিন্তু খেলার মাঠের কথা বলব না আজ। বলব না ব্যাট-বল হাতে দুই সংগ্রামী পুরুষসিংহের কাহিনী। আজ আমাদের বক্তব্যের রস রমণীয়। ক্রিকেট মাঠের বাইরে দুই প্রধানের রসিক মনের পরিচয় আজ দিতে বসেছি। কিন্তু খেলার মাঠের বাইরেই বা বলি কি করে। মাঠই যাঁদের পরিচয়, মাঠই যাঁদের জীবন—মন-প্রাণ সবকিছু—মাঠের কথা ভুলে গেলে তো তাঁদের কথা বলা যায় না।

বুড়ো ডাক্তার রসিক। সুরসিকই। সেবার মিডলসেক্সের বিরুদ্ধে খেলছেন ডাক্তার গ্রেস। সারাদিন ব্যাটিং করে দিনের শেষে ১৬৩ রান করে গ্রেস থেকে গেলেন নট আউট। পরিশ্রান্ত দেহে রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগেই এল কল। ডাক্তার গ্রেস। সুতরাং [illegible] হল। তারপর সমস্ত রাত ধরে প্রসব করানোর কাজে রইলেন মেতে। পরের দিন খুব স্বাভাবিকভাবে ব্যাটিং করে করলেন ২২১ রান। তারপর একটানা করলেন বোলিং।

খেলা শেষ হয়ে গেল। সন্ধ্যের সময় মিডলসেক্সের খেলোয়াড়রা ঘিরে ধরলেন গ্রেসকে। নানা কথা আর প্রশ্নের পর মিডলসেক্সের ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন, "গতরাত্রে যে প্রসব করাতে গেলেন তার খবর কি?"

"সন্তোষজনক", গ্রেসের নির্বিকার উত্তর।

গ্রেসের এই নির্বিকার মনোভাব ঠিক বুঝি পছন্দ হল না মিডলসেক্স দলের ক্যাপ্টেনের। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, "বাচ্চাটা আর তার মা ভালো আছে তো?"

গ্রেস আরও গম্ভীর। বললেন, "বাচ্চাটা মরেছে, মরেছে তার মাও। তবে বাঁচিয়ে দিয়েছি বাবাটাকে---!"

কিম্বা আর একটা ঘটনা। রাত্রি বেলায় কাতরানি শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল গ্রেসের। উঠে যা দেখলেন তাতে তাঁর চোখ ছানাবড়া, একটা চোর চুরি করতে আসছিল। জানলা দিয়ে ঘরে ঢুকতে যাবার সময় ভারী জানলার একটা কপাট তার হাতের ওপর পড়েছে। ফলে চোরটি বেশ জখম হয়ে সেখান থেকে নড়তে পারছে না। যন্ত্রণায় ছটফট করে কাতরাচ্ছে সেখানে।

পরের দিন ঘটনাটা শুনে ভাই এম ই গ্রেস জিজ্ঞেস করলেন, "তারপর তুই চোরটাকে নিয়ে করলি?"

ডবলিউ জি গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "চোরটার হাতে মলম লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলাম। তারপর ঘাড় ধরে বাইরে নিয়ে গিয়ে বিদায় করে দিলাম এক লাথি মেরে।"

"সে কি রে, তুই একটা বুদ্ধু!

চোরটাকে হাতে পেয়েও পুলিশে দিলি না ?"

"না, রোগীকে পুলিশে দিতে নেই। মেডিকেল এটিকেট বলে একটা জিনিষ আছে তো।"

এ রকম নির্ভেজাল রসিকতার ভরা ডবলিউ জি গ্রেসের সমস্ত জীবন। কিন্তু আমরা এখানে বসেছি ওরেলের কথা বলতে, ডবলিউ জি গ্রেসের কাহিনী নয়। কিন্তু আগেই বলেছি ক্রিকেটের রাজকুমারকে জানতে হলে, চিনতে হবে ক্রিকেট খেলার জনককে। আর সেই কারণে খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আলোচনায় সবার আগে এসে গেছেন দি ফাদার অফ ক্রিকেট, ক্রিকেটের জনক---ডবলিউ জি গ্রেস।

আমরা ডবলিউ জি গ্রেসের রসিক মনের পরিচয় কিছুটা পেয়েছি। এবার বলব ওরেলের কথা। কিন্তু ওরেলের কথা বলতে আমাদের বেশীদূর যেতে হবে না। ভারতবর্ষেই ঘটে যাওয়া যে ঘটনার কথা একদিন বেরীদার (শ্রীযুক্ত বেরী সর্বাধিকারী) কাছে শুনেছিলাম আর যার কথা শঙ্করীদা (শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু) একবার লিখেওছেন, সেই ঘটনার কথাই আজ বলব।

ঘটনাটি ওরেলের বিদ্রূপপূর্ণ রসিকতার একটি জলন্ত উদাহরণ। সামান্য এই ঘটনাতেই ওরেলের রসিকমনের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

ওরেল তখন মাদ্রাজে। এক নাছোড়বন্দা ভদ্রলোক ওরেলকে একনাগাড়ে প্রশ্ন করে চলেছেন। ওরেল বিরক্ত। ভদ্রলোককে প্রশ্রয় দিতে নারাজ। কিন্তু ভদ্রলোক নাছোড়বন্দা। ওরেলের শারীরিক ক্লান্তি পর্যন্ত তিনি উপেক্ষা

● ডবলিউ জি গ্রেস

করে চলেছেন। কিছুতেই ওরেলকে রেহাই দেবেন না তিনি।

সময়মত পেয়ে গেছি শঙ্করীদার লেখা। সেখান থেকেই তুলে দিলাম কিছু অংশ—

মাদ্রাজের এক নাছোড়বন্দা ভদ্রলোক ওরেলকে প্রশ্নে প্রশ্নে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন—

মিঃ ওরেল, আপনি কি করেন ?

ক্রিকেট খেলি।

মিঃ ওরেল, বাকি সময় কি করেন ?

ক্রিকেট খেলি।

মিঃ ওরেল, বাড়তি সময় কি করেন ?

আরও ক্রিকেট খেলি।

মাদ্রাজী ভদ্রলোক এতেও দমলেন না। ঘটা করে নিজের সম্বন্ধে জানাতে শুরু করলেন, তিনি স্বয়ং কি করেন বা না করেন। বিশেষ গৌরবের সঙ্গে জানালেন, তিনি লণ্ডনে ছিলেন বেশ ক'য়েক বছর এবং তাঁদের ছয় বছরের দাম্পত্যজীবনে সন্তানাদি চারটি। ওরেল শুধু একটি প্রশ্ন করলেন,—চোখের ও ঠোঁটের কোণে বিদ্যুৎ অথচ কণ্ঠ নিরীহ,—মিঃ লণ্ডনার, আপনি 'রা-ড়-তি' সময়ে কি করেন ?

সকলে হেসে গড়িয়ে পড়ল।

ছ'বছরে চারটি সন্তানের জনকের উদ্বৃত্ত সময়ের কর্ম সম্বন্ধে ওরেলের প্রশ্ন কতখানি সুনীতি-সঙ্গত হয়েছে তার বিচার আপনারা করবেন---।

আমি এখানে বসেছি ওরেলের রসিক মনের পরিচয় দিতে। মনে হয় নীতি-সুনীতির প্রশ্ন জলাঞ্জলি দিয়ে রসিকতাপূর্ণ ওরেলের ঐ প্রশ্নটিই সকলকে চিনিয়ে ওরেলের চির রসিক মনকে চিনিয়ে দেবে রসিক ক্রিকেটার ফ্রাঙ্ক ওরেলকে—রসিক মানুষ ফ্রাঙ্ক ওরেলকে।

স্মৃতিচারণ

(রবীন্দ্রনাথের জন্য)

পরিমল চক্রবর্তী

তোমার স্বপ্নের লোকে আমি ফিরে গিয়ে
এখনো সতত আসি হৃদয় রাঙিয়ে।
বকুল গোলাপ ফোটে মনের বাগানে
তোমার চিত্রের প্রেমে, স্নিগ্ধ গানে গানে।
যন্ত্রণার অন্ধকারে করি পারাপার
তোমাকে দিশারী করে তরণী আমার।
আমার কবিতা তুমি, স্মৃতির দর্পণ
তোমারি স্নেহল ছবি আঁকে অনুক্ষণ।

এখনো তোমাকে ভেবে হৃদয় বিস্মিত:
(কী যে কষ্টে রক্ষা করে যৌবনের রীত,
ফিরে গিয়ে চুপি চুপি সেই পুরাতন
অন্ধকারে, সমর্পিত করি দেহমন!)

এখনো সতত আসি হৃদয় রাঙিয়ে
তোমার স্বপ্নের লোকে আমি ফিরে গিয়ে॥

মণিপুরী নৃত্য

(সম্প্রতি মণিপুরী নৃত্য বোম্বাইতে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। গত একুশ বছর ধরে এখানে আমি মণিপুরী নৃত্যের শিক্ষকতা করে আসছি। আমার ছাত্র-ছাত্রীরা ও অনুরাগীরা প্রায়ই জানতে চান বোম্বাইতে কি করে এই নৃত্যের প্রবর্তন হলো, আর এখন এর গতিপ্রকৃতি কোন পথে। তাই এ সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করতে চাই।---লেখক]

আজকালকার শিল্পী

মণিপুরী নৃত্যের কথা বলার আগে আজকাল বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যেসব শিল্পীরা সংশ্লিষ্ট রয়েছেন তাঁদের ঝোঁক কোনদিকে সেকথা বলা দরকার। সত্যি বলতে কি, একটা বড় বন্ধনও আছে---সেটি হচ্ছে লোভ। এই লোভ শিল্পীকে সহজে আদর্শভ্রষ্ট করে কায়েমী স্বার্থের তাঁবেদার করে ফেলে। এর থেকে রক্ষা পেতে হলে চারিত্রিক দৃঢ়তার প্রয়োজন। তা না হলে পরে যেব দেখা দেয় এবং ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য একজনের আর একজনের ক্ষতি করতে বাধে না। আর শিল্পী তার শিল্প-সমৃদ্ধির কথা ভুলে গিয়ে কি করে সস্তায় নাম পাওয়া যায় সেই করে, ফলে চটকদার শিল্পকলার দিকে তার ঝোঁক যায়। এতে জনসাধারণের মন পাওয়া যায় ঠিক কিন্তু শিল্প-প্রতিভার বিকাশের পথটি রুদ্ধ হয়ে যায়।

আমরা এখন টাকা রোজগারের জন্য এত বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে, অর্থই এখন আমাদের জীবনের সর্বস্ব হয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় শিল্পকলাকে লোভমুক্ত করে পুনরুজ্জীবিত করা কষ্টকর। আমাদের পূর্বসূরীরা যে প্রাচীন ভাবধারা অনুসরণ করে আসছেন তার গোঁড়ামি থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। শুধু তাই নয় আধুনিক সমাজের চিন্তাধারার সাথেও আমাদের খাপ খাইয়ে চলতে হবে। এখনকার উন্নয়নশীল অর্থনীতিতে যেসব সুযোগ-সুবিধা রয়েছে উপযুক্ত শিক্ষালাভ করে শিল্পীরা বর্তমান সমাজের চাহিদা পূরণের উপযোগী করে নিজেদের গড়ে তুলতে পারেন। কিন্তু

নৃত্যশিল্প সাধারণ শিল্পকলার একটি অঙ্গ। সুতরাং এসব অসুবিধা নৃত্যশিল্পেও রয়েছে।

সুরেন্দ্র সিনহা

ক্লাসিক্যাল নৃত্য আমাদের একটা অতুলনীয় উত্তরাধিকারী। আমরা যদি অপপ্রচার করি তাহলে এর মান নেমে যেতে বাধ্য। শিক্ষার্থীরা যদি এক একটা বিষয়ে কৃতিত্ব অর্জন করতে পারে তাহলে শুধু যে ধারা অব্যাহত থাকবে তা নয়, সামগ্রিকভাবে নৃত্যকলার উন্নতি ঘটবে। সুতরাং কেবল টাকার লোভে নৃত্যশিক্ষা বা টাকার মাপে নৃত্য শিক্ষাদানের মনোভাব মুক্ত হয়ে আন্তরিকতার সাথে ব্রতী হতে হবে। এটুকু মনে রেখে চললে ভারতীয় নৃত্যকলার ধারা রক্ষিত হবে এবং বাহিরের চাপে নষ্ট হবার আশঙ্কাও আর থাকবে না। আজকালকার দিনে ছাত্র-শিক্ষকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে টাকাই বাধা সৃষ্টি করছে। শিক্ষকের ওপর শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা কমে আসছে। ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করে শিক্ষার্থীদের সাথে মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলা শিক্ষকদের কর্তব্য।

লোকনৃত্য

আমার মতে লোকনৃত্য যেহেতু যুগ যুগ ধরে আমাদের রক্তের সাথে মিশে আছে তাই এর আর কিছু শেখবার দরকার নেই--এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ অত্যন্ত সহজ লোকনৃত্য থেকেই ক্লাসিক্যাল নৃত্যের উৎপত্তি। লোকনৃত্যের প্রতিটি ক্ষেত্রে তার একটা নিজস্ব পদ্ধতি রয়েছে। উৎসবে, বড় বড় সহরে লোকনৃত্যানুষ্ঠান দেখে অনেক শিল্পী মনে করেন এতে তেমন কিছু নেই---তারা রপ্ত হয়ে গেছেন। সুতরাং নৃত্য রচনায় লেগে যান। এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে লোকনৃত্যের স্বাভাবিক গঠন উপেক্ষিত হয়, আজকাল

বিভিন্ন রাজ্যের যেসব লোকনৃত্য শহরে-নগরে দেখা যায় সেগুলিতে মূল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং লোকনৃত্যের উৎপত্তি যে রাজ্যে সেখানে তার প্রকৃত রীতি-পদ্ধতি যথাযথভাবে শিক্ষার জন্য এক একজন শিল্পীকে পাঠানো দরকার যাতে আর চোখ ধাঁধানো অলঙ্কার ও সাজসজ্জা দিয়ে লোক-নৃত্যের ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে দর্শকের মনকে সরিয়ে নেবার কৌশল না করা হয়। কেন না দেখা গেছে এইভাবে গোঁজামিল দিয়ে প্রায়ই বাহবা নেওয়া হয়। দর্শকদেরও উচিত নয় বিচার-বিবেচনা না করে এভাবে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মেতে ওঠা।

নৃত্যনাট্য

আজকাল বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন লেখার টুকরো টুকরো অংশ জুড়ে একটা নাটক রচনা করে নৃত্য-নাট্যরূপে পরিবেশন করা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এতে গল্পের সমাধি হচ্ছে। তা ছাড়া নৃত্য-গীত-বাদ্য এই ত্রিধারার সাবলীল প্রকাশের দিকটি কোন পর্যায়েই উপেক্ষা করা ঠিক নয়। যখন কোন নাচ সুর, লয়, গীতের গণ্ডী ছাড়িয়ে অভিনয়ের রূপ নিতে চায় তখন তার সঙ্গতি হারিয়ে ফেলে, যেমন কোন কোন গৃহিণী তার ঘর-কন্যার বাইরে পা ফেললে খেই হারিয়ে যান।

নৃত্যানুষ্ঠান

সাগর সৈকত, ক্লাব ও হোটেলে নৃত্যের আসর বসানো ঠিক নয়। কেন না ঐসব পরিবেশে দর্শকদের মন নৃত্যের দিকে থাকে না, খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজব হৈ-হল্লার দিকেই ঝোঁকটা থাকে বেশী। দলের একজন শুরু করলেই আর সকলে মেতে ওঠে তখন আর নৃত্য-গীতের দিকে মন বসে না। কাজেই প্রত্যেক শিল্পীকে এ সম্পর্কে হুঁশিয়ার হতে হবে এবং বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে---তা না হলে এতে তার নৃত্যকলার মান নেমে যেতে থাকে। আমার মতে শিল্পকলার ভেতর দিয়ে শিল্পী, গুণের মহত্তাদর্শ ফুটে উঠবে। দর্শকেরা শুধু আনন্দ পাবেন না উন্নত নৈতিক শিক্ষাও কিছু পাবেন।

মণিপুরী-নৃত্য

মণিপুরী নৃত্যের দু'টি দিক আছে, একটি তাণ্ডব, আর একটি লাস্য। একে আয়ত্ত করতে আট-ন' বছর লেগে যায়। শিক্ষকতার উপযুক্ত

হতে তো আর কয়েক বছর লাগবেই। তবে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঁচ বছরের সংক্ষিপ্ত কোর্স চালু করা হয়েছে। যাঁরা মণিপুরী নৃত্য সহজ মনে করে শিখতে আসেন লাস্য শিখতে গিয়ে ছন্দ আয়ত্ত করতে তাঁরা মুস্কিলে পড়েন। আবার যখন 'তাণ্ডব' শেখার সময় দৈহিক চর্চার উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে তখন মণিপুরী নাচ যে কি কঠিন তা বুঝতে শিখেন।

যেসব শিক্ষক মণিপুরী-নৃত্যের পদ্ধতি মেনে চলেন না অথচ শিক্ষার্থীদের কাছে নিজেদের জাহির করার জন্যে বিখ্যাত গুরু-বর্গের নাম করেন তাঁরাই এই নৃত্যের ক্ষতি করছেন। মণিপুরী-নৃত্য যাঁরা শেখান তাঁদের অন্তত এই ক'টি কথা জানা দরকার :---

আচাউবা ভঙ্গী পরেং, লাস্য বৃন্দাবন পরেং, খুরুম্বা পরেং, গোষ্ঠ ভঙ্গী পরেং, গোষ্ঠ বৃন্দাবন পরেং, লাস্য চালি, চালিভোদা, তাণ্ডব চালি, তাণ্ডব চালি ভোদা, রাধানর্তন, কৃষ্ণনর্তন, করতালি, মঞ্জিরা-নৃত্য, বৃন্দা-নৃত্য, খণ্ডিতা, কুঞ্জ খেল, রাধা বিরহ, মাখন চোর, পদ রেকে, হস্ত রেচক, গতি, ভ্রমরী, আকাশীচারী, ভৌমী-চারী, মির চালনা ও অন্তত কুড়ি পঁচিশ রকমের তালি, এ ছাড়া বিভিন্ন নৃত্যশাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজন, এগুলি যথাযথ-ভাবে রূপায়িত করতে পারলে মণিপুরের প্রচার বাড়বে এবং লোকে খাঁটি মণিপুরী-নৃত্যের সাথে পরিচিত হতে পারবে।

আগে মণিপুরী-নৃত্যের কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল না। স্বাধীনতা লাভের পর মণিপুরী একটি সরকারী শিক্ষায়তন স্থাপিত হয়েছে। এখান থেকে এখন ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। এই শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হবার আগে বিশ-পঁচিশ বছর ধরে মণিপুরী-নৃত্য শেখার পরও কোন ডিপ্লোমা বা সার্টিফিকেটের ব্যবস্থা ছিল না। এখন কিন্তু টাকা নিয়ে বেসরকারিভাবে কিছু কিছু সার্টি-ফিকেট দেওয়া হচ্ছে। এতে মণিপুরী-নৃত্যের মান নেমে যাবার আশঙ্কা দিয়েছে। কেন না, এই সার্টিফিকেটের জোরে সুষ্ঠু শিক্ষা গ্রহণ না করে যেখানে-সেখানে নৃত্যশিক্ষা সংস্থা খুলে দেওয়া হচ্ছে। অথচ বহু প্রবীণ নৃত্যশিল্পী সার্টিফিকেট না থাকার জন্য নৃত্য-শিক্ষালয় স্থাপন করতে পারছেন না। এঁদের কথা কেউ ভেবে দেখছেন না।

মুখোস

নয়া মেক্সিকো এবং আরিজোনার আদিম অধিবাসীদের সমাজে ব্যবহৃত একটি নকল অবয়ব

অভিনয়প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। মানুষ তার অবসর বিনোদনের জন্য ছবি এঁকেছে, গান বেঁধেছে, যাত্রা ও কথকতা, ঝুমুর, সারিগান, টুসু, হাফ-আখড়াই কত কি সবেরই না আসর বসিয়েছে, তার ঠিক নেই। পশ্চিম বাঙলাতেও উপজাতি সম্প্রদায়, আদিবাসী এবং অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে এমন কি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যেও অভিনয় করার স্পৃহা দেখা গেছে দীর্ঘদিন ধরে। পুরানো আমলের হিসাবে দেখি, আদিবাসী সম্প্রদায়গণের মধ্যে রামায়ণ-মহাভারত, পুরাণ ইত্যাদি নিয়ে নানা শ্রেণীর অভিনয় হচ্ছে। সেই অভিনয়ের জন্য পট আঁকা হয়েছে, পেছনে ঝোলানো হয়েছে পট, দৃশ্যাবলী আঁকা হয়েছে এই কাহিনীগুলিকে কেন্দ্র করে। সেইগুলি গুটিয়ে ও পরে তা পেছনে বেঁধে অভিনয়ের আসর বসেছে। উপজাতি সম্প্রদায়ের নাচের জন্য নানা পোষাকের মধ্যে মুখোসের আধিপত্য দেখা গেছে অনেক আগে থেকেই।

পশ্চিম বাঙলার উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছে, কোল, সাঁওতাল, মেচ, লেপচা, ভুটিয়া ইত্যাদি সাতটি

আশীষ বসু

সম্প্রদায়। আদিবাসীদের মধ্যে আছে লোহার কোরা, ডোম, খাসি খটিক, বেলদার, বেদিয়া বাউড়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়। এদের প্রায় প্রত্যেকেরই নিজস্ব বা সম্প্রদায়গত নাচ বা অনুরূপ অনুষ্ঠান আছে, যার মধ্যে মুখোস ব্যবহারের চলন হয়েছে। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া এবং দার্জিলিঙ জেলায় এবং উত্তরবঙ্গের আরও কয়েকটি স্থানে এই উপজাতি সম্প্রদায়ের বাস বেশী দেখা যায়।

উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই জাতীয় অনুষ্ঠানের সবচেয়ে বড় মরশুম ফাগুন-চৈত্র-বৈশাখ মাসে অর্থাৎ বসন্তকালে। বোঙ্গা বা সূর্য বা অন্যান্য দেব-দেবীর পূজার সময়েও এ জাতীয় অনুষ্ঠান হয়। বিবাহাদি উৎসবেও এই প্রকার নাচ ও গান অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বৃটিশ কলাম্বিয়ার আর এক ধরণের মুখোস

উপজাতি ও আদিবাসীদের জীবন সহজ সরল, তাই এইসব অনুষ্ঠানগুলি তাদের মধ্যে আনন্দের শিহরণ জাগায়।

পশ্চিম বাঙলায় চিত্রকর শ্রেণীর মধ্যে মুখোস তৈরী করতে দেখা যায়। পুরুলিয়া জেলার চোরদে-বাগমুণ্ডী অঞ্চলে ও মেদিনীপুরের নানা জায়গায় মুখোস তৈরীর প্রচুর কাজ এক সময় হতো। চোরদে-বাগমুণ্ডীতে এখনও অনেক মুখোস-শিল্পী আছেন যাঁদের হাতের কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে কয়েক জনের নাম দিচ্ছি। সর্বশ্রী অনিল সূত্রধর, চৈতন্যলাল সূত্রধর, দুর্গাচরণ দত্ত, ঘনশ্যাম পাল, কালীপদ, সুহৃদ, নকুল দত্ত, নেপাল শীল, রামচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে অনেকে ছড়িয়ে গেছেন বিহারে এবং উড়িষ্যায়। এঁদের একটি দলের সঙ্গে একবার আমার রাঁচীতে দেখা হয়েছিল ; সেখানকার প্রতিমা তৈরীর কাজের অর্ডার নিয়ে তাঁরা কাজ করতে এসেছিলেন।

ভ্যানকুবার দ্বীপপুঞ্জে প্রচলিত একটি কৃত্রিম মুখ
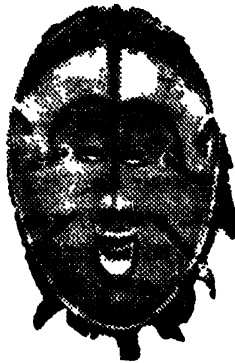
নিউ আয়ার্ল্যাণ্ডের এক কৃত্রিম অবয়ব

একটি রেড ইণ্ডিয়ান মুখোস

একটি আফ্রিকার "বাকুবা" মুখোস

● উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলবর্তী উপজাতিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত জীবজন্তুর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ মুখোস

● জাভা দেশীয় এক মুখোস

● বৃটিশ কলম্বিয়ায় প্রচলিত মুখোস দুই ভাগে বিভক্ত

● একটি "ইবোকুই" মুখোস
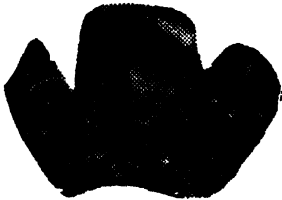
● HAIDI INDIAN দের ব্যবহৃত মুখোস। মুখোসটি দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায় এবং পরিধানকারীর অবয়বও পরিদৃশ্যমান হয়ে ওঠে

● মধ্য আফ্রিকার একটি [illegible] মুখোস

● আর একটি ধরণের "ইবোকুই" মুখোস

একটি আফ্রিকান মুখোস

সূত্রধর বলতে আমরা সাধারণত ...ঠের কারিগরই বুঝি, কিন্তু আসলে ...তীর দাঁতের কারিগর 'ভাস্কর' সম্প্রদায়, ...য়া, চিত্রকর, শিঙের কাজের কারি-..., পাথরের কাজের কারিগর ইত্যাদি ...নকেই সূত্রধর সম্প্রদায়ভুক্ত। এমন ... বিষ্ণুপুরের নক্সীতাসের কারিগর ...ৌজদার'রাও নাকি সূত্রধর।

বিহারের ছোটনাগপুর অঞ্চলেই ...খাস তৈরীর শিল্পটি সমধিক প্রসিদ্ধ। ...তীর কাছে বুন্দি, খুটিতে প্রচুর মুখোস ...তরী হয়। তবে সব সময়েই এ মুখোস ...'ওয়া যায় না। মুখোস তৈরী হয় বিশেষ ...শেষ উৎসব উপলক্ষে এবং একমাত্র ...খনই তা পাওয়া যায়। কাজের তারতম্যে

● নয়া আ...ল্যাণ্ডের আর একটি নকল মুখ

...তার দাম আট-দশ আনা থেকে চার-পাঁচ ...টাকা অবধি হতে পারে। মানভূম, সিংভূম ও সাঁওতাল পরগণার দুমকা প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক তৈরী হয়। সিংভূমের ...গামারিয় মুখোস তৈরীর একটি বিশেষ
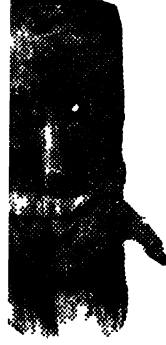
● পশ্চিম আফ্রিকার একটি নকল মুখ

শিল্পকেন্দ্র। ছৌ-নাচ বিহারের একটি অতি বিখ্যাত নৃত্য। এতে রাম, রাবণ, দশরথ, সীতা, হনুমান ইত্যাদির অভিনয়ে বিশেষভাবে তৈরী মুখোস ব্যবহৃত হয়।

● একটি তিব্বতী মুখোস

যুদ্ধ, শিকারের দৃশ্যাবলী, বিবাহোৎসবের কাজেও মুখোসের ব্যবহার হয়ে থাকে।

নাগাভূমি, নেফা প্রভৃতি অঞ্চলের মুখোসের শিল্পকাজও অতি উল্লেখ-যোগ্য। শুনেছি নাগাদের তৈরী কাঠের
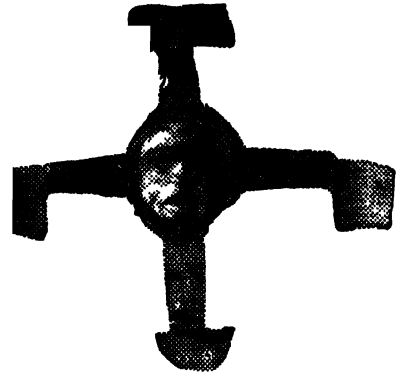
● "বেলা-কুলা-মাস্ক" নামে খ্যাত বৃটিশ কলম্বিয়ার আর একটি মুখোস

মুখোস এক অতি বিস্ময়কর শিল্পকাজ। নাগাদের এই মুখোস তৈরীর ইতিহাস আছে। নাগাদের মধ্যে Head hunting বা মাথা কাটার প্রচলন একদা ছিল। ছিন্ন মুণ্ডগুলিকে নাগা-গ্রামের 'মোবাঙ' বা সাধারণের জন্য ঘরের মধ্যে সাজিয়ে রাখা হতো এবং এই কর্তিত মুণ্ডগুলির ছাঁচ তোলা হতো কাঠে। কাঠের মুণ্ডগুলি হতো অবিকল আসলগুলির মতো। পরে আসলগুলি সরিয়ে নকলগুলিকে জায়গা দেওয়া হত।

মুখোস সাধারণত কাগজের মণ্ড দিয়ে তৈরী হয়। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও মুখোস-শিল্প রয়েছে। কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি জায়গার মুখোসও খুব উল্লেখযোগ্য।

এই রচনাটির সঙ্গে কয়েকটি বিচিত্র ধরণের বিদেশী মুখোসের আলোকচিত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

আমেরিকায় নাট্য মঞ্চের সূচনা ও ক্রমবিকাশ

প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

।। পাঁচ ।।

১৭৩৬ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী ডক স্ট্রিটে নিউ থিয়েটারের দ্বারোদ্ঘাটন হল ব্রিটিশ নাট্যকার জর্জ ফারকারের জনপ্রিয় কমেডি "দি রিক্রুটিং অফিসার" নাটক দিয়ে।

শুধু নাটক অভিনয়ের উদ্দেশে ঔপনিবেশিক আমেরিকায় এইটিই প্রথম প্রেক্ষাগৃহ।

এ সময়ে অনেক উন্নাসিক অভিজনেরা নৈতিকতার প্রশ্ন তুলেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমেরিকায় নাট্যাভিনয়ের প্রসার হতে লাগল। বিপ্লব যুগে ঘোড়দৌড় ও মোরগ লড়াইয়ের সঙ্গে পেশাদারী নাট্যাভিনয়ও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ১৭৮৩ সালে জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পর অভিনয়ের আসর আবার জাঁকিয়ে উঠল। এ সময়ে যে দলটি সবচেয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিল তার নাম "আমেরিকান কোম্পানী"। ১৭৮৭ সালে এই দলটি প্রথম জাতীয় কমেডির অভিনয় করেন। নাটকটির নাম "দি কনট্রাস্ট", নাট্যকার রয়াল টাইলার।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দশক নাগাদ নতুন নতুন নাটুকে দল জন্ম নিল, অনেক দেশীয় অভিনেতার আবির্ভাব হল, বস্টন থেকে লুইজিয়ানার নিউ অরলিয়েন্স পর্যন্ত প্রত্যেক শহরে শহরে নতুন নতুন নাট্যমঞ্চ গড়ে উঠল। অনেক বছর পর্যন্ত আমেরিকার নাট্যান্দোলনের কেন্দ্র ছিল ফিলাডেলফিয়া। মাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নাট্যাভিনয়ের কেন্দ্র হয়ে উঠল নিউ ইয়র্ক।

আমেরিকার মূল ভূখণ্ড যেমন সম্প্রসারিত হতে লাগল পশ্চিমাভিমুখে, নাট্যমঞ্চও তেমনি ক্রম-প্রসারিত হল পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত। সীমান্ত শহরগুলির অধিবাসীদের আনন্দ বর্ধনের জন্য সে যুগে আমেরিকার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। কখনও ঘোড়ার পিঠে চেপে, কখনও ওয়াগনে, কখনও বা নৌকায় তারা পথ অতিক্রম করেছে।

প্রথম দিকে তাঁবুতে, হোটেলের খাবারঘরে অভিনয়ের আসর বসত। ক্রমে স্থায়ী নাট্যালয় গড়ে উঠল। সানফ্রান্সিস্কোয় এক বিলাসবহুল প্রেক্ষাগৃহ তৈরি হল ১৮৬৯ সালে এবং একটি প্রথম শ্রেণীর নাটুকে দল এখানে অভিনয়

● নাট্যকার রবার্ট শেরউড

করল। ১৮৭০ সালের মধ্যে নেভাদার ভার্জিনিয়া শহরে পাঁচটি প্রেক্ষাগৃহ, একটি অপেরা হাউস ও ছয়টি ভ্যারাইটি হল নির্মিত হল। ১৮৭২ সালে উটার সল্ট লেক সিটিতে একটি মনোরম নাট্যমঞ্চ স্থাপিত হল।

ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক থিয়েটারেরও অনেক পরিবর্তন হচ্ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষদিকে ইংলণ্ড থেকে নিয়ে আসা হত স্থায়ী নাটুকে দল। ক্রমে এই ব্যবস্থা পরিবর্তিত হতে লাগল। প্রতিভাশালী অভিনেতৃদল আসতে লাগল স্থানীয় দলের সঙ্গে। ক্রমে এদের ঘিরে আরও কিছু সংখ্যক অভিনেতা-অভিনেত্রী এক একটা দল গড়ে তুলতে সহায়তা করল। এই দল দেশের নানাস্থান পরিভ্রমণ করে অভিনয় দেখাল।

এই সময়েই প্রথম নাটক পরিবর্তনের রীতি পালটে গিয়ে একই নাটক একাদিক্রমে অনেকবার অভিনয়ের রীতি প্রবর্তিত হল। সে যুগে এক বিরাট আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল "ফ্যাশন" নাটকটি। ১৮৪৫ সালের মার্চ মাসে এই নাটকটি নিউইয়র্কে ২০ দফা অভিনীত হয়েছিল। নাটকটি লিখেছিলেন শ্রীমতী কোরা অ্যান মোয়াট।

রোমাঞ্চকর, রোমান্টিক মেলোড্রামাগুলি তখন খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠত। এসব নাটকে সাধারণত অধর্মের ওপর ধর্মের জয়, দুর্জনের ওপর সাধুর প্রতিষ্ঠা দেখান হত। দর্শকেরা এতে খুবই আনন্দ পেত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি নাগাদ অতি নাটকীয় উপাদান-সম্বলিত নাটকগুলি জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠেছিল। নানা রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ করা হত—একই নাটকের মধ্যে। ঝড়-ঝঞ্ঝা দুরন্ত ঘোড়ার দৌড়, জাহাজ ডুবি ও অন্যান্য দুর্বিপাক দেখান হত।

তখন আমেরিকাবাসীরা অনেকেই নাটকের মধ্য দিয়ে কৌশলে নীতি শিক্ষাদান করতেন। তাই এই ধরণের নাটকও অনেক মঞ্চস্থ হয়েছিল। "দি ড্রানকার্ড" নাটকটি ছিল অত্যন্ত জনপ্রিয় নাটক। এতে সংযম অভ্যাসের সমর্থনে নাট্যবস্তু গড়ে তোলা হয়েছে।

তবে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মেলোড্রামা হল "আঙ্কল টমস কেবিন।" হ্যারিয়েট বীচার স্টো'র দাসপ্রথা বিরোধী বিষয়-বস্তু সম্বলিত উপন্যাস অবলম্বনে এই নাটকটি গড়ে উঠেছে। নাটকটির প্রথম অভিনয় হয় ১৮৫২ সালে। নাটকে একদিকে হাস্যরসের উপাদান যেমন রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি রয়েছে

● হ্যামলেটের রূপসজ্জায় আমেরিকার অন্যতম খ্যাতনামা নট এডউইন বুথ (১৮৩৩-৯৩)

বেদনা; একদিকে রয়েছে নিষ্ঠুর খামার-মালিকের মত দুর্জন, অন্যদিকে আবার যা কিছু সৎ তার রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আঙ্কল টমের মত ক্রীতদাস চরিত্রের মধ্য দিয়ে। আবার উত্তেজনাকর মুহূর্তেরও অভাব নেই নাটকে।

এই নাটকের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু নাট্যসম্প্রদায় গজিয়ে উঠল এই নাটকটিকে কেন্দ্র করে। এরা সারা দেশ ঘুরে এই নাটকের অভিনয় প্রদর্শন করতে লাগল। ১৮৯০' সালের মধ্যে এইরূপ প্রায় ৪০০ সম্প্রদায় এই নাটকের অভিনয় দেখিয়েছে। নাটকের খ্যাতি বিদেশেও ছড়িয়ে পড়ল। অচিরেই আঙ্কল টমের গল্প কুড়িটিরও বেশি ভাষায় নাট্যরূপায়িত হয়ে বিভিন্ন দেশে অভিনীত হতে লাগল।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রতিভাবান মার্কিন নট-নটীর আবির্ভাব হল। নিউ ইয়র্ক ও অন্যান্য শহরে যেসব প্রখ্যাত অভিনেতা দেখা যেত তাঁদের অধিকাংশই এসেছিলেন ইংলণ্ড থেকে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে কিছু-সংখ্যক আমেরিকান অভিনয়ে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে শার্লট কুশম্যান, ই এল ডেভেনপোর্ট ও এডউইন বুথের নাম উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীতে আরও অনেক প্রখ্যাত মার্কিন অভিনেতৃ গোষ্ঠীরও আবির্ভাব হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে পরিবারের সকলেই অভিনয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। যেমন জেফারসন পরিবার, ড্রু পরিবার, ব্যারীমুর পরিবার।

ওয়াশিংটন আরভিং-এর "রিপভ্যান উইঙ্কল" গল্পকে অবলম্বন করে লেখা নাটকে জোসেফ জেফারসনের অভিনয় অমর হয়ে রয়েছে। বিশিষ্ট মার্কিন নাট্যকার ইউজীন ও' নীলের পিতা জেমস ও' নীল ছিলেন একজন প্রখ্যাত অভিনেতা। জোসেফ জেফারসনের মত ও'নীল "দি কাউণ্ট অব মণ্টি ক্রিস্টো" নাটকে অভিনয় করে অমর হয়ে আছেন। হ্যামলেট, ওথেলোর মত চরিত্রেও তাঁর শিল্পিমনের স্বাক্ষর রয়েছে।

ড্রু-পরিবারের মধ্যে খ্যাতির উচ্চ-শিখরে আরোহণ করেছিলেন শ্রীমতী জন ড্রু। অত্যন্ত প্রতিভাময়ী এই অভিনেত্রী ১৮৬০ সালে ফিলাডেলফিয়ার আর্চ স্ট্রীট থিয়েটারের ম্যানেজার পদ গ্রহণ করেন। এই সময়ে তিনি এমন একটি অভিনেতৃগোষ্ঠী তৈরী করেছিলেন—যার তুলনা ছিল না। শ্রীমতী ড্রুর নাম আর একদিক থেকেও স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁর কন্যা জর্জিয়ানার সঙ্গে মরিস ব্যারীমুর নামক এক অভিনেতার বিবাহ হয়েছিল। এঁদেরই সন্তান হলেন এথেল, জন ও লায়নেল ব্যারীমুর—যাঁরা এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন অভিনয়ক্ষেত্রে।

নিজেদের দেশের মধ্যে যেমন অভিনয়-

শিল্পীর সৃষ্টি হয়েছিল, তেমনি আবার অন্যান্য দেশ থেকেও বিশিষ্ট শিল্পীরা আমেরিকায় এসে এখানকার রঙ্গমঞ্চকে পুষ্ট করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ তিন দশকে এরকম বহু বিদেশী শিল্পীর আগমন ঘটেছিল এদেশে। ফরাসী শিল্পী র‍্যাচেল ও বার্নহার্ট, বিশিষ্ট ইতালীয় অভিনেত্রী অ্যাডেলেড রিসটোরি ও এলিনোরা ডিউস, প্রতিভাময়ী ইংরেজ অভিনেত্রী এলেন টেরী, অদ্বিতীয় শিল্পী স্যার হেনরী আরভিং, পোলিশ অভিনেত্রী হেলেনা মোজেসকা আমেরিকার মঞ্চজগৎকে সমৃদ্ধিশালী করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকগুলিতে নিউ ইয়র্কের নাট্যালয়গুলির ম্যানেজারদেরও অবদান কম ছিল না। লেস্টার ওয়াল্যাক এবং অগাস্টিন ডালি অত্যন্ত প্রভাবশালী দু'জন ম্যানেজার ছিলেন। ডালি নিজে অনেকগুলি মৌলিক নাটক রচনাও করেছিলেন আবার অনেক গল্পের নাট্যরূপও দিয়েছিলেন এগুলির মোটসংখ্যা হবে প্রায় ৯০টি। ডালি নাট্যসমালোচকও ছিলেন। ডালির ফিফথ অ্যাভেনিউ থিয়েটার ১৮৬৯ সালে দ্বারোদ্ঘাটন করেছিল।

ডিয়ন বুশিকো বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালক ও ম্যানেজার। মার্কিন রঙ্গমঞ্চের জগতে তিনি একটা স্থায়ী ছাপ রেখে গেছেন। সমগ্র কর্মজীবনে তিনি প্রায় ১২৪খানি নাটক লিখেছিলেন।

দুই ভাই ড্যানিয়েল ও চার্লস ফ্রোম্যান এবং ডেভিড বেলাসকোর অবদানও স্মরণীয়। নাট্যকার, পরিচালক ও প্রযোজকরূপে বেলাসকো যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। মঞ্চে বাস্তব পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার দিকে তাঁর ঝোঁক ছিল খুব বেশি। তারকা সৃষ্টিতেও তিনি সহায়তা করেছেন। শিল্পীর মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনা তাঁর চোখে ধরা দিত সহজেই এবং তিনি তাঁদের শিক্ষা দিয়ে প্রকৃত শিল্পী করে তুলতেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে যারা বিশ্ববিশ্রুত শিল্পী হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মিসেস লেসলি কার্টার, মিনি ম্যাডার্ন ফিসকে, টাইরন পাওয়ার, লিলিয়ান গিশ, মেরী পিকফোর্ড প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

নিউ ইয়র্কের বাইরেও নাটক ও নাট্যমঞ্চের প্রসার হতে লাগল। চলচ্চিত্র তখনও জনসাধারণের মনে পরিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। এ সময়ে প্রতিটি শহরে অন্তত একটি স্থানীয় নাট্যকোম্পানী নাটক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করত সারা বছর ধরে। ১৯৩০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরণের অন্তত দুই হাজারটি দলের অস্তিত্ব ছিল।

লাওনেল ব্যারীমুর, এথেল ব্যারীমুর ও জন ব্যারীমুর

কিন্তু তাই বলে পল্লী অঞ্চলগুলি অবহেলিত ছিল না। ভ্রাম্যমাণ দলগুলি তাঁবু ফেলে শেক্সপীয়ার থেকে শুরু করে ব্রডওয়ের আধুনিকতম নাটকগুলি পর্যন্ত অভিনয়ের আয়োজন করত।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত মার্কিন রঙ্গমঞ্চের বাহ্যিক সম্প্রসারণ এবং প্রতিভাবান অভিনেতা ও দক্ষ

● 'দুটি মন' চিত্রে দেখা যাবে বিশ্বজিৎ ও তাঁর একমাত্র পুত্র শ্রীমান প্রসেনজিৎকে
আলোক চিত্র : জি, ডলি, এম-এ

প্রযোজক উদ্ভাবনের দিকেই বেশীর ভাগ প্রচেষ্টা নিবদ্ধ ছিল। এ সময়ে চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবে নাট্যালয় যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু উৎকৃষ্ট নাটক রচনার দিকে মনোযোগ খুব বেশি দেওয়া হয় নি।

বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা, অভিনয়-শিক্ষক ও ম্যানেজার স্টীল ম্যাক্‌কের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য —তাঁর নাটক সৃষ্টির প্রচেষ্টার জন্য। তাঁর "হ্যাজেল কার্ক" নাটক নিউ ইয়র্কে একাদিক্রমে দু'বছর ধরে অভিনীত হয়। ক্লাইড ফিচ্ (১৮৬৫-১৯০৯) ছিলেন একজন খ্যাতিমান লেখক। তিনি যেমন রসিকতা ও জাঁকজমকভরা নাটক "বো ব্রুমেল" লিখেছিলেন, তেমনি ইবসেনের অনুসরণে সামাজিক নাটক "দি ট্রুথ" লিখেও প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

মার্কিন নাটকের গুরুত্ব ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল এবং এদিক থেকে অগাস্টাস টমাসের (১৮৫৭-১৯৩৪) দান অসামান্য। তাঁর ধারণা ছিল নাটক হবে বিশেষ বিশেষ ভাবের দ্যোতক। তিনি সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে নাটক লিখেছেন।

[ক্রমশ।

জার্মান ছায়াচিত্রের নবযুগ

জগৎ যে এত মাধুর্যময়ী তার জন্য অনেকাংশে দায়ী—পরিবর্তন। পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই পৃথিবী ভিন্ন ভিন্ন রূপ নেয়। পরিবর্তন আছে বলেই মানুষ নতুনত্বের স্বাদ পায়। পরিবর্তন যদি না থাকত তা হলে তো পৃথিবী আর একপাও এগোত না। একটি নির্দিষ্ট জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। তিলমাত্র বৈচিত্র্যও তার ভাণ্ডারে মিলত না, তাই আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। জীবনের এক অমোঘ এবং অতি স্বাভাবিক নিয়ম, মানুষের চিন্তা, দৃষ্টি, ধ্যান-ধারণা, ভাব ভাবনা, কল্পনা, কর্ম,

আচার, আচরণ—সর্বক্ষেত্রেই পরিবর্তন অপরিহার্য।

পশ্চিম জার্মানীও আজ নানা দেশের মতই বহুবিধ পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়ে চলেছে। সেখানকার চলচ্চিত্রজগতেও তার ছোঁয়া লেগেছে। ফলে, সেখানকার ছবির মধ্যে আজ নতুন এক স্বতন্ত্র ভাবধারার প্রতিফলন ঘটেছে। সন্ধান মিলছে এক নবতর জীবনবোধের, এক অভূতপূর্ব চিন্তা-কল্পনার সম্যক প্রকাশ ঘটেছে রূপালী পর্দায়। জার্মান চলচ্চিত্রের দিগন্তের এই পরিধি বিস্তারে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন উইল ট্রেমপার, আলেকজাণ্ডার ক্লুগ, পিটার শামোনী, মাইকেল ফ্লেগার নামক অফুরন্ত সম্ভাবনাময় চারজন তরুণ পরিচালক। সারা জার্মানীতে আজ ব্যাপক আলোচনা তাঁদের কেন্দ্র করে। ঘরোয়া আলাপে, বন্ধু-সম্মিলনে, সাংস্কৃতিক পরিবেশে, সাধারণ মানুষের মধ্যে—সর্বত্রই এই চারজন আলোচিত হয়ে চলেছেন। পশ্চিম জার্মানীর চলচ্চিত্রের ইতিহাসে আজ যে নতুন অধ্যায়ের সম্মুখীন হল তার রূপকার এই তরুণ চতুষ্টয়। এঁদের সাধনায় এবং সক্রিয় ও সজীব চিন্তাধারায় পশ্চিম জার্মানীর চলচ্চিত্র-শিল্প আজ নতুন যুগের সম্মুখীন হয়েছে এবং হতে চলেছে।

ট্রেম্পার রচিত "দা টেডি বয়েস" এবং "ওয়েট আসফালট' নামক সার্থক চলচ্চিত্র দুটির চিত্র-নাট্যকার। "ফ্লাইট টু বার্লিন" এবং "এঞ্জেলস নাইট" নামক দুটি ফিচার ফিল্মও তিনি নির্মাণ করেছেন। এই ছবি দুটিতে জার্মানীর দেশবিভাগজনিত সমস্যা তুলে ধরা হয়েছে। ট্রেম্পারের "প্লারাফিমা অন দা স্প্রী" ছবিটি একটি নতুন সম্ভাবনার চিহ্ন বহন করে। বার্লিন শহরটিই এই ছবির শিল্পী। বিভিন্ন কোণ থেকে, নানাদিক থেকে ইনি এই ছবির মাধ্যমে বার্লিনকে দেখিয়েছেন। এঞ্জেলস নাইট"-এর জার্মানীর চিত্র-সমালোচকরা এঁকে সম্মানিত করেন (১৯৬২)। ট্রেম্পারের এই ছবিটির শিল্পীরা অখ্যাতদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হয়েছেন। পথচারীদের ডেকে তিনি এই ছবিতে শিল্পীর মর্যাদা দিয়েছেন। শিল্পীরা পারিশ্রমিক কিছু পান নি কিন্তু লাভের অংশ তাঁরা পেয়েছেন।

বলিষ্ঠ এবং সৃজনধর্মী সমালোচনার অনুসরণে জার্মান চিত্রের পুনরুজ্জীবন-সাধনে যে-তরুণশিল্পী-সম্প্রদায় যত্নবান, তাঁদের মুখপাত্র হলেন আলেকজাণ্ডার ক্লুগ। এই সম্প্রদায়টি "অবারহসেন গ্রুপ" নামে খ্যাত। ১৯৫৯ সালে "ব্রুট্যালিটি ইন স্টোন" নামে একটি স্বল্প দৈর্ঘ্যের প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করেন। তাঁরা "ডিপারচার ফ্রম ইয়েস্টার্ডে" ছবির জন্য তিনি অবলম্বন করেছেন "এ্যানিটা জি" নামক একটি গল্প। এই গল্প তারই একটি গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। এই গল্পে একটি মেয়ের কাহিনী রূপায়িত হয়েছে, যে-মেয়ে জীবনের নিয়মনির্দিষ্ট পথ থেকে ঘটনাচক্রে বিচ্যুত হয়ে ভিন্নপথ অবলম্বন করেছিল। কিন্তু নিয়মনিষ্ঠ সমাজে ফিরে আসার পথ খুঁজে বার করার মত শক্তি তার সঞ্চয়ে নেই।

"ডাস সাটার" নামক সাড়া-জাগানো উপন্যাসটির রচয়িতা গান্থার স্নুয়েনের সঙ্গে হাত মেলালেন পিটার শামেজি। এই উপন্যাসকে তিনি ছায়াছবির রূপ দেন। এতে দেখানো হয়েছে যে, ছেলেমেয়েদের মন কি করে সময়ের অগ্রসরণে বদলে যায় বাবা-মার যেসব

● জোড়াদীঘির 'চৌধুরী পরিবার' চিত্রের নায়িকা শ্রীমতী মাধবী মুখোপাধ্যায়
আলোকচিত্র : শান্তিময় সান্যাল

● ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত—'কাগার বঙ্গদর্শন' চিত্রের নায়িকা প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী শ্রীমতী ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়

আলোকচিত্র : জি, ডলি, এম-এ

ধ্যান ধারণা, কার্যাবলী তাদের কাছে ভ্রান্ত এবং অনুচিত বলে মনে হয়। কি ভাবে ভবিষ্যতে তাদেরই ভিতর সেই সব একদা তাদেরই দ্বারা সমালোচিত ঘটনা ও কার্যাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটে।

চলচ্চিত্রে অপ্রিয় এবং নিষ্ঠুর সত্যকে হাস্যরসের সাহায্যে উদ্‌ঘাটিত করার প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করবেন মাইকেল ফ্লেগার। "দ্য ডেড উইম্যান অফ বেভারলি হিলস" ছবিটির নির্মাণের কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য। তাঁর নতুন ছবির শিরোনাম "সেরেনেড অফ টুম্পাইস।"

● 'এণ্টনি ফিরিঙ্গী' চিত্রের নায়িকা বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীমতী আঞ্জরা

আলোকচিত্র : জি, ডলি, এম-এ

আইসেন ডর্ফের "ফ্রম দ্য লাইফ অফ এ গুড-ফর-নাথিং" নামক সুপ্রসিদ্ধ গল্প অবলম্বনে একটি চিত্র নির্মাণের আয়োজন করছেন।

চলচ্চিত্র শুধু নিছক প্রমোদই বিতরণ করে না, বক্তব্য প্রকাশের এক বিরাট মাধ্যম হল ছায়াছবি, তার সাহায্যে জীবনকে তার অফুরন্ত সম্ভার-সহ নানাভাবে নানাদিক দিয়ে তুলে ধরা যায়। এই তরুণ চতুষ্টয়ের চিন্তায় এবং কর্মে এই কথাগুলিরই প্রতিফলন ঘটে।

'আমাদের সময় ছবির রাজ্যে আবহাওয়া ছিল শিল্পময়—এখন তা বাণিজ্যধর্মী'—

—সুশীল মজুমদার

(সাক্ষাৎকার)

প্রচণ্ড শীতের এক উজ্জ্বল প্রভাত, শীতের মিষ্টি রোদ দূরীভূত করছে মানুষের মনের অবসন্নতা জড়তা। রশ্মিমান সূর্যের অকৃপণ দানে পৃথিবী হয়ে উঠছে পরিপূর্ণ। এই পরিবেশে এগিয়ে চলেছি সুপ্রশস্ত পথ বেয়ে, পিছনে সরে গেল ঢাকুরিয়া হ্রদ। হ্রদ সেতু এবং রেল লাইনও পেরিয়ে গেলুম। আবার ঘনবসতি। একটি বাড়ীর দোতলায় একটি সুসজ্জিত নিপুণ শিল্পরুচির পরিচয়সমৃদ্ধ কক্ষ। সেই কক্ষে দেখা পাওয়া গেল শ্রীযুক্ত সুশীল মজুমদারের। বাঙলার অগ্রণী চিত্রকারদের অন্যতম, বন্ধুবৎসল, সদালাপী মানুষ—সুশীল মজুমদারকে আমার আসার কথা পূর্বাহ্নেই জানিয়ে রেখেছিলুম।

সম্ভাষণ কুশলবিনিময়ের পর কাজ শুরু হল। জীবনের দীর্ঘ অংশ তাঁর অতিবাহিত হয়েছে চিত্রজগতে। চিত্রজগতের নানা ঘটনার কোথাও তিনি সাক্ষী, কোথাও তিনি নায়ক। এ জগতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আজ সাঁইত্রিশ বছরের। পরমায়ুর অতি সামান্য অংশমাত্র তখন তাঁর অতিক্রান্ত হয়েছে। সে ১৯২৮ সালের কথা। তার পূর্বে কেটেছে তাঁর নানা কাজে, পঠনে, অধ্যয়নে, ব্যবসায়ে, সমগ্র বিদ্যালয় জীবন তাঁর কেটেছে শান্তি-নিকেতনে (১৯১২-২১), প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন নাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন থেকে। তারপর একটি ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে হিসাব শিক্ষা করতে থাকেন। তারপর কিছুকাল যুক্ত ছিলেন তাঁদের পারিবারিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বেলেঘাটা হোসিয়ারীতে। তারপর মনোমোহন থিয়েটারে। তখন মনোমোহন থিয়েটারে যুক্ত ছিলেন দানীবাবু, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রমুখ দিকপাল শিল্পীর দল। জীবনের পালাবদল তাঁর এইখান থেকেই। এই সময়ে তাঁর চলার পথের মোড় ফিরল।

● সুশীল মজুমদার

সন্তোষ হাজরা পরিচালিত "ডন অফ লাইট" ছবিটিতে যোগ দিলেন সুশীল মজুমদার। জিজ্ঞাসা করি—এই ছবিতে কোন কাজের ভার আপনার উপর ন্যস্ত ছিল?

উত্তর দিলেন—কোন কাজ মানে? —কোন কাজ নয় তাই বল—অভিনয়ে, সাধারণ সহকারিত্বে, ক্যামেরায়, সেট নির্মাণে, শিল্প-নির্দেশনায়, পোষাকের ব্যাপারে, ল্যাবরেটারীর কাজে—কিসে ছিলুম না তাই বল?

নায়ক হিসাবে তাঁকে নির্বাচিত করলেন বলিভিয়ার 'প্রাক্তন কনসাল জেনারেল' এবং ভেনেযুয়েলার প্রাক্তন কনসাল এবং বর্তমানে সমগ্র ঠাকুর-পরিবারের প্রবীণতম পুরুষ শ্রীঅবনীমোহন ঠাকুর তাঁর পরিকল্পিত ছবির জন্যে। যে-ছবি টেগোর ফিল্ম কোম্পানীর পতাকাতলে নির্মিত হতে চলেছিল। অবনীমোহন ঠাকুরই তাঁকে প্রথম গাড়ী চালানোর শিক্ষা দেন. শেষ-

অবধি কোন কারণবশত এই চিত্র-নির্মাণ প্রচেষ্টা বাস্তবে পরিণত হয় নি। সুশীল মজুমদারকে অতঃপর দেখা গেল বড়ুয়া পিকচার্সের প্রপার্টি ম্যান হিসাবে। তারপর তাঁর পরিচালনায় গৃহীত হল 'একদা'। দুই রীল দৈর্ঘ্যে নির্মিত ছবি ভারতে সম্ভবত সেই সর্বপ্রথম রূপ নিল। 'একদা'র কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছিলেন স্বগত প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া।

জীবনের নাটকের আবার ঘটে দৃশ্যান্তর। তাঁর জীবন-নাট্যের এক পরবর্তী অঙ্কে তাঁর দর্শন মিলল পূর্ণ-দৈর্ঘ্য ছবি "তরুবালা"র পরিচালক-রূপে (১৯৩৪)। অহীন্দ্র চৌধুরী, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শৈলেন চৌধুরী, [illegible] গঙ্গোপাধ্যায়, প্রভা দেবী, জ্যোৎস্না গুপ্তা প্রভৃতি তরুবালার বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তারপর থেকে অসংখ্য চিত্র তিনি উপহার দিয়ে চলেছেন রসপিপাসু দর্শকদের। তাঁর পরিচালন প্রতিভার আর এক শ্রেষ্ঠ স্বাক্ষর মিলেছে "লাল-পাথর"-এ, বর্তমানে "লাল পাথর"-এর হিন্দী রূপদানে তিনি ব্যস্ত।

[illegible] এল। চা-পানের ফাঁকে ফাঁকে কথা চলতে থাকে। লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পরিচালককে জিজ্ঞাসা করি শিল্পী এবং পরিচালকের পরস্পরের সম্বন্ধ কি রকম হওয়া উচিত?

তার উত্তর এল—গুরু-শিষ্যের মধুর সম্পর্ক, বন্ধুর সম্পর্ক, উভয়ের মনের ভাষা উভয়কে বুঝতে হবে।

জিজ্ঞাসা করি—ছবির শ্রেষ্ঠত্ব আপনার মতে কিসে, অনেক ছবি দেখা যায় খুব সাড়া জাগায়, প্রচুর পয়সা পায়, কিন্তু সেইখানেই কি ছবির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হয়?

শান্তকণ্ঠে তিনি উত্তর দিলেন—যে ছবি মানুষের মনে দাগ রেখে যায় এবং সময়ের অগ্রসরণও মানুষের মন থেকে যে দাগ মিলিয়ে দিতে পারে না, সেই ছবিই শ্রেষ্ঠ ছবি বলব। একটু থেমে বললেন, কতকাল তো হয়ে গেল আজও 'রিক্তা' আমার মন জুড়ে আছে। অর্থাৎ ছবিটি নামে রিক্তা হলেও তার স্রষ্টার মন সে পূর্ণ করে রেখেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয়—সুশীল মজুমদার অভিনীত ও পরিচালিত এই বিখ্যাত ছবিটির বিশিষ্ট চরিত্রগুলিতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহন ঘোষাল, তুলসী লাহিড়ী, ছায়া দেবী, রমলা দেবী, দেববালা দেবী প্রভৃতি শিল্পি-বৃন্দ। তাঁর কথায় বোঝা গেল যে ক্ষণকালের উত্তেজনা ছবির শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের মাপকাঠি নয়।

জিজ্ঞাসা করি—জীবনের অসংখ্য বক্তব্য থাকে, সকল বক্তব্যই কি রূপালী পর্দায় তুলে ধরা যায়।

এবার ঘড়ির দিকে তাকাই। সময় সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। অল্প সময়ের পরিধিতেই এবার কাজ সমাপ্ত করতে হবে। জিজ্ঞাসা করি—আপনারা যখন প্রথম এ জগতে যোগ দেন তখন এখানে যে আবহাওয়া বিরাজমান ছিল সেই আবহাওয়ার সঙ্গে এখনকার আবহাওয়া আপনার মতে কি রকম?

উত্তরে বললেন, তখন সমগ্র পরিবেশ ছিল শিল্পধর্মী—এখন তা বাণিজ্য-ধর্মী। সেদিন অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল তার সামনে আজ সমাজে ঠাঁই মিলেছে বটে কিন্তু সেই 'সত্তা' আজ হারিয়ে গেছে।

তিনি উত্তরে বললেন, যায়। তবে মানুষের মন এখনও সেভাবে গড়ে ওঠে নি, আপন বক্তব্যকে আরও প্রাঞ্জল করে বললেন—এমন বহু বক্তব্য আছে যা এক আধারে তুলে ধরা যতখানি সহজ অন্য আধারে পরিবেশন ততটা সহজ নয়। যেমন বহু বক্তব্য সাহিত্যে প্রচার করা চলে, তার চিত্রায়ণ ঠিক হয়তো সকল ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তবে ব্যতিক্রমও আছে বৈকি। সেটা নির্ভর করে স্রষ্টার নৈপুণ্য এবং জনগণের গ্রহণ করার ক্ষমতা, ওদের দেশে বহু পুরোপুরি সাহিত্য-ধর্মী লেখার সার্থক চিত্রায়ণও তো ঘটেছে। তার উপর এটাও সত্য যে স্বল্প-পরিসরে সব কিছু প্রকাশ করা সহজ নয়।

বিখ্যাত চিত্র পরিচালক সুশীল মজুমদারের পিতৃ-মাতৃ পরিচয়ও অনন্য। সে যুগের রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর বাবার ও মায়ের উভয়েরই ছিল এক বিরাট অবদান ও অতি ঘনিষ্ঠ যোগ। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দানের ফলে বহু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে এই দম্পতিকে, যাঁদের নিঃস্বার্থ সাধনায় দেশজননীর শ্রীঅঙ্গ থেকে পরাধীনতার শৃঙ্খল সরে গেছে—স্বর্গত বসন্তকুমার মজুমদার এবং স্বর্গতা হেমপ্রভা মজুমদারের নাম সেই তালিকায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুশীল মজুমদার তাঁদেরই পুত্র। প্রখ্যাতনামা অভিনেতা স্বর্গত শৈলেন চৌধুরী তাঁর মাতুল। বিশিষ্টা অভিনেত্রী শ্রীমতী আরতি মজুমদার তাঁর জীবন সঙ্গিনী।

গান-বাজনার গালগল্প

(১৫)

বিটলস-এর রেকর্ড

বিটলস্-এর গান বেরোয় লং-প্লেইং রেকর্ডে এবং ৪৫ আর পি এম এক্সটেনডেড প্লে রেকর্ডে। ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে 'পার্লোফোন রেকর্ডে "Love Me Do" প্রথম বেরোবার পর এই জয়যাত্রা সুরু হয়েছে, বাঁধভাঙা বন্যার জলের মত প্রবল উচ্ছ্বাসে জনতার চাহিদা দেখা দিয়েছে। চোখ বুজে কল্পনা করা চলে—ই এম আই ফ্যাক্টরি হতে লক্ষ লক্ষ রেকর্ড হু-হু করে বেরিয়ে আসছে, গড়িয়ে চলে যাচ্ছে পৃথিবীর সর্বত্র—সবই বিটলস্-এর রেকর্ড। এখানে তার কিছু পরিচয় দেওয়া যাক।

লং-প্লেইং রেকর্ড

P M C 1206 ; উইথ দি বিটলস্। ১৯৬৩ সালে ২২শে নভেম্বর বিলাতে প্রথম প্রকাশিত হয়। রেকর্ড বেরুবার আগেই ১লা নভেম্বর তারিখে আগাম অর্ডার এসেছিল আড়াই লাখেরও বেশি।

এই সময়ে বিটলস-এর একখানি ৪৫ আর পি এম সিঙ্গল রেকর্ড বেরোবার ঘোষণা করা। রেকর্ডের গানটি হল "আই ওয়াননা হোল্ড ইওর হ্যাণ্ড" (I wanna hold your hand)। ঘোষণার তিনদিনের মধ্যে একমাত্র লণ্ডনে আগাম অর্ডারের পরিমাণ হয়েছিল সাত লাখের উপর।

উইথ দি বিটলস্ (With the Beatles) রেকর্ডে ১৪খানা গান, তার সাতখানাই লেনন ও ম্যাককার্টনির রচিত, আর একখানা হ্যারিসনের। বাকিগুলি বাইরের লেখকের। গানগুলির প্রথম লাইনগুলি এইরূপ :

প্রথম দিকে—

(১) I wont be long
(২) All I've got to do
(৩) All my loving
(৪) Don't bother me
(৫) Little child
(৬) Till there was you
(৭) Please mister postman

দ্বিতীয় দিকে—

(১) Roll over Beethoven
(২) Hold me tight
(৩) You really gotta hold on me
(৪) I wanna be your man
(৫) Devil in her heart
(৬) Not a second time
(৭) Money

সন্তোষকমা

গানগুলির প্রথমাংশ শুনলেই বোঝা যায়, তরুণ-তরুণীরা কেন এ গান শুনে মেতে ওঠে। P M C 1202 প্লিজ প্লিজ মি (Please please me)। এই রেকর্ডটিও বেরিয়েছিল ১৯৬৩ সালে উপরোক্ত P M C 1206 -এর আগেই এবং এটিও অকল্পনীয় জন-সম্বর্ধনা লাভ করেছিল। 'প্লিজ প্লিজ মি' রেকর্ডেও চৌদ্দখানি গান এবং তার মধ্যে আটখানিই ম্যাককার্টনি ও লেননের রচিত। গানগুলির প্রথম লাইন এইরূপ—

প্রথম দিকে—

(১) I saw her standing there
(২) Misery
(৩) Anna (Go to him)
(৪) Chains
(৫) Boys
(৬) Ask me why
(৭) Please please me (এটিও ম্যাককার্টনি ও লেননের রচিত।)

দ্বিতীয় দিকে—

(১) Love me do (এই গানটি ম্যাককার্টনি ও লেননের রচিত। এটিই পার্লোফোন রেকর্ডে প্রথম বেরুলে হৈ-হৈ পড়েছিল।)
(২) P. S. I love you
(৩) Baby It's you

● 'স্ট্রীট সিঙ্গারের' প্রযোজক ও পরিচালক শ্রীচন্দ্রশেখর
আলোকচিত্র : জি, ডলি, এম-এ

(৪) Do you want to know a secret
(৫) A taste of honey
(৬) Ther's a place
(৭) Twist and shout

PMC 1240 বিটল্‌স্ ফর সেল (Beatles for sale) এই রেকর্ডটি ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত হয়। এতে চৌদ্দখানি গান আছে এবং তার অধিকাংশ লেনন ও ম্যাককার্টনির রচিত। বিখ্যাত সমালোচক ডেরেক টেলর (Derek Taylor) এই রেকর্ডখানির প্রসঙ্গে যে সব উৎসাহ বাণী লিখেছিলেন তার মধ্যে এর কয়েক ক'টি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য :

"When in a generation or so, a radio-active cigar-smoking child, picnicking on Saturn, asks you what the Beatle affair was all about —"Did you actually know them ?" —Don't try to explain all about the long hair and the screams! Just play the child a few tracks from this album and he'll probably understand what it was all about. The Kids of AD 2000 will draw from the music much the same sense of wellbeing and warmth as we do to-day." For the magic of the Beatles is, I suspect, timeless and ageless. It has broken all frontiers and barriers. It has cut through differences of race, age and class. It is adored by the world."

অর্থাৎ—এক পুরুষের মধ্যে বা অনুরূপ সময়ের মধ্যে যখন তেজস্ক্রিয় (রেডিও এ্যাকটিভ) সিগারপায়ী শিশুরা শনিগ্রহে চড়ুইভাতি করতে করতে আপনাকে জিজ্ঞাসা করবে, বিটলস-এর ব্যাপার সব কি বিষয়ে ছিল—"তুমি কি তাদের সত্যই চিনতে?" তাহলে বিটল্‌স্-এর লম্বা চুল আর চীৎকার প্রভৃতি বিষয় বোঝাতে যাবেন না। এই রেকর্ডখানির কয়েকটি গান বাজিয়ে শোনাবেন, তা হলে সম্ভবত তারা বিটল্‌স্-এর বিষয় সব বুঝতে পারবে। ২০০০ খৃস্টাব্দের শিশুরা এই গানগুলি থেকে একই প্রকার আনন্দ ও উদ্দীপনা বোধ করবে যেমন আমরা এখন করি। কারণ বিটল্‌স্-এর যাদু, আমার ধারণা কালাতীত এবং যুগাতীত। তা সব সীমানা এবং বাধা অতিক্রম করে গিয়েছে। তা জাতি, বয়স ও শ্রেণীর পার্থক্য ভেদ করেছে। তা সারা পৃথিবীর সমাদর লাভ করেছে।"

● 'পাড়ি' চিত্রের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় বোম্বাইয়ের জনপ্রিয় নায়ক দিলীপকুমার
আলোকচিত্র : জি, ডলি, এম, এ

এই রেকর্ডখানির গানগুলি এই :

প্রথম দিক—

(১) No reply
(২) I'm a loser
(৩) Baby's in black
(৪) Rock and Roll music
(৫) I'll follow the sun
(৬) Mr. Moonlight
(৭) Kansas city

দ্বিতীয় দিক—

(১) Eight days a week
(২) Words of Love
(৩) Honey don't
(৪) Every little thing
(৫) I don't want to spoil the party
(৬) What you're doing
(৭) Everybody's trying to be my baby.

বিটল্‌স্ মঞ্চে এবং ডিস্কে, রেডিওতে এবং টেলিভিশনে যখন বিশ্বজোড়া নাম করেছে, ফিল্মে যে তাদের ডাক পড়বে তা তো জানা কথাই। প্রথম তারা যে ফিল্মে অবতীর্ণ হয় সে ছবির নামকরণও করেন তাদেরই একজন—রিঙ্গো। একদিন স্যুটিং-এর প্রচণ্ড খাটুনির পর রাতে বিশ্রাম করবার সময় আরাম কেদারায় দুলতে দুলতে রিঙ্গো বললে—আজ হাড়ভাঙা খাটুনির দিনের রাত্রি (A hard day' night)। কথাটা মনে ধরল সবার। ছবির নাম দেওয়া হল—"এ হার্ড ডেজ নাইট", সে ফিল্ম নিয়েও হৈ-হৈ হল খুব ; উদ্বোধনের দিন সিনেমার সুমুখে পুলিশ ভিড় সামলাতে পারে না। অতএব ঐ ছবির গানগুলি আবার রেকর্ডেও বেরুল।

বোম্বাই সমাচার

শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

হিন্দি ফিল্মজগতে ভাল গল্পের অভাব বহুদিনের।

প্রায় সব প্রযোজক ও পরিচালক তাঁদের এ অভাব-অভিযোগ সব সময় জানিয়ে আসছেন।

কিন্তু কেন এমনি অভাব-অভিযোগ?

এঁরা বলেন, সর্বভারতীয় হিন্দি চলচ্চিত্র-বাজারের জন্যে যেরূপ কাহিনীর প্রয়োজন, ঠিক সে জিনিষটি হিন্দি-গল্প লেখক বা কাহিনীকারদের কাছে পাওয়া যায় না। যায় না বলেই কাহিনীর চাহিদা সব সময় মিটিয়ে আসতে হচ্ছে বাইরের কোন গল্প-সাহিত্য থেকে। বেশীর ভাগই গৃহীত হয় বিদেশী বা পাশ্চাত্য কাহিনীর ভাবাবলম্বনে। এই ভাবাবলম্বন ভারতীয় পটভূমিকায়, ভারতীয় কুশীলবদের চরিত্রে এবং তাদের মুখের নানা মিশ্র সংলাপে পরিস্ফুট থাকে। অর্থাৎ এঁদের সমগ্র চেহারাটাই ভারতীয় নয়। বলা চলে, কোন পাশ্চাত্য দেশের মানুষকে হঠাৎ ভারতীয় পোষাক পরিয়ে দিলে যেরূপ হয়।

এমনি পাশ্চাত্য কাহিনীর ভাবাবলম্বন ব্যতীত বাংলা দেশের অনেক বিখ্যাত গল্প ও তামিল সাহিত্যের অনেক মূল কাহিনী থেকেও হিন্দি চলচ্চিত্রের প্রচুর 'সিনোপ্সিস' বেমালুম স্বনামে বা বেনামীতেও গ্রহণ করা হ'য়ে থাকে। প্রেমচাঁদ ও কিষণচাঁদ প্রমুখ মুষ্টিমেয় হিন্দি সাহিত্যের প্রসিদ্ধ কাহিনীকার ব্যতীত মনে হয় না আর খুব বেশী হিন্দি কাহিনীকারদের কাহিনী হিন্দি চিত্রে রূপায়িত হয়েছে।

তার মানে এই, হিন্দি-গল্প সাহিত্যের মধ্যে এমন কোন সরস মৌলিক উপাদান বা উপযুক্ত মালমশলা পাওয়া যায় না, যদ্দ্বারা হিন্দি চলচ্চিত্র হিন্দি গল্পকাহিনী থেকে পরিপুষ্ট হ'তে পারে।

কিন্তু হিন্দি চলচ্চিত্রকে বলিষ্ঠ রূপ দিতে গেলে সর্বভারতীয় হিন্দি কাহিনীর গল্পাংশই গ্রহণ করা ভাল। কারণ, কোন এক দেশের ভাষায় লিখিত গল্প বা কাহিনী অনুবাদের দ্বারা অন্যদেশের ভাষায় রূপান্তরিত হলেও প্রকৃতপক্ষে ভাবের মৌলিক সংস্কার ত্রুটি ঘটে। রবীন্দ্রনাথের মৌলিক কোন বাংলা কবিতা গুজরাতী-মারহাট্টি অনুবাদ-রূপান্তরে যেমন অনুভূতির রাজ্যে ছন্দপতন ঘটে। মনে হয় ঠিক এ কারণেই বিশ্ববরেণ্য পরিচালক সত্যজিৎ রায় নিজ প্রদেশের ভাষা ব্যতিরেকে অন্য কোন প্রাদেশিক ভাষায় চিত্র পরিচালনা করতে আজো বিমুখ রয়েছেন। হয়তো ওঁর বক্তব্য যে-ভাষা আয়ত্তের মধ্যে নেই, সেই ভাষায় কোন চিত্রের যথার্থ রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। আর দিলেও ভাব ও অনুভূতির রাজ্যে কারচুপি ঘটে।

সেক্সপীয়র নাটক যে ভাষায় সৃষ্ট, সেই ভাষার মালিকেরাই করেছে তার চরম ও সার্থক রূপায়ণ। ইংরাজীতে অনূদিত নাটক রবীন্দ্রনাথের Post Office অপেক্ষা মৌলিক বাংলা নাটক 'ডাকঘর' অনেক সার্থক ও ভাবগ্রাহী। বিমল রায় পরিচালিত হিন্দি-চিত্র 'দেবদাস' অপেক্ষা ৺প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত বাংলা চিত্র দেবদাস, অনেক রসোত্তীর্ণ। নীহাররঞ্জন গুপ্ত লিখিত গল্প উল্কার হিন্দীতে রূপায়িত চিত্র 'মেরি সুরৎ তেরি আঁখি' অপেক্ষা বাংলা মূল 'উল্কা' চিত্র অনেক জীবন্ত ও রসগ্রাহী।

সুতরাং মনে করা যেতে পারে ভাষাভিত্তিক চলচ্চিত্রে স্বজাতীয় সৃষ্ট গল্প-সাহিত্যের আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয়।

কিন্তু একটা কথা, যার ভাষা ও গল্প-সাহিত্য মূলত দুর্বল, তার কাছে কি আশা করা সম্ভব?

হিন্দি চলচ্চিত্র কি তার দুর্বল গল্প-সাহিত্যের মাধ্যমেই গড়ে উঠবে? এ প্রশ্ন আমি আজ সমগ্র হিন্দি-গল্প সাহিত্যের সামনে রাখতে চাই।

বিভিন্ন দেশের সাহিত্য অনুবাদের দ্বারা সাহিত্যের পুষ্টি হতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধি হবে না তাতে নিজ সাহিত্যের।

হিন্দি সাহিত্যকে আজ সর্বাঙ্গ সুন্দর ও বলিষ্ঠ করে তোলার ব্রত এসেছে।

কিন্তু —ভাল গল্প খুঁজতে কোন অনুবাদ কাহিনী বা কোন বিদেশীয় কাহিনী স্রেফ 'নকল' করে নেবার কারণও দেখতে পাইনে।

কারণ, গল্প ছড়িয়ে আছে নানা দেশের রাজপথে, জনপথে, আর জনারণ্যে। শুধু দু'চোখ খুলে প্রত্যক্ষ করে যাওয়া।

প্রসঙ্গত মনে পড়ে, কিছুদিন আগে আমাকে বিশেষ কাজে রাজস্থানের—প্রায় সর্বত্রই বলা চলে,—ঘুরে বেড়াতে হ'য়েছে। অর্থাৎ পূর্ব ভরতপুর থেকে পশ্চিম বাড়মেড় সীমান্ত আর উত্তর জয়সীলমেড় থেকে দক্ষিণ দুংগরপুর-প্রতাপগড় পর্যন্ত।

● বোম্বাইয়ের স্বনামধন্য নৃত্যশিল্পী গোপীকৃষ্ণকে আশীর্বাদ জানাচ্ছেন জনৈকা বৃদ্ধা মহিলা। আলোকচিত্র : জি, ডলি, এম, এ

● মালা সিন্‌হাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তাঁর বান্ধবী শ্রীমতী আগরওয়ালা

আলোকচিত্র : জি. ডলি, এম-এ

রাজপুতনা বা রাজস্থানের নানা ইতিহাস আর উপকথার কাহিনী আশৈশব মনের কোণে ভিড় করে আছে। এমনি ইতিহাস আর উপকথা উপকথার মতই সরস ও উপভোগ্য। আরাবল্লীর দুর্গম শিখরে, উপত্যকায়, খরস্রোতা চম্বলের কূলে-উপকূলে, বারমেড়-জয়শীলমেড়ের দুস্তর-'মরুভূমি'র ধূসর বালুকাকীর্ণ পথে, বিপথে, কত মোগল-পাঠান জাঠ-ভীল আর রাজপুতের শৌর্য-বীর্য ও রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ধুলি ধূসরত বিস্মরণী ছিন্নপত্রের মত ছড়িয়ে আছে এখানে-ওখানে। কোটা থেকে বুন্দি, আর বুন্দি থেকে দেউলি হয়ে টংক---তারপর জয়পুর, প্রায় দেড়শো মাইলের মত সুদীর্ঘ রাজবর্ত্ম অতিক্রম করে যেতে যেতে আমার মনে হয়েছে উপরে-লিখিত কথাগুলো। 'ঐতিহাসিক অশরীরী' মূর্তিগুলো যেন তখন দিন আর রাত্রির আড়ালে স্পর্শ করে গেছে আমার মন ও দেহকে। একটা অভূতপূর্ব অনুভূতির আবেদনে রোমকূপ শিউরে উঠেছে

● হিন্দী 'আফসানার' একটি আবেগমধুর মুহূর্তে প্রদীপকুমার ও পদ্মিনী
আলোকচিত্র : জি, ডলি, এম-এ

ার ভেবেছি, যে অনন্ত ইতিহাস ছিল জানার পথে, তারই জীবন্ত প্রতিচ্ছায়া এতদিনে ন প্রত্যক্ষ করতে পারছি।

াব হাদির, রাজা মানসিংহ, যশোবন্ত সিংহ, গিংহ, উদয়সিংহ, মহারাণা প্রতাপ সিংহ, ম সিংহ, ফতে সিং, মাধো সিং প্রভৃতি রাজপুত রকেশরীদের দুর্ধর্ষপূর্ণ পরাক্রম, স্বদেশের ধীনতা রক্ষার্থে আত্মাহুতি, মহান ন্যায়বিচার, ন-ধ্যান, প্রেম-প্রীতি-বাৎসল্য প্রভৃতি নানা গুণের অগ্নিশুদ্ধি স্পর্শ কালের শতযোজন ছনে রয়েও যেন প্রত্যক্ষের সীমায় ধরা দিতে কে।

উদয়পুর থেকে চিতোরগড় পথে আসতে তের গাড়ীতে বসে অনুভব করেছি মহারাণী গ্নীন ঐতিহাসিক সত্তা। তার আত্মোৎসর্গের নশ্বর ভাস্বর কাহিনী। তারপর আকাশচুম্বী তাদের কীর্তিস্তম্ভের অপূর্ব কীর্তিগাথার বৃত্ত। রয়েছে স্থিরপ্রতিজ্ঞ অপরাজেয় রাণা প্রতাপ সিংহের চমকপ্রদ বীরত্ব গাথা। তিহাসিক হলদিঘাটের যুদ্ধ। বিশ্বস্ত অশ্বকের প্রভুভক্তির নিষ্ঠা।

তারপর এসেছি জয়পুর থেকে মেরতা শহরে।

গিরিধারী প্রেমে আসক্তা ভক্তিমতী মীরার পিতৃভূমি। মীরার প্রতিষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণমন্দিরে প্রবেশ করে অনুভব করেছি কৃষ্ণ-প্রেমে আশ্লেষা মীরার অস্তিত্ব। আর কানে শুনতে পেয়েছি যেন বহুদূর থেকে ভেসে আসছে, 'মেরে ত' গিরিধারী লাল গোপাল---''

গোয়াই-মাধোপুর, ভরতপুর, নাথদ্বারা, ভীলওয়ারা, যোধপুর, দুংগরপুর, মারওয়ার পালি, মারওয়ার, ভিনমল পোকরণ, রামওয়ারা, পিপারসিটি, মালপুরা, বারমেড়---যেস্থানেই গিয়েছি, সেখানেই দেখেছি নানা ধরণের ঐতিহাসিক স্থাপত্যরীতি, বহুধারায় প্রবাহিত ঐতিহাসিক নানা শ্রেণীর মানুষ আর প্রাকৃতিক পরিবেশ। আর মনে হয়েছে অব্যক্ত সব কাহিনী ছড়িয়ে আছে ত' এখানেই---বোবা অতীতের গহ্বর থেকে বর্তমানের সূর্যালোকে। শুধু সুচিন্তার গ্রন্থন, আর প্লটের বিন্যাস মাত্র। কাজেই, আমার প্রশ্ন, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে হিন্দি লেখক আর কাহিনীকারেরা কি উক্ত অলিখিত কাহিনী সুস্পষ্ট ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন না?

কিন্তু কথায় আছে, 'মাথা নেই ত' মাথাব্যথা।'

হিন্দি চলচ্চিত্রজগতে গল্প নেই কিন্তু আছে চলচ্চিত্র প্রোডাকশানের ছোটবড় নানা অফিস।

মহালক্ষ্মী স্টেশনে নেমে একবার যদি ফেমাস বিল্ডিং-এ চলে আসতে পারেন, তবে দেখবেন আমি মিথ্যে বলেছি কি না।

প্রকাণ্ড চৌতালা বিল্ডিংসের যেদিকেই আপনি 'পাদক্ষেপ' করবেন সেদিকেই কোন-না কোন চলচ্চিত্র প্রোডাকশানের পর পর সাইনবোর্ড আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। কত প্রকারের নামের বাহার। A. C. Film, G. C. Film, T. K. Film, Imag. Makers, Filmiyng, All India Film-Making Syndicate, Savey Film Corporation, Chitralok, Shade and Light ইত্যাদি ইত্যাদি।

রকমারি নামের অতসব অফিস দেখে স্বভাবতই মনে হবে, সত্যি এইসব Film Maker-এর দল Production কিছু করছেন, নাকি, মাসের পর মাস ঘরের খেয়ে বুনো মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

যদি বলা যায়, শেষের কথাই ঠিক, তবে কিছু অন্যায় বলা হয় না। মোট কথা, শতকরা একশ' প্রোডাকশানের ইউনিটের মধ্যে মাত্র পঁচিশটি Production ক্ষেত্রে আছেন কি না, সন্দেহ আছে। বাকী সত্তর-পঁচাত্তরটি প্রোডাকশান ইউনিট কয়েক হাজার টাকা সম্বল করে নসিবের নৌকোয় নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি জমিয়েছেন,—যদি কোনদিন ডিস্ট্রিবিউটর-রূপী সোনার পাহাড়ের সন্ধান মেলে। যদি সন্ধান মেলে ত' ভাল, নয়ত একদিন নিঃশেষের চোরাবালীতে টুপ করে ডুবে যেতেও সময় লাগে না। অর্থাৎ Production unitটি বেমালুম হাওয়া,---ঘরে আসল মালিকের একসের-ই ওজনের তালা ঝুলে।

কিন্তু আশ্চর্য এই, যাঁরা হাজার টাকা সম্বলের নসিব নিয়ে Film Production তৈরী করেন, তাঁরা নিজেরাও জানেন, ভাল কোন Distributor বা কোন লাখপতি না জুটলে টুপ করে তাঁরা ডুবেই যাবেন কিন্তু সোনার হরিণ দেখার মত কেমন একটা মোহ---চলচ্চিত্রের ঐ অধরার মোহময়ীকে ত' ভোলা যায় না,—রূপছায়া রাজ্যের অদৃশ্য অপরূপাকে তাঁদের যে চাই-ই।

হিসেব করে দেখা গেছে, প্রায় বছরেই এমনি আট-দশটি চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান অকস্মাৎ

শোবার ঘরের দোরে এসে দাঁড়িয়েছেন মা নিঃশব্দে। দোর খুলে ছেলে আগেই দাঁড়িয়ে

মাকে এত রাত্রে দেখে ছেলে বিস্মিত। বললে, মা, তুমি এত রাতে?

মা জবাব দিলেন: একটা অস্বোয়াস্তিতে ঘুম আমার আসছে না বেটা, তা বাদে কেমন এক অজানা ভয়ে ধরে অস্থির হয়ে উঠেছি

ছেলে মায়ের মুখে নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকে কিছুটা শান্তভাবে বললে: আমি বুঝতে পেরেছি। নিশ্চয়ই এজন্যে---বলে সে সম্মুখ দিকে অংগুলি সংকেত করলে।

মা সেদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করে আতংকে শিউরে উঠলো যেন।

ওরই স্বামীর মৃতদেহ পড়ে আছে রক্তাক্ত হ'য়ে।

মা সংশয়-ভীরু কণ্ঠে বলে উঠলেন: না, না, আমি কিছু জানিনে বেটা, কিছু জানিনে।

আমাকে তোর ঘরে নিয়ে চল, আমি আর দেখতে পারিনে---

ছেলে সন্দেহভরা চোখে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে নিজের ঘরে নিয়ে গেল মাকে।---

টেকিডের পরমুহূর্তেই এগিয়ে গেলাম সেটের ভিতর।

দেখলেন আমাকে 'স্যাল্লেটার' নায়ক। সঙ্গে সঙ্গে চোখমুখ খুসীতে নেচে উঠলো তাঁর।

বললেন: আসুন, আসুন, ভাল আছেন ত'?

: হ্যাঁ,---কিন্তু এলেন কবে? আমি আনন্দপ্রকাশ করে বললুম।

: এসেছি দুদিন।---উত্তর দিলেন 'স্যাল্লেটার' নায়ক।

'সেটে' 'প্যাল্লা' বিলি করা হচ্ছিল, সেখান থেকে একটি নিয়ে উনি আমার হাতে দিয়ে বললেন, নিন্ মিষ্টি খান্,---পরিচালক নিশ্চয়ই মনে করেছেন। সট্‌টা অব্যর্থ হ'য়েছে। তাই 'মিষ্টি যোগ', বুঝলেন না?---বলে হাসলেন।

তারপর 'মেক্-আপ' রুমে চলে এলাম দুজনে। পরবর্তী খণ্ডদৃশ্যের প্রস্তুতির জন্যেই 'স্যাল্লেটার' নায়ককে আসতে হোলো।

কিছুক্ষণ উভয়ের কথোপকথন হোলো। উনি বললেন যে, পরিচালক হেমেনদার (গুপ্ত) বইটার (অনামিকা) স্যুটিং চলছে এখানে, তার জন্যে দুদিন থাকতে হবে। কোলকাতায় আর কোন নূতন বই নেই তাঁর হাতে কয়েকটি পুরাণো ছাড়া। কি করে উনি ফিল্মজগতে প্রবেশ করলেন, তারও কিছু উপভোগ্য কাহিনী বললেন আমায়।

সত্যজিৎ রায়ের 'মহানগরে' অভিনয় করে খ্যাতিসম্পন্ন হয়েছেন কি না,---জিজ্ঞেস করাতে উনি স্বীকার করে বললেন যে, শুধু তাই নয়, ঋত্বিক ঘটক পরিচালিত মেঘে-ঢাকা তারাতেও অভিনয় করে তিনি চিত্রজগতে সমধিক পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছেন। তাঁর সুখ্যাতির পথে পরিচালক তপন সিংহের কথাও বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করলেন।--

অনিল চ্যাটার্জী অভিনীত প্রথম হিন্দি চিত্র হেমন্তকুমার প্রযোজিত 'ফারার',---আর দ্বিতীয় চিত্র---'স্যাল্লেটা'। 'স্যাল্লেটার' অপরাপর ভূমিকালিপিতে আছেন, তনুজা (নায়িকা) কে, এন, সিং, ডেভিড্, রাজ মেহরা, অসিত সেন প্রভৃতি। সংগীত পরিচালনা করছেন হেমন্তকুমার।

টুকিটাকি-সংবাদ

একটি সুসংবাদ,---গত ১৩ তারিখে কুমারী নাজের সঙ্গে সুবিরাজের বিবাহ অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হ'য়েছে। এই উপলক্ষে ১৪ই তারিখে পৃথ্বীরাজ কাপুরের আবাসস্থল জুহুর গান্ধী কুটিরে একটি প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছিল। নাজের (তখন বেবী নাজ নামে পরিচিতা) চলচ্চিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ রাজকাপুর প্রযোজিত 'বুট পালিসে'---প্রায় তের বছর আগে। এই তের বছরে প্রায় শ'খানেক চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পান 'নাজ'। আর সুবিরাজ---পৃথ্বীরাজ কাপুর প্রতিষ্ঠিত পৃথ্বী থিয়েটারের একজন খ্যাতনামা অভিনেতা। চলচ্চিত্রেও তিনি বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত।---

● নায়িকা শ্রীমতী অমৃতা রায় ও জনৈকা শিল্পী
আলোকচিত্র : জানকীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবাদ-বিচিত্রা

নায়িকা ঃ সুচিত্রা সেন—নায়ক ঃ রাজকাপুর

জনপ্রিয়তার বিচারে বর্তমান যুগের বাংলা দেশের অভিনেত্রী মহলের নেত্রীস্থানীয়া শ্রীমতী সুচিত্রা সেন বোম্বাই-য়ের চিত্রজগতেও নবাগতা নন। ইতঃপূর্বে দিলীপকুমার, বলরাজ সাহনী ও দেবআনন্দ প্রমুখ জনপ্রিয় নায়কদের বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায় তিনি যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। দীর্ঘকাল পরে আবার তাঁকে হিন্দী ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে। এবার তিনি অভিনয় করবেন জনপ্রিয়তার মানদণ্ডে বর্তমান কালের বোম্বাইয়ের অভিনেতা মহলের নেতৃস্বরূপ রাজকুমারের বিপরীতে নায়িকার ভূমিকায়। যে চিত্রটির মাধ্যমে সুচিত্রা-রাজকাপুরের সম্মেলন ঘটেছে—সেই ছবিটির নাম "জোকার"। এই ছবিতে একটি সার্কাসের ক্লাউনের চরিত্রের রূপ দিচ্ছেন। বিখ্যাত চিত্রতারকা শ্রীমতী পদ্মিনীও এই চিত্রে একটি বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণা হচ্ছেন।

বাংলা চিত্রে বৈজয়ন্তীমালা

মাসিক বসুমতীর গত সংখ্যায় এই বিভাগে আমরা সুপ্রসিদ্ধা নায়িকা শ্রীমতী নার্গিসের বাংলাচিত্রে অবতরণের সংবাদ ঘোষণা করেছিলাম। বর্তমান সংখ্যায় এই বিভাগের আমরা আরও একজন প্রখ্যাতনাম্নী চিত্রতারকার বাংলা ছবিতে অভিনয়ের সংবাদ জানাচ্ছি। তাঁর নাম শ্রীমতী বৈজয়ন্তীমালা। চলচ্চিত্রে নির্মীয়মাণ বনফুলের বিখ্যাত রচনা "হাটে-বাজারে" নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধা হয়েছেন বৈজয়ন্তী। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্র-পরিচালক তপন সিংহ ছবিটি পরিচালনা করবেন। শ্রদ্ধেয় কথাশিল্পী বিদগ্ধ পরিচালক এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠা তারকার এই সমন্বয় সর্বতোভাবে সাফল্য অর্জন করবে এ আশা আমরা পোষণ করি।

ভানুমতীর সাহিত্যে পুরস্কার লাভ

দক্ষিণ ভারতের যশস্বিনী শিল্পী শ্রীমতী ভানুমতীর দক্ষতা কেবল অভিনয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ছোট গল্প রচনায় এবং কণ্ঠসঙ্গীতেও তাঁর প্রতিভা অল্প মূল্যের নয়। তাঁর সাহিত্য ও সঙ্গীত সাধনা তাঁকে যথেষ্ট খ্যাতিতে ভরিয়ে দিয়েছে। তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতিস্বরূপ অন্ধ্র প্রদেশ সাহিত্য আকাদামী তাঁর আট্টগারী কাঠালু নামক ছোট গল্পের সঙ্কলনটির জন্য তাঁকে

● 'শঙ্খবেলায়' তিন শিল্পী—উত্তমকুমার, মাধবী মুখোপাধ্যায় ও বসন্ত চৌধুরী
আলোকচিত্র : শান্তিময় সান্যাল

এক হাজার এক শ' ষোল টাকার একটি পুরস্কারে সম্মানিত করেছেন।

চিত্র-পরিচালনায় দ্বিতীয় সিংহলী মহিলা

সিংহলী মহিলাদের মধ্যে চিত্র-পরিচালনার দায়িত্ব প্রথম গ্রহণ করেন বিশিষ্টা অভিনেত্রী শ্রীমতী ফ্লোরিডা জয়ালাল। এ সংবাদ মাসিক বসুমতীর এই বিভাগেরই মাধ্যমেও পরিবেশিত হয়েছে। বর্তমানে জানা গেল যে, এ ক্ষেত্রে তিনি প্রথমা হলেও অদ্বিতীয়া আর নন। শ্রীমতী রুবি দিমেলও চিত্র-পরিচালকের আসরে অবতীর্ণা হয়েছেন। বয়স্কা চরিত্রের রূপদাত্রী হিসাবে সিংহলী চিত্রসমাজে শ্রীমতী রুবি দিমেল একটি বিশেষ আসনের অধিকারিণী। রুবি-পরিচালিত ছবিটির নাম "পিপেনা কুমুডু"।

সৌখিন-সমাচার

রামের সুমতি

সাহিত্যসম্রাট "শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি" সম্প্রতি অভিনয় করলেন রুচি সংসদের সদস্যারা। নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করেন, অদিতি মুখোপাধ্যায়, রেবা ঘোষ, আলোক মুখোপাধ্যায়, রীতা বিশ্বাস, তপতী মুখোপাধ্যায়, চৈতালি ঘোষ, রূপক বিশ্বাস, দেবাশীষ ঘোষ, রজত বিশ্বাস, কল্পনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীণা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নর নারায়ণ

ক্ষীরোদপ্রসাদের বিখ্যাত নাটক "নরনারায়ণ" নিবেদন করলেন "বৃহস্পতির আসর" গোষ্ঠী। বিভিন্ন চরিত্রের রূপদান করলেন শঙ্করনারায়ণ, মণীশ সেনগুপ্ত, পরেশ মল্লিক, সন্তোষ রায়, নিতাই মুখোপাধ্যায়, মিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি।

হাসপাতাল

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের লোকরঞ্জন শাখার উদ্যোগে হাসপাতাল নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। প্রযোজনায় ও পরিচালনায় ছিলেন প্রখ্যাত সুরশিল্পী শ্রীপঙ্কজকুমার মল্লিক ও খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীশচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বিভিন্ন ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন সর্বশ্রী রূপেন মিত্র, সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, চন্দ্রকান্ত মান্না, ষষ্ঠীচরণ দে, রাণী চক্রবর্তী, চিত্রা মণ্ডল, সমীর লাহিড়ী, নির্মাল্য সেনগুপ্ত, বেণু মিত্র, দুর্গা দে, পঙ্কজ মুখোপাধ্যায়, দিলীপ মিত্র, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, ব্রজ পাইন, বন্দনা দেবী ও রেখা চট্টোপাধ্যায়।

নৃত্যশিল্পী মালঞ্চ সেন

জয়পুর ঘরোয়ানার কথক-নৃত্যে মাত্র পনের বছর বয়সেই মালঞ্চ সেন যথেষ্ট সুনাম ও প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। ইনি জয়কুমারী দেবী ও রামগোপাল মিশ্রের নিকট শিক্ষালাভ করে[illegible] মাত্র দশ বছর বয়সে ইনি '[illegible] উপাধি লাভ করেন। ১৯৬১ সালে[illegible] সঙ্গীত সম্মেলনে ইনি কথক ম[illegible] এবং আধুনিক নৃত্যে প্রথম স্থান [illegible] করে বাঙলার মুখ উজ্জ্বল ক[illegible] দেশের মুখোজ্জ্বলকারিণী এই বা[illegible] তার শিল্পিজীবনের উত্তরোত্তর [illegible] ও সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

● নৃত্যশিল্পী মালঞ্চ সেন

নির্মীয়মাণ ছবি

তপন সিংহের "গল্প হলেও সত্যি"

বাঙলা চলচ্চিত্রের মানোন্নয়ন সমৃদ্ধিসাধনে এ যুগে তপন সিং[illegible] অবদান কম নয়। এবার দর্শক সাধার[illegible] তিনি উপহার দিচ্ছেন একটি অভি[illegible] ও বৈচিত্র্যপূর্ণ ছবি। ছবিটির [illegible] "গল্প হলেও সত্যি"। শ্রীসি[illegible] ছবিটির সঙ্গে শুধু পরিচালক হিসাবে যুক্ত নন—ছবিটির চিত্রনাট্যকার সুরকারও তিনিই। এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে একান্নিমাত্র [illegible] ছবির কাহিনী গড়ে উঠেছে।

তরুণ মজুমদারের "বালিকা বধূ"

এ কালের তরুণ চিত্রকারদের মধ্যে তরুণ মজুমদার একটি উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর প্রতিটি ছবিই তার শক্তিমত্তার এবং নৈপুণ্যের স্বাক্ষরসমৃদ্ধ—একথা বললে অত্যুক্তির দোষে দুষ্ট হতে হয় না। বর্তমানে যে ছবিটি তাঁর সুপরিচালনায় গৃহীত হচ্ছে তার নাম "বালিকা বধূ"। ছবিটিতে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও মুকুন্দদাসের দু'খানি হিসাবে ছ'খানি এবং একটি পুরাতন বাউল গান সংযোজিত হচ্ছে। এই ছবিটির মাধ্যমে বোম্বাইয়ের খ্যাতনামা বেহালাবাদক গজানন কারনাডের বেহালা শোনা যাবে।

॥ ইন্দ্রসেন ॥

"I go in quest of a great Perhaps."
—Francois Rebelais.

নীরব রাত্রির কৃষ্ণতমস কখন যে মুছে গেল, গভীর সুষুপ্তিতে মগ্ন থেকে জানতে পারেন না রামচন্দ্র। সারা রাত বিনিদ্রায় কেটে গেছে ইতিপূর্বে। তাই অন্যের আশ্রয়ে পরম নিশ্চিন্তায় ঘুমের মধ্যে ডুবে ছিলেন ভোরের পাখীর ডাক শুনে, তন্দ্রা টুটে যায়। কানে আসে পায়রার বকম-বকম। আলিসায় সারি দিয়ে ব'সেছে পায়রার পাল। গাছে গাছে পাখী ডাকছে শিস দিয়ে দিয়ে যেন দোসর সাথীকে ডাকছে দিনের আলো ফুটতেই। পথে পথে তৃণভুক পশুরা চলেছে দলে দলে। হয়তো চরতে বেরিয়েছে তারা। গরু আর ছাগলের ডাক শোনা যায়। তাদের কণ্ঠে ঝুলনো ঘণ্টা ঢং ঢং আওয়াজ তুলছে। মসজিদের মিনারে দাঁড়িয়ে মৌলবী আজান পড়ছে কাঁপা কাঁপা স্বরে। নমাজে বসতে হবে। তাই সকলের উদ্দেশ্যে আহ্বানমন্ত্র পাঠ চলেছে। এই পবিত্র অমূল্য প্রাতঃকাল বৃথা না যায়।

ঘুমের ঘোর রামচন্দ্রর চোখে। যেন এক আজব পৃথিবী দেখছেন। আজগুবী, অবিশ্বাস্য, অদ্ভুত ঠেকছে এই সন্দেহপূর্ণ পরিবেশ। সুসজ্জিত কক্ষটি সবিস্ময়ে দেখলেন নবাগত অতিথি। কোথাও কোন ত্রুটি নেই। কক্ষটি অম্লান, পরিচ্ছন্ন; নানা আসবাবে পরিপূর্ণ। যত আলো তত বাতাস। মুক্ত বাতায়ন থেকে দেখা যায় দীপ্তিমান তেজস্বান শুভ্র আকাশ। সূর্যের প্রথম রশ্মিতে ভাস্বর। সাড়া শব্দ শুনে রামচন্দ্র অনুমান করলেন, গৃহস্থ জেগেছে। লক্ষ্মীর সংসারে অধিক ঘুমের প্রশ্রয় দেয় না কেউ।

কক্ষের রুদ্ধদ্বার খুলতেই রামচন্দ্র দেখলেন, জনৈক পরিচারক অপেক্ষায় রত। চোখাচোখি হ'তেই ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে ভৃত্য প্রণাম ঠুকলো। বললে,—কর্তামশায় এত্তেলা পাঠিয়েছেন। স্নানপর্ব চুকিয়ে সদরে যেতে আজ্ঞা হয়।

—কে? ঘোষমহাশয়?

অপ্রতিভস্বরে বললেন রামচন্দ্র।

—হ কর্তা।

—কোথায় তিনি?

রামচন্দ্র সসংভ্রমে বলেন।

—এখন আছেন কুস্তীর আখড়ায়। পালোয়ানদের সাথে প্যাঁচ কষছেন। গায়ে মাটি মেখেছেন।

—শ্রীধর আর শ্রীনাথ, তাঁরা কোথায়?

—তাঁরা দণ্ড-বৈঠক দিতেছেন। এক এক লপ্তে শ'য়ে শ'য়ে দিবেন। মুগুর ভাঁজবেন। গায়ে তেল ডলবেন।

ক্ষীণ হাসি রামচন্দ্রের মুখে। স্বগতোক্তি করলেন,—শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনম্। সর্বাগ্রে শরীর, তত্ঃপর অন্য কিছু। তা তোমার নামটা কি জানা হয় নাই।

—অধমের নাম হুজুর ভৈরব দাস। মশায়ের শ্রীচরণের দাস আমি, আপনার সেবার লেগেই হুজুর আমাকে নিয়োগ করছেন। মশায়ের ফাই-ফরমাস শোনা, হুকুম তামিল করাই কাজ আমার। অষ্টপ্রহর হাজির পাবেন ভৈরবকে।

অবাক মানলেন রামচন্দ্র। যিনি সাহায্যপ্রার্থী, কর্মপ্রার্থী, তাঁর জন্য আবার ভৃত্য নিয়োগ কেন! রামচন্দ্র বললেন,—ভৈরব, বাতলে দিতে পারো কোন দিকে গোসলখানা?

—চলেন কর্তা। সাথে সাথে চলেন। গোসলে সবই প্রস্তুত আছে। দন্তমঞ্জনের নিমকাঠি, তেল, গামছা, ধুতি-চাদর, কাঠের পাদুকা।

পূজা-পাঠ সেরে শ্রীকান্ত যখন সদরে আসেন, তখন আবার কাছারী কিঞ্চিৎ জনাকীর্ণ হয়। বৈষয়িক কাজে লিপ্ত থাকেন শ্রীকান্ত। সংসারের আয়-ব্যয়ের হিসাব দেখেন স্বয়ং। নায়েব হাত-খাতা পেশ করেন। খাতায় কপাল ঠোকেন শ্রীকান্ত। অর্থাৎ দুর্গানাম, তারিখ, রোজ, সন-সাল লেখার শেষে আপন কপালে খাতা স্পর্শ করেন। কাছারীতে ধূনা পড়ে তখন। দুয়ারে দুয়ারে গঙ্গাজলের ছিটা পড়ে।

আলবোলা গর্জন তুলতে থাকে থেমে থেমে। সদর গম গম করছে শ্রীকান্তের জলদগম্ভীর কণ্ঠস্বরে। বিভাগীয় নায়েব গোমস্তারা প্রশ্নবাণে জর্জরিত হ'তে থাকেন। খাতার পরীক্ষায় কারচুপি ধ'রে ফেলেন গৃহস্বামী। গাছের ফল আর জমির ফসলের ফলনের হিসাব জানেন শ্রীকান্ত। জানেন কতটা জমিতে কতটা ফলে। কত ধানে কত চাল হয়।

শ্রীধর আর শ্রীনাথ পাঠে বসেন খানিক। গৃহশিক্ষকের অধীনে, ভাষা, সাহিত্য, গণিত শিক্ষা করেন দুই ভাই। সংস্কৃত আর ফার্সী পড়া চলে প্রতিনিয়ত।

সদাস্নাত ও নববস্ত্র পরিহিত রামচন্দ্র কাছারীতে প্রবেশ করতেই উপস্থিত ব্যক্তিদের বিদায় দিলেন শ্রীকান্ত। বললেন,—আইস রামচন্দ্র, গোপন কথা আছে।

তক্তাপোষে আসন গ্রহণ করেন রাম। তাঁর উজ্জ্বল মুখকান্তি দেখে যেন মুগ্ধ শ্রীকান্ত। কি অনবদ্য সুন্দর মুখশ্রী। আয়ত চক্ষু দুটিতে বুদ্ধির প্রাখর্য। উন্নত ললাটে যেন শুভচিহ্ন আঁকা।

কাছারী প্রায় শূন্য বলা যায়। শ্রীকান্ত ও রামচন্দ্র ব্যতীত তৃতীয় জন নেই। কয়েক মুহূর্ত চিন্তামগ্ন থেকে শ্রীকান্ত বললেন,—তুমি স্বপদে দণ্ডায়মান থাকো, একটা কার্যে ব্রতী হও, পদে অধিষ্ঠিত হও, ইহাই আমার একান্ত বাসনা রামচন্দ্র। জানি না তোমার কি অভিসন্ধি। কোন্ কর্তব্য তোমার পছন্দ হয়। স্বাধীন ব্যবসায় না অন্যের অধীনে কর্ম? খোলা মনে ব্যক্ত করো।

রামচন্দ্র স্মিতহাসির সঙ্গে বলেন,—ব্যবসায় মূলধন প্রয়োজন হয়। আমার তো কিছুই নাই। আমি নিঃস্ব, রিক্ত। অন্যের অধীনে কর্ম ভিন্ন আমার গতি কি। সর্বোপরি, মহাশয়, যেমত আজ্ঞা করেন তাহা শিরোধার্য জানবেন।

কাছারী তামাকের সুগন্ধে মশগুল। ধূম উদ্গিরণ করেন শ্রীকান্ত। আর মুগ্ধচোখে লক্ষ্য করেন রামচন্দ্রকে। কিশোরের মুখে পৌরুষ দীপ্যমান যেন। টিকালো নাসিকা যেন কঠিন প্রতিজ্ঞার পরিচয় প্রদান করে।

মুখ থেকে সটকা নামিয়ে শ্রীকান্ত বললেন,—তবে রাবণ অপেক্ষা রামের হস্তে মরণই শ্রেয়। নবাব সরকারের অধীনে যদি কর্মের সংস্থান সম্ভব হয়, তদপেক্ষা আর কিছুই ভাল হইতে পারে না। পাকা কাজ, সুখ-সুবিধা সুপ্রচুর। কর্মে দক্ষতা দেখালে ধাপে ধাপে উন্নতি জানিও।

দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস রামচন্দ্রের। সুযোগের সদ্ব্যবহার করবেন, মনে মনে পণ করলেন। বলেন,—ফলেন পরিচীয়তে। আশা করি, যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।

—জমির হিসাব-নিকাশ জ্ঞাত আছো কি রামচন্দ্র? জমির পরিমাপ, জমির মূল্যায়ন, বন্দোবস্তের নিয়মকানুন?

ধীরে ধীরে প্রশ্ন করেন শ্রীকান্ত। বিনম্রকণ্ঠে।

—সম্পূর্ণ জানা নাই মহাশয়, মিথ্যা বলি কেন। শিক্ষানবিশীতে জ্ঞান সঞ্চয় হইতে পারে। চেষ্টা যদি থাকে, কিছুই অবিদিত থাকিতে পারে না।

—তাহা আমি অস্বীকার করি না রামচন্দ্র। কিন্তু শিক্ষানবীশী সাকরেদীতে পুরা জ্ঞান হয় না, পড়াশুনা লিখন পঠনে যতটা হয়। যাহা হোক, আমি কয়েকখান পুঁথি তোমাকে দিব। সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করিও। কণ্ঠস্থ মুখস্থ ঠোঁটস্থ করিও। পুঁথিগুলি পয়ারছন্দে লেখা। পড়িতে অসুবিধা নাই।

রামচন্দ্র শ্রুতিধর। একবার মাত্র পাঠেই সকল বিষয় স্মৃতিবন্দী হয় তাঁর। তিনি বলেন,—যথাজ্ঞা মহাশয়। পুঁথিগুলি দিন। মহাশয়ের আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালিত হবে।

শ্রীকান্ত বলেন,—জ্ঞান বিষয়টা এমনই, যার কোন সীমা-পরিধি নাই। প্রতিক্ষণেই মানুষ একটা নূতন কিছু শিক্ষা লাভ করে। সামান্য একটা পিপীলিকার কাছেও শিক্ষা লাভ হয়। দেখিও পিপীলিকাশ্রেণী, কি পরিমাণ সঞ্চয়ী। বর্ষার আগে খাদ্যবস্তু সঞ্চয় করে তারা। জীবন ধারণের জন্যই যে খাদ্য রক্ষা। পক্ষীজাতি একটি একটি কুটা সংগ্রহ করিয়া বাসা নির্মাণ করে। শাবকপালকে আশ্রয় দিতে হয়। সেই অতি কষ্টে নির্মিত বাসা আবার ঝড়-ঝঞ্ঝা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ধূলিসাৎ হয়। পক্ষী তাই বলিয়া দিশাহারা হয়

না। পুনরায় নীড়রচনায় মনঃসংযোগ করে। তাই নহে কি?

—অতীব সত্যকথা। ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ। শিক্ষার শেষ নাই। জ্ঞান অসীম ও অনন্ত।

—পুঁথিগুলি পাঠাগারে রক্ষিত আছে। পুঁথির তালিকা ও সংখ্যা দেখিয়া তথ্য করিও রামচন্দ্র। পাঠের অভ্যাস করিলে দুর্বোধ্য বিষয়সমূহ জলবৎ তরল হইয়া যায়। জানিবে মনুষ্য অভ্যাসের দাস। বুদ্ধিমান জীব বলিতে একমাত্র মনুষ্যকেই বুঝায়। তাই বলি, আন্তরিক চেষ্টা থাকিলে মানবজাতির দুঃসাধ্য কিছুই থাকে না।

—আশীর্বাদ করেন, নিশ্চয়ই কৃতকার্য হইব।

কথা বলতে বলতে শ্রীকান্তর দুই পা স্পর্শ করলেন রামচন্দ্র। ভক্তিনম্র সুরে বলেন,—মহাশয়ের আশীষ লাভ হইলে আমি অসাধ্য সাধন করিতে পারি।

শ্রীকান্ত দুই হাত তোলেন। হাতে অভয়মুদ্রা। বললেন —তোমার জয় হোক। শতায়ু হও। উন্নতি করহ, প্রতিষ্ঠা লাভ করহ।

মুখে নটকা ধরলেন তিনি। রূপার আলবোলা গর্জে উঠলো যেন নতুন উদ্যমে। স্বর নামালেন গৃহকর্তা। প্রচুর ধূম উদগিরণের পরে প্রায় চুপি চুপি বললেন,—আপাতত একটা নামমাত্র হাত-খরচ মিলিবে। রাহা হিসাবে কিঞ্চিৎ অর্থপ্রাপ্তি আর কি। ততঃপর কর্মে পটু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নির্দিষ্ট মাসিক বেতনের পাকা বন্দোবস্ত। তুমি যেন কোনমতে নিরাশ হইও না রামচন্দ্র। আমাকেও আবার কেহ না স্বজনপোষণের দোষ না দেয়। আমি নবাবের আস্থাভাজন। বিশ্বাস ভঙ্গ হয়, এমন কিছুই করা সমীচীন নহে।

আবার বোল বলতে থাকলো আলবোলা। কাছারীর স্তব্ধতা ভঙ্গ হ'তে থাকে। রামচন্দ্র লক্ষ্য করলেন, শ্রীকান্ত যেন অন্যমনে কি এক চিন্তা করছেন। চোখের দৃষ্টি বক্রের কড়িতে নিবদ্ধ। শ্বেতচন্দনে লিপ্ত প্রশস্ত কপালে রেখা ফুটেছে। তামাক সেবনের সঙ্গে ভাবছেন কি যেন। বুদ্ধির খেলা চলছে অদৃশ্য মস্তিষ্কে।

—আমি পাঠাগারে যাইতে পারি, যদি অনুমতি দেন।

রামচন্দ্র বললেন সবিনয়ে। তক্তাপোষ থেকে গাত্রোত্থান করলেন।

—অবশ্য, অবশ্য। তৎপূর্বে আমার পুত্রদ্বয়কে ডাকি। বাৎলাইয়া দিই। ওরে শ্রীধর, ওরে শ্রীনাথ।

কাছারী কাঁপিয়ে ডাক ছাড়লেন শ্রীকান্ত। হুঙ্কারের মত শোনায় যেন। রামচন্দ্রের উদ্দেশে বললেন,—শ্রীধর, শ্রীনাথকে নির্দেশ দিই, তারা যেন দপ্তরে যাওয়ার প্রাক্কালে তোমাকে সঙ্গে লয়।

দুই ছেলে এসে দাঁড়ালো। তাদের আনতমুখে ভীতিপূর্ণ সম্ভ্রমের ভঙ্গী। পিতা যে কি আদেশ করবেন কে জানে।

শ্রীকান্ত বললেন,—রামচন্দ্রকে তোমাদিগের সহোদর-তুল্য মনে করিও। অদ্যই রামকে দপ্তরে যাইতে হয়। সঙ্গে লইতে ভুলিও না। না হয় আরও দুইটা বাহক লাগাইবা পাল্কীতে। একটা সমুখে, একটা পিছনে। তোমরা যে-সকল মুসাবিধার কাজ কর, রামচন্দ্রকে দেখাইবা। খসড়া, পাণ্ডুলিপি, ইত্যাদি। এখন রামকে পাঠাগারে ল'য়ে যাও। পুঁথির তালিকা দেখাও। আমি ইতোমধ্যে হাতের কাজ কয়েকটা সারি। আগামীকল্য প্রাতে রাজধানী একডালা যাত্রা করিব, স্থির আছে। নবাব সরকার থেকে ডাক আসছে, দরবারে হাজির হও। মন্ত্রি-পরিষদের বৈঠকে কিছু শলা-পরামর্শ আছে। জরুরী তলব, না যাইলেই নয়।

শ্রীধর বললে,—কোন্ পথে যাওয়া? জলপথে না স্থলপথে।

শ্রীকান্ত বললেন,—জলপথে। নৌকায় যাত্রা। মা গঙ্গার দর্শনলাভ হবে খানিক, আর কি চাই!

শ্রীধর।—বান ডাকলে গঙ্গাদেবী ভীষণা ভয়ঙ্করী রূপ ধরেন, তাই ভীত হই।

শ্রীকান্ত।—ভয় নাই, ভাঁটায় নৌকা চলিবে। জোয়ারের আগে তীরে আশ্রয় ল'বো। অতঃপর কপালে যাহা লেখা আছে তাহাই হইবে।

কথার শেষে হিসাবের ফর্দ তোলেন তিনি। কার গুজরতে কত তঙ্কা দেওয়া হয়েছে, দেখতে থাকলেন। রোকড় খাতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হয়। রোকড়ে লিখিত আছে নগদ টাকার বিস্তারিত হিসাব।

পাঠাগারে রাশি রাশি পুঁথি। সারি সারি সাজানো। বিষয়বস্তু অনুযায়ী পৃথকভাবে রক্ষিত। ধর্ম ও শাস্ত্র। ন্যায় ও দর্শন। কাব্যসাহিত্য। পদাবলী। অলঙ্কার। গণিত ইত্যাদি। সংস্কৃত, ফার্সী ও বঙ্গভাষায় রচিত পুঁথিরাশি।

সোঁদা গন্ধ পাঠাগারে। মসী লিখিত তালপত্র যত। তুলা, খড় ও কাষ্ঠের অংশুতে তৈয়ারী তুলট কাগজ। ধূলায় না মলিন হয়। কীটে না কাটে। তজ্জন্য জনা-কয় দপ্তরী নিযুক্ত আছে। তারা সংস্কারের কাজে রত। কেউ বা ফোঁড়াফুঁড়ি ও সেলাই করছে। গ্রন্থি বাঁধছে পুঁথিতে। পাঠাগারের অধ্যক্ষ জীর্ণ পুরাণো পুঁথি নকল করছেন। চিলের পালখের লেখনী, ভূষাকালি।

—আমাদিগের গ্রন্থকীট কৈ?

পরিহাসের সুরে বললে শ্রীধর।

লেখনী কানে তোলেন শিখাধারী অধ্যক্ষ। দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখেন আগন্তুকদের। বলেন,—কি বক্তব্য তাই শুনি। কি চাই বল। তামাসা রাখহ, আমার সময়ের মূল্য অনেক।

—কে অস্বীকার করে?

হাসতে হাসতে বললে শ্রীধর। বিছানো মাদুরে আসন গ্রহণ ক'রে বলে,—কীট কি সর্বদাই দংশন করে? বিরতি মানে না?

অধ্যক্ষ প্রাজ্ঞবৃদ্ধ। বিচক্ষণ। অথচ সুরসিক। পরিহাসে ক্ষুব্ধ হন না। তিনি বললেন, —কীট বহু প্রকার। তন্মধ্যে মনুষ্যকীট, যন্মধ্যে তোমাকেও গণ্য করা যায়, সদাই দংশায়। স্থান কাল পাত্র মানে না।

সশব্দে হেসে উঠলো শ্রীধর। শ্রীনাথ ও রামচন্দ্র। হাসতে হাসতে শ্রীধর বলে,—মনুষ্য কি কীটের পর্যায়ে পড়ে? কদাপি নয়। কিন্তু গ্রন্থকীট শব্দটা বৈদিক। বহুকাল যাবৎ প্রচলিত। মনুষ্য মধ্যে কদাচিৎ একটা দু'টা চোখে পড়ে।

—তুমি একটা কপি।

অধ্যক্ষ বললেন হাসিতে যোগ দিয়ে।

—মহাশয় একটি পরিপক্ব বাতাকু।

—বাজে বকিও না শ্রীধর। এই বালকটি কে তাই বল।

—নাম শ্রীরামচন্দ্র গুহ। আমাদিগের এক সহোদর। শ্রীনাথ বলতে থাকে। বলে,—পুঁথির তালিকাখানি দেন এই ভ্রাতাকে। যে যে পুঁথিপাঠে আগ্রহী হয়, সেগুলি দিবেন। পিতার আদেশ।

—তথাস্তু। এই লও তালিকা।

কথার শেষে রামচন্দ্রের হাতে তালিকা তুলে দিলেন অধ্যক্ষ। বললেন,—বিষয় অগ্রে নির্বাচন করহ। পুঁথির সংখ্যা লিখহ। পুঁতিকর্তার নাম।

—নকলের কাজটি কি তাহা দেখি। পদ্য না গদ্য?

শ্রীধর অনুকৃত লিপি দেখতে আগ্রহ প্রকাশ করলে। কথা বলতে বলতে অধ্যক্ষের লিপিতে চোখ দেয়। বলে,—মহাকবি কালিদাসের ঋতুসংহার না কি?

—না হে রসিকচূড়ামণি। অনুমানটা সত্য নয়।

সোচ্চারে প্রতিবাদ জানালেন অধ্যক্ষ। অতি কষ্টে হাসি দমন করলেন।

—তবে কি? মেঘদূতম্?

শ্রীধর বললে তামাসার সুরে। ফিসফিস কথায়।

—না হে না। চটুল কোথাকার।

—তবে কি? গীতা না মনুসংহিতা?

—একখানি পুরাণ। অতীব দুষ্প্রাপ্য। ভবিষ্য-পুরাণ। 'দর্শনেই চক্ষু সার্থক কর'। জানি শত চেষ্টাতেও অন্তস্ফুট করণে সক্ষম হইব না।

—পুরাণ উপনিষদ বার্ধক্যে পাঠ্য।

—কৈশোরে কি পাঠ্য তাহা শুনি? রসমঞ্জরী?

কৃত্রিম রাগের সুরে অধ্যক্ষ শুধোলেন।

আবার একটা হাসির জোয়ার ওঠে। তিনজনেই হাসতে থাকে সমস্বরে।

—রামচন্দ্রকে সাহায্য করেন। আমরা দু'জনার বিদায় হই। গ্রন্থকীট পুনরায় দংশনে প্রবৃত্ত হোন।

শ্রীধর ও শ্রীনাথ নিষ্ক্রান্ত হ'তেই রামচন্দ্র বললেন,—গণিতবিষয়ক পুঁথি কি কি আছে? তালিকায় উল্লেখ কৈ?

—অকারান্ত তালিকা। গ অক্ষরে দেখহ।

কান থেকে লেখনী নামিয়ে বললেন অধ্যক্ষ। অনুলিপি শুরু করলেন আবার। তিনি যেন চিত্রগুপ্ত। সদাই লেখায় রত। অনুক্ষণ লিখছেন।

তালিকা দেখতে থাকেন রামচন্দ্র। আকাঙ্ক্ষিত বিষয়ের পুঁথি ও পুঁথিকর্তার নাম লিখে রাখেন কদলী পাতায়।

পাঠাগারে যেন গাম্ভীর্য বিরাজ করে। অবিচ্ছিন্ন নীরবতা। অধ্যক্ষ লেখায় মগ্ন। দপ্তরীরা সেলাই ও সংস্কারের কাজে। অনুসন্ধিৎসু চোখে তালিকা পাঠ করছেন রামচন্দ্র। সকালের হলুদ রৌদ্র ছড়িয়েছে বিছানো মাদুরে। রামচন্দ্রর মুখে। খেয়াল নেই সেদিকে, তথ্যান্বেষীর। ফুরফুরে বাতাসে রামচন্দ্রর উত্তরীয়ের অঞ্চল-অংশ কাঁপছে।

"Thrones, dominations, princedoms, virtues, powers."

—John Milton

প্রভাতে একবার দর্শন দান করেন নবাব হোসেন শাহ।

সর্বসাধারণের উপস্থিতিতে দেখা দেন সুলতান। দুর্গের সংলগ্ন এক অলিন্দে এসে কিয়দক্ষণ দণ্ডায়মান থাকেন। দুর্গের বহিঃপ্রাঙ্গণে সহস্র সহস্র দর্শনপ্রার্থী। নবাবকে দেখে তারা উচ্ছ্বসিত, উদ্বেলিত হয়। হোসেনের দীর্ঘজীবন কামনা করে উচ্চকণ্ঠে। জয়ধ্বনি শোনায় সরবে।

দুই হাত শূন্যে তুলে প্রতি-অভিবাদন জানাতে থাকেন নবাব, সহাস্যবদনে। কিছু কিছু অর্থকড়ি দান খয়রাৎ করেন। কয়েক ধামা রূপার চাকতি স্বহস্তে নিক্ষেপ করেন হোসেন। মুঠো মুঠো ছুঁড়ে দেন অলিন্দ থেকে। ঝুল-বারান্দার নীচের প্রাঙ্গণে কাড়াকাড়ি পড়ে। রূপার চাকতির লোভে হাতাহাতি লাগে জনতার মধ্যে। নবাব লুটিয়ে দেন রাশি রাশি রূপার টুকরো। সূর্যালোকে চিক চিক করে রূপালী ধাতুর টুকরো টুকরো পাত।

জনগণও উপঢৌকন দেয় নবাবকে। সুলতান হোসেন শাহ শুধুমাত্র সিংহাসনের অধিকারী নহেন, তিনি আবার ধর্ম-সংস্কারক মহম্মদের বংশধর। তাঁর স্থান তাই জনমানসে। সম্ভ্রম, শ্রদ্ধার সঙ্গে মিশেছে অন্তরের আকুতি, ভক্তি। স্তুতির সঙ্গে আরাধনা, পূজা।

নবাবের প্রতিনিধিবর্গ গ্রহণ করছেন অর্ঘ্য, উপঢৌকন। নানা উপচারের নৈবেদ্য। চাল, ডাল, মসলা। ফল, ফুল, ক্ষেতের ফসল। ছাগ, মেষ, মোরগ, মৎস্য, আণ্ডা। দুগ্ধ, দধি, পনির, ঘৃত, তৈল।

সিংহাসন লাভ করে অনেকে। কেউ অধিকার করে। কেউ পায় উত্তরাধিকারসূত্রে। এই প্রসঙ্গে ফিরিশ্‌তা ব্যঙ্গের ছলে লিখেছেন: 'প্রভু হত্যা না করলে কেউ গৌড়ের সিংহাসন লাভ করতে পারতো না।'

ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন লিখে গেছেন: 'জলালুদ্দীন ফতে শাহেব হত্যার পরে যে কেউ রাজাকে হত্যা করতো, সেই দেশের সর্বত্র সিংহাসনের অধিকারী হিসাবে সম্মানিত হ'তো।'

পর্তুগীজ ঐতিহাসিক ফরিয়া-ই-সুজার রচনায় পাওয়া যায়,—'গৌড়দেশে কোন রাজপুত্র সিংহাসন অধিকার করে না। সময়ে সময়ে এমন কি ক্রীতদাসেরা প্রভু হত্যা ক'রে রাজ্যলাভ করে।'

চরম বিশৃঙ্খলায় অতীত হয়েছে গৌড়বঙ্গের বিগত দিনগুলি। দেশের এমনই দুর্ভাগ্য যে রাজার রাজত্ব অধিককাল স্থায়ী হয় না। আজ এক, কাল অন্য আর এক শাসকের আবির্ভাব হয়। হানাহানি, খণ্ডযুদ্ধ, রক্তপাত চলতেই থাকে। সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দলের প্রাধান্য চলে। আজকের আমীরকে কাল দেখা যায় রাস্তায়, ফকিররূপে। আবার আজ যে ফকির, কাল হয়তো সে হাতে মানদণ্ড ধরে।

রাজায় রাজায়, প্রভু ভৃত্যে যুদ্ধ চলে; মরে যত উলুখাগড়া। দেশে শান্তির লেশমাত্র থাকে না। কিছুই স্থিরতা নেই। স্থায়ী নয় কিছু। রাতারাতি আইন-কানুন পালটে যায়। রীতি-নীতির বদল। আগুন জ্বলতেই থাকে। ঘর-বসতি পুড়ে ছারখার হয়। দাঙ্গা-হাঙ্গামা লেগেই থাকে। শান্তিকামী দেশবাসীরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। ভিটামাটি ছেড়ে পালিয়ে যায় বাস্তুচ্যুত নরনারী। বহন ক'রে নিয়ে যায় বৃদ্ধ আর শিশুদের। দেশের লোকের দুঃখের অন্ত নেই। অন্ন-বস্ত্র জোটে না। রজনী বিনিদ্রায় কাটে।

এমন এক দুঃসময়ে হোসেন শাহের আবির্ভাব। মরাহাজার দেশে যেন শ্রাবণের জলভরা মেঘ দেখা দেয়। রুক্ষ্ম-রুক্ষ মরুভূমিতে দেখতে পাওয়া যায় মরীচিকা নয়, প্রাকৃতিক মরূদ্যান।

জনসাধারণকে দর্শনদানের পরে দরবার-কক্ষে বসেন নবাব।

নর্তকীরা আসে দুই দলে, দুই দিক থেকে। নাচতে নাচতে বরণ করে তারা। মুঠি মুঠি ফুল ছোঁড়ে নবাবের দিকে। শূন্য সাজি হাতে নাচতে নাচতে বেরিয়ে যায়। নবাবের সমুখে ধূপ ধূনা কর্পূর চন্দন জলতে থাকে। দু'জন ষোড়শী পরিচারিকা দু' পাশে থেকে চামরের হাওয়া খেলায়।

সারেঙ্গীর সুর-তরঙ্গ থামলে দরবারের কার্যসূচী শুরু হয়।

নির্দিষ্ট আসন আছে মন্ত্রীদের। উজীর আমীর আর অমাত্যদের জন্য পৃথক ফরাস। সেনাধ্যক্ষ, কারাধ্যক্ষ, কোষাধ্যক্ষ—কেউ বাদ নেই। সকলেই উপস্থিত। সর-এ-লস্করর৷ আছেন অনেকে।

দরবারে নবাবের প্রবেশ ঘোষিত হওয়ামাত্র সকলেই উঠে দণ্ডায়মান হয়েছেন। নীরব সম্মানপ্রদর্শন।

ক্ষুরধার তীক্ষ্ণবুদ্ধি নবাবের। একেক লহমায় দেখতে থাকেন তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের মুখবিম্ব। কার মুখ কি বলে। মুখের না কি আর এক ভাষা আছে, যা মুখর নয় মূক। মুখ দেখে পড়তে পারেন বিজ্ঞজনেরা। অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পান অন্তরছবি।

আপন কর্মপন্থা মনে মনে ছকে ফেলেছেন সুলতান। সিংহাসন লাভের পরে কি কি করণীয়।

নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে হলে সর্বাগ্রে পুরা দেশটাকে পুরাপুরি আয়ত্তে আনতে হয়। হোসেন তাই জানতে চাইলেন তাঁর রাজ্যসীমা। বললেন,—উজীর-এ-উজীর হামিদ খান কৈ?

উঠে দাঁড়িয়ে তসলিম ঠুকতে থাকলেন বিনয়াবনত হামিদ খান। বহু গুণে বিভূষিত হামিদ; অমূল্য অলৌকিক শক্তি ধারণ করেন। প্রধান উজিরত্ব প্রাপ্তি হওয়ায় হামিদ স্থানে স্থানে অন্নশালা, মসজিদ ও পুষ্করিণী নির্মাণের ব্যবস্থা ক'রেছেন। পিপীলিকা ও মক্ষীকে শর্করা দান করেন। কাক, পিক, কুকুর, শৃগালকেও আহার যোগান। পালন করেন যতেক বাতুল আতুরকে।

সুলতান বললেন,—আমার রাজত্বে জরীপ কি শুনাও হামিদ খান। বিস্তার কোথায় কোথায়?

মুজফ্‌ফর শাহের উজীর ছিলেন হোসেন। দীর্ঘকাল যাবৎ। শাসনদক্ষতার জন্য যশ ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তিনি জানেন না তাঁর রাজ্যসীমা, বিশ্বাস হয় না হামিদ খানের। তাঁর ধারণা হয় নবাব তাঁকে পরীক্ষা করছেন। পরখ করছেন, হামিদ দিবারাত্র দানধর্ম করে, না কাজ করে।

হামিদ তবুও বলতে থাকেন,— হুগলী, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পাটনা, ময়মনসিংহ, বর্ধমান, দিনাজপুর, বীরভূম, রংপুর, রাজসাহী, সারন, অর্গলা সাজলা মংখাবাদ, থানা লাওবলা, সিমলাবাদ, হোসেনবাদ, ফতেহাবাদ, হাতীগড, খলিফতাবাদ।

রাজ্যের একেক অংশের নাম শেষ হতে হামিদ খান ক্ষণেক নীরব থাকেন। নবাবের মৌখিক প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেন। দেখলেন সুলতানের শ্রীমুখে প্রসন্নতা ফুটেছে। হোসেন মৃদু মৃদু হাসছেন।

হামিদ খান বললেন,—তামাম বঙ্গদেশ নবাবের শাসন মানি লয়েছে। বিহারের একভাগ বশ মানিছে।

—সাবাস হামিদ খান। হাঙ্গামা হুজ্জৎ আছে কোথাও? হল্লা-হামলা?

হোসেন শাহ বললেন দিলখোলা হাসির সঙ্গে। নবাবের হাতে সদ্যফোটা লাল গুলাব। নাকের কাছে ধরে আছেন হোসেন। সুগন্ধ পান করছেন।

—জাঁহাপনা, বঙ্গাল বিহারে বিলকুল বাসিন্দা তোফা আছে। ঝগড়া করছে হাবসীরা। নবাবের সৈন্যদের সঙ্গে হাবসীদের লড়াই লেগেই আছে। চোরা-গোপ্তা খুন, দাঙ্গাবাজি, হানাদারি থামছে না। জবর-দখল করছে একটা একটা গাঁও। সড়ক সাঁকো খান খান ভাঙছে। ফসল লুটছে। গাই-বাছুর ভেড়া ছাগল পাকড়াও করছে জবরদস্তী। নবাবের হুকুম-নামা মানতে চায় না হাবসীরা।

চক্ষু যেন রক্তবর্ণ ধারণ করে। হোসেনের আয়ত বিস্ফারিত চোখের পলক পড়ে না। বজ্রমুষ্টিতে স্বর্ণ-সিংহাসনের হাতল ধরেন নবাব। একটা হাত ক্ষিপ্রবেগে স্পর্শ করে কটিতে ঝুলানো তরোয়াল। হোসেন সোচ্চারে বললেন,—আলাউদ্দীন রুকন্ খান! হাজতগুলা কি খালি? কেন তবে শুয়েশুয়ে হাজত বানাইনু!

রুকন্ খান আসন ছেড়ে উঠলেন। তসলিম ঠুকতে ঠুকতে বললেন,—শেখ হাব্বু বলুক জাঁহাপনা। খালি আছে না ভর্তি আছে।

—শেখ হাব্বু!

নবাব আর এক নাম উচ্চারণ করলেন সরবে।

—হাজতে আর একতিল জায়গা নাই জাঁহাপনা।

কারাধ্যক্ষ শেখ হাব্বু সরাসরি জানিয়ে দেয়।

আসন গ্রহণ করেছিলেন হামিদ খান। ধীরে ধীরে আবার উঠলেন। তসলিম ঠুকে বললেন;—জাঁহাপনা আপনার পাইকদের সামলানো দায়। পাইকরা যা খুসী করছে। রাজা আর আমীরদের ধরে ধরে শির ছিঁড়ছে। জাঁহাপনার বদনাম রটছে। কেন না পাইকরা নবাবের অধীনেই কাজ করে।

—পাইকদের দলটা ভাঙ্গি দেও হামিদ খান। তারা যেন আর দুর্গ-রক্ষার কাজে না থাকে। বিলকুল পাইকদের বরখাস্ত কর' আজই। আদেশ দিনু, কোন চাকরীতে পাইক আর হাবসী যেন আর বহাল না থাকে। হাবসীগুলোকে তাড়াও হামিদ খান। বঙ্গাল মুলুকের বাহিরে পাঠাও। হৈতন খাঁ, গৌরাই মল্লিক, করবে খাঁ।

হুকুমজারীর শেষে তিনজনের নাম উচ্চারণ করলেন হোসেন। তির্যকদৃষ্টিতে দেখলেন ইদিক সিদিক। হাতের গুলাব রেখে দিলেন আপন ক্রোড়ে। একটি বার তরবারি স্পর্শ করেন। ঝন ঝন শব্দ ওঠে থেকে থেকে। হোসেনের অঙ্গস্পর্শে চাঞ্চল্যে তরোয়ালের খাপের সঙ্গে সিংহাসনের সঙ্ঘর্ষ বাধে যেন।

তিনজন সেনাপতি। হৈতন, গৌরাই, করবে। তাঁরা সশস্ত্র। লৌহবর্মে আবৃত দেহ। মাথায় লোহার শিরস্ত্রাণ। লোহার জালির আবরণে ঢাকা মুখ। যত বা লম্বা তত বা চওড়া বপু। সেনাপতিদের মাথা দরবারের চন্দ্রাতপে প্রায় ঠেকছে।

—হাবসীদের টুঁটি টিপে মারো। বঙ্গাল মুলুক হ'তে তাড়াও। আর কোন কর্ম নাই তোমাদিগের তিনজনার। যত ফৌজ লাগে লাগাও। তোপের মুখে বাঁধি উড়ায়ে দাও শূয়োরের বাচ্চাদের। বন্দী হাবসীগুলোকে শিকলে বাঁধি রাজ্যের বাহিরে নির্বাসনে পাঠাও। জাহান্নামে যাক।

জোরালো কণ্ঠে বললেন হোসেন শাহ। দরবার কক্ষ যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে। নবাবের কথার প্রতিধ্বনি খেলে দরবারের কোন এক উচ্চ কোণে।

আদেশ লাভের সঙ্গে সঙ্গে দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন হৈতন, গৌরাই, করবে। কুর্নিশ ঠোকেন আর পিছু হটতে থাকেন এক পা এক পা। নবাবের আদেশ যেন শিরোধার্য।

—হামিদ খান, অদ্য হতে সৈয়দ, মোগল, হিন্দু ও আফগানদিগকে আমি যতেক উচ্চপদে নিয়োগ করিমু। আপনি পদের তালিকা পেশ করেন যথাসত্বর। আমার রাজ্যে দাঙ্গা-বাজী চলবে না। প্রজাদিগের কষ্ট তকলিফ বরদাস্ত করিমু না।

খোলামনে বললেন নবাব। সাফ জানিয়ে দিলেন মনের ইচ্ছা। হোসেন জানেন, শান্তি শৃঙ্খলা বজায় না থাকলে রাজ্য করায়ত্ত হ'তে পারে না। রাজ্য মধ্যে তাদের ঠাঁই নাই, যারা বিপক্ষের। অর্থাৎ বিরোধীপক্ষের বা শত্রুপক্ষের।

দরবারের কর্মধারা, কথাবার্তা, হুকুমজারী গড়গড়িয়ে লিখে চলেছে দু'জন কেরাণী। নবাবের প্রশ্ন অধ্যক্ষদের উত্তর সবই লিখিত হয়।

—গোপাল চক্রবর্তী কৈ?

স্বর পালটে বললেন হোসেন। হেলে দুলে বললেন। ব্যাকুল নয়নে খুঁজতে থাকেন তাঁর এক প্রিয়পাত্রকে।

আরিন্দা অর্থাৎ কর আদায়কারী গোপাল। রাজকোষে যত কর জমা পড়ে তার অধিকাংশটা জমা দেন তিনি। গোপালের প্রভাব প্রতিপত্তি ও কর্মক্ষমতা অসীম। প্রতিটি ইজারাদার গোপালের হাতের পুতুল। তিনি যা বলেন তারা তাই করে। সৎ ব্রাহ্মণ হিসাবেও যুবক গোপালের যথেষ্ট খ্যাতি আছে।

যুক্তকরে উঠে দাঁড়ালেন গোপাল। তাঁর রূপের ছটা দেখতে দেখতে হোসেন যেন মুগ্ধ হন। নবাব বললেন,—রাজকোষে বহুৎ অর্থের প্রয়োজন। গোপাল, তুমি কিঞ্চিৎ তৎপর হও।

—বারো লক্ষ টাকা জমা দিয়াছি জাঁহাপনা। চেষ্টায় আছি জানিবেন।

লালবাহাদুর অমর রহে !

জন্ম—২রা অক্টোবর, ১৯০৪ মৃত্যু—১১ই জানুয়ারী, ১৯৬৬

—লক্ষ লক্ষ টাকার দরকার গোপাল। আমি প্রজাদিগের সুখশান্তি চাহি। রাজ্যের বিস্তার অনেকটা। গোটা রাজত্বের উন্নতির জন্য কত অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে, গোপাল তুমিই কহ।

হোসেন মিষ্টস্বরে বললেন থেমে থেমে। গোপালের রূপে তিনি যেন বিমুগ্ধ বিস্মিত।

—অধিক বলার প্রয়োজন নাই জাঁহাপনা।

গোপাল যুক্তকরে নিবেদন করেন।

—সনাতন, রূপ, বল্লভ, কৈ? তিন ভাইকে দেখি না।

হোসেন কথা বলতে বলতে চোখের দৃষ্টিতে সন্ধান করেন। মন্ত্রীদের দিকে চোখ বুলিয়ে নিলেন।

—বল্লভ আসে নাই জাঁহাপনা। আমরা দু'জনাই উপস্থিত।

নতমস্তকে বললেন সনাতন। প্রণতি জানালেন কপালে কর ছুঁইয়ে। বুদ্ধিতে বৃহস্পতি সনাতন। পরম বৈষ্ণব তাঁরা। সনাতন, রূপ ও বল্লভ মহাপ্রভুর ভক্ত।

—তোমাদিগকে না দেখিলে বেদনা পাই সনাতন। আল্লা মঙ্গল করেন। কথা বলতে বলতে সিংহাসন ত্যাগ করলেন হোসেন। পার্ষদবর্গ উঠলেন। দরবার থেকে বেরিয়ে গেলেন ধীরে ধীরে। জরির নাগরা মচমচ আওয়াজ তোলে। দেখা যায়, হোসেনের মাথার মুকুটের শুভ্রশিখা। দরবারের দরজার বহিঃপথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। [ক্রমশ

॥ সাহিত্য-সমাচার ॥

শতগল্প

গল্প-গ্রন্থ অপেক্ষা প্রকাশকদের উপন্যাসের উপরেই ঝোঁক বেশী। তাহলেও খ্যাতিমান গল্প-লেখকদের নানাবিধ গল্প-গ্রন্থ ও গল্প-সংগ্রহের অভাব নেই। 'স্বনির্বাচিত গল্প', 'শ্রেষ্ঠ গল্প', 'গল্প-পঞ্চাশৎ' গ্রন্থগুলি গল্পের মর্যাদা বৃদ্ধিরই পরিচয় দান করে। সম্প্রতি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর 'শতগল্প' প্রকাশ বাংলা সাহিত্য গল্প-গ্রন্থ প্রকাশনায় একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। সর্বাধিক গল্প-লেখকদের অন্যতম অচিন্ত্যকুমার কেবলমাত্র গল্প-উপন্যাস রচনাতেই শ্রেষ্ঠ স্থানীয় নয়, অন্যান্য নানাবিধ রচনাতেই তিনি পারঙ্গম। তাঁর এই 'শত গল্প' বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে সাহিত্যিকদের যেমন অনুপ্রাণিত করবে, প্রকাশকদেরও অনুরূপ উৎসাহিত করবে।

উপেন্দ্রকিশোরের গ্রন্থস্বত্ব

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী শিশু-সাহিত্যের পথিকৃৎ, আদিপুরুষ। ছোটদের সাহিত্যে তাঁর অসামান্য সর্বাঙ্গীণ ভিত্ত ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তিস্বরূপ। তাঁর 'সেকালের কথা' (অধুনালুপ্ত), 'ছেলেদের রামায়ণ', 'ছেলেদের মহাভারত', 'মহাভারতের গল্প', 'টুনটুনির বই', 'ছোট্ট রামায়ণ', 'গুপি গাইন বাঘা বাইন' প্রভৃতি বইগুলি ছাড়াও অসংখ্য বিজ্ঞানভিত্তিক গল্প, জীবজন্তুর কাহিনী প্রভৃতি নানা ধরণের রচনা বিভিন্ন ...চীন পত্রিকা, যথা 'সখা', 'সাথী' 'সখা ও সাথী' এবং 'সন্দেশ' প্রভৃতি পত্রিকায় ছড়িয়ে আছে। বড়দের জন্য তাঁর রচিত সঙ্গীতবিষয়ক বহু প্রবন্ধ এবং 'হারমোনিয়াম শিক্ষা' ও 'বেহালা শিক্ষা' গ্রন্থ দু'খানিও আজ বিস্মৃতির অতলে। শিল্পী ও সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর ১২৭০ সালের ২৮শে বৈশাখ জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি পরলোকগমন করেন ১৩২২ সালের ৪ঠা পৌষ।

প্রিয়ব্রত

এই মৃত্যুকাল থেকে ৫০ বৎসর অতিক্রান্ত হওয়ায় সম্প্রতি তাঁর গ্রন্থস্বত্ব সর্বসাধারণের জন্য মুক্ত হল। আমরা শুনেছি, ইতিমধ্যেই কয়েকজন প্রকাশক এই গ্রন্থগুলি প্রকাশের আয়োজন করেছেন। উপেন্দ্রকিশোর স্বর্গত কবি সুকুমার রায়ের পিতা এবং বিখ্যাত শিল্পী ও চিত্র-পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পিতামহ।

বি.শ্ব. বক্তালয়ে শরৎ-বক্তৃতা

প্রবীণ ও খ্যাতিমান সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় এবার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শরৎ-বক্তৃতা' দানের সম্মানে সম্মানিত হয়েছিলেন। তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল, বাঙলার মোঁপাসা নামে খ্যাত সে-যুগের বিখ্যাত গল্প-লেখক, ঔপন্যাসিক ও 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার সম্পাদক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের জীবন ও রচনা সম্পর্কে। উপর্যুপরি তিন দিনের বক্তৃতার মধ্যে বিভূতিভূষণ তাঁর সহজ ও উপভোগ্য ভঙ্গিমায় প্রভাতকুমারের জীবন-কথা, কতকগুলি গল্পের বিশেষ মাধুর্য এবং কয়েকখানি উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসের স্বাদ অনেকের কাছেই পরিচিত, তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীগুলির পরিচয়ও অনেকের কাছে অবিদিত নয়, কিন্তু আলোচ্য জীবন-কথা তথা সাহিত্যালোচনাতেও তাঁর যে কি পরিমাণ তথ্যবহুল, বিশ্লেষণ শক্তিবিশিষ্ট ও প্রসাদগুণসমন্বিত, তা যাঁরাই তাঁর বক্তৃতা শুনেছেন, তাঁরাই উপলব্ধি করেছেন। এই বক্তৃতা গ্রন্থাকারে শীঘ্রই প্রকাশিত হবে।

বিবর

ছিছিকারের সমারোহের মধ্যেও সমরেশ বসুর 'বিবর' উপন্যাসখানি বাজারে প্রকাশিত হয়েছে এবং একটি সংস্করণ ইতিমধ্যে নিঃশেষিত হয়েছে বলেও প্রকাশ। পূজা-সংখ্যা 'দেশ' সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশকালেই এই উপন্যাস নিয়ে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বহু প্রবীণ পাঠক অশ্লীলতা দোষ-দুষ্ট ও কুরুচিপূর্ণ এই উপন্যাসটি বাড়ির ছেলেমেয়েদের হস্তগত হওয়ার পূর্বেই লুকিয়ে ফেলতে বাধ্য হন। একটি নামকরা, আভিজাত্যপূর্ণ, বহু প্রচারিত পত্রিকায় এ ধরণের উপন্যাস প্রকাশের বিরুদ্ধে অনেকে ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং এর স্বপক্ষে ও বিপক্ষে কিছু চিঠিপত্রও প্রকাশিত হয় উক্ত পত্রিকায়। অনেকের মতে এই ধরণের উপন্যাস প্রকাশ জাতীয় নৈতিক স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক। ইতিপূর্বে বহু-ক্ষেত্রে পুলিশ এ ধরণের উপন্যাস প্রকাশ সম্বন্ধে বিরুদ্ধভাব পোষণ করে, তার প্রকাশ ও প্রচার বন্ধ করে দিয়েছেন।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁরা কেন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করেন নি, সে কারণে পুলিশ কর্তৃপক্ষের উপরও অনেকে অভিযোগ করেছেন। গ্রন্থখানি যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, সে সম্বন্ধে কেবলমাত্র 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত চিঠিপত্রেই নয়, অন্যত্রও এ সম্বন্ধে বিশেষ বিরুদ্ধমত জনসাধারণকে অবহিত করেছে। প্রসঙ্গত দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবীণ সাহিত্যিক পরিমল গোস্বামীর পত্র এবং মাসিক 'কথা-সাহিত্য' পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ, ১৩৭২) শ্রীবোপদেব শর্মার 'সাময়িক সাহিত্য পরিক্রমা' পর্যায়ে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে আলোচিত দীর্ঘ রচনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! 'বিবর' অশ্লীল পর্যায়ভুক্ত গ্রন্থ নয় ব'লে পাঠকদের উদ্দেশ্যে বোপদেব বলেছেন—

'বিবরে' তাঁরা কি দেখতে পাবেন? দেখতে পাবেন, প্রকাশ্য রাজপথের মোড়ে মূত্র-পুরীষ-ন্যক্কার কুণ্ডের আঁস্তাকুড় সৃষ্টি করে একটা পাগল (পাগল, না মাতাল?—ভগবানের মার, না স্বখাত-সলিল?) তার মধ্যে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে, হাত-পা ছুঁড়ে পাঁক ছিটোচ্ছে আর অনর্গল কদর্য ভাষায় মুখখিস্তি করে চলেছে—এর মধ্যে অশ্লীলতা কোথায়? কৃমিকীটের বাসস্থানকে কি 'বিবর' বলা চলে?"

এই বাংলা। এর পরও এই 'বিবর' সম্বন্ধে অতিরিক্ত ক্ষোভের কারণ হয়েছে, অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর কলিকাতা শাখা থেকে প্রচারিত 'বঙ্গ আমার জননী আমার' বিভাগে এই গ্রন্থের সমালোচনা নিয়ে। সাধারণত যে ক্ষেত্রে বেতারে বহু বিধি-নিষেধের মধ্যে অন্যান্য গ্রন্থগুলি সমালোচিত হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে সাধারণের ক্ষোভ উদ্রেককারী এই গ্রন্থের সমালোচনার নামে দীর্ঘ স্তুতিবাদ এবং প্রসঙ্গত 'শ্রীঘোষ' নামক জনৈক অপরিচিত ব্যক্তি এই গ্রন্থ সম্পর্কে ইতিপূর্বে যে ফতোয়া জাহির করেছিলেন, বার বার সে সম্বন্ধে উক্তি এবং বাংলা ভাষায় বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ দশজন (শরৎচন্দ্র বাদ) গ্রন্থকারের দশখানি গ্রন্থের মধ্যে এই গ্রন্থের স্থান নির্ণয় করে যে বিস্ময়কর বাতুলতা প্রকাশিত হয়েছিল, তা সমস্ত সাহিত্যিকগোষ্ঠীর পক্ষেই মর্যাদাহানিকর। এ ধরণের বালপ্রৌঢ়ির পরিচয় ব্যক্তিগতভাবে কোন সুবিধাবাদীর পক্ষে সম্ভব হলেও, আকাশবাণীর ন্যায় একটি সর্বভারতীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কিভাবে সাহিত্য-সমালোচনার নামে এই কদর্য ও কুরুচিপূর্ণ গ্রন্থের ঈদৃশ প্রকাশ ঘটে, তা সত্যই বিস্ময়কর।

ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস

যখন স্বকপোলকল্পিত কাহিনীর অভাব ঘটে, তখনই কোন প্রাচীন ঘটনার বা ইতিহাসাশ্রিত বিষয়ের মধ্যে ডুব দেন ঔপন্যাসিকরা। সম্প্রতি উক্ত ধরণের উপন্যাসের বিশেষ প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে। অনেক সময় এর দ্বারা কাহিনীর আয়তন বৃদ্ধিরও সুযোগ ঘটে থাকে। সম্প্রতি শোনা যাচ্ছে, রোমাঞ্চ রহস্য ও গোয়েন্দা কাহিনীর রচনায় এ যুগের বিশেষ কৃতী লেখক নীহাররঞ্জন গুপ্তও অন্যান্য ধরণের কয়েকখানি উপন্যাস রচনার পর ঐতিহাসিক কাহিনীর উপর ভিত্তি করে দুইখণ্ডে একখানি বৃহদাকার উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছেন। কিছু অংশ তাঁর ইতিমধ্যেই লেখা হয়ে গিয়েছে। শোনা যায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত কড়ি-কপালে লেখক; তিনি যাতেই হাত দেন, তাতেই সোনা ফলে। দেখা যাক, এই উপন্যাসখানি আকারে ও অর্থোপার্জনে গোদা-গোদা পূর্ব-প্রকাশিত গদিদারদের 'আউট' করতে পারে কিনা।

মহাস্থবির জাতক

স্বর্গত প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'মহাস্থবির জাতক' গ্রন্থের সমূহখণ্ড একত্রে প্রকাশের আয়োজন করেছেন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিঃ। এটি খুবই আনন্দের কথা। ইতিপূর্বে তাঁরা শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত'র চারিটি খণ্ড একত্রে প্রকাশ করে পাঠক সাধারণের বিশেষ সুবিধা করে দিয়েছেন। কিন্তু 'মহাস্থবির জাতক'-এর শেষ অংশ এখনও গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত আছে এবং সেটি আতর্থীমহাশয় মৃত্যুর পূর্বেই নাকি শেষ করে গিয়েছেন।

'ধ্যেৎ' অসভ্য কোথাকার!

এটি একটি গল্পের নাম। কবিতার পংক্তি দিয়ে, গল্পের বিষয়বস্তুর সঙ্গে কোন সংগতি নেই এমন গালভরা মিষ্টি নাম দিয়ে, আমরা বহু গল্পের বিচিত্র নামকরণের নিদর্শন দেখেছি, কিন্তু ঠিক এ ধরণের নাম বিশেষ কোন স্ত্রীলোক লেখিকার লেখায় আমরা দেখেছি বলে মনে পড়ে না। 'নামে কি বা আসে-যায়' উক্তি কথিত থাকলেও 'ড্যা বুড়ীর বগলে হুঁকো', বা 'মাইরী তোর লজ্জা নেই?' গল্পের লজ্জাকর নামকরণ নিশ্চয়ই সুরুচির পরিচায়ক নয়। গল্পটি বেরিয়েছে মাসিক —'কল্লোল' পত্রিকায়।

কহ আমায় কহ

মোহনানন্দ গুপ্ত

ওগো তারা, রাতের তারা, রাতের ছোট্ট তারা,
রাত না হতে নীল আকাশে জাগাও তুমি সাড়া।

স্নিগ্ধ তোমার আলো দিয়ে আলপনাটি আঁকি
মেঘের স্তরে পরাও যেন মুক্তাগাঁথা রাখী।
তব আলোয় বিশ্ব ঘুমায় পাহাড় নদী গাছ,
নিঝুম হ'ল নিখিল ভুবন তোমার মায়ার কাছ।

ও ভাই তারা, রাতের তারা, কহ আমায় কহ,
সকালবেলা কোনখানেতে লুকায়ে তুমি রহ?
দিন ফুরালে হেসে এসে রাতের বার্তা দেহ
ও ভাই তারা, রাতের তারা, কহ আমায় কহ॥
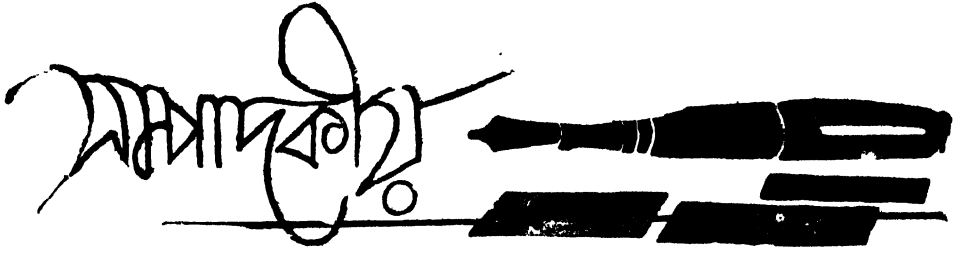
শাস্ত্রীজীর মহাপ্রয়াণ

সুখ এবং দুঃখ—মানব জীবনের এই দুটি বিশেষ অনুভূতিকে আমাদের সমাজে 'দুই ভাই' রূপে তুলনা করা হইয়া থাকে। তাহাদের একতালে চলা, সমান ছন্দে যুগ্ম পদক্ষেপ, সংঘবদ্ধতাই এই তুলনার কারণ। তুলনাটি যে অমূলক নয় তাহার একটি চরম প্রমাণ অদ্যকার প্রভাতী সংবাদপত্রগুলিতে মিলিল। প্রথম পৃষ্ঠায় একটি বিশেষ সুখবর এবং এক অতি বেদনাদায়ক নিদারুণ বার্তা পাশাপাশি স্থানলাভ করিল। বহু বিতর্কিত সমস্যাজর্জরিত তাসখণ্ড সম্মেলনের শান্তিপ্রসূ সাফল্যের সংবাদ জাতির মনে যে-পরিমাণ আনন্দ সঞ্চার করিল, তাহার বহু গুণ অধিক বেদনা সমগ্র জাতিকে স্তব্ধ, বিমূঢ় করিয়া দিল শাস্ত্রীজীর মহাপ্রয়াণের হৃদয়বিদারক বার্তায়।

ভারতের সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্রধানমন্ত্রী পঁয়তাল্লিশ কোটি ভারতবাসীর প্রিয়তম নেতা স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্যতম মহান সৈনিক আচার্য লালবাহাদুর শাস্ত্রী নাই, এ কথা বিশ্বাস করা সহজ নয়। তথাপি ইহা সত্য এবং অতি নিষ্ঠুর মর্মভেদী সত্য। ভারতবর্ষের এই গভীর সঙ্কটকালে যাঁহার বলিষ্ঠ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং গঠনমূলক নেতৃত্ব সারা দেশকে দুর্যোগের ত্রিযাম রাত্রির অন্ধকার অতিক্রম করার শক্তি, সাহস এবং প্রেরণা জোগাইতেছিল পরিপূর্ণরূপে সঙ্কট মুক্তির পূর্বেই তাঁহার আকস্মিক এবং অকাল প্রয়াণের ব্যথা যে কি দুঃসহ এবং মর্মান্তিক তাহা ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য---তাহা অনুভূতিসাপেক্ষ।

নেহরুবিহীন ভারতবর্ষে প্রধানমন্ত্রীর গুরুদায়িত্ব শাস্ত্রীজী যেদিন গ্রহণ করেন ভারতের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে সেদিন ঘোর দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া, আকাশে-বাতাসে সেদিন শুধু ভয়ঙ্করের অভিসার, দুর্যোগের ভয়াল ভ্রূকুটি, সর্বনাশের ইশারা, সেই পরিস্থিতিতে সেই উত্তাল তরঙ্গময়ী বিক্ষুব্ধ সমুদ্রে পঁয়তাল্লিশ কোটি নর-নারীর ভাগ্য সরণির কর্ণধাররূপে মাত্র উনিশ মাসের মধ্যবর্তী স্বল্প সময়ে তিনি যে অনন্যসাধারণ দক্ষতার নিদর্শন রাখিয়া গেলেন সমগ্র আন্তর্জাতিক পটভূমিতেও তাহার তুলনা বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

চরম বিপদের দিনে সমগ্র জাতিকে একতার মন্ত্রে উদ্বোধিত করার এবং দেশপ্রেমে নূতন করিয়া উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে তিনি যে অতুলনীয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিলেন তাহার মধ্যেই তাঁহার বিরাটত্ব এবং ঈশ্বরদত্ত শক্তির প্রমাণ প্রকৃষ্টরূপে নিহিত।

লালবাহাদুর শান্তির মূর্তিমন্ত বিগ্রহরূপে আজ শুধু ভারতের নয়, প্রায় সমগ্র বিশ্বেই পূজিত হইবেন। হিংসা, হানাহানি, লোভ, মত্ততা পৃথিবীকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেওয়ার পর যে কয়জন শান্তিদূত পৃথিবীর তাপদগ্ধবুকে জ্বালাহররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন শাস্ত্রীজীর স্থান তাঁহাদেরই মধ্যে, কিন্তু তিনি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া দেশের মর্যাদা ও সম্ভ্রমের বিনিময়ে তথাকথিত শান্তি ও বন্ধুত্ব অর্জনে মোটেই সম্মত ছিলেন না, যেখানে তিনি অনুভব করিয়াছেন দেশের সম্মান ভূলুণ্ঠিত ও মর্যাদা নষ্ট হইতে চলিয়াছে সেইখানেই তদ্দণ্ডে তাহার প্রতিবিধানে সর্বশক্তি প্রয়োগ করিয়াছেন, আক্রমণকারীকে মর্মে মর্মে বুঝাইয়া দিয়াছেন ভারতবর্ষ বন্ধুভাবাপন্ন মৈত্রীর মন্ত্রে বিশ্বাসী বটে কিন্তু সে দুর্বল নয়, অন্যায় আক্রমণ নীরবে বরদাস্ত করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয়। পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ভারতের বিরুদ্ধে অঘোষিত আক্রমণে সমগ্র পৃথিবী উপলব্ধি করিয়াছে যে খর্বাকৃতি, স্বল্পভাষী, সংযত মানুষটি প্রয়োজনে কতখানি বজ্রকঠোর হইতে পারেন এবং কি অমিতশক্তি তাঁহার আয়ত্তে আর পঁয়তাল্লিশ কোটি ভারতবাসীও নূতন করিয়া বুঝিল যে অমায়িক, মিষ্টভাষী ও বিনয়, নম্রতা ও সৌজন্যবোধের মূর্তপ্রতীক লালবাহাদুর শাস্ত্রীর নেতৃত্ব ভারতের কি বিরাট কি মহামূল্য সম্পদ।

দুর্ভাগ্য সমগ্র দেশবাসীর—সেই মহামূল্য সম্পদ হইতে আজ তাহারা বঞ্চিত, যে-সময়ে তাঁহার প্রয়োজন ছিল সর্বাধিক সেই চরম মুহূর্তেই, দূর বিদেশে, স্বজনবিহীন পরিবেশে, প্রচণ্ড শীতের এক অন্ধকার রাত্রির নিস্তব্ধতায় তাঁহার জীবনে মৃত্যুর পদসঞ্চার শ্রুত হইল। যাঁহার কল্যাণে সারা জাতির হৃদয় বহু দুঃখের দুস্তর সমুদ্র অতিক্রমণের পর সমৃদ্ধির সম্ভাবনাময় তীরে উপনীত হওয়ার আশা-আলোক তিলে তিলে দীপ্ত হইতে দীপ্ততর হইয়া উঠিতেছিল—পঁচিশে পৌষের অন্ধ রজনীর একটি মুহূর্ত সেই উজ্জ্বল আলোকপুঞ্জকে ফুৎকারে নির্বাপিত করিয়া দিল।

আমাদের সম্মুখে এখন বহু সমস্যা, বহু দায়িত্ব, বহুবিধ কাজ, শাস্ত্রীজী কায়িকভাবে আমাদের মধ্যে বর্তমান না থাকিলেও আমাদের কর্মে, আমাদের চেতনায়, আমাদের জীবনে জীবনে তিনি আরও অধিকতর শক্তিতে, ঔজ্জ্বল্যে এবং দীপ্তিতে বিরাজমান—

এই অনুভূতিই এই বিষাদঘন মুহূর্তে আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা, আমাদের একমাত্র প্রেরণা।

তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই নমস্কার, তাঁহার অনবদ্য কীর্তির উদ্দেশে উৎসর্গ করি প্রণতি, তাঁহার দুশ্চর কালজয়ী তপস্যার উদ্দেশে নিবেদন করি ভক্তিপূত মনের শ্রদ্ধার অর্ঘ্য।

মমের মহাপ্রয়াণে

জগতের রঙ্গমঞ্চ আবার অনেকখানি নিষ্প্রভ হইয়া গেল। বিরানব্বই বৎসরব্যাপী অবস্থানের পর তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন আরও একজন মহাশক্তিমান নট। এ কালীন বিশ্বসাহিত্যের সম্রাটস্বরূপ উইলিয়াম সমারসেট মম পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিলেন। রাখিয়া গেলেন অনবদ্য সৃষ্টি এবং বহন করিয়া লইয়া গেলেন বিশ্ববাসীর বিপুল শ্রদ্ধা এবং প্রণতি।

এ যুগের সাহিত্যের যুগবিবর্তনের নায়ক যাঁহারা মমের স্থান তাঁহাদেরই দলে। একটি যুগের অবসান এবং আর একটি যুগের আবির্ভাবের সন্ধিস্থলে ইঁহারা উভয়যুগের মধ্যবর্তী সেতুস্বরূপ বিরাজমান, সেই কারণেই তাঁহাদের সৃষ্টি এত লাবণ্যময়, বৈচিত্র্যে ভরপুর, সম্ভারে পরিপূর্ণ। যাঁহাদের রচনা কালোত্তীর্ণ বিশ্বসাহিত্যের সূচীপত্র বর্ধিত হইতে বিবর্ধিত করিয়াছে, সাধারণ মানুষকে চিন্তার জগতে উপনীত করিয়াছে পাঠকের মনের পরিধিকে বিস্তৃত হইতে বিস্তৃততর করিয়া তুলিয়াছে মম নিঃসন্দেহে তাঁহাদেরই একজন।

তাঁহার সারা জীবনের ইতিহাস নেত্রপাত করিলে দেখা যায় যে, সে ইতিহাসের অধ্যায়ে অধ্যায়ে, পাতায় পাতায়, পংক্তিতে পংক্তিতে বৈচিত্র্যের সমাবেশ, নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভাগ্য তাঁহাকে তাঁহার প্রথম জীবনে কখন কিভাবে কোন দিকে লইয়া গিয়াছে তাহা ভাবিলে বিস্ময়ের অবধি থাকে না। বাল্যকালে পিতৃমাতৃহীন আত্মীয়ের অভিভাবকতায় ক্রমবর্ধমান মমের প্রথম জীবনের ভাগ্যাকাশ নির্মল মেঘমুক্ত ছিল না, সে আকাশে ছিল কালো মেঘের ঘনঘোর, অদৃষ্টদেবীর প্রসন্ন হাসি সেদিন তাঁহার জন্য বরাদ্দ ছিল না, প্রতি পদে পদে সেদিন আসিয়াছে বাধা, অস্বাচ্ছন্দ্য, কিন্তু নিয়তির নির্মমতার ভ্রূকুটি জীবনযাত্রার দুঃসাহসী পথিককে ভীতকম্পিত করিতে পারেন নাই। ঝড়ের রাতের অভিসারী এই বিচিত্র মানুষটি নিছক ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করিয়া ছকে বাঁধা পথে পা ফেলেন নাই। অবশেষে একদিন এই অক্লান্ত জীবনযোদ্ধার জীবনতরণী সাফল্যের মোহানায় উপনীত হইল, নিয়তি অবনতমস্তকে বিজয়ী বীরের নিকট পরাজয় স্বীকার করিলে ধীরে ধীরে এক এক করিয়া পৃথিবী লাভ করিল অব হিউম্যান বণ্ডেজ, রেজার্স এজ, পেণ্টেড ভেল, মুন এ্যাণ্ড দ্য সিক্স পেন্স, ক্যাটালিনা প্রভৃতি আরও বহু অনবদ্য গ্রন্থ-জগতের কালজয়ী সঞ্চয়ের ভাণ্ডার আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সাহিত্যক্ষেত্রেও তিনি প্রথম জীবনে নিয়তির আঘাত অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রথম দিককার সাহিত্য সাধনা ক্রমাগত ব্যর্থতা ও বিরূপ সমালোচনার ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। ("he wrote and wrote and wrote and starved and starved and starved")

মমের সমগ্র সাহিত্যসম্ভারে অত্যুজ্জ্বল দীপ্তিতে প্রকাশিত জীবনদর্শনই মুখ্যত পাঠকচিত্তে রেখাপাত করে। মমের জীবনভাষ্য বা অধ্যাত্মচেতনা অপ্রিয় হইলেও মিথ্যা নয়, সর্বসাধারণের এমন কি অনেক বিদগ্ধ জনের দ্বারাও উপলব্ধ নয়। তাঁহার জীবনদর্শনের যথার্থ ভাষ্য বহু কৃতী পুরুষের সমালোচনাতেও অনুপস্থিত। সেই জীবনদর্শনের স্বরূপ অনেকেরই দৃষ্টি ও জ্ঞানের অগোচরে থাকিয়া গিয়াছে। নাস্তিক বলিয়া আপাতদৃষ্টিতে তিনি প্রতিভাত হইলেও তাঁহার রচনার গভীরে প্রবেশ করিলে এবং তাঁহার বক্তব্যের মূল সুরটি সম্যক অনুধাবন করিলে স্পষ্ট বোঝা যাইবে যে, আসলে তিনি আস্তিকের শিরোমণি। তিনি জীবন দেবতার উপাসক, তিনি জীবের মধ্যে শিবকে সন্ধান করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের পটভূমিতে অতীন্দ্রিয় জগতের প্রতিষ্ঠার কার্যে সচেষ্ট হইয়াছেন। ঈশ্বর মানেই চার্চ নয় আর চার্চ মানেই ঈশ্বর নয়—ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রেমে, ভালবাসায়, কর্মে—ইহাই মমের মূল জীবনদর্শন, ইহাই তাঁহার জীবনসত্য।

১৯৬৫ সালের প্রারম্ভে নশ্বর পৃথিবীর সহিত পার্থিব সম্পর্কচ্ছেদ করিয়াছেন কবি এলিয়ট এবং ইতিহাসপুরুষ চার্চিল, শেষভাগে গেলেন মানবপ্রেমিক সোয়াইটসার, সর্বশেষে গেলেন মনস্বী মম, লক্ষণীয় এই যে, চার্চিল এবং মম উভয়ে জন্মগ্রহণও করিয়াছেন একই অব্দে।

মমের মহাপ্রয়াণে ভারতের বেদনায় একটি বিশেষ কারণও আছে। ভারতের সহিত তাঁহার মানসিক যোগটি ছিল দৃঢ় এবং ঘনিষ্ঠ। মমের জীবনের সন্ধানপর্বে সর্ববিধ অতৃপ্তি হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিল ভারতীয় দর্শন। ভারতীয় দর্শনের মধ্যেই তিনি তাঁহার জীবন-জিজ্ঞাসার প্রাঞ্জল উত্তর পাইয়াছিলেন, সেই বিচারে মম ভারতের একান্ত আপন জন। প্রসঙ্গত উল্লেখনীয়, ভারতের অন্যতম পূজ্য মহাকবি মধুসূদনের জন্মের অর্ধশতাব্দী পূর্তিদিবসে মমের। জন্ম।

সুপরিণতবয়সে মম মহাপ্রস্থান

করিলেন এবং মৃত্যু অপেক্ষা জীবনের বড় সত্য ও সুনিশ্চিত পরিণতি আর দ্বিতীয়টি নেই সেদিক দিয়া মমের মৃত্যু পরম গৌরবের—তবে, তাঁহার লোকান্তরযাত্রায় বিশ্বমনীষী মেলা হইতে যে-বিরাট ব্যক্তিত্ব অপসৃত হইলেন সে শূন্য আসন পূরণ হইবার নয়, এবং এই অভাব পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ভাণ্ডারে এক বিশাল শূন্যতার সৃষ্টি করিবে, এই ভাবিয়া আমরা শোকসন্তপ্ত। তাঁহার আত্মার শান্তি কামনা করি।

সফল তাসখণ্ড সম্মেলন

সমসাময়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি সারা ভারতবাসীর দৃষ্টি পৃথিবীর কেবল একটি জায়গাতেই স্থিরনিবদ্ধ ছিল। সে জায়গাটি ভারতের কোন অংশ নয়। তাহা সোভিয়েট রাশিয়ার অন্তর্গত তাসখণ্ড। ভারত-পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান সমস্যার সমাধানকল্পে সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিনের মধ্যস্থতায় তাসখণ্ডে ভারত ও পাকি- স্তানের এক আলোচনা-বৈঠক আহূত হইল।

আশা-নিরাশার দোদুল-দোলায় বৈঠকের আরম্ভ। কোটি কোটি নর-নারীর মনে উৎকণ্ঠার অন্ত নাই, "কি হবে, কি হবে" ভাব। বৈঠকের সাফল্যই অগণিত নরনারীর অন্তরের আকুল কামনা। বৈঠক ব্যর্থ হইলেই সর্বনাশ—উভয় দেশের সম্পর্ক যে তখন কি পরিণতি লাভ করিবে তাহা ভাবিলে কূলকিনারা পাওয়া যায় না। ভারতীয় জনগণের মনের অবস্থা যখন এরূপ তখন আলোচনা বৈঠক সুরু হইল।

স্বাভাবিক গতিতে এ বৈঠক অগ্রসর হয় নাই, কখনও কখনও সাফল্যের দ্বার অতিক্রম করার ক্ষেত্রে এই সম্মেলনকে প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, তাহাতে সাধারণ মানুষের আশঙ্কা ও উদ্বেগও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে বহুগুণ। শেষে সর্বপ্রকার আশঙ্কা ও উদ্বেগের অবসান ঘটাইয়া উভয় দেশের কর্ণধারদ্বয় এক সন্তোষজনক মীমাংসায় উপনীত হইলেন। সম্মেলন সফল হইল। ভারত-পাকি-স্তানের সম্পর্কের ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় রচিত হইল। সূত্রপাত হইল নবযুগের উন্মুক্ত হইল এক নব দিগন্তের দুয়ার।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ স্বাক্ষরিত যৌথ ইস্তাহারে ঘোষিত হইল যে, উভয় দেশের সশস্ত্র ব্যক্তিদের ২৫-এ ফেবরারির মধ্যে তাঁহারা গত ৫ই আগষ্টের পূর্বে যে যে স্থানে অধিষ্ঠিত ছিলেন সেই সেই স্থানে ফিরাইয়া লইতে হইবে এবং উভয় পক্ষই যুদ্ধ-বিরতি রেখায় যুদ্ধ-বিরতি সর্ত মান্য করিয়া চলিবে, স্থির হইল যে, পরস্পর পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবে না।

এই সম্মেলনে আরও স্থির হইল যে, উভয় রাষ্ট্রই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যুদ্ধবন্দী বিনিময়ের নির্দেশ দান করি বেন এবং উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে প্রচারে উৎসাহ দিবেন না এবং পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নয়নমূলক প্রচারে সর্বদা সহযোগিতা ও উৎসাহ উভয়রাষ্ট্রই প্রদর্শন করিবেন।

সমগ্র বৈঠকটির মূল উদ্দেশ্যই ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। বহু বিষয়ে শাস্ত্রীজী ও আয়ুব খাঁর মতৈক্য উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ স্বস্তি ও আনন্দ দান করিল, এই মতৈক্যই বৈঠকের সাফল্যের একটি অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন।

দীর্ঘকাল ধরিয়া ভারত ও পাকি স্তানের সম্পর্ক তিক্ত হইতে তিক্ততর হইয়া উঠিতেছিল, তাসখণ্ড সম্মেলনে আশা-নিরাশা আলো-আঁধারির মধ্যে যে সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হইল সেগুলি শুধু উভয় দেশের শুধু রাজনৈতিক সম্পর্কই নয়, বাণিজ্যিক এবং সাংস্কৃতিক সম্পর্কও উত্তরোত্তর আরও ঘনিষ্ঠ এবং উন্নত করিয়া তুলিব।

পরম কল্যাণের বার্তাবহ এই বৈঠকটির সাফল্যের জন্য আর একজনও আজ ভারত-পাকিস্তান—উভয়রাষ্ট্রেই ষাট কোটি নরনারীর ঐকান্তিক ধন্যবাদ ও স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দনের অধিকারী। তিনি সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান-মন্ত্রী শ্রীকোসিগিন। দুই দেশের মধ্যে এক মিলনের প্রীতির, সহাবস্থানের সেতুবন্ধনে তিনি যে উদারতা এবং অপরিসীম নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বিস্ময়কর। এই বৈঠকটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার ক্ষেত্রে, ইহার পরিপার্শ্ব হইতে সর্বপ্রকার প্রতিকূলতা দূরীভূত করার ক্ষেত্রে যে-অতুলনীয় ক্লেশ স্বীকারের ও যথেষ্ট ধৈর্যের পরিচয় তাঁহাকে দিতে হই-য়াছে তাহাও অনস্বীকার্য।

দীর্ঘকালীন বিবাদ বিসম্বাদের এই পরম আনন্দময় পরিণতির পুণ্যমুহূর্তেও সারা ভারতবাসী আজ শোকার্ত। এই বৈঠকের অন্যতম নায়ক ভারতের জনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী বৈঠকের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেহান্তরিত হইলেন। তাঁহার এই আকস্মিক প্রয়াণ সারা ভারতবাসীর মনে যে নিদারুণ আঘাত আনিল তাহার প্রভাবে সমস্ত আনন্দই আজ ম্লান। দেশের অতীব দুর্দিনে তিনি যেভাবে জাতিকে রক্ষা করিয়া-ছেন তাহার দ্বারা তাঁহার মানসিক দৃঢ়তা, বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা সর্বতোভাবে প্রমাণিত। তাসখণ্ড সম্মেলন তাঁহার নশ্বরজীবনের এক অবিনশ্বর কীর্তি বলিয়াই ইতিহাসে বিবেচিত হইবে। এই সম্মেলনের মাধ্যমেই অশান্তি, হিংসা, হানাহানি, মত্ততার জগৎ হইতে আলোকের, সম্ভাবনার সমৃদ্ধির কল্যাণের জগতে উত্তরণের

সন্ধান তিনি দিলেন। মূর্তিমান শান্তিদূত শান্তির পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের শান্তির প্রতিষ্ঠায় পৃথিবীকে পুনরায় লাবণ্যমণ্ডিতে পরিণত করার সাধনায় আরও একধাপ অগ্রসর হইলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এই বৈঠকের সাফল্যে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী মি: উইলসন এবং মার্কিন রাষ্ট্রপতি মি: জনসনও যথেষ্ট আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন।

তাসখণ্ড বৈঠকের সর্তগুলি যাহাতে যথাযথ পালিত হয় আজ সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা উভয় রাষ্ট্রের নায়কবৃন্দের বিশেষ কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। আমরা প্রার্থনা করি যে, এই সম্মেলনে গৃহীত কোটি কোটি মানুষের পক্ষে পরম কল্যাণকর এই সিদ্ধান্তগুলি কার্যে পরিণত হউক। চুক্তির সর্তগুলি অক্ষরে অক্ষরে পালিত হউক এবং উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক প্রীতি ও সৌহার্দ্য বলিষ্ঠ, অটুট এবং চিরস্থায়ী হইতে থাকুক।'

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রথম বাঙ্গালী

আন্তর্জাতিক বর্ষারম্ভ দিবসের উজ্জ্বল প্রভাতে সংবাদপত্রসমূহ যে সংবাদ শীর্ষদেশে বহন করিয়া পাঠকদের নিকট পৌঁছাইয়া দিল—সেই সংবাদ বাঙালী পাঠক-পাঠিকামাত্রকেই উল্লাসে পূর্ণ করিবে ইহাতে সন্দেহ নাই। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর পদে একজন বাঙালীর এই প্রথম নিয়োগের গৌরবে সারা বাঙলা সমান অংশগ্রহণ করিবে এ সম্বন্ধে কোনপ্রকার অস্পষ্টতা থাকিতে পারে না।

লোকসভার সদস্য ও কলিকাতা হাইকোর্টের কৃতী ব্যারিস্টার শ্রীশচীন চৌধুরীর নাম ভারতের নূতন অর্থমন্ত্রী হিসাবে ঘোষিত হইল। সংবাদটি ঘোষিত হওয়া মাত্রই সমস্ত বাঙলা দেশে যে আনন্দ এবং উদ্দীপনার প্লাবন বহিল তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না।

বিদায়ী অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী পদত্যাগ করিলেন। কয়েকদিন ধরেই অবশ্য শোনা যাইতেছিল যে কৃষ্ণমাচারী আর অধিককাল মন্ত্রী থাকিবেন না। তিনি শীঘ্রই পদত্যাগ করিতে পারেন। সম্প্রতি তাঁহার কার্যাবলী বহু বিরূপ সমালোচনার জন্ম দিয়াছে। তাঁহার বিরুদ্ধে একটি স্মারকপত্রও রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হইয়াছে। যে নীতি তিনি অনুসরণ করিতেছিলেন তাহা অনেকেরই বিচারে ভ্রান্ত এবং জাতীয় কল্যাণের অন্তরায়। অর্থমন্ত্রী হিসাবে কৃষ্ণমাচারী ইতঃপূর্বেও একবার ইস্তফা দিয়াছিলেন, সেবারও লোকনিন্দার সম্মুখীন তাঁহাকে হইতে হইয়াছিল। সেবারেও নির্ঝঞ্ঝাট অবস্থায় তিনি পদত্যাগ করিতে পারেন নাই।

শ্রীচৌধুরীর এই নবপদ প্রাপ্তিতে আমরা তাঁহাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভকামনা জানাই। ভারত সরকারের সর্বাপেক্ষা দায়িত্বপূর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রকের ভার আজ তাঁহার হস্তে অর্পিত হইল। প্রতি পদে বাধা, প্রতিবন্ধকতা এবং অসংখ্য সমস্যা। তাঁহার কুশলী হস্তে এবং প্রখর বুদ্ধি ও দূরদর্শিতার দ্বারা আমরা প্রার্থনা করি সর্বপ্রকার বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া এই মন্ত্রকটি পরিচালিত হউক ও তাহার ফলে ভারতীয় জনগণের কল্যাণ সাধিত হউক। এই মন্ত্রকটি জাতীয় জীবনের সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সর্বক্ষেত্রেই ইহার সংযোগ অনিবার্য। সে ক্ষেত্রে যিনি ইহার শীর্ষে থাকিবেন তাঁহার নিকট দেশবাসীর অনেক প্রত্যাশা। ভারতবর্ষের জাতীয় ভাগ্যাকাশ এখন সমস্যা-মেঘমুক্ত নয়। একাধিক ক্ষেত্রে আমাদের বিদেশের সাহায্য প্রত্যাশা করিতে হয়। সেজন্য স্বনির্ভর হইবার জন্য আমাদের অনেক পরিকল্পনা কিন্তু সব কিছুরই রূপলাভ নির্ভর করে অর্থের উপর। সেই বিরাট দায়িত্বপূর্ণ মন্ত্রকের শীর্ষে আজ যিনি সমাসীন হইলেন তাঁহাকে ঈশ্বর শক্তি দান করুন এই গুরুদায়িত্ব পালনের। তাঁহার মন্ত্রিত্বকাল কৃতিত্বের এবং জনকল্যাণের এক দৃষ্টান্তস্বরূপ ভবিষ্যতে উজ্জ্বল হইয়া থাকুক—ইহাই আমাদের কাম্য।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করি যে শ্রীচৌধুরীর পূর্বসূরীগণেরির প্রত্যেককেই কার্যকাল অতিক্রান্ত হইবার পূর্বেই পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। শ্রীচৌধুরীর ক্ষেত্রে ইহার ব্যতিক্রম ঘটুক—ইহাও আমরা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।

শোভাযাত্রায় নগরবাসীর দুর্ভোগ

শুধু অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বেকারিত্বই নয় কলিকাতাবাসীকে আজকাল আরও এক গভীর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হয়। পথ চলাচলও আজ এক নিত্য সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। বিশেষত অপরাহ্নে স্বভাবতই যে সময় পথে চলমান লোকসংখ্যা আধিক্য লাভ করে সেই সময়ে এই সমস্যা আরও ব্যাপকতা ও সম্প্রসারণ লাভ করে। একে তো বৃষ্টি পড়িলে অধিকাংশ পথই জলমগ্ন হইয়া থাকে, জল নিকাশন হইতে অনেক সময় অতিক্রান্ত হইয়া যায়, কিন্তু তবুও পথঘাট শুষ্ক থাকিলেও রেহাই নাই। দীর্ঘ সারিবদ্ধ মিছিলের কৃপায় পথ পারাপার একেবারে অসম্ভব হইয়া ওঠে বলিলেই চলে।

মিছিলেরও প্রয়োজন আছে। তাহার গুরুত্বও অস্বীকার করা চলে না। বিদেশী শাসনের যুগে এক একটি ইংরেজী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সারিবদ্ধ মিছিল বিদেশী রাজকায়েম দৃঢ় আসনকে

ইয়া দিয়াছে। এক অভূতপূর্ব ীয়তামূলক চেতনার সঞ্চার য়াছে সাধারণ্যে, সমগ্র দেশ-কে উদ্বোধিত করিয়াছে দেশ-ীর মুক্তির সংগ্রামে, সেই বিচারে লের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মিছিলের মে নানা শিল্প সাংস্কৃতিক ও ানন্দদায়ক বস্তুর সারিবদ্ধ গতি ষের মনে এক অভিনব ভাবের র করে, মন পূর্ণ করিয়া তোলে। মিছিল যদি নিত্য-নৈমিত্তিক ার হইয়া দাঁড়ায় এবং প্রায়শ যর গতি বিঘ্নিত করে তখনই সমস্যায় পরিণতি লাভ করে। র্ণ, কোলাহলময় প্রাণচঞ্চল রাজ লির স্পন্দন সহসা যেখানে য়া যায় এবং অগণিত জনসাধারণ দুর্ভোগের সম্মুখীন হন সেখানে কে সমর্থন করা চলে না।

যে-কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া মিছিলের সৃষ্টি হয় এবং তাহা আয়তনে দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর থাকে এবং তাহার ফলে মানুষের দন জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, ন মিছিলেরও উদ্দেশ্য সিদ্ধ । জনসাধারণের সমর্থন সেখানে না, থাকে বিরক্তি।

াহারা হঠাৎ হঠাৎ মিছিল পরি-বা পরিকল্পনা করেন তাঁহা-উদ্দেশ্যে ইহাই বলিবার আছে তাঁহাদের সমস্যা এবং অভিযোগ ই আমরা অস্বীকার করি না তাঁহাদের যে দাবীর পিছনে র সমর্থন আছে তাহা নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হউক—এ কামনা জনসাধারণ যেমন সর্বান্তঃকরণে করেন, তেমনই জনজীবনের শান্তি অব্যাহত রাখার দায়িত্ব নাগরিক হিসাবে তাঁহাদেরও তো আছে। তাঁহারা যদি কাণ্ডজ্ঞান শূণ্য হইয়া যখন তখন বড় বড় রাজ-পথে ব্যস্ততার মুহূর্তে মিছিল বাহির করিয়া জনজীবন বিপর্যস্ত করিয়া তোলেন তাহা হইলে জনসমর্থন তাঁহারা কি করিয়া লাভ করিবেন, শুধু তাহাই নয়; সাধারণ মানুষের ক্ষতিসাধন করার অধিকারও তাঁহাদের নাই। সে দিক দিয়াও ইহা অন্যায়।

এই জাতীয় মিছিল কিভাবে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেই অবগত আছেন সমস্ত যানবাহনাদি অচল হইয়া এক বিরাট পংক্তির সৃষ্টি করে, মোড় পারাপার অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহার 'পর যাঁহাদের ট্রেন বা প্লেন ধরিবার কথা, তাঁহাদের রীতিমত বিপদ—সর্বো-পরি হাসপাতালমুখী রোগী বা যন্ত্রণা-কাতর প্রসূতির কি অবস্থা হয়, সে সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিবার কি কিছুই নাই! জনসাধারণ কি অপরাধ করিয়াছেন যাহার জন্য নিত্য তাঁহাদের এই দুর্ভোগের সম্মুখীন হইতে হইবে।

আমাদের চোখের সামনে সেদিন একটি ঘটনা ঘটিয়া গেল ধর্মতলা ষ্ট্রীটের উপর। এক চিকিৎসক একটি বালিকাকে লইয়া চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে যাইতেছেন, বালিকাটির দেহ রুধিরে প্লাবিত, দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে পাছে মিছিলকারীদের অবিশ্বাস হয়, সেজন্য তিনি বালিকাটিকে সঙ্গে লইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া করযোড়ে মিনতি করিলেন অনুগ্রহপূর্বক (?) তাঁহার গাড়ীটিকে মোড় পার হইতে দেওয়ার। মিছিলকারিগণ সে অনুনয়ে কর্ণপাতও করিল না। যতক্ষণ সেই দীর্ঘ মিছিল চলিতেছিল ততক্ষণ অসহায় চিকিৎসককে অপেক্ষা করিতে হইল আর বালিকাটির দেহরক্তে ও যন্ত্রণাকাতর কান্নায় তখন একাকার।

এক একটি বিবাহের মিছিলেও অনুরূপই অবস্থাই ঘটে। একজনের আনন্দের পথ প্রশস্ত হয় দশ জনের সর্বনাশে।

কিন্তু সরকারপক্ষের কি কিছুই এখানে করিবার নাই? আরক্ষাবাহিনী কি নীরব দর্শক হইয়াই থাকিবেন? শুধু রাইটার্স বিল্ডিংস বা লাল বাজারে ১৪৪ ধারা জারি করিলেই কি তাহা সমগ্র কলিকাতার উপর প্রযোজ্য হইল? তারা কলিকাতার মানচিত্র আরও অনেক বড়, অনেক বিরাট, অনেক বিশাল।

মিছিল বর্জন চলে না তাহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু ঘন ঘন যখন তখন শোভাযাত্রার মাধ্যমে নগর-বাসীকে দুর্ভোগের সম্মুখীন করা যাহাতে অবিলম্বে প্রতিরোধ হয় সে সম্বন্ধে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে সরকার ও পুলিশবাহিনীকে আমরা জনগণের কল্যাণের জন্যই বিশেষ অনুরোধ জানাইতেছি।

—২৬এ পৌষ, ১৩৭২।

শোক সংবাদ

খ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ গিরীন চক্রবর্তী ই পৌষ ৫৭ বছর বয়েসে লোকান্তর করেছেন। পূর্ববঙ্গের পল্লীগীতি জরুল সঙ্গীতের গায়ক হিসাবে ইনি রণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ভাগের পূর্বে পর্যন্ত ইনি ঢাকা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন! কয়েকটি ছায়াচিত্রের সঙ্গীত পরিচালক হিসাবেও ইনি সুনাম অর্জন করেন। * * * বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী কিশোরী রায় গত ১লা পৌষ ৫১ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর শিল্প-প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। পরবর্তী জীবনে চিত্র-শিল্পের ক্ষেত্রে ইনি যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শনে সক্ষম হন। শিল্পী হিসাবে ইনি স্বর্গত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছাত্র এবং সরকারী শিল্প ও কারু মহা-বিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক ছিলেন।

সম্পাদক—প্রাণতোষ ঘটক

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড: কলিকাতা, ১৬৬নং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট হইতে শ্রীসদ্কুমার

পাঠক পাঠিকার চিঠি

পত্রিকা সমালোচনা

সবিনয় নিবেদন---

মহাশয়, কার্তিক ১৩৭২ সালের মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের 'বিশ্বাস যদি নাই করেন' শীর্ষক প্রবন্ধ পড়ে আমার খুব ভাল লেগেছে। ঐ প্রবন্ধের শেষ-ছত্রের তিন উপরের ছত্রে যেখানে লেখক লিখছেন কিছুদিন আগে কোন এক সময় আমি একজন বিশেষ শক্তিসম্পন্ন ও জ্ঞানী সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পেয়েছিলুম। ইনি একাধারে সাধক ও সুসাহিত্যিক এবং মহাযোগী। ইনি শ্রীঅরবিন্দের 'দিব্যজীবন' মহাগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেছেন এবং সমগ্র ঋগ্বেদের ভাষ্য প্রণয়নে ব্যস্ত আছেন। 'আমি এই জ্ঞানী সন্ন্যাসীর সম্বন্ধে জানতে বিশেষ আগ্রহী। কারণ আমি তাঁর সঙ্গে পত্রালাপ করতে চাই বিশেষ কোন কারণে। যদি আপনার এই সন্ন্যাসীর নাম এবং ঠিকানা জানা থাকে তাহলে অনুগ্রহপূর্বক জানালে আমি বড়ই উপকৃতা হইব। যদি আপনি জানাতে অক্ষম হন তাহলে দয়া করে লেখক মণীন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের ঠিকানা পাঠাবেন। আমি লেখকের কাছ থেকে জেনে নেব---আশা করি, লেখকের ঠিকানা জানানোতে আপনার আপত্তির কোন কারণ নেই। আপনাকে বিরক্ত করার জন্য দুঃখিত। নমস্কারান্তে---শ্রীনীলিমা মুখোপাধ্যায়, ১২, বলরাম বসু সেকেণ্ড লেন, কলি-২৩।

মহাশয়,

বসুমতী নবরূপায়ণে বিশেষ পরিশীলিত ও রুচির ধারাবাহী হওয়ায় আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন। বর্তমান সংখ্যাটি আমার কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় বোধ হইয়াছে। দেবী ভট্টাচার্যের সার্থক স্বচ্ছন্দ অনুবাদ কবিতার রসধারাটিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে। এজন্য অনুবাদক ধন্যবাদার্হ, তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ দিবেন। আপনি আরও অনুবাদ, সার্থক বাঞ্ছিত অনুবাদ ছাপাইয়া পাঠকচিত্ত রসসিক্ত করিতে থাকুন। সামসুল হকের কবিতা ও শক্তি মুখোপাধ্যায়ের কবিতাও আমার কাছে বিশেষ রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। কবিদ্বয়কে আমার অভিনন্দন। বিষ্ণু দে'র কবিতা নিঃসন্দেহে একটি শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ---বসুমতীর। ব্যক্তিগতভাবে সুলেখা দাশগুপ্তাকে আমার ধন্যবাদ দিবেন। তাঁহার অনুপম হৃদয়গ্রাহী উপন্যাসটি সাগ্রহে পড়িতেছি। আর কি। প্রীতি শুভেচ্ছান্তে। ইতি---নগেন্দ্রনাথ চট্টো: ১১নং চণ্ডী ঘোষ রোড, কলিঃ---৪১।

মহাশয়,

আমি বসুমতীর একজন অনুরাগিণী গ্রাহিকা ও পাঠিকা। মাসিক বসুমতীর জন্মক্ষণ থেকেই আমার সঙ্গে তার পরিচয়, মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন হলেও প্রায় একটানা ৪৩ বছর ধরেই সম্পর্ক রেখেছি এবং তার কারণ মাসিক বসুমতীর গুণেই এ কথা বলাই বাহুল্য। সম্পাদক বদল হয়েছে কিন্তু মাসিক বসুমতীর ধারাটি ঠিক একভাবেই আছে। আজকালকার দিনে মাসিক বসুমতীই একমাত্র মাসিক পত্রিকা যার পুরাতন ঐতিহ্য একভাবেই আছে। এর চিঠিপত্র বিভাগটি অতি মূল্যবান। শুধু একটু অনুযোগ আপনার কাছে সুলেখা দাশগুপ্তর লেখা 'হৃদয়পাত্রে' বন্ধ রাখেন কেন? ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তর 'তালপাতার পুথি' সম্বন্ধেও একই অভিযোগ। 'বাঙালী মঞ্জিল'' বন্ধ করে দিলে কোন ক্ষতি নেই, যেমন 'কিংশুক রাগিণী' শেষ হওয়ায় পাঠকরা বেঁচেছেন। অবশ্য আমার এ কথা বলা উদ্দেশ্য নয় যে প্রত্যেকটি লেখা একই উৎকর্ষের স্বাক্ষর রাখবে, কারণ সাহিত্য পত্রিকা নদীর স্রোতের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। যাই হোক ঐ বন্ধ রাখা উপন্যাস দুটি বন্ধ রাখবেন না। কৃষ্ণা বসুর লেখা রঙিন কাহিনী খুব ভালো আর প্রণতি মুখোপাধ্যায়ের 'পূর্ণ-প্রাণে চাবার যাহা' খুব সুন্দর। এমন ভালো ভালো বিদেশী উপন্যাসের অনুবাদ আরো দেখবো আশা করি। যা তা মৌলিক বাংলা উপন্যাসের থেকে ঐ রকম অনুবাদ অনেক ভালো। নমস্কারান্তে---অলকা দেবী। মণীন্দ্র মিত্র সরণি, বাগবাজার, চন্দননগর।

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, আমরা 'মাসিক বসুমতী'র নিয়মিত পাঠকবৃন্দ; কয়েক বছর যাবৎ 'মাসিক বসুমতী' পড়িয়া আসিতেছি; আমরা 'মাসিক বসুমতী'র শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। 'মাসিক বসুমতী'র মূল্য-বৃদ্ধিতে আমাদের কোন দুঃখ নাই, বরং সহানুভূতি রহিল। সাহিত্য মূল্য ও যুগশিক্ষার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখিয়া ''বসুমতী'' যদি বিংশ শতাব্দীর রুচিশীল মাসিক পত্রিকা হিসাবে বাংলা সাংস্কৃতিক কাহেমী আসন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চেষ্টা করে, তাহলে চিরকৃতজ্ঞ বোধ করিব। সম্পাদক মহাশয়ের কাছে ইহাই আমাদের কামনা।

হ্যাঁ, ভাল কথা, আমাদের কিছু 'সাজেশন' আছে; শুনিয়া কাজ করিলে বড়ই কৃতজ্ঞবোধ করিব। 'অনুবাদ সাহিত্য' নামে একটি বিভাগ খোলা হোক এবং তাহাতে 'অনুবাদ সাহিত্য' নিয়ে আলোচনা করা হোক। 'ছোট গল্প' বাংলা সাহিত্যে নূতন বাঁক নিতে চেষ্টা করছে, নবীন ও প্রবীণ লেখকদের পরীক্ষামূলক ছোট গল্প (একটি করিয়া দু'টি) প্রত্যেক মাসের 'বসুমতী'তে বাহির করিলে বাধিত হইব।

প্রত্যেক মাসে একটি করিয়া বিদেশী গল্পের অনুবাদ 'মাসিক বসুমতী'তে বাহির করিলে বাধিত হইব।

ধারাবাহিক উপন্যাসের পাতাগুলো অবশ্যই বাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ প্রত্যেক মাসের 'বসুমতী'তে যে ধারাবাহিক উপন্যাস বাহির হয়, সেগুলো ৪।৫ পাতা করে থাকাই উচিত। নচেৎ পাঠকদের মনে রঙ ধরতে চায় না। বর্তমানে যেসব উপন্যাস 'মাসিক বসুমতী'তে বাহির হইতেছে, আগামী দিনের 'মাসিক বসুমতী' গুলোতে যেন তার ছিটেফোঁটা চিহ্ন না থাকে। অর্থাৎ আগামী দিনের বসুমতী (মাসিক)-তে যেন ভাল জাতের উপন্যাস পাওয়া যায়। একটি করিয়া বিদেশী উপন্যাসের সংক্ষিপ্তসার প্রত্যেক মাসের বসুমতীতে থাকা উচিত।

চার্লি চ্যাপলিন রচিত 'আত্মজীবনী'র বাংলা অনুবাদ 'মাসিক বসুমতী'তে ধারাবাহিক ভাবে বাহির করা হোক এবং সেই সঙ্গে জানাই সমরসেট মমের "অফ হিউম্যান বণ্ডেজ" এই বাংলা অনুবাদ বাহির করা হোক, সার্ত্রে-র "words"-এর অনুবাদ যদি কোনদিন মাসিক বসুমতীর পাতাতে দেখিতে পাই, সেদিন থেকে আমরা 'মাসিক বসুমতী'র কাছে চিরঋণী হইয়া রহিব।

হাক্সলের 'দি নিউ ব্রেভ ওয়ারল্ড' ও 'আইল্যাণ্ড' অনুবাদ সাহিত্য বিভাগে স্থান-লাভ করুক।

স্বদেশ ও বিদেশের বড় বড় মনীষীদের জীবনীসহ শিক্ষামূলক প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকায় বাহির করা হোক। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে জানিতে আমাদের বড়ই কৌতূহল এবং সেইরূপ একই কৌতূহল প্রকাশ করি যদি আমরা নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর চিন্তাশীল প্রবন্ধ মাসিক বসুমতীতে পাই। (১) ভারতের ভাষা ও ভাষা-সমস্যা (২) প্রাণতত্ত্ব (৩) প্রাণিতত্ত্ব (৪) প্রাচীন ভারতের মানুষ ও তাদের ইতিহাস (৫) বাঙালীর উৎপত্তি (৬) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস (৭) বাংলার পূজাপার্বণ, বাংলার ব্রতকথা। (৮) স্বদেশ ও স্বদেশী কথা প্রভৃতি। 'টম জোন্স' 'আঙ্কেল টমস কেবিন' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থগুলির সমালোচনাপূর্বক গল্পের অনুবাদ বাহির করিলে বাধিত হব। 'মানব মন' নামে একটি বিভাগ খোলা হোক এবং তাহাতে মনোবিদ্যা সংক্রান্ত বিষয় লইয়া সরল ও সহজ ভাবে আলোচনা করা হোক। "বিশ্ব-পরিচয়" নামে আর একটি বিভাগ খুলিতে অনুরোধ করি। এই বিভাগে বর্তমান বিশ্বের ঘটনাবলী লইয়া আলোচনা করা হোক। সংচলচ্চিত্রে চিন্তা মাসিক বসুমতী মারফৎ প্রচার করা হোক।

আশা করি, আমাদের সাজেশনগুলো আপনার কাজে লাগিবে। ইতি—

মোহিত মজুমদার, শান্তি বিশ্বাস, কলিকাতা—২৬, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়, মণ্টু দেবনাথ, কলিকাতা-২৫, সত্যেন লাহা, কলি-২৯।

গ্রাহক-গ্রাহিকা হইতে চাই

সচিব, বসন্তকুমার স্মৃতি গ্রাম্য গ্রন্থাগার, গ্রাম ও ডাক, পাসলা, জেলা—মুর্শিদাবাদ, পঃ বঙ্গ * * * সচিবকুমার, গ্রাম ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন গ্রন্থাগার, ডাক—কুমারগ্রামদুয়ার, জেলা—জলপাইগুড়ি * * * শিশিরকুমার লাহিড়ী, অবঃ-কে-এস-ডি। ডি বি আই টি এ অফিস, কালচিনি, ডুয়ার্স, জলপাইগুড়ি, পঃ বঙ্গ * * * শ্রীমতী তপতীরাণী চন্দ, অবঃ বি এন চন্দ, এ এম ও, ডাক—গাবলি, জেলা—বালাঘাট, মধ্যপ্রদেশ * * * শ্রীমতী লতা চট্টোপাধ্যায়, অবঃ ডাঃ জে এন চট্টোপাধ্যায়, এস আর বাঙ্গুর টি বি সানেটোরিয়াম, গ্রাম ও ডাক—মেদিনীপুর। * * * শ্রী এ সি রায়, সহকারী সার্জেন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, কৈঁরা, ডাক—কৈঁরা (বারবিল হয়ে) সন্দরগড় (উড়িষ্যা)। * * * শ্রীমতী শোভা রায়, অবঃ অমরেশচন্দ্র রায়, এ্যাডভোকেট, 'চন্দ্রালয়' ভাস্করগঞ্জ, বালাসোর। * * * শ্রীমতী প্রতিভা গুপ্ত, শাকতলা, এস এইচ সি, ডাক—সাঁওতালপুর, জেলা—জলপাইগুড়ি।

I am sending the annual subscription Rs. 15/- for the Monthly Basumati. Please acknowledge receipt of same. The Secretary, Sangathani, P.O. Dakshin-Chatra, (24 Pgs.)

The yearly subscription of Rs. 15/- (Fifteen) for the esteemed Monthly Basumati is sent herewith. Kindly send the magazine regularly every month. Mrs. Jharna Mitra, C/o Mr. R. K. Mitra, Dy. Manager, 19/2 G. C. Factory Estate Jabalpur, (M.P.)

আপনার পত্র পাইয়া আমার প্রিয় মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। প্রতিমাসে মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। ডাক্তার, এস কর বসু, বসু ক্লিনিক, ডাকঘর,—মদনগঞ্জ, কৃষণগড়, রাজস্থান।

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। প্রতিমাসে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী অঞ্জলি দে, অবধায়ক—এন সি দে, চীফ ইঞ্জিনীয়ার, ৯, বৈষ্ণবঘাটা লেন, কলি-৪৭।

I am sending Rs. 15/- towards the annual subscription of the Monthly Basumati. Kindly acknowledge receipt and send the magazine regularly. The Hony. Secretary, Railway Institute, P. O. Tatanagar, S. E. Rly.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক চাঁদা ১৫৲ পাঠাইলাম। প্রতিমাসে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রীমতী শা[illegible], চন্দ্রা, অবধায়ক—এম কে চন্দ্রা, ২২।এ হাডিঞ্জ রোড, পাটনা।

Remitting the amount of Rs. 15/- being the annual subscription of the Monthly Basumati. Please send the magazine regularly every month. Anil Krishna Sarkar. Advocate S. Govt. Pleader, Rai Bahadur A. Sarkar Road, Purulia.

মাসিক বসুমতীর বার্ষিক মূল্য ১৫৲ পাঠাইলাম। প্রতিমাসে নিয়মিত পত্রিকা পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রমিতী [illegible] অবধায়ক—ডাক্তার জি [illegible] সাহিবগঞ্জ, বিহার।

I am remitting herewith the sum of Rs. 15/- (fifteen) being the annual subscription of the Monthly Basumati. Please send the magazine as before every month. The Secretary, Raghunandan Library, Puri, Orissa.

মাসিক বসুমতীর এক বৎসরের চাঁদা ১৫৲ টাকা পাঠাইলাম। বর্তমান ঠিকানায় প্রতিমাসে নিয়মিত মাসিক বসুমতী পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। শ্রী এ কে নন্দী, অম্বরনাথ, মহারাষ্ট্র।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

০ মাসিক বসুমতীর ০

॥ গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী ॥

ভারতবর্ষে মাসিক বসুমতীর চাঁদা

বাৎসরিক সডাক ১৮৲ টাকা

ষাণ্মাসিক ” ৯৲ টাকা

ভারতবর্ষে ও পাকিস্থানে রেজিস্ট্রী ডাকে

বাৎসরিক ২৫৲ টাকা

ষাণ্মাসিক ১২·৫০ পয়সা

(ভারতীয় মুদ্রায়)

ভারতবর্ষের বাহিরে বাৎসরিক

রেজিস্ট্রী ডাকে ২৮৲ টাকা

পত্রিকা ছয় মাসের কম লইলে গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না। গ্রাহক হইতে হইলে পত্রিকা প্রাপকের নাম, ঠিকানাসহ আমাদের কার্যালয়ে অগ্রিম টাকা জমা দিতে হইবে কিম্বা মণিঅর্ডারযোগে পাঠাইতে হইবে।

বিনীত

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ — কর্মাধ্যক্ষ

কলিকাতা - ১২ — মাসিক বসুমতী

মাসিক বসুমতী বাংলার একমাত্র মুখপত্র

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক-লেখিকা		
১। কলা-কাকলি—				
(ক) রিচার্ড রজার্স	(জীবনী)	সুরপিপাসু	...	৬৭৭
(খ) আমেরিকায় নাট্যমঞ্চের সূচনা ও ক্রমবিকাশ	(প্রবন্ধ)	প্রভাতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	...	৬৭৯
(গ) বোম্বাই-সমাচার	(স্টুডিও পরিক্রমা)	নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত	...	৬৮৪
(ঘ) প্রচ্ছদ-পরিচিতি			...	৬৮৬
(ঙ) আজব দুনিয়া	(ঐ)	রমেন চৌধুরী	...	৬৮৮
(চ) সঙ্গীত-জগতের পরিবেশ পরিমার্জিত হওয়া উচিত	(প্রবন্ধ)	সুমিত্রা সেন	...	৬৯১
(ছ) চিত্র-প্রচেষ্টা	...	...	...	৬৯২
(জ) সৌখীন সমাচার	...	...	...	ঐ
(ঝ) সংবাদ-বিচিত্রা	...	...	...	ঐ
২। মহারাজা প্রতাপ-আদিত্য	(ধারাবাহিক উপন্যাস)	ইন্দ্রসেন	...	৬৯৩
৩। সম্পাদকীয়—	...	...	...	৭১৮
৪। শোক-সংবাদ—	...	...	...	৭২২

ফলপ্রদ
ও
আরামদায়ক
এ্যাক্রিমেন্ট
বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী।
পোড়া কাটা
এবং
সংক্রামক চর্মরোগে

মাসিক
বসুমতী
মাঘ, ১৩৭২

কয়েকটি স্কেচ্

—মিঃ হায়লুফ্

বিভট্রুপ অঙ্কিত

(রুশ শিল্পী)

৪৪ বর্ষ, মাঘ ১৩৭২ ॥ স্থাপিত ১৩২৯ ॥ দ্বিতীয় খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা

গুরুই দেবতা

গুরুকে মানুষ-বুদ্ধি করা মহাদোষ। যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়িবাড়ি যায়, তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়। অর্থাৎ যেদো মাতাল হলেও আমার গুরু নিত্যানন্দ-দাতা। মিছরি মিষ্টির মধ্যে নয়, ত্রিদোষনাশক; পাতিলেবু অম্বলের মধ্যে নয় অগ্নিবর্ধক, হিঞ্চেশাক শাকের মধ্যে নয়, পিত্তনাশক; তেমনই গুরুও মানুষের মধ্যে নন, ভবপারের কর্ণধার। গুরুর প্রসাদেই সর্বার্থ-সিদ্ধি হয়; গুরু মেহেরবান ত চেলা পলে যাবে। গুরু ও ইষ্ট অভেদ। ও শিষ্য, ঐ দেখ বলে চৈতন্য করে গুরুই শিষ্যের সম্মুখে তার ইষ্টরূপে প্রকট হন।

গুরুভক্তি

বাবা, কর্তা ও গুরু, এই তিনটি সম্ভাষণ শুনিতে ঠাকুর ভালবাসতেন না। দুষ্টবুদ্ধি কোন এক যুবক এই ভাবটি ভঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে এক দিন উদ্ধতভাবে তাঁহার কথার প্রতিবাদ করায়, তাহার কেন, সকলের কল্যাণ লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর কহেন, তোর এত হীনবুদ্ধি যে, তোর গুরুবাক্যে অনাদর! গুরুভক্তি ছিল মহামতি অর্জুনের। এক দিন ঠাকুর (শ্রীকৃষ্ণ) অর্জুনকে নিয়ে বেড়াবার সময়, তার গুরুভক্তি দেখাবার ইচ্ছায় কহেন, দেখ সখা! কত বক্ উড়ছে; গুরু-ভক্তিতে তাহাই প্রত্যক্ষ ক'রে অর্জুন বলিল, হাঁ সখা! আবার ঠাকুর যাই বল্লেন, কৈ সখা! পাখী কোথায়? অর্জুন অমনই বলিল, হাঁ সখা! পাখী ত দেখছি না। রাজপুত্র অর্জুন কি কৃষ্ণের খোসামুদী করছিল? তা নয়, অসীম গুরুভক্তিতে ঐরূপ দেখেছিল। এইরূপ গুরুভক্তি হওয়া চাই, তবেই কল্যাণ। ঠিক্ ঠিক্ যার গুরুভক্তি হয়, সে গুরুর বংশধর, অনুচর, এমন কি, তাঁর দেশের লোকদেরও গুরুর মত শ্রদ্ধা করে। দৈবাৎ এক জন মানুষ লঙ্কাতে গিয়ে পড়লে, তাহার ইষ্ট-দেবতা রামের মত মানুষের আকার দেখে, বিভীষণ তাকে রাম ব'লে পূজা ক'রে, ধন-রত্ন দিয়ে দেশে পাঠিয়ে দেন। যুবক তখন করযোড়ে নিবেদন করিল, জানি, আমি চিরদিনই আপনার অনুকম্পার পাত্র, কেবল আপনার মুখে "আমি তোর গুরু" এইটি শুনিবার ইচ্ছায় ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিয়াছি। ঠাকুরও কৃপাপরশে তাহাকে চরিতার্থ করিলেন।

ঈশ্বর-তত্ত্ব

ঠাকুর কহিলেন, শাস্ত্র বলেন, ঈশ্বর সাকার, আবার তিনি নিরাকার (রহস্য করিয়া) কেহ বলে ঈশ্বর নীরাকার কিনা জলের আকার। দেখ, ঈশ্বরের ইতি করা যায় না; তিনি সাকার, তিনি নিরাকার, আবার ইহার পরে যে কি, তা বলা যায় না। যেমন ঘণ্টা বাজল ঢং—এটি সাকার ভাব, তার পর ঢংয়ের অংটি নিরাকার ভাব, আর ঢং ও তার অংটি শুনে মনে যে একটা ভাবের উদয় হয়, সেটি সাকার নিরাকার পারের অবস্থা। সচ্চিদানন্দ-সাগরে কি আছে বা কি নাই, তা বলা যায় না। শ্রুতি সভয়ে এই কি এই কি ব'লে নীরব। ছয় ছয় খান দর্শন কত মতই বলিল, তবে তিনি যখন ভক্তি (আত্মরতি) হিমে জমাট বেঁধে (যেমন একই সময় একই জল তরল ও ঘন অর্থাৎ বরফ) আত্মপরিচয় করেন, তখনই জানতে পারা যায়, তিনি কেমন।

ব্রহ্মতত্ত্ব

মুখে বলাতে বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, শাস্ত্র, সব উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে, কিন্তু ব্রহ্ম বস্তু উচ্ছিষ্ট হন নাই। অর্থাৎ তিনি যে কি, তা কেহ বলিতে পারে নাই, ঠিক্ যেন বোবার স্বপ্ন দেখা। ঘি খেয়ে কেউ কি তার স্বাদ বলতে পারে?—জোর বলে, ঘি

ভের মত। রমণ-সুখ শ্রেষ্ঠ সুখ, যার জন্য সকল জীবই লালায়িত; পরব্রহ্ম হচ্ছেন সেই কোটি কোটি রমণ সুখের জমাট। শুদ্ধ সত্ত্ব ঋষিরা প্রতি রোমকূপে ব্রহ্মসুখ অনুভব ক'রে আত্মারাম হয়েছেন।

তত্ত্বকথা

এমত সময় তর্কচূড়ামণি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে বলেন, ও শশধর! তুমি ত মহাপণ্ডিত, কত বক্তৃতা দিচ্ছ, আমাকে কিছু শুনাও না? পণ্ডিতজী বিনীত হয়ে কহিলেন, শাস্ত্রের জটিল তত্ত্ব আলোচনায় কণ্ঠ শুষ্ক হইয়াছে, কোথায় আপনার কৃপায় ভক্তিবারিতে শান্তিলাভ করিব, না আমি আপনাকে তত্ত্বকথা শুনাইব? (শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এইরূপ প্রশ্নে কেশববাবুও ঠাকুরকে বলিয়াছেন—কামারশালায় কি ছুঁচ বেচা চলে?) ঠাকুর তখন কহিতে লাগিলেন—একমেবাদ্বিতীয়ং, বলিতে বলিতে ভাবস্থ, তথাপি অর্ধবাহ্য অবস্থায় কহিলেন, মানবে এই ভাব ধারণ করতে অক্ষম হবে ব'লে সচ্চিদানন্দ একাধারে অর্ধনারীশ্বর হলেন। তাতেও যদি সম্যক্ বুঝতে না পারে, তাই হরিহর ব্রহ্মাদি রূপ ধারণ করলেন। যিনি এমন, তাঁকে লাভ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে যোগ। ওগো! যোগ মানে হাতি ঘোড়া নয়, ভগবানে মনোযোগ। এই যোগের ধারা তিনটি —জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম।

জ্ঞান

এক জ্ঞানই জ্ঞান, বহু জ্ঞান অজ্ঞান। তিনি (বিভুই) জীব জগৎ সবই হয়েছেন, ইহাই অদ্বৈত জ্ঞান। তাঁর কাছে যাবার সময় কিন্তু নেতি নেতি ক'রে সব ফেলে যেতে হবে; অর্থাৎ যা কিছু দেখছি বা ভাবছি —সব মিথ্যা অসার। কেবল তিনিই সত্য ও সারাৎসার। এই ভাবটি এলে তবে পৌঁছান যায়। জ্ঞান তাঁর মহিমাতে মুগ্ধ হয়ে তাঁতেই গা ঢেলে দেয়, কি না তাতে ডুবে যায়; কেন না, তাঁর স্বরূপ জেনে তাই হয়ে যায়। তবে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কচিৎ কাহারও এই জ্ঞান হয়।

ভক্তি

ভক্তি কিন্তু ভগবানের ঐশ্বর্য-মহিমা বুঝে না, বা জানতেও চায় না। চায় কেবল মাধুর্য, যাতে তাঁকে নিরন্তর উপভোগ করবে। শুদ্ধ জ্ঞান আর শুদ্ধা ভক্তি এক। জ্ঞান পুরুষ ব'লে ভগবানের সদর বাড়িতেই থাকে, অর্থাৎ তাঁর মহিমাতে আত্মহারা হয়ে যায়। ভক্তি স্ত্রীলোক, তাঁর অন্দর মহলে যায়, আর রসো বৈ স যে তিনি, তাঁহার রস আস্বাদন করে। এই শুদ্ধা ভক্তি কেবল ব্রজগোপীদের হয়েছিল। মানবের পক্ষে সুদুর্লভ বলিয়া ঠাকুর গীতারম্ভ করিলেন—

আমি মুক্তি দিতে কাতর নই রে, শুদ্ধা ভক্তি দিতে কাতর হই।
আবার ভক্তি যে বা পায়, সে যে সেবা পায়।
তারে কেবা পায়, সে যে ত্রিলোক-জয়ী॥
শুদ্ধা ভক্তি কেবল আছে বৃন্দাবনে।
গোপ-গোপী বিনে অন্যে নাহি জানে॥
ভক্তির কারণে নন্দের ভবনে পিতা জানে নন্দের বাধা মাথায় বই॥
শুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই।
মুক্তি মিলে কভু ভক্তি মেলে কই!
ভক্তির কারণে, পাতাল ভুবনে বলি রাজার দ্বারে দ্বারী হয়ে রই।

মুক্তি দিলেই নিশ্চিন্ত, কোন ঝঞ্ঝাট থাকে না। সদাই সঙ্গে থাকতে হয় বলে', ভগবান সহজে ভক্তি দিতে রাজি হন না।

কর্ম

কর্মমাত্রই ভগবানের পূজা জেনে, তাঁর প্রীতির জন্য যে কর্মানুষ্ঠান করে, সেও মুক্ত। কেন না, নিরন্তর অনুষ্ঠান করায়, আপন অন্তরে সে ভগবানের বিকাশ উপলব্ধি করে।

অদ্বৈত জ্ঞান

অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা কর। দেখিস্‌না ময়রার দোকানে ছানা চিনি মেশায়ে একটা ঠাশা প্রস্তুত করে; পরে তা হতেই গোল্লা বরফি, তালসাঁশ, আতা সন্দেশ তৈরি করে। যেমন একই ছানা চিনির রূপান্তর নানা রকম সন্দেশ, তেমনই মানব-কল্যাণ-জন্য সেই একই সচ্চিদানন্দ বিভিন্ন নাম রূপ—শিব দুর্গা কৃষ্ণ বিষ্ণু, আবার জীবজগৎ হয়েও আপনাকেই প্রকাশ করছেন। পলতা হতে কলের জল এসে কলকেতার রাস্তায় আর লোকেদের বাড়িতে, কোথায় বাঘের মুখ কোথাও বা মানুষের মুখ দিয়ে যেমন সেই একই জল পড়ছে; তেমনই বিভু নানা রূপ ধ'রে খেলা করছেন।

মত না পথ

হিন্দুধর্ম বল, মুসলমানধর্ম বল বা খৃষ্টধর্ম বল, সকলেই সেই এক ঈশ্বরের কথাই বলছে; আর সেই এক এক মত আশ্রয় ক'রে মানব তাঁকেই লাভ করছে। অতএব যত মত তত পথ। তুমি তোমার ধর্মমতে যেমন নির্ভর কর, অপরকেও তার ধর্মমতের উপর তেমনই নির্ভর ক'রতে দাও।

উদারতা

গেড়ে ডোবাতেই দাম বাঁধে, যেমন হিঞ্চের দল, কলমির দাম; কিন্তু স্রোতের জলে দল বাঁধে না। গোঁড়ামিতেই দল পাকায়, উদার বুদ্ধি দল বাঁধে না। কোন বিষয়ে—ধর্ম বল, বিদ্যা বল, গানবাজনা বল, ঠিক ঠিক গুণী হলে তার উদার বুদ্ধি হয়।

সাধুসঙ্গ

ভগবৎ আরাধনার উদ্দেশে, অধিকারী ভেদে ঠাকুর পূজা, জপ, ধ্যান করিতে বলিতেন; কিন্তু সকলকেই কহিতেন, সদসৎ বিচার সতত আবশ্যক। আরও বলিতেন, তাঁর কাছে যাবার জন্য রাজপথ হচ্ছে সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গ, সাধুসেবা দ্বারা তাঁদের সদ্‌গুণ অলক্ষ্যে অন্তরে প্রবেশ করে, তাতে বিশেষ কল্যাণ হয়। চালুনি (চাল ধোয়া) জলে যেমন সিদ্ধির নেশা কাটে, সাধুসঙ্গ তেমনই সংসার-নেশা কেটে যায়। সাধু কি ক'রে চিনিব বলায় কহেন—মাথায় জটা, গেরুয়া পরা বা গায়ে ছাই মাখা, কৌপীন তেলক পরা ফোঁটা কাটা সাধু— যারা ওষুধ দেয়, রোগ ভাল করে ইত্যাদি, তাদের কখনও বিশ্বাস করবিনে। সাধুকে দিনে দেখবি, রাতে দেখবি তার কি রকম আচরণ, তবে বিশ্বাস করবি। মহাপ্রভু বলেছেন, যাঁকে দেখলে হৃদয়ে স্বতঃই ভগবদ্‌ভাবের উদ্দীপনা হয়, তিনিই প্রকৃত সাধু।

একঘেয়ে ভাব

একঘেয়ে ভাব ভাল নয়। পূজা করি ব'লে কীর্তন করব না, বা নাম করি ব'লে ধ্যান করব না, এ ভাব ভাল নয়। ভগবানকে ঝালে ঝোলে অম্বলে সকল রকমে আস্বাদ ক'রতে হবে!

ভগবানে চিত্ত-সমর্পণ

পাড়াগাঁয়ে মেয়েরা চিঁড়ে কোটে; এক জন ঢেঁকিতে পাড় দেয়, অপর জন হাত দিয়ে চিঁড়ের ধান উল্টে দেয়, কুলোতে ঝাড়ে, আর ক্রেতা এলে, তার সঙ্গে দর-দাম করে; কিন্তু মনটি রাখে ঢেঁকির মুগুরটি হাতে না পড়ে। তেমনই সংসারে যত কেন কর্ম কর না, মনকে সদাই ভগবৎপাদপদ্মে রাখবার চেষ্টা করবে, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা করবে, যাতে তাঁকে অন্তরে দেখতে পাও।

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলামৃত হইতে

বৌদ্ধগৃহী

বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস আলোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় ভগবান বুদ্ধের প্রচারের গোড়ার দিকে গৃহীদের কোন স্থান ছিল না। বুদ্ধ ভিক্ষুদের সঙ্গে নিয়ে দেশে দেশে প্রচার করতেন তাঁর ধর্মমত। দলে দলে লোক সংসার ছেড়ে ভিক্ষু হয়ে যোগ দেন বুদ্ধের সঙ্গে। সংঘ গড়ে তোলাই ছিল তখন তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি মনে করলেন গৃহস্থজীবন বুদ্ধত্বজীবনের ও তাঁর প্রচারিত নির্বাণমার্গের পরিপন্থী। তাই গৃহত্যাগী ভিক্ষু নিয়েই সৃষ্টি হয় বৌদ্ধ-সংঘের বনিয়াদ। তাঁর প্রচারিত চারি আর্য-সত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রভৃতি তত্ত্ব ও আত্মশুদ্ধি করে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে অর্হৎ হওয়াই ছিল বৌদ্ধধর্মের প্রধান লক্ষ্য। তখনও কিন্তু বৌদ্ধধর্মের আচার-অনুষ্ঠান ও পূজা-অর্চনাদির তেমন কোন উল্লেখ মেলে না।

বুদ্ধ তারপর ভাবলেন গৃহত্যাগী-দেরও বেঁচে থাকার জন্য গ্রাসাচ্ছাদনের দরকার। কোন উদাসীন সম্প্রদায়ই গৃহস্থের বদান্যতা ছাড়া বেঁচে থাকতে পারে না। তাদের জীবিকার কোন সংস্থান নেই। ধনাগমেরও কোন পথ নেই। অন্ন বস্ত্র প্রভৃতির জন্য তারা সততই গৃহীর উপর নির্ভর করে, সুতরাং সংঘের উত্তরো-ত্তর প্রসারের সঙ্গে গড়ে উঠল বৌদ্ধ-গৃহীসম্প্রদায়ও। বৌদ্ধ সাহিত্যে গৃহী শিষ্যদের মধ্যে পুরুষদের উপাসক ও নারীদের উপাসিকা বলা হয়। তারা ভিক্ষুদের আহার, বিহার ভৈষজ্য ও নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান করত। জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে গৃহীরা যে-কোন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীকে সম্মান প্রদর্শন করত ও দান দিত। এজন্যই বুদ্ধের নবপ্রতিষ্ঠিত সংঘে গৃহীদের কাছ থেকে দানাদি অনা-য়াসে লাভ করে দেশে দেশে ধর্ম প্রচার করতে সক্ষম হয়েছিলেন। গৃহীরা ভিক্ষু-দের সেবা, যত্ন ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদির প্রতি সদাই অবহিত থাকত। বর্ষাবাসের সময় ভিক্ষুদের

বুদ্ধদেব

অনুকূলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

চীবরাদি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র দান করত ও ধর্মোপদেশ শুনত। ভিক্ষুরা সাধারণত তাদের দান কথা, শীলকথা, স্বর্গকথা, কামের অপকারিতা, নৈষ্ক্রম্যের গুণ ইত্যাদি ধর্মোপদেশ দিতেন। পালি সাহিত্যে এরূপ দেশনাকে আনুপূর্বিক ধর্মকথা বলা হয়। ফলে ভিক্ষুদের সঙ্গে গৃহীদের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। ব্রত, আচার, অনুষ্ঠান, পূজা-অর্চনাদি ধর্মের বেশ অংগ হয়ে উঠল। এসব ধর্মানুষ্ঠানগুলো হল :—

(ক) ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল গ্রহণ।

(খ) উপোসথ দিনে ধর্মোপদেশ শ্রবণ, পঞ্চশীল বা অষ্টশীল গ্রহণ।

(গ) বর্ষান্তে প্রবারণা উৎসবে ভিক্ষুদের চীবর ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দান।

(ঘ) চার মহাপুণ্যস্থান দর্শন — বুদ্ধের জন্মস্থান (লুম্বিনী), সম্বোধি লাভ স্থান (বুদ্ধগয়া), ধর্মচক্র প্রবর্তন স্থান (সারনাথ) ও মহাপরিনির্বাণ স্থান (কুশীনগর)।

(ঙ) স্তূপ ও চৈত্যের পূজা।

উৎকল বা উড়িষ্যা দেশ হতে আগত ত্রপুষ ও ভল্লিক নামক দু'জন বণিকই ভগবান বুদ্ধের সর্বপ্রথম উপাসক। বুদ্ধ-গয়ায় সম্বোধি লাভ করার অনতিকাল পরেই বুদ্ধ এ দু'জনকে উপাসক করেন। বৌদ্ধ সাহিত্যে এদের বলা হয় দ্বৈবাচিক উপাসক। তাঁরা বুদ্ধের ও ধর্মের শরণ নিয়ে হন বৌদ্ধ উপাসক।—তখনও সংঘের উৎপত্তি হয় নি। তারপর যশের পিতা বারানসীতে হলেন বুদ্ধের তৃতীয় উপাসক। তাঁকেই বলা হয় ত্রৈবাচিক উপাসক—ইনিই হলেন জগতের সর্ব-প্রথম ত্রৈবাচিক উপাসক। সংঘের তখন উৎপত্তি হয়েছিল। সেজন্য তাকে সংঘেরও শরণ নিতে হয়েছিল। মোট-কথা, তাকে ত্রিশরণ (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ) নিয়েই উপাসক হতে হয়েছিল। অতঃপর ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, গৃহপতি প্রভৃতি সম্প্র-দায় হতে দলে দলে লোক বুদ্ধের উপাসক হয়ে তাঁর সেবা করত। বৌদ্ধ গৃহী হওয়ার জন্য বিশেষ কোন ধর্মীয় অনু-ষ্ঠানের কথা জানা যায় না।

পালি নিকায় ও শুভাকর গুপ্তের

-াদিকর্মরচনা নামক গ্রন্থ হতে জানা -ায় কেউ ত্রিশরণ (বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ) নিলেই তাকে বৌদ্ধ গৃহী বলা হয়। -র্তমানে সুদক্ষ ভিক্ষু ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল -ান করে প্রার্থীকে বৌদ্ধগৃহী করেন। পরিশেষে তিনি স্বস্তিবাচক পরিত্রাণ পাঠ করেন ও নবদীক্ষিতকে ধর্মোপদেশ দেন।

পালি নিকায়ে সদ্ধর্মের শ্রোতাদের মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে: ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও গৃহপতি, অঙ্গুত্তর নিকায়ে এদের বৃত্তির উল্লেখ আছে। ক্ষত্রিয়েরা রাজশক্তি নিয়ে প্রজা শাসন করত। ব্রাহ্মণেরা যাগযজ্ঞ পূজার্চনা ও মন্ত্র নিয়ে থাকত। গৃহপতিরা ব্যস্ত থাকত ব্যবসা, বাণিজ্য ও অন্যান্য কারুকর্ম নিয়ে। তাছাড়া ধনী, দরিদ্র, শ্রেষ্ঠী কৃষক, ছুতার, কর্মকার ও অন্যান্য বৃত্তিধারী লোকেরাও বুদ্ধের গৃহীশিষ্য হল। গৃহপতিরা সোনারূপা, অট্টালিকা, ভূসম্পত্তি, রূপবতী নারী, দাসদাসী নিয়ে প্রায়ই সুখে জীবন অতিবাহিত করত। বুদ্ধ তাদের আত্মসচেতন হতে, আপন দক্ষ শ্রমের দ্বারা পরিবার পোষণ করতে, কল্যাণ মিত্রের সংসর্গে আসতে এবং সৎ গুণ অর্জন করতে বলেন। গৃহপতিরা বুদ্ধের ধর্ম কথায় তুষ্ট হয়ে শ্রদ্ধাভরে বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের অর্থাৎ ত্রিরত্নের মহিমা কীর্তন করত। পালি নিকায় গ্রন্থে গৃহপতিবর্গ নামে কয়েকটি পরিচ্ছদ আছে। এতে বিশেষ করে গৃহপতিদের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ যে সব ধর্মোপদেশ দিয়েছেন সে সব বর্ণিত আছে। এখানে শীল, কর্মফল গৃহপতি ও গৃহপত্নীর আদর্শ ও বৌদ্ধধর্মের প্রধান তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। নীতিতত্ত্ব ও দর্শনের আলোচনাও এতে আবার রয়েছে। গৃহপতিবর্গে গৃহপতিদের প্রতি বুদ্ধের উপদেশাবলী বৌদ্ধ উপাসক ও উপাসিকাদের অবশ্য পালনীয়। নিকায়ে গৃহপতি-কর্তব্য এরূপে বর্ণিত আছে ----

(ক) মাতাপিতার ভরণপোষণ।

(খ) জ্যেষ্ঠদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

(গ) প্রিয়বাক্য ব্যবহার।

(ঘ) রূঢ়বাক্য পরিহার।

(ঙ) কৃপণতা পরিত্যাগ।

(চ) দান দেওয়া।

(ছ) সত্যকথা বলা।

(জ) ক্রোধ না করা ইত্যাদি।

এগুলি ছাড়া গৃহপতিদের আরও কতকগুলি কর্তব্যের নির্দেশ আছে---

(ক) বুদ্ধের প্রতি অচল শ্রদ্ধা।

(খ) ধর্মের মহিমা কীর্তন।

(গ) সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন।

(ঘ) দান করা---এমন কি নিজ পত্নীকেও দান করা।

(ঙ) ধর্মকথা শ্রবণে আগ্রহ।

(চ) পঞ্চনীবরণ (১) হতে বিমুক্ত।

জানা যায়, গৃহপতিদের সাতটি বিশেষ গুণ হল---শ্রদ্ধা, শীল, হ্রী, অপত্রাপ্য, বহুশ্রুত, ত্যাগ ও প্রজ্ঞা। গৃহপতিরা চারটি সংগ্রহবস্তু যথাযথ পালন করেন। যথা---দান, প্রিয়বচন, অর্থচর্যা, সমানর্থতা। পালি দীঘ নিকায়ের লক্খন ও সিগালোবাদসুত্ত হতেও বৌদ্ধ গৃহীদের কর্তব্য সম্বন্ধে জানা যায়। লক্খনসুত্তে উল্লেখ আছে---

(ক) কুশল কাজ করা।

(খ) দৈহিক, বাচনিক ও মানসিক কাজ ও চিন্তা হতে বিরত থাকা।

(গ) দানশীল হওয়া।

(ঘ) উপোসথ দিনে পঞ্চশীল বা অষ্টশীল পালন করা।

(ঙ) শ্রমণ ব্রাহ্মণদের দান করা।

(চ) কলহকারীদের কলহ প্রশমন করা।

(ছ) মাতাপিতার সেবা করা।

(জ) ক্রোধ বা দ্বেষ পোষণ না-করা।

(ঝ) শ্রমণ ও ব্রাহ্মণের নিকট ধর্মোপদেশ শুনা।

(ঞ) নৈতিক ও বৈষয়িক কল্যাণ সাধন করা।

(ট) অন্যের প্রতি সৌজন্য ইত্যাদি।

সিগালোবাদসুত্তে গৃহীদের আরও কিছু উপদেশ মেলে। এ সুত্তটিকে আবার গৃহীবিনয় বলা হয়। বুদ্ধের উপদেশগুলো হল :---

(ক) প্রাণিহত্যা হতে বিরতি।

(খ) মিথ্যাভাষণ হতে বিরতি।

(গ) ব্যভিচার হতে বিরতি।

(ঘ) সুরাপান হতে বিরতি।

(ঙ) নাচ-গান, বাজনা প্রভৃতি না-দেখা বা শুনা,

(চ) ছন্দ, দ্বেষ, মোহ বা ভয়ের বশে কোন অসৎ কাজ না করা।

(ছ) মাতাপিতা, আচার্য ও উপদেষ্টার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা।

(জ) দাসদাসী প্রভৃতির প্রতি অবহিত হাওয়া।

(ঝ) শ্রমণ ব্রাহ্মণকে অন্ন-বস্ত্রাদি দান করা।

(ঞ) সকলের কল্যাণ কামনা করা।

(ট) পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ করা।

(ঠ) দ্যূতক্রীড়া ও স্বার্থপর বন্ধুর সংসর্গ ত্যাগ করা ইত্যাদি।

ধর্মপদে গৃহীদের আবার নৈতিক শিক্ষার কথা আছে। গৃহীরা কিভাবে জীবনযাপন করলে নৈতিক উন্নতি লাভ করতে পারে, তাই এখানে বলা হয়েছে। যেমন----

সুখা মত্তেয্যতা লোকে অথো পেত্তেয্যতা সুখা।
সুখা সামঞ্ঞতা লোকে অথো
ব্রহ্মঞ্ঞতা সুখা।
সুখং যাব জরা সীলং সুখা
সদ্ধা পতিট্‌ঠিতা।
সুখো পঞ্ঞায় পটিলাভো পাপানং
অকরণং সুখং॥

---(জগতে মাতা ও পিতার সেবা সুখকর। শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের পরিচর্যা জগতে সুখদায়ক। বার্ধক্য পর্যন্ত শীল পালনই সুখকর। শ্রদ্ধায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সুখদায়ক। প্রজ্ঞা লাভই সুখজনক। পাপ না করাই সুখাবহ।

এ ছাড়া পালি মিলিন্দপঞ্হে গৃহীদের আরও কতকগুলি উপদেশ রয়েছে সেগুলি হ'ল---

১। কামচ্ছন্দ, ব্যাপাদ, থ্যানমিদ্ধ, উদ্ধত্য-কৌকৃত্য ও বিচিকিৎসা।

(ক) গৃহী সংঘের অভ্যুদয়ে সুখ ও বিপর্যয়ে দুঃখ।

(খ) ধর্মই গৃহী জীবনের কাম্য।

(গ) সদ্ধর্মের অবনতিতে তার শ্রীবৃদ্ধির জন্য সততই সচেষ্ট হওয়া।

(ঘ) সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হওয়া।

(ঙ) কর্ম ও বাক্য সুসংযত হওয়া।

(চ) ঐক্য রক্ষা করা।

(ছ) সংসর্গ ত্যাগ করা।

(জ) ধর্মবিষয়ে কপটতা পরিহার করা।

পালি বিনয় পিটকে গৃহীর শীল পালনের ফলের কথা বর্ণিত আছে। উল্লেখ আছে শীল পালনে গৃহী ধন-সম্পত্তি, যশ, সজ্ঞান মৃত্যু এবং মৃত্যুর পর দিব্য জীবন লাভ করে।

শীলাদি রক্ষা করা ছাড়া উপাসক-উপাসিকারা ভিক্ষুদের চীবর, পিণ্ডপাত, শয়নাসন, ভৈষজ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দান করে। তাদের বিশ্বাস, ভিক্ষুদের দান করলে পুণ্য হয় এবং এ পুণ্যের ফলে তারা পরজন্মে দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য, অপরূপ সৌন্দর্য ও ভোগ-সম্পদ লাভ করে। সেজন্য বৌদ্ধগৃহীরা দ্বিধাহীন চিত্তে সানন্দে দান দেয়। বর্ষা-বাসের পর বিহারের প্রবারণা উৎসব হতে গৃহীরা ভিক্ষুদের চীবর ও অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য বস্ত্র দান করে। উপোসথের দিনে বৌদ্ধগৃহীরা বিহারে গিয়ে ভিক্ষুর নিকট পঞ্চশীল বা অষ্টশীল গ্রহণ করে। তারা ঐ দিনের প্রায় বেশীর ভাগ সময়েই বিহারে ভিক্ষুদের নিকট ধর্মকথা শোনে। কেউ কেউ বা চল্লিশটি কর্মস্থানের যে-কোন একটিকে অবলম্বন করে ভাবনা করে। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধা হেতু অনেকে আবার অকুশল চিন্তা ত্যাগ করে চিত্ত সংযম লাভ করে ও ধ্যানস্থ হয়। নিকায়ো হতে জানা যায় চিত্ত গৃহপতি ও উত্তরা নন্দমাতা ধ্যানে দক্ষতা লাভ করেন। কোন কোন উপাসক আবার চারিটি ব্রহ্মবিহার----

অর্থাৎ মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা ভাবনা করে ও স্মৃত্যুপস্থান অভ্যাস করে। সিরিভদ্দ ও মানদিন্নাকে রোগের তীব্র যন্ত্রণা দূর করার জন্য স্মৃত্যুপস্থান অভ্যাস করতে বুদ্ধ উপদেশ দেন। বুদ্ধের শ্রেষ্ঠ নারী ভক্তদের অন্যতমা সামাবতী মৈত্রী ভাবনা করেন। খুজ্জমাতা, পটিসম্ভিদাজ্ঞান লাভ করেন। নন্দমাতা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে খ্যাতি-লাভ করেন। সুতরাং নারীরা নৈতিক কেন আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভেও সক্ষম হয়েছিল।

বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যেরা গৃহীদের প্রথমে ধর্মের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন না। গৃহীদের ধীশক্তি বুঝে ধর্মোপদেশ দেওয়া হত। পূর্বেই বলেছি গৃহীদের প্রথমে দানকথা, শীলকথা এবং স্বর্গকথা সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া হত তাদের মন ধর্মে প্রসাদ লাভ করলে, সংসার জীবনের অসারত্ব ও সন্ন্যাস জীবনের সুফল সম্বন্ধে ধর্ম-দেশনা দেওয়া হত। পরিশেষে দুঃখ সমুদয়, নিরোধ ও মার্গ সম্বন্ধে তাদের উপদেশ দেওয়া হত। বুদ্ধশিষ্য সারিপুত্র বুদ্ধভক্ত অনাথপিণ্ডদকে মৃত্যুশয্যায় ধর্ম-দেশনা করেন। ইহা শুনে তিনি আপন যন্ত্রণা হতে মুক্তি পান। এরূপে গৃহীরাও গভীর তত্ত্ব আয়ত্ত করতে পারত। তারা যদিও শ্বেত-বস্ত্র পরিহিত কিন্তু তারা ভিক্ষুদের মত আধ্যাত্মিক চিন্তায় উন্নত হতে সমর্থ হত।

গৃহীরা বিশ্বাস করে যে, পুণ্য কাজের ফলে মানুষ দেবলোকে দেবতা এমন কি দেবরাজ ইন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। বিমানবত্থুতে কর্মতত্ত্বকে অবলম্বন করে স্বর্গবিষয়ক প্রচুর বিবরণ মেলে, পুণ্যের ফলে গৃহীরা ও যম, তুষিত, চাতুর্মহারাজিক প্রভৃতি দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে। বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ আছে অষ্টশীল পালনের দ্বারা ষোড়শ মহাজনপদের রাজাও হওয়া যায়।

গৃহীরা আপন চরিত্রশুদ্ধি ও চিত্ত-শুদ্ধি দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে ব্রতী হয়। নিকায়ো হতে জানা যায় বুদ্ধভক্ত অনাথপিণ্ডদ ও অন্য নব্বই জন উপাসক সকৃদাগামী লাভ করে এবং আরও পাঁচশো গৃহী স্রোতাপত্তি লাভ করে। ককুধ নামক একজন গৃহী অনাগামী ফল-লাভ করে। এরূপে কলিঙ্গ, নিকট, কটিসসহ, তুট্ঠ, ভদ্দ, সুভদ্দ এবং আরও অনেক গৃহী আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করেও তারা স্রোতাপত্তি সকৃদাগামী ও অনাগামী ফল লাভ করে।

ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। গৃহীদের পূজা-অর্চনা ও অনুষ্ঠানাদি বৃদ্ধি পায়। বুদ্ধের সময়েও অবশ্য গৃহীদের চৈত্য ও স্তূপ গড়ে পূজা করার পরিচয় মেলে। মহাপরিনির্বাণ সূত্রে বৈশালী নগরের আশেপাশে গৌতমক, সত্তম্বক, বহুপুত্ত নামক চৈত্যের নাম পাওয়া যায়। তা ছাড়া উদেন, সারন্দদ চাপাল, আনন্দ (ভোগনগর), মল্লদের মকুটবন্ধন নামক আরও চৈত্যের উল্লেখ আছে।

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম বহির্ভারতেও ছড়িয়ে পড়ে। বুদ্ধধর্মের ক্রমবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধসংঘ ও গৃহী শিষ্যদের আচার-অনুষ্ঠান ও পূজার্চনাদি বেড়ে গেল। অনেকে মনে করেন অশোক নিজেও বৌদ্ধ উপাসক হন। বৈরাট শিলালেখ হতে জানা যায় তিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। বৌদ্ধ-গৃহী হিসাবে সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্ম এবং সংঘের উন্নতি ও হিতার্থে অনেক কল্যাণ-মূলক কাজ করেন। তিনি প্রতিদিন শত শত শ্রমণ ও ব্রাহ্মণদের আহার এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান করতেন। কথিত আছে, তিনি জম্বুদ্বীপে (ভারত-বর্ষে) ৮৪,০০০ বিহার নির্মাণ করেন। নেপালের তরাই অঞ্চলে নিগলভা নামক স্থানে পূর্ববুদ্ধ কনকমুনির স্তূপ সংস্কার করেন ও পূজা করেন। সংঘভেদ বন্ধ করার জন্য তিনি সাঁচী ও সারনাথে অনুশাসন-লিপি খোদাই করান। তিনি সভাসদগণ সহ ধর্মযাত্রায় বের হয়ে বুদ্ধের জন্মভূমি লুম্বিনী ও সম্বোধি লাভের স্থান বুদ্ধগয়া দর্শন করেন এবং শ্রমণ ব্রাহ্মণদের দান করেন।

অশোকোত্তর যুগে বৌদ্ধগৃহীদের পূজা ও অনুষ্ঠানাদি সহস্রধারায় বেড়ে উঠল।

ভৃগুজাতক

॥ ফাল্গুন মাসের ফলাফল ॥

ফাল্গুনে যাদের জন্ম, তাদের সঙ্গে ভাদ্র মাসে যাদের জন্ম, তাদের সঙ্গে একরূপ সমসূত্রের যোগ থাকবে, সুতরাং ভাদ্রের জাতকের কিংবা ভাদ্রের জাতিকার মধ্যে মিলনে মধুরভাবই জন্মী হবে। কিন্তু ভাদ্রের জাতকের ফাল্গুন মাসে কিংবা ফাল্গুনের জাতকের ভাদ্র মাসে অসুখ-বিসুখ হলে সাবধান থাকা দরকার। অনেক ক্ষেত্রে তা সঙ্কট আনতে পারে। ফাল্গুনের জাতিকার স্বভাবত সুশৃঙ্খল ও পরিপাটি জীবনের দিকে ঝোঁক থাকে। তাঁরা হবেন সুকণ্ঠী। শিল্প-চর্চায় তাঁরা সাফল্য অর্জন করতে পারেন। তাঁদের চোখ-মুখে বেশ আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ থাকবে। মুখমণ্ডলে থাকবে কোনরূপ বৈশিষ্ট্যের চিহ্ন। চোখে থাকবে আকর্ষণের ভাব। ফাল্গুন মাসে যেসব মেয়ের জন্ম তাদের চৌদ্দ বৎসর বয়স থেকে একুশ বর্ষ বয়স পর্যন্ত বিশেষ সাবধান থাকা দরকার। সঙ্গী নির্বাচনে কিংবা স্বেচ্ছাকৃত মোহের আবর্তে জীবন অশান্তিপূর্ণ হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। যাক্, এবারে ফাল্গুন মাসের কথা বলছি; কুম্ভে রবির প্রবেশকালে বৃষে রাহু ও বৃহস্পতি, বৃশ্চিকে চন্দ্র ও কেতু, মকরে শুক্র, কুম্ভে রবি, বুধ, মঙ্গল ও শনি থাকবে। ৩রা ফাল্গুন ১৫ই ফেব্রুয়ারী শুক্র ও বৃহস্পতি মার্গী হবে। ২৬-এ ফেব্রুয়ারী (১৪ই ফাল্গুন) বুধ মীনে যাবে এবং ১লা মার্চ (১৭ই ফাল্গুন) মঙ্গল মীনে যাবে। পরিক্রমায় চন্দ্র এসে পৌঁছবে শেষদিনে ধনুতে। এই যে মাসিক রাশিচক্র, তার উপর জন্মরাশি; লগ্ন ও জন্মকালীন রবির অবস্থান অনুযায়ী যে শুভাশুভ আভাস দেখা দেয়, তারই ইঙ্গিত আমরা এই অধ্যায়ে দিতে চেষ্টা করব প্রত্যেক মাসে। মনে রাখবেন, যাদের জন্ম ফাল্গুন মাসে কুম্ভ রাশিতে কিংবা কুম্ভলগ্নে তাদের জীবনধারায় কোনো না কোনভাবে এখন জটিলতা রয়েছে, তার জটাজাল ছিন্ন হতে এখনো চারমাস দেরী। যাদের সত্যি খারাপ যাচ্ছে, তাদের অধৈর্য হলে চলবে না। লালরঙের সঙ্গে বাসন্তী রঙ আর অপরাজিতার রঙ চোখের সামনে রাখুন—

মেষ ঃ আর্থিক যোগাযোগ আনবে এ মাস। তার উপর বন্ধুর সংখ্যা বাড়বে। পুরণো বন্ধুদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ পাবেন। স্বাস্থ্য অবশ্য মাসের শেষের দিকটায় কিছু উৎপাত করবে। বাতের পীড়া ও রক্তের চাপের উৎপাত দেখা দিতে পারে। যাদের বয়স পঁয়তাল্লিশের কিংবা ষাটের কাছাকাছি, তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ সাবধান থাকা দরকার। কেনাবেচার যারা

প্রশ্নোত্তর বিভাগ

মাসিক বসুমতীর প্রশ্নোত্তর-বিভাগে প্রকাশিত কুপন কেটে পাঠালে আপনার ভাগ্য সম্পর্কীয় প্রশ্নের উত্তর কিম্বা গ্রহবৈগুণ্যে আপনার পক্ষে কোন্ রত্ন ধারণ করা কর্তব্য তার নির্দেশ দেওয়া হবে। দুইটির বেশি প্রশ্নের উত্তর পাবেন না। প্রশ্নের উত্তর মাসিক বসুমতীতে ছাপা হবে। উত্তরের জন্য কোন রিপ্লাই কার্ড কিম্বা ডাক টিকিট পাঠাতে হবে না। কুপনের সংগে প্রশ্নটি লিখে পাঠাবেন। ঐ সংগে জন্মের সাল, তারিখ, ও সময় এবং জন্মস্থানের উল্লেখ করবেন। তার সংগে জন্মকুণ্ডলীও দিতে পারেন।

কুপন

নাম ____________

ঠিকানা ____________

পোঃ ________ গ্রাম ________

কারবারী, তাদের আয় বাড়বে। অবশ্য খনিজ দ্রব্য, লোহা কয়লা প্রভৃতি দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের মাসের একুশ তারিখের মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য সঙ্কট দেখা দিতে পারে। যান্ত্রিক দ্রব্যের সরবরাহ ও ব্যবসা যাঁরা করেন, তাঁদের মাসের শেষাংশ গোলমেলে। সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালকদের চুক্তি কিংবা নূতন কাজে হাত দিতে হলে মাসের সতেরো তারিখের মধ্যে অনুকূল। আইন-ব্যবসায়ী বিশেষ ক'রে এটর্নী শ্রেণীর বৃত্তি যাঁদের, তাঁরা কোনো মক্কেলের ব্যাপারে ঝঞ্ঝাটে পড়তে পারেন। বিচারক ও শাসক শ্রেণীর ব্যক্তিদের সুনাম ও কর্মক্ষেত্রে সুপরিবর্তন আসতে পারে। পুলিশের পদস্থ কর্মচারীদের কর্মক্ষেত্রে উন্নতি হলেও শেষাংশ ঝঞ্ঝাটপূর্ণ। লেখক ও শিল্পীদের আয় বাড়বে এবং নতুন সৃষ্টি বা কাজের সাফল্য এবং স্বীকৃতি লাভের সম্ভাবনা। যাঁদের বয়স চব্বিশ থেকে সাতাশ কিংবা একত্রিশ থেকে চৌত্রিশ তাদের সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগ হতে পারে। কুমারী মেয়েদের সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগাযোগ হতে পারে। বিশেষ করে পরীক্ষায় সাফল্য এবং চাকুরী লাভের চেষ্টা সার্থক হতে পারে। মেষ লগ্নে যাঁদের জন্ম, তাঁদের আর্থিক উন্নতি হলেও কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাট থাকবে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল চলবে। চাকুরীক্ষেত্রে উন্নতির সম্ভাবনাও রয়েছে।

বৃষ : এ মাস আপনার পক্ষে বড় গোলমেলে। পারিবারিক ব্যাপার এমন ঘোরালো হয়ে উঠতে পারে, যাতে কাজকর্মে বাধা ও অশান্তি সৃষ্টি হতে পারে। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে অনিয়ম কিংবা কোনো গোলমাল হওয়ায় শরীর খারাপ হতে পারে। ওষুধপত্র ব্যবহার সম্বন্ধে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। নতুন কোনো কারবার কিংবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারে উদ্যোগী হবার যোগাযোগ দেখা যায়। আইন-ব্যবসায়ীদের সাফল্য বুঝায়। অধ্যাপক বা শিক্ষক শ্রেণীর বৃত্তিধারীদের কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ। লেখক ও সাংবাদিকদেরও সুখবর পাবার সম্ভাবনা। পুলিশ বিভাগ ও সৈন্য বিভাগে চাকুরেদের পদোন্নতি ও স্থান পরিবর্তন হতে পারে। কাপড় ও সুতী-কলের কল-কারখানা যাদের তাদের বিশেষ জটিল সময়। চিকিৎসক ও রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবসায়ীদের পক্ষে আয়প্রদ। সিনেমা-সংক্রান্ত ব্যাপারের প্রযোজক ও পরিচালকদের অপ্রত্যাশিত আঘাত পাবার মত আশঙ্কা। ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষার ব্যাপারে আশাপ্রদ। ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলা দরকার। নিজের ভুলে কোনো দ্রব্য হারাতে পারেন। কুমারী ও বিবাহযোগ্যা মেয়েদের স্বেচ্ছাকৃত বিবাহে এগিয়ে যাবার আগে বিশেষ চিন্তা করা উচিত। প্রতারিত হবার আশঙ্কা রয়েছে। ভুল বুঝে দাম্পত্য-জীবনে অশান্তি আনা সম্পর্কে সাবধান থাকা দরকার। ছেলেমেয়েদের স্বাস্থ্য উৎপাত করতে পারে। বৃষলগ্নে জন্ম হলে নানা ঝঞ্ঝাট, স্বাস্থ্যের গোলমাল এবং আর্থিক অপচয়ের আশঙ্কা রয়েছে। অবশ্য চাকুরী ক্ষেত্রে উন্নতির আভাস পেতে পারেন।

মিথুন : নৈরাশ্য কেটে যাবার মত সময় এসেছে; তবু মাসের সতেরো তারিখ পর্যন্ত একটু সমঝে চলুন। স্বাস্থ্যের কোনোরূপ গোলমাল থাকলে সতর্ক হোন; নিজের খেয়াল-খুশীমত ওষুধপত্র ব্যবহার করবেন না। বিশিষ্ট চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। বিশেষ ক'রে পেটের কিংবা চোখের রোগ হলে সাবধান। যে ব্যবসায়ই থাক না কেন, এখন একটু গোলমেলে সময়। মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে আশাপ্রদ লক্ষণ দেখা দেবে। অবশ্য ছাপাখানা ও পুস্তকের ব্যবসায়ীদের পক্ষে লাভপ্রদ। কিন্তু কোনো বই নিয়ে কিংবা কারো সঙ্গে কাজকারবারের ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট দেখা দিতে পারে। সরকারী চাকুরী ক্ষেত্রে বিশেষ ক'রে যারা অ্যাকাউন্টস কিংবা কেরাণীর কাজে লিপ্ত তাঁদের উন্নতির আভাস ও বিভাগীয় পরীক্ষাদিতে সুফল হতে পারে। শিক্ষক ও অধ্যাপক শ্রেণীর ব্যক্তিদের আয়ের পথ সুগম হবে। নতুন কোনো দায়িত্ব ও আর্থিক সুযোগ আনতে পারে। চিত্র-প্রযোজক ও পরিচালকদের আর্থিক ব্যাপারে হতাশ হবার আশঙ্কা। কলকারখানার মালিক ও পরিচালকদের কর্মীদের ব্যাপারে ও সরবরাহের ব্যাপারে বাধা সৃষ্টি হতে পারে। কাপড়ের ব্যবসায়ীদের ঝঞ্ঝাটে পড়ার আশঙ্কা আছে। মহিলা কর্মপ্রার্থীদের চাকুরী লাভের সম্ভাবনা। ঐ রাশির মেয়েদের মনোমত স্থানে বিবাহ হতে পারে। সন্তান-সম্ভবাদের কিছু কষ্ট যেতে পারে। মিথুন লগ্নে জন্ম হলে কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাটের মধ্য দিয়ে আশার আলো ফুটে উঠবে। প্রীতির সম্পর্কের প্রসার ঘটবে। কিন্তু উদর-বায়ু ও রক্তের চাপের গোলমাল দেখা দিলে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

কর্কট : এ মাসে আগের জটিলতা অনেকাংশে কেটে যাবে। মাসের চৌঠো থেকে দশদিন বিশেষ লক্ষণীয়। কর্মক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা ও সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভেরও যোগাযোগ রয়েছে। আর্থিক ব্যাপারে অস্বাচ্ছন্দ্য কেটে যাবার কথা। আইন-ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী ও কন্ট্রাক্টার শ্রেণীর বৃত্তিভোগীদের পক্ষে মাসের একুশ তারিখ পর্যন্ত লক্ষণীয়। শেষাংশে পারিবারিক অসুখ-বিসুখ উৎপাত করতে পারে। রক্তের চাপ ও উদর-সংক্রান্ত পীড়াদি সম্পর্কে সাবধান থাকা দরকার। বৈষয়িক ব্যাপারে ঝগড়া-বিবাদ আপোষে মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করুন। ছেলেমেয়েদের মধ্যে কারো সম্পর্কে সুখবর পেতে পারেন। বিবাহিতা মহিলাদের সাংসারিক ক্ষেত্রে প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়লেও যে-কোনো কারণে স্বামীর জন্য দুশ্চিন্তা ভোগের কারণ রয়েছে। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে কোনো কাজ করা সম্পর্কে সাবধান। কুমারী মেয়েদের স্বেচ্ছাকৃত বিবাহে বাধা আসতে পারে। লেখক ও শিল্পীদের অভিলষিত কাজে অর্থাৎ নিজের রচনাদির ব্যাপারে সুনাম ও স্বীকৃতি লাভের কথা। বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে কারো আচরণ ক্ষোভ জন্মাতে পারে। রাজনৈতিক কর্মী ও নেতাদের পেক্ষে হতাশ হবার মত যোগ দেখা যায়। কর্কট লগ্নে

জন্ম হলে স্বাস্থ্যের গোলমাল, পারিবারিক ঝঞ্ঝাট এবং আর্থিক কোনো ব্যাপারে উৎকণ্ঠা ভোগের আশঙ্কা। আর্থিক ক্ষেত্রে আশাপ্রদ লক্ষণ রয়েছে।

সিংহ ঃ সাধারণভাবে গতানুগতিক হলেও মাসের মধ্যভাগ উদ্দেশ্য সিদ্ধির অনুকূল। গোড়ার দিকে উদ্যমে নৈরাশ্য, ব্যয়বৃদ্ধি ও পারিবারিক ঝঞ্ঝাট উৎপাত করতে পারে। শেষাংশে স্বাস্থ্য কিছু গোলমাল করবে। গলার অসুখ ও উদর-ঘটিত পীড়াদি সম্বন্ধে সাবধান থাকা দরকার। অধীনস্থ লোক কিংবা চাকর-বাকরের জন্যও ঝঞ্ঝাট হতে পারে। কোনো জিনিস বিক্রয় করার ব্যাপারে লাভবান হবার সম্ভাবনা। চুক্তির কাজে সাফল্য হতে পারে। সাহিত্যিক ও শিল্পীদের নতুন খবর উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়াবে। আইনজীবী ও দালাল শ্রেণীর ব্যক্তিদের কোনো ব্যাপারে হতাশ হবার আশঙ্কা। সিনেমার প্রযোজক ও পরিচালকদের নতুন বই নির্ধারণে কিংবা নতুন কোনো প্রচেষ্টায় সাবধান হওয়া উচিত। কলকারখানার পরিচালকদের পক্ষে উৎপাদনের ব্যাপারে কোনো সমস্যা দেখা দিতে পারে। কাপড়ের ব্যবসায়ীদের আকস্মিক ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট বুঝায়। সন্তান-সম্ভবা মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান থাকা উচিত। দাম্পত্য ক্ষেত্রে গোড়ার ও শেষের দিকে নিজের দোষে অশান্তি আসতে পারে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহে বাধা পড়তে পারে। সিংহ লগ্নে জন্ম হলে স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত। নতুন কোনো কাজ আরম্ভ করার আগে নিজের সামর্থ্য সম্পর্কে চিন্তা করুন। আর্থিক ক্ষেত্র আশাপ্রদ নয়।

কন্যা ঃ মনের দুর্বলতা ত্যাগ করুন। সঙ্কোচ না করে নিজের প্রাপ্য বা দাবী আদায়ের চেষ্টায় সাফল্য আশা করতে পারেন। অবশ্য ঝগড়া-ঝাটি ও মামলা-মোকদ্দমা এড়িয়ে চলা দরকার। জমি-বাড়ি ও স্বত্বাদির ব্যাপারে প্রতিবেশীর সঙ্গে গোলমাল দেখা দিতে পারে। ব্যবসায়ে মাসের তেরো দিনের পর আশাপ্রদ লক্ষণ দেখা দেবে। শারীরিক অবসাদ ও শিরঃপীড়াদি উৎপাত করতে পারে। কলকারখানায় শিল্প-উৎপাদনকারীদের সাবধান হয়ে চলা উচিত। সরকারী কণ্ট্রাক্টের যোগাযোগ হতে পারে। কিন্তু বেফাস কথা বলে উপকারী ব্যক্তিকে বিরূপ করে দেওয়া সম্পর্কে সাবধান। পাট ও তুলার ব্যবসায়ীদের ব্যবসায়ে সঙ্কট দেখা দেওয়ার আশঙ্কা। আইনজীবীদের পক্ষে মাসের শেষাংশ আশাপ্রদ নয়। চিত্র-প্রযোজক ও পরিচালকদের নতুন প্রচেষ্টায় সাফল্য আশা করা যায়। অবিবাহিতা মেয়েদের সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহের যোগাযোগ হবে। কিন্তু বিবাহিতা তরুণীদের সাংসারিক ক্ষেত্রে অপ্রত্যাশিত অশান্তি দেখা দিতে পারে। চাকুরীপ্রার্থীদের প্রতিযোগিতায় সাফল্য আশা করা যায়। কন্যা লগ্নে জন্ম হলে আর্থিক দুশ্চিন্তা দেখা দিলেও মধ্যভাগে অনুকূল অবস্থা দেখা দেবে। পারিবারিক কোনো শুভকর্মের যোগাযোগ দেখা যায়। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সাবধান থাকা দরকার। আশাতীত উপহার লাভ ও প্রাপ্তির সম্ভাবনাও আছে।

তুলা ঃ সামাজিক যোগাযোগ এবং প্রীতির সম্পর্কের প্রসার এ মাসের বৈশিষ্ট্য। কিন্তু স্বাস্থ্য প্রায়ই উৎপাত করবে। চাকুরী ক্ষেত্রে অভিলষিত ব্যাপারে আশাপ্রদ লক্ষণ দেখা যায়। কিন্তু আকস্মিক কোনো সমস্যা দেখা দিলে ধৈর্য ধরে থাকা উচিত। পুলিশ বিভাগ ও বিচারকদের চাকুরী ক্ষেত্রে সুপরিবর্তনের আভাস রয়েছে। যাদের চাকুরীর মেয়াদ শেষ হবার কথা, তাদের আবার নিয়োগ হবার সম্ভাবনা। কলকারখানার উৎপাদনকারীদের উৎপাদনে বাধার আশঙ্কা। ছাপাখানা ও পুস্তক ব্যবসায়ীদের লাভবান হবার সম্ভাবনা। খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসায়ে ও ঔষধাদির ব্যবসায়ে নৈরাশ্য দেখা দিতে পারে। আইনজীবীদের সুসময় বলা চলে। অপ্রত্যাশিতভাবে আগের কোনো ঝঞ্ঝাট মিটে যেতে পারে। ফাটকাবাজী ও বেআইনী কারবারীদের হঠাৎ বিপদ হতে পারে। পরীক্ষার্থীদের পক্ষে এখন সুসময় বলা চলে। দূরে কোথাও যাবার পক্ষে এখন বাধা রয়েছে। মহিলাদের পক্ষে এখন অভিলষিত কার্যে সাফল্য, প্রীতির প্রসার ও প্রিয়জনের উন্নতির সম্ভাবনা দেখা যায়। তরুণ-তরুণীদের স্বেচ্ছাকৃত বিবাহের ব্যাপারে এখনো মনস্থির করার পথে বাধা। পরীক্ষাদির ব্যাপারে মেয়েদের আশাতীত সুফল হতে পারে। রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের এখন হতাশ হবার সম্ভাবনা। তুলা লগ্নে জন্ম হলে নানা ঝঞ্ঝাট, আর্থিক ক্ষেত্রে নৈরাশ্য ও শত্রুতা বিক্ষুব্ধ করবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কে বিশেষ সাবধান থাকা উচিত।

বৃশ্চিক ঃ এ মাস আপনার পক্ষে কোনো ভাবে লক্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। গৃহ ও পারিবারিক সমস্যা মাঝে মাঝে উত্ত্যক্ত করবে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে গোড়ার সাত দিন ও শেষের সাত দিন অনুকূল। মধ্যভাগে কর্মক্ষেত্রে ঝঞ্ঝাট ও সমস্যা দেখা দিতে পারে। চিকিৎসক ও ইঞ্জিনীয়ার শ্রেণীর চাকুরেদের কর্মস্থান পরিবর্তনের আভাস রয়েছে। খনিজ দ্রব্য, লোহা ও কাঠের ব্যবসায়ীদের আশাহত হবার সম্ভাবনা কিন্তু কোনো সরবরাহের চুক্তিতে আশান্বিত হতে পারেন। জমি-বাড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে ঝঞ্ঝাট ও নতুন জমি কেনার গোলমাল হতে পারে। স্বাস্থ্য মোটামুটি ভাল গেলেও পুরনো কোনো রোগ থাকলে হঠাৎ তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। চিত্র-প্রযোজক ও পরিচালকদের পক্ষে সুযোগপ্রদ। পুলিশ ও শাসনবিভাগীয় চাকুরীতে মনোমত পরিবর্তনের আভাস দেখা যায়। পত্নী সন্তান-সম্ভবা হলে বিশেষ সাবধান। তরুণ ও অবিবাহিতদের পক্ষে বান্ধবীদের সম্পর্কে এবং নতুন পরিচিতা সম্পর্কে সাবধান থাকা দরকার। পরীক্ষার্থী মেয়েদের পরীক্ষায় বিশেষ সাফল্য আশা করা যায়। তরুণী মেয়েদের স্বেচ্ছাকৃত বিবাহে এগিয়ে না যাওয়া উচিৎ। প্রবীণ লেখক বা গ্রন্থকারদের সুখবর পাবার সম্ভাবনা। বৃশ্চিক লগ্নে জন্ম হলে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও আর্থিক লাভ হলেও শেষাংশে স্বাস্থ্যের গোলমাল ও পারিবারিক ঝঞ্ঝাট উৎপাত করবে।

ধনু : আপনার কর্মধারায় নতুন কোনো সূচনার আভাস রয়েছে। এ মাসে পরের কাজে কিংবা কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে নিজের স্বার্থত্যাগেরও আভাস রয়েছে। আর্থিক ব্যাপারে মাসের এগারো থেকে একুশ তারিখ লক্ষণীয় পরিবর্তন আনতে পারে। আইন ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে আয় বৃদ্ধির যোগ। চিকিৎসকদের পক্ষে গোড়ার নয়দিন ও শেষের পাঁচদিন বেশ অনুকূল। কণ্ট্রাক্টারদের হতাশ হবার কারণ রয়েছে। দূরে কোথাও কাজের প্রচেষ্টা নিষ্ফল হতে পারে তবু আগের কোনো পরিকল্পনা সফল হবার মত যোগাযোগ দেখা দিতে পারে। রাজনৈতিক ব্যাপারে সাফল্য আশা করা যায়। খাদ্যদ্রব্য ও কাপড়ের ব্যবসায়ে আগের চেয়ে ভাল। সম্পত্তিঘটিত ব্যাপারে শেষের বারোদিন মধ্যে কোনো ঝঞ্ঝাট দেখা দিতে পারে। দাম্পত্য-ক্ষেত্রে কিংবা পত্নীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে পনেরো তারিখ থেকে নয় দিন বিশেষ সতর্ক থাকা দরকার। পরীক্ষার্থী মেয়েদের অধৈর্য হয়ে ভুল করা সম্বন্ধে সাবধান। শিল্পী মেয়েদের নতুন যোগাযোগে ভাল হবে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভাল ফল আশা করা যায়। নতুন কোনো ব্যবসায়ে কিংবা লাভজনক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ব্যাপারেও যোগাযোগ হতে পারে। ধনু লগ্নে জন্ম হলে যে কাজে হাত দিয়েছেন, তাতে সাফল্য ও আর্থিক উন্নতি হলেও স্বাস্থ্যের গোলমাল উদ্ব্যস্ত করতে পারে। ছেলেমেয়েদের ব্যাপারে শুভফল আশা করা যায়।

মকর : নতুন ক্ষেত্রে কর্মের প্রসার বা যোগাযোগ হবার সম্ভাবনা। বিশেষ করে লেখক, শিল্পী ও গবেষকদের পক্ষে এ কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কোনো ব্যাপারে স্বীকৃতি কিংবা পুরস্কারাদি লাভেরও সম্ভাবনা। ব্যবসায় ক্ষেত্রে আয় বাড়বে। কিন্তু ব্যয়-বাহুল্য এবং আকস্মিক কোন ব্যাপারে অন্যের সাহায্য কিংবা ধার কর্জ হওয়ার সম্ভাবনা। কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তি দ্বারা উপকৃত হবেন। গুরুজনদের মধ্যে কারো সংকট পীড়াদি উৎকণ্ঠা সৃষ্টি করতে পারে। কাপড় ও সুতার ব্যবসায়ে কোন সংকট দেখা দিতে পারে। পুরনো কোনো মামলা-মোকদ্দমার ব্যাপারে সুরাহা হবার সম্ভাবনা। বিষয়-সম্পত্তি ও উত্তরাধিকার-সংক্রান্ত ব্যাপারে মাসের একুশ দিনের কাছাকাছি সময়ে কোনো সুরাহা হতে পারে। পত্নীর স্বাস্থ্য খারাপ গেলেও তার দিক থেকে বিশেষ সহায়তা কোনো বিপদের ঝুঁকি থেকে বাঁচিয়ে দিতে পারে। তেইশ তারিখ থেকে শেষের কয়দিনের মধ্যে নতুন কোনো কাজে নামার সম্ভাবনা। বিশিষ্ট বন্ধুর সহায়তায় বিশেষ উপকার হবার সম্ভাবনা। রক্তের চাপ ও গলার অসুখ-বিসুখ উৎপাত করতে পারে। অবিবাহিতা মেয়েদের সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিবাহ হতে পারে। মহিলা চাকুরীপ্রার্থীদের এবং পরীক্ষার্থীদের সামান্য লাভের সম্ভাবনা। কিন্তু প্রীতির পাত্র ও বিশ্বাসী বন্ধুজনের আচরণ মনে আঘাত দিতে পারে। মকর লগ্নে জন্ম হলে কার্যের প্রসার, আর্থিক উন্নতি এবং নতুন কাজে উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়বে। কিন্তু পারিবারিক ব্যাপারে মনের উপর মাঝে মাঝে চাপ পড়বে।

কুম্ভ : নিজের সম্বন্ধে সজাগ হোন। আশেপাশের ঝঞ্ঝাট অথবা বিরূপ পরিবেশ এড়িয়ে নিজের উদ্দেশ্য সফল করতে এগিয়ে চলুন। আপনার দৃঢ়তা ও নিষ্ঠাই আপনাকে জয়ী করবে। ভেঙে পড়লে চলবে না। আর্থিক ব্যাপারে নৈরাশ্য হয়ত থাকবে। কিন্তু দশ তারিখের পর অনেকাংশে অনুকূল হবে। যদি চাকরী করে থাকেন, তবে চাকরী ক্ষেত্রেও উপরওয়ালার সুনজরে পড়তে পারেন; লোকের কথায় কিংবা কে আপনার বিরুদ্ধে কি বলেছে, সেসব কথায় কান দেবেন না। আপনার যোগ্যতা বা গুণের স্বীকৃতি পাবেন। একুশ তারিখ পর্যন্ত ধৈর্য ধরে থাকুন। অবিবাহিতদের সম্ভবত বিবাহের যোগাযোগ দেখা দেবে। বিশেষ করে কুমারী মেয়েদের বিবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। এ সময়ে যেসব মেয়ের বিবাহ হবে, তাদের দাম্পত্যজীবন সুখেরই হবে। গলা, দাঁত ও কানের অসুখ দেখা দিলে সাবধান হবেন। সন্তান-সন্ততিদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সতর্ক থাকা দরকার। পাঁচ বছরের কম যেসব শিশুর বয়স তাদের রাস্তাঘাটে নামতে দেবেন না; কিংবা যন্ত্রপাতি, অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে দেবেন না। আইনজীবীদের ও চিকিৎসকদের আয় বাড়বে। লেখকদের নতুন বই প্রশংসা পাবে। কুম্ভ লগ্নে জন্ম হলে প্রীতির প্রসার, নতুন বন্ধুলাভ এবং চাকরী ক্ষেত্রে স্থান পরিবর্তনের সম্ভাবনা রয়েছে।

মীন : গোড়ার দিকে মনোমত কাজে বাধা আসতে পারে। কিন্তু মাসের এগারো তারিখের পর পরিকল্পনামত কাজ এবং চাকরী ক্ষেত্রে নতুন সম্ভাবনা দেখা যায়। ছেলেমেয়েদের সম্পর্কে কোনো সুখবর পেতে পারেন। বিবাহযোগ্যা মেয়ের বিবাহের পাকাপাকি কথাবার্তাও হতে পারে। কিন্তু পত্নীর স্বাস্থ্য উৎপাত করবে। মধ্যভাগে কয়েকদিন নিজেও ব্যথা-বেদনা ও জ্বর-সর্দিতে কষ্ট পেতে পারেন। লেখক ও অধ্যাপকদের পক্ষে এ সময় শুভপ্রদ। কোনো রচনা বা গ্রন্থ ভাগ্যের মোড় ফিরিয়ে দিতে পারে। রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িত থাকলে শত্রুপক্ষ সম্পর্কে সাবধান থাকা দরকার। আমদানী-রপ্তানীর কারবারীদের ব্যবসায়ে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৃহৎ কলকারখানার মালিক ও সংবাদপত্রের মালিকদের কোনোরূপ সংকট দেখা দিতে পারে। আইনজীবী ও বিচারকদের উন্নতি ও সুনাম বৃদ্ধির মত যোগ রয়েছে। পরীক্ষার্থীদের পক্ষে এ মাস সুযোগপ্রদ। কিন্তু তরুণীদের স্বেচ্ছাকৃত বিবাহে প্রতারিত ও বিপদগ্রস্ত হবার আশঙ্কা আছে। সূক্ষ্ম কারু-কার্যের ও ভাস্কর্যের কর্মী ও বৃত্তিধারীদের নতুন সুযোগ আসবে। মীন লগ্নে জন্ম হলে স্বাস্থ্যের গোলমাল ও আর্থিক দুশ্চিন্তা কাজকর্মের ক্ষতি করতে পারে। কিন্তু বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে নিজের পরিকল্পনা সফল হতে পারে।
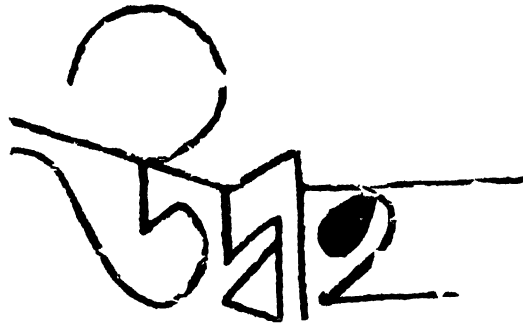
উদ্বাহ স্বরূপে সামাজিক। অনাদি ঊষায় মানুষ যখন সভ্যতার কাঁচা পথে হাঁটি হাঁটি পা পা তখন তার ব্যক্তিক এবং সামাজিক জীবন—আদৌ ছিল কি না—কোন কিছুই সঠিক বলা সম্ভব নয়। চরম শীতোষ্ণতার নাগরদোলায় দোদুল্যমান তদানীন্তন পৃথিবীতে তার টিকে থাকা যে কী দুঃসহ ছিল, কতবার যে তার অংশবিশেষ চিহ্নবিহীন হয়ে গেছে অতল জলের অপ্রতিরোধ্য উচ্ছ্বাসে আগ্নেয় উৎপাতের ভয়াবহ প্রাবল্যে, কিংবা অন্তহীন তুষার স্তূপের আগ্রাসী চলমানতার প্রকোপে তার কতক জানা, অধিকাংশই জানা যায় নি আজও। তবু, অনুমান করতে কষ্ট হয় না সে সময়ের মানুষকে। তার জীবনযাত্রার ছবি ভেসে ওঠে মানস-পটে কখনও কখনও।

ক্রমিক স্থিরতায় প্রকৃতি যখন অপেক্ষাকৃত শান্ত হয়ে এল, শান্ততর হতে লাগল পোষমানা কোনও বন্য জীবের মত, মানুষও নিজের কথা,—জীবনযাত্রার পদ্ধতি, ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবন, পারস্পরিক ভারসাম্য রক্ষা ইত্যাদি নানা প্রশ্ন নিয়ে বসার সুযোগ পেল স্থিরতর প্রাকৃতিক পরিবেশে। অনিশ্চয়তা যদি পায়ে পায়ে ফেরে ছায়ার মত, তবে চিন্তার অবকাশ মেলে না। যে জীবন মুহূর্তে নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশংকায় দোলাচল, সে জীবনে সমাজ ভাবনা নিতান্তই অলীক। আজ যে-কোন বস্তীর দিকে তাকালেই যেখানে জীবন দোলে সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সুতোর ওপর—এ কথার মর্ম সহজেই অনুভূত হয়। ওখানে শান্তি নেই, নিশ্চয় তার প্রসাদধন্য হতে পারে নি ওখানকার মানুষ, কাজেই দায়িত্বহীনতা, বেপরোয়া উদ্দাম মত্ততা ওদের জীবনে অত্যন্ত স্বাভাবিক। মূল কারণ ভিন্ন, সন্দেহ নেই; তবে কারণ যাই হোক, জীবনমরণের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে থাকার ফলাফল মূলত এক হওয়াই সম্ভব।

এই অনিশ্চয়তা আজ ছড়িয়ে পড়েছে সমাজের প্রায় সব স্তরে। ওপরতলার মুষ্টিমেয় ভাগ্যবান মানুষের ভাগ্যান্বেষণের অপার কৃপায় প্রায় গোটা সমাজের আজ নাভিশ্বাস উঠছে; চোখে পড়ে না চট্ করে হয় ত,

তথ্যান্বেষী

তবুও রঙিন চশমা খুলে নিলেই দেখা যায় আকাশ ততটা নীল নয়। শরতের আকাশও হাল্কা পাঁশুটে আস্তরণে উজ্জ্বল নীলাভা ম্লান করে দিয়েছে।

দাম্পত্য মানবজীবনের একটা অংশ; অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নিঃসন্দেহে। কেবল তার নিজের জীবনেই নয়, সমকালীন সমাজে এবং ভাবীকালেও এ জীবনের সুস্থতা-অসুস্থতা, আনন্দ-বেদনা ছায়া ফেলে। সে ছায়া দীর্ঘতর হয়ে ওঠে মানুষের গুরুত্বর ওপর কতকটা। কিন্তু, যত সামান্যই হোক, এর প্রভাব—প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ—পড়বেই, যত অকিঞ্চিৎকরই হোক না কেন।

আবৃত্ত দশমিকের মত ঘুরে ফিরে মানুষের জীবন দুঃস্বপ্নে মজে যাচ্ছে ক্ষেপে ক্ষেপে। দক্ষিণা হাওয়ার মাধুর্য কোন মুহূর্তে আসে ঠিকই, তবুও সে ভুলতে পারে না—'জন্মেই দেখি পেটে ভাত নেই কারো।' উদরান্ন জুগিয়ে নেওয়ার নিরবচ্ছিন্ন নিষ্ঠুর তাগিদে সে আজ মিলিত সংসার পাততে ভীতসন্ত্রস্ত। যে দুর্বহ বোঝা তার ঘাড়ে পাষাণভার, যার ভারে বিশ বছরেই সে ন্যুব্জদেহ আতংকিত তা' অন্য একজনকে এনে দুর্বহতর করে তোলার ভাবনাও তার কাছে দুঃস্বপ্নের বার্তা বয়ে আনে। কুড়িতে প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া ঘটে ওঠে না। যিনি আসবেন তাঁকে খাওয়াব কি? অনাগতদের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম। থাকবো কোন্ চুলোয়? কোন একটা বৃত্তিতে পাকাপোক্ত হওয়া দরকার, নিজেরই নুন আনতে পান্তা ফুরোয়—আর্থিক সাহায্য ছাড়া নতুন সংসার পাতা অসম্ভব। সেদিন আসতে আসতে চুলে পাক ধরবে। আপাততঃ উদ্বাহ নামক বিলাসিতা চিন্তার বাইরেই থাক।

এই হ'ল আজ ভারতের যুব-মানসের প্রতিফলন—উদ্বাহ সম্বন্ধে।

অথচ মন মানে না। আজ যাঁরা যৌবন জলতরংগের বেয়াড়াপনায় চিন্তিত এবং কটুভাষণে মুখর তাঁরা ভুলে যান তাঁদের সময়কার সামাজিক চেহারা। আজ আর কেউ কুড়িতে বুড়ি হয় না। প্রসাধনের কৃপায় মুখের রেখা ঢেকে পলাতক যৌবনকে ধরে রাখার ব্যর্থ করুণ প্রচেষ্টা চোখে পড়ে যত্রতত্র। ব্যর্থতা হতাশা দানা বাঁধছে ধীর নিশ্চিত গতিতে। কিশোরী ও যুবতীর। যুবক এবং সদ্য যৌবনোত্তীর্ণ হতাশদের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত। আইন-আদালতের পৃষ্ঠায় কয়েকদিন চোখ বোলালে রাতের ঘুম ছুটে যায়। তাও ক'টাই বা দৃষ্টিপথে আসে।

তাই, শুধু স্বাভাবিক চাহিদা—দেহ এবং মনের—মিটিয়ে দেওয়ার কথা উপেক্ষা করা আত্মহত্যারই নামান্তর মাত্র। শুধুমাত্র ভাবালুতার ঠুনকো বেলুনে ভর করে বলছি না হাজার হাজার যুবকের পরিণীত জীবনে আবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। সমস্যা-দুরূহ—সমাধানও ছেলের হাতের মোয়া নয় যে, তুলে দিলেই হ'ল। চরম নৈরাশ্য এবং পরাজিত মনোভাবের হাত থেকে যুবশক্তিকে বাঁচাতে হবে; নতুন জীবনের স্বপ্ন সময়মত বাস্তবায়নের সুযোগ এ ক্ষেত্রে অপরিহার্য। এ দেশের শান্তি রক্ষা করার দায়িত্ব যে সকলের, সমগ্রভাবে প্রতিটি মানুষের তা' অস্বীকার করা যায় কোন মুখে?

এলোমেলো বিশৃঙ্খল দায়িত্বহীনতা একক জীবনে যতখানি প্রভাবশীল বিবাহিত জীবনে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, তা হয় না। দৈহিক এবং মানসিক তৃপ্তির সংগে দায়িত্বভার সহজ হয়ে ওঠে; পরিশ্রম শুধুমাত্র জান্তব প্রয়োজন মেটানোর না থাকায় তা'তে আনন্দের লাগে। ভুললে চলে না বর্তমান কিছু অতীত আর কতকটা ভবিষ্যতের স্বপ্নই মানবজীবন। অতীত যার মেঘে ঢাকা, ভবিষ্যতের স্বপ্ন যার মনে নিরালম্ব, তার জীবনে হতাশা নিত্যসংগী। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজজীবনে তার সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনায় আলো-আঁধারি চলে; এই তার সুখ, এতেই তার বুক ভরে ওঠে কানায় কানায়। 'কী পাই নি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী' বলা তখনই সম্ভব হয়, যখন কিছু পাওয়ার আনন্দ ভিজিয়ে দেয় মনের স্তরগুলো। যত বড় স্বার্থপর এবং আত্মকেন্দ্রিকই হোক না কেন, বিনা চাওয়ায় কিছু না পেলে এবং অযাচিতে কিছু না দিলে সাধারণত মানুষের মন ভরে না।

দেওয়া চাই এমন কাউকে যাকে দিলে মন আপনা হ'তেই খুশী হয়ে ওঠে। মনে আসে না লাভ-ক্ষতির খতিয়ান। সে পেতে চায় এমন কারুর কাছ থেকে যে দিয়েই তৃপ্ত হবে, ভাববে না প্রতিদান পাওয়ার যোগ-বিয়োগের শেষ পর্যন্ত কী দাঁড়াবে।

কৈশোর ছেড়ে যৌবনে আসার কাল থেকে নবীনের কানে প্রবীণরা দাম্পত্য-জীবন আর সুখী-পরিবার গড়ার নানা আদর্শ আউড়ে চলেন ক্ষণে-ক্ষণে। গল্প-উপন্যাসে, নাটক ও চলচ্চিত্রে এ ধরণের বুলি ছড়িয়ে থাকে ইতস্তত। অথচ কুড়ি পেরিয়েছে যে, যার চোখে মিলিত সংসারের স্বপ্ন নিবিড় হয়ে উঠেছে দীর্ঘ দিনের নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে, তার স্বপ্ন যে নিছক স্বপ্নই তা' বুঝিয়ে দেওয়া হয় রূঢ় আঘাতে—ওহে, তিষ্ঠ ক্ষণকাল। কত কামাও তে মাসে যে ক্ষেপে উঠেছ উদ্বাহুর নামে। মুখুয্যেদের একটা যাত্রা দেখো, বুঝলে। তোমারই মংগল তা'তে, আমার আর কি।

এ জাতের বয়ান কানে আসে, আসবেও কান পাতলেই। ওরা উপহসিত হয় স্বপ্নময়তার অপবাদে; অথচ স্বপ্ন না থাকা যে কী ভয়াবহ তা' ভাবলেও শিউরে উঠি। প্রথম কবে যে স্বপ্ন দেখেছিল মানুষ। আজও তার জের মিটল না যার, ভগবান করুন এ স্বপ্ন যেন ভেঙে না যায় চিরতরে, অন্যথায় পরিণামচিন্তাও অস্তিত্বর ভিত্টুকু পর্যন্ত নাড়িয়ে দিয়ে নিরালম্ব করে দেয়।

অথচ আপাতদৃষ্টিতে এ সমস্যা সুরাহার কোন সূত্র চোখে পড়ে না। একটাই পথ খোলা আছে, তা' হ'ল পেছন ফেরা। অর্থাৎ, দু'-তিন পুরুষ আগের old fools-দের মত সদ্য যুবক সন্তানের দাম্পত্য-জীবনের পার্থিব দিকটার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সে ব্যাপারে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কিছুটা দায় নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া। এতে যে শুধু ওদেরই জীবন সুস্থ এবং সহজ হয়ে উঠবে তা নয়, ওদের সুস্থতা এবং স্বাভাবিকত্বর প্রসন্ন কিরণে গোটা সমাজটাই প্রসন্ন হয়ে উঠবে, অন্তত ইতিহাস সামনে রেখে সে সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই। এ দেশের এ ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ অতি দুরূহ। তাই বারান্তরে ভিন্ন দেশের তথ্যের সাহায্যে এ সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছে রইল।

আশ্রয়

রবীন্দ্র গুহ

সকলে বাঁচতে চায়। এমন কি সন্ধ্যার বিষন্ন গোলাপ
সারাদিন রৌদ্র মেখে বিকেলবেলায়
অচেনা স্পর্শ পেয়ে উষ্ণ হতে চায়।
তার বুকে গোপন দিনের ইচ্ছা, অনায়াস আলোর উত্তাপ।
ক্ষুদ্র কীট প্রাণপণ হেঁটে হেঁটে বকুলতলায়
একত্রিত উজ্জীবিত ধূপের সৌরভে;
এবং প্রেম, সুখ, ভালোবাসা ও প্রগাঢ় প্রণয়ের লোভে
দূরের পাখিরা সকলে ঘর খোঁজে নীরব জ্যোৎস্নায়।
কী উচ্ছল দুর্নিবার আশা। প্রতিদিন নগর প্রাচীরে
এইমতো আরও প্রচুর পাখি মনেমনে
ব্যস্ত হয়—দুঃখে, আলোতে, অভিমানে, আত্মহননে।
এবং সতর্ক জীবনের প্রথানুযায়ী ঈশ্বরে আশ্রয় নেয় ইত্যবসরে।

লাশ-চালা

অমরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়

॥ এক ॥

বিশ্বাস করতে পারেন?

এক শিক্ষিত যুবক নিরাশ্রয় নিঃসম্বল অবস্থায়, অনাহারে অনিদ্রায় কলকাতার পথে তিনদিন ঘুরে বেড়াচ্ছে কাজের সন্ধানে।

কিন্তু সব দরজাতেই একই উত্তর। শুধু বলার হেরফের। কোথাও মিষ্টি, কোথাও তেতো। কোথাও কিছু মৌখিক সহানুভূতি। কোথাও বা রূঢ় অপমান।

কাজ জোটে নি। সেই সঙ্গে উদরে জোটে নি অন্ন। তিনদিন অনাহারে বললেই চলে।

উপলব্ধি করতে পারেন, কোন মানুষের এই অসহ অবস্থাকে?

আজ আমার জীবনের যে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কাহিনী আপনাদের বলছি, তার পটভূমিকা হল এই।

দেশের বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শিখেছিলাম। কলকাতায় মধ্যে মধ্যে আসা-যাওয়া ছিল। বাবা-মা'র মৃত্যুর পর ভাগ্যের অন্বেষণে কলকাতায় এসেছিলাম। পকেটে ছিল ন'টাকা ষাট পয়সা। ঘুরতে ঘুরতে শিবপুরে জানাশোনা একটি লোকের মেসে উঠলাম।

পয়সা ফুরলো। ন'টাকার আর কতটুকুই বা আয়ু। জানাশোনা লোকটি তখন নিতান্তই অপরিচিত হয়ে উঠলেন। এ কদিন কোন রকমে চলল, দ্বিতীয় দিন মেসের অধিকারীর কটুবাক্য শুরু হল। নিদারুণ লজ্জায় মেস থেকে বেরিয়ে পথে নামলাম।

সে রাতটা কাটল একটা দোকানের ছাউনির তলায়। সকালে খিদের চোটে পকেটে যা ছিল তা খরচ করে ফেললাম। তারপর রইল সারাদিন কলকাতা কর্পোরেশনের কলের জল।

দিনভর টহল দেবার পর রাত্রে আর শরীর যেন টানতে পারছিলাম না। ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে একটা ফাঁকা গ্যারেজ দেখে তার মধ্যে ঢুকলাম। এবং সেই গ্যারেজের এক কোণে তেলকালি-কাদা-কেরাসিনসিক্ত মেঝের উপর তোফা ঘুম দিলাম।

সকাল। শরীর যেন পালকের মত হাল্কা। আবার পথ চলা। চায়ের দোকানে ভিড়। চায়ের পেয়ালা থেকে ধোঁয়া উঠছে। আর কিছু নয়। শুধু এক কাপ চা পাই তো আবার সারাদিন কাটিয়ে দিতে পারি।

অবশেষে যা কোনদিন কল্পনা করি নি তাই করতে প্রস্তুত হলাম। ভিক্ষা করবার জন্যে পথের মোড়ে দাঁড়ালাম।

এর আগে কাজের সন্ধানে অসংখ্য স্থানে বহু মানুষের সামনে দাঁড়িয়েছি, কখনো বা সেলাম ঠুকে, কখনো বা দণ্ডবৎ হয়ে, কখনো বা নমস্কার করে। কাজ পাই নি। যে-কোন কাজ করবার জন্যে রাজী ছিলাম।

মোটর ড্রাইভার (ভাল মোটর চালাতে জানতাম), বেয়ারা, বাজার সরকার, পিওন—যে কোন কাজ। কিন্তু কর্মদাতা সিদ্ধিদাতা সেই যে মুখ ফিরিয়ে রইলেন, সে মুখ তার আর আমার দিকে কৃপাদৃষ্টি নিয়ে ঘুরল না। কাজ জুটল না। বাকি রইল, ভিক্ষা, আর চুরি।

দাঁড়ালাম চৌমাথার মোড়ে। হাত পাতলাম। কিন্তু পয়সার বদলে পেলাম নানা বিশেষণ, নেশাখোর, গাঁটকাটা, পকেটমার---

হাত সরিয়ে নিলাম। সব রকম চেষ্টাই ব্যর্থ হল। বাকি রইল চুরি। লোকে তো বলে ঘ--কিন্তু চুরি করবার কলাকৌশল তো কিছুই জানি না।

ঘুরতে ঘুরতে শহরের উত্তর প্রান্তে। শ্যামবাজারের পাঁচমাথায়। মস্তবড় খাবারের দোকান। কাঁচের শো কেসের ভিতর থরে থরে খাবার সাজানো। কত রকমের খাবার---

দেখতে দেখতে মাথায় যেন আগুন লাগল। এক ঘুষিতে দাও এই কাচ চুরমার করে। তারপর যত ইচ্ছে থালা থেকে তুলে নাও—থালার পর থালা শেষ করে ফেলো—কচুরী আর সিঙ্গাড়া, মিহিদানা আর শোনপাপড়ি---

এই, হাট হাট। পথ আটকে ছিলাম বোধ হয়। এক ভুঁড়িওলা ভদ্রলোক আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে দোকানের ভিতর ঢুকে গেলেন। ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে এলাম।

সামনে একজন লোক চলেছে। তার পাঞ্জাবীর ঝোলা পকেটটা বেশ ভারী বোধ হচ্ছে। দেখবো নাকি চেষ্টা করে? ইচ্ছে হল। কিন্তু সাহসে কুললো না।

সন্ধ্যা হল। রাস্তার আলো জ্বলল। পায়ে পায়ে বাগবাজারের রাস্তা ধরে গঙ্গার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সুখের উপর আরও সুখ গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়তে লাগল। একে শীতকাল। তায় বৃষ্টি। সোনায় সোহাগা। শরীরের মধ্যেকার হাড়গুলো পর্যন্ত ঠক্‌ঠক্ করে নালিশ জানাতে লাগল।

অন্নপূর্ণা ঘাটের ওধারে একটা মাঝারি দোতালা বাড়ী। তারই গাড়ি-বারান্দার নীচে

ফিরে দাঁড়ালাম। চারিদিক নিঝুম নিস্তব্ধ। রাত্রি গভীর হতে গভীরতর হয়েছে। ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে বোধ হয়। রাস্তায় লোকজন নেই।

যে গাড়ীর নীচে আশ্রয় নিয়েছিলাম তার দোতলায় এবং একতলায় আলো জ্বলছে। হঠাৎ এই বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করবার অদম্য ইচ্ছে জাগল। কোন সঠিক উদ্দেশ্য ছিল না। [illegible] ঢুকব এই বাড়ির মধ্যে। গৃহস্বামীকে [illegible] খুলে বলব। তারপর দেখা যাক কী হয়।

[illegible] বাড়ির পিছন দিক পর্যন্ত [illegible] কোন দরজা তো খোলা নেই। [illegible] কোথাও নয়। জলের পাইপ বেয়ে [illegible] করে উঠে যাব এমন পাকা লোক আমি নই। তাহলে?

[illegible] করে উপায় মিলে গেল।

[illegible] দরজার পাশে পায়খানার ছাদটা বেশি উঁচু নয়। অল্প কসরতেই সেখানে [illegible]। তারপর সেখান থেকে ভিতরে [illegible]।

[illegible] গুর গুর করছে। এক প্রকার [illegible] আনন্দও বোধ করছি। কিছু একটা [illegible]। মনের মধ্যে তারই উত্তেজনা।

[illegible] একটা ছোট ঘরের পাশে রান্নাঘর। উনুনে [illegible] গনগন করছে। একপাশে একটা [illegible] দেওয়া।

[illegible] আনন্দে যেন লাফিয়ে উঠলাম। লুচি [illegible], দুধ---কত কী সাজানো। যেন আমারই [illegible] কেউ যত্ন করে সাজিয়ে রেখেছে। [illegible] কত যুগ পরে এই সব খাবার [illegible] পেটের মধ্যে শব্দ হতে লাগল। কে [illegible] কানে বললে, বসে যাও, আর দেরী [illegible]।

[illegible] মিনিটে থালা সাফ পাশেই একটা [illegible] কুঁজো আর জলের গেলাস। দু'তিন গেলাস জল খেয়ে একটা চাপা ঢেকুর [illegible] মনে হল যেন শরীরের ওজন [illegible] গেছে। একটা বিস্তীর্ণ আলস্যে [illegible] দারুণ জড়তা নামল। ঘুমে দুচোখ [illegible]।

[illegible]! চুরি করতে ঢুকে শেষে কী [illegible] ঘুমতে থাকব? পেশাদার চোরেরা [illegible] শুনে বলবে কি?

[illegible] বলুক, আমি তো আর নড়তে [illegible]। হাতড়াতে হাতড়াতে পাশের ঘরে [illegible] আধো-অন্ধকারে দেখলাম, এদিকে [illegible] তিনটে কৌচ আর কেদারা। বুঝলাম বৈঠকখানা।

[illegible] কৌচে। যেন জমিদার গুরু ভোজন

শেষ করে বিশ্রাম নিতে বসলেন। আবেশে দু'চোখের পাতা জড়িয়ে গেল।

হঠাৎ মনে হল, নীচের তলায় আমি একা নই। অন্য কেউ কাছাকাছি রয়েছে। ঠিক। থাকবার কথাই তো। যাদের বাড়ি তারা থাকবে না তো যাবে কোথায়?

চারিদিকে আলো জ্বলছে। সব দরজা খোলা। কম্পিত বুকে কৌচ থেকে উঠে দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। সহসা আমার গতি রুদ্ধ হল।

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে এক অপরিচিতা তরুণী।

॥ দুই ॥

মুহূর্তের জন্যে মাথাটা ঘুরে উঠল। চোর ধরা পড়েছে। এবার থানা--পুলিশ।

কিন্তু মেয়েটি তো চিৎকার করে উঠল না। চোর দেখে সে কি ভয় পেল না?

দুজনেই নিশ্চল। দুজনেই নীরব। এক এক সেকেণ্ডকে যেন এক এক যুগ বলে মনে হচ্ছে।

অবশেষে মেয়েটির কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মৃদু কম্পিত অথচ স্পষ্ট বাচনভঙ্গী।

---আপনি---আপনি এখানে কী করছেন? কি করতে এসেছেন?

লক্ষ্য করলাম, মেয়েটির চোখে-মুখে দারুণ ভয়ের চিহ্ন। কিন্তু তা বোধহয় আমাকে দেখে নয়।

বললাম---আমি আপনাদের বাড়ি অনধিকার প্রবেশ করেছি, আর পাশের ঘরে যার খাবার ছিল তার সমস্ত খাবার খেয়ে ফেলেছি।

মেয়েটি বললে---খাবার ছিল আমার। কিন্তু আপনি এ-ভাবে অনধিকার প্রবেশ করেছেন কেন?

আমতা আমতা করে কি বললাম, তা নিজেই বুঝলাম না। মেয়েটি নির্নিমেষ নয়নে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তখন কতকটা আশ্বস্ত হয়ে সংক্ষেপে নিজের অবস্থার কথা খুলে বললাম।

আমার কাহিনী শুনে মেয়েটি অস্ফুটে বললে---দু'দিন খাওয়া নেই, হাতে পয়সা নেই, মাথা খারাপ হওয়া আশ্চর্য নয়!

আমি অবাক হয়ে বললাম---আপনি আমার সব কথা বিশ্বাস করলেন?

---করলামই তো। কেন, সত্যি নয়?

একটা ঢোঁক গিলে বললাম---হঁ্যা, নিশ্চয়ই সত্যি। তবে অন্য কেউ হলে বিশ্বাস করত না।

পিছনে কি যেন শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি বিষম চমকে উঠল। তার মুখ সাদা হয়ে গেল। সারা শরীর কাঁপতে লাগল।

তার ভাবান্তর দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। মুখ ফিরিয়ে দেখলাম। একটা ভেজানো দরজা ধীরে ধীরে খুলে যাচ্ছে আর একটা বেড়াল ঘরে ঢুকছে।

বেড়ালটাকে দেখে মেয়েটি আশ্বস্ত হল। আমার দিকে ফিরে বললে---ও আমার পোষা মেনি।

বললাম---তা তো বুঝলাম। কিন্তু আপনি যেন অত্যন্ত ভয় পেয়েছেন। ব্যাপার কি বলুন তো?

---ব্যাপার। ব্যাপার---কিছু নয়।

---কিন্তু আমার যেন কেমন মনে হচ্ছে। যে কোন কারণেই হোক আপনি আতঙ্কগ্রস্ত আর সে আতঙ্ক আমাকে দেখে নয়।

মেয়েটি আয়ত দু চোখে ক্লান্ত দৃষ্টি। বললে, আপনাকে দেখে আতঙ্ক হবে কেন? আপনাকে দেখে ভয় পাইনি মোটেই।

বললাম—কিন্তু ভয় পাওয়া তো উচিৎ ছিল। গভীর রাত্রে চোরের মত একজন অপরিচিত লোক আপনাদের বাড়ীর মধ্যে---

—তাহলেও আমার ভয় করে নি।

—ধন্যবাদ। আচ্ছা, তাহলে অনুমতি করেন তো এবার যাই।

আমার কথা শুনে মেয়েটির বিবর্ণ ঠোঁটে ক্ষীণ হাসির কুঙ্কুম ফুটে উঠল। বললে—আমি অনুমতি না দিলে কি আপনি যেতে পারেন না? আপনাকে আটকাতে পারি তেমন ক্ষমতা আমার নেই।

অবস্থা আর পরিবেশ যদি অন্য রকম হত তাহলে উত্তরে নাটকীয়ভাবে কিছু বলা যেতে পারতো, কিন্তু বর্তমানে সে সুযোগ নেই। বললাম—আপনাকে মৌখিক ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আমার মনের কথা বলা যাবে না। সুতরাং সে চেষ্টা করব না। কিন্তু যদি আপনার কোন কাজে লাগতে পারতাম তাহলে সত্যিই কৃতার্থ বোধ করতাম। আমার মনে হচ্ছে, যে কোন কারণেই হোক, আপনি বিশেষ রকম উদ্বিগ্ন। অবিশ্যি সাবে বাবে আমার জানতে চাওয়াটা---

হঠাৎ মেয়েটি বললে—তাহলে যাবেন না। আমি বলব আপনাকে। হয়ত আপনার সাহায্য আমার দরকার হবে। আসুন আমার সঙ্গে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে ঘরে বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। আমি তাকে অনুসরণ করলাম।

অদূরে দোতলায় ওঠবার সিঁড়ি। মেয়েটি আমাকে আহ্বান করে দোতলায় উঠল। তার পিছু পিছু উপরে গিয়ে একটি ঘরের সামনে দাঁড়ালাম।

দরজার পাশে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে ক্লান্ত স্বরে মেয়েটি বললে—ভিতরে গিয়ে দেখুন।

ভিতরে গিয়ে দেখব? কী দেখবো? কিছুই বুঝতে পারছি না। সমস্তই যেন হেঁয়ালী বলে বোধ হচ্ছে।

মেয়েটি আবার বললে,—যান, ভিতরে যান।

দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

মাঝারি আকারের বসবার ঘর। একধারে দুই-তিনটে আলমারিতে বই সাজানো, নজরে পড়ল প্রথমেই।

মনে করেছিলাম, ঘরে কেউ নেই। কিন্তু তা নয়। ঘরের মধ্যে লোক রয়েছে। একপাশে একটি ছোট টেবিল। তার সামনে চেয়ারে বসে আছেন এক ব্যক্তি, বোধ করি গৃহস্বামী।

কিন্তু ভদ্রলোক অমন ভাবে বসে আছেন কেন? মাথাটা টেবিলের উপর নুয়ে পড়েছে। দুই হাত দুপাশে বিলম্বিত!---এগিয়ে গেলাম—এ কী ভীষণ ব্যাপার!

কী ভয়ানক! লোকটি জীবন্ত নয়—মৃত।

॥ তিন ॥

পিছনে অস্পষ্ট শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম। মেয়েটি ঘরের মধ্যে ঢুকে অবসন্ন-ভাবে একটা সোফায় বসে পড়ছে।

তার নিশ্বাস দ্রুত। তার চোখেমুখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। কিছুক্ষণের জন্যে বিহ্বল হয়ে গেলাম।

তারপর আবার মৃত ব্যক্তির প্রতি মনোযোগ দিলাম। বেশ কিছুক্ষণ হবে লোকটি মারা গেছে।

কেমন করে মরেছে, তা আবিষ্কার করতেও দেরী হল না। ভদ্রলোকের খয়েরি রং-এর পিরানের পিছন দিকে ঘাড়ের ঠিক নীচেই একটা গোল ক্ষতচিহ্নের মুখে চাপ চাপ রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে। কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁকে খুন করা হয়েছে। সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ঘরের এদিক ওদিক দেখলাম, কোন ছুরি বা অস্ত্র কোথাও পড়ে আছে, দেখতে পেলাম না।

টেবিলের সামনে গিয়ে ঝুঁকে দাঁড়ালাম। নিহত লোকটির বয়স পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে। রোগা চেহারা কিন্তু বেশ শক্ত-সমর্থ। সম্ভবত ভদ্রলোক চিঠি লিখতে বসেছিলেন, এমন সময় পিছন থেকে আঘাত করে তাঁকে মারা হয়েছে।

একটু পরে মেয়েটির কাছে গিয়ে প্রশ্ন করলাম—কে এই ভদ্রলোক?

উত্তর হল—আমার কাকা। বাবার বৈমাত্র ভাই।

—এ ব্যাপারের আপনি কিছু জানেন?

অনমনস্ক ভাবে মেয়েটি জবাব দিলে—কিছু জানি না। সেই তো বিপদ।

—তার মানে?

আমার পানে তাকিয়ে মেয়েটি বললে—তার মানে, লোকে বলবে, আমিই একাজ করেছি। বলবেই। আপনি আমায় সাহায্য করবেন বলছিলেন। সাহায্য করুন।

তার এলোমেলো কথার জবাবে কি উত্তর দেব ভেবে পেলাম না। কেন যে লোকে তাকেই সন্দেহ করবে, তারও গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারলাম না।

আপন মনে মেয়েটি বলতে লাগল—আপনাকে হয়ত সব কথা বোঝাতে পারবো না। কিন্তু সকলে বলবে, আমিই একাজ করেছি। কাকার সঙ্গে আমার সদ্ভাব ছিল না, একথা পাড়া-প্রতিবেশী সকলেই জানে। নিতান্ত বাধ্য হয়েই আমাকে এই লোকের আশ্রয়ে থাকতে হয়েছে। কিন্তু একদিনের জন্যেও আমার শান্তি ছিল না। কাকা আমাকে দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। আমিও তাঁকে কোনদিন সহ্য করতে পারি নি। কিন্তু তাহলেও আমি এই ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গও জানি না। আপনি দয়া করে আমার কথা বিশ্বাস করবেন।

সংক্ষেপে বললাম—বিশ্বাস করলাম।

মেয়েটি দু'তিন মিনিট নীরব রইল। কি যেন ভাবল। তারপর বললে—এখন আমার পরিত্রাণের একমাত্র পথ হচ্ছে, লাশটাকে সরিয়ে ফেলা, দূরে কোথাও রেখে আসা। এ ছাড়া অন্য কোন পথ নেই। আমি অনেক ভেবে দেখেছি।

—বুঝেছি। অন্য কোথাও মৃতদেহটাকে পাওয়া গেলে, ভদ্রলোক যে এই বাড়িতেই খুন হয়েছেন তা প্রমাণ হবে না এবং তখন আর লোকে আপনাকে সন্দেহ করবে না।

মেয়েটির ঠোঁটদুটি কাঁপতে লাগল। বললে—ঠিক। আমি ঠিক এ কথাই বলতে চাই-ছিলাম। আপনি যদি আমায় সাহায্য করেন তাহলে আমার কাছে যত টাকা আছে সব দেব। আপনি---

বললাম—টাকার কথা এখন থাক। তবে আপনাকে আমি সাহায্য করব। কিন্তু বাড়ির চাকর-ঝি! তারা যদি এসে পড়ে!

মাথা নেড়ে মেয়েটি বললে—সে ভয় নেই। তারা কাল আটটা ন'টার আগে আসবে না। ঠিকে লোক। সন্ধ্যার পর চলে যায়। পরের দিন আসে।

বললাম—আপনি নিশ্চিন্ত হন; লাশটার গতি করে দিচ্ছি। কিছু টাকা এনে দিন দিকি আমায়। একটা গাড়ি ভাড়া করবার দরকার হবে।

॥ চার ॥

গভীর রাত্রি ঝিম্‌ঝিম্ করছে।

শীতের বর্ষণসিক্ত নিশুতি রাত। রাস্তায় জনমানবের চিহ্ন নেই। মাথার উপর কালো আকাশে ঘন মেঘের কুণ্ডলী।

মনে হচ্ছিল যেন কোন স্বপ্নলোকে পৌঁছে অদ্ভুত অলৌকিক কাজে লিপ্ত হয়েছি। মাথায় পাগড়ির মত একটা র‍্যাপার জড়ানো। গায়ে একটা মোটা কম্বল। পিঠের উপর একটা দেড়মণ ভারী লাশ।

এই অবস্থায় পথ চলছি। অলৌকিক নয়তো কি?

কিন্তু আশ্চর্য, একটুও ভয় করছে না। বরঞ্চ, মনের মধ্যে এক প্রকার বিচিত্র উত্তেজিত আনন্দ বোধ করছি।

হ্যাঁ, এতদিনে একটা কাজের মতো কাজ পেয়েছি। জীবনে নাটক এসেছে। রোমাঞ্চকর নাটকের প্রথম অঙ্ক সুরু হয়েছে।

তা তো হয়েছে। কিন্তু যাব কোন দিকে? উত্তরে, দক্ষিণে, না পুবে?

এখন আর দিক-বিদিক বিচারের সময় নেই। যেদিকে দু'চোখ চায়। বাগবাজারের রাস্তা ধরে সেই অদ্ভুত লাশ-চালা নাটকের নায়ক আমি---এগিয়ে চললাম।

একজন দোকানি দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করতে করতে আমার দিকে চাইল।

পিঠের বোঝার উপর কম্বলটা ভাল করে টেনে দিয়ে বেসুরে একটা টপ্পাগান ধরে দিলাম---রাস্তা দিয়ে যেন মাতাল চলেছে---পদক্ষেপও নেই মত---

অদূরে তীব্র আলো। মোটরের হেড লাইট। জ্বলে উঠেই নিবে গেল।

একটা সঙ্কল্প এঁটে জোরে পা ফেলে এগিয়ে গেলাম। অনুমান মিথ্যা নয়। সামনে একটা ট্যাক্সি।

পথের পাশে একটা বাড়ীর সামনে ট্যাক্সিটা এসে দাঁড়িয়েছে। তারই হেড লাইটের আলো পথের উপর পড়েছিল।

সোয়ারী নেমে সামনের বাড়ীর মধ্যে চলে গেছে। আর ড্রাইভার তার মালপত্র পৌঁছে দিতে বাড়ীর মধ্যে ঢুকেছে।

এই এক সুযোগ। বোঝার ভার আর তো বইতে পারছি না। দেখা যাক।

ট্যাক্সির কাছে গেলাম। ড্রাইভার তখনো ভিতরে। চোখের পলকে ট্যাক্সির দরজা খুলে লাশটাকে হেঁচড়ে ভিতরে ফেলে পিছনকার সীটে বসিয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কম্বলটা দিয়ে ঢেকে দিলাম তার সর্বাঙ্গ---

ইতিমধ্যে ট্যাক্সিচালক বাইরে এসেছে।

আহা! আর এক মিনিট পরে যদি আসতো! তাহলে নির্বিঘ্নে লাশটাকে রেখে চম্পট দিতে পারতাম আর ড্রাইভার হয়ত ভিতরের অন্ধকারে তাকে দেখতে না পেয়ে ট্যাক্সি চালিয়ে চলে যেতো দূরে, হয়ত গ্যারেজে বা অন্য কোন সোয়ারীর আশায় অন্য পথ ধরে অনেক রাস্তা পার হয়ে। তারপর সেখানে যা ইচ্ছে তা হোক। ততক্ষণ আমি---আমরা নিরাপদ।

কিন্তু তা হল না। এবং যখন হল না তখন অভিনয় সুরু করতে হল!

---হ্যাঁ, বাবা। সোনারচাঁদ সাঙাৎ আমার; এ গাড়ী কি তোমারই বাবা?

কথার সঙ্গে সঙ্গে পকেটের টাকা ঝনঝন করে উঠল।

ড্রাইভার আমার টলটলায়মান অবস্থা দেখে আর জড়ানো কথা শুনে হেসে বললে---হ্যাঁ, আমারই গাড়ী। বাড়ি যাবেন?

আমার মাতলামো উত্তরোত্তর বাড়ছে।

---বাড়ী! কার বাড়ী? হ্যাঁ, বাড়ী যাব। দোস্ত কাৎ, আমি কিন্তু বাবা সিধে আছি। কেন, হ্যাঁ কি না, বল বাবা সাঙাৎ।

---হ্যাঁ, ঠিক আছেন।

ভিতরের লাশটাকে উদ্দেশ করে বললাম---শোন হে শোন, তুমি তো বাবা দাঁড়াতেই পারছিলে না, পা লটপট করছিল দু'পাত্র টেনেই। বুঝলে কিনা সাঙাৎ, দোস্ত আমার বেশি টানতে পারে না, দু'পাত্র টেনেই ব্যস, রাস্তাতেই শয্যে নেয় আর কি। তাই তুলে দিয়েছি গাড়িতে। আমিও এই উঠলাম।

বলতে বলতে গাড়ির ভিতর উঠে বসলাম।

অভিনয় বোধকরি নিখুঁত হয়েছিল। ড্রাইভার কোন সন্দেহ করল না। মোটরের স্টার্ট দিয়ে বললে---কোথায় যাবেন?

---কোথায়? অ্যাঁ। কোথায়? কোন দিকে? হ্যাঁ মনে পড়েছে, চলো বাবা টালার দিকে। ঐ যে পাঁচ মাথার মোড় দিয়ে বাঁ দিকে ঘুরে বেলগাছিয়া, সেখানে আছে অনাথ দেবের গলি। আহা! একে অনাথ, তায় দেবতা। পেন্নাম হই দাদাঠাকুর। চল বাবা অনাথদেবের গলি। আমাদের এই নড়বড়ে দাদাঠাকুরকে নামিয়ে দিয়ে, বুঝলে কিনা দাদাব, (ড্রাইভারের পিঠে গোঁজা দিয়ে) তোমাতে আমাতে আর দুচার পাত্তর---ভাবনা নেই, পকেটে বেস্ত আছে। কি বল?

ড্রাইভার কি বললে বুঝতে পারলাম না।

ফাঁকা রাস্তা দিয়ে তীরবেগে মোটর বেলগাছিয়া পুল পার হয়ে গেল।

শরীরের মধ্যে যেন ইলেকট্রিকের স্রোত বইছে। এই দারুণ শীতেও কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিটছে।

হঠাৎ দেখি, লাশটা হেলে পড়েছে। তার মাথাটা আমার কাঁধের উপর। শিউরে উঠে তাকে আবার সোজা করে বসিয়ে দিলাম। বারবার টলে পড়ে লাশটা যেন আপত্তি জানাতে লাগল। আর দারুণ অস্বস্তিতে আমার সারা শরীর বারবার মুচড়ে উঠতে লাগল।

---বাঁয়ে, হ্যাঁ। ঠিক হ্যায়। ওহে, ওঠো না চাঁদ! বাড়ি এসে পড়েছে! অ্যাঁ কি বলছ? না, বাবা, বোতল কি সঙ্গে এনেছি নাকি! শুনছো ড্রাইভার, বন্ধু আমার রসিক আছে, বলছে কি না, আর এক পাত্তর না টেনে নামতে পারছি না। ব্যস, ব্যস, ডাইনে ঘুরেই বাঁ দিকে। ব্যস। রোককে।

ড্রাইভার গাড়ি থামাল।

চাপা গলায় বললাম---দেখো ভাই ড্রাইভার। আমার বন্ধুর গিন্নিটা বড় বেয়াড়া। মোটরে এসেছে এইভাবে, দেখলে ভীষণ ক্ষেপে যাবে, আর আমাদের গুষ্টির তুষ্টি করে ছাড়বে। কাজ নেই ভাই সেসব কথা শুনে। শেষে একটা হাঙ্গামা বেধে যাবে। তার চেয়ে এক কাজ করা যাক। আমি ওকে নামাবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি মোটরটা চালিয়ে নিয়ে গিয়ে পার্কের ধারে দাঁড় করাও, আমি ওকে এদের বাড়ির রোয়াকে বসিয়ে বুঝেছো কিনা, দে লম্বা। তারপর তোমাতে আমাতে বুঝলে কিনা, চালাও পানসি বেলঘরিয়া।

এমন সুবোধ আর অবোধ ড্রাইভার আর দেখিনি। যা বললাম, অক্ষর অক্ষরে তা পালন করলে। মদের নেশায় অচৈতন্য বন্ধুকে যখন গাড়ি থেকে নামালাম, তখন সেদিকে একবার চেয়েও দেখল না, তাকে পথের উপর টেনে নামাতেই ধীরে ধীরে মোটর নিয়ে এগিয়ে গেল।

সর্বাঙ্গ উত্তেজনায় কাঁপছে। সবনাশ! দূরে একটা পুলিশ। সে কি আমায় দেখতে পেয়েছে? বোধহয় নয়।

যাই হোক, আর দেরী করা নয়।

একটা পাঁচীলের ধারে ফণিমনসার ঝোঁপের আড়ালে লাশটাকে বসিয়ে দিলাম। তারপর দ্রুতপদে পার্কের দিকে অগ্রসর হলাম।

দূর থেকে ড্রাইভার হাঁকল---বাবুজি! ইধর!

সাড়া দিয়ে তার কাছে গিয়ে মোটরে উঠে বসলাম।

কিছুক্ষণের জন্যে বোধ হয় অভিনয় ভুলে গিয়েছিলাম। পুলিশটা এগিয়ে এলো।

মুখ বার করে বললাম---আজ জাড়াটা বেশ চেপে পড়েছে। কী বল জমাদার?

---হাঁ বাবু! লেকেন, এত রাতে আপনি!

মুখটা বাড়িয়ে তার কানের কাছে নিয়ে গিয়ে দু'চারটে কথা বলতেই পাহারাওলাটি দু'চোখ বড় করে বললে---এহি বাত। সমঝা!

---চলো ড্রাইভার।

কনষ্টেবল এবার সেলাম করল। মোটর চলতে লাগল।

আমার ভাবভঙ্গী দেখে মোটর-চালক বোধ হয় কিছু বিস্মিত হয়েছিল। বললাম---অবস্থার ফেরে পড়লে সব রকমই করতে হয়, কি বল সাঙাৎ। চল, এবার আমরা বাড়ি যাই!

---কোন্ দিকে যাব, বলুন।

---কোন্ দিকে? যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে।

মনে মনে বললাম, ভাগ্যে এ অঞ্চলের অ্যাসিস্ট্যাণ্ট কমিশনারের নামটা জানা ছিল, তার আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে কনস্টেবলটাকে আচ্ছা বোকা বানানো গিয়েছে।

দেখতে দেখতে ট্যাক্সি বাগবাজারের মোড়ের কাছে এলো। বললাম---ব্যস! এইখানেই থামো। এই পাশেই আমার বাসা।

মোটর থেকে নেমে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে পূব দিকের গলির মধ্যে ঢুকে গেলাম। উদ্দেশ্য; মোটরচালককে আমার আসল গন্তব্য স্থলে জানতে না দেওয়া।

মিনিট দশেক পরে, যে বাড়ি থেকে লাশ বার করেছিলাম সেই বাড়ির দরজায় গিয়ে দাঁড়ালাম।

দরজা বন্ধ। দু'চারবার কড়া নাড়বার পর ভিতর থেকে প্রশ্ন এলো—কে?

সাড়া দিয়ে বললাম—আমি। অর্থাৎ খানিক আগে- - -

—বুঝেছি।

একটু পরেই মেয়েটি দরজা খুলে মুখ বাড়াল।

—এসেছেন?

—হ্যাঁ। এসেছি। এবং নির্বিঘ্নে আপনার কাজ সেরে এসেছি।

—বাঁচলাম। আসুন। ভিতরে আসুন।

ভিতরে গিয়ে সামনের ঘরে বসলাম।

মেয়েটি পাশের ঘর থেকে একটা মোটা কম্বল এনে আমার গায়ে ফেলে দিয়ে বললে—দারুণ শীত।

—তাতে আর সন্দেহ নেই। এই রকম একটা বস্তুর প্রয়োজন বোধ করছিলাম হাড়ে হাড়ে।

মেয়েটি একটু দূরে একখানা চৌকি টেনে নিয়ে বসল। দেখলাম, তার দু' চোখে ঘুম জড়ানো। স্বল্প আলোর নীচে তার সেই ঘুমাতুর দৃষ্টি যেন ঘরের মধ্যে মায়া ছড়ালো।

নীরবে তার মুখের পানে তাকিয়েছিলাম। মেয়েটি .. হাসল। তারপর বললে—আশ্চর্য আপনি চলে যাবার পর আমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলেন?

—হ্যাঁ। দিব্যি ঘুম দিচ্ছিলাম। আপনার কড়া নাড়া শুনে ঘুম ভাঙল।

একটু থেমে দু-চারটে কথা ভেবে নিয়ে বললাম—দেখুন, একটা কথা আছে।

—কি কথা, বলুন!

—আমাদের মধ্যে পরিচয় আর নামধাম গুলো জানা না থাকলে প্রতিপদে অসুবিধে। অতএব যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে- - -

—না, না। আপত্তি কিসের। আমার নাম রমলা। আমরা গোঁসাই।

—অধীনের নাম অতনু। আমরা ভট্টাচার্য।

রমলা মৃদু হাসল। আমার মুখের পানে চোখ তুলে বললে—তাহলে অতনুবাবু, এবার কাজের কথা হোক।

আমি হাসলাম। বললাম—হোক।

রমলা বললে—আপনাকে ধন্যবাদ দেবার শক্তি আমার নেই। আপনার ঋণ শোধ করবার নয়। তাহলেও বলুন, কত টাকা আপনাকে দেব?

রমলার কথা শুনে আমি হাসি চাপতে পারলাম না।

—হাসছেন কেন?

—হাসির কথা শুনে হাসাই তো স্বাভাবিক।

—আমি কি কিছু অন্যায় বলেছি?

হেসে বললাম—সেটা একটু ভেবে পরে বলব। উপস্থিত আর বসতে পারছি না। যদি অনুমতি করেন তাহলে এই সোফাটার ওপরেই একটু গড়িয়ে নি।

রমলা তাড়াতাড়ি বললে—বেশ তো। আপনি বিশ্রাম করুন। আমি যাই।

এই বলে সে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

কী অদ্ভুত পরিবেশ।

নিস্তব্ধ নির্জন বাড়ি। তার মধ্যে একটি মেয়ে। আর একটি ছেলে। এক ভয়ংকর অস্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে তাদের পরিচয়- -!

কিন্তু থাক ও সব দার্শনিক চিন্তা। তার চেয়ে ক্লান্ত দুটো চোখকে একটু বিশ্রাম দিই। সত্যিই ঘুমের ভারে দু' চোখের পাতা জড়িয়ে আসছিল। সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন অবসাদে নেতিয়ে পড়েছে।

তিন দিন উপবাসের পর আহার্য-আয়োজন।

তার উপর এই অস্বাভাবিক অকল্পনীয় ঘটনার উত্তেজনা ---শরীরের আর অপরাধ কি।

সোফার উপর দেহ এলিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সমস্ত পৃথিবী অন্ধকারে ডুব দেল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানি না।

হঠাৎ মনে হল, কে যেন নাম ধরে ডাকছে।

চোখ মেলে তাকালাম, অদূরে ডাক্তার দু'চোখের দৃষ্টি আমার মুখের উপর নিবদ্ধ।

অপরিচিত ঘর। অজানা পরিবেশ। অপরিচিতা মানবী এ যেন মধুর স্বপ্নের শেষ দশা।

দু' চোখ আমার যেন আপনি মুদে এলো।

---অতনুবাবু। উঠুন। সকাল হয়েছে।

আর স্বপ্ন দেখা চলল না।

উঠে বসলাম। চারিদিকে আলোয় আলো। গতরাত্রের দুঃসহ কালো যবনিকা সরে গেছে সকালবেলাকার নতুন আলোয় মনের মধ্যে নতুন স্পন্দন। যেন সকল ভয়ের শেষ হয়েছে।

বললাম---অনেকখানি বেলা হয়েছে। ডেকে দেননি কেন?

রমলা বললে---যে রকম অঘোরে ঘুমুচ্ছিলেন ডাকতে মায়া লাগল। তা ছাড়া আমিও ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। এই উঠলাম।

উঠে দাঁড়ালাম আর নয়। এবার বিদায়ের পালা।

বললাম---বলতে লজ্জা লজ্জা করছে। কিন্তু কিছু টাকা পেলে উপকার হত।

---নিশ্চয় নিশ্চয়।

রমলার মুখের উপর ক্ষীণ রক্তাভা দেখা দিল। ক্ষণেক ইতস্তত করে বললে একটা কথা বলছিলাম, অতনুবাবু।

---বলুন।

---বলছিলাম কি টাকা নিয়ে আপনার প্রয়োজনীয় জামা কাপড় আর সব জিনিষ কিনুন সেই সঙ্গে একটি বাসাও ঠিক করুন। তারপর যদি একবার দয়া করে আসেন তাহলে আপনার সঙ্গে আরও কিছু পরামর্শ করি। আমি বড় বিপন্ন বোধ করছি। কি করব, না করব ভেবে পাচ্ছি না।

মেয়েটির মধ্যে বাস্তববুদ্ধির অভাব নেই। নিজের অবস্থাটা সে ভাল করেই বুঝতে পেরেছে এবং সেজন্যে অতি মাত্রায় ঘাবড়ে না গিয়ে বরং অবস্থাকে অতিক্রম করবার কথা চিন্তা করছে।

বললাম---আমাকে বেশি বলতে হবে না রমলা দেবী। আমি নিশ্চয় আসবো।

একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রমলা বলল ---আপনার কথায় অনেকখানি ভরসা পেলাম। আমার যে আর কেউ নেই---

কথায় বিষাদের সুর।

একটু থেমে দ্বিধার সঙ্গে প্রশ্ন করলাম আপনার বাবা মা---

মাথা নাড়ল রমলা---বললে---দু'জনের কেউ নেই।

---ভাইবোন?

---তাও না।

একটু সঙ্কোচের সঙ্গেই প্রশ্ন করলাম ---বোধ হচ্ছে আপনার এখনো বিবাহ হয় নি---

আমার কথা শুনে রমলার ঠোঁটের কোণে মৃদু হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল। মুখটা ঈষৎ ফিরিয়ে নিয়ে বললে---আপনার অনুমান শক্তি প্রশংসা করবার মত।

তারপর মুখ ফিরিয়ে আমার মুখের পানে পূর্ণ দৃষ্টি স্থাপন করে বললে---তাহলে ওই কথাই রইল। আপনি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিরে আসছেন।

হেসে বললাম---সেই রকমই তো কথা হল।

---ধন্যবাদ। তাহলে ওপরে চলুন। কাকার বসবার ঘরেই আলমারিতে টাকা আছে। চাবি আমার কাছেই থাকে।

---চলুন।

দু'জনে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠলাম। আমি আগে। রমলা আমার পিছনে।

সকালবেলাকার আলোয় দেখলাম, দোতলাটি নীচের তলার চেয়ে অল্প পরিসর। পাশাপাশি বোধ হয় খানদুয়েক ঘর। সামনেই সেই ঘর যে ঘর থেকে রাত্রে লাশ চালান করেছিলাম।

ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল। রমলা আমার পাশ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে দরজা ঠেলে দিল।

ঘরের জানলাগুলো সব ছিল বন্ধ। তাই ভিতরটা অন্ধকার।

আমি দরজার মুখে দাঁড়ালাম।

রমলা বললে---বাঁ দিকে সুইচ আছে। হাত বাড়ালেই পাবেন।

আমি সেই দিক ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিলাম। তাই বোধ করি রমলা আমাকেই আলোটা জ্বালাতে বললে।

হাত বাড়াতেই সুইচ পেলাম। টিপে দিতেই উজ্জ্বল তীব্র আলোয় ঘর প্লাবিত হল---

পরক্ষণেই মনে হল যেন পাগল হয়ে গিয়েছি---অথবা দু'চোখ অন্ধ হয়ে গেছে--- অথবা---

অবিশ্বাস্য ব্যাপার।

ঘরের মধ্যে টেবিল ঠিক সেইস্থানেই রয়েছে। এবং টেবিলের ধারে চেয়ারের উপর ঠিক সেইভাবে দু' পাশে দু' হাত ঝুলিয়ে সেই লাশটা বসে আছে যাকে চার পাঁচ ঘণ্টা আগে কাঁধে করে আমি টালার রাস্তায় বসিয়ে দিয়ে এসেছিলাম।

[ক্রমশ।

বিদায় বেলায়

বিভাসিন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়

গানের আসর থেকে ছুটী নিতে হলে
"প্রিয়তম চলে যাই" কখনো না বলে
চলে যেয়ো। চুপিসারে
পা টিপে টিপে পেছনের দেয়াল ধরে
যেমন স্বর্গীয় পাখিরা ভেসে যায়
আকাশে সাগরের পারে
আপন খেয়ালে। পিছু না ফিরে।
ধ্যানীর কাছ থেকে সরে যেতে হলে
কোন পতনের শব্দ না তুলে
সকরুণ দৃষ্টিতে চলে যেয়ো।

কম্পিত অধরের মৃদু গুঞ্জনে জাগিও না
শুধু চলে যেয়ো, বিশাল অম্বরে বেহাগে বাহারে।
ক্রমাগত গিয়ে গিয়ে দূরে,
অশেষ দূরে জমিয়ো নিরন্তর পাড়ি।
প্রেমে যদি হয়ে থাকি ক্লিষ্ট, ক্ষমাতুর
ক্ষমা ক'রো।
ক্ষমা ক'রো যদি তোমার
সম্মানে স্বর্ণ না হতে পারি।
পুনশ্চ নতুন নাটক শুরু হলে
আসে যদি তোমাকে চাওয়ার দিন
তুমি আকাঙ্ক্ষার চিরকাল জ্বলো অমলিন।
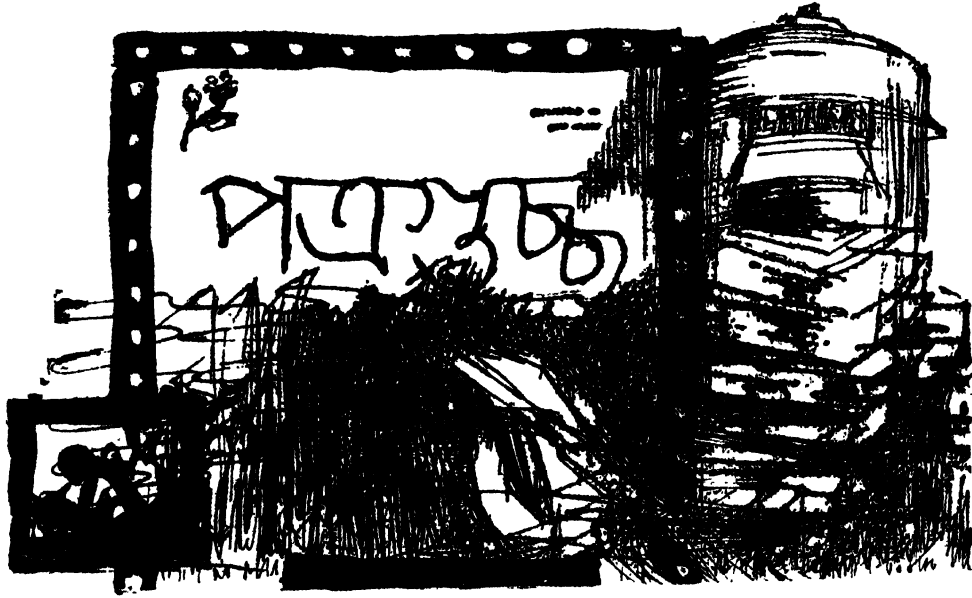
মাসিক বসুমতীর সম্পাদককে লেখা বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের পত্রাবলী

[মাসিক বসুমতী আগামী বৈশাখে চুয়াল্লিশ বর্ষ অতিক্রম করে পঁয়তাল্লিশ বর্ষে পদার্পণ করবে। তার এই চুয়াল্লিশ বছরের কাহিনী বাঙলা সাহিত্যের দুর্বার অগ্রগতির এক নিরবচ্ছিন্ন ইতিহাস। অগণিত পাঠক-পাঠিকা এবং অসংখ্য শুভানুধ্যায়ীর শুভেচ্ছাই তার যাত্রাপথের প্রধান পাথেয়। বর্তমানে পাঠক-পাঠিকা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন যে, মাসিক বসুমতী বর্ধিত কলেবরে আরও অধিক সম্ভার বহন করে আত্মপ্রকাশ করছে। আনন্দের বিষয়, এই আকারবৃদ্ধি সম্বন্ধে সাধারণো যথেষ্ট পরিমাণ অনুকূল প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হয়েছে। তার প্রমাণস্বরূপ আমরা অজস্র অভিনন্দনলিপি প্রতিদিনই পেয়ে থাকছি। এই অসংখ্য অভিনন্দন-জ্ঞাপকদের মধ্যে বাঙলার একাধিক লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যসেবীও আছেন। তাঁদেরই কয়েকজনের অভিনন্দনপত্র বর্তমান সংখ্যার 'পত্রগুচ্ছ' বিভাগে প্রকাশ করা হল। পত্রগুলির মধ্যে মাসিক বসুমতীর [illegible] দীপ্তিতে আলোকিত হয়েছে।—স]

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র

টালা পার্ক
কলিকাতা---২
ফোন---৫৬-৩৭৭৬

[illegible] এবং স্নেহভাজনেষু,

[illegible], তুমি মাসিক বসুমতী পত্রিকার কলেবরবৃদ্ধির পরিকল্পনা করেছ। তোমার এ সংকল্প এবং পরিকল্পনার সাফল্য সর্বাগ্রে কামনা করব আমি। তুমি মাসিক বসুমতীর ভার প্রথম গ্রহণ কর তখন একবার [illegible] কৃতিত্বের সার্থক পরিচয় দিয়েছ। যাতে বস্তু এবং উপচারে সাহিত্যে সন্দেশের, সুরসের প্রাচুর্যে [illegible] মানসিক ক্ষুধায় অমৃত না পার—বিষ দাও নি—[illegible] দিয়েছ। পুষ্টি এবং তুষ্টির জন্য চেষ্টার ত্রুটি কর নি। [illegible] অর্থাৎ দুগ্ধ দুর্লভ। আজ আর সে গলি-গলি [illegible] থাক—কিউ দিয়েও পাওয়া যায় না। সুবাই সহজলভ্য হয়েছে। বারে, হোটেলে কলকাতা শহরের নাকি আভিজাত্য বেড়েছে। আমি অভিজাত জন নই। গ্রামের মানুষ। বিলাতী আভিজাত্য মোটেই বপ্ন করতে পারি নি। তাই খুঁজে বেড়াই ওই দুষ্প্রাপ্য দুগ্ধ—আমার ঘরের শিশুদের জন্য এবং আমার নিজের জন্য—কি খুঁজছি অনুমান করতে পার।

সত্তরের কাছে এসে পৌঁছেছি। সামনে পরিপূর্ণ দিবালোকের মধ্যেও দেখছি একটা কুজ্ঝটিকার আভাস। তার বর্ণ---কৃষ্ণাভ। একটা কৃষ্ণ যবনিকা যেন ক্রমশ, সামনে এগিয়ে আসছে এবং এই মহানগরীর অন্নাভাব, স্থানাভাব বিক্ষোভ ও নানা প্রমত্ত জনের জড়িত কণ্ঠের স্খলিত আস্ফালনের মধ্যেও যেন মহাসমুদ্রের কল্লোল-ধ্বনির আভাস পাচ্ছি এবং বিমূঢ় হয়ে দেখছি জীবনের আজ কোন সম্বল বা পাথেয় আমার আছে? —দেখছি, কিছুই নেই। তাই খুঁজছি অমৃত। "যেনাহং নামৃতস্যাম তেনাহং কিমকুর্য্যাম।"

তোমার নবপরিকল্পনায় যে নূতন বিন্যাস—তার মধ্যে— তারই সন্ধান করব। তপস্বীর সন্ধান করব। প্রত্যাশায় রইলাম।

ইতি—

তোমাদের স্নেহভাজন

স্বা:—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রেমেন্দ্র মিত্রের পত্র

৫৭, হরিশ চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-২৬

বাংলা সাহিত্য প্রচারের ইতিহাসে মাসিক বসুমতীর নাম অবিস্মরণীয়। আজ পর্যন্ত চুয়াল্লিশ বৎসর ধরে যে ঐকান্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে এই অদ্বিতীয় পত্রিকাটি বাংলা-সাহিত্যের সেবা করে আসছে তার জন্যে বাংলা সাহিত্যের অনুরাগী মাত্রেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

স্বা:—প্রেমেন্দ্র মিত্র

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের পত্র

মাসিক বসুমতী যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, আমরা কল্লোলের লেখকেরা নিবারিত ছিলাম। যখন প্রাণতোষ এল তখনই দ্বার মোচন হল আর সাহিত্যের উদারস্রোতে হল নতুন প্রাণসঞ্চার। তৈল আর দৈব, স্বপ্ন আর বাস্তবের সার্থক মিলন ঘটাল প্রাণতোষ। নিমন্ত্রিত হয়ে চলে এলাম আসরে। কত লেখা যে লিখেছি এখানে—গল্প, কবিতা, উপন্যাস—এক ডাকে হিসেব দেওয়া যায় না। সর্বোপরি বছরের পর বছর ধরে লিখেছি দুটি সবিপুল ধারাবাহিক রচনা—"পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" আর "অখণ্ড অমিয় শ্রীগৌরাঙ্গ"। মাসিক বসুমতী না বাঁচলে—বাংলা সাহিত্যও বাঁচবে না। শুধু বাঁচুক নয়, প্রাণময় প্রাণতোষময় হয়ে বাঁচুক।

স্বা:—অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের পত্র

বসুমতীর ঐতিহ্য—দৈনিক এবং মাসিক দুটিরই—বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বড় এবং বিশিষ্ট অধ্যায়। মাসিক বসুমতীর ক্রমবিবর্তনে তার আয়তন বৃদ্ধির যে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে এটা পাঠক-সাধারণের সমাদরের একটা বড় নিদর্শন। এই উপলক্ষে আমি তাকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি।

স্বা:—শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়
২২-১২-৬৫

মনোজ বসুর পত্র

৪৬-১০৫৪
পি-৫৬০ লেক রোড,
কলিকাতা-২৯

"মাসিক বসুমতী" অতি সম্প্রতি আবার নতুন রূপ নিল। আয়তন বৃদ্ধি ও মুদ্রণ-সৌষ্ঠব ঘটেছে। সম্পাদকমশায় চিরদিনই বৈচিত্র্যের প্রয়াসী। এবারে কাগজখানি শত-দলের মতো পরিপূর্ণতা লাভ করল। নামী লেখকের লেখা যে নেই তা নয়। কিন্তু শুধুমাত্র নামের উপরে নির্ভর করে থাকেন না এঁরা। লেখক যা—ই হোন, লেখা নিশ্চিত ভালো হওয়া চাই। বস্তুত বাংলা মাসিকের মধ্যে এ কাগজ অতুলন।

আমার বিস্ময় লাগে, বৃহৎ কাগজের সুবিশাল উদর-পূর্তির জন্য মাসের পর মাস এত মনোরম স্বাস্থ্যপ্রদ সুখাদ্য এঁরা কেমন করে সংগ্রহ করেন।

স্বা:—মনোজ বসু
১৭-১২-৬৫

সৈয়দ মুজতবা আলীর পত্র

২২-১২-৬৫
[illegible] পাটি
পো:—বোলপুর
জেলা—বীরভূম

শ্রদ্ধাস্পদেষু।

'বসুমতী' প্রতিষ্ঠান, বিশেষত মাসিক 'বসুমতী,' যে কত দীর্ঘকাল ধরে নিরবচ্ছিন্ন বঙ্গসাহিত্যের সেবা করে আসছে সে কথা কোন সাহিত্যামোদীদেরই অজানা নয়। বস্তুত মাসিক বসুমতী বাঙলা-বিহার-আসামাদির কত সুদূরতম কোণে গিয়েও দেখতে পাওয়া যায় তা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়। মাসিক বসুমতীর জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ যে, এই পত্রিকা প্রাচীনপন্থী নবীনপন্থী উভয়কেই তৃপ্তি দিতে পারে।

সেই 'বসুমতী'র কলেবর বৃদ্ধির সংবাদে যে ঐ পত্রিকার পাঠকমাত্রেই সাতিশয় সন্তোষ প্রকাশ করবেন এ বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।

কলেবর বৃদ্ধি মাত্রই মেদবৃদ্ধি নয়। শশিকলা জনগণের হৃদয়ে আনন্দ দান করতে করতে কলেবরবৃদ্ধি করে। সর্বান্তঃ-করণে প্রার্থনা করি, বসুমতীর ক্ষেত্রে তাই হয়ে সে যেন অক্ষয় পূর্ণচন্দ্রত্ব লাভ করে। কিমধিকমিতি।

ভবদীয়

স্বা:—সৈয়দ মুজতবা আলী

বিষ্ণু দে'র পত্র

১২।১২।৬৫

সবিনয় নিবেদন,

বড় পত্রিকার প্রতিষ্ঠা ও প্রচারসাফল্যের সঙ্গে জড়িত থাকে পরীক্ষাবৃত্তির ছোট ছোট পত্র-পত্রিকার সার্থকতা। কারণ বৃহৎ পাঠক-সমাজের মধ্যে যাতায়াতের সুযোগ না থাকলে দেশের ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ থেকে যায় দৌর্বল্য। মাসিক বসুমতীর প্রতিষ্ঠা ও প্রসার দীর্ঘকাল ধরে সুপরিচিত। আপনারা যে তৎসত্ত্বেও বসুমতীকে আরো মনোজ্ঞ ও বড় করার কথা ভাবছেন তা জেনে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সনমস্কার---

স্বা:---বিষ্ণু দে

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের পত্র

Tarak Nath Gangopadhyay	Phone. 35-3574
M. A. D. Phil.	90/1 Baithakkhana
(Narayan Gangopadhyay)	Road
Department of Bengali.	Cal.-9
University College of Arts, Calcutta.	

'মাসিক বসুমতী'র নব-কলেবর দেখে খুব ভালো লাগল। সাহিত্য-সাধনায় এই পত্রিকার যে ঐতিহ্য এবং স্বাভাবিকভাবেই এর যে অসামান্য জনপ্রিয়তা---সুযোগ্য নবীন সম্পাদক শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটক সেই ইতিহাসের ধারাকে আরো উজ্জ্বল করেছেন, পত্রিকার লোকপ্রিয়তাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছেন। শ্রীযুক্ত ঘটক নিজে শিল্পী এবং প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক---পত্রিকার পরিকল্পনায় তাঁর প্রতিভা ও মৌলিকতা সর্বদা সক্রিয়। পত্রিকার বর্তমান রূপান্তর সেই মৌলিকতারই একটি সার্থক প্রকাশ। আমি বাংলা দেশের পাঠক-পাঠিকা এবং সংস্কৃতিসেবী সাধারণের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে 'মাসিক বসুমতী'র সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি কামনা করি।

স্বা:---নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
১লা জানুয়ারী, ১৯৬৬

বিমলচন্দ্র ঘোষের পত্র

কাব্যলোক
১, যদু ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা-২৬

মাসিক বসুমতী সম্পাদক
শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক
প্রীতিভাজনেষু---

বৃদ্ধাকে দিলে চৈতালি-মন
দীপ্ত প্রজ্ঞা সুস্থ মনন
লাবণ্যময় নিটোল স্বাস্থ্য
রূপশ্রী অনুপম।

বসুমতী আজ বসু পেল ফিরে
রামকৃষ্ণের দেবালয় ঘিরে
রবীন্দ্র-প্রেম বাণী প্রচারিণী
সাধনা মহোত্তম।
চেয়েছ কবির শুভাশীর্বাদ?
শোনো হৃদয়ের শঙ্খনিনাদ
মাতা বসুমতী পূজা প্রাঙ্গণে
বাজাই প্রাণোল্লাসে।
বন্ধু, তোমার পৌরোহিত্য
মুক্ত করুক নিখিলচিত্ত
অগ্রগতির আনুক সূচনা
মর্যাদার ইতিহাসে।

স্বা:---বিমলচন্দ্র ঘোষ
২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩৭২

বাণী রায়ের পত্র

বাণী-মন্দির
৭৩, সাদার্ন এভিনিউ,
কলিকাতা-২৯
ফোন-৪৬-২৫২০
১৬-১২-৬৫

সবিনয় নিবেদন,

মাসিক বসুমতীর আয়তন বৃদ্ধি উপলক্ষে অভিনন্দন জানাচ্ছি। পত্রিকাখানির জনপ্রিয়তা সুবিদিত। সম্প্রতি রূপ পরিবর্তিত হয়েছে পরিবর্ধনে। একটি মাসিকের মধ্যে বিরাট একটি পূজা সংখ্যার দেখা পেয়ে প্রতি মাসে পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ যে পুলকিত হয়ে উঠবেন একথা নিঃসন্দেহে বোঝা যায়। বিভিন্ন উপাদানে এবং অঙ্কনে অভিরাম হয়ে উঠেছে মাসিক বসুমতীর নবপর্যায়।

স্বা:-- বাণী রায়

শ্রীযুক্ত প্রাণতোষ ঘটক
সম্পাদক, 'মাসিক বসুমতী'

দক্ষিণারঞ্জন বসুর পত্র

দক্ষিণারঞ্জন বসু	ফোন : অফিস ৫৫-৫২৩১
বার্তা সম্পাদক, 'যুগান্তর'	বাসস্থান ৫৬-২৪০২
	১৪, আনন্দ চ্যাটার্জি লেন,
	কলিকাতা---৩
	১৫-১২-১৯৬৫

প্রীতিভাজনেষু,

ভাই প্রাণতোষবাবু, চলতি বছরের কার্তিক সংখ্যা থেকে মাসিক বসুমতীর আকারগত বৃদ্ধি নজরে পড়তেই তার গুণগত উৎকর্ষ যাচাই করতে মন চাইলো, দেখলাম, রচনা-বৈচিত্র্যে এবং নতুন ও পুরণো লেখকদের মিলনক্ষেত্র হিসেবে মাসিক বসুমতীর বোধ হয় তুলনা নেই। এই

জন্যে আপনাকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং আমি বিশ্বাস করি, দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যবাহী এই সাময়িক পত্রখানির অগণিত পাঠকের অকুণ্ঠ সাধুবাদ নিশ্চয়ই আপনার প্রাপ্য।

শুধু যেন আরো কিছু বলার রয়েছে অনুভব করছি। মানুষের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই, তার অগ্রগতিও যুগ যুগ ধরেই অব্যাহত গতিতেই চলে আসছে। সেই আকাঙ্ক্ষার প্রেরণাতেই বলছি মুদ্রণ-পারিপাট্যে, শিল্প-সৌকর্যে এবং সর্বোপরি রচনা নির্বাচনের দুরূহ কাজের সাফল্যে আপনার সুযোগ্য সম্পাদনায় মাসিক বসুমতী বিদেশের যে-কোন শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকার সমকক্ষতা কবে অর্জন করবে আমরা তারই জন্যে অধীর অপেক্ষায় থাকবো। বিজ্ঞানের জয়-যাত্রায় মানুষের সমাজে ও শিল্প-সাহিত্যে সারা পৃথিবীব্যাপী যে দ্রুত বিপুল পরিবর্তন এসেছে তারই সর্বতোমুখী ছায়াপাত দেখতে চাই আপনার সফল সম্পাদনায়। মনে হয়, পাঠকদের সেই আশা পূরণ করতেই বর্ধিত আকারের মাসিক বসুমতী বর্ধিত সুযোগ এনে দিয়েছে আপনার হাতে। আপনার পূর্ণ সাফল্য এবং মাসিক বসুমতীর আরো শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি। ইতি—

আপনাদের
স্বাঃ দক্ষিণারঞ্জন বসু

শ্রীপ্রাণতোষ ঘটক,
সম্পাদক, মাসিক বসুমতী,

সন্তোষকুমার ঘোষের পত্র

Phone---23-2283 (7 lines) Gram—
Ananda Bazar

আনন্দবাজার পত্রিকা
Ananda Bazar Patrika 6, Sooterkin
Street, Calcutta--1.

১৬ই ডিসেম্বর, '৬৫

প্রীতিভাজনেষু,

'বসুমতী' বাংলা দেশের অন্যতম প্রাচীনা সাহিত্যপত্র। শুধু বয়সে নয়, স্বভাবেও এই মাসিক পত্রটি সাহিত্যের ধাত্রী-প্রতিম। তার নব-বিন্যাস উপলক্ষে একটি কথাই জানাতে পারি,—আমরা আনন্দিত, আগ্রহান্বিতও।

শুভেচ্ছা জানবেন।

স্বাঃ সন্তোষকুমার ঘোষ

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পত্র

১৩-১২-৬৫

প্রীতিভাজনেষু,

মাসিক বসুমতী আপনার সম্পাদনায় কখনও এক জায়গায় থেমে থাকে নি, পত্রিকার আয়তন বৃদ্ধি তার, নব-পরিকল্পনায় তা পুনর্বার প্রমাণিত হচ্ছে। লেখক এবং পাঠকদের সেতুনির্মাণে আপনার উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

বিনীত—
স্বাঃ—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

বার্ধক্যের জন্য প্রার্থনা

(ইয়েট্‌স্‌)

বিধাতা বাঁচান যেন আমায় যে সব চিন্তা মানুষেরা করে
শুধুমাত্র মনে মনে তার হাত হতে:
যে মানুষ দীর্ঘস্থায়ী গান করে তার ভাবাবেগ
অস্থিতে মজ্জাতে:

প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ যে সব সদগুণে হন সর্ববরণীয়,
বিধাতা বাঁচান সেই গুণাবলী থেকে;
আহা! আমি কেই বা! যে গানের তাগিদে বোকা
আমাকে ভাববে না বলো লোকে?

জানাই প্রার্থনা তাই—ফ্যাশনের ভাষাও পাল্‌টায়
এবং প্রার্থনা ফের চলে,—
যেন আমি গ্রাহ্য হই—যদিও বা মরি বৃদ্ধকালে—
বোকা লোক, আবেগমন্থিত লোক ব'লে ॥

বিষ্ণু দে

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফারসী লেখক

মির্জা কাতিল

শ্রীরেজাউল করীম

অতি প্রাচীন দেশ এই ভারতবর্ষ। এদেশে স্মরণাতীতকাল থেকে নানা জাতি, উপজাতি, ধর্ম-সম্প্রদায়, সংস্কৃতি-সভ্যতা পাশাপাশি অস্তিত্ব রক্ষা করে টিকে আছে। সহ-অস্তিত্বের এমন সার্থক নিদর্শন পৃথিবীতে বিরল। অনৈতিহাসিক যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এদেশে অতি সহজেই বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে এমন সমন্বয় হয়েছে দীর্ঘ শতাব্দীর মধ্যে বিভিন্ন সভ্যতা এক দেহে মিলিত হয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে গোটা দেশকে মূল্যবান করে তুলেছে। অবশ্য এ কাজ একদিনে হয়নি। কখন কখন রাজশক্তির আভ্যন্তরীণ কলহ ও রাজন্যবর্গদের পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার চাপে সমন্বয়ের অগ্রগতি কিছুটা ব্যাহত হয়েছে। কিন্তু সমস্ত বাধা অতিক্রম করে ইতিহাস তার মহৎ লক্ষ্যের পথে অগ্রসর হয়েছে। ভারতবর্ষের মধ্যযুগের যে ইতিহাস আমরা পাই, তা সাধারণত রাজন্যবর্গের জীবন-কথায় পরিপূর্ণ। সে-সব ইতিহাসে সংস্কৃতি সমন্বয়ের কথা বেশী স্থান পায়নি। বৈদেশিকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করলে এদেশের সংস্কৃতি সমন্বয়ের কিছুটা আভাস পাওয়া যাবে। তবে এদেশের কতকগুলি লেখক মধ্যযুগের সব ভৌগোলিক বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করেছেন তা থেকে অনেক কিছু জানা যায়। এসব বিবরণ থেকে জানা যায় যে, দেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মধ্যে যুগে রীতিমতভাবে সমন্বয় হয়েছে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডাঃ তারাচাঁদ তাঁর হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বয় সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। ভারতের সংস্কৃতি সমন্বয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে নূতন করে ইতিহাস লিখতে হবে। নবনব আবিষ্কার দ্বারা বহু বিষয়ের উপর নূতন আলোকপাত করতে হবে। বৃটিশ যুগে ভারতবর্ষের যে ইতিহাস লিখিত হয়েছে তার মধ্যে আছে রাজনৈতিক অভিসন্ধি। সে ইতিহাস এই কথা বলে যে, অতীতে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে অহরহ দ্বন্দ্ব সঙ্ঘর্ষ লেগেছিল। মিলন বা ঐক্যের কোন সূত্র ছিল না। সে ইতিহাস বলে যে, ভারতে কোন সাংস্কৃতিক অবদান ছিল না। ঐক্য ও সমন্বয়ের জন্য যেসব উপাদানের প্রয়োজন তার ছিল যথেষ্ট অভাব। কিন্তু যাঁরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে সে যুগের ইতিহাস আলোচনা করেছেন, তাঁরা লক্ষ্য করেছেন যে, দ্বন্দ্ব-বিরোধ থাকা সত্ত্বেও ভারতে সাধারণ ঐক্যসূত্র ছিল এবং তা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিল না। আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের কালে যখন অতীতের দিকে লক্ষ্য করা হচ্ছে, তখন অজ্ঞাত বহু বিষয় আবিষ্কৃত হতে লাগল। দেখা গেল যে, ভারতবর্ষ কেবল সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব দ্বারা বিপর্যস্ত দেশ ছিল না। সেখানে রীতিমতভাবে ঐক্য ও সমন্বয়ের চেষ্টা হয়েছে এবং তা কি অনেকটা সাফল্য লাভও করেছে।

আজ এই প্রবন্ধে একজন লেখকের রচনা থেকে উদ্ধৃত করে দেখাব কেমনভাবে অতীত যুগে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংস্কৃতি সমন্বয় হয়েছে, ভাবের আদান-প্রদান হয়েছে এবং সামাজিক প্রথার মধ্যে ভাব-বিনিময় হয়েছে। সে লেখকের নাম মির্জা কাতিল। তিনি তাঁর সমসাময়িক কালের হিন্দু-মুসলমানের সমাজ-সংস্কৃতি আচার-প্রথা ইত্যাদি সম্বন্ধে একটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সে গ্রন্থ আজকের দিনে বিশেষ মূল্যবান। তিনি ভারতীয় জনগণের জীবনের কতিপয় দিকের যে-ছবি এঁকেছেন তা বিপুল তাৎপর্যপূর্ণ।

মির্জা কাতিল দিল্লীর শাহ-জাহানাবাদে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ক্ষত্রিয়-হিন্দু ছিলেন। পাঞ্জাবের পাতিয়ালা প্রদেশ ছিল তাঁদের আদি বাসস্থান। তিনি প্রথমে শাহ-জাহানাবাদে এবং পরে ফায়জাবাদে শিক্ষালাভ করেন। তাঁর শিক্ষাগুরু ছিলেন মির্জা মহম্মদ বাকির শাহিদ ইস্পাহানী। বাকির তৎকালের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। কাতিলের আসল নাম মির্জা মহম্মদ আছমন। কাতিল তাঁর কবি নাম।

সতের বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করে দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করতে লাগলেন। কিছুদিন সামরিক বাহিনীতে ছিলেন। অবশেষে লক্ষ্ণৌতে এসে স্থায়িভাবে বসবাস করতে লাগলেন। সেই সময় অযোধ্যার নবাব ছিলেন আসাফাদ্দৌলা। এই নবাব ছিলেন রক্ষণশীল শিয়া। তিনি নানাভাবে শিয়াদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং শিয়া মতবাদ প্রচার করবার জন্য নানা চেষ্টা করতেন। কাতিল এই প্রভাব অতিক্রম করতে পারেন নি। তিনিও শিয়ামত গ্রহণ করলেন। তবে তিনি মতের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন এবং ধর্ম বিষয়ে অনুদার হয়ে পড়েন নি। তিনি তৎকালীন কতিপয় নবাব এবং ওমরাহের সংস্পর্শে এসেছিলেন। কালপিতে নবাব ইমাদুল মুল্ক এবং নবাব গাজীউদ্দিন খাঁ তাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করতেন। শেষোক্ত নবাবের মৃত্যুর পর তিনি 'কালপি' পরিত্যাগ ক'

লক্ষ্ণৌতে উপস্থিত হলেন। সেখানে তিনি নবাব আসাফাদ্দৌলার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করলেন। এইভাবে নানা প্রকার অবস্থার মধ্যে তিনি প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন।

কাতিলের বিদ্যার গভীরতা ও উদার মত তাঁকে ভারতব্যাপী খ্যাতির উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করল। তাঁর সমসাময়িক লেখকগণ তাঁর যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। তাঁকে শ্রদ্ধাও করতেন। সেই সময় উর্দু সাহিত্য নূতন উদ্দীপনায় হেসে উঠছিল। অথচ উর্দু সাহিত্যের এই প্রভাবের সময়ও তিনি ফারসী ভাষাকেই তাঁর ভাব প্রচারের বাহনরূপে গ্রহণ করলেন। তিনি ইস্পাহান, ইরান, তুরান, আজারবাইজান প্রভৃতি অঞ্চল ভ্রমণ করেন। তার ফলে তাঁর ফারসী জ্ঞান সম্পূর্ণতা লাভ করে এবং এই ভাষায় কবিতা লেখেন এবং গদ্যও লেখেন। তাঁর কতকগুলি ফারসী কবিতার সংগ্রহ আছে। সে-সব কবিতা ভাবের গভীরতায় ও মরমী সুরের তীব্রতায় পাঠকের হৃদয়রঞ্জন করেছিল।

তাঁর একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'হাফ তে তামাশা।' এ গ্রন্থটি সে যুগের হিন্দু ও মুসলিম সমাজের সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্পর্কে একটি তথ্যপূর্ণ প্রামাণিক গ্রন্থ। কাতিল ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন এবং নানা শ্রেণীর লোকের সহিত পরিচিত হন। তিনি 'হিন্দু-মুসলমান-শিখদের ধর্ম, সমাজ-ব্যবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে—গবেষণা করেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতার কথা 'হাফ তে তামাশায়' লিপিবদ্ধ করেন। এই গ্রন্থে তিনি যেসব বিবরণ দিয়েছেন তা শুনা কথা নয়—তা তাঁর প্রত্যক্ষ দর্শনের অভিজ্ঞতা। এ বিষয়ে তিনি আরও কয়েকটি বই লেখেন। এইসব বই থেকে বহু বিষয় জানা যাবে। প্রত্যেক ধর্মের মধ্যে যে নানা উপবিভাগ (sect) আছে তাদের মধ্যে পরস্পরবিরোধী নানা প্রথা ও রীতি প্রচলিত আছে। তাদের যেসব উৎসব পাল-পার্বণ অনুষ্ঠান আছে—যেসব সামাজিক প্রতিষ্ঠান আছে সেসব বিষয় তিনি নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করেছেন। এই প্রবন্ধে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করব।

সে-যুগের হিন্দু-সমাজের আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি যা লক্ষ্য করেছেন প্রথমে সেই কথা বলব। তারপর মুসলিম সমাজের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্যগুলি আলোচনা করব

হিন্দু-সমাজের কথা

সেই আদিকালে হিন্দু-সমাজের মধ্যে চারিটি বিভাগ ছিল তা কাতিলের যুগে অক্ষুণ্ণ ছিল—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র। এদের মধ্যে কতকগুলি উপ-বিভাগও ছিল। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে বিশেষ বিশেষ প্রথা, পদ্ধতি, খাদ্য-রীতি ও অভ্যাস ছিল তার বিবরণ কাতিল দিতে ভুলেন নি। কাশ্মীরের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মাংস খাওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। অবশ্য ব্যতিক্রম ঘটনাও বহু ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে কনৌজি ব্রাহ্মণদের মধ্যেও মাংসাহার চলত। ক্ষত্রিয়দের মধ্যে যাঁরা বৈষ্ণব মত গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা আদৌ মাংসাহার করতেন না। কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্যান্য ক্ষত্রিয়গণ মাংসাহার করতেন। অবশ্য নিষিদ্ধ মাংস কেহই গ্রহণ করতেন না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে পংক্তিভোজন প্রায় চলত না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ হ'তনা। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও হ'ত।

বৈশ্যগণের মধ্যে বহু ছোট ছোট জাতি বিভাগ ছিল। আগারওয়াল ও সারোগি বৈশ্যগণ খুব ধর্মপ্রাণ ছিল। এদের মধ্যে খাদ্য ও বিবাহ ব্যাপারে বিধিনিষেধ ছিল। তারা মাংস ভোজন ঘৃণা করত। তাদের সম্মুখে মাংস কথাটা উচ্চারণ করলে তারা বিরক্ত হত এবং তাদের সহিত সংস্রব রাখত না।

শূদ্রদের বলা হ'ত আহির। কুর্মিরা শূদ্র বলেই গণ্য হত। কিন্তু তারা নিজেদেরকে কায়স্থ বলে দাবী করত। তারা মনে করত যে, তারা ব্রাহ্মণদের দেহ থেকে জন্মেছে। তারা ছোঁওয়া-ছুঁয়ি মেনে চলত। তাদের কেউ কেউ ব্রাহ্মণদের হাতেরও রান্না খেত না। কনৌজি ব্রাহ্মণদের সহিত তাদের সম্পর্ক ছিল। তাই বুঝি তাদের হাতের রান্না খেতে এদের আপত্তি ছিল না। তা ছাড়া অন্য কোন জাতের রান্না এরা খেত না। এই কনৌজি ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন জাতির সহিত এদের পংক্তিভোজন চলত না।

শূদ্রদের মধ্যে আর একটি জাতির কথা কাতিল উল্লেখ করেছেন। তাদের নাম 'আনালিয়া'। তখন তাদের সংখ্যা ছিল বহু। এরা সাধারণত রাজাদের গৃহকর্মে নিযুক্ত ছিল। তাদেরকে মুৎসুদ্দি বলা হত। তাদের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—তারা গণিত বিদ্যায় পারদর্শী ছিল। তাদের মধ্যে মাংসাহার প্রচলিত ছিল। তবে যারা বৈষ্ণবমতে চলিত তারা মাংস স্পর্শ করত না। কাতিল বলেন যে, সে যুগে প্রায় সকল সমাজে মাংসাহার প্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু শাস্ত্রে নিষিদ্ধ মাংস কোথাও প্রচলিত ছিল না। বৈশ্যদের কোন কোন অংশ মাংস একেবারে স্পর্শ করত না। এমন কি যে-সব ফলের রঙ মাংসের রঙের মত সে ফলও খেত না। বৈশ্যগণ পেঁয়াজ, রসুন, শালগম, গাজর এসব খেত না।

বস্তুত রীতিনীতি, আচার-পদ্ধতি, অভ্যাস, নৈতিক মানদণ্ড ও মূল্যবোধ ব্যাপারে সে যুগের হিন্দু-সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী বিভাগের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য ছিল না। হিন্দু-সমাজে নারীরা অত্যন্ত সম্মানজনক স্থান লাভ করত। খুল্লতাত বোন, মামাতো বোন, পিসতুত বোন মাসতুত বোন—এমন কি একই ঊর্দ্ধতন ঠাকুরদাদার বংশজাত মেয়েরাও নিজের আপন বোনের মত গণ্য হ'ত। মুসলমান সমাজের মধ্যে যেমন শিয়া সুন্নী, আহলে হাদিস প্রভৃতি ধর্মীয় দল আছে, হিন্দু-সমাজের মধ্যেও সেইরূপ নানা ধর্মীয় দল ও উপদল ছিল। কাতিল তাদেরও একটা বিবরণ দিয়েছেন। এইসব বিভাগ

ও উপবিভাগের মধ্যে আচার ও অনুষ্ঠানের ব্যাপারে কিছু পার্থক্য ছিল। অঘোরপন্থীরা গোরক্ষনাথ ব্যতীত অন্য কোন দেবতাকে স্বীকার করত না। তাকে তারা পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবতার বলে মনে করত। তাদের মধ্যে অনেক প্রকার আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। "চারণী" বলে আর এক প্রকার মতবাদীদের দল ছিল। তারা প্রচলিত কোন ধর্মীয় নেতাকে স্বীকার করত না। সাবোগি এবং আওসওয়ালগণ পরেশনাথের পূজা করত। দয়া প্রবণতা এদের একটি বিশেষ গুণ ছিল। এরা কোন প্রকার জীবহত্যা করত না। এমন কি "কেটে ফেল" এধরণের শব্দও উচ্চারণ করত না। এরা সমস্ত প্রকার মাংস থেকে বিরত থাকত। মাংসের মত দেখতে এমন কোন শাকসব্জীও গ্রহণ করত না। তাদের মধ্যে নানা প্রকার সম্প্রদায় প্রচলিত ছিল। আগরওয়াল ও সাবোগিদের মধ্যে দলীয় মনোভাব বিদ্যমান ছিল। সবোগিগণ অত্যন্ত জাঁকজমক সহিত পরেশনাথের পূজা করত।

এ স্বল্প পরিচিত এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিল—তাদেরকে বলা হত "হোসেনী ব্রাহ্মণ" কারণ তারা হজরত হোসেনের পরম অনুরক্ত ছিল। কোথা থেকে এদের উৎপত্তি তা স্পষ্টভাবে জানবার উপায় নাই। তবে তারা দাবী করে যে, মূলত তারা ব্রাহ্মণ বংশজাত। তাদের আদিপুরুষ হোসেনের মাথার বদলে নিজের একজন পুত্রের মাথা বলিদান করেছিলেন। সেই জন্য তারা নিজেদেরকে "হোসেনী" ব্রাহ্মণ বলে থাকে। এদের সম্পর্কে একটি অদ্ভুত জনশ্রুতি আছে যে, তারা নিজেদের জীবিকার জন্য মুসলিমদের দানের উপর নির্ভর করত। আজিও হোসেনী ব্রাহ্মণদের বংশধরকে আহমদাবাদ ও হায়দ্রাবাদে পাওয়া যাবে।

সওয়ার বলে একটি ধর্মসম্প্রদায় ছিল। তারা সম্ভবত জৈন সম্প্রদায়েরই একটি দল ছিল। পাছে মুখে পোকামাকড় প্রবেশ করে এই ভয়ে তারা মুখে মোটা কাপড় বেঁধে রাখত। কাভিল সে-সময়ের বিবরণ দিয়েছেন, সে সময় তাদের অনেকে শিক্ষাদান করত। আবার কেউ কেউ মহাজনী কারবার করত। শানওয়ি বলে আর একটি সম্প্রদায় ছিল তাদের মধ্যে হিন্দুধর্ম ও ইসলাম ধর্মের প্রভাব প্রবেশ করেছিল। তারা দুই সম্প্রদায়ের কতকগুলি আচার, অনুষ্ঠান পালন করত। তারা রমজান মাসে রোজা রাখত। পাঁচবার প্রার্থনা করত। মুসলিম-প্রথা অনুসারে রাত্রে জিকর বা ধ্যান করত। আবার অন্য দিকে খুব উৎসাহের সঙ্গে হিন্দু-উৎসবগুলি পালন করত। ভিক্ষুক ও অনাথ লোকদেরকে আহার দিত, কালিকাজি দেবীর পূজা অর্চনা করত এবং অপরাপর দেবতার সম্মুখে ধর্মসঙ্গীত গাইত অত্যন্ত ভক্তি ও বিহ্বলতার সহিত।

শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরা গুরু নানকের অনুসরণ করত। তাদের মধ্যে প্রধানত দুটি উপদলের নাম খালসা। তারা মাথায় লম্বা চুল রাখত। তারা তাদের মুখে রাখত দাড়ি। আর যারা এসব নিয়ম পালন করত না বলা হত খোলসা।" নানক সাহেবের উদ্দেশ্যে হালওয়া তৈয়ার করে সকলের মধ্যে বিতরণ করত। এইটা ছিল এই দলের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শিখেরা অন্য কোন হিন্দু দেবতাকে স্বীকার করত না। তারা গুরুনানককে ভগবান ও রক্ষাকর্তা বলে মনে করত। তাদের মধ্যে ধূমপান ছিল নিষিদ্ধ। ধূমপায়ীকে শাস্তি দিত। এমন কি সৈন্যদল থেকে বহিষ্কার করে দিত। এদের অনেকেই স্নান করত না। কিন্তু প্রধান খাদ্য গ্রহণের পূর্বে পোষাক পরিবর্তন করত। তারা পরস্পরকে অভিবাদন করত 'ওয়াগুরুমা" বলে।

শিখদের আর একটা দলের নাম সুথরাশাহী, দলটি সুথরা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এরা বড় বড় শহরে প্রচুর সংখ্যায় ব্যবসায় বাণিজ্য করত। এরা নির্ভীক ও সাহসী ছিল। স্পষ্টবাদিতা ছিল এদের একটা প্রধান গুণ। এদের অনেকে মুখে কালোরঙ লাগাত। দুটি ছোট কাঠিতে আঘাত করত। লোকসঙ্গীত গাইত। এইভাবে বড় বড় দোকানের সামনে এদেরকে দেখা যেত।

সে যুগে বৈরাগী বলে এক সম্প্রদায় ছিল। তারা প্রধানত দুটি দলে বিভক্ত ছিল। একদল শ্রীকৃষ্ণের পূজা করত। আর অন্যদল করত শ্রীরামচন্দ্রের পূজা। একদল অপর দলের প্রতি বৈরভাব পোষণ করত। একদল আগের দলের ধর্মমতকে নিন্দা করার সুযোগ ছাড়ত না এবং এই ভাবে নিজের ধর্মমতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চাইত। বৈরাগিগণ নানা তীর্থস্থানে জড় হত। তাদের অধিকাংশ লোক কোন পরিশ্রমকর কাজ করত না। ভিক্ষাই ছিল প্রধান জীবিকা। তাদের খাদ্য ছিল অত্যন্ত সাধারণ। তাদের মধ্যে অবাধ স্ত্রী-স্বাধীনতা ছিল।

বৈরাগী ও সন্ন্যাসীদের ধর্মাচরণ ব্যাপারে বহু পার্থক্য ছিল। একে অপরকে ঘৃণা করত। তাদের মধ্যে কখন কখন মারামারিও রক্তারক্তি হ'ত। সন্ন্যাসীরা হিন্দু-সমাজের বহু বিধি অমান্য করত। তারা দেহে কাদামাটি মাখত। ধূলায় শয়ন করত। তাদেরকে নাগা সন্ন্যাসী বলা হত। দক্ষিণী সন্ন্যাসীরা আরাম-আয়াসে জীবন যাপন করত। তারা শাহমাদারের ভক্ত ছিল। কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনের জন্য তাদের একটা খ্যাতি ছিল।

কবীরের অনুবর্তিগণ কবীরপন্থী বলে জ্ঞাত ছিল। 'সব্বাঙ্গী' বলে এক প্রকার সন্ন্যাসী ছিল। তাদের কতকগুলি নিয়ম ছিল। দক্ষিণ ভারতের নানা স্থানে তারা ঘুরে বেড়াত। তারা মহাদেব ও পার্বতীদেবীর পূজা করত। তখন হিন্দু সমাজের মধ্যে এত দল ও উপদল ছিল বটে কিন্তু সমস্ত স্তরের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য ছিল তাদের কাউকে হিন্দু-সমাজের বহির্ভূত মনে করা হত না। বিভিন্নতার মধ্যে ঐক্য, ইহাই ছিল ভারতের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। যে কোন যুগের হিন্দু-সমাজের দিকে লক্ষ্য করলে তা স্পষ্ট উপলব্ধি করা যাবে।

[আগামী সংখ্যায় শেষ ।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

॥ এক ॥

'হে প্রসন্ন, তোমার প্রসন্নতা আমার সমস্ত চিন্তায় বাক্যে কর্মে বিকাশ হতে থাক। আমার সমস্ত শরীরের রোমে রোমে সেই তোমার পরম পুলকময় প্রসন্নতা প্রবেশ করে এই শরীরকে ভাগবতী তনু করে তুলুক। জগতে এই শরীর তোমার প্রসাদ-অমৃতের পবিত্র পাত্র হয়ে বিরাজ করুক। তোমার সেই প্রসন্নতা আমার বুদ্ধিকে প্রশান্ত করুক, হৃদয়কে পবিত্র করুক, শক্তিকে মঙ্গল করুক। তোমার প্রসন্নতা তোমার বিচ্ছেদ সঙ্কট থেকে আমাকে চিরদিন রক্ষা করুক। তোমার প্রসন্নতা আমার চিরন্তন অন্তরের ধন হয়ে আমার চিরজীবন পথের সম্বল হয়ে থাক।'

এই প্রার্থনা রবীন্দ্রনাথের।

খড়দা আর সোদপুরের মাঝখানে পেনেটি। সেখানে ছাতুবাবুর বাগানবাড়িতে এসেছে রবীন্দ্রনাথ। বালক রবীন্দ্রনাথ।

এসেছে ডেঙ্গুজ্বরের ভয়ে। ডেঙ্গুজ্বরের মড়ক লেগেছে কলকাতায়।

এই প্রথম বাইরে আসা। ইট-কাঠ-পাথরের খাঁচার বাইরে মুক্তাঙ্গন বিশ্বকে সম্ভাষণ করা।

গঙ্গাতীরেই বাগানবাড়ি। বারান্দার সামনে পেয়ারা বন। পেয়ারা গাছের ফাঁক দিয়ে গঙ্গার দিকে চেয়ে বারান্দায় বসে থাকে রবীন্দ্রনাথ। নৌকো দেখে। দাঁড় টেনে পাল তুলে ভেসে চলেছে নৌকো, কোন নাম না-জানা বিস্ময়ের বন্দরে। মানচিত্রের সীমানা না মেনে, ভূগোলের গণ্ডি পেরিয়ে চিরন্তন রহস্যরাজ্যে।

এই রহস্যটিই আদিম ও অন্তহীন। আর আমার দুই চোখে বালকের সদ্যোজাগ্রত বিস্ময়।

দেখি আর অবাক হই। অবাক হয়ে দেখি কিন্তু প্রকাশের ভাষা নেই। 'কইতে কি চাই কইতে কথা বাধে।' ভাষার শেষ আছে অভিধানে কিন্তু অনুভবের অভিধান কোথায়?

মনে মনে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়ে। যে বাড়ি থাকলে রাজার বাড়ি হত না সেই রাজার বাড়ির খোঁজে। নদীর উপর দিয়ে যাচ্ছে যেসব নৌকো, তারই একটার সোয়ারি হবে। কল্পনার অমরাবতীকে সে ছুঁয়ে আসবে। সৌধ-চূড়ের একটি সোনার প্রদীপ ডাকে বুঝি তাকে হাত-ছানি দিয়ে।

'কোথায় আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা।'

সে তো মনে, কিন্তু বাস্তবে?

কী আছে বাস্তবে, দেখাই যাক না। অচেনাকে আমার ভয় কী? আমার মাও তো অচেনা ছিল কিন্তু নিল তো কোলে পেতে।'

'ছিল আমার মা অচেনা, নিল আমায় কোলে।

সকল প্রেমই অচেনা গো, তাই তো হৃদয় দোলে।'

কিসের টানে কে বলবে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু সেদিন পড়েই দেখল পায়ে শেকল আঁটা।

আগে আগে যাচ্ছেন দুজন অভিভাবক। পিছনে কে আসছে তাকে টের পেয়েছেন।

এ কী তুমি যাচ্ছ কোথায়?'

থমকে থমকে দাঁড়াল রবীন্দ্রনাথ। ধরা পড়ার মানে কী তা বুঝতে পেরেছে নিমেষে।

ছি ছি, এ তোমার কি পোশাক। যাও যাও এখুনি ফিরে যাও।

পোশাকে কোথায় ত্রুটি বুঝতে দেরি হল না। রবীন্দ্র-নাথের গায়ে জামা থাকলেও চাদর নেই, আর পা জুতোপরা থাকলেও মোজা ছাড়া।

ফিরে এল বাড়িতে। বসল এসে বারান্দায়। অম্লান চোখে দেখতে লাগল গঙ্গাকে।

ত্রুটি সংশোধন করবার উপায় নেই। যার মোজাও নেই চাদরও নেই তার কলঙ্কমোচন হয় কী করে?

কিন্তু গঙ্গাই সমস্ত নিষ্কলঙ্ক নির্বন্ধন করে দিল। মনকে ছুটি দিল জলস্রোতে। স্রোতে ভাসতে মনের সাজসজ্জা লাগে না। কারু সাধ্য নেই মনের পায়ে শিকলি এঁটে ঘরের দুয়ারে বন্দী করে। দূর দেশে ভেসে যাই, পরীর বাড়ির দরজায় গিয়ে ধাক্কা মারি।

যেখানে বেগ সেখানেই মুক্তি। যেখানে স্রোত সেখানেই স্বাধীনতা। একটি মুক্তি বিস্তারিণী আনন্দময়ী নদী সেই দিন থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে ঠাঁই নিয়েছে।

উর্মি কর্ম আর কলধ্বনি---নদী এক নিরুদ্দেশ নিরা-সক্তির নাম।

জল পড়ে, পাতা নড়ে---বর্ণ পরিচয়ের ঐ কটি কথা প্রচণ্ড সাড়া তুলেছে বালকের মনে। পড়া-নড়ার একটা অমোঘ ছন্দ দেখছে চারদিকে। একটা কিছু পড়ছে অমনি আরেকটা কিছু নড়ছে। শিশির পড়েছে অমনি চোখ মেলছে ফুল। চারদিকে শুধু স্পর্শ আর স্পন্দন। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির ঢেউ। করছে আনন্দ জাগছে ভালোবাসা।

প্রত্যেকটি দিন যেন একখানি সোনালি-পাড় দেওয়া নতুন চিঠির মত রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে পড়ছে। কী যে তার ভাষা বালক তা স্পষ্ট বুঝতে পারে না কিন্তু প্রাণে চাঞ্চল্য জাগে। দূরের বাণীর পরশ-মাণিকের ছোঁয়া লেগে একটি দীপ জ্বলে ওঠে অন্তরে। যে অজানার আহ্বানটি আসে রোজ চিঠিতে ভরে, সেই দীপশিখায় তাকে সম্ভাষণ জানায়।

তোমার চিঠির সমুচিত উত্তর দেব। এত চিঠি লিখছ তুমি চারদিকে আমি চুপ করে বসে থাকতে পারব না। তোমার সৌন্দর্যের উত্তরে আমার আনন্দকে পাঠাব।

কলির মধ্যে ফুল যেমন ফুটি-ফুটি করে, তেমনি সমস্ত কথার মধ্যে কবিতা যেন বলি-বলি করে উঠেছে।

পাকা আমটির মত দেখতে, বুড়ো শ্রীকণ্ঠবাবুর সঙ্গে সকলের ভাব। বৃদ্ধ দেবেন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে ছোট্ট রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। বাঁ পাশে একটি গুড়গুড়ি, কোলের উপর একটি সেতার আর কণ্ঠে বিরামহারা গীতস্রোত। বয়স মিলিয়ে চলতে পারেন সকলের সঙ্গে। প্রত্যেকের তিনি আপনজন, প্রত্যেকে তাঁকে পেয়ে খুশি। তিনি তো আপন খুশিতেই ভরপুর।

কী কবিতা লিখেছো আজ? দেখি দেখি। উৎসাহে উছলে উঠলেন শ্রীকণ্ঠবাবু।

কবিতা শোনাবার এমন শ্রোতা আর নেই। বুড়োকে রবীন্দ্রনাথের তাই দারুণ পছন্দ। স্থির মনোযোগে শুনবেন তো বটেই, শোনবার পর আনন্দে ফেটে পড়বেন। সেই আনন্দ আলোর মতই স্বচ্ছন্দ। কবিতায় গোঁজামিল থাক আনন্দে গোঁজামিল নেই।

দাও দাও, শীগ্‌গির দাও, তোমার বাবাকে শুনিয়ে দিয়ে আসি---যেন আনন্দের গুহা থেকে বেরিয়ে পড়েছে উদ্বেল কল্লোল প্রস্রবণ।

এতটা উৎসাহিত হবার কী আছে ভেবে পেল না রবীন্দ্র-নাথ।

দেবেন্দ্রনাথের কাছে ছুটে এলেন শ্রীকণ্ঠবাবু। দেখুন দেখুন রবি কী সুন্দর কবিতা লিখেছে। এমন চমৎকার কবিতা শোনেন নি আপনি কোনোদিন।

দেবেন্দ্রনাথ চোখ তুলে তাকালেন। শ্রীকণ্ঠবাবুর চোখেমুখে উজ্জ্বল সারল্য।

কি কবিতা? জিগগেস করলেন দেবেন্দ্রনাথ।

দুটি ঈশ্বরস্তব।

পড়ো।

গদগদস্বরে গম্ভীর পরিবেশ রচনা করে পড়লেন শ্রীকণ্ঠবাবু। ভবব্যাধিতে কী নিদারুণ জর্জরিত হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ তারই আতঙ্ককর বর্ণনা।

হো হো করে হেসে উঠলেন দেবেন্দ্রনাথ। সংসার পীড়ায় ক্লেশ পাচ্ছে তাঁর কনিষ্ঠ ছেলে এতে যেন তাঁর বিন্দুমাত্র উদ্বেগ নেই। দুঃসহ দাবদাহের মধ্যে সে যে শান্তির আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে ঈশ্বর ছায়ায় এতেও যেন নেই তাঁর উৎসাহ।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে দমতে দিলেন না শ্রীকণ্ঠবাবু। অন্তরের কথাটিই অন্তরতমের কথা। শুরুতেই ঠিক দেখেছ তোমার স্বরের গুরুকে।

শ্রীকণ্ঠবাবুর কণ্ঠেও সেই গান: 'অন্তরতর অন্তরতম তিনি যে, ভুলো না রে তায়---'

রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বারো বছরের বড়, তার জ্যোতিষদাদার লেখা---

'অন্তরে অন্তরতম তিনি যে
ভুলো না রে তায়,
থাকিলে তাঁর সঙ্গে পাপ-তাপ দূরে যায়।
হৃদয়ের প্রিয়ধন তাঁর সমান কে
সেই সখা বিনা সুখ-শান্তি
দিবে কে তোমায়?'

গান গাইতে গাইতে চৌকী ছেড়ে উঠে দাঁড়ান শ্রীকণ্ঠবাবু। দেবেন্দ্রনাথের মুখের সামনে হাত নেড়ে নৃত্য করে ওঠেন। তিনি তো আছেনই তুমিও আছ। অন্তরের অন্তরতম তুমি যে।

অন্তিমশয়নে শুয়েছেন শ্রীকণ্ঠবাবু। শেষবারের মত এসেছিলেন চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করে যেতে। তাঁর অন্তরের অন্তরতমের সঙ্গে।

মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। কিন্তু এ কালিমা নয় এ করুণা। এ বিলুপ্তি নয় প্রশান্তি। নীরবতা নয়, এ অন্তরঙ্গ গুঞ্জন। বিরল ভাষণ।

মৃত্যুশয্যায় শুয়ে গান গাইছেন শ্রীকণ্ঠবাবু: কী মধুর তব করুণা প্রভো, কি মধুর তব করুণা!

সম্মুখে শান্তির পারাবার প্রসারিত। সে পারাবারের চিরযাত্রার পাথেয়ই হচ্ছে ঈশ্বরের দয়া, ঈশ্বরের মার্জনা।

রবীন্দ্রনাথের ঠিক উপরের ভাই সোমেন্দ্র। দু বছরের বড়। আর সোমেন্দ্রর ঠিক সমবয়সী সত্যপ্রসাদ---ভাগ্নে। দিদি সৌদামিনীর ছেলে। সত্যপ্রসাদের ছোট বোন, সৌদামিনীর বড় মেয়ে ইরাবতী, রবীন্দ্রনাথের সমবয়সী, তার বাল্যখেলার সঙ্গিনী। সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের কাছে রাজার বাড়ির খবর এনে দিয়েছিল।

'আমার রাজা বাড়ি কোথায় শোন্ মা কানে-কানে।
ছাদের পাশে তুলসি গাছের টব আসে যেইখানে॥'

অনেক ভাগে জ্যোতিঃপ্রকাশ খুড়তুতো দিদি কাদম্বিনীর ছেলে, সেই রবীন্দ্রনাথকে প্রথম শেখাল কবিতা-লেখা, চৌদ্দ অক্ষরে পয়ার ছন্দের প্রয়োগকৌশল। দৃঢ় বন্ধনের মধ্যে থেকেও কবিতা কী রকম অসীমে বিস্তীর্ণ হতে পারে রবীন্দ্রনাথের এ যেন এক নতুন আবিষ্কার।

এগারো বছর পেরিয়েছে রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ স্থির করলেন, পৈতে দেবেন তিনজনকে। সোমেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ আর সত্যপ্রসাদকে। আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশকে ডাকিয়ে আনালেন বিহিত মন্ত্রমালা সঙ্কলন করতে। দেবেন্দ্রনাথের বন্ধু বেচারাম চাটুজ্জেরও ডাক পড়ল। তিনি মন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ শেখাতে। বারে-বারে আবৃত্তি করো। কণ্ঠস্থ অন্তঃস্থ করে ফেল। হৃদয়ঙ্গম করো এই উপন্যাসের তাৎপর্য।

উপনয়ন মানে উপস্থিতি। আমি এসেছি আমি জেগেছি। আমি হয়েছি।

নিয়মের জগৎ থেকে বেরিয়ে প্রেমের জগতে জন্ম নিতে চলেছি। অধ্যাত্ম জগতেই খুঁজতে চলেছি, ব্যক্তিত্বে বিশ্বের ব্যক্তিত্বের মুক্তি।

মুণ্ডিত মস্তক বালক-ব্রহ্মচারী রবীন্দ্রনাথ তেতালার অন্ধকারে বন্ধ হয়ে রইল তিন দিন। সঙ্গে আর দুই বটু, সত্যপ্রসাদ আর সোমেন। বউদিদি কাদম্বরী হবিষ্যান্ন যে খেতে দিচ্ছেন, সে এক নতুন রকমের স্বাদ। আর নতুন-শেখা গায়ত্রী, সে এক অপূর্ব স্বরধ্বনি।

ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। প্রত্যহ প্রাতে অভুক্ত থেকে দশবার গায়ত্রী মন্ত্র জপ করে উপাসনা করেন দেবেন্দ্রনাথ, সে উপাসনার উদ্ভাসনটি রবীন্দ্রনাথের স্বচক্ষে দেখা। যে মন্ত্রবলে এ উদ্দীপ্ত উদ্ভাসন সেটি আজ তার করায়ত্ত।

মন্ত্রের মানেটি বুঝিয়ে দিয়েছেন বেচারামবাবু। মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত নিজের এই আশ্চর্য সত্তাকে প্রস্ফুটিত করো, পরিব্যাপ্ত করো, এমনি একটা গাম্ভীর্যপূর্ণ অর্থ হবে হয়তো। তা আয়ত্ত করবার বুদ্ধি-বয়স তখনো হয়নি রবীন্দ্রনাথের। তবু মনে-মনে একটা আপ্রাণ প্রয়াস ছিল নিজেকে বড় করে দিই, বিস্তীর্ণ করে দিই। প্রবাহিত হই, প্রসারিত হই।

'প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভূলোকে,
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে উত্তরে দক্ষিণে, পূরবে পশ্চিমে।'

অর্থের চেয়েও ধ্বনিটি বুঝি বেশি আকর্ষণ করে। শরীরের অলক্ষ্য তারে অসংখ্য তারে ঝঙ্কার ওঠে। হৃদয়ের শঙ্খে শব্দিত হয়ে ওঠে প্রসুপ্ত সমুদ্র।

বোঝার জগতের জানলা দিয়ে উঁকি মারে না---বোঝার জগৎ। অন্তরের পৃথিবীতে একটি অনুভবের অন্তরীক্ষ। অনন্ত-ঈক্ষণ।

শানবাঁধানো মেঝের এককোণে বসে গায়ত্রী জপ করে রবীন্দ্রনাথ।

কেন কে জানে জপ করতে করতে অনর্গল জল পড়তে লাগল চোখ বেয়ে। এ কি বালক রবীন্দ্রনাথ কাঁদছে, না,

তার মনের মধ্যে যে এক চির বালক বাস করছেন, তার কান্না ?

আমাকে প্রকাশ করো এই বুঝি তাঁর চিরকালের কান্না।

সূর্য বিভাসিত হয়েছে আকাশে, তুমিও বিকশিত হও। তুমিও তোমার বদ্ধ সূর্যের মত জ্যোতির কনকপদ্ম উন্মোচিত করো। সূর্যের জ্যোতিতে তোমারও সত্তোর ছবি আছে তাকে প্রণাম জানাও। তোমার নিঃশব্দকে মন্ত্র-মুখর করে তোলো। নিশ্চেতনাকে প্রাণচ্ছন্দে স্পন্দমান।

কিন্তু ভাবনা হল নেড়া মাথায় ইস্কুলে যাবে কী করে। ছেলেরা মাথাটাকে যে তবলা বানিয়ে ছাড়বে। তা না বাজাক, বাণ তো ছুঁড়বে, অন্তত সূক্ষ্ম তাক করে বিদ্রূপের বাণ।

প্রথম স্কুল গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েন্টাল সেমিনারি। স্কুলে ভর্তি হবার বায়না ধরে কেঁদেছিল রবীন্দ্রনাথ। ভেবেছিল কী না জানি মজার জায়গা ঐ স্কুল। হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে বাড়িটা ওরই কোনো ঘরের কোণে।

কান্না দেখে গুরুমশাই চড় মেরে বসল, বললে, 'এখন ইস্কুলে যাবার জন্যে কাঁদছিস, পরে না-যাবার জন্যে এর চেয়ে অনেক বেশি কাঁদবি।'

সে ইস্কুলে বেশিদিন থাকতে হয়নি রবীন্দ্রনাথকে, ঢুকিয়ে দেওয়া হল নর্মাল স্কুলে। নানা কারণেই নর্মাল তখন অশান্তির, বালকদের উপর চলছে বিচিত্র অত্যাচার। সে কারণে এই নতুন উপহার---ন্যাড়া মাথা!

লজ্জায় ম্রিয়মাণ রবীন্দ্রনাথ, বাবা তেতলার ঘরে ডাক দিলেন। হিমালয়ের ডাক।

জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার সঙ্গে হিমালয় যাবে?'

হিমালয়! সমস্ত শুভ্রতার তুষার গলিয়ে দিয়ে বেগ নিয়ে এল যেন হৃদয়ের সুরধুনী। যাব, যাব, চিৎকার করে বলতে পারলে যেন সমীচীন উত্তর হত। কিন্তু সলজ্জ ক্ষুদ্র হাসিটুকু থেকেই বুঝতে পেরেছেন দেবেন্দ্রনাথ।

নতুন পোশাক তৈরি হল রবীন্দ্রনাথের জন্য। শুধু গায়ের পোশাক নয়, মাথার জন্যে জরির কাজকরা গোল একটি মখমলের টুপি।

নেড়া মাথায় টুপি পরব কী করে? মনে মনে প্রবল আপত্তি জানাতে চাইল রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলবার আগেই দেবেন্দ্রনাথ শান্তস্বরে বললেন, 'মাথায় পরো।'

আর কথা নেই। বাবা বলেছেন। তৎক্ষণাৎ নেড়া মাথায় মখমলের টুপি পরল রবীন্দ্রনাথ।

হিমালয়ে বেরুবার আগে কটা দিন বোলপুরে থাকবার কথা। ছাতিম আর বুনো জাম-খেজুরের বোলপুর। চারদিকে উধাওধাওয়া মাঠ। শুধু শ্যামলা শান্তি সুনীলা মুক্তি দিয়ে ভরা।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে বেড়ান দেবেন্দ্রনাথ। সেই উপলক্ষে বাংলার নানা জায়গায় ঘোরেন। একবার এমনি বোলপুর থেকে চলেছেন রায়পুরে, রাঙা লাল পথ দিয়ে। যাচ্ছেন পালকি চড়ে। চারদিকে শুধু ধুধু প্রান্তর, মাঝে মাঝে একটা-দুটো তালগাছ বা ছাতিম গাছ আর, আহা, কী সুন্দর এই শ্যামল ছায়ার দীর্ঘিকা। কী নাম এই দীঘিটার? ভুবনডাঙার, চারদিকে ভুবনডাঙার বাঁধ। যেখানে ভুবনকে এনে রাখা যায় একত্র করে। দেবেন্দ্রনাথ উদ্দীপিত হলেন। অনন্ত মাঠের সেই উল্লাস। তারপর রায়পুরের জমিদারের থেকে একলপ্তে কুড়ি বিঘে জমি কিনে ফেললেন দেবেন্দ্রনাথ। তৈরি করলেন ছোট একটি একতলা গৃহ। নিভৃতের কাছে নিঃশব্দ উপাসনার জন্যে।

কাছে গিয়ে বসাই হচ্ছে উপাসনা। হে নিঃশব্দ, তোমার কাছে বসলাম এসে বিরলে। হে গভীর গভীর, তুমি শোনো আমার অন্তরের মৌন।

সমুদ্রের পারে যেমন আলোকস্তম্ভ, তেমনি সংসারের পারে এই দীপজ্যোতি।

হে বিরাগি, তুমি যেমন নিঃসঙ্গ তেমনি আমাকে নিরাসক্ত করো। যেমন তুমি সব কর্ম নির্বাহ করেও কর্মে লিপ্ত নও তেমনি আমি আমার সমস্ত কর্মে জড়িত থেকেও সকল কর্মের উর্ধ্বে থাকি।

রবীন্দ্রনাথ তখন দু বছরের শিশু যখন এই জমি কিনে বাড়ি বানান দেবেন্দ্রনাথ। আরো ন' বছর পরে এই তার প্রথম আসা। প্রথম ট্রেনে চড়া। ঘনশ্যামল ও রক্ত-বেগুনি সবুজ-নীল পাড় দেওয়া মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটে চলা।

কিন্তু মাথার গোল টুপিটাই সব গোল বাধিয়েছে। বাবার দিকে আড়চোখে চেয়ে মাঝে মাঝে সেটা নামিয়ে রাখতে চায় রবীন্দ্রনাথ, তখুনি বাবার চোখের সঙ্গে চোকা-চুকি হয়ে যায়। নিরস্ত হতে হয় অমনি। নেড়া মাথাটাকে আর হাওয়া খাওয়ানো যায় না।

তার শ্যামাঞ্চল ছড়িয়ে মুক্ত প্রকৃতি কুড়িয়ে নিল রবীন্দ্রনাথকে। মনের মধ্যে দুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিল। আকাশ অফুরন্ত আলো আর হাওয়ার সঙ্গে অনির্বাণ প্রাণ নিয়ে দাঁড়াল এসে সামনে।

অগাধ শান্তির মত সন্ধ্যা নামে। বাগানের সামনে বারান্দায় এসে বসেন দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে ডাকেন গান গাইতে। বালক বেহাগে গান ধরে:

> 'তুমি বিনা কে প্রভু
>
> সংকট নিবারে,
>
> কে সহায় ভব অন্ধকারে।
>
> রয়েছি বন্দী মম মোহের আগারে।'

বড়দাদা দ্বিজেন ঠাকুরের লেখা। জ্যোতিদাদার লেখা আরো একটা গান বড় ভালো লাগে বাবার।

'শঙ্করশিব সংকটহারী, নিস্তারো প্রভো জয় দেবদেব।' এইটি পৈতের সময় সুধাকণ্ঠ বালক-বালিকাদের সঙ্গে গেয়েছিল রবীন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গে বিষ্ণুরাম চাটুজ্জের সেই গান :

'জয় জগজীবন জগত-পাতা হে,
জয় দীনশরণ শুভদাতা হে।'

রবীন্দ্রনাথের গানের প্রথম গুরু শ্রীকণ্ঠবাবু, শ্রীকণ্ঠ সিং, দ্বিতীয় বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী, তৃতীয় যদু ভট্ট।

রবীন্দ্রনাথ গাইছে আর তন্ময় হয়ে শুনছেন দেবেন্দ্রনাথ। দুটি হাত কোলের উপর জোড় করা। নিজের সমস্ত শক্তিকে সংহত করে এনে নিঃশব্দ আনন্দে নিঃশেষে সমর্পণ করে দিয়েছেন—ভঙ্গিটির তাই যেন অর্থ। একটি নীরব নমস্কারে সমস্ত জীবন যেন পর্যাপ্ত হয়ে নিবেদনের সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

'একটি নমস্কারে প্রভু একটি নমস্কারে,
সমস্ত মন পড়ে থাকুক তোমার ভবনদ্বারে।'

এ কার কাছে নিবেদন? এ নমস্কার কাকে?

যিনি ব্রহ্মাণ্ডকে অখণ্ড করে রয়েছেন তাঁকে। অন্তরে বাহিরে যিনি নিরন্তর, তাঁকে। যিনি পিতা, ত্রাতা, নিয়ন্তা, তাঁকে।

পিতার সেই মহৎ রূপটি নিজে নত হয়ে যেন রবীন্দ্রনাথের কাছে উদঘাটিত করেন দেবেন্দ্রনাথ। কিছু পাব বলে প্রণাম নয়, নয় কিছু দেব বলে। ভয়ে নয়, নয় বা পীড়নে। এ প্রণাম আনন্দে, গরিমায়, উপলব্ধিতে। তুমি আমার পিতা, আমার আপন, এ আনন্দ। আমি তোমার সন্তান, তোমার আপন, এ গৌরব।

তোমার শাসনের মধ্যে কল্যাণ, বিধানের মধ্যে ক্ষমা, বঞ্চনার মধ্যে নিষ্কৃতি।

অপরাজেয় আশার মত প্রভাত আসে। সকালবেলা ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেরোন রবীন্দ্রনাথ। ভিক্ষুক দেখলে বলেন, ভিক্ষে দাও। দীন-দরিদ্রের দিকে চোখ ফেরাও। এ সত্যিকারকে খোঁজ নাও। তার হাত ধরো। তাকে বোঝাও তুমি তার অপর জন নও, তুমি তার আপন জন।

অনেক জায়গা ঘুরে পৌঁছেছেন অমৃতসরে। সরোবরের মাঝখানে শিখদের গুরুদ্বার। সেখানে পিতা-পুত্রে যান প্রায়ই সকালবেলা। চলেছে অখণ্ড পাঠ আর নামকীর্তন। সেই শব্দসুধাসমুদ্রে স্নান করেন দুজনে।

একদিন তো ওদের ভজনে কণ্ঠ মেলালেন দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তো অবাক, তার চেয়ে বেশী অবাক শিখেরা। বিদেশীর গলায় এ কী সুর, এ কী ভাষা।

ব্যাকুলতাই সুর, ভাষাই পূজাঞ্জলি।

চোখ কান খোলা রেখে সব দেখে আর শোনে রবীন্দ্রনাথ। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপরেও যে ইন্দ্রজাল তাকে দেখে। তাকে শোনে।

অমৃতসর ডালহৌসী পাহাড় আর কতদূর? এবার চলো সেখানে, হিমালয়ের কোলে। গায়ত্রী থেকে হিমালয়। হিমালয়ই ভারতবর্ষের গায়ত্রী।

প্রভাতের মন্ত্র নিয়ে দাঁড়াও এবার উদয়শিখরে। ঘোষণা করো। তাকে আমি দেখেছি। তাকে আমি জেনেছি। সমস্ত অন্ধকারের পরপারে জাগ্রত সে শাশ্বত সূর্য।

দিকে দিকে রাষ্ট্র করে দাও এই নব প্রভাতের জয়ধ্বনি।

বন্ধনের মুক্তি, বিরোধের মুক্তি, অন্ধকারপীড়িত আপন মানবাত্মার শৃঙ্খলমোচন। সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার এ কয়দিনের মানবজন্ম চিরদিনের জন্যে সার্থক হোক।

[ক্রমশ

তাকে

মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়

তারপর তাকে দেখলাম এই কৃষ্ণচূড়ার নিচে।
নিচে যে কুঞ্জ আছে :
গত রাত্রের বৃষ্টির জলে ভিজে
অপরূপ সাজে-সাজে।
সেই কুঞ্জেতে দেখলাম তাকে কৃষ্ণচূড়ার নিচে,
জলটুঙিতে হাতছানি দেয় কী যে।
সূর্যকিরণ পড়েছে বুকের মাঝে,
রামধনু-রঙ শিখাযিত মর্নাসজে!
বকুলেরা ঝরে পড়ে অকারণ লাজে।
একহাতে টানে, আর-হাতে সে তা ফেলে দ্যায়,
নদীচরের চরে গোধূলি বেলায় সোনার প্রদীপ জেবলে দ্যায়!

আজ শরতের এই মধুময়
ফের দেখলাম তাকে :
বাঁশি শুনে সে যে নাচে।
চকাচকী যেথা মিলেছে সবুজ ধানের ক্ষেতের ফাঁকে।

কৃষ্ণচূড়ার ডালগুলি ফুলে ছেয়ে যায়!
শিশির-জড়ানো ভোরের বাতাস ঢালা সোক মিঠে ছাঁচে!
তারই যে নাচের তালে সৈকতে গাঁট-গাঁট শাদা তুলো—
ভেঙে পড়ে ঢেউগুলো!

বাগ্দেবী

—ভাস্কর শ্রীরমেশ পাল

মাসিক

বসুমতী

।। মাঘ, ১৩৭২ ।।

নর্তকী

—দুলাল বিশ্বাস

ব্যথাহত

—সুবীর গুপ্ত

বসুমতী

মাঘ, ১৩৭২ ॥

অনুকরণ

—শান্তিময় সান্যাল

আচ্ছাবাল (শ্রীনগর)

—সাগর রক্ষিত

মাসিক

বসুমতী

॥ মাঘ, ১৩৭২ ॥

গৃহদেবতা

—শ্রীঅরুণকুমার চট্টোপাধ্যায়

জয় জোয়ান, জয় কৃষাণ

—প্রবাল ভট্টাচার্য

মাসিক

বসুমতী

॥ মাঘ, ১৩৭২ ॥

এবার প্রিয়ংবদা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

॥ পনেরো ॥

ঘুমিয়ে পড়েছিল, উঠল একেবারে [illegible] বেলা। নিশানাথ তুলে দিল, [illegible] রাত্রে উঠিয়ে খাওয়াতে [illegible] করে দিয়েছিল। একটু গত-দিনের [illegible] আচ্ছন্ন হয়ে মুখের দিকে [illegible] করে চেয়ে রইল [illegible] তারপর বলল,—"একটা [illegible] তাহলে শেষ পর্যন্ত করে-ছিস্ বাবা?"

[illegible] হালকা ঠাট্টার টোনেই। [illegible]—"সন্দাটাই বা কোথায়—ওকে?"

"ওর মানে?"—সদ্য জাগরণের আচ্ছন্নতার মধ্যেই একটু বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করল লোকেশ।

"ওটা তো এসে গেল কিছুক্ষণ পরেই----"

"এসে গেল!"—ঘুমের আমেজ কেটে গিয়ে একেবারে সোজা হয়ে বসল লোকেশ।

"হ্যাঁ।"—নিরুদ্বেগ কণ্ঠে জবাব দিল নিশানাথ। বলল—"আমাদের তাড়া-তাড়ি ভালো করে খোঁজ না নিয়ে বেরিয়ে আসাটাই ভুল হয়েছিল। ঐ সেকেণ্ড ট্রেনটা থেকেই নামে। তারপর সন্ধান নিয়ে ট্যাক্সি ঠিক করতে রাত হয়ে যায়—ট্যাক্সিটা ভালোও ছিল না—এখানে যখন পৌঁছুল—"

"হয়ে গেছে আশীর্বাদ তাহলে?" চোখ দুটো ভয়ে আয়ত হ'য়ে উঠেছে লোকেশের। যেন ঠিকমত অর্থ গ্রহণ করতে পারছে না কথাগুলোর, তারই মাঝে হঠাৎ বাধা দিয়ে প্রশ্ন ক'রে উঠল।

নিশানাথ, বলে যাওয়ার সঙ্গে ওর ওপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি ফেলে রেখেছিল, কাঁধে একটা চাপড় বসিয়ে বলল—"হত-ভাগা। ভাঙবে তবু মচকাবে না। বুঝছে ঠিকই করেছিলাম, তবু দোষটা দেওয়াই চাই। নে, ওঠ, মুখ-হাত ধুয়ে নে তাড়াতাড়ি।"

একটু চেয়েই রইল মুখের দিকে লোকেশ, উৎকট রসিকতাটুকু পরিপাক করতে সময় লাগছে। একটু পরে বলল—"একটা কথা, আমার গাড়িটা কখন? ভাবছি ট্রেনেই যাব।----ওরকম ক'রে মুখের দিকে চেয়ে আছিস যে?"

"থাকতে হচ্ছে বৈকি চেয়ে। আবোল তাবোল বকছিস্, রাত্তিরে ঘুম হয়নি, না, ভাঙেইনি এখনও ঘুমের ঘোর?"

"আবোল তাবোল হোল? রাস্তা খারাপ, আসতে কষ্ট হয়েছিল, ঠিক করেছি জাপটা ড্রাইভার নিয়ে যাবে, আমি ট্রেনেই---"

"আবোল-তাবোল নয়তো কি? কাল ওরকম ব্যাপারটা হোল, সকাল সকাল উঠে কোথায় দেখবি, খোঁজ নিবি পিসিমার অবস্থাটা কি যাচ্ছে—এখনও তাঁর ভাত-মুড়ি পেটে গজগজ করছে—ক'বেলা যেন হোল?"

হেসে ফেলল লোকেশ। বলল—"তবু কাল রাত্তিরেরটা যদি নিজে হোতে বন্ধ না করতিস, যখন আরও একটু রকমারির কিছু আশা ছিল।---উনি আছেন কি রকম পিসিমা?"

"ভালো নয়, বিছানা নিয়েছেনই বলা যায় একরকম।"

"সেকি!! আর বদন?"—চারিদিক দিয়েই বিপদের সম্ভাবনার কথাটা একসঙ্গে মনে পড়ে গিয়ে অভি-ভূত ক'রে ফেলল লোকেশকে।

"অমনি খোঁজ নেওয়ার ঘটা পড়ে গেল।" —ওর দিকে একটু তির্যক দৃষ্টি-পাত করে, টিপ্পনী করল নিশা।

বিদ্রূপের মনোভাবটা একটু উগ্রভাবে এসে গেছে, বলল—"বদনের ভাবনা তোর না ভাবলেও চলে। ওকে যদি কিছু বলতেই হয় তো Tomboy—একটা বেটাছেলে মাকা মেয়ে বলা চলে, তোর মতন মেয়ে-মাকা পুরুষ নয়। Effeminate বললে জিভের ঝাল মেটে না, Tomboy—এর মতন একটা জোরালো কথা থাকলে ভালো হোত—হয়তো আছেই - - - -"

"আবোল-তাবোল আমিই বকছি ?"—উল্টো চাপ দেওয়ার জন্য খানিকটা থেমে যেতে দিয়ে বলল লোকেশ। —"একটা গুরুতর কিছু ঘটতে যাচ্ছে ব'লে দিয়ে - - - -"

"কত গুরুতর তা জানিস না"—বাধা দিয়ে বলল নিশানাথ—"উঠেই 'ট্রেন কখন্' শুনে কি মাথার ঠিক থাকে ? সেই বেদেনী বুড়ি এসে উপস্থিত হয়েছে - - - -"

"বেদেনী !! বলিস কিরে !!"—ওর দিকে মুখটা বাড়িয়ে ভয়ার্ত চাপা-কণ্ঠে প্রশ্ন করল লোকেশ। বলল—"এই ডামাডোলের মধ্যে বেদেনী এসে পড়লে তো- - -"

"বোঝ তাহলে।"—নিশাও গলাটা নামিয়ে আনল। বলল—"তাড়াতাড়ি মুখহাত ধুয়ে চা খেয়ে নে। পরামর্শ করতে হবে। বাড়িতে বসে ঠিক হবে না।"

লোকেশের অধৈর্যতাতেই চায়ের পাট আপাতত স্থগিত রেখে ওরা বেরিয়ে পড়ল। উৎসব-ক্লান্ত বাড়িটা এখনও ভাল করে জেগে ওঠেনি। দু'চারজন যাদের সঙ্গে দেখা হোল তাদের জানাল ওরা দীঘির ধার থেকে একটু বেড়িয়ে আসছে। দয়াদেবীর শেষ রাত্রির দিক থেকে একটু ঘুম এসেছে সুতরাং আপাতত ওঁর খোঁজ নিতে যাওয়ার প্রয়োজন হোল না। বদন আর মলিনাও ওর ঘরে রয়েছে। রাতটা একরকম জেগেই কেটেছে, ওঠেনি এখনও।

শুনল বেদেনীর কথা লোকেশ।

ডাকবাংলোর চৌকিদার পুরন্দর ঘোষ রাত্রে ভোজের লুচি-মিষ্টি নিতে এসেছিল, সেই খবরটা দেয় নিশানাথকে। বেদেনী কাল সন্ধ্যের সময় ডাকবাংলোর সামনে ফাঁকা জায়গাটায় ডেরা ফেলেছে। পুরন্দর আপত্তি করলে জানায় ওরা শুধু রাতটুকু কাটাবে, অন্ধকার হয়ে গেছে, এগুবার জো নেই, সকালেই চলে যাবে। তবু দিত না জায়গা পুরন্দর, কখন কোন অফিসার এসে পড়ে, কিন্তু কথাবার্তার মধ্যেই যখন টের পেল, সেই আগের বুড়ি, এঁদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, সকালে এদের এখানেই চলে আসবে, তখন আর আপত্তি করে নি।

খুবই একটা দুর্ঘটের ব্যাপার, এসেই পড়ত বেদেনী বোধহয় এই সময় পর্যন্ত, কিন্তু দৈবযোগে পুরন্দরের সবচেয়ে আগে দেখা হয়ে যায় নিশানাথের সঙ্গেই, ও পরিবেশনের এক-ফাঁকে বাইরের দিকে গিয়ে সিগারেট খাচ্ছিল। পুরন্দর মনে হোল একটা ভাল খবর জেনেই দিতে যাচ্ছিল বাড়িতে, গ্রামের লোক, বদন যে বুড়ির কাছ থেকেই নেওয়া সেটা জানত। নিশানাথ ওকে ঐখানেই চেক ক'রে দিল। দয়াময়ীর শরীর খারাপ, ও যেন ওদিক থেকেই ভাগিয়ে দেয় ওদের, কোনমতেই এদিকে আসতে না দেয়। বেশ ভাল করে লুচি-মিষ্টি তরকারির ব্যবস্থা ক'রে দিল নিশানাথ, নিয়ে চলে গেল পুরন্দর। ওর সামনেই।

তারপর আবার আজ ভোরেই এসে উপস্থিত হয়েছিল।

বুদ্ধি করে নিশানাথকে ঘুম থেকে তুলিয়ে ডেকে নিয়েছিল, খবর দিল বুড়ি কোনমতেই কথা শুনতে চাইছে না, আসবেই, পুরন্দর ঘণ্টাখানেকের জন্যে অপেক্ষা করতে বলে নিজের ভাইকেও বসিয়ে একরকম ছুটেই এসেছে। নিশানাথ তাকে ফেরৎ পাঠিয়ে, দরকার হ'লে জোর করে আটকে রাখবার আদেশ দিয়ে তাড়াতাড়ি এসে লোকেশকে তুলেছে। লোকেশ উঠেই শুনে ঘাবড়ে যাবে বলে পিসিমার ওপর প্রভাবটার কথা তুলে আরম্ভ করতে চেয়েছিল নিশানাথ। তিনি এখন ঘুমুচ্ছেন। অবশ্য একটা ঘুমের ওষুধ দিতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

ওর নিজের মত, এখনই ঝাঁপে করে বেরিয়ে যাওয়া। যে-কোন প্রকারে বুড়িকে ঐদিক থেকে সরিয়ে দিতে হবে এবং যতটা পারা যায় আর এদিকে আসবার সম্ভাবনা বন্ধ ক'রে।

লোকেশেরও অবশ্য তাই মত। দুই বন্ধুতে পরামর্শ করতে করতে ফিরে এল বাড়িতে।

॥ ষোল ॥

এসে দেখল বদন উঠেছে।

বেশ বড় উঠান। কয়েকজন চাকর দাসী, মুনিষ মজুর মিলে ধুয়ে-মুছে, মেজে-ঘসে কালকের বিশৃঙ্খলাটা সামলে নিচ্ছে ও রকের একধারে হাঁটুমুড়ে ডান হাতে চিবুকটা রেখে ব'সে আছে। ওদের কাজের তদারক নয়, বরং যেন—'কতদিন আর সামলানো যায় ?'—এরকম একটা ক্লান্ত নির্লিপ্ত ভাব। মুখটা থমথম করছে।

এদের দেখে প্রশ্ন করল—"কোথায় গিয়েছিলেন ? উঠে দেখি কেউ কোথায় নেই।"

অবশ্য নিশাকে উদ্দেশ করেই।

নিশা বলল—"একটু দীঘির পাড় থেকে ঘুরে আসতে গিয়েছিলাম। রাত্তিরটা বড় গরম গেছে তো - - - "

"ওঁর কাল খাওয়া হয়নি।"—সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করল বদন ক্লান্তভাবেই ; বলার ভঙ্গিতেই যা একটু অনুযোগের সুর রইল।

"তাই ওকে নিয়েও এলাম তাড়াতাড়ি। আর ও থাকতেই চাইছিল।"

—একটা সঙ্গত জবাবদিহি দেওয়ার জন্য মিথ্যা রচনা করেই বলল নিশানাথ তবে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব হারায় না, কাজও করে নিল আরও দুটো মিথ্যা ব'লে এই সুযোগে। বলল—"আমি বললাম —বরং চল্, চাটা খেয়ে জীপে করে না হয় একটু ঝিলের ধার থেকে বেড়িয়ে আসা যাবে। - - - অবশ্য তোমার

যদি আপত্তি না থাকে। ---দেখবে একটু তাড়াতাড়ি চেষ্টা ক'রে।"

রাকেশের দৃষ্টিটা অবাধ্যভাবেই এদিক কোণাকুণি ওর মুখের ওপর গিয়ে পড়ে। হঠাৎ যেন কেমন একটু দুর্বল হয়ে পড়েছে বদনের সামনে নিশানাথ। ওর পক্ষে নূতন।

তাড়াতাড়ি করে দিল বদন, একেবারে অন্য মানুষ হয়ে। সময় যতটা বাঁচানো যায় তার জন্য মলিনাকেও দিল ভুলে। ওদের ব্যস্ততার কথা তুলতে বলল—"সকালটাই ঠাণ্ডা, আশ্বিন-কার্তিকের রোদ, তেতে উঠতে দেরি হবেনা।"

[illegible] বাসি খাবার কিছু নয়। [illegible] হতে হতে সদ্য নিমকি, [illegible] চা, টোস্ট প্রস্তুত হয়ে গেছে [illegible] বসে খাইবে যাওয়ার সময়েও [illegible] বলে সাবধান ক'রে দিল—[illegible] তেতে ওঠবার আগেই যেন ফিরে আসে।

বুড়িকে দেখল ওরা।

নিশানাথ দেখেছে বারদুই ছেলে-[illegible] তখনও বুড়িই কিন্তু সে-বুড়ির সঙ্গে এ বুড়ির কোনই মিল নেই [illegible] একেবারে ধনুকের মতো বেঁকে গেছে। লোলচর্মের নীচে মোটা-মোটা হাড় কাঠগুলো রয়েছে জেগে, মাথায় গোটাকতক জটা। চিবুকের [illegible] পাঁচ-সাতটা চুল, এদিকে [illegible] টক্‌টক্‌ করছে, চক্ষু কোটরাগত আর ঘোলাটে হোলেও দৃষ্টি তীক্ষ্ণ। বয়স মনে হয় আশির বেশ কিছু ঊর্দ্ধেই চলে গেছে বুড়ির। পাশেই একটা হাত দুয়েক লম্বা আর প্রায় ঐরকমই চওড়া গাড়ি। একটা কাঠের বাক্সের নীচে চারটে ছোট ছোট চাকা বসানো, পেছন থেকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া যায়, সামনে থেকে টানবার জন্যও একটা কড়ায় মোটা দড়ি বাঁধা রয়েছে। বুড়ি নিশ্চয় চলচ্ছক্তিহীনাও হয়ে পড়েছে।

এবার আর বড় দল নয়। তেত্রিশ চৌত্রিশ বছরের একটি যুবা, বছর পঁচিশের একটি যুবতী, তার স্ত্রী মনে হয়; একটি ছেলে আর দুটি মেয়ে। ছেলেটিই বড়, বয়স তেরো-চৌদ্দ হবে। সম্পত্তির মধ্যে একটা হেটো ঘোড়া, এক-জোড়া রাম ছাগল, দুটো কুকুর, এক-ঝাঁকা মুরগী আর পিঁজরার মধ্যে একটা সজারু। স্থাবরের মধ্যে গোটা চারেক বাঁশে জড়ানো একটা ছোট তাঁবু, কিছু রন্ধনের তৈজসপত্র, কিছু টুকিটাকি আর একটা মাজারি গোছের বেতের ঝাঁপি। বোটা বোধ-হয় হাতের খেলা দেখায়।

ওরা জীপ থেকে নেমে সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বুড়ি চোখ তুলে খানিক-ক্ষণ ঠাহর করে দেখে একটা ঘড়ঘড়ে আওয়াজে প্রশ্ন করল—"তুরা স্যান-মশাইদের বাড়ির ছাওয়াল আঁচিস?"

নিশানাথ উত্তর দিল—"হ্যাঁ।"

স্মৃতিশক্তিটা বেশ ভালো কাজ করেনা নিশ্চয়, একটু থেমে প্রশ্ন করল—"কুঁড়ান্ কুঁথাকে আছে? আমার কুঁড়ান্? বিয়া-সাদি হঁইছে?"

"এবার হবে।"

"একবার দিখাবি নি?"

অনুরোধের টোনে প্রশ্ন করার জন্যই যেন একটু জোর পেয়ে নিশানাথ বলল—"দেখা কি ক'রে হবে আর? সাদি হ'তে যাচ্ছে---"

"হঁরে! হঁরে!"—মুহূর্তেই ঘোলাটে চোখ দুটো কোটরের মধ্যে জ্বলে উঠল বুড়ির। একটা চাড়া দিয়ে শরীরটা যতটা সম্ভব সিধে করে নিয়ে বলল—"তুরা বেইমান। গরীবকে ট্যাকা দেখিয়ে তার মাইয়া কেড়ে নিয়েছিস—এখন বুড়া হইছি মরব, শেষ দ্যাখা দেঁখাবি না একবার। আমি ঘোঁড়া বেঁচে, ছাগল বেঁচে, সব বেঁচে তুঁদের ট্যাকা দিঁয়া দিচ্ছি—ফিরাঁয়ে দে আমার কুড়ানরে! আমি যাঁব—দেঁখব—বুড়াকে শিখাঁয়ে দিয়েছিস, আমায় জেতে দিবেনাক—আমি যাঁবই—তুঁদের শক থাকে তো রাখ ধেরে আমায়—বাইন্ধা রাখ আমায়!--"

হাত দুটো দু'পাশে পুঁতে ঠেলে উঠেছে, বলতে বলতে সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপছে, কোটরের মধ্যে চোখ দুটো জ্বলছে। এতই আকস্মিক আর কথাগুলা এতই উগ্র তোড়ের ওপর বেরিয়ে আসছে যে এরা দুজনে তো হতচকিত হয়েই পড়েছে, বৌটাও যেন কি করবে বুঝে উঠতে পারছে না। পুরুষটা, এরা আসবার পরই একটা কাতা হাতে ক'রে কি করতে বাংলোর পেছনের দিকে চলে গিয়েছিল, ছুটে এসে বুকে-পিঠে হাত দিয়ে চেপে ধরল বুড়িকে। নরম গলায় বুঝিয়ে বলার ভঙ্গিতে বলল—"ক্ষেপে গেঁছে বুড়ি। খামোশ দেঁ—বাবুরা দিঁখাবেন, দিঁখাবেন না কেনে?—তুই তো কেঁড়ে নিবি না।"

আপনিই মরছিস, কুড়ানরে কুঁথায় রাখবি? -বাবুরা বুঝেন না? দিখাবেন।"

এদের দিকে চেয়ে চোখ টিপে দিল।

নিশানাথ একটু ভেবে নিয়ে উলটে দিল নিজের কথাটা। দাঁড়িয়েছিল, বসে প'ড়ে বলল—"তুই ঠিক হয়তো শুনিসনি বুড়ি। আমি বলছিলাম—দেখা ক'রে আর কি হবে? কুঁড়ানের মনটাও তো খারাপ হয়ে যাবে—দেখবে কত বুড়ি হয়ে গেছিস, এবার কবে মারাই যাবি হয়তো—আর দেখাই হবে না—কষ্ট হওয়ারই কথা তো।"

"তু দে বিটা দেখা কঁরিয়ে"—কাতরভাবে হাত দুটো ধরে ফেলল ওর। সে উগ্রভাব কোথায় গেছে চলে। চিবুকটা ধরে, নিজের মাথায় হাতটা বুলিয়ে নিয়ে সেই হাতটা ওর মাথায় বুলাতে বুলাতে বলল—"তু-দে বিটা দেঁখিয়ে। আমার যতো চুল তোর পেরমাই হঁবে। উর মন আরও খুশি হবে—আমার কাছে দাঁবাই আঁছে--আমি কঁইছি মন খারাপ হঁবে না ----এই দেখ্---"

ওর হাতটা খপ করে টেনে নিয়ে নিজের বুকের ওপর চেপে ধ'রে বলল—"এই দেখ বিটা—কালিজাটা খাঁখ হয়ে গেঁছে—দু'গালের বাচ্চা—নিজের বাচ্চাকে দুধ না দিয়ে উয়াকে খাওয়াইছিঁ—বড় কর্‌ছি—কুড়ানরে!—বিটিরে আমার!—ও হো-হো-হো-!--"

—একেবারেই ভেঙে পড়ল।

নিশা এসে ব'সেই একটু এগিয়ে গিয়ে ওর পিঠে হাত দিল। বলল—"চুপ কর বুড়ি, চুপ কর, আমি কথা দিচ্ছি তোকে দেখাব। একটু সময় দে আমায়। ওঁদের এখনও বলা হয়নি, গিয়ে কখন, কিভাবে দেখা হবে সেটা একটু ঠিক করে নিই। তবে কথা দিচ্ছি আমি বাড়ি ফরাবই, ওরা কেউ তো অবুঝ নয়। তোর কুড়ান এখন বড় হয়েছে—দশ বছরের মেয়েটি নয় যে কেড়ে নিয়ে যাবি—সেকথা তো বোঝেন ওঁরা—হবেন না কেন, হবেনই রাজি—তুই চুপ কর, কাঁদিসনি—"

শেষে ঐটুকু জুড়ে দিয়ে উঠে পড়ল নিশা। যাওয়ার সময় ছেলেটাকে ডেকে বলে দিল বুড়িকে একটু সামলে-সুমলে রাখতে, ওরা আজই কোন সময় দেখা করার ব্যবস্থা ক'রে জানিয়ে দেবে।

যেতে যেতেই দুই বন্ধুতে যুক্তিটা ঠিক ক'রে ফেলল। দয়াদেবীকে জানানর কোন কথাই ওঠে না, বাকি থাকে শুধু মদন। তার একবার না দেখা করবার কোন কারণ নেই। মনটা এখন বিচলিত রয়েছে, প্রস্তাবটা কি রকম পড়বে সেই হোল প্রশ্ন। তবে অতবড় মেয়ে, অমন বুদ্ধিমতী, এইসব না খাওয়ার মুখে এই সুযোগটা মুক্তির পথ ক'রে নেবে—এ ধারণাটাও উত্তট বলেই মনে হয় বৈকি। ওরা ঠিক করল বেদেনীর আসাটা এদিক থেকে একেবারেই গোপন রেখে বদনকেই শুধু বলবে। পুরন্দরকেও সাবধান করে দিল। [ক্রমশ।

বেলিনের পোষাক শিল্প

এক শতাব্দীর ওপরে জার্মানীর তৈরী পোষাক-পরিচ্ছদের কেন্দ্রস্থল হল বেলিন। সারা জার্মানীর প্রয়োজনীয় তৈরী পোশাক গত যুদ্ধের আগে এখান থেকেই যেত। যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর যুগে দেশ ভাগাভাগির দরুণ বেলিনের পোশাকের ব্যবসা প্রায় একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল। যাই হোক, বহু চেষ্টায় আবার এই শিল্পটি গড়ে উঠেছে এবং আজ সারা য়ুরোপে মহিলাদের পোশাকের সবচেয়ে বড় কেন্দ্র হ'ল পশ্চিম বেলিন। বছরে এখানে প্রায় দু'কোটি পোশাক তৈরী হয়। আর সেসব পোশাক কিনতে দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসে।

পশ্চিম বেলিনে মহিলাদের পোশাক তৈরীর প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় চারশ'। যুদ্ধের পর থেকেই বেশ মুস্কিলের মধ্যে এদের কাজকর্ম চালাতে হচ্ছে কারণ কাজ করার লোকের ভীষণ অভাব। দেশের মেয়েদের তারা ডবল মাইনে দিয়ে অধিক দিন কাজ করার সুবিধে দিয়েও প্রয়োজনীয় কর্মচারী যোগাড় করতে পারছিল না, কিন্তু ইদানীং টার্কি ও গ্রীস থেকে ভিনদেশী অনেক মেয়ে এনে পোশাক তৈরীর কাজে লাগিয়ে এই সমস্যার কিছুটা সুরাহা হয়েছে। আরও বিদেশী মেয়েদের কাজে লাগালে ভালো হয় বটে কিন্তু তা সম্ভব নয় কারণ পশ্চিম-বেলিনে স্থানাভাব একটা নিদারুণ সমস্যা। বিভক্ত পশ্চিম-বেলিনে নতুন মানুষদের আস্তানার সমস্যা যে কবে মিটবে কে জানে।

পশ্চিম-বেলিনের সবচেয়ে নামকরা কাপড় হল "বেলিন চিক"। এই কাপড় সত্যিই ভারি সুন্দর দেখতে ও পরেও খুব আরাম। এই কাপড়ে নানারকম নক্সা তোলে কুশলী সীবনশিল্পীরা। তারপর সেই কাপড় থেকে তৈরী হয় অপরূপ ছাঁটকাটের নানা রকম পোশাক-পরিচ্ছদ। এভাবে এই যন্ত্রযুগে আজও বেঁচে আছে বেলিনের বিখ্যাত এই কুটিরশিল্প।
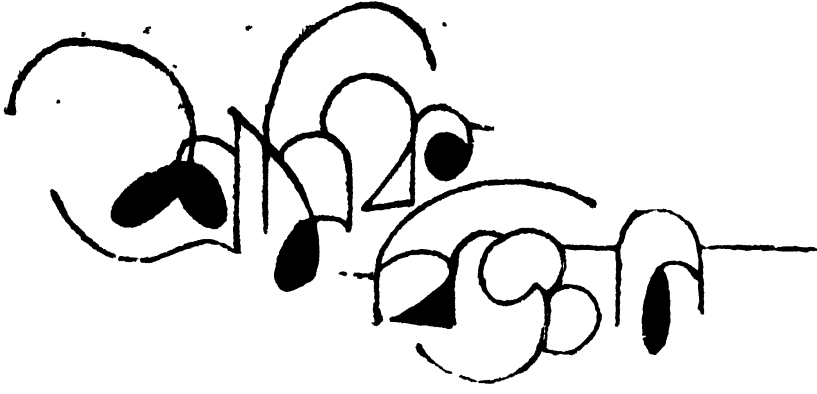
॥ এগারো ॥

প্রার্থী-সাক্ষাৎ

সাধারণত প্রার্থী-সাক্ষাৎ দ্বারা। (ইনটারভিউ) উদ্যোগ শিল্পের উপযুক্ত শ্রমিক নির্বাচন হয়ে থাকে, কিন্তু এই প্রার্থী-সাক্ষাৎ প্রথায় যথেষ্ট অসুবিধা আছে। এক নম্বর প্রার্থীর সহিত মুলাকাতের সময় কর্মকর্তার যে মেজাজ থাকে উনবিংশতম প্রার্থীর সাথে কথা বলার সময় তাঁর সেই মনোভাব থাকে না। এ ছাড়া প্রবাহ মানুষের ধ্যান-ধারণা ব্যক্তিত্বের ...কারণ সময় প্রবাহই মানুষের ধ্যান-ধারণার মুহুর্মুহু পরিবর্তন ঘটায়। কোন অপরিচিত কর্মপ্রার্থীর সহিত মুলাকাতের সময় ঐ জন সামান্য পারদর্শিতা দেখালে সাময়িকভাবে তাকে উত্তম মনে হয়। এতদ্ব্যতীত বহু বাগ্মী ব্যক্তিরা প্রায়ই কাজের দক্ষতা দেখাতে পারেনি। বহু ব্যক্তি ...বিদ্যা সুষ্ঠুভাবে কপচে গেলেও ...অপদার্থ প্রমাণিত হয়েছে। ...কালে প্রতিটি প্রার্থীর মানসিক ...অবস্থা স্থায়ী থাকে নি। এ'জন্য ...প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদানে তারা ...হয়েছে।

...কালে কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বাহুল্যের ...প্রত্যেককে সাক্ষাৎকারে ডাকা অসম্ভব ...লোককে 'প্রোসেস অফ এলিমিনেশন' ...বাদ দেওয়ার প্রয়োজন হয়। এই ...প্রথমে দেখা হয় যে এদের মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন তথা য়ুনিভার্সিটির সার্টিফিকেট বা ডিগ্রি আছে। কিনা? ...মাত্র ঐ সকল ব্যক্তিদের একত্রে ...পরীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। লিখিত পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের সাথে ...করা হয়। এর পর সাক্ষাতের দ্বারা ...ব্যক্তিদের অ্যাপ্রেণ্টিসরূপে নিযুক্ত ...তাদের ঐ বিশেষ কর্মের জন্য প্রয়োজনীয় ...আছে কি'না তা দেখা হয়। ...শিক্ষানবীশের কাজে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের ... পদসমূহে স্থায়িরূপে নিযুক্ত হয়।)

এ দেশের বহু মনীষী এই প্রার্থী-সাক্ষাৎ প্রথার পক্ষপাতী নন। এঁরা শিক্ষানবীশরূপে কর্মপ্রার্থীদের নিয়োগ করে তাদের কাজ দেখানর সুযোগ দিতে চান। এই শিক্ষানবীশদের ইংরাজিতে অ্যাপ্রেণ্টিস বলা হয়। এই সকল শিক্ষানবীশরা অসফল হলে কর্ম হতে তাদের বরখাস্ত করা হয়ে থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছে যে, অতি খারাপ কাজ না দেখালে ফোরম্যানরা তাদের বিরুদ্ধে রিপোর্ট করেননি। মোটামুটিভাবে কার্যক্ষম বিনয়ী শিক্ষানবীশদের তাঁরা প্রায়ই বরখাস্ত করে থাকেন। এই কারণে বহু ব্যক্তি নিজেদের দক্ষকর্মীরূপে

ডাঃ পঞ্চানন ঘোষাল

তৈরি করে নিতে পারেন নি। উপরন্তু দুইটি বা চারিটি শিক্ষানবীশের পদে ভর্তি হবার জন্যে শত শত ব্যক্তি আবেদন করে। এদের প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষানবীশ রূপে নিয়োগ করা সম্ভব নয়। এতোগুলি প্রার্থীর মধ্যে থেকে কয়জনকে মাত্র এঁদের বেছে নিতে হয়। এই ক্ষেত্রে প্রার্থী মনোনীত করতে হলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের সার্টিফিকেট-প্রাপ্ত ব্যক্তিদের লিখিত পরীক্ষার পর উহাদের প্রার্থী-সাক্ষাৎ একান্ত প্রয়োজন। এই দিক হতে বিচার করলে প্রার্থী-সাক্ষাৎ প্রথার প্রয়োজন অস্বীকার করা যায় না।

(কয়েকটি ক্ষেত্রে দক্ষতা নির্ণয়ার্থে পদপ্রার্থীদের সরাসরি পরীক্ষা করা চলে। একজন টাইপিস্টকে টাইপ করতে বলে কিংবা ড্রাইভারকে গাড়ি ড্রাইভ করতে বলে এই পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু তা সত্বেও তাদের দীর্ঘস্থায়ী ধৈর্য ও চরিত্র এতদ্দ্বারা জানা যায় না। স্বল্পমেয়াদী দক্ষতা এবং দীর্ঘমেয়াদী দক্ষতার মধ্যে প্রভেদ আছে। বহুকাল কর্মরত থাকলে অবশ্য দক্ষতা অর্জিত হতে পারে। কিন্তু এই মধ্যবর্তী কালে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে এ'জন্য যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করতে হয়।)।

অধুনা ...র-প্রার্থীদের সংখ্যা এতো অধিক হয়েছে যে ত্রিস্তর (Three tyre) পদ্ধতিতে এদের বহু ব্যক্তিকে বাদ দেওয়া দরকার হয়। প্রথমত এদের বিভিন্ন য়ুনিভারসিটি প্রদত্ত সার্টিফিকেট ও প্রশংসাপত্রসমূহ এবং তাদের আবেদন-পত্রে উল্লিখিত তথ্যাদি বিচার করে বহু প্রার্থীকে বাতিল করা যেতে পারে। এর পর বাকি বহু ব্যক্তিকে লিখিত পরীক্ষার দ্বারা বাতিল করা হয়। কিন্তু এই লিখিত পরীক্ষা প্রতিযোগিতামূলক হওয়া উচিত নয়। কারণ, এইরূপ পরীক্ষাতে প্রথম বা দ্বিতীয় হওয়া ব্যক্তিরা অন্য বিষয়ে পারদর্শিতা নাও দেখাতে পারে। এই লিখিত পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্যে কয়জন শ্রেষ্ঠমনা ব্যক্তিকে মাত্র প্রার্থী-সাক্ষাতের জন্য ডাকা হয়। এইভাবে শত শত ব্যক্তি র ভিতরে মাত্র দশজনকে শিক্ষানবীশের কাজে নিয়োগ করা যায়।

এই পন্থা ভালো কি মন্দ তা বহু শিল্পিক শ্রমিক-ছাঁটাইর হার পরিলক্ষ করে বুঝা যায়। এই অবস্থাতে প্রায় শ্রমিক-ছাঁটাইর হার অধিক দেখা যায়। প্রায় ক্ষেত্রে এরা দক্ষ-শ্রমিকরূপে নিজেদের তৈরি করতে অপারক হয়েছে। অবৈজ্ঞানিক ভাবে প্রার্থী-সাক্ষাৎ এবং অভিজ্ঞতার অভাবই এজন্য দায়ী। বহু ক্ষেত্রে তাঁরা বাগ্মিতা ও বহিরচাকচিক্যতে মোহিত হন। কয়েক ক্ষেত্রে এঁদের রাজনীতি এবং খেলাধূলা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়। এঁরা ভুলে যান যে এখানে তাদের কোনও সুবক্তাকে কিংবা খেলোয়াড়কে বা শিক্ষককে মনোনীত করতে বসা হয় নি। এখানে মাত্র কারিগরী-বিদ্যায় পারদর্শী উপযুক্ত প্রার্থীদের ঐখানকার পদ (post) বিশেষের উপর যথেষ্ট আগ্রহ আছে বা নেই তা বুঝাতে বলা হয়েছে। প্রার্থী-নির্বাচকরা ভুলে যান যে প্রার্থীদিগকে পূর্ব শিক্ষা-দীক্ষা ভুলিয়ে নিজেদের সম্পূর্ণ নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত করা চাই। এখানে তাদেরকে স্বস্ব কর্মক্ষেত্রের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। এখন বিবেচ্য বিষয় এই যে, ঐরূপভাবে নিজেদের নূতন পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর মত মানসিক অবস্থা তাদের আছে কি না। প্রার্থী-সাক্ষাৎ দ্বারা পদ-প্রার্থী-

দের দৈহিক ও মানসিক গঠন ঐ সকল পদের উপযোগী কি না তা প্রার্থী-নির্বাচকদের সর্বাগ্রে বুঝতে হবে। ঐ সকল কর্মের প্রতি প্রার্থীদের আগ্রহের অভাব থাকলে তাদের পক্ষে সুদক্ষ কর্মী হওয়া সম্ভব নয়। এই প্রার্থীদের পারিবারিক ও স্বকীয় (স্ব-অর্জিত) চিত্ত-প্রস্তুতি (প্রিডিসপোসিশন) কোন খাতে বহে মাত্র এইটুকু অবহিত হওয়া দরকার। বহু ব্যক্তি একটি বিশেষ বিষয়ে নানা কারণে চিত্ত-প্রস্তুতি অর্জন করে থাকে। এ ক্ষেত্রে অভ্যাস দ্বারা উহা তারা দ্রুতগতিতে বর্ধিত করতে সক্ষম। এইখানে কোনও বহির্জাগতিক জ্ঞানগরিমার প্রশ্নোত্তর অবান্তর প্রথা। ভুলে গেলে চলবে না যে সকল ব্যক্তি সকল পদের উপযুক্ত নয়। এইসব ভুলের জন্য যাকে উপযুক্ত মনে করা হয় সে অসফল এবং যাকে অনুপযুক্ত মনে করা হয় সে ঐ বিষয়ে সফলতা লাভ করে থাকে।

(বহু ক্ষেত্রে জিজ্ঞাসাবাদ দ্বারা জানা গিয়াছে যে, কোনও এক উপযুক্তমনা ব্যক্তি বহুবার বহু স্থানে চাকুরী করেছে। এমন কি, এই বিষয়ে সে বহু প্রশংসা-পত্রও দেখিয়েছে। কিন্তু সে কেন এক জায়গাতে টিকে না থেকে বার বার অন্যত্র কর্মের জন্য চেষ্টা করছে? এই বিষয় ঐ পদ-প্রার্থী নিজে না বুঝলেও সাক্ষাৎ-প্রার্থীদের বুঝে নিতে হবে যে তার মানসিক গঠন শিল্পক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে কাজ করার উপযুক্ত কিনা? এখানে তাকে কম বেতনে নিয়োগ করলে সে সুযোগমত অন্যত্র চাকুরি করবে। কোনও পদের পক্ষে আণ্ডার কোয়ালিফায়েড প্রার্থীদের মত ওভার-কোয়ালিফায়েড প্রার্থীদেরও নিয়োগ করা অনুচিত।

প্রায়ই কর্মকর্তারা কোন এক সুদর্শন যুবককে দেখে বলে থাকেন,—'বাঃ! ভেরি স্মার্ট বয়। আচ্ছা! কাল থেকে তুমি কাজে যোগদান ক'রো।' অন্য বিষয়ে ঐ যুবক বুদ্ধিমান ও কর্মতৎপর হলেও শিল্পক্ষেত্রে সে হয়তো পারদর্শিতা দেখাতে পারে না। এইজন্য বৈজ্ঞানিক পন্থাতে প্রার্থী-নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে।

(সিলেকশন বোর্ডসমূহে অন্ততঃ একজন সংশ্লিষ্ট কর্মবিষয়ে বিশেষজ্ঞ রাখা হয়। কিন্তু কোনও প্রার্থী তাঁর আত্মীয় বা বন্ধুপুত্র হলে ঐ ব্যক্তিকে বোর্ডে গ্রহণ করা উচিত নয়। এখানে প্রার্থী দুরূহ প্রশ্নের শেখানো উত্তর মুখস্থ বলে সকলকে মুগ্ধ করে দিতে পারে। কয়েক ক্ষেত্রে এলাহাবাদ বোর্ডের এবং কলিকাতা বোর্ডের বিশেষজ্ঞ মেম্বার পরস্পরের সাথে বন্দোবস্ত করে নিজ নিজ ক্যানডিডেটদের ব্যাক্ করেছেন। এইরূপ অসাধুতা হতে এই বোর্ডকে সেখানে মুক্ত রাখতে হবে।)

প্রার্থী-নির্বাচনে-প্রার্থী সাক্ষাৎ-এর বৈজ্ঞানিক পন্থা সমূহ এইবার আলোচনা করবো। কারখানাতে এবং অফিস কিম্বা কোনও সংস্থাতে কর্মী নির্বাচনকালে প্রথমে নির্বাচকদের এই প্রার্থী-সাক্ষাৎ কাজের জন্য নিজেদের যথোচিতভাবে প্রস্তুত করা উচিত। হবে। প্রথমে তাঁদের জানা দরকার যে কোনও এক পদের উপযুক্ত প্রার্থীর কি কি গুণ থাকা উচিত। কি কি গুণ বা দোষ থাকার জন্য কর্মীরা সফল বা অসফল হয় তা তাঁদের পূর্ব হতে জানা প্রয়োজন। এইজন্য সরজমিন তদন্ত দ্বারা তাঁদের জানতে হয় ফ্যাক্টরিসমূহে কি কি দোষে কর্মীদের বিতাড়িত করা হয়। এই সাথে তাঁদের এও জানতে হবে যে কি কি গুণের জন্যে তারা ঐখানে সুনাম অর্জন করেছে। বলা বাহুল্য, প্রতিটি ব্যক্তি প্রতিটি কাজের জন্য উপযুক্ত হয় না। একটি কাজে যে-কোনও এক ব্যক্তি অসফল হলেও অন্য একটি কর্মে সেই ব্যক্তি সুনাম অর্জন করে। অধিক ক্ষেত্রে প্রার্থী-সাক্ষাৎ দ্বারা কর্ম-প্রার্থীদের নির্বাচন করা হয়। কিন্তু সেখানেও দেখা যায় যে নির্বাচকরা কি জানার উদ্দেশ্য কি প্রশ্ন করবেন পূর্ব হতে সেই সম্বন্ধে একটি প্ল্যান তৈরী না করে প্রার্থীদের সহিত সাক্ষাৎ করে থাকেন। এর ফলে বহু এলোমেলো প্রশ্ন প্রার্থীদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। কি জানার উদ্দেশ্যে ঐ প্রশ্ন করা হলো তা প্রথমে প্রার্থীদের বুঝতে দিতে হবে। এই সকল প্রশ্ন যথেষ্ট পরিমাণে ভাব-প্রকাশক এবং বোধাত্মক হওয়া উচিত। এইজন্য সুপরিকল্পিতভাবে শব্দ চয়ন করে বাক্য-বিন্যাস করা চাই। কারণ, মনে যা ভাবা হয় তা প্রায়ই ভাষায় প্রকাশ পায় না। প্রার্থীদের ঘাবড়ানির ভাব (নারভাসনেস্) প্রথমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিদূরিত করতে হবে। এ'জন্য তাদেরকে প্রথমে জটিল প্রশ্ন না করে খুব সহজ প্রশ্ন করা উচিত। এইভাবে মানসিক ভারসাম্য তাদের আয়ত্তে এলে তাদেরকে জটিল প্রশ্ন করা যেতে পারে। কিন্তু কেবল সাক্ষাৎকার দ্বারা উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করা যায় না। তড়িৎ ঘড়িৎ মুখস্থ পুঁথিগত বিদ্যা কপচাতে পারলেই এইসব প্রার্থী সুদক্ষ কর্মী হতে পারে না। সাক্ষাৎকার দ্বারা তাদের বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে কিছুটা হয়তো ধারণা করা যেতে পারে। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না যে, কোনও কর্মে প্রবণতা না থাকলে সকলের বুদ্ধিমত্তা সকল বিষয়ে কার্যকরী হয় না। এইখানে তাদের ধৈর্যশক্তি, পরিশ্রমের ক্ষমতা, চিত্তের একাগ্রতা, দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণ, নিষ্ঠা ও পরিচ্ছন্নতা, উদ্ভাবনী শক্তি, অবলোকনের শক্তি (অবসারভেশন্), বিচারবুদ্ধি, কর্মতালের সাম্য, রি-অ্যাকশন টাইম (প্রতিক্রিয়া শক্তি) এবং দায়িত্ব বা সততা ও আনুগত্য প্রভৃতির প্রশ্নও জড়িত আছে। পুঁথিগত বিদ্যাতে পারদর্শী পণ্ডিত প্রার্থীরা সরজমিন কার্যক্ষেত্রে সফল নাও হতে পারে। এক ব্যক্তির বেশভূষা ও কথাবার্তা হতে সে প্যাকিং বা ড্রেসারের কাজ ভাল পারবে তা কারুর পক্ষে ধারণা করা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাক্ষাৎকারের কার্যকারিতা সম্বন্ধে অস্বীকার করা যায় না।

বি: দ্র:—সহস্র সহস্র পদ-প্রার্থী হতে উপযুক্ত ব্যক্তিদের বাছতে হলে প্রথমে লিখিত পরীক্ষা করা হয়। ইহাকে সাধারণ ভাষাতে গ্রুপ টেস্টিং বলা হয়। এই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ ব্যক্তিদের প্রার্থী-সাক্ষাৎ দ্বারা ব্যষ্টি পরীক্ষা (ইনডিভিজুয়েল টেস্ট) করা হয়। এতদ্দ্বারা পদ-প্রার্থীর সংখ্যা কমিয়ে আনা হয়। কিন্তু এতে বহু উপযুক্ত পদ-প্রার্থী বাদ পড়ে। প্রার্থীদের সংখ্যা খুব বেশি হলে এ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। পদ-প্রার্থীদের হাতে কলমে কাজকর্ম করতে বলে তাদের দক্ষতা পরীক্ষা করা চলে। কিন্তু এতে তাদের সহনশীলতা, পরিশ্রম শক্তি, কর্মোদ্যম, সহযোগী মনোভাব, চিন্তাধারা প্রভৃতি গুণাগুণ বুঝা যায় না। এজন্যে শিক্ষানবীশ বা অ্যাপ্রেন্টিস্ নিয়োগের ব্যবস্থা অনুমোদন করা হয়। এখানেও দেখা গিয়েছে যে, খুব অদক্ষ না হলে ফোরম্যানরা তাদের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন দেন নি। এর ফলে কারখানাতে বহু অদক্ষ কর্মী রয়ে যায়।

এজন্যে পদ-প্রার্থী নির্বাচনে মনোবিজ্ঞানীদের সাহায্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। কোনও এক পদের উপযুক্ত ও মানসিক দৈহিক গঠন কারুর আছে কি না তা মনোবিজ্ঞানীরা নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা জানাতে সক্ষম। এইরূপ মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিরা তাদের আপন স্বার্থে দ্রুতগতিতে কাজ-কর্ম শিখে তাতে তারা অভ্যস্ত হয়ে থাকে। এই ক্ষেত্রে তাদের উচিতমত আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধেও অবহিত হতে হবে। কারণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের পক্ষে ছোট কারখানা উপযুক্ত স্থান নয়। এক্ষেত্রে তারা সর্বদা অন্যত্র চাকুরির সন্ধান করবে। এর ফলে কর্মশালার কাজ-কর্মে তাদের একাগ্রতা থাকে না। কারখানাতে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা উহার তৎকালীন পরিস্থিতি ও কর্মী সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি বিষয় বিবেচনা করতে হবে। তা' না হলে প্রতিষ্ঠানের সাথে সাথে ঐ সকল পদ-প্রার্থীদেরও ক্ষতি করা হয়।

এইরূপ জ্ঞান-বুদ্ধি পরীক্ষা ব্যতীত শ্রমিকদের মানসিক ও দৈহিক প্রতিক্রিয়া কাল (Re-action time) শিল্পক্ষেত্রের উপযুক্ত কি না তা যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করা যায়। যে কার্যে বারে বারে অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তাতে শ্রমিকদের মানসিক প্রতিক্রিয়াকালের অধিকারী হওয়া দরকার।

এখানে শ্রমিকদের কোনও এক প্রশ্ন করলে সে যতো শীঘ্র তার উত্তর দিলে তা স্টপ্ ওয়াচ দ্বারা পরিমাপ করে এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার কাল নির্ণয় করা হয়। প্রশ্ন করার এবং উহার উত্তর পাওয়ার মধ্যবর্তী সময়টুকু ঐ শ্রমিকের মানসিক প্রতিক্রিয়ার কালরূপে বিবেচিত হবে। বিপজ্জনক-কার্যে কার্যরত শ্রমিকদের দৈব-দুর্ঘটনা এড়ানর জন্য শক্তিশালী দৈহিক প্রতিক্রিয়া-কালের অধিকারী হওয়া দরকার। শক্তিশালী রি-অ্যাকশনের অধিকারী শ্রমিকরা বিপদ দেখা-মাত্র দ্রুতগতিতে তাদের হাত বা পা সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়। শ্রমিকদের কায়িক প্রতিক্রিয়া নির্ণয়ের জন্য বহুবিধ যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বিপদ দেখা ও অঙ্গ সরানোর মধ্যবর্তী সময়ই ঐ শ্রমিকের দৈহিক প্রতিক্রিয়াকাল নির্ধারিত। এক সেকেণ্ডের এক হাজার ভাগের এক ভাগকে সিগমা বলা হয়। ঐ সিগমা পরিপ্রেক্ষিতে এই দৈহিক প্রতিক্রিয়া-কাল পরিমাপ করা হয়। এই প্রকার ব্যবস্থা দ্বারা নির্বাচিত উপযুক্ত প্রার্থীর মনোনীত হয় নি। অনেক ক্ষেত্রে বক্স নম্বরের বেনামীতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দ্বারা পদ-প্রার্থীদের আহ্বান করা হয়। এঁরা প্রার্থীরা ফ্যাক্টরির নাম না জেনে দরখাস্ত পাঠাতে চান নি। এইজন্য নিয়োগ-কর্তার পূর্বাহ্নে তাঁদের আত্মপরিচয় দেওয়া উচিত হবে। অন্য ক্ষেত্রে কয়েকজন মালিক আরও নিকৃষ্টতর ও জঘন্য ব্যবস্থা দ্বারা অপর ফ্যাক্টরীতে শিক্ষিত কর্মীকে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করেছেন এই সকল ক্ষেত্রে তাঁরা অন্য ফ্যাক্টরি হতে দক্ষ কর্মীদের অধিক বেতনের লোভ দেখিয়ে ভাঙিয়ে এনে নিজেদের ফ্যাক্টরিতে ভর্তি করে নেন। কিন্তু এ ব্যবস্থা শিল্পসংশ্লিষ্ট সকলের পক্ষেই আখেরে ক্ষতিকর হয়। আমি এঁদের এই ব্যবহার নিন্দনীয় ও কুরুচিপূর্ণ মনে করি।

এইখানে দুঃখের বিষয় এই যে, ভারতের ফ্যাক্টরিসমূহে আজও পর্যন্ত বৈজ্ঞানিক রীতিতে শ্রমিক ভর্তি করা হয় না। এইখানে (সাধারণত) যে যে পদ্ধতিতে শ্রমিক ভর্তি করা হয় সেই সকল উপায় এইবার আমি নিম্নের পৃথক পৃথক দফায় বিস্তারিতভাবে তাহা আলোচনা করব।

১। সাধারণত শ্রমিকরা ফ্যাক্টরি-গেটের নিকট বিশেষ বিশেষ দিনে কর্মের জন্য ভিড় করে দাঁড়ায়। ফ্যাক্টরির লেবার অফিসারগণ দারোয়ান দ্বারা তাদেরকে ভিতরে ডাকিয়ে এনে তাদের মধ্য হতে কুশলী বা অকুশলী কর্মী নির্বাচন করেন। ঐ সময় ভিড়ের চাপে উপযুক্ত ব্যক্তিরা প্রায়ই ভিতরে ঢুকতে পারে না। এই সুযোগে বহু লড়াকু প্রকৃতির অপরাধপ্রবণ কর্মী বহাল হয়েছে।

২। বহু ক্ষমতাশীল সরকারী কর্মচারী ও অন্যান্য ব্যক্তি তাঁদের পোষ্যবর্গকে বা পরিচিতদের [illegible] ম্যানেজারদের অনুরোধ করেন। বহু প্রকার বাধ্য-বাধকতা থাকাতে এঁদের প্রেরিত প্রার্থীরা অনুপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে তাদের ভর্তি করতে হয়। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে এদের ভর্তি করার ফলে ঐ সকল ক্ষমতাশীল ব্যক্তিদের সাথে মালিকদিগের ও ম্যানেজারের মনোমালিন্য ঘটেছে। কারণ, ঐ সকল অনুপযুক্ত ব্যক্তিদিগকে ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত করা উপযুক্ত ও দক্ষ শ্রমিকগণ পছন্দ না করাতে শ্রমিক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। তদুপরি এদের অদক্ষতার জন্যে শেষ-বেশ এদের এরা বরখাস্ত করতে বাধ্য হয়েছেন। এই জন্য প্রায়ই ঐ সকল ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা অন্যত্র দূর স্থানে বদলি হওয়া মাত্র তাদের আত্মীয়দের নানা কারণে (অকারণেও) বরখাস্ত করা হয়। কয়েক ক্ষেত্রে এদের ভর্তি করানোর পর এদের পদোন্নতি জন্যও তাগিদ এসে থাকে। বহু সুচতুর ম্যানেজার এদের কঠিন কাজ দেন—যে তাতে তারা একদিনও টিকে থাকতে না পেরে কর্মত্যাগ করে চলে যায়। আপাতঃ-দৃষ্টিতে এই (কৃত্রিম ভাবে সৃষ্ট) অক্ষমতা তাদের ক্ষতির কারণ হয়।

(৩) কর্মরত শ্রমিকদের অনুরোধে তাদের উপযুক্ত আত্মীয়দের মধ্য হতে শ্রমিক নিয়োগ করা হয়েছে। বহু শ্রমিক তাদের পোষ্যদের বা ঘরিয়াকে বিনা বেতনে তাদের তাঁতে মেসিনে নিযুক্ত রেখে তাদেরকে উহা চালাতে শেখায়। এইভাবে দক্ষতা অর্জন করলে এদের নিয়মমত ভর্তি করা হয়।

আপন আত্মীয় হওয়াতে উহাদের শিক্ষার জন্য ঐসব স্থায়ী কর্মীরা তাদের ভালোরূপে কাজ শেখায়। জুটমিলসমূহে তাঁতঘরে ও স্পিনিঙে এইরূপ প্রথা বহুদিন যাবৎ চালু আছে। এই ব্যবস্থাতে এদের জন্য পৃথক শিক্ষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় না।

(৪) কনট্রাক্টরগণ তাদের নিজেদের নিযুক্ত শ্রমিকদের মিলের মধ্যে এনে ঐখানকার কাজ-কর্ম করে। এই কনট্রাক্টরগণের কেহ কেহ ফ্যাক্টরির মাসিক মাহিনার চাকুরিয়া এবং এদের কেহ কেহ কনট্রাক্ট বেসিসে লেবার সাপ্লাই করে ও তাদের কাজের তদারকী করে ঐখানকার কাজকর্ম করে দেয়। কিন্তু তাদের অধীন কর্মীরা কোনও ক্ষেত্রেই ঐ সকল ফ্যাক্টরির চাকুরিয়া নহে। কনট্রাক্টরদের এই প্রথার অসুবিধা এই যে, কনট্রাক্ট ফুরোলে তারা তাদের দক্ষ কর্মীদের সাথে করে নিয়ে অন্যত্র চলে যায়।

(ফ্যাক্টরি অ্যাক্টের অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যার ঊর্ধ্ব সংখ্যক কর্মী বহাল করলে ঐ ফ্যাক্টরি অ্যাক্ট অনুসারে বহুবিধ আইন-কানুন এদের মেনে চলতে হয়। এইজন্য এরা এই প্রতিষ্ঠানে ফ্যাক্টরি এ্যাক্টের আওতে পড়বার আশঙ্কা এড়াবার জন্য কয়েকটি কনট্রাকটারের (ঠিকাদার) মারফৎ তাদের নিযুক্ত কর্মীদের দ্বারা ঐ ফ্যাক্টরির উৎপাদন কার্য সমাধা করে। অবশ্য কেবলমাত্র কোম্পানি এবং ছোট ফ্যাকটরির মালিকগণ এরূপ সুবিধা ভোগ করতে সক্ষম। এই সকল ঠিকাদারগণ তাদের তাঁদের লোক হলো বার্ষিক আয় ভাগাভাগি করে আয়কর প্রভৃতি কর বকলমে কমানো সম্ভব)।

কোলিয়ারি অঞ্চলে কয়লা খনিতে এই প্রকার ঠিকাদারি প্রথার বহুল প্রচলন আছে। মজদুরগণ এদের আজ্ঞাবাহীরূপে কাজ করে। এই সকল ঠিকাদারের মধ্যে পুরুষদের মত নারীরাও আছে। পুরুষ ঠিকাদারদের অধীনে পুরুষ-কর্মী এবং নারী ঠিকাদারদের অধীনে নারী-কর্মী বহাল থাকে। পুরুষ ঠিকাদারগণ প্রায়ই মজদুরদের দ্বারা ব্যক্তিগত চাষবাস এবং গৃহকর্মাদি বিনা বেতনে করিয়ে নেন। উপরন্তু কোম্পানীর প্রদত্ত এদের বেতনেরও কিছু অংশ নিজেরা আত্মসাৎ করেন। নারী ঠিকাদারদের কেহ কেহ ভীষণ প্রকৃতির দুশ্চরিত্রা ও মদ্যপায়ী হয়ে থাকেন। এঁদের কেহ কেহ ভয় ও লোভ দেখিয়ে এঁদের অধীন কুলি-কামিনীদের দুশ্চরিত্রা করে তোলেন।

(অনেক ফ্যাক্টরির মালিক লেবার ট্রাবল এড়াবার জন্যে এই ঠিকাদারি প্রথার পক্ষপাতী। কারণ, সাক্ষাৎভাবে এতে মজদুরদের সাথে মূল প্রতিষ্ঠানের কোনও সম্পর্ক থাকবার কথা নয়। এদের বেতন বৃদ্ধি প্রভৃতি যা কিছু ঝামেলা ঐ সকল ঠিকাদারদের স্কন্ধে তাঁরা চাপাতে চান। কিন্তু এই ক্ষেত্রে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা মূল কর্মক্ষেত্রে অবরোধ করে ঐ বকলম প্রথার প্রকৃত নায়ক মালিককেও তাদের নিযুক্ত ঠিকাদারদের সাথে উত্ত্যক্ত করে। কারণ, এই বকলম তথা বেনামী প্রথার প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে তারা অবহিত আছে।

(৫) আড়কাঠি :—এই আড়কাঠি প্রথা এককালে ভারতে প্রচলিত ছিল। ঐ সময় ভারতের বহুদূর প্রদেশে চা-বাগিচার কাজে কিংবা আফ্রিকা, সিংহল প্রভৃতি স্থানের জন্য শ্রমিক সংগ্রহ কষ্টসাধ্য ছিল। এইজন্য এই সকল আড়কাঠিগণ দেশের স্থানে স্থানে আড়কাঠি ঘাঁটি স্থাপন করে শ্রমিকদের লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে (বালকদের চুরি করে) জমায়েত করতো। এরপর এদেরকে তারা দীর্ঘ পাঁচ বা দশ বৎসরের চুক্তি-নামাতে টিপ সই দিতে বাধ্য করে দূর দূর স্থানে পণ্যদ্রব্যের মত চালান দিত। এই দীর্ঘমেয়াদী চুক্তিনামার অজুহাতে বহু বৎসর তাদের দেশে ফিরতে দেওয়া হত না।

(৬) চাকুরি-সংস্থা—এই চাকুরী সংস্থাকে এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ বলা হয়। উপযুক্ত স্থানীয় প্রার্থীদের জন্য কর্ম-সংস্থান করার জন্য ইহার সৃষ্টি। কারণ স্থানীয় যুবকদের কর্ম-সংস্থান না হলে স্থানীয় শান্তি বিনষ্ট হয় এবং তৎসহ স্থানীয় অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যায়। এরা কয়েকটি সঙ্গত কারণে ঈর্ষান্বিত হয়ে সরকার-বিরোধী দলের সৃষ্টি করে। এদের কেহ কেহ প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হয়ে উঠে। এদের বাসভূমিতে ফ্যাক্টরি স্থাপিত হলে এদের বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এজন্য এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এরা তাদের বাটীর কাছে চাকুরী পেতে চায়। স্থানীয় ব্যক্তিদের চাকুরিতে অগ্রাধিকার দেওয়াতে সুবিধাও আছে। এদের রাহাখরচ বাবদ অর্থব্যয় করতে না হওয়ায় এরা স্বল্প বেতনে সন্তুষ্ট থাকে। যাতায়াতে পরিশ্রান্ত না হওয়াতে এরা কর্ম-ক্লান্তিতে ভুগে না। কিন্তু বহু বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকরা এই কর্ম-সংস্থান বুরোগুলির সহিত সহযোগিতা করেন না। এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত কর্মসংস্থান বুরোর সাথে সহযোগিতা করলে এনাদের আত্মীয় ও স্বজন পোষণের অসুবিধা হয়ে থাকে। কয়েক ক্ষেত্রে এই সকল কর্ম-সংস্থান সংস্থার অধিকর্তারাও সকল প্রার্থীর প্রতি সমান সুবিচার করেন নি। অবশ্য এইরূপ অভিমত সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

(প্রায় ক্ষেত্রে কর্মবহুল ফ্যাক্টরিতে শিক্ষানবীশের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না। উপরন্তু নিতান্ত আপন ব্যক্তি না হলে কেহ কাহাকেও সুষ্ঠুভাবে শিক্ষাও দেয় না। উপরন্তু এই শিক্ষণকালে প্রায়শ ক্ষেত্রে কোনও পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না। এই সকল ফ্যাক্টরি কারও বাড়ি কাছে না থাকলে সেখানে অবৈতনিকভাবে শিক্ষালাভ (গাড়ি ভাড়ার অভাবে) সম্ভব হয় না। এই জন্যে বহু সংখ্যায় বিভিন্ন শ্রম-শিল্পের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষণ-শিবির পল্লীতে পল্লীতে স্থাপন করা উচিত।)

অসাধু কর্মতৎপরীন ব্যক্তিদের দ্বারা উৎকোচ গ্রহণান্তে শ্রমিক নিয়োগের কাহিনীও শুনা গিয়েছে। এই প্রথা বহাল থাকায় বহু অসংশ্লিষ্ট পেশাদারী দালাল-অপরাধীর সৃষ্টি হয়েছে। এরা ইতিমধ্যে সারা দেশে এক মহা অমঙ্গলকর অবস্থার সৃষ্টি করেছে। এই উৎকোচ গ্রহণান্তে সংগৃহীত অদক্ষ কর্মিগণ উদ্যোগ শিল্পে আজ এক মহা অভিশাপ। কয়েক ক্ষেত্রে এরা এক শ্রেণীর রাজনৈতিক দলের অর্থের বলে অসাধু নির্বাচকদের দ্বারা ফ্যাক্টরিতে নিযুক্ত হয়ে থাকে। এরা দুই দিক হতে বেতন পেয়ে দলের স্বার্থে সাথী শ্রমিকদের পরিচালিত করে থাকে। প্রায়শ ক্ষেত্রে নিম্ন পদের কর্মচারীদের উপর এক শ্রেণীর শ্রমিকদের নিয়োগ করার ভার থাকে। কিন্তু ফ্যাক্টরীতে সুষ্ঠুভাবে কর্মী নিয়োগে এদের সামান্যমাত্রও জ্ঞান নেই। কেবলমাত্র সৎ ও জ্ঞানী-গুণী দায়িত্বশীল কর্মচারীদের উপর যে কোনও প্রকার কর্মী নিয়োগের ভার থাকা উচিত।

প্রার্থী সাক্ষাৎকালে কর্মপ্রার্থীদের নানাভাবে বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়ে থাকে। ইংরাজী ইনটেলিজেন্স টেস্টের বাংলা পরিভাষা বুদ্ধি-পরিমাপ। সাক্ষাৎকালে নানা প্রকার বচন-বিন্যাস দ্বারা প্রার্থীদের জ্ঞান-বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়। প্রার্থী-সাক্ষাৎকালে পদপ্রার্থীদের দুই প্রকার প্রশ্ন করা হয়ে থাকে, যথা—প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ। 'হিমালয়ের উচ্চতা কি? বৃটেনের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি?' এই সকল সাধারণ জ্ঞানসম্পর্কিত পরোক্ষ প্রশ্ন। হিমালয়ের উচ্চতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে তার উত্তর হবে —'যে কোনও ভূগোলের পুস্তকে উহা লিখা আছে। আমি উহার মোটামুটি উচ্চতা বলতে পারি।' কোনও একটি তথ্যকার লেখা ও উহা কোন পুস্তকের কোথায় আছে—তা ত্বরিৎ গতিতে কেউ বলে দিলে তাকেই আমরা বিদ্বান ব্যক্তি বলবো। অযথা প্রতিটি বিষয়ে মনে রেখে মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করা উচিত নয়। অপরদিকে ডাক্তারকে দেহ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে এবং যন্ত্রবিদকে যন্ত্র সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হলে উহাকে আমরা প্রত্যক্ষ প্রশ্ন বলি। কিন্তু কারুর বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে হলে তাকে পরোক্ষ প্রশ্ন করা হয়। পরোক্ষ প্রশ্নতে ঠকানোর প্রশ্নের অবতারণা না করে কয়েক প্রকার মনগড়া ঘটনার বিষয় উল্লেখ করা উচিত। 'এইরূপ এক ঘটনা কর্মস্থলে ঘটলে তুমি সেই স্থলে কি করবে?'—একমাত্র এইরূপ প্রশ্নের সদুত্তর দ্বারা কর্মপ্রার্থীদের ঐ পদ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বুদ্ধিবৃত্তির পরিমাপ করা সম্ভব। এ সম্বন্ধে দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি বহুল প্রচলিত কাহিনী এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

"কোনও এক ফ্যাক্টরির কর্মকর্তা তাঁর কোয়ার্টার হতে রাত্রি দুই ঘটিকাতে হাওড়া স্টেশনে ট্রেন ধরবার জন্য বার হন। তাঁর মোটর ঐ ফ্যাক্টরির গেটে এলে ঐখানে পাহারারত দ্বারবান তাঁর মোটর কিছুক্ষণ সেখানে আটকে রেখে বলেছিল, 'সাব। এইমাত্র স্বপ্ন দেখলাম যে আপনার মনোনীত ট্রেনটিতে এক ভীষণ কলিশন হবে। ঐ ট্রেনে উঠলে আপনার নিশ্চয় মৃত্যু ঘটবে।' সাহেব তার কথা না শুনে স্টেশনে এসে শুনলেন যে ঐ ট্রেণ কিছুক্ষণ আগে ছেড়ে দিয়েছে। এই ট্রেন ফেইল হওয়াতে তিনি মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। এমন সময় তিনি শুনলেন যে পরবর্তী স্টেশনের কাছে ঐ ট্রেনে এক ভীষণ কলিশন হওয়াতে প্রতিটি যাত্রী নিহত বা আহত হয়েছে। এরপর বাড়িতে ফিরে সাহেব ঘটনাটি তাঁর স্ত্রীকে শুনিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,—'আচ্ছা। এখন ঐ দ্বারবান সম্বন্ধে আমার কর্তব্য কি?'

মেমসাহেব এই প্রশ্নের উত্তরে কৃতজ্ঞভাবে স্বামীকে বললেন, 'ওকে এখুনি সহস্র মুদ্রা পুরস্কার দাও। ও তোমাকে আটকানোর জন্যে দেরি হওয়ায় তুমি ট্রেন ফেইল করেছো। এ দিক হতে ও তোমার জীবনকে রক্ষা করেছে।'

এখন এই কাহিনীর সূত্র ধরে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে মেমসাহেব যাই বলুন না কেন, এক্ষেত্রে ফ্যাক্টরির ঐ কর্মকর্তা সাহেবের কর্তব্য কি হবে? এর একমাত্র উত্তর হবে যে, পাহারারত অবস্থাতে রাত্রে ঘুমানোর জন্য (ঘুমালে লোকে স্বপ্ন দেখে) ঐ সাহেবের পক্ষে ঐ দরোয়ানকে তখুনি বরখাস্ত করা উচিত হবে।"

বহু ক্ষেত্রে ধাঁধার আকারে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করা হয়েছে। 'কড়ির মা'র তিনটি ছেলে। তাদের দুজনের নাম, এককড়ি ও দু' কড়ি। এদের তৃতীয়জনের নাম কি?' অবশ্য এর একমাত্র উত্তর হবে—কড়ি। কারণ ঐ প্রশ্নের মধ্যেই বলা হয়েছে, 'কড়ির মা'র ইত্যাদি। এখানে বিবেচ্য বিষয় হবে এই যে, কতো শীঘ্র যথার্থ উত্তর পাওয়া গেল। কারণ, এমন বহু কাজ আছে যাতে দ্রুতসিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়ে থাকে। 'হোয়াট ইজ দি ডিফারেন্স বিটউইন স্টেশনমাস্টার অ্যাণ্ড স্কুলমাস্টার? ওয়ান মাইণ্ডস দি ট্রেন অ্যাণ্ড আদার ট্রেনস দি মাইণ্ড।' 'হোয়াট ইজ দি ডিফারেন্স বিটউইন ফুটবল এণ্ড দি প্রিন্স? ওয়ান ইজ থ্রোন টু দি এয়ার অ্যাণ্ড দি আদার ফ্রম এয়ার (Heir) টু দি থ্রোন (Throne)।' এ ধরণের জামাই-ঠকানো প্রশ্ন কদাপি কাউকে জিজ্ঞাসা করা উচিত হবে না। কিন্তু 'কাগজের সাথে কাপড়ের প্রভেদ কি?' এরূপ প্রশ্ন এদের যথাযথভাবে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

কোনও কর্মের প্রতি কারুর প্রবণতা (ইন্‌নেট এবিলিটি) এবং অভ্যাস-অর্জিত দক্ষতার প্রভেদ আছে। কোনও কর্মের প্রতি প্রবণতার অধিকারী ব্যক্তি উহা অভ্যাস দ্বারা বহু গুণে বাড়াতে পারে। এই ক্ষেত্রে প্রথমোক্ত ব্যক্তি শেষোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক দক্ষ হয়ে উঠে। কিন্তু বিভিন্ন কর্মে প্রয়োজনীয় দক্ষতা বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। এজন্য যে ব্যক্তি এক বিষয়ে দক্ষ সে ব্যক্তি অপর এক বিষয়ে দক্ষ হয় না। উপরন্তু একটি কর্মে যার প্রয়োজনীয় প্রবণতা আছে অপর এক কাজে তার সেই প্রবণতা নেই। এজন্যে একটি কাজে অদক্ষ হলেও সে অপর কাজে

দক্ষতা দেখায়। এইজন্য এও দেখা যায় যে, সমান সুবিধাভোগী হওয়া সত্ত্বেও একদল কর্মী অপর দল অপেক্ষা ভালো কাজ দেখায়।

এক্ষণে বিবেচ্য বিষয় এই যে, এই দক্ষতা কিভাবে তারা প্রমাণ করে? ধরা যাউক, দুই জনকে কাজ-কর্মে সমান সুবিধা দেওয়া হয়েছে। এই ক্ষেত্রে একজন প্রার্থী সহজ কাজ মাত্র চালাতে পারে। কিন্তু অন্যজনে সেই সঙ্গে কঠিন কাজও ভালো পারে। এ ক্ষেত্রে শেষোক্ত ব্যক্তি প্রথমোক্ত ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক দক্ষ বিবেচিত হবে। ধরা যাউক, কতকগুলি কার্য সমানভাবে কঠিন কার্য। একদল লোক অপর দল অপেক্ষা নির্দিষ্ট সময়ে ঐ কাজ অধিক সংখ্যাতে করলো। এইভাবে অধিক-সংখ্যক কাজে সক্ষম ব্যক্তিদের আমরা অধিক দক্ষ বলবো। সমান সুবিধাভোগী কর্মীদের মধ্যে একদল মন্থর গতিতে দ্রব্যোৎপাদন করে কিন্তু উহাদের অপর দিন ঐরূপ দ্রব্যোৎপাদন দ্রুত গতিতে সমাধা করে। এ ক্ষেত্রে শেষোক্ত দ্রুতগতি-সম্পন্ন কর্মীদের আমরা অধিক দক্ষ বলবো। এইরূপ পদ্ধতিতে সমান সুবিধাভোগী কর্মীদের দক্ষতার মান নির্ণয় করা যেতে পারে।

এইবার বিবেচ্য বিষয় এই যে, শ্রমিকদের মধ্যে কে দক্ষ, কে বা অদক্ষ হবে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা পূর্ব হতে কিরূপে বুঝা যেতে পারে? মনোবিজ্ঞানীদের মতে বুদ্ধি পরিমাপ, প্রবণতা পরীক্ষা (স্পেশাল অ্যাপটিটিউড) এবং দৈহিক পরিক্রমণ পরিলক্ষ্য করে ইহা পরিজ্ঞাত হওয়া সম্ভব। ডাইস ও অন্য দ্রব্য সাহায্যে বিশৃঙ্খল প্রথাতে নির্মিত বস্তুকে ভেঙে দিয়ে উহা পুনর্গঠন করতে বলে কেহ কেহ সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মক্ষমতা সম্বন্ধে এদের পরীক্ষা করেন। উপরন্তু বহুবিধ ধাঁধার প্রশ্ন তৈরী করেও এদের বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করা হয়। বহু ক্ষেত্রে যন্ত্রবিশেষের পার্টসগুলি একত্রিত করতে বলে কোনও কর্ম সম্পর্কিত কর্ম-প্রবণতা পরীক্ষা করা যায়। এখানে দেখা হয় যে, এরা কেবল সাবলীলভাবে আগ্রহ সহকারে ঐ যন্ত্রাংশ সমাবেশের কাজ করতে পারলো। স্ক্রু-ড্রাইভার সহযোগে স্ক্রু ড্রাইভ করতে বলে কিংবা হাতুড়ি দ্বারা পেরেক পুঁততে বলে শ্রমিকদের কর্মচাতুর্য এবং তৎসহ বল-বুদ্ধি পরীক্ষা করা যায়। এইসব কাজে পেশী ও স্নায়ুর শক্তি পর্যাপ্ত পরিমাণে তার মধ্যে আছে কি না, এদের কাজের মধ্যে ছন্দোবদ্ধ চাতুর্যপূর্ণ গতি পরিলক্ষ্য করে তা বুঝা যায়।

[কোনও এক কর্মের প্রতি কোনও এক প্রার্থীর প্রবণতা মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে পরীক্ষা করার রীতি আছে। ডাক্তারকে তার নিত্য-সঙ্গী স্টেথিসকোপ বা ডাক্তারি যন্ত্র আগ্রহান্বিত করে। কিন্তু ঐগুলি দেখলে একজন উকিল একটুও আগ্রহ প্রকাশ করে না। কিন্তু ঐ উকিল আইন পুস্তক এবং আদালতের রায় সম্বন্ধে অত্যধিকভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠে। এই আগ্রহ মানুষের চোখে নির্ভুল ভাবে ফুটে উঠতে বাধ্য। মনস্তাত্ত্বিক যন্ত্রে দৈহিক কম্পন দ্বারা উহা আরও সুঠামভাবে ধরা পড়ে। এই কারণে প্রার্থীদের সাক্ষাৎকালে কেউ একটি ইলেকট্রিক আবসেচার দেখালে কেউ অত্যধিক আগ্রহান্বিত হয়ে উঠে। কেউ বা তাতে নির্লিপ্ত ভাব দেখায় বা ভীত হয়ে উঠে। এই ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া যায়, প্রথমোক্ত ব্যক্তির মধ্যে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হবার উপযুক্ত পরিজ্ঞান ও প্রবণতা আছে। এই জন্য ঐ ব্যক্তিকে এই কাজে ভর্তি করে নেওয়া উচিত। এইভাবে বিভিন্ন পেশা সম্পর্কিত তথ্যের অবতরণ করে কিংবা বিভিন্ন পেশাতে প্রয়োজনীয় দ্রব্য তাদের দেখিয়ে তাদের আবভাব লক্ষ্য করে তাদের সেই সেই বিষয়ে প্রবণতা পরীক্ষা করা যায়।

করনিকদের কাজ-কর্ম দেহগত শ্রমিকদের মত হয় না। এদের দ্রুতগতিতে চিঠি-পত্র ড্রাফ্‌ট করতে হয়। এজন্য এদের মধ্যে ভাষার জ্ঞান অধিক থাকা চাই। এদের বহু জনকে একত্রে নিম্নোক্ত লিখিত প্রশ্ন দ্বারা পরীক্ষা করা যেতে পারে। এখানে কয়েকটি বিদেশীয় ইংরাজী প্রশ্ন উদ্ধৃত করলাম। অনুরূপভাবে দেশীয় ভাষাতেও প্রশ্নাদি চয়ন করা যেতে পারে। কিন্তু বহু ভাষাভাষী রাষ্ট্রে নাগরিকদের এই সকল প্রশ্নোত্তর আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরাজীতে তৈরী করা ভালো। এজন্য এই বিষয়ে ইংরাজী ভাষাতে লেখা প্রশ্নেরই অবতরণ করা হলো।

(১) টেনডর অ্যাণ্ড টাফ আর ওয়ার্ডস অফ্ (অপোসিট, সেম) মিনিঙ।---আণ্ডারলাইন কারেকট আনসার। (২) গুড ইজ টু ব্যাড অ্যাজ্ হোইট্ ইজ টু (ক্লিন, ব্ল্যাক, উইকেড, বেস্ট)।---আণ্ডারলাইন দি কারেক্ট আনসার। (৩) দি ম্যান (রোড, ফেল, ক্রাইসড) অফ হিজ বাইসাইকেল অ্যাণ্ড (কিয়োর্ড, ব্রোক, চেঞ্জড) হিজ্ আর্ম।---আণ্ডারলাইন কারেক্ট ওয়ার্ডস। (৪) মিক্সড সেনটেন্সেস : নাইট অ্যাটপ্লিপ টাইম ইজ দি টু বেস্ট।---রি-অ্যারেঞ্জ দি সেনটেন্স অ্যাণ্ড সে ওয়েদার ইট ইজ ট্রু অর ফলস্। (৫) রিসনিঙ : 'খ' আছে গ-এর পশ্চিমে এবং গ আছে ক-এর পশ্চিমে। তাহলে ঐ 'ক' ঐ গ-এর উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে না পশ্চিমে আছে।

মানুষের এই বুদ্ধিমত্তা পরিমাপ করার পর উহা কোন খাতে যেতে চায় বুঝা দরকার। মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে বালকের উপযুক্ত জীবিকা (career) কি হওয়া উচিত সেই সম্বন্ধে তার উপর নানারূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা নির্দেশ দেওয়া সম্ভব। সাধারণভাবে বলা হয় যে মানুষের স্বকীয় হবি (hobby) সমূহ পরিদৃষ্টে ইহা বলা যায়। কিন্তু বহু ব্যক্তি গৃহে টেবিল-চেয়ার যন্ত্র দ্বারা তৈরী করতে ভালোবাসে। কিন্তু তাকে ছুতার মিস্ত্রি হতে বললে সে আঁতকে উঠে উহার প্রতিবাদ করবে। কারণ, মনে মনে সে নিজেকে একজন ভবিষ্যৎ হাকিমরূপে কল্পনা করে থাকে। এই দিক হতে বিচার করলে বুঝা যায় যে, মানুষের ভবিষ্যৎ জীবিকা পূর্ব হতে নিরূপণ করা অতো সহজ কার্য নয়। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে সঠিকভাবে জীবিকা নির্বাচন না হলে মানুষের জীবন দুর্বহ হয়ে উঠে। বহু ব্যক্তি অপছন্দকার জীবিকার মধ্যে নিজেকে জোর করে খাপ খাওয়ানোর চেষ্টাতে মানসিক ভারসাম্য বিনষ্ট করেছে। কেহ কেহ এই অবস্থাতে ঐ অপছন্দকর কর্ম পরিত্যাগ করে অপরাধী জীবন যাপন করতে শুরু করে। বহু ছাত্রের অঙ্কশাস্ত্র বিভীষিকা হলেও ইতিহাস বা সাহিত্যে সে অতীব মনোযোগী। এরা সায়েন্স নিলে হয়তো এদের জীবন ব্যর্থ হয়ে যেতো। বিষয় আর্টস গ্রহণ করে এরা বড়ো জজ বা হাকিম হয়েছে। বহু ছাত্র লেখাপড়াতে অপদার্থ প্রমাণিত হলেও সে একটি গাড়ি মেরামত ত্বরিতগতিতে করেছে। এখানে বলা যায় যে তার পক্ষে মেকানিকের জীবিকা গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে ঘড়ি নির্মাতা, ইলেকট্রিসিয়ান, প্লাম্বার বা ইঞ্জিনীয়ার হবে কিনা তা কে বলে দিতে পারে। স্বভাবতঃ সে ইহার একটি বা অপরটি গ্রহণ করে এবং এতে সে হয় কৃতকার্য, নয় অকৃতকার্য হয়। কারণ, ইচ্ছামত প্রতিটি ক্ষেত্রে মনোনীত জীবিকার সন্ধান করতে পারা দুষ্কর। বহু ক্ষেত্রে পদপ্রার্থীদের কোন পদে নিযুক্ত হবার জন্যে সাধ থাকলেও সাধ্য থাকে না। কারুর পক্ষে ধাত্রী হবার ইচ্ছা হলেও তার উহার জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যা-বুদ্ধি থাকে নি। এইখানে একই গ্রুপের (ধরণের) অন্তর্গত বিভিন্ন শাখায় কার্যের মধ্যে একটিকে তার সুযোগ-সুবিধা ও বিদ্যা-বুদ্ধি মত বেছে নিতে হবে। এর পর এই মনোনীত কর্ম-গ্রুপের পেশার প্রতি তাহার প্রবণতাকে অভ্যাস দ্বারা উহার অন্তর্গত নির্দিষ্ট কার্যটিতে (শাখা) নিয়মিতভাবে মন বসাতে হবে। এইভাবে মূল বৃক্ষের গ্রুপ উপাসক মানুষটি তার ঐ নির্দিষ্ট শাখাকে ভালবাসতে শেখে। একই বৃক্ষের একটি শাখার বদলে অপর শাখা গ্রহণে তার খুব অসুবিধা হয় না। এই জন্যে কারুর হাকিম হবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সে অন্যগতিকে পুলিশ-সুপার হলে তার কোনও অসুবিধা হয় না। কিন্তু তার পক্ষে একজন

জীবিকা

ভালো ইঞ্জিনীয়ার বা ডাক্তার হওয়া সাধ্যাতীত হতো। এইজন্যে প্রথমে বিবিধ জীবিকা-সমূহকে তাহাদের সান্নিধ্যে অনুযায়ী এক-একটি গ্রুপে প্রথমে ভাগ করে নেওয়া দরকার। এমন কি সম্ভব হলে উহাদের কম-বেশি সাদৃশ্যানুযায়ী বিবিধ শ্রেণীতেও ভাগ করতে হবে। এর পর বিবেচনা করতে হবে যে ঐ বালকের ঐ সকল মূল বিভাগ এবং উহার শ্রেণী ও উপশ্রেণীর কোনটির উপর তার স্বাভাবিক আকর্ষণ বেশিমাত্রাতে আছে। এই জীবিকা-সম্পর্কিত বিভাগ ও উহার শ্রেণী ও উপশ্রেণী সৃষ্টির পন্থা প্রদর্শিত হলো।

বহু ক্ষেত্রে পিতা যে কাজ করে তাতেই সে তার পুত্রকে নিয়োগ করে। বহু পিতা আবার নিজে যে কাজ করে তাতে তার পুত্রকে আনতে চায় না। প্রায়শ ক্ষেত্রে নিজ নিজ কার্যে কেউ খুশি থাকে না। কোনও বালক বাড়ির কাজ সারবার জন্যে কারপেনটার হতে চায়। কোনও বালিকা রুগ্না মাকে নার্স করবার জন্যে নার্স হতে চায়। এই প্রকারের ইচ্ছা বা অভিপ্রায়কে এই সম্পর্কে কর্তব্যের মধ্যে আনা উচিত হবে না। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে কেহ নিজে কার্পেণ্টার না হলে কোনও বালক কার্পেণ্টার হবার উপযুক্ত কি না তা বলতে পারে না। বহু ক্ষেত্রে শিক্ষক বা পিতামাতা তাদের নিজেদের ইচ্ছাকে পুত্রের উপর চাপাতে চায় এবং এদের কেহ কেহ সেই ভাবে তাদের পুত্র-কন্যাকে গড়ে তুলে। আমি মনে করি যে, কোনও কর্ম-গ্রুপের উপর বালকের স্বাভাবিক কর্ম-প্রবণতা দেখা গেলে বাক্-প্রয়োগ দ্বারা (সাজেশন) উহার যে কোন শাখা কর্মের প্রতি তাকে আকৃষ্ট করা সম্ভব। অবশ্য এ বিষয়ে উহাদের মানসিক ও দৈহিক গঠন অনুকূল হওয়া চাই।

[ক্রমশ।

★ মাসিক বসুমতীতে লেখা ও ছবি পাঠানোর নিয়মাবলী ★

১। যে কোন প্রকাশযোগ্য রচনা—গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, জীবনী, সত্যঘটনা, ভ্রমণকাহিনী, স্মৃতিকথা, রহস্য-মূলক রচনা অর্থাৎ পাঠক-পাঠিকার পক্ষে আকর্ষণীয় ও আগ্রহ-উদ্দীপক লেখা আমরা সকল সময়েই প্রকাশার্থে বিবেচনা করে থাকি।

২। দীর্ঘ রচনা বা ধারাবাহিক প্রকাশিতব্য লেখা সম্পাদকীয় দপ্তরে পাঠাবার পূর্বে পত্রযোগে লিখিত মতামত গ্রহণ করতে হবে।

৩। রচনা সচিত্র হলে বা লেখার সঙ্গে ছবি (আলোক-চিত্র বা অঙ্কিতচিত্র) থাকলে সেই লেখা প্রকাশের প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে।

৪। রচনার নকল রেখে রচনাটি পাঠাবেন। কেন না, সর্বপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও ছাপাখানার কাগজের ভিড়ে রচনা হারিয়ে যেতে পারে। কিংবা ডাকের গোলমালেও রচনা হারিয়ে যেতে পারে।

৫। কোন রচনা বা ছবির মনোনয়ন বা অমনোনয়নের সংবাদ জানতে হলে বা অমনোনীত রচনা বা ছবি ফেরৎ নিতে হলে তৎসহ উপযুক্ত মূল্যের ডাকটিকিট অবশ্যই প্রেরণীয়।

৬। কবিতা সম্পর্কে কোন মতামত জানানো হয় না বা অমনোনীত কবিতা ফেরৎ পাঠানো হয় না।

৭। কাগজের এক পৃষ্ঠায় লেখাই বাঞ্ছনীয়। উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত পাণ্ডুলিপি ছাপাখানার জন্যে অচল।

৮। পাণ্ডুলিপিতে রচনার শেষে লেখক বা লেখিকার নাম স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে।

৯। প্রকাশযোগ্য ও যথোপযুক্ত রচনা ও ছবির জন্য সম্মান দক্ষিণা দেওয়া হয়।

১০। প্রতিটি রচনা সম্পাদকের নামে পাঠাতে হবে। খামের উপর "মাসিক বসুমতী"—এই কথাটি অবশ্যই লিখতে হবে।

১১। লেখা পাঠালেই তা সঙ্গে সঙ্গে দেখার বা লেখা মনোনীত হলেই তা সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ করার কোন প্রতি-শ্রুতি দেওয়া চলে না। প্রত্যহ অসংখ্য লেখা আসে, প্রতিটি পাঠান্তে প্রকাশের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সময়সাপেক্ষ।

১২। আলোকচিত্র বা অঙ্কিতচিত্রের পিছনে ছবির বিষয়বস্তু ও শিল্পীর নাম এবং ঠিকানা অবশ্যই লিখতে হবে।

“জন্তুনাং নরজন্ম দুর্লভতরম্”।

মানুষের ভালমন্দ জ্ঞান আছে বলিয়া কর্মবিশেষ দ্বারা দিব্যজ্ঞান লাভ করত ঈশ্বরের কৃপা হইলে মানুষ পরমার্থ লাভ করিতেও সমর্থ হয়। অতএব মনুষ্যজন্মই মোক্ষের সোপান। অত্যন্ত পুণ্যসঞ্চয় ব্যতীত এই মনুষ্য জন্ম লাভ করা যায় না। এই বিষয়ে শাস্ত্রবাক্য প্রণিধানযোগ্য—

"মনুষ্যসদৃশং জন্ম কুত্রাপি নৈব বিদ্যতে।
দেবতা: পিতর: সর্বে বাঞ্ছন্তি জন্ম-
মানুষম্।"

ইহার অর্থ এইরূপ—মনুষ্যসদৃশ জন্ম কোথায়ও নাই, দেবগণ ও পিতৃগণ সকলেই মনুষ্যজন্ম কামনা করে। পূর্বজন্মকৃত কর্মবশে কেহ বা মনুষ্যগর্ভে জন্মলাভ করে, কেহ বা শৃগাল-কুক্কুরাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। মনুষ্য জীবনে সৎকর্ম না করিলে জন্মান্তরে কোন যোনিতে জন্ম হইবে তাহার স্থিরতা নাই। সৎকার্য করিলে পরবর্তীকালে স্বর্গাদি সুখভোগ হয় এবং হীনকর্ম করিলে দেহান্তে নরকাদির জন্য ক্লেশভোগ হয়।

ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চভূত দ্বারা দেহের সৃষ্টি হয়। এই পঞ্চভূত অচেতন পদার্থ বলিয়া শরীরও অচেতন। কিন্তু এই পঞ্চভূতাত্মক দেহ যে সচেতন হয় তাহার কারণ হইতেছে শরীরে জীবাত্মার অধিষ্ঠান। জীবাত্মা ঈশ্বরের প্রেরণায় পঞ্চভৌতিক দেহ আশ্রয় করে। জীবাত্মা যখন এই দেহ পরিত্যাগ করে তখনই মানুষের মৃত্যু হয় বলিয়া আমরা মনে করি।

মানুষের দেহের মৃত্যু হইলেও আত্মার মৃত্যু নাই। দেহের নাশ হইলে আত্মা অপর দেহকে আশ্রয় করে। মানুষের মৃত্যুক্ষণেই জীবাত্মা যে শরীর গ্রহণ করে তাহাকে আতিবাহিক দেহ বলে। তখন এই দেহ হইতে তেজ, আকাশ ও বায়ু—এই তিনটি ভূত ঊর্ধ্বে গমন করে এবং অবশিষ্ট দুইটি ভূত পৃথিবী ও জল অধোদিকে গমন করে।

যেমন বিষ্ণুধর্মোত্তরে উক্ত আছে—

“তৎক্ষণাদেষ গৃহ্নাতি শরীরমাতিবাহিকম্।
ঊর্ধ্বং ব্রজন্তি ভূতানি ত্রীণ্যস্মাত্তস্য
বিগ্রহাৎ॥

ত্রীণি ভূতানি তেজোবায্বাকাশানি পৃথিবী জলে তু অধোগচ্ছত:। তৎক্ষণাৎ মৃত্যুক্ষণাৎ।”

মৃত্যুর পর এই আতিবাহিক দেহ কেবল মনুষ্যদিগেরই হইয়া থাকে, অপর জন্তুদিগের ঐ দেহ হয় না। কারণ মনুষ্যেতর জীবের দেহ কেবল কর্মভোগের জন্য, কর্মার্জনের জন্য নহে। এইজন্য পশুদের দেহ নাশ হওয়ার পরই পশ্বাদি জীবগণ কর্মভোগযোগ্য শরীরান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে।

ডঃ বাণী চক্রবর্তী

মনুষ্যের আতিবাহিক দেহ অত্যন্ত যাতনা ভোগ করে। এই দেহ কোন আশ্রয় লাভ করে না। ইহা তখন শ্মশানাধিষ্ঠাতৃ দেবগণের অধিকারগত হইয়া থাকে। এই দেবগণ হইতে আতিবাহিক দেহের শীঘ্র মুক্তি হয় না। সেই অবস্থায় ঐ দেহের শীত, বায়ু ও রৌদ্রজন্য ঘোর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ঐ ক্লেশের সাময়িক নিবৃত্তির জন্য দুগ্ধ ও জল আকাশে দিবার বিধি আছে। এইজন্য মন্ত্র আছে—

“আকাশস্থো নিরালম্বো বায়ুভূতো
নিরাশ্রয়।
ইদং নীরমিদং ক্ষীরং স্নাত্বা পীত্বা
সুখী ভব।”

—ইহা সাময়িক ক্লেশনিবৃত্তির জন্য মাত্র।

এই অবস্থা হইতে মুক্তিলাভের জন্য দশটি পিণ্ডদান করিয়া প্রেতদেহ নিষ্পাদন করিতে হয়। ঐ দশটি পিণ্ড এই দেহের অবয়ব সম্পাদন করিয়া সম্পূর্ণ প্রেতশরীর নিষ্পন্ন করে। এই বিষয়ে ব্রহ্ম কূর্মপুরাণের বাক্যই প্রমাণ যথা—

“শিরস্ত্বাদ্যেন পিণ্ডেন প্রেতস্য ক্রিয়তে
সদা।
দ্বিতীয়েন তু কর্ণাক্ষিনাসিকাস্তু সমাসত:॥
সমাংশভুজবক্ষাণি তৃতীয়েন যথাক্রমাৎ।
চতুর্থেন তু পিণ্ডেন নাভিলিঙ্গগুদানি চ॥
জানুজঙ্ঘে তথা পাদৌ পঞ্চমেন তু সর্বদা।
সর্বমর্মাণি ষষ্ঠেন সপ্তমেন তু নাড়য়॥
দন্তরোমাদ্যষ্টমেন বীর্যঞ্চ নবমে ন তু।
দশমেন চ পূর্ণত্বং তৃপ্ততা ক্ষুদ্বিপর্যয়:॥”

ইহার অর্থ এইরূপ—আদ্য পিণ্ডের দ্বারা সর্বদা প্রেতের মস্তক তৈয়ারী হয়। দ্বিতীয় দ্বারা কর্ণ, চক্ষু এবং নাসিকার নির্মাণ হয়, তৃতীয় যথাক্রমে গলা, স্কন্ধ, বাহু এবং বক্ষ কৃত হয়, চতুর্থ দ্বারা নাভি, লিঙ্গ এবং গুহ্যদেশ হয়, পঞ্চমের দ্বারা জানু, জঙ্ঘা এবং পদদ্বয়, ষষ্ঠ দ্বারা সকল প্রকার মর্মস্থান সপ্তম দ্বারা নাড়ীসকল, অষ্টম দ্বারা দন্ত ও লোমাদি নবম দ্বারা বীর্য এবং দশম দ্বারা পূর্ণত্ব, তৃপ্ত এবং ক্ষুধার শান্তি হয়।

এই দশটি পিণ্ডদান দ্বারা আতিবাহিক দেহের পর প্রেতশরীর উৎপন্ন হয়। অত:পর আদ্যশ্রাদ্ধ হইতে সপিণ্ডন পর্যন্ত শ্রাদ্ধ করার পর ঐ জীবাত্মা প্রেতদেহ পরিত্যাগ করিয়া আত্মকৃত কর্মভোগের জন্য যে দেহ লাভ করে তাহাকে ভোগ দেহ বলে। এইজন্য শাস্ত্রে উক্ত আছে—

“কৃতে সপিণ্ডীকরণে নর: সংবৎসরাৎ
পরম্।
প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং
প্রপদ্যতে।”

অর্থাৎ সংবৎসরের পর সপিণ্ডীকরণ করিলে মানুষ প্রেতদেহ পরিত্যাগ করিয়া ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়।

এই ভোগদেহ প্রাপ্তিকেই পিতৃত্ব প্রাপ্তি বলা হয়। কারণ এই বিষয়ে বচন আছে—

"প্রেতে পিতৃত্বমাপন্নে সপিণ্ডীকরণাদনু।
ক্রিয়তে যাঃ ক্রিয়াঃ পিত্র্যাঃ প্রোচ্যন্তে
তা নৃপোত্তমঃ।"

ইহার অর্থ এইরূপ---সপিণ্ডীকরণের পর প্রেতদেহ পিতৃত্বপ্রাপ্ত হইলে যেসব ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়, তাহা পিত্র্যকর্ম বলিয়া অভিহিত হয়।

বঙ্গদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মশাস্ত্র নিবন্ধকার শূলপাণি এই সম্বন্ধে বলেন---
"প্রেতত্বনিস্তারপূর্বা পিতৃলোক প্রাপ্তি বরগম্যতে, প্রেতত্বনিস্তারশ্চ ষোড়শ শ্রাদ্ধসাধ্যঃ।"

অতএব দেখা যায় যে প্রেতত্ব হইতে মুক্তির জন্য শাস্ত্রে ষোড়শপ্রকার শ্রাদ্ধ নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহা এইরূপ---
"দ্বাদশ প্রতিমাস্যানি আদ্যং ষাণ্মাসিকে তথা।
সপিণ্ডীকরণঞ্চৈব ইত্যেতৎ শ্রাদ্ধ
ষোড়শম্ ॥"

যেমন আদ্যশ্রাদ্ধ, বারটি মাসিক শ্রাদ্ধ, দুইটি ষাণ্মাসিক ও সপিণ্ডীকরণ--এই ষোড়শ প্রকার শ্রাদ্ধ। এই ষোলটি শ্রাদ্ধ দ্বারা লোকে ভোগদেহ প্রাপ্ত হইয়া স্বকীয় কর্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে গমন করে।

সপিণ্ডীকরণ করার পরও সেই পিতৃ প্রভৃতির উদ্দেশ্যে পুত্রগণ প্রতি মাসে শ্রাদ্ধ করিবে---উহা সাগ্নিক ব্যক্তির কেবল অমাবস্যায় কর্তব্য। আর নিরগ্নিকগণ কৃষ্ণপক্ষের যে কোন তিথিতে বিশেষত অমাবস্যায় এই শ্রাদ্ধ করিবে। তাহাতে অসমর্থ হইলে সম্পূর্ণ বৎসরের মধ্যে তিনটি মাসে শ্রাদ্ধ কর্তব্য। এই তিন মাস হইতেছে কন্যা, কুম্ভ ও বৃষরাশিতে সূর্য অবস্থিত থাকিলে অর্থাৎ আশ্বিন, ফাল্গুন ও জ্যৈষ্ঠ মাসে ইহা বিধেয়। ইহাতেও অশক্ত হইলে কেবল মহালয়াশ্রাদ্ধ কর্তব্য, তাহাতেও অপারগ হইলে কেবল দীপান্বিতাশ্রাদ্ধ অনুষ্ঠেয়।

হিন্দুধর্ম অনুসারে মানুষের মুক্তির জন্য শ্রাদ্ধক্রিয়া অপরিহার্য। কারণ জন্ম হইতেই মানুষ চারিটি ঋণে আবদ্ধ থাকে। যথা---দেবঋণ, ঋষিঋণ, পিতৃঋণ ও মনুষ্যঋণ। আবার দেখা যায় অতিথিঋণও এক প্রকার ঋণের মধ্যে গণ্য, অতিথির সেবা করিয়া ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হয়। এই সম্পর্কে শাস্ত্রীয় বচন আছে।---
"ঋণৈশ্চতুর্ভিঃ সংযুক্তা জায়ন্তে মানবা
ভুবি।
ঋষিদেবমনুষ্যাণাং দেবানামৃষীণাঞ্চ তথৈব চ।
পিতৃণামথ বিপ্রাণামতিথীনাঞ্চ পঞ্চমম্ ॥"

পিতৃঋণ পরিশোধ করিবার কারণ হইতেছে---যাঁহাদের বংশে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি, তাঁহাদের সর্ববিধ সাধনার ফল আংশিকভাবে আমরাও ভোগ করিয়া থাকি। তাঁহারা যদিও আমাদের দৃষ্টির অগোচরে পরলোকে বাস করিতেছেন, তথাপি তাঁহাদের তৃপ্তির উদ্দেশ্যে শাস্ত্রীয় বিধি পালন করা আমাদের কর্তব্য। পিতৃগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত শ্রাদ্ধ এবং তর্পণের দ্বারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিতে হয়, কেবল পুত্রোৎপাদনই একমাত্র উপায় নহে। যেমন আমরা দেখি মহাভারতে উক্ত আছে ---
"স্বাধ্যায়েন মহর্ষিভ্যো দেবেভ্যো
যজ্ঞকর্মণা।
পিতৃভ্যঃ শ্রাদ্ধদানেন নৃণামভ্যর্চনেন চ ॥"

ইহার অর্থ এইরূপ---বেদাধ্যয়ন দ্বারা মহর্ষিগণের, যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা দেবগণের, শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃগণের এবং অভ্যর্চনা দ্বারা নৃপতিগণের সন্তোষ বিধান হইয়া থাকে।

শ্রাদ্ধ এবং তর্পণের দ্বারা মানুষ পিতৃলোকের সহিত আপনার সম্বন্ধ শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিয়া থাকে, ইহাতে তাঁহাদের আত্মপ্রসাদও লাভ হয়।

পিণ্ডদানাদি শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকলাপযুক্ত অনুষ্ঠানের নাম শ্রাদ্ধ। শ্রাদ্ধ কথাটি যোগরূঢ় অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। কারণ 'শ্রাদ্ধং কুর্যাৎ' (অর্থাৎ শ্রাদ্ধ করিবে) এই শ্রুতি দ্বারা শ্রাদ্ধ নামক প্রসিদ্ধ কর্মবিশেষের বোধ হওয়ায় উহা রূঢ় এবং "শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে" (অর্থাৎ শ্রদ্ধা সহকারে যে যে অন্নাদির দান করা হয়, তাহার নাম শ্রাদ্ধ)---এইরূপ ঋষিবচন দ্বারা শ্রাদ্ধ শব্দের যৌগিকত্বও প্রতিপন্ন হইতেছে। শ্রাদ্ধ কথাটি যৌগিকত্ব এবং রূঢ়ত্ব--এই উভয়বিধ ধর্মবিশিষ্ট হওয়ায় শ্রাদ্ধ ভিন্ন অপরবিধ শ্রদ্ধাযুক্ত অন্নাদির দানকে আর শ্রাদ্ধরূপে নির্দেশ করা যাইতে পারিবে না। কারণ ঐরূপ দানে শ্রাদ্ধের যৌগিকত্ব ধর্ম থাকিলও রূঢ়ত্ব ধর্ম নাই।

আবার দেখা যায় দেবলের বচনে আছে---
"প্রত্যয়ো ধর্মকার্যেষু তথা শ্রদ্ধেত্যুদাহৃতা।
নাস্তিহ্যশ্রদ্ধধানস্য ধর্মকৃত্যে
প্রয়োজনম্ ॥"

অর্থাৎ ধর্মকার্যে বিশ্বাসই 'শ্রদ্ধা' নামে অভিহিত হইয়াছে। কারণ শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তি ধর্ম-কার্যানুষ্ঠানের কোনরূপ আবশ্যকতাই বোধ করে না।

শ্রাদ্ধ ও তর্পণ---এই উভয়ই 'পিতৃকৃত্য' নামে শাস্ত্রে কীর্তিত হইয়াছে। পিতৃ তর্পণের সঙ্গে সঙ্গে বৃক্ষ হইতে তৃণগুচ্ছ পর্যন্ত সকলের উদ্দেশ্যেই শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

শ্রাদ্ধের মুখ্য ফল যদিও পিতৃগণের তৃপ্তি, কিন্তু তাহাতে অনুষ্ঠাতার আরও কতকগুলি কল্যাণ সংসাধিত হয়।

পিতৃলোকের তৃপ্তির ফলে শ্রাদ্ধকর্তা উৎকৃষ্ট সন্তান, অটুট স্বাস্থ্য এবং প্রভূত অর্থের অধিকারী হইয়া থাকেন।

পূর্বোক্ত ষোড়শ শ্রাদ্ধ মানুষের মৃত্যুর পরই অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সংক্ষেপত এইরূপ বলা যায় যে---মৃত্যুর পর আতিবাহিক শরীর, তাহার পর প্রেতশরীর এবং পরে ভোগশরীর উৎপন্ন হয়। ভোগশরীর প্রাপ্ত হইলে পর সেই ব্যক্তি নিজের কর্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে গমন করে। যথা---
"ততঃ স নরকে যাতি স্বর্গে বা
স্বেন কর্মণা।"

এই ষোড়শ প্রকার শ্রাদ্ধ ছাড়া আরও অনেক প্রকার শ্রাদ্ধ আছে, যেমন---আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ, নবান্ন শ্রাদ্ধ, মঘা-ত্রয়োদশী শ্রাদ্ধ প্রভৃতি। তবে এই শ্রাদ্ধগুলি মানুষের মুক্তির জন্য অনুষ্ঠিত হয় না। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া এই শ্রাদ্ধগুলির অনুষ্ঠান হয়।

॥ ধারাবাহিক উপন্যাস ॥

একজন লামা ও মানস সরোবর

শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী

॥ ছয় ॥

আলমোড়ায় আমি আর একবার থেনদুপ লামাকে একান্তে পেয়েছিলাম। সকাল বেলায় কৈলাস যাত্রার ব্যবস্থা করে যখন আমরা কোথাও যাব ভাবছিলাম, সেই সময়ে লামাকে দেখতে পেয়েছিলাম দূরে। আর কেউ দেখতে পেয়েছিলেন কি না জানি না। বলেছিলাম: এইবারে একটুখানি ছুটি চাই, সময়মতো ঘরে ফিরব।

মায়া তাকিয়েছিল চারিধারে, তারপরে বলেছিল: আফিঙখোর।

আর কেউ তার এই মন্তব্য বুঝতে পারেনি, কিন্তু আমি পেরেছিলাম। বলেছিলাম: হ্যাঁ, নেশার সময় হয়েছে।

তারপরে হনহন করে হেঁটে লামার কাছে পৌঁছে গিয়েছিলাম।

সে আসছিল রামকৃষ্ণ আশ্রমের দিক থেকে। তাকে আবার আমি সেই দিকেই ফিরিয়ে নিয়ে গেলাম। তা না হলে আমার সবার সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যেত। খানিকটা এগিয়ে যেতেই সহরের কোলাহল শেষ হয়ে গেল, ফুরিয়ে গেল দোকান-পাট আর লোকজনের আনাগোনা। বললাম: আসুন না, এই নিরিবিলিতে একটুখানি বসি।

লামা কোন কথা কইল না, কিন্তু আমার পাশে এসে বসল।

বললাম: আজ আপনাকে খুব গম্ভীর দেখাচ্ছে।

লামা এ কথা অস্বীকার করল না, বলল: আজ সারাদিন মনটা ভার হয়ে আছে।

কেন?

কাল আপনার কাছে আমার জীবনের অনেক কথা বলে ফেলেছি। ইচ্ছে করছে, সে সব কথা ফিরিয়ে নিই।

কথা কি ফিরিয়ে নেওয়া যায়?

যায় না বলেই তো আজ আমার মন এমন ভারি লাগছে।

আমি বললাম: সবটুকু বলে ফেললেই মন হাল্কা হয়ে যাবে।

কিন্তু এ কথায় লামার বিশ্বাস হল কিনা বুঝতে পারলাম না। সে আগের মতোই গম্ভীর হয়ে রইল।

আলমোড়ার আকাশে তখন সকালের রৌদ্র ঝলমল করছে। কিন্তু এদিকটায় উত্তাপ লাগছে না। অল্প অল্প বাতাস আসছে ঝাউগাছের ফাঁক দিয়ে। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে আমি তাকে তার পুরণো গল্পের মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা করলাম। বললাম: কাল রাতে আমি আপনার কথা অনেক ভেবেছি। এ দেশে জন্মালে আমরা হয়তো আপনাকে প্রগতিশীল বলতাম, কিন্তু বিপদ্গামী বলে ভয় পেতাম না। আপনার মঠের লামারা আপনাকে রীতিমতো ভয় পেয়েছিলেন।

অন্যমনস্কভাবে লামা বলল: হয়তো তাই।

একটু থেমে বলল: হয়তো ছ্যাতেনকেও তারা একটা ষড়যন্ত্রের মধ্যে টেনে নিয়েছিল। আমি বুঝতে পারিনি।

আস্তে আস্তে থেনদুপ লামা তার জীবনের কাহিনীর মধ্যে ডুবে গেল।

টাশি থেনদুপ যে বড় হয়েছে, একদিন বড় লামাও এ কথা মেনে নিলেন। থেনদুপ এ কথা বুঝতে পারলো সেদিন, যেদিন বড় লামা তাকে ডেকে বললেন: ওরে, একটা মঠের ভিতরে কারও শিক্ষা কোনদিন সম্পূর্ণ হয় না। এ একটা কূপে বাস করে পৃথিবীর আস্বাদ নেবার মতন, মুখ বাড়িয়ে আকাশের একটুখানি জায়গাই দেখা যায়। কিন্তু পৃথিবীর যেমন শেষ নাই, জ্ঞানেরও তেমনি। শিক্ষা সম্পূর্ণ করবার জন্যে বাইরে বেরুতে হবে।

থেনদুপ ভারি আশ্চর্য হল। আজ ক'দিন ধরে তারও ঠিক এই কথাই মনে হচ্ছিল। তবুও পাচ্ছিল। বড় লামার কাছে সে কেমন করে বলবে। আজ তার বয়স কুড়ি পেরিয়ে গেছে। পাঁচ বছর থেকে সে মানুষ হয়েছে বড় লামার স্নেহ ও যত্নে। তার সঙ্গী হয়ে যারা এসেছিল, তারা কবে তাদের বাপমায়ের কাছে ফিরে গেছে। নতুন ছেলে এসেছে, তারাও গেছে ফিরে। তার মতো দু'একজন মাত্র রয়ে গেছে লামা হবার জন্য। আর একজন বয়স্ক মানুষ এসেছেন সংসার ত্যাগ করে। থেনদুপ লক্ষ্য করেছে যে এরা কেউই কিছু শেখবার জন্য আসেনি। এসেছে লামা সেজে লামার সম্মান ও নিশ্চিন্ত জীবনটুকু উপভোগ করতে। এ সব কথা ভাবলে থেনদুপের কান্না পায়।

বড় লামা বলছিলেন: বুদ্ধ তো সৃষ্টিছাড়া মানুষ ছিলেন না। জ্ঞানে তিনি বুদ্ধ হয়েছিলেন। সমস্ত জ্ঞান অর্জন করে আজও মানুষ বুদ্ধ হতে পারে।

থেনদুপের রোমাঞ্চ জাগল এই কথা শুনে। আজ তার প্রথম মনে হল যে, সে কিছুই এতদিন শেখেনি। জ্ঞানের প্রথম কথাটিই শেখেনি এতদিন। বছর কয়েক আগেও সে বড় লামার

সঙ্গে 'বড় হয়েছি' বলে তর্ক করত। বড় লামা যে তার চেয়ে ঢের বড়, সে কথা আজ তিনি প্রথম প্রমাণ করে ছিলেন। খেনদুপের আজ চেঁচিয়ে কাঁদতে ইচ্ছা হল।

কী হল রে?

খেনদুপের মুখের দিকে তাকিয়ে বড় লামা ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

কিন্তু খেনদুপ কোন উত্তর দিতে পারল না।

বড় লামা বললেন: ভয় কি, আজ থেকে তুমি আমার ঘরে শোবে, আমার পাশে।

বিস্ময়ে খেনদুপ অভিভূত হয়ে গেল, বলল: ভয় পাব কেন!

আমিও তো তাই বলছি, ভয় পাবার কোন দরকার নেই।

কিন্তু এই উত্তরে খেনদুপ সন্তুষ্ট হতে পারল না। সে বেশ বুঝতে পেরেছে যে, ভয় পাবার মতো কোন ঘটনা বড় লামার কানে পৌছেচে। তা না হলে এ কথা তিনি কেন বলবেন।

খেনদুপ একবার অনুরোধ করল: কী হয়েছে বলবেন না?

চোখ বুজে বড় লামা হাসতে লাগলেন।

খেনদুপ বুঝল যে এর বেশি আর কিছু তাঁর কাছে জানা যাবে না।

নিজের ঘরে এসে খেনদুপ ভাবতে লাগল। কিসের ভয়! কাকে ভয়! কেন তাকে ভয় পেতে হবে। তার এই ঘরটাও বড় লামা কেন নিরাপদ ভাবছেন না। খেনদুপের তো ভয়-ডর বলে কিছু নেই। তবে কি বড় লামা অন্য কোন আশঙ্কা করছেন। তার প্রাণের আশঙ্কা। কিন্তু কেন তিনি এমন আশঙ্কা করবেন। খেনদুপ তো অন্যায় করেনি।

কাল সকালবেলায় ছ্যাতেন তার কাছে এসেছিল। অনেকক্ষণ গল্প করেছিল তার সঙ্গে। তার বিবাহের বয়স হয়েছে। দেখতেও হয়েছে ভারি সুন্দর। ছ্যাতেন জানতে চাইছিলো, কেন সে এখনও মঠ ছাড়ছে না, কবে সে বাড়ি ফিরবে। বলেছিল, অনেক দিন তো তার মঠে কাটল, লেখাপড়াও করল অনেক। এখন বাড়ি ফিরে সংসার করতে বাধা কী। খেনদুপ এসব কথার কোন উত্তর দেয়নি। সে বলেছিল অন্য কথা। এখন তোমার কিছু শিখতে ইচ্ছে করে না?

ছ্যাতেন হাসল তার প্রশ্ন শুনে।

আর খেনদুপ বুঝল তার হাসির মানে। বুঝতে পারায় যে শৈশবের কথা ছ্যাতেনের আজও মনে আছে, মনে আছে সেই সব বোকার মতো কথা। সে বোকা না হলে কি আর লামা হবার কথা ভাবতে পারত। ছ্যাতেন আজ লজ্জা পাচ্ছে তার শৈশবের বোকামির জন্যে।

খেনদুপের সন্দেহ হল যে ছ্যাতেনের এখন বোধহয় অন্য কোন ফন্দী মাথায় আছে। তাইতেই সে কিছুদিন থেকে কারণে অকারণে উঠে আসছে মঠের ভিতর। এটা সেটা উপহার আনছে খেনদুপের জন্যে। কাল এনেছিল দুধের শক্ত বড়ি। লুকিয়ে তার হাতে দিয়ে বলেছিল: তোমার জন্যে এনেছি।

কুমড়ো বড়ির মতো সাদা দুধের বড়ি। চিবিয়ে খাবার উপায় নেই, সেদ্ধ করেই খেতে হয়। চুষে খেতে খেনদুপের ভাল লাগে না। সেকথা সে ছ্যাতেনকে জানিয়ে দিয়েছে। এও জানিয়েছে যে, কোন উপহার দিতে হলে মঠকে দেবে। কোন লামাকে দেওয়া উচিত নয়। ছ্যাতেন এসব কথা মানে না।

এক একদিন ছ্যাতেন তার বিয়ের গল্প শুরু করে দেয়। কত ভাল ভাল সম্বন্ধ আসছে, সেই সব গল্প। একটা সম্বন্ধ এসেছে, তারা পাঁচটা পিঠোপিঠি ভাই, পাঁচজনই রোজগেরে। ছ্যাতেনের মতো সুন্দরী মেয়ের লোভে এখনও বিয়েই করেনি। ঐ পাঁচজনের হাতে পড়লে ছ্যাতেনের আর কোন দুঃখই থাকবে না।

তবে বিয়ে করছ না কেন?

জানতে চায় খেনদুপ।

উত্তরে ছ্যাতেন হাসে। ছোট ছোট চোখ আরও ছোট করে অদ্ভুত রহস্যময় হাসি হাসে। খেনদুপের মনে হয় যে, ছ্যাতেন তাকে ঠাট্টা করছে তার অজ্ঞতার জন্য। তার নির্বুদ্ধিতার জন্য। লেখাপড়া শিখলে মানুষ বুঝি এমনিই নির্বোধ হয়।

ছ্যাতেনের এই হাসিটা খেনদুপের পরিচিত মনে হয় না। বলে: ভাল সম্বন্ধ সব সময় পাওয়া যায় না ছ্যাতেন, দেরি করা বোধহয় ঠিক হবে না।

খেনদুপ যে দিনে দিনে বোকা হয়ে যাচ্ছে। ছ্যাতেনের তাতে আর সন্দেহ রইল না। বলল: ভাবছি, একটা লামাকে ধরা যায় কি না।

কেন যাবে না। তোমার বিয়েতে আমি আমাদের বড় লামাকেই ধরে নিয়ে যাব। সেজন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

উত্তর শুনে ছ্যাতেন খিল খিল করে হেসে উঠল, আর বড় করুণ দেখাল খেনদুপকে। অপ্রতিভভাবে বলল: এতে হাসবার কী হল?

হাসব না! ঐ বুড়োকে বিয়ে করবে কে?

খেনদুপ এবারে ক্ষেপে গেল, বলল: বিয়ে করবে কেন! লামাকে কেউ বিয়ে করে, না লামা যায় কাউকে বিয়ে করতে!

হাসতে হাসতেই ছ্যাতেন বলল: আমি তো বিয়ের কথাই বলছি। কোন রকমে একটা ছোকরা লামাকে কি ভুলিয়ে ভাগিয়ে নিয়ে যেতে পারব না!

বলে নিজের দেহের দিকে তাকাল। ঢিলেঢালা ছুবার ভিতর তার দেহের রূপ আছে লুকনো। বাহিরে শুধু কৌতুকে উজ্জ্বল একখানা চোকো মুখ। এবারে খেনদুপের আর বুঝতে কিছুই বাকি রইল না। গম্ভীরভাবে বলল: এখন তুমি যেতে পার ছ্যাতেন, আমার অনেক কাজ আছে।

বলে সে নিজেই ছ্যাতেনের কাছ থেকে সরে গেল।

সেদিন রাত্রে খেনদুপের ঘুম আসছিল না। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল ভাবছিল। মেয়েরা কত ছলই না জানে। কত ছল জানে ঐ মেয়েটা। এতদিন সে সব কিছুই ভুলেছিল।

তার ছিল। হঠাৎ আজ ক'দিন থেকে মেয়েটা ঘোরাঘুরি শুরু করেছে। খেনদুপের বিশ্বাস হয় না যে, শৈশবের মন এখনও তার সজীব আছে। তার তো নেই।

খুব সাবধানে পা ফেলে শিতেন এল ঘরে। শিতেনও তার মতো লেখা-পড়া শিখতে এসেছে। ছেলেমানুষ। তার চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু খুব সরল ভালমানুষ এই ছেলেটি। ভাল লাগা জিনিসটা বুঝি সংক্রামক। যাকে ভাল লাগে, তারও ভাল লাগে। শত্রুতার বেলাতেও তেমনি। কারও প্রতি বিদ্বেষ থাকলে বুমেরাঙের মতো সেই বিদ্বেষ আসে ঘুরে। শিতেনকে খেনদুপের ভাল লাগে। তাই খুশি হল তার আগমনে। বলল : ঘুমোন নি এখনও ?

না।

শিতেন তার কাছে এসে বসল। কিন্তু আর কিছু বলল না।

খেনদুপ বলল : বাড়ির জন্যে মন খারাপ করছে বুঝি ?

শিতেন কোন উত্তর দিল না।

খেনদুপ তাকে একটা ঠেলা দিয়ে বলল : চুপ করে রইলে যে।

অসঙ্কোচে শিতেন বলল : আমার বড় ভয় করছে।

ভয় কিসের ?

কিন্তু এ কথারও উত্তর দিল না স্বল্পভাষী শিতেন।

বল না, আমি তো কাছেই আছি।

ভয়ে ভয়ে শিতেন বলল : তোমার জন্যেই তো ভয়।

আমার জন্যে।

ক'দিন থেকেই আমার কেমন ভয় করছে। তোমার নাম শুনতে পাচ্ছি সবার মুখে।

সে তো ভাল কথা রে।

শিতেন উঠে দাঁড়িয়েছিল, বলল : দরজাটা তুমি বন্ধ করে শুয়ো।

খেনদুপ হাসল তার ভাবনা দেখে। হাসল। কিন্তু দরজাটা বন্ধ করতেও ভুলল না। বড় লামার কথাও তার মনে পড়েছে। তিনি তাকে নিজের ঘরে রাখতে চেয়েছিলেন। খানিকটা সাবধান হবার প্রয়োজন হয়েছে নিশ্চয়ই।

নিশুতি রাতে খেনদুপের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, কেউ দরজা খুলে ঢোকবার চেষ্টা করছে। ঘরে বাতি নেই, বাইরে থেকেও কোন আলো আসছে না। শুধু শব্দ আসছিল, মনে হচ্ছিল, বাইরে কারা কথা কইছে অস্পষ্টভাবে। খেনদুপ নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে জেগে রইল। নেপথ্যের মানুষেরা চলে না গেলে হয়তো আরও অনেকক্ষণ জেগে থাকত। খেনদুপ বুঝতে পেরে-ছিল যে, কারা এসেছিল, হঠাৎ তারা পালিয়ে গেল। কাকে দেখে তারা পালাল। বড় লামা কি ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

পরদিন সকালে বড় লামাই তাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন : কাল আমার কথা না শুনে অন্যায় করেছ। আজ থেকে তুমি আমার ঘরে শোবে, আমার পাশে।

খেনদুপ আজ তাঁকে কোন প্রশ্ন করল না। আজ সে নিঃসন্দেহ হয়েছে যে, কোথায় একটুখানি তাল কেটে গেছে। তা না হলে তার জীবনের বীণা এমন বেসুরো বাজবে কেন। শুধু বেসুরো নয়। সাবধান হতে না পারলে কোন সুরেই হয়তো বাজবে না। তার উদ্ধত উন্মুখ জীবন কি এইভাবেই শেষ হয়ে যাবে।

এর জন্য দায়ী কে ? খেনদুপ নিজে তো কারও কোন অনিষ্ট করেনি। অনিষ্ট করা দূরে থাক, কারও অনিষ্টের চিন্তাও করেনি। তবে কেন সে কারও বিরাগের কারণ হবে। কেন তাকে তার জীবন বিপন্ন বলে ভাবনায় অস্থির হতে হবে!

তবে ছ্যাতেন এই সমস্ত গণ্ডগোলের মূলে। কিন্তু তাই বা কী করে সম্ভব হয়। শিতেন অবশ্য এমনই কিছু সন্দেহ করেছে। লামাদের মধ্যে একজন নাকি ছ্যাতেনকে খুব পছন্দ করেন, কিন্তু ছ্যাতেন তাঁকে আমল দেয় না। হঠাৎ আজ ক'দিন ধরে সে আসছে খেনদুপের কাছে, উপহার আনছে নানারকম। আঘাত একটু লাগে বৈকি।

খেনদুপ তার নিজের মনের কথাও ভাবে। তার দুর্বলতার কথা। ছ্যাতেনকে সে তো প্রায় ভুলেই গিয়েছিল। উৎসবের দিনে যখন এসেছে, সে তা খেয়ালই করেনি। নিজে থেকে সে কখনও এগিয়ে আসেনি, খেনদুপও তাকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেনি। যদি কখনও দেখেও থাকে তো আর দশটা ছেলের মেয়ের মতো একই চোখে দেখেছে। ক'দিন ধরে বারে বারে না এলে তাদের শৈশবের কথা হয়তো মনেই পড়ত না।

খেনদুপের আবার মনে পড়ছে, ছ্যাতেনের ছোটবেলার কথা। মঠে আসবার জন্য তখন সে ছটফট করত। বলত, লেখাপড়া শিখে সেও লামা হবে, দেশ থেকে দেশান্তরে যাবে। যে সমস্ত মেয়ে পড়তে চায় না, তাদের সবাইকে সে লামা করবে। তারপর পলদেন গোম্ফায় যখন তার ঠাঁই হল না, তখন নাকি সে দিনের পর দিন কেঁদেছে। তার কাছে এসেও সে কেঁদে গেছে। খেনদুপের মনে পড়ে, সে তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে যে, সে বড় লামা হলে আর কারও দুঃখ থাকবে না। সবাইকে সে থাকতে দেবে, মেয়েদেরও লামা হতে দেবে, জোর করে লামা করবে। খেনদুপের বয়স তখন পাঁচ, ছ্যাতেনেরও প্রায় ঐ বয়েস। খেনদুপের আজ এই কথা ভেবে আশ্চর্য লাগে যে, শৈশবের সমস্ত কথা ছ্যাতেন বেমালুম ভুলে গেল। পাঁচ বছর বয়সটা কি নিতান্ত কম। তখনও কি কেউ অজ্ঞান থাকে। থাকলে সেও তো সব ভুলে যেত।

খেনদুপের হঠাৎ মনে পড়ল যে শৈশবের একটা বাসনা তার বুকে বিঁধে আছে। এতদিন সে বুঝতে পারেনি যে, সেই কাঁটাটাই চলতে ফিরতে তাকে খচখচ করে ব্যথা দিত। নির্জনে রক্তপাত হত। খেনদুপ তা দেখতে পেত না। শিক্ষার এমন অভাব তার দেশে। পুরুষেরা শেখে না নিজের দোষে। কিন্তু মেয়েরা।

...দের যে কোন অধিকারই নেই। শিখবার শখ হলে টুঁটি টিপে সেই শখকে হত্যা করতে হবে। দেশজোড়া কুসংস্কার আর শিক্ষার অভাব। এই অন্ধকারকে ঘনিয়ে রেখেছে একদল স্বার্থপর মানুষ। একটা গোটা দেশকে অজ্ঞানে আবৃত রেখে তার ফল ভোগ করে যাবে নির্বিরোধে। সেদিন শুধু উৎসবের পরে থেনদুপ এই সমাজ ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানিয়েছে। শক্ত দৃঢ় প্রতিবাদ। থেনদুপ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল, তার হাতে কোনদিন ক্ষমতা এলে এর প্রতিকার সে করবেই, বাঁচবার জন্যে সবাইকে দেবে সমান অধিকার। রাজায়-প্রজায় লামায় ও গ্রামবাসীতে পুরুষে-নারীতে কোন প্রভেদ সে থাকতে দেবে না। বলেছিল ভারতের সংঘারামে ভিক্ষুদের সঙ্গে ভিক্ষুণীও আছে। যে পুঁথিখানির ভিতর এই সংবাদ সে পড়েছে, সেখানাও সকলকে দেখিয়ে দিয়েছে। সেদিন বড় লামা তাকে থামিয়ে না দিলে সে আরও অনেক কিছু বলতে পারত।

থেনদুপের মনে পড়ল, ঠিক এই সব কথা কোন উৎসবে না বললেও অনেকবার, অনেকের সামনে সে বলেছে, কিন্তু এ কি কোন অপরাধের কথা। সে তো দেশেরই মঙ্গল চায়। মঙ্গল চায় দেশবাসীর। মঙ্গল চাইলে তাকে কেন শাস্তি পেতে হবে।

রাত্রে বড় লামা তাকে ডেকে পাঠালেন। বললেন : তোমার বিছানাটা নিয়ে এস।

হতবুদ্ধির মতো থেনদুপ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

বড় লামা বললেন : তোমাকে বলিনি, এখন থেকে রোজ রাতে তুমি আমার ঘরে শোবে, আমার পাশে।

থেনদুপ প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল : তার কি দরকার আছে। আমি তো ভয় পাইনে।

বড় লামা গম্ভীর স্বরে বললেন : তুমি পাওনা, কিন্তু আমি পাই।

বিছানা আনতে গিয়ে থেনদুপ দেখল যে শিতেন তার ঘরে দাঁড়িয়ে আছে। বলল : বড় লামার ঘরে শোবে তো।

কী করে জানলি?

শুনতে পেলাম।

একটু থেমে বলল : এ ভালই হল।

বিরক্তভাবে থেনদুপ বলল : কেন?

শিতেন একেবারে কাছে ঘনিয়ে এল, বলল : সবাই ভাবছে, একদিন তুমিই বড় লামা হবে। মনে মনে বড় লামার নাকি তাই ইচ্ছে। আর তুমি বড় লামা হলেই সর্বনাশ। ধর্মনষ্ট হবে।

এই কথা!

বলে থেনদুপ একটা ভেংচি কাটল।

শিতেন বলল : ছ্যাতেনকে বোধহয় ওরাই তোমার পিছনে লাগিয়েছে। যদি মঠ না ছাড় তো—

কী করবে?

শিতেন এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। পালিয়ে গেল আর্তনাদ করে।

বড় লামার ঘরে ফিরে আসতেই তিনি বললেন : শুনতে পাচ্ছি, চীনের একদল লামা যাচ্ছেন ভারতবর্ষে।

ভারতবর্ষে!

থেনদুপ যেন লাফিয়ে উঠল।

বড় লামা মাথা নেড়ে বললেন : বুদ্ধের দেশেই যাচ্ছেন।

আমাকে কি তাঁরা সঙ্গে নেবেন? যেতে দেবেন আপনি?

একনিঃশ্বাসে থেনদুপ দুটো প্রশ্ন করে ফেলল।

উত্তরে বড় লামা হাসলেন। দু-চোখ তাঁর বুজে গেল। থেনদুপ অনুভব করল যে, এই ব্যবস্থায় বড় লামার সম্মতি আছে। বলল : আমার উপরে আপনার অনেক দয়া।

পুরণো দিনের মতো থেনদুপকে বড় লামা কাছে টেনে নিলেন।

দেখতে দেখতেই কথাটা চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে গেল। শিতেন এসে খবর দিল : সবাই খুব খুশি হয়েছে।

কেন বল তো?

শিতেন গম্ভীর হয়ে বলল : ভেবো না যে তোমার ভালো হচ্ছে বলে খুশি হয়েছে। তবে কি আপদ বিদেয় হল ভাবছে? ওরা ভাবছে, রাস্তায় যদি বাঘে মা' খায় তো ভারতবর্ষের মানুষে খাবে। আর শাক্যমুনির দয়ায় যদি নিতান্তই ফিরে আস তো—

এরা আমায় খাবে।

বলে থেনদুপ হেসে উঠল অনাবিল আনন্দে।

শিতেন তাকে সংশোধন করে দিল : অন্তত পলদেন গোম্ফায় আর তোমাকে ঢুকতে দেবে না।

থেনদুপ দেখলে যে প্রচ্ছন্ন বেদনায় তার মুখখানা ম্লান হয়ে গেছে।

থেনদুপ বলল : দুঃখ কেন ভাই, পৃথিবীর এই তো নিয়ম। ছাগলের পাল চলেছে, কি ইয়াকের দল। দলের সঙ্গে সোজা পথ চল, কোন গণ্ডগোল নেই। এদিক সেদিকে মুখ করেছ কি ঠ্যাঙার গুঁতো।

থেনদুপ সম্প্রতি এই কথা বুঝেছে। শিতেনের মুখ দেখে মনে হল যে, সেও এই কথা নতুন শুনছে। কিন্তু নতুন হলেও ঠিক নতুন বলে মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে যেন আলো-বাতাসের মতো এও একটা অতি পুরণো কথা, পুরণো সত্য। বিশ্বাস করতে তার একটুকু সন্দেহ জাগে না।

থেনদুপের খবর গোম্ফা থেকে গড়িয়ে নামল গ্রামের ভিতর। তার মা আজ বেঁচে নেই। অনেক দিন আগে তিনি মারা গেছেন। থেনদুপ তখন ছোট ছিল। খবর পেয়ে মঠ থেকে ছুটে গিয়েছিল মাকে দেখতে। মাকে সে দেখতে পেয়েছিল, কিন্তু মা তাকে দেখতে পান নি। থেনদুপ চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডেকেছিল। কিন্তু মা একবারও সাড়া দেননি। অভিমানে থেনদুপ ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল, মা তবু চোখ খোলেন নি। সবাই তাকে বুঝিয়েছিল যে, ডেকে আর লাভ নেই। ছোট মেয়েটি হয়ে মা এতক্ষণ অন্যের ঘর আলো করছেন।

আরও অনেক কথা থেনদুপ শুনেছিল। সে সব বুঝতে পারেনি। বলছিল, তার বাপেরাই তার মাকে

মেরে ফেলল। অতগুলো মানুষে মিলে একজনের উপর অত্যাচার করলে কি চলে! আরও সব অনেক কথা। থেনদুপের ভাল লাগেনি সেসব শুনতে। সেখানে থাকতেও ভাল লাগে নি। গোম্ফায় ফিরে এসে আর কখনও তাদের বাড়ি যায় নি। কেউ তার খোঁজও নেয়নি ঘন ঘন। তার বাপেরা এসেছে কচিৎ কদাচিৎ। এসেছে নিজেদের প্রয়োজনে।

থেনদুপের মনে হল, তার মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই তিনি ছুটে আসতেন। কেঁদে চুল ছিঁড়ে বাধা দিতেন তাকে। বিদেশীদের সঙ্গে ছেলে বিদেশ যাবে একা, এ তিনি কিছুতেই সইতেন না। সম্মতির জন্য থেনদুপকে বিপন্ন হতে হত. কিন্তু আনন্দ হত মায়ের সেই উদ্বেগ দেখে। মায়ের সেই ভাবনা বেদনা সেই স্নেহের স্পর্শ। সেইটুকু কল্পনা করে আজ তার রোমাঞ্চ হল।

মায়ের বদলে এল চ্যাতেন। বলল, তুমি নাকি ভারতবর্ষে যাচ্ছ?

গম্ভীরভাবে থেনদুপ বলল: হ্যা।

আর ফিরবে না?

জানিনে।

তুমি না বড় লামা হবে?

থেনদুপ আশ্চর্য হয়ে বলল: কে বলেছে এ কথা?

চ্যাতেন বলল: বড় লামার সঙ্গে তুমি ব্যবস্থা করেছ শুনলাম।

থেনদুপ বিহ্বল চোখে তাকাল চ্যাতেনের দিকে।

চ্যাতেন তাড়াতাড়ি বলল: লামারা তো সবাই তাই বলছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে থেনদুপ [illegible] সেই জন্যেই তো চলে যাচ্ছি।

আশ্চর্য হয়ে চ্যাতেন বলল: তুমি কি তাহলে বড় লামা হতে চাও না?

চাইলেই কি তা হওয়া যায়! [illegible] বড় লামা, কত বিদ্যা [illegible] তাঁর। কিছু না শিখেই বড় লামা হলে সবাই হাসবে যে!

তুমি তো শুনেছি অনেক জান।

[illegible] গোম্ফায় যা আছে, তা জানি। [illegible] এখানে [illegible] কিছুই নেই। যা শিখবার আছে, তা সবই বাইরে। সে সব না শিখলে চলবে কেন!

সব কিছু শেখবার জন্যেই বুঝি তুমি ভারতবর্ষে যাচ্ছ?

থেনদুপ মাথা নাড়ল।

চ্যাতেন জিজ্ঞাসা করল: ভারতবর্ষটা কি লামার কাছে?

তারপর নিজেই নিজের ভুলটা শোধরাল: না না, তা কী করে হবে! লামা তো এই দিকে, আর তোমরা শুনলাম অন্য দিকে যাবে।

বলে দক্ষিণে হাত বাড়াল।

এক মুহূর্ত থেমে বলল: ভারতবর্ষে কি আমাদের মতো মানুষ আছে?

থেনদুপ হাসল তার প্রশ্ন শুনে।

অপ্রতিভভাবে চ্যাতেন বলল: হাসলে যে?

বুদ্ধদেবের দেশ ভারতবর্ষ। সেখানে মানুষ থাকবেনা তো কি তিব্বতে থাকবে!

থেনদুপ চ্যাতেনকে এই কথা অকপটে বলল। কিন্তু বলেই ভাবল, তার ভুল হয়েছে। ভারতবর্ষ নামে যে একটা দেশ আছে, আর সে দেশ যে দক্ষিণে, একটুকু জানাই অনেকের কাছে অনেক জানা। চীনের লামারা এদিকে না এলে ভারতবর্ষ নামটাই অনেকে শুনত না। থেনদুপের বুকের ভিতর এক রকমের অদ্ভুত বেদনা সহসা গুমরে উঠল।

সবিস্ময়ে চ্যাতেন বলল: কেন সে দেশে লোক যায়।

থেনদুপ এ কথার উত্তর খুঁজে পেল-না। বড় লামার মুখে সে চীনের বড় বড় লামার গল্প শুনেছে। পুরাকালে তাঁরা ভারতবর্ষে যেতেন পড়াশুনা করতে। সেখানে লামাদেরও শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা ছিল। আজও সেরকম ব্যবস্থা আছে কি না, থেনদুপ তা জানে না। তা না জানুক। শাক্যমুনির জন্মের দেশ যে কোনদিন অন্ধকার হবে না। এ বিষয়ে তার সন্দেহ নেই।

চ্যাতেন বলল: উত্তর দিচ্ছ না যে!

ছোটছেলের মতো থেনদুপ বলল: কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।

তুমি কেন যাবে?

আমি! আমি পড়তে যাব।

ওরা তোমায় পড়তে দেবে তো?

কেন দেবে না?

চ্যাতেন থেনদুপের খুব কাছে ঘেঁষে এল। বলল: সবাই কী বলছে জান? বড় লামা নাকি তোমাকে অনেক টাকা দেবেন।

টাকা! টাকা নিয়ে আমি কী করব?

চ্যাতেন হাসল, বলল: তুমি এখানেই থাক, কোথাও গিয়ে তোমার কাজ নেই।

এ যে পরিহাসের কথা, থেনদুপ তা বোঝে। তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে বলল: আমার অনেক কাজ আছে চ্যাতেন, আমি যাই।

কাজ সকলেরই আছে, কিন্তু সকলে পালায় না।

সন্ধ্যাবেলায় শিতেন এল থেনদুপের কাছে, বলল: তুমি নাকি মঠের সব টাকা সঙ্গেই নিয়ে যাবে?

আমি! কে বলল একথা?

সবাই বলছে, সবাইতো জানে।

কই, আমি তো কিছু জানি না।

সত্যিই জানো না!

শিতেন আশ্চর্য হয়ে থেনদুপের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইল। তারপরে বলল: কিন্তু এ কথা তো কেউ বিশ্বাস করবে না। সবাই কী বলছে জান? বলছে, বড় লামার সঙ্গে ভাব করে তুমি সব লুটে নেবে।

কিন্তু টাকার তো আমার দরকার নেই।

তবে তুমি ভারতবর্ষে যাবে কী করে!

ছেলেমানুষের মতো থেনদুপ জিজ্ঞাসা করল: টাকা না থাকলে বুঝি ভারতবর্ষে ঢুকতে দেয় না?

শিতেন বলল: সেখানেও কি এমন গোম্ফা আছে যে তোমাকে দিনের পর দিন বসিয়ে খাওয়াবে!

চিন্তিতভাবে থেনদুপ বলল: তাহলে আমি কোথায় এত টাকা পাব?

শিতেন খুব কাছে সরে এল,

বলল : বড় লামা তো তোমাকে সব দেখিয়ে দিয়েছেন।

কী দেখিয়েছেন ?

যেখানে টাকা থাকে, সোনা-দানা, মণিমুক্তো !

গভীর বিস্ময়ে খেনদুপ হতবুদ্ধি হয়ে গেল। শিতেন আজ পাগলের মতো এ সব কী বলছে ! কিন্তু শিতেনের ঝুলিতে তখন আরও খবর ছিল। বলল : জান, লামারা সবাই রাত জাগছে। বলছে, বড় লামার জারিজুরি এবারে সব ধরে ফেলবে। কত হাজার বছরের পুরনো এই গোম্ফা কত সোনা-দানা, কত ধন রত্ন। বুড়ো কাউকে কিছু জানতে দেয় না। কোন্ সময়ে কোথা থেকে সে-সব বার করেন, কেউ আজ পর্যন্ত তা দেখে নি। এবারে লামারা কড়া পাহাড়া লাগিয়েছে। তোমার জন্যে তো একদিন খুলতেই হবে। সেদিন সব ধরে ফেলবে।

ওরা এসব জেনে কী করবে ?

শিতেন বলল : সে কথাও ওরা বলাবলি করছে। মঠে এসে ঢুকেছে বলে তো বুড়ো লামার মতো মরে থাকতে চায় না। টাকার হদিশ পেলে ওরা সেই টাকায় ফুর্তি করবে, জীবনটাকে করবে উপভোগ।

খেনদুপের একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

শিতেন বলল : কী হল ?

খেনদুপ গম্ভীর হয়ে বলল : মনে হয় এই জন্যেই বোধহয় বড় লামা ওদের কিছুই বলেন না।

শিতেন বলল : তোমাকে বলেছেন তো ?

জিজ্ঞেস করলে নিশ্চয়ই বলবেন।

শিতেনের ঠিক বিশ্বাস হল না এই কথা। খেনদুপকে বড় লামা নিশ্চয়ই সব বলেছেন। সারাদিন তো দু'জনে একসঙ্গে কাটান, কত কথা বলেন, কত গল্প করেন। এ সব কথা কি তাঁদের হয় নি। বড় লামা তো খুব বুড়ো হয়েছেন। আজ আছেন, কাল থাকবেন কিনা কেউ জানে না। তবু তিনি কাউকে কিছু বলেন নি, এমন হতেই পারে না।

খেনদুপ ভারি চালাক, তাই সব কথা গোপন করে যাচ্ছে। শিতেন বলল : কিন্তু তোমার কথা যে আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না ভাই।

কেন ?

কেউ বিশ্বাস করছে না।

কী বলছে সবাই ?

বলছে, তোমাদের দুজনকেই দেখে নেবে। তার আগে বার করতে চায় চোরা কুঠরীর সন্ধান। ও চাবি পেলেই বড় লামা হবার আর কোন বাধা থাকবে না।

শিতেনের কথা শুনে খেনদুপের বিস্ময়ের আর শেষ নেই। এতটুকু ছেলে শিতেন আজ এত কথা জেনে ফেলেছে ! অথচ তার চেয়েও আগে এসেছে সে এই গোম্ফায়। কিন্তু এসব কথা তার মনে কোনদিন আসেনি।

শিতেন বলল : তোমার সঙ্গে বড় লামার যত ভাব বাড়ছে, সবার আক্রোশও বাড়ছে তত। কিন্তু চোরা কুঠরীর হদিস পায় নি বলে কিছুই এখন করতে পারছে না।

হদিস পেলে কী করবে ?

শিতেন বুঝি শিউরে উঠল, বলল : সে আমি জানি না।

বড় লামা জানেন এ সব কথা ?

জানলে ওদের লু বানিয়ে দেবেন, বড় বড় লোমওয়ালা ভেড়া।

সত্যি ?

সত্যিই তো, লামারাই বলছিল। এই বড় লামা তখন ছোট। পুরণো বড় লামার সঙ্গে থেকে থেকে মন্তর-তন্তর সব শিখে নিয়েছিলেন। চোরা কুঠরীর চাবিটি পর্যন্ত নিজের কাছে রাখতেন। তারপর পুরণো বড় লামা মরবার পর অনেকে নাকি আপত্তি তুলেছিল। একদিন দল বেঁধে রাতে এসেছিল। ভেবেছিল, ভয় দেখিয়ে সব জেনে নেবে।

তারপর ?

তারপর আর কী ! ওদের দেখেই বড় লামা হাসলেন। হাতের মণিচক্র একবার কপালে ঠেকিয়ে ঘোরাতে লাগলেন। আর যে তাকে ধরতে এল, তার গায়েই ছুঁইয়ে দিলেন মণিচক্র। ছোঁয়ানোর সঙ্গে সঙ্গেই সে ভেড়া হয়ে গেল।

খেনদুপ অবিশ্বাসের হাসি হেসে বলল : দূর !

সত্যি। পরদিন নাকি একপাল ভেড়া এই গোম্ফা থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল।

খেনদুপ হাসতে হাসতে বলল : ওরা নিজেরা ভেড়া কি না, তাই ওরা নিজেদের গল্পই বলেছে।

তুমি বিশ্বাস করছ না তো, বড় লামা অনেক মন্তর-তন্তর জানেন।

জানেন বুঝি !

শিতেন আরও কাছে সরে এল, বলল : ভেড়া বানানো তুমি শিখে নিয়েছো তো ?

বানাবো তোমাকে ?

না না, আমাকে কেন ! আমি কোন দিন তোমার কোন ক্ষতি করব না। তুমি বড় লামা হলে আমি একাই তো খুশি হব।

খেনদুপ তার ঝুব্বার ভিতর থেকে মণিচক্রটা বার করেছিল। এবারে সেটা ভিতরে রেখে দিল।

আশ্বস্ত হয়ে শিতেন বলল : এ সব কথা তুমি কাউকে বলো না যেন।

কোন্ কথা ?

এই যে তোমাকে আমার খুশি হবার কথা বললাম।

কী হবে বলে দিলে ?

গলা টিপে ওরা আমায় মেরে ফেলবে।

তোমাকে ভয় দেখায় বুঝি ?

একদিন দেখিয়েছিল।

কেন ?

যেদিন ওরা তোমাকে মারবার কথা বলছিল। আমি ছিলাম সেখানে। আমাকে বলল, খবরদার, খেনদুপ যদি একটা কথা জানতে পারে তো তোর গলা টিপে মেরে ফেলব।

সেই ভয়ে বুঝি তুমি আমায় কিছু বল নি ?

সহসা একটা শব্দ পেয়ে শিতেন চমকে উঠল, ভয়ে ভয়ে বলল : আমি পালাই এবার।

বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল। [ক্রমশ

(৩)

আজ আর কাহারো গান নয়। আজ শুনিব শুধু বাণীকণ্ঠের গান। বাণীকণ্ঠ করাতির কাজ করে। পূর্বেই বলিয়াছি। অত্যধিক পরিশ্রমে এবং অর্ধাহারে-অনাহারে তার সারা গায়ে মাংস নাই বলিলেই চলে। মাত্র কয়েকখানা হাড়। কিন্তু কাষ্ঠবৎ সেই কঠিন হাড়গুলির ভিতর হইতে এমন মধুর নতুন নতুন সুর বাহির হয়, বহু তপস্যা করিয়াও আমার রচনা সেখানে পৌঁছিতে পারে না। তাহার গানের বুলির ভিতরে কি মোহ আছে, আমি এখনও বলিতে পারি না। আমাদের সাহিত্য-রুচি-সম্পন্ন মন বলে, এই সব রচনার মধ্যে তেমন কিছুই নাই। ভালবাসার চলতি সাধারণ কথাগুলিতেই এই সকল গান পূর্ণ। মাঝে মাঝে পূর্বসুরীদের কবিত্বপূর্ণ দু'একটি লাইন এখানে-ওখানে পাওয়া যায়। এগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে সব পল্লী কবিই নিজ নিজ রচনায় ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহার জন্য তাহারা সমঝদারদের কাছে দুষী বলিয়া গণ্য হয় না। কিন্তু পূর্বসুরীদের কবিত্বপূর্ণ অংশগুলি যথাস্থানে প্রয়োগ-কৌশল জানা না-থাকিলে নবীন রচনাকাররা তাহাদের সমঝদারদের কাছে নিন্দনীয় হইয়া থাকে।

বাণীকণ্ঠের গানের কথাগুলিতে আমার শিক্ষিত মন তেমন কোন কবিত্ব-শক্তির পরিচয় পায় না। কিন্তু তাঁর গানগুলি যখন সুরে গীত হয়, তখন মনে হয় এমন রচনা বুঝি কোথাও উপভোগ করি নাই। তাঁর গানের কথাগুলি বাদ দিয়া সেই সুরে নতুন রচনা ভরিয়া গায়কদের শিখাইয়া দিয়াছি; কিন্তু দেখিয়াছি, গ্রাম্য সমঝদারেরা বাণীকণ্ঠের গানগুলিকেই বেশি পছন্দ করে। আমরা যা' কিছু পছন্দ করি তার অনেকখানি আমাদের অবচেতন মনকে আকর্ষণ করে। হয়ত বাণীকণ্ঠের গানে পল্লীবাসীদের অবচেতন মন আকর্ষণ করার অনেক মধু মিশ্রিত আছে। কিন্তু আমাদের চেতন মন সেখানে প্রবেশ করিতে পারে না। সেই জন্য পল্লীকবিদের রচনার ভাল-মন্দ কিছু বলিতে সব সময়ই আমি সঙ্কোচ বোধ করি।

যাক এ সব কথা। বাণীকণ্ঠকে পাশে বসাইয়া হরি গান ধরিল। ওপাশে আনন্দ দোতারা লইয়া, পিছনে দুই-তিনজন দোহার। তাহারা সকলেই

জসীম উদ্‌দীন

ভাবপ্রবণ। হরি একবার গাহিয়া যেখানে গানটিকে ছাড়িয়া দেয় দোহারেরা সেই ভাববস্তুকে আরও মধুর করিয়া তোলে। দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগ এদের জীবনের পরতে পরতে। তাই চোখের পানিতে বুক ভাসাইতে বেশী সময় লাগে না। মাঝে মাঝে গান থামাইয়া আনন্দের সুমধুর দোতারা বাদ্য। গানের কথাগুলি অন্তরের যে স্থানে প্রবেশ করিতে পারে না আনন্দের কাষ্ঠের দোতারার সুর তারও গভীরে যাইয়া অন্তরের অন্তরতম স্থান স্পর্শ করে। হরির সুন্দরী বউটি এ কাজে ও কাজে উঠানে ঘুরিয়া বেড়ায়। গানে যখন মাতম আরম্ভ হয়, তখন ডাগর চোখ দুইটি মেলিয়া একপাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সেও হয়ত আপনার অগোচরে নিজের রূপপ্রভা দিয়া এই গানের ভাবালুতায় প্রভাব বিস্তার করে।

হরি গান ধরে,—বাণীকণ্ঠের গান ছিল অভিন্নহৃদয় বন্ধু

আমার প্রাণের পোষা রে
ছেড়ে গেল না পূরিল আশা।
ও সখি রে।
হাড় খেয়ে হাড়ুয়া পোকা
কেটে করল ফাঁপারে সখি
আমার তেমন দশা।
এমন সুখের কালে গেলরে ফেলে
মজায়ে কুল-নাশা রে।।
ও সখি রে।
জন্মাবধি লেগেছে রে
বধুর প্রেমের নেশারে সখি
কতই ভালবাসা।
অধম বাণী কয় মিটিল না রে
অনন্ত পিপাসা রে।।

এ গান শেষ হইলে হরি আবার গান ধরে—গানের পর গান, তারপরে গান।—

"কে তুমি বাঁশী বাজাইয়া যাও।
আমাকে তুমি সঙ্গে করিয়া লও।
পথের কত ধূলা তোমার
কমল পায়ে লাগিবে।
আমি নয়নের জলে তোমার
পা দু'খানি ধুয়াইয়া দিব।"

এই গানের ভিতরে সুরের এমনি যাদু ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে যে তাহা যে পর্যন্ত আয়ত্ত না করা যায় সে পর্যন্ত আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিতে হয়। হরি আবার গান ধরে,—

আমার প্রাণবন্ধু চলিয়া গিয়াছে,
সখিরে সে বুঝি আর
ফিরিবে না। বন্ধুবিহিন এ জীবন
রাখিয়া আর কি হইবে।
সখিরে : আমার মরণকালে
তোরা আমার মাথার কেশ
আর বক্ষের চর্ম যত্ন করিয়া রাখিস।
সেই নিষ্ঠুর যদি

আসে এগুলি তাকে সমর্পণ করিয়া
বলিস, তোমারই
আশা পথ চাহিয়া অভাগিনী
রাধা প্রাণত্যাগ করিয়াছে।"

এমনি গানে গানে কোথায় দিয়া যে রাত্রি প্রভাত হইল টেরও পাইলাম না।

পরদিন সকালে কানাই আসিয়া তাহার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করিল। এবার কানাইর সত্য সত্যই আটচালা টিনের ঘর হইয়াছে। মাঠে কয়েক বিঘা জমি কিনিয়াছে। কানাইর উন্নতি দেখিয়া আমার বড়ই ভাল লাগিল। প্রথম যেদিন তাহার দোহারা বাদ্য শুনিয়াছিলাম, ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলাম, 'কানাই! তোমার একচালা ঘরখানির পরিবর্তে একদিন তোমার আটচালা টিনের ঘর হইবে।' আজ তাহা সত্যে পরিণত হইয়াছে, জানিয়া বড়ই ভাল লাগিল।

এবার কড়িয়াল আসিয়া হরির বাড়িতে তিন-চার দিন কাটাইলাম। প্রতি রাত্রেই গানের জলসা চলিল।

ইহার কিছুদিন পরেই দেশ স্বাধীন হইল। দলে দলে হিন্দুরা পাকিস্তান ছাড়িয়া ভারতে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। আমাদের ফরিদপুর জেলায় কোনদিনই হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয় নাই। তবু পাকিস্তান ছাড়িয়া হরি হিন্দুস্থানে চলিয়া গেল। আনন্দের গানের দলটি হরির অভাবে একেবারে কানা হইয়া গেল। কিছুদিন পরে খবর পাইলাম, হরির সুন্দরী বউটি কোন ক্যাম্প হইতে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তার আর খোঁজ পাওয়া যায় নাই। হরি একবার পাকিস্তানে আসিয়াছিল কিন্তু আসিয়া থাকিবে কোথায়? তার ক্ষুদ্র বসতবাড়িটি আগেই বিক্রি করিয়া গিয়াছে। গানের দলের বন্ধুদের সঙ্গে অনেক চোখের জলের বিনিময় করিয়া হরি আবার হিন্দুস্থানে চলিয়া গেল। সেবার আনন্দের কাছে খবর পাইলাম হরিও ইহলোক ত্যাগ করিয়া ইহজনমের মত চলিয়া গিয়াছে। হরির সেই লেপাপোছা ছোট্ট উঠানখানি, গৃহকার্যরত হাস্যময় সেই বউটি, তাহাদের তুলসীতলা, যেখানে স্নান করিয়া বউটি রোজ মধ্যাহ্নকালে প্রণাম অঞ্জলি নিবেদন করিত, সব মিলিয়া পটুয়ার আঁকা একখানি সুন্দর চিত্রের মত আজও অন্তরে স্পষ্ট হইয়া আছে। আজও মাঝে মাঝে আমার আকাশেবাতাসে অভাগা হরির মধুর কণ্ঠস্বর আমি শুনিতে পাই।

সেটা বোধহয় কার্তিক মাস। আমি আনন্দের বাড়ি আসিয়াছি। সারা রাত্রি ভরিয়া গান শুনি। আনন্দ, তার বউ, ছেলেমেয়ে সকলেই আমাকে গুরুঠাকুরের মত ভক্তি করে। সুন্দর আসন করিয়া বসিতে দেয়। কোথাও গেলে মাথায় ছাতি আনিয়া ধরে। আনন্দের সমস্ত পরিবারময়—গ্রামবাসী প্রত্যেকে যেন আমার জন্য কিছু করিতে পাইলে কৃতার্থ হইয়া যায়। বিল হইতে, পুকুর হইতে, আনন্দের ছেলেরা-ভাইরা কই-মাগুর মাছ ধরিয়া আনে। দুপুরে রাত্রে আহারের ভাল বন্দোবস্ত। পূর্বেরই মত মেঝের খানিকটা লেপিয়া পুছিয়া তাহার উপর পিঁড়িখানা মেলিয়া আনন্দের বউ আঁচল দিয়া মুছিয়া দিয়া আমাকে সেখানে আসন গ্রহণ করিতে আহ্বান করে। কিছুক্ষণ পরে একখানা বড় থালায় ভাত, পঞ্চব্যঞ্জন সাজাইয়া আমার সামনে রাখিয়া দিয়া গলায় আঁচল জড়াইয়া মাটিতে কপাল রাখিয়া প্রণাম জানায়। এদের ভক্তিশ্রদ্ধা দেখিয়া মাঝে মাঝে ভ্রম হয়, আমিও যেন একজন মস্তবড় মহাপুরুষ বনিয়া গিয়াছি। এইভাবে তিন-চারদিন বেশ আনন্দে কাটিয়া গেল।

তখন বোধহয় বেলা দশটা হইবে। আনন্দের বৈঠকখানার পাশে আমগাছটির ছায়ায় বসিয়া আছি। সামনে সুদূরপ্রসারী মাঠ। সেই মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটি বিল। বিলের স্বচ্ছ জলের উপর সাদা সাদা বকগুলি শূন্যে পাখা বিস্তার করিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। বিলের ওপার হইতে চখা-চখির ডাক কানে আসিতেছে। সারা রাত্রি ভাব-গান শুনিয়া অশ্রু বিসর্জন করিয়াছি, আজ মনে হইতেছে সেই গান যেন আমার অন্তরকে ধৌত-পরিচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। এখন পৃথিবীর সমস্ত কিছুকে আমি যেন নতুন করিয়া দেখিতে পাইতেছি। সুদূরপ্রসারী নীল আকাশে মর্মতলে যেন আমি প্রবেশ করিতে পারিতেছি। সূর্যের আলো পড়িয়াছে সবুজ ধানাক্ষেতের উপর। গাছের ডালে কত রকমের পাখি ডাকিতেছে। এরা যেন সকলেই আমার অন্তরের তারে তারে বীণা বাজাইতেছে। গত রাত্রে যেসব গান শুনিয়াছি তাহারই সুরের রেশ সেখানে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

হঠাৎ কয়েকটি কিশোর বালকের কথায় আমার ধ্যানভঙ্গ হইল। তাহারা বলাবলি করিতেছে; "শালা মোছলমানেরা আমাদের দোয়াড়ির সামনে জাল পাতিতে আসিয়াছিল। যখন বেশ করিয়া কয়েক 'ঘা' লাগাইয়া দিলাম, পালাইবার পথ পাইল না।"

শুনিয়া আমি আশ্চর্য হইলাম। এ দেশের নমু-মুসলমানের লড়াই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। আবহমানকাল হইতে ইহাদের মধ্যে কে বেশী শক্তিশালী তাহা আজও প্রমাণিত হয় নাই। আজ কয়েকজন কিশোর বালকের আক্রমণে একদল মুসলমান পলাইয়া জীবন বাঁচাইল। ভাবিতে আমার খুবই আশ্চর্য বোধ হইল।

ইহার আধঘণ্টা পরে মাঠের ওপার হইতে ঢাল সড়কি লাঠি বল্লম লইয়া প্রায় দুই তিন শত মুসলমান 'আলী আলী' শব্দ করিয়া নমঃশূদ্র পল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। নমু পল্লীর লোকেরা প্রস্তুত ছিল না। যাহারা যাহারা বাড়ি ছিল সবাই মালকোচা দিয়া কাপড় পরিয়া তৈয়ার হইতে লাগিল; বাড়ির মা-মাসিরা বৌ-ঝিরা ঘরের চাং-এ রক্ষিত লাঠি, সড়কী, রামদা বাহির করিয়া তাহাদের হাতে দিতে লাগিল। নিজের ছেলে বা স্বামী যে এই মরণঘাতী লড়াইয়ে

যাত্রা করিতেছে সে জন্য তাহাদের মনে কোন চিন্তা নাই; কোন উদ্বেগ নাই। এ যেন নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। মুহূর্তের মধ্যে প্রায় বিশ ত্রিশ জন নমু বাড়ির সামনে সার দিয়া দাঁড়াইল। মেয়েরা ঘরের চাং হইতে পাঁজাপাঁজা আগচোখা বাঁশ আনিয়া তাহাদের পিছনে জড় করিল। দূর হইতে এ-গুলি শত্রুপক্ষের লোকদের লক্ষ্য করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হইবে।

আমি ত' আনন্দের বহির্বাটিতে তাহার জলচৌকিখানার উপর গুরু-ঠাকুরের মতই বসিয়া আছি। আমার বুকের মধ্যে দুরুদুরু করিয়া কাঁপি-তেছে। ভাবিতেছি আজ আমার মরণ নিশ্চয়। হয় হিন্দুর হাতে নয় মুসল-মানের হাতে। এ দেশে নমু-মুসলমানের দাঙ্গা একবার লাগিলে দুই এক দিনে শেষ হয় না। দুই চার মাস, এমন কি বৎসরখানেক পর্যন্তও তাহার জের চলে। এমন যে প্রতাপশালী বৃটিশ সরকার তাহাকেও এরূপ দাঙ্গা থামাইতে হিমসিম খাইতে হইত। এমনি দোয়াড়ি পাতার মত ছোটখাটো ঘটনা লইয়া এ অঞ্চলে দাঙ্গা বাধে। তারপর এ গ্রামে ও গ্রামে ছড়াইতে ছড়াইতে সমস্ত দেশে আগুন জ্বলে। আমি ভাবিতেছি, মুসল-মানেরা যদি এই গ্রামে আসিয়া হামলা করে, তাহারা জানিবে আমি হিন্দু। সুতরাং সকলের আগে আমাকেই মারিবে। আর নমুরাত' আমাকে মুসলমান বলিয়াই জানে। তাহারা আমাকে হয় কালীরমন্দিরে লইয়া গিয়াই বলি করিবে, অথবা আমার মুণ্ড কাটিয়া লাঠির আগায় বাঁধিয়া মুসলমানদের সামনে ঝুলাইয়া ধরিবে। অতীতকালের ইতিহাসের ইত্যাকার বহু ঘটনা যেন জীবন্ত হইয়া আমার বুকের কাঁপুনিকে আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে। আনন্দ এখন বাড়ি নাই। সে বাজারে গিয়াছে। সে যদি থাকিত তবে তাহার উপর কিঞ্চিৎ ভরসা করিতে পারিতাম। ওদিকে মুসলমানেরা আরও আগাইয়া আসিতেছে। মুহুর্মুহু আলী আলী আওয়াজ দিতেছে। তাহার দাপটে বুকের কাঁপুনির সঙ্গে আমার পায়ের তলার মাটিও যন কাঁপিয়া উঠিতেছে। নমুরাও এদিক হইতে হুঙ্কার দিয়া উঠিল। সে কি যেমন তেমন হুঙ্কার! একবার নমুদের তরফ হইতে আবার মুসলমানদের তরফ হইতে। সমস্ত আকাশ পৃথিবী যেন কি এক ভয়ঙ্করের খেলার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। মুসলমানেরা আরও নিকটে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। মাঝখানে মাত্র তিন চারখান ক্ষেতের ব্যবধান। এবার হুঙ্কার দিয়া নমুদের গ্রামে ঝাপাইয়া পড়িলেই সর্বনাশের খেলা আরম্ভ হইবে।

এমন সময় আনন্দের কাকা পাষাণ মণ্ডল দুই দলের মধ্যখানে যাইয়া নিজের ভাই ভাতিজাদের দিকে ফিরিয়া অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ আরম্ভ করিল, "হারামজাদারা, দোয়াড়ি পাতবার গেছিলি। দোয়াড়ি তোদের---"আরও যা গালাগালি করিল তাহা ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। ইত্যাকার গালাগালিতে তাহার ভাই ভাতিজারা লাইন ছাড়িয়া যার যার বাড়ি প্রবেশ করিল।

অনতিদূরে দাঁড়াইয়া মুসলমানেরা এই গালাগালি শুনিতেছিল। তাহারা ধীরে ধীরে হাতের চাল লাঠি ফেলিয়া আনন্দের বহির্বাটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। চার-পাঁচটি হুঁকায় তামাক সাজাইয়া নমুরা এই আগত মেহমান-দিগকে আদর-আপ্যায়ন করিল।

বহুক্ষণ গল্পগুজব করিয়া পান-তামাক খাইয়া মুসলমানেরা যার যার বাড়ি চলিয়া গেল। বলা বাহুল্য, এতক্ষণ যে তাহারা গল্পগুজব করিল তাহার মধ্যে দোয়ারি পাতা লইয়া যে রক্তক্ষয়ী বিবাদ বাঁধিতেছিল সে বিষয়ের কোন উল্লেখই ছিল না। পাষাণ মণ্ডলের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের জন্য আজ সমস্ত নমু-মুসলমান পাড়া যে কি সর্বনাশ হইতে রক্ষা পাইল তাহা ভাবিয়া কৃতজ্ঞতায় আমার সমস্ত অন্তর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। আমি তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া আমার শ্রদ্ধা ও ভাল-বাসা জানাইলাম।

পাষাণ মণ্ডলের চেহারাটি কে যেন কালো পাথর কুন্দিয়া গঠন করিয়াছে ছোটোখাটো মানুষটি। দুই বাহু যেন দুইখানা শক্ত গজারিকাঠ। মাংসপেশী বহুল আঁটসাঁট শরীর। শুনিয়াছি, প্রায় কাইজায় সে একাই এক শ' লোকের সঙ্গে লড়াই করিয়া জিতিতে পারে। তাহার শক্ত গায়ের মাংসে সড়কি কাতরা বিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু এজন্য আমি তাহার তারিফ করি না। আজ যেভাবে সে এই দুই সম্প্রদায়কে দাঙ্গার হাত হইতে রক্ষা করিল তাহা কোন দেশের ইতিহাসে লেখা থাকিবে না। আমাদের দেশ যদি সত্যকার সরকারের হাতে থাকিত তবে তাহারা এই পাষাণ মণ্ডলকে ডাকিয়া আনিয়া দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে সম্মানিত করিত। গ্রাম দেশগুলিতে আজও পাষাণ মণ্ডলের মত বহু হৃদয়বান লোক আছে, কিন্তু কে তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবে? গত দুর্ভিক্ষের পরে আবার আনন্দের দেশে যাইয়া পাষাণ মণ্ডলের সাথে দেখা হইল। অর্ধাহারে অনাহারে তাহার সেই বলিষ্ঠ মাংসপেশীগুলি শুখাইয়া গিয়াছে। হালের গরু নাই। দিনের ঘরখানা কবেই বিক্রী করিয়া ফেলিয়াছে। আজ আর তার বিগত জীবনের বহু প্রায় কাইজা জয়ের কাহিনী কেহ বলিল না। আজ সে যুদ্ধ করিতেছে দারুণ অভাবের সঙ্গে—ছেলে মেয়ের অকাল মৃত্যুজনিত দুঃখ বেদনার সঙ্গে। আহা এ সংগ্রামের যুদ্ধকৌশল কিছুই তাহার জানা নাই।

স্বাধীনতার পরে আমি ঢাকায় চলিয়া আসিলাম। এতদিনের সাহচর্যে আনন্দ আমার ভাবলোকের বন্ধু—আমার আত্মার আত্মীয়। তাই তার বাজনা—তার গান শুনিতে আমি বহু মাইল অতিক্রম করিয়া তার গ্রামে যাই। বাড়িতে যখন আসি সেও মাঝে মাঝে আসিয়া আমাকে গান শুনাইয়া যায়।

আমি তখন গণ সংযোগ বিভাগে সঙ্গীত প্রচারণীর চাকরী করি, আমার অধীনে একটি তবলচির চাকরী খালি হইল। আনন্দ তবলা বাজাইতে

পারে না। সে দোতারা বাজায়। কর্তৃপক্ষকে আমি জানাইলাম, আমার সঙ্গীত প্রচারের কার্যে গ্রাম্য-সুরই বহুলাংশে ব্যবহৃত হয়। এইসব গানে তবলার চাইতে দোতারা বাদ্যই উত্তম সঙ্গত করিতে পারে। অনুমতি পাইলে তবলা বাদকের পদে আমি আনন্দকে নিয়োগ করিতে পারি

কর্তৃপক্ষ আমার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। আনন্দকে তবলা বাদকের চাকরী দিয়া ঢাকায় আনয়ন করিলাম। গ্রাম্যচাষী আনন্দ আমার সামনে আসিয়া আরও দশজন ভদ্রসন্তানের সঙ্গে সম আসনে চেয়ারে বসিবার অধিকার পাইল।

এবার আনন্দকে যখন ডাকি তখনই পাই। গান শুনিতে ইচ্ছা হইলে তাহাকে বাড়িতে ডাকিয়া আনিয়া দুই বন্ধু সারারাত্র জাগরণ করি। শহরে গ্রামে যেখানে আমার বক্তৃতায় নিমন্ত্রণ হয় সেখানে আনন্দকে সঙ্গে লইয়া যাই। তাহার বাদ্য শুনিয়া শ্রোতৃমণ্ডলী বাহবা দেয়। প্রথমে আনন্দ আমাদের ছোঁয়া কিছু খাইত না। কিন্তু মফস্বলে সব সময় তাহার আহারের জন্য পৃথক বন্দোবস্ত করা যায় না। ধীরে ধীরে আনন্দ আমাদের সঙ্গেই আহার করিতে অভ্যস্ত হইল। সে বলিত, আপনি আমার গুরু। আমাদের কত হিন্দু তো সানাল পিরের শিষ্য। তাহারা সানাল পিরের সিন্নি খাইলে ত' কেহ কোন আপত্তি করে না; আপনার সঙ্গে খাইলেও কোন পাপ হইবে না।"

ধীরে ধীরে আনন্দের গলা হইতে তুলসীর মালাটি যে কবে অন্তর্হিত হইল টেরও পাইলাম না। কিন্তু কানাইর মত আনন্দ শহরে আসিয়া নানা রাগ-রাগিণী শিক্ষা করিয়া গ্রামের মধুর কারুকলাপূর্ণ সুরগুলি দোতারায় তুলিতে তার সেই সহজ সরল গ্রামীয়তা ভুলিল না।

এইভাবে প্রায় চার পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। মাসে মাসে আনন্দ বেতন পাইয়া তাহার অধিকাংশই বাড়িতে পাঠায়। সেই টাকায় তাহার অভাবগ্রস্ত পরিবার কিছুটা সচ্ছলতার স্পর্শ পাইল। আনন্দের এক দোষ। সে প্রায়ই ছুটি লইয়া বাড়ি যায়। ছুটি দিতে না চাহিলেও সে চলিয়া যায়। সে গ্রামের মানুষ। শহরে আসিয়া সে যেন পানির মাছ ডাঙ্গায় পড়িয়াছে। এখানে যে ভদ্রসমাজে তার বাজনার এত তারিফ তাহাতে তাহার মন ভরে না। ইহাদের প্রশংসার কৃত্রিমতা তাহার অবচেতন মন বুঝিতে পারে। গ্রামের গুণগ্রাহীরা যেভাবে তার গান শুনিয়া, বাজনা শুনিয়া মুগ্ধ হয় সহরের শ্রোতা-দের মধ্যে তাহা পাওয়া যায় না। ইহা আমি জানি। তাই অফিসের কাজে ব্যাঘাত হইলেও আনন্দের ছুটি মঞ্জুর করি।

একদিন আনন্দ আসিয়া বলিল, কয়েক বছর আগে তাহার ছোট ভাই মরিয়া গিয়াছে। তাহার বিধবা স্ত্রীকে সে ঢাকায় লইয়া আসিতে চায়। শহরে থাকিয়া দুইবেলা হাত পোড়াইয়া রান্না করিতে তাহার বড়ই ক্লেশ হয়। আমি যদি অনুমতি করি---।"

আমি সানন্দে তাহাকে অনুমতি দিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে আনন্দ একদিন সন্ধ্যায় তাহার ভাইবউকে আমার বাসায় লইয়া আসিল। নমুদের রং সৌন্দর্য খুবই কম। কিন্তু কি মেয়ে কি পুরুষ সকলেরই স্বাস্থ্য বেশ ভাল গাবদা গাবদা মুখখানা বউটির। বে মোটাসোটা। আমাকে আমার স্ত্রীকে পা ছুঁইয়া প্রণাম করিল। আমার স্ত্রী তাহাদিগকে ভালমত নাস্তা খাওয়াইয়া আপ্যায়ন করিলেন।

ইহার কিছু দিন পরে আনন্দ আসিয়া আমার কাছে নালিশ করিল, "আপনার অধীনের অন্যান্য গায়কেরা আমার ভাইবউকে আর আমাকে লইয়া কুৎসিত ঠাট্টা করে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তাহারা কি বলে?"

আনন্দ উত্তর করিল, "তাহা বলা যায় না। তবে আপনি গুরু আপনার কাছে গোপন করিব না। তাহারা বলে, আনন্দ ভাইবউকে লইয়া বেশ মশগুল হইয়া আছে।"

আমি আমার গায়কদিগকে ডাকিয়া বেশ করিয়া ধমকাইয়া দিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে কোন ব্যাপার লইয়া উপরোক্ত কর্মকর্তা মিষ্টার আহম্মদ হোসেনের সঙ্গে আমার ভীষণ ঝগড়া হইল। এই ঝগড়া শুধু মুখে মুখেই শেষ হইল না। ফাইলে লিপিবদ্ধ হইয়া কিছুদিন পরস্পরের বাদপ্রতিবাদ চলিল। আবহমান কালের আমার বিশ্বাস আমি যদি নিজে কোন অপরাধ না করি, কেহই আমার কোন ক্ষতি করিতে পারে না। জীবনের সুদীর্ঘ সংগ্রাম-ক্ষেত্রে বহুবার ইহা প্রমাণিত হইয়াছে এবারও ডিরেক্টর সাহেব আমার কোন ক্ষতি করিতে পারিলেন না। [ক্রমশ।

দিনান্ত লিপি

জগন্নাথ ঘোষ

স্মৃতির সংকল্প থাক। আমাকে ডেকো না তুমি আর।
ঘাসের মুকুরে আঁকা থাক কিছু করুণ বিকেল।
অনেক দেখার আলো অপরিচয়ের অন্ধকার
বুকে করে কখনকি অনাহত যন্ত্রণা অঢেল
দিনান্ত লিপিতে লিখে রাখে? বলেছিলে, রাখে।
আমাকে যা দিয়েছিলে, তা নয় কাঞ্চন, আমি তাকে
জেনেছি সে মূল্যহীন কাঁচ। আমাকে ডেকো না তুমি।
যে পাখিরা উড়ে গেছে, বিকেলের সোনালি ডানায়
তারা আর ফিরবে না প্রতীক্ষার আলোয় আভায়।
যাকে ভুলে যেতে চাও, সে এক ধূসর মরুভূমি
অন্তরে অংকন করে—যতই গভীরে যাও তার,
খুঁজেও পাবে না তাকে। আমাকে ডেকো না তুমি আর।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ এগারো ॥

—দেবব্রত ভীষ্ম—

দেবগুরু দৈত্যগুরুসম শাস্ত্রে জ্ঞান।
অস্ত্রশিক্ষা জানে ভৃগুরামের সমান ॥
সংসারে যতেক বিদ্যা যত নীতিধর্ম।
এ পুত্রের অগোচর নহে কোন কর্ম ॥
—গঙ্গার উক্তি (কাশীরাম দাস)

পুত্রনার মৃত্যুর পর পাঁচ বৎসরকাল অতিবাহিত হয়েছে। বেদব্যাস শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন নানাতীর্থ পর্যটন করতে করতে কুরুরাজধানী হস্তিনাপুরে এসে উপনীত হলেন।

কৌরবরাজকুলের সঙ্গে বেদব্যাসের খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। বেদব্যাসের গর্ভধারিণী জননী যোজনগন্ধা সত্যবতী কুরুরাজ শান্তনুর পট্টমহিষী, দেবব্রত ভীষ্মের বিমাতা। সত্যবতীর পুত্র কুরুরাজ বিচিত্রবীর্যের পত্নীদ্বয় অম্বিকা ও অম্বালিকার সন্তান ধৃতরাষ্ট্র এবং পাণ্ডু বেদব্যাসেরই ঔরসজাত সন্তান। দাসীপুত্র বিদুরের জনকও ঋষি বেদব্যাস। এসব কারণে কুরুরাজপরিবারে বেদব্যাস একটা বিশেষ সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী ছিলেন। তিনি হস্তিনাপুরে উপনীত হতে অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে তাঁর অভ্যর্থনা করা হোলো।

মহারাজা পাণ্ডু তখন প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সপরিবারে অরণ্যবাসী হয়েছে। ধৃতরাষ্ট্র রাজসিংহাসনে সমাসীন। রাজা ধৃতরাষ্ট্র এবং পট্টমহিষী গান্ধারী বেদব্যাসকে রাজ-অন্তঃপুরে আমন্ত্রণ করে চরণ বন্দনা করলো। ধৃতরাষ্ট্রের সন্তানদের তিনি এর আগে আর দেখেন নি। ছয় বৎসর বয়স্ক রাজকুমার দুর্যোধন, তার অনুজ দুঃশাসন, দুঃসহ, বিকর্ণ প্রভৃতি অন্যান্য রাজকুমার, রাজকন্যা দুঃশলা, প্রত্যেককে একে একে উপস্থিত করা হোলো তার সম্মুখে। বেদব্যাস প্রত্যেককেই আশীর্বাদ করলেন। ধৃতরাষ্ট্রের বৈশ্যাকন্যাজাত দ্বিতীয়া মহিষীর পুত্র যুযুৎসু ঈষৎ সঙ্কোচের সঙ্গে দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েছিলো। তাকেও কাছে ডেকে স্নেহভাষণ করলেন। একে একে সকলের কুশল প্রশ্ন করলেন বেদব্যাস। ধৃতরাষ্ট্র এবং গান্ধারী বিনম্রকণ্ঠে রাজপুরীর সবার সংবাদ জানালো। কিন্তু বেদব্যাস মনে মনে অস্বস্তিবোধ করলেন। অন্যান্য বারের মতো সহজ স্বচ্ছন্দ পরিবেশ এবার তিনি দেখতে পেলেন না। দেবব্রত ভীষ্ম রাজপ্রাসাদের মহাগোপুরেই তাঁর অভ্যর্থনা করেছিলো, অভ্যন্তরমণ্ডপে আর আসেনি। জননী সত্যবতীও এখানে উপস্থিত হননি। বিদুর এবং তার পত্নী পরাশরীকেও দেখা গেল না।

বারীন্দ্রনাথ দাশ

তাদের কথা জিজ্ঞেস করলেন বেদব্যাস। গান্ধারী উত্তর দিলো, "দেবী সত্যবতী আজকাল প্রাসাদের অন্য অংশে পৃথকভাবে বসবাস করেন। খুল্লতাত ভীষ্ম ব্যতীত আর কারো সঙ্গে বাক্যালাপ বড়ো একটা করেন না। পূজা অর্চনা ও শাস্ত্রপাঠেই সারাদিন অতিবাহিত করেন। আমি যখন তাঁকে সংবাদ পাঠালাম যে, আপনাকে অন্তঃপুরে আমন্ত্রণ করা হয়েছে, তিনি জানালেন যে এখানে এসে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, আপনাকে তিনি তাঁর কক্ষেই প্রত্যাশা করেন।"

"সেটাই তো স্বাভাবিক," বেদব্যাস মৃদুহেসে উত্তর দিলেন, "আমি তাঁর সন্তান, তিনি এসে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন কেন, আমিই তো তাঁকে প্রণাম করতে যাবো।"

"অন্যান্য বার তিনি এখানেই আসতেন," শোনা গেল একটি অপরিচিত কণ্ঠস্বর।

বেদব্যাস ফিরে তাকালেন। তরুণবয়স্ক ঈষৎ খর্বকায় এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে প্রশস্ত কক্ষের একপ্রান্তে। অতি শুভ্র তার দেহের বর্ণ, কিন্তু মুখের গঠন আর্য জাতীয়দের মতো নয়। উচ্চকুলজাত ব্যক্তির মতো তার ব্যক্তিত্ব, মুখে একটা ক্রূরতার ভাব না থাকলে প্রায় সুদর্শনই বলা চলতো। নাতিবৃহৎ দুটি চোখ অতি প্রখর, অধরপ্রান্ত ব্যঙ্গ ও তাচ্ছিল্যের হাসিতে একটু বঙ্কিত হয়ে আছে।

বেদব্যাস স্থিরদৃষ্টিতে তার ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করে নিয়ে উত্তর দিলেন, "আমার জননী বৃদ্ধা হয়েছেন, এখন আর তাঁর পক্ষে সহজভাবে প্রাসাদের সর্বত্র ঘুরে বেড়ানো সম্ভব নয়।"

গান্ধারী আশা করেছিলো বেদব্যাস হয়তো এ ব্যক্তির পরিচয় জানতে চাইবেন। কিন্তু তিনি কোনো প্রশ্ন করলেন না বলে নিজের থেকেই বললো, "ও আমার সহোদর, গান্ধাররাজপুত্র শকুনি।"

বেদব্যাস আবার ফিরে তাকালেন শকুনির দিকে। —"ও, তুমি গান্ধাররাজ সুবলের পুত্র? বাহ্লীক জাতীয় পুরুষেরা স্বভাবতই একটু নাস্তিক, মুনি ঋষি সন্ন্যাসীদের প্রতি তারা বেশী শ্রদ্ধা দেখায় না। কিন্তু তোমার পিতা সুবল আমাকে যথেষ্ট সমীহ করেন।"

শকুনির মুখে একটা উদ্ধত হাসি দেখা গেল। সে ধীরপদে অগ্রসর হয়ে বেদব্যাসের চরণ স্পর্শ করলো।

বেদব্যাস তার প্রতি আর ভ্রূক্ষেপ করলেন না। ধৃতরাষ্ট্রের দিকে ফিরে

বললেন, "আমি আশা করেছিলাম বিদুর এবং তার পত্নী পরাশরীও এখানে উপস্থিত থাকবে।"

ধৃতরাষ্ট্র উত্তর দিলো, "আমি যতদূর জানি, বিদুর এবং পরাশরী পিতামহী সত্যবতীর ওখানে উপস্থিত হবেন আপনাকে প্রণাম করতে।"

শকুনি বলে উঠলো, মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের কাছে একথা গোপন রাখার প্রয়োজন কি?"

"না না, গোপন কিছুই রাখতে চাই না," ধৃতরাষ্ট্র অপ্রতিভ হয়ে বললো, "তবে এসব রাজপ্রাসাদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার, তিনি কোনোরকম আগ্রহ বোধ করবেন না।"

"কি ব্যাপার?" বেদব্যাস জিজ্ঞেস করলেন।

"এমন কিছু নয়," গান্ধারী তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, "রাজপ্রাসাদের ইদানীং কিছু কিছু নতুন রীতির প্রবর্তন করা হয়েছে। অন্তঃপুর-সভায় রাজা, মহিষী এবং রাজপুত্র ও রাজকন্যা ব্যতীত আর কেউ উপস্থিত থাকে না।"

"বিদুর কি রাজ-পরিবারের একজন নয়?" ব্যাসদেব জিজ্ঞেস করলেন।

"বিদুরকে আমরা কুরুবংশজাত বলে গণ্য করি না," উত্তর দিলো শকুনি।

ব্যাসদেবের মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে উঠলো। কিছু একটা উত্তর দিতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু গান্ধারীর পাণ্ডুর মুখখানি দেখে সংযত হলেন। প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বললেন, "শতশৃঙ্গ থেকে কোনো সংবাদ এসেছে?"

ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডু তার দুই পত্নী কুন্তী এবং মাদ্রীকে নিয়ে কয়েক বৎসর ধরে বাস করছে হিমালয়ের শতশৃঙ্গ পর্বতে।

শকুনি উত্তর দিলো, "সেখানে তাঁর চারটি ক্ষেত্রজপুত্রের জন্ম হয়েছে, আর কত হবে। দেবী মাদ্রী নাকি নিয়োগের মাধ্যমে আরো একটি পুত্র চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ হয়নি।"

বেদব্যাস ভ্রূকুটি করলেন। গান্ধারী তাড়াতাড়ি শকুনিকে বললো, "তুমি চুপ করো শকুনি। ইদানীং অত্যন্ত প্রগলভ হয়ে উঠেছো।"

বেদব্যাস তাকিয়ে দেখলো ধৃতরাষ্ট্রের দিকে। দেখলো ধৃতরাষ্ট্রের মুখের উপর মৃদুহাসি।

গান্ধারী উত্তর দিলো, "কিছুদিন আগে তাঁদের সংবাদ এসেছে। তাঁরা কুশলেই আছেন। তাঁরা হস্তিনাপুরে আর ফিরবেন না বলেই মনে হয়।"

"রাজকুমারেরা ফিরে আসবে যথাসময়ে," বললেন বেদব্যাস।

"কেন? ওরা ফিরে আসবে কেন?" তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো শকুনি।

শকুনির কথায় ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী দুজনে যেন একটু অপ্রস্তুত হোলো। ধৃতরাষ্ট্র বলে উঠলো, "শকুনি বোধহয় বলতে চাইছে, পিতামাতাকে ছেড়ে পাণ্ডুর সন্তানেরা কি এতদূর থেকে ফিরে আসবে?"

"ওরা ক্ষত্রিয় সন্তান," গম্ভীরকণ্ঠে বললেন বেদব্যাস, "তাদের শিক্ষার সুব্যবস্থা জনবিরল পার্বত্য অঞ্চলে হতে পারে না, তাদের যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করতে হবে, রাজকার্যে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে, সুতরাং তাদের হস্তিনাপুরে ফিরে আসা প্রয়োজন।"

কেউ কোনো উত্তর দিলো না। কারো মনে যে একথার অনুমোদন নেই একথা অনুভব করতে পারলেন ব্যাসদেব।

শিষ্টালাপ আরো কিছুক্ষণ চললো, কিন্তু কারো কথায় কোনোরকম আন্তরিকতা নেই। ব্যাসদেব ধীরে ধীরে উঠে পড়লেন সেখান থেকে। প্রাসাদের অন্তর্বংশিক তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে গেল প্রাসাদের অন্য অংশে দেবী সত্যবতীর কাছে।

সত্যবতী বৃদ্ধা হয়েছেন কিন্তু অথর্ব হয়ে পড়েন নি। মাথার চুল একেবারে শুভ্র হয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর জরাজীর্ণ মুখখানি এখনো এক অভিজনোচিত ব্যক্তিত্বে ভাস্বর হয়ে আছে। তিনি পরম স্নেহের সঙ্গে তাঁর কানীন পুত্রের স্বাগত করলেন। বিদুর এবং তার পত্নী পরাশরীও অপেক্ষা করছিলো সেখানে। ওরা এসে বেদব্যাসকে প্রণাম করলো।

"কুরু-রাজপ্রাসাদে বহুবার এসেছি," বললেন ব্যাসদেব, "কিন্তু এবার অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি।"

সত্যবতী চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, "দ্বৈপায়ন, আমার আর এখানে ভালো লাগছে না, আমি রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে এখন আশ্রমবাসী হতে চাই। তুমি আমাকে এখান থেকে নিয়ে চলো।"

"মা," উত্তর দিলেন ব্যাসদেব, "এখনো সময় হয়নি।"

"আমাকে আর ক'দিন এখানে এভাবে থাকতে হবে?"

"যেদিন সময় হবে আমি নিজেই এসে বলবো।"

"এখানে থাকতে আমার খুব অসুবিধা হচ্ছে," বললেন সত্যবতী।

"হ্যাঁ মা, আমি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু তোমার তো কোনো অনাদর হচ্ছে না।"

"আমার ভীষ্ম যদ্দিন আছে, কেউ আমার অনাদর করতে সাহসী হবে না। কিন্তু—"

সত্যবতী কথা শেষ করলেন না দেখে বেদব্যাস জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু কি মা?"

"ভীষ্মর পক্ষেও এখানে বেশিদিন থাকা হয়তো সহজসাধ্য হবে না।"

"ভীষ্মকে কেউ ক্ষমতাচ্যুত করবে এ কি সম্ভব?"

"না, ওকে ক্ষমতাচ্যুত কেউ করতে পারবে না। কিন্তু—এরা যেভাবে আজকাল তার প্রতি অনাদর ও অবহেলা দেখাচ্ছে, সে এই অবস্থা সহ্য করে বেশীদিন এখানে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না।"

"তাকে থাকতে হবে," বললেন ব্যাসদেব, "পাণ্ডুর পুত্র-সন্তানদের

মঙ্গলের জন্যে ভীষ্মকে হস্তিনাপুরে থাকতে হবে।"

সত্যবতী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তারপর বললেন, "শকুনি হস্তিনাপুরে এসে স্থায়িভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করার পর থেকে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে।"

"শকুনি এখানে এলো কেন?"

"ভীষ্ম এখানে আসছে। তাকেই জিজ্ঞেস করো," বলে সত্যবতী অশ্রু-মোচন করলেন।

সত্যবতীর অশ্রু দেখে ব্যাসদেব বিচলিত হলেন। বললেন, "তোমার কি হয়েছে মা? তোমায় তো কোনো দিন এত কাতর দেখি নি।"

"আমার মন ভেঙে গেছে দ্বৈপায়ন", উত্তর দিলেন সত্যবতী, "কুরুরাজ যখন আমাকে বিবাহ করতে চেয়েছিলেন, তোমার জন্মের কথা তাঁর অজানা ছিলো না। কিন্তু তিনি সসম্মানে আমাকে পট্টমহিষীর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্ররূপে দেবব্রত ভীষ্ম যুবরাজের পদে অধিষ্ঠিত ছিলো বলে আমার পিতা যখন তাকে কন্যাদান করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন, ভীষ্ম তাঁকে আশ্বস্ত করবার জন্য সিংহাসনের অধিকার স্বেচ্ছায় ত্যাগ করলো, সিংহাসনের জন্যে আমার সন্তানের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী যাতে না হয় সেজন্যে আজীবন কৌমার্যের অঙ্গীকার করলো। আজ সেই সিংহাসনে নিজের সন্তানের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছে আমারই পৌত্র ধৃতরাষ্ট্র এবং সেই জন্যে ভীষ্মের প্রতি তাদের এত বিদ্বেষ। ওরা জানে ভীষ্ম বর্তমান থাকতে পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ-পুত্রকে অধিকারচ্যুত করে ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্রকে সিংহাসন দেওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। আমাদের রাজমহিষী গান্ধারীর প্রকৃতি অনুদার নয়, কিন্তু শকুনির কুমন্ত্রণায় ধৃতরাষ্ট্রের মন বিষাক্ত হয়ে গেছে।"

সত্যবতী আর ব্যাসদেব যখন বাক্যালাপ করছিলো, সে সময় ভীষ্ম কক্ষে প্রবেশ করে ব্যাসদেবের অনুমতি পেয়ে আসন গ্রহণ করলো। ব্যাসদেবের সঙ্গে এবার ভীষ্মের দেখা হয়েছে অনেকদিন পরে। ভীষ্মও বার্ধক্যে উপনীত হয়েছে, কিন্তু তার পেশীসংবদ্ধ দেহ যুবাপুরুষের মতোই সুগঠিত। বার্ধক্যের ভারে এখনো পৃষ্ঠ অবনত হয়নি, এখনো ভীষ্মের শাল-প্রাংশু ঋজুকান্তি। কিন্তু ব্যাসদেব লক্ষ্য করলেন, এবার ভীষ্মের চোখে ঈষৎ দুশ্চিন্তার ছায়া।

"দেবব্রত," ব্যাসদেব সম্বোধন করলেন ভীষ্মকে, "শকুনির তো থাকবার কথা গান্ধারে, সে এখানে কেন এলো?"

ভীষ্ম হেসে উত্তর দিলো, "তার এখানে আসবার আসল কারণ হোলো শূরসেন রাজ্যের অধিপতি কংস।"

"আমিও তাই অনুমান করছিলাম", বললেন ব্যাসদেব।

"আমি সংবাদ পেয়েছি যে, এ ব্যাপারে কংস মগধরাজ জরাসন্ধের নির্দেশেই পরিচালিত হচ্ছে," ভীষ্ম বললো।

"এ তো খুবই স্বাভাবিক," বলে উঠলেন ব্যাসদেব, "কংস নিশ্চয়ই চাইবে না যে বসুদেবের ভগ্নী কুন্তীর পুত্র শূরসেন রাজ্যের প্রতিবেশী কুরু-রাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হোক, কারণ তাহলে বৃষ্ণিরা কুরুরাজ্যের সহায়তা পেতে পারে কংসকে ক্ষমতা-চ্যুত করবার জন্যে।"

"সে তো অনেক পরের কথা," ভীষ্ম হাসলো, "কংসের উপস্থিত সমস্যা হোলো কুন্তীর পালকপিতা রাজা কুন্তিভোজ এবং রাজা দ্রুপদের মিত্রতাবন্ধন শিথিল করা। রাজা কুন্তিভোজ বসুদেব এবং কুন্তীর পিতা শূরের পিতৃস্বসার পুত্র। সুতরাং তাঁর সহানুভূতি বৃষ্ণিদের জন্যে। পাঞ্চালও শূরসেনের প্রতিবেশী রাজ্য। কংসের অত্যাচারে অনেক বৃষ্ণি সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। রাজা দ্রুপদও জানে যে জরাসন্ধ ও কংসের লোলুপদৃষ্টি আছে তার রাজ্যের উপর। সুতরাং কংসের রাজ্য বিস্তারের নীতি ব্যর্থ করতে দ্রুপদও কৃতসংকল্প। দু' রাজ্যের মাঝখানে আছে কুরুরাজ্য। যদি আমরাও রাজা কুন্তিভোজ ও রাজা দ্রুপদের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হই, তাহলে জরাসন্ধ ও কংসের রাজ্য বিস্তারের নীতি এক দুর্লঙ্ঘ্য বাধার সম্মুখীন হবে। যদি কুরুরাজ্য কংসের প্রতি শত্রুতার নীতি গ্রহণ করে নিস্পৃহও থাকে, তাহলে কংস এবং জরাসন্ধ দ্রুপদ ও কুন্তিভোজকে পৃথক পৃথক ভাবে পরাজিত করতে সক্ষম হবে কারণ ওদের সেনা-বাহিনী সম্মিলিত হতে পারবে না।"

"এই উদ্দেশ্যে ওরা গান্ধার রাজ-পুত্র শকুনিকে হস্তিনাপুরে এনে ধৃত-রাষ্ট্রকে নিজের প্রভাবাধীন করবার নির্দেশ দিয়েছে?" জিজ্ঞেস করলেন ব্যাসদেব।

"ওরা শকুনিকে নির্দেশ কিছু দেয়নি। ওরা দূত ও উপঢৌকন প্রেরণ করেছে গান্ধার-রাজ সুবলের কাছে, সুবলের সঙ্গে মিত্রতা করেছে। যত-দূর জানি জরাসন্ধ প্রচুর স্বর্ণ ও মণিমুক্তা দিয়েছে সুবলকে, সুবলের নির্দেশেই শকুনি হস্তিনাপুরে এসে বসবাস করতে আরম্ভ করেছে। এ ছাড়া আরো একটি সংবাদ আমি পেয়েছি।"

"কি সংবাদ?" জানতে চাইলেন ব্যাসদেব।

"কংস গোপনে দূত পাঠিয়েছে ধৃতরাষ্ট্রের কাছে। এই আশ্বাস দিয়েছে যে, কুরুরাজ্যের সিংহাসনে ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্রের অধিকার যাতে সর্বজনস্বীকৃত হয়, এর জন্যে কংস যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।"

পূর্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠপুত্রের অধিকার স্বীকার করে নিতে পারে, কিন্তু পশ্চিমাঞ্চল তো করবে না।"

"যদি আমরা রাজা কুন্তিভোজ ও রাজা দ্রুপদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কংস ও জরাসন্ধের বিরুদ্ধে সম্মিলিত প্রতি-রোধ গড়ে তুলতে পারি, তাহলে পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যও আমাদের পক্ষ অবলম্বন করবে। কিন্তু যদি কুরুরাজ্য নিরপেক্ষতা অবলম্বন করে তাহলে ওসব রাজ্য নিজেদের নিরা-

[illegible] জন্যে কংস ও জরাসন্ধের সঙ্গে কোনো না-কোনো রকম একটা সন্ধি করতে বাধ্য হবে। প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের রাজাও কংস ও জরাসন্ধের সঙ্গে মিত্রতা-সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। এদের সম্মিলিত শক্তির প্রতিরোধ করা এদিকের কোনো রাজ্যের পক্ষে এককভাবে সম্ভব নয়।"

"তুমি পারো দেবব্রত," ব্যাসদেব বললো ভীষ্মকে।

"হ্যাঁ, আমি পারি, তবে একলা নয়। যদি কুন্তিভোজ ও দ্রুপদের সঙ্গে সম্মিলিত হই, তাহলে পারি। যোদ্ধা হিসেবে জরাসন্ধ বা কংসকে আমার সমকক্ষ আমি মনে করি না। কিন্তু তাদের সম্মিলিত সৈন্যবল আমাদের কুরুরাজ্যের সৈন্যবলের চাইতে অনেক বেশী।"

"জরাসন্ধ আর কংস অনেক বিবেচনা করে গান্ধার রাজ্যের সঙ্গে মিত্রতা করেছে। সে আছে পশ্চিমে অনেক পেছনে। পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলি কংস ও জরাসন্ধের বিরুদ্ধাচারণ করবার আগে একথা নিশ্চয়ই ভেবে দেখবে যে তাদের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করতে পারে কংসের মিত্র গান্ধাররাজ সুবল এবং যেহেতু কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্র তাঁর জামাতা, এজন্যে ওরা কুরুরাজ্যের উপর ভরসা নাও করতে পারে।"

"ওখানেই তো আমার অসুবিধে," ভীষ্ম সখেদে উত্তর দিলো, "রাজ্যশাসন ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব আমার, অথচ রাজ্যের রাজা ধৃতরাষ্ট্র। তার অসম্মতিতে কিছু করার অধিকার আমার নেই। এদিকে জানতে পারলাম কংস চেদিরাজ দমঘোষের সঙ্গে মিত্রতাসম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এ কি করে সম্ভব হোলো আমি এখনো জানতে পারি নি। রাজা দমঘোষ বসুদেবের ভগ্নীপতি, কুন্তীর ভগ্নী শ্রুতশ্রবার স্বামী। সুতরাং তার সহানুভূতি তো বৃষ্ণিদের জন্যই হওয়ার কথা। আমার অনুমান কংস দমঘোষকে কুন্তিভোজের প্রতিদ্বন্দ্বী করে দাঁড় করাতে চাইছেন। সম্ভবত কুন্তিভোজের রাজ্য দমঘোষের রাজ্যের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়ার লোভ দেখিয়েছে কংস।"

"তোমার অনুমান ভুল নাও হতে পারে। দমঘোষ অত্যন্ত লোভী প্রকৃতির ব্যক্তি। তিন চার বছর তার কোনো সংবাদ পাইনি। তার কি কোন সন্তান হয়েছে?"

"তিন বছর আগে একটি সন্তান হয়েছে," ভীষ্ম উত্তর দিলো, "এই পুত্রসন্তানের নাম রাখা হয়েছে শিশুপাল।" [ক্রমশ।

সুনন্দার জন্য

বটকৃষ্ণ দাস

সুনন্দা, তোমার দুঃখ বুঝি আমি। কিন্তু নিরুপায়।
আমার আয়ত্তে নেই কাঞ্চন, কৌলীন্য, ঘরবাড়ি
অর্থাৎ তুমি যা চাও। আমি শিল্পী। একান্ত আনাড়ী
জীবনের কূটকর্মে। সমন্বয়ী রঙে ও রেখায়
ছিন্নভিন্ন স্মৃতির টুকরোকে আমি রূপ দিই। গড়ি
জীবনের যন্ত্রণার রক্তক্ষরা নিঃসঙ্গ প্রতিমা
অন্ধকারে। [illegible] বাঁচি, এই আর্ত অস্তিত্বের সীমা

আমাকে অস্থির করে। নিদ্রা কাড়ে নিষ্ঠুর শর্বরী।
সুনন্দা, তুমিও জানোঃ জীবনলক্ষ্মীর বরাভয়
চাইলেও, মেলে না। তাই অদৃষ্টের দেবতাকে রোজ
খাজনা দিয়ে, নির্বিকারে আমি তার অতীব সহজ
নিয়মকে মেনে চলি। শিল্পী আমি। আমার বাঙ্ময়
হৃদয়কে রূপ দিই। আযৌবন যে-নারী আমাকে
ভালবেসে পুড়ে গেলো,—আমি তার শীতল অংগারে
নিজেরই ব্যর্থতা ঢাকি। যে-আধারে তুলে ধরি তারে,—
তোমার অজ্ঞাত নয়। সুনন্দা, তুমিও চেনো তাকে॥

কুয়াশা

আশিক [illegible]পাধ্যায়

সারারাত যতো ঝরলো হিমের বৃষ্টি,
সকালের গলে পরালো মুক্তোমালা;
এখুনি ফুরাবে মেললে অরুণ দৃষ্টি
স্মৃতির শিয়রে ফিরবে দহন জ্বালা।

চুলু চুলু চোখে চিন্তায় তাই নয়
ছুঁড়ে ফেলে দাও বিলাসের কুললোভ,
দু' হাতে নিবিড় উত্তাপে সখী হয়
বিচূর্ণ, শত হৃদয়ের জমা ক্ষোভ।

তটিনীর ঢেউ সমুদ্র বুকে মিশে
উত্তাল ফণা ঊর্মিতে নেচে দোলে,
আমাদেরো এই জীবনের থরথরে
প্রতিজ্ঞা এসে স্বপ্নের দোর খোলে।

মনের আকাশে কুয়াশার ভিড়, সই,
দেখাবে না পথ, পাবে নাকো কোনো থই॥

চন্দেল্ল স্মৃতি ॥

॥ চেন্দ ॥

স্বপ্নের মধ্যে অতিবাহিত হচ্ছে ক'টি দিন। জীবনের ক'টি অবিস্মরণীয় দিন। এ কটি দিন মিলে জীবনের এক বিভিন্ন [illegible] পরিচ্ছেদ।

ভোরবেলা বার হই, কুয়াশার মধ্যে দিয়ে [illegible], ঘরে বেড়াই মন্দিরের ধারে ধারে। [illegible] একটি শিলামূর্তিকে ফিরে ফিরে বারে বারে [illegible], কোনো একটি মূর্তিকে হঠাৎ নতুন করে আবিষ্কার করি। চেয়ে চেয়ে চোখ আর ফেরে না, খেয়াল থাকে না কতো সময় কেটে গেল। যতোই দেখি, দেখা শেষ হয় না, জীবনে শেষ হবার নয়।

বেলা বাড়ে,—বাড়ে সূর্যের তাপ আর উত্তাপ। দেশী-বিদেশী নানা দর্শক মন্দির এলাকায় জমায়েত হয়। ক্রমে সূর্য মাথার উপর ওঠে। মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্য আবার সার্কিট হাউসে ফিরে যেতে ইচ্ছা হয় না। বাস স্ট্যাণ্ডের পাশে ভাজিপুরীর দোকান। সেখানেই [illegible] করি।

আবার ফিরে ফিরে আসি পশ্চিম মন্দির গোষ্ঠীর চত্বরে। ছায়ার আশ্রয়ে বসে থাকি মধ্যাহ্নের তপ্তবেলায়। কোন মর্মর মায়াবিনীর চারু আঁখির দিকে তাকিয়ে চোখ জড়িয়ে আসে।

আবার কখন চলে যাই জৈন মন্দির গোষ্ঠীর কাছে। পার্শ্বনাথ মন্দিরটি আবার দেখি। হাঁটতে হাঁটতে জটকারি মন্দির পর্যন্ত ঘুরে আসি। দেখে আসি তার বিরাট চতুর্ভুজ মূর্তি। প্রথম সেদিন ক্লোদ আর খারের সঙ্গে এদিকে এসেছিলাম। সেদিন এই জটকারি মন্দিরটি দেখা হয়নি।

সূর্য পশ্চিমে চলবার সঙ্গে সঙ্গে ছায়াঘন হয়, কুয়াশা নামে, শীত নামে। একে একে পর্যটকরা মন্দির এলাকা ছেড়ে চলে যায়। পশ্চিম মন্দির গোষ্ঠীর কাছাকাছির ভিড় পাতলা হয়। প্রত্নতত্ত্ববিভাগের যে কর্মচারীটি গেটের ধারে বসে বই আর ছবি বিক্রি করে সে তার মালপত্র গুছিয়ে তোলে। গেট বন্ধ হবার সময় হয়। ফাঁকা হয়ে আসে রাস্তার মোড়।

আমার রাতের আশ্রয় সার্কিট হাউস। সেখানে আর যারা আশ্রয় নিয়েছে তারা সকলেই বিদেশী। তাদের কয়েকজনের সঙ্গে মোটামুটি আলাপ হয়েছে। কিছু মুচকি হাসা, কিছু শুভ অভিবাদন, কিছু প্রশ্নোত্তর। দিনান্তে সার্কিট হাউসে ফিরে তাদের সঙ্গে সামাজিক মেলামেশা, হাসিগপ্পে যোগ দেবার উৎসাহ আমার নেই, প্রয়োজনও নেই।

তাই আমি পায়ে পায়ে যাই জর্ডিন মিউ-সিয়ামের পাশ দিয়ে মাতঙ্গেশ্বর মন্দিরে। এই মন্দির জীবন্ত। এই মন্দিরে আলো জ্বলে, পূজারী ও পূজার্থীর সমাবেশ। এই মন্দিরে সন্ধ্যারতির

নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

শঙ্খঘণ্টাধ্বনি। সিঁড়ির উঁচু উঁচু ধাপ বেয়ে মন্দিরে প্রবেশ করি। প্রণাম করি মৃত্যুঞ্জয় মহাদেব লিঙ্গকে।

কলঞ্জর দুর্গজয়ের সঙ্গে সঙ্গে চন্দেল্লশক্তির অভ্যুত্থান। মহাভারতের বনপর্বে ও পদ্মপুরাণের আদিখণ্ডে কলঞ্জর তীর্থের উল্লেখ আছে। কলঞ্জর অতি প্রাচীন শৈবতীর্থ। এখানে যুগ যুগ ধরে নীলকণ্ঠ মহাদেবের প্রতিষ্ঠা। এই তীর্থের দেবহ্রদে একবার স্নান করলে সহস্র গোদানতুল্য ফল। কলঞ্জর দুর্গ জয় করেন চন্দেল্লরাজ যশোবর্মণ। তিনি বিষ্ণু উপাসক ছিলেন। তাঁর পরবর্তী রাজা ধঙ্গদেবের সময় থেকে চন্দেল্লরাজারা একনিষ্ঠ শিবোপাসক হন। সর্বধর্মের প্রতি অনুকূলতা থাকলেও শিবই হন চন্দেল্লবংশের প্রধান উপাস্য দেবতা।

খাজুরাহোর শ্রেষ্ঠ মন্দির কাণ্ডারিয়া শিব-মন্দির। আর আজও খাজুরাহোতে যে মন্দিরে প্রতিদিনের পূজা আরাধনা চলে, সে মন্দিরও শিবেরই। মাতঙ্গেশ্বর শিবের মন্দির। মন্দিরের গর্ভগৃহের সমতল জুড়ে কুড়ি ফুট বৃত্তের বিরাট গৌরীপট্ট। আট ফুট উঁচু ও প্রায় চার ফুট ব্যাসের মসৃণ পাথরের বিশাল শিবলিঙ্গ। এই মন্দিরকে খাজুরাহোর পবিত্রতম মন্দির বলে মান্য করা হয়।

মাতঙ্গেশ্বর মন্দিরের আরতি শেষ হতে হতে খাজুরাহোর ভ্রমণকারীদের দিন শেষ হয়। হোটেল ধর্মশালা সার্কিট হাউসের অধিবাসীরা অধিকাংশই তাদের ডেরায় ফিরে গেছে। আমি এসে বসি বাস স্ট্যাণ্ডের উল্টো দিকের চায়ের দোকানের ফাঁকা বেঞ্চিতে। পাশে এসে বসে প্রিয়সঙ্গিনী ক্লোদ।

খারে বললে, দাদা, কথা দিয়ে কথা রাখছেন না, এমনি ফাঁকি দিচ্ছেন কেন?

ভোরবেলা বার হচ্ছিলাম, সার্কিট হাউসের গেট সবে পার হয়েছি, পিছন থেকে খারে ডাকল, অভিযোগ করল, আমি কথা দিয়ে কথা রাখিনি, এই কাক-ভোরে তাকে নাকি ফাঁকি দিচ্ছি।

খারের পরনে পায়জামা আর ঢিলে ওভার-কোট। বুঝলাম আমাকে ধরবার জন্যেই এই ভোরে উঠে এসেছে। বললাম, কী ব্যাপার? কী অপরাধ আমি করেছি?

এই যে কেউ না উঠতে গুটি গুটি সরে পড়ছেন? কথা দিয়েছিলেন সকালবেলাকার ব্রেকফাস্টটা রোজ আমাকে খাওয়াবেন, বেমালুম ভুলে গেছেন।

সত্যিই কথা দিয়েছিলাম সকালের ব্রেক-ফাস্ট আর রাত্রের ডিনার খারের সঙ্গে খাব, খারে হবে আমাদের অতিথি। কিন্তু পয়লা দিনের সকাল থেকেই ব্রেকফাস্টে আমি অনুপস্থিত। ভোরবেলা আমি ঘরে থাকতে পারিনে। সূর্যো-দয়ের আগেই আমি ছটফটিয়ে উঠে পড়ি, গলাবন্ধ কোট এঁটে দ্রুতগতিতে পথে বার হই। ঘন কুয়াশার মধ্যে দিয়ে হাঁটি, খাজুরাহোর মন্দির চূড়াকে প্রতিদিন সর্বপ্রথম দেখব এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে।

ব্রেকফাস্টের কথা মনেও পড়ে নি এ ক'দিন চায়ের দোকানের ঝাঁপ খুব সকাল সকালই খোলে,—উনুনে আঁচ পড়ে। পশ্চিম মন্দির গোষ্ঠীর চত্বরে একপাক ঘুরে এসে সেই উনুনের ধারে এসে বসি, কনকনে শীতের আড়ষ্ট আঙুল-গুলিকে আগুনের উপর মেলে ধরি। একটু পরে দোকানী সামনে মেলে ধরে ফুটন্ত চা আর কটা দিশী বিস্কুট।

আজ খারের কাছে ধরা পড়ে গেছি। সত্যিই

তাকে কথা দিয়ে কথা রাখিনি, ফাঁকি দিয়েছি। খারে বললে,—আজ আর ছাড়ছিনে। পথ আটকাতে চাইনে,—তবেঠিক সাড়ে আটটায় ফিরে আসবেন। অন্তত তিন দিনের পাওনা ব্রেক ফাস্ট আজ আপনার কাছ থেকে উশুল করব।

মুচকি হেসে বললাম, বহুত আচ্ছা।

সার্কিট হাউসের সামনেই সুন্দর সাজানো উদ্যান। একপাশে বিস্তৃত লন। কয়েকটি ছায়া-তরু। সেই লনে ঢুকতে দেখি মধুর রৌদ্রছায়ার নিচে নিচু টেবিল, বেতের চেয়ার। চারটি চেয়ার তার একটি খালি, আমার অপেক্ষায়। একটিতে খারে, একটিতে ক্রোদ, আর একটিতে যিনি আসীন, তাঁর পিঠটি দেখা যাচ্ছে।

ক্রোদ হাসিমুখে বললে, শুভ প্রভাত।

খারে বললে, আসুন দাদা। আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছি। আমার এক বন্ধু এসেছেন, আলাপ করিয়ে দিই।

নতুন মানুষটি উঠে দাঁড়ালেন। চোখে চোখ পড়ল। বললেন, আরে আপনি?

আমি বললাম, আরে গুপ্তেজী?

শান্তাপ্রসাদ গুপ্ত। খাজুরাহোতে থাকবার পথে যাঁর সঙ্গে পরিচয়। সাগর থেকে ছতরপুর পর্যন্ত যাঁর সঙ্গে এক বাসে এসেছি। নানা গল্প করেছি। বুন্দেলা নায়ক মহারাজা ছত্রশালের স্মৃতির প্রতি একসঙ্গে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছি।

গুপ্তেজী খারের বন্ধু। তাঁর সঙ্গে আগেই আমার পরিচয় হয়েছে শুনে সে যেমন আশ্চর্য তেমনি খুশিও হোলো। বললে,—যাক, একটা সারপ্রাইজ আপনি আমাকে দিলেন, এবার আমি আপনাকে একটা সারপ্রাইজ দিই?

সে আবার কী?

চট্ করে ব্রেকফাস্ট খেয়ে তৈরি হয়ে নিন। গুপ্তজীর জীপ রেডি।

কোথায় যাব?

যাবেন মহোবা।

খারের মতো লোক হয় না। গুপ্তেজী কাল রাত্রে সরকারী টুরে খাজুরাহো পৌঁছেছিলেন। খারে তাঁকে বলেছিল, তার এক বন্ধুকে মহোবা দেখিয়ে আনতে।

গুপ্তেজী রাজি হয়েছিলেন। সেই বন্ধুর সঙ্গে আগেই যে গুপ্তেজীর আলাপ হয়ে আছে তা অবশ্য খারেও জানত না। গুপ্তেজী বললেন, তোমার এই বন্ধুর সঙ্গে এখানে দেখা হবে এই সম্ভাবনা নিয়েই কিন্তু আমি এসেছি।

খারে খুব খুশি হোলো।

গুপ্তেজীর সঙ্গে তাঁর জীপে চড়ে মহোবা ভ্রমণের কথা একমিনিটে পাকা হোলো। সন্ধ্যেবেলা ফিরে আসা যাবে। এখন বেরিয়ে পড়লেই হোলো।

ক্রোদ স্মিতমুখে শুনছিল আমাদের কথাবার্তা। এবার চেয়ার থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। বললে,—বাঃ আমি যাব না বুঝি?

কপট দুঃখে কণ্ঠ করুণ করে খারে বললে, তুমিও যাবে? একটা দিনের জন্যে দাদাকে এখান থেকে সরাবার চক্রান্ত করলাম। ভাবলাম একটা দিন তোমাকে একলা পাব? সে আশাও ব্যর্থ হবে?

খাজুরাহো থেকে মহোবা চল্লিশ মাইল। পাকা রাস্তা। ঝাঁসি-মাণিকপুর রেলপথে মহোবা রেল স্টেশনও আছে। গুপ্তেজীর দ্রুতগামী জীপে ঘণ্টা দেড়েকের মধ্যে আমরা পৌঁছে গেলাম।

মহোবা চন্দেল্ল রাজধানী ছিল। বহু প্রাসাদ ছিল, বহু বিরাট মন্দির ছিল। বিভিন্ন শত্রুর আক্রমণ বারে বারে মহোবাকে বিপর্যস্ত করেছিল, তার গৌরব-মহিমা বিধ্বস্ত করেছিল। চন্দেল্ল যুগের স্মৃতিচিহ্ন বিরল।

প্রধান দ্রষ্টব্য কয়েকটি বিরাট বিরাট জলাশয়। প্রাকৃতিক হ্রদের মতো বিশাল। দশম একাদশ শতাব্দীতে চন্দেল্ল রাজারা এগুলি কাটিয়েছিলেন। সবচেয়ে বিখ্যাত মদন সাগর। এই সাগর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাজ মদন বর্মণ। আর একটি জলাশয়ের নাম কিরাত সাগর। মদন সাগরের তীরে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে মহোবা নগরী।

প্রতিহার-রাজধানী কাণ্যকুব্জের মতো চন্দেল্ল-রাজধানী মহোবাও একদা বহু প্রাসাদ ও মন্দিরে সুশোভিত ছিল। হিন্দু যুগের কোনো প্রাসাদের চিহ্নমাত্র নেই। শহরের উত্তর দিকে রয়েছে এক প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। সাগরের তীরে তীরে আধ-ভাঙা নানা মন্দির ও প্রস্তরমূর্তি।

এমনি এক মন্দির মদন সাগরের তীরে মনিয়াদেব বা মনিয়া দেবীর মন্দির। তা ছাড়া কণ্ঠেশ্বর শিব ও চণ্ডিকা দেবীর মন্দির। চণ্ডিকা মূর্তি অষ্টাদশভুজা। বারো ফুট উঁচু। শক্তি-উপাসকদের প্রিয়তীর্থ। মদন সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি পাহাড়,—সেই পাহাড়ে পাথর কেটে চব্বিশটি জৈন তীর্থংকর মূর্তি। শহরের পথে যেতে আরো কয়েকটি মন্দির আছে।

মদন সাগর ও কিরাত সাগর ছাড়া চন্দেল্ল-স্মৃতি-নিদর্শন অতি সামান্য। রামকুণ্ড একটি পবিত্র কুণ্ড। বলা হয় এখানে চন্দেল্ল বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রবর্মণ বা নন্নুক দেহরক্ষা করেন। মনিয়া-মন্দিরের সামনে একাদশ শতাব্দীর একটি শিলাফলক আছে। মদন সাগরের কাছে একটি শিলাস্তম্ভ আছে, যার নাম আলহা স্তম্ভ। মহোবা নগরে পরমার্দিদেবের দুই বীর সেনাপতি আলহা-উদলের নাম আজও স্মরণীয়। পৃথ্বী-রাজের বিরুদ্ধে মহোবার ভীষণ যুদ্ধে উদল নিহত হন। আলহা অত্যন্ত আহত হলেও প্রাণ হারান নি। লোকবিশ্বাস যে যোগবলে আলহা অমর হয়ে বিরাজ করছেন। কখনো কখনো মূর্তি ধারণ করে আজও তিনি দেখা দেন।

খাজুরাহো দেখতে এসে চন্দেল্ল-রাজধানী মহোবা ঘুরে যাবার ইচ্ছা হয়েছিল। গুপ্তেজীর সাহায্যে তা সম্ভব হোলো। মহোবায় রাজ-নৈতিক গরিমা চন্দেল্ল ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে অস্তমিত হয়েছিল। গুপ্তেজী বলেছিলেন,—চন্দেল্ল স্মৃতি হিসেবে খাজুরাহো ছাড়া আর কিছুই নেই। কলঞ্জর বা অজয়গড় দুর্গে কিছুই দেখবেন না। রাজধানী মহোবাতেও না।

ঠিক তাই। তবে শীতের বেলায় চল্লিশ-আশী মাইল মোটর ভ্রমণ ভালোই লাগল। দুপুরবেলা মহোবার এক খাবারের দোকানে আমরা খেলাম। গুপ্তেজী সরকারী অফিসার, তা ছাড়া আমাদের সঙ্গে সুন্দরী মেমসাহেব। দোকানী খুব যত্ন করে আমাদের বসালো। গরম ভাজা পুরী, আলু গোবীর তরকারী, মন দই আর খাস্তা গজা। ক্রোদ উভয় হাতের আঙুল ব্যবহার করে মহানন্দে খেল।

বিকেলবেলা আবার জীপে চড়ে চল্লিশ মাইল পথ পার হয়ে আমরা খাজুরাহো ফিরলাম অপরাহ্নের রোদ ফসল কাটা মাঠে সোনালী রঙ ছড়িয়েছে। অদূরের গ্রামের কিষাণের কুটিরগুলি যেন নতুন খড়ে ছাওয়া, পড়ন্ত রোদ্দুরে লাল টকটকে,—যেন ঝাঁকে ঝাঁকে বুগনভিলিয়া। স্টিয়ারিং-এ গুপ্তেজী, মাঝখানে ক্রোদ, একপাশে আমি। খোলা জীপের হু-হু বাতাসে খুশীভরে লুটোপুটি খাচ্ছে ক্রোদের সোনালী চুল। চকচক করছে তার গভীর নীল চোখ।

শেষ সন্ধ্যার আলো-আঁধারিতে সেই চোখ দুটি বিচ্ছেদ-বেদনায় কালো হয়ে ফুটে আছে। রাত্রির শেষ ক'টি ঘণ্টা,—কাল খাজুরাহো থেকে বিদায়।

মাতঙ্গেশ্বর মন্দিরের আরতি দেখতে গিয়েছিলাম শেষবারের মতো। প্রণাম করে ফিরে আসতে আসতে অন্ধকার ঘন। মন্দির চূড়াগুলি আর দেখা যায় না। দৃষ্টির আড়ালে খাজুরাহো।

ইতিহাস মৃত নয়, অর্থহীন নয়। ইতিহাস জাতির বুকের কালের অবিনশ্বর সুন্দর ইতিহাস আঙুল দিয়ে দেখায় আমরা কী ছিলাম, কী হয়েছি,—আবার কী হতে হবে। ইতিহাস শুধু জীর্ণ পুঁথি নয়, মৃত অক্ষর

নয়,—ইতিহাস জাতির চিন্তা-ভাবনা ধ্যান-ধারণা ও সৃষ্টি-সংস্কৃতির পরিচয়। যুগ যুগ ধরে ভারতবাসী যা সৃষ্টি করেছে, যে চিন্তা করেছে, সামাজিক চেতনা ও সংস্কারকে যে রূপে বিকশিত করেছে তাই ভারতবর্ষের ইতিহাস। সেই ইতিহাস ভারতবর্ষের ইতিহাস। সেই ইতিহাস ভারতবর্ষের সাহিত্য, ভারতবর্ষের ধর্মচেতনায়, ভারতবর্ষের সমাজ-ভাবনায়, ভারতবর্ষের স্থাপত্য-ভাস্কর্যের শিল্প-নিদর্শনে। সেই ইতিহাসের এক মহা-উদ্ভাসিত অধ্যায় চন্দেল্লকীর্তি খাজুরাহো।

খাজুরাহো দর্শন করে ভারত ইতিহাসের কী শিক্ষা লাভ করলাম তাই ভাবতে ভাবতে আসছিলাম। সেই চায়ের দোকানের বেঞ্চি। সেখান থেকে মৃদু ডাক দিল ক্লোদ। নীরবে তার পাশে গিয়ে বসলাম।

ক্লোদ একলা নয়। খাজুরাহোর শেষ সন্ধ্যায় ক্ষণকালের আরো দু'জন বন্ধু, খারে আর গুপ্তেজী। গুপ্তেজী তাঁর স্বভাবসুলভ মৃদু-কণ্ঠে কথা বলছিলেন,—আমি সে আলোচনায় শ্রোতা হলাম।

গুপ্তেজী বলছিলেন,---আমি ইতিহাস জানিনে, শিল্প জানিনে। আমি মাটি কাটার রাস্তা বানাবার ইঞ্জিনীয়ার। তবু আমি এ পথে মতোবার যাই, ঐ কাণ্ডারিয়া আর দেবী জগদম্বা মন্দিরকে একবার দেখে যেতে ভুলি নে। দেখি আর শিখি,---একটি শিক্ষাকে মনের মধ্যে শক্ত করে তুলি।

খারে মৃদু হেসে বললে,---কী সেই শিক্ষা ইঞ্জিনীয়ার সাহেব?

কোন এক পণ্ডিত বলেছিলেন,---কোন এক জাতিকে যদি জানতে চাও তার নারী জাতিকে জানো। যে জাতির নারী সুন্দর, সে জাতিও সুন্দর। যে জাতির নারী স্বাধীন সেই জাতিও স্বাধীন, খাজুরাহোর মূর্তিগুলি আমি দেখি,---আর ভাবি, আমাদের দেশ আমাদের জাতি একদিন কতো সুন্দর, কতো স্বাধীন ছিল।

ক্লোদ আস্তে আস্তে বললে,---ভারতবর্ষ আজ তো স্বাধীন মিস্টার গুপ্তে। আর আমি দেখেছি, আপনাদের জাতিও সুন্দর।

গুপ্তেজী মাথা নাড়লেন।

না, মাদ্‌মোয়াজেল, বহু শত বছরের দাসত্বের পর সবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি। স্বাধীনতার বনিয়াদ গড়বার স্বাধীনতা। আমি যেমন করছি, জঙ্গল কেটে রাস্তা বানাবার স্বাধীনতা। রাজনৈতিক দাসত্বের ফলে আমাদের নারীকে আমরা দাসত্বের শৃংখলে বেঁধে রেখেছিলাম---এখন সেই শৃংখল ভাঙছে, প্রকৃত স্বাধীনতার আশা জাগছে। তাকে আমরা ঘোমটার আড়ালে রেখেছিলাম। সেই ঘোমটা খসেছে,—তার সুন্দর মুখের আলোয় আমাদের অন্ধকার সমাজ সুন্দর হয়ে উঠছে।

গুপ্তের কথা শুনতে শুনতে আমিও ভাবছিলাম। আমাদের বেদ-উপনিষদে ঋষিকা ও ব্রহ্মবাদিনী মনস্বিনীদের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ থেরী-গাথায় উল্লিখিত হয়েছে ভক্তি ও শক্তিমতী ভিক্ষুণীদের নাম। রাজ্য শাসনে পারদর্শিনী নারীদের উল্লেখ আছে ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসে। নারী যোদ্ধৃবাহিনী ছিল। সভাসদা কুমারী কন্যারা স্বয়ংবর সভায় স্বামী নির্বাচন করতেন। নারীর হ্লাদিনী-শক্তির জয়গান করেছেন সংস্কৃত মহাকবির দল। তাঁদের সমস্ত কবি-প্রতিভাকে তাঁরা উজাড় করে দিয়েছেন নারীর রূপমাধুরীর বর্ণনায়।

আর সেই নারী চির শৃংখলিতা। বাল্যে পিতার, যৌবনে ভর্তার ও বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। সেই নারী, যে শিব-সংগম বিহ্বলা পার্বতী, সৃষ্টির অধিষ্ঠাত্রী। এই নাকি সমাজের বিধান,---কারণ নারীর আত্মা নেই। দেহও নেই, সে দেহ মন অবগুণ্ঠনের আড়ালে।

গুপ্তেজীর কথার জের টেনে খারে বললে,—ক্লোদ, তুমি মেয়ে। এ দেশে আসবার আগে এখানকার মেয়েদের কথা তুমি শুনে আসো নি? শোনো নি পর্দাপ্রথার কথা, বহু বিবাহের কথা, সতীদাহের কথা?

শুনেছি বৈকি। সে সব বুঝি মিথ্যে?

মিথ্যে কে বললে ক্লোদ? সব সত্যি, যেমন এই খাজুরাহো সত্যি। খাজুরাহো একদিন মিথ্যে হয়ে গিয়েছিল,--আর এরা হয়েছিল সত্যি। আজ দিন আসছে, মিথ্যে হয়ে যাচ্ছে সংস্কারের শৃংখল, সত্য হয়ে ফুটে উঠছে খাজুরাহোর বাণী। এই বাণীমন্ত্রে আবার উজ্জীবিত হবে আমাদের নারী,—তার নির্লজ্জ স্বাধীনতায়, তার অসংকোচ বলিষ্ঠতায়, তার আকুল সৌন্দর্যে সারা দেশকে ভরে তুলবে। তার বাসনার অসংখ্য আকর্ষণে জাতিকে নতুন সৃষ্টির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

এই আলোচনায় যোগ দিয়ে আমি কথা বাড়ালাম না। মনে হোলো আমাদের সঙ্গে না দেখে ক্লোদ যদি কোনো মেয়ের সঙ্গে খাজুরাহো দেখত তাহলে আরো ভালো হোতো। ভারতীয় মেয়ে, এ যুগের মেয়ে। এমনি দেখার নিমন্ত্রণ আমিও পেয়েছিলাম,---রাখা সম্ভব হয় নি।

কাল সকালে একই বাসে আমরা যাব। পান্না হয়ে সাতনা পর্যন্ত বাস বদলে সড়ক পথে এলাহাবাদ পর্যন্তও যেতে পারি। সেখানে বিদায় নেব ক্লোদের কাছ থেকে। ক্লোদ যাবে বারাণসী।

আমি বললাম,---ক্লোদ, এলাহাবাদে তুমি দু'দিন থেকে যেয়ো। সেখানে অনেক কিছু দেখবার আছে। তা ছাড়া আমাদের প্রিয় নেতা জহরলালের জন্মস্থান।

ক্লোদ বললে,---তাতে অসুবিধা হবে না। থাকার ব্যবস্থা করে দেবে তো?

নিশ্চয়ই করে দেব। খুব ভালো ব্যবস্থা। সে নিয়ে তুমি ভেবো না।

সেই মেয়ে। ভারতীয় মেয়ে, এ যুগের মেয়ে। তার এলাহাবাদের ঠিকানাটি আমার কাছে লেখা আছে। সেও ক্লোদেরই মতো আমার ক্ষণকালের যাত্রাসঙ্গিনী। সে স্বাধীন, সে সুন্দর, সে মূর্তিমতী বাসনা।

নাম তার সরযূ।

॥ সমাপ্ত ॥

শিল্পের বিক্ষত রাত্রি

অসীম বসু

শিল্পের বিক্ষত রাত্রি রহস্যে নিগূঢ়;
ধর্নান্ত বাঞ্জনা এক নিভৃত সত্তায়
হয়তো বা ইন্দ্রিয়ের আশ্রিতে বিধুর,
অহরহ ক্ষিপ্ত করে অনন্ত কথায়।

এক এক দশকের পীড়িত মন্ত্রণা
আক্ষেপে অমোঘ হয় সর্পদষ্টপ্রাণ,
ব্যথিত চিন্তায় ক্লিষ্ট হাজার মন্ত্রণা,
প্রতিটি দিনের মৃত্যু করেছি নির্মাণ।

বিক্ষুব্ধ যন্ত্রণা এক শব্দের অতীত
আলোকিত প্রতীক্ষায় প্রমূর্ত সংগীত।

তাইতো সূর্যের কালে বিষাদের গতি
প্রতিটি শোণিত ভাগে অশুভ লক্ষণ,
সহস্র শিল্পের স্বপ্নে নিষ্ফল প্রণতি
বিভ্রান্ত দিনান্তে তাই দৃপ্ত যতক্ষণ।

জিনিস পুরণো হ'লেই তার কদর সব সময় কমে না। কারণ জানা। একটা হ'ল পাতলা পকেট। হাত-ফেরতা মালের দৌলতে অনেক সময়ই কর্তাদের মুখ রক্ষে হয়, শুধু গিন্নীর কাছেই নয়, পড়শীর কাছেও বটে। এ ছাড়া কিছু হাতানর শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং মানসিক তৃপ্তি ত' আছেই। পুরণো আসবাবের দোকান প্রায়ই সরগরম। বাড়িরও মালিক পাল্টায়। তবে গাড়ির বাজারে হাত বদলের নক্সা বেশ জমাট।

নতুন গাড়ির জন্য অনেক সময়েই হাঁ করে বসে থাকতে হয়। অথচ, প্রয়োজন যুক্তি মানে না। কাজেই খোঁজ পড়ে পুরণো গাড়ির। তা ছাড়া ব্যক্তিগত নানা কারণে (পকেটের কথাটাও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য) নতুনের চেয়ে হাত-ফেরতা গাড়ির প্রতি অনেকেরই আন্তরিক টান লক্ষ্য করা যায়।

যাই হোক, পুরণো যানের বাজার ভাল। কী এ দেশে, কী য়ুরোপে আর আমেরিকায়। দিল্লীতে নাম করা পুরণো মোটর কেনার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায় হরদম। নতুন অমিল, নতুবা ট্যাক গরমিল অথচ পড়শীর নাকে অভিজাত যানের ধোঁয়া ছাড়তে না পারলে জীবনের অর্ধেক আনন্দই মাটি হয় শেঠজীর। কাজেই হাত ফেরতা গাড়ি ছাড়া গতি নেই। তারপর না হয় মেজে ঘসে বিগত যৌবনার জৌলুস ফেরান যাবে।

এখন, কেনার সময় খটকা বাধে—গাড়িটা ঠিক চালু থাকবে ত'? গালে

যন্ত্রবিদ্

চড় মেরে পয়সাগুলো নিচ্ছে না ত'? এ চিন্তা সব দেশের পুরণো গাড়ির খদ্দেরদের।

ইংল্যাণ্ডে বছরে হাজার পঞ্চাশেক গাড়ির হাতবদল ঘটে। বন্ধুবান্ধব বা বড় গোছের নাম করা দোকান ইত্যাদি থেকে চলে গাড়ি এবং টাকার লেন-দেন। এ দেশেও অর্থনীতির ভেল্কীতে কিছু লোকের ক্রম-স্ফীতায়মান জোব্বার পকেটের দৌলতে এ কারবার ক্রমশ ফলাও হচ্ছে। প্রয়োজনে ত' লাগেই—তা ছাড়া ধূলো উড়িয়ে যাতায়াত এখন এদেশে সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের অতি নির্ভরযোগ্য পন্থা। সেইসব ভাগ্যবানদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করছি দু'চার কথা। যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে ওয়াকেফহাল এবং নিতান্তই অনাড়ী মানুষ, সকলেরই উদ্দেশ্যে এই নিবেদন। শুধু পুরণো যান গ্যারেজে ঢোকানর রেস্ত এবং ইচ্ছে থাকলেই তা কাজে আসবে।

যেমন, গাড়ির ত্রুটি যে কীভাবে ঢেকে দেওয়া যায় একফোঁটা তেলের সাহায্যে তা না দেখলে বিশ্বাস করা কষ্টকর। ক্ষয়ে যাওয়া কল লুকোবার জন্য Sump-এর মধ্যে নতুন তেল দেওয়া চলে, তেল গাঢ়তর করলে oil Gauge-এর চাপ কৃত্রিম উপায়ে বেড়ে উঠবে।

রিয়ার এ্যাক্সেল থেকে হয়ত তেল চোঁয়ায়, অর্থাৎ হাফ্ শ্যাফ্টস দুমড়েছে, তা হ'লে একটা নতুন রিটেনিং ওয়াশার লাগালে তা ধরার কোন উপায় থাকবে না। ক্ষয়ে যাওয়া ক্রাউন হুইল আর পিনিয়ন-এর শব্দ বন্ধ করার জন্য রিয়ার এ্যাক্সেল তেলে টইটুম্বুর করলেই হাতে হাতে ফল।

সূক্ষ্মতর কায়দাও বেশ চালু। খুঁৎওলা ব্যাটারীতে কৃত্রিমভাবে চার্জ লাগান, কোন ভাঙা চ্যাসিস্ দণ্ড বা লোহার এ্যাংগল দিয়ে চাপ দিয়ে সাময়িকভাবে ক্রেতাকে খুশি করা, ভাঙা স্প্রিং ও পুরণো স্প্রিংয়ের টুকরোর সাহায্যে চাপ দিয়ে দেখিয়ে চালান চলে হরদম।

একরকম রাসায়নিক পিস্টন্ সীল্-এর সাহায্যে লজ্‌ঝড় এঞ্জিন-এর ঘড়ঘড়ানি থামান এবং তার ধূম্রজাল উদ্‌গীরণ বন্ধ করারও রেওয়াজ বর্তমান।

এমন গাড়ি হয় তো অনেক সময় দু'-চারশ টাকা কমেও মেরে দেওয়া যায়। সাধারণ বাজার দর থেকে ঐ টাকা ক'টা কম দিতে হ'লে খুশি হওয়ারই

কথা। কিন্তু রসিদের কালি শুকতে না শুকোতেই যদি স্প্রিং জানান দেয়, যদি হাণ্ডেলটা ঝাঁকুনির সঙ্গে সঙ্গে উঠে আসে? কিংবা একঝলক ধোঁয়া প্রায় দম বন্ধ করে দেওয়ার উপক্রম করে?

তা ছাড়াও, প্রায় সব সময়েই দোকানী বলে, আগে এক ভদ্রলোক গাড়িটা কিনে ব্যবহার করতেন। মালিকটি কেমন তা যাচিয়ে নেওয়া নিতান্ত প্রয়োজন—বহু ক্ষেত্রেই তিনি গাড়ি ভাড়া খাটানর কোন এক অফিসের কর্তাব্যক্তি, যাঁর নামে এবং ঠিকানায় কোম্পানীর সব গাড়ি রেজিস্ট্রী করা হয়ে থাকে। কাজেই মালিক একজন ত' বটেই, বুঝতেই পারছেন—শুধু শ'য়ে শ'য়ে চালকদের হাতে ঘুরেছে বেচারা, এই যা।

তবে বেশ বড়সড় কোম্পানীর কাছ থেকে পুরণো গাড়ি কেনা মোটামুটি নিরাপদ। কেন না, ওদের সুনাম খুব দরকার, কাজেই খদ্দের ঠকানতে ওদের বেশী উৎসাহ না থাকাই স্বাভাবিক।

ছোটখাট দোকান থেকে কিনতে হ'লে এমন দোকান বাছাই করা উচিত যা আগে কোনও বড় মোটর উৎপাদকের এজেণ্ট হিসাবে বেশ কিছুদিন কাজ করেছে সুনামের সঙ্গে।

সব থেকে ভাল গাড়ি সেগুলোই, যেগুলো শোফার-এর তত্ত্বাবধানে থাকে, কেন না, ঐ মানুষটি এ কাজে আগ্রহশীল। তা ছাড়া, যান্ত্রিক প্রবণতাসম্পন্ন মানুষের গাড়িও বেশ ভাল থাকে সাধারণত। একেবারে লজ্‌ঝড় হয় ব্যবসায়ের খাতিরে ঘোরাফেরা করেন যাঁরা তাদের গাড়িগুলো।

আরও দেখা উচিৎ কীভাবে গাড়িটা রাখা হ'ত। কারণ, খোলামেলায় পড়ে থাকলে মরচে ধরবেই। পুরণো যান কেনার সময় এ ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধান থাকতে হয়। রং করে বারবার স্প্রে করে মরচে ঢেকে দেওয়া যায়, কিন্তু তাতে মরচের বিস্তৃতি রোধ করা যায় না।

এছাড়াও, কেনার সময় গ্যারাণ্টি কার্ড নেওয়া উচিৎ। বিক্রেতাদের স্মৃতিশক্তি বড় দুর্বল, অনেক সময়েই।

ঝঞ্চাট কম নয়। তবুও মনে রাখলে ভাল হয় যে, কোন কোন কারণে অসুবিধে দেখা দিয়েছে বলেই গাড়ির হাত বদল ঘটেছে। ত্রুটি আছেই। তামাতুলসী হাতে নিয়ে তা বলা চলে। কাজেই বাইরের চকমকি দেখে চোখ ধাঁধালেও কিঞ্চিৎ ভেবেচিন্তে এগোনো উচিৎ। আর, যত সস্তায় পাওয়া যাবে তত ঝামেলা বাড়বে।

সব থেকে ভাল হয়—যদি যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে ক্রেতার বিশেষ জানাশোনা না থাকে—কেনার আগে এ ব্যাপারে উৎসাহী এবং কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন কাউকে দিয়ে ভাল করে পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া।

পুরণো চাল ভাতে বাড়ে। পুরণো গাড়িও ঝামেলা বাড়ায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, খুব দেখেশুনে না কিনলে।

গন্ধের প্রভাবঃ পশুপাখীর

কান কোন গন্ধ প্রীতিকর, কোন কোনটি বিরক্তি আনে। ঘরের ফুলদানীতে রাখা গোলাপগুচ্ছের অধিকাংশ মানুষের কাছে স্বাগত; ওই জায়গায় পচা, ঝাঁঝাল গন্ধওয়ালা রাখার কথা কেউ ভাবতেই পারে না।

পরন্তু, একই গন্ধ মানুষ এবং ইতর প্রাণিকুলের কাছে রম্য বা প্রীতিকর ঠেকে না। অধিকন্তু, মানুষের চেয়ে বহু প্রাণীর ঘ্রাণশক্তি তীব্রতর। যে গন্ধ শুঁকে কুকুর এমন একজনকে অনুসরণ করে যার অস্তিত্ব কোন মানুষের পক্ষে সন্দেহ করা পর্যন্ত অসম্ভব।

মানুষ এবং কুকুরের শরীর সংস্থান তুলনা করে দেখলেই এতে বিস্মিত হবার কিছু থাকে না। কুকুরের নাকের ফুটো—যে ফুটোয় অল্‌ফ্যাক্‌টরি সেল থাকে—বিশেষভাবে পরিণত, ওদের অল্‌ফ্যাক্‌টরি শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীর প্রসার মানুষের তুলনায় ঢের বেশী। মস্তিষ্কের যে স্নায়ুকেন্দ্রে গন্ধবার্তা পৌঁছিয়ে কাজে আসার মত হয় তাও উন্নত পরিণত। অন্যান্য বহু জন্তু সম্পর্কে এ কথা খাটে। কেন না, অনেক স্তন্যপায়ী, মাছ এবং পোকামাকড়ের পক্ষে দৃষ্টির তুলনায় গন্ধ বিচারক্ষমতা অধিকতররূপে প্রয়োজনীয়, ওদের জীবনে গন্ধের ভূমিকা প্রধান; যেমন আমরা চলি দৃষ্টি দিয়ে, ওরা তেমনি গন্ধ দিয়ে চালিত।

কোন কোন প্রাণীর আচরণ বুঝতে গেলে এই কথাগুলো মনে রাখা দরকার। বম্বিক্‌স প্রজাপতি দীর্ঘদিন প্রাণিবিদ্যার পণ্ডিতদের কৌতূহলান্বিত করে রেখেছে, বহু কিছু বিচিত্র প্রকল্পও তৈরী হয়েছে তার ফলে। কীটজ্ঞ পণ্ডিতেরা এই জাতের একটি উর্বর স্ত্রী-প্রজাপতির সাহায্যে বহু পুং প্রজাপতি ধরেছেন।

বমবিক্‌স স্ত্রী-প্রজাপতির পেটে একটি গ্রন্থি রয়েছে, তা থেকে খুব সূক্ষ্ম গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, আমাদের নাকে তা লাগা সম্ভব নয়। যখন কোন স্ত্রী-প্রজাপতি পুং-প্রজাপতিকে আকৃষ্ট করতে চায়, তখন সে ঐ গ্রন্থি ঘুরিয়ে সুন্দর গন্ধ বিস্তার করে। পতঙ্গর ঘ্রাণকেন্দ্র তার শুঁড়ে। যে-কোন প্রজাপতি-সংগ্রাহক পুং-বম্বিক্‌স থেকে স্ত্রী-বম্বিক্‌স পৃথক করতে পারেন ওদের শুঁড় দেখে, পুরুষের শুঁড় লম্বা এবং তাতে অসংখ্য অল্‌ফ্যাক্‌টরি সেল বর্তমান। ওদের বড়সড় শুঁড় থেকে বোঝা যায় কত বেশী ক্ষমতা-ওয়ালা ওদের অলফ্যাক্‌টরি সেলগুলো। শারীর তত্ত্বগতভাবে কুকুরের গন্ধগ্রাহক নাকের ফুটোর সঙ্গে ওগুলোর সাদৃশ্য আছে।

বস্তুবন্ধু

পুং-বমবিক্‌স প্রাণগুলোর গন্ধে আকৃষ্ট হয়। আকর্ষণকারিণীর চেহারা নিয়ে ওদের আদৌ মাথাব্যথা নেই। ব্যাপারটা আমাদের কাছে কিঞ্চিৎ অদ্ভুত ঠেকে, সন্দেহ নেই। ওদের কাছে প্রকৃতির আকর্ষণ নিছক গন্ধনির্ভর। গন্ধই সব আকর্ষণের সারাৎসার। স্ত্রী-শরীর থেকে গ্রন্থি কেটে নিয়ে আলাদা করে রাখা হয়েছিল। ফলে, যদিও তার চেহারার কোনও পরিবর্তন হয়নি, পুংপ্রজাপতি গ্রন্থিটির দিকে আকৃষ্ট হয়ে ওটার সঙ্গে মিলিত হ'তে সচেষ্ট হয়।

এই গন্ধটির রাসায়নিক সংশ্লেষণ সম্ভব হয়েছে কুড়ি বছরের একটানা চেষ্টার ফলে। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী অধ্যাপক Adolf Bufenandt-এর পরিচালনায় গন্ধগ্রন্থি থেকে বস্তু ভাগ করা হয় এবং তার রাসায়নিক গঠন ধরা পড়ে। এর পর ঐ জিনিষ তৈরী করা খুব শক্ত হয়নি। একটা কাচদণ্ডের ওপর সামান্য পরিমাপে তা রেখে দেখা গেছে পুং-প্রজাপতি ওর দিকে উড়ে আসছে, ঠিক যেমন কোনও স্ত্রী-প্রজাপতির দিকে আসে। বোঝা গেল স্পষ্ট করে যে, গন্ধই ওদের টানে, খুপসুরৎ চেহারা নয়।

রৌদ্রোজ্জ্বল কোন এক বসন্ত সকালে বনের মধ্যে হয়ত চোখে পড়ে পুং-বাম্বলবী'র আনাগোনা, গাছের গুঁড়ির গোড়ার দিকে। বাকলের নানা জায়গা ছুঁয়ে উড়ে যায়। শতখানেক গজ উড়ে যায়, কোন গাছের শাখার বসে, আবার একই কাণ্ড ঘটায়। চোয়াল দিয়ে পাতাগুলোর কিনারা ছোঁয়, উড়ে যায়, থতমত খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, আর তারপর ফিরে যায় যেখান থেকে সুরু করেছিল সেইখানে। ইতিমধ্যে একচক্কর দেওয়া হয়েছে অনেকটা জায়গা জুড়ে, যার মধ্যে সে বেশ রহস্যময়ভাবে অবতরণ করেছে বারকয়েক।

ওর চোয়ালের গোড়ায় গন্ধগ্রন্থি রয়েছে। এই বিচিত্র গন্ধটি আমরাও টের পাই। সকালবেলা ঘুরতে ঘুরতে পাতায় আর গাছের গোড়ায় পুরুষটি গন্ধ রেখে যায়। সকাল থেকে রাত্তির অবধি এই কাণ্ড চলে। বনের অন্যত্র অন্যান্য পুং-প্রজাপতি একই কাজে বিভোর।

যে বাম্বলবীগুলো ধরে চিহ্নিত করা হয়েছিল ছাড়ামাত্র ওরা আবার অন্তহীন পরিক্রমণ সুরু করে দেয়। পেটের তাগিদে আশপাশের মাঠে গেলেও, চট করে ওরা ফিরে এসে চক্কর দেওয়া সুরু করে। ওদের চিহ্নিত জায়গার গন্ধে আকুল হয়ে আসে স্ত্রী-বাম্বলবী। অপেক্ষা করে প্রেমিকের জন্য।

একই জায়গায় নানা জাতের বাম্বলবী থাকলেও স্ত্রীগুলোর অসুবিধে হয় না নিজের জাতের একজনকে বেছে নিতে। প্রকৃতিরাণীর কলাকৌশল বিচিত্রতম। জাত ভেদে চোয়ালের গন্ধ

বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে আচার্য লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে ফোঁটা দিচ্ছেন জনৈকা ছাত্রী। পার্শ্বে উপবিষ্ট রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রীমতী নাইডু

চিত্র সংবাদ ★

সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন শ্রীমতী ললিতা শাস্ত্রীকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীকামরাজের সঙ্গে আলোচনারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপ্রধান শ্রীহুবার্ট হামফ্রে। মধ্যে রাষ্ট্রদূত চেষ্টার বোল্‌জ

রাজস্থানের লোকনৃত্য-শিল্পীবৃন্দের সঙ্গে রাজধানীতে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী

● নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শ্রীমতী শাস্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন

● তাসখন্দের উজবেক ন্যাশানাল থিয়েটারে পাকিস্তানের রাষ্ট্রপ্রধান আয়ুব খান, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী শ্রীকোসিগিন ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী
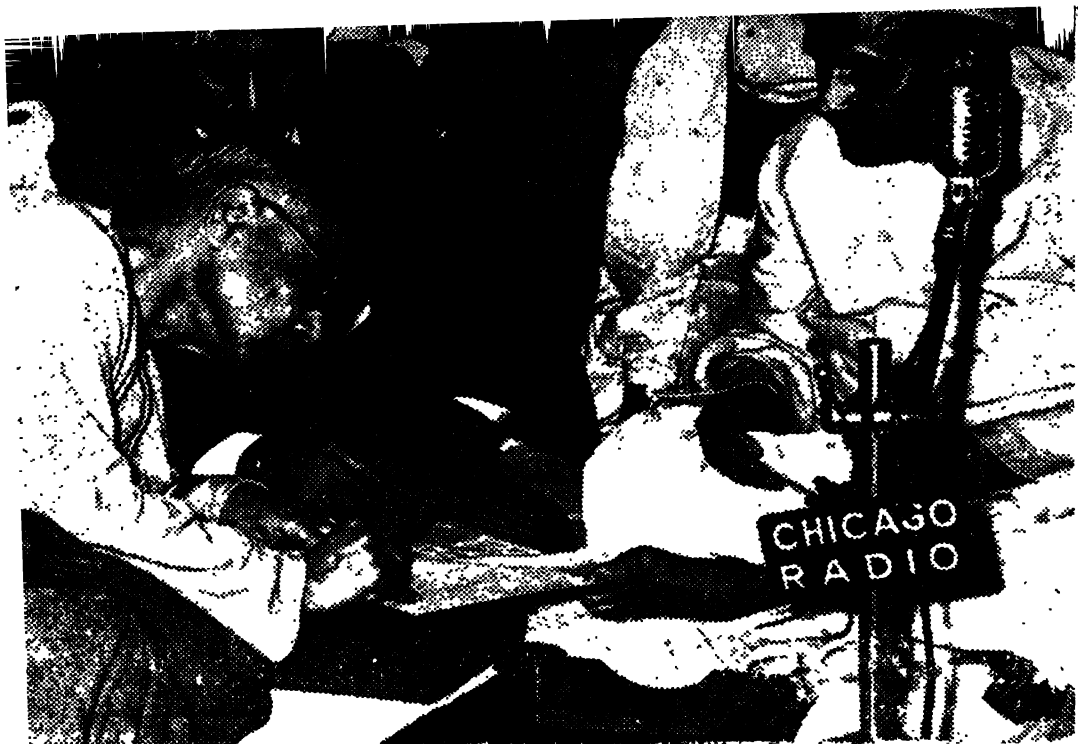
কুমার সিংহ হলে ভোট গণনার পর ফলাফল পত্রে স্বাক্ষর করছেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়
সামনে উপবিষ্ট রয়েছেন সভা-পরিচালক শ্রীরামসুভগ সিংহ

কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির নেত্রী নির্বাচনের পর ভোটারদের ধন্যবাদ দিচ্ছেন
শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী

ভিন্ন হয়। তা ছাড়া, কোন জাত নীচু ডালে বা শেকড়ের ওপর নিজেদের গন্ধ রেখে যায়, কেউ বা গাছের ওপরদিককার পাতার ওপর। অন্যদের পছন্দ ঘাস। জন্মগত প্রবৃত্তিবশে স্ত্রীগুলো বুঝতে পারে কোনখানে পুরুষের আমন্ত্রণ অপেক্ষা করছে তার জন্য।

এসব আকর্ষণীয় গন্ধর উদ্দেশ্য উপজাতিগুলো টিকিয়ে রাখে। কিন্তু খাবার যোগাড়ের ক্ষেত্রেও এর অবদান কোনমতেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ফুল ছড়িয়ে দেয় মনভুলান গন্ধ, ছুটে আসে পতঙ্গকুল, খাদ্যের সন্ধান পায় এবং ওদের অস্তিত্বও নষ্ট হয় না এর ফলে।

তা ছাড়া, ওদের পায়ে পায়ে রেণু ছড়িয়ে পড়ে একজাতীয় অন্য ফুলে এবং ফুলগাছগুলো বেঁচে যায়।

এই উর্বরীকরণে মধুলোভী মৌমাছি-কুলের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কেবল ক্ষণিকের ক্ষুন্নিবৃত্তি নয়, শীতের জন্যও ওরা জমায়। সেইজন্যই ফুলে ফুলে ওদের অবিরাম ভ্রমণ। মক্ষিকার আর একটা বৈশিষ্ট্য আছে : ওরা 'বিশুদ্ধ'; প্রত্যেকে একটা বিশেষ উপজাতির ফুল বেছে নেয়। পরাগমিলন কার্যকর হওয়ার জন্য অভ্যাস অতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু একেবারে নিঃসন্দিগ্ধ হ'লে তবেই এই বিশুদ্ধতা দেখান সম্ভব হয় ওদের পক্ষে। বিভিন্ন উপজাতির ফুলে গন্ধও ভিন্ন, এই ভিন্নতা ওদের চিনে নেওয়ার পক্ষে নিতান্ত জরুরী।

মনুষ্যেতর প্রাণিজগতে গন্ধের প্রভাব অপরিমেয়। খানিক জানা গেছে, আরও জানা যাবে। প্রকৃতির কোলে মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে প্রাণের লীলা অহরহ তরঙ্গিত। বড় বিচিত্র এই লীলা। মানুষের সঙ্গে ওই প্রাণিকুলের তফাৎ বড় কম নয়। পার্থক্য আছে বলেই ওরা আমাদের কাছে অত্যন্ত আকর্ষণীয়। রূপকথার মত মনোহর ওদের জীবনগাথা। আর, ওদের জীবনে গন্ধর প্রভাব সত্যিই বিস্ময়কর। মূলত গন্ধর ওপর নির্ভর করেই টিকে আছে অগণিত মনুষ্যেতর জীব।

প্রেম ও রাশিতত্ত্ব

ডাঃ কিন্‌সে-র Sexual Behaviour in the Human Male (১৯৪৮) এবং Sexual Behaviour in the Human Female (১৯৫৩) বই দু'টি তাঁর এবং তাঁর সহকর্মীদের প্রায় পনের বছর অনুসন্ধান ও গবেষণার ফল। ডাঃ কিন্‌সে তাঁর সহকর্মীদের সাহায্যে পাঁচ হাজারের কিছু বেশী মার্কিন নর ও সমসংখ্যক মার্কিন নারীর বিবাহপূর্ব ও বিবাহোত্তর যৌন-অভিজ্ঞতা বিষয়ে খুঁটিনাটি তথ্য সংগ্রহ করে উপরোক্ত বই দু'টিতে সন্নিবেশিত করেছেন। বই দু'টি স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমালোচনা হয়েছে বিস্তর। কেউ কেউ মনে করেন তাঁর অবলম্বিত পন্থা ঠিক বৈজ্ঞানিক নয়। অন্যরা বলেন বৈজ্ঞানিক উপায় অনুসরণ করা হ'লেও তার প্রভাব আদৌ মঙ্গলকর নয়। অর্থাৎ তাঁদের মতে চাপা থাকলেই অমঙ্গল এড়ান যেত। বেশ কৌতূহলজনক মত সন্দেহ নেই।

অন্যান্য যৌন-বিশেষজ্ঞরাও নানা তথ্য যোগাড় করেছেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে, এবং সংগৃহীত সংখ্যাতত্ত্বভিত্তিক মত প্রকাশ করেছেন নর-নারীর জীবনে প্রেম নামক অতি প্রাচীন এবং অর্বাচীন,

জ্ঞানান্বেষক

আধেক-জানা, আধা-রহস্যময় দেহ-মনের ওই বৃত্তিটি সম্বন্ধে।

সমকাম এবং বিপরীত কাম সম্বন্ধে ডাঃ কিন্‌সে নীচের তথ্য দিয়ে মার্কিন নরনারীর জীবনে ঐ দুই প্রবৃত্তির ধারণা দিয়েছেন—

০ : পূর্ণ বিপরীতকামী।

১ : প্রায় সকলেই বিপরীতকামী, সামান্য সমকামী।

২ : প্রায় সকলেই বিপরীতকামী, কিন্তু মাঝে মাঝে সমকামী। ক্রমানুয়ে সমকামিতার মাত্রা বাড়তে বাড়তে পূর্ণ সমকামী।

এ তথ্য মার্কিন দেশ সম্বন্ধে মোটামুটি প্রযোজ্য বলেই পণ্ডিতদের ধারণা।

এটি এবং সমজাতীয় আলোচনা পড়লে মনে হয় এত কাণ্ডের পেছনে মন নামক আপদটির কোন অস্তিত্ব নেই এবং সংখ্যামাফিক বিশ্লেষণ করলেই প্রেম রহস্যের চিচিং ফাঁক। তথ্যনির্ভরতা বৈজ্ঞানিক পন্থা ঠিকই। কিন্তু মানুষ নিয়ে—জ্যান্ত, সদা পরিবর্তনশীল মানুষ নিয়ে যে বিজ্ঞানের কারবার সেখানে কি বিশুদ্ধ তথ্যনিষ্ঠা ঠিক ছবি তুলে ধরতে পারে? মানবিক অনুভব চিন্তা ইত্যাকার ব্যাপার কি কোনকালে ধরা গেছে সংখ্যার জালে? এখনও পর্যন্ত না। কাজেই, ঐ সব যৌনবিদ্‌দের গবেষণার অপূর্ণতা অস্বীকার করার

কোনও পথ দেখাতে পাই না। যেন মানুষ নিছক দেহবিলাসী ; একজন পুরুষ ক'জন মেয়ের প্রেমে পড়েছে, ক'জনকে চুমুও খেয়েছে হিসেব করতে পারলেই প্রেম রহস্যের চি চিং ফাঁক হয়ে গেল। কিনযের রিপোর্ট পড়লে মনে হয়, প্রেম এক ধরণের ইনডোর গেম, যা কি না কায়দাকানুন রপ্ত করে কিছুদিন অভ্যেস করলেই হাতের মুঠোয়। আর, খেলা যখন, তখন যতজন সঙ্গী বা সঙ্গিনী জোটে ততই সুবিধে, ততই হাত রপ্ত হয়ে উঠবে। অনায়াস ভঙ্গী শ্বাস-প্রশ্বাসের মত আপন নিয়মে কাজ চালিয়ে যাবে আজীবন।

একটা কথা দুঁদে পণ্ডিতরা জিজ্ঞেস করতে ভুলেছিলেন : প্রেম করার সময় প্রেমিক বা প্রেমিকার হৃদয়াবেগ কী ধরণের হয়। এ সময় রক্তচাপ বাড়ে, সমস্ত দেহ ভীষণভাবে উত্তেজিত হয় ঠিকই, এ তথ্য তাঁরা জেনেছেন। কিন্তু এগুলো এক হৃদয়াবেগের বহিঃপ্রকাশ। মূল বস্তুটির খবর কি? প্রেম কি দৌড় প্রতিযোগিতা যে ওতে প্রেমিক-প্রেমিকার সংখ্যা যৌনাভিজ্ঞতার মাত্রা মনের ক্ষেত্রে সর্বাধিক মূল্যবান, অভিজ্ঞতার মানের চেয়েও বেশী? কাজেই, ঐসব রিপোর্ট যৌনজীবন নিয়ে প্রায়ই বিব্রত মানুষকে চিন্তিত করে তোলে, তাদের দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকে, নিজেদের ওপর অনেকেরই বোধহয় আস্থা কমে যায়।

যৌনাবর্তে পাক খাওয়া মানুষ শংকিত মনে ভাবতে থাকেন—বা বাবা! ব্যাপারটি তা হ'লে বেশ যান্ত্রিক, জীবন স্পন্দহীন—আনন্দদায়ক, মানসতৃপ্তিকর কিছু নয়। ফল, বহু ক্ষেত্রে তিক্ততা সৃষ্টি, নিজের প্রতি অবিশ্বাস ; শান্ত আনন্দ বা তৃপ্ত হৃদয়াবেগের অন্তর্ধান।

বহু আশঙ্কিত মানসতৃপ্তি প্রেমের আবির্ভাব ছাড়া সম্ভব নয়। প্রেম—যার সুরু দৈহিক কামনায়, পরিণতি মানস-সম্মিলনে—দেহ-মননির্ভর। ভারতীয় দৃষ্টিতে কাম-এ যার সুরু প্রেম-এ তার সারা। প্রেম প্রেমিক-প্রেমিকার তাদাত্ম্য-বোধ, যা চতুর্বর্গ পুরুষার্থ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষলাভের অভ্রান্ত পথ। দেহজ কামনার পঙ্কে যে মানসপদ্মের জন্ম তারই নাম প্রেম। এ প্রেম মানুষকে কাছে টানে, শেষে একীভূত করে দেয়। মনু বলেছেন—

ধর্মার্থাবুচ্যতে শ্রেয়ঃ কামার্থৌ ধর্ম এব চ।
অর্থ এবেহ বা শ্রেয়স্ত্রিবর্গ ইতি তু স্থিতি॥

এ দৃষ্টিতে কাম ধর্মবিরুদ্ধ। শ্রেয় ধর্মের সঙ্গে প্রেমের কোন বিরোধ নেই। কাম মূল, উপলক্ষ্য। তা আশ্রয় করে লক্ষ্য, প্রেম বিকশিত হয়ে ওঠে। এ চিন্তায় কাম ও প্রেম এক গভীর পরিণতির সূত্রে বিধৃত।

প্রেম এক গূঢ় ও গাঢ় অনুভূতি যা মুহূর্তের জন্যও প্রেমাস্পদ বা প্রেমিকার কথা ভোলে না, পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সঙ্গী বা সঙ্গিনীব গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন মমতা এর বৈশিষ্ট্য।

এই হল আসল কথা। নিছক দেহ-তৃপ্তির উপায় কখনও প্রেমপাত্র হ'তে পারে না। যৌন-জীবনে প্রেমের গভীর অনুভূতি না থাকলে সবই নিছক আঙ্গিকে পর্যবসিত হয় ; কৈশোরে বা যৌবনে একবারও ধর্মীয় মানসিক বাধা না পেয়ে কেউ যদি অসংখ্যবার যৌনমিলনে ব্রতী হন তা হলেও প্রেম নেপথ্যেই থেকে যায়। গবেষকদের সংখ্যাতত্ত্ব যেন মরম না জেনে ধরম বাখানের মত।

পারস্পরিক প্রীতিময় শ্রদ্ধার ভাব খুঁচিয়ে জাগান সম্ভব নয়। যৌন আঙ্গিকের গৎ মুখস্থ করলেও তা অলভ্য। ভিড় লেখেই আছে যৌন-বিশেষজ্ঞের চেম্বারে। যেন, দু' একটা টেকনিকাল ত্রুটি দূর হলেই মানুষের জীবনে প্রেমের ফুল ফুটে অম্লান সৌন্দর্য নিয়ে। ত্রুটি দূর করা দরকার অবশ্যই, কিন্তু মানুষ ভুলে যায় মূল রোগ তার হৃদয়ের গভীরে। সে রোগের জড় না মেরে দিলে তাদের জীবনে কখনও আকাঙ্ক্ষিত তৃপ্তি আসবে না। আসতে পারে না।

মনে রাখলে ভাল হয়—all true love is on based esteem.

তা হ'লে অনুভবে ধরা পড়ে প্রেম নিজেই পূর্ণ করে দেয়, দরকষার অপেক্ষা না করেই। প্রেম কখনও একক নয়, তা প্রেমপাত্রসাপেক্ষ—love is an egotism of two—এবং দু'য়ের egotism কালে ছড়িয়ে পড়ে বিশেষ থেকে নির্বিশেষে, তার মাধুর্য ক্ষরিত হয়ে স্নিগ্ধ করে তোলে মানব সমাজকে, কেবল প্রেমিক-প্রেমিকাকেই নয়। তখনই তা সার্থক। পূর্ণ। বৃহত্তর মঙ্গলের অঙ্গীভূত।

॥ ধারাবাহিক রচনা ॥

প[illegible] সার্থক। পদযুগল চরিতার্থ। [illegible] ধন্য। ক্ষুদিরাম দীর্ঘ কবিডোর দেখে [illegible] নিশ্বল। কামারপুকুরের দেউলটুকু [illegible]। এই তো প্রকৃত দেউল। দেবাদিদেব [illegible] মহেশ্বর। সবার ওপর যাঁর [illegible] তাঁর এই তো প্রকৃত মন্দির। এ কি [illegible] চোখ বন্ধ করলেই তিনি এ কি দেখছেন? [illegible] কামারপুকুরের নয়নাভিরাম রঘুবীর [illegible] "রঘুবীর" "রঘুবীর" বলে ব্রাহ্মণ [illegible] পড়েন।

[illegible] ধীরে ধীরে শঙ্করের নাম প্রবেশ [illegible]। [illegible] দল দূর থেকে ভোলা মহেশের [illegible] করতে আসছেন যে।

[illegible] আলো মিলিয়ে গেল? সেই [illegible] আলো দেখেছিলেন কামারপুকুরের [illegible]। ধীরে ধীরে মন্দমন্দ সমীরণ [illegible] যেন অবশ হয়ে আসছিল। পা দু'টো [illegible] না যেন। কোত্থেকে একটা অবসাদ [illegible] আঁকড়ে ধরলো। ক্ষুদিরাম সেদিন [illegible] পাশেই গভীর নিদ্রায় অসময়ে মগ্ন [illegible]।

[illegible]

[illegible] এক অদ্ভুত ঘটনা।

[illegible] পাশে এসে দাঁড়ালেন মানুষরূপে। [illegible] সেনাহীন। নিজমুখে বললেন, "[illegible] আমায় নিয়ে চলো। তোমার পবিত্র [illegible]।"

[illegible] ভেঙে গেল। আলোটা কোথায় মিলি[illegible]। ঠিক নীলও নয়, উজ্জ্বল [illegible] নয়, যেন জ্যোৎস্নাপুলকিত স্নিগ্ধ জ্যো[illegible] আভা।

[illegible] সেই আভাই আজ আবার দেখলেন [illegible]।

[illegible] কিন্তু সেই বনানী থেকেই উদ্ধার [illegible] রঘুবীর বিগ্রহ। আজও কামারপুকুর [illegible] সে বিগ্রহ নিত্য বন্দিত।

[illegible]

[illegible] কমলাসন রঘুকুলতিলকের [illegible] কল্পতরু দেবাদিদেব মহেশ্বরের [illegible] যাচ্ছে কেন?

[illegible] এক। অনিত্য জগতে শুধু এইটুকু [illegible] নিত্য। একো দেব: সর্বভূতেষু [illegible]। মানুষের ভিতর, জন্তু-জানোয়ারের ভিতর, প্রকৃতির বনরাজির ভিতর যে এক ও অদ্বিতীয় পরম দেবতা বিরাজমান ক্ষুদিরাম তাঁকে প্রণাম জানান মনে মনে। এ কি হলো তাঁর?

চোখ বন্ধ করে দেখছেন বিরাট মন্দিরের আলোর সাথে যেন সব কিছু মিলে গেল। আবার সেই আলো থেকে বেরুলো হলধর, মদন, গোপাল, নরহরি এরা যে সবাই কামারপুকুরের তাঁতি, কুমোর, কামার, চাষী। আবার বিস্ময়ে চোখ বন্ধ করেন ব্রাহ্মণ। এবার সব মিলে মৃদু হাসিতে সামনে দাঁড়ালো ধনুর্বাণধারী কিশোর অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র।

মনের সংশয় ঘুচলো না।

এ কি করে হয়?

ধীরে ধীরে ধ্যানমগ্ন ব্রাহ্মণ সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। মন ছুটে যায় পরম ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ সাগরে। সেখানে সবই মধুময়। ক্ষুদিরাম আপন অনুভূতিতে জানলেন এ বিশ্বের সবাই একই পিতার সন্তান। একই নদীর বিভিন্ন শাখা, একই সাগরে গিয়ে মিলছে তারা।'

শ্রীবিবেকরঞ্জন ভট্টাচার্য

জলের তরঙ্গ জলেই হচ্ছে লয়। বিন্দু বিন্দু গিয়ে মিলছে সিন্ধুতে।

ধীরে ধীরে গ্রামের দিকে যাত্রা করলেন। এ অনির্বচনীয় সুধাস্বাদের কথা সহযাত্রীকে আর কিছু বললেন না। কে জানে তারা কি ভাববে? কি বলবে?

সবার দিকে প্রসন্ন নয়নে তাকান। যে ক্ষুদিরাম সেদিন কামারপুকুর থেকে বেরিয়েছিল আর যে ক্ষুদিরাম আজ কামারপুকুর চললেন তাঁরা যেন একই লোক নয়। যেন এই কদিনে সব কিছু বদলে গেছে। একটা জ্যোতির্ময় প্রসন্নভাব এসে ক্ষুদিরামকে যেন অন্য মানুষ করে দিয়েছে।

সহযাত্রীর দল এটা লক্ষ্য করেছেন। তাঁরাও ধন্য। তীর্থযাত্রায় ক্ষুদিরামের সহযাত্রী হবার সৌভাগ্য যাদের তাঁরাও নেহাৎ নগণ্য যাত্রী নন। তাঁরাও প্রণম্য।

দিন গেল। মাস গেল। বছর এলো ফিরে। ক্ষুদিরাম ফিরে এলেন কামারপুকুরে।

পুত্র রামকুমার এসে প্রণাম করলেন। ছুটে এলেন কন্যা কাত্যায়নী। বিজয়গর্বে চন্দ্রা রঘুবীরের পুজো করেন। তাঁর জানা ছিল ব্রাহ্মণ বিনা বিপদেই ফিরবেন। এতদিনের এত আকুল ডাক বিফল যাবে না কখনও।

এলো তীর্থপিপাসু গ্রামের পুণ্যাত্মার দল। তীর্থ যাদের হয়ে ওঠে না, তীর্থযাত্রার কাহিনী তাদের সমান পুণ্য দেয়।

আনন্দাশ্রুতে ক্ষুদিরাম বসে পড়েন। বন্ধু, সখা, সুখলাল। আহা। এই সুখের দিনে তুমি কোথায়?

আরও একটা বছর ঘুরে এলো। ঘরে এলো দ্বিতীয় পুত্র।

তীর্থের নামে নাম রাখা হল তাঁর রামেশ্বর।

॥ তিন ॥

পাখীর কলকাকলিতে বন্দিত হয় নব অরুণোদয়। কোকিলের কুহুডাকে মধুবসন্তের সূচনা। নতুন যুগের ভোরে যাঁরা আসেন খেলার সাথী তাঁরা সাথেই আসে।

কামারপুকুরের ছোট্ট চাটুজ্জে পরিবারের অনেক পরিবর্তন ঘটে গেছে। ক্ষুদিরাম যেন সংসারে থেকেও সন্ন্যাসী। দিবাযামিনী কাটছে শুধু পূজার্চনায়। দিবানিশি শুধু এক স্বপ্ন—রঘুবীর।

বাংলার ছোট্ট নিরালা পল্লীটিকুতে যখন চলছে দরিদ্র ব্রাহ্মণের গভীর তপস্যা, সমগ্র বাংলা তখন ভারতবর্ষকে মোহান্ধ তমিস্রা থেকে আলোর পথের সন্ধান দিতে ব্যগ্র। নিদ্রিত জাতির ঘুম কিছুতেই যে ভাঙছে না। কয়েক দশকের ভিতর বিদেশী শাসক যেন সমগ্র দেশের চিন্তা-শক্তি ধ্যান-ধারণাকেও অন্ধ অনুকরণ মোহের মাকড়সার জাল বুনে আটকে ফেলেছে।

পলাশীর রক্তপ্লাবিত প্রাঙ্গণের বেদনাঘন কাহিনী কয়েক দশকেই যেন সবার মন থেকে মুছে গেছে। এদিকে ধীরে ধীরে নতুন শহর গড়ে উঠছে বাংলায়। নাম তার কলকাতা—কালিকা ক্ষেত্র। কলিকাতা, সুতানটি, গোবিন্দপুর মিলে গেছে।

নতুন শিক্ষার প্লাবন এসেছে রাজা রামমোহন রায়ের ডাকে। নতুন উৎসাহ। নতুন উদ্দীপনা। সংস্কৃতের সাথে সাথে ইংরিজী পড়তে হবে। জানতে হবে ওদেশের চিন্তা-

[illegible]। আনতে হবে ওদের যা কিছু ভালো। মুছতে হবে এদেশের যা কিছু কালো। চাই শুধু আলো—নতুন জগতের সাথে পরিচয়ের আলো।

রাজা রামমোহন ভাবতেন সংকীর্ণ রাজা। তিনিই ডেকে বললেন শুধু সংস্কৃত কেন?

জোন্স সাহেব লোক ভালো। সংস্কৃত কলেজ খুলেছো। তবে নতুন শিক্ষা দিতে এত ভয় কেন? কেন এত সংকোচ? এ দ্বিধার কারণ কি?

শিক্ষার অগ্নিশিখা সেদিন যে অগ্নিহোত্রী জ্বালিয়েছিলেন, বর্তমান জাগ্রত স্বাধীন ভারত নতমস্তকে তাঁকে আবার জানাক প্রণতি— রাজা রামমোহন রায়। শুধু এদেশে নয় রাজা-রাণীর দেশ সাতসমুদ্র তেরোনদীর পারে গিয়ে খাস বিলেতে গিয়ে রাজা জানালেন তাদের অজ্ঞানের অন্ধকারে যাদের আড়ালে ঢাকবার চেষ্টা করছো তারা আলোর সন্ধান পেয়েছে। বর্তমান শিক্ষার স্বাদ তারা পেয়েছে। তাদের আর পিছু ডেকো না। যেতে দাও এগিয়ে সামনের দিকে।

শুধু কি তাই?

কতশত বছর ধরে অসহায় বিধবার ক্রন্দন-রোলে বাংলার আকাশ-বাতাস বিষিয়েছিল কে জানে? বিধাতার রুদ্ররোষ বাংলা সমাজকে প্রজ্বলিত করতে চলেছিল। "সতীত্ব" নামে জীবন্ত কোমল নারীর দেহযজ্ঞে বাংলার আকাশ ছিল ধূমাচ্ছন্ন। দুর্যোগের ঘন ঘোর ঘটা ছিল আসন্ন। মৃত্যুর দুয়ারে গিয়ে যে নিরাশ্রয়া অবলার দল সমাজকে, জাতিকে, দেশকে অভি-সম্পাত করে চলেছিল ধীরে ধীরে তাদের মিশ্রিত অভিশাপে যে-বজ্র তৈরী হয়ে চলেছিল নতুন শিক্ষিত সমাজ সেদিন তার সঙ্কেত পেয়েছিল। ধর্মের নামে, ক্ষয়িষ্ণু সমাজের নিয়মে মানুষের মুখোস পরে যে জানোয়ারের দল আপন স্বার্থসিদ্ধির জন্য কোমল জীবনগুলোর অবসান ঘটাতে ব্যস্ত ছিল ধীরে ধীরে কে তাদের মুখোস খুলে দিলেন?

কে প্রথম গগনভেদী হুঙ্কার দিয়ে স্বার্থ-কামী পথ-কুকুরদলকে এ উন্মত্ত আগুনের খেলা থেকে দূরে তাড়ালেন? রাজা রামমোহন রায়।

চারিদিকে বাজানো হচ্ছে দামামা, দুন্দুভি। ধর্মের দোহাই দিয়ে খোল, করতাল। ধর্মের দোহাই দিয়ে কীর্তনের নামে হচ্ছে উন্মাদের প্রলাপ। স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত অবলা নারীকে আরোহণ করাবার রাজসিক আয়োজন।

কেন?

লোভ। শুধু প্রলোভন। ধন সম্পত্তির প্রলোভন। সংসার থেকে একটি জীবন সরাবার নিছক চাতুরী। পৃথিবী থেকে একটি মুখ সরলেই অন্নের অংশটুকু বাড়বে।

এরাই মানুষ নামক জানোয়ার। তাই সোনার বাংলার পল্লীতে পল্লীতে অবলার আর্তনাদ। এত বড় বাংলায় কেউ কি নেই এ অবলার বন্ধু? কোথায় সেই যোগসিদ্ধ পুরুষ—আপন শক্তি দিয়ে, আপন মেধায়, আপন তপস্যায় এ প্রবল উন্মাদ দলকে যে করবে পরাহত? এই কি জয়দেব, চৈতন্য মহাপ্রভুর সোনার বাংলা? কোথায় গেল সেই মহাপুরুষদের মহান তপস্যায় সংহত শক্তি?

তখনও গঙ্গার জল শুকোয় নি। গোদাবরীর চূর্ণ তরঙ্গমালা তখনও নৃত্যলীলা।

তাই শক্তির ডাক শোনা গেল মহাশক্তির পুণ্যতীর্থে।

একটি দুটি নয়। বছরে দশ সহস্র বিধবার জীবনাবসান ঘটতো সতীত্ব গ্রহণের নামে। লাসিংটন সাহেব সেটা যতই কমিয়ে বলুন না কেন।

রাজা রামমোহন শুধু কি রাজা? তিনি যে ঋষিও। রাজর্ষি। হাতে হাত মেলালেন বিদেশী শাসক। যেমনি শক্তি, তেমনি মন। দুটো মিলিয়ে দিয়েছে তাঁকে অটল সঙ্কল্প। রাজার কথায় সায় দিলেন লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক।

সেদিনের আকাশে ছিল মুক্তির আনন্দ। অবলা বালার মুক্তির অকৃত্রিম-অনাবিল বেদনা-ঘন আনন্দ। স্বামীহারা কোন নারী হাসতে জানে? তবুও জীবনকে কে না ভালবাসে? কে না বাঁচতে চায়?

তারিখটা মনে পড়ে? সেই নিদারুণ সতী-দাহ প্রথা কানুন দিয়ে এদেশ থেকে তাড়াবার তারিখ? সেদিন ছিল ডিসেম্বর মাসের চতুর্থ দিন। আঠারো শো উনত্রিশ সাল। ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষাংশ।

কামারপুকুর গ্রামের রামেশ্বরের বয়স তখন মাত্র তিন বছর। বাংলার রাজধানী বদলেছে। দুয়োরাণীর নির্বাসন হয়েছে। সুয়োরাণীর রাজত্ব। বাংলার সংস্কৃতি, রাজনীতির, কেন্দ্রস্থল বদলে গেছে—বুড়ী গঙ্গার তীর থেকে সেটা বদলে গেছে ভাগীরথীর তীরে। ঢাকা থেকে কলকাতায়। মাঝে কিছু-দিন কেটেছিল মুর্শিদাবাদে।

কলকাতার কাছে শ্রীরামপুর, হুগলী। যীশুর সন্তানদল এসেছেন। সাতসমুদ্র ডিঙিয়ে হতভাগা নাস্তিকদের মুক্তি বিতরণ করতে। 'হিদেনের' দলকে 'হেভেন'-এ নিতে। কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে এসেছেন ফাদার মার্শম্যান। এসেছেন কেরী। কলকাতায় পদার্পণ করেছেন হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও, ডেভিড হেয়ার।

বাংলার কাল্গুনে তখন নতুন আগুন। বিদ্রোহের আগুন। অল্প বিদ্যার বিপদ। বিদেশী শাসকের প্রতিচ্ছবি। হিন্দুয়ানার সিলেটাই হয়ে দাঁড়ালো আল্ট্রা মডার্ন ফ্যাশান। হিন্দুর ছেলে মাধব মল্লিক তো লিখেই ফেললে, "যদি হৃদয় দিয়ে কোনো জিনিষকে ঘৃণা করি, তাহলে সেটা হলো হিন্দুধর্ম।" ইফ্ দেয়ার ইস্ এনিথিং দ্যাট্ উই হেট্ ফ্রম্ দি বটম্ অব্ আওয়ার হার্ট, ইট্ ইস্ হিন্দুইস্‌ম্। আদালতে ছোকরারদল প্রকাশ্যভাবে বলতে সুরু করেছে গঙ্গাজলের দোহাই বললেন হুজুর? সেটা আবার কি জিনিষ? গঙ্গা জলটল আমরা মানি না। রসিক মল্লিক রসিয়ে বলল, "আই ডু নট বিলিভ ইন্ দি সেক্রেডনেস অব দি গ্যাঞ্জেস। তবুও গঙ্গার জল শুকোয় নি।

দেশ থেকে বাল্মীকি, বেদব্যাসের নির্বাসন হলো। নির্বাসিত হলেন কৌটিল্য, যাজ্ঞবল্ক্য মনু। তাঁদের জায়গা নিলেন বেকন, লক, হিউম, স্মিথ, পাইন, বেন্থামের দল।

কোন্‌টা পথ, কোনটা বিপথ, সেইটেই একটা বিপদে দাঁড়ালো। নতুন বিদেশী ছাঁচে দেশী লোকগুলোকে ঢালার চেষ্টা চললো। কোনো জায়গায় ছাঁচ ভাঙলো কাঁচা বলে। কোনো জায়গায় ভাঙলো দেশী কাঁচা মন। যে মন মজলো সে ভাঙলো আপন কুল, মান। ধর্ম গেল গঙ্গার জলে লুকোতে। অর্থ গেল বিদেশীদের নকলে নেশায়। মোক্ষ হল পিতৃ-পুরুষের চতুর্দশ পুরুষের শ্রাদ্ধে।

কবি মাইকেল মধুসূদন তখন শিশুমাত্র। কলকাতা থেকে বাহান্ন মাইল দূরে মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামের সিংহশিশু তখনও পায়ে হেঁটে কলকাতায় এসে পৌঁছোন নি।

॥ চার ॥

কামারপুকুরের ছোট্ট গ্রামে যখন বিহঙ্গকল কাকলি মুকুলিত কুসুমদলের সাথে প্রভাত বন্দনায় ব্যস্ত, প্রভাতীর সুরে বৈরাগীর প্রাণ-মাতানো গানে চোখ দুটো খুলে গ্রামের বধূ যখন সচকিত হয়ে ওঠে, ব্রহ্মাম্বরাদির স্তব পাঠরত ব্রাহ্মণ যখন নামাবলী কাঁধে খড়ম পায়ে দীঘির কালো জলের ঘাটের দিকে চলেছেন তখন বিশ্বের অপর প্রান্তে সাতসমুদ্র তেরো নদীর কিনারায় ইয়োরোপে কি চলেছে?

পলাশীর যুদ্ধের ঠিক ষাটটা বছর কেটেছে। ডাকাতির টাকা দেশে নিয়ে বিদেশী বণিক তখন একটা নতুন অভিনয় নিয়ে ব্যস্ত। এ অভিনয়ের হিরো হলো মেশিন। যুগটার গতি যেন সম্পূর্ণ অভিনব।

বাংলা-বিহারের রক্তে গড়ে উঠলো ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ড। ওয়ারেন হেস্টিংস-এর ইম্পিচমেণ্টে বার্ক, শেরিডনের মুখে ভারতবর্ষে তার অত্যাচারের কাহিনী শুনে বিদেশী পার্লামেণ্টে কোমলহৃদয়া নারী মূর্চ্ছা গেলেন। ক্লাইভের সিংহাসন, নীলামের টাকা তার কিছু দিন পূর্বেই জাহাজে ভরে বিলেতের বন্দরে গিয়ে পৌঁছেছে। ইয়াঙ্কদের মনস্তত্ত্ব ঘটালো যে বেজা ধাঁ ইতিহাসে

তার ক্ষমা নেই। বাংলা বিহার হারালো এক-তৃতীয়াংশ সন্তান। আকাশে-বাতাসে ভেসে গেল তাদের ক্রন্দনরোল। ধীরে ধীরে গড়ে উঠলো নতুন ধর্ম, নতুন সমাজ। গড়ে উঠলো ভারতের রক্তস্নাত নতুন অভিজাত সম্প্রদায়। জন্ম হল নতুন দর্শনের। নাম তার ক্যাপিটালিজম্। উদ্দেশ্য শুধু যক্ষের আরাধনা। পুঁজি সংগ্রহ। পুঁজি যাঁর, সমাজ তার। যক্ষ যার ওপর প্রসন্ন নতুন সমাজে তারই শুধু জায়গা। মানুষের মান নিরূপণের মাপকাঠি হলো পাউণ্ড শিলিং পেন্স—টাকা আনা পাই। এর একটখানি চুলচেরা ভুল করার উপায় নেই। বিধানের মান জমা পড়লো ধনীর পায়ে।

মানুষ আর মানুষকে মানুষ হিসাবে জানতে চাইল না। মানুষ মেশিনের সামিল হয়ে গেল। এতদিন টাকা আনা পাই ছিল মানুষের গোলাম, এবার মানুষ হলো টাকা আনা পাই-এর গোলাম। দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টে গেল। জীবন দর্শন বলে আলাদা আর কিছু রইলো না। পশ্চিম থেকে মৈত্রী-ভালবাসার নির্বাসন হলো—মানুষের প্রতি মানুষ তার কর্তব্য ভুলল। একটা নতুন ভূতুড়ে নেশা তার ঘাড়ে চাপলো—ম্যামন জায়গা নিল প্রেমের পূজারী ভগবান যীশুর। পশ্চিম বাঁধা পড়লো আপন সৃষ্টির জালে। নতুন সমাজে মানুষ দেখলো কলসী থেকে বেরুলো দানবটার মতন নতুন সৃষ্টি পদ্ধতি যেন হাঁ করে মানুষকে গিলতে আসছে। নতুন জীবনদর্শনে মানুষের পরিচয় হলো মেশিনের মালিকানা নিয়ে।

পশ্চিমের মাটি ডুকরে কেঁদে উঠলো। সন্তানেরা আর তার মাকে মানছে না। গ্রাম ছেড়ে সবাই ছুটছে নগরের দিকে। সেই নগর যেখানে নতুন নেশা ভাঙা বস্তী দিল তাদের নতুন আশ্রয়। গ্রামের খোলা মাঠ-পথ-ঘাট ফেলে মাতালের মতন চাষীর দল ছুটলো নতুন দানবের পদলেহনের লোভে। মৃগমরীচিকা হলো তারা শ্রমিক। বিবেক বুদ্ধি বিবেচনা চিন্তাধারা অবসর পূজার্চনা বাঁধা পড়লো পুঁজীবাদীর পদতলে। সেদিন শয়তানের অট্টহাসিতে পশ্চিমের দেবতা ভীতসন্ত্রস্ত হয়েছিলেন কি?

আজও তার ইতিহাস লেখা হয় নি। শুধু ভারতবর্ষের নিংড়ে নেওয়া রক্তেই নয়, পশ্চিমের শতসহস্র চাষীর নিষ্পেষিত শক্তিতে শত শত গ্রামের পুঞ্জীভূত বেদনাশ্রুতে গড়ে উঠলো উদ্ধত ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিভলিউশন। গ্রামের পর গ্রাম, অরণ্যের পর অরণ্য গ্রাস করে নতুন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন হাঁ করে গিলতে এলো তার আপন স্রষ্টাকে। মানুষ নিজের সৃষ্টিতেই নিজে শৃঙখলাবদ্ধ হলো। আপন সন্তানের খেলা দেখে প্রকৃতি সেদিন শুধু মৃদুভাবে হেসেছিলেন কি? সেদিনও টেম্‌স্-এর তরঙ্গমালা তার প্রবাহ বন্ধ করেনি; বন্ধ হয়নি পশ্চিমের আকাশে সূর্যকিরণ।

স্বার্থান্ধ সাম্রাজ্যলোলুপ পশ্চিমের রাষ্ট্র একে অন্যকে গ্রাস করতে চলল। চাই সাম্রাজ্য বিস্তার। চাই কলোনী। নিষ্পেষণ করার অভিনব পথ চললো। শুধু মানুষকে নয়, দেশকে। উদ্ধত ফ্রান্স মাথা নীচু করেছে। মদগর্বী নেপোলিয়ানের হিসাবে ভুল ধরা পড়েছে। শুধু আত্মম্ভরিতায় একটা দেশ জাগতে পারে না। একটামাত্র লোকের অহমিকাকে রূপায়ণে জাগে না কোনো জাতি। চাই তপস্যা, সাধনা। গভীর তমিস্রার ভিতরই আলোর জন্ম। তমিস্রার তপস্যাটুকু কার চোখে ধরা পড়ে? কে বলতে পারে শক্তির উৎস কোথায়?

দার্শনিক স্পিনোজার দিব্যদৃষ্টি যেন বাস্তবরূপ নিল। দেড়শো বছর পরে তাঁর অনুভূতি রূপ পেতে চললো। কেউ কখনও কল্পনা করতে পেরেছে কি সমাজে পবিত্র বাইবেলের জায়গা নিয়ে কখনও প্রশ্ন উঠতে পারে? কিন্তু উঠলো কলহ। আবার কলহ। প্রেমের দেবতার সন্তান আত্মঘাতী কলহ জাগাল।

তুমি কে?

আমি প্রোটেস্টান্ট?

তুমি?

আমি রোমান ক্যাথলিক।

তুমি কে?

আমি ডেভিড ষ্ট্রস।

কি বলতে চাও?

প্রশ্ন করছি যীশু বলে ইতিহাসে সত্যি কি কেউ ছিল?

এ যে ব্ল্যাসফেমি।

তুমি কে?

জানো না কনিবিয়ারের নাম?

কি বলতে চাও?

যীশুর এত ভজনা করছো সবাই। প্রমাণ করতে পারো—

যীশু বলে সত্যিই কেউ ছিলেন? বাইবেলের এত সমাদর। বলতে পারো বাইবেল-এর কটা কথা তোমাদের যীশু সাহেবের?

এ যে ডিলিরিয়ম।

উন্মাদের প্রলাপ?

তুমি কে?

ম্যাথু আরনল্ড। শুধু ধর্মের পথেই কি চালাতে শিখছো বাইবেলে? যদিও প্রকৃত পথের সন্ধানও পাচ্ছ ওখানে, পবিত্র বাইবেল দিচ্ছে তোমাদের নতুন একটা অমৃতের সন্ধান। বলতো সেটা কি? সেটা সাহিত্য। সেইটেই প্রকৃত সাহিত্য যাতে পাবে জীবন দর্শন।

শুধু কি তাই? ঐ যে নতুন একটা সুর আসছে, ওঁরা কি বলতে চান?' 'গড্ ক্রিয়েটেড ম্যান?' ভগবান মানুষ তৈরী করেছেন? কে বলেছে? আমি চার্লস লায়েল বলছি যা কিছু চলছে সবার পিছনে রয়েছে শুধু বিজ্ঞান। আর কিছু নয়। শুধু বিজ্ঞান।

তারপর?